দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৩ | ১ম সংখ্যা

ফকিরের বাঁশি

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

বেদনায় বেদনায় পা ফেলিয়া পার যদি এস তবে কাছে,
কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ পথখানি তোমা তরে প্রসারিত আছে।
জানি তুমি ব্যথাভীরু' আসিবেনা আশা কভু করিনা তোমার,
কুশাঙ্কুর বেঁধে যদি যাবে থামি, নয়নে বহিবে অশ্রুধার।

এ পথে চলিতে পারে সে-ই শুধু যার নাই কোনো বিবেচনা,
ভদ্রাভদ্র শুভাশুভ সুখদুঃখে আছে যার সম অ-চেতনা,
আছে শুধু দুর্নিবার গতিশক্তি, বাঁধিতে পারে না যারে কিছু,
সমুন্নত শির যার, থাক ভার মাথা কভু করেনা সে নীচু।

অগ্রসর হয় যত করে তত ক্ষিপ্রগতি, বহেনা উজানে,
বাহিরের প্রবর্ত্তনা নিরর্থক চলে শুধু অন্তরের টানে,
ক্ষতি লাভ গণনা সে শিখে নাই, শিখিবেনা জানি কোনো কালে।
ফেলে মুছি হেলাভরে কী ভবিষ্যবাণী বিধি লিখিয়াছে ভালে।

নিতান্ত যে বেপরোয়া দ্বিধাহীন আমি শুধু তারে ভালবাসি,
অকুতোভয়ারে জানি এপথে আনিবে টানি উদাসীর বাঁশি।

মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব *

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি, ব্যারিষ্টার-এট-ল

পুণ্যশ্লোক পরমহংসদেবের নাম ধারণ করিয়া আপনাদের এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত। আজ এই সম্মেলনে সেই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। সে আলোচনা শতাধিকবার শত শত সাধকবৃন্দ ও মনীষিগণ নানা প্রদেশে নানা আকারে করিয়াছেন। আমি এই সভাতে শুদ্ধ পরমহংসদেবের ঐশী প্রেরণালব্ধ যে গূঢ় সত্য যাহা আপনাদের এই সংঘকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহারই আংশিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় আপনাদের সংঘের মূল উদ্দেশ্য লোকহিত-ব্রত প্রচার—অর্থাৎ মানুষ কি করিয়া স্বার্থ-সঙ্কুচিত সামান্য লাভের লোভ ত্যাগ করিয়া পরার্থ-প্রসারিত অসামান্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়—পূর্ণ মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হয় সেই বার্ত্তার সন্ধান সুযোগ প্রদানই আপনাদের সংঘের মুখ্য চেষ্টা। এত বড় কথা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা সাধারণের নাই—কারণ জীবনের উপলব্ধি নিম্নতম স্তরের সংজ্ঞা বোধে সম্ভবপর নয়। ভগবান বশিষ্ঠ বলিয়াছেন :—

> তরবো জীবন্তি, জীবন্তি পশু-পক্ষিণঃ।
> স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

গাছ পালা পশু পক্ষীর যে জীবন ধারণ তাহাতে জীবনের উপলব্ধি নাই, যথার্থ জীবন বলিতে মনন-যুক্ত জীবন বোঝায়। মানুষ তখনই নিম্নতম অস্তিত্বের স্তর অতিক্রম করিয়াছে যখন সে তাহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়াছে; জড়ত্ব অতিক্রম করিয়া, পশুত্ব অতিক্রম করিয়া সে জীবত্বে পৌঁছিয়াছে। সেই প্রথম জীবন-সত্বা বোধ কিন্তু মনুষ্যত্বের উন্মেষমাত্র। র‍্যাশনালিটির (Rationality) অঙ্কুর এখনও মরত্বের সীমা ছাড়িয়ে যায় নাই, শুদ্ধ মনন বৃত্তি অমরত্বে লইয়া যায় না, কারণ যে জ্ঞান পারম্পর্য্য-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আপেক্ষিক ও অপরিণত। পূর্ণ জ্ঞান এনে দেয় অনন্তের আভাস, সে জ্ঞান চেষ্টালব্ধ নয়, তাহা কেবল অতিমানুষ সাপেক্ষ। Karl Spitteler বলিয়াছেন An Anfang war Schlaft, Ich erganze an Anfang war Traum অর্থাৎ জীবনের প্রারম্ভে সুপ্তি শুধু সুপ্তি নয় স্বপ্ন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শত শত নরনারী এই স্বপ্নাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে না। কখন কখন এক একজন মহাপুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ জাগ্রত হ'য়ে উঠেন। সেই জাগ্রত অবস্থার তীব্র বেদনাবোধ তাঁহাকে স্থির হইতে দেয় না। এই অবস্থাতেই আমাদের পিতামহ জীবন-প্রভাতে তূর্য্যধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত ক'রে বলেছিলেন "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্যবরাণ্ নিবোধত! এই জাগরণ মন্ত্র যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সে মনুষ্যত্ব সীমা অতিক্রম ক'রে দেবত্ব সান্নিধ্যে এসে পড়ে। সে পায় অমৃতের সন্ধান। এই অবস্থাতেই মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃত স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্", এই অবস্থাতেই যীশু বলিয়াছিলেন "What will it profit a man if he gets the whole world and loses his own soul?" আত্মার বিনিময়ে সমস্ত জগৎলাভে কি ফল?

স্বয়ংসিদ্ধ রামকৃষ্ণদেব জীবনব্যাপী সমাধিতে প্রতিপন্ন করেছেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই বিশ্ব ঈশান্বিত, ঈশানুপ্রাণিত। এই জ্ঞান অমরত্বলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে। এখানেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা—দেবত্বের প্রতিষ্ঠা।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্থে যে দেবত্ব বুঝায় এই মূল সূত্রটি রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের জগদ্ব্যাপী জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া বেশ দেখা যাইতেছে যে জীবনের উদ্দেশ্য মানুষের দৈনবত্ব পরিপুষ্ট করা এই আদর্শে জনসাধারণকে গড়িয়া তোলা পশ্চিমদেশীয় বুধ-

মণ্ডলীর বিশেষ সাধনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক জীবনপ্রবাহের ধারাতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয়। কিন্তু অনন্তকালব্যাপী পরিবর্ত্তনে কখনই অব্যয় শক্তির স্ব-প্রকাশ সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই একটি নবজাগরণ আসিয়া পড়ে যাহাতে প্রকৃতির গূঢ় অন্তঃকরণে যে সত্য নিহিত আছে সেই অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্ববীজের স্বরূপ অন্ততঃ সাঙ্কেতিক আকারে প্রতিভাত হয়। এই যে নূতন জীবনালোক সে শুধু জীব ও জড়ের গঠনপার্থক্যবোধক নয়, সেই আলোক এই দুই শ্রেণীর প্রকৃতি-গত বৈষম্যও স্পষ্ট করিয়া তুলে। এই বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে সাধারণ সংজ্ঞাবোধক অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া পূর্ণ Humanism মনুষ্য-বাদ বিস্তার লাভ করে। অবশ্য মানুষের সত্তা নির্ণয়ের এই চেষ্টা চিরদিনই মানুষের অন্তর্নিহিত তবে সাধারণতঃ ইহা সুপ্ত। অসামান্য ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে সেই সুপ্ত চেষ্টা জাগিয়া উঠে। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সত্য বহু ব্যক্তি-পুঞ্জের সমবেত চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহাই এক যুগ-মানবের পূর্ণ মনুষ্যত্বে হঠাৎ অসামান্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একটা সহজ উদাহরণের কথা অনেকেরই মনে হইবে। মানুষ যখন শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করে তখন তাহার সকল আয়াস সংজ্ঞা-নির্দ্দিষ্ট সীমায় বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যখন মাত্র স্থূল লক্ষণ নির্দ্দেশক আনুমানিক জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-বোধক প্রজ্ঞা-প্রয়োগবিধি মানুষ আয়ত্ত করে তখন হয় তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু জনসাধারণের জন্য এ বিধি নহে। গ্রীক দার্শনিক (বোধ হয় Socrates) বলিয়াছেন Gnothi Seanton আত্মানং বিদ্ধি। কিন্তু কথায় বলা ও কাজে করা, এই 'দুই'এর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। হাজার হাজার বার হাজার হাজার লোক অনেক বড় বড় কথা মুখে বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু কাজে দেখাইয়াছেন কয় জন? ইহার কারণ আমাদের অতি তুচ্ছ স্বচেষ্ট সাধনে ফল অল্পই পাওয়া যায়, যখন পরম পুরুষের অনন্ত বিভা মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণ করে তুলে তখনই আমরা বুঝিতে পারি

• Alles Vergangliche it nur ein Gleichriss এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ একটি প্রতীক মাত্র। যে বিরাট পুরুষ অণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরমাণু পুঞ্জীভূত ক'রে বৃহৎ অপেক্ষা বৃহত্তর জগৎ গঠন ক'রেছেন তাঁহারই আংশিক আবির্ভাব সামান্য মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যে পরিবর্ত্তিত করে। মানুষকে দেয় দেবত্ব।

পরমহংসদেব শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার সাধারণ পণ্ডিতসুলভ শাস্ত্র-জ্ঞানের আবশ্যকতা ছিল না। তিনি সকল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সকল জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, —তিনি যে তত্ত্বজ্ঞ। যে জ্ঞান মানুষকে যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সামান্য, যাহা কিছু নশ্বর সে সকলের পরপ্রান্তে যাহা বৃহৎ, যাহা অসামান্য, যাহা অবিনশ্বর সেই অমৃতের সন্নিধানে লইয়া যায় সেই জ্ঞানে মণ্ডিত ছিলেন এই যুগাবতার। শঙ্করাচার্য্য হয়ত সোঽহং মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের পরমহংসদেব যে অমৃতের ধারায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত ক'রে গিয়েছেন তাহা অনন্য-সাধারণ। মনুষ্যত্ব এখানে দেবত্বে পরিণত হয়েছে। আর আমাদের দেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে এমনটি সম্ভবপর হইত না। প্রথম সাম গীতের ধ্বনিতে আমাদের তাপোবনে অমৃতের বার্ত্তা ঘোষিত হয়েছে, জলদগম্ভীর স্বরে বিশ্বপ্রান্ত কম্পিত হয়েছে

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ
জানাম্যহং ত্বাং পুরুষং পরস্তং

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর আমি সেই পরমপুরুষকে জানিয়াছি। এই বাণী রামকৃষ্ণের নিকট অতি সত্য হইয়াছিল। তিনিও আমাদিগকে সেই ঋষি-বাক্যই স্মরণ করাইয়াছেন। আমরা যেন এই অনবদ্য পুরুষের আচারপূত মহাপ্রাণ মন্ত্র তাঁহার শিষ্যের মতনই উচ্চারণ করিবার শক্তি লাভ করি। উপনিষদের মহা উদ্বোধন চিরদিন আমাদিগকে জাগ্রত রাখুক

অসতো মাং সদ্‌গময়।
তমসো মাং জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচি

* (বারাকপুরে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সম্মেলনে পঠিত)।
২৭ অক্টোবর ১৯৩৬

দুল্ব-বর্ণিত বৌদ্ধ-সঙ্গীতির বৈঠক

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু, ডি-এস্‌সি

রাজগৃহ ও বৈশালীসঙ্গীতি, এবং কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনা পরম্পরা তিব্বতীয় "দুল্ব" (বিনয়-পিটক) শাস্ত্রের একাদশ খণ্ড হইতে লওয়া হইয়াছে ; ইহাই তিব্বতী-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একমাত্র প্রামাণিক বৃত্তান্ত। বিদ্যাকরপ্রভ ও ধর্মশ্রীপ্রভ নামে দুই বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত হইলেন তিব্বতী ভাষায় অনুবাদকর্তা। প্রায় বাহান্ন বৎসর হইল, W. Woodville Rockhill উক্ত খণ্ডের অনুবাদ তাঁহার ইংরাজী বুদ্ধচরিতে প্রকাশ করেন, * এস্থলে তাঁহারই অনুগমন করিলাম।

১

জ্ঞান ও সুকৃত মহিমায় সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত মহাকাশ্যপ বুদ্ধনির্ব্বাণের পর অবগত হইলেন যে লোকে বলিতেছে, "যখন শারিপুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অশীতিসহস্র, মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্তরহাজার এবং শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশসহস্র ভিক্ষু কালগ্রাসে পতিত হইল, তখন ভগবান তথাগতের বাণী ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে ; কারণ, উক্তশক্তিমান্‌ ভিক্ষুগণের অন্তর্ধানে বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সূত্রান্ত, বিনয় ও মাতৃকা-বিষয়ে আর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেখা যায় না।" মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগের এইরূপ নিন্দাবাদ, দোষারোপ ও কুৎসা শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন তাঁহারা যেন তথায় (কুশীনারায়) অবস্থিতি করেন। ভিক্ষুগণ স্বীকৃত হইলে মহাকাশ্যপ মাননীয় পূর্ণকে বলিলেন, "পূর্ণ, ঘণ্টা বাজাও, ভিক্ষুদের আহ্বান কর।" স্বীকারান্তে পূর্ণ পরমমোক্ষের চতুর্থপাদ ধ্যানে মগ্ন হইয়া জ্ঞানালোক অর্জ্জন করিলেন ; অতঃপর ঘণ্টাবাদন করিতে লাগিলেন। সেই বাদ্যশ্রবণে দিগ্বিদিক্‌ হইতে ভিক্ষুমণ্ডলী মিলিত হইতে লাগিল ; ইহাঁদের মধ্যে পঞ্চশত অর্হৎ ছিলেন। মহাকাশ্যপ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রদ্ধেয়গণ, ভিক্ষু-সংঘের কোন্‌ বিশিষ্ট সভ্য এখানে উপস্থিত হয়েন নাই ?" তাঁহারা (অনুসন্ধানে) অবগত হইলেন যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ গোভাম্পতি উপস্থিত নাই। গোভাম্পতি এই সময়ে শীরিষকবৃক্ষ তপোবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাশ্যপ পূর্ণকে বলিলেন, "পূর্ণ, যথায় গোভাম্পতি বিরাজ করিতেছেন তথায় যাইয়া তাঁহাকে বল যে 'সংঘের সর্ব্বসভ্যসন্মিলিত কাশ্যপ তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন ত্বরায় সংঘের কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হন'।" মহামান্য পূর্ণ সম্মত হইয়া কুশীনারা পরিত্যাগ করিলেন এবং সত্বর শীরিষকবৃক্ষ তপোবনে উপস্থিত হইয়া গোভাম্পতির চরণবন্দনান্তে কাশ্যপবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে গোভাম্পতি চিন্তা করিলেন ব্যাপারটি কি হইতে পারে, 'নিশ্চয়ই অনিত্যতার বাত্যাস্পর্শে জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে', কারণ ভগবান বুদ্ধ গত হইয়াছেন। পূর্ণকে তিনি জানাইলেন যে তিনি যাইতে অক্ষম, তাঁহার অন্তিমকাল সমাগত। এজন্য তিনি পূর্ণের হস্তে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ও তিনপ্রস্থ বহির্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "এগুলি সংঘে প্রদান করিও।" অতঃপর মন্ত্রবলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি নির্ব্বাণগতি লাভ করিলেন। তাঁহার পূতদেহকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পূর্ণ যমল শালতরুকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; তথায় পঞ্চশতভিক্ষু লইয়া কাশ্যপ তাঁহার অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভিক্ষাপাত্র ও পরিচ্ছদ উপহার দিয়া তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত গোচর করিলেন।

কাশ্যপ ভিক্ষুদের বলিলেন যে মগধেই সুগত সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন এজন্য সেইখানেই সম্মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়,

* "Life of the Buddha", W. W. Rockhill, Chap V, 1884.

এবং এবিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। জনৈক ভিক্ষু বোধিবৃক্ষমূলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কাশ্যপ বলিলেন যে অজাতশত্রু একজন দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসী রাজা, এজন্য সংঘের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন, এ হেতু রাজগৃহে যাওয়াই সমীচীন। ভিক্ষুগণ সম্মত হইয়া প্রশ্ন করিলেন যে প্রভুর পরিচর্য্যাকারী আনন্দকে সংঘ প্রবেশে অধিকার দেওয়া যাইতে পারা যায় কিনা, কারণ বহু সূত্র আছে যাহা প্রভু আনন্দকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কাশ্যপ বলিলেন, "দেখুন, যদি আপনারা আমাদের সব ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে দলভুক্ত করেন কতিপয় ভিক্ষু বিরক্ত হইতে পারেন; এজন্য আমি বলি, যদি আনন্দকে সংঘের পানীয় যোগাইবার ভারার্পণ করা যায় তবে প্রবেশাধিকার দেওয়া চলে, নচেৎ তাহাকে বর্জ্জন করিতে হয়।" ভিক্ষুগণ এ বিষয়ে সম্মতিদান করিলে কাশ্যপ আনন্দকে বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় আনন্দ, তোমাকে সংঘের নিমিত্ত পানীয় সরবরাহের কার্য্য যদি দেওয়া হয় তবে তুমি···।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

অতঃপর কাশ্যপ প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করিলেন: "শ্রদ্ধেয়গণ শ্রবণ করুণ। এই মাননীয় আনন্দ ভগবান তথাগতের পার্ষদ ছিলেন, এবং ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান বহু সূত্র বলিয়াছেন, ইঁহাকে সংঘের পানীয় সরবরাহক নিযুক্ত করা হইল। এক্ষণে আমি আপনাদের সম্মতি ভিক্ষা করিতেছি, যদি সমীচীন বোধ করেন তবে মৌনবলম্বন করিয়া থাকিবেন।" ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইলে কাশ্যপ পুনরায় আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, তুমি যে রাস্তা দিয়া সুবিধা হয় ভিক্ষুগণসহ রাজগৃহে গমন কর; আমি [সহজেই]* যাইতেছি।" তৎপরেই কাশ্যপ রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিবামাত্র শ্রীবুদ্ধের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইল ও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাকাশ্যপ তাঁহাকে সূত্রান্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্মে সম্যকভিজ্ঞ পাঁচশত ভিক্ষুর উদ্দেশ্য অবগত করাইলে তিনি তাঁহাদের আবশ্যকীয় যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। নিমন্ত্রণযজ্ঞস্থলীরূপে সহরটি নানাবিধ সজ্জায় বিভূষিত হইল।

আনন্দের সহিত স্থবিরগণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় তাঁহারা সঙ্গীতির বৈঠক মনোনীত করিবেন; কারণ, কালান্তকনিবাস বংশকুঞ্জ অথবা গৃধ্রকূট পর্ব্বত উপযুক্ত স্থান নয়, তবে ন্যগ্রোধগুহা †. বেশ নির্জ্জন কেবল স্থানাভাব না হইলেই হইল। নৃপতি শেষোক্ত স্থানটি উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে জানিয়া তথায় আসনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

২

ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে কাশ্যপ অনিরুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন যে সংমিলিত ভিক্ষুগণমধ্যে রিপুর দাস কিংবা অবিদ্যাচ্ছন্ন কেহ আছেন কিনা অনুসন্ধান করিতে। অনিরুদ্ধের আবিষ্কারে মাত্র একজন ঐরূপ আছেন বিঘোষিত হইল; তিনি স্বয়ং আনন্দ। অতএব কাশ্যপ ভিক্ষু সম্মেলনে তাহাকে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন।

আনন্দ

মাননীয় কাশ্যপ, ধৈর্য্যধারণ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি কখনও নৈতিক কোন অপরাধ করি নাই, কোন উপদেশ অমান্য করি নাই, সদাচরণের বিরুদ্ধে কদাপি দণ্ডায়মান হই নাই, সংঘের পক্ষে অশোভন অথবা অনিষ্টকর কোন কার্য্য করি নাই।

কাশ্যপ

আনন্দ, তুমি তথাগতের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলে, তুমি যে তোমার উক্ত অপরাধগুলির মধ্যে কোন কিছুতে অভিযুক্ত নও ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তুমি বলিতেছ যে সংঘের কোন অনিষ্ট কর নাই। যদি তাহাই হয় তবে ভগবানের বাক্য 'স্ত্রীজন সর্পের মতই ভয়াবহ, সংঘে তাহাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া মূঢ়তা' হেলন করিয়া তুমি কি বল নাই যে 'তাঁহাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া যাইতে পারে'?

---

*অর্থাৎ "বায়ুর উপর দিয়া"—Rockhill.

†অথবা পিপ্পলগুহা (Fah Hian, পৃঃ ১১৭: Hiuen Thsang B. IX. পৃঃ ২২)। রক্‌হিল্ বলেন যে বৈভব-পর্ব্বতস্থ সপ্তপর্ণীগুহাতেই সংঘের অধিষ্ঠান হয়। এবিষয়ে 'মহাবংশ' দ্রষ্টব্য।

আনন্দ

স্থৈর্য্যলাভ করিয়া শুনুন্ কাশ্যপ। আমি ভাবিয়াছিলাম মহাপ্রজাপতী গৌতমীর কথা। তিনি কত সহ্য করিয়াছিলেন? শ্রীবুদ্ধের মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। এজন্য, আমি নিবেদন করিয়াছিলাম যে মাত্র আমার আত্মীয়াগণই সংঘে প্রবেশ করিলে কোন দোষ হইবে না। আমার মনে হয় ইহাতে লজ্জাকর কোন কার্য্য করা হয় নাই।

কাশ্যপ

যখন নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবান বলিলেন যে 'বুদ্ধেরা ইচ্ছামত তাঁহাদের জীবনকাল বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ,' তখন তুমি কেন তাঁহাকে এই ধরাধামে আরও কিছুকাল থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলে না? ইহাতে মনুষ্যগণের কল্যাণই হইত।

আনন্দ

কাশ্যপ, ইহাতে আশ্চর্য্য বা লজ্জার কোন হেতু নাই, কারণ মার আমার উপর প্রভাব বিস্তার করায় আমি ঐরূপ অনুরোধ করিতে পারি নাই।

কাশ্যপ

আর একটি অপরাধ করিয়াছ। তুমি একদিন শ্রীবুদ্ধের হেমবর্ণ পরিচ্ছদের উপর পদস্থাপন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলে।

আনন্দ

আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম, কারণ সেখানে কোন ভিক্ষু-বন্ধু উপস্থিত ছিলেন না।

কাশ্যপ

আরও এক অপরাধ করিয়াছ। যমলশালবৃক্ষ মধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ তথাগত তোমার নিকট পানীয় প্রার্থী হইলে তুমি তাঁহার নিমিত্ত জল আনিতে যাও নাই।

আনন্দ

কাশ্যপ, এবিষয়ে, আমি তিরস্কৃত হইবার যোগ্য নহি; কারণ, কুকুস্থন নদীর উপর দিয়া সেই সময়ে পাঁচশত মালবাহী শকট চলিয়া যাওয়ায় নদীর জল কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল, পানের পক্ষে তাহা অনুকূল ছিল না।

কাশ্যপ

তুমি কেন সে সময়ে তোমার ভিক্ষাপাত্র আকাশের দিকে পাতিলে না, দেবগণ তাহা জলপূর্ণ করিয়া দিতেন? অধিকন্তু, তথাগতের বিধান ছিল যে প্রতি মোক্ষসূত্রের ষাণ্মাসিক আবৃত্তিকালে যখন 'ক্ষুদ্র নৈতিক অনুশাসন এবং খুঁটিনাটি উপদেশ * আসিবে তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ ইচ্ছামত আবৃত্তি চালাইতে বা বন্ধ করিতে পারিবে; কিন্তু আনন্দ, কি হেতু তুমি 'ক্ষুদ্র নৈতিক অনুশাসন এবং খুঁটিনাটি উপদেশ' কোন ভাগ তাহা ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও নাই †!...এক্ষণে (তোমার এই শৈথিল্যহেতু) আমি বলিতেছি যে, ৪ পারাজিক, ১৩ সঙ্ঘাদিশেষ, ২ অনিয়ত, ৩০ নির্স্গগিয় পচিত্তিয়, ৯০ পচিত্তিয়, ৪ প্রতিদেসনীয়, এবং যাবতীয় সেখিয়া ধর্ম্মগুলি 'ক্ষুদ্র নৈতিক অনুশাসন ও খুঁটিনাটি উপদেশ' মধ্যে গণ্য। কেহ বলেন, যাহা ৪ পারাজিকে ১৩ সঙ্ঘাদিশেষে ২ অনিয়তে ৩০ নির্স্গগিয় পচিত্তিয়ে ৯০ পচিত্তিয়ে ৪ প্রতিদেসনিয়ে নাই তাহা 'ক্ষুদ্র নৈতিক অনুশাসন ও খুঁটিনাটি উপদেশ' বলিয়া গণ্য। কেহ বা বলেন যে, যাহা ৪পারাজিকে ১৩ সঙ্ঘাদিশেষে ২ অনিয়তে ৩০ নির্স্গগিয় পচিত্তিয়ে এবং ৯০ পচিত্তিয়ে নাই তাহা 'ক্ষুদ্র...উপদেশ' মধ্যে গণ্য। কেহ কেহ বলেন, ৪ পারাজিক ১৩ সঙ্ঘাদিশেষ ২ অনিয়ত ৩০ নির্স্গগিয় ভিন্ন সমস্তই 'ক্ষুদ্র...উপদেশ' বলিয়া পরিগণিত। পুনশ্চ, অপরে বলিয়া থাকেন, ৪ পারাজিক ১৩ সঙ্ঘাদিশেষ ২ অনিয়ত ভিন্ন সবই 'ক্ষুদ্র...উপদেশ'। এক্ষণে যদি কোন তির্থিক জানিতে পারেন যে কতিপয় ভিক্ষু চারি পারাজিক মান্য করিতেছেন অথবা ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ ধরিয়া আছেন, তবে আমার মতে বলিতে হয় যে "শ্রমণ গৌতমের মতবাদ ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে: যাবৎ গৌতম জীবিত ছিলেন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার বিধি পালন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহারা যদৃচ্ছরুচি প্রশ্রয়ের আশ্রয় লইতেছে, যাহা তাহারা করিতে চায় তাহাই করে, যাহা চায় না তাহা করে না।" অতএব, আনন্দ! তুমি ভবিষ্যৎ

*'minor precepts and minutiae'—Rockhill.

†আনন্দের এই বিষয়ে ত্রুটি হওয়ায় মনে হয় 'প্রথম সঙ্গীতি' আহ্বানের একটি মুখ্য কারণ।

মানবসন্তানের জন্য এবিষয়টি তথাগত হইতে না জানিয়া লওয়ায় অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করিয়াছ।

আনন্দ

যখন তথাগত এই বাক্যগুলি বলেন তখন তাঁহাকে চিরতরে হারাইতে হইবে এই আশঙ্কায় আমি দুঃখে মুহ্যমান ছিলাম।

কাশ্যপ

আনন্দ, তুমি কি ভুলই করিলে! ভগবান তথাগতের পার্ষদ হইয়া যদি একথা স্মরণ রাখিতে যে যাবতীয় সৃষ্টপদার্থই স্বভাবে অনিত্য, তবে শোককাতর হইতে না। অধিকন্তু তুমি নীচ প্রকৃতি স্ত্রীপুরুষগণকে তথাগতের গুহ্যাঙ্গ দেখাইয়া-ছিলে কেন?

আনন্দ

শ্রদ্ধেয় কাশ্যপ, ইহাতে আশ্চর্য্য বা লজ্জিত হইবার কোন হেতু নাই। আমার ধারণা হইয়াছিল যে স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ কামাসক্ত, যদি ভগবানের গুহ্যদেশ তাহারা দর্শন করে তবে তাহারা বিরতকামাই হইবে।

কাশ্যপ

আরও দেখ আনন্দ, তুমি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকগণকে ভগবানের হিরণ্ময় দেহ দেখাইয়াছিলে কেন? তখন তাহারা অশ্রুজলে ঐ দেহকে অপবিত্র করিতেছিল? *

আনন্দ

আমি ভাবিয়াছিলাম যদি তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন, তবে অনেকের মধ্যেই তাঁহার মত হইবার বাসনা প্রবুদ্ধ হইবে।

কাশ্যপ

আনন্দ, তুমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছ। ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তিরেকে, এ সংঘের অধিবেশনে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। অতএব এখান হইতে সত্বর প্রস্থান কর, শুদ্ধসত্ত্বজনগণের মধ্যে তোমার আসন হইতে পারে না।

* বুদ্ধের দেহরক্ষার পরে অনেকা স্ত্রীলোক তাঁহার দেহ পূজা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাম্বুজ অশ্রুসিক্ত করিয়াছিল।—Beal "Four Lectures," পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য।

৭

...র সন্তাপে ক্ষুণ্ন হইয়া আনন্দ তথাগতের বাক্য স্মরণ করিলেন; বাক্যগুলি তিনি দেহাবসানের অল্পপূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।—"আনন্দ, দুঃখ করিওনা, সন্তপ্ত হইও না, শোকাতুর হইওনা; সংঘের শীর্ষস্থানীয় ভিক্ষুমহাকাশ্যপের কথায় অবহিত হইবে। ধৈর্য্যধারণ করিয়া তাঁহার আদেশ মান্য করিও। কাঁদিও না আনন্দ, তুমি ধর্ম্মনীতিকে হীনপ্রভ করিবে না, গৌরবমণ্ডিত করিবে।"

অতঃপর অনিরুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন,—যাও আনন্দ! কামনার প্রতি অণুটিকে ধ্বংস কর, অর্হৎ হও, তৎপরে সংঘে প্রবেশ করিও।

৩

আনন্দ মৃত গুরুর বিষয় চিন্তা করিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং তিনি সাতিশয় মর্ম্মবেদনায় ক্লিষ্ট হইলেন। ব্রিজিগণের (sic—বৈশালী?) শহরের দিকে প্রস্থান করিলেন, এবং নিদাঘের নিয়মাদি পালন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সে সময়ে আনন্দের পার্ষদ ছিলেন মাননীয় ব্রিজিপুত্র (ব্রিজি-বংশীয় জনৈক আয়ুষ্মৎ); তিনি চারি সংসদ ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দ সর্ব্বদুষ্কৃত স্খালন নিমিত্ত মনো-নিবেশ করিলেন। যখন সমাধিমগ্ন হইয়া ব্রিজিপুত্র বুঝিতে পারিলেন যে তখন পর্য্যন্ত আনন্দ কামজিৎ হইতে পারেন নাই তখন তৎসমীপে গিয়া বলিতে লাগিলেন :—

> গৌতম আনন্দ! এবে কর প্রণিধান,—
> আঁধারে রহিবে সদা বিটপীর স্থান;
> মনশ্চক্ষু সংযোজন কর দৃঢ় করি,
> নিরবাণে স্থিরমতি, অপরা পাসরি;
> ধ্যানে প্রবেশি' যবে যোগস্থ রহিবে,
> অচিরেই শান্তলোক দেখিতে পাইবে। *

আনন্দ যখন ব্রিজিপুত্রের উপদেশবাক্য শুনিতে পাইলেন, তখন সূর্য্য অস্তচূড়াবলম্বী; তিনি কোন সমীপবর্ত্তী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পঞ্চপাপ বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিলেন, এবং

* Rockhill এর অনুবাদ :—

"Gautama, be thou not heedless;
Keep near a tree in the dark, and on nirvana,
Fix thy mind; transport tyself into dhyana,
And ere long thou shalt find the abode of peace."

রাত্রির প্রথম যামেই তিনি পাপ চিন্তা হইতে মনকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করিলেন। মধ্যযামে তিনি বিহারের বহির্দেশে গমন করিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বিহারে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া যেমন তিনি একটি পদ অপরটির উপর তুলিয়া ধরিয়াছেন, অমনি, আশ্চর্য্য! তাঁহার 'দৃষ্টি, স্মৃতি ও চৈতন্য' † সম্বন্ধে অভিনব ধারণা সমুদ্ভূত হইল; যখন তিনি উপাধানে মস্তকরক্ষা করিলেন তখন তাঁহার অন্তর সর্ব্ব আস্রব হইতে মুক্ত হইল। আনন্দ পরম সুখ ও শান্তির আস্বাদে সিদ্ধাবস্থায় উন্নীত হইয়া অর্হৎ পদ লাভ করিলেন। অতঃপর যেখানে ন্যগ্রোধ (সপ্তপাণি) গুহাভ্যন্তরে পঞ্চশত অর্হৎ লইয়া মহাকাশ্যপ ধর্ম্মসমূহের সঙ্কলনে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশ্যপ ভিক্ষুদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহোদয়গণ, ভবিষ্যতে যাহাতে ভিক্ষুগণ বিস্মৃত ও অজ্ঞ হইয়া না পড়েন, এবং সূত্রন্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন (কারণ, সূত্রনিচয়ের কোন গাথা নাই), এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে গাথা সম্বলিত করিয়া সূত্রভাগ আবৃত্তি করা হইবে এবং অপরাহ্ণে সূত্রন্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবেচনা [আবৃত্তি বা আলোচনা] করা যাইবে"। এই বাক্য শ্রবণে ভিক্ষুগণ কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সূত্রন্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ভাগ সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হইবে; তদুত্তরে কাশ্যপ জানাইলেন যে প্রথমেই সূত্রন্ত সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইবে।

অতঃপর পঞ্চশত অর্হৎ মহাকাশ্যপকে সঙ্গীতির সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বেদীতে উপবেশন করিয়া সংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা আনন্দকে শাক্যমুনিসৃষ্ট সূত্রন্ত সঙ্কলন করিতে অনুমতি করিতে পারেন কিনা। তাঁহারা তূষ্ণীভাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বেদীপরি তাঁহাদের পরিচ্ছদ বিস্তার করিয়া দিলেন। আনন্দ বেদীকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করিলেন, এবং সমাগত স্থবিরগণকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া বেদীতে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে চিন্তা করিলেন, "যদি আমি ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত সূত্রন্ত সমুদয় বুঝিয়া থাকি—নাগলোকে তথাগত বহু সূত্রন্ত বলিয়াছিলেন, দেবলোকে বহু সূত্রন্ত বলিয়াছিলেন, আমাকে অনেক সূত্রন্ত বলিয়াছিলেন,—আমি তৎসমুদয় এক-একটি করিয়া কালানুক্রমিক রূপে আমার শ্রুতি, স্মৃতি ও জ্ঞানানুসারে আবৃত্তি করিব।"

কাশ্যপ কহিলেন, "আনন্দ, কোন স্থানে গুরুদেব জগতের কল্যাণের নিমিত্ত, মারকে জয় করিয়া মূলসূত্রগুলি বুঝাইয়াছিলেন? আয়ুষ্মৎ, সূত্রন্ত আবৃত্তি করিয়া যাও।"

আনন্দ আশ্বস্ত হইয়া বদ্ধকরপুটে উচ্চৈঃস্বরে 'ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্র' * আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে অজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য ‡ মহাকাশ্যপকে বলিলেন, "মহামতি কাশ্যপ, আমি এই সূত্র শ্রবণ করিয়াছিলাম, ইহা আমার হিতার্থেই উক্ত হয়। ইহা দ্বারা আমার শোণিত ও অশ্রুসাগর বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; অস্থিকঙ্কালের পর্ব্বত আমি অতিক্রম করিয়া গেলাম; নরকের দ্বার রুদ্ধ হইল, এবং স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। যখন উক্ত মহামূল্য সূত্র-রত্ন কথিত হয় তখন আমি ও অশীতি সহস্র দেবগণ সম্যক সত্যদৃষ্টি লাভ করি এবং পাপবিমুক্ত হই। এক্ষণে সেই বহু পুরাতন সূত্র আবৃত্ত হইল শুনিতে পাইলাম; আমি দেখিতেছি যে অনিত্য নয় এমন বস্তু কিছুই নাই!" এই কথা বলিয়া অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য অচেতন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে আনন্দ ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর চিত্ত-ক্ষোভ উপস্থিত হইল, কারণ তাঁহারা গতায়ু প্রভুর বিষয় চিন্তা করিলেন এবং তিনিও যে বিনাশ ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই তাহা উপলব্ধি করিলেন।

অতঃপর কাশ্যপ দ্বিতীয় সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাও পঞ্চভিক্ষুর হিতার্থে বারাণসীতে কথিত হয়। দ্বিতীয় সূত্রের আবৃত্তি শেষে অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য বলিলেন যে ইহা দ্বারাই

† ড্তিব শেস্-ব্দিজন্-দাঙ্-ল্দাং পাই হ্দুন্-শেস্; "notion of the visible, of memory, of self-consciousness." (R.)

* "Sermon of the Establishment of the Kingdom of Righteousness"—Rockhill.

‡ ব্রাহ্মণপঞ্চক পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নাম,—কোণ্ডঞ (অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য), ভদ্দেয়, বপ্প, মহানাম, অস্সজি।

তাঁহার অর্হৎ পদ লাভ হয়, এবং তাঁহার অপর চারিজনকে ভিক্ষুণী করে। পুনরায় তিনি ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যখন আনন্দ প্রত্যেক সূত্রের আবৃত্তি সমাপন করিতে লাগিলেন তখন কাশ্যপ ও সংঘ-সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই তাহা হইলে ধর্ম্ম, ইহাই বিনয়!"

এইরূপে আনন্দ তথাগতের সমুদয় সূত্রান্ত বিভাগ আবৃত্তি করিয়া গেলেন; কোন্ কোন্ গ্রামে, কোন্ কোন্ নগরে, কোন্ কোন্ প্রদেশে, কোন্ কোন্ রাজ্যে সূত্রগুলি কথিত হয় তাহাও উল্লেখ করিলেন। যখন 'স্কন্ধ' বিষয়ক কোন সূত্রের অবতারণা করিলেন তখন স্কন্ধশীর্ষক রূপে সঙ্কলিত হইল; যখন 'আয়তন' বিষয়ক কোন সূত্রের অবতারণা করিলেন তখন ষড়ায়তনশীর্ষক রূপে সঙ্কলিত হইল; শ্রাবকগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত সমুদয় তিনি "শ্রাবক-ব্যাখ্যা" ভাগে সঙ্কলন করিলেন; বুদ্ধের ব্যাখ্যাত সমুদয় তিনি "বুদ্ধ-ব্যাখ্যা" ভাগে সঙ্কলন করিলেন। স্মৃতি, যোগ, প্রকৃত রূপান্তর, ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ মনোবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ক সূত্রগুলি তিনি "পথ-শাখা" বিভাগে সঙ্কলন করিলেন। এতদ্ভিন্ন "অভ্রান্ত সূত্র", গাথা-সম্বলিত "সুনাম সূত্র" সংগ্রহ করিলেন। দীর্ঘসূত্রগুলি "দীর্ঘাগম", মাঝারি গুলি "মজ্ঝিমাগম" এবং দু-দশটি বাক্যে সম্পূর্ণগুলি "একোত্তরাগম" নামে অভিহিত হইল।*

কার্য্যসমাধান্তে কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাননীয় আনন্দ, তোমার ব্যাখ্যার কি পরিসমাপ্তি হইল?"

আনন্দ কহিলেন, "মহামান্য কাশ্যপ, ইহাই সব"। অতঃপর তিনি বেদী হইতে অবতরণ করিলেন।

কাশ্যপ কহিলেন, "শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণ! তথাগতের সমুদয় সূত্রান্তবিভাগ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে আমরা বিনয়-বিভাগ আরম্ভ করিব।"

* এই বাক্য হইতে অনুমিত হয় যে ধর্ম্মবিধিগুলি এই সঙ্গীতিতেই লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা বিশদরূপে উক্ত নাই, কারণ তিব্বতী ধাতু 'হ্রি-বা' (লেখা) কথাটির কোথাও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ, কতিপয় ভিক্ষু একটি অধ্যায়ের ভারপ্রাপ্ত হন, অপর কয়েকজন অপর অধ্যায়ের ভারপ্রাপ্ত হন। শ্রুতি অধিগম্য অধ্যায়গুলি তাঁহারা শিক্ষা দিতেন।

৪

সেই সময়ে উপলি নামে এক মহামান্য জ্ঞানী স্থবির ছিলেন, তিনি যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কাশ্যপ বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সংঘে প্রস্তাব করিলেন যে মহামতি উপলি বিনয় বিভাগ সঙ্কলন করুন। সংঘের সম্মতিক্রমে কাশ্যপ উপলিকে কহিলেন, "মহামান্য উপলি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিনয় আবৃত্তি করুন, তথাগতের যাহা বিনয় তাহার প্রতি সূক্ষ্ম অংশটি আবৃত্তি করিতে ভুলিবেন না।

—"নিশ্চয়ই করিব।"

বেদীর আসনে উপবিষ্ট হইলে কাশ্যপ পুনরায় উপলিকে বলিলেন, "আপনি প্রত্যেকটি বিধি কোন্ স্থানে এবং কি হেতু তথাগত কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হয় তাহার বিবরণ দিবেন"।

উপলি কহিলেন, "বারানসীতে ইহা পঞ্চভিক্ষুর হিতার্থে কথিত হয়—ভগবান তথাগত ব্যবস্থা করেন যে বহির্বাস গোলাকৃতি হওয়া আবশ্যক।"

কাশ্যপ তৎপরে প্রশ্ন করিলেন, কোন্ স্থানে এবং কি হেতু দ্বিতীয় বিধি কথিত হয়। তদুত্তরে উপলি কহিলেন, "বারানসীতে পঞ্চভিক্ষুর উদ্দেশ্যে কথিত হয় যে ভিক্ষুগণ বৃত্তাকার সংঘাতী (তিচস্-গস্) পরিধান করিবে। অতঃপর, তৃতীয় বিধি কলন্দক নামক গ্রামে প্রবর্ত্তিত হয়, সুদত্ত নামে জনৈক কলন্দকনিবাসীর জন্য।..."

এইরূপে উপলি বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত প্রত্যেক বিধি বিষয়ের বর্ণনা করিলেন, এবং ঊনপঞ্চশতী ভিক্ষু অবহিতচিত্তে সমুদয় শ্রবণ করিলেন। প্রত্যেক বিধি-শেষে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "ইহাই বিধি...। এইগুলি পারাজিক, এইগুলি সঙ্ঘাদিশেষ, এইগুলি অনিয়তদ্বয়, এইগুলি ত্রিংশৎ নিসর্গিয় পচিত্তিয়, এইগুলি নবতি পচিত্তিয়ধর্ম্ম, এইগুলি চারি প্রতিদেশনিয়, ইহাই সেখিয়াধর্ম্মাবলী, এইগুলি সপ্ত অধিকরণ সমথ ধর্ম্ম। এইগুলি গ্রাহ্য, এইগুলি অগ্রাহ্য। সংঘে প্রবেশ করিয়া এই প্রণালীতে উপসম্পদাবিধি গ্রহনীয়। প্রশ্ন করিবার এই নিয়ম, ক্রিয়া করিবার এই প্রণালী। এই এই ব্যক্তি সংঘে প্রবেশ করিতে পারে, এই এই ব্যক্তি পারে না। এইরূপে অপরাধ

স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে নির্জন বাস করিতে হয়। এই এই গুলিকে বলে অভ্যাস। এইগুলি গৌণ নৈতিক ব্যবস্থা। এইটি সমাধানন্দির্দেশক সূত্র (index). উপাসনার (ঞিOমস্-পা) এই প্রণালী।"...

উপলির আবৃত্তি শেষে মহাকাশ্যপ চিন্তা করিলেন, "যে সমুদয় ব্যক্তি অতঃপর জ্ঞানলিপ্সু হইবে, অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম পালন করিবে, ধর্ম্মের সার আস্বাদে পরিতৃপ্ত হইবে, তাহাদের নিমিত্ত আমি স্বয়ং সূত্রস্ত ও বিনয়ের অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাতৃকা-বিভাগের ব্যাখ্যা সম্পাদন করিব।" অতঃপর তিনি বেদীতে আরোহণপূর্ব্বক ভিক্ষুগণকে সম্ভাষণ করিলেন, "মহোদয়গণ, মাতৃকার বিষয় কি?" ভিক্ষুগণ বলিলেন, "যে সমুদয় প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করিবার জন্য যে (জ্ঞান) আবশ্যক তাহাই 'মাতৃকা' নামে অভিহিত। অতএব, ইহাতে থাকিবে চারি স্মৃত্যুপস্থানের ব্যাখ্যা, চারি সম্যক্ ত্যাগ, চারি ঋদ্ধিপদ, পঞ্চবৃত্তি, পঞ্চশক্তি, সপ্ত বোধিশাখা, পবিত্র অষ্টবিধমার্গ, চারি প্রকার বৈশ্লেষনিক জ্ঞান, শ্রমণের চতুর্বর্গ ফল, ধর্ম্মের চতুর্বাণী, ক্লেশনাশ, ইষ্টজ্ঞান, চরমের কথা, অত্যন্ত শূন্যতার অত্যন্ত শূন্যতা, অবিশেষের অবিশেষ ("Uncharacteristic of the Uncharacteristic"—Rockhill), যোগযুক্ত সমাধি, পূর্ণবোধিমোক্ষ, বিষয়িগত জ্ঞান [বিজ্ঞান], নির্ব্বাণ, অপার্থিব দৃষ্টি, ধর্ম্মসংগ্রহ ও সঙ্কলনের অভ্রান্ত পন্থা, এইগুলি লইয়াই মাতৃকা বা অভিধর্ম্ম [অধ্যাত্মশাস্ত্র]।"

কাশ্যপ ধর্ম্মের অধ্যাত্মবিষয়ক বিভাগ সঙ্কলন সমাপন করিলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে যক্ষগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সাবাস্! মহাত্মা কাশ্যপ, পঞ্চশত অর্হৎ! আপনারা তথাগতের ত্রিপিটক সঙ্কলন করিলেন; (অতঃপর) দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, অসুরগণ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে!..."

সংঘের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কাশ্যপ চিন্তা করিলেন ভবিষ্যৎ লোকহিতার্থে আবশ্যকীয় কর্ম্ম তিনি শেষ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কাল ফুরাইয়াছে। আনন্দের সমীপে গিয়া তিনি বলিলেন, "আনন্দ! তথাগত ধর্ম্ম সংরক্ষণের ভার (আমার উপর) ন্যস্ত করিয়া নির্ব্বাণলাভ করেন। আমি চলিয়া গেলে তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ (patriach) হইয়া ধর্ম্মরক্ষণার্থ প্রযত্ন করিবে। রাজগৃহে জনৈক সওদাগরের এক পুত্র জন্মিবে, তিনি সর্ব্বদা শণবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবেন এজন্য তিনি 'শাণাবসিক' নামে অভিহিত হইবেন। তিনি সমুদ্রযাত্রা সমাপনান্তে বৌদ্ধ সংঘকে পাঁচ বৎসর যাবৎ সেবা করিবেন, তৎপরে সংঘে প্রবেশলাভ করিলে তুমি তাহার হস্তে ধর্ম্মভার অর্পণ করিও।"

ইহা বলিয়া মহাকাশ্যপ প্রস্থান করিলেন, এবং চারি মহা চৈত্য ও অষ্ট দেহাবশেষ চৈত্য (chaityas of the relics) পূজা সমাপনান্তে নাগরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বুদ্ধের চক্ষু ও দন্তের সম্বর্দ্ধনা করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের আবাসভূমিতে গিয়া বুদ্ধের অপর দন্তের সম্মান দেখাইলেন। সুমেরু পর্ব্বত (ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবনিবাস) হইতে অন্তর্হিত হইয়া তিনি রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং রাজা অজাতশত্রুকে তাঁহার দেহত্যাগের বিষয় জানাইতে মানস করিলেন। রাজ-প্রাসাদে গমনপূর্ব্বক দ্বারীকে কহিলেন, "যাও, রাজ অজাতশত্রুকে বল যে কাশ্যপ রাজদর্শন প্রার্থী"। দ্বারী বলিল, "মহারাজ নিদ্রিত"। কাশ্যপ দ্বারীকে জানাইলেন যে রাজ-সন্নিধানে গিয়া এ বিষয় জানাইলে ভাল হয়। দ্বারী বলিল, 'মহোদয়, রাজা উগ্র হইয়া আছেন; জাগরিত করিলে আমাকে বধ করিয়া ফেলিবেন!" কাশ্যপ কহিলেন, "জাগরিত হইলে কহিও যে মহাকাশ্যপ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।"

অতঃপর কাশ্যপ কুক্কুটপদ-পর্ব্বতের দক্ষিণ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তথায় ত্রিশৃঙ্গের মধ্যস্থলে একটি তৃণময় পাটি সজ্জিত করিয়া আনুষঙ্গিক অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি সকল প্রকাশ পূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।*

কাশ্যপের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাজা অজাতশত্রু মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। আনন্দ সমভিব্যাহারে কুক্কুটপদ পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "শ্রীবুদ্ধের দেহাবসানের পর তাঁহার অদৃষ্টে সে মূর্ত্তি দর্শন ঘটিল না, পরন্তু মহাকাশ্যপের দেহাবসান সময়েও আমার ভাগ্যে অদর্শনই

* হিউনথ্সাং এর মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের বিশবৎসর পরে কাশ্যপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। Hieuen Thsang. B.IX. p.7.

ঘটিল, অতঃপর আপনার দেহাবসানের কালে যেন আমায় দর্শন না দিয়া বঞ্চিত না করেন।" এজন্য স্থবির (আনন্দ) প্রতিশ্রুত হইলেন যে রাজা তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইবেন না। রাজা অজাতশত্রু কাশ্যপের নির্ব্বাণ-পীঠে একটি চৈত্য নির্ম্মান করাইয়া সেই চৈত্যের যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা প্রদর্শন করিলেন।

৫

সমুদ্রযাত্রা শেষ করিয়া শাণাবসিক নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কোষাগারে স্বীয় ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। পাঁচ বৎসর সংঘের সেবাকাজে ব্রতী থাকিয়া একদা বংশকুঞ্জে গমন করিলেন। তথায় আনন্দকে গন্ধকুট দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, "বুদ্ধ কোথায়?" স্থবির প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস, তথাগত নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণে শাণাবসিক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। জল সেচনান্তে সংবিৎলাভ করিয়া তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থবির, শারিপুত্র কোথায়?"

—"তিনিও গত হইয়াছেন; অধিক কি বলিব, মৌদগলায়ন ও মহাকাশ্যপও আর নাই। বৎস, তুমি তথাগতের শিষ্যবর্গের উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মের ভাঁণ্ডার পরিপূর্ণ কর, তথাগতের' সংঘে প্রবেশ কর।"

শাণাবসিক বলিলেন, "তবে তাহাই হউক"। এবং যেরূপ বিধির নির্বন্ধ ছিল তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই ত্রিবিধ জ্ঞান আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন, এবং ত্রিপিটক তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। আনন্দ যাহা বলেন তাঁহার স্মৃতিফলকে গাঁথিয়া যায়। একদা বংশকুঞ্জে জনৈক ভিক্ষু এই গাথাটি কীর্ত্তন করেন*:

শতবর্ষ আয়ুভাগ বিহগের পদদাগ
তরলিত জলোপরি ভাসে;
পতগের পদছায়া যেমতি দেখায় মায়া
জীবের সুকৃতি ফল নাশে।*

Rockhillএর অনুবাদ:—
"In whom life is of (but) an hundred years,
It is as the footprint of a bird on water;

আনন্দ এই গাথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুর সমীপবর্তী হইয় বলিলেন, "বৎস, তথাগত ইহা বলেন নাই, পরন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যাহা তাহা এই"—

শতবর্ষ আয়ুভাগ বিহগের পদদাগ
জন্মমৃত্যু অনিত্য সকলি;
উভশ্রেণী জনগণে শিখাইলে সুযতনে—
ধরিত্রীর নিত্যভাব বলি,
নাস্তিক মনুষ্যজনে অমর্ষ আসিবে মনে,
আস্তিকের বিগড়িবে জ্ঞান;
সূত্রান্ত ধারণা ভ্রমি' যথা শোভে জলাভূমি
গবাদি করিতে যায় পান।
বিলয়ের তীরে আসিবেক ধীরে
জনে জনে লইয়ে সুমতি,
পরাজ্ঞান ভুলি অনর্থ সকলি
মৃত্যুকালে হইবে বিস্মৃতি।
শ্রুতবাক্য না বুঝিলে কিবা ফল ইথে মিলে
ভ্রান্তবিদ্যা ধূমেরি আকাশ,
মিছাই শ্রবণ তা'র শুদ্ধ চিন্তা নাহি যার—
মেধাফল হয় না প্রকাশ।*

Like the appearance of the footprint of bird on water.

Is the virtue of the life of each separat one."

তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন, গাথা অত্য দুর্বোধ্য

* Rockhillএর অনুবাদ:—

"In whom life is of an hundred years,
There is therefore birth and decay;
By teaching to both classes of men
That here on earth exists permanency,'
The unbeliever will have angry thoughts,
The believer perverted ideas.
Having wrongly understood the Sutranta,
They go like cattle in a swamp.
When they are nigh unto dissolution,
Their minds have no knowledge of their aw death;

অতঃপর উক্ত ভিক্ষু তাঁহার আচার্যাকে ('master) কহিলেন, "আনন্দ বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার স্মৃতিশক্তিও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং দেহ জরায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।" আচার্য্য কহিলেন, "যাও, স্থবির আনন্দকে বল যে আপনি ভুল করিয়াছেন, কারণ আপনার স্মৃতি অবিকল নাই"। ভিক্ষু গমন করিয়া ঐ কথা জানাইলে স্থবির কহিলেন, "বৎস, আমি একথা বলি নাই যে তথাগত একথা বলেন নাই।" স্বীয় আচার্য্যের বাণীর পুনরুক্তি করিলে আনন্দ ভিক্ষুকে বলিলেন, "যদি তোমার আচার্য্য ভিক্ষুর সহিত (এ বিষয় লইয়া) বাক্যালাপ করি, তাহাতে কলহের সৃষ্টি হইবে; তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন্ তথায় আমার গমন করা কর্ত্তব্য নয়, তিনি ত আমার এখানে আসেন নাই"।

তৎপরে আনন্দ এইরূপ চিন্তা করিলেন, "শারিপুত্র মৌদ্গলায়ন প্রভৃতি গত হইলেন, এবং আমিও গত হইলে তথাগতের ধর্ম্ম সহস্র বৎসরব্যাপীকাল অনুসৃত হইবে। প্রাচীনগণ পূর্ব্বেই গিয়াছেন, অধুনা তরুণদিগের সহিত আমার ঐক্য হয় না। আমি একাকী দাঁড়াইয়া আছি। আমি সঙ্গীহীন; বন্ধু ও সাথীরা বহুপূর্ব্বেই মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।" তখন শাণাবসিককে বলিলেন, "বৎস, তথাগত মহাকাশ্যপের উপর ধর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, মহাকাশ্যপও আমার উপর ন্যস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমিও তোমার উপর সেই ভার অর্পণ করিতেছি, আমার অবসানে ধর্ম্ম রক্ষা করিও। অধিকন্তু, মথুরা নগরের জনৈক সদাগরের নট ও ভট (Sic) নামক পুত্রদ্বয় ঐ প্রদেশের বিমুরুন্দ নামক স্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিবে।

When one understands not what he has heard, 'tis fruitless;
To understand what is erroneous is as smoke.
To hear and of correct understanding
To be deprived, is to have intelligene without fruit."

রকহিলের মতে মূল তিব্বতী গাথা নির্ভুল নয়। কিংবা আনন্দের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়ায় গাথাটীতেও ভুল ঢুকিয়া গিয়াছে।

ইহা তথাগত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন। পরন্তু, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে বিমুরুন্দের বিহার নির্ম্মিত হইবার পর জনৈক গুপ্ত নামধেয় সুগন্ধিবিক্রেতার উপগুপ্ত নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তথাগতের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির শত বৎসর অতীত হইলে সে সংঘে প্রবেশ করিবে। বিশেষ লক্ষণ * বর্জ্জিত হইয়াও সে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে ও বুদ্ধের সমুদয় কার্য্যাবলী সে সম্পাদন করিবে। এক্ষণে আমার দেহাবসানের কালও আগত।" অতঃপর চিন্তা করিলেন, "যদি আমি এখানে (বংশকুঞ্জে) দেহত্যাগ করি, রাজা অজাতশত্রু ও ব্রিজিগণ পরস্পর বৈরতা সূত্রে আবদ্ধ থাকায়, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ আমার দেহাবশেষের একাংশও প্রাপ্ত হইবেনা; যদি আমি বৈশালীতে দেহত্যাগ করি তাহারাও রাজা অজাতশত্রুকে একাংশও প্রদান করিবে না। অতএব আমি গঙ্গানদীর মধ্যভাগে দেহত্যাগ করিব।" তিনি তথায় চলিলেন।

এদিকে অজাতশত্রু স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার (মস্তকোপরি ধৃত) ছত্র-দণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তিনি ভীত হইয়া জাগরিত হইলেন; পরক্ষণে দ্বারীর নিকট জ্ঞাত হইলেন যে স্থবির আনন্দ দেহ রক্ষা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অতঃপর জল সেচন দ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় মহাত্মা আনন্দ দেহ রক্ষা করিয়াছেন?" মাননীয় শাণাবসিক বলিলেন, "মহারাজ, ভগবান্ তথাগতকে সেবা করিবার জন্য যিনি সৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই মহাতেজা গুরুদেব ধর্ম্মরত্ন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং স্বকীয় জ্ঞানশক্তি তাঁহাকে (বহুকাল) জীবন ধারণ করিতে সমর্থ করিয়াছে, তিনি বৈশালীর দিকে গমন করিয়াছেন।"

অজাতশত্রু চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দেবগণ বৈশালীর অধিবাসিবৃন্দকে বলিলেন, "মহাত্মা আনন্দ, জনগণের প্রদীপ, লোক প্রেমিক,

*"Buddha without the characteristic signs (Rockhill) 'That is to say he will have an enlightened mind, but will not have 32 signs of the greatman, or the 80 peculiarities which characterised the Gautama Buddha" (Rockhill)

মহাতেজা, ক্ষুধ তামস ঘুচাইয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইতে চলিলেন"। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা তীরে উপস্থিত হইলে, মহামতি আনন্দ নৌকায় উঠিয়া গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইলেন। রাজা অজাতশত্রু স্থবির আনন্দের চরণোদ্দেশে মস্তক আনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীবুদ্ধের আয়ত চক্ষু শতদল পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত। আপনি তিনপুরুষের (জীবন) কাল ধরিয়া প্রদীপ (স্বরূপ) ছিলেন এবং (সত্যের) শান্তি অধিগত করিয়াছিলেন, আমরা আপনার শরণ লইলাম। যদি আপনি শান্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে আমাদের নিমিত্ত আপনার তনু জল হইতে হেথায় নিক্ষেপ করুন।" বৈশালীর অধিবাসীগণ উক্তরূপ কহিলে আনন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যদি আমি আমার দেহ মগধ দেশে নিক্ষেপ করি, লিচ্ছবিগণ নিশ্চয়ই মর্ম্মপীড়িত হইবে; যদি আমি বৃজি প্রদেশে নিক্ষেপ করি মগধরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন। অতএব আমি দেহার্দ্ধ রাজাকে প্রদান করিব ও অপরার্দ্ধ বৃজিবাসিদেব দিব, এতদ্বারা আমার দেহাবশেষের উভয়াংশই উপযুক্ত শাশ্বত সম্মান লাভ করিবে।"

আনন্দের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিতপ্রায়; বসুন্ধরা ছয় প্রকারে কম্পিত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক ঋষি পাঁচশত অনুচর লইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে স্থবির আনন্দ সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং বদ্ধকরপুটে নিবেদন করিলেন, 'মহাত্মন্ সদ্ধর্ম্মের সংঘমধ্যে আমাদের গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক, এবং আমরা সকলে যাহাতে ভিক্ষুর আবশ্যকীয় উপকরণ পাইতে পারি তদ্রূপ ব্যবস্থা প্রদান করুন"। আনন্দ বলিলেন, "শিষ্যবর্গ সমেত আমার নিকট এস"। আনন্দের ইচ্ছায় অবিলম্বেই পঞ্চশত শিষ্যগণ সহ ঋষি তথায় উপনীত হইলেন। স্থবির আনন্দ নদীর মধ্যভাগে শুষ্কডাঙা সৃষ্টি করিয়া স্থানটিকে অনধিগম্য করিলেন, তৎপরে সশিষ্য ঋষিকে সংঘ প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহাদের ঈপ্সিত উপসম্পাদ্ বৃত্তিতে অধিকার দিলে তাঁহারা 'অনগমিন্' এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ত্রিকর্ম * বিষয় তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। এবং তাঁহারা সর্ব্বক্লেশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া "অর্হৎ" সম্মানে বিভূষিত হইলেন। গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং দিবার মধ্যবর্ত্তী কালে সংঘ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় মনুষ্যের নিকট তাঁহারা "মধ্যান্তিক" এবং কতিপয়ের নিকট "মধ্যনিক" বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

অতঃপর তাঁহারা আনন্দের পদানত হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু! তথাগত সর্ব্বশেষে ধর্ম্মগ্রহণকারী (convert) সুভদ্রকে বলিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বেই নির্বাণে প্রবেশ করিতে, অতএব গুরুদেব! আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে আপনার নির্বাণ লাভের পূর্ব্বক্ষণেই আমাদের নির্বাণে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করুন; কেন না, এতদ্বারা আপনার অন্তিমদশা আর আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না।"

স্থবির প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎসগণ, তথাগত মহাকাশ্যপের নিকট ধর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া গত হন; স্থবির মহাকাশ্যপ আমার কাছেও এই বলিয়া ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, 'আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্মের ভার তোমাতেই রহিল।' পরন্তু, তথাগত কচ্‌মির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'কচ্‌মির প্রদেশই ঈপ্সিত ধ্যানের পক্ষে সর্ব্বোপযুক্ত স্থান, (আমার মৃত্যুর) শতবর্ষ পরে * মধ্যান্তিক নামা ভিক্ষু এই প্রদেশে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবে'। অতএব, বৎস (তথায়) ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিও।"

মধ্যান্তিক ঋষি উত্তর করিলেন, "যথাজ্ঞা পালন করিব।"

তৎপরে মহামতি আনন্দ নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণলোচনে জনৈক মগধবাসী কহিল, "প্রভু, এদিকে আগমন করুন"। জনৈক বৃজিবাসী বলিল, "প্রভু, এদিকে আগমন করুন"। ঐ দুইব্যক্তি নদীর দুই তট হইতে উক্তরূপ কহিলে তিনি সবিবেচনাবশে

* সম্ভবতঃ, 'সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ চিন্তা, সম্যক্ বাক্য' এই তিনটি। এ বিষয়ে Rockhill, l. c., Feer, "Introduction du Bouddhism dans le Kachmir," পৃঃ ৯, এবং Taranath, পৃঃ ৭, দ্রষ্টব্য।

* Rockhill বলিতেছেন, "This is extraordinary, for either Ananda's life must have been much longer than all other legends say, or else Madhyantika only carried out Ananda's command some 70 years after his master's death". This would allow sufficient time for Shanabasika's partriarchate". See Taranath's Remark. p. 10.

জরাপীড়িত দেহযষ্টি দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপরে আনন্দ তাঁহার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া বহুবিধ ইন্দ্রজাল ব্যাপার রচনা করিলেন, এবং বহ্নিতে বারি বিক্ষেপ করিলে যাহা হয় [বাষ্পের আকার ধারণ করিয়া] সেইরূপে পরিনির্বাণে প্রবেশ করিলেন।

বৈশালীবাসিগণ তাঁহার দেহার্দ্ধগ্রহণ করিল এবং অপরার্দ্ধ লইলেন রাজা অজাতশত্রু। এইরূপ কথিত আছে :—

প্রজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূচীমুখে
ক্ষেত্রশৈলে করি পরাজয়
আধাআধি বাঁটি দিলা ভূপে,
বৃজিকুলে, শকতি আশয়।*

অতঃপর লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে এক চৈত্যস্থাপন করিয়া সেই দেহার্দ্ধভাগ তন্মধ্যে রক্ষা করিল, এবং নৃপতি অজাতশত্রুও পাটলিপুত্রে আর এক চৈত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে অপরার্দ্ধ স্থাপন করিলেন।

মধ্যান্তিক ঋষি চিন্তা করিলেন, "গুরুদেব কচ্‌মিরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আমায় আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, (কারণ) তথাগত ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তথায় মধ্যান্তিক নামে ভিক্ষু কচ্‌মিরের বিদ্বেষ পরায়ণ নাগ হুলুন্তকে ✿ জয় করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবে। অতএব, আমি সে ইচ্ছা ফলবতী করিব।" তদনন্তর মহামান্য মধ্যান্তিক কচ্‌মির দেশে গমন পূর্ব্বক বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কচ্‌মিরের নাগগণকে পরাজয় করিতে হইলে যদি তাহাদের উত্যক্ত করা যায় তবে তাহাদের বশীভূত করিতে সমর্থ হইব।" অতঃপর তিনি চিত্ত সমাহিত করিয়া যোগারূঢ় হইলেন; কচ্‌মির রাজ্য ষড়বিধরূপে প্রকম্পিত হইল। নাগগণ জ্বালাতন হইয়া ভীষণ হাঁকাইতে লাগিল, এবং প্রবল বারিপাত করাইয়া স্থবিরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি করুণার গভীর ধ্যানে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এজন্য নাগগণ তাঁহার অজরাখার প্রান্তটি পর্য্যন্ত নড়াইতে সমর্থ হইল না। নাগগণ তীরবৃষ্টি করিল; কিন্তু স্থবির, উৎ (?) পদ্ম, কুমুদ, শ্বেতোৎপলের মতই সেগুলিকে ভূমে পাতিত করিলেন। নাগগণ বজ্র, তীক্ষ্ণশর, অসি, পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে সমুদয় অস্ত্র নীল পদ্মপুষ্পবৃষ্টির ন্যায় স্থবিরের দেহ স্পর্শ করিল। মধ্যান্তিক করুণার গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকায় বজ্রাগ্নি তাঁহার অঙ্গ দগ্ধ করিতে পারিল না, অস্ত্রশস্ত্র হইতেও কোন অনিষ্ট হইল না। নাগগণ চমৎকৃত হইল। অতঃপর তাহারা স্থবীরের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাত্মা, আপনি কে?"

স্থবির বলিলেন, "এই স্থানটি আমায় প্রদান কর।"

নাগগণ বলিল, "একখণ্ড পাথর দান, ইহার আর মূল্য কি!"

স্থবির বলিলেন, "ভগবান তথাগত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে এই স্থানটি আমার হইবে। এই কচ্‌মির রাজ্য ধ্যানের পক্ষে অতি উত্তম স্থান অতএব ইহা আমারই।"

নাগগণ বলিল, "তথাগত কি ঐরূপ বলিয়াছিলেন?"

—নিশ্চয়ই।

—স্থবির! কি পরিমাণ স্থান আপনাকে প্রদান করিতে হইবে?

—আমি বীরাসনে বসিলে যতটুকু আবৃত হয়।

—মহাত্মা! তাহাই হউক।

অতঃপর স্থবির ব্যত্যস্তপদে উপবেশন করিলে নয়টি উপত্যকার নিম্নসীমা পর্য্যন্ত (সমুদয় ভূমি) তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।

নাগগণ প্রশ্ন করিল, "আপনার অনুচর কয়জন?"

স্থবির চিন্তা করিয়া বলিলেন, "পঞ্চশত অর্হৎ।"

—"তাহাই হউক। কিন্তু এই অর্হৎগণ মধ্যে একমাত্র ব্যক্তির যদি অভাব হয় তবে কচ্‌মির ভূভাগ আমরা পুনর্গ্রহণ করিব।"

—"আচ্ছা। তবে, এ স্থানে দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়

---

* "By the sagacious diamond of wisdom,
Who has subdued the mountain of his own body,
A half was given to the sovereign,
mighty gave nation"—
Rockhill.

✿ অন্যত্র নাগরাজ হুলব্ নামে পরিচিত।

শ্রেণীর বসবাস করানও প্রয়োজন ; এজন্য আমি হেথায় গৃহী গণকেও বসবাস করাইব।"

নাগগণ সম্মতি প্রদান করিলে স্থবির চতুর্দিকে গ্রাম, শহর, জনপদ সৃষ্টি করিয়া সে স্থানগুলি জনাকীর্ণ করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিল, "অতঃপর স্থবির! আমরা কিরূপে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিব?" তচ্ছ্রবণে স্থবির জনগণ লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে অধিরোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'কুঙ্কুম উৎপাটিত কর।" এই বাক্যে শৈলবাসী নাগগণ রুষ্ট হইলে স্থবির তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন।

তাহারা বলিল, "ভগবান তথাগতের ধর্ম্ম কতকাল হইবে?"

স্থবির উত্তর দিলেন, "এক হাজার বৎসর।"

অতঃপর তাহারা তাঁহাকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল যে "বুদ্ধের শিক্ষা যতকাল থাকিবে ততকাল আমরা আপনাদের এই স্থান হইতে কুঙ্কুমবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে দিব।" স্থবির কচ্মিরে কুঙ্কুম রোপণ করিয়া শুভেচ্ছা জানাইলেন, এবং উহাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।*

স্থবির মধ্যান্তিক কচ্মিরে তথাগতের ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া দিকে দিকে ছড়াইতে লাগিলেন ; এবং দানশীল ও ধার্ম্মিকজনগণের অন্তরকে সুখান্বিত করিয়া ও বহুবিধ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া অগ্নিতে বারিনিষেক ফলের ন্যায় নির্ব্বাণলাভ করিলেন। তাঁহার দেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অগুরুচন্দন কাষ্ঠাদি দ্বারা দগ্ধীভূত হইলে (দগ্ধাবশেষ) একটি চৈত্যে সংস্থাপিত হইল।

অতঃপর মহামান্য শাণাবসিক শ্রদ্ধাস্পদ উপগুপ্তকে সংঘে গ্রহণ করিলেন। ইঁহার দ্বারা ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রসারতা বৃদ্ধি পাইল। শাণাবসিক শ্রদ্ধেয় উপগুপ্তকে কহিলেন, "উপগুপ্ত, শ্রবণ কর। ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মভার মহাত্মা কাশ্যপের উপর ন্যস্ত করিয়া নির্ব্বাণলাভ করেন ; মহাত্মা কাশ্যপও আমার গুরুদেবের উপর উহা ন্যস্ত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। এক্ষণে, বৎস, আমি যৎকালে নির্ব্বাণলাভ করিব তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, এবং প্রাণমনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বাক্যই বলিবে যে 'এইরূপে ভগবান বুদ্ধ বলিলেন।" অনন্তর, মহাত্মা শাণাবসিক দানশীল ও ধর্ম্মস্থরক্ত জনসমূহের হৃদয়কে আহ্লাদিত করিয়া, নানাবিধ অলৌকিকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া—যেমন, স্বকীয় দেহ হইতে স্ফুলিঙ্গ, অগ্নি, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ—এরূপ একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় উন্নীত হইলেন যথায় মায়িক অণুটির পর্য্যন্ত অস্তিত্ব নাই।

স্থবির উপগুপ্ত শ্রদ্ধেয় ধীতিককে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন, ধীতিক ধর্ম্মের অঙ্গসমুদয় সাধন করিয়া শ্রদ্ধেয় কালকে [তিঃ নগ্-পো] শিক্ষাদান করিলেন, ও মহামান্য কাল্ শ্রদ্ধেয় সুদর্শনকে [তিঃ লেগ্স্-মৎঙ্] শিক্ষিত করিলেন। এইরূপে এই সংঘে ঐরাবততুল্য * [তিঃ গ্লাং-পো] বিক্রমশালী অনেক মহাত্মা মহাপ্রস্থান করেন।

৮

বুদ্ধনির্ব্বাণের ১১০ বৎসর অতীত হইলে বিজয় সূর্য্য আঁধারে আবৃত হইল। বৈশালীর ভিক্ষুগণ দশটি অপরাধ-জনক অলীক প্রতিজ্ঞা উত্থাপন করিলেন, তাহা বুদ্ধশিক্ষার বহির্ভূত, এবং বিনয় ও ধর্ম্মেরও অঙ্গ নহে ; তাঁহারা শিক্ষা দিতেছিলেন যে এই প্রতিজ্ঞা সমুদয় ধর্ম্মানুগ। সেই দশবিধ বিধি এইরূপ :—

[এক] বৈশালী ভিক্ষুগণ "অলল্" উচ্চারণ করা বৈধ স্থির করেন। যাঁহাদের এই বিষয়ে সম্মতি নাই তাঁহারা

---

* এই কুঙ্কুম পদ্মগন্ধী। দেশভেদে তিন প্রকার কুঙ্কুমের পরিচয় পাওয়া যায় ; কাশ্মীর, বাহ্লিক (Balkh, আফগানিস্থানের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল) ও পারস্য কুঙ্কুম প্রখ্যাত। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ 'ভাবপ্রকাশে' আছে :—

কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধিতৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥

* "Glang-po," "elephant" may imply here that these first patriarchs were the mightiest of their order, and were not succeeded by as great ones.—Rockhill, l. c. ১৭০ পৃঃ

বিরুদ্ধধর্মী (heterodox), যাঁহারা বৈশালীভিন্ন অন্যত্র মিলিত হন তাঁহারা স্বধর্মনিষ্ঠ (orthodox).

এই প্রথম প্রশ্নটি অধর্মীয়, যেহেতু শ্রীবুদ্ধের শিক্ষায় উহা ছিল না এবং বিনয়ধর্ম্মের অন্তর্গতও নহে; ইহা বৈশালীভিক্ষু-সম্প্রদায় আচরণ করিত ও বিধিগত বলিয়া প্রচার করিত।

[দুই] বৈশালীভিক্ষুগণ বলিত, "মহোদয়গণ আপনারা 'ভোগ' করুন"

ভিক্ষু সংঘে ভোগের প্রশ্রয় দেওয়ায় তাহারা ভোগকে বৈধস্থির করিল। এ বিষয়ে যাঁহারা সম্মত নন তাঁহারা বিরুদ্ধধর্মী, এবং যাঁহারা (বৈশালীভিন্ন) অন্যত্র মিলিত হন তাঁহারা স্বধর্মনিষ্ঠ।

[তিন] বৈশালীভিক্ষুগণ কোন ভিক্ষুর স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করা অথবা অপরের দ্বারা করান বৈধস্থির করেন।

[চার] বৈশালীভিক্ষুগণ, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ভিক্ষু লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে, এইটি বৈধকর্ম্মরূপে স্থির করেন; তবে খানিকটা পবিত্র লবণ * যথাসময়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

[পাঁচ] বৈশালীভিক্ষুগণ বিহার হইতে ১ অথবা ১½ যোজন গিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ ও আহারাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে; ইহা বৈধ।

[ছয়] বৈশালীভিক্ষুগণ শক্ত ও তরল উভয়বিধ খাদ্য-নিয়মানুগ গণ্য হওয়ায় দুই অঙ্গুলির সাহায্যে আহার করা বৈধ স্থির করেন।

[সাত] বৈশালীভিক্ষুগণ রক্তপের ন্যায় খমীরযুক্ত সুরা শোষণ করিয়া পান করিতে পারিবে যদিও ভিক্ষু পান করিয়া পীড়িত হইতে পারেন। ইহাও বৈধ।

[আট] বৈশালীভিক্ষুগণ দধিদুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া মাঝে মাঝে খাইতে পারিবেন। ইহাও বৈধ।

[নয়] বৈশালী ভিক্ষুগণ নূতন মাদুর 'সুগত-বিঘৎ' * পরিমাণ চওড়া ধারমুড়ী না দিয়াও ব্যবহার করিতে পারিবেন। ইহাও বৈধ।

[দশ] বৈশালীভিক্ষুগণ গোলাকৃতি ভিক্ষাপাত্র গন্ধদ্রব্য চর্চিত, সুমিষ্ট জলিতধূপবাস দ্বারা সুরভিষিক্ত ও বিভিন্ন সৌগন্ধীপুষ্পদ্বারা বিভূষিত করা বৈধ স্থির করেন। তৎপরে তাঁহারা কোন শ্রমণের শিরোপরি মাদুর সংন্যস্ত করিয়া তদুপরি ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলে, ভিক্ষু সদররাস্তা, গলিরাস্তা, চৌরাস্তা দিয়া প্রস্থান করিতে করিতে বলিবে, "শোন, সব বৈশালীর অধিবাসিগণ, সব নাগরীকগণ, সব বিদেশীগণ! এই ভিক্ষাপাত্র অতীব মনোহর; যে ব্যক্তি ইহাতে (অল্প) দান করিবে, (অথবা) অত্যন্ত বেশীপরিমাণে দান করিবে, (অথবা) যে ব্যক্তি ইহাতে বহুল পরিমাণে উপনয়ন (ইঃ offerings) প্রদান করিবে, সে দুর্লভ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে তাহার অশেষবিধ উপকার ও কল্যাণ সাধন হইবে"। এবংবিধ প্রকারে তাহারা প্রচুর ধনসম্পদ, স্বর্ণ ও অন্যান্য রত্নাদি প্রাপ্ত হয়, এবং এই (বৃত্তি) বৈশালীভিক্ষুগণ-দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহারা সুবর্ণরজতাদি গ্রহণ বিধিসম্মত বলিয়া স্থির করিল। ‡

৯

এক্ষণে, বৈশালীতে সর্বকাম † নামে জনৈক স্থবির

* দুবের ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে কোন্ কোন্‌রূপে লবণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যেমন ঢাকনি-ওয়ালা বাক্সের মধ্যে রাখা যেতে পারে। তিব্বতী প্রাতিমোক্ষসূত্র, ৬১ পরিচ্ছেদ অন্তর্গত 'বিনয়-বিভঙ্গে' লবণ শিঙার উল্লেখ আছে। এই শিঙার তিঃ ট্সুবা-রু, ইঃ salt-horn.

* "ভিক্ষুনি বিনয়-বিভঙ্গে" বুদ্ধবিঘৎ হইল দেড়হস্ত পরিমাণ।

‡ দশবিধ প্রশ্নের প্রতিজ্ঞাগুলি বিভিন্নরূপ দেখা যায়। এ বিষয়ে, 'মহাবংশ', Beal, 'Four lutures' পৃঃ ৮৩, ও Rhys David, "Buddhism", পৃঃ ২১ , দ্রষ্টব্য।

† "In the Mahawanso, p. 18-19, it is said that Sarbakama was a Pachina priest, and that he was at that time high priest of the world, and had already attained a standing of 120 years since the ordination of Upasampada. The same work, p. 15, calls Yaso, son of Kakandaka, the brahman, versed in the six branches of doctrinal knowledge and powerful in his calling" —W. W. Rockhill, l. c.

ছিলেন। তিনি অষ্টমহামোক্ষ সাধনের অর্হৎ-যোগী বলিয়া কীর্ত্তিত। আনন্দের জীবিতকাল হইতেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। পরন্তু, শোণাক নগরে যশস্ নামে এক অর্হৎ বাস করিতেন, তিনিও উক্তরূপ যোগী বলিয়া বিশ্রুত। একদা যশস্ পঞ্চশত অনুচর লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তত্রত্য ভিক্ষুগণ তাঁহাদের ধনবণ্টনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেন্সর্ [ইঃ Censor, বাঃ নাগরিকের নৈতিক চরিত্র পরিদর্শক, তিঃ দোগ-স্কস্] ঘোষণা করিলেন যে স্থবির সম্প্রদায়ের যে কেহ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐ ধনের ব্যবহার করিতে পারেন, এবং যশস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহোদয়! ধনসম্ভারের মধ্যে আপনি কি গ্রহণ করিবেন?" অতঃপর সেন্সর্ যশস্‌কে দশ সুবিধার বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। স্থবির চিন্তা করিলেন, "বাস্তবিকই এইটি কি একমাত্র ক্ষত (ইঃ Canker) না আরও আছে!" এবং দেখিলেন যে উক্ত দশবিধ অবৈধাচার অনুবর্ত্তনে বিধি-শৈথিল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব, ধর্ম্ম সংরক্ষণের নিমিত্ত তিনি মহামতি সর্বকাম সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদ-প্রান্তে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন :—

—"অলল্" উচ্চারণ বৈধ কি অবৈধ?

—মহোদয়, ইহার অর্থ কি?

(অতঃপর যশস্ বুঝাইয়া দিলে সর্বকাম বলিলেন)

—মহোদয়, ইহা ন্যায়সঙ্গত নয়।

—স্থবির, কোনস্থানে ইহা অবৈধ প্রতিপন্ন হয়?

—চম্পা নগরে।

—কি হেতু?

—ছয় ভিক্ষুর কর্ম্মের নিমিত্ত।

—কি রূপ অপরাধ কৃত হইয়াছিল?

—তাঁহারা "দুক্কত" অপরাধে অপরাধী হন।

—স্থবির, ইহাই প্রথম প্রশ্রয়। যাহা সূত্রন্ত ও বিনয়কে অবহেলা করিতেছে, বুদ্ধের উপদেশে যাহা নাই, সূত্রে নাই, বিনয়ে নাই, অভিধর্ম্মে নাই, বৈশালী ভিক্ষুগণ অবৈধকে বৈধ বলিয়া শিক্ষা দিতেছে। তাহারা যদি ইহা অনুষ্ঠান করে আপনি কি স্থির থাকিবেন?

(সর্বকাম নিরুত্তরে রহিলে যশস্ পুনরায় বলিলেন)

—স্থবির, আমার জিজ্ঞাস্য, আমোদ প্রমোদ করা কি বৈধ?

—মহোদয়, ইহার অর্থ কি?

(অতঃপর যশস্ বুঝাইয়া দিলে সর্বকাম বলিলেন)

—মহোদয়, ইহা বৈধ নয়। চম্পকনগরে ছয় ভিক্ষুর কর্ম্ম হেতু ইহা অবৈধ প্রতিপন্ন হয়, ও "দুক্কত" অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

—স্থবির, ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্রয়। 'যাহা...থাকিবেন?'

(সর্বকাম নিরুত্তরে রহিলে যশস্ পুনরায় বলিলেন)

—স্থবির, আমার জিজ্ঞাস্য, মৃত্তিকা খনন করিবার নিমিত্ত ভিক্ষুর শক্তিপ্রয়োগ করা কি বৈধ?

—মহোদয়, ইহা বৈধ নয়। শ্রাবস্তীতে ছয় ভিক্ষুর কর্ম্ম-হেতু ইহা অবৈধ প্রতিপন্ন হইয়াছে, ও ইহা "পাচিত্তিয়" অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

—স্থবির, ইহাই তৃতীয় প্রশ্রয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ব্যবহারের জন্য লবণ সংগ্রহ করিয়া রাখা কি বিধিসঙ্গত?

—মহোদয়, তাহা নয়। রাজগৃহে শারিপুত্রের কার্য্য নিবন্ধন ইহা অসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়" মধ্যে গণ্য।

—স্থবির, ইহাই চতুর্থ প্রশ্রয়। অতঃপর জিজ্ঞাস্য, দেড় ক্রোশ ভ্রমণান্তে ভিক্ষুর আহার গ্রহণ কি ন্যায়সঙ্গত?

—মহোদয়, তাহা নয়। রাজগৃহে দেবদত্তের কর্ম্মহেতু ইহা অন্যায়রূপে প্রতিপন্ন হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়" মধ্যে গণ্য।

—স্থবির, ইহাই পঞ্চম প্রশ্রয়। অতঃপর জিজ্ঞাস্য, আহারকালে দুই অঙ্গুলির ব্যবহার কি আচারানুগ?

—মহোদয়, তাহা নয়। শ্রাবস্তীতে বহু ভিক্ষু এইরূপ করায় অবৈধ প্রতিপন্ন হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়।"

—স্থবির, ইহাই ষষ্ঠ প্রশ্রয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, সুরাচোষণ করিয়া পীড়িত হওয়া কি বৈধ?

—মহোদয়, তাহা নয়। শ্রাবস্তীতে আয়ুষ্মৎ স্বরথের কার্য্যহেতু ইহা অবৈধ প্রতিপন্ন হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়।"

—স্থবির, ইহাই সপ্তম প্রশ্রয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দধি দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করা কি আচারসঙ্গত?

—মহোদয়, তাহা নয়। শ্রাবস্তীতে কতিপয় ভিক্ষুর কার্য্যহেতু ইহা অসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়"।

—স্থবির, ইহাই অষ্টম প্রশ্রয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, মাদুর ব্যবহার কি বিধানানুগ?

—মহোদয়, তাহা নয়। শ্রাবস্তীতে কতিপয় ভিক্ষুর কার্য্য হেতু ইহা নিষিদ্ধ হয়, এবং ইহাও "পাচিত্তিয়" মধ্যে গণ্য।

—স্থবির, ইহাই নবম প্রশ্রয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান গ্রহণ কি বিধিসম্মত?

—মহোদয়, তাহা নয়। 'বিনয়', 'দীর্ঘাগম', মজ্ঝিমাগম', প্রাতিমোক্ষ সূত্রের "কঠিন" অধ্যায়, 'একোত্তরাগম' প্রভৃতি অনুসারে ইহা নিসর্গ্গিয় পাচিত্তিয় মধ্যে গণ্য।

—স্থবির, ইহাই দশম প্রশ্ন। যাহা সূত্রান্ত, বিনয়কে অমান্য করিতেছে, প্রভুর উপদেশ মধ্যে নাই…যদি ইহা অনুষ্ঠিত হয় আপনি কি স্থির হইয়া থাকিবেন?

মহোদয়, আপনি যত্র গমন করিতে অভিলাষ করেন আমি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া তত্র আপনার অনুগমন করিব।

এই কথা বলিয়া সর্ব্বকাম পরমসিদ্ধাবস্থার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

সেই সময়ে শোণাক্ নগরে শাল্হ নামে জনৈক মহামান্য স্থবির বাস করিতেন, তিনি আনন্দের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অষ্টসিদ্ধিযোগে তিনি অর্হৎ-যোগী। যশস শাল্হের নিকট গমন করিয়া তদীয় পদপ্রান্তে প্রণাম পুরঃসর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলি একে একে উত্থাপন করিয়া (সর্ব্বকামের ন্যায়) তুল্য উত্তর লাভ করিলেন। এবং তিনিও তাঁহার অনুসরণ করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। তৎপরে যশস্ সঙ্কাস্ নগরে গমন করিলেন। তথায় মহামান্য স্থবির বাসভগামি বাস করিতেন; তিনিও পূর্ব্ববর্ণিত স্থবিরদ্বয়ের মত অর্হৎ এবং আনন্দের সমসাময়িক। এখানেও অনুরূপ প্রত্যুত্তর ও সম্মতি পাইয়া যশস পাটলিপুত্র গমন করিলেন। তথায় মহামতি কুমাশোভিত বাস করিতেন।…অতঃপর শ্রুঘ্ন (নগরে) গমন করিয়া তত্রত্য মহামতি 'অজ্জিত' স্থানে দশপ্রশ্ন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর মহিষ্মতি গমন করিয়া শ্রদ্ধেয় সম্ভূতের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সহদশ-প্রদেশস্থ মহাত্মা রেবতের সহিত দশপ্রশ্ন বিষয়ে পূর্ব্বপ্রকার আলাপ করিলেন। রেবত তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল (তথায়) বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিশ্রামশেষে অনুচররূপে তাঁহার সঙ্গী হইবেন বলিলেন।

১০

ইত্যবসরে বৈশালী ভিক্ষুগণ যশসের দলভুক্ত ভিক্ষুগণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহাদের গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে তিনি (যশস) সপক্ষদল সংগ্রহার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি দল গড়িতে চান কি হেতু?"

—মহাশয়গণ, সংঘে মতভেদ দেখা দিয়াছে।

—প্রিয় মহোদয়গণ, আমরা এমন কী করিয়াছি যাহাতে মতভেদ হইতে পারে?

যশসের শিষ্যগণ সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তাহারা বলিল :—

—ইহা ন্যায়-সঙ্গত নয়, কেন না তথাগতের আজ্ঞাগুলির পৃথক অর্থ দেখিয়া আপনারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যাইতেছেন?

যশসের শিষ্যগণমধ্যে একজন (যিনি সরলমতি ও যাঁহার পরুষ বাক্য সদিচ্ছাপ্রণোদিত) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহোদয়গণ, সংঘের অবশিষ্ট ভিক্ষুরা যাহা যাহা পালন করেন না আপনারা তাহাই করিতেছেন, আপনারা অবৈধ ও শ্রমনগণের অযোগ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। আপনারা শ্রুত আছেন যে তথাগত প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সহস্র বৎসর হইবে, কিন্তু অনতিকালমধ্যে এই ধর্ম্মের মলিনতা প্রাপ্ত হইবার হেতু আপনারাই হইতেছেন; এজন্য ভগবানের আজ্ঞা অবহেলন করিয়া আপনারা দুষ্ট ক্ষত প্রবেশ করাইতেছেন। যাহার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কোথায় ধর্ম্ম বজায় রাখিবেন, না আপনারাই কিনা মতভেদ সৃষ্টি করিতেছেন?"

এবংবিধ কঠোর বাক্য শ্রবণে তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। পরক্ষণে বৈশালী ভিক্ষুগণ পরস্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইল : "মহামতি যশস্ সপক্ষ আনয়নে গিয়াছেন! যদি সংঘে মতভেদ সৃষ্টি করায় আমরাই দায়ী, তবে চিন্তিত হইবার কি আছে? তোমরা বল এখন কর্ত্তব্য কি?" একজন অপরজনকে বলিল, "চল, যশস্ যাহা করিয়াছেন আমরাও তাহা করি। তিনি দলপুষ্ট হইতে গিয়াছেন, আমরাও আমাদের দল বৃদ্ধি করি।" অপর একজন বলিল, "মহাশয়গণ, উহারা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এস পলায়ন করি।" অপর একজন বলিল, "যাইব কোথায়? যেথায়ই যাই আমাদের সকলে মন্দই ভাবিবে। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিব; আমরা ফাঁদে পড়িয়াছি।" অপর একজন বলিল, "চল আমরা ভিক্ষাপাত্র, অঙ্গরাখা, বাগুরা, পানপাত্র, মেখলা দিয়া প্রতিবেশী ভিক্ষুগণকে একত্র জড় করি, সবই বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।"

এই পন্থা সকলে অনুমোদন করিলে তাহারা ব্যবস্থানুগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; কাহাকেও পরিচ্ছদ, কাহাকেও আঙ-রাখা, কাহাকেও পাজামা, কাহাকেও পাতলা কম্বল, কাহাকেও আস্তরণ, কাহাকেও ভিক্ষাপাত্র, কাহাকেও ঝাঁঝরি দিয়া একত্র সংহত করিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এদিকে যশস অল্পে-অল্পে সপক্ষদল গঠন করিয়া বৈশালীতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রশ্ন করিল, "ভগবন্,

আপনার পক্ষ সমর্থনকারী জনগণের সাক্ষাৎ কি পাইয়াছেন ?" যশস্ কহিলেন, "বৎসগণ, তাঁহারা সত্বর উপস্থিত হইবেন।"

শিষ্যগণ. বৈশালীভিক্ষুগণের সহিত তাহাদের কথোপকথনের সারমর্ম্ম গুরুকে শ্রবণ করাইলে যশস্ কহিলেন, "বিধিবিধানসমূহের শৈথিল্যকারী দল সত্বরই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, অতএব ধর্ম্মের সুদৃঢ়রক্ষণে আমরা. বদ্ধপরিকর হইব ; কারণ "গাথা"য় আছে—

স্থগিতের যোগ্য কাজ ঝটিতি যে সাধে
ত্বরায় বিহিত কর্ম্ম মুলতুবী বাঁধে,
কর্ম্মের সম্যক পথ করেনা সাধন,
অজ্ঞ সে, ঝঞ্ঝাট তার বিধির লিখন ;
নীচ অযোগ্য জনের সঙ্গে সদা রত,
ঋদ্ধিক্ষয় হয় তার কৃষ্ণশশী মত ;
বৈধকর্ম্ম ত্বরায় যে করে মতিমান
সততা ত্যজেনা কভু, হয় লাভবান ;
সুযোগ্য ধার্ম্মিক সাথে সদাই পীরিত,
ভাগ্যরূপে চন্দ্রকলা বাড়ে সুনিশ্চিত।*

অতঃপর যশস সিদ্ধিধ্যানে মনোনিবেশ.করিয়া মণ্ডপে [ইং Hall, তিঃ হথর্-বিয-খমৃস্] উপবেশন পূর্ব্বক বিহিত-পন্থা নির্ণয় করিলেন। ঘণ্টাবাদন করায় উনসপ্তশত অর্হৎ আহুত হইল। সকলেই আনন্দের সমসাময়িক। সেইকালে মহাত্মা কুয্যশোভিত "স্তম্ভ" [তিঃ হ্গগ্, ইঃ 'arresting'] সমাধিস্থ থাকায় ঘণ্টারাব তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। অর্হৎগণ সমবেত হইলে মহামান্য যশস্ চিন্তা করিতে লাগিলেন "যদি আমি প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে অভিবাদন জানাই তবে একটা গণ্ডগোল সৃষ্ট হইতে পারে অতএব আমি নাম ধরিয়া কাহাকেও আহ্বান করিব না।" তিনি বৃদ্ধ স্থবিরগণকে প্রণাম ও তন্নিম্ন প্রাচীনগণকে কপালে হাত দিয়া অভিবাদন জানাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ইতোমধ্যে কুয্যশোভিতের ধ্যান ভঙ্গ হইলে জনৈক দেব তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "মহামান্য কুয্যশোভিত! আপনি কি হেতু চিন্তিত মনে অবস্থিতি করিতেছেন? সত্বর বৈশালীতে গমন করুন, তথায় উনসপ্তশত অর্হৎ ধর্ম্মসংরক্ষণার্থে মিলিত হইয়াছেন, আপনিও একজন পরম জ্ঞানী। [তিঃ খ্যিদ্ দাজ্ মথং-পো গচিগ্-পা *] পরক্ষণেই তিনি পাটলিপুত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন এবং মণ্ডপদ্বারসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিলেন, কারণ, দ্বার রুদ্ধ ছিল। মণ্ডপস্থ জনগণকে "তিনি কে" ইহা কতিপয় ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিদিত করাইলে, তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

তৎপরে মান্যবর যশস তাঁহাদের দশবিধ প্রশ্রয়ের কথা পূর্ব্বালোচিত সর্ব্বকাম ও অন্যান্য অর্হৎ সমীপে কথিত ভাষায় জ্ঞাত করাইলেন, এবং তাঁহারাও পূর্ব্বালোচিত ভাষায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে, তিনি কহিলেন, "এই বৈশালীর ভিক্ষুগণ অবৈধকে বৈধ বলিয়া বিঘোষিত করিতেছেন, এবং অবৈধ অনুষ্ঠান করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেছি।" প্রতি প্রশ্রয়ের প্রতিবাদ শেষে তাঁহারা সকলেই উক্তরূপ বাক্য পুনরাবৃত্তি করিলেন। অতঃপর, দশ প্রশ্রয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও প্রতিবাদান্তে তাঁহারা ঘণ্টাবাদন করিয়া বৈশালীর ভিক্ষুমণ্ডলীকে সংহৃত করিলে যশস সঙ্গীতির কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহাদের জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

---

* Rockhillএর অনুবাদ :—

He who instantly does a thing to be postponed, who postpones (a thing to be done) instantly,
Who follows not the rightway of doing, a fool he, trouble is his share ;
Cut off by associating with obscure and unworthy friends,
His prosperity will decrease like the waning moon.
He who swiftly does what is useful has not forsaken wisdom.
He who has not put away the right way of doing wise, happiness will be his,
Not cut off by associating with worthy virtuous friends.
His prosperity will go on increasing like the waxing moon.

* ভাবার্থঃ—আপনিই একমাত্র জ্ঞানী, যাহার অভাবে সপ্তশত পূর্ণ হইতে বাকী রহিয়াছে।

সুশান্ত সা'

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল

আগেই বলেছি, ঘাটের পারে বসে, গায় তেল মাখতে মাখতে নানান রকমের চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রাণটা ক্রমেই শান্ত হয়ে এল সেদিন। তারপর স্নান সেরে যখন ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম মনটা তখন আমার মাধুর্য্যে ভরা। ইতিমধ্যে জলে নেমে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে তুষারবালার চরিত্রের কমনীয় দিকটা মনে মনে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে ভাবলাম "দোষ গুণেই ত মানুষ হয়। তুষারের দোষের দিকটা যত বড়ই হোকনা কেন, গুণের দিকটার মূল্যও ত কম নয়। অমন যার রূপ, তার চরিত্রের একটু ঝাঁঝ থাকবেই ত—সেইটেই যেন স্বাভাবিক।" মনে মনে একটা গ্লানি অনুভব করতে লাগলাম, নিজের মনের অসংযত দুর্ব্বলতার জন্য। ভাবলাম "আচ্ছা ও না-হয় রেগে যায়, কিন্তু আমিই বা সঙ্গে সঙ্গে অত রাগ করি কেন? আমি যদি না রাগি তাহলেই ত কোন রকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। ও যতই রাগে ততই যদি প্রাণ ভরা আদর দিয়ে ভিজিয়ে ওর প্রাণখানাকে ঠাণ্ডা করে দি—তাহলেই ত আবার সব মধুর হয়ে ওঠে। না হয় ক্ষমাই করে নিলাম ওর সব অপরাধ। তাতে ত আমার দুর্ব্বলতা নাই। জীবনে ওর ত আর কিছুই নেই—সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যে নির্ভর করে, একান্ত আমারই উপর।"

এই রকম সব ভাবতে ভাবতে ঠিক করে নিলাম, আর কখনও ওর উপর রাগ করব না, তা ও যতই অপরাধ করুক না কেন। জীবনে একটা মস্ত বড় সমস্যা যেন নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আমাদের জীবনের বিরোধ যেন আজকে থেকে শেষ হল। সমস্ত দুপুরটা, দুজনার প্রাণের প্রীতির আদান প্রদানে কী রকম করে মধুর করে তুলব—এই কল্পনায় আত্মহারা হয়ে চললাম বাড়ীর ভিতরে।

দরজা দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকবার পথে তুষারবালার সঙ্গে দেখা হ'ল। তেল মেখে নাইতে চলেছে সে। চুলগুলো টেনে কপালের উপর দিয়ে বাঁধা। বেশ পালিশ করে তেল মাখা মুখে। মাথায় ঘোমটা। গায় একখানা সবুজ ডোরা কাটা গামছা জড়ান। কিছুই নয় তবুও মোটের উপর সমস্ত মিলিয়ে বেশ যেন একটু পরিপাটি ধরণ।

এইটেই ছিল তুষারবালার সাজ গোজের বিশেষত্ব। সাজ গোজে যে ভাবেই থাকুক না কেন, সব সময়েই কেমন্ যেন একটু পরিপাটি ধরণ, সবই যেন বেশ ফিটফাট—সুরুচি পরিচায়ক। এবং বেশীর ভাগ সময়েই সাজগোজের মধ্যে বেশ একটু বাহার ফুটিয়ে তুলতে সে যেন ছিল সিদ্ধহস্ত। বেশীর ভাগ সময়েই তুষারবালার সাজ-গোজের ধরণ আমার চোখ দুটোকে মুগ্ধ করত। কিন্তু তবুও সময় সময় সাজ-গোজের বাহার যে একটু অতিরিক্ত বলে আমার মনে হত না এমন নয়।

তুষারবালা নাইতে চলেছে। আমার সঙ্গে চোখো-চোখী হওয়াতেই চোখ ফিরিয়ে নিলে। দেখলাম চোখে ঘৃণা ও বিরক্তির সংমিশ্রণে একটা দারুণ রুক্ষভাব ফুটে উঠেছে। একটু পরিহাস করে বললাম—

আহা! রাই চলেছে সিনান তরে
পথেই বা না ঢলে পড়ে!

কোনও কথা না বলে মৃদু মন্থর গতিতে চলে গেল। একটু পিছে পিছে সরলা ঝি, একখানি গঙ্গা-যমুনা পাড় মিহি তাঁতের সাড়ী হাতে এবং সাবানের বাক্স খানা নিয়ে

চলেছে। আমার পাশাপাশি হওয়াতেই জড়সড় হয়ে একটু ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

শোবার ঘরে গিয়ে শার্সীর সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি কিছুতেই যেন পছন্দসই হচ্ছে না—এমন সময় হঠাৎ পুকুর পাড়ের দিক দিয়ে একটা চীৎকার শোনা গেল। আমি একটু চমকে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখ্‌তে পেলাম আমাদের বাড়ীর চাকরবাকরগুলো বাড়ীর ভিতর থেকে পুকুর পাড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে, যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই পুকুরের দিকে ছুটলাম। আমাদের পুকুরের উত্তরের পাড়ের ঘাটের উপর গিয়ে দেখি জলের কিনারায় তুষারবালা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তার শরীরের নীচের দিকের বেশীর ভাগটাই জলের মধ্যে তলিয়ে গেছে, মাথাটা কাত হয়ে পড়ে আছে জলের কিনারায় ধাপের উপরে; সরলা ঝি প্রাণপণ শক্তিতে তাকে টেনে রেখেছে নইলে যেন সমস্ত শরীর এখুনি জলের ভিতর তলিয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নেমে গিয়ে তুষারবালার দেহখানি আঁকড়ে ধরলাম, কোনরকমে তাকে টেনে তুলে শোয়ালাম ঘাটের নীচের ধাপে। অবিন্যস্ত বস্ত্র কতকটা সংযত করে দিয়ে তার মাথার কাছে ধাপের উপর বসে পড়ে তার মুখখানি সযত্নে তুলে নিলাম আমার কোলের উপরে। তারপর হাতে করে জল তুলে জোরে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম তার চোখে মুখে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারবালা চোখ চাইলে। একটা আকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল। কাতরকণ্ঠে বল্‌লে "ওগো! আমি আর বাঁচ্‌ব না—তুমি আমায় ঘরে নিয়ে চল।"

এই বলে দুহাত দিয়ে আকুল ভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। ঘাটে অনেক লোক জড় হয়েছিল, এমনকি মা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘাটের নীচের ধাপে। আমার যেন একটু লজ্জা হ'ল। মনে হল এখান থেকে তুষারবালাকে যতশীঘ্র ঘরের ভিতর নিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। আস্তে মধুর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি এখন উঠে যেতে পারবে?"

বল্‌লে "না, না আমি উঠ্‌তে পারব না। আমার বুকের মধ্যে এখনও কেমন করছে, বড্ড মাথা ঘুরছে। ওগো! আমার কি হবে?"

এই বলে আকুল ভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

বল্‌লাম "এ অবস্থায় তোমার ঠাণ্ডাও লাগ্‌ছে—তাই ত কি করা যায়।"

তুষারবালা বল্‌লে "সবাইকে এখান থেকে যেতে বল, তারপর তুমি আমাকে ধরে নিয়ে চল।"

আমি চাকরবাকরদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম "তোমরা সব যাও এখান থেকে।"

মা বললেন "হ্যাঁ, সব চল্‌ এখান থেকে। সুশন! তুই ওকে একটু সুস্থ করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আয়।"

এইবলে সকলের সঙ্গে মাও ঘাট ছেড়ে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ তুষারবালা চোখ বুজে এলিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। একটা বাহু তুলে দিয়ে জড়িয়ে রইল আমার গলা। আমার মনের অবস্থা তখন যে ঠিক কি হয়েছিল এতদিন পরে ভেবে বলা কঠিন। স্নান করে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে যতই না কেন মনে মনে কল্পনা করেছিলাম, তুষারবালার সঙ্গে বিরোধ আমারই প্রাণের মাধুর্য্য ঢেলে মিটিয়ে ফেল্‌ব, তবু ও মনের কোণে যে আমার ত্রাস একেবারেই ছিলনা এমন নয়। তাই তুষারবালার এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের পরস্পরের মিলন বিনা বাধায় সহজ হয়ে উঠ্‌ল দেখে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। যদিও তুষারবালার ব্যবহারে একটু অতিরিক্ত ঢঙে পড়া ভাবে মন আমার ও অবস্থাতেও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল।

যাই হোক কিছুক্ষণ পরে ধীরে তুষারবালাকে তুলে বসালাম, কোনরকমে উঠে বসেই মাথাটী এলিয়ে রাখলে আমার বুকের উপরে। আমি একবার তাড়াতাড়ি ঘাটের চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম কেউ কোথাও আছে কিনা। তারপর সেই অবস্থাতেই দেহখানি জড়িয়ে ধরে সযত্নে দাঁড় করিয়ে ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে চল্‌লাম—বাঁধা ঘাটের ধাপে ধাপে।

উপরের ধাপে এসেই "আমি আর পারছিনা" বলে একেবারে যেন এলিয়ে পড়ল। তখন নিরুপায় দেখে আমি তুষারবালাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, হাঁটুর নীচে একখানি হাত এবং গলার নীচে আর একখানি হাত দিয়ে। কিন্তু দেখলাম আমার শক্তিতে তা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তুষারবালাও বোধহয় বুঝলে; বললে, "থাক্‌, থাক্‌, চল্‌ কোনরকমে হেঁটেই যাচ্ছি" এই বলে আমার অঙ্গের উপর সমস্ত অঙ্গখানি এলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চল্‌ল বাড়ীর ভিতরে।

কোনরকমে শোবার ঘরে নিয়ে এসে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তারপর শৈলি ঝিকে ডেকে বল্‌লাম "শীঘ্র একবাটী গরম দুধ নিয়ে এস।" তুষারবালা শুয়ে শুয়ে আস্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি খেয়েছ"?

আমি বল্‌লাম "না। হবে এখন তুমি ব্যস্ত হও না।" তুষারবালা আবার বল্‌লে "না, না বড্ড বেলা হয়ে গেছে, তুমি খেয়ে যাও। এক কাজ কর, ঠাকুরকে বল এইখানে আমার সামনে তোমার খাবার দিয়ে যেতে।"

তীব্র জোরের সঙ্গে বলবার শক্তি হয়ে উঠত তার, যে মনকে ধাঁধা লাগিয়ে দিত। ভাবতাম হয়ত যা বলছে সবই ঠিক, হয়ত কোনদিন আমি ওর প্রতি ঐ রকম অমানুষিক ব্যবহার করেছিলেমই বা।

বিবাহের ৬।৭ বৎসর পরে—তখনও ত বুঝিনি সয়তান ঘুমোই না। শান্তরূপে মধুর হয়ে ওঠা তারই আর এক লীলা। নিজেকে লুকিয়ে ফেলার শক্তি ছিল তার এত অসাধারণ যে তার মধুর লীলায় তুষারবালার চোখের মধ্যে আভাষে পর্য্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

সে দিন দুপুরে কথায় কথায় তুষারবালা বললে "চাঁপা মেয়েটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

চাঁপা মুকুন্দের স্ত্রী। এই বছর ৫।৬ বিবাহ হয়েছে। এবং বয়সে প্রায় তুষারেরই সমবয়সী। দিব্যি গোলগাল চেহারা, গোল মুখের গড়ন, শ্যামবর্ণ রং, ছোট ছোট ভাসা চোখ। চোখের নীচে পাতলা ঠোঁট দুটীতে সব সময়েই যেন কেমন একটা হাসি লেগে থাকত। সেটা বোধ হয় ঠোঁটের গড়নেরই ভঙ্গী। শুনেছি তার বাপের বাড়ীর নাম—"দেখন হাঁসি"। ভাল নাম চম্পা, চাঁপা বলেই সবাই তাকে ডাকে। তুষারবালার কথা শুনে আমি একটু অবাক হলাম। চাঁপা মেয়েটীকে আমি ভাল বলেই জানতাম। জিজ্ঞাসা করলাম :

"কেন ?"

তুষার বললে "বড্ড বেশী অহঙ্কার, কিসের এত জাঁক ?"

বললাম "অহঙ্কার ? মুকুন্দর স্ত্রী তোমার কাছে আবার কিসের অহঙ্কার করবে ;"

বললে "কি জানি। বোধহয় সবাই ভাল বলে তাই—অহঙ্কারে ফেটে যাচ্ছে।"

মুকুন্দর স্ত্রীর আমাদের সমাজে সুখ্যাতি ছিল। অত্যন্ত কর্ম্মপটু, বিশেষতঃ রন্ধনে তার সুনাম এতই বেশী হয়ে উঠেছিল যে গ্রামের সকল বাড়ীরই কাজেকর্ম্মে রন্ধনের ভার মুকুন্দর স্ত্রীর উপরেই পড়ত। এ ছাড়া শাশুড়ী দেওর প্রভৃতি সকলেরই যথাসাধ্য যত্ন আদর করতে একটুও নাকি ক্লান্তি বোধ করত না। বেশ মনে আছে, মার মুখে, মুকুন্দর স্ত্রীর কথা উঠলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমি বড় সঙ্কুচিত হয়ে উঠতাম। মনে হ'ত পরক্ষে তুষারকেই অবমাননা করা হচ্ছে। সন্ত্রস্ত চাহনিতে তুষারের দিকে চেয়ে দেখতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এ সব কথা যে তাকে এতটুকুও স্পর্শ করেছে তুষারের ধরনে তাঁর কোন লক্ষণই প্রকাশ পেত না। আপন মনে গম্ভীরভাবে নিজের কাজ করে যেত, ওসব কথা যেন তার কাণেও আসেনি।

কেন জানিনা চাঁপার বিষয় স্পষ্টাস্পষ্টি কোন কথা তুষারের সঙ্গে এতদিন আমার হয়নি। চাঁপার কথা উঠলেই তুষার কেমন যেন চুপ হয়ে যেত, কথা বাড়তে দিত না। চাঁপার সঙ্গে তুষারের প্রায়ই দেখা হ'ত—যতদূর লক্ষ্য করেছিলাম চাঁপা অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মধুর ব্যবহার করত তুষারের সঙ্গে—যেন বড্ড বেশী আপনার করে নিতে চায়। তুষারও কিছু খারাপ ব্যবহার করত না। কিন্তু তবুও কেমন যেন ভাব জমল না।

বললাম 'কেন ? তোমার সঙ্গে ত খুব ভাল ব্যবহার করে।"

বললে "ব্যবহারে খারাপ নয়—তবে—সে তোমরা পুরুষমানুষ ঠিক বুঝতে পারবে না। ব্যবহারের মধ্যে নিজের আহ্লাদেই যেন গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার ভাল লাগে না।"

বললাম "মরুকগে যাক, ওদের ঘরের বৌ ওদের ভাল লাগলেই ভাল।"

বললে 'ঠাকুরপোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনা।"

বললাম "সে কি কথা ! মুকুন্দকে দেখেত তা মোটেই মনে হয় না।"

বললে "তোমার কাছে আর কি বলবে ? চাপতে পারেনা আমার কাছে। মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে। হাজার হলেও ত ঠাকুরপো বুদ্ধিমান, বাইরে দেখে বুঝতে পারবে কেন ?"

বললাম "কি জানি হবে।"

সত্যকথা বলতে গেলে কথাটা আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হল না। তুষারকেই যে ঠিক অবিশ্বাস করেছিলাম তা নয়, কথাটা দুতিন মুখে মুখে ঘুরে এসে বোধহয় তিলে তাল হয়ে উঠেছে।" একটু চুপ করে রইলাম। হঠাৎ তুষারবালা বললে,—

"ঠাকুরপো শুনেছে আমার এই অসুখের কথা ?"

বললাম "বোধহয় না। শুনলে নিশ্চয়ই একবার এসে তোমায় দেখে যেত। বিকেল বেলা তাকে ডেকে পাঠাব-এখন।"

তারপর দু একটা কথা কইতে কইতেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৭ই ফাল্গুন সোমবার সকাল ১০টায় ভবানীপুর হরিশ মুখুজ্জের রোডে নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ। ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় পুরী 'হোটেল ডি জগন্নাথ'-এ ঘটনার সমাপ্তি।

পাত্র-পাত্রী

বরদা	সৌদামিনী
অশ্বিনী	উমা
নীলাদ্রি	অঘোরমণি
ফটিক	লবঙ্গ
অনুকূল	মিসেস্ রে
হারাণ	ইত্যাদি
ফেলারাম	
নেচারাম	
কথক ঠাকুর	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

৭ই ফাল্গুন সকাল ১০টা। হরিশ মুখুজ্জের রোড, ভবানীপুর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঐ দিন, বেলা তিনটা। বরদা মিত্রের চড়কডাঙার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর।

তৃতীয় দৃশ্য

ঐ দিন সন্ধ্যার পর চড়কডাঙার সুবোধ মিত্রের চণ্ডীমণ্ডপে কথকতার আসর।

চতুর্থ দৃশ্য

ঐ দিন রাত্রি ১১টা। বরদা মিত্রের বাড়ীর দোতলার ঘর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

৮ই ফাল্গুন, সন্ধ্যা। হাওড়া ষ্টেশন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

৯ই ফাল্গুন সন্ধ্যা। পুরীর সমুদ্র তীর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১০ই ফাল্গুন সকাল ৭টা। হোটেল ডি জগন্নাথের দোতলার একটি কক্ষ।

তৃতীয় দৃশ্য

ঐ দিন বেলা ১০টা। ঐ হোটেলের ড্রয়িং রুম।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভবানীপুর হরিশ মুখুজ্জের রোড। অশ্বিনী সেনের একতালা বাড়ীর সম্মুখ। রাস্তার উপর একখানি রোয়াক। বেলা সাড়ে দশটা, রোদের তেজ প্রখর হইয়াছে।

একটা বকুল গাছ ঠেস দিয়া অনুকূল ঘোষ দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষু মুদ্রিত, দেহ নিস্পন্দ। অনুকূল লোকটি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। দু' একজন করিতে করিতে চারিপাশে কৌতূহলী পথিকের ভিড় জমিয়া আসিল। গোখেল স্কুলের কয়েকজন টিচার ও কয়েকটি মেয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। সকলেই যথেচ্ছ মন্তব্য করিতেছে, তাহাতে গোলমাল জমিয়া উঠিয়াছে।

বৃত্তান্ত জানার জন্য অশ্বিনী সেন দরজা খুলিয়া রোয়াকে আসিল, তারপর রাস্তায় নামিল। অশ্বিনীর বয়স পঁয়ত্রিশের কম হইবে না; রোগা চেহারা।

জনতার কয়েকজনকে ক খ গ ও ঘ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।]

অশ্বিনী। কি হয়েছে?

ক। একটা লোক মরে দাঁড়িয়ে আছে—

অশ্বিনী। অ্যা ?

ক। বজ্রাঘাত—ছুঁলেই পড়ে যাবে—

ঘ। এ বোল্ট্ ফ্রম্ দ্য ব্লু (A bolt from the blue)

গ। লক্ষণ তাই বটে।

ঘ। না হে, এ সন্ন্যাস রোগ—

গ। লক্ষণ সেই রকম—

অশ্বিনী। আ-হা-হা, পথ ছাড়ুন ত। মরে নি—মরলে ওরকম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে কে ?

খ। মরে নি ? মাই গড্ (My god)!

ক। আরে, এ ঝিনঝিনিয়া নয় ত ?

গ। লক্ষণ ত তাই। এক-শ' কলসী জল ঢালতে হবে। মশায়রা কলসীর জোগাড় দেখুন।

অশ্বিনী। অনুকূল যে !—

খ। যে-ই হোক, অ্যাম্বুলেন্স চাই—

ঘ। তার আগে পুলিশ। স্বদেশী ব্যাপার ট্যাপার হতে পারে—

অশ্বিনী। কোন কিছু নয়—ব্যাপার কেবল মাত্র ঘুমের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চালাচ্ছে—নাক ডাকছে শুনতে পাচ্ছেন না ?

খ। তা ডাকে—অমন ঢের ঢের ডেকে থাকে। ডাকতে লাগলেই যে মরবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। খবর রাখেন না ত, মরার আজকাল কত সায়েন্টিফিক রকমফের বেরুচ্ছে।—মরেও আজকাল লোকে লাফায়, হাসে, কথা বলে।—আমাদের দেশেই কতগণ্ডা কেস রয়েছে শুনবেন তবে ?

অশ্বিনী। আজ্ঞে না। তারচেয়ে বরং আপনারা এখন আসুনগে। অনুকূলের সঙ্গে বিশ বছরের জানাশোনা। একেও জানি—এর ঘুমকেও জানি। শিবু পণ্ডিতের জল-বিছুটিতেও হুঁস হত না—ঘুমের জ্বালায় শেষে ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী বসল।—অনুকূল ? অনুকূল ?

[নানা জনে নানা মন্তব্য করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। অশ্বিনী অনুকূলের গা ঝাঁকাইয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিল। অনুকূলের সাড়া নাই।]

ক। দেখছেন ত ?

অশ্বিনী। এরই মধ্যে দেখবেন আর কি ? এই রকম অন্ততঃ মিনিট দশেক গায়ের উপর কসরৎ চালাতে হবে, ঐ একমাত্র উপায়,—নইলে কানের কাছে ঢাক পিটলেও এ মহাঘুম ভাঙবে না।...অনুকূল, অনুকূল ? ও ভাই অনুকূল, চোখ মেল—আমি অশ্বিনী।

[অবশেষে অনেক কষ্টে অনুকূলের ঘুম ভাঙ্গিল, সে চোখ মেলিল।]

ঘ। কলির কুম্ভকর্ণ।

গ। লক্ষণ বটে সেই রকম।

[রাস্তার জনতা তখন একেবারে সরিয়া গিয়াছে]

অশ্বিনী। অনুকূল, নেপোলিয়ান শুনেছি ঘোড়ার উপর বসে ঘুমুতেন—তুমি একেবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তোমরা সব মহাপুরুষ।

অনুকূল। (সপ্রতিভ ভাবে) কই, না ঘুম কোথা ? রোদ্দুরের যে ঝাঁঝ—চোখ বুঁজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

[অনুকূল হঠাৎ মহাব্যস্ত হইয়া রাস্তার এদিক ওদিক কি খুঁজিতে লাগিল।]

অশ্বিনী। কি খুঁজছ ?

অনুকূল। আরে ভাই, হাতে একটা পাঁজি ছিল—আচার্য্যি বাড়ী থেকে যাত্রার দিন দেখিয়ে আসছি। রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে। দাঁড়াও একটু এগিয়ে দেখে আসি—

অশ্বিনী। অত উতলা হচ্ছ কেন ? জিনিষ ত একখানা পাঁজি। বরদা মিত্তিরের তিন লাখ টাকা ব্যাঙ্কে পচছে, সাত আনার পাঁজি হারিয়ে তার আর কি লোকসানটা করবে ? চল চল—ঐ আমার বাড়ী, চাতালে বসে খানিক গল্প করিগে—কদ্দিন পরে দেখা।

[অনুকূল একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে।]

হ'ল কি ? ন যযৌ ন তস্থৌ !

অনুকূল। বরদা বাবুকে তুমি জানলে কি করে হে ?

অশ্বিনী। (হাসিতে হাসিতে) চড়কডাঙায় বাড়ী, ন'মাস ছ'মাসের পথ ত নয় !

[কথা কহিতে কহিতে দু'জনে রোয়াকের চাতালে গিয়া বসিয়াছে।]

বরদা বাবু হলেন আমাদের ওয়ার্ডের কর্ত্তামশাই—

বারোয়ারীর প্রেসিডেণ্ট—নীলাদ্রিশেখরের বাবা—তোমার বোনের শ্বশুর—গেল মাসে শুভকর্ম্ম হয়েছে—শাঁখের সাইজের নিমন্ত্রণ চিঠি—কেমন মিলছে ত হে ?

[অনুকূল সিগারেট বাহির করিল, অশ্বিনীকে একটা দিল]

অনুকূল। সমস্ত খবরই রাখ দেখছি—

অশ্বিনী। সে ত বরাবরই। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঘনিষ্ঠতর কুটুম্ব হতে হতে বেঁচে গেছি—খবর না রাখলে তোমরাই বা ভাববে কি ? চেষ্টার ত কখন ক্রটি কর নি ভাই,—তা সত্ত্বেও—খবর এসে যথাকালে ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছে। অনুকূল, বড্ড যে মুসড়ে পড়লে ? মনে মনে গর্ব্ব ছিল, এইবার অশ্বিনী সেনের চোখে ধূলো দিয়েছি,—সেই গর্ব্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল বুঝি ?

অনুকূল। তা নয় অশ্বিনী, আমি ভাবছি—খবর এসে গেল—অথচ তুমি চুপচাপ বসে রইলে—

অশ্বিনী। কক্ষণো না, কে বলেছে ? অশ্বিনীকান্ত—সে পাত্রই নয়। আমি সেই মুহূর্ত্তে গিয়ে বরদাবাবুকে ধরে পড়লাম। তখন আমার রোখ চেপে গেছে, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে—ও মেয়ে ঘরে আনতেই হবে। আমার ঘরে দিলে না ত নীলাদ্রির ঘরে নিয়ে এলাম। রাখতে পারলে আটকে ? তিনটে রাস্তার আগপাছ হলে কি হয়—বরদাবাবুর আমি ডান হাত। ওঁর কাছে নীলু যা—আমিও তাই। তুমি ভাবছ নেহাৎ গল্প কথা—বিশ্বাস হচ্ছে না—না ?

অনুকূল। হওয়া শক্ত বটে। আমরা বরাবর শুনে আসছি—

অশ্বিনী। মিথ্যে শোন নি। দু'বছর ধরে তোমরা যেখানে যত সম্বন্ধ করেছ আমি ইস্কুপে উল্টো পাক দিয়ে এসেছি; ইদানীং ঐ ত একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কারণ ত' তোমার অজানা নয় ভাই। মেয়ে দেখতে গেলুম—বিয়ে না হয় নাই দেবে—কিন্তু তোমার বাবা একেবারে মেয়েই দেখালেন না। রেল-ভাড়া তিন টাকা সাত আনা একদম গচ্চা গেল। বল, এতে অপমান হয় না কার ?

অনুকূল। (লজ্জিত ভাবে) বাবার ঐ এক কেমন স্বভাব। এমন একগুঁয়ে—

অশ্বিনী। তি-ন টা-কা সা-ত আ-না—দু-এক পয়সা নয়। আমার চোখে সেদিন জল এসেছিল। প্রথমটা মনে এল প্রবল বৈরাগ্য—দুত্তোর বলে হিমালয়ের দিকে মহাপ্রস্থানের উপক্রম। তাতে খরচ বেশী—তখন এল প্রতিহিংসা—তোমাদের পিছনে পিছনে জোড়া দুই জুতো ক্ষয় করে বেড়িয়েছি। কিন্তু এখন—কৃতজ্ঞতা, অন্তরভরা অফুরন্ত অসীম কৃতজ্ঞতা—

[অশ্বিনী হাসিতে লাগিল। অনুকূল অবাক হইয়া গেল।]

অনুকূল। কৃতজ্ঞতা ?

অশ্বিনী। নিশ্চয়। একশো বার। বাড়ীতে গিয়ে তোমার বাবাকে শতকোটি প্রণাম দিও। জমাখরচ খতিয়ে দেখেছি—নিদেন পক্ষে সাতশো তেষট্টি টাকা অতিরিক্ত মুনোফো। ভাগ্যিস তোমরা মেয়ে দাওনি—তা'হলে কি জুটত এমনটি ?

অনুকূল। বিয়ে-থাওয়া তোমার হয়ে গেছে নাকি, অশ্বিনী ?

অশ্বিনী। একেবারে হয়ে যায় নি যদি চ—কিন্তু বাকীও বড় নেই। বেশি দূরেও নয়, বনগাঁয়—কলকাতা থেকে ঘণ্টা দুয়ের রাস্তা—সে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ—

[হঠাৎ তীক্ষ্ণচোখে সে রাস্তার দিকে তাকাইল।]

রোসো ভাই, রিকসাখানা সন্দেহজনক বোধ হচ্ছে। হুঁ—ঠিক তাই—

অনুকূল। ও কারা ?

অশ্বিনী। ঐ বনগাঁর খুড়ী ঠাকরুণ, আর খুড়ো মশায়। খুড়ীই গার্জেন কি না। আমাকে ভয়ানক পছন্দ, ইদানীং প্রায়ই পদধূলি দিচ্ছেন। আজ কনেকে এখানে নিয়ে আসবার কথা। মা বুড়ো মানুষ—বাড়ীতে নিয়ে এসে তিনি দেখতে চান—

[অশ্বিনী রোয়াক হইতে নামিয়া রাস্তার মোড় অবধি গিয়াছে]

অশ্বিনী। উঠোনা অনুকূল,—এঁদের বসিয়ে দিয়েই আসছি। এক মিনিট মাত্তোর। অনেক কথা আছে—। এই রিক্সা—রোকো, রোকো—এখানে।

[রিক্সা থামিল। রঙ্গক্ষেত্রে উদয় হইলেন অঘোরমণি ও কার্ত্তিকচন্দ্র। অঘোরমণি অতি স্থূল, কার্ত্তিক অতি কৃশ। কার্ত্তিকের পায়ে

মোজা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে গরম কোট—কোটের বুক পকেট হইতে টেথেসকোপের মুখটা দেখা যায়।]

অশ্বিনী। আসুন, আসুন খুড়ী মা—আসতে আজ্ঞা হয় খুড়োমশায়। ভিতরে চলুন। মা পথ চেয়ে বসে আছেন।

অঘোর। লবঙ্গকে আনা গেল না। এখানে আসতে হবে শুনে কাল থেকে কাঁপুনী সুরু হয়েছে।

ফটিক। আম ডাক্তার মানুষ, বাজে ভেলকি ত আর শুনব না—নাড়ী ধরে দেখলাম। বলব কি বাবাজী, সত্যিই ঢেঁকির পাড় পড়ছে—

অশ্বিনী। সে ত ভাল কথা নয়···শুভকর্ম্মের পরে তা হলে কি হবে? তখন না এলে—

ফটিক। হাঁঃ, তখনকার আবার ভাবনা! বলিদানের আগেই যা ডাকাডাকি—পরে ত একেবারে চুপ চাপ হয়ে যায়—

অশ্বিনী। (বিরস মুখে) যা-ই হোক, বড্ড মুস্কিলের কথা হয়ে পড়ছে খুড়ীমা, দু'মাসে একুনে উনিশবার বনগাঁ গেলাম—বাইশ টাকা ন আনা ট্রেণ ভাড়া; অথচ কনে কাপড়ের পুঁটলি হয়ে থাকেন, আজও কনে দেখা হল না—মা জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারি নে—

অঘোর। আচ্ছা, আমিই জবাব দেব'খন। দেখবার কি আছে। যা বলেছি,—চেহারা প্রতিমার মতো, রং কাঁচা সোনা। দেখা শুনো না হয়ে কি আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?

ফটিক। আহা, ব্যস্ত কি বাবাজীবন, পরে এত দেখবে যে তখন না দেখবার জন্য চোখ বুঁজে থাকতে হবে। চলো—চলো—

[অশ্বিনী অঘোরমণি ও ফটিককে লইয়া রোয়াকের পাশ দিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।]

[এদিকে ঝিরিঝিরি পাইয়া ঐ চাতালের ঐ খানেই অনুকূল একটু ঘুমাইবার জোগাড় করিয়াছিল। হঠাৎ প্রবল কোলাহলে আতঙ্কিত হইয়া চোখ মেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোলাহল কোন অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্পজনিত নয়—একটি মিছিল আসিতেছে। সামনে 'নিশান' ধরিয়া দুইটি ছোকরা। নিশানে লেখা আছে—'নারী-জাগরণ সংঘ', পিছনে মেয়ে ও ছেলের দল সারবন্দী কোরাস গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তার পিছনে বাদকদল—গলায় হারমোনিয়াম তবলা প্রভৃতি ঝোলানো। বীরদর্পে সকলে মার্চ করিয়া চলিয়াছে।]

গান

সূর্য্য উদিল পূর্ব্ব গগণে,
জাগো বীর নারী সমরাঙ্গণে
অন্ধকারের শত বন্দিনী,
এস দলে দলে না মানি' বাধা—
বাজাও ডঙ্কা; কিসের শঙ্কা?
লাগুক গাত্রে খানিক কাদা।
এস গলাগলি গিন্নি ও মেয়ে
কি ভাবিছ ঘরে হাঁ করিয়া চেয়ে?
ছাড়হ খুন্তি হে ক্ষেন্তি মাসী,
বাঙালী জাতির তোমরা আধা।
হে নারী, রবে কি চির নির্ব্বাক
অবগুণ্ঠনে ঢাকা দিয়ে টাক?
আজি হাঁক দাও প্রলয় ছন্দে—
মোদের সংঘে দু'সিকে চাঁদা।

[গানের শেষ দিকটায় অশ্বিনী রোয়াকের দরজা খুলিয়া অনুকূলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।]

অনুকূল। বড় ভয়ানক গান ত অশ্বিনী—

অশ্বিনী। এ সবের ইদানীং বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে। চারিদিকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ—

অনুকূল। আরে, দুর্ভিক্ষ কোথায়? বন্দিনী, সমরাঙ্গণ, ডঙ্কা বাজনা—শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—

অশ্বিনী। কিন্তু আসল কাব্যরস ঐ শেষখানটায়—দু'সিকে চাঁদা। যে যাই বলুক মূলে রয়েছে স্রেফ দুর্ভিক্ষ। যে দিন কাল পড়েছে, সামাল সামাল—জমাখরচে খুব হুঁশিয়ারী চাই। খুড়ী ঠাকরুণ বলছিলেন, কনে কাঁচা সোনার রং। মাকে কাণে কাণে বলে এলাম, তা হোকগে মা, বাজারে কিন্তু কাঁচা সোনার চেয়ে গিনি সোনার দর বেশী। এতক্ষণ সেই খতিয়ে দেখা চলছে।

অনুকূল। তোমার বাড়ীতে কুটুম্ব, আমি আর বসব না

অশ্বিনী। কিন্তু কি কথা আছে বলছিলে—

অশ্বিনী। একটা খবরের জন্য বড় উদ্বিগ্ন আছি ভাই। তোমার বোনের বিয়ে ত যা হোক করে ঘটিয়ে দিলাম,

এখন অতঃপরের কি বলত? নীলাদ্রিটা আবার বড্ড গোঁয়ার কিনা; আমায় ত হাঁকিয়েই দিয়েছিল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নেহি মাংতা। শেষকালে বরদাবাবুকে অনেক বলে কয়ে—

[অনুকূল প্রবল বেগে হাসিতে লাগিল]

অনুকূল। ওরা বল্লে পাড়াগেঁয়ে? হায়রে অদৃষ্ট! সহরের বাসিন্দা হলে কি হবে, আমি ত দেখছি মান্ধাতার আমলের সেকেলে!

অশ্বিনী। বটে! বটে! ঠিক বলছ? আমরা এতকাল আছি, কই আমরা ত বুঝতে পারি নি—

অনুকূল। আমার বুঝতে একটা দিনও দেরী হয় নি। উমা আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলে কি হয়,—ইংরাজী বাংলা যা হোক কিছু জানে—গান-বাজনাও অল্প সল্প শিখেছে—কিন্তু ওদের যা রকম সকম—বুড়োর বোধ হয় কাণে সা রে গা মা গেলেই পতন ও মূর্চ্ছা হয়ে যায়। বোনকে তাই কেবলই বলছি—ওরে, সাবধান, সাবধান—গান গেয়ে বসিস নে—

অশ্বিনী। বুড়োর হ'তে পারে···কিন্তু ছেলে যে নবীন, কলেজের পোড়ো—ইয়ং বেঙ্গল—

অনুকূল। সে বুড়োর প্রপিতামহ। কদমফুলি চুল ছাঁটা···বাবার সামনে দাঁড়ালেই ঘাড়টা পয়তাল্লিশ ডিক্রী ঝুঁকে আসে—চশমা-আঁটা নবীন পরাশর মুনি আর কি!

অশ্বিনী। বটে? তা হলে খুব সামাল কিন্তু। ওরা গোঁয়ারের গুষ্ঠি।

অনুকূল। গোঁয়ার?

অশ্বিনী। একশবার—একেবারে কাঠ গোঁয়ার। তুমি বাল্যবন্ধু—তোমার কাছে ঢাকাঢাকি কি—গেল বছর বারোয়ারীর জমাখরচ নিয়ে বুড়ো মিটিংএর মাঝখানে বলে বসল,—অশ্বিনী, তোমায় চাবকাব। আবার, পিতৃভক্ত ছেলে—তার কিঞ্চিৎ অধিক পরাক্রম, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি হাণ্টার বের করে ফেলল। আমি আপনার লোক, আমি অবশ্য কিছু মনে করি নি কিন্তু বুঝে দেখ ব্যাপার টা।··· চুপ, চুপ! নীলাদ্রি ভাই, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

[নীলাদ্রি আসিয়া দাঁড়াইল। চেহারা অনুকূল যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, সেরূপ মোটেই নয়। তেইশ চব্বিশ, চশমা পরা স্বাস্থ্যবান সুশ্রী যুবক।]

নীলাদ্রি। মিষ্টি কম এসেছে, তাই আবার ছুটতে হল। সেজদা যে এখানে—অশ্বিনীর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

অশ্বিনী। সে কি আজকের? অনুকূল আমার বিশ বছরের সাথী। তখন কোথায় তোমরা—কোথায় বা কুটুম্বিতে?

নীলাদ্রি। অশ্বিনী, তুমি ত আমাদের ও পথ ছেড়েই দিয়েছ! বাড়ীতে বসে বসে কি যে কর! আজকে যেওনা একবার। সেজদা, পাঁজি দেখানো হয়ে গেছে? আচার্য্যি মশায় কি বললেন? মঘা, অশ্লেষা, ত্র্যহস্পর্শ এখন ত সারবন্দী চলেছে—

অনুকূল। কেবল কালকের দিনটে ছাড়া। কালই রওনা হওয়া যাক। সকালবেলা বাবার কাছে টেলিগ্রাম করে দেব—

নীলাদ্রি। সেজদা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন। কাল···কাল হবে না—কিছুতে হবে না। কি বল, অশ্বিনী?

অশ্বিনী। সে কি কথা, অনুকূল! এসেছ কুটুম্বের বাড়ীতে—দু'চার দিন থাক—

অনুকূল। না হে—উমার কথাটাও একবার ভাবতে হবে। ছেলেমানুষ—নিশ্চয় মন খারাপ হয়েছে। পরের জায়গায় আর কখনো ত আসেনি—

নীলাদ্রি। তার আবার পরের জায়গা কোনটা? পর ত এমন আমরা। বাবা রাতদিন আগলে নিয়ে বসে আছেন, ঠাকরুণের টিকির আগাটাও দেখবার জো নেই।··· সে সব কিছু নয়, মন খারাপ হয়েছে আপনার। বলুন সেজদা, কি অসুবিধে হচ্ছে—বলতেই হবে।

অনুকূল। হ্যা অসুবিধে একটু হচ্ছে বই কি, ভাই! সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের কলকাতা শহর ভদ্রলোকের বসবাসের জায়গা নয়। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি ট্রাম ঘড়ঘড় করছে। এক ঘুমের পর শুনি, জোড় কদমে পা ফেলে ঘোড়া গাড়ি টেনে চলেছে···আবার রাত না পোহাতে ময়লার গাড়ির সারি চলেছে ছড়ছড়, ছড়ছড়—।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখন এমন হয়েছে, রাস্তা চলতেই ঘুম পায়—

নীলাদ্রি। আচ্ছা সেজ দা, আর চলতে চলতে ঘুমুতে হবে না। এবার চিলে কোঠায় চাবি দিয়ে রাখব, তিন দিন পড়ে পড়ে ঘুমোন—অশ্লেষা আরম্ভ হয়ে গেলে তখন দোর খুলব। আসুন দিকি।...অশ্বিনী, বিকেলের দিকে যাচ্ছ তা হলে।

[অশ্বিনী ঘাড় নাড়িল। অনুকূল ও নীলাদ্রি অনুচ্চস্বরে কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে হাসিয়া গলা ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল।]

অশ্বিনী। (পিছন হইতে উহাদের দিকে বক্র ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।) ঈস্, গতিক ত সুবিধের নয়—'সখি আমায় ধর ধর' অবস্থা! ওরে অবোধগণ, বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু অতঃপর আছে; অশ্বিনী সেন আর হেলা করবে না। দুটো মাস নিজের ধান্দায় বেরিয়েছি, এদিকে পাকা দেখা, লগ্ন পত্তোর বিয়ে, বৌ ভাত,—চটপট সমস্ত সেরে ফেলেছে, আর এমনি দুর্ভাগ্য আমার দু'মাসে রেল কোম্পানীকে একুনে বাইশ টাকা ন' আনা দণ্ড দিয়েও শ্রীমতীটির চোখের দেখাটুকু মিলল না—

[অঘোরমণি ও ফটিকচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন]

আপনারা চললেন না কি, খুড়ীমা?

অঘোর। হ্যাঁ, কথাবার্ত্তা হয়ে গেল বেয়ানের সঙ্গে। আর দেরী করছি নে, কাল মেয়ে দেখা। উনি বল্লেন, আমি আর কি দেখব,—ছেলে দেখলেই হবে। তা'হলে বাবাজী, কালকেই—কি বল?

অশ্বিনী। যে আজ্ঞে। মা যখন বলেছেন—বুঝলেন না? তা হলেই হল। আমার ত দেখবার কোন ইয়ে ছিল না, আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট। নেহাৎ মা বলছেন—কি করা যায় বলুন—

অঘোর। কাল সন্ধ্যের এক্সপ্রেসে আমরা পুরী যাচ্ছি, লবজও যাবে। তুমি হাওড়া ষ্টেশনে থেকো, টিকিট্ কেটে তুলে দিতে হবে। সেই সময় দেখিয়ে দেব।...কিন্তু বাবাজী, মতামত আমাদেরও একটা আছে। আমাদের কথাটা মনে আছে?

অশ্বিনী। ইনসিওর? খুড়ী মা, আপনি কি—

অঘোর। ইনসিওরেন্স এজেন্ট। তোমার খুড়োমশাই ডাক্তার—উনি কেস এগজামিন করেন। আমাদের জয়েণ্ট বিজ্‌নেস্। কিন্তু আমাদের জন্য ত বলছি না। ভগবান না করুন, বিয়ের পরেই যদি কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে—এমন ত হামেশাই হচ্ছে—মেয়ে দেব, মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখব না? বাবাজী, আমরা তোমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী—বিয়ের আয়োজন করতে লাগ, আর ঐ সঙ্গে প্রিমিয়ামেরও জোগাড় দেখ—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চড়কডাঙায় বরদাকান্ত মিত্রের বৈঠকখানা ঘর। পশ্চিমের দরজা খোলা। সামনে ছোট উঠান। উঠানের ওপারে ফুটপাথ। এই দরজার ঠিক সামনা সামনি পরদা টাঙানো অন্দরের পথ। আবার উত্তরের দিকে আর একটা দরজা আছে, সে দিক দিয়াও অন্দরে যাতায়াত চলে।

ঘরের একদিকে নীচু তক্তাপোষ, তাহাতে ধবধবে চাদর পাতা। আর একদিকে দেয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকটা আলমারি, পাঁচ-ছ খানা চেয়ার, একখানা ইজি চেয়ার।

দেয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডারে ৭ই ফাল্গুন তারিখ দেখা যাইতেছে। এখনও বেশ শীতের আমেজ আছে। ঘরের সিলিং-ফ্যানের ব্লেড খোলা।

এখন বেলা তিনটা। নূতন বধূ উমা পানের ট্রে লইতে এ ঘরে আসিয়াছিল, নীলাদ্রি তাহার পথ আটকাইয়া ফেলিয়াছে।]

উমা। পরিবেশন করছি, পথ আটকালে যে—

নীলাদ্রি। একটা মিষ্টি দিয়ে যাও—

উমা। মিষ্টি কোথায়? পান আছে—

নীলাদ্রি। বেশ, তা-ই সই! না-না, হাতে নেব কেন? মুখের মধ্যে এই, এই এখানে দিয়ে দিতে হবে—

উমা। ধ্যেৎ, আমার লজ্জা করে না বুঝি?

নীলাদ্রি। এখানে ত কেউ নেই—

উমা। তুমি আছ—

নীলাদ্রি। আচ্ছা, আমি চোখ বুঁজলাম। (চোখ বুঁজিল)—এইবার?

উমা। তুমি চোখ মিটমিট করে দেখছ—

নীলাদ্রি। দেখছি না। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, দেখছি না। উমা লক্ষীটি,—

উমা। আচ্ছা—

[নীলাদ্রির মুখে চুণ মাখাইয়া দুষ্ট উমা চঞ্চল পায়ে ছুটিয়া পলাইল।]

নীলাদ্রি। (মুখে হাত লাগাইয়া দেখিয়া) ঈশ্... দেখেছ, করেছে কি! রোসো—তোমার দুষ্টুমি দেখে নিচ্ছি—

[ছুটিয়া সে উমার পিছনে যাইবে, এমন সময় বাহির হইতে অশ্বিনীর ডাক]—নীলাদ্রি, আছ?

নীলাদ্রি। এস ভাই, অশ্বিনী—

[তোয়ালে দিয়া প্রাণপণে মুখের চুণের দাগ তুলিয়া ফেলিল]

বোসো—হ্যাঁ হ্যাঁ এ খানটাতেই বোসো। সেজ দাদার সঙ্গে তোমার বিশ বছরের ঘনিষ্টতা; আচ্ছা, বলতে পার, দাদা এমন ভালমানুষ—বোনটি তাঁর এমন দুষ্টু হল কি করে।

অশ্বিনী। দুষ্টু নাকি? আগে ত এতটুকু মেয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করত—গলায় এক কুড়ি মাদুলি ঝুলিয়ে খিন খিন করে নেচে বেড়াত—

নীলাদ্রি। ওঁদের বাড়ীতেও বুঝি দু-একবার গিয়েছে—

অশ্বিনী। দু-একবার কি—অন্তত পক্ষে দু'শ বার। ওঁদের কোন খবরটা না জানি—

নীলাদ্রি। বটে, বল না দু'চারটা, শুনি—

অশ্বিনী। বলতাম ত অনেক কিছুই! কিন্তু বনগাঁর এক সম্বন্ধ নিয়ে দুই মাস একরকম বাড়ী ছাড়া। হঠাৎ একদিন বাড়ী এসে দেখি, বৌভাতের নিমন্ত্রণ চিঠি—বৌভাত তখন চার দিন চলে গেছে। তা যা হোক, বলি বনছে কেমন? মানে, এ মেয়ে ত তোমাদের ঘরের মতো নয়—

নীলাদ্রি। ঠিক বলেছ অশ্বিনী, তা আমিও বুঝতে পারছি; এ ঘরে মানায় না ওকে—

অশ্বিনী। পারছ ত? আরও বুঝবে, দু-চার বছর কাটুক। তোমরা হলে সাবেকী গৃহস্থ—জঙ্গল কেটে বসতি—এ সব মানাবে কি করে? কি রকম শিক্ষা দীক্ষা! ভদ্রলোকের মেয়ে গান গায়—বলি শুনেছ কখনো? খাটের উপর শুয়ে কাণে কাণে প্রেমগুঞ্জন নয়—একেবারে আকাশ-ভেদী সঙ্গীত, রাস্তায় দু'শ লোক দাঁড়িয়ে যায়—

নীলাদ্রি। হামেশাই শুনছি। রেডিয়োয়, গ্রামোফোনে, গলির জানলায় জানলায়, রাস্তাঘাটে—...কিন্তু ঘরের মধ্যে সামনাসামনি বসে প্রথম শুনলাম আজ সকাল বেলা—

[অশ্বিনী এতক্ষণে বুঝিয়াছে, হাওয়া উল্টা দিকে চলিয়াছে]

অশ্বিনী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! প্যাঁচ চিনতে পারিনি—ইস্ক্রুপ এঁটে গেল নাকি?

[ভিতরের দিক হইতে অর্গান বাজিয়া উঠিল।]

নীলাদ্রি। অশ্বিনী, উনি আনন্দপ্রতিমা। সত্তর বছরের এই বাড়ী—মাঝে মাঝে বিয়ের রসুন চৌকি ছাড়া কোন বাজনা কখনো বাজেনি। উনি এসেই আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছেন।

অশ্বিনী। তা ঢেউ খাওয়া মন্দ নয়, তাল সামলাতে পারলে এক রকম ভালই। আচ্ছা নীলু ভাই, এসব বুঝি তোমার খুব পছন্দ? মেয়ে লোকে গান গাবে, পাঞ্জা লড়বে, যুযুৎসু খেলবে, মোটর চালাবে—

নীলাদ্রি। উনি মোটর চালনাও জানেন না কি?

অশ্বিনী। অজ পাড়াগাঁ জায়গা—এক হাঁটু কাদায় মোটর ষ্টার্ট নেয় না যে। উমি আমাদের ইয়া ইয়া পনি লাগাম ধরে ঘোড়দৌড় করে নিয়ে বেড়ায়। কল্পনা করতে পার?

নীলাদ্রি। তা পারি। এবং সম্প্রতি ঘোড়ার অভাবেই বোধ করি—

অশ্বিনী। তোমাকে নিয়ে ঘোড়দৌড় সুরু করেছেন এবং লাগামের অভাবে কাণ ধরে। এবং অনুমান হচ্ছে তোমার তাতে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়ে গেছে—

নীলাদ্রি। অশ্বিনী, উনি নৃত্য জানেন?

অশ্বিনী। হুঁ,—আর তার চেয়ে বেশী জানেন নাচাতে। এখানে পা দিয়েই বুঝতে পারছি। কিন্তু নীলু, লক্ষ্য রেখ—

আনন্দের ঢেউটা অধিক উত্তাল না হয়। তোমার বাবা জানতে পারলে যুগলকে ব্যাঙের নৃত্য নাচিয়ে ছাড়বেন—

নীলাদ্রি। (হাসিয়া উঠিয়া) খেপেছ? বাবা যে ব্যান্নো সাহেবের ছাত্র—রীতিমত নব্য তন্ত্রের লোক—

অশ্বিনী। ষাট বছরের নব্য! বল কি?…কিন্তু অনুকূল বলছিল, উল্টো কথা—

নীলাদ্রি। সেজদা জানবেন কি—আরে আমরাই কি আগে জানতাম যে বাবার চুল সাদা কিন্তু বুকের ভেতরটা সবুজ? বউ আসা অবধি তাকে চোখে চোখে রাখেন—কি যত্ন, কি আদর? ডেকে ডেকে তার গান শোনেন।

অশ্বিনী। গান শোনেন? বরদা বাবু? আমার মাথা ঘুরছে—গোলমাল লেগে যাচ্ছে। বরদাবাবু চলেন সবুজের দলে?

নীলাদ্রি। নিবিড় গভীর সবুজ—আচ্ছা, বুঝেই দেখ না। চুল পেকেছে, ওকালতি ছেড়েছেন কিন্তু কোন দিন গীতা নিয়ে বসতে দেখেছ? এই যে তুমিই সেবার কোন গোস্বামীর কাছে দীক্ষা দিয়ে গলায় কণ্ঠি পরে মাস দুই খুব খোল পিটতে সুরু করলে—বাবাকে দেখেছ সে রকম?

অশ্বিনী। না—তা দেখিনি। তবে নীরোগ শরীর—আখেরের জন্য দু'পয়সা গুছিয়ে নিয়েছেন—খোল না পিটে চলে, গীতারও আবশ্যক হয় না—কেন হাঙ্গামে যাবেন? কিন্তু তর্কাতর্কির কথা নয় নীলু,—তুমি হলপ করে বলতে পার বরদা বাবু সবুজ? মানে অনুকূল একরকম বলে তুমি এক রকম বলো—আমরা বরাবর দেখে আসছি আর এক রকম—

নীলাদ্রি। কিন্তু তোমার মাথা ব্যথাটা কি অশ্বিনী?

অশ্বিনী। মাথা ঢুকিয়েছি বলেই না মাথা ব্যথা। শুভকর্ম চুকে গেল, ভাবনা আমার ঘোচে না। তবে খুলেই বলি ভাই। উর্মিটার বড্ড শুচিবাই—মার্বেলের উপর গোবর মাটি লেপা অভ্যাস। তার উপর শিব পূজো, ষষ্ঠি পূজো—ঘেঁটু পূজো—বারমাস উপসর্গ একটা লেগেই আছে। আমরা পই পই করে মানা করে দিয়েছি…আছেও খুব সেরে সামলে। শেষকালে এই সব নিয়ে কোন রকম গণ্ডগোল যদি হয়, অনুকূলদের কি বলে কৈফিয়ৎ দেব? মানে ওদের ত ইচ্ছে দিল না—নেহাৎ আমারই কথায়।—চুপ…চুপ, কর্ত্তা আসছেন—যা সব বলে ফেললাম ঘুণাক্ষরে ওঁর কাণে না যায়। মেয়েটার মুখ চেয়ো ভাই, আমার একেবারে বিশেষ অনুরোধ—

[অশ্বিনী নীলাদ্রির হাত জড়াইয়া ধরিল। বরদা বাবু আসিতেই হাত ছাড়িয়া দিল। বরদাবাবুর মাথা ভরা পাকা চুল, ফরসা চেহারা, শরীরে সামর্থ্য আছে।]

বরদা। নীলে, তুই এখানে বসে গল্প গিলছিল্—আমি উপর নীচে এঘর ওঘর বারাণ্ডা উঠোন—রাজ্যিশুদ্ধ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। তোর ন'মামীর মেয়েরা এসেছিলেন—সীতানাথের বাড়ীর ওঁয়ারাও—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, তাই ত চলে এলাম। বিস্তর মেয়েমানুষ—

বরদা। মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ তা কি হয়েছে? বাঘ-সিংহী ত নয়? তুই নবাবের বেটা কাজ দেখলে পাশ কাটাস্। তা এলি—এলি; বসে বসে গল্প করছিলি কোন লজ্জায়?

নীলাদ্রি। এখানে আর কাজ কি?

বরদা। কাজ কি? দেখে আয় হতভাগা কাজ কাকে বলে! মাথা ভাঙতে লাগলাম, বৌমা তুমি আবার পরিবেশন করছ কেন? তা কিছুতে শুনলে? পানের ডিবে নিয়ে ঘুর ঘুর করে ঘুরতে লাগল।…দেখ্, আলসে অকেজো লোক আমার দু'চক্ষের বিষ। সর্ব্বক্ষণ একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকবি। বসে বসে গল্প না করে বই নিয়ে বসলি না কেন? তা হলেও বুঝতাম এগ্‌জামিন এসেছে—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, পড়া হল্ল তপস্যা…এই গোলমালের মধ্যে—

বরদা। নাঃ, এখানে হবে কেন? তপোবন চাই। বেশ ত, এখন সবাই চলে গেছে আর ছুতো চলবে না। তোমার মা রান্নাঘরে, বৌমা একা কেবল মাঝের ঘরটিতে। তুমি উত্তরের কুঠুরীতে তপোবন বানিয়ে নেওগে। আমি এখানে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নেব—

নীলাদ্রি। (ব্যস্তভাবে বিশেষ আজ্ঞানুবর্ত্তিতার সহিত) যে আজ্ঞে—

[নীলাদ্রি চলিয়া যাইতেছিল, বরদা বাবু তাঁহাকে পুনশ্চ ডাকিলেন]

বরদা। অমনি চল্লে? একটা কথা ভাল করে শুনে নিয়ে যাবে, নবাবের বেটার সে হুঁস নেই। একটা বালিশ পাঠিয়ে দিও এখানে—আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পোড়ো, ওতে মনসংযোগ হয়—এখান থেকে যেন শুনতে পাই—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে—

বরদা। আবার চাল্ল? ভাল করে শুনে যেতে পার না? বালিশ নিয়ে বৌমাকে এখানে পাঠিয়ে দাও গে, আমাদের মায়ে-পোয়ে অনেক কথাবার্ত্তা আছে।

[নীলাদ্রির মুখভাবটা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মতো। ডুবন্ত লোক তৃণখণ্ডের ভরসায় যেমন হাত বাড়ায় তেমনি ভাবে একটু পরে সে কথা কহিল]

নীলাদ্রি। এখানেই?

বরদা। এখানে বই কি? উপরে গেলে তোমার আবার তপস্যার ব্যাঘাত হবে যে। (অশ্বিনীর দিকে একবার তাকাইয়া) অশ্বিনী এখনই উঠে যাচ্ছে,...ও ত আর বসবাস করতে আসে নি।

[ততক্ষণে নীলাদ্রি পায়ে পায়ে চলিয়া গিয়াছে।]

তারপর অশ্বিনী, কি খবর বল। সেই হাওলাতী টাকা দশটা বুঝি! ওখানেই রেখে যাও—

অশ্বিনী। সে ত বোশেখ মাসে দেবার কথা—

বরদা। বোশেখ মাসের কথা বুঝি। তা বেশ, বোশেখেই এসো। ভুলো না। আজকে কি তা হলে?

অশ্বিনী। আপনার সঙ্গে নয়। অনুকূল আমার বিশিষ্ট বন্ধু, ওদের ওখানে বিশ বচ্ছর গতায়াত। ও-ই আমার বাড়ীতে গিয়ে ডেকে এসেছিল। সে ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। আচ্ছা—উঠি তবে—

বরদা। আহা, বোসোই না...ঐ তোমাদের এক বদ অভ্যাস, কথার মাঝখানে উঠে পড়। বিশ বচ্ছর গতায়াত—তা হলে ত আমার মা-টিকেও আজন্ম দেখে আসছ। আমার মা জননী—বুঝতে পারলে না?

অশ্বিনী। উর্মি?

বরদা। হ্যাঁ। এতদিনে মা আমার বাড়ী আলো করে এসেছেন। বুঝলে অশ্বিনী, একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না, মা একেবারে আনন্দের খনি, স্বর্ণপ্রতিমা—অমন হয় না—দেখেছ ত তুমি—

অশ্বিনী। হয় না, তাকি বলা যায়? আমারও একটা সম্বন্ধ হচ্ছে—মেয়ে পরমা সুন্দরী—কাঁচা সোনার রং—

বরদা। যা-ই বল অশ্বিনী, কাঁচা সোনা বড্ড ফিকে। দুধে-আলতাই ভাল। যেমন আমার বউমা।...আচ্ছা অশ্বিনী, আচ্ছা লোক ত তুমি! বিশ বছর ওদের বাড়ীতে গতায়াত—আমি দেশদেশান্তর ঘুরে মরছি—তুমি একটা দিনও ত মায়ের খবর বল নি।—

অশ্বিনী। বলতাম—নিশ্চয় বলতাম। কিন্তু হল কি—আচ্ছা খুলেই বলি—(হঠাৎ গলা নামাইয়া) মানে নীলু কিছু বলতে দেয় না! সে গা ছুয়ে দিব্যি করিয়ে নিল—

বরদা। বলতে দেয় না! আমি হিল্লী দিল্লী তোলপাড় করছি, সে নবাবের বেটা জেনে শুনে চুপচাপ থাকে, মজা দেখে বুঝি—

অশ্বিনী। সে ভাবল, যদি আপনার পছন্দ না হয়। মানে তার গিয়ে বড্ড ঝোঁক পড়ল এই মেয়ের উপর—

বরদা। পছন্দ হবে না। দেখ অশ্বিনী, হতভাগা এগ্‌জামিন পটাপট পাশ করে বটে...কিন্তু বুদ্ধি এক ছটাক নেই। ছেলের বাড়ী মায়ের আসা—তার পছন্দ অপছন্দের কথা কি? গিন্নিকে তা হলে ও বুঝি দেখে শুনে হিসেব করে গর্ভধারিণী পদে বহাল করেছে?

অশ্বিনী। না—তা একটু সঙ্কোচ হবে বৈ কি।...অর্থাৎ আপনার গুরু ব্যারো সাহেব—অনুকূলদের হলেন খড়দার কৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাই। আবার উর্মিটাও তেমনি—রাতদিন "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি নিভং"—শিবপূজো লেগেই আছে। আপনাদের হল সবুজের বাড়ী—ওরা নিদারুণ সেকেলে।

বরদা। নীলে তাই বলে বুঝি! দেখ বেটার বুদ্ধি। আমার ঘরের লক্ষ্মীঠাকরুণ—তিনি সেকেলে হবেন না ত কি হীল তোলা জুতো পরে ঠুক ঠুক করে সিগারেট ফুঁকে বেড়াবেন?

অশ্বিনী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ? ইস্কুপ প্যাঁচে প্যাঁচে এঁটেই চলল যে-

বরদা। আচ্ছা অশ্বিনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মা-লক্ষ্মীর এই শিব পূজো-টুজো—নীলে জেনে শুনেই বিয়েয় রাজী হয়েছে ত?

অশ্বিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ।—তাকে কিছুই গোপন করিনি।

বরদা। তবে এ তোমার কাজ, অশ্বিনী। নিশ্চয় তোমার কাজ—নিশ্চয় তোমার কাজ। এতটা আখের ভেবে চলবে, এত বুদ্ধি সে নবাবের বেটার মাথায় নেই। সে যে বরাবর তার গর্ভধারিণীর সঙ্গে উল্টো কথাই বলে এসেছে। আর এ বড় সহজে হয়নি—তা-ও বুঝতে পারছি··· তোমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

অশ্বিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ।—ন'সিকে দামের জুতোজোড়া শুকতলা অবধি ক্ষয়ে গেছে—

বরদা। আমি ন'সিকে দিয়ে দেব অশ্বিনী। আহা শিব পূজো করেন, এ সব খবর ত জানতাম না। দেখ, আমি পূজো করিনে—বুঝিও নে, কিন্তু ওসব করা ভাল। এতদিন ভেবে দেখিনি—এখন দেখছি পূজো করা রীতিমত উচিত। এই ইয়ে—দেখ অশ্বিনী;···ন'সিকে-টিকে আর কি—হাওলাতীর সেই টাকার এক পয়সাও তোমাকে দিতে হবে না।···দিতেও না অবশ্য। যা-ই হোক, স্বয়ং লক্ষ্মীকে আমার বাড়ীতে এনে দিয়েছ—তার একটা কৃতজ্ঞতা আছে ত?

অশ্বিনী। যে আজ্ঞে—

[অশ্বিনী প্রণাম করিয়া দরজা ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অন্দরের দিককার পরদা সরাইয়া উমা ঘরে ঢুকিল; হাতে তার বালিশ ও হাতপাখা।]

বরদা। বাইরের দুয়োরে খিলটা আঁটি আগে—আবার হয়ত কেউ এসে পড়বে।

[খিল দিয়া বরদা বাবু ইজি চেয়ারে বসিলেন

এমন ছটফটে মেয়ে ত দেখিনি। রাতদিন খাটবি—ওরে, এই পাশে এই খানটায় একটু বোস্ দিকি।

[পাশের চেয়ারটা নির্দেশ করিলেন। উমা সেইখানে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখা করিতে লাগিল।]

শীতে মরে যাচ্ছি, পাখা দিয়ে কি হবে? নাঃ—তোর কাজের ঠেলায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়—

উমা। (কৃত্রিম রাগে পাখা ফেলিয়া দিল) রইল পাখা। এই বসলাম ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। হ'ল ত?

বরদা।—হ্যাঁ—দু'দণ্ড স্থির হয়ে বোসো। বোসে বোসে গল্প কর। সেইজন্যে ত বাইরের ঘরে টেনে নিয়ে এলাম। এখানে আর মেয়েরা কেউ মাথা গলাতে পারছে না। আচ্ছা—মা-লক্ষ্মী, বেয়ান বুঝি আসবার সময় দিব্যি দিয়েছেন, বিনা কাজে বসে থাকতে পারবে না!

উমা। উঃ—কাজ ত করছি কত!

বরদা। না—মোটে কাজ করতে পারবে না। কাজের লোক আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। আমার কাছে বসে বসে খালি গল্প করবে। বুঝলে ত?

[উমা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু ইতিমধ্যে একখানা চিরুণী লইয়া সে শ্বশুরের চুল আঁচড়াইতে সুরু করিয়াছে।—বরদা বাবু এতক্ষণ পরে আন্দাজে হাত বুলাইয়া টের পাইলেন।]

আবার হাত নিশ পিশ করতে লেগেছে? নাঃ, পারা গেল না—

উমা। বাবা, এ আমার অভ্যেস দোষ···আমার ভাল লাগে—

বরদা। ভাল লাগে? তবে দিলাম এই মাথা পেতে—যা খুশী কর। কিন্তু বুড়ো ছেলেকে নব কার্ত্তিক সাজিয়ে কি হবে মা? তার চেয়ে বরঞ্চ পাকা চুল তোল···দেখি কেমন শিখেছ?

উমা। শিখব কোথা? বাবার মাথায় ত পাকা চুল নেই—

বরদা। ঈস্—বড্ড যে অহঙ্কার? হয়েছেও তেমনি—দর্পহারী দর্প ভেঙেছেন। এবারে নতুন বাপের মাথা জন্মা শন ক্ষেত।

উমা। দর্প নয়—মনে মনে বড় ক্ষোভ ছিল, বাবা।··· ও আমি থাকতে দিচ্ছি বুঝি? দেখুন না কি করি। তিন দিনে সমস্ত তুলে ফেলে বাবার মাথার মতো করে দেব—

বরদা। পারবি নে···পারবি নে। পাকা চুল ত কাঁচা হয়ে আর গজাবে না—মাঝের থেকে টাকই বেরুবে শুধু।···হ্যাঁরে মেয়ে, তুই নাকি খুব শিবপূজো করিস্—

[উমা নির্ব্বাক]

আবার তখন দেখলাম, দিব্যি কেমন গান গাইতে পারিস্।

উমা। (দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে) বাবা, আপনি যা বলবেন এখন থেকে তাই করব।

বরদা। (হাসিতে হাসিতে) আরে, আমিত কিছুই করিনে—কোনটাই জানিনে। কিন্তু আমার মতে—ও সব ভাল। পূজো ভাল—গানও ভাল। বরঞ্চ আমি বলি কি—গান গাইতে হয় ত শিবের গান গেও। পূজো-গান একসঙ্গে দুই-ই হয়ে যাবে—দু'রকম খাটনি হবে না।…আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বল্। মন টি'কছে ত এখানে? কোন রকম কষ্ট হচ্ছে না ত?

উমা। কষ্ট কিসের? এত বড় বাড়ী, এত লোকজন… জিনিষ পত্তোর—

বরদা। সমস্ত তোমার, মা—সমস্ত তোমার। আমাদের বুড়ো বুড়ীকে দু'মুঠো করে খেতে দিও আর ঐ নবাবের বেটাকে একটু চালিয়ে নিয়ে বেড়িও। ব্যস। তোমার জিনিষ-পত্তোর, লোকজন সব বুজে সুজে নাও—আমাদের ছুটি। গিন্নি, ও গিন্নি—ওঁর ঐ বড় দোষ—ডাকলে খেয়াল হয় না। বুড়ো হ'লে অনেক ব্যাধি হয়। ও গিন্নি, গিন্নি—

[সৌদামিনী প্রবেশ করিলেন। কাঁচাপাকা চুল—দোহারা গড়ন। এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন, এ বয়সেও তাহার পরিচয় মিলে।]

সৌদামিনী। কি বলছ?

বরদা। বলছিলাম, বুড়ো মানুষের অনেক দোষ—

সৌদামিনী। তোমার কিনা কানের দোষ—বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে তাই কালা ঠাওরাও। ভাবলাম, কী না জানি অঘটন ঘটেছে! অত চেঁচাচ্ছিলে কেন?

বরদা। চেঁচাই কেন? চেঁচাই আনন্দে। গিন্নি, মেয়ে মেয়ে করে ঠাকুর-দেবস্থানে ধর্ণা দিয়ে থাকতে, কবজ-মাদুলিতে গলা আর হাত লিচুর থোলো হয়ে উঠেছিল… অত মানত বিফল হয় না। মেয়ে পেটে এল না, হেঁটে এসে ঘরে উঠল। তাই বলছিলাম,—মা-লক্ষ্মী, তোমার ভাঁড়ার বুঝে সমঝে নিয়ে বুড়ো বুড়ীকে এবার ছুটি দাও।

সৌদামিনী। লক্ষ্মীঠাকরুণ যে এদিকে আধখানা হয়ে গেছে, সেটা তাকিয়ে দেখ?

বরদা। কেন? কেন? অসুখ করেছে?—দেখি,… তাইত ঠিক! গিন্নি, আমি কালা নই—কানা। তাকিয়ে দেখিনে। এক্ষুনি ডাক্তার নিয়ে আসুক—সরকার চলে যাক—যত বড় ডাক্তার থাকে নিয়ে আসুক—

সৌদামিনী। (মৃদু হাসিয়া) তার চেয়ে—নতুন জায়গা, ঘুমটুম হয় না হয় ত—যখন তখন ঝিমোয়—আমি বলি, মিছে দেরী করে কাজ কি, বৌমা অধুকূলের সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে যাক। নীলুও যাক। দিন দশেক পরে ফিরে আসবে। জোড়ে পাঠাবার জন্য বেয়ান আজও চিঠি দিয়েছেন।

বরদা। নীলে যাবে? অসম্ভব। দু'মাস বাদে তার এগজামিন—এখন এক একটা মিনিট যে তার একটা দিনের সমান। নতুন জায়গা—ও কোন কাজের কথা নয়। সত্যি মা, বলো তোমার ঘুম হয় না কেন?

[সৌদামিনী হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন; উমারও মুখ লাল।]

বলো—বলো—

উমা। (কি বলিবে সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া একটু ইতস্তত করিল; তার পর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল) বড্ড গরম…আর মশা—

বরদা। (আশ্চর্য্য হইয়া) গরম? আমরা শীতে হি হি করে কাঁপি—আর তোর গরম লাগে?

সৌদামিনী। ওদের অল্প বয়স—তাজা রক্ত—ওদের সঙ্গে তুলনা আমাদের?

বরদা। মা-লক্ষ্মীর আমার গরমে ঘুম হয় না, আর আমি কুম্ভকর্ণের গুষ্টি পুষে মরছি…সন্ধ্যে থেকে সব কমপিটি-সনে নাক ডাকতে সুরু করে—আর কার ঘুম হল না হল, খেয়াল নেই। কালই সব বিদেয় করছি—দাঁড়াও।…তা নীলের ঘরটা সত্যিই গুমোট বটে। শোন গিন্নি, বৌমা রাত্রে তোমার ঘরে শোবেন—

সৌদামিনী। (হাসিয়া) তা এবার ব্যবস্থা ভাল হয়েছে—

বরদা। মন্দ কিসে? তোমার ঘরে খুব হাওয়া—খুব ঘুম হয়। তার সাক্ষী আমি। সেদিন দুয়োর ভেঙে মরি—চুরুট ফেলে গিয়েছিলাম—

সৌদামিনী। (গলা নামাইয়া একান্তে) শুধু কি চুরুট?

বিদ্রোহ করব। আমার রাগ খারাপ—বাবা-মা কারো কথা শুনব না—

উমা। তা, না শুনো। এখন পথ ছাড় দিকি—

[উমা পাশ কাটাইয়া যাইতে নীলাদ্রি বুক ফুলাইয়া বীর বীক্রমে তাহার সামনে গিয়া হাত ধরিল]

নালিশ করে দেব কিন্তু। ও বাবা, মশা এই ঘর অবধি ধাওয়া করেছে—

নীলাদ্রি। গ্রাহ্য করিনে—

[ঠিক এই সময় জুতার আওয়াজ হইল। নীলাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে আর এক মানুষ। সন্ত্রস্তভাবে সে উমার হাত ছাড়িয়া দিল। বরদা প্রবেশ করিলেন।]

বরদা। (তীক্ষ্ণ রুক্ষ দৃষ্টিতে এখানে কি?

নীলাদ্রি। বই—

বরদা। বৈঠকখানায় বই?

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। কালকে শোবার সময় বই উপরে নিয়ে গিয়েছিলাম—খুঁজে পাচ্ছি না—

বরদা। উঁস্, বড্ড যে অভিনিবেশ। আজকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পড়া হচ্ছে নাকি?

নীলাদ্রি। এগ্‌জামিন সামনে—ভাবলাম, যতক্ষণ ঘুম না আসে পড়া যাবে।

বরদা। তা ভাল। এখন হারিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ ত? আবার আমার টাকা পাঁচেক গচ্চা লাগাও। নবাবের বেটার বই জোগাতে জোগাতে ফতুর হলাম—

নীলাদ্রি। হারায় নি নিশ্চয়—আছে কোথাও। মানে—বার বার উপর-নীচে টানাটানি—

বরদা। তোমার বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। হারাণ, ওরে হারাণ—

[বাড়ীর চাকর হারাণ প্রবেশ করিল]

দেখ্ এই ইয়ে—বই টানাটানি করে কচি বাবুর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। আজ থেকে ওর বিছানা নীচে হবে, আর দরকারী বই-টই উপর থেকে সব নীচে এক জায়গায় এনে রাখবি। বুঝলি?

হারাণ। আজ্ঞে—

বরদা। কি বুঝলি, বল্ ত—

হারাণ। বিছানা উপরে হবে, আর দরকারী বই-টই নীচে নিয়ে রাখব—

বরদা। আমার মাথা··· নীলে, ওকে সব বুঝিয়ে—গুছিয়ে গাছিয়ে নিবি। কেমন, ব্যবস্থা ভাল হল না?—আর বই হারাবে না।

নীলাদ্রি। (করুণ কণ্ঠে) আজ্ঞে—

বরদা। (উমার দিকে লক্ষ্য করিয়া) একি মা-লক্ষ্মি, তুমি যে এখনো তৈরী হওনি? এতক্ষণ করছিলে কি?

উমা। (বরদার অলক্ষ্যে নীলাদ্রির দিকে তাকাইয়া চাপা গলায়) বলে দি?

[নীলাদ্রি কাতর চোখে উমাকে অনুনয় জানাইল।]

উমা। আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে—

বরদা। কি? কি?

উমা। কানের দুল—

বরদা। ধয়ে গেছে। ভারী ত দাম। বিশ-পঁচিশ টাকা—তা যাক গে—তুই মুখ আঁধার করিসনে, মা। ওর চেয়ে ভাল জিনিষ গড়িয়ে দেব—হীরে বসানো। কালই স্যাকরা ডাকব।...(চিন্তিত স্বরে) কিন্তু আজকে এখন যাস্ কি পরে? দেখি···গিন্নি, ও গিন্নি—নাঃ—বুড়ো মানুষের অনেক দোষ,—কানে শোনে না। ও গিন্নি?

[সৌদামিনী প্রবেশ করিল।]

সৌদামিনী। কি?

বরদা। কানের দুল আছে?

সৌদামিনী। দুলের দোকান করেছি কিনা? কেন, কে পরবে?

বরদা। (উমাকে দেখাইয়া) সে যেন আর জানেন না—

সৌদামিনী। বৌমার কানে ত ঐ রয়েছে। তোমার পরতে হয় ত বলো—

উমা। (অলক্ষ্যে নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল) তাই ত, কানেই আছে দেখছি—

বরদা। কানেই আছে! অথচ তুই দেখিসনি··· আমিও

না। যেমন হাবা মা, তেমনি হাবা ছেলে। হা—হা—হা।

[হঠাৎ হাসি থামাইয়া]

ও বুঝেছি, ফাঁকি—ফাঁকি। ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলি। বেশ—বেশ—তাই হবে। বরদা মিত্তির এক কথার লোক—দেশ সুদ্ধ সবাই জানে। কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, কালই স্যাকরা ডাকব।…এখন চল দিকি উপরে, চটপট করে একটু তৈরী হয়ে নেবে।

[উমাকে লইয়া বরদাবাবু অন্দরের দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন। নীলাদ্রি একেবারে ফাটিয়া পড়িল।

নীলাদ্রি। মা, দেখলে,—বিচারটা দেখলে? এর একটা বিহিত কর। নইলে—নইলে—

সৌদামিনী। কিসের বিচার?

নীলাদ্রি। কিসের বিচার? কি হচ্ছে তুমি জান না—কিছু বুঝতে পারছ না?

সৌদামিনী। না বাপু, তুই বুঝিয়ে দে—

নীলাদ্রি। আমার বই-এর পাঁচ টাকায় বাবা ফতুর হয়ে যান…আর ওদিকে ভুল থাকলেও স্ত্রীরের ভুল হুকুম হয়ে যায়। পরের বাড়ীর অত বড় ডাগর মেয়ে—তার সামনে যখন তখন আমাকে যাচ্ছেতাই করে বলা… টিপিটিপি হাসতে হাসতে বাবার সঙ্গে চলে গেল, আমি পষ্ট দেখলাম। এর বিহিত কর, বলে দিচ্ছি। নইলে—নইলে—কিচ্ছু গ্রাহ্য করব না; আমার রাগ খারাপ—আমি ঠিক বিদ্রোহ করব—

তৃতীয় দৃশ্য

[সুবোধ মিত্রের প্রশস্ত নাট মণ্ডপ। কথকতার আসর। মণ্ডপের উত্তর প্রান্তে বেদীর উপর কথক ঠাকুর দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট। ঠাকুরের কপালে চন্দন, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় একরাশ সাদা ফুলের মালা। মণ্ডপের পশ্চিমদিকে চিকের আড়ালে মেয়েদের স্থান। কিন্তু সেখানে সকল শ্রেণীর জায়গা কুলায় নাই; অনেকে চিকের বাহিরে আসিয়াও বসিয়াছেন। ঠিক তাঁহাদের সম্মুখে অর্থাৎ মণ্ডপের পূর্ব্বপ্রান্তে, এবং দক্ষিণ প্রান্তেরও অনেকটা অংশ জুড়িয়া পুরুষদের বসিবার জায়গা। এই দুই দল শ্রোতার মাঝখান দিয়া বেদী অবধি পথ রহিয়াছে। মণ্ডপের মাঝখানে মস্ত বড় বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে। অনেক শ্রোতা এখনও আসিতেছেন। মেয়েদের অনেকেই থালায় করিয়া চাল, তরকারী ও পয়সা প্রভৃতি আনিতেছেন; সমস্ত বেদীর সামনে সারবন্দী রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জায়গায় বসিতেছেন।

চিকের বাহিরে মেয়েদের সারি যেখানে শেষ হইয়াছে, ঠিক সেখানে সৌদামিনী ও উমা; তাহাদের কাছেই বরদাকান্ত। অপর দিকে পুরুষ শ্রোতাদের মাঝে অশ্বিনীকে দেখা যাইতেছে। হারাণ বসিয়া আছে, দক্ষিণের প্রবেশপথ হইতে অধিক দূরে নহে।

যবনিকা উঠিতে দেখা গেল, কথকঠাকুর মধুর কণ্ঠে গান ধরিয়াছেন। শ্রোতারা তদ্গত হইয়া শুনিতেছে। উমার যেন বাহ্যজ্ঞান নাই…এমন কি বরদাকান্ত অবধি বিমুগ্ধ।

কথক।

বঁধুর লাগিয়া বাসর সাজানু
গাঁথিনু ফুলের মালা
কাজল পরিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা।
(নিঠুর সে বঁধু এলো না হায়—
আমার, চোখের সলিলে
সাধের কাজল টুটিয়া মুছিয়া যায়—)
বন্ধু,—হায় রে নিঠুর বন্ধু—
আসিবে বলিয়া পরাণ তিয়াসে
বসিনু দ্বারের পাশে—
গহিন আঁধারে—সাধের প্রদীপ
নিভিল দীঘল-শ্বাসে।
আসিবে বলিয়া লিখিনু দিবসে—
খোয়ানু নখের ছন্দ—
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ।
(সখি, কহিবি বঁধুর পায়—
পথ চেয়ে চেয়ে অন্ধ দু আঁখি—
বঁধু যে এল না হায়।)

বৃন্দা রাইএর দশা বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, শ্যামসুন্দর উন্মনা হয়ে উঠলেন। প্রাণ আজ আকুল হয়ে ছুটে যেতে যায়, বৃন্দাবনের বনে বনে, কেলিকদম্ব তলে, বিজন যমুনা পুলিনে—

[নীলাদ্রি আসিল। রাগত ভাব। হাতঘড়ি আর একবার দেখিল। আবার ওদিকে বরদাবাবু—সে ভয়টাও সম্পূর্ণ আছে। এদিক ওদিক তাকাইয়া সে থামের কাছে বসিল, যাহাতে বরদাবাবুর নজর না পড়ে, অথচ উমার দেখিতে বাধা না হয়।]

নীলাদ্রি। ঘড়ি দেখতে দেখতে এ দুটি আঁখিরও প্রায় সেই দশা। পাক্কা দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল—খেয়াল নেই যে ভদ্র লোককে কথা দিয়ে এসেছি—

[উমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নীলাদ্রি অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল…কখনো কাসে, কখনো তুড়ি দেয়।—কিন্তু উমার যেন সম্বিৎ নাই, এমন নিবিষ্ট হইয়া গান শুনিতেছে।…অবশেষে ইসারা করিয়া হারাণকে কাছে ডাকিয়া আনিল।]

কথক।

ধূলি-ধূসর তনু ধৈরজ না রহে
ধূলায় লুটাল ভরমে।
এলানো কবরীভার হার তেয়াগিল
তাপিত তৃষিত পরাণে।
(হায় রে সখা, রাইএর দশা শোন—)
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
গঙ্গার বারি দু'নয়ানে—
তোমারি বিরহে রাই, অন্তরে জরজর
মানস মিলন শমনে॥

[এক একটা গানের শেষে কথকঠাকুর মুদিত চোখে ভাবাবিষ্ট হয়ে খানিকক্ষণ যেন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করিতে থাকেন। কেহ কেহ তখন হাতপাখা দিয়া বাতাস করে। নীলাদ্রি ও হারাণের কথাবার্ত্তা বরাবরই চলিতেছে। এই বিরামের সময়টিতে কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শোনা যায়।]

নীলাদ্রি। শুনছিস্?

হারাণ। আজ্ঞে কচিবাবু, বড্ড কান্না লাগছে। এ পালাটা হল কিসের?

নীলাদ্রি। বিরহের পালা, রাই ঠাকরুণের। এ কালে বিরহ ঘেঁসতে পারে না। হা-র ভে-রা-গি-ল—এ কালের ওঁরা সব বিরহের চোটে মুক্তোর হার ডবল করে পরে আসেন।

কথক। হে মাধব, একবার গিয়ে দেখ শ্রীমতীকে—

মাধব, কি কহিব সে বর রমণী
দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনু আভরণ
গলি গলি মিলত ধরণী।
(সোনার তনু যায় যে গলে)
(জল হয়ে তার সোনার তনু
পহর পহর যায় যে গলে)
(চোখের জলের অঝোর ধারায়
সোনার তনু যায় যে গলে)

নীলাদ্রি। গলে টলে গিয়ে এখনো তনুখানা যা আছে, তা পাকা একশ পাউণ্ডের ধাক্কা। এক-আধ আউন্স বাড়তি পড়তি গিয়ে থাকে ত সে মশার কামড়ে, বিরহের জন্য নয়। ও সব সেকালে হ'ত - একালে হয় না, বুঝলি রে হারাণ -

কথক। তখন কৃষ্ণচূড়ামণি বলছেন ওগো বৃন্দে, তুমি কেবল তোমার প্রিয় সখীর কথা বলছ, আমার দশা দেখ না একবার। চাঁপা ফুল দেখে চম্পক বরণ প্যারীর কথা মনে পড়ে যায়…চিত্ত কেঁপে ওঠে—

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ
রাই-রূপ অন্তরে জাগেরে নিরন্তর
অনুভবি তাহারি সোহাগ।

নীলাদ্রি। এ কথাটা মিথ্যে নয়, তবে ঐ চাঁপা ফুল টুল নয়—এভিডেন্স অ্যাক্টের পাতা। আশ্চর্য্য, শুঁয়ো পোকার মতো কালো কালো ছাপার হরপের মধ্যেও চোখ কান নাক সুদ্ধ গোটা মুখ ভেসে ওঠে—

কথক। শ্রীমতী-স্মরণে কৃষ্ণচন্দ্রের চোখেও ঘুম নেই। বিনিদ্র চোখে গভীর বিরহ-নিশি যাপন করেন—

গহন বিরহক লাগি
রজনী পোহায়ই জাগি।
করতঁহি পিয়ারি ধেয়ান
সো বিনে আকুল কান।

নীলাদ্রি। ঠিক ঠিক! হুবহু লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। পেনালকোডের চারটে সেক্‌সন পড়ে ফেললাম—কি আশ্চর্য্য—তবু ঘুম এল না। কিন্তু…ও হারাণ, দেখ দিকি তাকিয়ে—তোদের বৌ-মণির বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে—

হারাণ। না কচিবাবু, ঐ যে প্যাট প্যাট করে কথক ঠাকুরের দিকে চেয়ে রয়েছেন—

[কথক ঠাকুরের হাতে একজনে হুঁকা আগাইয়া দিল। ঠাকুর বেদী হইতে নামিয়া ধীরে সুস্থে তামাক খাইতে লাগিলেন। দু-চার জনে ঘিরিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছে। ঠাকুরও তাহার উত্তর দিতেছেন কিন্তু কিছুই আমাদের শ্রুতিগম্য নয়।]

নীলাদ্রি। (রাগ করিয়া) চেয়ে থাকলে কি হয়! চেয়ে থেকে বুঝি ঘুম পায় না? পড়তে পড়তে যখন ঘুম পায়—বাবা সামনে থাকলে আমি ত প্রাণপণে চেয়ে থাকি—(একটুখানি চিন্তা করিয়া) দেখ্ হারাণ, এক কাজ আছে। (পকেটবুক বাহির করিয়া তাহার এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া ফেলিল) এই কাগজখানা—থাম্ (ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া লিখিতে লাগিল) এই কাগজ খানা—তোর ঐ বৌ-মণিকে—থাম্—হ্যাঁ, তোর বৌ-মণিকে দিয়ে আয় দিকি। লুকিয়ে দিয়ে আসবি…কেউ যেন দেখতে না পায়…বুঝতে পারলি? বাবা-মা এ বাড়ীর ও বাড়ীর কত লোক, কেউ না দেখে—খবরদার। পারবি ত?

হারাণ। খুব পারব, কচিবাবু।

নীলাদ্রি। রোসো…হঠাৎ তুই ওদিকে গিয়ে দাঁড়ালে লোকের নজর পড়বে। এক কাজ কর্…এই পানের ট্রে-টা নে। সকলকে দুটো একটা পান দিতে দিতে ওদিকে চলে যা। এ-ও ত কাকার বাড়ী—তুই পান দিলে কেউ কিছু মনে করবে না—

হারাণ। তা করবে না—

নীলাদ্রি। ও-দিকেও পান দিতে যাবি। তারপর ফাঁক বুঝে বৌ-মণিকে কাগজখানা দিস্।

হারাণ। বৌ-মণিকে পান দেব না?

নীলাদ্রি। তা—দিস্ একটা। বরঞ্চ—ঠিক হয়েছে—এই শোন্—পানের সঙ্গে কাগজখানাও হাতের মধ্যে দিয়ে দিবি—বুঝলি রে?

হারাণ। কর্ত্তাবাবু ত পান খান না—আচ্ছা, বৌ-মণিকে পান দিলাম—কর্ত্তাবাবুকে কাগজ দিলাম—তা হয় না কচিবাবু—

নীলাদ্রি। তা হলে তোকে খুন করে ফেলব। যা বলেছি, তার এক চুল যদি এদিক-ওদিক হয়—দেখতে পাবি—

[হারাণ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া পানের ট্রে হাতে লইয়া উঠিল। যথা নির্দেশ পান দিতে দিতে আগাইতে লাগিল। ভয়ে নীলাদ্রির যা অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। হারাণ কিন্তু ঠিক ঠিক উমাকে পান ও কাগজখানা দিল।]

ব্রেভো!

[হাতে কাগজ পাইয়াই উমা চোখ তুলিল। নীলাদ্রির সঙ্গে চোখাচোখি হইল। তারপর উমা সকলের অলক্ষ্যে চিঠিখানা পড়িল। আবার পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হইল। উমা বরদাকে কি বলিল, বরদাও উত্তরে কি বলিলেন; উমা উঠিল; তারপর সৌদামিনীকে বরদা কি বলিলেন; সৌদামিনী তাহার উত্তর দিলেন। বরদাও উঠিলেন।]

কথক। (বেদীতে উঠিতে উঠিতে) উঠলেন বরদাবাবু! এইবার যে কৃষ্ণ রাই সন্দর্শনে বৃন্দাবন যাত্রা করছেন—

বরদা। করেছেন বটে, কিন্তু রাত বড় অধিক হয়ে পড়েছে, সকলকার ঘুম ধরেছে। এখন সুবিধে হবে কি?

[বরদা উমা ও আর কয়টি মেয়ে ততক্ষণে পশ্চিমের একটা দরজার পথে চলিয়া গিয়াছেন। কথক তখন তান ধরিয়াছেন। নীলাদ্রি সদরের পথে তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছে, এমনি সময়ে দ্রুতপদে অশ্বিনী ঘুরিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল।]

অশ্বিনী। ওটা কি হ'ল?

নীলাদ্রি। কি?

অশ্বিনী। ধর্মকথা হচ্ছে, তার মধ্যে মেয়েমানষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া। অশ্বিনী পুজোর জমাখরচ ইচ্ছে করে পোড়ায়; একা অশ্বিনীই শঠ—না?

নীলাদ্রি। চুপ কর ভাই, চুপ কর…যা ভাবছ, তা নয়—

অশ্বিনী। চিঠি নয়? নোট? দেখ, ভদ্রমেয়ে জড়িত আছেন, তোমার বাবাও ওদিকটায় ছিলেন—তাই কেবল গণ্ডগোল করিনি—

নীলাদ্রি। ওঁকে চিঠি দিইছি—তোমাকেই নোট দিচ্ছি,

অশ্বিনী। চুপ কর, বাবা না জানতে পারেন—

অশ্বিনী। (হাসিয়া উঠিয়া) ক্ষেপেছ ? কাকপক্ষীতে জানবে, অশ্বিনী সেন থাকতে ? একটু ঠাট্টা করলাম ভাই—কিছু মনে কোর না।

[অশ্বিনী ও নীলাদ্রি বিভিন্নদিকে চলিয়া গেল। কথক পুনরায় গান ধরিলেন।]

কথক। মন্দির-বাহিরে কঠিন কবাট
চলে কানু শঙ্কিল পঙ্কিল বাট—

চতুর্থ দৃশ্য

[সৌদামিনীর শোবার ঘর। দেয়াল-ঘড়িতে ১১টা বাজিয়াছে। দেয়ালে অনেকগুলি বাঁধানো দেবদেবীর ছবি।

ঘরের একপাশে বড় কাপড়-চোপড় রাখিবার আলমারি—তাহারই কাছে আর একটা কাচের আলমারিতে নানা রকম পুতুল, কৃষ্ণনগরের মাটির নানারকম ফল প্রভৃতি। একখানা জলচৌকির উপর আসন পাতা। তাহার পাশে কোশা-কুশী ঘণ্টা ও নানাবিধ পূজার বাসনপত্র।

আর একদিকে ছোট টেবিল। টেবিল থেকে কিছু দূরে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া দু তিনখানা চেয়ার।

ঘরের মাঝখানে পাশাপাশি দু'খানা ছোট খাট—দু'টা খাটেই বিছানা পাতা। উহার একটায় সৌদামিনীর, অন্যটায় উমার শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। উমা তার বিছানায় একটা পাতলা লেপ গায়ে শুইয়া আছে। শিয়রের খানিকটা দূরে একটা টিপয়ের উপর ঢাকনি দেওয়া নীল বৈদ্যুতিক টেবিল-আলো। ঘরে আবছা আবছা অন্ধকার।

নীলাদ্রি টিপি টিপি ঘরে ঢুকিল।]

নীলাদ্রি। [অত্যন্ত সন্তর্পণে খাটের দিকে আগাইতে আগাইতে চাপা গলায়] উমা, উমা—উমারাণী ও কি, ঘুম ? না, চালাকী হচ্ছে ? জাগো উমারাণী, আঁখির পাঁপড়ি দুটো উন্মোচন কর। আমি হৃদয়ভরা প্রীতিপুষ্প নিয়ে তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি।...না না আর দুষ্টুমি কোরো না—অশ্বিনী যদি দেখে ফেলে (হাসিয়া ফেলিল) তা হলে নোটেও মুখ বন্ধ হবে না। নিশুতি রাতে নিঃশব্দে নায়িকার গৃহে প্রবেশ। রীতিমত রোমিও জুলিয়েটের ব্যাপার।...দুষ্টু, চোখ বুঁজে মিটি মিটি হাসছ বুঝি—

[নীলাদ্রি মুখের কাপড় টানিয়া সরাইতেই উমা আধঘুমের মধ্যে চেঁচাইয়া উঠিল।]

উমা। কে ? কে ? কে রে ? ও বাবা গো—

[বরদা নিজের ঘর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন]

কি হয়েছে ? ও বৌমা, কি হয়েছে ?—আমি যাচ্ছি—

নীলাদ্রি। (উমার মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়া) আমি—আমি—ওগো আমি,—চুপ। বলো স্বপ্ন দেখেছ ·· ওরে ঐ এলেন বলে—বলো—

[বরদা নিজের ঘর হইতে চীৎকার করিতেছেন]

আঃ আমার খড়ম গেল কোথায় ? আরে দুত্তোর ! ও বৌমা, ভয় নেই—আমি আসছি—

নীলাদ্রি। বলো, আসতে হবে না—একটা বেড়াল·· বলো—বলো—

উমা। (নিদ্রাজড়িত স্বরে) একটা বেড়াল—

নীলাদ্রি। মনে মনে বলছ নাকি ? চেঁচিয়ে বলো। ওরে, এসে পড়লেন যে ! ছি ছি ছি—দালান দিয়ে আসছেন, পালাই কোন পথে ?—একটা বেড়াল—চেঁচিয়ে বলো—

[বরদা দ্রুত খড়ম খটখট করিতে করিতে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহির হইতে বলিতেছেন]

এই এসেছি বৌমা, ভয় নেই—ভয় নেই—

[নীলাদ্রি সেই মুহূর্তে উমার গায়ের লেপ টানিয়া আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তার পাশে শুইয়া পড়িল। পরক্ষণে মুখ বাড়াইয়া বলিল]

নীলাদ্রি। মনে রেখ, আমি পাশবালিশ মাত্র··· সাবধান। [পুনশ্চ লেপের মধ্যে মাথা ঢুকাইল]

[বরদা প্রবেশ করিলেন]

বরদা। [উদ্বিগ্নভাবে] কি বৌমা, কি হয়েছে ?

উমা। স্বপ্ন দেখেছিলাম, বাবা, চোর এসেছে—

বরদা। (রুখিয়া উঠিলেন) সমস্ত দোষ গিন্নির। বুড়ো মানষের অনেক দোষ। এখনো তিনি কথকতা শুনছেন। পুণ্যির বস্তা বয়ে আসবেন। ঘরে এক ফোঁটা বউ একা একা শুয়ে···দরজা খোলা, চোর ত আসবেই—

উমা। সত্যি সত্যি ত আসেনি। জেগে দেখলাম—চোর নয়, বেড়াল—

বরদা। আসেনি—আসতেও ত পারত। কিন্তু গিন্নির আক্কেলটা কি—দেখত—

উমা। এবার দরজা দিয়ে শোব। মা এলে খুলে দেব। আমার ভয় করবে না—আপনি যান বাবা, রাত জেগে বসে বসে কেন কষ্ট করবেন?

বরদা। কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয় আমার? [দেয়ালের ধারের চেয়ার টানিয়া আনিয়া উবু হইয়া বেশ আঁটিয়া সাঁটিয়া বসিলেন]
রাতে ঘুমুই না, কেবল কাসি পায়—আর চুরুট খাই। বরঞ্চ তোমার শাশুড়ী যতক্ষণ না আসেন, এখানে বসে বসে গল্প করা যাবে। রোসো—চুরুট নিয়ে আসি।—

[বরদা বাহির হইয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি মুখ বাহির করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল]

নীলাদ্রি। তোমারই দোষ—

[সঙ্গে সঙ্গে বরদা প্রবেশ করিলেন; নীলাদ্রি সেই মুহূর্তে লেপে মাথা ঢুকাইয়া পুনশ্চ পাশবালিশ।]

বরদা। ভয় করবে না ত মা? এই আমি এলাম বলে—কোন ভয় নেই। শুধু কেবল চুরুটের কোটোটা—একটা বদ অভ্যেস হয়ে গেছে—

উমা। আপনি আসবেন না, শুয়ে পড়ুন গে—

বরদা। (হাসিয়া) তাই কি হয় রে পাগলী মেয়ে!

[বরদা চলিয়া যাইতে নীলাদ্রি মাথা বাহির করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল]

নীলাদ্রি। তোমারই দোষ। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

উমা। আমি কি জানি—যে তুমি! ঘুমের মধ্যে তুমি চোরের মতো মুখের কাপড় তুলছিলে কেন?

নীলাদ্রি। কেন ঘুমোও? সেইটেই ত দোষ—

উমা। চিঠিতে ছিল—

নীলাদ্রি। কি ছিল চিঠিতে?—ছিল, তুমি বাবার ঘরে বেশীক্ষণ থাকবে না। ঘুম আসছে ব'লে এ ঘরে এসে শোবে। দরজা খোলা থাকবে ব্যস্—

উমা। বাঃ রে—। তাই ত করেছি—

নীলাদ্রি। তা করেছ। কিন্তু ঘুমের ভান করবার কথা ছিল—সত্যি সত্যি ঘুম আসে কেন?

উমা। আর চিঠিতে নিজের বিষয় কি কথা লেখা ছিল, মশাই! (টানিয়া টানিয়া ব্যঙ্গের সুরে) আমি একটাবার কেবল চোখের দেখা দেখে আসব।—ঘুমুই বা মরর থাকি—চোখের দেখা দেখ্‌তে কিসে আটকায় বল ত মশাই!

নীলাদ্রি। আশ্চর্য্য! ঘুম আসে তোমার! আর তারই ফলে এই দুর্ভোগ।

উমা। তোমার ত দুর্ভোগ ভারি! লেপের তলে দিব্যি আরাম করে আছ, আর আমি শীতে হি হি করে মরি এদিকে।

নীলাদ্রি। উমা, এ বাড়িতে কি লেপের দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে লেপ মুড়ি দিতে এই ঘরে এসেছি! এবার ত দীর্ঘ-ছন্দে তোমরা গল্প সুরু করবে, আর আমি ঐ লেপ চাপা পড়ে দম আটকে ওর নীচে ঠিক মরে থাকব। কোন সন্দেহ নেই। [লেপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোজা নামিয়া দাঁড়াইল] উমা, নির্ব্বিঘ্নে থাক—আমি প্রাণ নিয়ে পালাই। কাল চলে যাচ্ছ—ভেবে ছিলাম যে—যাকগে -(নিশ্বাস ফেলিল)

[দরজা অবধি গিয়া হঠাৎ যেন বাঘ দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। লেপমুড়ি দিয়া তৎক্ষণাৎ যথাপূর্ব্ব শুইল। চাপাগলায় কহিল]

খড়মের শব্দ আসছে। উপায় নেই, আমি ফের পাশবালিশ হলাম। গল্প জমিয়ে নিও না—দোহাই তোমার—সংক্ষেপে সেরো…

[করুণ চোখে উমার দিকে এক নজর চাহিয়া নীলাদ্রি মাথা ঢাকিল। বরদাবাবু প্রবেশ করিলেন।]

বরদা। চুরুট পেলাম, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর বড় শীত শীত করছিল মোজা পরে বালাপোষ খানা গায়ে দিয়ে এলাম। তাই দেরি হয়ে গেল। ভয় করছিল না ত?

উমা। না—আপনি না এলেও ভয় করত না—

বরদা। তা হোক্—তা হোক্! হাঁ মা, লেপ গায়ে দেওনি যে বড়। পাশ বালিশের উপর লেপ ছড়িয়ে রেখেছ কেন?

উমা। বড্ড গরম হচ্ছে, বাবা।

বরদা। সে কি? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমার

শীত যাচ্ছে না—আর তোর গরম হচ্ছে?…উঁহু—ঐ যে কাঁপছিস্—শীত লাগ্ছে, বুঝতে পারছিস নে—

উমা। না—কোথায় শীত?

বরদা। ঐ যে—ঐ যে—সমস্ত শরীর খুঁকড়ে আসছে। ঠকঠকিয়ে কাঁপছিস, আর বলিস শীত কোথায়? শীত লাগছে, বুঝতে পারছিস নে। দাঁড়া—লেপটা গায়ে দিয়ে দিই—

[বরদা উঠিবার উপক্রম করিতেই উমা তড়িদ্বেগে উঠিয়া বরদাবাবুর পাশে আসিয়া বসিল।]

উমা। হাঁ বাবা, কাঁপছিই বটে। চোখ বুঁজে ছিলাম..আবার যেন সেই স্বপ্ন—কাল কাল, সাদা সাদা, হলদে হলদে, যেন বেড়ালের দল-বাঘের মতো বড় বড় চোখ।…আর আমি শোব না। আপনার পাশে বসে বসে গল্প করব।…আচ্ছা বাবা, ওদের বাড়ীতে কথকতা ক'দিন হচ্ছে?

বরদা। তা হচ্ছে বটে অনেক দিন…ঠিক জানিনে; কাল সুবোধকে জিজ্ঞাসা করব। আমার ইচ্ছে ছিল কিন্তু শুনবার; সময় টময় ত এতদিন বড় হয় নি—আচ্ছা, কেমন শুনলি বল ত?

উমা। ভাল।

বরদা গানগুলো কেমন?

উমা। বেশ।

বরদা রাধাকৃষ্ণের লীলা—আ হাহা—অমন কি আর হয়—

উমা। হয় বই কি, বাবা।

বরদা। হয়? কোথায় হয়? দেবতাদের হয়েছিল; মানুষের তা শুনলে পুণ্যি হয়—

উমা। কিন্তু মানুষের নিজের বেলা রাগ হয়—না?

বরদা। তা হবে না? দেবতা আর মানুষ?

[সৌদামিনী প্রবেশ করিলেন]

এই যে এতক্ষণে গিন্নি এলেন। অত পুণ্যি বয়ে আনতে পারলে? না—হারাণ ছিল বুঝি সঙ্গে। গান শেষ হল?

সৌদা। কেন, কি কাজ আটকে আছে বলত, আমার জন্যে?

বরদা। এই বৌমা—একা একা—কে পাহারা দেয়?

সৌদা। যত অনাছিষ্টি তোমার। বৌ আছে, ছেলে আছে - পাহারা দেবে পাড়ার লোকে?

বরদা। হুঁ। ছেলের বয়ে গেছে। তার বলে এগজামিন…কত পড়াশুনো…সমস্ত রাত সে পাহারা দিয়ে বেড়াবে। সে আমার ছেলে—অকর্ম্মা আড্ডাবাজ ত নয়—

সৌদা। ছেলে না পারে বাপে ত পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ। (বরদার কানে কানে) নিজের বয়সকালের কথা কিছু মনে পড়ে?

বরদা। কি?

সৌদা। কিছু না। তুমি যাও। আমি দুয়োর দিই। যাও—রাত হয়েছে।

[বরদা চলিয়া গেলে সৌদামিনী দরজায় খিল দিলেন।]

একি বৌমা, হারাণের কাণ্ড বুঝি? দিগ্‌গজ এক বালিশ এনে বিছানা জুড়ে দিয়েছে। শোবে কোথায়?

উমা। শুয়েই ত ছিলাম। কিছু অসুবিধে হবে না, মা, পাশবালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস—

সৌদা। না—অসুবিধে হবে না বৈ কি! আর একটা ছোট পাশবালিশ দেব এখন।…ওটা আলমারীর মাথায় তুলে রাখি—

[সৌদামিনী পাশবালিশে হাত দিবার আগেই উমা আগে গিয়া নিজে উহা সরাইতে প্রবৃত্ত হইল। আলমারীর মাথায় তোলা অসম্ভব দেখিয়া টেবিলের উপর রাখিবার মতলবে সেই দিকে লইতে গেল। কিন্তু বলে পারিয়া উঠিল না, মেজের পড়িয়া গেল।]

আপনি কেন কষ্ট করবেন? আমি রাখছি। এই—এখন এই নীচে থাক।

সৌদা। হ্যাঁরে পাগলীর মেয়ে, ঐ হল বুঝি। মেজের ধুলোবালির মধ্যে রাখতে হয়! আলমারীর মাথায় রাখো। না হয় সরো—আমি রাখছি।

উমা। [পুনরায় চেষ্টা করিয়া পারিল না; তখন পাশবালিশ একটু গড়াইয়া সরাইয়া দিল। তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিল] থাক্ না ওখানে।

সৌদা। তুলতে পারলি নে বুঝি! লোহার নয়—

পাথরের নয়—তুলোর বালিশ তুলতে পারলি নে! আচ্ছা পালোয়ানের বেটি দেখ্ছি—সর্—

উমা। (বাধা দিল) থাক্—থাক্ না মা—আপনি কেন কষ্ট করবেন।

সৌদা। ভারী ত কষ্ট! আর লেপটাই বা মেজের উপর গড়াচ্ছে কেন? ওটা ত গায়ে দিবি?

উমা। নাঃ লেপ কি হবে? যে গরম—

[সৌদামিনী না শুনিয়া লেপ ধরিয়া টানিলেন]

সৌদা। একি? বালিশের মাথায় চুল!—হাত-পা গজিয়েছে! একি গোটা একটা মানুষ···(লেপ ছাড়িয়া দিয়া) একি?

[উমা নিরুত্তর]

ও বৌমা, কে এ? চোর টোর নাকি?

উমা। (ক্রন্দনাকুল কণ্ঠে) আমি জানিনে—

সৌদা। তুমি কিছু জান না, বিছানার উপর মানুষ,—তুমি কিছু জান না—

উমা। মানুষ যে লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশ হয়ে ছিল—

সৌদা। বালিশ নামালে···সরালে তবু টের পেলে না? কি সর্ব্বনাশ···

[সৌদামিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন]

সৌদা। কি ঘুমরে বাপু, উপুড় হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। আরে, নীলু না? ও বৌমা, এখানে নীলু এল কোত্থেকে?

উমা। (রাগে ও অভিমানে) আমি জানি নে—

[অকস্মাৎ দরজা ঝনঝনিয়া উঠিল। বাহির হইতে বরদার কণ্ঠ—]

গিন্নি, দুয়ার খোল···

[নীলাদ্রি তড়াক করিয়া উঠিয়া সৌদামিনীর পা জড়াইয়া ধরিল। দরজায় ক্রমাগত আঘাত পড়িতেছে।]

নীলাদ্রি। খুলো না মা, আত্মহত্যা করব। তোমার বউ খাট থেকে ফেলে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে। তা-ও সয়েছে। কিন্তু এর উপর বাবার গালি সইবে না।

বরদা। ও গিন্নি, কথা বলছ—দুয়োর খোল না কেন?

সৌদা। তুই কখন এসেছিস? এলি কোত্থেকে?

নীলাদ্রি। সে কথা পরে হবে। আপাততঃ বাঁচাও। আচ্ছা, লেপ মুড়ি দিয়ে আগে কের পাশ বালিশ হই, তারপর দোর খুলো—

বরদা। (জানলায় মুখ বাড়াইয়া) গিন্নি, দুয়োর খুলছ না কেন? চুরুটের কোটো ফেলে এসেছি। ও কি? অ্যা—ও নবাবের বেটা ঢুকল কখন? এগজামিন সামনে—পড়াশুনো নেই—খোল খোল—দুয়োর খোল—

[সৌদামিনী দরজা খুলিলেন]

তুই এখানে কেন?

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, বড্ড মশা...পড়া যায় না।

বরদা। নীচের ঘরেও? হারাণ! হারাণ!...দিনে ত কিছু বলিস নে—

নীলাদ্রি। রাত্তেই উপদ্রবটা বেশী কিনা—

বরদা। হুঁ।···হারাণ! হারাণ!—হারাণ বৈঠকখানায় বইটইগুলো দিয়ে আসুক—সেখানে বসে পড়গে। কেমন, ভাল হবে না?

নীলাদ্রি। (করুণ কণ্ঠে) আজ্ঞে, তা হবে। কিন্তু—

বরদা। আবার কিন্তু কি?

নীলাদ্রি। ঘুম এসে পড়লে—

বরদা। ওখানেই খাটের উপর শুয়ো।

নীলাদ্রি। কিন্তু অনুকূলবাবু সেখানে ঘুমুচ্ছেন, আর ভয়ানক নাক ডাকছেন। নাক ডাকলে পড়ায় মনসংযোগের অসুবিধে ঘটে।

বরদা। তা বটে!—তা হলে হারাণ বইটইগুলো আমার ঘরেই দিয়ে আসুক। আমার ঘরে মশা নেই··· আমি নাকও ডাকাইনে—ওখানে নিশ্চয় সুবিধে হবে—কি বলিস?

নীলাদ্রি। (করুণ কণ্ঠে) আজ্ঞে, তা হবে—কিন্তু—

সৌদা। আমার হবে না। ও আলো জেলে বসে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না?

বরদা। তোমার?

সৌদা। হ্যা, আমি আজ তোমার ঘরে শোবো।

বরদা। আমার ঘরে? তা হলে বৌমা যে এদিকে একা থাকেন···আজ হয় না···আজ থাক্—

সৌদা। (দৃঢ় স্বরে) আজই আমার দরকার আছে—

বরদা। মুস্কিল···হারাণ, হারাণ!···তা হলে বৌমাও

ঐ ঘরে থাকেন নাকি? ওখানে দু'টো খাট মোটে—হারাণকে দিয়ে আর একটা আনিয়ে নিতে হয়—

সৌদা। না, বৌমা যাবে না। আমার অনেক কথা আছে, বৌমা গেলে হবে না—

বরদা। (রাগ করিয়া) হবে না ত পরের মেয়েকে পাহারা দেবে কে? সত্যি সত্যি ত একা ফেলে রাখা যায় না।

সৌদা। নীলুকে বল—

বরদা। ওর এগজামিন…এ সব ঝঞ্ঝাটে ও আসবে কেন? আর আমিই বা বলব কোন হিসেবে? একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে ত?

সৌদা। (তরল অস্বচ্ছ কণ্ঠে) আছে নাকি? যাক্, একটা দুর্ভাবনা ঘুচলো। (নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করিয়া) নীলু বাবা, তুই বরঞ্চ আজকের রাতটা এখানেই বসে পড়। বউমা একটা কথাও বলবেন না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবেন—অসুবিধে হবে?

নীলাদ্রি। (কৃতজ্ঞ চোখে মায়ের দিকে চাহিল) না।

বরদা। বুঝে সুজে ঠিক করে বলছ ত?

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, কিছু অসুবিধে হবে না।

বরদা। হুঁ…হারাণ! হারাণ! এতক্ষণ ধরে ডাকছি বেটাকে…হারাণ! হারাণ! বেটা মরল নাকি?

[হারাণ প্রবেশ করিল]

হারাণ। আজ্ঞে—

বরদা। কচিবাবুর বইটইগুলো এই ঘরে এনে দে।

[হারাণ চলিয়া গেল]

(নীলাদ্রির প্রতি) অসুবিধে হলে আমায় ডেকে বোলো—কোনো রকম সঙ্কোচের আবশ্যক নেই। না হয় অন্য কোন রকম ব্যবস্থা—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে না, কোনই অসুবিধে হবে না—

বরদা। হবে না—কি করে বললে? বেটা কি দৈবজ্ঞ হয়েছ? এখন নেই পরেও ত হতে পারে? মা-লক্ষ্মী, যাও—শুয়ে পড়োগে—আজকে আর ঘুমের ব্যাঘাত হবে না, এখানে হাওয়া খুব—গরম লাগবে না—

[বরদাবাবু ও সৌদামিনী চলিয়া যাইতেছেন,—এমনি সময়ে দুই হাতে যত বই ধরিতে পারে, হারাণ আনিয়া ভড়্মুড় করিয়া টেবিলের উপর ফেলিল। আবার সে বাহির হইয়া গেল]

এই সব হাঙ্গামে তোমার পড়াশুনোর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। মুখ ফুটে না বললে কি হয়, বুঝতে পারি। দেখ, ইয়ে—সকাল বেলাই তোমার লটবহর নিয়ে হোষ্টেলে চলে যাবে। বুঝলে? এ গণ্ডগোলের মধ্যে আর নয়—

[বরদাবাবু ও সৌদামিনী চলিয়া গেলেন]

[নীলাদ্রি অসহায়ভাবে উমার খাটের কোণে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল]

নীলাদ্রি। হোষ্টেলে না গিয়ে বনবাসে গেলে ত গণ্ডগোল মোটেই নেই! আমি কক্ষণো যাব না—বিদ্রোহ করব—দেখি—

[বরদাবাবু পুনশ্চ প্রবেশ করিলেন, নীলাদ্রি তড়াক করিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বই গোছাইতে প্রবৃত্ত হইল।]

বরদা। আর দেখ, চিটিংএর চ্যাপ্টার আজ শেষ করাই চাই। কাল আমি জিজ্ঞাসা করব। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ো,…আমি শুয়ে শুয়ে শুনবো…চেঁচিয়ে পড়লে বেশ মন-সংযোগ হয়—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে—

[বরদা চলিয়া গেলেন—নীলাদ্রি রাগে অধৈর্য্য হইয়া টেবিলের উপর জোরে এক কিল মারিল; তারপর আবার সভয়ে উঁকি দিয়া দেখে, সে শব্দটা বাবার কাণে গিয়াছে কিনা। তারপর ওদিককার জানলাগুলি সব বন্ধ করিল, দরজা ভেজানো ছিল, সেটা আর বন্ধ করিবার খেয়াল হইল না।

[একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে টেবিলখানা সরাইয়া Penal Code এর বইখান খুলিল। সেই খোলা বই হাতে চেয়ারখানা টেবিলের দিক হইতে ঘুরাইয়া উমার শিয়রের দিকে ফিরাইল।]

নীলাদ্রি। উমা!

উমা। উঁ—

নীলাদ্রি। শুনছ—

উমা। হুঁ—

নীলাদ্রি। কেবল উঁ আর হুঁ—ঠোঁটে চাবি এঁটে দিয়েছ বুঝি? তোমার অভিধানে শব্দ সঙ্কোচন হয়ে কেবল ঐ দুটোতে ঠেকেছে নাকি? (উমার উত্তর নাই)

রাগ করলে লক্ষ্মীটি? কিন্তু আজকের এ রাত কি ঘুমোবার জন্যে? একবার দেখ তাকিয়ে—

উমা। খাসা—

নীলাদ্রি। যাক্—'খা' আর 'সা' দু অক্ষরে দাঁড়িয়েছে। উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু খাসা কি?

উমা। আজকের রাত—

নীলাদ্রি। উমা, তোমার মুখ এদিকে, আর এদিকের জানালা বন্ধ—

উমা। রাত্তির বেলা বন্ধ ঘরই ত খাসা—

নীলাদ্রি। ঘুমোবার মজা হয়—না?

[উমা হঠাৎ চোখ মেলিল, বালিশে ভর দিয়া খানিকটা উঁচু হইয়া অতি মধুর দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে তাকাইয়া গাহিয়া উঠিল]

উমা। ঘুম...ঘুম...ঘুম

ঘুম নামেরে আঁখির আগে

আজকে রাতে আঁখির আগে—

মিষ্টি চাঁদের মুখটি জাগে—

নীলাদ্রি। জানলা বন্ধ—কাকপক্ষী শুনছে না—গাও—

উমা। চম্পাবতী ঘুমতি গাঙের কূলে

জোছনা রাতে নয়ান দু'টি ঢুলে—

তারার আলো মধুর ঝরে অনুরাগে,

চাঁদের মতন মুখটি জাগে

নীলাদ্রি। আরও—

উমা। উঁহু। (গাহিয়া উঠিল)

ঘুম নামেরে আঁখির আগে—

নীলাদ্রি। রাগ কোরো না, উমা। কিন্তু আজকের এ রাতে ঘুমানো অপরাধ—

উমা। তোমার পেনাল কোডে এ সব লেখা রয়েছে বুঝি—

নীলাদ্রি। হ্যাঁ—এবং ঘুমোলে কি শাস্তি, তা-ও রয়েছে। —শুনবে?

উমা। রক্ষে কর, মশাই। এখন নয়—কাল বাবা যখন পড়া ধরবেন, তাঁকেই শুনিয়ে দিও—

নীলাদ্রি। (গম্ভীর স্বরে) কাল তুমি চলে যাচ্ছ—নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিও। তারপর আমিও হোষ্টেলে যাচ্ছি—হোষ্টেলে ল'য়ের বইয়ের পাতায় তোমার মুখপদ্ম দেখব, কাষ্ঠের মাদুরের উপর পড়ে পড়ে এমনি দুই একটা রাত্রির সুখস্মৃতি ধ্যান করব। সে-ই হবে জীবনের পরম সান্ত্বনা। এই ভিক্ষা থেকে বঞ্চিত কোরো না আমায়। আচ্ছা উমা, বাপের বাড়ীর সুখ-সমাদরের মধ্যে আমার কথা একটাবারও মনে পড়বে?

উমা। পড়বে—

নীলাদ্রি। পড়বে? আমি ধন্য। আচ্ছা, আমি যে ব্যাকুল কামনা জানাই—তোমার তা'তে কষ্ট হয় না?

উমা। খুব হয়—

নীলাদ্রি। আমি কৃতকৃতার্থ। তোমার মতো মহিমময়ীর

[নীলাদ্রির মুখ উমার মুখের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এমনি সময়ে হুড়মুড় করিয়া হারাণ আর একগাদা বই আনিয়া ঢালিল। নীলাদ্রি চমকিয়া মুখ সড়াইয়া লইল।]

আবার কি?

হারাণ। বই—

নীলাদ্রি। হতভাগা, সমস্ত রাত ধরে তুই বই আনবি নাকি?

হারাণ। না কচিবাবু, আর বোঝা তিনেক আনলেই হয়ে যাবে—

নীলাদ্রি। জমিদারী দর্পণ, পথে চলতে ঘাসের ফুল, নূতন পঞ্জিকা—বইএর গন্ধমাদন—বাড়ীর যেখানে যে বই ছিল সব এনে জড় করছিস?

হারাণ। তা হলে আর বই আনতে হবে না?

নীলাদ্রি। আর আনলে মাথা ভেঙে দেবো। বেরো—

[হারাণ চলিয়া গেল; নীলাদ্রি দরজায় খিল দিয়া আবার যথাস্থানে বসিল]

[আগেকার কথার জের টানিয়া]

আমার সৌভাগ্যের অন্ত নেই, উমা! এই অভাজনের কথা স্মরণ করে তুমি কষ্ট পাও—

উমা। ঘুম হয় না বলে আরও বেশী পাই—

নীলাদ্রি। হায়, হায়! আমার দুঃখে তোমার ঘুম নেই—

উমা। কানের কাছে অমন করতে লাগলে ঘুমের দোষ কি? কিন্তু এবার পড়াশুনো আরম্ভ কর তুমি। বাবা কি বলে গেছেন শুনলে না? এগজামিন কাছে—

নীলাদ্রি। এগজামিন…এগজামিন…পৃথিবীতে নিশুত রাত্রে প্রিয়ার পাশে মানুষে পেনাল কোড মুখস্ত করতে এসেছে। বেশ, আমি এই চিটিংএর চ্যাপ্টার পড়তে লাগি—ঘুমিও না কিন্তু—

উমা। ঘুমোবো না, কিছুতে ঘুমোবো না—কথা দিচ্ছি।

নীলাদ্রি। কিন্তু এখনই—এই যে চোখ বোঁজা—

উমা। কই?

নীলাদ্রি। (হাত বুলাইয়া) এই যে—

উমা। (নীলাদ্রির চোখের উপর হাত দিয়া আর এই যে—মশায়েরও চোখ বোঁজা হাত বুলিয়ে দেখলাম—

নীলাদ্রি। আমার খোলা চোখ বুঁজে গেল··হাত দিলে চোখ বোঁজে না কার?

উমা। আর আমার বোঁজা চোখ হাত লেগে খুলে গেছে, এই দেখ—

[মুখ তুলিয়া হাসিমুখে উমা তাকাইল—নীলাদ্রি অত্যন্ত প্রসন্ন হইল]

নীলাদ্রি। বেশ! অমনি অমনি করে ঘোমটা খুলে চাঁদের মতো মুখখানা আমার দিকে তুলে ধর। সমুদ্রের মতো মন আমার উদ্বেল হয়ে উঠছে—

উমা। তা বই কি! মা গো মা · আমার লজ্জা করে না বুঝি! বুড়ো থুথ্‌ড়ে নয়—কচি খোকা নয়—জোয়ান যুবো ছেলে—তার সামনে—ছি-ছি—তা আমি পারবো না—

[ঘোমটা মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল]

নীলাদ্রি। দুষ্টুমি! রোসো—

[নীলাদ্রি অগ্রসর হইল। হাতের বই মাটিতে পড়িয়া গেল। বরদা বাবু বাহির হইতে দুয়ার ঝাঁকাইয়া—]

নীলে, নীলে,—

উঃ··· বই কোথায় গেল, বই? আচ্ছা মুস্কিল···সমস্ত রাত্তির ঘুমোবেন না—আরে, দুত্তোর—

[বই কুড়াইয়া তুলিয়া, কিন্তু বই খুলিবার আগেই চেঁচাইতে শুরু করিয়াছে]

Hail, Holy Light, Offspring of Heaven.

[চেয়ার যথাস্থানে সরাইয়া লইল। তারপর বই খুলিতে খুলিতে]

Whoever—whatever—whichever—

[বরদা বাহির হইতে দুয়ার আরও জোরে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে]

ওরে নীলে, কানে কথা নিস্‌নে -দুয়োর খোল্‌না—

[দুয়ার খুলিয়া দিতে বরদাবাবু প্রবেশ করিলেন।]

বরদা। বউমা, ঘুমুচ্ছো ত? দেখতে এলাম। ওরে বাপু, পরের মেয়ে এসেছে···গিয়ে নিন্দে মন্দ করবে। সাবধান, সাবধান। ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। দেখিস্ -

নীলাদ্রি। আজ্ঞে, তা দেখ্‌ছি' উনি ঘুমুচ্ছেন, বেশ অসাড় হয়েই ঘুমুচ্ছেন।

বরদা। তোর যা কাণ্ডজ্ঞান—তোর উপর আমি ভরসা করি কিনা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে খবর নেব। ও বউমা, বউমা···ঘুমুচ্ছ ত? হ্যাঁ—না—একটা জবাব দাও, নিশ্চিন্ত হয়ে যাই—

উমা। হ্যাঁ—

বরদা। যাক্—বাঁচলাম। আবার এসে খবর নেব—

নীলাদ্রি। আর বারবার কষ্ট করে আসবার দরকার কি? বাবা? শুনলেন ত?

বরদা। কষ্ট হয়, আমার হবে, তোর তাতে ক্ষতিটা কি রে নবাবের বেটা? পরের মেয়ে এসেছে, আমার নিজের মেয়ে নেই—তাকে একটু যত্ন আত্তি করব, তোর তাতে হিংসে হয় বুঝি?

নীলাদ্রি। মানে—বারবার দুয়োর খোলা—পড়ায় মনসংযোগের একটু ইয়ে হয় কিনা—

বরদা। (বন্ধ জানালার দিকে লক্ষ্য করিয়া) ওঃ! জানলা এঁটে অন্ধকূপ করে রেখেছ···তাই গলা শুনতে পাচ্ছি না। জানলা খোল্ তোর বারবার দুয়োর খুলতে হবে না, আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাবো—

[বরদাবাবু বাহির হইয়া গেলেন, নীলাদ্রি দরজা বন্ধ করিল।]

[বরদাবাবু যাইতে যাইতে জানালায় মুখ বাড়াইয়া]

তুই যে হাঁ করে বসে রইলি। অকেজো মানুষ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। পড়্-

নীলাদ্রি। (নিশ্বাস ফেলিয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইল) Whoever, by deceiving any person freduleatly or dishonestly—উমা, ঘুমিও না—induces the person - দোহাই উমা, ফাঁক পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো না — ধরো, আপাততঃ এই আমাদের শেষ দেখা—induces the person so deceived to deliver—চোখ বুঁজে পড়লে যে—to deliver any property to any person or—না, আজকে ছাড়বো না - কানের কাছে সমস্ত রাত পেনাল কোডের ধারাবর্ষণ চলবে—ছাত ফেটে যায় যাক—দেখি ঘুম আসে কি করে—(খুব জোরে জোরে) or intentionally induces the person so induced and which act or omission causes damage to that person is said to 'cheat'

[জানালায় সৌদামিনী ও বরদা আসিলেন]

সৌদামিনী। নীলু, কি আরম্ভ করেছিস? কাউকে ঘুমুতে দিবি নে?

নীলা। বাবা যে বললেন—

সৌদা। ওঁর কি···একটা কিছু বললেই হল মা-লক্ষ্মীর জন্য এদিকে দরদ উথলে ওঠে;—আরে এ পড়ায় যে মরা মানুষ ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে--

বরদা। আবার এদিকে ওর এগজামিন—সেটা দেখতে হবে ত? তা নীলে, বরঞ্চ যতটা পড়েছিস—এখন মনে মনে আবৃত্তি কর—চিটিং-এর কদ্দুর?

নীলা। আজ্ঞে রপ্ত হয়ে গেছে—

সৌদা। আবার জানালা খুলে দিয়েছিস কেন রে, নীলু? চোখে আলো গিয়ে লাগছে···ঘুম হচ্ছে না।

নীলা। বাবা যে বললেন—

বরদা। তা নীলে, এখন বরং জানালা বন্ধ করে পড়। ওঁর যখন ঘুম হচ্ছে না—ওঁর—শরীরটে আজ ভাল নেই—

[বরদা এক পা চলিয়া গিয়া আবার জানলায় ফিরিয়া আসিলেন]

বরদা। ও বৌমা, বৌমা ঘুমুচ্ছ ত? জবাব দাও—জবাব না দিলে বুঝব কি করে?

উমা। হ্যাঁ—

বরদা। নিশ্চিন্ত হলাম। আর একটা কথা। ও বৌমা, পড়াশুনোর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি ত? হ্যাঁ না—একটা জবাব দাও। বড্ড উদ্বেগ হয়েছে।

উমা। না—

বরদা। যাক, স্বস্তি পেলাম। নীলে, জানলা দে—

[বরদা ও সৌদামিনী জানলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নীলাদ্রি জানালা আঁটিয়া দিল]

নীলাদ্রি। কবাট ভেঙে ফেললেও আর খুলবো না—(উমার কাছে আসিয়া) উমা, উমা, উমারাণী—

উমা। কাল আবার গাড়ীতে রাত জাগতে হবে—লক্ষ্মীটি, ঘুমুতে দাও একটু—

নীলাদ্রি। সাতটায় গাড়ী—তোমরা খুব সকাল সকাল যেও। আমি হোষ্টেল থেকে গিয়ে দু চোখ ভরে একটাবার দেখে আসব।

উমা। আচ্ছা···এইবার ঘুমুই—

নীলাদ্রি। আর একটা কথা—

উমা। না, আর কথা নয়—

নিশুত রাত, আড়াই প'র
ঘুমায় মাঠ বালুর চর
চুপ···চুপ···চুপ বন্ধ নিদয়
চম্পাবতীর ঘুম লাগে·
ঘুম···ঘুম···ঘুম···ঘুম লাগেরে—
আঁখির আগে।

[উমা দু'চোখ মুদিয়া বালিশে এলাইয়া পড়িল। ভোরের আলো তখন দক্ষিণের দিককার জানলার পথে ঘরে ঢুকিয়াছে। পাড়ায় আর কাহাদের বাড়ী বিয়ে; সেই বিয়ে-বাড়ীর রসুনচৌকা হঠাৎ সানায়ে ভোরের সুর ধরিল। দূর হইতে সেই সুর আসিতেছে।

নীলাদ্রি বিমুগ্ধ চোখে ঘুমন্ত বধূর দিকে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে তার মুখ বধূর অনাবৃত মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এমনি সময়ে যবনিকা পড়িল।]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমনোজ বসু

আলোর পথিক

শ্রীমতী তরলিকা দেবী

একা চলি—সম্মুখে আসন্ন রাত্রি,
দুর্দ্দিন বরষায় নভ নিশ্চিহ্ন,
গুরু গুরু মেঘ ডাকে কাঁপায়ে ধরিত্রী
জমাট্ আঁধার এসে করে পথ ছিন্ন।

•
•

একখানি বড় আশা সম্বল করিয়া
তার বড় সাহসেতে মন বিস্তীর্ণ,
চপলা চমকি ওঠে আন্ধার হরিয়া,
আমি চলি একা পথে কন্টকাকীর্ণ।

নিরাশার হতাশার গান গায় প্রেতিনী
শ্মশানের ভূত নাচে পথখানি রুধিয়া,
বাধার পাহাড় পথে বসে আছে শকুনি,
আলোর পথিক আমি চলি চোখ মুদিয়া!

পথ হ'তে প্রান্তরে প্রান্তর হ'তে পথ
কালের চাকায় ঘুরি আঁধারের যাত্রী,
বিশ্বাস নিয়ে প্রাণে সম্মুখে চলে রথ,
শুকতারা দেখা দেয়, ঐ শেষ রাত্রি!

প্রভাতের আবাহন গেয়ে আসে বন্ধু
প্রস্ফুট কমলের বুকে দোলে মালিকা,
প্রাণে মনে কম্পন্ দোলে সাত সিন্ধু,
সরমেতে রঞ্জিত হাসে দিগ্‌বালিকা!

কর্ম্মের ধারা চোখে, ভাষা তোলে ঝঙ্কার,
যৌবন জয় গাহে, মনে উন্-মাদনা,
নবীন-কিরণ-জালে তোলে বীর টঙ্কার
জীর্ণতা অবসাদ মুছি সব যাতনা!

বাংলার চিত্রশিল্পের ধারা

(য়্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের চিত্র-প্রদর্শনী অবলম্বনে)

শ্রীপ্ররোধ বসু এম্-এ

বাংলায় চিত্রশিল্পের নবযুগ—বিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই তার জন্ম হয়েচে। এর পূর্ব্বে বাংলাদেশে শিল্পচর্চ্চা যে একেবারে হোত না তা নয়, তবে য়ুরোপীয় পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে সে শিল্পের নিজস্ব সত্বা বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যান্ত যে আর্ট বাংলার শিক্ষিত মহলে সমাদর পেয়ে এসেছিল তা'কে সংক্ষেপে 'চোর বাগানের আর্ট' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই শিল্পীদের অনেকেই পাশ্চাত্য টেক্‌নিক্ অল্পবিস্তর আয়ত্ত করেছিলেন—এবং যে সমস্ত চিত্র তাঁরা প্রকাশ করতেন তাতে অনেক সময় অঙ্কণ-রীতি অথবা বর্ণবিন্যাসের যথেষ্ট পটুতা দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু যে জিনিষের অভাবে তাঁদের শিল্প আর্টের পর্য্যায়ে পৌছত না সে হচ্ছে চিত্র-ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্যের একান্ত অভাব। গ্রীক নর নারীর দেহ এঁকে তার উপর তাঁরা বাংলাদেশের ধুতি, কামিজ, শাড়ী চাপিয়ে বাঙালী বানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। মেমসাহেবকে শাড়ী পরালেই তিনি বাংলার কুললক্ষ্মী হ'তে পারেন কিনা সে বিষয়ে তাঁরা চিন্তার আবশ্যকতা যেন বোধ করতেন না। এইখানেই তাঁদের অভাব ছিল—প্রকৃত শিল্পদৃষ্টির।

ধোপার ঘাট—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

প্রচলিত এই বিসদৃশ আর্টের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ-বাণী ঘোষণা করলেন হ্যাভেল সাহেব—"আত্মাণং বিদ্ধি"! তাঁরই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যে শিল্পী মৃত ভারত-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। ভারত-শিল্পের এই নব ভগীরথ যে ভাবগঙ্গাকে বাংলার মাটীতে নাবিয়ে আন্‌লেন তা' সমগ্র বাংলাদেশকে প্লাবিত ও উর্ব্বরা করে' ভারতের প্রত্যন্ত সীমা পর্য্যন্ত আপনার স্রোতরেখা বিস্তীর্ণ করেচে। তাই আজ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, জয়পুর, মাদ্রাজ, অন্ধ্রদেশ, সিংহল

প্রভৃতি সব জায়গাতেই দেখছি বাংলার এই নবযুগের শিল্পীদল সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এর একমাত্র কারণ এই যে বাংলার শিল্পীদের মন নবযুগের আলোতে মুক্ত ও সচল হয়েছে, অন্য প্রদেশে তা' হয়নি। যে আঘাতে হ্যাভেল সাহেব আর্ট স্কুলের বিলিতী আর্ট গ্যালারী ভেঙে ফেললেন সেই আঘাতেই বাংলার শিল্পীদের মনের নিগড়ও ছিন্ন হয়ে গেল। এতে করে শুধু যে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারত-শিল্পই প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল তা' নয়,—পাশ্চাত্য রীতিতে

আমার বাড়ীর ছাতে – শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

যাঁরা ছবি আঁকছিলেন এই বিপ্লবের আঘাতে তাঁদেরও অঙ্কণপদ্ধতি সম্বন্ধে ভিন্ন ধারায় চিন্তা করার সময় এল। আজ বাংলায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পন্থায় রূপায়িত শিল্পের যে বিপুল প্রবাহ বয়ে চলেছে তারই খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন মিউজিয়মে চারু শিল্প পরিষদের (Academy of Fine Arts) চিত্র-প্রদর্শনীতে। এ প্রদর্শনীর একটা বিশেষত্ব দেখা গেল যে এঁরা বাংলার চিত্র-শিল্পের কোন ভাবধারাকে বাদ দিয়ে চলেন নি। যামিনীরঞ্জন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সবাই এখানে সমাদরে স্থান পেয়েছেন। বাংলার সমগ্র শিল্পরূপের সঙ্গে দর্শককে পরিচিত করাবার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ও তাঁর সহকর্ম্মীবৃন্দ বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

মিস্ আনা অর্ণসোণ্ট—শ্রীঅতুল বসু

বাংলার চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ভাবধারার বিশেষ আলোচনা করার পূর্ব্বে চিত্র-শিল্পের মূলতত্ত্বের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা বিখ্যাত ইংরেজ শিল্প- সমালোচক স্যার চার্লস্ হোম্‌সের সাহায্য নিতে পারি। (১)

ছবি যে পদ্ধতিতেই আঁকা হোক্ না কেন, তার ভেতর অল্পাধিক পরিমাণে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সামঞ্জস্য বা ছন্দের ঐক্য Unity) : সমস্ত ছবিটী মূলতঃ একটি ভাব প্রকাশ করবে এবং একই ছন্দে রচিত হবে।
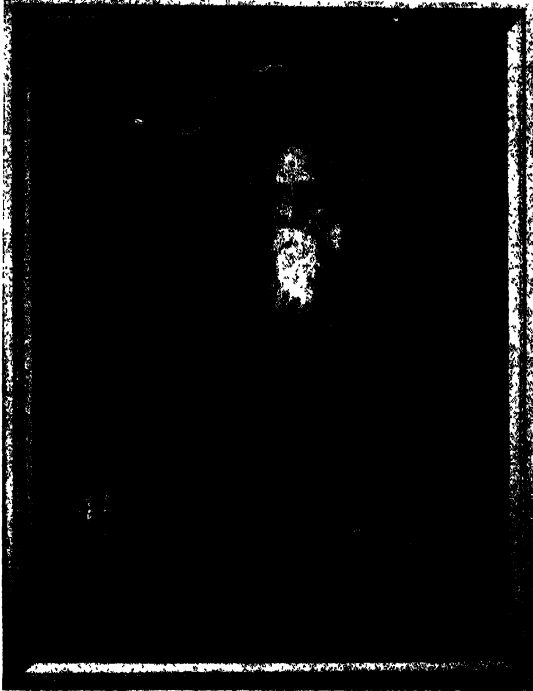
রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅতুল বসু

দ্বিতীয়তঃ প্রাণশক্তি (Vitality) : যে জীবনীশক্তি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে পরিব্যাপ্ত তাকেই ছবিতে প্রমূর্ত্ত করে তুলতে হবে। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করতে পারলে রং ও রেখার সমস্ত নৈপুণ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তৃতীয় গুণ হচ্ছে অসীমতা (Infinity) : যা ছবিকে মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়ে কল্পলোকের দিকে উধাও করে নিয়ে যাবে। যে ছবির ভেতর এই মিষ্টিসিজমের, এই অবাস্তবতার ছাপ নেই তা কখনই খুঁব উচ্চস্তরের আর্ট হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সত্য বটে, সঙ্গীতের মত চিত্রশিল্পে এই অসীমতার নির্দ্দেশ অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর কাজ, কিন্তু খুব উঁচুদরের ছবিতে এ গুণটী না থাক্‌লেই চলবে না। ইংলণ্ডের এতবড় পেইণ্টার সার্জ্জেণ্টকেও শিল্পীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া গেল না কেবলমাত্র তাঁর চিত্রে এই গুণটী ততটা বিকশিত নয় বলে'। চতুর্থতঃ, সমস্ত ছবিতে থাক্‌বে একটা সমাহিত ভাব (Repose) : যে দেয়ালে ছবি টাঙানো থাকবে—সেই দেয়ালের অংশ হিসেবেই নিতে হবে তাকে। রং বা রেখার প্রাবল্যে যেন সে দেয়ালকে ছাপিয়ে না ওঠে এই হবে ভাল ছবির প্রকৃতিগত লক্ষণ। ছবিতে এমন একটী প্রসাদগুণ থাক্‌বে যার ভেতর মন সমাহিত হবে একেবারে 'তীর নিবদ্ধ ইব'।

সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেক ভাল ছবিতেই ছন্দের ঐক্য, প্রাণশক্তির প্রকাশ, অসীমতার নির্দ্দেশ ও সমাহিত ভাব এই চারিটী গুণই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকবে। এই কথাটী মনে রাখলে আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান

রাধার বিরহ—শ্রীনন্দলাল বসু

বাংলার চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ধারার সম্যক রসোপলব্ধি সহজ হবে। বাংলার চিত্রশিল্প আজ যে ত্রি-ধারায় প্রবাহিত

হয়ে চলেচে মোটামুটি-ভাবে তাদের নাম দেওয়া যেতে পারে (১) প্রাচ্য ধারা (২) প্রতীচ্য ধারা ও (৩) আধুনিক ধারা। এই তিন ধারার অপূর্ব্ব সম্মিলন আমরা দেখতে পেয়েচি এবার চারুশিল্প পরিষদের প্রদর্শনীতে। এই

(৬) মা ও ছেলে—শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়

প্রদর্শনীর ছবি থেকেই আমরা বাংলার চিত্রশিল্পের গতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(১) প্রাচ্য ধারা (Oriental School)

সাধারণতঃ ওরিয়েন্টাল আর্ট বলতে আমরা ভারত-শিল্পকেই বুঝে' থাকি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। জাপানী, চৈনিক এবং পারসিক শিল্প এর খুব বড় অংশ জুড়ে' আছে, এবং এক প্রাচ্য শিল্পের অন্তর্গত হলেও ভারত-শিল্পের সঙ্গে এদের মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। ভারত-শিল্পের মূলসূত্র হোল—একান্ত ভাবে ধ্যানোপহৃতি। শিল্পগুরু শুক্রাচার্য্য বল্‌চেন—

ধ্যানযোগস্য সংসিদ্ধৈ প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম—
প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।

ভারত-শিল্পীর কর্ত্তব্য হোল বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারা অন্তরে যে-ভাব মূর্ত্তির উদয় হবে রঙে ও রেখায় তাকে প্রকাশ করা।

এতে যদি তার ভাবমূর্ত্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগতের কোন মিল না থাকে তা নিয়ে সে ইতস্তত করবে না। বিশ্ব-প্রকৃতির যে মানসী রূপ সে আঁকবে তা হবে একেবারে বস্তু-নিরপেক্ষ।

অপর পক্ষে জাপানী ও চৈনিক শিল্পের মূলতত্ত্ব হোল—বিশ্ব-সৃষ্টির মর্ম্মার্থ (inner significance) গ্রহণ করা এবং সেই মর্ম্ম-কথা সহজে ও সংযত-ভাবে প্রকাশ করা। পত্র পুষ্প বিহীন একটী শাখার খানিকটা এঁকে শীতের সমস্ত রিক্ততাকে প্রমূর্ত্ত করে তোলা, এক জাপানী ও চৈনিক শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা এখানে কোন অজ্ঞাত চৈনিক চিত্রকরের অঙ্কিত "বাঁশ" ছবিটী দিলাম।

শিল্পী এখানে বাঁশঝাড়ের একটা অংশকে আশ্রয় করে তুলির এক আঁচড়ে যে প্রাণ-শক্তিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন তা অলৌকিক।

বাংলাদেশের তরফ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন দেওয়া যেতে পারে খাঁটি বাঙালী শিল্পী শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়কে—যিনি বাংলার পট-শিল্পকে অবলম্বন করে আর্টের উচ্চতম আদর্শকে বিকশিত করেচেন। সঙ্গীতে কীর্ত্তন ও বাউলের মত বাংলার একেবারে নিজস্ব যদি কোন চিত্ররীতি থাকে তবে, তা' হচ্ছে এই পট। একে যামিনীরঞ্জন অত্যন্ত উচ্চগ্রামে তুলেচেন যাতে করে এর সৌন্দর্য্যের আবেদন বর্ত্তমান

ঠাকুমা'—শ্রীযামিনীরঞ্জন রায়

আমরা তিনটি—শ্রীঅবনী সেন
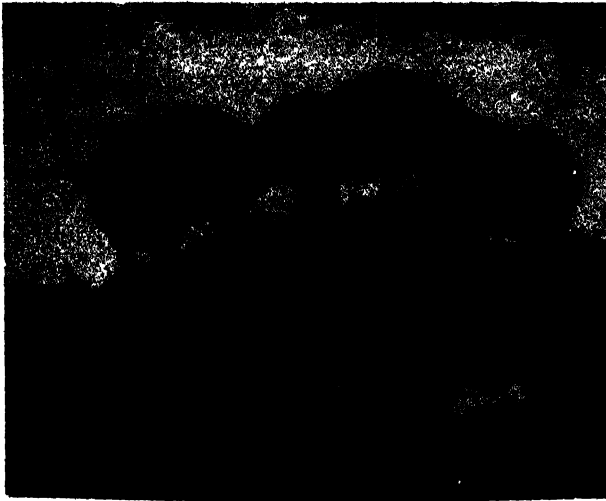
মুখোপাধ্যায়ের 'বসন্ত' ও 'বনপথ' ছবি দু'খানি বর্ণ-লেপনে স্নিগ্ধ ও ছন্দের ঐক্যে (Unity) অনবদ্য হয়েছে। চিত্র রচনায় ঐক্যের দিকে এতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাংলার অল্প শিল্পীর ভেতরই দেখতে পাওয়া যায়। মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী রাণী চন্দের লিনোকাট ও ছবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েচে। এতকাল আমরা তাঁর লিনোকাটের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম, বর্ণচিত্রেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েচেন। তাঁর সাঁওতাল "নাচ" বর্ণসামঞ্জস্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে নৃত্যছন্দকে প্রতিমূর্ত্ত করে তুলেচে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবার বর্ণচিত্রের চেয়ে

কালের মনকে স্বচ্ছন্দে স্পর্শ করতে পারে। মায়ের মাতৃত্ব, পল্লী মেয়ের মাধুর্য্যটুকু মাত্র ছেঁকে নিয়ে তাকে কয়েকটী সবল রেখার টানে তিনি প্রস্ফুটিত করে তুলেচেন। Vitalityতে এদের সঙ্গে জাপানী ও চৈনিক চিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যামিনীরঞ্জনের ছবিতে প্রাণশক্তির সঙ্গে সমাহিত ভাবের (repose) এমন আশ্চর্য্য সম্মিলন ঘটেচে যা জাপানী চিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে এ কথাটী মনে রাখা দরকার যে যামিনীরঞ্জনের মত অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী ছাড়া এ রীতির ছবিতে উৎকর্ষ লাভ করা খুবই কঠিন।

ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রশিল্পীদের ভিতর অবনীন্দ্র নাথের পরই নাম করা যেতে পারে শ্রীনন্দলাল বসুর। তাঁর "রাধার বিরহ" ছবিখানি দেখে মনে হয় তিনি বর্ত্তমানে রেখার চেয়ে বর্ণ-বিন্যাসের (colour harmony) দিকে ঝোঁক দিয়েচেন বেশী। ভারতীয় রীতিতে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেচেন। শ্রীবিনোদবিহারী

চিত্রাঙ্গদা—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

লিনোকাটের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েচেন। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদার' লিনোকাটগুলি ছন্দবৈচিত্র্য ও ভাবদ্যোতনায় অতি সুন্দর পরিণতি লাভ করেচে। বর্ণ ও রেখার সামঞ্জস্যে ও অঙ্কন-ভঙ্গীর স্বকীয়তায় শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের ছবি উল্লেখযোগ্য।

প্রতীচ্য ধারা (Western School)

গ্রীক্-শিল্প ও তার থেকে উদ্ভূত সমগ্র পাশ্চাত্য শিল্পের লক্ষ্য হোল এই বিশ্বসৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করা। এখানেও শিল্পীকে ধ্যানস্থ হয়ে বিশ্বরূপের

নারী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তর্নিহিত ভাবটি উপলব্ধি করতে হবে, কিন্তু তার প্রকাশ বস্তু-নিরপেক্ষ হবে না। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতির মূলগত পার্থক্য: ভারত-শিল্প আপনার মানসী মূর্ত্তিকে রূপ দিয়েচে প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, য়ুরোপের শিল্প তার মানসীকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেচে বাস্তব জগতের, পরিদৃশ্যমান বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়ে। তার মন্ত্র হচ্ছে—

> "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।"

কিন্তু একবার বন্ধনকে, বাস্তবকে স্বীকার করলে তার আর আয়োজনের অন্ত থাকে না। কত বিচিত্র তার অঙ্কন-রীতি, বর্ণলেপন ও আলোকসম্পাত। র‍্যাফেল থেকে আরম্ভ করে সার্জেন্ট পর্য্যন্ত য়ুরোপের চিত্রশিল্প কত বিচিত্র ভঙ্গীতে আপনাকে প্রকাশ করে চলেচে ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। এ শিল্পের টেক্‌নিক্
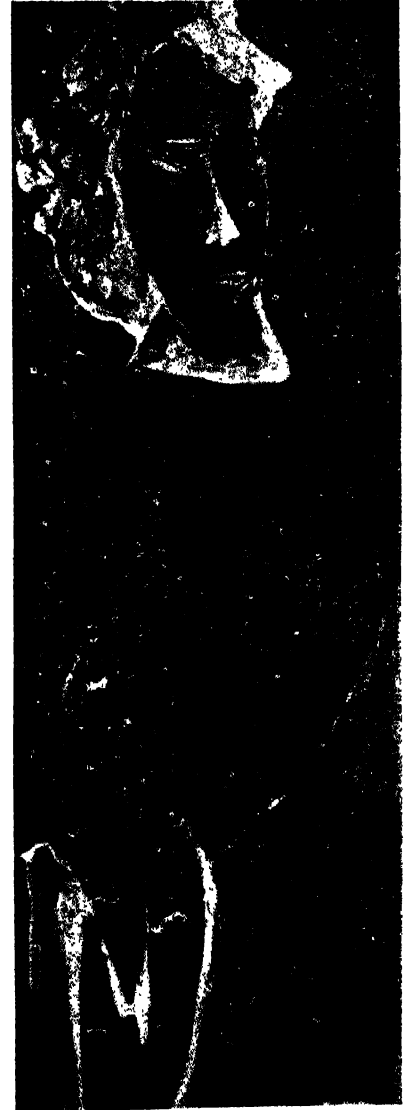
বীর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এত ব্যাপক ও সাধনসাপেক্ষ যে তাকে করায়ত্ত করে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য

কাক—শ্রীমতী উমা দাস গুপ্তা

পাশ্চাত্য রীতিতে যে কয়জন বাঙালী শিল্পী কৃতিত্ব লাভ করেচেন তার ভেতর শ্রীঅতুল বসুর স্থান সর্কোচ্চে। পোর্ট্রেট পেইন্টার হিসাবে তিনি শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেচেন। তাঁর আঁকা "মিস্ আনা অর্ণসোল্ট", "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়" ও "রবীন্দ্রনাথ" এবার প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করেচে। "রবীন্দ্রনাথের" তৈলচিত্রখানি সবচেয়ে বিস্ময়কর। এ ছবিতে 'লাবণ্য' নেই, আছে 'বন্যার' সংহত অথচ দুর্দ্দমনীয় স্রোতবেগ—যা প্রকাশ পেয়েচে তাঁর ঈষৎ বিস্রস্ত কেশে, তাঁর ভাবগভীর দৃষ্টিতে ও তাঁর শ্বেত শ্মশ্রুর উচ্ছ্বাসে। ছন্দের ঐক্যে, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ও ভাব মাধুর্য্যে এ ছবি বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীললিতমোহন সেন প্রতীচ্য রীতির বিভিন্ন পন্থায় তুলি চালনা করেচেন এবং প্রতি পন্থাতেই তাঁর দক্ষ হাত এবং শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া গিয়েচে। সবচেয়ে প্রশংসনীয় তাঁর আলোকসম্পাত। "সূর্য্যালোকের চুম্বন" নূতন ভঙ্গীর একটি সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু তার চেয়েও আমাদের ভাল লেগেচে তাঁর "পল্লীমেয়ের" রেখাচিত্রখানি। ভুটিয়া পল্লীবালার সরলতা ও গ্রাম্যতার ছাপটুকু অতি সুন্দর ফুটেচে।

রবীন্দ্রনাথ এবার ছবি দিয়ে প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করেচেন সন্দেহ নেই। তাঁর কোন কোন ছবিতে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতির কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও প্রকাশভঙ্গী

পল্লীমেয়ে—শ্রীললিতমোহন সেন

ও বর্ণ বিন্যাসের স্বকীয়তায় তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ছবিগুলিতে রবীন্দ্র-মনের বিপুল ভাববন্যা যে উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এসেচে—তাতে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে তাদের

Primitive Art এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। Vitalityর ওপর এতটা জোর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছবিতে যে আশ্চর্য্য ছন্দের ঐক্য রয়েচে তা কেবল ছন্দের ওপর রবীন্দ্রনাথের জন্মগত অধিকার আছে বলে'ই সম্ভব হয়েচে। "নারী" ও "বীর" ছবি দু'টী সেইদিক থেকে ভাবোদ্যতনায় অপরূপ হয়েচে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে ভাবোচ্ছ্বাস সংযত ও মধুর, ছবিতে রং ও রেখায় যেন তিনি তাকে বল্গা ছেড়ে দিয়েচেন। এ যেন তাঁর "লিপিকা"র 'ঘোড়া'। ক্ষিতির ভাগ (Controlling force *) একেবারে নেই বললেই চলে, কিন্তু মরুৎ ও ব্যোম এদের ভেতর এত ঠেসে দিয়েচেন যে রংয়ের নেশায় এরা "পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে এই তার মৎলব।"

আধুনিক ধারা (Modern School)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই ধারার গণ্ডীতে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশে আর একদল তরুণ শিল্পী গড়ে উঠ্‌চে যাঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশাপ্রদ। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রখর এবং অঙ্কনরীতি সবল ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। মনে হয় এঁরা সংস্কারের (tradition) মায়া কাটিয়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করচেন। যেমন সভ্যতার বিকাশে তেমনি আর্টের উৎকর্ষে এই অতীত সংস্কৃতির একটা বড় স্থান থাকলেও যদি তাকেই আমরা চিরন্তন বলে আঁকড়ে ধরি তা'হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ অতীত কালের সংস্কৃতি যত সুন্দরই হোক না কেন তা' সেই অতীত কালেরই চিন্তাধারার বিকাশ। তাকে এ যুগের ওপর সম্পূর্ণরূপে চাপাতে চেষ্টা করলে তা' বর্ত্তমান কালের ভাবধারার সঙ্গে খাপ না খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এ সম্বন্ধে স্যার চার্লস্ হোম্‌সের মতবাদটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বল্‌চেন—"সংস্কার হচ্চে সেই নিয়ম-সমষ্টি যা আর্ট এবং তৎকালীন পারিপার্শ্বিকের ভেতর সামঞ্জস্য বিধান করে। সুতরাং একযুগ বা একদেশে যে সংস্কার অতি সুষ্ঠু, অন্য যুগ বা অন্য দেশের পক্ষে তা মারাত্মক হতে পারে। কারণ পরিবর্ত্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে তা' খাপ খাবে না। সেই জন্যই (আর্টে) প্রাচীন রীতি পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করায় বিপদ আছে।" (১)

ব্রহ্মপুত্রের তীর—শ্রীজয়নুল আবেদীন

* "The controlling force is as constant and as powerful as is the motor force that gives the impulse to Expression"—"Fine Arts" by G. Baldwin Brown pp. 42.

(১) "Tradition is no more than the body

এইদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ভারত পদ্ধতি বাংলার শিল্পজীবনকে উদ্বুদ্ধ করলেও

পুকুরঘাট—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন বর্তমান যুগের সৌন্দর্য্যের দাবী মিটিয়ে উঠতে পারচে না। প্রাচীন ভারতের যে সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে এই শিল্পরীতির অতি সুন্দর সঙ্গতি ছিল আজকের দিনে তাকে প্রবর্ত্তিত করতে হলে যে টেক্‌নিক্যাল সামর্থ্যের প্রয়োজন তা যেন আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। তাই বাস্তব সৌন্দর্য্যের এক নব আবেদন তরুণ শিল্পীদলকে অনুপ্রাণিত করেচে। তাঁদের শিল্পের বিষয়-বস্তু তাঁরা সংগ্রহ করচেন মহাভারত, রামায়ণ থেকে নয় নিজেদের পারিপার্শ্বিক জীবনায়ন থেকে। আমাদেরই বাড়ীর ছাদের মেয়েটি, পুকুর ঘাট, পাড়াগাঁয়ের পথ, ধোপার ঘাট, কিম্বা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা—বাংলার এই সমস্ত অতি পরিচিত ও অন্তরঙ্গ বিষয়-বস্তু দিয়েচে তাঁদের শিল্পের প্রেরণা। "কিন্তু এই সমস্ত তুচ্ছ জিনিষকে আশ্রয় করে তাঁরা [illegible]

of principles which secure conformity between art and its contemporary environment. What is a perfect tradition for one period or climate may thus be a fatal influence for another period or climate, because it does not fit with the changed conditions. Hence the danger of revival of old methods."

Sir Charles Holmes—"Notes on the Science of Picture Making".

যে উৎকর্ষ লাভ করেছেন তা বিস্ময়কর। এইখানে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের একটী কথার সার্থকতা "পথের সৌন্দর্য্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে, সে আছে শুধু পথিকের চলার বেগে।" তেমনি শিল্পের সৌন্দর্য্যও তার বিষয়-বস্তুতে নেই, আছে প্রকৃত শিল্পীর যাদুতুলির স্পর্শ।

আধুনিক ধারায় যে তরুণ শিল্পীদল স্বকীয়তা ও উৎকর্ষ লাভ করেছেন তাদের ভেতর শ্রীগোবর্দ্ধন আশ অন্যতম। তাঁর অঙ্কনরীতি পাশ্চাত্য একটি বিশিষ্ট ধারার অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি চিত্রে ছন্দের ঐক্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তৈলচিত্রে শ্রীমাখনলাল দত্ত গুপ্তের "এগারই নভেম্বর" শ্রীবিশ্বনাথ সেনের "নাটিনের লোকে-ক্লেড" ও শ্রীকালিদাস করের "নবান্নের নিস্তব্ধতা" উচ্চ শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেয়। শ্রীঅবনী সেনের "গ্রাম্য তন্বী" ড্রামাটিক বৈশিষ্ট্যের সুন্দর নিদর্শন।

নাচ
শ্রীমতী রাণী চন্দ

বাজার ঘাট
শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার
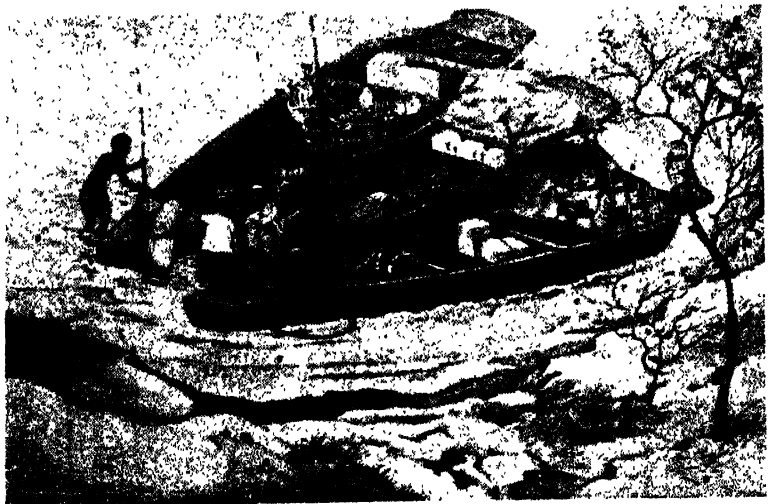
শ্রীবিভাংশুশেখর ভট্টাচার্য্যের "আমার বাড়ীর ছাতে" ছবিটী তৈলচিত্রের ভেতরই একটী নূতন ভঙ্গীতে আঁকা হয়েচে। ছাতে কাপড় শুকোতে দিয়ে যে মেয়েটী আলসে ধরে দাঁড়িয়ে আছে জানি সে আমাদেরই ঘরের মেয়ে, কিন্তু

মাছধরার আয়োজন —শ্রীবিমল দে

ধান কাটা—শ্রীআবদুল মৈন

ইন্দ্র বর্ণসম্ভারে শিল্পী তাকে যে কল্পলোকে নিয়ে গিয়েচেন সেখানে সে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েচে।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুকুর ঘাট" ও শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদারের "বাজার ঘাট" ভারতীয় রীতির আধুনিক রূপের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বর্ণ সামঞ্জস্যে ও ঐক্যে এরা সুন্দর পরিণতি লাভ করেচে।

শ্রীমতী উষা দাশ-গুপ্তার "কাক" ছবিটী জাপানী রীতিতে প্রভাবান্বিত হলেও শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় এতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কিন্তু সবচেয়ে আমাদের বিস্মিত করেচে তরুণ মুসলমান শিল্পী শ্রীজয়নুল আবেদীনের ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্যাবলি। এঁর বর্ণবিন্যাসের দক্ষতা, তীক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিশেষ করে এঁর লঘু ও ক্ষিপ্র তুলির টান অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর। ইনি এখনো ছাত্র। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইনি আধুনিক ধারায় কীর্ত্তি করবেন।

গত কয়েক বছর ধরে' আধুনিক ধারার এই তরুণ শিল্পীদের রচনা দেখে মনে আশা হয়েচে বাংলার চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ। বর্ত্তমান জগৎ ও চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা যে বিচিত্র পন্থায় বাংলার চিত্রশিল্পকে বিকশিত করে এগিয়ে চলেচেন এতে বোঝা যায় তাঁদের মন সক্রিয় হয়েচে ও আপনার গতিবেগ লাভ

করেচে। আমাদের একথা ভুললে চলবেনা যে বাংলা দেশ পলিমাটির দেশ। এখানে জীবনের শস্য প্রতি বৎসর নূতন হয়ে, শ্যামল হয়ে ফলে। এখানে কোন পুরণো কীর্ত্তিই

বাঁশ—অজ্ঞাত চৈনিক চিত্রকর

নূতনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—বাংলার নদী কীর্ত্তিনাশা।

শ্রীপ্রবোধ বসু

দেখা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেন

শুধাল মোরে—"ডাকিলে কেন,
কিসের প্রয়োজন?"
বলিনু ধীরে—"দেখিব বারের তরে।"
বলিল—"যাই তবে?"
তুলিনু আঁখি সরম মাখি
তাহার নয়ন'পরে।

কি যেন বাণী, চকিতে টানি
নয়ন পল্লবে
তুলিল দু'নয়ন।
বলিনু তারে—"হয়েছে মোর,
এখন তবে যাও।"

বিভল আঁখি আমাতে রাখি
কহিল শুধু ধীরে—
"ও কালো দু'টি নয়ন তুলি
বারেক পুনঃ চাও।"

শীতাভিষেক

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

উত্তরে
বাজিল রে
ডঙ্কা।
জাগাইতে শঙ্কা
কম্পিত বক্ষ'পরে,—
দুর্ব্বল
ধরা-তল
স্তব্ধ ;
আশ্রয়-লব্ধ
গেহে দেহ তপ্ত করে।

বাহিরের
তুষারের
চূর্ণ
প্রান্তরে পূর্ণ,
সাজাইল শুভ্র সাজে
যেন, শীতে
শ্রান্তিতে
সুপ্ত,
প্রাণ-বায়ু-লুপ্ত,
শ্বেত-কেশ বৃদ্ধ রাজে।

হিমালয়ে
হিম বহে
গর্ব্বে,
গিরি-গুহা-গর্ভে
সন্ন্যাসী অগ্নি জ্বালে ;
তরু-'পরে
মেলি' ধরে
ছত্রে
তমালের পত্র,
তুষারের বিন্দু ঢালে।

নীল নভে
এল যবে
লগ্ন,—
হ'য়ে রূপ-মগ্ন
হেরিল সে সৌম্য ভূপে,
দিল হার
হিম-ধার
ছন্দ,
সিঞ্চিল গন্ধ,
বরি' নিল মৌন রূপে।

—:*:—

প্রশ্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

উপল চুম্বিয়া, স্বচ্ছতোয়া তন্দ্রার কূলে বৌদ্ধগুরু ভগবান সোমদত্তের আশ্রম। পশ্চাতে অনন্তবিস্তারী শালবন, দিবসেও গোধূলির ন্যায় স্নিগ্ধ, মৌন, তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সম্মুখে নগাধিরাজ তুঙ্গচূড়; শুভ্র যজ্ঞোপবীতের মত তন্দ্রা তাহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আশ্রমের পাদদেশ ধৌত করিয়া নৃত্যপরা বঙ্কিম গতিতে বন হইতে বনান্তরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আশ্রমটি জনবিরল। ভগবান স্বয়ং এবং তাঁহার দ্বাদশ-সংখ্যক শিষ্য,—মনুষ্য বলিতে প্রায় এই। এই বিরলতা অনেকটা পূর্ণ করিয়াছে মনুষ্যেতর নানাবিধ জীবের সমাগমে। তটভূমি যেমন বিক্ষুব্ধ ঊর্মিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার বিক্ষোভ নষ্ট করে, এই আত্মসমাহিত আশ্রমও তেমনি মুক্ত প্রকৃতির হিংসা-ভীতিসংক্ষুব্ধ জীবনিয়মকে আপন অঙ্কে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমস্ত অসমতা, সমস্ত বিরোধ তাবৎ-কালের জন্য বিদূরিত করিয়া দেয়। ভগবানের মানসকন্দর হইতে যেন এক স্নিগ্ধ মাতৃভাব উৎসারিত হইয়া সমস্ত আশ্রমটিকে ছাইয়া আছে, প্রকৃতির শিশুর মত সেই অমৃতের জন্যই যেন জীবকুল লালায়িত হইয়া আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়া আসে। বাহিরে প্রাণধর্মের শত বিক্ষোভ, হেথায় স্নিগ্ধ শান্তি, তৃপ্ত বিচরণ।

এ ব্যতীত আর একটি জীব এই আশ্রমের মধ্যে আছে। তাহার একটু পৃথকভাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত, কেননা তাহার মনুষ্যের আকৃতির সঙ্গে আরণ্যক প্রকৃতি এমন ভাবে মিলিয়াছে যে তাহাকে কোন পর্যায়েই ঠিকভাবে ফেলা যায় না।

সে চারুদত্তা, ভগবান সোমদত্তের পালিতা কন্যা। [illegible]

অনেকগুলি জনশ্রুতিই আশ্রমের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া পরস্পরকে সংশয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। শিষ্যদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস চারুদত্তা পিতৃমাতৃহীনা গৃহস্থকন্যা, সমীপবর্তী কোন গ্রাম হইতে ভগবান করুণাপরবশ হইয়া লইয়া আসেন। গুরুর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিষ্যেরা বলে—চারুদত্তা ভগবানের মানসকন্যা, তাঁহার ইচ্ছাসম্ভূতা। যাহারা একটু চটুল এবং বিশ্বাস আর অভিমতের মধ্যে দুঃসাহসিকতা রাখে তাহারা প্রচার করে চারুদত্তা রূপ-যৌবনে শকুন্তলা। বিদ্যারণ্যের কে এক আচার্য্য উপাসিক এক সময় এক পার্ব্বত্য তরুণীর নিকট যোগভ্রষ্ট হন এবং তাহার পর উগ্রতর বৈরাগ্যে আশ্রম ত্যাগ করেন। চারুদত্তা সেই তপস্খলনের সাক্ষ্য।

যাহা হউক স্বল্পবাক শিষ্যেরা এ লইয়া অধিক বাক্য বিনিময় করেনা, গুরুর নিকট কখন কোন প্রশ্ন উঠে নাই, তিনিও এ বিষয়ে মৌন। আর বন্য-হরিণীর জন্ম পরিচয়ের জন্য কেই বা কবে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে? সে যে আছে, গিরি-বন-প্রান্তরকে তাহার অবাধ, মুক্ত জীবন দিয়া পূর্ণ করিয়া আছে এই তাহার জীবনের চরম সত্য। তাহার কৃষ্ণায়ত চক্ষু, সুকুমার অঙ্গযষ্টি সে প্রাণের প্রাচুর্য্যে সদা উজ্জ্বল এই পরিচয়ই তাহার সব পরিচয়ের ঊর্দ্ধে; সেই চক্ষু, সেই তনু অঙ্গের উদ্ভব কোথায়, কোন্ প্রদীপ থেকে তাহার প্রাণের দীপ জ্বালা সে কথা কি অন্ত-বিশ্বের অবান্তরই নয়?

আশ্রমের সংযত পরিসরের মধ্যে সে কুলাইয়া ওঠে না, তাই তুঙ্গচূড়ের শিখর হইতে শালবনের গহন গভীরতা পর্য্যন্ত এক বিরাট অনির্দ্দেশ্য ভূভাগে সে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। বলা যাইতে পারে এটা বনচারী চারুদত্তার [illegible]। [illegible] মত সে সর্ব্বত্র-গতি।—[illegible] যেথা

বায় পর্বতের বন্ধুর গাত্র বাহিয়া চলিয়াছে, একা কিম্বা হয়ত একপাল আশ্রমপশু পরিবৃত—উদ্দেশ্য হয়ত মৃগয়া কিম্বা শুধুই এমনি একটা নিরুদ্দিষ্ট অভিযান।...কখন সঙ্গিনী তাহার তন্দ্রা ;—বকে বক্ষ রাখিয়া দুই সখীর নর্ম ক্রীড়া চলিয়াছে—উচ্ছ্বসিত কলকাকলীতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত, উৎক্ষিপ্ত শীকরমুষ্টিতে বাতাস অভিষিক্ত।...কখন সে নিষ্ঠুর, তাহার ধমনীতে বুঝি তাহার কোন্ বন্যমাতার রক্ত নাচিয়া উঠে, বনকান্তার আলোড়িত করিয়া তাহার সংহারের জয়যাত্রা চলে।...কখন বা—প্রকৃতি নিজেই যখন উদ্দাম—নিদাঘের স্তব্ধতা ভাঙিয়া উর্মিবিক্ষুব্ধ মৃত্যুস্রোতের মত প্রবল বন্যা গর্জিয়া ছোটে—পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম বিকল আর্তনাদে বনভূমি মথিত করিয়া তোলে, চারুদত্তা বহুসন্তান-বতী বিপন্না জননীর মতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ওঠে ;—কোথায় তাহার নিজের হাতে বৃক্ষলগ্নকরা লতা আশ্রয়চ্যুত—কোথায় নীড়ভ্রষ্ট শাবক অন্ধ আতঙ্কে মাতৃবক্ষ অন্বেষণ করে—বন পর্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হইতে কত সব অনির্দ্ধারিত ব্যথার আর্তনাদ ওঠে—চারুদত্তার কিশোর বক্ষতটে এ সবের প্রতিঘাত জাগে, অসহায় করুণায় চক্ষু দুইটি স্থির করিয়া এই মহাবৃত্ত ঝটিকার পানে চাহিয়া থাকে।...প্রকৃতি যখন শান্ত হয় চারুদত্তা তাহার মুর্চ্ছিত বনপরিবারের দেহে মমতার প্রলেপ মাখাইয়া ফিরিতে থাকে।

পরের দিন হয়ত সে নিজেই আবার চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল একটি ক্ষুদ্র ঝটিকা।

২

একদা অপরাহ্ণ সময়ে শিষ্যপরিবৃত ভগবান্ সোমদত্ত পিয়ালছায়ে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রালোচন করিতেছেন এমন সময় আশ্রমসীমায় একটি সুদৃশ অশ্বরথ আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে ভদ্রবেশপরিহিত এক সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় অবতরণ করিলেন ; সঙ্গে, অনুমান অষ্টাদশবর্ষীয়, প্রিয়দর্শন একটি যুবা। ভগবান ব্যস্তসমস্তে অগ্রসর হইয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন এবং শিষ্যকর্তৃক বিস্তৃত আসন গ্রহণ করিলে প্রৌঢ়ের বদনে স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরিচয় ও কুশল ক্ষেমাদি প্রশ্ন করিলেন।

প্রৌঢ় বলিলেন—"ভগবন্ ; আপনার এ-সেবক, দুর্দ্ধর্ষ হূনদিগের পরাভবকারী সুপর্ণাধীপ, প্রজারঞ্জন মহারাজ সূর্য্যসেনের নগরামাত্য, নাম বানভদ্র। ভগবৎ কৃপায় রাজানুগ্রহ প্রভৃতি সুধীকথিত ষট্‌সম্পদে সম্পন্ন হইয়াও সম্প্রতি আমি দারুণ মানসিক চিন্তায় গ্রস্ত হইয়া সুখভ্রষ্ট হইয়াছি। আপনার দাসানুদাস এই কিশোর আমার একমাত্র তনয়। এর দৈহিক কান্তি ও আলৌকিক ধীশক্তি এতাবৎ আমার পরম আনন্দ ও তৃপ্তি হেতুভূত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহাতে আমরা সকলেই কুমারের ভাবী ঐহিক জীবন ও তদনন্তর পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। কুমার লিখন, পঠন এবং মননের দ্বারা কাব্যানুশীলনে ব্রতী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার আচরণে আনুষঙ্গিক বিকার পরিলক্ষিত হইতেছে।

হে মহাপ্রাণ, ধর্ম্মাচার্য্যগণ বলেন কবিবৃত্তি সাতিশয় লঘুবৃত্তি ;—প্রাকৃতিক ও মানবিক ব্যাপারে যাহা কিছু অলীক অস্থায়ী, সৌন্দর্য্যের মোহজনক নামে অভিহিত হইয়া যাহা সত্যকে অবলুপ্ত করিয়া দাঁড়ায়, সেই সমস্তকেই আশ্রয় করিয়া এই বৃত্তি জাগিয়া উঠে বলিয়া ইহা চিত্তের দার্ঢ্য বিনষ্ট করে মাত্র এবং সেই হেতু লৌকিক, পারত্রিক উভয়বিধ সাফল্যেরই অন্তরায়। নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক বিলাসপ্রবণতা সাধারণভাবে এই বৃত্তির অনুকূল, তদুপরি পৌর সুধিগণ প্রশংসার ইন্ধন দিয়া ইহাকে আরও উদ্দীপিত করিয়া তুলেন। সুতরাং নগরবাস এবং পৌরভাবাপন্ন শিক্ষা কুমারের পক্ষে অহিতকর জানিয়া আমি আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি—এই আশায় যে আপনি আপনার পুণ্য জ্ঞানালোকের দ্বারা ইহার মতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কাব্য ভাবাপন্ন কুমারের মতি এখন রাহুক চলিত যন্ত্রের মত মলিন ও কলুষিত। হে সুধীসত্তম, এক্ষণে আপনি ইহাকে শিষ্যত্বে বৃত করিয়া আমার আশা সফল করুন, কুমারের প্রতিভাকে সার্থকতা দান করুন, আপনার প্রদীপ্ত যশোরশ্মিকে আরও সুদূর-প্রসারিত করুন।

সোমদত্ত কুমারকে স্মিতহাস্যে সাদর আহ্বান করিয়া আপন বামপার্শ্বে বসাইয়া তাহার শিরচুম্বন করিলেন, তদনন্তর তাহার পৃষ্ঠে বামকর ন্যস্ত করিয়া বাণভদ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মহাত্মা, আপনার এই পুত্র যে ধীমান এবং শীলবান

তাহা তাহার আকৃতিই সম্যক পরিচিত করিতেছে এবং কুমারকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আমি অভূতপূর্ব আনন্দই লাভ করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার কিছু বক্তব্য আছে।—কুমার যৌবন সীমায় উপনীত, তাহা ভিন্ন তাহার কবিপ্রকৃতি চিত্তের মুক্তি সূচিত করে, এ অবস্থায় নববিধ জীবনধারা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কুমারের অভিমত লওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। হে নরবর, ধর্ম্মই মানবজীবনের পরম বস্তু বটে, কিন্তু যতদিন কোন বাসনা দ্বারা চিত্তের প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ অথবা সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে ততদিন বল প্রয়োগের দ্বারা ধর্ম্মের প্রবেশ ঘটাইবার চেষ্টা শুধু বিড়ম্বনাই নয়, অধিকন্তু বিপজ্জনক। ভগবান বুদ্ধ প্রমুখ সকলেরই প্রথমে সাক্ষাৎ ভোগের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকার চিত্তবিকার হেতু কঠোর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, পরে সেই বৈরাগ্যমার্জ্জিত পথে পরমধর্ম্মের প্রবেশ ঘটে।

বানভদ্র উত্তর করিলেন—"হে ভদন্ত, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সহিত আচরণে আমি ভগবান কৌটিল্যের নীতিই অনুসরণ করি। তাহা ভিন্ন কাব্যানুশীলন লঘু বৃত্তি হইলেও হীন বা গর্হিত নয় যে কোনরূপ শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা কুমারকে বিরত করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই যথাবিহিত তাহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। সুযাতক নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছানুসারেই কাব্যানু-শীলনে বিরত হইয়াছে। বস্তুত সে অনুতপ্ত এবং তাহার চিত্ত এই অনুতাপের অনলে দগ্ধ এবং নির্ম্মল হইয়াই মহর্দ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর অধিকতর উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। হে মহামতি চিত্তের শুদ্ধির এই মহাশুভক্ষণে আপনি কুমারকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

৩

নদী যেমন সাগরের মধ্যে আত্মবিলীন হয়, গন্ধ যেমন বায়ুর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দেয়, সাধ্বী যেমন দয়িতের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে, সুজাতক কায়মনোবাক্যে সেইরূপ নিজেকে ধর্ম্মের মধ্যে রিক্ত করিয়া দিতে মনস্থ করিল। সোমদত্ত বলিয়াছিলেন—তাহার কবিপ্রকৃতি চিত্তের মুক্তি সূচিত করে;—সুজাতক, আত্মচিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করিল কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এ মুক্তি কি বাঞ্ছনীয়? মানুষের জীবনের চারিদিকে এই যে সীমার পর সীমা শুভ বন্ধনী—শাস্ত্রের সীমা, সমাজের প্রয়োজনের সীমা—অসম্ভাবনাকে বাহিরে ফেলিয়া সম্ভাবনার সীমা—জীবনকে কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই যে সবের সৃষ্টি, সেসব কিছুই সে মানে নাই। তাহার মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের চেয়েও অবাধ মুক্তিতে সৌন্দর্য্যের এক অর্থহীন কল্পলোকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—সৌন্দর্য্যের কল্পলোকে—সেখানে এই ধরণীর সব অসারতা, সব সামান্যতা, সব দীনতাও তাহার নিজের মনের রঙীন আলোকে, তাহার নিজের সৃষ্ট মূঢ় বিস্ময়ের মধ্যে আলোকদামাঙ্ক সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আজ চিত্ত তাহার প্রবুদ্ধ, সে বুঝিয়াছে—ওই মুক্তি মিথ্যা—ও থেকে মুক্তি চাই, পরিত্রাণ চাই। এই পৃথিবী কঠিন সত্যে পূর্ণ, এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধে বিরাট অনধিগত সত্য। ...সমস্ত মনকে প্রতিজ্ঞায় কঠোর করিয়া সুজাতক বলে—আমি ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলাম। অপব্যায়িত জীবনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব, জীবনের ঐ ব্যর্থ অংশকে নির্ম্মমভাবে অস্বীকার করিয়া, আমার সমস্ত জীবন থেকে ওকে নিরবশেষ ভাবে মুছিয়া ফেলিয়া।

কবি সুজাতক শাস্ত্রের গহন কাননে প্রবেশ করিল।

তীক্ষ্ণ মেধা, কঠোর অধ্যবসায় সাফল্যকে দিন দিন করায়ত্ত করিয়া আনিতেছে। কবির কৌতুক চঞ্চল নয়নে জ্ঞানের দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের শান্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য সকলের চক্ষে যেমন বাহ্য পরিবর্ত্তনটা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও বুঝিতে পারিল সে সিদ্ধির পথে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে,—অনুভব করিল তাহার জগতের উপর থেকে মায়া আবরণটা খসিয়া পড়িয়া জগৎ তাহার কাছে দিন দিন রূঢ় কঠোর সত্যরূপে জাগিয়া উঠিতেছে। বুঝিল—এই আকাশ, এই নদ নদী প্রান্তর, লতা-গুল্ম-বৃক্ষ, পত্র পুষ্প কিশলয়, এই মানব জীবন—শৈশব-যৌবন-জরায়, সুখে দুঃখে বিচিত্র—এসবের উপর এত দিন কিসের একটা আবরণ ছিল—কি একটা মিথ্যা আলোর প্রলেপ, তাই এতদিন বোঝা যায় নাই, তাই এতদিন পৃথিবী ছিল অপার্থিব। আজ বোঝা যাইতেছে—সব স্পষ্ট রূঢ়, দান—যতটুকু ততটুকুই—তাহার তিলমাত্র বেশী কিছু নয়।

ধর্ম বলেন এসব যতটুকু ঠিক ততটুকুও নয়। ইন্দ্রিয়ের ক্ষণভঙ্গুর বুদ্বুদের গায়ে ক্ষণিকের চপল বর্ণবিন্যাস মাত্র। সব মায়া। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ এক মহাশূন্যের বিকার। হে মুক্তিকামী জীব, তুমি জ্ঞানশলাকাদ্বারা তোমার, অন্তর্জগৎ আর এই শূন্যাত্মক বহির্জগৎ দিয়া গড়া এই মায়ার বুদ্বুদ বিদ্ধ কর। তবেই তোমার প্রতিষ্ঠা,—তাহাতেই তোমার আকাঙ্ক্ষাহীন চিত্ত বর্ণমলিনতাহীন মহা জ্যোতির্লোকে পরম বিলুপ্তিকে লাভ করিবে। সেই অবোধগম্য মহানির্বাণই তোমার তপস্যা হোক।

সুজাতক ধর্মকে আশ্রয় করিল, এই মহাবিলয়কে জীবনের সাধনা করিল। এই তপস্যার অনলে, জীবনে আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পরম কাম্য বলিয়া সঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, সমস্তই অঞ্জলি ভরিয়া আহুতি দিতে লাগিল।

দিন দিন সে আশ্রমে বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীর্থেরা শুষ্ক সম্ভ্রমের দ্বারা এবং গুরু প্রগাঢ় প্রীতি, মৌন-প্রশংস দৃষ্টি এবং সর্বোপরি সখ্যভাবের দ্বারা তাহার বিশিষ্টতাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। শুধু একস্থানে এর ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল।

চারুদত্তার আচরণে সুজাতকের ক্রমবর্দ্ধমান গাম্ভীর্য্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল না। অথবা আরও সত্যরূপে বলা চলে যে পরিবর্ত্তনটুকু ঘটাইল তাহা তাহার গাম্ভীর্য্যকে মর্য্যাদা না দিয়া বরং লাঘব করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইতে লাগিল।

সুজাতক কোন আশ্রমতরুতলে শিলাসনে বসিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, চারুদত্তা আসিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার দাঁড়ানর ভঙ্গিমায় এবং ব্যবধান রক্ষায় বেশ একটি সম্ভ্রমের ভাব প্রস্ফুট, কিন্তু সেটি কপট-সম্ভ্রম-অভিনয়, এবং অভিনয় যে সুজাতক তাহা জানে। একবার চাহিয়া দেখিয়া আবার অধ্যয়ন নিরত হয়। চারুদত্তা আগাইয়া আসে, তাহার সঙ্গে তাহার পার্শ্বচরবৃন্দ—কয়েকটি সারমেয়, এক মৃগদম্পতি, একটি চক্রশৃঙ্গ, দীর্ঘশ্মশ্রু বন্যছাগী; চারুদত্তাকে ঘিরিয়া সবগুলি তাহার লক্ষ্য সুজাতকের পানে চাহিয়া থাকে। সুজাতক একটু বিব্রত হয় এবং যদিও তাহার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তথাপি দৃষ্টি ত হ তে নিরুদ্ধ রাখে।

চারুদত্তা বলে—"কুমার, আমরা সকলেই ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; অশ্রুমুখী এই ছাগী বলিল—'ক্লান্তি অপনোদনের উৎকৃষ্ট উপায় শাস্ত্রশ্রবণ, কেননা শুনা। শাস্ত্র সংসারের বৃহত্তর দুঃখ ক্লেশকেও নষ্ট করিতে সক্ষম, অতএব..."

ছাগীর ঘূর্ণিত শৃঙ্গের মধ্যে লঘুভাবে হস্তচালনা করিয়া সশব্দে হাসিয়া ওঠে।

সুজাতকের শাস্ত্রে অভিনিবেশ, যাহা চারুদত্তার উপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার এই প্রখর হাস্যে একেবারে যেন শতখণ্ডিত হইয়া যায়। বৃথা প্রয়াস, এই বর্বর প্রকৃতি দুহিতার কাছে পরিত্রাণ নাই। বরং বিলম্বে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায়, মর্য্যাদায় আরও আঘাত দিবে। সুজাতক গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বোধ হয় হাসিয়া বলে—"অয়ি প্রগল্ভে, শাস্ত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ তুমি খুব সৎ-গুরুর নিকটই পাইয়াছ,—উঁহার দীর্ঘ পক্ব শ্মশ্রু, শৃঙ্গরূপী জটিল জটা এবং সর্বোপরি গম্ভীর দৃষ্টি সমস্তই গভীর তত্ত্বজ্ঞান সূচিত করে। উঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই অযোগ্য শিক্ষার্থীকে শাস্ত্রপাঠের অনুজ্ঞা করিয়া উঁহার অবমাননা করিলে মাত্র। এই গুরু-অবজ্ঞা অমার্জ্জনীয়।"

জাতিগত-অভ্যাসমত ছাগী কখন কখন বোধ হয় এইরূপ মন্তব্যের শেষে একটা কম্পিত হ্রস্বধ্বনি করে। মনে হয় সে সুজাতকের বাক্য আগ্রহভরে সমর্থন করিল,—সে সত্যই অবমানিত।

উভয়েই হাস্য করিয়া ওঠে। তাহার পর আলাপের স্রোত দিকপরিবর্ত্তন করে। শ্রোতা সুজাতক, বক্তা চারুদত্তা, কেননা সে বাক্যে চপল এবং সুপটু, তাহার জীবনক্ষেত্র সুপ্রসারিত এবং তাহার অভিজ্ঞতা প্রতিদিনের নানাবিধ ঘটনার দ্বারা সুসমৃদ্ধ, নিত্য নূতন এবং প্রত্যক্ষতায় সজীব। মৃগয়ার কথা, ভিলেদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনের কাহিনী।...এক এক সময় দৃষ্টিপথের অতীত বিস্তীর্ণতর জগতের কথা তোলে, বলে—"কুমার তোমাদের আশ্রমবাসীদিগের বোধ হয় মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে তুঙ্গচূড়ের চেয়ে বড় কিছুই নাই। ও সমস্ত দক্ষিণভাগটা এমনি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যে তোমাদের ধারণায় দোষও দেওয়া যায় না; এমন কি উর পরে

যে আরও কিছু আছে এ কখনও বোধ হয় তোমাদের বিশ্বাস হয় না; অন্তত আমার তো এক সময় হইতই না। একদিন কৌতূহলবশে আমি সমস্ত দ্বিপ্রহর ধরিয়া আমার সারমেয় চারিটি লইয়া তুঙ্গচূড়ের শিখরে আরোহণ করিলাম। ঐ যে শিখরদেশে ক্ষুদ্র বৃক্ষ এখান হইতে দেখা যাইতেছে উহার ছায়াতলে গিয়া বসিলাম। ওখান হইতে দেখা যায় উহার অপর দিকে জলহীন এক বিশাল পুষ্করিণীর মত এক প্রান্তর। সেখানে একেবারেই বৃক্ষাদি নাই, সুধু ভদ্রার ক্ষীণ চপল ধারা বক্রগতিতে বাহিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্র সমস্ত স্থানটিকে ভরিয়া দিয়া অস্পষ্ট জলের মত কাঁপিতে থাকে। পিতা বলেন ঐ নাকি মরীচিকা; আমি প্রলুব্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে পারিতাম বলিয়া পিতা অতিশয় তিরস্কার করেন। তোমাদের শাস্ত্রে নাকি আছে করিলে লোকে প্রাণ হারায় না?—আছে না এমন অদ্ভুত কথা কুমার?"

সুজাতক সে কথার উত্তর না দিয়া, তুঙ্গচূড়ের পানে এক প্রকার উদাস করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করে—"সেই প্রান্তরের পারে কি আছে?"

"হ্যাঁ,—তাহার পর আছে অসংখ্য গাঢ় নীল পর্বত। বহুদূরে; দেখায় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু আমি ভিলদের মুখে শুনিয়াছি ওগুলা সবই তুঙ্গচূড়ের চেয়ে উচ্চ।...আমার ভিলেরা কি বলে বল দেখি কুমার?...বলে—'পাহাড়ী ঝরণা।'

একটি তরল, তরঙ্গিত হাস্য করিয়া ওঠে; বলে—"অদ্ভুদ নাম নয় কুমার? লোকে মনে করিবে এ কন্যা..."

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে—"কুমার, তোমার সতর্ক থাকাই ভাল। এখনই হয়ত আমি ভদ্রার মত জলোচ্ছ্বাসে তোমায় সিক্ত করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিব, কিম্বা তোমায় নিতান্ত এক তৃণখণ্ডের মতই ভাসাইয়া লইয়া যাইব—কোথায় থাকিবে তোমার তপস্যা, তোমার গ্রন্থ..."

গাম্ভীর্য্য ভাঙিয়া আবার হাসির হিল্লোল ওঠে।

আবার সহজভাবে গল্প চলে,—"ভদ্রার ঝরণার কথা—ভিলদের মুখে শোনা গল্প—অধিত্যকার ওদিকে, নীল শৈলস্তূপের মধ্যে বহুদূরে কোন একস্থানে ভদ্রার জন্ম। ভিলেরা বলে সে নাকি এক অতি দুর্গম কিন্তু অপরূপ স্থান। ভিলদের দেবতারা স্বর্গ সুন্দরীদের সঙ্গে সেখানে নাকি শিশু-ভদ্রার পবিত্র জলে নিত্যই স্নান করিতে আসেন। কথাটা তোমার বিশ্বাস হয় কুমার? আমার তো কই হয় না। দেবতাদের তো স্বর্গেই তাঁহাদের জন্য নন্দনদী বর্ত্তমান। পৃথিবীর জিনিস কি এত সুন্দর কখন হয় যে দেবতারাও লোভের বশে নামিয়া আসিবেন?"

হঠাৎ কৌতুকচ্ছটায় মুখটা দীপ্ত হইয়া ওঠে "দেখ কেমন অদ্ভুদ কথা কুমার।—দেবতারা পৃথিবীর সুন্দর জিনিসের জন্য স্বর্গ ছাড়া, আবার এদিকে মানুষ স্বর্গের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য আছে না আছে তাহার জন্য পৃথিবীর সব ছাড়িয়া ভুলিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত। তোমার এটা খুব আশ্চর্য্য বোধ হয় না কুমার?"

সুজাতকের মন যেন হঠাৎ কোথায় পথ হারাইয়া গেছে, শূন্যবদ্ধ দৃষ্টি যেন তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে...

চারুদত্তা হাসি-গম্ভীরতায় মিশাইয়া কপট অনুনয়ের সহিত বলে—"দেবতাদের ভুল ধরিতে গিয়া এই দেখ আমার নিজের ভুল!—আমি আবার উলটিয়া তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি—যে নিজেই স্বর্গের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত!...না কুমার, আমায় ক্ষমা কর, সত্যই তো পৃথিবীতে আবার কি সুন্দর আছে?...আমার এই ছাগ-সুন্দরীই তাহার সাক্ষ্য, দেখনা। ক্ষমা করিলে তো?

কৌতুকে উচ্ছল হইয়া ওঠে, দুষ্ট ভঙ্গিতে শিরশ্চালন করিয়া বলে—"তাহা হইলে কিন্তু স্বর্গ আয়ত্ত হইলে এই দীনা চারুদত্তাকে ভুলিও না..."

তাহাকে তো সাধীনতা শেখায় নাই কেহ, হঠাৎ সুজাতকের হস্তদ্বয় ধরিয়া মিনতিতে যেন ভাঙিয়া গিয়া বলে—"করিবেনা তো বঞ্চিত কুমার? না দেবতাদের মত, চারুদত্তার মত, তুমিও ভুল করিয়া বসিবে?"

তরুপাদমূলের শিলা খণ্ডের উপর ভদ্রার কলোচ্ছ্বাসের মত, হাস্য-কৌতুকের তরঙ্গ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল; শিলা অচল রহিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কি আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে?

৪

সেসন্ধান রাখিবার জন্য সুজাতকের কোন প্রয়োজনও ছিল না, ব্যগ্রতা ও ছিল না। চারুদত্তার স্বৈর গতি, তাহার

তপস্যা আশ্রম জীবনের এমন একটা সাধারণ ব্যাপার, আর সুজাতকের নিকট আসিয়া তাহার সহিত রহস্য ক্রমে এমন নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সেটাতে মনোযোগ আকর্ষণের কিছু নাই। এক এক সময় হয়ত এক প্রকার অন্যমনস্কতা আসে, কিন্তু সে ক্ষণিক, অস্পষ্ট।

একদিন কিন্তু কোথা হইতে কি হইল, সুজাতক হঠাৎ নিজের মনের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

চারুদত্তা কয়েক দিন আসে নাই, কি একটা অভিনব খেয়াল লইয়া সে ব্যস্ত আছে বোধ হয়। বাধাহীন অবসর পাইয়া সুজাতক শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া সে যেন আরোহিকা দিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে উঠিয়া চলিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান বৈরাগ্যের একটি সুনিবিড় আনন্দে মনটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আর তাহার উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলায় পৃথিবী যে ক্রমেই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিতকর হইয়া উঠিতেছে।

এমনি এক সময় কেমন অহেতুকভাবেই মনে পড়িয়া গেল—এই সময়টিতে চারুদত্তার আসিবার কথা,—সে আজ কতদিন হইল আসে নাই।

একবার আনমনাভাবে চক্ষু তুলিয়া, আবার তখনই হস্তধৃত পৃষ্ঠাটি উলটাইয়া সুজাতক গ্রন্থে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু কোথা দিয়া কি একটা বিপর্য্যয় যে ঘটিয়া গেল, এই একটু পূর্ব্বের প্রাণপূর্ণ, ওজস্বী অক্ষরগুলা যেন কঙ্কালের মত শুষ্ক হইয়া গেল এবং যে দৃপ্ত-বৈরাগ্য এতক্ষণ একটি সমাহিত তৃপ্তির আকারে মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল সেই বৈরাগ্যই যেন রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকের আকাশ-বাতাসে এক আকুল হাহাকার তুলিয়া তাহার চেতনাকে মুহ্যমান করিয়া দিল।...কখন তাহার গ্রন্থলগ্ন অঙ্গুলি নিশ্চল হইয়া গেল এবং গ্রন্থচ্যুত দৃষ্টি দূরে কাছে সকল স্থানেই কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

মনে হইল যেন সে-ই পৃথিবীর যা কিছু সব। সে-ই তাহার অজস্র মুক্ত আনন্দ দিয়া এই আশ্রম দিগলম্বিত এই গিরি কানন, এই নদী,—দূরের কাছের যাহা কিছু সমস্তই সত্য করিয়া রাখিয়াছিল; আজ সে কতদিন নাই, তাই সমস্তই যেন প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় উদাস, মলিন হইয়া গিয়াছে।...

চিত্তের গহন কন্দরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরও কত সব অচিন্তিত কথা, কত অচিন্তনীয় প্রশ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একি—ব্যথা, না আনন্দ?

সুজাতক আর মনের দিকে চাহিতে সাহস করিল না। এই দ্রবমান মনকে কঠিনতর নিরোধের দ্বারা একেবারে বিশুষ্ক করিয়া লইবার জন্য সে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

আশ্রমের এই মুক্ত বহিরাঙ্গন নিরাপদ নয়। এখানে তরুলতার মর্ম্মরে, বিহঙ্গের কাকলিতে, ভদ্রার কল্লোলে একটা অতি সূক্ষ্ম মাদকতা আছে—বিষবায়ুর মত শ্বাস পথে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অলক্ষিত ভাবেই তাহা চিত্তের বিকার ঘটায়; এরই মায়ার মধ্যে চারুদত্তা তাহার উপস্থিতির দ্বারা বিস্মরণ ঘটায় আর অনুপস্থিতির দ্বারা ঘটায় বিভ্রম। এখানে, অনাবৃত আকাশের তলে তপঃবিঘ্নের সমস্ত পথই খোলা। সুজাতক বৃক্ষবেদী ত্যাগ করিয়া একদিন কুটিরে প্রবেশ করিল এবং তপঃভ্রংশের সমস্ত সম্ভাবনাকে বাহিরে ফেলিয়া কুটির-দ্বার বন্ধ করিল; কঠোরতর তপস্যা আরম্ভ হইল।

পরিণাম কিন্তু হইল বিপরীত; সুজাতক অচিরেই বুঝিতে পারিল তাহার অতিনিরুদ্ধ চিত্ত স্পষ্টভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে তাহার নগ্ন প্রকৃতিতে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দাবি লইয়া, তাহার সমস্ত ব্যর্থতার সুতীব্র অনুযোগ লইয়া। কেন তাহার এ নির্য্যাতন? যুগ যুগ ধরিয়া আকাশ আর ধরাতল—এই দুই কূলের মধ্য দিয়া বিশ্বের আনন্দ-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে;—সে কবি, সে দরদী, বিধাতার বরে সে চক্ষুষ্মান, সেই এই অমৃতধারার অধিকারি; যাহারা অন্ধ, এর অস্তিত্বই যাহারা জানে না তাহাদের কাছে এর গৌরব কোথায়? সে বৃত হইয়াও, অধিকারী হইয়াও আত্মপ্রতারণা করিল? বিধাতার দেওয়া অঞ্জন-প্রলেপ স্বীয় করে মুছিয়া ফেলিল?...

সুজাতকের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া যায়, তাহার প্রায়ান্ধকার তপঃকুটীরে—মরুর বুকে মরীচিকার মত একটা মায়ার লীলাস্রোত উচ্ছল হইয়া ওঠে—নিঃসঙ্কোচ নীলাকাশ, গীত গন্ধে ভরা বিচিত্র জীবন...ঊষার অস্পষ্ট আলোকে শত-দলের মত ভাসিয়া ওঠে কত দিনের দেখা কত হাসি, স্তিমিত সন্ধ্যার নক্ষত্রের মত কত অর্দ্ধবিস্মৃত অশ্রু জল।...দিকচক্র বালে নবোদিত চন্দ্রের মত জাগিয়া ওঠে চারুদত্তা কোন্ মায়

বলে—যাহার মধ্যে আকাশ বাতাস, হাসি অশ্রু সব কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।...এই তো জীবন—অবাধ স্বতঃসিদ্ধ সুস্পষ্ট। এই মহাসত্যকে ঠেলিয়া সে বিরস গৈরিক, কালজীর্ণ তাল পত্রের গভীর বলিরেখার মধ্যে কিসের সন্ধানে ব্যাকুল?

তালপত্রের মসীরেখা আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে,—যেন ক্রুদ্ধ ভ্রূভঙ্গি পরুষ উচ্চারণে শাস্ত্রগ্রন্থ বলে—'মূঢ়, অক্ষরের অন্তরালে অর্থের মতই এই বিশ্বের পরমার্থ বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে সুপ্ত তুমি অর্থ ছাড়িয়া অক্ষরের রেখা বিন্যাসেই রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিবে? এই মোহ কি তোমার জন্য?'

সংশয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণে মন গতিহীন হইয়া পড়ে, একটা কঠোর আত্মবিপ্লবের শ্রান্তি ভিন্ন এক এক সময় আর কিছুই অনুভব করিবার শক্তি থাকেনা।

৫

শ্রাবণ রজনী। সুজাতক শাস্ত্র-নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়াছিল, হঠাৎ মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দ তাহার কানে বাজিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বায়ুতাড়িত হইয়া সমস্ত আশ্রমভূমি যেন সুপ্তির কোল হইতে এক নিমেষে জাগিয়া উঠিল। বায়ুর বেগে তাহার তৃণকুটীর উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

সুজাতকের দেহে যেন একটা আনন্দ শিহরণ জাগিল এবং কেমন করিয়া বলা যায় না, প্রকৃতির এই বিপ্লবের মধ্যে চারুদত্তার মুখখানি হঠাৎ ভাসিয়া উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবে কম্পিত দীপশিখাটি সতেজ করিতে করিতে সুজাতকের মনে পড়িয়া গেল আশ্রম পশুগুলির কথা...আহা, চারুদত্তার পালিতজীব সব, এখনই এই নিদারুণ ঝঞ্ঝা বৃষ্টিতে তাহাদের কষ্টের আর পরিসীমা থাকিবেনা।

সুজাতক বাহির হইবার জন্য দ্বার খুলিতেই একটি একটু বড় গোছের পতঙ্গ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া সুজাতকের হাসি পাইল,—নিরাপত্তার ধারণা মন্দ নয়, জলবায়ু হইতে একেবারে অগ্নিতে আশ্রয়! সে ক্ষিপ্র গতিতে গিয়া পতঙ্গটিকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আবার দ্বার খুলিতেই পতঙ্গটি সবেগে প্রবেশ দীপাভিমুখী হইল। সুজাতক পুনরায় তাহাকে বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—আহা, অবোধ জীব!

এবার পতঙ্গটি দ্বার মুক্তির অপেক্ষা করিল না; নিজের শরীরটিকে সাধ্যমত সঙ্কুচিত করিয়া, দ্বারের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে প্রাণপণ শক্তি দিয়া প্রবেশ করিল এবং সুজাতকের চেষ্টাকে কিছুক্ষণ ব্যর্থ করিয়া চক্রাকারে প্রদীপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

সুজাতক একটু বেগ পাইয়াই সেটিকে ধরিল, তাহার পর একটি মৃৎপাত্রে চাপা দিয়া আশ্রম পশুগুলির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। বৃষ্টি তখন আসন্ন প্রায়।

ক্ষণপরে বৃষ্টিতে আপাদমস্তক সিক্ত হইয়া ফিরিল। দ্বার ঠেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।—ধ্যানাকৃষ্টার মতই চারুদত্তা তাহার গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান, তাহার পায়ের কাছে দগ্ধপক্ষ সেই বহ্নিকামী পতঙ্গটি, দূরে মৃৎপাত্রটি বসান রহিয়াছে।

বিস্ময় অপগত হইয়া সুজাতকের চক্ষু করুণায় সজল হইয়া আসিল। চারুদত্তার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া সে শুধু বলিল—"চারুদত্তে, এই মূঢ় পতঙ্গ দীপশিখায় বারংবার আত্মঘাতী হইতে যাইতেছিল, তাই আমি ইহাকে মৃৎপাত্র চাপা দিয়া রক্ষা করি...'

চারুদত্তা নিঃসঙ্কোচ হাস্যে ক্ষুদ্র কুটিরখানি কম্পিত করিয়া তুলিল, বলিল—"কুমার, ঝঞ্ঝার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া আমি আশ্রম পশুগুলিকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য যাইতে-ছিলাম, এমন সময় তুমুল বর্ষা নামিল। ক্ষিপ্রগতিতে তোমার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখি কুটীর শূন্য। মনে হইল তাহা হইলে একটু শাস্ত্র আলোচনাই করা যাক। তন্দ্রার জলে নামিলে যেমন জলমত্তার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া ওঠে, তোমার এই তপঃগৃহে প্রবেশ করিলেও তেমনি ভাবে জ্ঞানলিপ্সা প্রবল হইয়া ওঠার সম্ভাবনা আছে দেখা গেল। কিন্তু শুভ-কর্মে তো বাধা থাকে, একটা চাপা শুষ্ক শব্দ কানে গেল। "সর্প নয়তো?" বলিয়া মাথা ঘুরাইতেই উপুর করা ঐ পাত্রটার উপর নজর গেল, শব্দ ওর মধ্যে হইতেই আসিতেছে।

কৌতূহলী হইয়া পাত্রটি তুলিয়া ধরিতেই এই পতঙ্গটি

...বাহির হইয়া আসিল, বুঝিলাম, এ কুমারের অহিংসাভত্তের নিদর্শন। আমার বড় হাসি পাইল।"

সুজাতক কিঞ্চিত বিস্ময় এবং অনেকটা অনুযোগের স্বরে বলিল—"তোমার হাসি পাইল! আমি শুকে দাহন হইতে রক্ষা করিলাম, সুধীগণের মতে এ-ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম..."

চারুদত্তা আবার সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল; বলিল—"এ-কর্ম মন্দ নয়। কুমার, তাহাকে আলোক থেকে, তাহার মুক্তি থেকে, তাহার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকার কারাগারে তাহার শ্বাসটুকু রোধ করিবার উপক্রম করিয়া এ-ধর্ম মন্দ নয়! আমায় নিজেকেই এবার সাবধান হইতে হইবে, কোনদিন ভুজচুড়ের বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া কুটীরের এই নিরাপদ গভীর মধ্যে আমায় না কারারুদ্ধ কর..."

বাহিরে মেঘ-গর্জন চলিয়াছে,—মৃদঙ্গের সহিত সঙ্গীতের মত তাহার কণ্ঠে আবার কলহাস্য জাগিয়া উঠিল। পায়ের কাছে দগ্ধ পক্ষ পতঙ্গটি পড়িয়া আছে; নিশ্চল!

চারুদত্তা বলিতে লাগিল—"বাঁচিয়া মরার চেয়ে মরিয়া বাঁচা কি বাঞ্ছনীয় নয় কুমার? মুক্ত হইয়া উহার যদি উল্লাস দেখিতে! পতঙ্গ হইয়া যখন উহার জন্ম, তখন প্রদীপে দাহন তো ওর, সুনিশ্চিত কুমার। তোমার উচিৎ ছিল উহাকে বহুদূরে লইয়া গিয়া নিরাপদ করা অথবা দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া।"

হাসিয়া বলিল—"নির্ব্বিঘ্ন অন্ধকার, সেও কিছু মন্দ নয়; কিন্তু আলোর তো কোন অপরাধ নেই, তাহাকে অযথা নিভান অন্যায়; অন্যায় নয় কুমার?"

সুজাতক অন্যমনস্ক ছিল, প্রশ্নে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল "হাঁ, অন্যায় বৈ কি!"

"আলোর যখন দোষ নাই তখন পতঙ্গকে সরানই ছিল সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত, কেন না আলোয় ঝাঁপ দিতে গিয়া পতঙ্গ নিরাপরাধ প্রদীপকে নির্বাপিত করিয়াছে—এমনও দেখিয়াছি কুমার।"

চারুদত্তার তনু অবয়বে, স্ফুরিত অধরে এবং কৌতুক তরল, আয়ত চক্ষু দুটিতে কম্পমান দীপশিখার চঞ্চল আলোক দুলিতেছে। সুজাতক—সংযতচিত্ত সুজাতক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। আজই, এই একটু পূর্বে, দুর্যোগের প্রারম্ভে চারুদত্তার মুখখানি মনে পড়িয়াছিল,—এমন ভাবে মনে পড়া পূর্বে কখনও ঘটে নাই। তাপদগ্ধ নিদাঘের শেষে এই বর্ষার মত সেও একটা দুর্যোগ—তাহার বৈরাগ্যের যত্ন সঞ্চিত কঠোরতার উপর একটা অব্যর্থ আক্রমণ!...সেই চারুদত্তা এখন এই গৃহমধ্যে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া। সুজাতক ফিরিয়া দেখিল না বটে, তবে দেখিল না বলিয়াই স্পষ্টতরভাবে অনুভব করিল—তাহারই অঙ্গের উপচীয়মান দীপ্তিতে প্রদীপের অকিঞ্চন আলোক ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছে। জলন্ত কিরণ রেখার মত তাহার আরক্ত পদনখের কাছে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ পড়িয়া।

কত রাত্রে বলা যায় না, একবার বায়ু মন্দীভূত হইল, মনে হইল বর্ষাও ক্ষান্ত হইয়াছে। স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া সুজাতক কুটীরের দ্বার খুলিয়া বলিল—"চারুদত্তে, এই অবসরে তুমি প্রস্থান কর, আবার বোধ হয় এখনই বর্ষা নামিবে।" চারুদত্তা বাহির হইলে একবার মনে হইল আগাইয়া দিয়া আসে, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া গেল না। ফিরিয়া আসিয়া অর্গলবদ্ধ করিল।

রাত্রির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগ আরও বাড়িল। প্রকৃতি ক্ষণিকের জন্য বিরাম লইয়া আবার যেন প্রলয়ের উন্মাদনায় জাগিয়া উঠিল। সুজাতক অনুভব করিল আজ তাহার মনেও এই রকম—বোধ হয় এর চেয়েও একটা প্রবলতর ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ ছারখার করিয়া দিতেছে। কোথায় জ্ঞান? কোথায় বৈরাগ্য? কোথায় ধর্ম্ম?...থাক সব...কী ধর্ম তাহার? তাহার অন্তরের অন্তর প্রশ্ন করিয়া উঠিল—জীবনের মূল প্রকৃতির সহিত বিরোধ করিয়া এই যে কঠোর সাধনা এই কি প্রকৃতই তাহার ধর্ম্ম?—এই কি জীবনসত্যের উপলব্ধি? সে কবি, সৃষ্টির বিচিত্র রূপের রস লইয়া তাহার চিত্ত-শতদল ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে তুলিয়া মরুর দহনে বিসর্জন করাই কি হইল তাহার ধর্ম্ম!

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন—যদি ইহাই তাহার ধর্ম্ম হয়, এই দীর্ঘ বৎসর ত্রয়ের তপস্যাতেও সে কি এই ধর্ম্মে কণামাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর হইল—না, পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ না হইয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে তিন বৎসর ব্যর্থ

এই দীর্ঘ সময়ের উপর দিয়া একবার অতীতের পানে ফিরিয়া গেল। দেখিল কিছু ব্যর্থ হয় নাই। এখানকার গিরিবন, নদী কান্তার দিগলুণ্ঠিত উদার আকাশ—এখানকার যা কিছু সমস্তই তাহার জীবনে সত্য হইয়া আছে;—সে যখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিল, ইহারা সব কোন মায়ার বলে তাহরে চিত্তের গহন লোকে প্রবেশ করিয়া বসিয়াছিল। কি করিয়া এ সম্ভব হইল? মনের এই মণিকোটার কুঞ্চিকা কাহার হাতে ছিল?

তাহার সমস্ত মনকে দীপ্ত করিয়া চারুদত্তার মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল। শত প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও সে-ই তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কোন অবোধ্য নিয়মে তাহার গতি ছিল অবাধ এবং সে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য ছানিয়া লইয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিত—ভ্রমর যেমন পুষ্পের পরাগ মাখিয়া, পুষ্পের মধু লইয়া, পুষ্পের গন্ধ বহিয়া বহিয়া বিবরে প্রবেশ করে।

আজ ঝঞ্ঝার রাত, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা অনিয়ম, অসংযম। সুজাতক চারুদত্তাকে অস্বীকার করিলনা, কোন কিছুর ভয়ে কিম্বা জীবনাতীত কোন কিছুর আশায় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল না। তাহার অন্তর এক মধুর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নিজেকেও অস্বীকার করিল না। সে কবি; রূপ তাহার সাধনা, আবার হয়ত রূপই তাহার মৃত্যু। তা হউক। তাহার মনে পড়িল—"বাঁচিয়া মরার চেয়ে মরিয়া বাঁচা কি বাঞ্ছনীয় নয় কুমার?"—'হাঁ, হে প্রিয়ে, হে দীপ, হে বহ্নি, মরিয়া বাঁচাই বাঞ্ছনীয়; এই তিন বৎসরের দীর্ঘ যুগ ব্যাপিয়া চৈতন্যহীন আবেগে আমি তোমাকেই আবেষ্টন করিয়া ঘুরিয়াছি, এইবার বক্ষ পাতিয়া তোমায় গ্রহণ করিব; একটি সমস্ত বিলীনকরা আলিঙ্গনে থাকিবে তুমি আর মৃত্যু,—সুতীব্র সুখ, আর সুকঠোর বেদনা…কি ম—কী আনন্দ!…

চিন্তার এই আনন্দ হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। কানে বাজিয়া উঠিল চারুদত্তার কথাগুলা—"আলোয় ঝাঁপ দিতে গিয়া পতঙ্গ নিরপরাধ প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করিয়াছে এমনও দেখিয়াছি কুমার।" তাহাই কি হইবে? সার্থক মরণ মরিতে গিয়া সে কি এই অম্লান দীপশিখা নিভাইয়া দিবে?

বাহিরের ও অন্তরের ঝঞ্ঝা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কয়েক-দণ্ডের রজনী যেন দীর্ঘাকৃত হইয়া একটি অন্তহীন যুগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঝঞ্ঝারও অন্ত নাই চিত্তের দ্বন্দ্বেরও অবসান নাই। আশা বাসনা বিদ্রোহ বিষাদের আলোড়নের মধ্যে সমস্ত চিত্তাকাশ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুজ্জ্বালার মত শুধু একটা কথাই ঝলসিয়া উঠিতে লাগিল—যদি নিরপরাধ প্রদীপ নির্বাপিত হয়!—নিরপরাধ প্রদীপ—গ্লানিহীন, অকুণ্ঠ এই বালিকা…

এক সময়, একই সুরে বাঁধা বাহির এবং অন্তরপ্রকৃতি শান্ত হইয়া আসিল। সমস্ত গর্জ্জনমন্থন থামিয়া গিয়া একটা অতল শ্রান্তিতে, একটা নিঃশব্দ বিষাদে বিশ্বচরাচর ভরিয়া গেল।…সুজাতক চিত্ত স্থির করিয়া লইয়াছে।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া আশ্রমবাসীরা দেখিল সুজাতকের কুটীর শূন্য। প্রদীপমূলে মুদিত শাস্ত্রগ্রন্থের উপর দগ্ধপক্ষ একটি মৃত কীট; পাশে সুজাতকের হস্তাক্ষরে লেখা—"আমার প্রশ্ন।" সকলে বিস্ময় মানিল।

সুজাতক শাস্ত্রের চিরসন্দিগ্ধ মস্তিষ্কের মধ্যে জগতের চির অমিমাংসিত প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
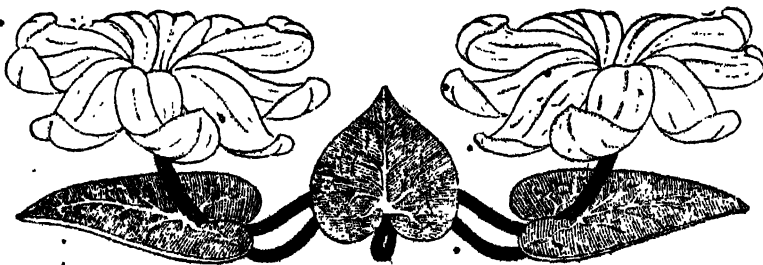
ভারতের সাধনায় পুরাণের দান

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন

ভারতের সাধনতত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তর বিভাগ করিলে গীতার, তন্ত্র প্রচারের পরেই পুরাণের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও পুরাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে, এমন কি প্রাচীনতম ঋগ্বেদের প্রচারের সময় হইতে তাহারই অংশরূপে ভারতের সাধকমণ্ডলীর পরিজ্ঞাত ছিল তথাপি ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচার প্রধানত গীতা প্রচারের পরেই দেখা যায়, তবে এ বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে পুরাণ শাস্ত্র এবং তাহার মৌলিকতার বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ পুরাণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় মতই বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত নহে।

ভারতীয় শাস্ত্রাদির বিচারে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকস্‌-মূলার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি উপনিষদ ও দর্শনের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম্মের উচ্চতম বিকশিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে উপনিষদ ও দর্শন যুগের পর ভারতের অবনতির কাল আরম্ভ হয় এবং পুরাণগুলি সেই অবনত যুগের রচনা; কারণ পুরাণের ইতিহাসভাগ আলোচনা দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অধিকাংশ পুরাণই খ্রীষ্টিয় দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত এবং সেই সময় হইতেই ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম শিক্ষা প্রভৃতি সমস্তই অবনতির পথে ধাবিত; সুতরাং তাঁহার মতে পৌরাণিক ধর্ম্ম খুব উন্নত ধর্ম্ম নহে এবং আমাদের মধ্যেও অনেকেই জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক এই মত পোষণ করিয়া পুরাণ শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তাত্ত্বিকের কথায় ইহার কারণ বিচার করিলে বলিতে পারা যায়—নৈমিষারণ্যে ঋষি কথিত পুরাণ শাস্ত্রের বহিরঙ্গের ইতিহাস আবিষ্কার করিতে প্রত্নতাত্ত্বিকের ছুরিকা হস্তে শান্তিময় তপোবনে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষের পাদপমূল ছেদনেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পবিত্র আশ্রমের সন্ধান বা ঋষির প্রাণের স্পর্শ না পাইয়া ব্যর্থ মনে পুরাণগুলিকে অবনত যুগের অনুন্নত ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং সর্ব্বত্যাগী লোকহিতৈষী ঋষিকুল আমাদের জন্য পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে সাধনতত্ত্বের যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

পুরাণ সাধারণভাবে পুরাতন কথার সংগ্রহ হইলেও বেদার্থের পূরক বলিয়াই পুরাণ নামে অভিহিত—অর্থাৎ যাহা বেদে ও উপনিষদে সূত্রাকারে বা সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত তাহাই পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। মহাভারতে আমরা একথার প্রমাণ পাই; মহাভারত এমনও বলিয়াছেন, "যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ উপনিষদ সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না তিনি বিচক্ষণ হন না। ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের সম্যক অর্থ বুঝিতে হইবে। বেদের অনেকাংশ লুপ্ত হইয়াছে, পুরাণে অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদোক্ত তত্ত্ব সকল সংগৃহীত আছে।[১] সুতরাং পুরাণকে প্রাচীনকালে প্রচলিত কতকগুলি উপন্যাসের সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে ভুল বুঝা হইবে। এবং যে কোন প্রাচীন আখ্যায়িকাযুক্ত গ্রন্থকে পুরাণ বলিলেও ভুল হইবে। ন্যূনাতিরিক্ত পাঁচটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রগ্রন্থই পুরাণ নামে অভিহিত; তাই অমরকোষে ইহার প্রতিশব্দ "পঞ্চ লক্ষণম্" পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণে এই পাঁচটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন—

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরাণিশ্চ।
> বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

---

[১] যো বিদ্যাৎ চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
নচেৎ পুরাণং সং বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাৎ বেদো—মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥
(মহাভারত—আদিপর্ব্ব)

"সর্গ অর্থে সৃষ্টি, প্রতিসর্গ অর্থে পুনঃপুনঃ লয় ও পুনঃপুনঃ সৃষ্টি; বংশ অর্থে প্রাচীন ঋষি ও রাজকুলের বংশ পরিচয়, মন্বন্তর অর্থে কোন মনুর পর কোন মনুর প্রাদুর্ভাব এবং বংশানুচরিত অর্থে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি বংশের রাজগণের চরিতকথা।" প্রধানত এই পাঁচটিই পুরাণ-সাহিত্যের বিষয় ভাগ। এবং বর্ত্তমান প্রচলিত অল্পাধিক এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত যে আঠারখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার মূল সূত্রভাগ বেদ হইতেই সঙ্কলিত বলিয়া শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়। শাস্ত্রপ্রমাণে ইহাও জানা যায় যে অতি প্রাচীন কালে বেদেরও কোন বিশেষ নাম বা বিভাগ ছিল না। দ্বাপরের শেষে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নানা ঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা ও মন্ত্রবিভাগ অনুযায়ী ঋক যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভক্ত করেন (১) এবং বেদোক্ত আখ্যান ও উপাখ্যান ভাগ লইয়া এক পুরাণ-সংহিতা প্রনয়ন করিয়া তদীয় শিষ্য লোমহর্ষণের উপর তাহার প্রচারের ভার প্রদান করেন (২)।

বেদ বিভাগকারী মহর্ষি বেদব্যাসের পুরাণ সঙ্কলনের প্রয়োজনজ্ঞাপক একটী সুন্দর বাণী আমরা দেবীভাগবত নামক মহাপুরাণের সূচনাতেই প্রাপ্ত হই। নৈমিষারণ্যে মুনি সমাজের নিকট ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা বলিতেছেন, "ধর্ম্মরক্ষাভিলাষী বেদব্যাস সকল মন্বন্তরেই প্রতি দ্বাপর যুগে যথানিয়মে পুরাণসকল প্রকাশ করেন। বেদব্যাস আর কেহই নহেন, স্বয়ং বিষ্ণুই জগতের হিতাভিলাষে প্রতি দ্বাপর যুগেই বেদব্যাসরূপে এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করেন। কলিকালে ব্রাহ্মণগণ অল্পায়ু এবং অল্পবুদ্ধি অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক তদর্থজ্ঞানে অসমর্থ ইহা জানিয়াই ভগবান প্রতি দ্বাপরে বেদের অর্থ প্রতিপাদক পবিত্র পুরাণ-সংহিতা প্রকাশ করেন।" আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রানুশীলনকারী মহাত্মাদেরই এই মত দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্", ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থ। বেদের যাহা জ্ঞানকাণ্ড তাহাই পরে আরণ্যক ও উপনিষদ নামে পরিচিত এবং ইহার মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বসকল পরিব্যক্ত হইয়াছে এ কথা সর্ব্বজনমান্য। এতদুক্ত নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বাণী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য ঋষি বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সারকথা এই ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রচারিত। সুতরাং পুরাণশাস্ত্রকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বলায় ইহা যে অনুন্নতধর্ম্ম প্রচারক নহে তাহা বোধ হয় সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

পুরাণের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বজ্ঞাপক বহু শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় শাস্ত্রাদি পুরাণকে বেদেরই ন্যায় প্রাচীন ও অপৌরুষেয় পবিত্র পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহাকে পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন।১। বৃহদারণ্যক ও শত পথ ব্রাহ্মণও ইহাকে বেদের সহিত উৎপন্ন বলিয়াছেন।২। সেই মহাভূত অর্থাৎ ব্রহ্মের নিশ্বাস হইতে ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস পুরাণ ও উপনিষদ নির্গত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অন্যত্র পুরাণের এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন "যে বিদ্বান বাক্য ইতিহাস ও পুরাণ প্রতিদিন পাঠ করেন তাহার প্রতি দেবতারা তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ প্রদান করেন।৩। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু

(১) এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্র মভুদ্‌যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথা করোৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ।৩।৪।১১

(২) আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণ সংহিতাংচক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাস শিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণ সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাস মহামুনিঃ॥
ঐ ৩।৬।১৬, ১৭

।১। সোঽবাচ ঋগ্বেদং ভগবোধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বনিং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।

।২। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতাৎ যৎ ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ

।৩। এবং বিদ্বান বাকো বাক্যমিতিহাসঃ পুরাণমিত্যহরহ স্বাধ্যায়মধীতে এন তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বভোগৈঃ।

নাই কারণ বেদের ব্রাহ্মণযুগ উপনিষদের পূর্ব্বে এবং উপনিষদ-গুলি ব্রাহ্মণ পরিশিষ্ট আরণ্যকেরই ক্রমবিকাশ।

এই সকল বৈদিক প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে পুরাণ বেদেরই ন্যায় প্রাচীন ও অপৌরষেয় বেদেরই অংশ ও বেদ হইতে অভিন্ন পঞ্চম বেদরূপ সর্ব্ব জনমান্য পবিত্র শাস্ত্র।

পুরাণগুলির প্রচারকাল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় পৌরব রাজা পরীক্ষিত হইতে চতুর্থ রাজা অধিসীম কৃষ্ণের রাজত্বকালে নৈমিষারণ্যে মহর্ষি সৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞসভায় ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা কর্ত্তৃক পুরাণ-গুলি প্রচারিত ও কীর্ত্তিত হইয়াছিল। ১। নৈমিষারণ্যের যজ্ঞসভা জগত বরেণ্য ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা ও বিচারের এক মহাসভা বলিয়াই মনে হয়। বিগত চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভা হইতে আমরা নৈমিষারণ্যের যজ্ঞসভার কথা কল্পনা করিতে পারি। কুলপতি মহর্ষি সৌনকের উদ্যোগে আহুত ধর্ম্মসভায় তৎকালীন তত্ত্বদর্শী মনীষীদের জীবজগত ও ঈশ্বর বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞান ও গবেষণার কথা আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া নৈমিষারণ্য ভারতীয় শাস্ত্রাদি প্রচারের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থান রূপে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। সেখানে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় পুরাণগুলিরও আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে অধিসীম কৃষ্ণের রাজত্বকালে পুরাণগুলির অধিকাংশ রচনাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান লিখিত পুরাণগুলিতে অধিসীম কৃষ্ণের রাজত্বের অনেক পরবর্ত্তী কালের যে সব রাজকুলের ইতিহাস —ধর্ম্ম সমাজ লোকাচার দেশাচার প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় তাহা পরবর্ত্তীকালে লিখিতভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ২

এখানে বলা আবশ্যক বেদের আখ্যান-ভাগ লইয়া বেদ-ব্যাস যে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন তাহাই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অষ্টাদশ বিভিন্ন নামে আঠারখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া আদিগুরুর সম্মান রক্ষার্থে সকলগুলিই ব্যাস বিরচিত বলিয়া প্রচার করেন। পরে বিভিন্ন ঋষিমুখে শ্রবণ করিয়া ব্যাসশিষ্য লোম-হর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে ঋষিসমাজে সেগুলি কীর্ত্তন করেন, সেই জন্য লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে ভাষা এবং ছন্দের যথেষ্ট বিভিন্নতা থাকিলেও সকলগুলিই ব্যাস বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশেষভাবে "সর্গাদি" পঞ্চ বিষয়ের কথা পুরাণের আলোচ্য বিষয় হইলেও সাধারণভাবে আমরা পুরাণের দুইটি প্রধান ভাগ দেখিতে পাই—একটী ইতিহাস আর একটী তত্ত্ব।

ভারতের ইতিহাসের উপাদানের জন্য আমরা মেগাস্থনিস হিয়েনসান্ প্রভৃতি বৈদেশিক পরিব্রাজকের নিকট যথেষ্ট ঋণী সত্য, তাঁহাদের দান আমরা খুব যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং ভারতের ইতিহাস রচনায় তাহাদের মতামত খুব শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখও করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা এত সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত যে তাহার দ্বারা একটা প্রাচীন মহা-জাতির ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, হইতেও পারে না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দান এই পুরাণ-সাহিত্যকে সামান্য উপন্যাসের সমষ্টি মনে না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তো ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণের দান কোন মতেই অবহেলার বিষয় নহে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত হইতেছে সেই পদ্ধতি অনুকরণ করিয়া ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধিৎসু হইলে পুরাণ আমাদিগকে খুব বেশী সাহায্য করিতে পারিবে না সত্য, তবে একথা আরও সত্য, এরূপ ইতিহাসের অনুশীলনে আমরা সত্যকার ভারতকে প্রকাশও করিতে পারিবনা। 'কোন্ রাজা কত বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিনি কয়টা যুদ্ধ জয় করেছিলেন অথবা কিনি কয়টা প্রাসাদ বা দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন' তাহার আলোচনায় ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না। ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতকে চিনিতে হইবে, ভারতের জাতীয় জীবনের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে। ভারতের মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য মুক্তি—এই দুঃখময় সংসারে পুনঃ

। ১। অধিসীম কৃষ্ণ ধর্ম্মাত্মা সাম্প্রতং যো মহাযশা।
(বায়ুপুরাণ)

। ২। জষ্টিস্ পার্জিটারের পৌরাণিক গবেষণা দ্রষ্টব্য

পুনঃ গমনাগমনের নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করা তপস্যা করাই ভারতের মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—তার জাগতিক জীবনের সমুদায় কর্ম্মপ্রচেষ্টা তার শিক্ষানীতি তার সমাজনীতি তার রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমস্তই তার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাহায্যার্থে গঠিত। সুতরাং স্বীয় ব্যবহারিক জীবনের কর্ম্মব্যবহারের দ্বারা যিনি যতখানি এই উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া ভারতীয় মনুষ্য সমাজকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছেন ভারতের পুরাণ ইতিহাস সেই সব আদর্শ জীবনের কথা ততখানি প্রচার করিয়া মনুষ্যসমাজকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মাদের জীবনীই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। তবে পুরাণের কথায় দেখা যায় এইরূপ মনুষ্যসমাজের শিক্ষাগুরু মহামানবদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণভাবে অবতার কথায় দশ অবতারের কথা প্রসিদ্ধ থাকিলেও পুরাণে অসংখ্য অবতারের কথা পাওয়া যায়। পুরাণবক্তা কালে নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবা মুনি সমাজকে বলিতেছেন "হে দ্বিজগণ! সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য, অপক্ষয়শূণ্য জলাশয় হইতে যেরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয় সেইরূপ ভগবান হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছেন।, ১। কেহ পূর্ণ কেহ অংশ কেহ অংশাংশ, আবার কেহ গুণাবতার, কেহ লীলাবতার কেহ কর্ম্মাবতার যে কেহ ভারতকে কোন নূতন তত্ত্বের বাণী দিয়াছেন, যে কেহ ভারতের রুদ্ধ ও অচল ভাবধারাকে অগ্রগমনে সহায়তা করিয়া তাহাকে সাধনপথের নূতন গতি দান করিয়াছেন পুরাণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার বা বিভূতি বলিয়া তাঁহার জীবনী কীর্ত্তন করিয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। তাই আমরা পুরাণে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেব ঋষি মনু, মনুপুত্র ও প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহারই (ভগবানেরই) অংশ বলিয়া পূজিত এবং তাঁহাদের দ্বারাই জগতের উন্নতিকর বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া অশেষ প্রকারে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাই। ।২। ব্যবহারিক জগতের কার্য্যকারিতার দিক দিয়াও কৃষি বাণিজ্যাদির প্রথম প্রবর্ত্তক ভারতের আদি রাজা পৃথুকে পুরাণ পৃথিবী দোহনকারী কর্ম্মাবতার বলিয়া ভারতের রাজগণের তালিকার শিরোদেশে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারকারী প্রজানুরঞ্জনের জন্য সর্ব্বত্যাগী রাজার আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচন্দ্র একজন যুগাবতাররূপে পূজিত ও কীর্ত্তিত।

এইরূপ শিক্ষা সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের দিক দিয়া ভারতের অগ্রগমনে সহায়তাকারী যে অসংখ্য আদর্শ জীবনের কথা পুরাণের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে তাহারই মধ্যে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের বীজ নিহিত। সুতরাং ভারতের ইতিহাসসাধনায় পুরাণের দান যে অমূল্য তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় পুরাণের দান যথেষ্ট থাকিলেও ইহাই তাহার মুখ্য দান নহে। জীবজগত ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রচার, জীব ও জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের তত্ত্ব প্রচারই পুরাণের মুখ্য কথা।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড বহু দেববাদ এবং জ্ঞানকাণ্ড "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপে একেশ্বরবাদ প্রচার করিলে তাহাদের উপযুক্ত ব্যাখ্যার অভাবে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল পুরাণ সেই উভয় বৈদিক মতেরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া উভয়েরই সত্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জীবজগত ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে বাণী উপনিষদ সংক্ষিপ্তভাবে প্রচার করিয়াছেন পুরাণে আমরা বহু উদাহরণের সহিত বহু প্রকারে তাহার ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগু-বারুণী সংবাদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে আবার সময়ে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম, শ্রবণাদি সাধন দ্বারা বিশেষরূপে তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর) ।১। তাহার উপর সাংখ্য দর্শন যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহা নিরীশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পুরাণে আমরা উপনিষদের এই

১। অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাসরসঃ স্যুঃসহস্রশঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।১।৩।২৬

২। ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্র মহৌজসঃ।
কলা সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্মৃতাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

১। যতোবা ইমানিভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্মেতি।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রত্যেক বাণীরই সোদাহরণ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। নিরীশ্বর সাংখ্য যেখানে সত্বরজস্তমোময় স্বতঃ পরিণামী প্রকৃতি নির্ব্বিকার পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি এবং তাহাদের বিচ্ছেদে লয় দেখাইয়াছেন পুরাণ সেখানে প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতিপরিণামী হইয়া সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন দেখাইয়াছেন। যে নিত্য স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে সত্বাদি গুণের ক্ষোভজনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আশ্রয়।১। বলিয়া "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...তদ্‌ব্রহ্ম" উপনিষদোক্ত এই স্বেশ্বর সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে নানাবিধ জড় ও জীব সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তাঁহার দ্বারাই এ সকলের স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় উপনিষদের এই তত্ত্ব প্রচার এবং সেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের আরাধনাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই শিক্ষা প্রচারই পুরাণের প্রধান কার্য্য। সেই জন্য অধিকাংশ পুরাণে আমরা ভগবানের যে অসংখ্য রূপের অসংখ্য রকমের পূজা অর্চ্চনাদি এবং নানা সদাচার ও ব্রত নিয়মাদি পালনের কথা দেখি ইহাতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের নির্ম্মম প্রতিযোগীতার মধ্যে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সহস্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে মানুষকে যত অধিককাল ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত রাখা যায় তাহারই চেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নৈমিষারণ্যের ধর্ম্ম মহাসভায় পুরাণগুলি কীর্ত্তিত হইবার কথায় বুঝা যায় যে পৌরাণিক শিক্ষার কথা গীতার ধর্ম্ম প্রচারের পরেই প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় আচার্য্যগণের তত্ত্বপ্রচার পদ্ধতির যে একটা বিশেষ নিয়ম তাহাই রক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় আচার্য্যগণের শিক্ষা প্রচারের সেই বিশেষ নিয়ম এই যে শিষ্য অনুসন্ধিৎসু না হইলে এবং তাহাকে উপযুক্ত না বুঝিলে তাঁহারা অনধিকারীর নিকট তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন না। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রচার বিষয়ে সর্ব্বত্রই এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাই পুরাণ প্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় পর পর অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে ভারত ভগবদ মহিমাত্মক পুরাণকথা শুনিবার জন্য উপযুক্ত এবং অনুসন্ধিৎসু হইলে লোকহিতৈষী ঋষিকুল ব্যাপকভাবে পুরাণের মহতী শিক্ষার কথা প্রচার করেন। উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপ একেশ্বর ব্রহ্মবাদে ভারতীয় সাধকমণ্ডলী দৃশ্যমান জগতকে নিরাশ করিয়া তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অতিমাত্রায় সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ায় ব্যবহারিক জগতের কর্ম্মহীনতায় দেশ নিস্বস্ব হইতে থাকিলে তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দার্শনিকেরা একেবারে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া মানবীয় মস্তিষ্কের বিচারবুদ্ধির দ্বারা জগত্তত্ত্ব প্রচার করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও মানবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যুক্তি তর্কের দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব তাহার চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিচারে, কিন্তু তাহাতে চরম সত্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে তাহার ফলে মানব আত্মশক্তিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হইয়া মানবীয় মস্তিষ্কের বিচারে জাগতিক সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইলে ভারতে এক অমিত তেজশালী ক্ষাত্রশক্তিপ্রধান বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি হয়। পরে দেখা যায় সেই আত্মম্ভরী বিরাট সভ্যতার ক্ষুধা মিটাইতে ক্রমেই জগত অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং শেষে তার সংঘর্ষে আসিয়া সত্য যেদিন বিপন্ন হইয়া উঠিল সেইদিন ভগবান সত্যের পাঞ্চজন্যনিনাদে কুরুক্ষেত্রের মহাহবে সেই বিরাট আত্মম্ভরী সভ্যতার ধ্বংসসাধন করিলেন। এবং সেই দাম্ভিকতার তাণ্ডবলীলাক্ষেত্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবকে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন "মানব! তোমার ইন্দ্রিয়ের শক্তির গর্ব্ব করিও না। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়া নিজ শক্তিতে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্ব দেহাভিমানী জীবকে চালিত করিতেছেন। মানবের অন্তর্যামীরূপে সমুদায় জ্ঞান ও কর্ম্মের জগত তিনিই চালনা করিতেছেন।" ১। ভারত ঋষি কথিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" রূপ ব্রহ্মতত্ত্বের এক নূতন ব্যাখ্যা শুনিল। এক তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই সত্য কিন্তু দৃশ্যমান আর যা সব মিথ্যা বা

।১। সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান ;
গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতিকাল সংলয়। বিষ্ণুপুরাণ।১।২

।১। ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

মায়া বা ইন্দ্রজাল নহে, অন্য কিছুও নহে—এ সবই তিনি, এই বিশ্ব সেই বিশ্বরূপ ভগবানেরই রূপ। মানব কৃতার্থ হইল।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পার্থিব ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব নিরীশ্বর বিচার-বুদ্ধির দাম্ভিকতা ও স্বার্থপরতার ধ্বংস হইলে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া দাম্ভিকতা ও স্বার্থপরতার নির্ম্মম পরিণতি দর্শন করিয়া মানব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল সেই সর্ব্বেশ্বর সনাতন বাসুদেবের কথা শুনিবার জন্য, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য। তাই দেখা যায় সেই সর্ব্বেশ্বর সনাতন ঈশ্বরের মহিমা, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের বার্ত্তা প্রচাররূপ পুরাণকথা বহু পূর্ব্ব হইতে সাধকমণ্ডলীর পরিজ্ঞাত থাকিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতার বাণী প্রচার হইবার পর ভগবদ কথা শুনিবার জন্য অধিকারী ভারতকে ঈশ্বরতত্ত্ব শুনাইবার জন্য পুরাণকথা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য উপসংহার করিলে বোধ হয় বলিতে পারা যায়,—পুরাণ প্রথমতঃ ভারতের জ্ঞান ও ভক্তি প্রচারক মহামানবদের জীবনেতিহাস দান করিয়া ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ পরিব্যক্ত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দর্শনোক্ত নিরীশ্বর সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ঈশ্বরবাদ যুক্ত করিয়া সেশ্বর সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার দ্বারা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ পরিস্ফুট করিয়াছে। তৃতীয়তঃ—পুরাণ যাহা দিয়াছে জগতের অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহা দিতে পারে নাই। উপনিষদের ঋষি, দর্শনের যুক্তিবাদী যাহা দিতে পারেন নাই এমন কি বেদও যাহা পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই পুরাণ আমাদিগকে তাহাই দিয়াছেন,—ইহাই ভারতের সাধনায় পুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। পুরাণ প্রচারের পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষি যাহাকে চিন্তা করিয়াই ভয়ে ও সম্ভ্রমে মূক হইয়া পড়িয়াছিলেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" (তৈত্তিরীয়) বাক্য ও মন যাহার নাগ না পাইয়া ফিরিয়া আসে, দর্শনের বিচারক যাহাকে নিজেদের বিচারবুদ্ধির মধ্যে আনিতে না পারিয়া নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছেন, ।১। কেহ বা ভয়ে ভয়ে মাত্র স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ২। এমন কি গীতা যাহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলিয়াই উপসংহার করিয়াছেন, ব্যবহারিক জীবনে যাহাকে প্রকাশ করেন নাই, পুরাণের ঋষি সেই "অবাঙ মনসো গোচর" বাক্য মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মকে মানবের পুত্ররূপে সখারূপে প্রভু বা রাজারূপে জীবনসঙ্গীরূপে এবং প্রিয়তম দয়িতরূপে মানবের সম্মুখে আবির্ভাবের তত্ত্ব প্রচার করিয়া জীবের সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-বন্ধন দেখাইয়াছেন, এবং বেদ যেখানে "পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নয়—পুত্রের মধ্যে সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান হেতু পুত্র প্রিয়" এই বাণী দিয়া পুত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন পুরাণ আমাদিগকে সেই বেদবাক্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দান করিয়াছেন। উপনিষদের God in Universeকে God in person এ ব্যক্ত করিয়া পুরাণ ভারতীয় সাধনতত্ত্বের একটা প্রত্যক্ষ রূপ দিয়াছেন। "কৃষ্ণের (ভগবানের) যতেক লীলা। সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" নরলীলায় অবতীর্ণ ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্বই ভারতের সাধনায় পুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

(১) বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন।
(২) পাতঞ্জলদর্শন—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"।

একটি পয়সা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য বি, এস্-সি

কমল কি এক অফিসে কাজ করে। মাসান্তে সে ত্রিশ টাকা পায়। সংসারে তার ছোট মেয়ে 'জলি' ও জলির মা সরমা। সহরের এক নিভৃত কোণে সে বাস করে। আড়াই খানা ঘর, একখানা বসিবার, একখানা শুইবার ও খাইবার, বাকী আধখানা ভাঁড়ার ঘর ও পাকের ঘর। ছোট সংসার, ছোট ছোট অভাব অভিযোগ—বেশ চলে। বেশ চলে, কারণ, কত বি-এ, এম্-এ, পাশ করা ছেলে বসিয়া আছে। সে তো তবু মাসান্তে ত্রিশ টাকা পায়। আই-এ ফেল করা ছাত্রের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, বোধ হয় আশাতিরিক্ত।

এমনিভাবেই বোধ হয় তাহাদের বাকী দিনগুলি চলিয়া যাইত। কিন্তু জলির অসুখ হওয়াতেই যত মুস্কিল হইয়াছে। বিশেষ কিছুই না—জ্বর। যা দুরন্ত মেয়ে, একটু যদি কথা শোনে! কিছু না...ঋতু-পরিবর্ত্তন...একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া...দুই দিনেই ভাল হইবে...ইত্যাদি কতভাবে মনকে প্রবোধ দিয়াও কিছু হইল না; কারণ, জলি ভাল হইবার কোনও লক্ষণ দেখাইতেছে না, উত্তরোত্তর অসুখ যেন বাড়েই। কাজেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বিনয় বাবুকে ডাকা হইল। ডাক্তারের এক দাগ ঔষধেই জ্বর জল হইয়া যাইবে, এইরূপ আশা করিলেও ডাক্তার বাবুর দুই তিন শিশি ঔষধ লাগিল। মনটা যেন কেমন করিয়া ওঠে। জোর করিয়া মনকে শাসন করিতে হয়—না, না, জলি ভাল হইবে, কেন অমঙ্গল আশঙ্কা কর। তবু সাতদিন—ছোট মেয়ে।

মুস্কিল আরও যে সে বার্লি খাইতে চায় না। কত রকম বুঝাইয়া কত ভাবে খাওয়াইতে হয়। লেবু কিনিয়া বাজে খরচ করিবার পয়সাও তো তাহাদের নাই। লেবু হইলে হয়তো বার্লি খাইত। তবু কত রকম ভাবে একটি পয়সা বাঁচাইয়া সে মাঝে মাঝে লেবুও আনে। গরীব আর কত করিতে পারে? মাসে মাসে পাঁচ টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে হয়। নিজেদের খাওয়া-পরা আছে। শীত আসিয়া পড়িল, একখানা আলোয়ান না হইলে আর চলে না। সরমার কাপড় নাই। দেশে বাড়ীর খাজনা দিতে হইবে। কিছু ঋণ আছে, তাহা শোধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এ রকম অবস্থায় অসুখ হইলে চলে কি করিয়া? অসুখেরও যেন সারিবার নাম নাই। তবু উপায় তো নাই! তাই সে ডাক্তার ডাকিয়াছে, বার্লি কিনিয়াছে, লেবুও তো মাঝে মাঝে আনে!

এত অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও কমল মাহিনা পাইলে সরমার নিকট একটাকা রাখিতে দেয়, এবং জলিকে এক পয়সার লিলি বিস্কুট কিনিয়া দেয়। চাকরী পাইবার পর হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সরমাকে এক টাকা রাখিতে দিলেও সে তাহা কোনও দিন রাখিতে পারে নাই। মাস যখন শেষ হইয়া আসে, তখন এই এক টাকা কাজে লাগে।

আজ শুক্রবার, পহেলা নভেম্বর। বিশেষ করিয়া কেরাণী মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কারণ, এই দিনটা তাহাদের সব চেয়ে প্রিয় দিন। বন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কেবল বসিয়া বসিয়া রুটিন বাধা কাজ করিতে করিতে কেরাণীরা কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আজিকার দিন আসিতেই তাহাদের শুষ্ক, বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়াছে"। বেলা দুইটার'পর কমল ত্রিশ টাকা পাইল: পাঁচটার সময় সে বাসার দিকে ছুটিল। পথে আবার তাহাকে বাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। বিস্কুটওয়ালা ডাকিল' "বাবু"। আজ যে মাসের পহেলা তাহা বিস্কুটওয়ালা জানে। কিন্তু জলির যে অসুখ! কেমন আছে কে জানে? কমল থামিল না।

সমস্ত কাজ সারিয়া যখন সে বাসায় পৌঁছিল, তখন সাতটা। শুইবার ঘরে একটি লণ্ঠন নিভু নিভু হইয়া জ্বলিতেছে। ঘরের সমস্ত অন্ধকার যেন তাহাতে আরও বেশী করিয়া চোখে পড়ে। জলির কাছে সরমা অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। কমলের পদশব্দে সে সচেতন হইল। তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল,

'এখন ও কেমন আছে?'

কিন্তু, তার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া নিজেই জলির মাথায়, গালে বুকে, পেটে, পায়ের তলায় হাত দিয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করিল। বুক ও পেট কি গরম।

'জরটা আজও ছাড়ল না।'

গোটা দুই বাতাসা ও এক গ্লাস জল আনিয়া সরমা বলিল, তুমি একটু বস, আমি ভাতটা রান্না করি।'

সরমা উঠিতেই কমল বলিল, 'শোনো'

সরমা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'এই নূতন পয়সাটি জলিকে দিও, ও তা' হ'লে হয়তো বার্লি খেতে আপত্তি করবে না। আজ ডাক্তার এসেছিল

'হু''।

পরের দিন জলি কিছুতেই শুইয়া থাকিবে না—নূতন পয়সাটি পাওয়াতে তাহার এতই আনন্দ হইয়াছে। বার্লি খাইতে সে মোটেই আপত্তি করিল না, এক চুমুকেই পাত্র শেষ করিয়া দিল। তার পর সে যে সেই উঠিয়া বসিয়াছে, আর শুইবে না। তার কোমর ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। ক্লান্তির চিহ্ন তাহার মুখে চোখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে বসিয়াই রহিল, এবং তার পুতুলের সেই টিনের বাক্সও আনিয়া দিতে হইল। পয়সাটিকে একবার এপিঠ, আবার ওপিঠ করিয়া কত ভাবেই যে সে দেখিল। পয়সাটি তাহার গালে লাগাইল, উঃ, কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা, একটু পরে পয়সাটি গরম হইয়া উঠিল, সে তখন উহা মাটীতে রাখিয়া দিল, আবার গালে রাখিল; পুতুলকে লক্ষ্য করিয়া সে কত কথা কহিল, সে পুতুলের বিয়ের সময় কত গয়না দিবে, কত লজেনচুষ, কত বিস্কুট দিবে, চকমাটী দিবে, ঘোড়া কিনিয়া দিবে, ভাল কাপড় ভাল জামা, কাণে দুল, কত কি দিবে, বাক্স ভরিয়া নূতন ঠাণ্ডা' পয়সা দিবে—উঃ কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা—

পয়সাটি কেমন সুন্দর—কেমন সুন্দর রং—কেমন ঠাণ্ডা, ছবিটি কেমন সুন্দর, লেখাগুলি কেমন স্পষ্ট। বড় হইয়া সে এই লেখা পড়িবে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে উহাতে কি লেখা আছে, এই সুন্দর ছবিটি কার। কেমন সুন্দর গোল, কেমন চলে, কেমন সুন্দর শব্দ হয়, সোনার মত রং, সোনাই বুঝি—

'কি, মা এখন শোও লক্ষ্মী, তোমার তো জর হয়েছে তুমি তো বোঝ। জলি কত ভাল মেয়ে, জলি সব বোঝে, জলি এখন শোবে। হাঁ চলো। তুমি আগে বড় হও, তারপর এমনি কত পয়সা তোমাকে দেব; জলি খুব ভাল মেয়ে, আমার কথা সে শোনে। তোমার বিয়ের সময় তোমাকে অনেক পয়সা দেব, অনেক পুতুল, পুতুলের কত জামা, কত কাপড়—লক্ষ্মী মেয়ে জলি—'

'না, মা, আমি শোব না, জ্বর না ছাই। মা, এই ছবিটা কার? পয়সাতে কি লেখা থাকে মা?''

'ওটা রাজার ছবি, পয়সাতে লেখা থাকে যে এটা এক পয়সা। জলি লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠো—'

'না, মা, একটু পরে—'

একটু পরে সরমা আসিয়া দেখিল যে জলি সেখানেই ঘুমাইতেছে, তাহার বুকের কাছে পুতুল ও সেই পয়সা। কমল তখন আফিসে চলিয়া গিয়াছে। সরমা জলিকে কোলে করিয়া বিছানাতে শোওয়াইয়া রাখিল। জলির তন্দ্রা মুহূর্ত্তের জন্য দূর হইতেই সে বলিল, 'মা, আমার পয়সা, পুতুল?' 'এই যে, মা।' জলি আশ্বস্ত হইল। বুকের কাছে পয়সা ও পুতুল রাখিয়া আবার ঘুমাইল।

সরমার জন্য এক জোড়া কাপড় কিনিয়া বাসায় ফিরিতে আজও সাতটা হইয়া গেল। আসিয়া দেখে সরমা চৌকির নীচে কি যেন খুঁজিতেছে।

'ব্যাপার কি?'

'জলির পয়সাটা কোথায় যে পড়ে গেছে, তাই—'

'কেমন আছে?'

'জ্বরটা বোধ হয় বেড়েছে; সকালে অতক্ষণ বসে রইল, কিছুতেই উঠল না, পরে নীচেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হয়তো তাই জ্বর বাড়ল। তবু মেয়ে যদি কথা শোনে; বিকালেও পয়সা নিয়ে অনেকক্ষণ খেলেছে; হাত হ'তে বুঝি পড়ে গেছে. আমি তাই দেখছি। এতক্ষণ তো ও জেগেই ছিল—'

'ঝাঁটাটা নিয়ে এসো। তারপর খোঁজো।'

কমলকে দুইটা বাতাসা ও এক গ্লাস জল দিয়া চৌকির নীচ ঝাঁট দেওয়া হইল। একটি চুলের কাঁটা, দুইটি আলপিন্, খানিকটা ধূলা, কয়েকটা মাকড়শা ও ঝাঁটার সঙ্গে কিছু মাকড়শার জাল আসিল. কিন্তু পয়সা পাওয়া গেল না।

'মা, আমার পয়সা—'

'এই যে,' বলিয়া কমল জলিকে আরেকটি পয়সা দিতে গেল।

'না, না, এটা নয়, আমার নূতন পয়সা, রাজার ছবি আছে, লেখা আছে, কেমন সুন্দর গোল, কেমন শব্দ হয়, কেমন ঠাণ্ডা, কেমন সোনার মত রং—'

'এটারও তো শব্দ হয়, এটাও ঠাণ্ডা, কেমন গোল, দেখই একবার, এতেও রাজার ছবি—'

'না, না, ওটা নয়, ওটা যে পুরাণো, আমার নূতন পয়সা—'

জলিকে কিছুতেই বুঝানো গেল না যে নূতন আর পুরাতন পয়সা মূল্য হিসাবে একই, নূতন হইলেই তার দাম বাড়ে না বা পুরাতন হইলেই তাহা অচল হয় না। কিন্তু যে জন জিনিষের দাম সৌন্দর্য্য দিয়া ঠিক করে, তাহাকে আর কি বলা যায়। ঘরে আর নূতন পয়সাও ছিল না যে দেওয়া যায়।

'আজ তো পাওয়া গেল না—এখন ঘুমোও, কাল ভোরে ভাল করে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। ঘরেই আছে। এখন যে রাত্রি, অন্ধকার। লক্ষ্মী, জলি খুব ভাল।'

মাঝ রাতে জলি যেন কেমন করিয়া উঠিল।

'ওগো, ওঠো একবার'

'কি. কি,'—কমল বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'জলি যেন কেমন করে, তুমি এখুনি একবার বিনয় বাবুকে ডাকো, শিগগির যাও।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই বিনয় বাবুকে লইয়া কমল আসিল।

জলি তখন বলিতেছে—'আমার পয়সা . কেমন গোল ···কেমন ঠাণ্ডা...কেমন সুন্দর ছবি···ও .পুতুল···কেমন সুন্দর···মা···ন···আমি যাব না...'

বিনয় বাবুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তবু মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি?' সমস্ত ঘটনা শুনিয়া প্রেসক্রপসন্ লিখিতে বসিলেন। লিখিবার প্রথম দিকে তিনি হাসি হাসি ভাব দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত সে ভাব রাখিতে পারিলেন না। যাইবার সময় আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, 'এখনই আনিয়া খাওয়াবেন, আসুন আমার সঙ্গে। এ কিছু নয়। এখনই ভাল হবে। আজ ওর শরীর ও মন দুটার উপরেই অত্যাচার হয়েছে, কাজেই—যাক্, চলুন—আলোটা নিন্।'

রাস্তা হইতেই কমল শুনিল, জলি বলিতেছে—'মা আমার পয়সা···ওটা নয়...নূতন ··পুরাতন...ইস্···আমার ...গোল···ছবি···সুন্দর··ঠাণ্ডা···

ঔষধ খাওয়াইবার ঘণ্টা দুই পরে জলির কথা কওয়া থামিয়া গেল। কিন্তু, তাহার জীবনও যে শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন হয়তো। অনেক পূর্বে আলোর আভাস ফুটিয়া উঠিল। দুই একটা করিয়া ক্রমে অনেক পক্ষী জাগিয়া উঠিল। রাস্তার আলোগুলি এক সঙ্গে নিভিয়া গেল। পাশের কোনও বাসায় হয়তো কোনও পরীক্ষার্থী ছাত্র পড়িতেছে। দুই এক জন করিয়া লোক জাগিল। এমন সময় জলি 'মা' বলিয়া ওপারের দিকে যাত্রা করিল।

তার পর?—তার পর সমস্তই সাধারণ ও মামুলী গোছের। ক্রন্দন—প্রতিবেশীর সান্ত্বনা—কতিপয় যুবকের দাহকার্য্যে সাহায্য ইত্যাদি—

ভোরের আলো ঘরে আসিতেই কিন্তু সেই পয়সাটি চৌকাঠের কাছে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অভিভাষণ

রাজনীতিক আদর্শ এবং চিন্তা সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের অভিমত বহুবার তিনি দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মত গত বৎসর কংগ্রেসসভাপতিরূপে তাঁহাকে অনেক লেখায়, অনেক বক্তৃতায় এবং অনেক ডাক্ ও বিবৃতিতে অনেকবার বলিতে হইয়াছে। কাজেই, এবারকার অভিভাষণ স্বভাবতঃই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অভিভাষণ, এখানকার অন্যান্য বক্তৃতা এবং প্রস্তাবসমূহের মর্ম্ম ও অভিপ্রায়ও দেশবাসীর অজ্ঞাত নহে। কিন্তু এখানে প্রকাশিত মত বা প্রস্তাবের মূল্য শুধু নূতনত্বের জন্য নহে। পুরাতন কথাও যে নূতন করিয়া শুনিবার মূল্য আছে, চিন্তাশীল শক্তিমান লোকের মনের আলোকে বহু পুরাতন মতকেও যে নূতনরূপে দেখা যায়, বহু পুরাতন আদর্শেরও পূর্ণ মূল্য বুঝিতে হইলে যে বহু আলোচনা এবং বহু ব্যাখ্যা প্রয়োজন, বহু প্রাচীন সমস্যার সকজ্ঞাত মুক্তিপথেও যে নূতন আলোকপাত হইতে পারে, এ সকল কারণের দ্বারাও এখানকার বক্তৃতা, বিতর্ক ও প্রস্তাবাদির মূল্য নিরূপিত হইবে না। রাজনীতিক মৌলিক চিন্তা কোন সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিতী মীমাংসা অথবা ভারত সম্পর্কে কোন নূতন রাজনীতিক মত বা আদর্শের ব্যাখ্যা বরং আমরা অন্যান্য উপযুক্ত ক্ষেত্রেই বেশী আশা করিতে পারি। এখানকার বক্তৃতাসমূহে বিশেষ করিয়া সভাপতির অভিভাষণে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, বিভিন্ন সমস্যাকে যেভাবে দেখা হইয়াছে, সমাধানের যে সকল উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সেই পথের অনুসরণ করিবে, কংগ্রেস বিভিন্ন সমস্যাকে কার্য্যতঃ এই চক্ষে দেখিবার, এবং এখানে উল্লিখিত পথেই তাহাদের সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং এখানে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের পশ্চাতে শক্তিশালী রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষমতা এবং কর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়াই এ সকলের এত গুরুত্ব। ইহারা দেশের রাজনীতিক মতের নির্দেশক না হইয়া, রাজনীতিক কর্ম্মের ও নানা সমস্যা সম্বন্ধে কার্য্যতঃ যে সকল নীতি অনুসৃত হইবে তাহার নিরূপক হইবে বলিয়াই ইহাদের গুরুত্ব। দেশের অগ্রবর্ত্তী রাজনীতিক সকল দলের লোকেরাই কংগ্রেসকে মিলিত কর্ম্মক্ষেত্র করিতে চাহিতেছেন এবং ইহাদের প্রতিনিধিরাও এখানে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াও এসকলের বাড়িয়াছে। কারণ বক্তাদের, বিশেষ করিয়া সভাপতির বক্তৃতার সময় ইহাদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে, ইহাদেরই সাহায্যে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কাজেই, এখানে ব্যক্ত মতামত, নানা রাষ্ট্রিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কোন বা কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মতামতমাত্র নহে। যাঁহাদের রাজনীতিক চেতনা আছে, নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে নানা রাজনীতিক মতের ও দলের এমন বহু লক্ষ লোকের সমর্থন এখানে প্রকাশিত মত এবং অভিপ্রায়সমূহের পশ্চাতে রহিয়াছে বলিয়াও এ সকলের গুরুত্ব আছে ;—এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী আছে। এই সকল গুরুত্ব দেশের উপর ইহাদের প্রভাবের জন্য, সভাপতির সমগ্র অভিভাষণ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি সবই উদ্ধৃত করিতে পারিলে

আমরা সুখী হইতাম। তাহা সম্ভব নহে বলিয়া কোন কোন স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

বাংলার কথা

রাজনীতি সম্পর্কিত তীব্র দুঃখের মধ্যে বিনা বিচারে আবদ্ধ বন্দীদের দুঃখই বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ। অল্পসময়ের মধ্যে তিনজন বন্দীর আত্মহত্যা এই দুঃখবোধকে তীব্রতর করিয়াছে। ইঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং সভাপতি অভিভাষণের প্রথমেই আবেগের সহিত বলিয়াছেন :—

"কারাগার ও বন্দীশালানিবাসী সহকর্ম্মীদিগকে আমাদের অভিনন্দন পাঠাইতেছি। তাঁহাদের দুর্দ্দশা শেষ হয় নাই এবং তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে শঙ্কিত মনে আমরা শুনিলাম যে শ্যামল বাংলার বুকে জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছে বলিয়া তিনজন বন্দী আত্মহত্যা করিয়াছেন ; বাংলার অগণিত তরুণ তরুণী অন্তরীণ বাস করিতেছেন—ইহার কোন শেষ নাই। অন্যত্র নাৎসী জার্ম্মানীতে ইহারই অনুরূপ অবস্থা আমরা দেখিতে পাই ; এখানেও বন্দীশালা পূর্ণ হইতেছে এবং আত্মহত্যাও বিরল নহে।"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উল্লেখের সময় তাঁহার পরামর্শ ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহার কথা ও তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া সভাপতি বলেন, "অসহায়ভাবে আমাদের নারী ও পুরুষদের এই নিষ্পেষণ আমরা দেখিতেছি কিন্তু, বর্ত্তমানের এই নিঃসহায়তাই আমাদের এই অসহনীয় অবস্থা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর করিতেছে।"

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্যগুলি যে আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা এবং এ সম্পর্কে কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতি যে যথেষ্ট দৃঢ় নহে ও কতকটা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচায়ক সেকথা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে আমরা কয়েকবার বলিয়াছি। রাষ্ট্রিক আদর্শ হিসাবে জওহরলাল যে দলের লোক তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এদিক দিয়া একটা নূতন নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি অনেকেই আশা করিতেছিলেন। কিন্তু, গত নয় মাসে (জওহরলালের নেতৃত্বের সময়) এবিষয়ে কংগ্রেসের মনোভাবের ও কর্ম্মনীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আগামী শাসনতন্ত্রে ইহাদের সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া ব্রিটিসভারতীয়দের রাষ্ট্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার পাকা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন :—"উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটীস শাসনের প্রথম দিকের অশান্ত অবস্থার মধ্যে বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যগুলি গড়িয়া উঠে। রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের সহিত কৃত যে সকল সন্ধিপত্রকে যখন তখন আমাদের সম্মুখে স্পর্শের অযোগ্য পবিত্র দলিল বলিয়া ধরা হয়, এই সময়েই সে সকলের উৎপত্তি হয়।

ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত এই সময়ের ইওরোপের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইওরোপে এই সময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন এবং অব্যাহত রাজক্ষমতা পরিচালনা এবং ধর্ম্মের নামে নানাবিধ সন্ধি অবাধগতিতে চলিত। দাসত্ব আইন-অনুমোদিত ছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক এই একশত বৎসর সময়ের মধ্যে ইওরোপের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। নানা বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধ্বংস পাইয়াছে, এবং রাজারাও প্রায় কেহ টিকিয়া নাই বলিলেই হয়। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে, আধুনিক শ্রমশিল্পের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান ভোটাধিকারের সহিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কোন দেশে আবার ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব ইহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। যে রাশিয়া পশ্চাতে পড়িয়া ছিল এক বিপুল লাফ দিয়া সে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এমন এক অর্থনীতিক বিধান গড়িয়া তুলিয়াছে যাহার ফলে চারিদিকেই বিস্ময়কর উন্নতিসাধনে সে সমর্থ হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া জগৎ আরও এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে ; এই সদা পরিবর্ত্তনশীল জগতে স্থির থাকিয়া প্রারম্ভিক উনবিংশ

শতাব্দীর দৃষ্টি লইয়া ইহারা আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। পুরাতন সন্ধিগুলি অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া আছে। এই সকল সন্ধি জনসাধারণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সহিত করা হয় নাই, তাহাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সহিত করা হইয়াছে। কোনজাতি, কোন জনসমাজ এই প্রকার অবস্থা সহ্য করিতে পারে না। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কৃত এই সকল প্রাচীন ব্যবস্থাকে আমরা স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে খাপ খাইতে হইবে এবং কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের ন্যায় এখানকার অধিবাসীদেরও একই প্রকার ব্যক্তিগত নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই সকল রাজ্যের সহিত সন্ধি বা সার্ব্বভৌমত্বের কথা শোনা যায় নাই। এই সকল শাসকেরা সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায় তাঁহাদের স্থান জানিতেন এবং ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের শক্তিমান হস্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত। কিন্তু ভারতে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারের সহিত ইহারা এক কাল্পনিক প্রাধান্য পাইয়া গেলেন; কারণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ইহাদের সাহায্যের উপর ক্রমেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে লাগিলেন।" দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে শাসক এবং তাহাদের মন্ত্রীদের দেরী লাগে নাই—তাঁহারা ইহাকে কাজে লাগাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া উভয়ের নিকট হইতেই সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিফল হন নাই। ইহাতে তাঁহারা অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। ভারতের অবশিষ্টাংশের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে স্বেচ্ছাচারীরূপে থাকিয়া তাঁহারা ভারতের অন্যান্য অংশের উপর ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার পাইলেন। আজ আমরা তাঁহাদিগকে এমনভাবে কথা বলিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের জন্য সর্ত্ত উপস্থিত করিতে দেখিতে পাইতেছি যেন তাঁহারা স্বাধীন। বড়লাটের সার্ব্বভৌমত্বের উচ্ছেদের কথাও হইয়াছে —যাহাতে এই রাজ্যগুলি তাহাদের লগ্ন এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনায় এজগতে এককই অবস্থান করিতে পারে এবং যাহাতে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়। বড় বড় কয়েকটি রাজ্যে উৎকৃষ্ট সেনাদল গঠন একটা বিশেষ অনিষ্টকর পরিণতি।"

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রায় সকল সমস্যার উল্লেখ

নূতন শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচন, মন্ত্রীত্বগ্রহণ, ভূমি সমস্যা, কৃষকদের রক্ষা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত চেষ্টা, আরবদের সংগ্রাম, স্পেনের সঙ্কট, ফ্যাসিজিমের অগ্রগতি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী সংক্ষিপ্ত হইলেও দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইওরোপে গণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির যে দ্বন্দ্ব সব দেশে চলিয়াছে স্পেনে তাহাই মারাত্মক মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সংঘর্ষকে আমরা কখন নিরাসক্ত দর্শকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিব না—এযুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। সমগ্র বিশ্বে যে আজ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ও আদর্শের সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার ফলাফলের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদেরও ভাগ্য বিজড়িত। আমাদের জাতীয় সামাজিক স্বাধীনতা যে বিশ্বসমস্যারই অন্তর্গত সে কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। দেশকে যে সকল নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে, পণ্ডিতজীর মতে তাহাতে জাতি দুর্ব্বল না হইয়া তাহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে এবং এই সকল অত্যাচার প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শক্তির পরিমাপক।

দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা

আমাদের দৈনন্দিন সমস্যা সম্বন্ধে সভাপতি বলিয়াছেন "দুঃসহ দারিদ্র্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্যা আমাদের সদাবর্ত্তমান বাস্তব সমস্যা। বেকার সমস্যা মধ্যবিত্তদেরও কবলিত করিয়াছে এবং ক্রমেই তাহাদের পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। সমগ্র জগতই আজ কষ্টদায়ক বৈষম্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু, একথা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষের ন্যায় অন্য কোথায়ও এই বৈষম্য এত বিস্ময়কর নহে। ব্রিটীশ শক্তির সুস্পষ্ট প্রতীক, রাজৈশ্বর্য্যপূর্ণ দিল্লীনগরী তাহার বিপুল জাঁকজমক, স্থূল আড়ম্বর এবং অপব্যয়ের আতিশয্য লইয়া

দাঁড়াইয়া আছে, আর ইহারই কয়েক মাইলের মধ্যে ভারতের উপবাসী কৃষকদের মাটীর কুঁড়ে ঘর রহিয়াছে। ইহাদেরই যৎসামান্য আয় হইতে এই সকল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মোটা মোটা মাহিনা ও ভাতা দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের রাজন্যেরা তাঁহাদের দরিদ্র নিঃস্ব প্রজাবর্গের সম্মুখে তাঁহাদের প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য্যের জাঁক করেন এবং অবাধ প্রভুত্বে তাঁহাদের জন্মগত অধিকারের ও সন্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধে কথা বলেন।"

ভারতবর্ষে ব্রিটীশ শাসন

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রেরিত ইউনিয়ন ডেলিগেসনের অন্যতম সদস্য Dr. N. J. Van der Merwe, M. P. ফিরিয়া গিয়া তাঁহার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রয়টারের নিকট একটি বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিটি ভারতে প্রেরিত (সঙ্গত কারণেই) হয় নাই; 'নেটাল এডভার্টাইজার'এ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতবর্ষে আমি যাহা দেখিলাম তাহাই আমাকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বড় শত্রু করিয়াছে। শতকরা ৭০ জন লোক যখন খাইতে পাইতেছে না, ৩০ কোটিরও উপর লোক যখন অক্ষরজ্ঞানহীন হইয়া আছে তখন, নব দিল্লী নির্ম্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ইহা অতীতের প্রতাপশালী মোগলদেরই অনুকরণ করিয়াছে। ভারতের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জনের অপেক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা অনেক ভাল। বম্বে ও কলিকাতার ন্যায় বড় বড় নগরের রাস্তার উপর হাজার হাজার লোক নিদ্রা যায়,—কারণ তাহাদের কোন আশ্রয় নাই। এখানে সেখানে ২১ জনের গায়ের উপর পা না দিয়া এই নিদ্রিতদের মধ্যে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে কখন কখন কষ্টকর হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে, যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন লোক বাস করে, দারিদ্র্য হৃদয়বিদারক। লোকে মাটীর কুটীরে বাস করে, এখানে স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মগুলিও অজ্ঞাত। ভারতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক গড়পড়তা দৈনিক আয় দুই পেন্সেরও কম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে আমরা যে সব অবস্থাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি, অন্যান্য দেশের লোকেরা সে সব অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যান। অভ্যাসের ফলে আমাদের কাছে যাহা আবৃত হইয়া আছে, সাম্রাজ্যবাদের সেই নগ্নরূপ বিদেশীর অনভ্যস্ত চোখে স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার সমাবর্ত্তন উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংস্রবহীন কোন ব্যক্তির পক্ষে সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা এই প্রথম। গতানুগতিক বহুবার শ্রুত কথার পরিবর্ত্তে ছাত্রেরা এবার কিছু নূতন কথা শুনিতে পাইবেন। ধুতি চাদর পরিয়া যোগ দেওয়া যাইবে বলিয়া অনেক বেশী ছাত্র এবার উপস্থিত থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

নারীরক্ষার অক্ষমতায় পুরুষের গ্লানি

বাংলাদেশে নারীনির্য্যাতনের এত দীর্ঘ ইতিহাসে পুরুষের বীরত্বের কথা, সাহসের কথা, নিজের জীবনপণে নারীকে রক্ষা করিবার কথা যে কোথায়ও শোনা যায় না, বাঙ্গালী পুরুষের পক্ষে ইহা দুরপনেয় কলঙ্কের কথা। আশুতোষ-হলে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত নারীরক্ষা সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী পুরুষদের এই ভীরুতাকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন :—

"সীতা হরণের পর সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র যে বিপুল উদ্যম দেখিয়েছিলেন যা অসাধারণ পৌরুষ দেখিয়েছিলেন, আজকালকার বাংলার পতিপুত্রগণের সে উদ্যম কোথাও কেউ দেখেছেন কি? একজনও কেউ নিজের ক্ষত বিক্ষত দেহের পণে, নিজের জীবনপণে, স্ত্রীকে দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে এ কথা কেউ কোথাও শুনেছে? হিন্দুমিশন স্ত্রীহরণের ফর্দ্দ বের করেছেন, স্বামীদের শূরত্বের ও বীরত্বের ফর্দ্দ বের করতে পেরেছেন কি? হিন্দুস্ত্রী শুধু পথেই বিবর্জ্জিতা নয়, অন্তের দ্বারা

আক্রান্ত হলে গৃহেও বিবর্জ্জিতা। হিন্দু পুরুষের জীবনের মটো হয়েছে—আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। ···নারীরক্ষা যে আজ আমাদের দেশের একটা সমস্যার বিষয়, সভা-সম্মিলনী করে আলোচ্য বিষয় এইটেই ত এ দেশের পুরুষ জাতির পক্ষে একটা মস্ত আত্ম-অসম্মানের কথা। যাকে বিয়ে করে ঘরে আনলে, যাহার ভরণ পোষণের দায়িক হলে, তার রক্ষার দায়িকও যে তুমি, এ বিষয়ে কি কোন বিচার-বিতণ্ডা হতে পারে? যদি ভাত কাপড় দেবার ক্ষমতা না থাকে তবে বৌ ঘরে আনা যেমন নিকৃষ্ট পুরুষের কাজ, তেমনই বৌকে পরপুরুষের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য না রেখে বিয়ে ক'রে বিপদসঙ্কুল স্থানে এনে রাখা ততোধিক নিকৃষ্ট এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়।"

সমাজ যাঁহাদের রক্ষা করিতে পারে না তাঁহাদের নির্য্যাতনের দায়িত্ব সমাজের, সেজন্য সমাজেরই কলঙ্কের ভাগী হওয়া উচিত এবং যাঁহারা অত্যাচারিতা হন, তাঁহারা যাহাতে আরও অত্যাচারের ও কলঙ্কের ভাগী না হন তাহা দেখিবার ভারও সমাজের। কিন্তু, ব্যাপার ঠিক উল্টা চলিতেছে, নির্লজ্জ সমাজ নিজের অক্ষমতার ফল অতি সহজে নির্য্যাতিতার ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করে। শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী বলিয়াছেন :—

...একজন অভাগিনী হিন্দুনারী অপহৃতা ও অত্যাচারিতা হলে শেষ পর্য্যন্ত তার পরিণামটা কি হয়? সে আর কোন দিনই তার আত্মীয় কুটুম্বের সমাজে স্বামী, পুত্র কন্যা, পিতা বা ভ্রাতা ভগিনীর গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায় না। স্বেচ্ছায় দূষিতা না হলেও চিরকালের জন্য কলঙ্কের দাগ তার অদৃষ্ট হতে মুছে না।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন এবার বড়দিনে রাঁচীতে অনুষ্ঠিত হইল। প্রবাসী বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে, প্রবাসী-বাঙ্গালী তাঁহাদের জন্মভূমির মধ্যে সংযোগ সাধনের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বাঙ্গালী জীবনের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য। সাহিত্য-সম্মিলন হিসাবেও ইহার মূল্য উপেক্ষনীয় নহে। জাতীয় ঐক্যের যতগুলি লক্ষণ ও উপায় আছে, ভাষার ঐক্যই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বাংলার যে প্রবাসী সন্তানেরা বাংলা হইতে বহুদূরে আছেন, বাংলার সহিত যাঁহাদের অন্য সর্ব্ব-প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, শুধু মাত্র ভাষাই আজও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী করিয়া রাখিয়াছে। সংযোগের এই একমাত্র সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিবার চেষ্টার এইজন্যই বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে।

এখানকার মূল ও বিভিন্ন শাখার সভাপতিরা ও বক্তারা প্রণিধানযোগ্য চিন্তাউদ্দীপক যে সকল কথা বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার সহিত একান্তভাবে জড়িত নানা সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবার তাহার উল্লেখ ও সমালোচনা সম্ভব

বাংলাদেশে ক্ষয়রোগের প্রভাব

রোগ ও অস্বাস্থ্য লইয়া আমাদের নিত্য ঘর করিতে হয় বলিয়া তাহার ভীষণতা ও অনিষ্টকর প্রভাব সম্পর্কে আমরা অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। নিবারণযোগ্য নানাবিধ রোগের বিস্তৃতি কমাইবার, ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার, প্রথম সুযোগেই প্রতিকারের জন্য তৎপর হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টাও স্বভাবতঃই শিথিল হইয়াছে। অথচ বিপদ যখন সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠে, অবহিত এবং সতর্ক হইবার দায়িত্বও তখন সর্ব্বাধিক হয়। নিজেদের স্বাস্থ্যবিধি নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার, অপরকে সে সম্বন্ধে সচেতন করিবার, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব যদি আমরা সকলেই পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার মধ্যেও যে আমরা কতকটা সুস্থ থাকিতে পারি তাহা নিঃসন্দেহ সত্য। দারিদ্র্য এবং ক্ষমতার অভাব অপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতা আমাদের ভোগ ও ব্যাধির জন্য কম দায়ী নহে। চিত্ত উদ্ভ্রান্তকারী নানা সমস্যা এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বহুবিধ কর্ম্মের আহ্বানের সম্মুখে এই প্রকার নীরস কর্ত্তব্যের আবেদন হয়ত কাহাকেও স্পর্শ করিবে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রতিযোগিতায় মহৎ প্রচেষ্টার এক কথায় সর্ব্বক্ষেত্রেই এই হীন স্বাস্থ্য আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানের সাধনায়

হউক, কর্ম্মের সাফল্যে হউক, মৌলিক চিন্তায় হউক, রাষ্ট্রিক নেতৃত্বে হউক, কোথায়ও যে বাঙ্গালীরা আজ বিশেষ শক্তির পরিচয় দিতে পারিতেছেন না, তাহার অন্যান্য অধিকতর শক্তিশালী কারণ থাকিলেও বাঙ্গালীর ক্রমবর্দ্ধমান রোগ-প্রবণতার অংশও তাহার মধ্যে কম নহে। এই দেশবাসীর হীনস্বাস্থ্য দেখিয়া এবং ইহাকেই সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচার-মূলক অবস্থা সম্পর্কে ইহাদের সহিষ্ণু মনোভাবের কারণ মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বেলসফোর্ড তাঁহার 'Rebel India পুস্তকে বলিয়াছেন, Rebel do not start life with Malarious spleens' ম্যালেরিয়ার প্লীহা লইয়া বিপ্লবীরা জীবন আরম্ভ করে না। উক্তিটির যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া, কালা আজর এবং সম্প্রতি বেরিবেরি আমাদের নিত্য ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে। অথচ, ইহার সকল গুলিই ব্যক্তিগত এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণ নিবারণযোগ্য। ক্ষয়রোগ যে দেশের মধ্যে মারাত্মক রূপে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং আমাদের জাতীয় জীবনের উপর যে তাহার ফল ভয়াবহ, একথাটা আমরা অনেকেই জানি এবং একথাও সত্য যে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ সতর্কতা এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনস্বরূপ সাবধানতা (যাহা আমরা কোথায়ও অজ্ঞতা বশতঃ, কোথায়ও সঙ্কোচ বশতঃ, কোথায়ও মমতা বশতঃ এবং কোথায়ও বা কতকটা অবহেলা বশতঃ সাধারণত লই না) এই ব্যাধির বিস্তার বহুল পরিমাণে রোধ করিতে সমর্থ হইবে।

বাংলার টিউবার-কিউলোসিস এসোসিয়েসনে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের পরিদর্শন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইহার ব্যাপকতা সম্বন্ধে বলেন, "বর্ত্তমানে বাংলায় প্রতি একলক্ষ লোকের মধ্যে এই রোগে বৎসরে দুই শত ব্যক্তির মৃত্যু হয়; অর্থাৎ বাংলাদেশে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ লোক এই রোগে প্রাণ দেয় এবং এই সংখ্যার দশগুণ অর্থাৎ দশলক্ষ লোক এই রোগে ভুগিয়া থাকে। এই সংখ্যা প্রকৃত অবস্থার পরিজ্ঞাপক না হইতে পারে, কারণ যক্ষ্মার ব্যাপকতা এবং তাহার মৃত্যুর হার সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাব বাংলা বা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের নাই।"

কিন্তু শুধু মাত্র সংখ্যা দেখিয়া ইহার ব্যাপ্তির সকল ভয়াবহ দিক বুঝা যাইবে না। অন্যান্য ব্যাধি সমাজের সর্ব্বস্তরে কতকটা সমভাবে বণ্টিত। ইহার বিস্তৃতি পল্লী অপেক্ষা সহরে অনেক অধিক। পল্লীগ্রামের রোগীদেরও অনেকে হয় সহর হইতে এই রোগ বাধাইয়া আনেন না হয় সহরবাসী রোগাক্রান্ত আত্মীয়দের নিকট হইতে রোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সমাজের অন্য কোন স্তর অপেক্ষা এই রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। অর্থাৎ সমগ্র জন সংখ্যার সহিত রোগাক্রান্তদের যে অনুপাতের কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে রোগ যে শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মাত্র তাহাদের সংখ্যা ধরিলে এই অনুপাত আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য অন্য যে শ্রেণীর লোকের যতই ভবিষ্য সম্ভাবনা থাকুক, বর্ত্তমান পর্য্যন্ত—অদূর ভবিষ্যতের পক্ষেও একথা সত্য—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সকল প্রকার মঙ্গল প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন এবং পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যম এবং কর্ম্মশক্তি এই এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে জাতীয় জীবন যে অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহার পর যদি বয়সের কথা বিবেচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে তরুণ বয়স্কেরাই এবং তাঁহাদের মধ্যেও আবার মেয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ইহার কবলে পতিত হন। তরুণ বয়স্কদের এইরূপ অকাল মৃত্যু অথবা অকর্ম্মণ্য জীবন—তাহাও আবার বিশেষ করিয়া মেয়েদের যে, রোগীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের দিক দিয়া সবিশেষ করুণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের যুবশক্তির এই শোচনীয় ক্ষয়ের ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে যে কতকটা মারাত্মক হইতেছে সে হিসাবটাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। ডাঃ রায় এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "কিন্তু যাহা আমাদিগকে আতঙ্কে অভিভূত করিতেছে তাহা শুধু মাত্র সংখ্যা নহে। বাংলার টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েসন যে সীমাবদ্ধ অনুসন্ধান চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কুড়ি হইতে তিরিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং এই রোগে আক্রান্তও

হইয়া থাকেন সর্ব্বাপেক্ষা এই বয়সের লোকেরা বেশী; এবং যেখানকার সংখ্যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সেই কলিকাতা সহরের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে এই বয়সের মেয়েদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা একই বয়সের পুরুষদের অপেক্ষা পাঁচগুণ।"

ঐই বয়সের মেয়েদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়ায় ইহার বিস্তৃতিও দ্রুততর হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া যদি ইহাদের শিশু সন্তানসন্ততি থাকে। এই সকল সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রামিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং যাহাদের মধ্যে রোগলক্ষণ দৃষ্ট নাও হয় তাহাদেরও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য আশাপ্রদ নহে

ব্যক্তিগত এবং সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা ক্ষয়রোগ বিস্তারের আংশিক প্রতিরোধ যদিও সম্ভব তবুও এ সম্পর্কে প্রয়োজনানুরূপ ফলপ্রদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা একমাত্র সরকারেই আছে। অথচ, এই জীবন-মরণ সমস্যা সমাধানে সরকার পক্ষ হইতে প্রায় কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যেখানে প্রতি বৎসর এই রোগে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় এবং দশলক্ষ লোক ভুগিয়া থাকে সেই বাংলাদেশে মাত্র ২৮০র মত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাহাও আবার অধিকাংশস্থলে এই সকল প্রতিষ্ঠান বে-সরকারী। ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ গত সত্তর বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার প্রতি লক্ষে ৩৩০ হইতে ৭৬ এ নামিয়াছে এবং গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ২০০ হইতে ৭৬ হইয়াছে।

শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার

আমাদের শিক্ষাবিধানের নানাবিধ দোষত্রুটী আছে। কিন্তু বিদেশী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষাদানের প্রথা যে অসাফল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ সে সম্বন্ধে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তাহা হইলেও কোন নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে লোকের মনে শঙ্কা স্বাভাবিক। সেই জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত নূতন ব্যবস্থার (মাতৃভাষায় শিক্ষাদান) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক লোকের মনে দ্বিধা রহিয়া গিয়াছে। যদিও এই নব প্রবর্ত্তিত বিধানে ছাত্রদের ইংরাজী জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার এবং বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে তবুও, অনেকের এই আশঙ্কা আছে যে ইহাতে ছাত্রদের ইংরাজীজ্ঞান অপুষ্ট থাকিয়া যাইবে, দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা ভাল হইবে না এবং ইংরাজী ভাল না শিখিবার ফলে আমাদের মানসিক শক্তি এবং কৃষ্টি প্রভৃতি উচ্চতর জিনিসের অবনতি ঘটিবে। এ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তিনজন মনীষির সম্পূর্ণ আধুনিক উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর পণ্ডিত ইকবাল নারায়ণ গুর্ট্টু ২৭শে ডিসেম্বর এ সম্পর্কে বলিয়াছেন :-

"আমাদের শিক্ষাবিধানে মাতৃভাষাকে যে নিম্নস্থান দান করা হইয়াছে এবং শিক্ষার বাহনরূপে যে মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করা হইয়াছে তাহার অস্বাভাবিকত্ব, যে কোন বিদেশী সংস্কারমুক্ত চিত্তে সমস্যাটিকে দেখিবেন তাঁহারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; কিন্তু, অভ্যাসের ফলে আমরা শান্তভাবে ইহাকে মানিয়া লইয়াছি এবং সহিয়া যাইতেছি। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এই প্রকার নিতান্ত ত্রুটীযুক্ত শিক্ষা বিধানের ফলে শিক্ষিতশ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৫ই ডিসেম্বর নাগপুর সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"জাতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধান সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই সকল ভাষাকেই আমরা শিক্ষার বাহন করিব এবং ইহাদেরই সাহায্যে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে দূরদূরান্তরে বিস্তৃত করিব—বিদ্বজ্জনোচিত এবং সাধারণের উপযোগী—এই উভয়রূপেই করিব।

বর্ত্তমান শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক দৈন্যের তুলনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মানসিক শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ হইবার প্রধান কারণ স্বরূপে শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সাপরু পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় বলিয়াছেন (২২শে ডিসেম্বর) :—

"সর্ব্বোপরি তাঁহাদের কৃষ্টির বাহন ছিল তাঁহাদের নিজেদের ভাষা। বিদেশী ভাষা শিক্ষায় আমি প্রতিবাদ

করিতেছি বা সেই প্রকারের ইঙ্গিত করিতেছি, এই কথা মনে করিয়া যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। আমি বাস্তবিক পক্ষে মনে করি যে, যত বেশী বিদেশী ভাষা আমরা শিখি, আমাদের মনের প্রসারতার পক্ষে ততই ভাল; কিন্তু, এ কথা আমি ভুলিতে পারি না যে, কৃষ্টিমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি আমাদের নিজেদের ভাষাতেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং একমাত্র তাহাই হইতে পারে। আজ যদি ঠাকুর ও ইকবাল বড় হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা আমাদের কৃষ্টি সম্পদে চিরন্তন কিছু দান করিয়া থাকেন যদি তাঁহারা আমাদের চিন্তা উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন যাহা সময় সময় আমাদিগকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায় সেই উচ্চতর এবং সূক্ষ্মতর হৃদয়বৃত্তি জাগ্রত করিয়া থাকেন তবে তাহা এইজন্যই সম্ভব হইয়াছে যে তাঁহারা বাংলা ও উর্দ্দুতে তাহাদের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। একটা গোটা জাতিকে যেমন বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত করিয়া তুলা সম্ভব নহে, তেমনই অপর জাতির ভাষায় কোন জাতির কৃষ্টির উন্নতি সম্ভব নহে।

জাপানপ্রবাসী ভারতীয়দের নূতন দৃষ্টান্ত

ধর্ম্মোৎসবের মধ্য দিয়া নূতন কোন প্রেরণা লাভ করিবার দিন হয়ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও যেরূপ রেষারেষি চলে, নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া আমরা যে প্রকার অশোভন আস্ফালনে মত্ত হই, বহুস্থলে উৎসবক্ষেত্র যেরূপ রণক্ষেত্রে পরিণত হয় তাহাতে জাপানের কোবে ও ওসাকা প্রবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ পার্শী প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভারতীয়েরা যে একত্রে জাতীয় উৎসব রূপে ইণ্ডিয়া ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান সোসাল ক্লাব-এর মিলিত উদ্যোগে দীপালী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা যেমন আশা ও আনন্দের কথা তেমনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে শিক্ষার কথা। এই উপলক্ষে ইঁহারা একত্রে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবগুলিও ইঁহারা এই ভাবে সম্পন্ন করিবেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার নববিধান

আগামী ১৯৪০ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বহুদিন পূর্ব্বে সঙ্কলিত নববিধান অনুযায়ী হইবে। ইহাতে ভূগোল, ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল নূতন বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণতর হইবে। প্রবর্ত্তিত বিধানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে যে এক ইংরাজী ব্যতীত অন্য সকল বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিখান হইবে। দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকাদিও অনুমোদিত হইয়া বাহির হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তনে '৪০ এর পরেও অবশ্য ২।৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে পড়িবার সুযোগ পাওয়ায় ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয় শিখিবার সময় অকারণ মানসিক নিষ্পেষণের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইবেন, ইংরাজীর চাপ হইতে মুক্তি পাইয়া ছাত্রেরা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবেন।

প্রবেশিকার ছাত্রদের ইংরাজী জ্ঞান সাধারণতঃ এতটা হয় না যাহাতে তাঁহারা সহজে ইংরাজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন অথবা অতি সহজে এই ভাষা বুঝিতে পারেন। ফলে পাঠ্য প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদিগকে বাহন ইংরাজীর প্রতি এত মনোযোগ দিতে হয়, অনেকস্থলে কণ্ঠস্থ করিতে এত যত্ন লইতে হয় যে, মূল বিষয় নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া বুদ্ধি অপেক্ষা স্মৃতিশক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে হয় এবং ফলে বুদ্ধি এবং ঔৎসুক্য নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইলে শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুতর ত্রুটি সংশোধিত হইয়া ছেলেদের মধ্যে মানসিক সক্রিয়তা দেখা দিবে আশা করা যাইতেছে। অবশ্য শিক্ষার উচ্চতর বিভাগেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইলে পূর্ণ সুফল কখনও পাওয়া যাইবে না।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও ইংরাজী শিক্ষার যে প্রধান স্থান রাখা হইয়াছে তদপেক্ষা তাহাকে গৌণস্থান দান করা অধিকতর লাভের হইবে কি না, সাধারণ ছাত্রের জন্য সাহিত্যিক ইংরাজীর পরিবর্ত্তে কাজের উপযোগী ইংরাজী শিক্ষাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিতদের

অধিকাংশ লোক ইংরাজী সাহিত্যের কোন ধার ধারেন না ও ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হন নাই এবং ইংরাজী সাহিত্যের চাপে পড়িয়া যাঁহাদের স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। যে ইংরাজীর জ্ঞান আমাদের সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য তাহা ব্যবহারিক ইংরাজী। সাহিত্যের দ্বারা প্রতিভাবান ছাত্রেরাই মাত্র লাভবান হইতে পারেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদেশী ভাষাকে এতটা প্রাধান্য দান একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব হইয়াছে।.

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান হইলেও প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে হইবে। ইহাতে ইংরাজীতে অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা হইবে। ইংরাজী শিক্ষার বাহন থাকার একটা বিশেষ করুণাত্মক দিক এই ছিল যে ইংরাজী না জানার ফলে গণিতের ভাল ছাত্রকেও অঙ্কের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতে হইত। প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে হইলে এই অসুবিধা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর

শ্রীযুক্ত এ, এফ, রহমানের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে অধ্যাপক ও ইতিহাস বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ডাঃ মজুমদার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণা করিয়া এবং সে সম্বন্ধে মূল্যবান পুস্তকাদি লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৮ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন এবং বৃহত্তর ভারত সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য জাভা ও বালি গমন করেন। ইনি ১৯২৬ এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাচ্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। ঢাকায় একসিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম অধ্যাপক সদস্যরূপে এবং প্রথম ডিন-অফ-দি-ফ্যাকালটি-অব-আর্টস-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

একভাষা কি এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ

ভারতবর্ষে বহুভাষা প্রচলিত বলিয়া ভারতবাসীদের জাতীয়তার দাবী ভুয়া এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী বহুজাতি অধ্যুষিত মহাদেশ বিশেষ এই কথা বলিয়া ভারত বিদ্বেষীরা ভারতবর্ষের ঐক্যের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে দুই শতাধিক ভাষার প্রচলন থাকিলেও, অর্দ্ধেকের উপর ভারতবাসীর মাতৃভাষা হিন্দী ও বাংলা এবং পরস্পর নিকট সম্বন্ধযুক্ত আর্য্যগোষ্ঠির কয়েকটি ভাষার মধ্যে অধিকাংশ ভারতবাসীর মাতৃভাষা সীমাবদ্ধ। কিন্তু, একভাষা যদি এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ হইত তবে ছোটখাট ২১টি দেশের কথা বাদ দিলেও, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী দেশও জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারও পাইত না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার ভাষাসমস্যা সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,—"ভাষা ও বংশের একত্ব কি জাতীয়তার একমাত্র প্রমাণ? এখানে আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ অসংখ্য জাতির লোক এবং তাঁহারা বহুভাষা বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ বহু সংখ্যক জাতিক, ভাষিক এবং রাজনীতিক দলে বিভক্ত। তাই বলিয়া আমেরিকা কি একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইবে না?

এই মাসে সভাপতি নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে এই দেশে বিদেশী ভাষায় ৮০০শত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা আছে। এই ৮০০ পত্রিকা ৩২টি ভাষা ও উপ-ভাষায় ছাপা হয় এবং ইহাদের মোট প্রচারসংখ্যা প্রায় এক কোটি। বিদেশে যাহাদের জন্ম হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক ইংরাজী ভাষাভাষী দেশসমূহ হইতে আসিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশী ভাষা বলেন তাঁহাদের মধ্যে জার্ম্মানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এক বার্লিন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য যে-কোন সহর অপেক্ষা চিকাগোতে জার্ম্মানদের সংখ্যা অধিক এবং একমাত্র ওয়ারসই চিকাগোর পোলদের সংখ্যা অতিক্রম করিতে পারে। পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা একমাত্র নিউ ইয়র্ক সহরেই ইহুদী ভাষাভাষী ইহুদীর সংখ্যা অধিক। ভিন্ন

করিতেছি বা সেই প্রকারের ইঙ্গিত করিতেছি, এই কথা মনে করিয়া যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। আমি বাস্তবিক পক্ষে মনে করি যে, যত বেশী বিদেশী ভাষা আমরা শিখি, আমাদের মনের প্রসারতার পক্ষে ততই ভাল; কিন্তু, এ কথা আমি ভুলিতে পারি না যে, কৃষ্টিমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি আমাদের নিজেদের ভাষাতেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং একমাত্র তাহাই হইতে পারে। আজ যদি ঠাকুর ও ইকবাল বড় হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা আমাদের কৃষ্টি সম্পদে চিরন্তন কিছু দান করিয়া থাকেন যদি তাঁহারা আমাদের চিন্তা উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন, যাহা সময় সময় আমাদিগকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায় সেই উচ্চতর এবং সুক্ষ্মতর হৃদয়বৃত্তি জাগ্রত করিয়া থাকেন তবে তাহা এইজন্যই সম্ভব হইয়াছে যে তাঁহারা বাংলা ও উর্দ্দুতে তাঁহাদের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। একটা গোটা জাতিকে যেমন বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত করিয়া তুলা সম্ভব নহে, তেমনই অপর জাতির ভাষায় কোন জাতির কৃষ্টির উন্নতি সম্ভব নহে।

জাপানপ্রবাসী ভারতীয়দের নূতন দৃষ্টান্ত

ধর্ম্মোৎসবের মধ্য দিয়া নূতন কোন প্রেরণা লাভ করিবার দিন হয়ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও যেরূপ রেষারেষি চলে, নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া আমরা যে প্রকার অশোভন আস্ফালনে মত্ত হই, বহুস্থলে উৎসবক্ষেত্র যেরূপ রণক্ষেত্রে পরিণত হয় তাহাতে জাপানের কোব ও ওসাকা প্রবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ পার্শী প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভারতীয়েরা যে একত্রে জাতীয় উৎসব রূপে ইণ্ডিয়া ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান সোসাল ক্লাব-এর মিলিত উদ্যোগে দীপালী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা যেমন আশা ও আনন্দের কথা তেমনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে শিক্ষার কথা। এই উপলক্ষে ইঁহারা একত্রে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবগুলিও ইঁহারা এই ভাবে সম্পন্ন করিবেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার নববিধান

আগামী ১৯৪০ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বহুদিন পূর্ব্বে সঙ্কল্পিত নববিধান অনুসারে হইবে। ইহাতে ভূগোল, ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল নূতন বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণতর হইবে। প্রবর্ত্তিত বিধানের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে যে এক ইংরাজী ব্যতীত অন্য সকল বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিখান হইবে। দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকাদিও অনুমোদিত হইয়া বাহির হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তনে '৪০ এর পরেও অবশ্য ২।৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হইবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে পড়িবার সুযোগ পাওয়ায় ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয় শিখিবার সময় অকারণ মানসিক নিষ্পেষণের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাইবেন, ইংরাজীর চাপ হইতে মুক্তি পাইয়া ছাত্রেরা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবেন।

প্রবেশিকার ছাত্রদের ইংরাজী জ্ঞান সাধারণতঃ এতটা হয় না যাহাতে তাঁহারা সহজে ইংরাজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন অথবা অতি সহজে এই ভাষা বুঝিতে পারেন। ফলে পাঠ্য প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদিগকে বাহন ইংরাজীর প্রতি এত মনোযোগ দিতে হয়, অনেকস্থলে কণ্ঠস্থ করিতে এত যত্ন লইতে হয় যে, মূল বিষয় নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া বুদ্ধি অপেক্ষা স্মৃতিশক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে হয় এবং ফলে বুদ্ধি এবং ঔৎসুক্য নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইলে শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুতর ত্রুটি সংশোধিত হইয়া ছেলেদের মধ্যে মানসিক সক্রিয়তা দেখা দিবে আশা করা যাইতেছে। অবশ্য শিক্ষার উচ্চতর বিভাগেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইলে পূর্ণ সুফল কখনও পাওয়া যাইবে না।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও ইংরাজী শিক্ষার যে প্রধান স্থান রাখা হইয়াছে তদপেক্ষা তাহাকে গৌণস্থান দান করা অধিকতর লাভের হইবে কি না, সাধারণ ছাত্রের জন্য সাহিত্যিক ইংরাজীর পরিবর্ত্তে কাজের উপযোগী ইংরাজী শিক্ষাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিতদের

অধিকাংশ লোক ইংরাজী সাহিত্যের কোন ধার ধারেন না ও ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হন নাই এবং ইংরাজী সাহিত্যের চাপে পড়িয়া যাঁহাদের স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। যে ইংরাজীর জ্ঞান আমাদের সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য তাহা ব্যবহারিক ইংরাজী। সাহিত্যের দ্বারা প্রতিভাবান ছাত্রেরাই মাত্র লাভবান হইতে পারেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদেশী ভাষাকে এতটা প্রাধান্য দান একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান হইলেও প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে হইবে। ইহাতে ইংরাজীতে অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা হইবে। ইংরাজী শিক্ষার বাহন থাকার একটা বিশেষ করুণাত্মক দিক এই ছিল যে ইংরাজী না জানার ফলে গণিতের ভাল ছাত্রকেও অঙ্কের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতে হইত। প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে হইলে এই অসুবিধা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর

শ্রীযুক্ত এ, এফ, রহমানের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে অধ্যাপক ও ইতিহাস বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ডাঃ মজুমদার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণা করিয়া এবং সে সম্বন্ধে মূল্যবান পুস্তকাদি লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৮ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন এবং বৃহত্তর ভারত সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য জাভা ও বালি গমন করেন। ইনি ১৯২৬ এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাচ্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। ঢাকায় একসিকিউটিভ কাউন্‌সিলের প্রথম অধ্যাপক সদস্যরূপে এবং প্রথম ডিন-অফ-দি-ফ্যাকালটি-অব-আর্টস-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

একভাষা কি এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ

ভারতবর্ষে বহুভাষা প্রচলিত বলিয়া ভারতবাসীদের জাতীয়তার দাবী ভুয়া এবং পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী বহুজাতি অধ্যুষিত মহাদেশ বিশেষ এই কথা বলিয়া ভারত বিদ্বেষীরা ভারতবর্ষের ঐক্যের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে দুই শতাধিক ভাষার প্রচলন থাকিলেও, অর্দ্ধেকের উপর ভারতবাসীর মাতৃভাষা হিন্দী ও বাংলা এবং পরস্পর নিকট সম্বন্ধযুক্ত আর্য্যগোষ্ঠির কয়েকটি ভাষার মধ্যে অধিকাংশ ভারতবাসীর মাতৃভাষা সীমাবদ্ধ। কিন্তু, একভাষা যদি এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ হইত তবে ছোটখাট ২।১টি দেশের কথা বাদ দিলেও, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী দেশও জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারও পাইত না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার ভাষাসমস্যা সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিতেছেন,—"ভাষা ও বংশের একত্ব কি জাতীয়তার একমাত্র প্রমাণ? এখানে আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ অসংখ্য জাতির লোক এবং তাঁহারা বহুভাষা বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ বহু সংখ্যক জাতিক, ভাষিক এবং রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। তাই বলিয়া আমেরিকা কি একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইবে না?

এই মাসে সভাপতি নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে এই দেশে বিদেশী ভাষার ৮০০শত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা আছে। এই ৮০০ পত্রিকা ৩২টি ভাষা ও উপ-ভাষায় ছাপা হয় এবং ইহাদের মোট প্রচারসংখ্যা প্রায় এক কোটি। বিদেশে যাহাদের জন্ম হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক ইংরাজী ভাষাভাষী দেশসমূহ হইতে আসিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশী ভাষা বলেন তাঁহাদের মধ্যে জার্ম্মানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এক বার্লিন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য যে-কোন সহর অপেক্ষা চিকাগোতে জার্ম্মানদের সংখ্যা অধিক এবং একমাত্র ওয়ারসই চিকাগোর পোলদের সংখ্যা অতিক্রম করিতে পারে। পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা একমাত্র নিউ ইয়র্ক সহরেই ইহুদী ভাষাভাষী ইহুদীর সংখ্যা অধিক। ভিন্ন

বংশোদ্ভূত আমেরিকার নাগরিকেরা তাহাদের পিতৃপুরুষের ভাষা পরিত্যাগ করিতেও রাজী নহে। যুক্তরাষ্ট্রে ইটালিয়ান ভাষার ১৪৯ খানা জার্ম্মান ভাষার ১৩৪ খানা ইহুদী ভাষার ৮২ খানা, পোলিস ভাষার ৮০ খানা, স্পেনিস ভাষার ৭১ খানা পত্রিকা আছে। দৈনিক সিরীয় এবং আরবী ভাষার পত্রিকাও আছে।

'লিটারারি ডাইজেস্ট'এর বিবরণ অনুসারে গত সভাপতি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে গণতন্ত্রীদল শত শত স্থান হইতে ১৬টি ভাষায় রেডিওতে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সতেরটি ভাষায় ৩০ লক্ষ প্রচারপত্র ছাপিয়াছিলেন। সাধারণতন্ত্রীদল ও ২২টি ভাষাভাষী দলের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় শত শত বক্তৃতা রেডিও সাহায্যে প্রচার করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ অদ্ভুত হরফে হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করিয়াছিলেন।

বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের প্রচারসংখ্যা বিপুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে নিউ ইয়র্কের বিউইস্ ডেলি ফরওয়ার্ডের পাঠকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার; ফিলাডেলফিয়ার একখানি ইটালীয় সংবাদপত্রের ৬৩ হাজার; নিউ ইয়র্কের একখানা জার্ম্মান সংবাদপত্রের ৫৭ হাজার প্রভৃতি।"

অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রচারিত বিদেশীভাষার শত শত সংবাদপত্র আছে। ইহাদের প্রচার অল্প হইলেও প্রতিপত্তি কম নহে।

রাশিয়ায় শস্য সম্পর্কীয় গবেষণ

" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ডাঃ জে. সি, ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রাশিয়ায় শস্য সম্পর্কীয় গবেষণায় সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের যে অসামান্য কৃতিত্বের কথা বলিয়াছেন তাহাতে আশা হয় যে কৃষিজগতে অচিরে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। একপ্রকার আবহাওয়ার শস্য অন্য প্রকার আবহাওয়ায় উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং বর্ত্তমানে শস্যোৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বহু বিস্তৃত ভূখণ্ডে শস্যোৎপাদন সম্ভব হইবে।

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে শস্যের বৃদ্ধি অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত এবং পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উত্তাপ ও আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শস্যকে ভ্রূণাবস্থাতে বীজাভ্যন্তর হইতেই ইহার কয়েকটি স্তর অতিক্রম করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অনেকটা সময় বাঁচিয়া যায়। বৎসরের অধিকাংশ সময় রাশিয়ার ক্ষেত্রসমূহ বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সময়ের সহিত দৌড়ের পাল্লা দিয়া তবে এখানে চাষ করিতে হয়। যে সকল স্থান মাত্র গ্রীষ্মের চারি মাস বরফমুক্ত থাকে এমন ক্ষেত্রেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত বীজের দ্বারা ভাল গমের ফসল পাওয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ দেশসমূহের হ্রস্ব শীতের দিনের ফসলগুলি এখন রাশিয়ার দীর্ঘ দিন বিশিষ্ট গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন করা সম্ভব হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে অঙ্কুর অবস্থাতেই প্রয়োজনানুরূপ অন্ধকারে রাখিয়া দিলে পরে নিরবচ্ছিন্ন আলোকের মধ্যে উহারা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল শস্যের চাষ রাশিয়ায় কল্পনাতীত ছিল, বর্ত্তমানে তুহিন মণ্ডলের মধ্যেই ভালভাবে সে সকলের চাষ হইতেছে। অঙ্কুরোদগম হইতে শস্য পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত সময়কেও হ্রস্ব করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং আলু সোয়াবিন প্রভৃতি ফসলে এ দিক দিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের ফলে, বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল স্বল্পস্থায়ী আবহাওয়ার মধ্যে ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব হইতেছে এবং পূর্ব্বে যে জলবায়ু কোন বিশেষ শস্যের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই শস্যের বীজকে সেই জলবায়ুর উপযোগী করিয়া লওয়া হইতেছে। ইহাতে ইউরোপ ও এসিয়ার উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ শস্যহীন ভূখণ্ডের পক্ষে বিপুল শস্য সম্ভাব্যতা দেখা দিয়াছে এবং নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত শক্তিমান জাতি এই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহার বিজ্ঞানের শক্তি লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

চীনে উচ্চ শিক্ষা

চীনের নানাপ্রকার জটিল অন্তর্বিপ্লব, নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি এবং সাধারণ নিরাপত্তার অভাব সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের

পুনর্গঠনের জন্য সমগ্র মহাচীন ব্যাপিয়া যে বিপুল প্রয়াস চলিয়াছে তাহার প্রমাণ শুধু রাজনৈতিক চেষ্টার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই। সদাবর্ত্তমান অশান্তির মধ্যেও যে দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে এবং আধুনিক শিক্ষার সকল বিভাগেরই যে চর্চ্চা চলিতেছে ইহা এই দেশের অধিবাসীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, দৃঢ়চিত্ততা এবং কর্ম্মকুশলতার সূচনা করে। নানকিংএর 'মিনিস্ট্রি-অব-এডুকেশন" কর্ত্তৃক সংগৃহীত উচ্চশিক্ষার হিসাবে প্রকাশ :—

বিশ্ববিদ্যালয় : জাতীয়, ১৩ ; প্রাদেশিক, ৯ ; বেসরকারী, ১৯ ; মোট, ৪১।

স্বতন্ত্র কলেজ : জাতীয়, ২ ; প্রাদেশিক, ১৩ ; জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ৫ ; বেসরকারী, ১০ ; মোট ৩০।

বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা : আইন এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞান, ১৬৪৮৭ ; সাহিত্য ও দর্শন ১০,০৬৬ ; শিক্ষা ৩,২৩১ ; বাণিজ্য ২,১৫৬ ; এনজিনিয়ারিং ৪,০৮৪ ; জাতীয় বিজ্ঞান ৩,৭৩০ ; চিকিৎসা ১,৮০০ ; কৃষি ১৪১৩ ; মোট ৪৪,১৬৭।

গ্রাজুয়েটদের মানসিক উৎকর্ষ

আমাদের গ্রাজুয়েটদের মানসিক উৎকর্ষ যে আশানুরূপ নহে তাহার দায়িত্ব তাঁহাদের নহে। শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ ক্রটি, বিশেষ করিয়া শিক্ষার বাহন হিসাবে বিদেশী ভাষার ব্যবহার, দারিদ্র্য, উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাব প্রভৃতি নানা কারণ ইহার জন্য দায়ী হইলেও এই তথ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমাদের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে মানসিক উৎকর্ষ আশানুরূপ নহে। একথা শুধু বাংলার পক্ষে নহে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পক্ষেও সত্য। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় সার তেজ বাহাদুর এ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"একথা আমি অনুভব না করিয়া পারি না যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রাজুয়েটদের পক্ষে অত্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একথা মনে করা ভুল হইবে যে, তিন চারি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁহারা যে শিক্ষা পাইয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের গভীর প্রকৃতির অংশ হইয়া যায়। নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্র ব্যতীত ইঁহাদের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধনশীল নহে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিত্যাগের সাথে সাথেই ইহার বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় এবং শীঘ্রই সজীবতা হারাইয়া ইহা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। অনেকের সম্পর্কেই এ দাবী আর করা যায় না যে তাঁহাদের সদা জাগ্রত বুদ্ধির কৌতূহলের ন্যায় কোন কিছু আছে। তাঁহাদের জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে, এবং সমসাময়িক যে সকল মস্তিষ্কের শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া লোকে মহৎ চিন্তায় এবং বৃহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে সেই সকল শক্তি ও তাঁহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী সংযোগ থাকে না ; শিল্প কলা, কবিতা ও নাটক তাঁহাদের মনের কাছে কোন দুর্নিবার আবেদন লইয়া আসে না।"

ডাঃ কালিদাস নাগ

ডাঃ কালিদাস নাগ আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট'এ প্রথম ভারতীয় পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে হনলুলুতে বক্তৃতা দিবার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এসিয়ার সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারসাধন ও উক্ত বিষয় অধ্যয়নে এই ইনস্টিটিউট আত্মনিয়োগ করিবেন। ডাঃ নাগ ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে রোম, হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া পেনসিলভানিয়া চিকাগো, কালিফোর্নিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন।

স্বাস্থ্যহীনতা ও জনসাধারণের ঔদাসীন্য

যদিও রাজনৈতিক পরাধীনতা, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য প্রভৃতি অন্য সকল দুঃখের জন্য দায়ী এবং ইহার মধ্যে আবার দারিদ্র্য অন্যান্য দুঃখের মূল এবং যদিও পরাধীনতা ও দারিদ্র্য না ঘুচিলে অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দূর হইবে না তবুও বর্ত্তমান অবস্থায়ও চেষ্টার দ্বারা ইহার প্রত্যেকটিরই আংশিক প্রতিকার সম্ভব এবং ইহার একটির সহিত অন্যটির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট যে একের প্রতিকার অপরের প্রতিকারে সহায়তা করে এবং একের বৃদ্ধি অপরের প্রতিকার দুষ্কর করিয়া তুলে। যে রাজনৈতিক পরাধীনতা ও দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, সংঘবদ্ধতার অভাব প্রভৃতির জন্য দায়ী, সেই

পরাধীনতা ও দারিদ্র্য দূর করিবার পথেও এই সকল দুর্বলতাই আবার প্রধান অন্তরায়; এবং আমরা যদি চেষ্টা করিয়া বর্তমান দুরবস্থার মধ্যেও অপেক্ষাকৃত সুস্থ, শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ হইতে পারি তবে তাহার ফল আমাদের রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক জীবনেও প্রতিফলিত হইবে। আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা যেখানে গিয়া ঠেকিয়াছে, আমরা যেরূপ রোগপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছি, এবং নানাপ্রকারের রোগ দেশে যেভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যথোচিত মনোযোগী হইতে না পারিলে, অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে সফলতা লাভ আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িবে। দেশের এই স্বাস্থ্যহীনতা সম্বন্ধে জনসাধারণের ঔদাসীন্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতি রাও বাহাদুর বি-এন-ব্যাস করাচীতে তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"সাধারণের স্বাস্থ্য এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যা সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ অতি অল্পই মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা রাজনৈতিক গোলমাল লইয়া এত ব্যস্ত যে জীবনের পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় এই ব্যাপারটিকে তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে দিয়াছেন। তাঁহারা শঙ্কাজনক শিশুমৃত্যুর মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের সদাবর্তমান বহুসংখ্যক স্থানীয় ও সংক্রামক ব্যাধির এবং মৃত্যু, রোগ ও অপরিচ্ছন্নতার আবহাওয়ার কথা ভুলিয়া আছেন। শারীরিক স্বাস্থ্যে দুর্বল কোন জাতি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইতে পারে না। আমরা যতক্ষণ এই নিদারুণ অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতেছি ততক্ষণ প্রাচীন সভ্যতা এবং গৌরবময় অতীতের জন্য গর্ব করা নিতান্তই অর্থহীন। যদি আমরা জগতের জাতিসমূহের মধ্যে সমান মর্য্যাদার দাবী লইয়া বাঁচিতে চাই তবে আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের মানকে অন্যান্য সভ্য দেশের সমান করিয়া তুলিতে হইবে।"

রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতি যে কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত কথাগুলি মূলত সত্য। আমরা যদি রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আরও অধিক সচেতন হইতে পারিতাম তবে আমাদের অন্য সকল দুরবস্থা দূর হইতে পারিত এবং এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবুও অন্য কিছু করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিলে দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে।

এদেশে ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসা

এ দেশে ঔষধ প্রস্তুতের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে যেমন উপযুক্ত শিক্ষাবিশিষ্ট অনেক বেকার যুবক কাজ পাইয়া যাইতে পারেন তেমনই দেশের অনেকটা টাকা দেশে থাকিয়া যাইতে পারে। এ বিষয়টির প্রতি নিখিল ভারত মেডিক্যাল কন্‌ফারেনসের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে এবং মেডিক্যাল কলেজ-রি-ইউনিয়ন ভেষজ প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে কলিকাতার মেয়র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাসায়নিক ও নার্কোটিক জাতীয় ঔষধ বাদ দিয়া ভারতবর্ষে বৎসরে বিদেশ হইতে দুই কোটি টাকার উপর ঔষধ আমদানী হয় এবং ইহার অনেকগুলি একেবারেই অকেজো। হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং পটাসিয়াম পার্ম্যাগানেট প্রভৃতির ন্যায় নিতান্ত সাদাসিধা ঔষধ বিপুল পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। অথচ, অনায়াসে এ সব দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। দেশজ ঔষধপত্র সম্বন্ধে গবেষণারও বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহার গবেষণা এবং ঔষধাদি প্রস্তুত হইলে একদিকে যেমন ভারতীয় ফারমাকোপীয়া গড়িয়া উঠিবে তেমনই চিকিৎসার বর্তমান দুর্মূল্যতা কমিয়া যাইবে।

আমেরিকান মহিলার রাশিয়ার অভিজ্ঞতা

পৃথিবীতে সর্বত্র প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অভিনব পরীক্ষায় রাশিয়া ব্যাপৃত আছে। তাঁহার এই নূতন অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে এত পরস্পর বিরোধী বিবরণ আমরা পাইয়া থাকি যে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহ রহিয়া যায়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অসঙ্কোচ বিরুদ্ধ প্রচারের ফলেই লোকের কাছে রাশিয়া এই প্রকার রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি

মিসেস গ্রেস হিলইয়ার্ড নাম্নী শিশু শিক্ষাবিদ একজন আমেরিকান মহিলা পৃথিবীর প্রতিনিধিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তিনি ইউনাইটেড প্রেসের নিকট তাঁহার রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি সেখানে কাহারও বিষন্ন মুখ দেখেন নাই, কাহাকেও অভিযোগ করিতে শুনেন নাই, কাহাকেও অলস দেখেন নাই, কাহাকেও ক্ষুধার্ত্ত দেখেন নাই। সকলের মুখেই আনন্দের জ্যোতি দেখিয়াছেন, শিক্ষার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা এবং অদ্ভুত প্রসার দেখিয়াছেন, সাম্যের নূতন জগৎ দেখিয়াছেন। রাশিয়ার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"রাশিয়ার প্রতি ব্যক্তি, এমন কি দীন-দরিদ্রের মুখেও যে প্রদীপ্ত আনন্দের জ্যোতি দেখিয়া আসিয়াছি তাহাই আমার গত গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার স্বল্পকাল অবস্থান করিবার সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্মৃতি। লেনিনগ্রাড ও মস্কোর রাস্তায় যাহারা ভীড় করে তাহারা সাধারণতঃ দরিদ্র; তাহারা ছুটাছুটি করিয়া এমনভাবে তাহাদের কঠিন শ্রমসাধ্য কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করিতেছে, যেন তাহারা দুগ্ধ ও মধু প্লাবিত রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া সেখানে ছুটিতেছে। আমি একটি বিষন্ন মুখের কথাও স্মরণ করিতে পারি না।"

এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার বিপুলতায় ও অভিনবত্বে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—"আমরা লেনিনগ্রাড মস্কো এবং কিভ'এর শিক্ষা ও বিশ্রামের পার্ক দেখিলাম। ইহার প্রত্যেকটি পার্ক হইতে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমি এখানে প্রথম দেখিলাম যে তরুণদিগের শিক্ষার উপযোগী সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। এখানকার শিক্ষা কোন প্রত্যাশিত সমাজের উপযোগী হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রস্তুত হইবার জন্য নহে। এই পার্কগুলি এক একটি নগর বিশেষ, বিভিন্ন দলের জন্য এখানে অসংখ্য প্রকার কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানে যান্ত্রিক শিক্ষার জন্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এবং শরীর চর্চ্চার জন্য এমন বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, এমনভাবে যন্ত্রাদি ও উপদেষ্টার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, গৃহাদি এমন সজ্জিত হইয়াছে যাহার কাছাকাছিও অন্য কোন দেশে দেখি নাই।...এই পার্কগুলি পরীক্ষামূলক অবস্থা পার হইয়াছে। ইহারা বিরল নহে। এগুলি শত শত নহে সহস্র সহস্র কর্ম্মরত দরিদ্রের জন্য কাজ করিতেছে।"

এদেশে শিক্ষার অদ্ভুত প্রসার সম্বন্ধে ইনি বলিতেছেন :—

"আমরা দেখিলাম সংবাদপত্র কিনিতে ইচ্ছুক লোকেরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুস্তকাদি সস্তা এবং লোকে যথাসাধ্য তাহা কিনিতে ইচ্ছুক দেখিলাম। রাশিয়ার আকস্মিক শিক্ষাবিস্তার এখানকার ছাপাখানাগুলির ক্ষমতা ও কাগজ প্রস্তুতের ব্যবসার উপর বিশেষ চাপ দিয়াছে।"

এখানকার বিলাসিতা, খাদ্যের প্রাচুর্য্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাধারণ অবস্থা ইনি যাহা দেখিয়াছেন :—

"বিলাসী লোকের উপযুক্ত কোন খাদ্য আমরা দেখিলাম না। শুধু নিষেধাত্মক মূল্যেই তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষুধার কোন চিহ্নই আমরা দেখিলাম না—খাদ্যপ্রার্থীও না। ...উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং তাহা এখনও বিলাসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া বাড়ী ও রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্যেই প্রথমে হাত দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্রশিল্প ইহার পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা যাইবার সময় দেখিলাম মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনার বাসগৃহসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে।...রাশিয়ায় আমরা একটিও অলস লোক দেখি নাই, একজনের মুখেও বিরক্তির চিহ্ন দেখি নাই।"

উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"এখানে আমরা নূতন জীবন দেখিলাম—প্রতি হৃদয়ে নূতন আশার স্পন্দন দেখিলাম। এই প্রকার বিপুল পরীক্ষার জন্য যে দুঃখ সহন অনিবার্য্য প্রত্যেকে তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে। বিপুল জনসাধারণের দুঃখ ও ত্যাগের উপর সমন্বয়ের এক নূতন জগত গড়িয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য দেখিবার মত, ইহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য।"

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১৬

দীপ্তি কম্যুনিজম সম্বন্ধে একখানা বই পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে লেখকের একটা অভিমত সম্বন্ধে গবেষণার সবটুকু শেষ করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। লেখক এদেশীয়, বোধ হয় ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের ন্যাসরক্ষক রূপে নিযুক্ত হইয়াই তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মূল কথা এই যে, ভারতবর্ষে কস্মিনকালে কম্যুনিজম বা কোন রকম 'ইজমের' উৎপাত ছিল না। জাতিবিভাগের সুন্দর বাঁধনের ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর লোক বা সম্প্রদায় আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল। এই সুন্দর বৈজ্ঞানিক সমাজের স্তর-বিন্যাসকে গ্রীক ঐতিহাসিক ভারতের জাতি বিভাগের সুন্দর বন্দোবস্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। যে যাহার জাতিব্যবসা করিত এবং সকলেই পরস্পরের নিকট সামাজিক লেন দেন বা আদান প্রদানে বাধ্য থাকিত, কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে অথবা কেহ কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে তিষ্টিতে পারিত না

তাহার পর—বহুশত বর্ষ সন্তোষ ও শান্তি উপভোগ করিবার পর—সমাজে আসিল বিদেশের আমদানী সাম্যবাদ। কালচার বা শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতালাভের ফলে সমাজে সকলেই সমান আসন করিয়া লইতে অধিকারী। এই কালচারের মূল হইল লেখাপড়া শিক্ষা। লেখাপড়া—অর্থে গভর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। সে শিক্ষা অর্জ্জন করিতে পারিলে রাজদ্বারে সম্মান, খেতাব, অর্থ, যশঃ—সবই। সে শিক্ষার বাজারে দর'ও অত্যধিক—বিবাহের বাজারে বরের দরই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া রাজ সরকারে বড় বড় চাকুরী, আদালতে ওকালতী, হাসপাতালে ডাক্তারী এবং পূর্ত্তবিভাগে ইঞ্জিনিয়ারী। জাতিব্যবসা অপেক্ষা ইহার মোহ ও আকর্ষণ-প্রলোভন অনেক বেশী। কাজেই সকলেই ঝুঁকিল ঐ শিক্ষার দিকে। ইহার ফলে অনেকে জাতিব্যবসা ছাড়িয়া দিতে লাগিল, সমাজে আসিল ওলট পালোট, বিরোধ বিশৃঙ্খলা, অশান্তি অসন্তোষ। অতএব যত অনিষ্টের মূলই হইতেছে আমদানি-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদি মানবী ইভ বা হবা জগতে আনিয়াছিলেন দুঃখ ও পাপ, আর আধুনিক যুগেও এই শিক্ষার ফলে আসিয়াছে কম্যুনিজম, ধনিক-শ্রমিকে কলহ এবং বেকার সমস্যা ও অশান্তি-অসন্তোষ।

দীপ্তি ইহাই পাঠ করিয়া হাসিতেছিল। এত বড় একটা বিষয়—যাহার সমস্যা লইয়া জগতের উন্নত সভ্য দেশ-সমূহে বড় বড় মনীষী অহরহ মাথা ঘামাইয়াও কোন কূলকিনারা পাইতেছেন না, তাহার এমনই সহজ সমাধান হওয়া সম্ভব বটে! জগতে তাহা হইলে শিক্ষার কোন মূল্য নাই? অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে শিক্ষার সমাদর ছিল—তখনও চীন তিব্বত গ্রীস রোম মিশর প্রভৃতি দেশের কালচারের সহিত এ দেশের কালচারের আদান প্রদান হইত। তবে শিক্ষার কি অপরাধ? বিদেশের শিক্ষা বলিয়াই কি তাহার যত অপরাধ? বিদেশের শিক্ষা আমদানি না হইলে এ দেশের ভূগর্ভের কয়লা, লোহা, অভ্র প্রভৃতি ভূগর্ভেই রহিয়া যাইত না কি, ভূপৃষ্ঠে চা-এর অথবা কুইনিনের চাষ হইত কি? রেল, মোটর, তার, ফোন, বিজলি বাতি, সিনেমা টকি, গ্রামোফোন প্রভৃতির দর্শন পাওয়া যাইত কি? এ সকল আমদানি হওয়ায় ইষ্টও অনেক সাধিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের সহিত প্রতি-যোগিতায় এ দেশের এখন দাঁড়াইবার সামর্থ হইতেছে—দেশে ধনাগমের পথও পরিষ্কৃত হইতেছে। কলকারখানায় যেমন অনিষ্টও আছে, ইষ্টও তেমনি আছে। কলকারখানা আমদানি না হইলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জোলা তাঁতী কোথায় দাঁড়াইত?

দীপ্তির চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া দাসী আসিয়া খবর দিল, বাদুড়বাগানের দিদিমণির বাড়ী হইতে লোক পত্র লইয়া আসিয়াছে, উত্তর দিবেন কি? দীপ্তি কেতাব মুড়িয়া রাখিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিল। পত্রখানি নীহার তাহার পিত্রালয় হইতে লিখিয়াছে, সে সম্প্রতি পিত্রালয়ে আসিয়াছে। পত্রে মাত্র দুই চারি ছত্র লেখা। দীপ্তি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া দিল, পত্রের জবাব দিতে হইবে না, কেবল পত্রবাহক গিয়া বলিবে যে, অদ্য অপরাহ্ণেই দীপ্তি তাহাদের ওখানে গিয়া নীহারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। পত্রে নীহারই তাহাকে শীঘ্র সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে সে যখন নীহারের পিত্রালয়ে উপস্থিত তখন তথায় মহা ধূমধাম, আনন্দ সমাগম,—নীহারের একটি খুল্লতাত পুত্রের বিবাহ হইতেছে, তাহারই উদ্যোগপর্ব্ব। ফটকের উপর নহবৎ বাজিতেছে, দাসদাসীরা রঙ্গবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, দেউড়ীতে দ্বারপাল তকমা শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া গম্ভীর মূর্ত্তিতে পাহারা দিতেছে, বাড়ীর ছেলেপুলেরা নববস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। নীহারের পিতা সঙ্গতিপন্ন বা স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাওড়া রেল আফিসে মোটা মাহিনার চাকুরী করিতেন, কাজেই এই ঘটা ও আড়ম্বর।

সেদিন যোগাযোগও হইয়াছিল ভাল—নীহারের সাধ ভক্ষণের দরুণ একটু ছোটখাটো উৎসবও ছিল। তাই এমনি নীহার বন্ধুকে আসিতে লিখিয়াছিল,—ইচ্ছা, দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা ও একসঙ্গে পান ভোজন করা হইবে। বাড়ীর মস্ত সমারোহ ব্যাপার দেখিয়া দীপ্তি বিস্মিত হইয়াছিল। নীহার যে অন্তর্বত্নী, দীপ্তি তাহা জানিত, কিন্তু বাড়ীর বিবাহের কথা সে কিছুই শুনে নাই। না শুনিবার কারণও যে ছিল না তাহা নহে। নীহারের পিতা তাঁহার ভ্রাতার সহিত একান্নভুক্ত পরিবার ছিলেন না। পৈতৃক ভিটা এক হইলেও উভয়ের সাংসারিক ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন। বিশেষতঃ বিবাহের তখনও ছয় সাত দিন বাকী, অব্যূঢ়ান্ন উৎসবেরও তখনও তিন চারি দিন বাকী। কাজেই দীপ্তির বাড়ী তখনও নিমন্ত্রণ হয় নাই।

দীপ্তি বিস্মিত হইল এই হেতু যে, নীহারের সাধ ভক্ষণের উৎসবে এত বড় সমারোহ ব্যাপার কেন! তাই নীহারের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইতেই সে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "ইস্, ছেলে না হতেই এই, না জানি হলে কি করবি তোরা!"

নীহার কথাটার অর্থ খুঁজিয়া পাইল না, বলিল, "কেন, ছেলে না হতেই কি রাজা বাজড়ার যজ্ঞি হোলো, যে ঠাট্টা করছিস্?"

দীপ্তি বলিল, "বাঃ! এই সানাই নবৎ—লোকজনের হুড়োহুড়ি, ডাষ্টবিনে মাছের আঁশের দুর্গন্ধ, এঁটো কলাপাতা, ভাঁড়, খুরি—"

নীহার হো হো হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আ মরণ! ওসব বুঝি আমার জন্যে হচ্ছে—ওযে ছোড়দার বিয়ের যজ্ঞির জন্যে—তা জানিস নে?"

দীপ্তি অপ্রতিভ হইবার বা হটিবার পাত্র নহে, তাই তখনও শ্লেষের সুর ত্যাগ করিল না, বলিল, "বিয়ের যজ্ঞি? ওমা তা কাকমুখে খবরটাও ত পাইনি—খবর দিসনি বুঝি পাছে এসে লুচি মণ্ডায় ভাগ বসাই, কেমন, না?"

নীহার হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওঃ! মুখপুড়ি ত মস্ত খাইয়ে, তাই ভয়ে খবর দিই নি!"

দীপ্তি সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু বিয়েই হোক আর যাই হোক, এসব জাঁক জমক কেন বল্ ত? আজকাল নাকি আর সানাই নবৎ আছে?—খালি বাজে খরচ, খালি বাজে খরচ—সেকেলে ঢঙ!"

নীহার বলিল, "বাজে খরচ? তা হলে নবৎ অলাদের চলবে কেমন করে? ওরাও ত মানুষ, দেশের লোক।"

দীপ্তি বলিল, "কেন, অন্য কাজ করুক, চাষবাস করুক, না হয় মোট বয়ে পেট চালাক।"

নীহার বলিল, "বটে? তা হলে যারা চাষ করে খায় বা মোট বয়ে পেটের অন্ন যোগাড় করে, তারা কোথায় যায়? ওঁরা বলেন, আমাদের সমাজে সবাইকে সবাই সাহায্য করে, খাওয়াবার মত করে সকলে সকলকে কাজ দেয়; তবেই না দেশে সবাই খেতে পায়।"

দীপ্তি বলিল, "তা বলে আলসে কুড়েদেরও বসিয়ে বসিয়ে

খাওয়াতে হবে ? এ কেমন কথা ! তোর ওঁরা এর উত্তরে কি বলেন ?"

নীহার বলিল, "তোর সঙ্গে অত বকৃতে পারিনি বাপু— তুই যেমন লজিকের পণ্ডিত, থাকতো হিমুদা তা হলে তোর তোড়া মুখ ভোঁতা করে দিত।"

দীপ্তি বলিল, 'তাই নাকি ? তা না হয় একদিন পরীক্ষা করা যাবে, এখন চল দিকি, তোর যজ্ঞির জন্যে কি ঘটা হয়েছে দেখে আসি।"

নীহার বলিল, "অবাক ! আমার আবার যজ্ঞি কিসের ? দু'চার জন আপনা আপনির ভেতর খেতে বলা হয়েছে, এই যা, আর ঐ পুজো আচ্চা।"

দীপ্তি বলিল, "আ গেলো, পুজো আচ্চাই ত দেখতে চাইছি"—

"নীহার দি, ও নীহার দি—এই দেখ না"—বলিতে বলিতে রেখা কক্ষে ছুটিয়া প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে হিমাংশু--হিমাংশুর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। হঠাৎ দীপ্তিকে দেখিয়াই সে গম্ভীর মুখে কক্ষ ত্যাগ করিল। নীহার তাড়াতাড়ি বলিল, "ওমা, ও কি হিমুদা—ওযে দীপ্তি, তুমি এলে আর চলে যাচ্ছ কেন ? এসো, বসো।"

হিমাংশু বলিল, "না, আমার কাজ আছে, রেখাকে দিয়ে গেলুম—"

নীহার বলিল, "কেন, রেখা বুঝি একলা আসতে পারতো না ? বোসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি হিমুদা, এদ্দিন পরে যদি এলে—আচ্ছা মার সঙ্গে দেখা করেই যাও।"

রেখা বলিল, "তা বুঝি বাকী আছে নীহার দি ? আমরা ত আগে মাসীমার কাছে গিয়েছিলুন গো—দাদা তোমার জন্যে কত কি এনেছে, সেখানে রেখে এলো।"

দীপ্তি হিমাংশুকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া বলিল, "আপনারা ভাই-বোনে দুটো কথা বলুন তাতে আমিই বা বাধা দিতে যাবো কেন ? আপনি বসুন, আমি বরং পুজোর কি উদ্যুগ হচ্ছে দেখে আসি।"

হিমাংশু আরও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা, আপনি বসুন, আমি—আমার বিশেষ কাজ রয়েছে—একবার—"

দীপ্তি স্বভাবসুলভ শ্লেষোক্তির দংশনেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিল না, ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "ও: তা বটে, যে রকম কাজের লোক আপনি, আজ পাটনা, কাল গয়া—"

কে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিতে ফুৎকার দিল, হিমাংশু দপ করিয়া জলিয়া উঠিয়া বলিল, "ও: এই জন্যেই বুঝি বাবার কাছে ওসব খবর যোগান দেওয়ার লোকের অভাব হয় নি ? তা, মেয়েছেলেদের স্বভাবই যখন পরের কাজে অনধিকার চর্চ্চা করা, তখন দোষ ত দেওয়া চলে না কারও—"

দীপ্তি ক্রোধে আরক্তমুখ হইয়া উঠিল, নীহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে রেখা কক্ষের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "দাদা, ও দাদা,—বারে তুমি চলে যাচ্ছো যে, নীহারদিকে যে কাপড় দেখান হল না এখনও, বারে !"

হিমাংশু থমকিয়া দাঁড়াইল। সুযোগ বুঝিয়া নীহার বলিল, "কাপড় ? কি কাপড় হিমুদা ?"

রেখা বলিল, "ঐ যে, তোমার জন্যে কাপড় এনেছে দাদা, কোনখানা পছন্দ করবে দেখাতে, সব রয়েছে মাসীমার কাছে। চলনা দেখবে নীহার দি।" কচি কচি চম্পকাঙ্গুলীর দ্বারা রেখা তাহার নীহারদিকে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

হিমাংশু বাহির হইতেই গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ, কোন-খানা তোমার পছন্দ হয় দেখে রেখে দিও—বাবা পাঠিয়েছেন তোমার জন্যে—আমি চললুম।"

দীপ্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর দিকে যাবেন কি হিমাংশু বাবু, না কলে বাইরে যাবেন ?"

অতর্কিত ও অসম্ভাবিত প্রশ্নে হিমাংশু বিস্মিত হইয়া নযযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে একটি কথাও বাহির হইল না।

দীপ্তি তখনও হাসিতেছিল, নীহার অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দীপ্তি আবার বলিল, "বলছিলুম কি, যদি বাড়ী যান, তাহলে একসঙ্গেই যাওয়া যেত, আমারও একটু জ্যেঠামণির সঙ্গে দরকার আছে—"

নীহার বাধা দিয়া বলিল, "বারে, না খেয়ে যাবি না কি ?

জান হিমুদা পোড়ার মুখী আমায় কি তত্ত্ব পাঠিয়েছে? উঃ! যেন একটা যজ্ঞি বাড়ীর তত্ত্ব! এ দিকে বলেন আবার নবোৎ-টবোতে বাজে খরচ হয়!"

হিমাংশু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "একটা আর্জেন্ট কলে টালিগঞ্জে যেতে হবে এখুনি—ওঁদের ইচ্ছে হলে রেখার সঙ্গে যেতে পারেন, বাড়ী ত ওঁর অচেনা নেই।"

হিমাংশু যাত্রার্থে পাদপ্রসারণ করিয়াছে, অমনি দীপ্তি শ্লেষের স্বরে বলিল, "নবোৎ রস্নচৌকি বাজে খরচ নয়, হিমাংশু বাবু?"

হিমাংশুও সমান স্বরে বলিল, "বড়লোকদের অনাবশ্যক মোটর চড়ে বেড়ান যদি বাজে খরচ না হয়, তা হলে হয়ত গরীব নবৎ-অলাদের দিনগুজরণের টাকা যোগানটাও বাজে খরচ না হতে পারে।"

সত্যই এবার আর হিমাংশু দাঁড়াইল না, মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বহির্দ্দেশে চলিয়া গেল। নীহার বলিল, "তুই পোড়ারমুখী বড় দুষ্টু, হিমুদাকে রাগিয়ে তাড়িয়ে দিলি। না রাগলে দেখিয়ে দিত তোকে বাজে খরচ নিয়ে তর্ক করার মজা।"

দীপ্তি অন্যমনস্ক হইয়াছিল। নীহারের কথার জবাব দিতে গিয়া রেখাকে দেখিয়া নীরব হইল। নীহার বলিল, "যা ত রেখা মার কাছে পুজো-আচ্চার উদ্যুগ হচ্ছে দেখগে যা, আমরা যাচ্ছি এখুনি। আর দেখ, আমার কাপড়গুলো থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখগে যা।"

রেখা দৌড় দিল। দীপ্তি বলিল, "দাম্ভিক পুরুষদের রাগিয়ে দিতে আমার বড্ডো ভাল লাগে—"

নীহার ঈষৎ রুষ্ট স্বরে বলিল, "হিমুদা দাম্ভিক? বারে!"

দীপ্তি বলিল, "নিশ্চয়ই! যাকে আমরা বলি আত্মম্ভরী—আপনি যা বোঝেন, অপরে তা বোঝে না!"

নীহার আহত হইয়া অভিমানভরে আঘাত দিয়া বলিল, "ওঃ এই জন্যেই বুঝি রেখার সামনে কথা কইছিলি নে? তবে যে বলিস, যা বলবার সকলের সামনে বলা ভাল, লুকিয়ে মনে রাখলে মনের পাপ থাকে—"

দীপ্তি বলিল, "তা ত বলিই। তবে রেখা ছেলেমানুষ, বোঝবার বয়েস ওর হয় নি, হয় ত রাগ করতো, অভিমান করতো।"

নীহার বলিল, "তা আমিও ত রাগ করছি, অভিমান করছি। হিমুদার সম্বন্ধে তুই অন্যায় বলবি, আমি রাগ করবো না? তুই না বলিস, কারুর অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে আলোচনা করা অভদ্রতা?"

দীপ্তি বলিল, "পাঁচশো বার! ওকথা এখনও বলছি। তবে ন্যায় অন্যায় আলোচনা না করলেও যা সত্যি তা সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সকল সময়েই বলতে পারা যায়।

নীহার বলিল, "যা সত্যি!—কি সত্যি?"

দীপ্তি বলিল, "এই হিমাংশু বাবুর পাটনা গয়া টহল দিয়ে মজদুরদের সভায় লেকচার দেওয়া, আর আমি তাই মনে করিয়ে দিয়েছিলুম বলে আমাকে গোয়েন্দার ক্লাশে ভর্ত্তি করে দেওয়া—"

নীহার ঔৎসুক্যভরে বলিল, "সত্যি, ওটা তোদের মধ্যে কি কথা হোলো বল্ ত কি, হয়েছিল কি?"

দীপ্তি বলিল, "কিছু না। বাবার সঙ্গে জ্যেঠামণিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে আর তোরও খুব আপনার জন বলে আমি ডিসপেনসারীর কারবারটা দেখতে বলেছিলুম ভাল করে জ্যেঠামণিকে। জ্যেঠামণি আমার কাছে চান ওর নাড়ীনক্ষত্র, তা আমি কোথায় পাবো? কলকাতায় কারবার করতে গেলে সাবধান হতে হয়—কেন না নানা রকমের ফন্দীবাজ লোক ঘোরে ঠকাবার জন্যে—তাই কারবারটা ভাল করে দেখবার দরকার আছে বলেছিলুম, হিমাংশু বাবুর এইতেই রাগ।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল, "হিমুদার দেখছি অন্যায় রাগ। কোথায় তুই গেলি ওরই ভাল দেখতে, না তোরই ওপরে রাগ!"

দীপ্তি হঠাৎ আরক্ত মুখখানি নামাইয়া লইল। নীহার তাড়াতাড়ি বলিল, "তা যেন হ'ল, হিমুদা না হয় নেমক-হারামই হল, কিন্তু দাম্ভিক হ'ল কোনখানটায়?"

দীপ্তি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তার পরিচয় ত এইমাত্র পেলে। আমাদের যজ্ঞিতে বাজে খরচের কথায়

উনি আমাদের বড়লোক বলে খোঁচা দিলেন—কারণ আমরা মোটর চড়ে বেড়াই। রসুনচৌকি-ওয়ালার মত সোফারদেরও ত দিন গুজরান হওয়া চাই!"

নীহার বলিল, "বা রে, তুই উল্টো তর্ক করছিস। হিমুদা ত তাই বলচে, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তারা পাঁচজন মজুর মুটেকে পালন করবে, তবেই ত সমাজ চলবে। হিমুদা বলে,—যাকগে সে সব কথা। জানিস, হিমুদার কত দান? কত মজুর সভায় কত টাকা দান করে। যা রোজগার করে, তার বারো আনা অনেক গরীবের ছেলের লেখাপড়ার মাসহরা দেয়, গাঁয়ের কত বিধবা অনাথার খোরপোষ দেয়, কত হাসপাতালে গরীবদের অমনি দেখে—এ আজকালের কথা নয়, যদ্দিন হিমুদা ডাক্তার হয়ে বেরোয়নি তখনও—"

দীপ্তি বলিল, "সে ত ভালই করেন তিনি—এতে কার আপত্তি থাকতে পারে? তবে তিনি যা বোঝেন তাই ভাল, অন্য লোকে কিছু বোঝে না, এটা কিন্তু ভাল না।"

নীহার বলিল, "কি রকম?"

দীপ্তি বলিল, "এই যেমন আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। আমরা যদি কিছু ভাল ভেবেও বলি, তাও তাঁর বিবেচনায় মন্দ। কারণ, মেয়েছেলেদের ওসব অনধিকার চর্চ্চা! এতটা আত্মম্ভরী হওয়া ভাল কি করে বলতে পারি?"

নীহার বলিল, "কবে আবার তোমার ভাল কথায় হিমুদা মন্দ দেখলে? এ যে বাপু তোমার বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করা।"

দীপ্তি বলিল, "বটে? আমিই দোষী হলুম? এই যে তোমার সামনেই আমি খানিক আগে বললুম, যেখানে সেখানে মজুর মজদুরদের সঙ্গে হুজুগে মেতে বেড়ানর কথা—ওতে কি ডাক্তারী কাজের ক্ষতি হয় না? জ্যেঠামণি যখন অতটা টাকা দিয়ে ডিস্পেনসারীর কারবার করে দিয়েছেন, তখন ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও ত তাঁর দেখার দরকার।"

নীহার বলিল, "তা হতে পারে। কিন্তু এটাও ত দেখতে হবে যে, পুরুষ মানুষে যে কার-কারবার করে, তাতে কথা কইতে যাওয়া সত্যিই আমাদের অনধিকারচর্চ্চা। আমরা ওর কি বুঝি? এতে হিমুদার রাগ হবেই ত।"

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তাহার পর বলিল, "তুই হলি কি? তোর এ সব ধারণা হ'ল কোত্থেকে? পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষ নিয়ে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই। চোখের সামনে জানাশোনা মানুষের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা হচ্ছে দেখলে মানুষ মাত্রেরই তাকে সাবধান করে দেবার অধিকার আছে।"

নীহার বলিল, "তুই যাই বল, পুরুষরা আমাদের মাথায় করে রাখলেও আমরা তাদের অনেক নীচে আছি। মনে ভাবিস, আমরা মস্ত স্বাধীন হয়েছি, ওদের মতই কার-কারবারে মাথা খাটাতে পারি, মতামত দিতে পারি। কিন্তু আসলে আমরা যতই স্বাধীন হয়েছি বলি, তবু আমরা এখনও ওদের মুখ চেয়ে থাকি, ওদের প্রভু ব'লে ওদের উপরেই নির্ভর করি। আর শুধু করি না, নির্ভর করতে সত্যিই ভালবাসি।"

কথাটা বলিবার সময় নীহারের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু দীপ্তির মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাহা নীহারের কল্পনাতীত। দীপ্তি প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার অন্তরের রুদ্ধ ক্রোধ ও ঘৃণা তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিল।

ক্ষণপরে সে অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোর সঙ্গে তর্ক করাই মিথ্যে। পশুর মত মানুষেরও গায়ের জোর আছে। সে জোরের বিপক্ষে বরং লড়াই করা যায়, কিন্তু তর্ক করবারও একটা যে গায়ের জোর আছে, তার বিপক্ষে সকলকে হার মানতে হয়। যে গায়ের জোরে বলে, মেয়ে মানুষের মাথা নেই, বুদ্ধি বিবেচনা নেই, তাকে কেউ জোর করে বলাতে পারে কি যে, তাদের মাথা আছে?"

নীহার বুঝিয়াছিল, দীপ্তি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তথাপি তর্ক ছাড়িল না। তাহাকে আরও খানিকটা রাগাইয়া দিলে কেমন দেখায়, কেবল তাহাই দেখিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই যতই বল, মেয়ে মানুষ কখনও পুরুষের মত প্রতিভার অধিকারী হতে পারে না, এ পর্য্যন্ত কখনও তা হয়নি, আর হবেও না। তারা কেবল সেজেগুজে থাকবার আর পুরুষের পূজো পাবারই অধিকারী। তারা এ পর্য্যন্ত এমন কিছু বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নি বা বলে যেতে

পারেনি, যা অমর হয়ে থাকবে—তবে তারা যা বলে তাই পুরুষদের কাছে মিষ্টি।"

দীপ্তি যে এতক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল, ইহাই আশ্চর্য্য। বোধহয় বিষাক্ত বাণ বা বিষবাষ্পও তাহার কাছে ইহার অপেক্ষা অধিক কঠোর বা প্রাণমনঃপীড়াদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত না। কথা শেষ হইবামাত্র সে তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "তাই হোক, তোমার কথা নিয়ে তুমি থাকো, আমি তাতে ভাগ বসাতে চাইনে—আমি এখনই যাচ্ছি চলে এখান থেকে—"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দীপ্তি প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। নীহার এবার সত্যই ভীত হইয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই রাগ করলি? ঠাট্টা বুঝতে পারলি নে। ঘাট হয়েছে ভাই, মাপ কর আমায়—আর আমি তোকে রাগাতে যাব না।"

দীপ্তির চোখের জল মুক্তাবিন্দুর মত টলটল করিতেছিল, বুঝি ঝরিয়া পড়ে। সে তাহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "না, না, আমি যাই চলে—"

নীহার বুঝিল কি, এ অভিমানের ক্রন্দন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, নীহার আরও কঠিন বন্ধনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ইস, যেতে দিলুম এই যে, মাকে না বলে যাবি যে বড়! আমার কাছে আমোদ করবিনে তবে—পোড়ারমুখী রেগেই মলেন! সত্যি বলছি ভাই, আমারা ওদের চেয়ে ঢের বড়—ওরা কিসে বড়? কেবল গায়ের জোর আছে বলেই বুঝি?"

দীপ্তি এতক্ষণে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আচ্ছা, সত্যি বল দিকি, আমাদের চেয়ে ওরা কিসে বেশী প্র্যাকটিক্যাল?"

নীহার বলিল, 'নিশ্চয়ই না।. আমরা গুছিয়ে না দিলে ওদের সংসার কোথায় থাকতো? এই দেখনা, সাহেবদের দেশে ঘর গোছাবার দায়িত্ব কেউ নেয় না বলে হোটেলই ওদের ভরসা হয়েছে।"

দীপ্তি হো হো হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দূর পোড়ারমুখী, আমি ওকথা ভেবে বলিনি। যাক্ গে, আমাদের ওসব কথায় মাথা ঘামাবার দরকার কি? চল, এইবার তোদের পুজো-আচ্চা দেখি গিয়ে।".

নীহার বন্ধুকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "আ মরণ, সে নাকি এখনও বাকী আছে! আর পূজো-আচ্চা ত ভারী।"

দীপ্তি বলিল, "তা না হয় তোর কাপড়-চোপড় দেখি গিয়ে চল। সেই মেয়েটি কোথায় গেল—সেই যে রেখা না কি!"

নীহার বলিল, "সে মেয়েমজলিসেই আছে।. কেন? তাকে যে বড্ডো মনে লেগেছে দেখছি।"

দীপ্তি আপন মনে বলিল, "জ্যাঠামণি একদিন ওকে আমাদের ওখানে যেতে দেবেন কি? রেখাকে আমার বড্ডো ভাল লাগে।"

নীহার মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, বলিল, "তাই না কি? কেন বল দিকি?"

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বলিল, "দিব্বি দেখতে মেয়েটি, মুখখানি যেন হাসছে!"

নীহার একদিনের কথা মনে করিল, সেদিন তাহার বন্ধুর সম্বন্ধে তাহার শ্বশুরের দেশের বৌঝিরা ঐ ভাবেরই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া দীপ্তীর কত রাগ!

১৭

শান্ত স্থির পুষ্করিণীর নিস্তরঙ্গজলে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে আলোড়িত চঞ্চল জল ক্ষুদ্র হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর বৃত্তের আকারে তটপ্রান্তের অভিমুখে ধাবিত হয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে ক্রমশঃ এমন বৃহত্তর ঘটনার উৎপত্তি হয়, যাহার ফলে সংসারে বিপর্য্যয় ঘটে—সব ওলটপালোট হইয়া যায়। লেডি ডক্টর বাণীদেবী ও লেডি পামিষ্ট কল্পনাদেবীর সংসারেও এমনই হইয়াছিল।

যত গোলযোগ ঘটিয়াছিল মন্মথনাথকে লইয়া। এক একটি লোকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এইরূপ যে, তাহারা সাবালক হইলেও অপরে তাহাদিগকে সাবালক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না, এমন কি তাহার কোন কথায় সার বা ভার আছে বলিয়া স্বীকারই করিতে প্রস্তুত হয় না। এই হেতু সে কথায় ও কাজে বিরক্তি বা ক্রোধের ভাব প্রকাশ না করিলেও ভিতরে বিষম উষ্মা অনুভব করে।

মন্মথনাথের ইদানীং আরও একটি বিষম উষ্মার কারণ

হইয়াছিল এই যে, কল্পনাদেবী পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে আর প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না, পরন্তু তাঁহার সেই দৃষ্টিটি গিয়া পড়িয়াছিল অন্য একটি জীবের উপর—সে শশাঙ্কমোহন। মন্মথনাথ তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত এবং তাহার আখ্যা দিয়াছিল ভুঁইফোঁড় জীব। কল্পনাদেবীর এই নূতন কৃপাদৃষ্টির গভীরতা ছিল কতটুকু, তাহা অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না, কিন্তু অনুগ্রহ বা কৃপাপ্রার্থীদের ভালবাসার দৃষ্টির মাপকাঠিতে তাহা অতি গভীর বলিয়া অনুমিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। বিশেষতঃ সেই ভালবাসায় যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, তখন ত আর কথাই নাই। মন্মথনাথ নিজের ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাপকাঠিতে উহার গভীরতাটুকু অতিমাত্র অপরিমেয় আকারেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল এবং সেজন্য তাহার মনে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি জিঘাংসা বৃত্তির উন্মেষ হইতেছিল। যদি কাহারও দৃষ্টিতে নরহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে শশাঙ্কের প্রতি মন্মথের দৃষ্টিপাতের প্রতি পর্য্যায়ে অনুক্ষণ তাহা ফুটিয়া উঠিত।

অবশ্য একথা সত্য যে, কল্পনাদেবী তাহার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না বা তাঁহার উপর তাহার বিশেষ কোন দাবী দাওয়াও ছিল না। বরং এক হিসাবে তাহার উপরেই কল্পনাদেবীর দাবী দাওয়া থাকিবার কথা, কেন না আংশিক ভাবে তিনি তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। এজন্য তাহার উপর তাঁহার জোর জবরদস্তি খাটিত। অপর পক্ষে তাঁহার উপর তাহার জোর জবরদস্তির কোন দাবী ছিল না। তবে প্রথম যৌবনের সুচনা হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণের যে একটা দাবী জন্মিয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে কল্পনাদেবী প্রকাশ্যে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিতেন না এবং অতিমাত্র ঘনিষ্টতার ফলে মন্মথনাথ তাঁহার নিজের ও তাঁহার তথাকথিত ভগিনীর কারকারবারের এমন কিছু গোপন তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যাহাতে প্রকাশ্যে তাহার বিরাগের উৎপত্তির কারণ হইতে কল্পনাদেবীর সাহসে কুলাইত না।

এ সব অবৈধ ভালবাসার যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, কল্পনাদেবীতে তাহা ইদানীং বিশেষরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ মোহ কখনও স্থায়ী হয় না। যতদিন যৌবনের উদ্দাম লালসা বর্ত্তমান থাকে, ততদিনই ইহার স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টি হইতে পারে, তাহার পর ভোগের অন্তে উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। মন্মথনাথ তরুণ যুবক, তাহার উপর সুপুরুষ। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহার নূতনত্বের মোহ অপসরিত হইতে লাগিল এবং তাহার উপর যখন বাণীদেবীর অংশীদার ও পরামর্শদাতারূপে শশাঙ্কমোহনের উদয় হইল, তখন সে মন্মথের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে একটা সীমারেখার ব্যবধান টানিয়া দিতে লাগিল। এ বিষয়ে তাহার মানসিক প্রবৃত্তিও অনেক সহায়তা করিল। মন্মথনাথে প্রলোভনের অবশিষ্ট আর আছে কি? সে তাহারই অন্নদাস, তাহারই কৃপাপাত্র। কিন্তু তাহাতে আর নূতনত্ব নাই, অর্থার্জ্জনেও সে আর সহায়ক নহে। মস্তিষ্ক তাহার নিজের, মন্মথ যন্ত্রমাত্র, তাহারই ইঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অর্থ সংগ্রহ করে মাত্র। যখন অর্থের অনাটন হয়, তখন তাহাকেই কৌশলে ধনবান পতঙ্গকে তাহার রূপ-যৌবনের আলোকে আকর্ষণ করিতে হয়—তবে প্রকাশ্যে নহে, গোপনে। প্রথমতঃ মন্মথকে বশে রাখিবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ কারবারের ঠাট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। কিন্তু যেখানে একত্র অহরহ বসবাস, সেখানে বেশী দিন এসব ব্যাপার গোপন থাকে না। কাজেই প্রথম প্রথম অতিমাত্র মনোমালিন্য, বিবাদ বিরোধ, মান অভিমান, কান্নাকাটি। তাহার পর ক্রমশঃ সবই সহ্য হইয়া যাইতে লাগিল। তবে যতটুকু সম্ভব মন্মথের দৃষ্টির অন্তরালে।

যতদিন শশাঙ্কমোহনের উদয় হয় নাই, ততদিন মন্মথ এই বিচিত্র জীবনযাত্রাকে অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যফল বলিয়া ধরিয়া লইয়া অন্নদাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই শশাঙ্ক?—অসহ্য! একটি প্রকাণ্ড অপদার্থ, দুর্দ্দান্ত মাতাল, ঠগ জুয়াচোর, নীচ কপট, বাচাল, বিশ্বাসঘাতক। মুখে সে রাজা-উজীর মারে, কিন্তু কাজে? ইহার এমন কি গুণ আছে, এই কপট ফন্দীবাজ এমন কি অর্থার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে যে, সে তাঁহাদের কারবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়? আর—আর মন্মথনাথের অন্তরের মধ্যে

হিংসা ও ক্রোধের আগুন জলিয়া উঠে—নয়নে বিষবহ্নি উদ্গীরিত হয়,—এই লম্পট মাতালটাই কিনা উড়িয়া আসিয়া কল্পনার হৃদয়রাজ্য জুড়িয়া বসিল! মানুষ কি সাধে জিঘাংসা পরায়ণ হয়?

এ বিষয়ে কল্পনার সকাশে অনুযোগ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। প্রথম প্রথম কল্পনাদেবী হাসিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন, অথবা অতিমাত্র আদর আপ্যায়নে মন্মথকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মন্মথ তাহাতে প্রথম প্রথম ভুলিলেও শেষের দিকে তাহার তিরস্কার অনুযোগ গঞ্জনা ভর্ৎসনার মাত্রা যখন অত্যধিক হইতে লাগিল, তখন কল্পনাদেবীও নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তাহার নিজের পথ অনুসন্ধান করিয়া লইবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। ফলে বিবোধ ক্রমশঃ চরমে পরিণত হইল। তখন বাণীদেবীকে মধ্যস্থতা করিয়া বহুক্ষেত্রে বিবাদভঞ্জন করিতে হইত।

একদিন সত্যসত্যই শশাঙ্কমোহনের সহিত মন্মথনাথের হাতাহাতিই হইয়া গেল। বলা বাহুল্য শশাঙ্কই মার খাইল। সেদিন কল্পনাদেবী রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উৎকট অপমান করিয়া মন্মথকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মন্মথ সেই কালরাত্রিতে আর ঘরে ফিরিল না, কোন এক রূপজীবিনীর আলয়ে নিশাযাপন করিল। ডিসপেনসারীর বিল সাধিবার সূত্রে পূর্ব্বে তাহার সহিত মন্মথের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, সেখানে তাহার গতিবিধিও ছিল। তদবধি মন্মথের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

মন্মথ অতি অল্প বয়স হইতেই পিতৃমাতৃহীন—এমন কি কোনরূপ অভিভাবকহীন হইয়া সংসার স্রোতে শৈবালের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সেই অবস্থায় তাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব সুচরিত্র হইয়া জীবিকার্জ্জন করা সম্ভব হয়, সে তাহাই করিয়া যাইতেছিল—তাহার পর কল্পনা ও বাণী দেবীর সঙ্গলাভ। মানুষ সঙ্গগুণে বা সঙ্গদোষে হয় দেবতা না হয় পশুভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মন্মথ তাহার ব্যতিক্রম নহে। কল্পনার সাহচর্য্যে সে কল্পনার রঙ্গীন জগৎকে আশ্রয় করিয়া প্রথম যৌবনের মাদকতায় তাহার পাপজীবনের কার-কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার একটি গুণ এই ছিল যে, সে কল্পনাকে যথার্থই ভালবাসিত এবং তাহার কথায় সত্যই উঠিত বসিত—এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রাণপাত পর্য্যন্তও করিতে পারিত। বাণী ও কল্পনা দেবীর সঙ্গগুণে সে মদ্যপানে এবং ঠকামি জুয়াচুরিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কখনও অতিরিক্ত মদ্যপ বা ভীষণ হিংস্র নরশোণিত পিপাসু নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয় নাই। কল্পনার ব্যবহারে সে কিন্তু দ্রুত সেই পথে অবতরণ করিতে লাগিল। অবতরণের পথ দ্রুতই হইয়া থাকে। এবং সেই অবতরণের খবর পাইতেও কল্পনা ও শশাঙ্কের বাকি রহিল না। শশাঙ্ক সে সংবাদ সরবরাহ করিতে যে তিল মাত্র বিলম্ব করিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

যেদিন কুসুম আসিয়া মন্মথনাথের গ্রেফতারের খবর দেয়, তৎপরদিন শশাঙ্কমোহনের চৈতন্যোদয়ের পর বাণীদেবীর পরামর্শমত সে তাহার বিপক্ষে মামলা তুলিয়া লইবার সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করিল। তদ্বিরে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ধনী মাড়োয়ারী বাবু মামলা চালাইতে সম্মত হইলেন না, পুলিসও নীরব রহিয়া গেল। কাজেই সে যাত্রা মন্মথনাথ রক্ষা পাইল। কিন্তু সে জন্য সে আর্টিষ্ট-ভবনে রেহাই পাইল না। কল্পনাদেবী তাহাকে বাক্যবাণে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর যখন মিঃ সানিয়্যাল তাঁহার ইংরাজী বুকনি সমেত কথার ঝাল তাহাতে মিশাইতে লাগিলেন, তখন মন্মথ সত্য সত্যই পাগলের মত হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে বাণীদেবীও উপস্থিত ছিলেন না, তিনি সে সময়ে ব্যবসার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই ব্যাপার ক্রমে সঙ্গীন হইয়া উঠিল

সেদিন যখন বিবাদ অত্যন্ত প্রখরভাব ধারণ করে, তখন বাণীদেবী উপস্থিত ছিলেন না এবং থাকিলে সুকৌশলে এবং সুন্দর রাজনীতিক চালে উহা মিটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জরুরী একটা শিকার অন্বেষণের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি মন্মথনাথের আগমনের পূর্ব্বেই স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের দুই ভগিনী ও মিঃ এস্ সানিয়েলের মধ্যে মন্মথনাথের কুকীর্ত্তি সম্পর্কেই আলোচনা চলিতেছিল। সেই আলোচনা আরম্ভ করেন মিঃ সানিয়্যাল। তিনি

বলেন, 'সভ্য জগতে সভ্য মানুষ কখনও ভুলেও অনুশোচনা করে না, পাপ করেছি বলে জীভ কাটে না—আসলে কথা হচ্ছে, অসভ্য জঙ্গলী জানোয়াররা পুণ্যি বা পাপ করা কাকে বলে তার আইডিয়াই করতে পারে না। তোমাদের ডোমেষ্টিক ডাভটি ঐ সেকেণ্ড ক্লাসেরই লোক।"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "কি রকম ?"

শশাঙ্ক বলিলেন, "সুন্দরভাবে অথবা চমৎকাররূপে পাপ করতে পারে, মজা উপভোগ করতে পারে বড়লোকে—যাদের কড়ির উপর কণ্ট্রোল আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে। নইলে মড়িপোড়া গরীব গুরবোরা ? আরে ফাই, ফাই !"

বাণীদেবী বলিলেন, "তা বাপু তোমাদের এটা মস্ত অন্যায়। সে গরীব হোক বোকা হোক যা হোক, এদ্দিন তোমাদেরই পোষা ডাভটি হয়েছিলো তো। তোমরা দিলে ওর মেজাজ বিগড়ে—শুধু তাহলেও রক্ষে ছিল—দিলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। ও যাবে না বিগড়ে ?"

মিঃ সানিয়াল তাঁহার কথা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, "বাই জোভ,—তোমার এ কথায় ত একসেপশান নেবার কিছু নেই। বিগড়োনো বলে কোন কথাই নেই,—আসলে হচ্ছে, সব চুপিসাড়ে, ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে, কেউ না জানতে পারে। নইলে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা—সেটা ত মস্ত বড় একটা আর্ট !"

কল্পনাদেবী অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন ! ও আবার নাকি খাবে কাঁঠাল ভেঙে পরের মাথায় ? গেছি আর কি ? ঘটে যদি ওর সে বুদ্ধিও থাকতো !"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "না, না,—যতটা ভাবছো ততটা নয়। ইচ্ছেটা আছে পূর্ণ মাত্রায় কাঁঠাল খেতে, তবে তার বুদ্ধিটুকু যোগায় নি ওর প্রভিডেন্স, এই যা।"

বাণীদেবী বলিলেন, "যাক, কত টাকা ভেঙেছে ধরতে পারলে কিছু ?"

মিঃ সানিয়াল দীর্ঘ সিগারে একটি বিপুল টান দিয়া অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বলিলেন, 'ওঃ সব শুনতে পাবে ক্রমে।"

কল্পনাদেবী একটু অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, "তোমার 'ক্রমে' ত ? মস্ত বড় কাজের লোক কিনা—দু গেলাস বেশী চললো ত অমনি কুপোকাৎ !"

কল্পনাদেবী পুনরায় বলিলেন, "নাও ঢের ভনিতা হয়েছে, দিদিরও কলের সময় হয়েছে। যা করবার করে ফেলো চট করে।"

বাণীদেবী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আর দেরী কোরো না, মন্মথও এসে পড়লো বলে। ওর সম্বন্ধে যা করবার বা ওকে যা বলবার, এখনই ঠিক করে ফেলো। নইলে তোমাদের যে মুখ আলগা, আর গরম মাথা ! বিগড়ে ত গেছলোই ও। দেখো সাবধানে কথা কোয়ো, ওকে হাতে রাখা চাই এখনও কিছুদিন, বুঝলে ?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—ও যেখানেই থাকুক, আমি তু বলে ডাকলেই আসবে। তবে ঐ কুসুমটার গ্রাস থেকে ওকে ছাড়াতে হবে বটে।"

বাণীদেবী বলিলেন, "সে ত আর চোখ রাঙালে হবে না"—

কল্পনা দেবী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "না, তা কেন, ওকে রসগোল্লা খাইয়ে ওপথ ছাড়াতে হবে, কেমন না ? তুমি থামো বলছি। জানো ঐ কালকুটে মেয়ে মানুষটার কাছে বাহাদুরী মারতে গিয়ে ডাক্তারখানার তবিল ভেঙেছে ? রোজ নবাবী দেখিয়ে মদ মাংস খাইয়েছে আর বলেছে, জাহাজে ডেলি নসিকে দশসিকে রোজগার করেছে ! ভাগ্যে ডাক্তারটা কিছু দেখে না।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "ওঃ রোজগার ? ফেয়ারলি ওয়েল, ঠিক পথই বেছে নিয়েছে, তবে কাজটা হয়েছে একটু কাঁচা। বিলগুলো সেধে নিয়ে একদিন ফায়ার একসিডেণ্ট করে নিলেই হোতো—তা হলে বিলের তাড়ার জন্যে জবাবদিহি করতে হোতো না। বিশেষ যে সার্প এণ্ড ইনটেলিজেণ্ট গার্লটা বুড়োর চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছে, তার ত আর জোড়া দেখতে পাইনে। ওঃ মার্ভালাস ইনটেলেক্ট—যেমন প্যারাগণ অফ বিউটি"—

কল্পনাদেবী ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম, থাম, একবারে

লাল গড়িয়ে পড়ছে যে মুখ দিয়ে! লজ্জাও করে না? ঐ, দিদি,—মোটরে কেবল হর্ণ দিচ্ছে। দেখো, বল্লভপুরের এই ঘরটা হাত ছাড়া হয়ে না যায়”—

বাণীদেবী আর একবার দর্পণে কপোলের উপর চূর্ণ কুন্তলগুলিকে আঁঠা দিয়া জুড়িতে জুড়িতে বলিলেন, “তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা, আর আমার হাত যশ! দেখা যাক্, কি করতে পারি।”

সোপানে অবতরণ করিতে করিতে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “হঁ, ভাল কথা, দেখিস যেন মন্মথকে চটিয়ে দিস নে—ও রাগলে সব ফেঁসে যাবে কিন্তু।”

বাণীদেবী চলিয়া গেলে পর মিঃ সানিয়াল আসন ত্যাগান্তে কল্পনাদেবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “এক পেগ না হলে ত আর চলছে না, ডিয়ারি! সব শরীরটা যেন কালিয়ে আসছে শীতে।”

কল্পনাদেবী আপনাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বলিলেন, “আঃ! ইডিয়ট! সময়-অসময় নেই?—তোমার শরীর ত চব্বিশ ঘণ্টা কালিয়েই আছে! যারা কাজের মানুষ হয়, তারা এমন করে শরীরটাকে মাটী করে ফেলে না। নিবিরাম!”

ডিকাণ্টার ও গেলাসের ঠুন ঠুন বাদ্য সংকারে নিবিরাম আসিয়া টেবিলের উপর সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক করিয়া দিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “ড্রাই ডিস-টিস কিছু দিয়ে যাবো এখন?”

কল্পনাদেবী বলিলেন, “না—তা এক আধটা দিয়ে যেতে পারো। তবে দিদি ফিরে না এলে ডিনার হবে না।”

কিছুক্ষণ পান ভোজন চলিল। মিঃ সানিয়্যালের ভাগে ভোজনের ভাগ যত না পড়িল, পানের ভাগ পড়িল তাহার চতুর্গুণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘূর্ণিত লোচনের লোলুপ দৃষ্টিও নিবদ্ধ হইয়া রহিল কল্পনাদেবীর সুসজ্জিত যৌবনশ্রীর উপর। তিনি টেবিলের উপর করাঙ্গুলির তাল রাখিয়া মৃদুগুঞ্জনে সুর ভাঁজিলেন,—“ও হেভেন্‌লি ইউথ—ও মাই বিউটি—”

হঠাৎ নিম্নতলে এক কলহমিশ্রিত চীৎকার উঠিল,—‘খুবরদার হারামজাদা! মুখ সামলে কথা ক’স—আমায় ধাক্কা? তোর-

উভয়ে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—সে চীৎকার যে মন্মথনাথের, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কল্পনাদেবী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। শশাঙ্কমোহন বোতল গেলাস টেবিলের নিচে লুকায়িত করিতেছিলেন, উঠিয়া গিয়া কল্পনাদেবীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, গোঁয়ারটা মাতাল হয়ে আসছে বোধ হয়, তুমি ওদিকে যেওনা।”

কল্পনাদেবী সবলে হাত ছিনাইয়া দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং মন্মথনাথকে উপরে উঠিতে আসিয়া দেখিয়া সক্রোধে বলিলেন, ‘মাতলামি করবার জায়গা পাওনি বুঝি আর? বেরিয়ে যাও বলছি এখনি—মাথা ঠাণ্ডা হলে যা বলবার বলতে এসো।”

হঠাৎ কল্পনাদেবীর এমনই ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি বাণীদেবীর সমস্ত উপদেশই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই যেমনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, অমনি কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “দেখ দিকি, কি কাণ্ড বাধিয়ে এলে সেদিন—কোথায় তার জন্যে একটু লজ্জা হবে, তা না যে কে সেই। ওমা, আমরা ভেবে ভেবে মরছি—”

ততক্ষণে মন্মথনাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিল। কল্পনাদেবীর কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া চোখ মুখ আগুন করিয়া বলিল, “ওঃ তাই বটে। বড্ডো আমোদের সময়ে বাধা দিয়েছি! দেখো, ভাল হবে না বলছি—ঐ মর্কটটাকে সত্যি বলছি, খুনোখুনি হয়ে যাবে একটা—রাস্কেল কোথাকার”—

মন্মথনাথের চোখে সত্যই তখন খুনের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মাথায়ও খুন চাপিয়াছিল, সে হস্ত উত্তোলন করিয়া যেভাবে শশাঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল, তাহাতে শশাঙ্কমোহন সত্যই ভীত হইয়া টেবিলের অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন, আর কল্পনাদেবীও ভীত হইয়া শুষ্কমুখে বলিলেন, “ছিঃ মোনো! এই দিকে এস,—এসো আমার কাছে, এসো বলছি!”

শোনা যায়, ময়াল সাপের চাহনিতে বনের জীব জন্তু

দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া উদ্যতমুষ্টি অবনমিত করিয়া একান্ত ভক্ত কুকুরের ন্যায় সুড় সুড় করিয়া অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িল, চলচ্ছক্তি ব্যতীত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি তখন যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কল্পনাদেবী তখন তাহার অংসের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া আধ আধ সুরে বলিলেন, "এম্‌নি করে ছোটলোক চাকর বাকরদের সঙ্গে মারামারি করতে হয়!"

মন্মথনাথ গলিয়া গেল,—বিশেষতঃ সে তখন শশাঙ্ক-মোহনের কালো হাঁড়ীর মত মুখমণ্ডল দেখিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। সেও মিষ্টসুরে বলিল, "তা আমার নিজের বাড়ীতে ঢুকতে ওরা আমায় বাধা দেয় কেন?"

'আমার নিজের বাড়ী' কথাটা বলিবার সময় মন্মথনাথ যে দৃষ্টিতে শশাঙ্কমোহনের দিকে চাহিয়াছিল, বোধ হয় নেপো-লিয়ন অষ্টালিজের রণজয়ের পরেও তেমন দৃষ্টিতে বিজিতদের দিকে চাহিয়াছিলেন কি না সন্দেহ!

শশাঙ্কমোহন বিকৃতমুখে বলিলেন, "নিজের বাড়ীতে ঢোকবার মত মুখ খুবই রেখেছো বোধ হয়, মাষ্টার মন্মথ"—

মন্মথ বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "চোপরাও হারামজাদ!—তুই কথা কবার কে?—আমি—"

শশাঙ্কমোহনও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "সাট্ অপ্ ইউ ব্লাডি র‍্যাস্কাল"—

কল্পনাদেবী তাড়াতাড়ি মাঝে পড়িয়া বলিলেন, "আহা হা কি কর সব—এসো খাওয়া দাওয়া করা যাক—দিদি এসে পড়লো বলে—না হয় আমরা বসে যাই"—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরের ফটকে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সোপান হইতে বাণীদেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কিগো নিধিরাম, তোমার দিদিমণিরা খেতে বসেন নি কি?" পরক্ষণেই তিনি কক্ষদ্বারে দর্শন দিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এই যে মোনোও এসেছে দেখছি—তা তোমরা খেতে বস নি এখনও?—"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "না তোমার জন্যেই দেরী হচ্ছে—"

বাণীদেবী পার্শ্বের কক্ষে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন, "কি দরকার দেরী করবার—রাত ত এদিকে বারোটাও হোলো। ওরা দুজনে অমন গোমড়া হয়ে রয়েছে কেন? বল না ডিনার দিয়ে যেতে—"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ও কিছু না—ও অমন হয়ে থাকে—"

শশাঙ্কমোহন লাফাইয়া উঠিয়া টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! কিছু না কি রকম? আমায় বলে হারামজাদ—ব্রেণলেস ইডিয়ট!" বাণীদেবীকে দেখিয়া ক্রমে তাঁহার সাহস গজাইয়া উঠিয়াছিল। মন্মথনাথও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া আবার মুষ্টি উত্তোলন করিয়া চীৎকার করিতে না করিতেই বাধা দিয়া কল্পনাদেবী শ্লেষের ভঙ্গীতে বলিলেন, "আর তুমিও কি কসুর করেছো? তুমিও ত ওকে ব্লাডি র‍্যাস্কেল বলেছো।"

শশাঙ্কমোহন মেঝের উপর পা ঠুকিয়া বলিলেন, "ও ইয়েস—এ হাণ্ড্রেড টাইমস বলবো—একটা ওয়ার্থলেস রেচ—ও কি কাজ করেছে সেটা একবার দেখলে না? বিলের টাকা ভাঙ্গে—ওর নামে সিভিল ক্রিমিন্যাল দুইই আসতে পারে জানো"—

মন্মথনাথ বাঘের মত থাবা মারিয়া মিঃ সানিয়্যালের কলার ও নেকটাই আঁকড়িয়া ধরিয়া রাক্ষসের মত চীৎকার করিয়া বলিল, "বেশ করেছি শুয়ার-কি-বাচ্ছা, খুব করেছি! তুই যে ডাক্তার খানার হাজার হাজার তবিল তছরূপ করেছিস্ ফল্‌স্ বিল দেখিয়ে—"

বাণীদেবী তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বিষম ধমক দিয়া বলিলেন, "কোথাকার মাতাল রে এটা—যা মুখে আসছে তাই বলে গাল দিচ্ছে। আ মলো, গালমন্দ করতে হয়, রাস্তায় গিয়ে করনা দুজনে।"

কল্পনা দেবীও সায় দিয়া বলিলেন, "দেখনা যেন শিয়াল কুকুরের ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছে—চাকর বামুনের সামনে! বেরিয়ে যাও এখান থেকে বলছি।"

নিশুতি রাতে তাঁহার সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন ইস্পাতের ধারের মত কর্ণকুহর বিদারণ করিল। মিঃ সানিয়্যাল এবার সত্যই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "কে—আমিও? ইউ মিন—মিসেলফও দূর হয়ে যাবো? বাই জোভ!"

এই বিসদৃশ মুহূর্ত্তেও তাঁহার বুকনি শুনিয়া ও হাবভাব দেখিয়া বাণীদেবী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমিও খেপেছো শশাঙ্ক ওদের সঙ্গে? এসো সবাই খাবে এসো। ওরে, ড্রাই ডিসগুলো নিয়ে আয়—"

শশাঙ্কমোহন কিন্তু কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করিলেন না, তিনি তখনও বিরস ও বিষণ্ণ বদনে রহিয়া বলিলেন, "না, না, লেট আস কাম টু এ ডিসিসান—"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ডিসিসান আবার কি—দুজনেই দুজনের সঙ্গে সেক-হ্যাণ্ড করো—এস মোনো—"

মন্মথনাথ অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু শশাঙ্কমোহনের মগজে তখন বোধহয় সুরাদেবী দুষ্টা সরস্বতীর ন্যায় ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। যিনি স্বভাবতই অতিমাত্র সাবধান—যিনি ওজন বুঝিয়া দরকারী কথা কহিতে অভ্যস্ত, বিবাদ বিসম্বাদের ত্রিসীমা যিনি মাড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, মানুষের সহিত আপোষ রফা করিয়া কোলে ঝোল টানাই যাঁহার প্রফেসান,—আজ তিনি হঠাৎ কেন যে অসম্ভবরূপে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে অতি বড় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও বোধ হয় হার মানিয়া যাইবেন। সত্যই মিঃ সানিয়্যাল বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বাই নো মিন্‌স্! লেট হিম ফার্ষ্ট এপলোজাইস।"

মন্মথনাথ বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কে আমি মাপ চাইবো কখনই না—বিশেষ ঐ মর্কটের কাছে? ওঃ—"

মিঃ সানিয়্যাল মুষ্টি উদ্যত করিয়া বলিলেন, "মর্কট? ইউ ড্যাম সোয়াইন!" মুষ্টি কিন্তু তাঁহার ব্যবহার করিবার অবসর হইল না, দ্রুতবেগে মন্মথনাথের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া টেবিলের একটি পায়ায় বাধা পাইয়া তিনি সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন—মন্মথনাথ হো হো রবে হাসিয়া

কল্পনাদেবী ভৃত্য-পরিজনের সম্মুখে এইভাবে হতমান হইয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, ভীষণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই দরোয়ান, নিকাল দেও আবি—নিকাল দেও। ছোটলোক—কোথাকার! লজ্জা করে না এমনি করে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে?"

ততক্ষণ নিধিরাম ও দরোয়ান আসিয়া শশাঙ্কমোহনকে ধরিয়া তুলিয়াছিল, তিনি কোটের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অভিমানাহত ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা,—নিকাল দেও? আমাকে? নিকেল্‌ফ কে?"

কল্পনাদেবী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "নিধি, তোমরা ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো—"

বাণীদেবী বলিলেন, "আহা-হা! তাকি হয়? ডিনার রেডি—এসো শশাঙ্ক—"

শশাঙ্কমোহন গদগদস্বরে বলিলেন, "ওঃ এনাফ! আর খেয়ে কাজ নেই, ঢের হয়েছে। আচ্ছা—দেখুবো—আই 'ইল সি!"

মন্মথের দিকে কটমট দৃষ্টিপাত করিয়া হুক হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া শশাঙ্কমোহন সোপান বহিয়া নামিয়া গেলেন—বাণীদেবী তাঁহাকে বাধা দিতে গেলে কল্পনাদেবী তাঁহাকে ধরিয়া নিবারণ করিলেন, বলিলেন, "থাক না এখন, ফিরে আসতেও দেরী হবে না।"

আহারাদির পর দুই ভগিনীতে রাত্রি যাপনের পূর্ব্বে যখন দুইটি সিগারেট ধরাইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন এবং মন্মথনাথ নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, তখন বাণীদেবী বলিলেন, "তোর সব বিপরীত—মোনোকে শাসন না করে চটিয়ে দিলি শশাঙ্ককে কাজটা কি ভাল করলি?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "তুমি বোঝো না কিছু দেখছি। শশাঙ্ক রাগলেও ওর মুখ বন্ধ—কিন্তু মন্মথ? বাপরে! তুমিই না বল, ও বিগড়ে গেলে রক্ষে নেই?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রতিষ্ঠা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রেলওয়ে কনষ্ট্রাক্শানের চাকরী।

কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার যো নাই। উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব্ব-বাংলা এবং বিহার ও আসামের সমস্ত ই-বি-আর সিষ্টেম আগাগোড়া চষিয়া বেড়াইতে হয়। আজ হয়তো ঢাকায় লাইন তৈরীর কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকি, আবার কাল হয়তো যন্ত্রপাতি লইয়া পাক্শীর পদ্মার রুদ্র ভাঙনকে সংযত করিবার অর্ডার আসে।

ভবঘুরে জীবনটা কাটিতেছিল বেশ।

প্রকৃতির সমস্ত বুকখানাকে নির্দয়ভাবে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলি। বনের পর বন কাটিয়া ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়াইয়া নদী-নালার উপর বাঁধ বাঁধিয়া লাইন গাঁথিয়া যাই। সাবল, কোদাল এবং গাঁইতির জোরে স্বভাবের স্নায়ুপেশীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ করিয়া সর্বগ্রাসী বিশ্বকর্ম্মার পূজার উপচার সংগ্রহ করি। লোহার করাল ঝঞ্ঝনার সাথে সাথে রুদ্রের চরণধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কুণ্ডলি করিয়া বিষ-নিঃশ্বাস ছড়াইয়া যান্ত্রিক সরীসৃপ সভ্যতার সাথে সাথে ধ্বংসের গোড়া পত্তন করিয়া চলে।

কিন্তু সময় সময় করুণা হয় প্রকৃতির নিষ্ফল ক্ষোভের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া। ভরা বর্ষার হার্ডিঞ্জ ব্রীজ। দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার গেরুয়া জল তটরেখা অতিক্রম করিয়া বিনাশের আনন্দে উদ্দাম হইতে চায়। মানুষের কর্মশালার ভিত্তি নড়িয়া ওঠে, লোহা-পাথরের শৃঙ্খল লইয়া আমরা ক্ষুব্ধ পদ্মাকে আবদ্ধ করিবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসি।

তখন সন্ধ্যা।

এপাশে বিরাটকায় লোহার পুলটা পাণ্ডুর তারার আলোয় একটা মহাকায় দানবের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বর্ষার প্রবল জলস্রোত পিলারে পিলারে ব্যাহত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়াছে এবং একটা অবিচ্ছিন্ন শ্রান্তিহীন বিরাট গম্ভীর কল্লোলে পদ্মার সমস্ত বুকটা যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এপারে অসংখ্য ইলেকট্রিক লাইট উঁচু তীর হইতে নদীর জলে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে মিশিয়াছে দু'একটা ষ্টিমারের আলো। সকলের মাঝখানে পদ্মার বিরাট স্রোতধারা অনাদি জীবন-মৃত্যুর চলৎ স্রোতের প্রত্যক্ষ সঙ্কেত যেন।

পদ্মার পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এদিকে ব্রীজের দক্ষিণদিকে যেখানে ভাঙন ধরিয়াছে, সেখানে মেইন লাইন হইতে একটা লাইন টানিয়া আনা হইয়াছে। মালগাড়ি ভরিয়া রাশি রাশি পাথর আনিয়া ঢালা হইতেছে, যেমন করিয়াই হোক্ মানুষের এই কীর্ত্তিকে রক্ষা করিতে হইবে প্রকৃতির সংক্ষুব্ধ আক্রোষ হইতে। পদ্মার স্রোত আসিয়া পাথরের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, তার পর নিরাশা-কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, শুধু শাদা শাদা ফেনার চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া।

অদূরে কুলি-কোয়ার্টারগুলিতে আলো জ্বলিতেছে। সেই দিকে এবং পদ্মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনটা ভাবপ্রবণ হইয়া ওঠে, মনে হয় পরস্পর বিরোধী দুইটি শক্তির এই যে নির্লজ্জ প্রাণান্ত সংগ্রাম ইহার অবসানে কে পাইবে কতটুকু? দু'জনের সামনেই একটা অসাধারণ অন্ধতা, অজ্ঞতার আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে একটা প্রকাণ্ড সঙ্ঘর্ষের পানে—যেমন করিয়া অন্ধকার রাত্রের দুইটা বিপরীতগামী এক্সপ্রেসের কলিসান্ এবং ক্ষমাহীন সর্ব্বনাশের মাঝখানেই যা'র অনিবার্য পরিসমাপ্তি!

অকস্মাৎ একটা নিরুদ্ধ চিন্তার দুয়ার খুলিয়া যায় যেন।

ঝর্ ঝর্ করিয়া রাশি রাশি হাওয়া আসিতে থাকে, সপ্তর্ষির গতি-পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে রাত্রি বাড়িয়া চলে। পাক্সী ষ্টেশানের সিগন্যালে নীল আলো দেখিতে পাওয়া যায়, কী একটা ট্রেন্ আসিতেছে বোধ হয়।

দিনের পরে দিন।

লোহা-লক্কড়, চেইন, বলটু এবং ফিস্‌প্লেটের মাঝখানে যেন নিঃশ্বাসের অবকাশ নাই। মাইলের পর মাইল অগ্রসর হইয়া যাই, সৃষ্টির পরোয়ানা লইয়া সম্মুখের জগৎ বিরাট অসহায়তায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেয়। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, সমস্ত জীবনটা কর্মচক্রের অবিরাম গতির সঙ্গে যেন বাঁধা পড়িয়া গেছে।

হুকুম আসিল, এবার যাত্রা করিতে হইবে আসামে। গৌহাটির ওদিকে কতকটা জায়গায় এক্‌সটেন্‌সান অনিবার্য হইয়াই পড়িয়াছে।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট গোবিন্দ আসিয়া বিরক্তকণ্ঠে বলে, "এমন ক'রলে তো আর পারা যায় না! আমরা যেন মেসিন, চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল কাজ আর কাজ, বিরাম নেই তার! ক'দিন এখানে বেশ বিশ্রাম করা যাচ্ছিল, তা' কোম্পানীর আর সইল না!"

সান্ত্বনা দিয়া বলি, "যে কাজের যে ধরণ, রাগ ক'রলে লাভ হবেনা গোবিন্দ! তা'র চাইতে কুলির সর্দারকে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রতে ব'লে দাও, কাল্‌কে ষ্টার্ট করার অর্ডার আছে।"

গোবিন্দ তবু বকিতে থাকে: "এবারে লম্বা ছুটি নেব, তারপরে গতিক বুঝলে একেবারে দেব সেলাম ঠুকে, বুঝলেন নন্দ দা! কদ্দিন আর পোয়ানো যায় এ ঝক্‌মারী, বলুন তো! শ্বশুর ব'লেছিলেন, ঢুকিয়ে দেবেন কর্পোরেশানে, তা নয় এই কন্‌ট্রাকসানেই মরতে এলাম—হুঃ!"

শ্বশুরের প্রতি গোবিন্দের অচলা নিষ্ঠা। ভদ্রলোক কী মন্ত্রে জামাইকে এত বশ করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার প্রসঙ্গ উঠিলে আর সহজে ওর মুখ বন্ধ হইতে চায় না। চলিতেই থাকে:

"উনি কাউন্সিলার নন বটে, কিন্তু আগাগোড়া কলকাতা কর্পোরেশনটা, মায় মেয়র স্বয়ং পর্য্যন্ত ওঁর হাতের মুঠোয় কি না! উনি ইচ্ছে ক'রলে এক কথায় একশো টাকার চাকরী,— দুত্তোর ছেড়েই দেব এই ছন্নছাড়া গোলামী!"

কিন্তু গোবিন্দকে আমি চিনি। ব্রীজ ইন্‌সপেক্টরগিরির অজস্র কাঁচা পয়সার সুযোগ হইতে নিজেকে যে ও স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়া লইবে না, ওর বুদ্ধির উপরে এতটুকু শ্রদ্ধা আমার আছে। তা' ছাড়া ওর অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী শ্বশুরের ক্ষমতা সম্বন্ধে বোধ হয় আমার মতোই মনে মনে কিছু সন্দেহ পোষণ করে—মুখে যাই-ই বলুক না কেন।

হাসিয়া বলি: "কিন্তু এখন গল্প ক'রবার সময় নেই গোবিন্দ, সাহেবের ট্রলি আস্‌বার সময় হয়েচে। তুমি বরং কুলিগুলোর কাজে নজর রাখো। আমি রিপোর্টটা দিই।

একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই গোবিন্দ চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে বাহির হইতে ওর উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে আসে, কুলি-গুলোকে ধমকাইতেছে। সাহেব আসিবার পূর্ব্বাহ্নে এটা অবশ্য কর্ত্তব্য বই কি।

আসামের পার্ব্বত্য প্রকৃতি।

বাঙলার মাটির মতো নমনীয় স্নেহশীল নয়, যেন একটা কঠোর স্পর্দ্ধা লইয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই নিশ্ছেদ শ্যামলশ্রী এখানে অনেকটাই বদ্‌লাইয়া গেছে, ধূসর পাহাড়ের রুক্ষতা ইতস্তত চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। শাবলের ঘা লাগিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায় না, চক্‌মকির স্ফুলিঙ্গ হানিয়া ঠন্ করিয়া সে আঘাত ফিরাইয়া দেয়। সহজে পরাজয় স্বীকার করিবেনা যেন।

কিন্তু না করিয়াও উপায় নাই। যেখানে বাহুবল অশক্ত সেখানে বিজ্ঞান তাহার মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। সংগ্রাম করিয়া দুর্বল পৃথিবী সেখানে জিতিবে কী করিয়া! শেষ পর্যন্ত ডিনামাইট আছে সহায়, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা শতচূর্ণ হইয়া পথ করিয়া দিতে বাধ্য।

পাহাড়ের কোলেই তাঁবু গাড়িয়া বসিয়াছি।

সমস্ত দিন কাজ চলে। লাইন মাপা, পাথর ঢালা, স্লিপার ফেলা, সর্ব্বশেষ লাইন বসানো। সঙ্গের কুলিরা কাজ করে, সেই সাথে প্রয়োজন বোধে স্থানীয় কুলিও কতক কতক সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইয়া দিতে হয় দিন মজুরীর হিসাবে। উপরি লাভের অঙ্কটাও এই খানেই স্ফীত।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ওদের কাজ দেখি।

মেয়েরাও অনেক সময় কাজ করিতে আসে, খুঁটি, নাটি

হঠাৎ এক সময় কেমন করিয়া যেন ওদের একটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া যায়।

আসামী মেয়ে।

বয়েস আঠারো উনিশের বেশি হইবে না, সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। শ্যামল মুখখানা সুশ্রী হয় তো নয়, কিন্তু আমাদের বাঙালি মেয়ের মতোই একটা সরল মাধুর্য মাখানো। আর মেয়েটা কী হাসিতেই জানে! কথায় কথায় অপর্যাপ্ত হাসির তরঙ্গ বন্যার মতো ছড়াইয়া দেয়। ভারী সুন্দর লাগে আমার।

কিন্তু গোবিন্দ চটিয়া যায়। বলে, "আর যাইই বলুন না দাদা, মেয়েটা যে বড্ড বেহায়া এটা কিন্তু স্বীকার ক'রতেই হ'বে। আমার শ্বশুর বলেন, বাঙালী মেয়েদের চরিত্রের প্রধান গুণ হ'চ্ছে এই যে তা'রা লজ্জাশীলা। অতগুলো পর পুরুষের মাঝখানে অমনি করে হাসি, রামঃ।"

গোবিন্দের বিভিন্নমুখী সংস্কারের কাছে কিছু বলাই নিস্ফল, তবু ওকে উসকাইবার জন্যই বলি, "আমাদের বাঙালী মেয়েদের লজ্জার পরিমাণটা আর একটু কম হলে যাতটার পক্ষে সেটা ভাল হত গোবিন্দ।"

গোবিন্দ উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে: "তা তো হ'চ্ছেই দাদা, তা'র জন্যে আর আক্ষেপ কেন? আপনাদের নারী-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা লজ্জা সরমের শেষ বিন্দুটুকুনও ভুলতে ব'সেচে আর কি। সাধে কী শ্বশুর ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে চু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেননা!"

"তা' তোমার স্ত্রীও তা' হ'লে—"

মুখের কথা লুফিয়া নেয় গোবিন্দ: "নিশ্চয়। নারী-প্রগতির হাওয়া তা'র গায়ে লাগেনি', ইস্কুলে পড়েনি কিনা! আর লজ্জা, সে আর কী ব'লব দাদা যেন একেবারে লজ্জাবতী লতা—!"

শেষ কথাটা বলে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া।

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়ি: "একটু বেড়িয়ে আসি গোবিন্দ, ও প্রসঙ্গ এখন থাক্‌!"

কিন্তু গোবিন্দ সঙ্গ লইতে ছাড়েনা। বলিয়া চলে, শ্বশুর বলেন আমার মেয়েকে আমি বয়াটেপানা শিখ্‌তে দিইনি বাপু, তা'কে তৈরী ক'রেচি সীতা সাবিত্রীর আদর্শে! কাজে কর্মে, রান্নায় বান্নায়, একেবারে—হুঁঃ!"

গোবিন্দের সতী সাবিত্রীর আদর্শের সাথে আমার মত মেলেনা বলিয়াই ওদের সঙ্গে আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিনা।

সন্ধ্যার সময় মজুরী লইতে আসে দল বাঁধিয়া।

ইচ্ছা করিয়াই সকলের শেষে ওদের নাম ডাকি। ভীড় যখন একেবারে কমিয়া যায়, তখন পুরুষটাকে জিজ্ঞাসা করি, "তোর নাম কিষণ না-রে?"

মাথা নাড়িয়া জানায়, ওই নামই বটে।

সবল চেহারা মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। বয়েস্ কতই বা হইবে, হয়তো কুড়ি বাইশ।

আবার প্রশ্ন করি: "তোদের বাড়ি কোথায়?"

দেশী ভাষায় কিষণ উত্তর দেয়: "এদিকের দু'টো পাহাড় পার হ'য়ে একখানা গাঁয়ের পরেই।"

"কে কে আছে তোর?"

জিজ্ঞাসা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা বাঁধনহারা ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে হাসিয়া ওঠে, কেন কে জানে। কিষণ ধমকাইয়া ওঠে; "হাসিস্ নি, চুপ কর্ মণিয়া। না বাবু, শুধু আমি আর আমার বৌ, আর কেউ নেই আমাদের।"

বলিয়া আঙুল দিয়া বৌকে দেখাইয়া দেয়।

আরো দু' একটা কথার পরে ওদের বিদায় করিয়া দিই।

দূরে দেখিতে পাই, পাহাড়ের বাঁক ঘুরিয়া ওরা দু'জনে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ওদের মধুনীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে। ওদের যৌবন-স্বপ্নে রচা একটি কুটির, কপোত-কপোতীর একটি স্নিগ্ধ বিরামকুঞ্জ ওদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া। নিজের বুকের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন শূন্যতা যেন এই মুহূর্তে প্রকট হইয়া ওঠে।

আলাপ ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে।

একদিন বলি, "তুই আমার কাজ ক'রবি কিষণ?"

সাগ্রহেই রাজী হয়। বলে, "ক'রব বাবু।"

—"তা হ'লে মাইনে নিবি কত?"

একমুখ চরিতার্থতার হাসি হাসিয়া জবাব দেয়, "আপনি যা ভালো মনে করে দেবেন, তাই-ই নেব।"

ঠিক হইয়া যায়। কাজ ভালোই করে বলিতে হইবে,

খুসী না হইয়া উপায় নাই। ক্রমে ক্রমে এমন হয় যে ওর হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি; কিন্তু দিন-মজুরীর মোহ তবুও ছাড়িতে পারে না। অবসর পাইলেই গাঁইতি কাঁধে করিয়া ছুটিয়া যায়।

কখনো বা বলি, "এত খাটতে পারবি কেন রে?"

স্মিত হাসিয়া উত্তর করে, "বেশ পারব বাবু এতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না।"

না হয় ভালোই।

মাঝে মাঝে মনিয়া আসে।

ওকে ডাকিয়া দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দিবে কী, হাসিয়াই কুটি কুটি হইয়া যায়, বোধ হয় আমার অদ্ভুত আসামী উচ্চারণ শুনিয়া। তবু ওর হাসিই আমার ভালো লাগে, হয় তো শুধু হাসি-শোনার জন্যই ওর সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করি।

এক সময়ে কিষণকে জিজ্ঞাসা করি, "যাবি আমার সঙ্গে বাঙলা দেশে?"

প্রথমেই উৎসাহের বশে বলিয়া ফেলে, "যাব।" কিন্তু তারপরেই মত বদলাইয়া যায়, বলে, "না বাবু, যেতে পারব না দেশ ছেড়ে।"

মতি পরিবর্তনের কারণটা বুঝিতে পারি। সকৌতুকে বলি: "দেশ ছেড়ে, না বৌকে ছেড়ে?"

সলজ্জ হাসিয়া কিষণ চুপ করিয়া থাকে। সরল, স্বচ্ছ, সত্য,—জবাব দিবার কীই বা আছে?

সমস্ত দিনের কর্মকাতর দেহমনকে সজীব করিবার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার আগে বাহির হইয়া পাড়ি।

খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর বাঁশির সুর কাণে আসিতে থাকে। হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে সেদিকে চলিতে আরম্ভ করি।

ছোট একটা পাহাড়ী স্রোত। জল অল্প, কিন্তু স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী স্রোতের টান শ্রাবণের ভরা গঙ্গার চাইতেও অনেক বেশি প্রখর। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, হাত দিলে যেন কচ করিয়া কাটিয়া যায়।

সেইখানে একটা পাথরের উপর বসিয়া কিষণ বাঁশি বাজায়। পাশে মণিয়া। আমাকে দেখিয়া বাঁশি বন্ধ করিয়া অভ্যর্থনা করে, বড় একটা পাথরের চাপ দেখাইয়া দিয়া বলে, "বসুন বাবু।"

বসি। বলি, "বেশ তো বাঁশি বাজাচ্ছিলি, বন্ধ ক'রলি কেন? আবার বাজা।"

কিন্তু আর বাজায় না। হয়তো প্রাণের স্বতোৎসারী সহজ ছন্দটি আমার আগমনে ব্যাহত হইয়া গেছে। বলে, "আপনার ওখানে আর একমাস কাজ ক'রব বাবু, তারপর চলে যাব।"

বিস্মিত হইয়া বলি, "চলে যাবি? কোথায়?"

—"চা বাগানে।"

চা বাগানে! বিস্ময় বাড়িয়াই যায়: "সেখানে যাবি কিসের জন্য?"

খাটতে যাব বাবু। মণিয়ার এক ভাই আছে, চা বাগানের সর্দার। সে বলেছে, চা বাগানে নাকি ভারী সুবিধে, মজুরী বেশি, খাটুনিও কম। মণিয়ারও তাই ইচ্ছে।"

দুঃখিত হইয়া বলি, "সত্যিই তা হ'লে যাচ্ছিস্? একা, না মণিয়াকে নিয়ে?"

মণিয়ার রুদ্ধ হাসির স্রোত এবার বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এরকম কারণে-অকারণে হাসিয়া ওঠা ওর বৈশিষ্ট্য। পার্ব্বত্য প্রকৃতির স্তব্ধতা সে হাসির ঝঙ্কারে যেন গুঞ্জন করিয়া ওঠে।

কিষণ বলে, "না বাবু, আমরা দুজনেই যাবো। আর মণিয়া ছেলেমানুষ, কার কাছেই বা রেখে' যাবো ওকে। কেউই তো নেই আমাদের।"

শেষ কথাটায় বেদনার আভাষ পাই।

মণিয়া বোঝে। বলে, "কেউ নাই বা থাকল, আমরা তো আছি। তা'র জন্যে দুঃখ কিসের রে?"

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। ওদের নিশ্চিন্ত নির্ভর ভরা মুখের পানে চাহিয়া "মহুয়ার" দুটো লাইন মনে পড়িয়া যায়:

"কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।"

আসন্ন সন্ধ্যার প্রশান্ত মুহূর্তটিতে দুইটি প্রাণের সানন্দ স্পন্দন যেন আমার মনের তন্ত্রীতে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে।

কাজ আর কাজ, লোহা আর পাথর! কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, নিশ্ছিদ্র জমাট দিনগুলি।

সামনের বড় পাহাড়টা পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বিধ্বস্ত না করিতে পারিলে মানুষের জয়ের অভিযান অগ্রসর হইতে পারে না।

হেডকোয়ার্টার হইতে সাহেব আসিয়া দেখিয়া যায়।

পরের দিন সুরক্ষিত লোহার গাড়িতে করিয়া ডিনামাইট আমদানী হয়, বিংশ শতাব্দীর মহাকালের সর্ব্বধ্বংসী বজ্রের দল।

বড় বড় ট্যাবলেটের মতো দেখিতে, কে জানে এতটুকু একটা জিনিসের মধ্যে সংহারের এত প্রচণ্ড, দুর্দমনীয় শক্তি। লোহার মতো কঠিন পাহাড়ের বুক এক আঘাতে শতচূর্ণ করিয়া ফেলে। যন্ত্রযুগ, দধীচি নোবেলের বহু দুঃখের সাধনার ফল এই বজ্র!

সতর্কতার ত্রুটি নাই।

কয়েক ফুট পুরু লোহার ঘর, বরফের মতো ঠাণ্ডা। বাহির হইতে এতটুকুও আলো সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। অতি সাবধানে ঢুকিয়া আনিতে হয় ডিনামাইট বাহির করিয়া, এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় একটা জীবন্ত মানুষের অস্তিত্ব শত খণ্ড হইয়া যাইতে পারে হয় তো।

পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ডিনামাইট সাজাইতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে লম্বা লম্বা পলিতা, একদল কুলি আসিয়া তড়িৎ গতিতে পলিতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া তেমনি দ্রুত বেগে অনেকখানি দূরে নিরাপদ জায়গায় সরিয়া আসে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এক সঙ্গে যেন একশো বজ্র গর্জন করিয়া ওঠে, সে শব্দে দু'কাণ বধির হইয়া যায়। পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায় সামনের পাহাড়টা শতচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

তারপর শাবল গাঁইতি কাঁধে লইয়া আসে কুলির দল, পাথর সরাইয়া পথ তৈরী করিতে থাকে।

এমনি করিয়াই চলিতেছিল।

কিষণ আর মণিয়া আসে সঙ্গে একরাশ ফলফুল লইয়া। জিজ্ঞাসা করি, "হঠাৎ এগুলো কেনরে?"

বলে, "সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল বাবু, আর তিন চার দিনের মধ্যেই আমরা চা-বাগানে চলেছি।"

বেদনায় সমস্ত মনটা যেন ভারী হইয়া ওঠে। আত্মীয়হীন প্রবাসে এই দুটি চক্রবাক দম্পতী আমার নিঃসঙ্গ অন্তঃকরণকে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কে জানে! কথা খুঁজিয়া পাইনা, পকেট হইতে দু'খানা দশটাকার নোট ওদের হাতে ফেলিয়া দিয়া বলি, "তোদের বকশিস্ দিলুম।"

মণিয়া এবারে হাসেনা, ওর ডাগর দুটি কৃতজ্ঞ চোখ মেলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া থাকে।

কিষণ গভীর কণ্ঠে বলে, "আপনার দয়া কোনোদিন ভুলবনা বাবু!"

ওরা বিদায় লইয়া যায়।

অজ্ঞাতসারেই একটা নিঃশ্বাস পড়ে, জোর করিয়া মনটাকে কাগজ-পত্রে ডুবাইয়া দিই। জীবনটা একটা অশ্রান্ত কর্ম্মস্রোত, সেখানে ভাববিলাসের স্থান মিলিবে না।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কাণে আসে। এখন কোথায় ডিনামাইট ফাটিল? পরিচিত একটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সন্দেহে থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে

গোবিন্দ ছুটিয়া আসে ব্যস্ত হইয়া।

"আবার সেই রকম অ্যাক্সিডেণ্ট দাদা! কোন একটা ট্যাবলেটের অ্যাক্‌শান হয় নি, পাথরের ভেতরে ছিল লুকিয়ে। আপনার ওই চাকরটা, কিষণ না-কি নাম, পাথরের ওপরে যেমনি গাঁইতির ঘা দিয়াছে, অমনি বার্ষ্ট ক'রে—"

চোখের সামনে সমস্ত আলো যেনো এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া যায়।

গোবিন্দ বলিতে থাকে: "চারিদিকে কেবল রক্ত আর মাংসের টুক্‌রো, লোকটার আর চিহ্নমাত্রও নেই। বীভৎস! ওপরে এক্ষুনি একটা রিপোর্ট ক'রে দিন, সাহেব এসে যা হয় করুক। কোম্পানীকে এ যাত্রা আবার কম্‌পেনসেসানের দায়ে না পড়তে হয়!"

মস্তিষ্ক হইতে আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন মুছিয়া গেছে—

মণিয়ার হাস্যোচ্ছ্বসিত মুখখানা পলকের জন্য একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়...

...কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে এ বলির মূল্য কতটুকুই বা?

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র ও শেষপ্রশ্ন*

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, সামাজিক অনুশাসন এবং ধর্মের অন্ধ মূঢ়তা—যাহা মানবের কল্যাণকে পদে পদে ব্যাহত করিয়া আসিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ। অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও নরনারীর প্রতি সুগভীর দরদ দিয়া তিনি সমাজের মর্ম্মস্থলকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন—তাহার মধ্যে যাহা অসুন্দর ও অকল্যাণকর তাহা তাঁহাকে বেদনা দিয়াছে এবং তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার দ্বারা ব্যঙ্গে, কৌতুকে, কারুণ্যে ও বেদনার ছায়াসম্পাতে অপরূপ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অতুলনীয় ভাষায়। আমাদের সামাজিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যেও যে আনন্দ-বেদনা, যে রস, যে মাধুর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই, সে রস ও মাধুর্য্যকে যাহা প্রতি-নিয়ত পিষ্ট করিয়া চলিয়াছে সে সব প্রবল বিরুদ্ধশক্তির অন্যায় অত্যাচারকেও আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। নারীর প্রতি পুরুষ-নিরঙ্কুশ সমাজের যে চিত্তহীন কঠোরতা, বিধি-নিষেধের যুক্তিহীন নির্য্যাতনে ক্লিষ্ট, পীড়িত নারী-চিত্তের যে চিরন্তন আকুতি তাহা তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; এবং এই উপলব্ধি তাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়াবেগের রসে অনুরঞ্জিত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহার সাহিত্যে। শুধু নারীর প্রতি অবিচার নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধেই তিনি নিঃশঙ্ক সার্থকতার সহিত অভিযান করিয়াছেন: সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যমূলক বিধি-ব্যবস্থার ধ্বংসের ইঙ্গিতই তিনি দিয়াছেন। তাঁহার নিজের ভাষাতেই "ক্ষমাহীন সমাজ প্রীতিহীন ধর্ম্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা,—এর আমূল পরিবর্ত্তন ও প্রতিকারের বিপ্লবপন্থাতেই" মানবজাতির কল্যাণ। শরৎ-সাহিত্যের ব্যাপক ও বিস্তৃত সমালোচনা করিবার দিন এখনও আসে নাই,—আমাদের ভাবী সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার যথার্থ সমালোচনা অভিব্যক্ত হইবে। আমরা শুধু 'শেষপ্রশ্নের' মূল তথ্যটি অনুধাবনের প্রয়াস পাইব।

'শেষপ্রশ্ন' যখন প্রকাশিত হইল তখন বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে এক প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল। কেহ বা ইহার প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিলেন; আর কেহ বা পরম বিজ্ঞভাবে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে শরৎবাবুর "শেষপ্রশ্নে" কোন আর্ট নেই—আছে কেবল শব্দের ঝঙ্কার, তার্কিক-গবেষণা ও ভাষাবিন্যাসের চাতুরীর অভ্যন্তরে পশ্চিমের জীবন-যাত্রার অন্ধ-অনুকরণের প্রচেষ্টা। কেহ রসস্রষ্টাকে নৈয়ায়িকের আসনে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন; আর কেহ বা বুঝিয়া ফেলিলেন "শেষপ্রশ্নের" কমল কাঁদায় না, ঝাঁপায় না, হাসে না, কাঁদে না—এ যেন বিলেত থেকে আমদানী করা এক বাণ্ডিল তর্কমাত্র। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যেদিন এই বিচার-বিতর্কের নিষ্পত্তি হইবে, "শেষপ্রশ্নের" চরম জবাব মিলিবে।

যুক্তিহীন সংস্কারের অন্ধ অনুবর্ত্তন ও গতানুগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যে প্রবল বিদ্রোহ তাহার পূর্ণ প্রতীক "শেষপ্রশ্নের" কমল। নারী-জাতির প্রতি যুগপরম্পরায় যে বৈষম্যমূলক অবিচার চলিয়া

* ইংরেজী ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ, আই-ই-এস্ মহোদয়ের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত "শরৎ-বন্দনা" উৎসবে পঠিত। ইহার অনতিকাল পরেই লেখক রাজবন্দীরূপে অবরুদ্ধ হওয়ায় এই প্রবন্ধ এতদিন প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

আসিয়াছে, যে ধূর্ত্ততা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়া নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছে তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে কমলের আবির্ভাব। যে সাহিত্য ও শাস্ত্র কেবলমাত্র দুঃখভোগ ও নিঃস্বার্থ আত্মদানকেই নারীজাতির চরম আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে তাহা পুরুষেরই সৃষ্টি। শুধু সাহিত্যে নয়, সমাজের বিধান, ধর্ম্মের অনুশাসন প্রভৃতির ভিতর দিয়াও পুরুষ নারীজাতিকে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে। নিঃস্বার্থ আত্মদান, আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মবিস্মরণকেই নারীজাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া চিরাচরিত প্রথার আলোবায়ুহীন গহ্বরে তাঁহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থ দিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তার ফলে তাহাদের অন্তর-বাহিরে যে আত্মপ্রবঞ্চনার লীলা চলিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে স্বার্থান্ধ পুরুষের "বাহাবা"। পুরুষ নারীকে দেবী বলিয়া তোষামোদ করিয়াছে, 'পূজার্হাঃ মহাভাগা" বলিয়া তাহাদিগকে মোহগ্রস্ত করিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করিবার স্বাভাবিক অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে তাহাদের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যাহা Ibsen-এর "The Doll's House" "নাটকের নায়িকা Norar মুখে সবলে উচ্চারিত হইয়াছে, "Before all else I am a reasonable human being" শরৎচন্দ্র নারীজীবনের সেই সত্যটিই কমলের ভিতর দিয়া প্রচলিত বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহের ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কমলের সত্যিকার পরিচয় পাই তখন, যখন সে রাজেনকে বলিতেছে—"ভাই, লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী; তা হলে তোমার সাথেই আমার সম্বন্ধ হবে অক্ষয়।" কমলের সমগ্র চরিত্রে তাহার বিপ্লবী প্রকৃতিটাই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গতানুগতিকতার কোন বন্ধন, প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার কোন মায়াজাল তাহার সত্য-সন্ধ চিত্তের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। মানবের কল্যাণ সে কামনা করিয়াছে, সমাজের মান্ধাতা পুরুষটিকে বাঁচাইবার জন্য মানুষের শুভকে বলি দেওয়াটাকে সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই অক্ষয় প্রভৃতি গোঁড়ার দল তাহাকে ঘৃণা করিল; তাহার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল; কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্জ্জয় ইচ্ছা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অদম্য সাহস তাহার চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে যে আমাদের সমগ্র চিত্ত-বৃত্তি তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত বাক্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। 'বদ্ধমত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে প্রাচীন সংস্কারের আড়ালে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট" হইয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়; অচল সংস্কারের আবর্ত্তে নিমজ্জিত থাকিয়া চলিষ্ণু জগতের মঙ্গলজনক আবহাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিবার মতো তামসিক মন তাহার নাই। তাইত তাহার সমস্ত বাক্যে, সমস্ত কর্ম্মে কেবল বিদ্রোহের ঝড়ই প্রবাহিত হইতেছে। তাহার এই সচলতা, এই দুর্ব্বার প্রাণশক্তি জড়ভাবাপন্ন, রীতিনিষ্ঠ নারীস্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না বলিয়াই সমাজের সঙ্গে তাহার দ্বন্দ্ব।

কমলকে আমরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি না সত্য; কিন্তু তাহাকে আমাদের সমাজের ভাবী কল্যাণের অগ্রদূতরূপে মানিয়া লইতেই হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কমল বিপ্লবী। সমাজ-বিপ্লবের প্রবল প্রবাহে প্রচলিত অনেক ব্যবস্থাই ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে আবর্ত্তিত হইয়া উঠে। কিন্তু এই বিপর্য্যয়ের পর নূতন সৃষ্টির যে অম্লান সুষমা প্রকাশ পাইবে তাহাই জাতির চিত্তকে নন্দিত করিবে। শরৎ চন্দ্রের পূর্ব্বতন সমস্ত গ্রন্থে প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও অস্বীকারের ভাব ধূমায়িত হইয়াছে তাহাই বিপ্লবের সূচনায় প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার "শেষপ্রশ্নে"। "শেষপ্রশ্নের" কমল প্রাচীনের সাথে আপোষ করিয়া চলিতে পারে নাই, চলিষ্ণু চিত্তের বিচিত্র প্রবাহ তাহাকে প্রবলবেগে নূতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শে যে নূতন সৃষ্টি বিকাশ লাভ করিতেছে তাহাই আমাদের জাতিকে কল্যাণের সন্ধান দিবে; প্রাচীনের অন্ধ-অনুবর্ত্তনে আমাদের সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়, আনন্দ ম্লান হয়, তাহাতে আমাদের কল্যাণ

নাই। রীতিনীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই রীতিনীতি—গোড়াতেই এই সত্যটি ভুলিয়া মানুষ দুঃখ পায় ও দুঃখ দেয়। ঠিক এই কথাটিই কমলের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে,—"ভারতের বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর।" আসল কথা বর্ত্তমান কালে সে বৈশিষ্ট্য কল্যাণকর কিনা; এ ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ মাত্র। মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মন যদি কেবলমাত্র প্রাচীনকেই প্রদক্ষিণ করিতে থাকে তবে পরিবর্ত্তনশীল জগৎ হইতে সে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং তাহাতেই তাহার পরম অকল্যাণ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা মানুষের মঙ্গল সংসাধন করিয়াছিল আজও তাহার মধ্যেই মানুষের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে—এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা মানুষকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহার পরিমাপ করা যায় না। ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া বর্ত্তমানকালের শিক্ষা-সভ্যতাকে অস্বীকার করিবার মনোবৃত্তি আমাদের প্রগতির পথে প্রবলতম অন্তরায়। আমাদের প্রাণশক্তি এতই ক্ষীণ যে আমরা বাহিরকে অভ্যর্থনা করিতে বেদনা পাই। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে একটা গণ্ডী টানিয়া তাহার ভিতর নিশ্চিন্ত আরামে অবস্থান করিয়া অতীতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলাতেই ভারতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছি বলিয়াই যদি আমরা দম্ভ করি তবে বুঝিতে হইবে আমাদের বুদ্ধি জড়তাগ্রস্ত হইয়াছে। "শেষপ্রশ্নের" কমল তাই বলিতেছে "বাইরে যদি আলো জ্বলে, পূর্ব্বদিগন্তে যদি সূর্য্যোদয় হয় তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে দেখতে হবে, এই হবে স্বদেশপ্রীতি?" কমলের মনে এই বিদ্রোহ জন্ম দিয়াছে প্রাচ্যের শিক্ষা ও ঐতিহ্যের সাথে প্রতীচ্যের সভ্যতা ও আদর্শের সংঘর্ষ কমল যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়েরই ফল। তাহার বিচিত্র জন্মবৃত্তান্তের ভিতরও বোধ হয় শরৎচন্দ্রের এই ইঙ্গিতই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কমলের জননী প্রাচ্যের, জনক প্রতীচ্যের—এ দুয়ের মিলনে কমলের উৎপত্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারা ও জীবনযাত্রার সমন্বয়েই আমাদের সত্যিকার কল্যাণ সূচিত হইবে ইহাই সম্ভবতঃ শরৎবাবু দেখাইতে চাহিয়াছেন তাঁহার 'শেষপ্রশ্নে'। সঙ্কীর্ণ বৈশিষ্ট্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমরা ভাবি যে অপর জাতির প্রাণশক্তির সংস্পর্শে আমাদের বিনষ্টি। কিন্তু আমাদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে চিরকাল এই সংস্পর্শকে এড়াইয়া চলিবার মধ্যে। প্রাচীন এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলে না বলিয়াই যদি জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক ব্যবস্থাকে আমরা অবজ্ঞা করি তবেই আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব। সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধ যদি আমাদিগকে বিশ্বের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করে তবে ইহার কী সার্থকতা আছে! কমলের মুখ দিয়া শরৎবাবু জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করিয়াছেন "বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধিনিষেধের ধ্বজা বয়ে বেড়ায় তবে ক্ষতি কি?" গোঁড়ার দল ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বলিল তাহা হইলে যে আমাদের ভারতের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। কমল তখন অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, "নাই বা চেনা গেল ভারতের মুণি-ঋষিদের বংশধর বলে, কিন্তু মানুষ হিসাবে ত চেনা যাবে। সেটাও ত অসত্য নয়।" কমলের মুখে এই যে বিশ্বমানবিকতার ইঙ্গিত Religion of humanityর এই যে অস্পষ্ট অভিব্যক্তি, ইহাকে স্বীকার করিতে গোঁড়ার দল পারে নাই, কিন্তু আমরাও যদি এই সত্যকে অবহেলা করি তবেই আমাদের 'মহতী বিনষ্টিঃ'। অভ্যাসের ও সংস্কারের জড়তা এবং মূঢ়তা হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বলোকের প্রাণের দরবারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই যেন কমলের অভিযান। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তনের' দাদাঠাকুরের কথা মনে পড়ে, "যে চক্র অভ্যাসের চক্র যা' কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকে বের করে সোজা বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই আমার ব্রত।"

কমলের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে সে বিবাহবন্ধনের সত্যকে স্বীকার করে নাই,—ইহা তাহার পক্ষে একটা অবান্তর অনুষ্ঠান মাত্র; সর্ব্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মের বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া সে স্বেচ্ছাচারকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু এই অভিযোগের মূলেও একটা

দৃঢ়মূল সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে নীতি শব্দটার যথার্থ তাৎপর্য্য কি? দেশ কাল ও অবস্থা ভেদে যাহার পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হয় তার কোনো বিশিষ্টরূপকে আমরা একমাত্র সত্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি কিনা! মানুষের ক্রমবিকাশ ও আনন্দ যাহাতে বাধপ্রাপ্ত না হয় তাহারই প্রয়োজনে বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মন অপ্রধানকে প্রাধান্য দিয়াছে; গতানুগতিকতার যুগকাষ্ঠে নিজের আনন্দকে বলি দিয়াছে, জগতের কত দুঃখ, কত বেদনা ও বৈষম্য যে ইহাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাই এই সংস্কারমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নীতি কথাটার বহু প্রাচীন এবং অভ্রান্ত তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে আমাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। (মনীষী Bertrand Russel তাঁহার Marriage and Morals" গ্রন্থে ইহার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন।) বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ভিতর সত্য নাই, সত্য আছে নরনারীর অন্তরের একান্ত মিলনে—ইহাই কমলের জীবনে রূপায়িত হইয়াছে। গোঁড়াদের দৃঢ়মূল সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগিল, তাহারা ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু কমল বিচলিত হইল না। যাহার ভিতর সত্য নাই, সমাজের ভয়ে তাহাকেই মানিয়া লইবার মতো দুর্ব্বলতা তাহার নাই। অন্তরে প্রেম নাই অথচ বাহিরের বন্ধন জোর করিয়া প্রেমের ভান আদায় করিবে—ইহার মতো অসুন্দর জগতে আর কিছুই নাই, নর-নারীর আত্মা ইহাতে অপমানিত হয়। তাই কমল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহের সুরে প্রচার করে, "একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে কারো অব্যাহতির পথ যদি সারাজীবনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায় তবে তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলা চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুলচুকেরই সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না। কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনি অধিক সেইখানেই লোক সকল উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে তবে তাকে ভালো বলে স্বীকার করা যায় না।" প্রেমের দুর্ব্বার শক্তি দিয়া অন্যকে একান্তভাবে আপন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমাদের নাই বলিয়াই বাহিরের বন্ধনকে এত কঠিন বলে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রাণপণ প্রযত্ন। অন্তরে যখন প্রেমের অভাব, তখন সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক বন্ধনে বাঁধিয়া রাখার মধ্যে আনন্দ নেই—এই বাধ্যতামূলক মিলনের মধ্যে মানবাত্মার পরম দুঃখ, পরম অপমান। নারী-পুরুষের পরস্পরের স্বাধীনতা যদি লোপ পায় তবে তাহাদের অন্তরের বন্ধনটাও সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। একের অন্তর যদি অন্যকে পরমভাবে অভিনন্দিত না করে তবে বাহিরের আনুষ্ঠানিক মিলনটা যে শুধু অসুন্দর তা নয়—অশ্লীল। নর-নারীর একটা মাত্র বন্ধন থাকিবে এবং সেটা প্রেমের বন্ধন; এই কথাটিই পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাসেলের চিন্তায় অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রেমের যে বন্ধন সেটা সত্যিকারের বন্ধন নয়—অন্তরের ঘনিষ্ঠ যোগ; তাতে আছে আনন্দ; নইলে বন্ধন মাত্রেই দুঃখ, বেদনা, অপমান। নরনারীর সার্থক সম্বন্ধের ইঙ্গিত দিতে গিয়া Russel বলিয়াছেন "The only human relations that have value are those that are rooted in mutual freedom, where there is no domination—no tie except love and affection, no economic or conventional necessity to preserve the external show when the inner life is dead." কমলও তাই বলে, "মনই যদি দেউলে হয় তবে পুরুতের মন্ত্রকে মহাজনখাতা করে সুদ আদায় হতে পারে; কিন্তু আসল তো ডুবল।" মনের মিলনের অভাব তবুও বাহিরের বন্ধনকে ছিন্ন করিবার উপায় নেই—ইহার যে মর্ম্মান্তিক বিড়ম্বনা তাহা নিপুনভাবে চিত্রিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ" গ্রন্থে। কুমু ও মধুসূদনের অন্তরের ঘনিষ্ঠ যোগ কিছুতেই স্থাপিত হইল না; চিত্তবিহীন দেহদানের পরমতম অশ্লীলতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত কুমুর সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইল এবং যাহাকে ভালবাসিতে পারিল না তাহারই সন্তানের জননী হইবার মতো নিদারুণ লাঞ্ছনা কুমুকে ভোগ করিতে হইল। এই যে দ্বন্দ্ব ইহাই আমাদের সামাজিক জীবনের পরম ট্র্যাজেডি। আন্তরিক

সম্বন্ধ হইতে আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াই আমরা নিজের মঙ্গলকে পর্যুদস্ত হইতে দিই ; ইহার কোনো সার্থকতই নাই,—"It becomes sooner or later retrospective tomb of dead joys, not a wells-pring of new life."

মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের প্রবলতম অন্তরায়— "অতীতের শৃঙ্খলা, আচারের আবর্জ্জনা, অভ্যাসের অত্যাচার, অন্ধ সংস্কার ও মূঢ় ধার্ম্মিকতা।" তাই এইসকল বিরুদ্ধশক্তির নাগপাশ হইতে কমল নিজেকে এবং সমাজকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছে। প্রাচীন বলিয়াই প্রাচীনের উপর সাধারণ লোকের যে যুক্তিহীন আকর্ষণ তাহাকে কমল মানসিক জড়তা বলিয়াই মনে করে ; সে বলে "বস্তু অতীত হয় কালের ধর্ম্মে, কিন্তু তাকে ভাল হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই কোনো কিছু পূজ্য হয়ে উঠে না।"

কমল প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে জানে কিন্তু সে ভালবাসা যখন উপেক্ষিত হয় তখন শুধু অতীতের স্মৃতি এবং অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য বন্ধনকে স্বীকার করিয়া প্রিয়জনের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া তাহার স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়াকে সে নারীজাতির কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না। পুরুষের অন্তর হইতে প্রেম লুপ্ত হইবে, পুরুষ নারীকে কামনা করিবেনা ; তবুও তাহার হৃদয়ের বহির্দেশে পড়িয়া থাকিয়া তাহার ক্রীড়নক হইবার মধ্যে নারীজাতির যে দুর্ব্বিষহ লজ্জা তাহা কমল সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। তাই অবিচলিত কণ্ঠে সে বলিতে পারে, "যারা পুরুষের ভোগের বস্তু আমি তাদের জাত নই।" এই আত্মিক দৃঢ়তার বলেই সে সমাজের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করিয়া অজিতের সত্য প্রেমকে সার্থক করিতে অগ্রসর হইল। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সমস্ত নারী-চরিত্রই প্রচলিত বিধানের দ্বারা পিষ্ট হইয়া সেই বিধানের নির্ম্মমতা ও ক্রুরতা সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু অভয়া ব্যতীত আর কেহই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে নাই। যে আগুণ অভয়ার চরিত্রে স্ফুলিঙ্গাকারে দেখা দিয়াছে তাহাই প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে কমলের চরিত্রে।

কমলের আর একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করি— সেটা তাহার হৃদয়ের পূর্ণতা। বহু অবস্থাবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, দুঃখ সে যথেষ্টই পাইয়াছে, কিন্তু অতীতের দুঃখ-বেদনা তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ম্লান করিতে পারে নাই। আনন্দকে সে যেমন-ভাবে উপভোগ করে দুঃখকে তেমনি অবলীলাক্রমে সহ্য করে। শিবনাথ যেদিন ছলনা ও মিথ্যাচারের ভিতর দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, সেদিন কী অরুন্তুদ বেদনায় যে তাহার নারী-চিত্ত ব্যথিত পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না ; কিন্তু সেই বেদনা তাহার হৃদয়-গ্রন্থিকে শিথিল করিয়া তাহাকে ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত করিতে পারিলনা। শিবনাথের নিকট অভিযোগ ও অনুযোগের ক্রন্দনও সে গাহিলনা। তাহার প্রতারণা ও তাহার দেওয়া দুঃখকে সে চিত্তের দৃঢ়তা দিয়া গ্রহণ করিল এবং ভবিষ্যতের আশায় তাকে পরমভোগ্য বস্তু করিয়া তুলিল। অপরিমেয় দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়াও ভবিষ্যতের জন্য আনন্দলোক সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে। সংসারের দেওয়া দুঃখে, আঘাতে পর্যুদস্ত হইয়া যাহারা মনে করে ক্রন্দনই একমাত্র অবলম্বন তাহারা আর যাহাই বুঝুক নিজেদের কল্যাণ বুঝে না। তাই ত কমলের মুখে প্রকাশ পায়, "অসময়ে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেছে বলে এই অন্ধকারই হবে সত্যি আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায় তবে দুচোখ বুজে তাকেই বলতে হবে ঐ আলো নয়, এ মিথ্যে ? জীবনটা কি এমনি ছেলেখেলা করে সাঙ্গ করে দেবার ?" তাহার "জীবন ত দেউলে হয়ে যায় নি," তাই ভবিষ্যতের সৃষ্টিতে সে শঙ্কিত ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে না। কমল দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রচার করে, "একদিন যাকে ভালোবেসেছিলাম কোনদিন কোনো কারণে তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল, অনড়, জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয় সুন্দরও নয়।" অন্য মেয়েদের মতো পুরুষের দেওয়া সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করিয়া "ব্যথার পূজা সমাপন করিবার মতো দুর্ব্বলতা ও জড়ত্ব" তাহার নাই। যে বিদ্রোহ কমলের চরিত্রে উৎসারিত হইয়াছে তেমনই একটা বিদ্রোহের সুর রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছিল,—

"যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা

নিশীথ নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি।"

শিবনাথ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবার পর কমল হাহাকার করে নাই, সেই মর্ম্মন্তুদ বেদনাকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছে,—ইহাতে তাহার অন্তরের প্রেম সম্বন্ধে অনেক সমালোচকই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার এই নির্ব্বিকার ভাবকে অস্বাভাবিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার জোরে তাহার সুগভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ হইতে না দিলেও শিবনাথের প্রতি তাহার ভালবাসা যে কত প্রবল ছিল, এবং শিবনাথের এই নির্ম্মম হৃদয়হীনতা তাহার স্বভাবকোমল বুকে কী কঠোর আঘাত করিয়াছিল তাহা শরৎবাবু দু'একটা রেখাতেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। রাজেন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে "তার পরে লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই, বলিতে বলিতে সে (কমল) সহসা উঠিয়া বাতি বাড়াইয়া দিবার জন্য পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল," এই সহসা উঠিয়া অশ্রুনিরোধের প্রয়াসের ভিতর দিয়াই শিবনাথের প্রতি তাহার প্রেমের নিবিড়তা এবং তাহার নারী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিবনাথ যখন তাহার প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিলনা তখন তাহার এই অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া "যৌবনে যোগিনী" সাজিবার মধ্যেই নারী-জীবনের কল্যাণ বলিয়া সে মানিয়া লইতে পারিলনা। ইহার ফলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ উগ্ররূপেই প্রকাশ পাইল। কমল হৃদয়হীনা নয় ; তাহার নারী-হৃদয়ের অপরূপ মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে পীড়িত শিবনাথের শয্যাপার্শ্বে তাহার সস্নেহ উক্তিতে। শিবনাথ তাহার প্রতি যে হীন আচরণ করিয়াছে তাহা তাহার বিদ্রোহী চিত্তকে শিবনাথের কলুষস্পর্শ হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গেলেও শিবনাথের প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রীতি শেষ পর্য্যন্ত তাহার নারী-হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। শিবনাথের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বিগলিত হৃদয়ে পরম স্নেহের সহিত কমল বলিতেছে, "নিছক বঞ্চনাকে মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা'ত হয়ে গেছে সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করো ; হয়তো সুখী হতে পারবে। লক্ষ্মীটি! ভুলোনা, তোমার ভালো হোক, তুমি ভালো থাকো, এ আজও আমি সত্যি সত্যিই চাই।" এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া কমলের নারী-হৃদয়ের সত্যিকার মর্য্যাদা শরৎবাবু দিয়াছেন। যেখানে অন্তরের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, সেখানে দেহের সম্বন্ধ ও সমাজের বন্ধনকে সে স্বীকার করিতে পারে নাই ; কিন্তু যাহাকে একদিন সত্যই ভালোবাসিয়াছিল তাহার প্রতি নির্ম্মম হইয়া উঠিতেও পারে নাই ; তাহার নারী-প্রকৃতির এইখানেই বিশেষত্ব। কমলের চরিত্রে নারীসুলভ কোমলতা ও মাধুর্য্যের সঙ্গে তেজস্বিতার সংমিশ্রণ হইয়াছে। সে স্বাধীন অথচ সকলের পরিচর্য্যায় তাহার কল্যাণ-হস্তদুটি রত। সে দৃপ্ত মহিমায় আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য কাহাকেও উদ্ধতভাবে আঘাত করিতেছে না। অক্ষয় প্রভৃতির হীন ষড়যন্ত্রকে সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের হীনতায় ক্ষুদ্র হইয়া উঠে নাই ; কিম্বা সকলের বিরুদ্ধতায় নিজের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, নিজের স্বাধীন মতবাদও বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহার মধ্যে প্রিয়জনের কাছে আত্মনিবেদন করিবার ইচ্ছার অভাব নাই, কিন্তু সেই আত্মদান দাসীর হীনতায় পর্য্যবসিত হয় নাই।

সত্যকে গোপন করিয়া অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করিবার ভণ্ডামি তাহার নাই। তাই ত অজিতের নিকট তাহার অসংবৃত ও অসুন্দর জন্মকাহিনী অসংকোচে বর্ণনা করিতে তাহার বাধিল না। কারণ তাহার জন্ম-ইতিহাসে যে কদর্য্যতা আছে তাহা তাহার জীবনকে ম্লান করিতে পারে নাই। কমল দেশের অকল্যাণকর রীতিনীতি ও বিধি-ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করিয়াছে কিন্তু দেশকে অবজ্ঞা করে নাই। দেশের প্রতি তাহার নিবিড় অনুরাগের পরিচয় তাহার বাক্যে ও কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশপ্রেম অর্থে যদি দেশের অচল, জড় সমাজব্যবস্থা ও ধর্ম্মান্ধতাকে মানিয়া চলা বুঝায় তবে ইহার কোন সার্থকতা নাই। কমলের মুখ দিয়া শরৎবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,

"লৌকিক আচার অনুষ্ঠানই হোক্ বা পারলৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মই হোক্, কেবলমাত্র দেশের বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার মধ্যে দিয়া স্বদেশপ্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণে দেবতাকে খুসি করা যায় না; তিনি ক্ষুণ্ণ হন।"

সংযম ও আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবার উপায় নাই, কমলও তাহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু সংযম যেখানে নিছক আত্মপীড়ন, আত্মত্যাগ যেখানে স্বেচ্ছাচার ও প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান মাত্র সেখানে ইহা যে কতই অসুন্দর, কী বিভৎস কমল তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছে। কমল একান্ত বিশ্বাসভরেই বলিয়া উঠে, "সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে দেয়, সেখানে তার কোনো সার্থকতা নেই; বরং সেটা আত্মনিগ্রহেরই রূপান্তর। ও বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা, তাকে বাঁধা দরকার। সীমা মেনে চলাই ত সংযম; শক্তির স্পর্দ্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব; তখন আর তাকে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। অতিসংযম একধরণের অসংযম।" আশুবাবুর একনিষ্ঠ প্রেম ও সংযত জীবনযাত্রা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কেননা সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। শরীর-ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া অবিনাশ যখন দ্বিতীয়-বার দার পরিগ্রহ করিল তখনও আমরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইনা; কিন্তু যখন দেখি অবিনাশেরই গৃহকোণে আর একটি তরুণ প্রাণকে সংযম আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি মোহ-জনক বাক্যের দ্বার চিরাচরিত সংস্কারের মোহে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়া জীবনের আশা আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া পরের দ্বারে নিঃস্বার্থ দাসীপনায় ব্যাপৃত রাখা হইয়াছে এবং যখন তাহার পরের জন্য, আত্মদান ও নিঃস্বার্থ সেবা-ধর্ম্মের পুরস্কার মিলিল আশ্রয়হীনতায়, তখনও কি এই সংযম ও আত্মদানের মহিমা কীর্ত্তনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে আমাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয় না? শুধু নীলিমা নয়, এমন আরও কত জীবনকে যে সমাজ উচ্চ আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া পলে পলে অগ্নিশিখায় দগ্ধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহাদের বৈধব্য-জীবনের বঞ্চিত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অকথিত মৌন বেদনা অহরহ গুমরিয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের অন্তরে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলিতেছে তাহাকে বাহ্যিক সংস্কারের আবরণ আর কতদিন আবরিত করিয়া রাখিবে? এই যন্ত্রবৎ মন ও যন্ত্রবৎ জীবন হইতে মুক্তির জন্য তাহাদের ভিতর যে আকুল ক্রন্দন উত্থিত হইতেছে তাহা কি সমগ্র হিন্দু সমাজের বনিয়াদ ধ্বংস করিবে না?

হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কঠোর দুঃখভোগ ও অতি-সংযমের ভিতর দিয়া যে শিক্ষাদান চলিয়াছে তাহা যে সুকুমার বালকদের জীবনকে অঙ্কুরেই পিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে তাহা সংস্কারান্ধ হরেন্দ্র বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলেও কমল তাহার অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। এই যে রিক্ততার সাধনা, ইহা মানুষের চিত্তকে নিঃস্ব করিয়া দেয়, জীবনকে জড়তাগ্রস্ত ও তামসিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। "যে কেবল অস্বীকারের মধ্য দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই হাত দিয়া ভগবান ঐশ্বর্য্যের চাবিকাঠি পাঠাইয়া দিবে" এই ধারণা কমলের মনে স্থান পাইল না। তার পর রাজেন্দ্রের যে শোচনীয় পরিণতির উল্লেখের সঙ্গে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইয়াছে তাহা পড়িয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, "ইহাতেই কি মানব-জীবনের সার্থকতা?"

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

বেদনা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ব্যাণ্ডেল লোক্যাল ছাড়িতেছে।

সুমিত্রা তার স্বামীর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া দেখে পিছনের কামরাগুলায় কেহই নাই, সবকেই সামনে ছুটিতেছে।

তার স্বামী নিবারণ বলিল, এসো এই একখানা গাড়ীতে নিরিবিলি বসা যাক্।

সুমিত্রা বলিল, দেখো বাবু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কেউ এসব গাড়ীতে উঠ্‌ছেনা কেন, এ বোধহয় কেটে দিয়ে যাবে!

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া নিবারণ বলে, তাই কি হয়! এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, কেটে দেবার হলে এখানে রাখতইনা, নয়ত কিছু একটা লেখা থাকত।

সুমিত্রা কহিল, চলো ত' আগে ওদিকটা দেখে আসি, গার্ডের গাড়ি কোথায় গেল, গার্ডই বা কই, বলিয়া সামনের দিকে চলিল।

খানিকটা অগ্রসর হইয়াই দেখা গেল, বাস্তবিক গাড়-গুলা কাটা, সম্মুখের অংশই যাইবে।

ওদিকে বেল্ দিয়াছে, গাড়ি দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে সম্মুখে যে গাড়িটা পাইল তাহাতেই দুইজনে উঠিয়া পড়িল।

সেটা মেয়েদের গাড়ি নয়, নানা দেশের নানা জাতির পুরুষে ভর্ত্তি। মহিলা দেখিয়া কেহ জায়গাও ছাড়িয়া দিলনা, সে সূক্ষ্ম রুচিবোধ তাহাদের নাই। দরজার কোনে দুইজনের বসিবার মত একটা স্বতন্ত্র আসন পাইয়া তারা বসিয়া গেল।

সুমিত্রা লেখিকা, উপন্যাস লেখে। বিচিত্র কামরাটি সে বসিয়া বসিয়া পর্য্যবেক্ষন করিতে লাগিল। অনেকখানি লম্বা, দুই ঘোড়া দরজা, দুপাশে, ঠেলিয়া খুলিতে হয়, খোলাই আছে, হাঁ হাঁ করিতেছে যেন। গাড়ীগুলা সাধারণতঃই নীচু, উঁচু গাড়ী হইতে যেমন বাহিরের দৃশ্য মনোরম লাগে এগুলাতে তেমন নয়। হিন্দুস্থানী মাড়োয়াড়ী, মুসলমান, বাঙ্গালী পাশাপাশি বসিয়া গেছে। মাথার উপরে তারের তাকে রাশি রাশি কপি, বালির কাগজের ঠোঙায় আটা এবং চটের বস্তায় বাজার রাখা হইয়াছে।

লিলুয়া আসিতেই একটা লেবুওয়ালা উঠিয়া পড়িয়া "নিবু দেবা" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল এবং প্যাসেঞ্জারের ভিড় ঠেলিয়া এদিকে ওদিকে আনাগোণা করিতে লাগিল। 'পয়সা-পয়সা' 'আনামে পাঁচটা' করিয়া সে মন্দ বিক্রী করিল না। বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানদের রৌদ্রক্লান্ত রুক্ষ শীর্ণ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া সুমিত্রা ভাবিতে লাগিল, ডেলি-প্যাসেঞ্জারীর বিপর্য্যয় পরিশ্রম করিয়া কোমলতা এবং সৌন্দর্য্য যেন নিঃশেষ হইয়া গেছে। শীতে ও গ্রীষ্মে, ঝড়ে ও বর্ষায়, অনিবার এই আসা-যাওয়াতেই পরমায়ু যেন কমিয়া যায়। এই নিপীড়িত বৃহৎ বঙ্গের কথা সে লিখিবে কিন্তু পড়িবার প্রবৃত্তি, সময়, ও স্বচ্ছলতা কি ইহাদের থাকিবে? ম্যালেরিয়াজীর্ণ স্যাঁৎ সেঁতে জলভূমির উপর দিয়া বনভূমির পাশ দিয়া ভিড়ে ও তাড়ায় গালাগালি ও অপমানে কেরাণীদের এই যে আনাগোণা, লোহার শক্তি চূর্ণ করিবার এ যেন কায়েমী ব্যবস্থা।

বেলুড়ে উঠিল, নেবেন শিবশঙ্কর বাম বা আশ্চর্য্য মলম। কেটে গেছে? ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে? সে রক্ত থামছেনা, একটু তুলি ক'রে লাগিয়ে দিন, তখনি রক্ত বন্ধ হবে। কাটা ছেঁড়া পোড়া হাজা বাত ব্যথা আঙ্গুলহাড়া—

এদিক হইতে আর একজন চীৎকার করিল, 'গরম প্যান্ট ছেলেদের' বলিয়া একতাড়া প্যান্ট শূন্যে তুলিয়া নাড়িতে লাগিল।

ওদিককার লোকটি তখন এদিকে ঘুরিয়া চীৎকার করিতেছে, আর আছে শিবশঙ্কর দাঁতের মাজন। দাঁত কন্ কন্ করছে, জল খেতে পারছেন না, কিছু খেতে গেলেই কষ্ট হচ্ছে, যেন দাঁতের গোড়া কেটে যাচ্ছে, মাজন দিয়ে

দাঁতটি মাজুন। ব্যবহার করলেই টের পাবেন, মাত্র দুপয়সা। দাঁত-কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ চিন্ চিন্ "চাই প্যাণ্ট, ছেলেদের প্যাণ্ট" এর গোলমালে মিলাইয়া গেল।

আবার সুরু হইল—দরকার থাকে চেয়ে নেবেন। আর আছে ভাস্কর লবণ, ষোল টাকা ফীএর ডাক্তারের কাজ করবে।

পরের ষ্টেশনে এরা নামিয়া গেল, নূতন দল উঠিল. খাস্তাভাজা সস্তাভাজা চানাচুর গরম। ব্যাণ্ডেল লোকাল চলেছে, শুধুমুখে ব'সে থাকা ভালো দেখায় না, দুপয়সায় তিনপ্যাকেট চানাচুর কিনে খেতে খেতে যান।

অ্যাই পান্, পান চাই পয়সায় চার পান—অনেকেই আধ পয়সার পান কিনিল।

সুমিত্রার চোখে জল আসিয়া গেছে। সে সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ে। বিশেষত কিছু বিক্রয় হইতেছেনা, চীৎকার করিয়া গলাই শুধু ফাটতেছে। কিনিবেই বা কে? সঙ্গতিই বা কার?

কপি এবং বাজার, ক্যালেণ্ডার এবং সস্তা খেলনা লইয়া গৃহাভিমুখী লোকেরা নামিয়া গেল, কিন্তু সুমিত্রার ব্যথার ভার নামিল না।

শ্রীরামপুরে তার স্বামীর বন্ধু সুপেন বিশ্বাস মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অফিসার সে, বন্ধু ও তাহার বন্ধু-পত্নীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আতিথ্যের আয়োজনের ত্রুটি করে নাই।

কিন্তু তার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুমিত্রা যতই ডেলিপ্যাসেঞ্জার ও ক্যানভাসারদের ম্লান বিষণ্ণ মুখ ও হতাশাময় জীবনের কথা ভাবে, ততই পিছনের হলঘরের বিজলী-আলো সঙ্গীত ও সুভোজ্যের প্রাচুর্য্যের প্রতি ঘৃণাবিমিশ্র অনুকম্পা তার জাগিয়া ওঠে।

যে ব্যথা যুগে যুগে বুদ্ধ চৈতন্য ও মহামানবদের গৃহহারা করিয়াছে, তাহারি শততম অংশ যেন তার কোমল অন্তর-লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং সে রাত্রে কিছুই গলাধঃকরন না করিতে পারিয়া তার উপবাসী দেহ ও বেদনার্ত্ত হৃদয় জীবনের একটা রাত্রিকে মধুময়ী করিয়া দিল।

যাহাদের জন্য তাহার সুন্দর মুখখানি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল তাহারা তাহাকে চেনে না, রজনী প্রভাত হইতেই নূতন উদ্যমে গতানুগতিক বিদগ্ধ জীবনের পথে গড্ডালিকাপ্রবাহ চলিবে।

সুমিত্রা দেখে কিশোরীচাঁদ মেমোরিয়াল-হলের ওপাশ দিয়া ভারাক্রান্ত লোক্যালগুলি কলিকাতার দিকে চলিয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস

আলোক চিত্রশিল্পী—লেখক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইয়োরোপের অন্যদেশগুলি অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু স্পেন অতীতের মধ্যেই বেঁচে আছে। তাদের উদ্দেশ্য অতীতকে সাজিয়ে রাখা গৌরব অনুভব করবার জন্য, বর্ত্তমানকে দেখাবার জন্য ও বিদেশীকে দেশে আকর্ষণ

আলকাথারের কারুশিল্প

করবার জন্য। স্পেন নিজেই হচ্ছে অতীতের মুখর প্রতীক, মূক সাক্ষীমাত্র নয়; তার মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, বর্ত্তমানকে মিশিয়ে দেয় ও স্বদেশের প্রাচীনরূপটীর আভাস দেয়। স্পেনের অতীত যেন নিজের জন্যই বেঁচে আছে; লোকদেখানর জন্য নয়। বিদেশী পর্যাটকের জন্য সে এতদিন ব্যস্তও ছিল না। মাত্র কয়েকবৎসর থেকে বিদেশীর দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে দেশ-ভ্রমণ ও অবসর বিনোদনের জন্য। ইয়োরোপের সব দেশেই বাহিরের দর্শক আকর্ষণ করতে টুরিষ্ট এজেন্সী সৃষ্টি হয়েছে বহু বহু বর্ষ থেকে; কিন্তু "পাত্রোনাতো ন্যাথনাল দেল তুরিসমো", বেশী দিনের প্রতিষ্ঠান নয়।

জীবনের সব বিকাশের মধ্যেই অতীতের অস্তিত্ব ও দাবী আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। বিভিন্ন প্রদেশগুলি এখনো তাদের চারশতবৎসর আগে হারাণ প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়ে এক দেশ হতে চায় না। সেজন্য স্পেনের অমর বীর রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাজর্ষি ফিলিপের চেষ্টা ও আকাঙ্খাকে এরা ব্যর্থ করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ফিলিপ সমগ্র স্পেনকে এক ধর্ম্মরাজ্যে বাঁধবার চেষ্টায় প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা কৌশলে যে হরণ করেছিলেন সেকথা এদের অন্তরে দাবানলের মত জ্বলে স্পেনের প্রতি তার বিরাট্ দানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্যাটালান প্রদেশগুলি তাদের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে স্পেনের রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙ্গন এখানে থেকেই আরম্ভ হবে। লণ্ডন ও প্যারিস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যতখানি মাদ্রিদ স্পেনের ঠিক ততখানি নয়। বার্সিলোনা, সেভিল ও ভ্যালেন্সিয়া মাদ্রিদের সঙ্গে অনেকবিষয়ে পাল্লা দেয়। রাজনীতিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার জন্য বার্সিলোনা শুধু স্পেনের বোম্বাই হয়েই ক্ষান্ত নয়; তার চিন্তা ও গতি স্বতন্ত্র; মাদ্রিদকে সে উপেক্ষা করতেও পশ্চাৎপদ নয়। কাজেই মাদ্রিদ স্পেনের রাজধানী বললেই সবটুকু বলা হয় না। তাকে এখনো সহর (Ciudad থিউদাদ) বলে স্বীকার করা হয় নি, সে হচ্ছে শুধু villa.

সার্থকনামা কিন্তু এই ভিলা। এর চারদিকের গিরিশ্রেণী-শোভিত পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভিয়েনা ছাড়া কোথাও বুঝি তার তুলনা মিলে না। কথায় বলে ভিয়েনা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সঙ্গীত, উত্তরে নৃত্য ও দক্ষিণে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। পাসিও দেল প্রাদোর রমনীয় রাজপথে বেড়াতে বেড়াতে একে মোটেই কোলাহলমুখর, ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্কুল সহর বলে মনে হয় না। এখানে যত শ্রমিকসংঘ ও সমাজবাদীসংঘ আছে রাশিয়া ব্যতীত আর

আল্‌হাম্ব্রার পথে

অশ্বতরযান
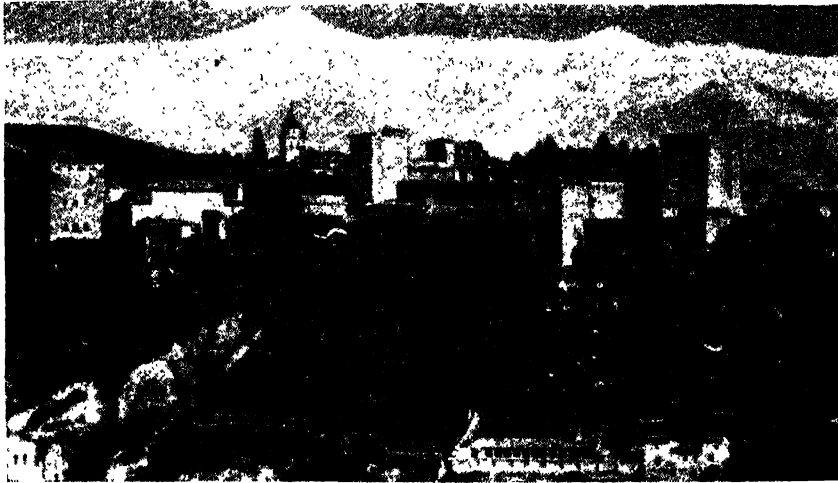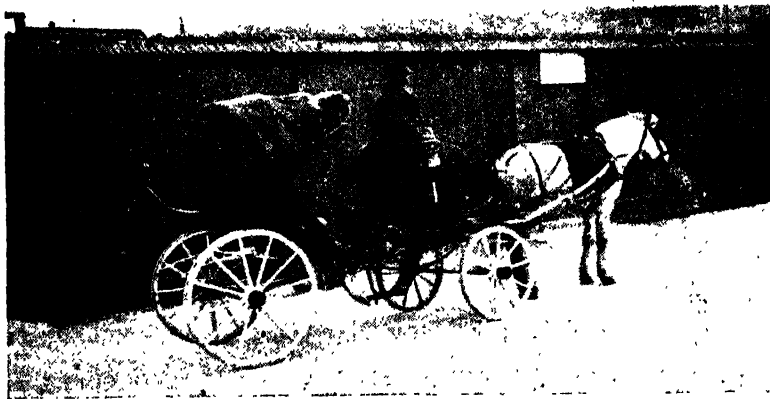
প্রণয় দিয়ে ঘেরা। মাদ্রিদ সম্বন্ধেও ওই রকম কোন প্রবাদ রচনা করলে প্রবাদের সার্থকতা হ'ত। সবদিকে সৌন্দর্য্য দিয়ে ঘেরা এই সহর; রাজপ্রাসাদ থেকে যে দৃশ্য দেখা যায় তাতে একটী ছোট জনাকীর্ণ রাজধানীতে আছি কোন দেশের সহরে বোধ হয় এত নেই। সহরের উপকণ্ঠেই সেনাশিবির, পল্লীর পথকে কলিকাতার মেছুয়াবাজার বলে ভ্রম করলে বিশেষ ভুল হবে না। তবু এসহর বিরামে অমরাবতী, চিত্তপ্রসাদের প্রমোদকানন। ব্যাঙ্ক-পল্লী কি

আর কোথাও উদ্দামস্ফূর্তির ঔদ্ধত্য বা ব্যস্তবাগীশতার চিহ্ন নেই। এই ভোজনবিলাসীর তীর্থে সাধরণ হোটেলেও নয় পর্ব্বের ভোজন উপভোগ করতে করতে কতবার মনে হয়েছে লণ্ডনের পরিবর্ত্তে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হলেই ভাল হ'ত। তাহলে লণ্ডনের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে নববর্ষকে উদ্দাম নৃত্য দিয়ে অভিনন্দন করার দৃশ্য দেখতাম না; বারটী ঘণ্টাধ্বনির প্রত্যেকটীর সঙ্গে এক একটী আঙুর মুখে দিয়ে নববর্ষকে অমনই সুন্দর সরসভাবে উপভোগ করবার স্বপ্ন দেখতাম।

কিছু নয়। শুধু আমেরিকা আবিষ্কারের স্মৃতিই ইয়োরোপকে কলম্বস তথা স্পেনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রাখবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিস্পানীদের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী অভিযানে যেতে কেহ পারে নি; সমস্ত পৃথিবীতে ধনরত্ন আহরণ, সুচারুরূপে সাম্রাজ্যগঠন ও শাসনব্যবস্থা করতে স্পেন ছিল অতুলনীয়। পোপের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নূতন আবিষ্কৃত পৃথিবীকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে পোর্টুগালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং এই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পোর্টুগালকেও ষাট্ বৎসর নিজের অধীনে রেখে দিয়েছিল। আর্মাডাধ্বংসের ও হল্যান্ডের
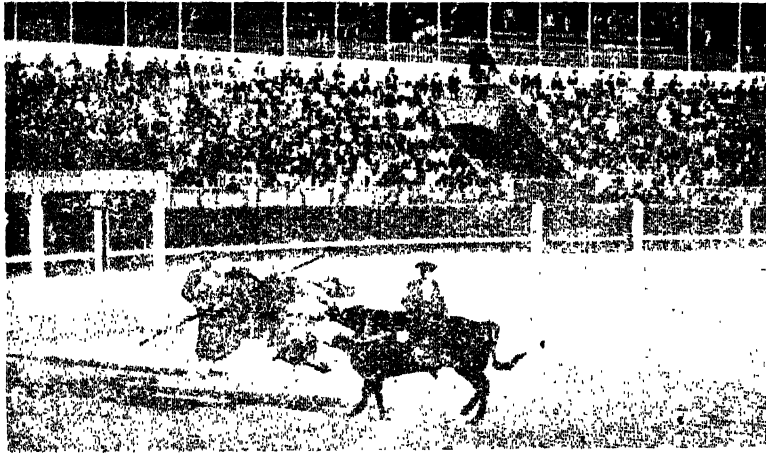
বুল-ফাইট

ইয়োরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিকাশের প্রথম লক্ষণ দেখি বাহিরের পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণের চেষ্টায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরাট্ স্বর্ণময় কল্পনার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা ও তার ফলে আমেরিকা আবিষ্কার হচ্ছে স্পেনের ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠদান। এ যে কত বড় তা একথা মনে করলেই বুঝা যাবে যে বর্ত্তমান পৃথিবীই হচ্ছে ইয়োরোপের আবিষ্কার ও মানবসভ্যতাকে দান। আমাদের সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা সম্বন্ধে একটা চমকপ্রদ ধারণা ছিল বটে; পেরুতে রামলীলার মত উৎসব বা মেক্সিকোতে গণেশমূর্ত্তির মত মূর্ত্তি প্রাপ্তির উদাহরণ দেখিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা গমনাগমন প্রমাণের চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এসবের দাম ব্যবহারিক বিজ্ঞানসম্মত ভৌগলিক জ্ঞান হিসাবে

স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত স্পেনের সমরপটুতা অতুলনীয় ছিল। স্পেনের সে দিনও নেই, সে গৌরবও নেই। তবু লোকের মন বিপুল ধনসাম্রাজ্যের অধিকারীরই মত দিলদরিয়া আছে এখানে। এদেশের সাধারণ লোকের কথায় কথায় রাজা-উজির মারাটা ঠিক নিষ্ফল বাগাড়ম্বরের মত হাস্যকর শুনায় না; এ যেন অতীতের স্মৃতির করুণ ঝঙ্কার।*

* ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী অসম্পূর্ণভাবে লিখিত অধ্যায়ের প্রচুর উপকরণ সেভিলের Archivos des Indios এ আছে। এমন কোন স্পানিশ ও পোর্টুগীজ জানা ভারতীয় ঐতিহাসিক কি নেই যিনি এগুলি থেকে জ্ঞান আহরণ করে সে অধ্যায় সম্পূর্ণ করতে পারেন?

বর্ণসমস্যা স্পেনে কখনো ছিল না, এখনো নেই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহুদি ও মুরের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তার মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্মান্ধতা, বর্ণ নয়। ফ্রান্স যে রকম আফ্রিকান ফরাসী প্রজাকে সৈন্যদলে স্থান ও দেশের প্রধান মন্ত্রী বা সেনাপতি হবার পর্যন্ত আইনগত অধিকার দিয়েছে স্পেনও তাই দিয়েছে। আফ্রিকাতে স্পেনের বিরাট সৈন্যদল আছে। স্পেনে যে কোন অশ্বেতকায় ব্যক্তি উদ্ধত কৌতূহল বা আঘাতপ্রবণ মন্তব্য না জাগিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে। নিগ্রো শ্বেতকায়ার সঙ্গে অবাধে নাচতে পারে, তার সঙ্গী হতে পারে। তাতে কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এতে স্পেনের বিপদও হয়েছে সমূহ। ল্যাটিন আমেরিকায় একটা বর্ণসঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়েছে যারা হিস্পানী চরিত্রের দোষগুলি বেশ তীব্র মাত্রায় পেয়েছে। স্পেনের অধঃপতনের একটা ঐতিহাসিক কারণ জাতীয় বিশুদ্ধি রক্ষা না করা। তার প্রাচ্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের একটা প্রধান কারণ এই থেকে।

নিজেকে একদিনের জন্যও অপরিচিত বিদেশী বা অপ্রত্যাশিত অতিথি মনে হচ্ছে না। বিদেশী এদের দেশে অবহেলিত না হয়, অসুবিধায় না পড়ে সে প্রয়াসের পরিচয় কতবার পেয়েছি। সালামাঙ্কায় যখন শেষ রাত্রে পৌঁছানোর পর সহসা তুষারপাতের জন্য দূরবর্তী হোটেলে যাওয়া হল না বলে ষ্টেশনের ক্যান্টিনে কফির গ্লাস হাতে করে চুল্লের আগুনের ধারে বসে রাত কাটিয়ে দিতে হল, তখন এই বিদেশীকে সঙ্গ দিবার জন্য গৃহস্বামী ও স্বামিনী তুষার পাতের রাত্রে তপ্ত শয্যার আহ্বান উপেক্ষা করে গল্প ও হাস্যকৌতুকে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিল। সহরের প্রাচীনতা ও দর্শনযোগ্যতা সম্বন্ধে তারা উপভোগ্য গল্প করে যেতে লাগল। যে দূর বিদেশী এতদূর থেকে সালামাঙ্কার গীর্জা ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এসেছে সে যাতে এগুলি সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা নিয়ে যেতে পারে সে জন্য তাদের কত বর্ণনা ও চেষ্টা! সেভিলে মাত্র পথের আলাপে একটা আইনের ছাত্র বিদেশী ছাত্রকে অন্তরঙ্গভাবে সঙ্গ দিল, সারাদিন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সহর, 'ডন কিখতে'র (Don Quixote) লেখকের স্মৃতি-সরোবর; ঐশ্বর্য্যময় রাজপ্রাসাদ আলকাথার (Alcazar) দেখিয়ে বেড়াল ও সন্ধ্যাবেলা নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে চাইল। গ্রানাডা থেকে কর্দোভার দীর্ঘ মটরপথে জলপাই কুঞ্জে ঢাকা পর্বতের সানুদেশে ঘুরে ঘুরে মটর চলার সময় সব আরোহীর সঙ্গে কত আলাপ হয়ে গেল, যার মাধুর্য্য ও আন্তরিকতা মনে ছাপ না রেখে পারে না। অথচ কত রকমের ও কত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার লোক সেখানে ছিল। কত সময় কত শিক্ষিত ভদ্রলোক—বেকার নয়—
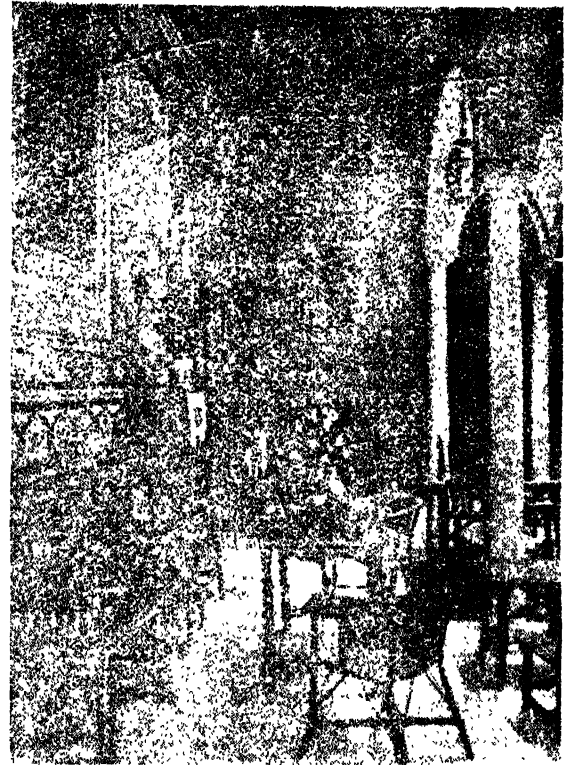
একটি হোটেলের ভোজনশালা

অযাচিত ভাবে সঙ্গ দিয়াছেন, নানা দ্রষ্টব্য দেখিয়েছেন, যেন কত দিনের পরিচয়। ভ্যালেন্সিয়া থেকে বার্সিলোনার ট্রেন যখন নীল ভূমধ্যসাগরের জলে বিধৌত প্রস্তরবন্ধুর অনুপম দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন বার্সিলোনার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ গায়ক মনের আবেগে গান শুনিয়ে দিলেন "হে 'morena' বাদামী বর্ণের বন্ধু আমার"। অনেক দেশে পেয়েছি ব্যবহারিক ভদ্রতা, এখানে পেলাম আন্তরিক সহৃদয়তা।

বিশেষভাবে ভারতবাসীর পক্ষে স্পেনকে ভাবজগতেও আপনার বলে ঠেকে। এখানে মনের হাসি অধরপ্রান্তে মিলিয়ে না গিয়ে ঝিকমিক করে আত্মপ্রকাশ করে। কেহ বিরক্তিকে ভদ্রতায় ঢেকে 'ঘ্যাট্‌স্‌ অল্‌রাইট' বলে বসে না, চিত্রপটের সামনে সে মন জেগে থাকে। যে অশ্বতরযান ধূলিধূসরিত রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে অকারণে, সে জনতা যাতে মুখে ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়ে সোরগোল করছে, পথে যেতে যেতে সহসা যে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি মেঘের আভাস

শেষ ভোজন—শিল্পী তিৎশিয়ান
এস্কোরিয়াল্সের চিত্রশালা

শেষ ভোজন—শিল্পী দা ভিঞ্চি
লুভর্‌ চিত্রশালা

অথচ ভারতবর্ষের মত, আন্তরিকতার বড়াই করে হাজার অপ্রিয় কথা মুখে প্রকাশ করে ফেলে না। এদের সামাজিকতার মধ্যে একটা সুষ্ঠু ভদ্রতা আছে, যা অন্তরকে আকৃষ্ট করবেই। শুধু কি তাই? সময়ে অসময়ে প্রবাসী মন অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজের দেশে ছুটে আসবার সুযোগ পায় এমনি একটা ছড়িয়ে ও যে আঁখি-তারকা বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছে সে সব মিলে মনকে উতলা করে তুলে, ছয় হাজার মাইল দূরত্বকে নিমেষে লোপ করে দেয়।

দিকে দিকে এই জাতির উৎসবপ্রবণতার প্রমাণ পাই। এবং আর কোন দেশ বোধ হয় উৎসবের দিক দিয়ে প্রাচীন ও

বীন উভয়কেই এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি। এ হিসাবে আমাদের দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠছে। পশ্চিমের ভাবস্রোতের আবর্ত্তে পড়ে আমরা নিজেদের প্রাচীন উৎসবগুলি হারাচ্ছি বা বিতৃষ্ণার চোখে দেখছি, যথা দেশের রং আমাদের মনে কোন রং লাগাতে পারছে না। অন্যদিকে আমরা সব পাশ্চাত্য আমোদ প্রমোদও গ্রহণ করতে পারব না; যথা বলরুমের নাচকে তার আনন্দদায়ক সামাজিকতা ও বহুকে সে আনন্দের প্রত্যক্ষ অংশীদার করার শোভনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারবে না। এই রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার বিপক্ষে সিনেমা, ফুটবল প্রভৃতির কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু আমি শুধু যে-অনুষ্ঠানগুলি সমাজের সকলকে আনন্দের মধ্যে টেনে আনে তাদের কথাই এখানে বলছি। এ হিসাবে স্পেন অনেক সজীব ও সক্রিয়; পুরাতন উৎসবগুলি একটুও ত্যাগ করেনি এবং নূতন গুলিকেও সাদরে গ্রহণ করেছে। Zazz এর প্রচলন খুব বেশী হয়েছে, তাবলে Castinetকে কেহ ফেলে দেয়নি। বিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন 'বুল-ফাইট' বর্ত্তমানকালের রুচি অনুসারে নিষ্ঠুর মনে হবে বলে তাকে কিছু পরিবর্ত্তন করে নিয়েছে। কিন্তু 'টরসে'র নামে এরা আগেকার মতই উল্লসিত হয়ে উঠে; 'মাতাদোর'-সম্মান অভিজাত মহলেও এখনো অক্ষুণ্ন আছে। শ্রেষ্ঠ বৃষযোদ্ধার সম্মান কোন সেনাপতির চেয়ে কম নয়। অভিজাত সুন্দরীরাও এদের সঙ্গে পরিচয় রাখতে উৎসুক ও আলাপ করে উৎফুল্ল হন। আর একটী জাতীয় উৎসব হচ্ছে বার্ষিক মেলা ("ফেরিয়া")। এই মেলাগুলির মধ্যে স্পেনের প্রাণের যে পরিচয় পাই তা ভারতবর্ষের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। নাগরদোলাটী পর্য্যন্ত ঠিক আছে; আর আছে সেই ধূলিধূসর, কোলাহলমুখর জনাকীর্ণ পথে দ্রব্যসম্ভার। সব জুড়ে আছে প্রাণের বিচিত্র উল্লাস, প্রচুর, বর্ণসমৃদ্ধ ও আড়ম্বরময়। দুর্লভ আরবী গন্ধদ্রব্য থেকে মূরীয় কারুকার্য্যখচিত সূক্ষ্ম ছুরিকা পর্য্যন্ত যা কিছু মধ্যযুগ সম্বন্ধে রোমান্টিক, কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলতে পারে তার সবই এখানে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান দেখতে পাওয়া যাবে।

জীবনের স্রোত এদেশে গভীরতার চেয়ে প্রসারের খাতেই বইছে বেশী। নারী প্রগতি এদেশে আগে খুব বেশী দূর এগোয় নি। এমন কি পর্দ্দা না থাকলেও অভিজাত ও দরিদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীতে নারীজীবন বহুভাবে অবরুদ্ধ ছিল। তখনকার দিনের আধুনিকাদের ভাগ্যে নিন্দা ও সামাজিক অসুবিধার ভয় ছিল খুব বেশী। যুগলনৃত্যের প্রচলন ছিল খুব কম। ইয়োরোপে সব দেশেই এ যুগে নারী হয়েছে স্বাধীনা আর নারীজীবন হয়েছে বহির্ম্মুখী। কিন্তু হিস্পানী কাণ্ডই অন্যরকম। স্পেন যুগলনৃত্য যদি গ্রহন করল ত তাকে 'অলিম্পিক' প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাল। এদেশে নাচ এত লালিত্যময়, এত মৃদু মধুর, কিন্তু এতে এরা ক্লান্ত নয়। মাদ্রিদের বাৎসরিক 'মারাথন' নাচ যেরকম সমারোহে সম্পন্ন হয় তা যেন একরকম জাতীয় উৎসব। এক

আলহাম্ব্রার মর্ম্মরস্বপ্ন

হাজার ঘণ্টা যে যুগল অবিশ্রান্ত নাচতে পারবে তারা বিপুল পুরস্কার পাবে। রাত্রির পর রাত্রি আলোকে উজ্জ্বল, বাদ্যে মুখর নৃত্যসভায় দর্শক আসবে, কোলাহল হবে, কিন্তু তার মধ্যেও এদের, চোখের পর্দ্দায় একাধিক সহস্র আরব্য রজনীর মত এক একটি রাত্রি নূতন মোহ, নূতন আবেশ এনে দিবে। নর্ত্তক নর্ত্তকীর দল ঘুমে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে আসে, তবু প্রসাধন করে মুখের চূর্ণকামটুকু ঠিক রাখা চাই। এদের মত চূড়ান্ত করতে ইয়োরোপে কেহ পারবে না। সিনরিটাদের দেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে যদি পুরুষের ডাক পড়ে তাহলে এদেশের

এরা শুধু ইংলণ্ডের মত অফিসে ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কারখানায় পুরুষের স্থান অধিকার করেই নিবৃত্ত হবে না; রাজপুতানীদের মত জহরানলে আত্মাহুতি না দিয়ে রণক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী হবে ও পুরুষের স্থান অধিকার করবে। হিস্পানী কোমলাঙ্গী প্রমদারা প্রয়োজন পড়লে সহজেই পুরুষেরও প্রমাদ ঘটাতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এরা একটি সুকুমার স্বপ্নের সৃষ্টি করে যা চিরকাল ধরে আমাদের কৈশোরের কল্পনা ও যৌবনের অন্বেষণ। প্রত্যহের তুচ্ছতাকে এরা কি যেন এক মায়াকাঠির স্পর্শে উজ্জ্বল সার্থক করে তুলে, জীবনের উচ্ছল

বার্সিলোনার প্রাসাদ—রাত্রির আলোয়

মুক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে, ভাবনাহীন কৌতুক প্রমোদে, সুমধুর গীতবাদ্যে, মার্জ্জিত অথচ সহজ রুচির বিকাশে। সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাতেও ভোজন শেষ আঙ্গুর-পর্ব্ব চলবে, কক্ষান্তরাল থেকে গীতারের মাদকতাময় মৃদু মূর্চ্ছনা ভেসে আসবে; মূরীয় কারুকার্য্যখচিত দেওয়ালে দাভিঞ্চির বা ভিংশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটীর প্রতিলিপি থাকবে; টেবিলের আবরণটী মূরদের বিশেষত্বসূচক নীলবর্ণের হয়ত হবে; তখন স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে মানসচক্ষে আলহাম্ব্রার মর্ম্মরস্বপ্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে অথবা সারাদিনের দর্শনক্লান্ত চক্ষু আরামে মুদিত থেকেই বিলাসপ্রিয়া সম্রাটমহিষীদের লীলানিকেতন আলকাথারের শিল্পকলা আবার নিরীক্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই উজ্জ্বল নীলাকাশপটে বার্সিলোনার প্রাসাদ বিচিত্র বর্ণের আলোকরশ্মিসম্পাতে মনোহর হয়ে উঠে, প্লেন গাছের ছায়াছন্ন যে পথ রৌদ্রের উত্তাপে মধুর হয়ে ছিল সে পথ স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে যায়।

স্পেনে এই আমি ঠিক সময়ে এসেছি। শীতের প্রকোপেও এখনো কুঞ্জে কুঞ্জে রৌদ্রের কমলা রংএ বড় সুন্দর দেখায়—যদিও জানি এই কুঞ্জে বসন্তের চুম্বনপুলক বেশী মানাত। আমি পরিণত পত্র পুষ্প সম্ভারের বিকাশের মধ্যে কোন দেশে যেতে চাই না, কারণ সে সময় যে কোন দেশ সুন্দর হয়ে সাজবে। আমি চাই বসন্তের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা। চাই কুঞ্জপথে এই কমনীয় কমলার নবীন পল্লবশোভা, গুচ্ছে গুচ্ছে অনতিপক্ক ফল, পরিপূর্ণতার রসে আনত নয়, প্রথম ধবলিমার কৈশোর সৌন্দর্য্যে আকুল। এই মাটীতে স্নিগ্ধ স্পর্শ আছে, ভীরু কম্পিত ভায়োলেটের মত অনির্ব্বচনীয় সুকুমারতা আছে, সরস নবীন প্রাণ আছে। আবেশে চোখ বুজে একটী সুন্দরতর জগতের আভাস পাই, যে দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই, আছে শুধু কবিতায় ও কল্পনায়।

মাদিয়েরার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তবু মদির আবেশ অনুভব করি। ভ্যালেন্সিয়ার নীল সমুদ্রসৈকতের কমলা-কুঞ্জের মৃদু সৌরভ আমাকে পাগল করে তুলেছে। দেহবন্ধন যেন শিথিল মুক্ত হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার কী অনির্ব্বচনীয় উল্লাস, কী অপরিসীম আনন্দ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

সে বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শিবরাত্রিতে কুম্ভের প্রথম স্নান হয়ে গেছে। কুম্ভের প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ স্নান ৩০ শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে। দিন যতই সমীপবর্ত্তী হয়ে আসছে, মেলার জনতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার পাঁচ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী, ধনী দরিদ্র, রাজা মহারাজা, স্ত্রী পুরুষের সে এক বিরাট যজ্ঞ ক্ষেত্র! শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য—হেন সাধু-সম্প্রদায় নেই যার অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীগণ দলে দলে উপস্থিত হয়ে এই কুম্ভযোগ পর্ব্বে যোগ না দিয়েছেন। 'হর হর বম্ বম্' 'গঙ্গে হর হর' ইত্যাদি বাক্য সমস্বরে উচ্চারিত করতে করতে যখন দশনামী, দণ্ডী, নাগা, আকাশ-মুখী, অঘোরপন্থী, লিঙ্গায়ৎ, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, দরবেশ, আউল, কিশোরীভজন, দশমার্গী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুগণ সারিবদ্ধ হয়ে পরে পরে গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের দিকে অগ্রসর হন তখন মনে হয় যেন সর্ব্বশাখা-প্রশাখাপুষ্ট ভারতবর্ষের বিপুল ধর্ম্মস্রোত পুণ্যতোয় ভাগীরথী-স্রোতে মিলিত হ'তে চলেছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি এমনই এক দিনে অসীমানন্দ স্বামীর সহিত অমরেশ অনাবৃত দেহে এবং নগ্ন পদে গঙ্গাস্নানের জন্য ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের অভিমুখে চলেছিল। যৌবনের শেষ সীমা পশ্চাতে ফেলে সে প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে উপনীত হয়েছে। বয়স তার চল্লিশের দুই তিন বৎসর বেশিই হবে। কিন্তু অবয়বের মধ্যে অতিক্রান্ত-যৌবনের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। সুগঠিত গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, ক্ষিপ্র এবং আয়াসহীন পদক্ষেপ।

গঙ্গাস্নান-উন্মুখ বিপুল জনস্রোত নির্দ্দেশ করে অসীমানন্দ স্বামী বললেন, "এর মধ্যে কি তুমি কোনো বস্তুই পেলে না অমরেশ? কোনো আনন্দ, কোনো তৃপ্তি? একেবারেই কিছু না?"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে মৃদুস্মিত মুখে মাথা নেড়ে অমরেশ বললে, "না। যা পাব না ভয় করে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় এসেছিলাম সত্যিই তার কিছুই পেলাম না। আনন্দ নিশ্চয় পেয়েছি, তৃপ্তিও হয় ত' কিছু,—কিন্তু এ কথা নিরন্তর মনে হয় যে, ইহ বাহ্য আগে চল।" ব'লে অমরেশ হাসতে লাগল।

অসীমানন্দ বললেন, "আগে ত নিশ্চয়ই চলবে; কিন্তু ইহ বাহ্য তাই বা কি ক'রে বল? তারই বা প্রমাণ কোথায়?"

পূর্ব্ববৎ সহাস্য মুখে অমরেশ বললে, "আবার কিছুক্ষণ আগের সেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের তর্ক এসে পড়ছে প্রভু।"

অসীমানন্দও সহাস্য মুখে বললেন, "তা এসে পড়ছে বটে; কিন্তু এসে যদি পড়ে তা হ'লে এই কথাই বুঝতে হবে যে সে তর্কের এখনও শেষ হয়নি। তুমি দার্শনিক, পণ্ডিত, জ্ঞানী; তুমি যুক্তিবাদী; ন্যায়ের প্রসাদগুণে তোমার যুক্তিপদ্ধতি সুস্থ ও সবল; কিন্তু অনুমানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হ'লেও তোমার চলবেনা অমরেশ। যুক্তি পরিচালনার একটা বড় রকম অস্ত্র হচ্ছে অনুমান।"

অমরেশ সংক্ষেপে বললে, "এ কথা মানি।"

অসীমানন্দ বললেন, "এ কথা মানোনা, কিন্তু স্বীকার করো।"

অসীমানন্দর মন্তব্য শুনে অমরেশ উচ্চস্বরে হেসে উঠল; বললে, "আমার দুর্ব্বলতা জানতে প্রভুর একটুও বাকি নেই।"

অসীমানন্দও হাসতে লাগলেন ; বললেন, "এড়িয়ে গেলে চলবেনা অমরেশ। তোমাদের আইন শাস্ত্রও অনুমানকে এত বেশি স্বীকার করে যে একটা কোনো ব্যাপার highly probable কিম্বা highly improbable হ'লে তার উপর নির্ভর ক'রে দণ্ড অথবা মুক্তি দিতে ইতস্ততঃ করেনা।"

অমরেশ বললে, "শুধু তাই কেন মহারাজ, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যই প্রখর অনুমানেরই সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু মানুষের কল্যাণের চরমতম কথা যে highly probable-এর ভিত্তির উপর নির্ভর করবে, মন তা মানতে চায় না। পরিপূর্ণ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে-দিন বিশ্বাসকে পাওয়া যাবে সে শুভদিনের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তার পূর্ব্বে অপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখতে চাইনে। সুতরাং আমার কৃষ্ণ বহু দূরেই আছেন।"

স্মিতমুখে অসীমানন্দ বললেন, "দূরে না হয় আছেন, কিন্তু আছেন ত ?"

অমরেশও সহাস্যমুখে বললে, "তাও ঠিক বলতে পারিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন প্রভু, আমি আস্তিক না হ'তে পারি, কিন্তু নাস্তিকও নই। আমি বিশ্বাসও করিনে, অবিশ্বাসও করিনে।"

অসীমানন্দ বললেন, "তা জানি,—তুমি বিশ্বাস করনা ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আর অবিশ্বাস করনা ঈশ্বরের নাস্তিত্বে!"

অসীমানন্দের মন্তব্যে অমরেশ এবং অসীমানন্দ উভয়েই সমস্বরে হেসে উঠলেন। কিন্তু অদূরবর্ত্তিনী এক যুবতীকে লক্ষ্য ক'রে সেই উৎকলিত হাস্যধ্বনি মধ্যপথেই শুব্ধ হ'য়ে গেল। যুবতির গতি থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল যে সে অমরেশদের উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হচ্ছে। মুখে তার উৎকট চিন্তা এবং দুঃখের অনুপেক্ষণীয় চিহ্ন।

অসীমানন্দ গতি রোধ করলেন, তারপর যুবতী নিকটে উপস্থিত হ'লে বললেন, "আমাদের কি কিছু বলবে মা তুমি ?"

যুবতী তার করুণ দৃষ্টি অসীমানন্দের প্রতি স্থাপিত ক'রে বললে, "হ্যাঁ বাবা, আমার বড় বিপদ!"

"কি বিপদ ?"

"কাল রাত্রি থেকে মার কলেরা হয়েছে, এখন অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছে!"

"কোথায় তোমরা আছ ?"

প্রান্তরের অপর দিকে একটা বৃহৎ গাছের তলায় যাত্রী-নিবাসের জন্য নির্ম্মিত একটা অস্থায়ী কুটির দেখিয়ে দিয়ে যুবতী বললে, "গাছতলায় ওই চালাঘরে।"

অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অসীমানন্দ বললেন, "এখন কি করা যায় বল অমর ?"

অমরেশ বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, যা করবার আমি করছি। আপনি যাবার পথে দুজন স্বেচ্ছাসেবক আর সম্ভব হয় ত' একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন। স্নান ক'রে এখনি ত আপনাকে পাঠে বসতে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে অসীমানন্দ বললেন, "আচ্ছা, সেই রকমই কর। পাঠ শেষ করেই আমি তোমার সাহায্যে আসছি।" তার পর যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "তোমাদের নামটা রিলিফ অফিসে লিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। তোমাদের সঙ্গে যিনি পুরুষ অভিভাবক আছেন তাঁর নাম কি মা ?

যুবতী বললে, "বিজয়লাল দাস, কিন্তু কাল রাত্রে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে তিনি আর ফেরেননি। দু তিন বার ভেদ বমি হয়েছিল, তাঁরও বোধ হয় ঐ রোগ হয়েছে।"

"তোমাদের সঙ্গে আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই ?"

"শুধু ভজুয়া নামে একজন চাকর আছে, তারও অসুখ।"

"তোমার মার নাম কি ?"

"মার নাম প্রভাবতী।"

"আর তোমার নাম ?"

একবার অমরেশের প্রতি এবং তৎপরে অসীমানন্দর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুবতী বললে, "আমার নাম পারুল।"

অসীমানন্দ বললেন, "আচ্ছা, তা হ'লেই হবে।" তারপর অমরেশের একেবারে নিকটে উপস্থিত হ'য়ে নিম্নস্বরে বললেন, "বড় কঠিন ধরণের অসুখ, সমস্ত দলটি আক্রান্ত হয়েছে। অকারণ নিজেকে বিপন্ন কোরোনা অমরেশ, সাবধানে থেকো।"

মৃদুস্মিত মুখে অমরেশ বললে, "আচ্ছা।"

কুটিরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে অমরেশ পারুলকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল থেকে আপনার মার কোন ওষুধ পড়েছে কি ?"

পারুল বল্লে, "দু-চার ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ছাড়া আর কিছুই পড়েনি।"

"কি ওষুধ পড়েছিল জানেন?"

"না, তা' ত জানিনে,—বিজয় বাবু যতক্ষণ ছিলেন দিয়েছিলেন।"

"জ্ঞান আছে?"

"বোধহয় নেই। কথা বলতে পারছে না।"

আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে অমরেশ নিঃশব্দে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

কুটিরে উপনীত হয়ে সর্ব্বাগ্রে সে প্রভাবতীর নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখলে। বাহুর সর্ব্বত্র পরীক্ষা ক'রেও কোথাও সামান্যমাত্র নাড়ীর গতি পাওয়া গেলনা। ঘরের ভিতর অতিশয় দুর্গন্ধ, এবং রোগিণীর দেহের উপর এক ঝাঁক মাছির উৎপাত। বাহিরে বেরিয়ে এসে অমরেশ পারুলকে ডেকে বল্লে, "ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত আপনি বাইরেই অপেক্ষা করুন, এখন আপনার মার কাছে ব'সে বিশেষ কোনো কাজ নেই।"

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখে গভীর সন্ত্রাসের চিহ্ন ফুটে উঠল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বল্লে, "কেন? তবে মা নেই না-কি?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে অমরেশ সান্ত্বনা-করুণ কণ্ঠে বল্লে, "কি করবেন বলুন, উপায় ত নেই। আমার মনে হয় আপনি যা ভয় করছেন তাই ঘটেছে। তবে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত—"

অমরেশের কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে পারুল উন্মত্তের মত দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল, তার পর বিগতপ্রাণ জননীর দেহখানা সবলে জড়িয়ে ধ'রে মুখের উপর বারম্বার চুমু খেতে খেতে আর্ত্তস্বরে রোদন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে অমরেশ পারুলকে বেরিয়ে আসবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করলে, কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় অগত্যা দৃঢ়ভাবে তার বাম বাহু ধারণ ক'রে সবলে তাকে বাহিরে টেনে নিয়ে এল। বৃক্ষতলে তাকে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, "এরকম ভাবে ইচ্ছে ক'রে নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত ক'রে কোনো লাভ আছে কি? জানেন ত' কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ।"

রোদন করতে করতে পারুল বল্লে, "তা জানি, কিন্তু এখন আর আমারই বা বেঁচে কি লাভ বলুন?"

অমরেশ বল্লে, "তা' ত ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যেও ত আমাদের অনেককে বেঁচে থাকতে হয়। সংসারকে সাজিয়ে রাখবার জন্যে সুখী অসুখী ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন নেই কি?"

সৃষ্টিরহস্যের এই তত্ত্ব-কথার প্রতি কোন প্রকার মন্তব্য প্রয়োগ না ক'রে পারুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে ফুলে রোদন করতে লাগল, এবং অমরেশ সকৌতুক কৌতূহলের সহিত মৃত্যু ও শোকের এই সহসালব্ধ লীলামাধুর্য্যের গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হ'ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা উপস্থিত হ'ল এবং ডাক্তার কর্ত্তৃক রোগিণীর মৃত্যু বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই চালা ঘর হ'তে প্রয়োজন মত বাঁশ এবং রজ্জু সংগ্রহ ক'রে শব বহনের ব্যবস্থা ক'রে ফেল্লে।

রোরুদ্যমানা পারুলকে সম্বোধন ক'রে অমরেশ বল্লে, "এখন এত-বড় একটা কর্ত্তব্য সামনে রয়েছে, এখন অত কাতর হ'লে চলে কি?"

অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে পারুল বল্লে, "কি করতে হবে বলুন?"

"ভজুয়া ব'লে আপনাদের যে চাকরের কথা বলছিলেন, সে কোথায়?"

পারুল বল্লে, "আপনার সঙ্গে ফিরে আসবার পর থেকে তাকে আর দেখতে পাচ্ছিনে। টাকাকড়ির হাত বাক্সটাও তারই জিম্মায় ছিল।"

"নগদ টাকাকড়ি কিছুই আর তা হ'লে নেই ত?"

পারুল বল্লে, "না তা নেই। কিন্তু তার জন্যে আটকাবে না, আমি তিন চারগাছা চুড়ি খুলে দিচ্ছি।" ব'লে বাম হস্ত হ'তে চুড়ি উন্মোচিত করতে উদ্যত হ'ল।

অমরেশ তাকে নিরস্ত ক'রে বল্লে, "এখন থাক, প্রয়োজন হ'লে খুললেই হবে।" তারপর পারুলের কাছ থেকে ভজুয়া এবং বিজয়লালের আকৃতি নিরূপিত ক'রে নিয়ে একজন স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পুলিশে সংবাদ প্রেরণ ক'রে চালাঘরটায় অগ্নি প্রয়োগের পর প্রভাবতীর মৃত দেহ নিয়ে শ্মশানাভিমুখে নির্গত হ'ল। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনের পথে

ডাঃ এন, ব্যানার্জ্জি

মানুষ অতুল ধন-সম্পদের মাঝে ডুবিয়া থাকিয়াও অন্তর্নিহিত বেদনা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। অতুল ঐশ্বর্য্য মানুষের সুখের উৎস কোথায় সন্ধান দিতে পারে। অজ্ঞতা দূর না হইলে আনন্দ কোথায়? ধনৈশ্বর্য্য বাহ্যিক সুখ স্বচ্ছন্দের বিধান করিতে পারে কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দ সত্বেও মানুষের ব্যথা যে কোথায় লাগিয়া থাকে, তাহার সন্ধান কে বলিবে? লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া যাঁহারা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অন্তরেও যে বিষাদের ছায়া পড়ে একথা লোক ভাবিতে পারেনা; কিন্তু জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, তাঁহাদের অন্তরেও সর্ব্বদা ভয় আশঙ্কা লাগিয়া আছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যাহারা তাঁহাদের কোলে থাকিয়া সংসারকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের ব্যাধির আশঙ্কা সব সময় পিতামাতার মনকে ভীত করিয়া রাখিয়াছে; সামান্য জল বায়ুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিশ এমন কি নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া আক্রমণ করে। ছোট ছোট ফুলের মত শিশু, যাহাদের নৃত্য-কৌতুক হাসি, শিশুকণ্ঠের কাকলিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে দিবারাত্র ম্লান মুখে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কোন পিতা মাতা শান্তি পান? ধনীর দুলালকে হয়তো সারা মাসই শয্যায় কাটাইতে হইল, রোগের কাতরোক্তি সমস্ত গৃহখানাকেই বিষাদপূর্ণ করিয়া তুলিল। স্নেহশীল জনক, মঙ্গলময়ী জননী, তাহার রোগপাণ্ডুর মুখ দেখিয়া, অন্তরের কোনে কেবল অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারের মধ্যেও এই অশান্তি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া গৃহস্বামী যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিলেন তাহা হয়ত অসুখেই ব্যয় হইয়া গেল। গৃহে আসিয়া গৃহিণীর কাছে সন্তানের অসুস্থতার সংবাদ শুনিলেন, অমনি তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। পিতামাতার সুখ দুঃখ নির্ভর করে সন্তানের সুখ স্বচ্ছন্দের উপর। গৃহে আসিয়া কর্ম্মক্লান্ত পিতা সন্তানের হাসিমুখ মিষ্ট কথা শুনিয়া তৃপ্ত হন। সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে সেই সব আদরের দুলাল দুলালীদের সবল দেহে ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দেখিলে। আর যদি বারমাসই অসুস্থ থাকিয়া কষ্টভোগ করে তাহা হইলে পিতামাতার মনে কতখানি দুঃখ আনয়ন করে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

সাংসারিক বা সামাজিক জীবনে কল্যাণ আনিতে হইলে, জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকাই জীবন নহে, জাতির কল্যাণ নির্ভর করিতেছে শিশুদের উপর; সুস্থ সবল শিশু যে দেশে ঘরে ঘরে জন্মিবে সেই দেশ শুধু ধন-সম্পদে নহে, সাহস তেজ ও বিক্রমে বলশালী হইবে। যে দেশের শিশুরা সারা বছরই সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিসে ভোগে সে দেশের জাতির মেরুদণ্ড যাইবে ভাঙ্গিয়া। এই অসুস্থতার হাত হইতে বালক বালিকাকে রক্ষা করিতে হইলে, সুইজারল্যাণ্ডের রচি কোম্পানীর তৈরী 'সিরোলিন' ঘরে ঘরে রাখিতে হইবে। খাইতে সুস্বাদু বলিয়া শিশুরা নির্ব্বিবাদে ইহা সেবন করিয়া থাকে। উপায় থাকিতে পিতামাতা সাবধান হউন ইহাই দেশ দাবী করিতে পারে। দেশের সব ভাবী বংশধরগণ যাহাতে দীর্ঘজীবি, নীরোগ হয় ইহাই দেশের কামনা। সর্দ্দি, কাশি হইলে কিম্বা হইবার পরে 'সিরোলিন' খাইলে, আশু ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্বামী যদি এ বিষয় বিশেষ যত্ন লেন ও সতর্ক হন তাহা হইলে আমাদের সংসারের এবং দেশের কল্যাণ সাধন হইবে।

ছান্দসী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ

সঙ্গীত-হারা যত জীবনের বাণীতে
যুক্ত করিলে যদি ছন্দ,
পড়িল কি মোহময় শৃঙ্খল-খানিতে
মুক্ত বিহঙ্গম বন্ধ ?
নহে নহে,—ইঙ্গিতে অনন্ত আভাসে
বন্ধনে দিয়েছ যে মুক্তি,—
জীবনের বাতায়নে ধরণী ও আকাশে
চলিছে নিরন্তর যুক্তি।

বেষ্টিত বাহু দু'টি রচিত এ তোরণে
সুদূরের বায়ু বহে মন্দ,
তারি কম্পনে ভাসে ব্যাকুলিত স্মরণে
কোন্ ভুবনের ফুলগন্ধ !

সীমাহীন নীলাকাশ আসিয়াছে নামিয়া
মর্ত্তের ক্ষুদ্র ও-বক্ষে,
বাধাহীন জলভরা মেঘ আছে থামিয়া
কজ্জল-কালো দু'টি চক্ষে।

আমারে হারায়ে যেতে সাগরের অকূলে
সীমাহীন ওই দিক্-প্রান্তে,
পাষাণ-প্রাচীরে দিলে বাতায়ন কে খুলে
ইঙ্গিত করিলে সীমান্তে।
বন্ধনে বহি' আনি' মুক্তির বারতা
ওগো মোর অসীমের সরণি,—
জীবনের সঙ্গীত-হারা নিশ্চলতা
আজি পেল ছন্দের তরণী।

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ২১এ ফেব্রুয়ারী ৯ ফাল্গুন, রবিবার হ'তে আরম্ভ করে তিন দিন চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হ'বে। মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন সুপণ্ডিত দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতি পদেও সুযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন বলে' আমরা সংবাদ পেয়েছি। সম্মিলনের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রবন্ধ সম্পাদক, বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির, চন্দননগর এই ঠিকানায় প্রেরিত হ'লে সাদরে গৃহীত হবে। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এই অধিবেশনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৭ বাং ২৮শে পৌষ ১৩৪৩ বিচিত্রা নিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

"বিচিত্রা" এবং বিচিত্রা নিকেতনের কার্য্যালয়ের সহিত যাঁরা সামান্য মাত্রও সংশ্লিষ্ট তাঁরা জানেন শরৎবাবু বিচিত্রা নিকেতনের কতখানি ছিলেন। বোধ করি মৃত্যুর দিনেও "বিচিত্রা নিকেতনের" শুভাশুভ তাঁর চিন্তার সর্ব্বপ্রধান বিষয়বস্তু ছিল এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ইদানিং ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল শ্রমসাপেক্ষ কর্ত্তব্য পালন সব সময়ে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হলেও তৎপূর্ব্বে বহু দীর্ঘকাল তিনি যে নিরলস পরিশ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আন্তরিক অনুরাগের সহিত কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন তা সত্যই বিরল। বিচিত্রার কর্ত্তৃপক্ষের তিনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন,—তাঁর মৃত্যুতে বিচিত্রা নিকেতন একজন পরম শুভানুধ্যায়ী হ'তে বঞ্চিত হ'ল তা নিঃসন্দেহ।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহবিমুক্ত আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করুক এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুর‍্যান্স সোসাইটি লিঃ

ঊনত্রিংশ বার্ষিক বিবরণী

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুর‍্যান্স সোসাইটির যে ঊনত্রিংশ বার্ষিক (১৯৩৫-৩৬) বিবরণী আমাদের হস্তগত হ'য়েছে তা পড়ে' বাংলাদেশের এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতিতে আমরা প্রকৃতই গৌরব অনুভব করতে পারি।

নূতন বীমার পরিমাণের হিসাবে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় হিন্দুস্থান এ বৎসরও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বৎসরের শেষে সোসাইটিতে ১২ কোটি টাকার উপর বীমাপত্র চলতি ছিল। প্রিমিয়াম বাবদ আয় পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হ'য়ে আলোচ্য বর্ষে ৫২৪১৭৬৬৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে। দাদনী টাকার সুদ বাবদ ৯ লক্ষ টাকার উপর আয় হ'য়েছে। পূর্ব্ব বৎসর বীমার তহবিল ছিল ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, বর্ত্তমানে তা ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সোসাইটির মূলধনের পরিমাণও ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকার উপর উঠেছে। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটি মৃত্যুদাবী এবং বীমাপত্রের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ প্রায় সাড়ে ষোল লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। সোসাইটির সূত্রপাত

হ'তে অদ্যাবধি বীমাকারীদের দাবী ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর মিটান হ'য়েছে।

সোসাইটির ব্যয়ের হার আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২ ভাগ কমেছে দেখে আমারা অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের শতকরা ৩৩-৩ ভাগ। পরিচালকবর্গ এই ব্যয়ের হার আরও যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বেন বলে আমরা আশা করি।

কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতির উপর এ পর্য্যন্ত ৪২ লক্ষ টাকার উপর দাদন করা হয়েছে। বন্ধকী সূত্রে ৬৬ লক্ষ টাকার উপর ভূ-সম্পত্তিতে ৫২ লক্ষের উপর এবং বীমাপত্রের উপর ২০ লক্ষ টাকার অধিক নিয়োজিত আছে। হিন্দুস্থানের দাদনপদ্ধতি ইহার উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। মূলধনের নিরাপত্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী টাকা খাটিয়ে উচ্চ হারে সুদ অর্জ্জন হিন্দুস্থানের দাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের এবং বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির এতাদৃশ উন্নতিতে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন
লক্ষ্ণৌ নগরীতে নবম অধিবেশন

গত ২৬এ হতে ৩০এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের ৯ম অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। যুক্তপ্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষী ও শিল্প প্রদর্শনীর সহযোগিতায় ও সাহায্যে এই সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ গুণী এই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে যোগদান করেন। রায় উমানাথ বালি, ডাঃ ডি, আর ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর প্রভৃতি সম্মিলনের সম্পাদকদের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে এই অধিবেশন সাফল্য লাভ করে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় রাজেশ্বর বালি মহোদয় টেহ্‌রীর মহারাজ বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং সে সকলের উন্নতিকল্পে তাঁর উৎসাহদান সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কিছু বলেন। সমিতির পক্ষ হ'তে তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং সঙ্গীত বিশারদদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিখিলভারত সঙ্গীত সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশন দ্বারা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত প্রচার এবং সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তন যে কতটা সাহায্য প্রাপ্ত হ'য়েছে তারও উল্লেখ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুদিগম্বরজি, নবাব হামিদ আলি খাঁ, রাজা মহম্মদ আলি খাঁ, অতুলপ্রসাদ, উজির খাঁ, জাকিরউদ্দিন খাঁ, আল্লাবন্দে খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, নাসিরুদ্দিন, আবিদ হোসেন, বীরু মিশ্র প্রভৃতি শিল্পীশ্রেষ্ঠের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তিনি মহারাজ বাহাদুরকে সম্মিলন উদ্বোধন করতে অনুরোধ করেন।

সুবিখ্যাত গায়ক সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের 'ছায়ানট' ও 'আড়ানা' রাগিণীর সুললিত আলাপ ও ধ্রুপদ গানে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হ'ন। সঙ্গীত-জগতে তাঁর উচ্চস্থান সর্ব্বজনস্বীকৃত। বাংলার প্রতিনিধি-রূপে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় সভায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ খ্যাল গায়ক ওস্তাদ

গীতসাগর গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফৈয়জ খাঁ সাহেবের 'বাহার' 'ভৈরবী' 'পুরিয়া' 'খাম্বাজ' প্রভৃতি রাগিণীর বিচিত্র আলাপে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। গোপেশ্বরবাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেদারা' রাগিণীর আলাপে ও ধ্রুপদগানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুগায়িকা কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও কুমারী সুষমা দে'র গান বিশেষ উপভোগ্য হ'য়েছিল। এঁরা দুজনেও স্বর্ণপদক পেয়েছেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু নারীকণ্ঠে গান গেয়ে সকলকে মোহিত করেন এবং কয়েকটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হ'ন। কুমারী রেণুকা সাহার সেতার এবং কুমারী অমলা নন্দী, বীণা নন্দী ও আশা ওঝার নৃত্য অতিশয় চমৎকার হ'য়েছিল এবং এঁদের প্রত্যেকেই স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। নয় বৎসর

বয়স্কা কুমারী পুষ্পরাণী অত্যাশ্চর্য্য নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়ে ৬টি সুবর্ণপদক এবং দুটি কাপ পুরস্কার পেয়েছেন। ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য্য এবং পুত্র আর, এন্, ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীতে সকলে প্রীত হ'ন।

অন্যান্য ভারতশ্রেষ্ঠ গুনিদের মধ্যে হাফেজ আলি খাঁ, ইনায়েৎ খঁ, নারায়ণ রাও ব্যাস, মুস্তি খাঁ, প্রোঃ আগা খাঁ, ডি, এন, পটবর্দ্ধন, রহিমুদ্দিন খাঁ, দিলীপচাঁদ বেদী, আলাউদ্দীন, নাসির খাঁ, বন্দে হোসেন, অবুছন সাহেব (নৃত্য), জি, এন্. নাটু (মরিস কলেজ), মহাদেওপ্রসাদ, চন্দ্রিকাপ্রসাদ, সখারাম রাও, ওম্‌রাও খাঁ, আত্মাপ্রকাশ বর্ম্মা, (মুখে ঘুঙুর বাদ্য) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৩০এ রাত্রিতে সম্মিলন শেষ হয়।

'যাদুসম্রাট' পি, সি, সরকার

কলিকাতার খ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার অল্প বয়সেই যাদুবিদ্যায় যে অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জ্জন

যাদুসম্রাট পি সি সরকার

করেছেন তা সত্যই সবিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। এই অল্প বয়সেই তিনি দেশ-বিদেশে তাঁর বিস্ময়জনক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে বহু অভিজ্ঞ এবং প্রাচীন গুণীজনকেও বিমুগ্ধ ক'রে দিয়েছেন।

প্রফেসার পি, সি, সরকার ইংলণ্ডের যাদুকর সংঘের 'জুয়েল' প্রাপ্ত 'পূর্ণ' সভ্য, লিষ্টার ম্যাজিক সার্কলের 'সম্মানিত সদস্য', প্যারিসের কলেজ অফ্ সাইকলজির খ্যাতনামা ছাত্র এবং প্রাচ্যের প্রতিনিধি ব'লে সর্ব্ব দেশে পরিগণিত।

বৃদ্ধ যাদুকর গণপতি প্রফেসার সরকারের দক্ষতায় বিমুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে 'যাদুসম্রাট' উপাধি দান করেছেন এবং 'কৃতিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ব'লে অভিহিত করেছেন।

প্রফেসার সরকার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অধিবাসী। কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য শীঘ্রই তাঁর জাপান, এবং তথা হ'তে আমেরিকা ও ইউরোপ গমনের কথা আছে। আমরা প্রফেসার সরকারের অধিকতর উন্নতি, সর্ব্বদেশে জয় লাভ এবং সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ড্রাগ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কোং

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ভেষজ এবং প্রসাধন দ্রব্য প্রতিষ্ঠান অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং'র নিকট হ'তে আমরা তিন প্রকারের তিনটি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার উপহার পেয়েছি। বহুব্যবহৃত সুবিখ্যাত কেশতৈল 'যামিনীয়া' তৈল এবং পুষ্পসুগন্ধি 'অটো দিলবাহার' এই প্রতিষ্ঠানেরই প্রস্তুত দুইটি সর্ব্বজনপ্রিয় প্রসাধন সামগ্রী।

আমরা চিত্তাকর্ষক ক্যালেণ্ডার তিনটির জন্য আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফটো সোসাইটি ও একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলির ফটোগ্রাফ কলিকাতা ১৫৭ বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক গৃহীত। ফটোগুলি অতিশয় সুন্দর হয়েছে ব'লেই সেগুলি থেকে ব্লক এত পরিচ্ছন্ন হতে পেরেছে। ছবিগুলির ফটোগ্রাফ গ্রহণে এই সুবিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠানের যশ অক্ষুণ্ণ রইল।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta, and Published by Indubhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা, ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা চার আনা ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য মায় ডাক মাশুল তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম দেশের বাহিরে বার্ষিক মূল্য দশ টাকা ও ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা। মূল্যাদি "স্বত্বাধিকারী বিচিত্রা নিকেতন লিঃ"—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন। উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে কোনো-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কূপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা অবশ্য জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত কবিতা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথবা এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতি স্থান-বিশেষে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা দ 'বর্জ্জ ইস্'-অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ১ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১২৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ [illegible] পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ২৭০৪

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৪৩ | ২য় সংখ্যা

ছাত্রদের প্রতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু এবারকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলা দেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্য-বিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হোলো।

দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তাবিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয়নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা যে-বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত সঙ্কীর্ণ শ্রেণী-বিশেষের অলঙ্কার-প্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয়নি, নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকে শক্তি দেবে শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এই জন্যই এই শিক্ষার সর্বজনসুগমতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করেনি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা,—ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি, জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পংক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যা-দানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার

এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয়নি, যেমন সাহারা-মরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সঙ্কোচবশত চিত্তশাসন এক হোতে পারেনি। বর্তমানকালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্য-জাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয়নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায় এক জাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয় কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তি-ব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে কেননা ঋণ ক'রে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখৎ লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষায় পার হোলো তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধিদ্বারা চিহ্নিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের রচিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী ব'লে গণ্য হোতে থাকে। বলা বাহুল্য যে পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী ক'রে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া।

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হোতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে; স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে এ'কে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক অপরিচিত ব'লে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য কিন্তু চিত্ত-সম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তিদ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ, কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হোতে থাকে; সরস্বতী অকৃপণ, কেননা সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলা-দেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করেনি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার

উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যারা বিদ্বান্ ব'লে গণ্য ছিলেন তারা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য, ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে, দূরদেশি ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্য-সৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেই সঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরস-ভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি যে, ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আহ্বান করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম-পদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্টন-হোমর-প্রতিভার অতিথি-সৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হোতে থাকে।

এই যেমন কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন, তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পথ-মুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথা-সাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। কিন্তু যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরিশিখরের জল-প্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে, তখন দুই তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান ক'রে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান্ করে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্য-প্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিত-সমাজ নিশ্চিত স্থির ক'রেছিলেন যে তাদের ভাব-রস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপাদান একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্প-শিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যে দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ হয়তো বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেতে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলেফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

"বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা লাভে গৌরবান্বিত হবে সেই আশার সঙ্কেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি, তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন ক'রে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি।"

নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয়নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তারপরে কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমতো একদিন সসঙ্কোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম, মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম, এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্য-লাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হোতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হোত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হোত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতা-লাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষাসঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেখানে যে জন-মন একদা ছিল অখ্যাত অন্ধকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায়, সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এদিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যা-নিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকার কাজ ক'রে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়, সে স্পর্শও ক্ষীণ, যে হেতু তা প্রাণবান নয়, যে হেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্য-মহাদেশের যে-যে অংশে নব দিনের উদ্বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মানলাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ-ক্ষেত্র থেকে পৃথক ক'রে রেখেছেন, তাকে ভিন্ন জাতীয় ব'লে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা-সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলিন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমঞ্চ চূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপরে তিনিই বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন,

সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্যবাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ ক'রে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল, বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নব পল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে, যেখানে স্থানীয় প্রজা-সাধারণের ভাষা না হোক্‌ পরন্তু শ্রেণী বিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে; এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সঙ্কল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি-দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে, তবু অন্ততঃ ৫ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই যে সম্মান নিবেদন করলেন, এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্য্যবান্‌ পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব-সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধনসঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্চে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যে রকম প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধ'রে মানুষের স্বাধিকারকে নির্ম্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে, ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয়নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয়নি। আজ তা হোতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝিকালে যখন ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তখন ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে; সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিত কালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ন হোলো, ক্ষীণ হোলো যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্ম্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন, তারা পরস্পরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষসাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায়নি। মানব-জগতের যে ঊর্দ্ধলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপুপদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড় ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে আমরা যে সকল মহামহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি, তাদের প্রধান সাধনা ছিল মানবজগতের ঊর্দ্ধলোককে নির্ম্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্ম্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাসহীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব'লে যারা গর্ব করে এই

সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত ব'লে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। তার নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা ব'লে অস্বীকার করতে পারিনে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য একথা বলব না।

সভ্যতার পদস্খলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বারবার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বারবার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্যদেশেও; দেখা গেছে মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয় করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়েও। য়ুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে, দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হোলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না, এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্য্যের অসঙ্কুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত,—দেখিয়েছে প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞান-বিতরণের কাজে, আরোগ্য-সাধনের উদ্যোগে। আজও এই সাঙ্ঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যারা, নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে দুর্বলের পক্ষে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন ক'রে নিচ্ছেন। বারেবারে অকৃতার্থ হোলেও তাঁরাই আজ পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারিদিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্র-বিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে, সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হোতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন সুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ ক'রে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কিনা এখনো তার প্রমাণ পাইনি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ্য আমাদের ঘটেনি। কিন্তু ঘুর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে, এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল। বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণ-বোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হোলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি, সৌভ্রাত্র্য সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে মরণদশা তার বুকে থরনখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণ জর্জর ক'রে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে, অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ ক'রে

চলতে হবে, যে পরাস্ত যদি হোতেও হয়, তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়, যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝ-দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় মনে না করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোযোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না; অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা কদর্যতা সব কিছুকে অত্যুক্তি-বর্জিত ক'রে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহঙ্কারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যবার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে আমাদের স্বভাবে; আমাদের অভ্যাসে; আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনি আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থায় অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ ক'রে বধির শত্রুর অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি, তখনি হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে—"তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্ম-শত্রুতার বিরুদ্ধে, প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দী-নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তিমূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তারপরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে ভিক্ষুকতার ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ব বন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানমর্যাদা-বিসর্জন
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুশান্ত সা'

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল

৬

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা প্রায় ঢলে পড়েছে। আমাদের শোবার ঘরের পশ্চিমের জানালা দুটী দিয়ে দুই ঝলক্ ম্লান রৌদ্র আমাদের ঘরের মধ্যে এসে খানিকটা আমাদের খাটের উপরে খানিকটা মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছিল।

তুষারবালাই আমাকে ঠেলে তুললে। বললে "ওঠ, ওঠ, বেলা যে গেল।"

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—"উঃ বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি এখন আছ কেমন"—এই বলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে ফেল্লাম। বাইরে বারান্দায় গিয়ে ঘটী করে জল মুখে চোখে খানিকটা ছিটিয়ে দিয়ে বংশী চাকরটাকে ডেকে চায়ের জল চড়াতে বলে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে খাটের উপর বসেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ীর বাইরের একজন বরকন্দাজ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে সেলাম দিয়ে বললে "হুজুর, মহল থেকে একজন লোক এসেছে। বিশেষ জরুরী কাজ, আলী মিঞা বল্লেন হুজুরকে একবার বাইরে যেতে।"

"আচ্ছা, একটু পরে যাচ্ছি।" বলে লোকটাকে বিদায় দিলাম। তুষারবালা আমার কোঁচার খুঁট চেপে ধরে বললে "তোমাকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না। এই যাবে আর সমস্ত সন্ধ্যাটা কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকবে। এই শরীরে সারা সন্ধ্যা একলা কি করে থাকি বল?"

আমি বল্লাম "চা টা খেয়ে নি। যাব আর আসব। আজ মোটেই দেরী করব না।"

তুষারবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, "না, না তা কেন, আমার জন্য তুমি তোমার কাজ নষ্ট করবে কেন? তার চাইতে এক কাজ কর—বংশী চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দাও ঠাকুরপোর কাছে; আমাকে দুখানা বই দেবে বলেছিল। চেয়ে নিয়ে আসুক।"

আমি বললাম "তুমি এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছ ত?"

বললে—"বড্ড কাহিল বোধ হচ্ছে। মাথাটাও ঘুরছে এখনও। দেখি, উঠি একবার—তোমার চায়ের বন্দোবস্ত করি।" এই বলে আস্তে আস্তে উঠে বস্‌ল।

আমি বললাম "তুমি ব্যস্ত হয়ো না। বংশীকে আমি এইখানেই চা আন্‌তে বলেছি।"

একটু পরেই বংশী কেট্‌লীতে গরম জল দুটো চায়ের বাটী দুধ চিনি চা ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির করল। মেজেতে একখানা আসন পেতে দিয়ে তার সামনে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখলে। তুষারবালা অতি সন্তর্পনে উঠে ধীরে ধীরে গিয়ে বস্‌ল সেই আসনের উপরে। আমিও একটা আসন নিয়ে মেজেতে তার কাছে গিয়ে বস্‌লাম।

তুষারবালা বললে 'শুধু চা খাবে? সরলাকে ডেকে ২।১ খানা লুচি করতে বলি না?"

আমি বললাম "না, না দরকার নাই। বড্ড বেলায় খেয়েছি। এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কিছু খাবে এখন?"

বললে "না, থাক।"

চা খেতে লাগ্‌লাম। চা খেতে খেতে তুষারবালা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বুঝি চা খেয়েই বাইরে চলে যাবে?"

বললাম "হ্যাঁ, এই যাব'খন একটু পরে।"

তুষারবালা বললে, "সমস্ত দিন মাথা খাওয়া দাওয়া কিছু দেখা হল না। হয়ত আমার উপর মনে মনে কতই না রেগে যাচ্ছেন।...বংশীকে একবার ডাক না, আর একটু গরম জল নিয়ে আসুক।"

বংশী এল, তাকে গরম জল আনতে বলা হল। তুষার-বালা চা খেতে খেতে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তন্ময় হয়ে কি এত ভাবছ?"

বললে, "না, কিছু না।"

বললাম, "তবুও শুনি না।"

বললে, "শরীরটা এখনও ঠিক হল না, সারা সন্ধ্যাটা শুয়েই থাকতে হবে। একলা একলা কি করে কাটবে ভাবছি।"

বললাম "বংশীকে মুকুন্দর কাছে পাঠাই।"

বংশী গরম জল নিয়ে ঘরে এল।

আমি বললাম, "বংশী! এক কাজ কর, ও বাড়ী গিয়ে ছোটবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

তুষারবালা তাড়াতাড়ি বললে "না না, ডাকবার দরকার কি।"

বলিস বৌঠাকুরাণীর অসুখ করেছে, আপনি যে বই দুখানা দেবেন বলেছিলেন দিন্‌!"

আমি বললাম, "আসুক না, গল্পে-সল্পে একটু অন্যমনস্ক হবে।"

বললে, "না, হয়ত কোন কাজকর্ম্ম আছে।"

চা খাওয়া হয়ে গেলে তুষারবালা বললে, "তুমি আর একটু বস, আমি চট্‌ করে কাপড়খানা ছেড়ে চুলটা বেঁধে নি। খাটের উপর পড়ে গিয়ে কেমন যেন একটা ভয় হয়েছে আমার। ভাবি, আবার তেমনি মাথা না ঘুরে উঠে।

আমি বললাম, "বেশ ত নাও না।"

তুষারবালা কোন রকমে উঠে তোরঙ্গ থেকে একখানি রঙিন সাড়ী বার করলে। তারপর দেওয়ালে টাঙান আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধলে। বেঁধে বললে, "যাই, মুখটায় একটু সাবান দিয়ে আসি। সমস্ত দিন কি ভাবেই আছি। তোমার আমাকে দেখতে বড্ড খারাপ লাগছে না?"

আমি বললাম, "তুমি যেমন থাক, তাতেই তোমাকে ভাল দেখায়।"

"যত বাজে কথা"—বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে সেই রঙিন্‌ সাড়ীখানা পরলে। তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, 'চুলটা ঠিক করে দাও না, তুমি যেমন পছন্দ কর।"

আমি উঠে তুষারবালার চুল কপালের উপর একটু ঢেউ খেলিয়ে ঠিক করে দিলাম। তারপর তুষারবালা কপালে সিঁদুরের টিপ পরলে; তার খানিকটা গুঁড়ো ঈষৎ ঝরে এসে পড়ল নাকের উপরে।

আমি বল্‌লাম 'নাকটা পুঁছে ফেল, সিঁদুর পরেছে।" একটু হেসে বল্‌লে "না, থাক্‌। জান ত ওটা স্বামী-সোহাগিনীর লক্ষণ।"

এই বলে ক্লান্তি ভরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। মাথাখানা তুলে রাখ্‌লে হাতের উপরে। আমি যাওয়ার জন্য চটী পায়ে দিয়ে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি, তুষারবালা বল্‌লে, "বস, আর একটু বস। ঘোরাঘুরি করে মাথাটা কি রকম করছে। একটু সুস্থ হয়ে নি, তারপর যেও।"

আমি বসলাম। কিন্তু কথাবার্ত্তা আর বিশেষ কিছু জোম্‌ল না। বোধ হয় সমস্ত দিন ঐ ভাবে থেকে থেকে আমার মনটা তখন একটু বাইরে বেরুবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তুষারবালাও আর বিশেষ কিছু বল্‌লে না। চোখ বুঁজে রইল, যেন তার শরীর যথার্থই একটা যন্ত্রণা তাকে যেন অভিভূত করে ফেল্‌ছে। কিছুক্ষণ পরে বংশী এল।

বল্‌লে, "ছোটবাবু এখুনি আসছেন।"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা আমি এখন ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ দেরী করব না।"

তুষারবালা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "না, না, কাজ শেষ না

করে এস না। স্ত্রীর জন্য কাজ অবহেলা করা— জান ত আমি ওসব পছন্দ করিনা।"

অন্দরমহল থেকে সদরের দিকে যেতে যেতে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা হ'ল।

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বৌঠানের কি হয়েছে ?"

বল্‌লাম "বিশেষ কিছু নয়। সকালবেলা চান করতে গিয়ে ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তুই যা, শোবার ঘরে শুয়ে আছে, একটু শব্দ গল্প-সল্প করগে। আমি বাইরে একটু কাজ সেরে আসি।"

মুকুন্দ ভিতরের দিকে চলে গেল।

* * *

কাজ কর্ম্ম সারতে আমার বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে পুকুরের ধারে দাদার সঙ্গে দেখা হল। দাদা তখন সান্ধ্য স্নান সেরে উঠে আসছেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম দাদা বার মাসই তিন বেলা স্নান করতেন। দাদা জিজ্ঞাসা করলেন 'সুশন! বৌমা এ বেলা ভাল আছেন ত ?"

আমি বল্‌লাম "হ্যাঁ"।

ভাল যে ছিলেন সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই তুষারকে ছেড়ে এসে আমি তার জন্য কোন রকম উদ্বেগ বা চিন্তা অনুভব করিনি।

দাদা এক প্রস্তাব করে বসলেন। বল্‌লেন "দেখ সুশন, মার বড্ড কাশী যাবার ইচ্ছে হয়েছে। আজ বিকেল বেলা আমাকে বল্‌ছিলেন। এক কাজ করিনা, মাকে নিয়ে আমি দিন কতক কাশী থেকে আসি।"

কথাটা শুনে আমি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। মার যে এ সংসারে শান্তি ছিল না তা আমি জানতাম। তবুও ভিতরে ভিতরে যে এতখানি হয়ে উঠেছিল—যে মা আমাদের সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হতে চাইছেন এতটা বুঝতে পারিনি। বুকে একটা ব্যথা লাগল। হঠাৎ কি জবাব দেব খুঁজে পেলাম না। বল্‌লাম 'আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে এখন। তুমি এখন এই শীতে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগিও না।"

দাদা আর কিছু না বলে ভিতরে চলে গেলেন। আমিও প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটু ব্যথা বয়ে নিয়ে ভিতরের দিকে চল্‌তে লাগলাম। উপরের বারান্দায় এসে দেখি তুষারবালার ঘরের সামনে দরজার পাশে হ্যারিকেনটা কমান রয়েছে। এবং ঘরের ভিতর হতে গড়িয়ে পড়া তুষার বালার চিরপরিচিত উচ্চ হাস্য কানে এল। হঠাৎ কি ভেবে আমি সে ঘরে না গিয়ে মার সন্ধানে নীচে গেলাম।

মুকুন্দর সঙ্গে তুষারবালার সম্পর্ক ক্রমেই মধুর হতে মধুরতর হয়ে উঠ্‌ছিল—আমার বড় ভাল লাগত। বিবাহের পরে প্রথম যেদিন মুকুন্দর সঙ্গে তুষারবালার পরিচয় হল, মুকুন্দ নানান রকম মিষ্টি কথায় এমন করে নিজেকে তুষার বালার কাছে প্রতিষ্ঠিত করে ফেল্‌লে যে আমি অবাক হয়েছিলাম। মুকুন্দটা ঢং কম জানে না ত! তুষারবালা প্রথমে কিছুতেই কথা কইবে না। মুকুন্দ মেজের একটা আসন টেনে নিয়ে বসে পড়ে বল্‌লে "এই বসলাম বৌঠান্! কথা যতক্ষণ না কইবে এখান থেকে উঠ্‌বও না, জলস্পর্শও করবনা। এ দেওরটার সঙ্গে পেরে উঠা খুব সহজ হবে না বৌঠান্। আপনার করে নিতেই হবে একে।"

এইরকম ধরনের নানান রকম কথার মধ্যে তুষার-বালাকে কথা কইয়ে, নিজের গান শুনিয়ে প্রথম দিনই একেবারে জমিয়ে দিয়ে গেল। তারপর থেকে প্রথম প্রথম প্রায় রোজই আস্‌ত এবং নানান রকম ঠাট্টা তামাসা রসিকতার মধ্য দিয়ে তুষারবালার সঙ্গে পরিচয়টা বিশেষ রকম মধুর করে তুল্‌ল। এবং লক্ষ্য করেছিলাম মুকুন্দকে তুষারবালার শুধু যে ভাল লাগ্‌ত তা নয়, তার প্রতি একটা আন্তরিক টানেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কতদিন আমাকে বলেছে "মুকুন্দঠাকুরপোর মত দেওর পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যের ফল। কি মিষ্টি ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তার। আমার ছোট ভাই নেই, মুকুন্দঠাকুরপো সে অভাব পূরণ করল।"

শুনে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। মুকুন্দকে আমিও ত চিরকালই স্নেহ করে এসেছি। এবং লেখাপড়ায় মুকুন্দ আমার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পর পর দুবার যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে বস্‌ল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও মুকুন্দর যাতে রীতিমত শিক্ষালাভ হয় আমি তার

বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম। ছুটীতে ছুটীতে নানান রকম বই কিনে রুটীন করে মুকুন্দকে পড়াবার ব্যবস্থা করতাম। ভাল ভাল ইংরাজী উপন্যাস পড়ে তর্জ্জমা করে মুকুন্দকে শোনাতে আমার ক্লান্তি ছিলনা। কিন্তু ফলে বিশেষ কিছু যে হয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না।

মুকুন্দর বুদ্ধিটা কিন্তু লেখাপড়ায় যতটা খেলুক বা নাই খেলুক জমিদারীর কাজকর্ম্মে বেশ কাজে লাগতে লাগলো। এবং পর পর দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার দরুণ, তার বাপ যখন তাকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে জমিদারীর কাজকর্ম্ম শেখাতে লাগলেন, তখন অল্প দিনের মধ্যেই জমিদারীর কাজকর্ম্মে সে বেশ পাকা হয়ে উঠল। এবং ইতিমধ্যে বার দুই জমিদারীর সরিকানা ব্যাপারে আলী-মিঞার মত তোখড় লোকের সঙ্গেও সমানে টক্কর দিতে সে একটুও পিছপাও হয়নি। এবং নেহাত আমি মধ্যে না থাকলে মুকুন্দর সঙ্গে আলীমিঞার বিরোধটা বেশ গুরুতর রকমেরই হয়ে উঠত। আলীমিঞা অনেকদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছেন, "বাবু ওবাড়ীর ছোটবাবুকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না। দরকার হলে আপনাকে পর্য্যন্ত ছোবল মারতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করবেন না।"

আমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতাম। কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হ'ত ভাবতাম—আলীমিঞা মুকুন্দকে ভুল বিচার করেছেন।

বিশেষতঃ তুষারের সঙ্গে মুকুন্দর সম্পর্কটা যতই মধুর হয়ে নিবিড় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, ততই যেন আমার প্রাণে প্রাণে মুকুন্দর সঙ্গে স্নেহের বন্ধনটা আরও দৃঢ় হ'ল। ভাবতাম মুকুন্দ সত্যিই যেন আমার মায়ের পেটের ছোট ভাই। তার উপর যেন সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে নির্ভর করা চলে। ছোটবেলা থেকেই সে আমার অনুগত এবং আজকে পর্য্যন্ত সে কোন দিনই আমার সম্মুখে আমার এতটুকুও অমর্য্যাদা করেনি। সেই জন্যই বোধ হয় আলীমিঞার কথাটা কোনোদিক দিয়েই আমাকে এতটুকু স্পর্শ করল না। তাই—আলীমিঞার কথাটা রাত্রে বিছানায় শুয়ে হাসতে হাসতে তুষারকে গল্প করলে, তুষার যখন আলীমিঞার উপর ভীষণ রেগে গেল, তখন আমার ভালই লেগেছিল। ভেবেছিলাম অন্যদিকে যাই হোক মুকুন্দর প্রতি মনোভাবে আমার আর তুষারের মনে সুর মিলেছে।

সে সব যাই হোক, মার সন্ধানে নীচে গিয়ে প্রথমেই খবর নিলাম ঠাকুর ঘরে। মা সন্ধ্যার সময়টা হয় পূজোর ঘরে না হয় নীচের তলায় তাঁর একখানা শোবার ঘর ছিল সেইটেতে শুয়ে কাটিয়ে দিতেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে প্রথম পূজোর ঘরের দিকে গেলাম; দেখলাম ঘরে পিতলের পিলসুজের উপরে একটা তেলের প্রদীপ জলছে—ঘরে কেউ নাই। সেখান থেকে মার একতলার শোবার ঘরের দিকে চললাম। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি মা অন্ধকার ঘরে খাটের উপর চুপ করে শুয়ে আছেন।

মার ঘরের দিকে এগুতে প্রাণে কেমন যেন লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ ভাব। কেন যে এ সঙ্কোচ কিছুই তার কারণ খুঁজে পাওয়া গেলনা। সমস্ত দিনটা মার কোন খবর নিইনি—তাই কি?—কিন্তু কতদিন ত এমন চলে যায়, মার কোন খবরই নেওয়া হয় না। তবে? তুষারবালাকে নিয়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিয়েছি বলে কি? কিন্তু তাতে ত দোষের কিছুই ছিল না। তবুও কেন যে সঙ্কোচ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মার দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডেকে বললাম "মা, তুমি এ সময় এ রকম চুপচাপ শুয়ে আছ কেন? শরীর খারাপ হয়েছে কি?"

মা আমার গলা শুনে খাটের উপর উঠে বসে ডাকলেন "কে, সুশন? আয়, বোস।"

আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে, মা?"

বললেন "না, এমনিই শুয়ে ছিলাম।"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। মা সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌ ভাল আছে ত?"

আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ, কি আর এমন হয়েছিল।"

কথার সুরের মধ্যে বোধ হয় একটু তাচ্ছিল্য ছিল। বোধ হয় ভেবেছিলাম বৌয়ের বিষয় একটু তাচ্ছিল্যের সুরে

কথা কইলে মা হয়ত খুশী হবেন। কি জানি! মা সে কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। আমি একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! তুমি না কি আমাদের ছেড়ে কাশী যেতে চাও?"

মা একটু হেসে বল্লেন, "কে বল্লে রে?"

আমি বল্লাম, "কেন? এই ত দাদা বল্ছিল?"

মা বল্লেন, "ইচ্ছেটা তোর দাদারই বেশী। তবে আমারও কিছু অনিচ্ছে নেই।"

বল্লাম, "তুমি আমাদের ছেড়ে কাশীবাসী হবে?"

মা একটু চুপ করে রইলেন। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি মার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিল কি না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "একদিন ত সকলকে ছেড়ে যেতেই হবে। আর কি নিয়েই বা এ সংসারে থাক্ব? প্রশ্নটা ত কিছুতেই আর কেথা করলে না— তোরও ত একটাও ছেলেপুলে হলনা।"

বললাম. "তাই বলে তোমার এখন কাশীবাস করার সময় হয়নি। তোমার কাশী যাওয়া হবে না মা। নেহাত বেড়াতে যেতে চাও আমি না হয় একবার তোমায় নিয়ে বেড়িয়ে আস্ব।"

মা একটু হাস্লেন। হেসে বল্লেন "আচ্ছা, তাই হবে

মার সঙ্গে খানিক্ষণ এটা ওটা সেটা দুচারটে বাজে কথায় সময় কাটিয়ে নিজের শোবার ঘরে ফিরে এলাম।

পথে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা হল। সে নেমে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম "মুকুন্দ! এরই মধ্যে চললি?" মুকুন্দ বললে "হাঁ শান্তদা, বড্ড রাত হয়ে গেছে, এখন বাড়ী যাই। বোঠান এখন ভালই আছেন। পারি ত কাল আবার আসব।"

মুকুন্দ চলে গেল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে এসে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

মনটা কেন জানিনা কেমন যেন ভারী বোধ হচ্ছিল। মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়ার পর থেকেই মনের হালকা ভাবটা কেটে গেছে। কোথায় যেন প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা পাচ্ছিলাম। মা ত কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি করেন নি বরং বেশ সহজ সরল ভাবেই কথাবার্ত্তা কয়েছেন আমার সঙ্গে। কাশীও ত যাবেন না বললেন। তবুও মার ঘর থেকে বেরিয়েই প্রাণটা কেমন যেন বুকের মধ্যে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। যেন জীবনে কোথায় কোন্ একটা দিক ধ্বসে ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, ঠেকান দায়।

তুষারবালার ঘরে যখন গিয়ে ঢুকলাম তখন মনটাকে নানান রকম এলোমেলো চিন্তা পেয়ে বসেছে। কোন কিছুই যেন মন আঁকড়ে ধরতে পারছে না--এমনি ক্লান্ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। যেন কোন কিছুতেই তার উৎসাহ নাই।

তুষারবালা বললে, "বেশ লোক ত! এতক্ষণে আসবার সময় হল?" একটু আবদারের সুরেই বললে "কেন এত দেরী করলে?"

অন্যমনস্ক ভাবে বল্লাম, "কাজের ঝঞ্চাট কি কম।"

তুষারবালা বললে, "কাজের ঝঞ্চাট তোমার অনেকক্ষণ মিটে গেছে। দরজা পর্য্যন্ত এসে আবার ফিরে গেলে কেন?"

বললাম, "মার সঙ্গে একটু দেখা করে এলাম।"

বললে, "বেশ, আমি উৎসুক হয়ে আছি—এই আসে, এই আসে- যাও, তুমি ভারী নিষ্ঠুর।"

এই বলে একটু অভিমানের ভঙ্গীতে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। তুষারবালার অভিমানটুকু আমি যেন লক্ষ্য করেও করলাম না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুলই আঁচড়াতে লাগলাম। তুষারবালা একটু চুপ করে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, "কী এত ভাবছ? কাছে এস না।"

আমি "হাঁ যাই"—বলে তুষারবালার পাশে খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। নেহাত কিছু বলা দরকার বলে বোধহয় জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ত এখন বেশ ভালই আছ, না?"

তুষারবালা বললে, "কি জানি" বলেই খাটের উপর বসে বসে সেও যেন কি ভাবতে লাগল।

শুয়ে পড়ে আমার মন অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যেন

এলিয়ে পড়ল। ভাবলাম সকাল থেকে কত কাণ্ডই না হ'ল আজ। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি।

খেয়ে দেয়ে রাত্রে আলো নিভিয়ে যখন তুষারবালার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তুষারবালা কেমন যেন একটু অতিরিক্ত আমার বুকের মধ্যে এগিয়ে এল।

আস্তে বললে 'ওগো! যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি।"

এ সোজা কথাটায় আমি যেন কেমন চমকে উঠলাম। বুকটা একটা অজানা ভয়ে কি রকম যেন কেঁপে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম "কি, কি কথা?"

তুষারবালা তেমনি শান্তভাবেই বললে, "রাগ করবেনা বল?"

আমি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা বলছ না?"

তুষারবালা আস্তে বললে, "ঠাকুরপো অতি জঘন্য লোক। আগে কি জানতাম!"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন? কেন?"

বললে "আমার প্রতি ওর ভাব সাব মোটেই ভাল নয়। ছিঃ, ভাবতেও ঘেন্না করে। আমি আর ওর সঙ্গে মিশব না।"

আমার বুকের উপর দিয়ে সহসা যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

মাধবীর প্রতি

শ্রীঅনামিকা দেবী

হায় মাধবী—বিদায়ক্ষণে সরম ভুলো,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা ভুলে, তোমার মরমখানি
আপনি খুলো।
কমল হাতে, বিদায় প্রাতে—অঞ্জলিতে
পূর্ণ করো,
যাবার ক্ষণে, আপন মনে, বেদন জলে—
আঁখি ভরো—
'গোপন বাণী'—শঙ্কা মানি আর নাহিগো
নীরব থেকো;
বিদায় সাঁঝে, পরাণ মাঝে—সরম নাহি—
লুকায়ে রেখো।
সময় হলে, আপনি গলে, গাঁথা মালা
পরিয়ে দিও,
শেষের কথায়, মরম ব্যথায়—অধর নাহি
ফিরিয়ে নিও।

ছন্দের অ আ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ছন্দ কাব্যের প্রাণ বা জীবনীশক্তি—যেমন অর্থ হল তার মন, আর কথা, বাক্য বা শব্দ তার দেহ। কথায় দিয়েছে কাঠাম, স্থূল আকার—প্রতিষ্ঠা, স্থিতি; ছন্দে দিয়েছে গতি—সজীবতা; অর্থে দিয়েছে জ্যোতি—সত্যের প্রকাশ, উপলব্ধির আলো। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বলব ছন্দের কথা।

ছন্দেরও বলা যেতে পারে আছে আবার তিনটি অঙ্গ—বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ আর অন্তস্তমাঙ্গ। ছন্দের বহিরঙ্গ—কাঠাম, ছাঁচ, স্থূল দেহ—হল মাত্রা। মাত্রা বলতে অবশ্য এখানে বুঝব মাত্রা, পর্ব্ব এবং পদ। এই যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে—

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা—

এখানে প্রতি পদ বা পংক্তিতে চতুর্দ্দশ অক্ষর এবং দুইটি পদাংশ বা পর্ব্ব (৮+৬), উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটা যতি বা ছেদ। পয়ারের এই বাঁধুনিকে অর্থগত যতির বৈচিত্র্য দিয়ে ভেঙ্গে একটা নূতন গাঁথুনি দিয়েছেন মধুসূদন—

কোষশূণ্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে।

অথবা

মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে।

এখানেও মূলে ঐ একই কাঠাম: ৮+৬=১৪।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ একটা দিই—

রাতের নাচন শেষ করে দিয়ে
অপ্সরী গেছে চলে।
লঘু চরণের মঞ্জীর তার
পড়ে আছে ধরাতলে॥

এটি হল ত্রিপদী। মাত্রাবিন্যাস, ৬+৬+৮=২০।

স্বরবৃত্তের উদাহরণরূপে নিতে পারি সত্যেন্দ্রনাথের:—

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও—

এটি হল চতুষ্পদী, প্রতিপদে আবার চতুঃস্বর—অবশ্য মনে রাখতে হবে স্বরবৃত্তে চতুঃস্বরই স্বভাবত হল মূল বা ন্যূনতম পর্ব্বের মাপ।

এই রকমে পদবিন্যাস, পর্ব্ববিভাগ এবং মাত্রা স্বর অক্ষর বণ্টন—এই নিয়ে ছন্দের কঙ্কালরূপ—মূল আকার ও প্রতিষ্ঠা। কঙ্কালের উপর মাংস ও পেশীর যোগ হয় ধ্বনির রোলে ও ঝঙ্কারে। ধ্বনির উৎস প্রথমে হল ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত। ব্যঞ্জনের যথাযোগ্য সমাবেশ—সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বৈপরীত্য পুনরুক্তি প্রভৃতি কারুকার্য্য ছন্দোৎকর্ষের সাধারণ ও সুলভ উপায়। রবীন্দ্রনাথের যে পংক্তি দুটি প্রথমে উদ্ধৃত করেছি, সেখানে একটু লক্ষ্য করে দেখুন—ব্যঞ্জনবিন্যাস কত কৌশলে করা হয়েছে—বলা বাহুল্য কবি ভেবে চিন্তে বেছে খুঁটে, তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেন না, তাঁর নিভৃত শ্রুতি আপনা হতে অবলীলাক্রমে এ কাজটি করে যায়। সে যা হোক, দেখুন এখানে—"শ" এর পুনরুক্তি তারপর ধ, থ, ছ সব উষ্মবর্ণ এবং সাথে সাথে এদেরই কোমল রূপ ত, দ, ক, জ। "ন" এর কোমলতর রণন প্রথম আরম্ভ হয়ে কেমন দ্বিতীয় ছত্রে বহুগুণিত হয়ে বেড়ে গিয়েছে থেমেছে "ন্ত"র মধুর ও ঘোরাল ঝঙ্কারে। কাব্যের বাব্য এই রকমেই সরস শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। ঝঙ্কারের জন্য অনেক কবি প্রচুর ব্যবহার করেন ন্ত, ঞ্জ, র্ণ, ন্ন—ন'র সব প্রতিধ্বনিত ধ্বনি। ব্যঞ্জনের কলরোল উপলরাশি প্রতিহত জলধারার মত কেমন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে শুনুন—

শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠে সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন তার—

ইংরাজীতেও দেখুন ব্যঞ্জনের পেলবতা তরলতা—"র" ও "ল" যোগাযোগে—শেলী কেমন ফুটিয়ে তুলেছেন—

Lull'd by the coil of the crystalline streams

আবার রূঢ়তা, রুক্ষতা, কঠোরতা সেক্সপীয়রের এই ছত্রে কেমন দেখা দিয়াছে—

And in this harsh world draw thy breath in pain—

এখানে rsh, rld, dr, br—"r"-এর যুক্তধ্বনি সব উচ্চারণকে ব্যাহত, ব্যথিত ক্লিষ্ট করেই তুলেছে—অর্থকে সার্থক করে।

ব্যঞ্জনের ধ্বনিমাহাত্ম্য আমরা দেখলাম—কিন্তু এই বাহ্য। ধ্বনির সূক্ষ্মতর তানের জন্য আরও আগে কহিতে হয়। এই সূক্ষ্মতর তান দিয়েছে স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনকে যদি বলা যায় ছন্দের মাংসপেশী, স্বরবর্ণকে তবে বলতে পারি নাড়ী, স্নায়ু।

ফলতঃ প্রাচীনতর ভাষায় এই স্বরবর্ণের উপরই নির্ভর করছে ছন্দের বৈশিষ্ট্য গড়ন ও চলন। ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে গৌণ অলঙ্কার, স্বরবর্ণই মুখ্য অবয়ব। স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ও গুরু লঘু বিভাগের কথা আমি বলছি। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ছন্দের প্রাণ (সুতরাং আমাদের কথায়, কাব্যের প্রাণের প্রাণ) হল এই স্বরবর্ণের দোল। বিশেষভাবে গ্রীকভাষায় স্বরবর্ণের শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর—অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে ছন্দের স্রোত প্রধানত স্বরকেই আশ্রয় করে চলেছে ব্যঞ্জন সেখানে একান্ত গৌণ সহায় মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে স্বরকে ধরে ফুটে ওঠে, ফুলে ফুলে চলে রেখার দীর্ঘায়ত লতায়িত লাস্য—বঙ্কিমচন্দ্রের অতিপ্রিয় কালিদাসের এই শ্লোকটিতে দীর্ঘস্বরবহুলধ্বনি তার নির্দ্দেশ্য বস্তু-সমুদ্রের কেমন প্রতিচ্ছবি এঁকে তুলেছে—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজীনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা

অন্যপক্ষে, ব্যঞ্জন ছন্দে এনে দিতে পারে গাঢ়তা, দৃঢ়তা, কাঠিন্য—আর মনপ্লুত মুখর গতি। প্রাচীন ভাষার মত অর্ব্বাচীন ভাষায় স্বরবর্ণের মাহাত্ম্য অতখানি আর নাই। কারণ আধুনিক ভাষার ছন্দে দোল ক্রমেই নির্ভর করছে ঝোঁকের উপর, টানের উপর নয়। বিশেষভাবে ইংরাজীতে দেখি এই ঝোঁকেরই—দিলীপকুমারের ভাষায়, প্রস্বনের একাধিপত্য এবং এখানে হ্রস্বদীর্ঘ বা গুরুলঘু স্বর নির্ণয় করা হয় ঝোঁক বা ঝোঁকের অভাব দিয়ে। তবুও একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যায় ইংরাজীতেও আছে সত্যকার হ্রস্বদীর্ঘ স্বর। ঝোঁকের আশ্রয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনিই দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে—সেই ঝোঁককে আমি স্বরবর্ণের সাথে সংযুক্ত করছি না। স্বরবর্ণের দীর্ঘ স্বরেই তার স্বরূপ বেশি প্রকট। সেক্সপীয়রের পূর্ব্বউদ্ধৃত পংক্তিটি দেখুন—harsh এর দীর্ঘ a, world এর (w) o, draw এর সুদীর্ঘ a(w) এবং pain দীর্ঘ ai—ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসের মত অতি কষ্টে বুক চিরে চিরে বের হয়ে আসছে না! স্বর ও ব্যঞ্জনের যুগ্ম মাহাত্ম্য সেক্সপীয়রের এই লাইনটি অপূর্ব্ব করে তুলেছে। অথবা ধরুন শেলীর,

Blow
Her clarion o'er the dreamy earth—

কিম্বা

When I arose and saw the dawn
I sigh'd for thee
When light rode high and the dew was gone—

শেলীর যে ভাবমগ্ন ব্যোমচারী অশরীরী আবেগ মনে হয় নাকি তা এখানে দীর্ঘ স্বরের টানে টানে উধাও হয়ে চলেছে—এই স্বরের সুরের কল্যাণেই তার পদক্ষেপ লঘু হয়ে পাখীর পাখার গতি পেয়েছে—ব্যঞ্জনের স্থূলতর স্পষ্টতর শব্দকে এখানে ওখানে শুধু স্পর্শ করে, পৃথিবীর স্মৃতিটুকু কেবল জাগিয়ে রেখেছে কোন রকমে।

বাংলা ছন্দে স্বরের স্থান ও দান কি? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বিশেষ কিছু নাই। কারণ সাধারণ অর্থে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর' বাংলায় নাই—অর্থাৎ নিয়মবাধা হ্রস্বদীর্ঘ, সংস্কৃতের অনুরূপ; এমন কি ইংরাজীর অনুরূপও কিছু নাই। হ্রস্বদীর্ঘকে আমরা সমান মূল্য দিয়ে থাকি—অনেকখানি ফরাসীর মত।

এটি হল সাধারণ মোটা কথা। সূক্ষ্মতর কথা হল এই যে বাংলাতে ধরা বাঁধা দীর্ঘ স্বরের পরিবর্ত্তে আছে ধরাবাঁধা গুরুবর্ণ—এখানে স্বর কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু তার

বৈশিষ্ট্য হল ঝোঁক—ইংরাজী stress এর চেয়ে এঁর সাদৃশ্য ফরাসী accent tonique এর সাথে অর্থাৎ ধ্বনি দীর্ঘ ও ঝোঁকালো যতখানি হয় তার চেয়ে বেশি হয় উদাত্ত (উঁচু বা চড়া)। যুক্ত বা হসন্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ব বর্ণ পায় এই ধ্বনিগৌরব (সংস্কৃতের মত)। স্বরমাত্রিক ছন্দে বিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে এ জিনিষটি—ধরুন সত্যেন্দ্রনাথের—

ঝর্ণা! ঝর্ণা! বিদ্যুৎপর্ণা!

কিন্তু স্বরবর্ণের ধ্বনি এখানে রয়েছে যেন গৌণ, ব্যঞ্জনের একান্ত যেন অনুগত, ব্যঞ্জনের ধ্বনিকেই মুখরিত করে ধরবার জন্য। স্বরবর্ণের নিজস্ব ধ্বনি, তার এলায়িত তরঙ্গায়িত বিলম্বিত বিসর্পিত চলন ফুটে ওঠে বিশেষভাবে দেখি অযুক্তবর্ণ যোজনায়, জোড়া-কথা-ছাড়া-পদ রচনায়। এই ধরুন যেমন রবীন্দ্রনাথের—

আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—

অথবা,

আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা—

এখানে মনে হয় ব্যঞ্জনের ধ্বনি স্তিমিত হয়ে স্বরের ধ্বনিকে প্রাধান্য দিয়েছে—স্বরের টানা রেখায় কি সুদীর্ঘ আলপনাখানি। কিম্বা ধরা যেতে পারে দিলীপকুমারের—

ঘিরে রাখো মোরে তব নীহারিকা মেখলায় হে মণি-অম্বর...
দোলাও আমারে নীল ঘুমপাড়ানিয়া গানে, হে সিন্ধুমর্ম্মর...

এখানে ছন্দের গতি সমস্তখানি চলেছে স্বরবর্ণের টানা ঢেউ-এর দোলে—শেষ হয়ে গিয়েছে যুক্তাক্ষরের ব্যঞ্জনপ্রধান একটা প্লুত উদাত্ত ধ্বনির মধ্যে, বেলা তটে এসে ভেঙ্গে পড়ে যেমন তরঙ্গমালা।

স্বরবর্ণের দ্রুততর গতিও সম্ভব—দ্রুত অথচ দীর্ঘ পদক্ষেপ—এই যেমন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

এই যে কয়েকটি উদাহরণ আমি দিলাম এখানে স্বরবর্ণের নিজস্ব নির্মুক্তধ্বনি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও সম্মুখবর্ত্তী; তবে, স্বরধ্বনির সাধারণ ও স্বাভাবিক স্থান হল ব্যঞ্জনের পশ্চাতে, আড়ালে। ব্যঞ্জন দিতেছে ঝঙ্কার কলরোল, স্বর তার মধ্যে এনে দিয়েছে বিস্তার, তান, মীড়। ব্যঞ্জন হল, বলা যেতে পারে, পৃথিবীধর্ম্মী আর স্বর হল আকাশধর্ম্মী। স্বরেরই ভিতর দিয়ে ছন্দের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। এমন কি মধুসূদনেরও ব্যঞ্জনবহুল যুক্তবর্ণভারাক্রান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, ব্যঞ্জনের স্পষ্ট মুখরতার অন্তরালে স্বরবর্ণের সূক্ষ্মতর বেগ ও প্রতিধ্বনি স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

ছন্দের মূল কাঠাম, তার অঙ্গবন্ধ—যাকে বলা যেতে পারে তাল সেটি—নির্ণিত হয় পদবিভাগে বা পর্ব্বে (ইংরাজী বা গ্রীক-লাতিনের foot), এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু এ হল ছন্দের প্রধান বা মোটা মোটা তরঙ্গলাস্য—তার সূক্ষ্মতর স্পন্দন নির্ভর করে ক্ষুদ্রতর পদাংশ বা আদি পদাংশের উপর। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাংলায় এ রকম আদি পদাংশ দুই ধরণের এবং তারা এনে দেয় ভিন্ন চাল—সম আর অসম অথবা দুই আর তিন মাত্রার চাল। বাংলা ছন্দস্পন্দের একটা মূল রহস্য এখানে এবং তাল সমান হলেও তাতে দোলের বৈচিত্র্য আসে এই দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের—

শুধু কি। মুখের। বাক্য। শুনেছ। দেবতা

হল প্রধানত তিনের চাল। কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য এর পরের পংক্তিটি

শোন। নি কি ॥ জন। নীর ॥ অন্ত। রের ॥ কথা।

হল দুএর চাল। আবার

ঐ। আসে। ঐ ॥ অতি। ভৈ। রব ॥ হরষে...
ঘন। গৌ। রবে ॥ নব। যৌ। বনা ॥ বরষা—

এখানেও দুএর চাল। প্রতি পংক্তির শেষ গর্ব্বটি—হরষে, বরষা—তিন মাত্রা এবং তিনের চাল বাহ্যত। কিন্তু আবৃত্তিকালে আমরা "হরষে," "বরষা"র শেষ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ করে পড়ি এবং দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে থাকি—যেমন "ঐ," "ভৈ," 'গৌ"এর দুই দুই মাত্রা—তা হলে এটিও চার মাত্রা এবং দুই এর চাল।

এক হিসাবে দেখান যেতে পারে ইংরাজীতেও (এবং গ্রীক লাতিনেও) আছে এই রকম দুই বা তিনের চাল, অর্থাৎ সহজ কথায় যে বলা হয়, প্রতি ফুট দুই বা তিন

সিলেব্‌লে গঠিত। কিন্তু প্রথম কথা বাংলা যে দুই বা তিন মাত্রার চাল, সেই দুই বা তিন মাত্রা দিয়ে সব সময় পর্ব্ব-বিভাগ নির্দ্দেশ হয় না। সাধারণত পর্ব্বের জন্য প্রয়োজন দুই বা তিনের গুণিতক চার বা ছয়। বস্তুত বাংলা পর্ব্বের সঙ্গে ইংরাজী ফুট সকল সময়ে মিলিয়ে ধরা যায় না। বাংলার পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছেদ বা যতি তাকে cæsura বলতে হয় ফুটএর ছেদ অতখানি গতির অপেক্ষা রাখে না। তারপর, রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখিয়েছেন—যে দুই মাত্রায় যেন দেয় একটা গোটা আবর্ত্ত বা ঢেউ, তারপরে পূর্ণতর ছেদ; কিন্তু তিনের মাত্রা অসম্পূর্ণ, তার পূর্ত্তির জন্য প্রয়োজন আরও তিন মাত্রা। দুই এর মাত্রা দেয় স্থিতি—তিনে গতি। বাংলায় অযুগ্ম মাত্রার পদ অবশ্যই হয়, কিন্তু সেটি কেমন যেন তার অস্থিতির অনিশ্চয়তার অবস্থা। ইংরাজীর চেয়ে এখানেও বাংলার সাদৃশ্য বরং দেখি ফরাসীর সাথে। ফরাসীতেও ইংরাজীর মত ফুট-বিভাগ নাই, আছে বাংলার মত পর্ব্ব-বিভাগ; আর তারও চাল দুই-এর ও তিনের—প্রধানতই দুই-এর, তিনের চালকেও দুই-এর চালে কেটে কেটে আবৃত্তি করা হয়—বিশেষতঃ গানে। দুই এর চাল (যথা, ওদের জাতীয় সঙ্গীত)

Allons। enfants। de la। patrie

তিনের চাল

Aux armes। citoyens।

Formey vos। bataillons।

কিন্তু আমরা বলছিলাম বাংলায় স্বরকে টেনে দীর্ঘ করবার রীতি। এ কথা থেকে আমরা বাংলা ছন্দের মণি-কোঠায়, যাকে গোড়ায় আমি বলেছি অন্তস্তমাঙ্গ তার মধ্যে এসে পড়লাম। বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বর বিভাগ নাই অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর হ্রস্বই, দীর্ঘ স্বর দীর্ঘই এ রকম সুনিশ্চিত নিয়ম এখানে নাই, যেমন সংস্কৃতে বা গ্রীক লাতিনে আছে—এই চলিত সিদ্ধান্তটি আমরা ধরে নিয়েছি, তাতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা দরকার। হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর হয়ত নাই, কিন্তু বাংলায় আছে হ্রস্বদীর্ঘ সুর—তা ছাড়া কোন ভাষাতেই বোধ হয় তান সৃষ্টি হতে পারে না। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ সুর আমরা দিয়ে থাকি অর্থ অনুসারে, ভাব অনুসারে, ভঙ্গী অনুসারে, দোল অনুসারে, অর্থাৎ ছন্দ অনুসারে। এই হ্রস্বদীর্ঘ সুর আছে বলে তাকে একটা কিছু ছাঁচে ঢেলে বিশেষ রূপ দেওয়া যায় বলে, লঘুগুরু ছন্দ বাংলায় কৃত্রিম নয়, পায় একটা সহজ স্বাভাবিক গতি। তবুও বলতে হবে বাংলা শব্দের মূল বৈশিষ্ট্য, তার সাধারণ প্রকৃতি হল হ্রস্বদীর্ঘের বাঁধা নিয়ম হতে মুক্তি, ধ্বনির লীলায় তার স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি স্বেচ্ছাচার।

বাংলা ছন্দের একটি নিভৃত রহস্যই ইচ্ছামত হ্রস্বকে দীর্ঘ করা, দীর্ঘকে হ্রস্ব করা এবং এই উপায়ে একটা তান বা সুর বিস্তার। যখন আবৃত্তি করা হয়

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক—

যেমন নদী, তীর, বেণীর দীর্ঘ ঈর দীর্ঘ উচ্চারণ ইচ্ছাসাপেক্ষ—তবে 'তীরে' দীর্ঘ উচ্চারণ করলে শ্রুতি-সৌষ্ঠবের জন্য পরের পংক্তির হ্রস্ব "শি", কেও দীর্ঘ করতে হয়। "শিখ", "নির্ভীক" সম্বন্ধেও ঐ এক কথা—'শি" হ্রস্ব "ভী" দীর্ঘ—আবৃত্তিতে দুটিকেই হ্রস্ব বা দুটিকেই দীর্ঘ করতে পারা যায়। "এ" কার সবও ঐ রকম ইচ্ছামত কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ করে পড়া যায়। এই সব হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রা গণনার মধ্যে আসে না, এদের কোন নিয়ম নাই, অথচ ছন্দের একটা সূক্ষ্ম স্পন্দ বা দোল বা সুর এদের থেকে উঠেছে।

বাংলা কবিতা আমরা পড়ি—ছন্দের দোল দেখাবার জন্য—সুর করে; ইংরাজী কবিতা সেভাবে পড়া চলে না। এর কারণ হতে পারে যে বিশেষভাবে প্রাচ্যে এবং প্রাচীনকালে ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই কাব্য ছিল সঙ্গীতমূলক—কবিতা রচিত হ'ত গানের জন্য। স্কুলে বাংলার অনুসরণে ইংরাজী কবিতাও সুর করে পড়বার জন্য আমরা অনেকেই হয়ত তিরস্কৃত হয়েছি। তবুও ইংরাজিতে ও-ধরণের সুর না থাকলেও আছে একটা modulation—স্বরবিভঙ্গ—ফরাসীরা আবার সেটুকু পর্য্যন্ত বর্জ্জন করে কবিতা আবৃত্তি করে যথাসম্ভব গদ্যের মত সাদাসিদা ভাবে। কিন্তু ফরাসী

কাব্য ছন্দের মধ্যেও নাই কি তানের সুরের অনুরূপ একটা বিশেষ স্বরলীলা ?

ফলত সব কবিতার অর্থাৎ ছন্দের ধর্ম্মই এই তান বা সুর বা স্বর—তবে তার ধরণ বিভিন্ন হতে পারে বা কম বেশি পরিস্ফুট হ'তে পারে। গান গাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গায়ক যেমন একটু গুণগুণ করে নিয়ে থাকেন (অন্ততপক্ষে "মনে মনে"), আমি যে তান বা সুরের কথা বলছি তা ছন্দের পক্ষে হল এই গুণগুণ। এর মানে যন্ত্র বাঁধা—যেখান থেকে যে চালে ছন্দ চলবে সেখানে সেই ভঙ্গী নিয়ে ধ্বনিকে উঠে দাঁড়ান। এ জিনিষের বিশ্লেষণ হয় না—কেবল অনুভবগম্য।

এরও আগে আছে। কারণ ছন্দের দোল এসেছে আরও দূরবর্ত্তী লোক থেকে—কিন্তু বিশ্লেষণের সীমা এই পর্য্যন্ত। এর পরে যা তা হ'ল অবাঙ্মনসগোচর, ব্রহ্মের মত—সুতরাং আলোচনা-বহির্ভূত। ছন্দ মূলত স্বরূপত কি ? শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলতে পারি—Some one dancing upstairs.

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অন্বেষণ *

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

তামাক খাইবে ব'লে 'টিকে' হাতে ক'রে
প্রতিবেশী বাড়ী গিয়ে ডাকে উচ্চস্বরে ;
তখন গভীর রাত নিদ্রিত সকলে,
দ্বারে কর হানে গিয়ে সে-জন সবলে।
গৃহস্বামী জেগে উঠে খুলে দিয়ে দ্বার,
জিজ্ঞাসিল, "এত রাত্রে কি কাজ তোমার ?"
সে কহিল, "কাজ আর কি আছে তেমন,
জানই ত তামাকের নেশাটা কেমন।
টিকে ধরাইব ব'লে আসিয়াছি তাই,
কোথাও আগুন ঘরে রাখিবে কি ছাই।"
গৃহস্বামী হাসি' কয়, "পথ দেখে এলে
লণ্ঠন লইয়া হাতে, অগ্নি নাহি পেলে ?"
কাছে পেয়ে এইরূপে তবু নাহি পায়,
মুগ্ধ জীব কহে দেব, চারিদিকে চায়।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাণী—ক্রমশ প্রকাশ্য

শেষ সন্ধ্যা

শ্রীসুপ্রভা দেবী

"এ মোর নিয়তি," কহিনু তখন, "তাই হোক
তবে হোক তাই,
আমার সত্য, স্বপ্ন তোমার, অর্থ কিছুই নাই।
তবু নাহি, নাহি অভিমান,
শুধু এ আমার আশীষস্নিগ্ধ ছলছল দু'নয়ান;
তোমারে স্মরিব মহা গৌরবে ধন্য করেছ প্রাণ

আশা দিয়েছিলে, লহ ফিরাইয়া—
প্রীতির সুবাস ভরি
স্মরণ করিতে দেহ অধিকার আজি এ মিনতি করি।
আরো আছে কোন অভিলাষ ?
একসাথে দোঁহে অশ্বভ্রমণ—তাও যদি অবকাশ।
শেষের সন্ধ্যা যাপিব দুজনে, ছিল মনে অভিলাষ।"

ক্ষণকাল চাহি, ক্ষণকাল থামি; কালো চোখে
কালো ছায়া
আমার বক্ষে নাচে আশা আর নাচে সংশয়ছায়া;
জীবন মরণ দুলিছে দোলায়; জীবন লভিনু দান
সকল মিনতি। চিত্তবীণায় জাগে আনন্দতান!
শেষ আশা মোর বৃথা আশা নয়,
হোক তাহা ক্ষণকাল,
সেই ক্ষণকাল ধন্য আমার, সে আমার চিরকাল।
অশ্ব ছুটিবে, পার্শ্বে রহিব, শুধু রব দুইজন,
সেই মহাক্ষণে আজি যে দেবতা, সার্থক এ জীবন।
শুধু হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব মিশে নিঃশ্বাস বায়
কেবা জানে যদি এ নিশিথে আজি
জগৎ ফুরায়ে যায়!

গোধূলি আকাশে মেঘ দেখিয়াছ,
সোনালী সে মেঘকায়া
অস্তরবির পরশ মেদুর, উদয় চাঁদের মায়া
সন্ধ্যা তারার আশীষ দীপ্ত—নয়ন চাহিয়া রয়,
সে মেঘের পানে আপনা হারায়ে
আঁখি যে চাহিয়া রয়!
মেঘ ঘিরে আসে, ঘিরে আসে রবি,
চন্দ্র, সাঁঝের তারা
পরম মরণ ঘিরে আসে বুঝি, সীমার বাঁধনহারা
বুঝি স্বরগের মিলিল নিশানা, এই কি স্বরগ মোর?
বঁধুরে পেয়েছি বক্ষে আমার, এই তো স্বরগ মোর!
ভয়ে থরথর হিয়া কাঁপে, নাচে পরানে পুলক ঘোর!

বাহিরিনু দোঁহে অশ্ব চড়িয়া, বহে সন্ধ্যার বায়,
আমার মনের বন্ধ আগল চকিতে টুটিয়া যায়।
পিছে পড়ে রয় অতীতের আশা, দুঃখ রহিল পিছে,
যা করেছি আর যাহা করি নাই;
মনে হোল সব মিছে;
হয়ত পেতেম হৃদয় তাহার, হয়তো পেতেম না,
শুধু এ সন্ধ্যা সত্য আমার আর কিছু নাহি জানা।

সকল সাধন, ব্যর্থ সাধন? এ শুধু আমার নয়,
এ মন নিয়তি—মানব নিয়তি—বিশ্ব জুড়িয়া রয়।
দোঁহে ছুটিয়াছি, মনে হয় বুঝি, পরাণ উড়িয়া যায়,
চারিদিকে একি নূতন পৃথিবী! অবাক নয়ন চায়।

দুই ধারে ধায় জীবনের ধারা, কর্ম্মের কোলাহল
কত প্রয়াসের, কত বেদনার পরিণাম নিষ্ফল।
অতীতের কত মায়াময় আশা, বর্ত্তমানের ফাঁকি,
কিছু করিয়াছি, বহু করি নাই, কত কাজ রয় বাকি।
আমি ভেবেছিনু···যাক সেই কথা —
সকরুণ দুরাশায়,
ভেবেছিনু তার পেয়েছি হৃদয়···স্বপ্ন টুটিল হায়!

কত কল্পনা কোরকে শুকায়, আশা, ভাষা নাহি পায়
কত সাধ থাকে, সাহস থাকেনা, না-বলা রহিয়া যায়,
ওগো শুনেছ কি কত, অশ্রুত গীত, মরমের গুঞ্জন
হায় দেখিতে যা চাই, দেখিতে না পাই —
নাহি খোলে গুণ্ঠন।

কত মুকুটের রাজ-মর্য্যাদা, বিজয় প্রয়াস কত
বিস্মরণের সমাধি লভিয়া মহা-নিদ্রায় গত!
হে কবি, তোমার ললিত রাগিনী গাঁথিছে ছন্দে সুরে
অগীত আমার অনুভূতিখানি, তোমারে ধন্য মানি।
তবুও শুধাই, লভিয়াছ তারে, অথবা এখনো দূরে
যাহারে চাহিয়া সাধনা তোমার, যাহারে সত্য জানি
সপিঁয়াছ মন, নব যৌবন; কী পেয়েছ বল দেখি?
আমার কবিতা অশ্বভ্রমণ—তুচ্ছ কবিতা সে কি?

ওগো কবি, ওগো শিল্পী, হে সঙ্গীতকার,
রাখিয়ো মনে,
তোমার স্বপ্ন সত্য সে নয়···বিশ্বমানব মনে
চিরকাল তব স্মৃতি নাহি রবে···শিল্প অমর নয়,
এ জীবনে শুধু সত্য জানিও জীবনের পরিচয়।

যা পেয়েছি, মোরে ধন্য মেনেছি,
হে মোর নিয়তি, করুণা করি
শেষ অঞ্জলি দাও তবে মোরে অমর সুধায় ভরি:
সুধা-রঙিন এই ক্ষণকাল, যদি এ ফুরায়ে যায়,
নূতন জীবনে পথ চলা ফের নূতনের ভরসায়?
আমার পরম আমার চরম এই ক্ষণকাল —
পেয়েছি তাই,
ললাটে ধরেছি যশোমন্দার আর কিছু আশা নাই।
নয়ন মেলিয়া এ ভুবন মোর লেগেছে এমন ভালো,
উজ্জ্বলতর লাগিবে কি আর নব স্বরগের আলো?
এ সুধানিমেষ কামনার শেষ, জীবনের সীমারেখা,
আমার স্বরগ, স্বরগের দেবী—পরপারে যায় দেখা।

তারে ঘিরে জাগে মহামৌনতা···দুজনে নীরবে রই,
সম্মুখে ওই স্বর্গ মোদের···দুজনে চাহিয়া রই।
জীবনে দেউলে পরম লগ্ন, স্বর্গ সমুখ করি
এই মহাক্ষণ মৃত্যুবিহীন অজর সুধায় ভরি।
দোঁহে চলেছি মহাকাল পথ অনন্তকাল ধরি,
এই ক্ষণকাল হোক্ চিরকাল—অফুরান বিভাবরী।

শ্রীসুপ্রভা দেবী

* Browning-এর The Last Ride together-এর অনুবাদ

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়, গীতার এই সুপ্রচলিত কথাটি অনেকেই অনেক রকমে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেরই আপন আপন ধর্ম্মে অবস্থান করা উচিত, নিজের ধর্ম্ম দোষপূর্ণ দেখিতে পাইলেও কাহারও কর্ত্তব্য নহে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা—এইরূপ ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It (Religion) is more an integral part of one's self than of one's body. Religion is the tie that binds one to ones Creator, and while the body perishes as it has to, religion persists even after that". অর্থাৎ, "ধর্ম্ম মানুষের দেহের জিনিষ নহে, আত্মার অন্তরস্থ জিনিষ। ধর্ম্ম হইতেছে মানুষের সহিত তাহার স্রষ্টার সম্বন্ধ। শরীর একদিন ধ্বংস হইবেই কিন্তু ধর্ম্ম তাহার পরও বর্ত্তমান থাকিবে।" কিন্তু এই ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম বলিতে গীতা আজকালকার ন্যায় Religion বুঝে নাই; ধর্ম্ম Religion অপেক্ষা ব্যাপক। যেমন আগুনের ধর্ম্ম দহন করা, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, তেমনিই প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক মনুষ্যের আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী যে কর্ম্ম, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অন্যান্য বস্তুর স্বাধীনতা নাই, তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা আছে, সে নিজের প্রকৃতির গতিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য কোন বাহ্যিক আদর্শ, বাহ্যিক কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ করিলে তাহার অকল্যাণ হয়, তাহার আত্মবিকাশ বিপর্য্যস্ত হয়, ইহাই গীতার বক্তব্যের মূল তত্ত্ব।—

ধর্ম্ম শব্দের যাহা আধুনিক প্রচলিত অর্থ, Religion, তাহার দ্বারা বুঝায় কোন বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের উপাসনা করা। ভগবান সম্বন্ধে পরিকল্পনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও যুগে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং সেই সেই দেশ ও যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে। যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি যাহার প্রকৃতির উপযোগী সেইরূপ উপাসনাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর—এই নীতি গীতার শিক্ষার অনুযায়ী। খ্রীষ্টানকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া যদি কাহারও হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও যে তাঁহাকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম লইয়াই থাকিতে হইবে—ইহা কখনই গীতার শিক্ষা হইতে পারে না। তেমনিই যদি কোন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সামাজিক বা অর্থনীতিক সুখ সুবিধার জন্য মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, নিজের গভীর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের হিসাব না লয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় এবং আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক। মানুষের বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে নানা প্রকার ধর্ম্ম ও উপাসনা পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছে। আদিম নিবাসীরা ইট পাথরের পূজা করে, তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম এবং তাহাদের প্রগতির সহায়; কেহ ইহকাল ও পরকালে সুখ ভোগের জন্য নানা দেবদেবীর পূজা করে, ভগবানের বিভিন্ন রূপ বা প্রতীকের উপাসনা করে, আবার কেহ কোন প্রতীক স্বীকার না করিয়া সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে চায়। হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা সকল প্রকার উপাসনা পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে প্রকৃতিভেদে এবং অধিকার ভেদে। খ্রীষ্টানেরা বলেন একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের শরণ না লইলে কাহারও মুক্তি নাই, মুসলমানেরা বলেন মহম্মদীয় শিক্ষা অনুসারে উপাসনা না করিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, কিন্তু গীতা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছে, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, এক ভগবানই সেই সব উপাসনা গ্রহণ করেন এবং তিনিই সকল উপাসককে তাহাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু গীতা উপাসনার

উচ্চ নীচ ক্রম স্বীকার করিয়াছে,—যে যেমন ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে উপাসনা করে সে তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়। সাংসারিক বা স্বর্গীয় ভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষায় যাহারা দেবতাগণের উপাসনা করে তাহাদের সেই ভোগ সুখ অস্থায়ী, কিন্তু যাহারা সকল কামনাশূন্য হইয়া একমাত্র ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার ভজনা করে, তাহারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের জীবনে দিব্য রূপান্তর সাধিত হয়, তাঁহারা ভাগবত-জ্যোতি, শান্তি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠেন এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ গতি অমৃতত্ব। গীতা বলিয়াছে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা মনুষ্য একই জন্মে নিম্নতম স্তর হইতেও উর্দ্ধতম গতি লাভ করিতে পারে, অতএব যে যে ধর্ম্ম লইয়া আছে তাহাকে চিরজীবন সেই ধর্ম্ম লইয়াই থাকিতে হইবে, ইহা গীতার শিক্ষা নহে। বাহ্যিক প্রয়োজনের জন্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুখ সুবিধার জন্য যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, তাহাদের ধর্ম্ম কেবল Credal profession বা লোকাচার মাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন হইলে উচ্চতর স্তরের উপাসনাপদ্ধতি ও সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা।

কিন্তু এখানে গীতা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই। যে কর্ম্ম যাহার প্রকৃতি হইতে স্বভাবতঃ উৎসারিত হয় তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম অনুসারে মানুষকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, এবং প্রাচীন ভারতে এই বিভাগ ধরিয়াই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছিল, গীতায় এখানে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং শূদ্রের বংশধরগণকে চিরকাল শূদ্রের কর্ম্ম লইয়াই থাকিতে হইবে, ইহা কখনই গীতার শিক্ষা নহে। গীতা যে চারি বর্ণ বিভাগের কথা বলিয়াছে, তাহা গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম বিভাগ, জন্ম অনুসারে নহে। বংশের গুণ লোকে পাইয়া থাকে, কিন্তু সেটা আংশিক মাত্র, তাহার দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ধারা নির্নীত হয় না। ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিয়াও লোকে ব্রাহ্মণের গুণ পায় না, আবার শূদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণের গুণ পাইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব গীতার দোহাই দিয়া জাতিভেদের সমর্থন কিছুতেই করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি শূদ্রের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রকৃতি, ব্রাহ্মণের গুণ পাইয়াছে, তাহাকে চিরজন্ম শূদ্রের স্তরে, শূদ্রের কর্ম্ম লইয়াই থাকিতে হইবে, ইহা গীতার স্বধর্ম্ম শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।

শুধু তাহাই নহে, সকল মনুষ্যের প্রকৃতিতেই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের গুণ নিহিত রহিয়াছে এবং সেই সবের বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই মানুষ পূর্ণতা লাভ করিবে। সকলেরই চাই ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের সঙ্গতি, শূদ্রের সেবা ও কর্ম্ম। তবে ক্রমবিকাশ ধারায় কোন বিশেষ স্তরে কাহারও মধ্যে কোন বিশেষ গুণের প্রাধান্য হয় এবং সেইটিকে ধরিয়াই তাহার মধ্যে অন্যান্য গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অতএব সমাজকে মোটামুটি চারি বর্ণে বিভাগ করা যাইতে পারে এবং সেই বিভাগ হইতে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিসকল তাহাদের পথের নির্দ্দেশ পাইতে পারে, এইটিই ছিল ভারতীয় প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্যের মূলতত্ত্ব। কিন্তু মানুষের গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে ঠিক ঠিক সামাজিক শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিবে কে? বস্তুতঃ কালক্রমে বর্ণবিভাগ জন্ম অনুসারে কড়াকড়ি জাতি বিভাগে পরিণত হয় এবং তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়। তথাপি যতদিন জাতিভেদের দ্বারা অর্থনৈতিক কর্ম্ম বিভাগের (division of labour) প্রয়োজনসিদ্ধ হইতেছিল, ততদিন তাহার কিছু উপযোগিতা ছিল। এখন আর তাহাও নাই, লোকে আর বংশগত পেশা অনুসরণ করিতে নিজদিগকে বাধ্য মনে করে না এবং তাহা সম্ভবও নয়। অতএব জন্মগত এই কৃত্রিম জাতিভেদের আর কোন উপযোগিতা বা সার্থকতা নাই—ইহা কেবল সমাজে দুর্ব্বলতা ও দারুণ বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করিতেছে। আমাদিগকে মনস্তত্ত্বের এই গভীর সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে শুধু তাহার দ্বারাই তাহার বর্ণ বা কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হয় না, এমন কি সাধনা দ্বারা মানুষ একই জন্মে শূদ্রত্ব হইতে অন্য বর্ণসকলের স্তরে উঠিতে পারে, মানুষের পক্ষে যাহা পরম গতি তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে গীতার শিক্ষায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের স্থান নাই—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
গীতা—৯।৩২

"হে পার্থ! আমার শরণাগত হইলে পাপযোনি সম্ভূত চণ্ডাল এবং স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।" আমরা দেশাচার ও জাতিগত অহঙ্কারের দ্বারা নিজেদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাই এই সত্য গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ইহার ফল অতি সাংঘাতিক হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ক্রমবিকাশ ধারায় মানুষের মধ্যে এক এক সময় এক এক গুণের প্রাধান্য হয়। সমাজের ক্রমবিকাশেও এক এক সময় এক এক শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে এবং ইহাও প্রকৃতির প্রয়োজনীয় বিধান। "প্রকৃতি তাহার প্রগতির জন্য সাময়িকভাবে যে গুণ চায়, যে শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধ ভাবে সেই গুণের বিকাশ করে, সেই শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করে। যদি প্রকৃতি শক্তি ও চরিত্রবল চায়, তাহা হইলে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য হয়। যদি সে জ্ঞান বিজ্ঞান চায় তাহা হইলে শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর প্রাধান্য হয়; যদি কার্য্যকরী দক্ষতা, চাতুর্য্য, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও দক্ষ সংগঠনের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে বুর্জ্জোয়া বা বৈশ্য শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে, এবং সাধারণতঃ আইন ব্যবসায়ী-রাই তাহাদের নেতা হয়; যদি সাধারণ সুখ সাচ্ছন্দ্যের বিস্তার এবং শ্রম সংগঠনের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই যে ঘটনা, শ্রেণী বিশেষেরই হউক বা জাতি বিশেষেরই হউক প্রাধান্য, ইহা কেবল একটি সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত আর বেশী কিছু হইতে পারে না; কারণ মানবজীবনে প্রকৃতির ইহা কখনই চরম লক্ষ্য হইতে পারে না যে, কতিপয় লোক অধিক সংখ্যক লোককে শোষণ করিবে। (এমন কি অধিক সংখ্যক লোকই কতিপয় লোককে শোষণ করিবে), মানব সমাজের অধিকাংশকে অবনত ও পরাধীন রাখিয়া কেবল কতকগুলি লোক পূর্ণতা লাভ করিবে; এ-সব কেবল সাময়িক কৌশলমাত্র হইতে পারে"—শ্রীঅরবিন্দ। প্রকৃতির উদ্দেশ্য মানুষ ক্রমশঃ সমতার দিকেই অগ্রসর হউক, সব সমরূপ বা "একাকার" নহে, তাহা সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে, কিন্তু মূলগত এমন সমতা চাই যাহা বৈচিত্র্যের খেলার পরিপন্থী হইবে না, এইরূপ সমতা মানবের পূর্ণ সিদ্ধির জন্য অপরিহার্য্য, যে সমাজ প্রকৃতির এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার উপর ভীষণতম দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়ে। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি ভারতবর্ষে। এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা দেশের অধিকাংশ লোককে যতদূর সম্ভব নিজেদের স্তরে তুলিয়া লইতে শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া এবং নিজেদের ও সমাজের বাকী অংশের মধ্যে প্রাধান্যের এক অনতিক্রমনীয় ব্যবধান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখিয়া দেশের চরম অবনতি ও অধঃপতনের প্রধান নিমিত্ত হইয়াছে, স্বেচ্ছায় তাহারা যাহাদিগকে নিজেদের সমান করিয়া লয় নাই, আজ অপমানে তাহাদের সবার সহিত সমান হইতে হইয়াছে।

"স্বধর্ম্ম"র পরিবর্ত্তে গীতা অন্যত্র "সহজম্ কর্ম্ম" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। ইহার অর্থ, যে কর্ম্ম লইয়া লোক জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহা হইতেই বুঝায় না যে, যে-বংশে যে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে সেই বংশের কর্ম্মই তাহার কর্ম্ম। গীতা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়াছে। আমাদের প্রকৃতি আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দ্বারা নির্নীত হয়, কেবল বংশ (horedity) দ্বারা নহে। আর ব্রাহ্মণের গুণ ও প্রকৃতি লইয়া লোকে যে শুধু ব্রাহ্মণের বংশেই জন্মগ্রহণ করে না তাহা বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে। অতএব কে কোন কুলে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা না ধরিয়া, প্রত্যেকে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহাতে সে অবাধে তাহার বিকাশ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে পায় তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়াই সমাজের কর্ত্তব্য এবং ইহাই শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। তাহা হইলে সকলেই আপন আপন স্বধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। নতুবা জাতি ভেদের ন্যায় কড়াকড়ি শ্রেণীবিভাগ বজায় রাখিলে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া মানুষ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। মানুষ যে কর্ম্মই করুক না কেন, যদি তাহা ভগবানে উৎসর্গ করা হয়, তাহার দ্বারাই সমস্ত জীবন যজ্ঞে পরিণত

হইতে পারে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু যাহার যেটি স্বভাবের অনুযায়ী, তাহার পক্ষে সেই কর্ম্মটিই উপযোগী। যে কর্ম্ম মানুষের স্বভাবের অনুযায়ী নহে, বাহির হইতে তাহা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত, স্বনুষ্ঠিত, দেখাইলেও বস্তুতঃ তাহা আত্মবিকাশের উপযোগী নহে। কারণ সে কর্ম্ম অন্তর হইতে আইসে না, একটা বাহিক উদ্দেশ্য বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয়। বাহির হইতে বিগুণ বা দোষযুক্ত দেখাইলেও আপন আপন স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

মানুষ যখন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম যজ্ঞরূপে সম্পাদন করে তখন তাহার কোন পাপই হয় না। আমরা যতদিন ত্রিগুণের মধ্যে রহিয়াছি, আমাদের কোন কর্ম্মই একেবারে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষ হইতে পারে না, আমাদের সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত, তাই বলিয়া আমাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত, well regulated, হওয়া প্রয়োজন, নিয়তং কর্ম্ম, কিন্তু তাহা ভিতর হইতে উৎসারিত হওয়া চাই, আমাদের সত্তার ধর্ম্মের সহিত তাহার মিল থাকা চাই, স্বভাবনিয়তম্ কর্ম্ম, ইহাই গীতার শিক্ষা। ধর্ম্ম বলিতে গীতা religion বা morality বুঝে নাই, ধর্ম্ম হইতেছে এইরূপ স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম।

যেমন ব্যষ্টির স্বধর্ম্ম আছে, তেমনি সমষ্টিরও স্বধর্ম্ম আছে। পরিবার, কুল, জাতি, শ্রেণী, সামাজিক আধ্যাত্মিক, শ্রমিক বা অন্যবিধ সঙ্ঘ, অধিজাতি (nation)—ইহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের বিকাশ করে এবং সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেই তাহারা রক্ষা পায়, সুস্থভাবে টিকিয়া থাকিতে এবং সুচারুভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, ইহাই ভারতের প্রাচীন শিক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যথাযথ ভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিজের প্রকৃতির এবং নিজের শ্রেণীর প্রকৃতির সত্য ধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে এবং সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণী প্রত্যেক সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি জীবন যদি স্বধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহা হইলেই বিশ্বজগতের যেমন সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, মানব জীবনেও তেমনিই সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। অন্যের ধর্ম্ম অনুসরণ করা সকল সময়েই বিপজ্জনক কারণ তাহা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বিপর্য্যস্ত করে। তাহা ভিতর হইতে আসে না, বাহির হইতে কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই চাপে মানুষ তাহার প্রকৃত অধ্যাত্মসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া যদি জীবনে অকৃতকার্য্য হইতে হয়, এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়, কারণ এ-সবের দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ বিপর্য্যস্ত হয় না। সকল সফলতা বিফলতা জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ অমৃতত্বের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুসরণ না করিলে সে এই কল্যাণমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সাময়িক সফলতাতে সে ক্ষতির পূরণ হয় না। আমাদের অন্তরের যাহা সত্য সেই অনুসারেই আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে, কোন বাহিক বা কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ করিলে চলিবে না। আমাদের কর্ম্ম যেন হয় আমাদের আত্মার এবং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির জীবন্ত ও যথার্থ প্রকাশ। কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে আমাদের আত্মার এই অন্তরতম সত্যের অনুসরণ করিয়াই আমরা কাল সহকারে দিব্য প্রকৃতির অমৃতধর্ম্মে উপনীত হইতে পারিব। সেখানে আমরা ভগবানের সহিত এবং আমাদের প্রকৃত সত্তার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত ঐক্যে বাস করিতে পারিব, এবং সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্ম্মের মুক্তির মধ্যে ভাগবত কর্ম্মের নির্দ্দোষ যন্ত্র হইয়া উঠিব।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শ্রীমনোজ বসু

৩য় অঙ্ক

[হাওড়া ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণী যাত্রীদের বসিবার কক্ষ। মাঝে মাঝে গাড়ীর হুইশিল ও গাড়ী চলিবার শব্দ শোনা যাইতেছে। বাহির হইতে যাত্রীদের রকমারি কোলাহলও কানে আসে।

বিকাল বেলা। কক্ষে মাত্র দুইটি প্রাণী—উমা ও অনুকূল। অনুকূল একটা ইজি চেয়ারে পড়িয়া আছে, উমা আর একটি চেয়ারে। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, বেডিং প্রভৃতি একপাশে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে।]

অনুকূল। (একখানা টাইম টেবল উল্টাইতে উল্টাইতে) নাঃ, অনেক দেখেছি, তোর মতো ব্যস্তবাগীশ লোক দেখব না আর। গাড়ী সেই কোন' সাতটায়—আর দুপুরে খেয়ে ভাল করে একটু ঘুমুতেও দিলি নে!

উমা। ঘুমিয়েছ কম কি, সেজদা। চারটে বাজলে তবে ত ডেকে তুলেছি—

অনুকূল। রাখ্‌ তোদের ঐ শহুরে চারটে। শহুরে ঘড়ি শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর বেজে যায়…কেরাণীদের অফিস ফিরতি বেলা কিনা…ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে রাখে। রাস্তাভরা রোদ হাঁ হাঁ করছে, তখন হল চারটে; আর আমাদের টাপাকোনায় চারটে বাজতে রাত' দুপুর হয়ে যায়—। সহরে এই মাসখানেক থেকে তোর অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে—চোখের দুপাতা এক হতে চায় না। খালি 'সেজদা, চলো—' 'সেজদা সময় হয়েচে'। জ্বালিয়ে মারিস্‌ একেবারে!

উমা। তা বলবে বৈকি সেজদা' শ্বশুরঘর ত করতে হ'ল না! শ্বশুরবাড়ী নয়, শরশয্যা,—নড়তে চড়তে খচখচ ক'রে বেঁধে।—এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—

অনুকূল। তোর ত সেরকম নয়। বুড়ো যে বউমা বলতে অজ্ঞান। হ্যাঁরে, নীলাদ্রি কি রকম রে? অশ্বিনী বলে ওঁরা নাকি গোয়ারের গুষ্ঠি—

উমা। বড় মিছে বলেনি সেজদা, আমি ত ভয়ে কাঁপি। ছেলে হুকুম করেন—ঘুমিওনা। চোখ বুঁজলে এমন পড়া সুরু হয়—আমি ত আমি—সরস্বতী অবধি ত্রাহি ডাক ছাড়েন। আবার বাবা আদর করে বলেন বৌমা, তোমার বুঝি ঘুম হয় না—আহা হা নিরিবিলি ঘুমোও। মিনিটে মিনিটে তদারক করে যান। ভয়ানক উদ্বেগ। যতক্ষণ না বলব—'হ্যাঁ ঘুমিয়েছি' কিছুতে নিশ্চিন্ত হবেন না।—কত কষ্ট বল ত সেজদা।

অনুকূল। তা ঠিক। সব কষ্ট সহ্য হয়, ঘুমের কষ্ট সহ্য হয় না। কিন্তু কি জানিস্‌ উমা, ওটা ওরা ইচ্ছে করে করে না—সহুরে লোকের অভ্যাস দোষ—

উমা। আমার অদৃষ্টের দোষ। তোমার আবার যে হাই উঠছে সেজদা, ঘুমুবে? গাড়ীর এখনো দেরি আছে, না হয় ওখানেই একটু ঘুমিয়ে নাও—

অনুকূল। না, ঘুম আসবে কেন? আর এলেই ঘুমোব? এত জিনিষপত্তোর,—তার উপর একা মানুষ তুই—এ সমস্ত আমার জিম্মায়, সঙ্গে দ্বিতীয় মানুষ নেই—ঘুমুলেই হল? কিন্তু আমি কেবল তোরই কথা ভাবছি, বোন। বুড়ো সেকেলে মানুষ—তার কথা ধরিনে। কিন্তু নীলাদ্রি একালের ছেলে—লেখাপড়া শিখেছে—আগুন সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করেছে—

উমা। কেন বলো আর সেজ্‌দা! তার জ্বালাতেই ত এমন ছুটোছুটি করে আসা। সমস্ত রাত শিয়রে বসে কড়া পাহারা—

অনুকূল। পাহারা দিক্—সে মন্দ কথা নয়। তুই ঘুমুচ্ছিস্, বসে বসে পাহারা দিচ্ছে, মশা-মাছি তাড়াচ্ছে—এ ত ভদ্দরলোকের লক্ষণ। কিন্তু ঘুমুতে দেবেনা—এ কি অন্যায়!···তুই যে বাড়ি থাকতে বললিনে। তা হলে—

উমা। তাহলে কি সেজ্‌দা—

অনুকূল। মুখে বলে আর কি হবে? আবার ত দেখা হবে—তখন দেখিস, দেখে নিস্—শর্ম্মারামকে এমন শেখা শিখিয়ে দেব—

উমা। ও সেজদা, শেখাবে কি অমনি চোখ বুঁজে?

অনুকূল। চোখ্ বোঁজে সাধে? চোখ্ বুঁজে আসে রাগে। যা ভাবছিস তা না, সঙ্গে মেয়েমানুষ—লগেজ—দায়িত্ব-জ্ঞান আছে। ঘুমোই নি—ঘুমোবো না—না—না—

[অনুকূলের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। একটু পরে নীলাদ্রি ভিতরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল।]

উমা। (হাসিয়া) এসো—দেখ, কথা রেখেছি কি না! বোসো—

[সোফার উপর পাশে জায়গা দেখাইয়া দিল। নীলাদ্রি এদিক-ওদিক তাকাইয়া সসঙ্কোচে একপাশে বসিল]

উমা। ছি ছি! এ করলে কি বল ত!

নীলাদ্রি। (চমকিত হইয়া) কি?

উমা। একে পুরুষমানুষ—তায় পরের বাড়ীর ছেলে—একেবারে এত কাছে এসে বসলে—মাঝখানে মোটে পাঁচ-সাত হাত জায়গা···লোকে দেখলে বলবে কি?

নীলাদ্রি। পাঁচ-সাত হাত না, পাঁচ-সাত ইঞ্চি বলো। কিন্তু—সেজদা কি এখানেও ঘুমুচ্চেন—

উমা। না—কক্ষণো না। সঙ্গে মেয়েমানুষ—জিনিষ-পত্তোর—দায়িত্বজ্ঞান আছে, ঘুমোন কি করে? চোখ বুঁজে নাক ডেকে সম্ভবতঃ দায়িত্ব চিন্তা করছেন। (নীলাদ্রির দিকে লক্ষ্য করিয়া উমা ব্যস্ত হইয়া উঠিল) এ কি? উস্কো খুস্কো চুল—তোমার এ চেহারা কেন? খাওয়া দাওয়া করোনি বুঝি, তুমি কি পাগল হয়েছ?

নীলাদ্রি। পাগল করলে কে, উমা? কোন মানুষ এমন অবস্থায় স্থির থাকতে পারে? নিষ্ঠুর,—হৃদয়হীন পিতা। সম্মুখে উত্তাল সুধা-সমুদ্র, আমি পিপাসাতুর—সামনে বসে থেকে কেবল ঢেউ গুণে যেতে হবে। কেন, কি দরকার ছিল এর?

উমা। দরকার তোমার নয়—তাঁরই মেয়ের দরকার ছিল—

নীলাদ্রি। বেশ। তোমাদের বাপ-মেয়ের মধুর পবিত্র সম্বন্ধ জগতে আদর্শ হয়ে থাকুক। কিছু আপত্তি ছিল না; কিন্তু তার মধ্যে এ অভাগ্য সাক্ষীগোপালকে প্রয়োজন হল কেন?

উমা। চিনি আসে মহাজনের ঘরে। মাঝে বলদ লাগে কেন মশায়? কনকাঞ্জলির সময় মা জিজ্ঞাসা করেন—বাবা, কোথায় যাচ্ছ? জবাব দিতে হয়—তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। তার মানে বোঝ?

নীলাদ্রি। কি?

উমা। মানে—দাসী তাঁদেরই···তোমার যা কিছু সে উপরি পাওনা। চিনির বস্তা ছিঁড়ে যা ছিটে ফোঁটা পড়ে, তোমার ভাগ্যে তাই তার বেশী লোভ করতে নেই—বুঝলে?

নীলাদ্রি। হাঁ—বুঝলাম! তুমি হাসছ, বিদায় বেলায় ঠাট্টা করছ—বুঝ্‌লাম ষড়যন্ত্রীর মধ্যে তুমিও একজন। থাক। স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলাম, এই অকরুণ পৃথিবীতে আমার একবিন্দু সান্ত্বনা নেই—

উমা। সেই দুঃখে যাবার সময় পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে না ত? হ্যাঁগো, বল—

[দু'জন তারকেশ্বরের যাত্রী প্রবেশ করিয়া মোটঘাট মেজেয় চেয়ারে—যেখানে খুসী দমাদম ফেলিল। লোক দুইটি পাড়াগেঁয়ে—কথাবার্ত্তায় বোঝা যায়, যশোর-খুলনার দিক হইতে আসিয়াছে। একজন মোটা বেঁটে গোলগাল, মুখে গোঁফদাড়ি নাই—আর একজন লম্বা ছিপছিপে, মুখে দিব্য গোঁফের তাড়া। ধরা যাক, প্রথমজনের নাম বেচারাম—দ্বিতীয় ফেলারাম। দু'জনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আসিতেছিল।]

ফেলারাম। তারকেশ্বরের ভাড়া স'সাত আনা? (ট্যাকের পয়সা বাহির করিয়া গণিতে গণিতে) খুচরো অত হবে না। ও মামা, হাপ্ টিকিটে চলে না?

বেচারাম। তোর হবে হাপটিকিট?

ফেলা। হ্যাঁ মামা, তা হ'লি কিন্তু কুলোয়ে যায়। এই ধরগে রাম—ছুই-তিন—...তিন আনা। রাম—ছুই... ছু'পয়সা। আর থাকলো এক আধলা। ওডা তুমি এখন ছ্যাওগে—বাবার থানে যায়ে লোট ভাঙায়ে শোধ দেবানে।

বেচা। অমন মোচার মতো গোঁফ জোড়া—তোর হাপ টিকিট হবে বৈকি? হাপ্ টিকিট পায় কেডা? যে ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ কেডা? রেলের বাবুরা ত কুষ্ঠি ঠিকুজী নিয়ে গুণতে বস্‌পে না। যার গোঁফদাড়ি নেই খাটো খোটো মানুষ—। হাপ টিকিট আমার হ'লিও হ'তি পারে।

ফেলা। হ্যাঁ মামা, গোঁফেরই ওজনটা এমন বেশী? গোঁফশুদ্ধ আমার মতো একজোড়া দাঁড়িপাল্লায় তুললিও ত তোমার আধাআধি পৌঁছুতি পারবানে না। তোমার হবেনে হাপটিকিট—আর আমার পুরো?

বেচা। ওরে বাপু, ওজনে হবে কি...এযে আইনের মারপ্যাচ।

ফেলা। তা হোক্ আইন। তা'হলি তারকেশ্বর অবধি গোঁফের ভাড়া সাড়ে চোদ্দ পয়সা আর মানষের সাড়ে চোদ্দ পয়সা। বেশ মামা, তাই যদি হয়, গঙ্গার ঘাটের তে গোঁফ কামায়ে আসিগে। এট্টা পয়সা—না হয় ছুডোই নেবেনে। তবু মুনোফো—। তুমি মালপত্তোর দেখো মামা।

[ফেলারাম সত্যই রওনা হইল]

বেচা। যা বেটা পাড়াগাঁয়ে ভূত। গোঁফ না কামায়ে বেটার মাথাটা কামায়ে ঘোল ঢালে দেয়...তালি বড্ড সুখ হয়; কিন্তু, ওরে তামুক কনে? মোলো যা—তামুক গাঁটি করে নিয়ে গেলি নাকি? বসে বসে এখন করি কি? তামুক দিয়ে যা ওরে হারামজাদা,—

[বেচারামও প্রস্থান করিল]

নীলাদ্রি। বিশ্বাস করিনে, বাবার ব্যবহারে তোমার মনে ব্যথা বাজে না। উমা, তুমিও বিদ্রোহী হও—

উমা। ও কাজ তোমার মতো সবাই কি পেরে ওঠে? জন্ম জন্ম কত পুণ্য করেচি, তারই ফলে অমন শ্বশুর শাশুড়ী পেয়েছি। আমি বাবু ও সব দলে নেই—আমি ভাগ্যধরী।

নীলাদ্রি। বেশ। সৌভাগ্যগর্কে গরবিনী হয়ে চলে যাও বাপের বাড়ি। প্রার্থনা করি, কল্যাণ হোক। কিন্তু যদি কোন দিন অকস্মাৎ পিওন এনে চিঠি দেয়—এই চির-নির্য্যাতিত আর পৃথিবীতে নেই. সেদিন একফোঁটা চোখের জল ফেলো হে নিষ্ঠুরা—

উমা। অমন বোলোনা, ছিঃ তোমার যে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল খারাপ হলে আমাদের সকলেরই লজ্জা—

নীলাদ্রি। তাই বলছি উমা, পরীক্ষার পেষণচক্রে হতভাগ্য বিরহী প্রাণ যদি নিষ্পেষিত হয়ে যায়—তার জন্যে একটি আতপ্ত নিশ্বাস ফেলো—। একটি রাতে যে তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছিল—এক অপরাহ্ণে ষ্টেশনের বেঞ্চিতে বসে অনেক করুণ কামনা জানিয়েছিল. এক সকালে চুপি চুপি যে তোমার পিছনে

উমা। না—না—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থামো—

নীলাদ্রি। উমা, এই বিদায় দিনে কষ্ট হচ্ছে না তোমার? একটুও কষ্ট হচ্ছে না?

উমা। নাঃ কষ্ট কিসের!

নীলাদ্রি। ওরে পাষাণী, কষ্ট হচ্ছে না? উমা—উমারাণী, সত্যি বল...একটুও না?

উমা। (মুখ ফিরাইয়া) না—না—না—

নীলাদ্রি। মিছে কথা। কই, আমার দিকে তাকাও—চাও দেখি...কেমন-

[জোর করিয়া উমার মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝর ঝর করিয়া তার চোখের জল গড়াইয়া পড়িল]

একি, চোখে জল. বাঁধ ভাঙা বন্যা—উমা উমারাণী—

উমা। চোখের অসুখ—

নীলাদ্রি। না—মনের। আমি যেতে দেব না, যা হবার হোক। এই কান্না নিয়ে কোমায় যেতে দিতে পারব না আমি—

উমা। কান্নার বড় দোষ! অমন করলে কার না কান্না আসে? তোমার আসে না?—

[ভাবাবেশে উমা নীলাদ্রির কাঁধে মাথাটি রাখিল। এমন সময়ে বেচারাম প্রবেশ করিল।]

বেচারাম। টিকে আছে?

নীলাদ্রি। (চমকিত হইয়া) কি?

বেচা। টিকে…কিম্বা কাঠকয়লা…নেহাৎ পক্ষে ঘুড়ি হ'লিও চলে। বাবুমশায় সঙ্গে নারকেলের খোসা রাখেন না?

নীলাদ্রি। এখানে কেন? যাও—

বেচা। আহা চটেন কেন, বাবুমশায়। নেহাৎ বেকায়দায় পড়িছি। থাকে ত দেন—ভোগাবেন না।

[ইতিমধ্যে ফেলারামও প্রবেশ করিয়াছে]

ফেলা। আর অমনি চিনেকাঠি এট্টা। গঙ্গাচ্চানের সময় গাঁটি ছিল…সে ঘোড়ার ডিমও ভিজে গেছে—

বেচা। (ফিরিয়া দেখিল) ফিরে আলি? ওরে হারামজাদা, গোঁফ কামালিনে?

ফেলা। যাচ্ছি মামা, এক্ষুণি যাবো। তোমার উপুকারের জন্যি ফিরে আলাম। তামুক বার করে দিয়ে মনডা কেমন হ'ল—ভাবলাম, মামা বুড়োমানুষ—তামুক সাজাসাজির এত হাঙ্গামা কি পা'রে উঠপেনে? যাই কলকেডা ধরায়ে দিয়ে আসি—

বেচা। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তখনই বললাম—ভাগনে কলকেতা যাচ্ছিস…পোড়া কলকেতায় তামুক খাবার আগুনডাও পাওয়া যায় না। নারকেলের খোসা বেশী করে নে… শুনলিনে সে কথা—এখন বোঝ্। গোঁফ কামায়ে ফেলায়ে আসিসনে কিন্তু,—ঐ গোঁফের ঘুড়ি পাকায়ে তামুক খাতি হবেনে—

ফেলা। আরে আস্পর্দ্ধা, আমায় গোঁফের আগুনে তামুক খাবে? নিজের চিতের আগুনে খালিও ত হয়—

বেচা। শক্ত কথা কোসনে ভাগনে, আমি কিন্তু রা'গে যাবানে। হচ্ছে ছাটা গোঁফের কথা—তার মধ্যি জ্যান্ত মানষির চিতের কথা ওঠে কি জন্যি?—কি জন্যি?

নীলাদ্রি। ভ্যাখ, এটা ঝগড়া মারামারির জায়গা নয়— যাও তোমরা—বেরিয়ে যাও—

[দুজনে মুখোমুখি যুদ্ধোদ্যোগ হইতেছিল—এক মুহূর্তে বিরোধ ভুলিয়া তাহারা পাশাপাশি নীলাদ্রির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল]

বেচা। কেন? যাব কেন? তোমরা চড়নদার— আমরাও চড়নদার।

ফেলা। তোমার কিনা জায়গায় মারামারি করতিছি? ভাড়া কি আমার থেকে এট্টা পয়সা কম নেবেনে?

নীলাদ্রি। এখানে আসতে হলে বেশী ভাড়া লাগে। ঐ ঘুমিয়ে আছে রেলের বড়বাবু, চেহারা দেখ্‌ছ ত? ডাকব?

বেচা। (হঠাৎ স্বর নরম হইয়া গেল) এটা কি দেড়া ভাড়ার ঘর?—

নীলাদ্রি। তারও বেশী।

বেচা। তা'হলি চল্লাম। যাচ্ছি দেবস্থানে ঝগড়া ঝাটির কাজ কি? বাবু মশায়ও ত গাজনে যাচ্ছেন, মা-ঠাকরুণিও যাচ্ছেন। যান, থানে দেখা হবেনে—

ফেলা। তা'হলি নারকেলের খোসা রাখেন না বাবু মশায়—

[তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি গোছাইয়া ফেলারাম, বেচারাম বাহির হইয়া গেল।]

নীলাদ্রি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারবনা উমা,— এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম…প্ল্যান ঠিক হয়ে গেছে— শোন।

[নীলাদ্রি ফিস ফিস করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল]

উমা। (প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া) না—না—ও হয় না—

নীলাদ্রি। হয় না? দুজনে অনন্ত অশ্রুসাগরের দুই পারে ভেসে বেড়াব—সেইটেই হয়? কেন, আপত্তিটা কিসের?

উমা। আমার ভয় করে—কেউ জান্তে পারলে কি হবে, বল ত—

নীলাদ্রি। জানবে কে? সেজ্‌দাকে এক্ষুণি জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি—দেখ। আর তিন চারটা দিনের ব্যাপার ত মোটে তারপর তোমাকে অমনি-অমনি চাঁপাকোণায় রেখে চলে আসব—

উমা। কেউ যদি হোষ্টেলে খোঁজ করে—

নীলাদ্রি। শনি-রবির আগে নয়। আজ ত মোটে মঙ্গলবার। শুক্রবার নিদেন শনিবার নাগাত নিশ্চয় ফিরছি·· শনিবারে বিকেলে যথাকালে ভালছেলে হয়ে বাড়ি হাজরে দেব। [উমা কিন্তু বুঝিতেছে না—মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িতেছে] আর বাবা যদি খোঁজই করেন···কৈফিয়তের অভাব কি? বন্ধুর বিয়ে—প্রিন্সিপ্যালের পিসির শ্রাদ্ধ—যাহোক কিছু বললেই হল—

উমা। না গো, আমার ভয় করে· এ পাগলামি বুদ্ধি ছাড়ো—

নীলাদ্রি। পাগলামি কোনটা? মাত্তোর আট দশ ঘণ্টার পথ পুরী। দিব্যি হোটেল—একেবারে সমুদ্রের উপর। দখিনখোলা—ছোট্ট একটা ঘর নেব। হু-হু করে ঢেউ আছড়াবে, জ্যোৎস্নায় ঘরের মেজে ভরে যাবে···তুমি আমি জানলা খুলে সমস্ত রাত বসে থাকব। সাহেবরা ত এ রকম হামেশাই করছে। বিয়ের পর বউ বগলে নিয়ে নিউগিনি, কামস্কাকটা, আর্টিক ওশান—কাঁহা কাঁহা মুলুক হনিমুন করে বেড়াচ্ছে—তারা কি পাগল?

উমা। ও সাহেবদের চলে। সত্যি, ভাব দিকি—বিদেশ বেভুঁই···রোগপীড়ে হতে পারে, কত কি ঘটতে পারে—দু'টি মাত্র প্রাণী—ভয় হয় না?

[হাতে এটাচিকেশ, অঘোরমণি শিকদার প্রবেশ করিলেন]

অঘোর। কিছু না। এটা বিংশ শতাব্দী। ভয় আবার কিসের? যমালয়ে গিয়েও কলা দেখানো যায়—অবশ্য যদি মোটা ইনসিওর করা থাকে—

নীলাদ্রি। আপনি—

অঘোর। ইনসিওরেন্স এজেণ্ট। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই বিজ্‌নেস্, যে-কোন অবস্থায় কাজ করি। ডাক্তার সঙ্গেই থাকেন। এই একটুখানি পেছিয়ে পড়েছেন—এক্ষুণি, পাঁচমিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন বলে—আপনি ততক্ষণ স্কিমগুলি একটু পড়ে দেখতে লাগুন—

নীলাদ্রি। সর্ব্বনাশ! ইনসিওর করাতে চান নাকি? আমরা যে এখন—

অঘোর। হাঁ হাঁ শুনেছি,—বিদেশ বেভুঁয়ে যাচ্ছেন। তা হলে ইনসিওর করে যান। গাড়ীর কলিশন হোক্—ভূমিকম্প টাইফয়েড, থাইসিস্—যাচ্ছে তাই হোকগে—কিছুর আর ভয় রইল না।

নীলাদ্রি। ক্ষমা কর্ব্বেন।—এখন বড্ড মনের উদ্বেগ—

অঘোর। তাতে ইনসিওর আটকায় না। মন যাচ্ছে তাই হোকগে—ওর মাপজোগ নিতে হবে না—ওজনও লাগবে না—শরীরটা থাকলে হল। চটপট একটা স্কিম ঠিক করে ফেলুন—

নীলাদ্রি। মরছি নিজের ভাবনায়—আপনি এলেন স্কিম নিয়ে—দেখুন, আপনি মায়ের বয়সী—আপনাকে মিনতি করে বলছি—

অঘোর। বেশ, আপনি তবে নিজের ভাবনা ভাবুন। আমি ততক্ষণ বৌটির সঙ্গে কথা বলি। হাঁ বাছা, তোমরা কোথায় চলেছ?

উমা। ঠিক নেই - উনি বলছেন···

নীলাদ্রি। (তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল) শুনুন—

অঘোর। আপনার ভাবনার ত ডিস্টার্ব করছি না—আপনি কেন আমাদের কথাবার্ত্তায় ডিসটার্ব করেন? হ্যাঁ, উনি বলছেন - কোথায় যাবে?

উমা। পুরী।

অঘোর। বাঃ, বেশ ভাল জায়গা। আমরাও পুরী যাব। তবে আর তাড়াতাড়ি নেই। গাড়ীর মধ্যেই হতে পারবে। আচ্ছা ও মেয়ে, তুমি এইদিকে একটু এস ত তবে। আমার নোট বইটায় তোমার স্বামীর নাম, শ্বশুরের নাম, দেওর ননদ কয়টী—সমস্ত এই নোটবুকে টুকে দাও ত—

নীলাদ্রি। আপনি যে এখুনি Family History নিতে বসলেন···ওঁর সাথে আমার খুব জরুরি কথাবার্ত্তা—

অঘোর। এ কাজটাও কম জরুরী নয়। · আপনি বড্ড বিরক্ত হচ্ছেন দেখছি। যাকগে, আমার তাড়াতাড়ি নেই। এক গাড়ীতেই যাচ্ছি ত। আপনাকে জল করে বুঝিয়ে দেব আমি যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। তাইত, আমার ডাক্তার এখনো এসে পৌছুল না ··সঙ্গে ভাসুর-ঝি রয়েচে। আপনি ত ভাবনাই করছেন মশায়, এই স্কিমগুলো নিয়েই বরং ভাবতে থাকুন, কাজ এগিয়ে থাকবে—

[একখানা প্রসপেক্টাস রাখিয়া অঘোর প্রস্থান করিলেন]

নীলাদ্রি। কি গেরো। গাড়ীতে আবার ছেঁকে না ধরে!

উমা। তাই বলছিলাম, গিয়ে কাজ নেই—

নীলাদ্রি। বল কি উমা, সমুদ্র দেখবে না?—তোমার চোখের তারার মতো গভীর কালো সমুদ্র। অগাধ অপার সমুদ্র—তারই পারে আমরা নীড় বাঁধব। ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠছে···দোহাই তোমার, অমত কোরোনা। —কেমন?···সেজদা, সেজদা,—

উমা। সেজদা'কে কি বলবে?

নীলাদ্রি। সে ঠিক আছে, ভেবোনা। ও সেজদা, সেজদাগো—

অনুকূল। উ—

উমা। বেশ যা হোক। আমি একলা একটী মেয়ে··· জিনিষপত্রের আণ্ডিল এই ফেলে রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছ?

অনুকূল। আরে ঘুমোলাম কখন? এইত মাত্তোর একটু চোখ বুঁজে আছি। চোখ বুঁজে থাকলেই ঘুমিয়ে পড়া হয়?

উমা। চোখ খুলেই দেখনা সেজদা—কে এসেছে,—

অনুকূল। এঁ্যা, কে, চোর-ছ্যাঁচোড় নয়ত! (চকিতে চোখ খুলিয়া) একি নীলু যে?

নীলা। সেজদা, ভীষণ দরকার—ছুটে আসছি—বাবা পাঠালেন—

অনুকূল। কি—কি? কোন বিপদ টিপদ নয় ত?

নীলাদ্রি। বিপদ···তা বিপদ একরকম বই কি? হার্ট প্যালপিটেশন···হৃদপিণ্ড ধুপধাপ্ করছে—

অনুকূল। তোমার?

নীলাদ্রি। হ্যাঁ আমার—আরও অনেকের। বাবা বললেন ছুটে গিয়ে ষ্টেশন থেকে বৌমাকে ফিরিয়ে আন—

অনুকূল। তোমাদের এই বিপদ—মুস্কিল ..তাহলে আমাকেও যেতে হয়। এই লট বহর নিয়ে···ওদিকে ষ্টেশনে গাড়ী থাকবে—

নীলাদ্রি। আহা-হা, আপনি কেন? আপনি ওসব নিয়ে চলে যান। খালি ঐ সুটকেশটা আর এই ছোট বেডিংটা থাকুক। আমি শুক্রবারে নিজে গিয়ে আপনার বোনকে রেখে আসব, আপনি সেদিন বরং ষ্টেশনে থাকবেন—

অনুকূল। সে হয় না, আমার কি আক্কেল নেই? তোমার বাবা বলবেন,—দেখলে—কুটুম্বের ছেলে বিপদের কথা শুনল···তবু এল না। মুটে ডাক। কি আর হবে— চলো—

নীলাদ্রি। না—না, আপনি নয়—বাবা স্পষ্ট করে মানা-ই করে দিয়েছেন। মানে···আপনাকে বলব না-ই বা কেন·· আমাদেরই হার্ট প্যালপিটেশন—মা'র একটু অন্য রকম অর্থাৎ ডাক্তার বলছিল, বোধ হয় কলেরা। এমন অবস্থায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া—

অনুকূল। বল কি? তবে উমাকেই নিয়ে যাচ্ছ কোন বিবেচনায়? ছেলেমানুষ···ও গিয়ে কি করবে?

নীলাদ্রি। ডাক্তার বল্লেই বুঝি অমনি কলেরা দাঁড়াবে। কিছুনা, কিছুনা। সামান্য উদরাময় গোছের—তা-ও সেরে উঠেছে। নাঃ, আসল কথা আর না ভাঙলে হলনা দেখছি। বাবার এক পিসতুতো ভাইয়ের মাসতুতো বোন আসবেন কাল সকালে। এক্ষুনি খবর পাওয়া গেল। আমাদের জোড়ে দেখতে চান কিনা! বাবা তাই··পাঠিয়ে দিলেন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান। আমি বেস্পতিবার নিজে পৌছে দিয়ে আসব—

অনুকূল। কি বলিস উমা, যাবি? সে হয় না নীলু .. ছেলেমানুষ, বাপের বাড়ী যাবে—সাধ আহ্লাদ করে এতদূর এসেচে এখনই বলছিল, এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

নীলাদ্রি। কি বলছিল!

অনুকূল। (সামলাইয়া লইয়া) না-না, কোন দোষের কথা নয় ভাই, প্রকাণ্ড বাড়ি, কলকাতা সহর…অভ্যেস ত নেই। রাত্রে ঘুম হয়না—তাই বলছিল, ফাঁকায় এসে বাঁচলাম।

নীলাদ্রি। ঘুম হয় না—তা-ও বলেছে?

অনুকূল। তাতে নিন্দের কথাটা কি হল? ঘুম ত কত রকমে না হতে পারে! হ্যাঁরে উমি, ঘুম হয়নি কেন? বাপের বাড়ী যাবার আহ্লাদে বোধ হয়?

উমা। তা বই কি! সেজদা, তোমায় বলিনি?

নীলাদ্রি। কি! কি বলেছ?

অনুকূল। কিছু না ভাই, আমার বোন নিন্দে করবার মেয়েই নয়। বলছিল—তোমাদের এমন আদর যত্ন—

উমা। তাই বলেছি নাকি সেজদা?

অনুকূল। (রাগিয়া) তা ছাড়া আবার কিরে? [চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন] ভারি দুর্জ্জয় সাহস দেখছি…চুপ—

[উমা চুপ করিল না, কৃত্রিম ব্যাঙ্গভরা কণ্ঠে বলিল]

উমা। এই যে তুমি বল্লে—সামনে পেলে আচ্ছা করে দেখে নেবে—

অনুকূল। নেবই ত। দেখা ফুরিয়ে যাচ্ছে না রে বোকা। শুক্রবারে ত যাচ্ছে ওখানে—

নীলাদ্রি। কি দেখবেন সেজদা?

অনুকূল। দেখব তোমায়। একা আমি নয়, বৌদিদিরাও বলে রেখেছেন—মা বাবা সকলেই। বলেন—বিয়ের হৈ চৈ-এর মধ্যে বর মোটে দেখাই হয়নি। আচ্ছা, ভাই,—যেয়ো শুক্রবারে। গাড়ীর আর দেরী নেই—এইবার কুলি ডাক—

নীলাদ্রি। এই কুলি—কুলি। বেটারা হল্লা করছে কানে কথা শুনবে না। দাঁড়ান—

[নীলাদ্রি কুলি ডাকিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।]

উমা। সেজদা, তোমার সমস্ত কেবল মুখে মুখে। বলছিলে আচ্ছা করে শিখিয়ে দেবে—

অনুকূল। বলেছি, মুখে বলেছি। ষ্টাম্পে সই করে দিইনি—আদালতেও হলপ করে বলিনি। অসাক্ষাতে লোকে ত রাজাকেও কত মন্দ বলে। তোরও সাহস বলিহারি, বাবা আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়ে রেখেছেন—পুরুষ মানুষ চটে গিয়ে একটা কাণ্ডাকাণ্ড করে বসে যদি—

[নীলাদ্রি কুলি লইয়া আসিল। কুলিরা জিনিষপত্র মাথায় লইয়া চলিল]

নীলাদ্রি। সেজদা, জিনিষপত্র নিয়ে যান [অনুকূল ব্যস্তভাবে বাহির হইলেন] [উমাকে] আমাদের গাড়ীরও দেরী নেই। অত গয়না গায়ে রাখবার দরকার নেই সুটকেশে পুরে ফেল। তৈরী হয়ে থাক। আমি অমনি টিকিট করেই আসব।

[নীলাদ্রিও চলিয়া গেল। অনুকূল আগেই গিয়াছিল। উমা আপনমনে সুটকেশে গহনা ভরিতেছে।]

উমা। ভারি আশ্চর্য্য! কোথায় যাব বাপের বাড়ি—আর চললাম পুরী। ভূগোলেই পড়ে আসছি, অসীম বিস্তীর্ণ জলরাশি! বাপরে বাপ্ ওঁর কি দুঃসাহস—কিন্তু আইডিয়া-গুলো সত্যি চমৎকার!

[অশ্বিনী ভিতরে ঢুকিয়া উকি ঝুঁকি দিল, অশ্বিনীর বেশভূষায় বিশেষত্ব আছে। উমা একটু পরে লক্ষ্য করিল ও জড়সড় হইয়া রহিল।]

অশ্বিনী। হুঁ—ঠিক তাই। রোগ নির্ণয়ে অশ্বিনীর ভুল হয়না—এখন সামাল হয়ে অষুধ নির্ব্বাচন দরকার। নীলুর পরে সম্ভ্রম বেড়ে যাচ্ছে। বউ জোড় ভেঙ্গে বাপের বাড়ি গেলেন ত ও-ও তক্ষুণি নূতন জোড় গেঁথে চলল পুরী। ছোকরা বেকার থাকতে জানেনা—যাকে বলে পুরুষসিংহ।

[নীলাদ্রি প্রবেশ করিল] এইযে ভাই নীলু—

নীলাদ্রি। (মুখ ফ্যাকাশে) তুমি এখানেও?

অশ্বিনী। কনে দেখতে এসেছিলাম। সেই এসেছি বেলা দুটোয়। ঘুরে ঘুরে কনে দেখে বেড়াচ্চি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সব দেশেরই নমুনা দেখা গেল—কিন্তু আমার ভাগ্যে কোনটি—ষ্টেইটেরই নিশানদিহি হল না।

নীলাদ্রি। তার মানে?

অশ্বিনী। খুড়ি ঠাকরুণ বললেন ষ্টেশনে থাকতে। কনে দেখা যাবে আর অমনি টিকিট কেটে গাড়ীতে তুলে দিতেও হবে। অবশ্য কিছু খুলে বলেননি।—টিকিট অফিসে তাক করে বসে আছি—দেখি, তুমিও পুরীর টিকিট কিনলে।

সকালবেলা ত হোষ্টেলে ঢুকছিলে। কর্ত্তামশাই বললেন বাড়ীতে পড়ার জুৎ হচ্ছে না। হ্যাঁ ভাই, হোষ্টেলেও জুৎ হল না বুঝি···সমুদ্রের ধারে তপোবন বানাতে চলেছ—

নীলাদ্রি। (অশ্বিনীর হাত জড়াইয়া ধরিল) দোহাই ভাই অশ্বিনী, বাবা না জানতে পারেন—

অশ্বিনী। (জিভ কাটিয়া) ক্ষেপেছ? কালকের পত্রের ব্যাপার জেনেছে কেউ?···দেখ ভাই নীলু, আমার একটা উপকার করবে?

নীলাদ্রি। নিশ্চয়। প্রাণপাত করেও যদি—

অশ্বিনী। না, ওসব বড় বড় অনুষ্ঠানের আবশ্যক হবেনা, এই যৎসামান্য দুটো হিতোপদেশ মাত্র। দেখ, বিয়ে আমি করিনি কিন্তু উদ্যোগের অভাব আছে, একথাত অতি বড় শত্রুতেও বলবে না। ইস্কুল থেকেই পাত্রী খুঁজতে লেগেছি নক্সা এঁকে একএকটা গলি হিসেব করে বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বেড়িয়েছি, উস্কো-খুস্কো চুল দেখলেই জিজ্ঞাসা করি—কন্যাদায় নাকি? কিন্তু বরাবর তাক্ ফস্‌কে এসেছে।

নীলাদ্রি। সময় যায়নি, এখানে বসে থাক—কন্যাপক্ষ এসে পড়্‌বেন—

অশ্বিনী। কিছু বিশ্বাস নেই ভাই, এ অদৃষ্টে সব মরীচিকা হয়ে দাঁড়ায়—ঐ অনুকূলের বোনের সম্বন্ধেও ঐ রকম মনে হয়েছিল—আমার যদিও ওটায় কিঞ্চিৎমাত্র ঝোঁক ছিলনা—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তুমি গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে এলে। আর তোমার হাতের তাকও বলিহারি! কাল রাত সাড়ে ৯টায় পত্রাঘাঠ করলে, আজ সন্ধ্যা না লাগতেই তিনি ষ্টেশনে পরে গড়াচ্চেন এবং আশা করা যায় আগামী কাল এ সময়টায় তোমার তপোবনের ভোমরা হয়ে তিনি কানে কানে কঠোপনিষদ গুঞ্জন করবেন—

নীলাদ্রি। দেখো অশ্বিনী, কেষ্ট্র না জানতে পারে—

অশ্বিনী। আর আমি হতভাগা দুপুর থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছি, জনস্রোত দেখছি, শিরদাঁড়া বিদ্রোহ করে আর দাঁড়াতে চাচ্ছে না, ক্ষিধের চোটে পেটের পাকযন্ত্র অবধি হজম হয়ে গেছে—এখনও মোহমুদ্গরের অবস্থা চলছে—কা তব কান্তা—

নীলাদ্রি। অশ্বিনী, এই টাকা দুটো বরং নাও, কিছু খেয়ে নিয়ে একেবারে খাঁটি হয়ে এসে বোসো—

অশ্বিনী। (টাকা হাত পাতিয়া লইল) [স্বগত] হোলো ভালো—ট্যাক্সি ভাড়াটা জুটে গেল—বাসে যেতে দেরী হয়ে যেত।

নীলাদ্রি। আর একটা কাজ—ভাই, ফিরবার পথে গোলদীঘির ওখানে নেমে এই চিঠিটা হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডের ওখানে পৌছে দিয়ে যেও। ডাকে দিতাম—কিন্তু একদিন দেরী হয়ে যাবে—আর সে বেটা যেমন পাজী—

[অশ্বিনী ঘাড় নাড়িয়া—চিঠি লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। নীলাদ্রি এবার দরজা পার হইয়া ওয়েটিং রুমে উমার কাছে আসিল। উমা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল]

উমা। বাপ্‌রে বাপ্, গল্প জমিয়ে নিলে আর জ্ঞান থাকে না। দেরী হয়ে গেল—

নীলাদ্রি। (এতক্ষণ পরে হাসিল) এত অধীরতা? কিন্তু আমরা ব্যস্ত হলে গাড়ি যে আগে ছাড়বেনা—এই মুস্কিল।

উমা। আমার যা ভয় হচ্ছে। এখানে এই অবস্থায় যদি ধরা পড়ে যাই—। কথা বলছিলে, ও লোকটা কে?

নীলাদ্রি। ও একটা লোক—সামান্য জানাশোনা—

উমা। টাকা দিলে কেন?

নীলাদ্রি। গরীব মানুষ—খেতে পায়না—তাই জলটল খেতে দিলাম···সাহায্য···পরোপকার করতে হয় বুঝলে?

উমা। তা বুঝেছি, যত বুঝছি অন্তরাত্মা তত জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে।

নীলাদ্রি। সেটা গাড়িতে বসে। আর এখানে নয়। —ওঠো—চলো—

উমা। কুলি?

নীলাদ্রি। এই জিমনাষ্টিক করা কুলিটি হাজির থাকতে—

[নীলাদ্রি জিনিসপত্র লইল, পিছনে উমা। ইহারা বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকিলেন ডাক্তার ফটিকচন্দ্র শিকদার ও তাঁহার ভাইঝি পরম লজ্জাবতী লবঙ্গ। লবঙ্গর সর্ব্বাঙ্গ দস্তুর মতো কাপড়ে মোড়া; অঙ্গশোভা দেখিবার জো নাই]

লবঙ্গ। অ কাকা, তুমি যে বড় বললে না কিছু—চুপচাপ চলে এলে—

ফটিক। বলব আবার কি? কাকে বলব?

লবঙ্গ। বলবে কাকে? বলবার মানুষ পেলে না? এই যে গায়ের কাছ দিয়ে এক ধিঙ্গী মাগী আর দুষমন এক মরদ বেরিয়ে গেল -

ফটিক। আহা—ষেটের বাছারা নিরাপদে বেরিয়ে গেছে—

লবঙ্গ। তুমি চোখের উপর দেখলে! হাত ধরে দুটো ঝাঁকি মেরে বলতে পারলে না, তোমরা কেমন ধারা লোক হে—

ফটিক। দুটো মানুষে ধাবড়ে যাচ্ছ মা, আর গাড়ীতে উঠবার সময় যে দু'শ মানুষ মোষের মতো গুঁতিয়ে ফেলে দেবে? তখন? তোমাদের জন্যে আমি দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াব?

লবঙ্গ। আনলে কেন তবে? সম্ভ্রম বাঁচাতে পারো না—তবে এ হাওয়া খাওয়াবার নাম করে আনবার কি দরকার? কাকীমাকে তাই বলছিলাম—কাকার ভরসায় যাওয়া—

ফটিক। এযে মা উল্টো চাপ দিচ্ছ? তুমি এবং তোমার কাকীমাই ত ভরসা আমার। সেবার অমনি রথের সময় বড্ড ভিড়। বুদ্ধি করে তোমার কাকীকে আগে ঠেলে দিলাম। বচন সুরু করলেন, মানুষ আর পালাতে দিশে পায়না। ফাঁকার মধ্য দিয়ে দিব্যি আরাম করে পুণ্যার্জ্জন করা চলল। তোমার কাকীমা ত ভয় পান না মা, তাঁর সহবাসে থেকে তুমি এ কি শিখলে?

লবঙ্গ। ভয় আমি পাই নাকি? থাকত একলা ঐ মাগিটা। তা নয় সঙ্গে যে ঐ পুরুষ মানুষ,—লজ্জা লাগে না? পুরুষের সামনে কথা কব আমি কি তেমনি বেহায়া? কাকীমা বলেছে—সে সব এখন নয়—বয়স টয়স হোক। পই পই করে মানা করে দিয়েছে—

ফটিক। বেশ বেশ, লজ্জাবতী; তা'হলে বরং তোমাদের মেয়েদের গাড়ীতেই চালান করে দেব। বচন না বেরুলে শেষে পেট ফুলে একটা কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে। এইবার তা'হলে গা তোল ত লক্ষ্মী মা।

লবঙ্গ। কাকীমা?

ফটিক। কোন ভয় নেই, তিনি ঠিক কোট খুঁজে নেবেন। তিনি জলেও ডুবেন না, আগুনেও পুড়বেন না, রাস্তায় পড়ে থাকলেও পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ হিসাবে কেউ কাছ ঘেঁসবে না। ওঠো-

লবঙ্গ। মানষের ভিড় না কমলে আমি যাব না—

ফটিক ষ্টেশনের ভিড়—সে ত রাত বারোটার আগে কমবে না। বলি, অবুঝ কেন? তুমি আর তোমার কাকীমা—মানষে তোমাদের কি করবে শুনি?

লবঙ্গ। মা গো—বেটারা কটমট করে তাকায়, গা ঠেঁসে ঠেঁসে চলে যায়—

ফটিক। বেটাদের সাহস ত কম নয়! তাহলে ত তারা এক একটা নেপোলিয়ান! যুদ্ধে যায়না কেন? কিন্তু দেখ মা, শিয়ালদ' থেকে সংস্পর্শ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এক্সপ্রেসটি ত ফেল করিয়েছ—আবার লোকালটাও যদি চলে যায়—সমস্ত রাত এই ষ্টেশনের হিমে পড়ে থেকে আমার ব্রঙ্কাইটিস হবে—

লবঙ্গ। দাঁড়ান তবে, একটা পান খেয়ে নি—

ফটিক। আবার পান? এই যে পোল পেরিয়ে এসে গাড়ী থামিয়ে চুণ কিনে তিন তিনটে পান সেজে খেয়ে এলে—

লবঙ্গ। চুণ আছে, কিন্তু দোক্তা ফুরিয়েছে—কাকা, চট করে সেই দোকানটা থেকে—

ফটিক। দোক্তা নিয়ে আসছি আর তার পাশের দোকান থেকে চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ—সমস্ত নিয়ে আসছি। পান চলুক, দোক্তা চলুক—তারপর রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়াও চলতে থাক। হিমালয় ঘাড়ের পর চাপিয়ে তোমার কাকীমা সরে পড়েছেন। এই পাহাড় বারবার নাড়ানো কি যে সে মানুষের কর্ম্ম? তুমি মা, পান খেতে লাগ—আমি তোমার কাকীমাকে দেখে আসি—

[ফটিক বাহির হইয়া গেলেন; ওদিকে বরদাকে লইয়া অশ্বিনী ঢুকিল]

অশ্বিনী। ঐ যে—বিদ্যাধরিটি বসে আছেন—

বরদা। নীলে ?

অশ্বিনী। কোন দিকে গেছে, আসবে এক্ষুনি।

বরদা। অশ্বিনী, তোমাকে আমি চাবকাব। গুণধরের এ সব কীর্ত্তি দেখাতে বুড়োকে এদ্দূর আনলে? একটু দয়া হল না? কিন্তু পুলিশ-টুলিশ ডেকে কাজ নেই, খবরের কাগজে বেরুবে, আমার মুখ পুরবে, মা-লক্ষ্মীর কানে যাবে। তার চেয়ে মেয়েটিকে ডাক ত ?

অশ্বিনী। ওগো ? শুনছেন ? ও ভদ্দোরলোকের মেয়ে, শুনুন একটা কথা—

বরদা। ডাক ;. ওঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠাও। দরকার হয় কিছু দক্ষিণা করেও। আমি এদিকে দেখতে লাগি, হারামজাদাকে একটু বিশেষ করে সম্বর্দ্ধনা করতে হবে— [বরদা বাহিরে গেলেন]

অশ্বিনী। দেখুন ..অত লজ্জা কি—আমার সঙ্গে দু' একটা কথা বলুন—লোকসান হবে না—

লবঙ্গ। (আরও ঘোমটা টানিয়া দিয়া) ও কাকীমা—

অশ্বিনী। কাকীমার দরকার নেই ত ? কথা আপনার সঙ্গে। মুখ দেখাতে লজ্জা করে ত বরঞ্চ আরও দু-এক পর্দ্দা মুরি দিয়ে কথা বলুন। লাভের কথাই। বেশী চাপাচাপ করেন ত বিশ টাকা অবধিও উঠতে রাজি—

লবঙ্গ। ও কাকিমা, কাকামশাইগো আর এক ভেরুয়া মরতে এসেছে—শিগগির এস—

[হঠাৎ চীৎকারে অশ্বিনী চমকিয়া গিয়াছে। দু'চারিজন লোক এবং রেলওয়ে পুলিশ ঘরে ঢুকিল]

কনেষ্টবল। কেয়া হুয়া ? হাল্লা মাচায়া কাহে ?

[লবঙ্গ হাতের ইঙ্গিতে অশ্বিনীকে দেখাইল—অশ্বিনী সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিল ; কনেষ্টবল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। উপস্থিত লোকগুলা হট্টগোল করিতে লাগিল। এই সময় হন্তদন্ত হইয়া অঘোরমণি ছুটিয়া আসিলেন ; সঙ্গে ফটিক]

অঘোর। কি কিরে ? কি হয়েছে লবঙ্গ ? এ কে ?

অশ্বিনী। (ক্রন্দনাকুল কণ্ঠে) আমি খুড়ীমা—

অঘোর। বাবাজী ? আরে পাহারাওয়ালা, উনকো ধরা কাঁহে ? ও হামারা হবু জামাই হ্যায়। কনেকা সাথ মোলাকাত করনে আয়া—

পাহারাওয়ালা। ছিয়া, ছিয়া! এৎনা হুজ্জৎ!—বাঙালী লোগ দুলহিন্‌কে সাথ ইস ঢংসে মোলাকাত করতা হ্যায়— আরে ইয়ে তো বহুত লড়নেওয়ালা জাত হ্যায়—

[পাহারাওয়ালা বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে হাত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। লবঙ্গ মুখ ফিরাইয়াছে—কাপড় আরও দুপর্দ্দা চড়িয়েছে। লোকগুলা নানারূপ মন্তব্য করিয়া হাসাহাসি করিতে করিতে চলিয়া গেল।]

ফটিক। তাড়াতাড়ি কর—আর দেরি হ'লে গাড়ী পাওয়া যাবে না। বাবাজী, সমস্ত ষ্টেশনে আমরা তোমাকে খুঁজে হয়রাণ—আর তুমি এদিকে—

অঘোর। (হাসিয়া) ওদের কি? আজকালকার ধরণই এই। দু'টিতে দিব্যি আলাপ জমিয়ে নিয়েছে—

অশ্বিনী। আজ্ঞে—শুধু আলাপ জমানো কি—আমার বুকের আত্মারাম অবধি জমে যাবার উক্রপম হয়েছিল।

অঘোর। তা লবঙ্গ আমাদের খুব জমাতে পারে, আমার ভাসুরঝি, আমারই নিজের হাতে গড়া। এই আলাপের গুণেই গেল বছর আমার কেশ হয়েছে—

ফটিক। ইনসিওরেন্স থাক এখন। ঐ ঘণ্টা দিল বুঝি

[সকলে উঠিল। অশ্বিনী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ঘোমটায় ঢাকা লজ্জাবতী কনের মুখ দেখিতে পাইল না]

অঘোর। কনে দেখা হয়েছে, বাবাজী ?

অশ্বিনী। মুখ দেখান নি খুড়িমা, কানেই শুধু মধু ঢাললেন।

ফটিক। পুরীর লোকালের আর দেরি নেই কিন্তু— এ গাড়ী ফেল হলে ষ্টেশনে পরে আমার ব্রঙ্কাইটিস হবে।

অশ্বিনী। তবে পুরীতেই যান--আমরাও যাচ্ছি সেখানে—

[বরদা প্রবেশ করিলেন]

বরদা। সে হারামজাদার ত পাত্তা নেই—এদিকের কি হল ?

অশ্বিনী। এরা সে নয়। ও খুড়িমা, একটা লোক দেখেছেন—চশমা চোখে, ফরসা চেহারা—

অঘোর। সঙ্গে একটা ছুঁড়ি। তারা পুরী এক্সপ্রেসে চলে গেছে। আমারই client—আমার কাছে ইনসিওর করবে—

[অঘোরমণি, ফটিক ও লবঙ্গ চলিয়া গেলেন]

অশ্বিনী। অতএব পুরী যেতে হবে—

বরদা। অশ্বিনী, তোমায় আমি চাবকাব—

অশ্বিনী। নীলুর হাতের চিঠি—হোটেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লেখা—এ চিঠি ত জাল নয়, ওঁরাও মিথ্যে সাক্ষী দিলেন না—

বরদা। কালকের চিঠির ব্যাপার কেন তুমি আমায় জানাও নি? কুলাঙ্গার এমনি করে মুখ পোড়াল। আমার মা-লক্ষ্মীর কাছে আমি কি করে মুখ দেখাব? তাকে কি বলে বোঝাব? হারামজাদাকে আমি সমুদ্দুরের জলে ডুবিয়ে মারব—

অশ্বিনী। আজ্ঞে, তা হলে পুরী যেতে হবে—

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[পুরীর সমুদ্রকূলে প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যা। বহু নরনারী বিচিত্র বেশে বায়ুসেবন করিতেছে। অনতিস্পষ্ট আলোয় এক জায়গায় দেখা গেল—ঢেউএর সঙ্গে তাল রাখিয়া, পাল্লা দিয়া কতকগুলি দুরন্ত ছেলে মেয়ে হাত ধরিয়া নাচিতেছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছে—

ঢেউরা নাচছে—নাচছে,—নাচছে—
রাঙা জলে ঝিকিমিকি রূপের বাহার—
ঢেউ তুলে কালোচুলে আবছা আঁধার।
ঢেউরা হাসছে—ছুটি ছুটি আসছে—
খলখল করতালি, হাওয়ায় ওড়ে বালি—
আকাশে মেঘের ফালি ওড়ে দুর্ব্বার—
মেঘে মেঘে সন্ধ্যার সোনামুখ ভার।

* * * *

চাঁদ হেসে কয়—ঘোমটা খোল,
মুখটি দেখি ও মানিনী.
চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি
বধুর চোখের অঝোর জল—
সিন্ধু-শকুন থমকে থাকে,
পাখায় ঢাকা নিশীথিনী—
থমকে দাঁড়ায় সারি সারি
অনন্ত ঢেউ অচঞ্চল

* * * *

চাঁদের আলোয় চোখের জলে
হঠাৎ ফোটে ফিনিক হাসি
মেঘ কেটেছে, সোনার আলোয়
সাগরবেলা একাকার
রূপালী ঢেউ হেসে আকুল,
ছড়িয়ে পরে রূপের বাহার।

[তারপর রাত বেশী হইয়াছে। বেলাভূমি নির্জ্জন হইয়া গেল। সাদা বালুতে জ্যোৎস্না ঝিকমিক করিতেছে উমা ও নীলাদ্রি বেড়াইতে বেড়াইতে একটি নির্জ্জন অংশে আসিয়া পড়িয়াছে। অশ্রান্ত তরঙ্গের ধ্বনি শোনা যাইতেছে।]

উমা। ঝড় বইছে নাকি?

নীলাদ্রি। আমাদের মনের মধ্যে। জ্যোৎস্না রাত—দিনের মতো পরিষ্কার: অশ্রান্ত সাগর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে। উমা, এদিকটা নির্জ্জন। এস, নুলিয়াদের এই নৌকোর কিনারে বসি।

উমা। আমার কিন্তু কান্না পাচ্ছে—কিছুতে ভয় যাচ্ছে না—

নীলাদ্রি। কিসের ভয়? কোন বাধাবন্ধন নেই··· তোমার আমার মধ্যে আজ কোন ব্যবধান নেই। উমা, পরের বাড়ীর মেয়ের মতন এমন তফাৎ হয়ে রইলে কেন?

উমা। এই বুঝি তফাৎ?···আচ্ছা, বাবা যদি হঠাৎ এসে দেখেন এই রকম—

নীলাদ্রি। বুঝেছি। চাঁদের আলোয় ভূতের ছায়া ভেসে আসছে।···বাবা, এখন পাঁচশো মাইল দূরে। উমা, একটা গান কর দিকি—

উমা। দূর—

নীলাদ্রি। এই ত জায়গা। খুব মিষ্টি একটা গান—

উমা। মিষ্টি গান মনে আসছে না। কেবলি কান্না পাচ্ছে। তুমি কানে হাত দেবে না ত?—

(উমা গান ধরিল)

বাঁশী বাজাইও না—

ও বাঁশী বাজাইও না, মিছে কেন বাজাও বাঁশী!

সোনার বরণ চম্পাফুল রে—

কলির মুখে হইল বাসি।

ঐ চম্পাবতীর নয়ান-জলে

সায়র-বুকে ঢেউ উথলে রে—

বালুর পাড়ে বসে কন্যা এলায়ে কেশের রাশি।

গহিন হ'ল রাতের নিশি নিশুত বালুর চরে—

নীল দরিয়া ছলছলিয়া কেঁদে কেঁদে মরে—

পরাণ-বন্ধু কোন না দেশে—

সপ্তডিঙা বেয়ে গেছে—

ঘরের কন্যা পথ চেয়ে তার

হইল রে উদাসী।

[ডাক্তার ফটিকচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে অশেষবিধ শীতবস্ত্র আঁটা। উমা সসঙ্কোচে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল]

ফটিক। এটা কিন্তু ঠিক নয় স্যর।

নীলাদ্রি। জ্বালাতন!···কোনটা ঠিক নয়, গান গাওয়া?

ফটিক। গান গাওয়া খারাপ—ওতে টন্‌শিলে ইনফ্লামেশন হ'তে পারে। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ ঠাণ্ডা লাগানো। চট করে ব্রঙ্কাইটিস্ ধরে যাবে—

নীলাদ্রি। আপনিও ত বেরিয়েছেন, ঠাণ্ডা কি আপনাকে রেহাই দেবে?

ফটিক। বেরিয়েছি কি সাধে? Pre-caution যত দূর নিতে হয় নিয়েছি···তবু ভয় ঘোচেনি। এই দেখুন, গায়ে গরম গেঞ্জি, তার উপর গরম কামিজ, তার উপর ওয়েষ্টকোট, তার উপর কোট, তার উপর আলোয়ান—মাথায় মঙ্কিক্যাপ, তার উপর কম্ফর্টার। তবু আসতে কি চাই? ওই যে আবছায়া কালো কালো—ল্যাম্পপোষ্ট নয়, এখানকার ল্যাম্পপোষ্ট স্যর, অত লম্বা হয় না—শ্রীমতী ঐ দাঁড়িয়ে আছেন। উনি ধরে পড়লেন—চলো বেড়িয়ে আসি। কি করি স্যর, টানে টানে আসতে হোলো—

নীলাদ্রি। আমাদেরও ঠিক তাই। উনি সমুদ্র দেখেননি···বললেন—দেখব। বলতে হল, তথাস্তু।

ফটিক। সে সব আমাদের নয় স্যর। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই পঞ্চশর পিঠটান দিলেন। তখন থেকেই টানাটানির সংসার—প্রেমের টান নয় স্যর—কম্ফর্টারের টান—

নীলাদ্রি। সে কি?

ফটিক। আসব না—কিছুতে আসব না—দুয়োর এঁটে প্রাকটিশ্ অব মেডিসিন্ খুলে বসেছি, বই কেড়ে ফেলে কম্ফর্টার ধরে এই টান। বরাবর হিড় হিড় করে টেনে—মানুষ দেখে এখানে এসে তবে ছাড়লেন। আমিও সুড়ুৎ করে সরে এসেছি।···এইযে উনিও এসে পড়েছেন—

[অঘোরমণি প্রবেশ করিলেন]

অঘোর। মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা। ছেলে মারা গেছে, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। বললাম, মানুষ অমর নয়—মিষ্টার রায়ও মারা যেতে পারেন। ইনসিওর করুন। কান্নার দায় হতে নিষ্কৃতি পাবেন।

নীলাদ্রি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ—এই ত সেই।

অঘোর। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীলাদ্রিকে দেখিতে দেখিতে) মশাই, আপনাকে যেন চেনা চেনা লাগছে—

নীলাদ্রি। না—আপনার ভুল হচ্ছে—আমার ত মনে পড়েনা—

অঘোর। ক্লায়েণ্ট সম্বন্ধে আমার ভুল হয়না—হাঁ, মনে পড়েছে। কালকে—হাওড়া ষ্টেশনে দেখা। আমরা দুর্ভাগাক্রমে এক্সপ্রেস ফেল করে বসলাম। ডক্টর শিকদারের সঙ্গে পরিচয় হয়নি? ইনি আমার স্বামী এবং ডাক্তার; আমার সমস্ত কেশ এগজামিন করেন। কাল প্রস্পেক্টাস্ রেখে এসেছিলাম—পড়ে ফেলেছেন?

নীলাদ্রি। আজ্ঞে না। আর এখন দরকারও নেই। কয়েকদিনেয় জন্য মাত্র এসেছি—

অঘোর। ঠিক। পৃথিবীর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। ক'দিনের জন্যই বা আসা! ঐজন্য ইনসিওর আবশ্যক।

নীলাদ্রি। কিন্তু দেখুন···আমরা একটু বিষয়ান্তরে আলাপ করছিলাম।—

অঘোর। ওঃ, sorry; তাহলে আলাপই চলুন। আমি বরঞ্চ আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছি ওদিকে।—

ঐ হোটেলে উঠেছেন ত? আমরাও ওখানে। কাল দেখা করব। আসুন—

[অঘোরমণি উমার হাত ধরিলেন]

নীলাদ্রি। দেখুন আলাপটা যে মিসেস মিত্তিরের সঙ্গেই—

অঘোর। আপাততঃ মিষ্টার শিকদারের সঙ্গেই হোক না! কি লজ্জার কথা বলুন তো···আপনারা বন্ধুলোক—দুটো দিন কেটে গেল, এখনও পরিচয়টাই জানতে পারলাম না—

নীলাদ্রি। তাড়াতাড়ি কি? কাল ত দেখাই হচ্ছে—

অঘোর। (হাসিয়া) মিসেস মিত্তিরের সাথে তার আগে—এই রাত্তিরেই দেখা হচ্ছে। ভয় নেই, আমরা ঐ ফ্লাপ্ষ্টাফের কাছে গিয়েই বসছি। (ফটিকের প্রতি) তুমি ত আচ্ছা লোক···হাঁ করে বসে আছ।—ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ কর—

[উমাকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া অঘোরমণি চলিয়া গেলেন]

ফটিক। তাই হোক। আলাপই করি। আমার সঙ্গে আলাপ করুন, স্যর—

নীলাদ্রি। করুন—

ফটিক। কি আলাপ করা যায়,···আপনার নামটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি স্যর?

নীলাদ্রি। কালোশশী মিত্তির।

ফটিক। বাপের নাম?

নীলাদ্রি। Family History ডাক্তার বাবু? আপনি ব্যস্ত হবেন না, সে ওদিকে এতক্ষণ নেওয়া হচ্ছে।

ফটিক। তা ত হচ্ছেই। কিন্তু আমাকেও নিতে হবে। ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে—আমাদের জয়েণ্ট বিজনেস্ স্যর—

নীলাদ্রি। কিন্তু সুবিধে হবেনা। আমাদের থাইসিসের ফ্যামিলি। বাড়িশুদ্ধ সমস্ত—

ফটিক। তাতে আটকাবে না। আপনি নিজে ঠিক থাকলেই হল—

নীলাদ্রি। আমারই সবচেয়ে বেশী—একেবারে এখন-তখন অবস্থা। নইলে পয়সা খরচ করে পুরী এসেছি—বুঝছেন না?

[অঘোরমণি ও উমা পুনঃ প্রবেশ করিলেন]

অঘোর। আলাপ চলছে?

ফটিক। চলছে বটে। কিন্তু সুবিধের নয়। থাইসিসের ফ্যামিলি—

অঘোর। তুমি বুঝি ডাক্তারী বিদ্যে ফলাচ্ছ? খবরদার ডাক্তার, আমার কেশ নষ্ট করলে ভাল হবেনা কিন্তু—

ফটিক। আমি কি করব?

অঘোর। তোমায় নতুন কিছু করতে ত বলছিনে। যা যা বলি, টপাটপ Medical Reportয়ে লিখে সই করে দেবে। মিসেস মিত্তিরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি—খুব সজ্জন সুস্থ পরিবার।

নীলাদ্রি। কিন্তু মিসেস মিত্তির যে মিথ্যে করে বলেননি তার প্রমাণ কি?

অঘোর। আচ্ছা, তুমি ডাক্তারী পড়েছিলে কি করতে? মুখের কথা মেনে নিচ্ছ, পরীক্ষা করে দেখতে পার না?

ফটিক। আমি কি ষ্টেথেস্কোপ নিয়ে এসেছি?

অঘোর। না থাকে, নিয়ে এসো। আমি বসে আছি—

নীলাদ্রি। দোহাই আপনাদের। অব্যাহতি দিন—আজকের রাতটা অব্যাহতি দিন। আমি ইনসিওরেন্স করব—করব, নিশ্চয় করব।

অঘোর। বেশ, ভদ্রলোকের কথায় কাল সকালেই দেখা করবে। (হাসিয়া) এখন হয়ত একটু বিরক্ত হচ্ছেন—কিন্তু যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী আমরা—পরে বুঝবেন।··· আচ্ছা, নমস্কার—

[অঘোরমণি ও ফটিক চলিয়া গেলেন]

নীলাদ্রি। বাপ্রে বাপ্—হিতাকাঙ্ক্ষীরা কিছুতে ছাড়েনা! এবারে আপাততঃ একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যাক্—

উমা। নিশ্বাস ফেলবে কি? আরও সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। আমরা বসে কথা বলছি···গলা শুনলাম··· তারপর আবছা আবছা দেখলাম—বাবা, সঙ্গে আর একটা লোক—এইখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন—

নীলাদ্রি। খেপেছো? সে আর কারা। বাবা জানবেন কি করে?

উমা। (হঠাৎ) ঐ দেখ, ঐ তাঁরা···চিনতে পারছ ?

[নেপথ্যে বরদার গলা] ও অশ্বিনী ?—

উমা। ঐ শোন গলা—

নীলাদ্রি। তাইত, তাইত! অশ্বিনীই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওকে আমি খুন করব। এসো—পালাই—আরাম আমাদের অদৃষ্টে নাই—

[উমা ও নীলাদ্রি দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল]

[বরদা ও অশ্বিনী প্রবেশ করিলেন]

বরদা। ও অশ্বিনী, সমস্ত ভুয়ো। আমার নীলু সে রকম ছেলে নয়। আমার ছেলে আমি চিনিনে? বারোয়ারীর হিসেব নিয়ে সেবার চাবকেছিলাম, তোমায় আবার চাবকা'ব অশ্বিনী—

অশ্বিনী। না কর্ত্তা, মিথ্যে নয়—ঠিক তারা এসেছে—

বরদা। এসেছে ? তবে উড়ে গেল নাকি ? ধরমশালা, মন্দির, হোটেল, রাস্তাঘাট—সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি···। অশ্বিনী, তোমার মতলব বুঝেছি—আমার খরচায় এখানে বসে বস্তা বস্তা লুচি ওড়াতে এসেছ ?

অশ্বিনী। আজ্ঞে না। তারা এসেছে। খুড়ী ঠাকরুণ বললেন—শুনলেন ত—ওঁরা এক্সপ্রেস ফেল করলেন—তারা চলে এসেছে। খুড়ীঠাকরুণ ত মিথ্যে বলার লোক নন—

বরদা। না, তুমি মিথ্যে বলার লোক নও, তোমার খুড়ী নয়—সব যুধিষ্ঠিরের বংশ। যত মিথ্যুক বদমায়েস আমার নীলু! সে বোঝেনা, বুড়ো বাপ তার অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে, সোণার প্রতিমা গলায় ছুরি বসাবে, তার গর্ভধারিণী পাগল হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে—সোণার হাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে সে এখানে চলে এসেছে—আমার একমাত্র ছেলে—একটুকু বয়স থেকে বড় করেছি—এখনো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেনা—

[কান্নায় গলা আটকাইয়া আসিল, বরদা আর কথা বলিতে পারিলেন না]

অশ্বিনী। কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ করছেন। খুড়ীত আমার আপন খুড়ী নন—আমার বাড়ীর কেউই নন—তা'হলে না হয় অবিশ্বাসের কথা ছিল। উনি কুটুম্ব মানুষ—সেই যে বনগাঁর সম্বন্ধের কথা বলেছিলাম—উনি সেই কনের খুড়িমা—

বরদা। সেই যে কাঁচা সোণার রং তাঁরি খুড়ী ? কাঁচা সোণাটীও সঙ্গে আছেন। ও অশ্বিনী তোমার মতলব বুঝেছি। তুমি সেই টানে টানে আমার খরচে পুরীধামে এসে বসেছ। তোমায় আমি চাবকাব—

অশ্বিনী। ব্যস্ত হবেননা। একটা দিন সময় দিন—আমি ঠিক সন্ধান করে বের করব। না পারি, তখন যা হয় করবেন—

বরদা। বেশ তাই। একি অশ্বিনী, সমুদ্দুর ত আচ্ছা ছেঁচড়া। আমার কাপড় ভিজিয়ে দিল। দুত্তোর, এই দুপুর রাতে নাকানি চুকানি খাইয়ে দিল। তুমি আমাকে এই নোনাজল খাওয়াতে নিয়ে এসেছ, তোমায় আমি ঠিক চাবকাবো, অশ্বিনী—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পুরী। হোটেলের কক্ষ। সামান্য দু-একটা চেয়ার, ছোট খাট—সকাল ৭টা। দরজা জানালা ভেজানো। নীলাদ্রি আধশোওয়া অবস্থায়; উমা চাপা গলায় হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতেছে।

উমা। মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরে রে—
গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণিয়ে
বন্ধু, তোমার মুখের পরে—
মুখের পরে, চোখের পরে, লাল অধরের মধুর তরে—
গান-সায়রে ঢেউ দিয়েছে
উছলে পড়ে কোমল গায়ে—
কাদের কনে সঙ্গোপনে—
যায়রে কূলের ছায়ে ছায়ে ?
অবাক বাতাস থমকে থাকে—
মন-ভোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে—
গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণিয়ে
আকুল চুলে লুটে পড়ে—
মুখের পরে চোখের পরে,
লাল অধরের মধুর তরে।

নীলাদ্রি। ভ্রমরের গুঞ্জরণ বন্ধ থাকুক, উমা। মনে রেখো এটা রোগীর ঘর। পেঁচার মতো গম্ভীর হয়ে থাকবার জায়গা। ভ্রমর এখানে আসবে কি কুইনাইন গিলতে?

উমা। (হাসিয়া গান ধরিল)

বাঘ দিয়েছে হাঁম—
—সুঁদর বনের গোল ঝাড়ে।
পেঁচা কয়, মেঘ ডাকে কি
ঝোপের মাঝে বারে বারে?
—পেঁচা ত অবাক!
বাঘ দিয়েছে হাঁক।

নীলাদ্রি। নাগো-না দরজা ভেজানো আছে বটে, ফাঁক দিয়ে কণ্ঠ বেরোনো বিচিত্র নয়। স্বামী এমন অসুস্থ যে ঘর থেকে বেরুতেই পারছে না, এমন অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গীত-অনুশীলন—সবাই সন্দেহ করবে। হোটেলের ড্রয়িং রুমে হিতার্থীরা বাদানুবাদ সুরু করবেন—

উমা। কি রকমটা হবে, আন্দাজ কর দিকি?

নীলাদ্রি। বলবে, জ্বর টর মিছে কথা, ছুতো ধরে পড়ে আছে—

উমা। এবং ছুতো ধরে লেপ মুড়ি দিয়ে বিস্কুট চুরি করে খাচ্ছে—

নীলাদ্রি। কিংবা তার চেয়েও মিষ্টতর কিছু। যেহেতু স্বামীসেবার অজুহাতে তুমিও সকাল থেকে বেরোওনি। সে সব কিছু গ্রাহ্য করিনে, উমা, কারো ত ধার করে খাইনি। কিন্তু আশঙ্কা, বন্ধুরা জানতে পারলে এক্ষুনি ড্রয়িং রুমে টেনে নিয়ে ব্রিজ খেলতে বসাবেন।

উমা। এবং একটু পরে বাবা জুতো ফট ফট করতে করতে এসে বলবেন—নীলে, এগজামিনের পড়া পড়ছিস না?

নীলাদ্রি। উমা, ভয় দেখিওনা বলছি—সত্যি সত্যি উনি আসতে পারে—

উমা। কিন্তু এরকমভাবে কদিন চলবে? এস না—টাঙ্গা গাড়ীতে ষ্টেশনে গিয়ে পালাই! ওঁরা সহরময় খোঁজাখুঁজি করে বেড়ান—

নীলাদ্রি। সাহস করিনে, দুষ্ট গ্রহের মতো অশ্বিনী সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। হয়ত ইতিমধ্যে ষ্টেশনে ডিটেকটিভ মোতায়েন করেছে।...সকাল থেকে চা না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। দুপুরের ব্যবস্থা যে কি হবে—। আমার ত আসবে বালি, তোমারতাতেই ভাগ বসাবো। বলি, চাকরটাকে ঘুসটুস দিয়ে কোনরকম অতিরিক্ত ব্যবস্থা করতে পার? (হাসিয়া) আমাদের অবস্থা হয়েছে—বুঝলে উমা, শত্রু বেষ্টিত দুর্গের মতো—

[দরজার উপর মৃদু করাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রি বিছানায় পড়িয়া রোগীর মতো কাতরাইতে কাতরাইতে বলিল]

নীলাদ্রি। আয়—

[পরিচারক একখানা রেকাবী হাতে করিয়া ঢুকিল। রেকাবীর উপর একখানা নামের কার্ড। কার্ড তুলিয়া ধরিয়া নীলাদ্রি পড়িল]

নীলাদ্রি। ডক্টর ফটিকচন্দ্র শিকদার এল, এম, এফ—। বলগে, দেখা হবেনা—অসুখ বেড়েছে—

পরিচারক। বলেছিলাম। তিনি বলেন, সেই জন্যেই তিনি আসবেন। ডাক্তার ত অসুখ হলেই যায়—

নীলাদ্রি। আসবেন জোর করে নাকি? বলগে, আমরা হাতুড়ে ডাক্তার দেখাইনে। ডাক্তার দেখাতে হয়, কলকাতায় গিয়ে দেখাব।

[উমা আবার চাপা গলায় গান ধরিল—]

উমা। সূর্য্য হাসে নীল আকাশে
পেঁচার চোখে কান্না আসে—
পেঁচা কয়, কি সর্ব্বনাশ—
বনভরা ঐ ফুলের বাস—
মৌমাছি যে মাতাল হয়ে—
উড়লো ঝাঁকে ঝাঁক—
(সুঁদর বনে) বাঘ দিয়েছে ডাক।

[গানের শেষ দিকে অঘোরমণি ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া উমার পিছনে বসিলেন; উমা দেখে নাই; নীলাদ্রি দেখিতে পাইয়া সত্যই আতঙ্কিত হইল]

অঘোর। খবর টবর নিইনি, মিষ্টার মিত্তির। অপরাধ নেবেন না। কাল এত সব কথাবার্ত্তা—এর মধ্যে হঠাৎ

অসুখ·· এমন উতলা হয়ে উঠলাম, খবর দেওয়ার কথা মনেই হ'লনা। আমার যা ভয় হয়েছিল! এখনো ইনসিওরেন্স প্রোপাজালই যাইনি—ভালমন্দ কিছু হলে মিসেস মিত্তির কেঁদেই কূল পেতেন না। যা-ই হোক, ভাল আছেন দেখে আশ্বস্ত হলাম—

নীলাদ্রি। ভাল আছি, কে বল্লে?

অঘোর। আপনার স্ত্রী বল্লেন—আপনিও বল্লেন—

নীলাদ্রি। আমি?

উমা। আমিই বা বল্লাম কখন?

অঘোর। আপনাদের মুখ চোখ বলেছে। এমন হাসি খুসী—হ্যাঁ, তেমন মোটারকম ইনসিওরেন্স থাকলে সম্ভব বটে—

নীলাদ্রি। আমার অসুখ· একশোবার অসুখ··· আমায় বকাবেন না—

অঘোর। কিছু নয়—ওটা মরিচীকা, মনের ভ্রম—আমি বাজী রাখতে পারি। ও হয় মশাই, ত্রিশ বছর এই কাজ করছি। অনেক দেখেছি—অসুখ সামান্য কথা—আমাদের ভয়ে কত লোক আগে থাকতে মরেই যায়-। আমরা তবু ছাড়িনে।

নীলাদ্রি। (হাত জোড় করিয়া) আপনি দয়া করে চলে যাবেন কি?

অঘোর। অসুখ?—বেশ তবে ডাক্তার দেখান? ওগো, বাইরে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? ভেতরে এসো।

[ডাক্তার ফটিকচন্দ্রের প্রবেশ]

বন্ধুবান্ধবের রোগে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, ও ডাক্তারী শিখেছ কি জন্যে? বল শিগ্‌গিব কি রোগ?

ফটিক। কি রোগ?

অঘোর। রোগী বলবে ত লোকে তোমায় ডাকবে কেন?

ফটিক। ষ্টেথেস্কোপ্ বের করব, না থার্মোমিটার?—না, আবার ছুরি ছোরা চালানোর প্রয়োজন হয়? মোটামুটী একটা বলে দিন, শুনি। বলি, দেহের কোনখানে বেদনা-টেদনা ঠেকছে?

নীলাদ্রি। দেখুন, মাথায় আমার আগুন জ্বলে উঠচে। এ সময়টায়—

ফটিক। প্রোপোজালটা সই করে সর্ব্বাগ্রে ওঁকে বিদায় করুন। শিরোরোগ সারতে কিছু সময় লেগে—

নীলাদ্রি। শিরের ভিতর আমার খুন চেপে আসছে—আপনারা যাবেন—না শান্তিভঙ্গের জন্য পুলিস ডাকতে হবে?

অঘোর। আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছেন। আচ্ছা, আপাততঃ চললাম—কিন্তু আমরা যথার্থই হিতাকাঙ্ক্ষী—আমাদের পরে অভিমান রাখবেন না—সময়ান্তরে দেখা হবে—

[অঘোরমণি চলিয়া গেলেন]

নীলাদ্রি। (ফটিকের প্রতি) আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন—

ফটিক। ডাক্তার ডাকলেন, ফিয়ের টাকা দেবেন না?

নীলাদ্রি। উমা, দাও দু'টো টাকা।—ঐ আমাদেব দণ্ড। (উমা টাকা বাহির করিয়া দিল: ফটিক দেখিয়া শুনিয়া বাজাইয়া লইয়া গেলেন।) দুয়োর দাও—শিগ্‌গিব খিল এঁটে দাও। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকি, তুমি মাথার পাশে বোস···পার ত চোখে দু-একফোঁটা অশ্রু আমদানী কর। কি জানি দরদীরা দরজা ভেঙেও ঢুকতে পারেন। বিশ্বাস নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

[পুরী। হোটেলের ড্রয়িং-রুম। বেলা ১০টা। ড্রয়িংরুম সুসজ্জিত। সোফা, চেয়ার, টিপয়, ফুলদানী—কোন অঙ্গে ত্রুটী নাই। একপাশে গু'টি চারপাঁচ চেয়ার ও টেবিল লইয়া ম্যানেজার অফিস সাজাইয়া বসিয়াছেন। অপর দিকে নীচু তক্তাপোসের উপর ফরাস বিছানো। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে ১০ই ফাল্গুন তারিখ দেখা যাইতেছে।

ফরাসের উপর দু'জনে দাবা খেলিতেছে; তাহাদের পাশে আরও দু'চারজন বসিয়া আছে। ঘরের মধ্য দিয়ে হোটেলের লোকজনের চলাচলের পথ। সুসজ্জিত নানাধরনের মেয়েপুরুষ—কেহ বাহির হইতেছেন, কেহবা বাহির হইতে বেড়াইয়া ভিতরে ঢুকিতেছেন। ম্যানেজার টেবিলের সামনে খাতায় পত্রে বসিয়া আছেন। অশ্বিনী ও বরদা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।]

ম্যানেজার। না, নীলাদ্রি নামে আমার হোটেলে কেউ নেই—

অশ্বিনী। তবে কি নামে আছে?

ম্যানেজার। মশায়, এখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা এসে ওঠেন। ফৌজদারী ফেরোয়ারী আসামীর তল্লাসে এসে থাকেন ত, ঐ সত্যবাদী ভোজন-কেবিনে খোঁজ করুনগে — দু দুটো বাড়ী নিয়ে আমার হোটেল—এখনো জলজ্যান্ত তিনটে রায় সাহেব উপরতলায় কাগজ পড়ছেন—

অশ্বিনী। ম্যানেজার বাবু, আপনার নামের খাতাটা একবার দিন না—

ম্যানেজার। মাপ করবেন। ওটা কারো কাছে দেবার নিয়ম নেই, একমাত্র পুলিশের লোক ছাড়া। আর পুলিশের লোক যদি হন, সন্তোষজনক প্রমাণ দিন।

অশ্বিনী। পুলিশ নই, কিন্তু প্রমাণ দিচ্ছি—

[অশ্বিনী বরদাকে ইঙ্গিত করিল। বরদা একটা টাকা লইয়া ম্যানেজারের হাতে গুঁজিয়া দিলেন]

তবে আপাততঃ সন্তোষজনক যদি না-ও হয়, কাজ সমাধা হলে নিশ্চয় হবে, এ আপনাকে কথা দিয়ে রাখছি—। দিন খাতাটা।

ম্যানেজার। তাই ত, মুস্কিলে ফেললেন। আপনাদের মতো বিশিষ্ট লোক একটা অনুরোধ করলেন, শুনেও পারা যায় না। জানেন ত এটা হোটেল—সত্যবাদী মাঝির ভোজন কেবিন নয়—দশজনের শুভ উইলে এটা বেঁচে আছে।·ওরে, কে আছিস্—বাবুদের দুই কাপ চা দেরে যা—

[ম্যানেজার খাতাটা অশ্বিনীর হাতে দিয়া ওদিকে একটা কাগজ পত্রে কি লিখিতে লাগিলেন। অশ্বিনী নিবিষ্টমনে দেখিতেছে।]

অশ্বিনী। ম্যানেজারবাবু, এই জোড়াটা কি রকম? নীলকণ্ঠ বিশ্বাস ও স্ত্রী—এঁরা ত কাল এসে পৌঁচেছেন—

ম্যানেজার। ভদ্রলোক সেওড়াফুলির গুদোমবাবু ছিলেন। দু'বস্তা ময়দা সরিয়ে চাকরী যায়। তবু বেশ দু' পয়সা করে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে এসে থাকেন হোটেলে। থার্ড ক্লাশে থাকেন। জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হাপুস চোখে কাঁদতে থাকেন। গায়ে শ্বেতি উঠেছে। কেমন মশায়, মিলছে?

বরদা। হুঁ মিলবে! নীলু আমার সেই রকম ছেলে কি না? নিজের স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না যে—। অশ্বিনী, আমি তোমার মতলব বুঝেছি। জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছে হয়েছিল, আমাকেও হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলে। তোমাকে আমি—

অশ্বিনী। বসুন—মেজাজ হারাবেন না। আচ্ছা, এই জোড়া—

ম্যানেজার। মিষ্টার এণ্ড মিসেস রে। ওদিকে এগুবেন না মশায়, হোটেলের চাকরবাকরগুলোও এগুতে সাহস পায় না—হবু না হক থাপ্পর ঝাড়ে, সাহেবি মেজাজ—কিন্তু র —কি আর তুলনা দেই—আমাদের সুহাসবাবুর ঐ নতুন ছাতাটা—

অশ্বিনী। আচ্ছা এই?

ম্যানেজার। এখনো দেখা হয়নি? ওঁকে ধরেন নি? আচ্ছা জোর কপাল দেখছি আপনাদের। গিন্নি ইন্সিওরেন্স এজেন্ট, কর্তা ডাক্তার। মিসেস অঘোরমণি শিকদার ও ডাক্তার ফটিকচন্দ্র শিকদার। এখানে প্রায়ই এসে মক্কেল পাকড়ান।

অশ্বিনী। খুড়ীমা আর খুড়োমশাই। আচ্ছা, ম্যানেজার বাবু, খুড়োমশায়ের ভাইঝিটাও ত প্রায়ই আসেন—

বরদা। ঐ ভাইঝিটা হল তোমার আসল মতলব। আমি বুঝেছি, অশ্বিনী। তোমায় আমি—

অশ্বিনী। আহা, অধীর হচ্ছেন কেন? তারা গা ঢাকা দিয়ে আছে, সমস্ত খবর না নিয়ে ধরা যাবে না।—

[চাকর দু'কাপ চা বরদা ও অশ্বিনীর সামনে রাখিয়া গেল।]

বরদা। নীলু আমার কক্ষণো ঐ ভাইঝি সেজে গা ঢাকা দেয় নি—তোমায় আমি হলপ করে বলছি—

অশ্বিনী। অধীর হবেন না। কর্তামশাই, চা খান—ম্যানেজার বাবু, ওঁরা যখন প্রায়ই এসে থাকেন তখন ভাইঝিটার সঙ্গে আপনার নিশ্চয় চাক্ষুষ দেখাশুনা আছে—

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিও চাক্ষুষ করে পুলকিত হন। ঐ যে ওঁরা সবশুদ্ধ সশরীরে হাজির।

[ফটিক, অঘোরমণি এবং লজ্জাবতী লবঙ্গ বাহির হইতে বেড়াইয়া ফিরিল।]

আসুন মিসেস শিকদার, মিস ও মিষ্টার শিকদার,... দু'জন বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

[ভাবী শ্বশুড়বাড়ীর লোক দেখিয়া অশ্বিনীর সম্ভবতঃ লজ্জা হইল। সে মাথা ঝুঁকিয়া অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত খাতা দেখিতে প্রবৃত্ত হইল।]

ফটিক। (বরদার প্রতি) আমার কথা? অসুখ করেছে? বলুন কি অসুখ। ষ্টেথেস্‌কোপ আজ সঙ্গেই আছে—

অঘোর। তোমার বই কি? আগে ইনসিওর না করে তোমায় লোকে ডাকবে? ইনসিওর করে বরং ডাকতে পারে। তোমার দয়ায় টাকাটা শিগ্‌গির মিলে যায়। হ্যাঁ মশায়, আপনার বয়স কত? অবশ্য তাতে আটকাবে না—তেমন মোটারকম কাজ হয়, বয়স কমিয়ে আপনাকে তিরিশেও দাঁড় করাতে পারি—

বরদা। অশ্বিনী, খুঁজে পাবে না। নীলু তেমন ছেলে নয়। এখন এদিক সামলাও। মতলব করে কি তোমার খুড়ীমার কবলে ফেলতে এখানে নিয়ে এসেছ? তোমায় আমি ঠিক—

['অশ্বিনী'র নাম শুনিয়া লজ্জাবতী লবঙ্গ দ্রুতবেগে ছুটিয়া ভিতরে ঢুকিল। অশ্বিনী যেন এতক্ষণে তাহাদের দেখিল। আসিয়া প্রণাম করিয়া ঘাড় নীচু করিয়া বসিল। ম্যানেজার ভিতর দিক উঠিয়া গেলেন।]

ফটিক। তাই ত, বাবাজীবন যে!

অঘোর। বাবাজী, এঁকে ত চিনতে পারছি না।

অশ্বিনী। কর্ত্তামশাই,—পাড়ার গার্জ্জেন। আমাদের পিতৃতুল্য।

অঘোর। খাসা হয়েছে, লবঙ্গ রয়েছে—তাহলে পাকা দেখার কাজটা একেবারে এখানে—

অশ্বিনী। অজ্ঞে, তাই হোক্—

বরদা। অশ্বিনী!—

অশ্বিনী। একটু দেরি হবে খুড়ীমা। আরও একটা কাজে আসা হয়েছে। সেটার জন্য কর্ত্তামশায় বড্ড উদ্বেগের মধ্যে আছেন—

অঘোর। দেরি হবে? আচ্ছা, সেরে নাও—আমরা বসি—

[অঘোর ও ফটিক সোফায় গিয়া বসিলেন। অশ্বিনী মহা ব্যস্তভাবে খাতার পাতা উল্টাইতেছে। বরদা হাতে ভর দিয়া মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে। এমনি সময়ে দাবাড়েরা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

১ম দাবাড়ে। কিস্তি!

২য় দাবাড়ে। এই চললো গজ—

[আবার নিঃশব্দ। তখন ফটিক ও অঘোরমণিতে কথা হইতেছে।]

ফটিক। রোগীর সামনে আমার বদনাম কর! ইনসিওরেন্স না করে আমায় ডাকবে না। কেন? কি জন্য? তেমনি, আমার হল না—তোমারও না! ঠাট্টার একটা সীমা থাকা উচিৎ। স্ত্রী না হলে তোমার নামে আমি মানহানির মামলা করতাম—

অঘোর। ঠাট্টা কোথায়? লোকের কথাই আমি মুখে বললাম। জিজ্ঞাসা করি, কত টাকা তোমার সংসারে আসে?

ফটিক। তোমার দালালীর চেয়ে ঢের বেশী। খাঁটি গঙ্গার জল ইনজেকশন করে—অষুধের দাম আদায় করি··· বুক পরীক্ষা করতে গিয়ে আগে বুক পকেটে হাত দিই—মনিব্যাগের ওজন বুঝে প্রেস্কৃপসন করি। এইত এই কতক্ষণ আগে—তুমি তিন দিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেও পারলে না—আমি কালোশশী বাবুর কাছ থেকে আমার ফি নগদ আদায় করে নিয়ে এলাম—

অঘোর। কালোশশীটা আবার কে? নীলাদ্রি মিত্তিরের কথা বলছ?

ফটিক। না। কালোশশী মিত্তির—আমায় নিজে নাম বলেছে। তোমার মতো পচা স্মরণশক্তি আমার নয়—

অঘোর। না। নীলাদ্রি মিত্তির—বউটি নিজের হাতে কাগজে লিখে দিয়েছে—

ফটিক। দশ হাজার টাকা বাজী। বের করো কাগজ—

অঘোর। দশটা টাকা দিবার মুরোদ আছে? সে যাক। নীলশশী হোক আর কালাপাহাড় হোক—লোকটা কি ছোটলোক! তিন দিন ধরে পিছনে ঘুরছি—ভদ্রলোক হয়ে কথা দিয়ে—শেষে একেবারে সোজা হাঁকিয়ে দিলে। এমাসে এখোনো যে তিনটি হাজারের কেস চাই—

[অঘোরমণি চিন্তিত হইলেন হঠাৎ এই সময়ে হোটেলের ভিতর দিকে খুব হাঁকডাক হইতে লাগিল।]

শোন, তোমার লাইফটাই ইনসিওর করি এবার। প্রিমিয়াম আমি দেব। টাকা পাবার সময়ও কিন্তু আমি—

ফটিক। আপত্তি নেই···কিন্তু মেডিকেল ফি আমার—সেটা মাপ হবে না—

[ক্রুদ্ধ ম্যানেজার চাকরকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন। চাকরের হাতে অনেকগুলি পাতা ও খবরের কাগজ জড়ানো- -একটা বাটি। বাটিতে ভাত ও মাছ ভাজা।]

ম্যানেজার। খোল্···বের কর কি আছে—

চাকর। আমি কি জানি—

ম্যানেজার। তুই জানিস্‌নে হারামজাদা···জানি আমি? এ কি? ভাত, মাছ ভাজা···ডিম সেদ্ধ—

চাকর। আমি জানি না ম্যানেজার বাবু; মাইরি, জগন্নাথের দিব্যি। আমি দোতলার দক্ষিণের ঘরে আছিলাম—

ম্যানেজার। অমনি বাটিটা খবরের কাগজে মোড়ক হয়ে উড়ে এসে তোর হাতে পড়ল! দোতলার দক্ষিণের ঘরে? দাঁড়া···ভদ্রলোকের অসুখ, এইত দুধ-সাবু দিয়েছে সেখানে। হারামজাদা মিথ্যে বলবার জায়গা পাস্‌ না—

[চাকরকে মারিতে উদ্যত]

চাকর। হ্যাঁ দুধ-সাবু! থালা ভরত্তি ভাত উড়ে যাচ্ছে—মাছের কাঁটা আলুর খোসায় পাহাড় জমে গেছে—

অঘোর। দোতলার দক্ষিণের ঘর ত? অসুখ না হাতী, এমন অভদ্র লোক—

ফটিক। আমি একজন ডাক্তার স্যর—ক্যাম্বেলে পাশ। আমি স্বচক্ষে পরীক্ষা করে এসেছি—অসুখ নয়, ভুয়ো।

অশ্বিনী। পয়সার আশ্রয় মশায়, স্রেফ্‌ জমা খরচের ব্যাপার। ওত হরদম হচ্ছে। (চাকরের প্রতি) বল্‌ বেটা কত দিয়েছে তোকে?

ম্যানেজার। বল্‌ বল্‌ (লাঠি তুলিল)

চাকর। দেয়নি, দিবে বলেছে। গিন্নির যত ভাত সব বাবু খেল। গিন্নি বলে—খাও, খাও, আমি না হয় সাবুই খাব। তখন কর্ত্তা বললে লুকিয়ে আর কিছু আন্‌তে পারিস? এক টাকা দিব!

ম্যানেজার। ভদ্রলোক কাল এসেছে—অতি মিশুক, অমায়িক লোক। সকাল থেকে আজ বেরুলেনই না। ওঁর স্ত্রীও বেরুন নি—

অঘোর। বেরুবেন কি দুঃখে? ঘরের মধ্যেই একশো মজা—দরজা এঁটে হল্লা হচ্ছিল—

ফটিক। মেয়ে মানুষটি গান গাচ্ছিলেন—

১ম দাবাড়ে। (মুখ ফিরাইয়া) এসব ত সন্দেহজনক কথা—

২য় দাবাড়ে। (১ম-এর মুখ খেলার দিকে ফিরাইয়া) জোড়া ঘোড়া ছুটল টক্‌ টক্‌ টক্‌—

বরদা। ঠাকুর দেবতার গান হলে অবশ্য মন্দ কথা নয়। কিন্তু দেশে নানান রকমের বড় প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। তাড়া খেয়ে জোড়ে জোড়ে এই দিকে এসে জোটে। এ সম্বন্ধে প্রতিবিধান হওয়া দরকার—

১ম দাবাড়ে। প্রতিবিধান হওয়া দরকার ম্যানেজার বাবু—

২য় দাবাড়ে। (১ম-এর মুখ খেলার দিকে ফিরাইয়া) আগে দাবা সামলাও—

[অনেকেই বেড়াইয়া ফিরিতেছে, আবার গোলমাল শুনিয়া ভিতর হইতেও অনেকে এদিকে আসিতেছে। মেয়ে-পুরুষে সেখানে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই]

অশ্বিনী। ভদ্রলোকের নামটি কি ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার। (খাতা দেখিয়া) লাল মোহন মিত্তির—

ফটিক। না স্যর—কালোশশী মিত্তির—আমায় নিজে বলেছেন—

অঘোর। কক্ষণো নয়—নীলাদ্রিশেখর মিত্তির। মেয়েটি নিজের হাতে লিখে দিয়েছে, এই দেখুন—

বরদা। নীলু?

অঘোর। তাহলে বুঝছেন সবাই, পাপ না থাকলে এত সব জাল নামের মানে কি?

২য় দাবাড়ে। জাল তার প্রমাণ কি? একটা মানুষের তিনটে নামও ত থাকতে পারে?

অঘোর। একবার লাল একবার নীল একবার কালো? সে মানুষ নয়, বহুরূপী—

অশ্বিনী। যা বলেছেন ঠিক তাই, খুড়ীমা—একেবারে বর্ণে বর্ণে ধরে ফেলেছেন। আমরা ওঁদের খোঁজেই এতদূর—

ফটিক। পরিবার নিয়ে থাকি, ম্যানেজার বাবু—লোকটাকে সরিয়ে দিন—

১ম দাবাড়ে। এক্ষণই-এই মুহূর্ত্তে—নইলে ভোজন-কেবিনে গিয়ে উঠব।

ম্যানেজার। এই বেলাটা—

[মিসেস রে চশমা পরা আধুনিক মহিলা।]

মিসেস রে। No mercy to the moral wreck.

১ম দাবাড়ে। না পারেন, বলুন—আমরা ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে আস্‌ছি—

[আরও কয়েকজন লোক প্রবেশ করিল]

আগন্তুকগণ। কি, কি হয়েছে ম্যানেজার বাবু?

[সকলে ঠিক একই কথা বলিতেছে না—এক ধরণের কথা বলিতেছে। তাহার ফলে হট্টগোল হইতে লাগিল]

[ম্যানেজার ভিতরে ঢুকিলেন]

অশ্বিনী। দেখলেন কর্ত্তামশাই, মিথ্যে বলেছিলাম না কি? কাজ হাসিল—এবারে চা-টা খান⋯জড়িয়ে গেছে বোধ হয়—

[বরদ চায়ের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন; তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে]

আ-হা, ফেলে দিলেন। ম্যানেজার বাবু আদর করে দিলেন। না খান— আমাদের বল্লেই হত—

বরদা। অশ্বিনী, তোমাকে আমি চাবকাব—

অশ্বিনী। বিচার মন্দ নয়। ছেলে করল কীর্ত্তি আমি খাব চাবুক। ছেলেকে সন্দেশ খাওয়াবেন বোধ হয়—

১ম দাবাড়ে। আপনার ছেলে? আহা⋯মুখোজ্জ্বল-কারী ছেলে⋯হীরের টুকরো—খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে এসেছেন?

২য় দাবাড়ে। আমার মনে হয়, তিনটের কোনটাই ওর নাম নয়। বাজে সময় কাটিও না—এই দিকে ফেরো—

[১ম দাবাড়ে অবশ্য ফিরিল না]

বরদা। ছেলে আমার নেই, মরে গেছে—সাগরের জলে বিসর্জ্জন দেব, তাই এসেছি।

[উত্তেজনায় নীলাদ্রির চোখ মুখ লাল। দ্রুতবেগে সে প্রবেশ করিল]

নীলাদ্রি। কারা বের করে দেবে? আমি দেখতে চাই।

[১ম দাবাড়ে ঝাঁ করিয়া খেলার দিকে মুখ ঘুরাইয়া খেলায় মনোযোগী হইল]

১ম দাবাড়ে। এই নৌকো চাললাম—

২য়। কিস্তি সামলাও আগে—(মুখ ফিরাইয়া নিল)

নীলাদ্রি। চরিত্র নিয়ে কথা বলে! কারা? যাবার আগে চরম শিক্ষা দিয়ে যাবো—

মিসেস রে। এক নম্বর—this old fellow [বরদাকে নির্দ্দেশ করিলেন]

নীলাদ্রি। বাবা—আপনি? (জিভ কাটিয়া বরদাকে প্রণাম করিল—বরদা পা সরাইয়া লইলেন) আর অশ্বিনী, তুমি স্পাই হয়ে মিছামিছি এখানে বুড়ো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমাকে আমি খুন করব।

অশ্বিনী। না ভাই, মশা মারলে হাত ময়লা হবে। উনি তবু চাবকাতে চান, তুমি যে আরও খারাপ কথা বলো—

[নীলাদ্রি কঠোর দৃষ্টিতে মিষ্টার ও মিসেস শিকদারের দিকে তাকাইল]

অঘোর। কেবল মাত্র অনুমানের উপর ভদ্রলোকের অসম্মান করা উচিত হয় নি—অনুসন্ধান হওয়া উচিত ছিল।

ফটিক। নিশ্চয়, ম্যানেজারেরই দোষ—

বরদা। হারামজাদা, আমার মুখ পোড়ালি। আগে তোকে মেরে ফেলব—তারপর সাগরের জলে আমি আত্ম-ঘাতী হব। দেশে এমুখ কেমন করে দেখাব?

[বরদ কাঁদিয়া ফেলিলেন]

[ঠিক এই সময়ে চাকরের মাথায় বেডিং ও স্যুটকেশ—সঙ্গে ম্যানেজার—উমা আসিয়া প্রবেশ করিল]

উমা। বাবা!

বরদা। একি, মা-লক্ষ্মী, তুমি কোন ট্রেণে এলে? হতভাগিনী, তুমিও খবর পেয়েছ?

উমা। (প্রণাম করিয়া) এ কি চেহারা হয়ে গেছে, বাবা। ম্যানেজার বাবু, এখন কিছুতে যাওয়া হতে

পারে না। যা-ই বলুন। বাবা এসেছেন—উনি বিশ্রাম করবেন।

বরদা। ও মা, তুই কোথায় উঠেছিস? কার সঙ্গে যাচ্ছিস?

উমা। এখানেই আছি, বাবা।

বরদা। আর?

উমা। আর কি?

বরদা। আর কোন মেয়ে-টেয়ে?…ঐযে অশ্বিনী বল্লে—

উমা। আর ত কেউ নেই—ঝি-টীও নেই—কেবল আমরা।

বরদা। অশ্বিনী?—না, থাক। হাঁ মা, এখানে কোন রকম অসুবিধে টসুবিধে—

উমা। না বাবা—এখানে মশা নেই—

বরদা। ম্যানেজার বাবু, সেই যে সন্তোষজনকের কথা হয়েছিল—তাই হবে। আমরা দু-চার দিন থাকব। মা-য়ে পোয়ে সমুদ্দুরে নাইতে হবে। কিন্তু তুই নবাবের বেটা, এখানে এসে বসে আছিস; মাথার উপর এগজামিন—রাত্রের গাড়িতেই চলে যা—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে—

বরদা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, না হয়—থাক দুটো একটা দিন। আশা করে এসেছিস—এখনো মন্দির-টন্দির দেখা হয়নি বোধ হয়—

নীলাদ্রি। আজ্ঞে না—

বরদা। ঘুরে ঘুরে তা-ই দেখিস! কিন্তু আমার মাকে যদি জ্বালাস, তখন দেখতে পাবি—

অঘোর। বাবাজী, তোমার কর্ত্তামশায়ের কাজ বোধ হয় সারা হল—আমরা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি, এইবার আমাদেরটা—

ফটিক। তাই হোক। সবাই উপস্থিত রয়েছেন, আর দেরী করে লাভ নেই—

বরদা। কি অশ্বিনী?

অশ্বিনী। সেই যে বনগাঁর সম্বন্ধটা—

বরদা। মনে পড়েছে—সেই কাঁচাসোনা ত?

অশ্বিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা তাই পাকা দেখতে বলছেন।

বরদা। এতক্ষণে তোমার মতলব ঠিক বুঝতে পারলাম, অশ্বিনী। আমায় পাকা দেখাতে পুরী টেনে নিয়ে এসেছ! তা দোষ দিইনে…আমাকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে কার না ইচ্ছে করে? এই মা-টীকে ত এই দু' চোখে দেখে বের করেছি। ম্যানেজার বাবু, সন্দেশ চাই যে—দশটাকার সন্দেশ—এখুনি দরকার।

(ম্যানেজারকে টাকা দিলেন)

মিসেস রে। সন্দেশ is not to my liking.

(বিরক্তমুখে মিসেস রে চলিয়া গেলেন)

বরদা। কিন্তু খালি হাতে কি করে পাকা দেখা হয়—অশ্বিনী, আগে বল নাই কেন?—তোমায় আমি—

উমা। (তাড়াতাড়ি কানের দুল জোড়া খুলিয়া) বাবা, দুল দিয়ে মুখ দেখুন। আপনি ত আমায় আর একজোড়া হীরের দুল গড়িয়ে দিয়েছেন।

[ইতিমধ্যে অঘোরমণি ও ফটিক গিয়া আপাদমস্তক গুণ্ঠনবতী লবঙ্গকে ধরিয়া আনিলেন।]

বরদা। মুখ খোল, মা'কে দেখি—

(মুখ দেখিয়া চাপা গলায়)

অশ্বিনী, এই তোমার কাঁচাসোনা?

অশ্বিনী। নাই হ'ল। আমি হিসেবী লোক আমার জমাখরচে ঠিক বসান হল, তা রূপের দিকে একটু যখন খাদ হল—আপনি মধ্যবর্ত্তী আছেন, রূপোর দিকে এগিয়ে দিলে মোটের উপর ঠিক গিয়ে দাঁড়াবে। খুড়ীমাকে বলুন, ইনসিওরেন্স করতে পারি, কিন্তু গোড়ার প্রিমিয়ামটা ওঁকেই দিতে হবে।

[বরদা লবঙ্গকে গহনা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মেয়েরা উলু দিল। একটি মেয়ে কোণা হইতে একটা শঙ্খ লইয়া বাজাইতে লাগিল। সন্দেশ আসিল। দাবাড়েরা দাবা ফেলিয়া আগাইয়া আসিল—মিষ্টিমুখের ব্যাপারে তাহাদেরই উৎসাহ সব চেয়ে বেশী।]

সমাপ্ত

শ্রীমনোজ বসু

—:*:—

শরৎ-প্রতিভা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এ

বেদনা ও সহানুভূতি সাহিত্যিকের প্রেরণার উৎস। যাঁহার চিত্ত এই বেদনায় উদ্বেলিত হয় যত বেশী, তিনি সাহিত্যের সেবায় পাঠকমনে রসের সঞ্চার করিতে পারেনও তত বেশী! শরৎচন্দ্র বেদনার—রিক্ততার নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে, উপন্যাসে। সেই মর্ম্মন্তুদ হাহাকারে যাহাদের অন্তর ব্যথিত হয়, তাহারা সমালোচক না হইতে পারে—কিন্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহাদের থাকিতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যের তিনি যে প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন, নরনারীর মনের গোপন কক্ষে প্রতিনিয়ত যে ঘাত-প্রতিঘাত আলোড়ন বিক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে, সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত সংস্কারের নামে, ধর্ম্মের নামে, আচারের নামে অহর্নিশি যে প্রহসন-লীলা চলিতেছে, অন্ধতায় চোখ বাঁধা কত কত বলি প্রতিনিয়ত স্বেচ্ছায় গলা বাড়াইয়া দিতেছে, তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনা বিলাসের জন্য, অবসর বিনোদনের জন্য তরল রস পরিবেশন নহে, তিনি সমস্ত জীবনে যাহা শিরায় শিরায় সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহার অন্তর যাহার সত্যরূপে সর্ব্বদা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তিনি তাহাই এতটুকু রঙ্ না ফলাইয়া সুন্দর লিপি-চাতুর্য্যের সহিত জানাইয়াছেন। সেইখানেই তাঁহার কাব্য সমাধা হইয়াছে। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপক্ক রসে মণ্ডিত করিয়া তিনি যেসমুদয় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাই সামাজিকদের সামনে ধরিয়াছেন—সমাধানের জন্য। শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, সকলেই যাহাতে তাঁহার অনুভূত ব্যথায় ব্যথী হয় এমনি সহজ, সরল ভঙ্গিতে তিনি তাঁহার আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে "তান সেনের সঙ্গীত মেঠো-সুরে-গান-গাওয়া হীন রাখালদের জন্য নহে।"

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীবিশ্রুত কবি। বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া তিনি সাহিত্যের যে অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দেশপ্রীতি, সাহিত্যপ্রীতি চিরকাল সোণার অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাকিবে সাহিত্যের ইতিহাসে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার সে আসন অটল রহিয়াছে—রহিবেও। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সমস্যা গুটি পাকাইতেছিল, বহুকাল পরে তাহাই শরৎ-সাহিত্যে রূপ পাইয়াছে। সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন হাসি কান্নায়, ব্যথা নৈরাশ্যের সত্য রূপটী শরৎচন্দ্র যেভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন তেমনটী বুঝি আর কেহ পারেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসরাজির যথাযথ সমালোচনা যেদিন হইবে সেদিন এই কথাটী স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে যে দুরূহ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহা তাঁহার শক্তিসঞ্চার এবং ঐকান্তিকতার পরিচয় দেয়। তিনি কবিকল্পনার মুক্তপক্ষ আশ্রয় করিয়াই উপন্যাসের পথের এই পাষাণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক; বাস্তবতা যখন আদর্শবাদের সহিত একান্তভাবে মিশিয়া অপরূপত্বের সৃষ্টি করিয়াছে সেইখানেই তাঁহার সৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সব সময়েই তাঁহাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই দেখিয়াছেন, আর যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এবং লেখন-ক্ষমতা একান্ত বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক। ভৈরব আচার্য্যের বাড়ীতে যখন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ রমেশ রমার একটী মাত্র কথায়—"তোমার লজ্জা করেনা, কিন্তু আমি যে লজ্জায় ম'রে যাই"—শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেইখানেই ভৈরব-দুহিতা ছেলে-কোলে লক্ষ্মী অতি অভদ্র নিষ্ঠুরের মত বলিয়া বসিল—"ও তাই বুঝি তুমি মরেছ রমা-দি।" আর কোথাও এই পল্লী-লক্ষ্মীটীর সন্ধান পাওয়া যায়না। কিন্তু একান্ত অযত্নে

দুই বিন্দু কালি ছুঁড়িয়া শরৎচন্দ্র যে একটী রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা হয়না। সন্ন্যাসী শ্রীকান্ত অনিচ্ছায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে, তখন হঠাৎ একটী দশ এগার বছরের মেয়ে সজল চোখে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে, যার দিদি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে এবং বাপের বাড়ী না যাইতে যাইতে যে নিজেও ঐরূপে প্রাণত্যাগ করিবে; শ্রীকান্ত তাহার জন্য একখানি বেয়ারিং চিঠি ছাড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা আমাদের অন্তরে কত না সহানুভূতি আকর্ষণ করে!

সমাজে যাহারা অনাদৃত, ঘৃণ্য তাহারা শুধুই ঘৃণ্য নহে—তাহাদের ভিতরেও যে মনুষ্যত্ব আছে। সময় এবং সুযোগ পাইলে তাহারাও যে সমাজের লোকের সহিত একাসনের দাবী করিতে পারে শরৎচন্দ্র ইহা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার সৃষ্ট সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, পিয়ারী, অন্নদা, অভয়া ইহারা নারী হিসাবে কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে একান্ত সংরক্ষণশীল (Conservative) একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সাবিত্রীর নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবনে শুধু শুভ্র শুচিতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন, যাহার রূপের খ্যাতিতে তিনি মুগ্ধ, বিবিধ ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া যাহার সতীত্বের তিনি উপর্যুপরি পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহার নারীত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে তিনি দারুণ বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। লুপ্তস্মৃতি অতীতের মুহূর্ত্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রেমাস্পদের দৃষ্টিসুখ হইতে পর্য্যন্ত তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। চন্দ্রমুখী—যাহার সুপ্ত নারীত্ব দেবদাসকেদেখামাত্রই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—আজীবন প্রেমের বেদীমূলে আত্মশুদ্ধির তপশ্চারণ করিয়াছে যে, তাহাকে তাহার শেষ সাধ—দেবদাসের অন্তিমে সেবা ও দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী—যে শিশুকালের পুতুল খেলায় শ্রীকান্তকে বঁইচি মালায় বরণ করিয়াছিল, যাহার একনিষ্ঠতার ভিতর পিয়ারী প্রতিনিয়ত আত্মহত্যা করিতেছিল, যাহার অন্তরে বুভুক্ষু মাতৃত্ব মাথা কুটিয়া মরিতেছিল, নারীসুলভ সঙ্কোচ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে একান্ত প্রার্থীর মত তাহাই প্রিয়তমকে জানাইয়াছিল—তাহার জীবনও নারীত্বের দিক্ দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেই অন্নদা দিদি! পতিব্রতার প্রতিমূর্ত্তি যাহাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, দারিদ্র্য, দুঃখ সমুদয় অঙ্গাভরণ করিয়া গঞ্জিকা সেবী নারীঘাতী স্বামীর যে নিরন্তর সেবা করিয়াছে, সহিষ্ণুতায় যে অতুলনীয়, সেও সমাজের চক্ষে হইয়াছে কুলটা। আবার রমা। শৈশবে ছেলেখেলার মত যাহার বিবাহ হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই যে বিধবা হইয়াছিল, পাঁচ বৎসরের মেয়ে রমা রমেশের মাতৃবিয়োগ-দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল—"রমেশদা, তুমি কেঁদনা। আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ ক'রে নেব।" বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসপটে যাহার অতি সুন্দরমূর্ত্তিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কাহার? কিন্তু তাহার সেই রিক্ত জীবনকে সামাজিক আবেষ্টনের ভিতর সার্থক করিয়া তুলিবার কোন সম্ভাবনা কোথায়? তাই অন্তর যখন তাহার রমেশের প্রতিটি সৎকার্য্যে তাহাকে নিরন্তর সেইদিকেই টানিতেছিল তখন "যিনি সব জানেন, সেই জ্যাঠাইমা" তাহাকে রুগ্ন দেহে বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে টানিয়া লইয়া চলিলেন। এই খানে যে নিখুঁত Tragedyর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে শরৎচন্দের অপরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'বড় দিদি' ও 'হেমনলিনী' দুইটী করুণ রূপ! যিনি বৈধব্যদশায় নিষ্ঠা এবং আচারকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিয়াছিলেন, 'আপন ভোলা' এই বাঁদরটাকে অতিমাত্রায় অনুকম্পা—করুণা করিতেছিলেন, তাঁহারই অন্তরলোকে—অন্ধকার প্রদেশে সহসা ক্ষণিকের বিদ্যুতচমকে যাহা দৃষ্ট হইল তাহাতে সেখানকার হাহাকার জলজল করিয়া উঠিল। আর হেমনলিনী দারুণ ব্যর্থতার দুর্জ্জয় অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল "তখন মনে ছিল না গুণীদা!" শরৎচন্দ্র একান্ত উদাসীনতার সহিত এই সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য, তাঁহার সমবেদনার অশ্রু আমরা না দেখিয়া বিস্মিত হইতে পারি সত্য, কিন্তু এই নিরপেক্ষতার ভিতর দিয়া যে গুরুতর সমস্যাগুলির সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে অস্থির, ব্যাকুল করিয়া তুলেনা কি!

টলষ্টয়, ডষ্টয়ভাস্কি'র ন্যায় পতিত, ভ্রষ্ট, সমাজপিষ্ট ক্লিষ্ট মানবের অপূর্ব্ব বাস্তব চিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁহার লেখায় নাই টলষ্টয়, ডষ্টয়ভাস্কি'র আইডিয়ালিজ্‌ম্।

তাদের পরমাশ্চর্য্য ভাবদৃষ্টি—যাহা কালোকে সাদা করিয়া তোলে, যাহা যাহা পাথরের মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগায়, এই মত কতদূর সুসহ তাহা বলা কঠিন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে উচ্চাঙ্গের বাস্তবতা আদর্শবাদের সংমিশ্রণ ছাড়া সম্ভব নহে। যদ্যপি তিনি বাস্তবতায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে আদর্শবাদে তিনি হীনপ্রভ হইলেন কি করিয়া। সাবিত্রীর নামে যে উপীনদা খড়্গহস্ত, সেই 'পাথরের দেবতা'ই কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইলেন সেই সাবিত্রীর সেবা লইয়া। সেই সাবিত্রী হইল তাঁহার ভগ্নি। আমরা যাহাকে দুঃসাহসিকতা মনে করি—আদর্শবাদের পর্য্যায়ে যদি তাহাকে রক্ষা করি, তবে দেখিতে পাই যে রাজলক্ষ্মী যে গ্রামের মেয়ে, পিয়ারী হইয়া সেই গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে সে ফিরিয়া আসিল। নিসম্পর্কীয় এক পুরুষকে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বামীত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ এই দৃশ্যটী চমকপ্রদ, অথচ চিত্তাকর্ষক। আর চন্দ্রমুখী—বারাঙ্গনা উত্তরকালে মমূর্ষু দেবদাসের স্মৃতিপটে যখন দেখা দিল তখন তাহার আসন হইল ঠিক্ দেবদাসের মায়ের পার্শ্বে। সংরক্ষণশীল সমাজের ব্রাহ্মণ-কুমারের কি শক্তি ছিল যাহাতে তিনি এই অঘটন ঘটাইতে পারেন। এখানে শরৎচন্দ্র স্রষ্টা, শিল্পী। তিনি সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী। সমস্যাসৃষ্টি বিষয়ে মৌলিকতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই সমস্যা বিবিধ চরিত্রের ঘটনা পরম্পরায় হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। চরিত্র সৃষ্টি ও বিশ্লেষণে তিনি অপরাজেয়। বিশেষতঃ স্ত্রী-চরিত্রগুলি তাঁহার সমুদয় গ্রন্থেই বিশেষ প্রাণ-বান, জীবন্ত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক সেক্সপীয়র সম্বন্ধে কোন সমালোচক বলিয়াছেন "Shakespear's women often take the initiative."—এই মত শরৎ চন্দ্র সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। তাঁহার সৃষ্ট পিয়ারী রাজলক্ষ্মীর রাজসিক সংস্করণ এত সবল, এত উজ্জ্বল যে ক্ষণে ক্ষণে শ্রীকান্ত যেন তাহার নিকট ম্লান জ্যোতিঃ হইয়া পড়িয়াছে। অভগ্নার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তেজদৃপ্ত বচনে শ্রীকান্ত বিহ্বল হইয়া উঠে। বিজয়ার বাক্‌যুদ্ধে, চটুলতায় ডাক্তার নরেন পরাভূত হয়। এমন কি টগর বোষ্টমীর রক্তচক্ষুর নীচে নন্দ মিস্ত্রীও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। জ্যাঠাইমার উপদেশে রুড়কী কলেজের ছাত্র রমেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়। উচ্চশিক্ষিত বিলাতী হাওয়াপুষ্ট অধ্যাপক প্রবরও ভট্টচার্য্য-কন্যা উষার মৃদুদৃঢ়তায় দিশেহারা হাইয়া যান। কমলের তর্কজালে প্রবীন আশুবদ্দির জ্ঞান গরিমা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। বস্তুতঃ নারী-চরিত্রে তিনি যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাহার মূলে রহিয়াছে অভিজ্ঞতা ও দরদ। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথাযথ প্রকাশ করিলে তিনি হইতেন photographer বা আলোকচিত্র-শিল্পী। সে প্রকাশ হইল সাধারণ সত্য। কিন্তু তিনি অভিজ্ঞতাকে অন্তরের সুষমায় বিভূষিত করিয়া যে সত্যের পরিবেশন করিয়াছেন তাহা যথার্থ সত্য। এখানে তিনি প্রকৃত শিল্পী।

সমাজ-জীবনের চিত্র অঙ্কনেও তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। পল্লীসমাজের যে নিখুঁত চিত্রখানি একের পর এক তিনি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিটী চরিত্রের যেন হৃদস্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়, পল্লী-জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত, পল্লীসমাজের কোন অভিজ্ঞতা না লাভ করিয়াই বিরাট আদর্শকে সংস্কারের কাযে লাগান যে কত দুরূহ তাহা তাঁহারা জানেন। আর রমেশের চরিত্রে তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বড় ব্যথায় একদিন রমেশ জ্যাঠাইমাকে বলিয়াছিল "এদের ক্ষমা করলে ভাবে ভয়ে পেছিয়ে গেল। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়।" পল্লীগ্রামের পরশ্রীকাতর কূপমণ্ডুকদের এমন সজীব করিয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহাদের প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িলেই বোধ হয় যে ইহারা আমাদের পরিচিত—ইহাদের যেন কোথায় দেখিয়াছি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসম্ভার হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত বাহির করিতে গেলে ইহাই পাওয়া যায় যে ঈশ্বর থাকুন আর না থাকুন মানুষের কল্যান-সাধনই জীবনের সার্থকতার সর্ব্বোচ্চ সোপান। প্রয়োজনবোধে তিনি গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোন ধর্ম্মকেই নিন্দা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আসলে কিন্তু কোন ধর্ম্মের নিন্দা করা তাঁহার ন্যায় উদারহৃদয় সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নহে। ভাবের

আবেগে, ঘটনাপরম্পরার সংযোজনায় যাহাই প্রয়োজন হইয়াছে, প্রেরণার অনুশাসনে তিনি তাহাই করিয়াছেন মাত্র। রাসবিহারী একান্ত বিরক্ত হইয়া যেদিন বিলাসকে বলিল "ব্রাহ্মই হই আর যাই হই কৈবর্ত্ত তো ইত্যাদি" সেদিন ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্লেষ শরৎচন্দ্র করেন নাই। রাসবিহারীরই চরিত্র সুস্পষ্ট করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে তাহাকে দিয়া এই উক্তি তিনি করাইয়াছেন। আবার 'গৃহদাহ'তে অচলাকে অশেষ দুঃখ দিয়া যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহাও সত্য নহে। হিন্দুসমাজে অতটা স্বাধীন একটী সংস্কারসম্পন্না তরুণীকে তিনি পান নাই বলিয়াই অচলা ও তাহার পিতাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

মনিষী র‌্যঁমা রোঁল্যা প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সত্যই শরৎ-সাহিত্যের স্থান তত উঁচে কি না, এবং প্রকৃত সাহিত্য হিসাবেই বা শরৎ-সাহিত্যের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে কি না বিদগ্ধ জন তাহার বিবেচনা করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

—:*:—

দুঃখের সূক্ত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ

দুখের ছবি দেখে দেখে, দুখের কারণ খুঁজেছি ঢের,
খুঁজে' খুঁজে' এবার হেতু কতক তাহার পেয়েছি টের!
ভাগ্যহীনে নসিব নাশে,
এড়ায় কে সে 'অক্টোপাশে'?
জ্বালার বাতি জেলে জেলে টান্‌তে যে হয় জ্বালার জের,
জীবন-পাতায় একই কথা লিখ্‌তে যে হয় হায়রে ফের!

সকল প্রকৃতিতে কেবল বাজে নাকি প্রেমের গান!
ব'লে গেছেন অনেক গুণী আছে যাঁদের মহৎ মান।
নয় এ জগৎ ছোটর তরে,
শুনছি সদা পুলক ভরে,
শক্তি যাঁদের আছে বিপুল, ধরায় শুধু তাঁদের স্থান!
ভাগ্যপ্রেমের পরিচয় তো পেল অনেক চোখ ও কান।

সেদিন আমি কি দেখেছি, শুনবি তোরা, শুনবি ভাই?
ছড়ায় প্রাতে কৃষক বীচি, মাঠের বুকে সকল ঠাঁই।
অপরাহ্ণে এসে দেখি,
কোথায় গেল? একি! একি!
চড়াইগুলো খায় তা' খুঁটি' অধিক বাকি নাইরে নাই,
নূতন ক'রে ছড়ায় খুশী এমন চাষা কোথায় পাই?

গুটি কয়েক ডিম পেড়েছে নিমগাছে ওই বুলবুলি,
হাঁড়িচাঁচা এসে সেদিন খেল যে প্রায় সবগুলি;
চেঁচিয়ে কাঁদে বুলবুলি-মা,
সুখের কি তা'র আছে সীমা?
ল্যাজ ঝোলা ওই পাখীগুলি উচ্চে তা'দের ল্যাজ তুলি'—
দেয় বাহবা হাঁড়িচাঁচায়, সবাই তা'দের প্রাণ খুলি'।

নিয়তি ভাই, এমনি ক'রেই খাচ্ছে অনেক খাচ্ছে গো,
রক্তে তা'দের হচ্ছে নদী, ভেসে অনেক যাচ্ছে গো।
ছোট্ট যা'রা দৃষ্টি এড়ায়,
তা'রাই দেখি সৃষ্টি বাড়ায়,
অ-দৃষ্টরাই, অদৃষ্টেরি বাড়িয়ে মান বাঁচ্‌ছে গো,
বাগিয়ে ভুঁড়ি দিচ্ছে তুড়ি, মঞ্চোপরি নাচ্‌ছে গো!

‘কুইন মেরী’

গত ২৬শে মে সাদাম্‌টন বন্দর থেকে ‘কুইন্ মেরী’ জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন ‘বড় জাহাজ তৈরী’ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটী বিশিষ্ট স্থান করেচে।

আটলান্টিক সাগরে পাঁচটী জাতি খেয়াপারের জাহাজকে কত বড় করতে পারে তাই নিয়ে অনেকদিন থেকেই প্রতিযোগিতা করচে। এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েচে ব্যাপার যে সবাই ভাব্‌চে জাহাজ আর কত বড় করা যেতে পারে। বৃহৎকায় জাহাজ তৈরীর একটা কি সীমা নেই?

এই সব বড় জাহাজ তৈরী করতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়। কিন্তু তার তুলনায় আয় হয় কেমন?

আটলান্টিক খেয়াজাহাজের এ প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ করে জার্ম্মাণি।

ভার্সাইএর সন্ধি অনুসারে জার্ম্মাণি মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, তা হারিয়ে ফেল্লে। ১৯৩০ সালে তারা ‘ব্রিমেন’ আর ‘ইউরোপা’ বলে তুখানা খুব বড় জাহাজ সমুদ্রে ভাসালে। আটলান্টিকে তখন এত বড় জাহাজ আর ছিল না। বাইশ বছর ধরে গ্রেট ব্রিটেন এ-ক্ষেত্রে সকলের বড় ছিল ‘মোরিটানিয়া’ জাহাজের দরুণ। বাইশ বছরের মধ্যে এর চেয়ে বড় জাহাজ আর তৈরী হয় নি।

তারপর ইটালি কতগুলি বড় জাহাজ তৈরী করলে, তাদের মধ্যে ‘রেক্স’ আর ‘কন্টি ডি সাভোরিয়া’ প্রসিদ্ধ। ফ্রান্স ‘নরম্যাণ্ডি’ বলে খুব বড় একখানা জাহাজ তৈরী করে এদের হারিয়ে দিলে। ‘নরম্যাণ্ডি’র সমান বড় জাহাজ তখন পর্য্যন্ত কেউ আটলান্টিকে নামায় নি।

এর উত্তর দিলে গ্রেট্ ব্রিটেন ‘কুইন মেরি’ জাহাজে। কিন্তু এরই মধ্যে শোনা যাচ্চে মার্কিন যুক্তরাজ্যে তুখানা অতিকায় জাহাজ তৈরী হচ্চে, এরা ‘কুইন মেরি’র চেয়ে তত বড় হবে, ‘মোরিটানিয়া’র চেয়ে ‘কুইন্ মেরি’ যত বড়।

এই প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়? এই সব ভাসমান হোটেল তৈরী করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তার সুদ পোষাবে কি না এ সন্দেহ এখন অনেকের মনে উঠেচে।

‘নরম্যাণ্ডি’ জাহাজ তৈরী করে ফ্রান্স যে লাভবান হয়নি, একথা ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারো অবিদিত নেই।

‘নরম্যাণ্ডি’ জাহাজ তৈরী যারা করেছিল, তাদের তুবার জাহাজখানা মেরামত করতেই অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে যায়। বিলাসের যোগে উপবায়ন-বাদ পড়েনি ‘নরম্যাণ্ডি’ জাহাজে। বেগও ছিল খুব বেশী, সে হিসেবে দেখতে গেলে এর চেয়ে বেগবান জাহাজ জার্ম্মাণির ‘ব্রিমেন’ও নয়।

কিন্তু প্রধান দোষ এর দাঁড়ালো এই যে এর বিরাট ইঞ্জিন চলবার সময় জাহাজখানা এত কাঁপাতো যে বাধ্য হয়ে তুবছর পরে ইঞ্জিন খুলে ফেলে আবার নতুন করে অন্য ধরণের ইঞ্জিন বসাতে হোল। তাতেও দোষ একেবারে

গেলনা—বছর খানেক পরে ইঞ্জিন আবার খুলতে হয়, আবার বসাতে হয়। গভর্ণমেন্ট অর্থসাহায্য না করলে জাহাজ কোম্পানীকে এতে বিপুল ক্ষতিস্বীকার করতে হোত।

জার্ম্মাণ ও ইটালিয়ান গভর্ণমেন্টও নিজেদের দেশের জাহাজ কোম্পানীকে এর জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ লোকে বলেন, আটলাণ্টিক খেয়াজাহাজ বেশী বড় করে আর কোনো লাভ নেই। এর একটা সীমা আছে, এবং বর্ত্তমানে সে সীমার কাছাকাছি এসে পৌছেচে সবাই। চাহিদার চেয়ে জিনিষের যদি বাজারে সরবরাহ বেশী হয়, তবে ব্যবসায়ীকে লোকসান সহ্য করতে তো হবেই। এ ক্ষেত্রেও ক্রমে সেই দশা হয়ে উঠচে।

আর দু-তিন ঘণ্টা আগে যাত্রীকে সাদাম্‌টন থেকে নিউ ইয়র্কে পৌছে দেবার জন্যে একরাশ টাকা ব্যয় করেই বা কি হবে? অর্থনীতির দিক থেকে শুধু নয়, বিজ্ঞানের দিক থেকেও দেখলে এতে আর সুবিধে নেই। কারণ বিমান পথে যখন যে-কোনো বর্ত্তমান বেগবান জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ সময়ে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করা যায়, তখন জাহাজে আর অনর্থক অর্থ ব্যয় কেন?

বাইরের লোককে এরূপ স্বীকার করতেই হবে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে তারাই সকলের চেয়ে বেশী সক্ষম, যাদের অর্থব্যয়ে 'কুইন মেরি' তৈরী হয়েচে। যারা নিজেদের ও শেয়ার-হোল্ডারদের টাকা এত বড় বিশাল জাহাজ তৈরী করতে লাগিয়েচে বা যারা বিশ্বাস করে যে এই জাহাজ

কেবিন অবজারভেসন লাউঞ্জ এবং কক্‌টেল বার

ইঞ্জিনের গতি বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতাই এখন প্রধান। ঘণ্টায় দু-তিন মাইল গতি বৃদ্ধি করার ব্যাপার সোজা নয়, কারণ এই সব বড় বড় জাহাজ এক একটী বড় বড় হোটেলের সমান। এদের জোরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিশেষতঃ আটলাণ্টিকের ঢেউ কাটিয়ে—তার আবার প্রতিযোগিতা! সেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে আটলাণ্টিকের 'ব্লু রিবন' লাভ করা বড় সোজা নয়।

চালিয়ে লাভ হবে বা তাদের অর্থব্যয় সার্থক হবে তারাই জানে কেন এ জাহাজ তৈরী হোল। তাদের জিজ্ঞাসা করাও হয়েছিল একথা।

তারা বলে, অন্য জাহাজের কথা আমরা জানিনে, কিন্তু 'কুইন মেরি' সে ধরণের প্রতিযোগিতার ফলে উৎপন্ন জাহাজ নয়। আমরা হুজুগে পড়ে কোন কাজ করিনে। ১৮৪০ সালে আমাদের তৎকালীন মালিক স্যামুয়েল কুনার্ড 'ব্রিটানিয়া'

জাহাজ তৈরী করান, তখন এত বড় জাহাজ কেউ কখনো চোখেও দেখেনি—তখন তো আর এমন প্রতিযোগিতা ছিলনা, কিন্তু তখনও তো আমরা বড় জাহাজ তৈরী করতে পয়সা খরচ করেছিলাম ?

আমাদের উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জাহাজ-নির্ম্মাণের আধুনিক রীতির সুযোগ

"এ্যাভনে সন্ধ্যায়"—শিল্পী এ নিউটন

গ্রহণ করে লণ্ডন-নিউ ইয়র্কগামী যাত্রীদের আরাম ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের ফার্ম্মের সেই প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবো।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে জাহাজের আকার ও গঠন প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হাইড্রো-মেকানিক্স্ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সমুদ্রগামী জাহাজের ইঞ্জিন তৈরীর অনেক উন্নতি হয়েচে। আমাদের লাইনের জাহাজ ছিল সেকেলে ধরণের, অথচ জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও ইটালিতে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাহাজ তৈরী হয়েচে গত ১৫ । ১৬ বছরের মধ্যে। সুতরাং আমাদের নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা আর সম্ভবপর নয়।

মিতব্যয়িতার দিক থেকে দেখতে গেলেও এতে আমাদের সুবিধা আছে। সাদাম্‌টন-নিউইয়র্ক লাইনে আমাদের তিনখানা জাহাজ চলছিল, আমরা সেখানে দুখানা জাহাজে আজ চালাতে চাই। তিনখানা জাহাজের যাত্রী দুখানা জাহাজে ধরাতে গেলে জাহাজের আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তার গতিও বৃদ্ধি করতে হবে। এই সব দিকে চোখ রেখেই 'কুইন মেরী' তৈরী হয়েচে।

দুখানা জাহাজ চালাতে আমাদের খরচ অনেক কম পড়বে, অথচ যাত্রীদেরও সময়ের সাশ্রয় হবে। বড় জাহাজে বেশী জায়গা থাকার দরুণ যাত্রীদের আরামের সুব্যবস্থা-গুলিও ভালভাবে করতে পারা যাবে। অবিশ্যি এতে যদি আমরা আটলাণ্টিক খেয়াজাহাজের প্রতিযোগিতার 'ব্লু রিবন্' লাভ করি, তাতে বিজ্ঞাপনের দিক থেকে খুব সুবিধে হবে, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য তা নয়। 'ব্লু রিবন্' পাওয়ার জন্যে এত পয়সা খরচ করবে, আমাদের ফার্ম্ম এত কাঁচা নয়।

কুনার্ড-হোয়াইট ষ্টার লাইন কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্যর পার্সি বেটস্ তাঁর উপরোক্ত যুক্তির সঙ্গে আর একটা কথা জুড়ে দিয়েচেন, যেটা অনেকটা হেঁয়ালির মত শোনাবে। তিনি বলেন, 'কুইন্ মেরি'র মত আর একখানা জাহাজ তাঁরা যখন তৈরী করে জলে ভাসাবেন, তখন দেখা যাবে ব্যবসানীতি ও অর্থব্যয়ের দিক থেকে তাঁদের জাহাজ দুখানা সকলের চেয়ে ছোট এবং সকলের চেয়ে কম বেগবান। সেই 'ব্যবসানীতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে সীমা, তা ছাড়িয়ে গেলেই অমিতব্যয়িতার বিপদজনক পথে আমাদের পা দিতে হবে।

স্যর পার্সি বেটস্ তাঁর নিজের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু এটাও ভেবে দেখবার বিষয় যে এ পর্য্যন্ত 'কুইন্ মেরি'র জুড়ি যে জাহাজ-খানা তৈরী হবার কথা, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাকে ভাল করে বুঝতে হলে আটলাণ্টিক খেয়াজাহাজগুলি কি কাজ করে এবং গত একশত বৎসরের মধ্যে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করবার ক্ষেত্রে কি কি উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সাদাম্‌টন্ বন্দর থেকে দুপুরবেলা যে জাহাজ নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, সোলেণ্ট নামক সমুদ্রের ছোট খাড়ি দিয়ে তাকে খুব আস্তে যেতে হয় প্রায় কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত।

কুইন মেরী—সম্মুখ দৃশ্য

নিড্‌লস্-এর বাতি-ঘর ছাড়িয়ে আইল-অফ্-ওয়াইটকে বাঁদিকে রেখে অল্প দূরেই খোলা জায়গা ইংলিস্-চ্যানেল। এই চ্যানেলের পথে চেরবুর্গ পর্য্যন্ত ৬০ মাইল সে খুব জোরে যেতে পারে। চেরবুর্গ বন্দরে ইউরোপের অন্য অন্য দেশের যাত্রীদের জন্যে দু-তিন ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতে হয়।

সাদাম্‌টন ছেড়ে যাওয়ার আট ঘণ্টা পরে জাহাজ প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ আটলাণ্টিকের পথে যাত্রা সুরু করে—চেরবুর্গ থেকে আম্‌ব্রোজ চ্যানেল পর্য্যন্ত প্রায় ৩১৬০ মাইল সমুদ্রপথ।

আম্‌ব্রোজ চ্যানেল থেকে নিউ ইয়র্ক ডক্ পর্য্যন্ত জল-পুলিশ ও কোয়ারাণ্টাইন আইনের গোলযোগের জন্যে আরও ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। সুতরাং আটলাণ্টিকে পাড়ি দেওয়ার সময়ের সাথে আরও প্রায় তেরো ঘণ্টা যোগ করলে সমস্ত জলযাত্রার প্রকৃত সময়ের আন্দাজ পাওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন গীবনস্

১৯২৯ সালে 'মোরিটানিয়া' জাহাজ প্রথমবার যখন আটলাণ্টিকের খেয়া দেয় তখন ২৬ নট্ প্রতি ঘণ্টায় গিয়ে মোট ৪ দিন ২১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে সাদাম্‌টন থেকে নিউ ইয়র্কে পৌঁছায়। সেখানে অন্ততঃ ছ'দিন থাকার পরে তবে প্রত্যাবর্ত্তন সুরু করে। যাত্রী ও মাল নামাতে এবং

জাহাজের কলকব্জা পরিষ্কার করতে যায় তিন দিন। আর তিন দিন লাগে ইঞ্জিনের তেল পুরতে ও নতুন যাত্রী ওঠাতে। সুতরাং দুখানা জাহাজ এ লাইনে যদি চালানো যায়, তাতে কুলায় না। কারণ ১৫ দিন অন্তর জাহাজখানার নিউ ইয়র্ক যাওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্বে এই লাইনে চারখানা জাহাজের কম কাজ চলতো না। ১৮৪০ সালে 'ব্রিটানিয়া' জলে ভাসানো হয়। তখনকার আমলে 'ব্রিটানিয়া' যত বড়ই হোক, এখনকার তুলনায় কিছুই নয়। আরও তিনখানা এই আকৃতির জাহাজ ক্লাইড্ নদীর জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানায় কুনার্ড কোম্পানীর জন্যে তৈরী হয়। তখনকার জাহাজ চলতো প্যাড্‌ল দ্বারা, 'স্ক্রু'র তখনও আবিষ্কার হয় নি।

'ব্রিটানিয়া' এই পথ ১৪ দিন ৮ ঘণ্টায় অতিক্রম করে এবং তখন এই সময়ই অল্প বলে গণ্য হয়। এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে আর কোনো জাহাজ সাদাম্টন থেকে নিউ ইয়র্ক যেতে পারতো না।

বিগত নব্বুই বছরের মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণরীতির এত উন্নতি হয়েছে, যে ১৪ দিনের জায়গায় এখন জাহাজ ৪ দিনে যায়। এদিকে ইংলিশ চ্যানেল ও চেরবুর্গ, ওদিকে আম্‌ব্রোজ চ্যানেল ও নিউ ইয়র্কের ডকে জাহাজ বাধা হয়ে যতখানি বিলম্ব করে, সেটুকু বাদ দিয়ে আট্‌লাণ্টিক সমুদ্র পথে জাহাজ যায় মাত্র ১২০ ঘণ্টা।

হোয়াইট ষ্টার ও কুনার্ড লাইনের প্রত্যেক জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীকে উপদেশ দেওয়া আছে যে ১২০ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র পার হতে হবে। প্রত্যেক জাহাজের কাপ্তেন এই সময়ের মধ্যে পাড়ি দিতে চেষ্টা করেন, তবে ঝড় বৃষ্টি বা অন্য দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা স্বতন্ত্র। সমুদ্রবক্ষে ঘন কুয়াশা হোলে জাহাজ অনেক সময় পুরো দমে চালানো যায় না। যে সময় বরফের চাপ উত্তর সমুদ্র থেকে দক্ষিণ দিকে যায় তখনও খুব সাবধানে জাহাজ চালাতে হয়।

হোয়াইট ষ্টার লাইনের 'ম্যাজেষ্টিক্', 'ওলিম্পিক' ও 'হোমারিক্'—এই তিনখানা জাহাজ এবং কুনার্ড কোম্পানীর তিনখানি জাহাজ 'একুইটানিয়া' 'মোরিটানিয়া' ও 'বেরেনজারিয়া' এই পথে বরাবর চলে আসছিল—কুনার্ড কোম্পানী হঠাৎ মতলব করলে যে দুখানা জাহাজে কাজ চালাবো। 'একুইটানিয়া' ও 'বেরেণজারিয়া' জাহাজ দুখানা ওরা কিছুকাল চালিয়ে দেখলে যে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়। জাহাজ দুখানা খুব বেশী দ্রুতগামী নয়, নিউ ইয়র্ক বন্দরে সবশুদ্ধ দু'দিন মাত্র জাহাজ বিলম্ব করতো, এতে অর্দ্ধেক যাত্রী উঠতে পারতো না। উত্তমরূপে পরিষ্কার না করার জন্যে জাহাজের কলকব্জাও খারাপ হয়ে যেতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন স্যার এড্‌গার্ড ব্রিটেন

'একুইটানিয়া' জাহাজের সঙ্গে চালাবার জন্যে তাই 'কুইন মেরি' জাহাজের সৃষ্টি। 'মোরিটানিয়া' ও 'বেরেণজারিয়া' ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তাদের লোহালক্কড় অন্য জাহাজ তৈরী করতে লাগানো হবে।

একদল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আছে, তারা জাহাজে যতক্ষণ

থাকে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য সমুদ্রকে ভুলে থাকা—কারণ সমুদ্রের ঢেউয়ের দুলুনি তারা সহ্য করতে পারে না। এ দল বাদ দিয়েও সমুদ্র যাত্রায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রথম ও প্রধান যে অসুবিধা, সে হোল এর নিষ্ক্রিয়তা।

যত বড় হোটেলই হোক, এবং তাতে যত আরামই থাকুক, সপ্তাহের পরে সপ্তাহ যদি হাত পা কোলে করে হোটেলের মধ্যেই বসে থাকতে হয় তা কারো ভাল লাগেনা। 'কুইন মেরি' জাহাজের মধ্যে আটকে থাকা মানে সহরের মধ্যে কোনো একটা হোটেলে চুপ চাপ বসে থাকা।

তবুও কোম্পানী যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে। জাহাজে দুটো গির্জ্জা আছে, একটা রোমান ক্যাথলিক আর একটা অ্যাংলিকান। ইহুদিদের জন্য পৃথক ভজনালয় আছে। দুটো সাঁতার দেবার পুকুর, কুকুরের বেড়াবার জন্যে ডেক, ফুলের বাগান, বড় বড় ব্রিটিশ চিত্রকরের আঁকা ছবি ওদের ডাইনিং রুমে ঝুলছে দেওয়ালে। কিন্তু এসব বাইরের ব্যাপার, আসল জিনিসটা হচ্ছে এই যে 'কুইন মেরি' তার নির্দিষ্ট কাজ করে উঠতে পারবে কি পারবে না। অর্থাৎ দুখানা জাহাজে তিনখানা জাহাজের কাজ চলবে কি না। যদি তা সম্ভব হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে 'কুইন মেরি'র চেয়েও বড় জাহাজ তৈরী হবে কি না?

কুনার্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা বলেন, তা হওয়া অসম্ভব নয়। আটলান্টিকের পথে যত বড় জাহাজই হোক, ভাসানো যেতে পারে। সুয়েজের পথে তা চলে না, কারণ ও পথে জাহাজের আয়তন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সুয়েজ খালের প্রস্থের সংকীর্ণতা দ্বারা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

——:*:——

বৌ-পরিচয়

শ্রীদেবব্রত ঘটক

স্নিগ্ধা

স্নিগ্ধা, তুমি স্নিগ্ধ বটে
বাসতে পারো ভালো,
প্রিয়ার উপযুক্ত তুমি
একটু শুধু কালো।

পান্না

ঝলমল বেশটা,
কুঞ্চিত কেশটা,
সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা
পান্না,
হাসি মধু-বৃষ্টি,
সুধা আঁখি-দৃষ্টি,
গান সম মিষ্টি
কান্না.—
সব তার ভাল শুধু
বিশ্রী রান্না।

মঞ্জুলিকা

মঞ্জুলিকা নামটি তাহার
কোঁকড়া কালো চুলের বাহার,
রত্ন এমন জুটবে যাহার
হয় সে রাজাধিরাজ,
না হয়তো সে শ্রেষ্ঠ কবি,
ছন্দে মধুর আঁকবে ছবি,—
আঁকবে ছবি দেবে যাহা
উর্ব্বশীকে লাজ!
এমন মণি রাখবো কোথায়
সমস্যা তাই আজ।

শান্তি

সুন্দরী শান্তি,
জানে ভাল নৃত্য,
ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে
মুগ্ধ এ চিত্ত !
গৃহকাজে সুনিপুণা,
লেখাপড়া জানা-শুনা ;
প্রকৃতিটা কিছু ঝাল
আর কিছু তিক্ত !
এইটুকু দোষ শুধু
নহিলে সে ভৃত্য।

শুভ্রা

শুভ্রারে আমি বাসিয়াছি ভাল, তাহারেই আমি চাই,
শুভ্রা কিন্তু বৌদিকে নাকি বলিয়াছে --আশা নাই।
যদি হতে পারি আই-সি-এস বা নিদেন ব্যারিষ্টার,
তবেই তাহারে অঙ্গুরী দিতে পাব আমি অধিকার।
বামন হইয়া চাঁদে হাত যেন—বাসিয়াছি ভাল কাকে?
হতাশ হইয়া ধরিয়াছি তাই অগত্যা 'অনিতাকে'।

অনিতা

কুমারী অনিতা বিকেল বেলায়
পার্টনার করে টেনিস খেলায়
আমারে নিত্য, চিত্ত মাঝারে ঝঙ্কারি উঠে গান ;
সোজা মারে যদি মিস্ করি কভু,
হাসিয়া উড়ায়, বকে না সে তবু,
মোর দোষে সেট্ নষ্ট হলে সে চাপড়ায় পিঠ হেসে ;
সর্পিল-বেগে চেয়ে মোর পানে
হাসিয়া অনিতা কটাক্ষ হানে,—
সহিতে না পারি হৃদয়ের আশা কহি তারে অবশেষে,—
সলজ্জ চেয়ে অনিতা যা বলে
সে-কথা শুনিয়া বসি ভূমিতলে, —
টেনিস্-অপোনেণ্ট্ 'জীবন দে-'কে সে করিয়াছে
হিয়া দান !

বিয়ে এবং তৎপরে

বিয়ের রাতে আঁখির পাতে ঘুম আসেনা মোর,
স্বপনমাঝে ভাস্‌ছি যেন, লাগছে নেশার ঘোর !
মালবিকা, পত্রলেখা,
বেবী, বেলা, মঞ্জু, রেখা
নয় কিছু নয়, আমার বধূর, 'অন্নাকালী' নাম,
বিদ্যা তাহার 'দ্বিতীয় ভাগ,' বাড়ী 'ভগ্নগ্রাম'।
মোটর-কারে চড়তে 'আন্নু' ভয় পেয়ে যায় বড়,
গান জানেনা, নাচ জানেনা—বেজায় জড়সড়।
মা বলে 'ও কর্ম্মে ভালো,
লক্ষ্মী আন্নু হোক্ না কালো,—'
রাত বারোটার আগে দেখা দেয়না কোন ছলে,
'এল্-ও-ভি-ঈ' শুন্‌লে আন্নু 'লজ্জা করে' বলে।

শ্রীদেবব্রত ঘটক

আপোষে মীমাংসা

শ্রীমতী সরযূ সেন

রুচি হয়েছে অতিষ্ঠ।

সে ছিল তার বাপ মায়ের পাঁচ নম্বরের মেয়ে, বড় ভাইও ছিল ছ'জন। সে-ই সবার ছোট বলে তার অনেক কিছু আবদার সবাই সয়ে যায়।

বড়ো বোনগুলো বড়ো না হতেই বরের ঘাড়ে বাহিত হচ্ছে দেখে রুচির অব্যবহিত বড়োটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নারীর অধিকারের সীমানা খানিকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল, অর্থাৎ সে স্কুল ছেড়ে কলেজে যেতে সুরু করে দেয়। তার ওপরে, ভাবী বর নির্ব্বাচনের ভার অনেকটা নিজে নেয়ায় তার বরটি হোল সব জামায়ের চেয়ে সুন্দর এবং আধুনিক।

রুচির রুচি ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে উঠে আর এক ধাপ উঁচুতে বাঁধা ছিল বটে, কিন্তু কি মুস্কিল, তার বাপ পাবে পেনসন আর ভাই দুজন যাবে বিলাত অর্থাৎ আয় কমবে, আর খরচ বাড়বে।

বড়ো দু'ভায়ের বিদ্যের জাহাজের সাজ-সরঞ্জামের বাহুল্যে তারা নিজেরাই বান চাল হবার যোগাড়; কেননা তাদের ডিগ্রি ও পদমর্য্যাদার অনুরূপ ভেক না হলে ভিখ্ মিলবে কেন?

এদিকে সেজ ভায়ের এনগেজমেণ্ট করা কনে এবার বি-এ পেরিয়ে বিয়ের আশায় তার বাগদত্তের স্বদেশ প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে।

পরের দুটীর আদর্শ সম্ভবতঃ আরো সুমহান বলেই তারা ইউরোপ যাওয়ার আগে কোথাও ধরা ছোঁয়া দেয়াকে নেহাৎ খেলোমি বলেই মনে করে।

কনিষ্ঠটি ত পট্টাপট্টি কারুকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না অর্থাৎ সে ভাবী কালের অধিবাসী, জরা জীর্ণ আধুনিক সেখানে অচল।

অবস্থা যখন এমনই তখন ফার্ষ্ট ক্লাশে ওঠা নাবালিকা রুচিকে পাত্রস্থা করবার কল্পনা যে বাপ-মার মাথায় আসতে পারে, একথা রুচির কল্পনাতীত বলেই সে অতিমাত্রায় বিস্মিত বিরক্ত ও বিপন্ন হয়ে বিপ্লবী হলো।

রুচির অতিষ্ঠতার কারণটা কিছু মাত্র কম নয়। ওর শিক্ষা দীক্ষার ভাবী সম্ভাবনার পক্ষে অবিচার ত হয়েছেই, ওর মার্জ্জিত রুচির মর্য্যাদাও তাঁরা রাখেননি।

রুচির মার প্রথম যৌবনের গঙ্গাজলের কি প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে এমন অনধিকার চর্চ্চার ঘূর্ণি তোলা উচিত ছিল, যে তার সখীর মেয়েকে পর্য্যন্ত তলিয়ে নেবে?

তাও আবার সেই মাননীয়া মহিলাটি তর্কের অবকাশ পর্য্যন্ত রাখেননি, একদম বন্ধুপ্রেমের অসতর্ক মুহূর্ত্তে কথা আদায় করে জীবন-যবনিকার আড়ালে সেই যে লুকিয়েছেন, জীবনের এপারে আর তার পাত্তা মেলার সম্ভাবনা নেই।

সেই ছেলেবেলাকার দিনে দশবার দেখা ছেলে টেবু—তার সঙ্গে খেলা করা ঝগড়া করা চলে বলে কি বিয়ে করাও চলে?—ছিঃ।

ওর উৎপাতের জ্বালায় রুচির একটা কালো কুকুরের নামই রাখা হয়েছে টেবি। অমন কেলেকেষ্ট—রুদ্রমূর্ত্তি উস্কো খুস্কো চুল—ডানপিটে ছেলেকে টোপর পরিয়ে সভার মধ্যে মালা দিতে হবে ভেবেই রুচির কান্না পাচ্ছে।

ওগো মাগো, এতই যদি মনে ছিল, আঁতুড়ে কি একটু নুনও জোটেনি?—

মা বলে,—ছেলেটি স্কলার, এন্‌জিনিয়ার হতে সখ,—আমরা পেছনে মুরুব্বি দাঁড়ালে সংসারে ও অনেক কিছু উন্নতি করে নেবে, আর ও যেরকম উদ্যোগী।

ওঃ, বয়ে গেল!—আজকাল পথে ঘাটে ঢের অমন ভালো ছেলে পাওয়া যায়। এতেই কী এমন অমূল্য নিধি বনে গিয়েছে যে ছেলের গঙ্গাজল মাসি একেবারে গলে গিয়ে

চুল টেনে সন্দেশ খাওয়া, শুকুতে দেয়া শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে বল বানানো, ভাঁড়ার লুটে চড়িভাতির ভোজ, নতুন লিচুর কলমের ডাল ভেঙে ছড়ি তৈরী, নতুন কেনা ছুরির ধার পরখ করতে সেতারের তার কাটা আর দেরাজের গা কেটে নাম লেখা, এমনি আরো হাজারো রকমের সত উদভট আজগুবি কীর্ত্তিকাণ্ড একদম ভুলে গেল?

কিছু দিতে হবেনা বলে তারা ভুলতে পারে, কিন্তু ভোলেনি রুচি, কিছুতে ভোলেনি তার বিনুনী সুদ্ধ চুল কেটে নেওয়া,—যা শোধরাতে তার পুরো দেড়টি বছর সময় লেগেছিল।

ঐ ছেলে? বুড়ো ধাড়ী হিংসুটে ঝগড়াটে দস্যি ছেলেকে কক্ষনো কোনো মেয়ে ভালোবাসতে পারে?

ক বছর কটক কলেজে পড়ে সে পীর হয়েছে না কি? ভারী ত বিদেশ থাকা,—দিল্লি না দিল্লী, চীন না জাপান—শিখেছে নিশ্চয় গাছে চড়া আর ডিগবাজী খাওয়া।

ওকে বিয়ে? কক্ষনো না।

রুচির বিয়েরই দরকার নেই। ওরা যদি দয়া করে ওকে পড়ায় ত সেই ঢের, ও আর কিছু চায় না। নিজের জন্যে আর কোনো খরচ করতে ও দেবেনা, এমন কি ভালো কাপড় জামা পর্য্যন্ত না। যে কটা আছে, এক্ষুনি বিলিয়ে দিতে রাজি।

এই রকম বৈরাগ্যোচিত মনোভাবের প্রাবল্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা সম্ভব অসম্ভব জল্পনা কল্পনা যখন রুচিকে আন্দোলিত উদ্বেলিত করছে ঠিক তখনই—সেই রাত্রি দশটার পরে—খেয়ে দেয়ে বিছানায় সটান পড়ে সেই কটকের বাসার শ্রীমান টেবু ওরফে বিভাসচন্দ্রও এমনি অদৃষ্ট চিন্তায় মগ্ন।

হায়রে, আজ যদি প্রকাশ প্রভাস থাকতো, তাহলে কি তার এই দুর্দ্দশা হয়? অন্ততঃ দুটো জলজ্যান্ত বৌদিও তার দুঃখ বুঝবার জন্যে কতো আকুলি বিকুলি করে বেড়াতো।

আজকে তার না-দেখা বড় বোনগুলোর জন্যও কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পর পর সাতটি ছেলেমেয়ে-মরা মায়ের কোলে ও জন্মেছে বলে, মা দিনরাত খুব দেবতার দুয়োরে মাথা খুঁড়তেন,—ঠাকুর, একে যেন রেখে যেতে পারি!

মাথা খুঁড়ে খুঁড়েই তিনি অমন অকালে চলে গেলেন, ছেলের সুখ সুবিধার দিকে মা হয়ে একবার চাইলেন না পর্য্যন্ত।

বাবা ত যত রাজ্যের জাঠতুত খুড়তুত নিয়ে ঘর করছেন, তাঁর একমাত্র ছেলের ভাগ্য সইমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে। ভাবচেন বুঝি বড়োলোকের জামাই-গিরির লাইসেন্সের জোরে ছেলে বিলেত ঘুরে আসুক, কেননা তারা বিলেত ফেরতের গুষ্টি।

ছোঃ, সে অমন টাকার জোরে নাম কিনতে চায় না। সে চায় নিজের বিদ্যা বুদ্ধির জোরে বড়ো হতে, তবেইনা মান থাকে।

ছেলেবেলার কল্পনাপ্রবণ মনটা তার এখনো তেমনি আছে। ঐসব উদ্ভট ব্যক্তিকের ছিট আছে বলেই আজো সে বিলাসিতায় ভয় পায়। বীরত্বের অপলাপ কিছুতে ঘটলে তার লজ্জায় মুখ লুকোবার ঠাঁই মেলেনা। তার বিয়ে করতে হবে ঐ ভনকাতুরে বিলাসী 'এনামেল' করা মেয়ে রুচিকে?

যে রুচি বয়েসে ছোট হলেও তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না, বড়োদের দরবারে নালিশ করে দিনরাত তাকে নাকাল করবার চেষ্টায় যেরাই ছিল যার একমাত্র কাজ, যাকে তখন খুন করলেও তার আপশোষ ছিলনা,—অবশ্য এখন আর অমন ছেলেবুদ্ধি নেই, বিশেষ দুরন্তপনায় ভাটি পড়েছে মা মরার পর থেকেই—কিন্তু সেই রুচি?

এই যে কতোদূরে জ্ঞাতি কাকার বাসায় সে আছে, সবাই তাকে ভালোবাসে, ভাল বলে, আর রুচির কাছে আখ্যা পেয়েছিল সে ছোটলোক গুণ্ডা।

তার কালরূপের ইঙ্গিতস্বরূপ টেরি কুকুরটাকে সেদিনো সে রুচির দাদাদের সঙ্গে লেকের ধারে দেখেছে, ছুটিতে যখন কলকাতা গিয়েছিল। দেশে কি আর মেয়ে নেই?

যে রুচি বিভাসের খুড়তুত বোন নীলাকে সবাই ভালো-বাসে বলে কেঁদে দিয়েছিল, হেনার পুতুলটা ফিরে নিয়ে দত্তাপহরণ করলে, বিভাসের নতুন প্রাইজের বই-এর রঙিন ফিতা কাঙালের মত চেয়ে নিয়ে বিনুনিতে ঝুলোলে—বিভাস ত তা দেখে রাগে থ মেরে গিয়েছিল? আর সেই রাগেই না

সে তার বিনুনী কাটে? নিজের গোয়ার্ত্তুমিতে এখন নিজেরই হাসি পায়?—সেই হ্যাংলা রুচি?

দুপাতা ইংরাজি পড়েই আজ সে বুড়ো মাতব্বর হয়েছে না কি? ভারী ত কটা রং, ঐ অহঙ্কারেই যে মেয়ে তাকে কাল বলে করুণার চোখে দেখেছে সে মেয়ের চেয়ে কালো যে-কোন মেয়েও ঢের ভালো।

ওকে বিয়ে করবে না, করবে না, সে কিছুতে, কক্ষনো—

কিন্তু একথা কাকে বলা যায়? এঃ, আবার কাকে বলা, বলা উচিৎ ঐ রুচিকেই, যে তোমাতে আমার রুচি নেই।

কিন্তু সেটা ত ভদ্রতাসম্মত ব্যাপার নয়। একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করার মতো কল্পনাও তার নেই—

সে কি করবে ভেবে আকাশ পাতাল না পেয়ে ঠিক করে আপাততঃ একটু বেড়ান যাক। খরচ তার খুব বেশী লাগবেনা, গরীবের মতো চলার অভ্যাস বেশ আছে। শরীরও তত অপটু নয়, পাদচারেই অনেকটা মেরে দিতে পারবে।

কয়েকদিন পরে আত্মীয়দের নাগালের বাইরে বেরিয়ে পড়বার সঙ্কল্প নিয়ে সে কটক ছেড়ে পুরীর সমুদ্র তীর দেখে উদাসীনের মতো দিন কাটায়। সে কি জানে এখানেই তার রুচির সঙ্গে দেখা হবে, আর পরস্পর পরস্পরকে মনোভাব স্পষ্ট করে জানাবার সুযোগ মিলবে?

একদিন বিকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখতে পায় সে, একটি কিশোরী মেয়ে দুটী ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সাগর বেলায় নুড়ি আর ঝিনুক কুড়োচ্ছে, সঙ্গে ফিরচে কালো রেশমের পুটুলির মতো একটা—কি আশ্চর্য্য, ঐ টেবিই না? বাঃ ভুল দেখলাম না তো? কিন্তু নামে দেগে দেওয়া .. ওকে ভুলবার যো নেই যে!—তাইত। এরাও তবে......

নতুন মানুষ তাকে দেখছে দেখে বেটে কুকুরটা কুৎকুতে চোখ তুলে বারে বারে ফিরে চায়। হঠাৎ উচ্চ কলধ্বনির সঙ্গে শোনে—টেবি, টেবি!—

লেজ নেড়ে নেড়ে কালো মাণিক তার নামের মর্য্যাদা রাখতে ছোটে। বিস্মিত স্থির দৃষ্টি আহ্বানকারিণীর মুখে বুলিয়ে বিভাস ওকে টেবু চিনতে পারে—রুচিই ত, হাঁ ওই যে যমের অরুচি! যখন তখন এ নাম বলে সে বমি করতে চাইত, আর ছিচ্ কাঁদুনে মেয়ে কেঁদে হাট বসিয়ে দিত। তার পরই একদিন কার পরামর্শে না জানি টেবির সৃষ্টি।

চোখে চোখ পড়তেই অতিমাত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ দুটো রুচি নামাতেই ভুলে যায়,—কে? ওমা, সেই টেবু চন্দর আবার এখানে? কোথাও টিকতে দেবেনা না কি? সন্ধান পেলে কি করে যে পিসিমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি এখানে?...

আমি আরো কতো বুদ্ধি করে কটকের কাছে এলাম, যদি বা কোন গতিকে ওকে ক্ষেপিয়ে বিয়েটা ভেঙে দেয়া যায়! ..তা ভালোই ত, যা হোক্ মুখোমুখী হয়ে যাক।

...বাবাঃ, দেখো ছেলে কতো বড়ো হয়েচে, এখন আর ওকে যা তা কিছু বলা যায় না ত। এতদিন কিনা দেখিনি, .. ওর সবই যেন বদলে গেছে। বড়ো হয়েছে বলে দেমাক আরো বেড়েছে নিশ্চয়। কে বলবে ও সে ফড়িঙ্গে টেবু?—তবে হাঁ, সাজের কায়দা, চলার ধরণ একই—জংলী।

এখনো কি সেই ডানপিটে আছে, না ভদ্রতা শিখেছে একটু? অন্ততঃ মুখটা দেখে ত মনে হয়। রুচি ভাবে।

ফস্ করে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে যায় আপনি টেব্—না বিভাস বাবু?

ওর চাউনির অবিচ্ছিন্নতায় বিভাস্ ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়ে। এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একটু হাস্তে চেষ্টা করে যাহোক একটা আলাপ সুরু করে দেয়—

কে? চেনা মানুষ যে! বেড়াতে এসেচো বুঝি? বড়ো কেউ সঙ্গে নেই যে সইমা কই? কতকগুলি প্রশ্ন বিভাস একসঙ্গে করে।

ওর এক কথায়ই রুচির রাগ ধরে যায়। এরি মধ্যে শাসন সুরু হয়েছে, বড়ো কেউ সঙ্গে নেই কেন...? বার করচি তোমার শাসন।

রুচিও পরপর বলে—মা কলকাতায়, এলাম এই ছুটিতে আর কি! তা আর বড়োর দরকার কি? আমিই ত ঢের বড়ো হয়ে গেছি।

বিভাস দেখছে ফোঁস করাটা ঠিক আছে। মাথা নেড়ে সায় দেয়—তা বটে!

সঙ্গে সঙ্গে ভাবে—চেহারার এত পরিবর্ত্তনে মনটা কি একটুও বদলায় নি? অন্ততঃ বদলান তো উচিত, নইলে শিক্ষার সার্থকতা কি?…তা যাক, না বদলাক, আমারি বা কি।

বাবুগিরিটা ত পুরোই আছে, না আরো একটু বেড়েছে দেখছি, কিন্তু এটা স্বীকার পেতেই হবে, বাবুগিরিটা ওকে আশ্চর্য্য মানায়, একটুও যেন বেশী মনে হয় না।

খানিকটা সময় উস্ খুস করে বিভাস বলে ফেলে—দেখা যখন হঠাৎ হোলই,…তখন একটা দরকারী কথা এখনই হয়ে যাক। ক'দিন ধরে ভাবছিলাম তোমাকে জানান উচিত—তা—

রুচি পরম ঔদাসীন্যে আকাশ দেখতে দেখতে মন্তব্য করে,—দরকার থাকলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, তবে… আপনার সব কথাই যে মেনে নেবো এটা হয়ত আশা করবেন না।

তার পরেই তাড়তাড়ি সঙ্গের হাঁ-করে কথা-গেলা মেয়ে দুটোকে—এই থলেটা নে ত, ভালো দেখে দেখে নুড়ি ঝিনুক কুড়িয়ে ভর্ত্তি করে আন্, আমি এখানে একটু বসছি—বলেই রুমালটা বিছিয়ে বসে পড়ে।

বিভাস হেসে বলে—মোটে-না-মানা মানুষের উপর সব কথা মানার আশা করাই বেয়াদবি। কিন্তু এবার মানের বাড়াবাড়িতে অবাক হচ্ছি বলে রাখি, হঠাৎ তুই-তুমির ক্লাস থেকে একেবারে আপনিতে প্রমোশন পেয়েছি দেখছি।

রুচির গাম্ভীর্য্য আরো বেড়ে যায়।

—ছেলে বেলায় কারুরই ভদ্রতাজ্ঞান থাকেনা, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই-ই সর্ব্বত্র সম্ভ্রম রেখে কথা বলে। সে সম্ভ্রম পরের নয়, তার নিজেরই।

হার মেনে বিভাস স্বীকার পায়,—হ্যাঁ, তুমি বলা উচিৎ হয়নি, ওটা একটা আত্মীয়তার চিহ্ন। তবে কিনা পুরোনো অভ্যেস, মুখে বেরিয়ে গেল এই যা,—তা মাপ করো—করুন। বিভাস হাসে। একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলে,—

কথাটা এই, আমাদের অভিভাবকরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টকে একত্রে বাঁধতে একমত। আমাদেরো যে মতামত থাকতে পারে, তাঁরা হয়ত ভুলেই আছেন, নয় বিশ্বাসই করেন না—

বাধা দিয়ে রুচি বলে—আমরা দুজনে তাঁদের বিপরিতেও ত একমত হতে পারি। আর তা হলেই তাঁদের ভুলও ভাঙবে, বিশ্বাসও হবে—

বিভাস হেসে উঠে—ওঃ, তাহলে আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।…একটি মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম, সেটা আর সৌভাগ্যবশতঃ ভাঙ্‌তে হবে না।

রুচির গায়ে প্রায় জ্বালা ধরে।—ছেলেটা ওকে সৌভাগ্য বলে না মেনে আবার বড়াই করে ওকেই জানাচ্ছে।

আগে পিছে কিছু না ভেবেই রুচি শুনিয়ে দেয়—ঈস, তাদের কথা শুনলাম আর কি? এতদিনে ক-বে সিভিল ম্যারেজ হয়ে যেত, শুধু নাবালকের গেঁড়োয় না আটকালে!

বিভাস একটু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে মাথা নাড়ে—হুঁ!

খানিক পরে রুচিই স্তব্ধতা ভাঙ্গে—হ্যাঁ, তিনি বুঝি গ্রাজুয়েট?

বিভাস ওর সন্ধানী দৃষ্টিতে একটু অস্বস্তি বোধ করে—না, সেসব কিছুনা। গরীবের মেয়ে; বাপের খরচ চলেনা। এমনি কিছু পড়তে জানে; তা কাজ টাজ খুব পারে। আর অহঙ্কার নেই একটুও, সহ্য ধৈর্য্য আছে। আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে বেশ।

রুচি ঠোঁট ওল্টায়—ওঃ, তা দেখতে খু-ব চমৎকার বুঝি।

বিভাস টিপে টিপে শূন্যে তাকিয়ে কথা কয়—তা—চমৎকার বৈ কি। এই আমারি মতো কালো, অহঙ্কার করে কালো কুকুর পোষার মতো রং তার নেই। বলেই বিভাস আড়চোখে রুচির দিকে তাকায়।

রুচি হঠাৎ টেবিটার পিঠে একটা লাথি ছুঁড়ে গম্ভীর স্বরে বলে—তা সাদা বেড়াল রেখেছে বুঝি!

টেবিটা কেউ কেউ করে দূরে সরে যেতেই বিভাস হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে টেনে নেয়—আরে এসো এসো, আমার কাছে এসো, আমি যে তোমার বন্ধু!

দুজনেই এবার হেসে ওঠে। তবে উচ্ছ্বসিত নয়, একটু টেনে টেনে।

—সাদা বেড়াল, হাঃ হাঃ—মনে হয়নি ত? আচ্ছা এবার গিয়ে বলবো।...কিন্তু সেই সৌভাগ্যবান সুন্দর মানুষটিকে জানবার সৌভাগ্য আমার হবে কি?

রুচি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না না, আগে একটা জানাজানি হয়ে সব ভেঙে যাক আর কি! তিনি মোটে এ দেশেই নেই, পড়তে গেছেন।

—ওঃ, আমারি ভুল, বিলেতের মাটি না মাড়ালে জাতে ওঠা যায়না যে!

ওর স্পর্দ্ধায় রুচি ঠোঁট কামড়ায়।

আবার খানিকটা সময় যায়। বিভাস বলে—ধন্যবাদ, এত সহজে কাজটা হবে ভাবি নি।

রুচি তেতে ওঠে—কেন? ভাবছিলেন বুঝি আমি হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি লাগিয়ে দেবো?

বিভাস আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—বাঃ, বেশ, সে কি? —ছিঃ, একি কথা? আমি যে একান্ত দায়ে পড়েছি, সেই জন্যেই না বলা।

—দায়ে? অর্থাৎ আপনার তেমন মত নেই এতে? তবে কেন আপনি একজনের সর্ব্বনাশ করতে চান, যাকে ভালোবাসতে পারবেন না তাকে বিয়ে করে?

—তাকে আমি না নিলে যে তার বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে; তার বাপ যে টাকা দেবে না।

—তা আপনিই কেন টাকাটা তাকে দিয়ে দিন না? জীবন নষ্ট করার চেয়ে টাকা নষ্ট করা ঢের ভালো।

—আমিই বা অতো টাকা এখন পাই কোথায়?

একটু ভেবে রুচি বলে—না হয় শ পাচেক আমি ধার দিতে পারি, বাকীটা যদি চালাতে পারেন। তবে আমার কিন্তু সেটা এক বছর পরেই লাগবে,—তখন দরকার হবে ত!

রুচি ঘেমে ওঠে।

বিভাস বলে—এক বছরের মধ্যে যদি শোধ দিতে না পারি? থাক কাজ নেই নিয়ে, যা হবার হয়ে যাক।

রুচি তবু অমত করে—ছেলেবেলা মারামারি করেছি বলেও আমরা বন্ধুই ত। একজনকার জন্য আর একজন একটু ক্ষতি স্বীকার করবো না? না হয় আর এক বছর,—যত দিনে পারেন দেবেন।

—ধন্যবাদ; তা তুমিই নয় ক্ষতি স্বীকার করলে, তোমায় তিনি রাজী হবেন কেন? আমি আরো ভাবছি তোমরা বুঝি সাইনাইড্ পকেটে করে ফেরো, নির্দ্ধারিত সময়ের একচুল ওদিক হলেই—

—বাঃ, কি চালাকি! আমরা অতো ভাবপ্রবণ নই!

—বলো কি? কাউকে না জানিয়ে ভাব করে বসে আছো, আরো বলছো ভাবপ্রবণ নই?

রুচি অন্যায়টা অস্বীকার করতে না পেরে যেন ছটফট করছে, ঘেমে উঠেছে। ওকে দেখে বিভাসের বেশ মজা লাগে, রাগও ধরে,—কি একগুঁয়ে মেয়ে! বিভাস বলে চলেছে—কিন্তু রুচি, আমার নয়—মানে—ইয়ে তোমার মা যখন জানবেন তাঁর মেয়ের গুণ, তখন তিনি যে কি আঘাত পাবেন আমি ভাবতেই পারছিনে।

— আর আপনার গুণে ঘাট নেই?

—তা যত খারাপ লোকই হইনা কেন, সইমার মুখো-মুখী—এত অমতেও আমি অস্বীকার পেতে পারতুম না।

রুচির চোখ অভিমানে ছলো ছলো হয়ে আসে, আর কিছু না পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে – বাঃ, আমার মাকে আপনি আমার চেয়েও বেশী ভালোবাসেন?

—না বেশী বাসিনে, তবে সমান সমান অন্ততঃ বাসি। তুমি যখন জন্মাওনি তখন থেকেই তিনি আমায় নিয়ে নিয়েচেন। মাকে বলেছিলেন, একে আমায় দিয়ে দে ভাই, তোর কোলে ত একটাও টিকলো না।

রুচি মাথা নেড়ে বলে—কিন্তু আমার মা কক্ষনো অমন আবদার সইতে পারেন না। সে দেখেছি গঙ্গাজল মাসিকে, খেয়ে ফেল্লেও কথাটি কইতে পারতেন না। কি ভালোই বাসতেন, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কতো কি যে দিয়েচেন, কাঁদবার ফুরসুৎ দেন নি তোমার মার খেয়ে।—

—অনেক—অনেক—অনেক ধন্যবাদ রুচি, ভদ্রতার আপনি থেকে আত্মীয়তার তুমিতে নেমে এলাম, কি ভাগ্য! আবার উঠিও যেন দয়াকরে!

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে রুচি ব'লে, ধ্যেৎ, শুধু কথার ফাঁক খুঁজে বেড়ানো, ভারি দুষ্টু তো?

—সেকি আজ নতুন জানলে? কিন্তু না, সত্যি বলছি,

তোমার ঢের দয়ার পরিচয় পেলেম। এতো মহৎ তুমি! সকলকার সামনে প্রত্যাখ্যানের অপমান না সইয়ে যে আপোষে বিদেয় দিয়েছ, এতেই আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তার ওপরে আবার অনিচ্ছার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে অনুরোধ করে, সাহায্য দিতে চেয়ে যে দরদ দেখালে, নিজের ক্ষতি করেও অযাচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জগতে বন্ধুপ্রীতির যে রেকর্ড রাখলে এর আমি যে কি দিয়ে শোধ দেবো তা ভেবেই পাচ্ছিনে।

রুচির কুঞ্চিত ভ্রূকে আমোলে না এনে আরো ভারিক্কি চালে বলে যায়--তবে জানোই ত রুচি, আমি চিরকেলে গোঁয়ার, তোমার এত উদারতার মান রাখতে পারলাম না। আমার সাহায্যের দরকার নেই। তোমার অহেতুক পরোপকারটা বন্ধ হলো বলে রেগে যেয়ো না, আমি ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সবার সম্মতিতে তুমি তোমার বাগ্‌দত্তকে যাতে নির্ব্বিঘ্নে বিয়ে করতে পার প্রাণপণে তার চেষ্টা করবো।

রুচি ক্রমাগত তাতছে, তা বুঝেও ও বলে চলে—আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি। আমরা পরস্পর বন্ধুই ত। এবার তুমি অনুগ্রহ করে তাঁর পরিচয়টা আমায় দিয়ে দাও, শুধু সাহায্য করতে সাহায্য করো, তোমাদের শুভমিলনের সহায়তার অধিকার দিয়ে ধন্য করো।

—তোমার লম্বা বক্তৃতাটা অনুগ্রহ করে থামাবে কি?

তবু না-ছোড়বান্দা ও বলে—ভয় কি রুচি, সইমা খুসী মনেই মত দেবেন, সাবালকত্বের দেরী দরকার হবে না।

এবারে রুচি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঝেঁঝেঁ বলে—ছাই বিয়ে, কে তোমাকে আদিখ্যেতা করতে বলেছে?

—মানে? তুমি আমার বন্ধুত্ব চাওনা? আমি আরো স্কলারশিপের টাকায় কেনা ঘড়িটা তোমার বরকে উপহার দেবো ভেবে বসে আছি।

—ওই কথা ছাড়া তোমার কি আর কোনো কথাই নেই?

—আহা, চটো কেন? কি আর থাকতে পারে এ অবস্থায়? আমরা কি দুজনেই আমাদের সমস্যার আপোষে মীমাংসা করতে বলিনি? কিন্তু কি মজা দ্যাখো, আমরা এদিকে পরামর্শ করে পরস্পরের অমতকে অনুমোদন করচি, আর আমাদের অভিভাবকরা হয়ত এক্ষুনি নিশ্চিন্ত মনে বিপরীত মতের বন্দোবস্ত পাকা করে ফর্দ্দ ধরচেন!

—আবার?

—তবে কি বলবো?

—আর কিছু না থাকে তোমার বিয়ের গল্পই করো না? আমার বরের কথা এত বলেছ যে তোমার কনের ওপর যথেষ্ট অবিচার হয়ে গেছে।

বিভাস হাসে।

অস্তারুণের আভায় লালিম রুচির মুখে চেয়ে বিভাস বলে থাক্, আর—

- আমাকে জানাতে চাওনা? এই তোমার বন্ধুত্বের বড়াই? তোমার সে ভালো কনের কথা ঝগড়াটে রুচিকে জানাবেনা এই ত?

বিভাস তবু হাসে—আর শুনে কি হবে?

—তাই নাকি? যদি কখনো দেখতে যাই সবাই বলাবলি করবে এই মেয়েটার সঙ্গে আবার অমন ভালো ছেলের বিয়ের কথা হয়েছিল। তাই বুঝি তোমার দয়া হচ্ছে? ...তা নাইবা দেখলাম, নামটাই অন্তত শুনি?—

—বানিয়ে আর কতো বলা যায়?

অর্থাৎ?

—অর্থাৎ মিছে কথা।

-- মিছে কথা? তুমি খামোখা মিছে বলে আমার কাছ থেকে এতগুলো মিছে আদায় করে নিয়েছ? দণ্ডবৎ তোমায় মশাই! রুচির মুখে মৃদু হাসি দেখা যায়।

—তাহলে তুমিও?

—হ্যাঁ।

দুজনে আবার হাসে।

বিভাস দূরে চেয়ে বলে—ওরা নুড়ি কুড়িয়ে ফিরে আসচে। আমাদের কথা আবার ফিরে আরম্ভ করি,—দু'কথারই এবার শেষ হবে। তুমি আমাকে চাও না...আমিও তোমায়—থাক্—এই ত?

—কি তুমিও আমায়?

—ও আর কি শুনবে?—বাস্, এইত?—ব্যাপারটা সোজা হয়ে গেল।

—না বলো, কি তুমিও আমায়?

—থাক্ না, তোমার মতে আমিও সায় দিলাম, অতএব আমরা—

—আঃ, আমি শুনবো, বলো, বলো তুমি,—কথা শুনচো না কেন? কি তুমিও আমায়?

—যদি বলি চাই?

—তাহলে আমি যে চাই না তাই বা কি করে জানলে? রুচির চোখ দুটো শান্ত হয়ে আসে।

—কেন, এই এতক্ষণ যে বল্লে?

—সে ত তুমিও কত বলেছ?

এবারে বিভাস টেবিকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে আসে,—রুচি—

রুচি আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে বালির ওপর হাঁটুগেড়ে দুহাতে টেবিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে—টেবু, আমার টেবু!

বিভাস নীচু হয়ে দুহাতে ওর মুখটা ফিরিয়ে ধরে চোখে চোখ রেখে হাসে—ছিঃ ঘোলে সাধ মেটাচ্ছ কেন?

ততক্ষণে ছোট মেয়ে দুষ্টটা প্রায় এসে গেছে ভর্ত্তি খলেটায় দুদিকে ধরে দোল দিতে দিতে।

শ্রীমতী সরযূ সেন

-:*:—

পল্লী-সন্ধ্যা

শ্রীকল্যাণকুমার সোম

রূপময়ী সন্ধ্যা, অপরূপ বর্ণা!
তব রূপ মোর মনে জাগালো আনন্দ,
নিয়ে এলে পৃথিবীতে শান্তির ঝর্ণা,
বাতাসের সাথে ভাসে মাধবীর গন্ধ!

সারা দিবসের কাজে ক্লান্ত যে মনটা,
সারাদিন পথ চলে শ্রান্ত যে ধরণী;
সহসা বাজিয়া ওঠে মঙ্গলঘন্টা—
এলে তুমি সন্ধ্যা, কল্যাণবরণী!

মাঠ হতে ধেনুপাল গৃহে যবে ফিরে যায়,
পল্লীর বধূগণ জলে ভরে কলসী—
সবিতার শেষ রেশ পানে ওরা ফিরে চায়,
ক্ষণিকের তরে ওরা হ'য়ে ওঠে উদাসী!

মনে পড়ে ফেলে-আসা অতীতের গত দিন,
মনে পড়ে কতো স্মৃতি সুখ-দুখ জড়ানো!
বেদনায় বেজে ওঠে ওদের পরাণ-বীণ—
ফিরে তো পাবেনা কভু হয়েছে যা ছড়ানো!

ডানা মেলে পাখিগুলো ফিরে আসে কুলায়ে,
কাজ সেরে গৃহে ফিরে কৃষকেরা ক্লান্ত,
ঘরের মধুর মায়া দেয় প্রাণ জুড়ায়ে
সুমধুর বিশ্রামে হয় তারা শান্ত।

সন্ধ্যা-সমীরে মন ভরি ওঠে হরষে,
ক্লান্ত ধরাতে আনো শান্তির বন্যা!
তৃপ্তি জাগাও প্রাণে পুলকের পরশে,
সৃষ্টির মাঝে ওগো তুমি যে অনন্যা!

যাও বন্ধু যাও

মোহাম্মদ শওকাত আলি

ব্যথার বারিধি-তীরে এলে মিছে ভুলে' !
সুন্দরী-তরুণী-তন্বী-লায়িলী-দোসরা শিঁরী,
এলে সেই কূলে—
যেথায় শুধুই জল—তরঙ্গে শুধু লীলা-খেলা
প্রভাতের চারু সূর্য্য—মধ্যাহ্নের দীপ্ত-জ্যোতি ভানু
নিত্য নতজানু,
যেথায় পেলনা ঠাঁই নিতু শেষ-বেলা !
এলে সেই উপকূলে—সেই বালু-তীরে—
যেথায় ব্যথার কবি আসে ফিরে' ফিরে'
পূরবীর কণ্ঠ নিয়া ;
গেঁথে রেখে যায়
বেদনার মাল্য-খানি রক্ত-জবা দিয়া।
দক্ষিণা মলয় আসে—
হাসে অবিশ্বাসে—
পত্রের আড়ালে তা'র রেখে যায় হাস —
সুগোপন নগ্ন পরিহাস !
এলে সেই শাপ-ভ্রষ্ট সেই দুষ্ট-ভূমে—
যেথাকার মাটি চুমে' চুমে'
পূর্ণ শশী দেহ করে ক্ষয়,
মহাকাল যেথা ভুলে জয়-পরাজয় ;
জরা মৃত্যু গেয়ে যায় গান,
পাষাণের বক্ষ চিরে দুলে অভিমান,
অপমান-জ্বালা ভুলে মানিনীর মন,
নৃপতি রাখিয়া আসে স্বর্ণ-সিংহাসন—
সসমুখ-শির তা'র নত-শির করি'
সসম্মানে লয় বরি'
ব্যথা-পয়োধির
এক বিন্দু নীর।
হেথাকার অট্ট হাহাকার,
ম্লান-অন্ধকার—
এ শুধু আমার।
থাক মোর তরে
আমার অন্তর ভরে'
শরতের ছল-ভরা হাসি,
মরু-মরীচিকা আর—
প্রেম সর্ব্বনাশী।...
সেই হ'বে ভাল—
ধরণীর গৃহে গৃহে যাও দীপ জাল !
যাও বন্ধু যাও—
তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত বুকে অমৃত বিলাও।
স্বামীরে বাসিও ভাল—সন্তানেরে দিয়ো ভালবাসা,
নিরাশেরে দিয়ো নব আশা ;
দেহের দেউলে তব পূজারীর নিয়ো অর্ঘ-দান,
ভোগীরও রাখিও সেথা মান !
আমারে ভুলিয়ো বন্ধু— ভুলো বারিধিরে ;—
মোর সিন্ধু-তীরে
তুমি যে আসিয়াছিলে—গেয়েছিলে গান,
ভুলেছিলে লাজ-লজ্জা-মান-অপমান—
এই সত্য হোক !
এই সত্য জয়ী হোক ; দ্যুলোক-ভূলোক
ইহারে করুক স্তব, করুক আরতি ;
ইহারে পূজুক নিত্য
গ্রহ-রাজ্যে গরবিনী সতী-অরুন্ধতী !
আমারে রাখিও বন্ধু দূরে—অতি দূরে ;—
রজনীর স্বপ্ন-রাজ্য-পুরে
যদি অকস্মাৎ
মিলনের রাত
এসে পড়ি ভুলে —
ক্ষমিও ক্ষমিও বন্ধু, দুর্ব্বল কবিরে কোরো ক্ষমা —
ওগো মনোরমা !
ভুলিও সিন্ধুর তীর—সেই কূলে কূলে
গোধূলির আধ-গন্ধে তব বিচরণ ;
ভুলো সেই যামিনীর সেই মধুক্ষণ
প্রিয়ারে জড়ায়ে বুকে। চুমিয়া তাহারে
ভুলো এই বন্ধুহারা—প্রিয়াহারা—অভিশপ্ত
ব্যর্থ অভাগারে।

নারীপ্রগতি

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

রাঁচি সহরের দক্ষিণ কোণে নূতন যে পাড়াটীর পত্তন হইয়াছে তার নাম 'হিনু'। সহর থেকে বিলম্বিতচ্ছন্দে ঢেউ খেলিয়া এই স্থানটি উঁচু হইয়া আবার এদিক ওদিক নামিয়া গিয়াছে; তারপর আবার খোলা তরঙ্গায়িত প্রান্তর বালি কাঁকরে ভরা, তিন দিকেই দিগন্ত প্রসারী। এই হিনু পাড়াটি বাঙ্গালী বাবুদের কলোনি, প্রায় সকলেই বিহার সরকারের হিসাব বিভাগের অফিসের কেরাণী।

স্থানটী গাছপালা বর্জ্জিত একেবারে উন্মুক্ত; আকাশ বাতাস নির্ব্বাধ অনাবিল। এরি মধ্যে সারি সারি কতগুলি অতি দীর্ঘ ব্যারাক, তাহাই বহুধা বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট বাস-গৃহ তৈয়ারী হইয়াছে। এই গুলিই কেরাণী-পাখীদের কুলায়;—সরকার বাহাদুরের অনুকম্পামিশ্র খেয়ালের নিদর্শন। ঘন সন্নিবিষ্ট হইলেও বাসাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঙ্গলার নানা স্থান থেকে সমাগত প্রায় দেড়শ বাঙ্গালী পরিবার এখানে বাস করে।

একত্র এক স্থানে এক কর্ম্ম ব্যাপদেশে এইভাবে থাকিতে গিয়া এদের মধ্যে আশ্চর্য্য একটা সম্প্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিয়া গিয়াছে, যার কল্পনাও অন্যত্র নাই। একটা বিচিত্র সমাজ পরস্পরের মধ্যে নানা বিরোধভাব কাটাইয়া সহজ সরল আচার ব্যবহার ও সহৃদয় আদান প্রদান লইয়া এখানে পুষ্ট তুষ্ট রহিয়াছে।

কেরাণী জীবনের পরিচয় অনাবশ্যক। সূর্য্যের উদয়াস্তের মত নিত্য একই সময়ে আফিসে যাতায়াত, নিত্য পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দিনের পর দিন একই ধারার কাজ; ঘরে ফিরিয়া যে সুখ দুঃখ সমাকুল বিশ্রাম সেও নিত্যকার ব্যাপার—এর মধ্যে জীবনটা একঘেয়ে না হইয়া যায়না। বাহিরের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে যা কিছু উদাসীন পরিচয়, সেটা সংবাদ-পত্র মুখে এবং সেখানেই তার ইতি। কেরাণীকুল স্বভাবসিদ্ধ দার্শনিক, সদাই আত্মতুষ্ট, অন্তত তাই থাকা উচিত। জগদ্ব্যাপারে যখন জগন্নাথেরই হাত নাই, তখন এ বেচারারা তা লইয়া মাথা ঘামাইতে যায় কেন?—অবসরই বা কোথায়? হৈ-চৈ করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া কে-ই বা কতটুকু জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারিয়াছে? নিজেদের অবস্থা ব্যবস্থা লইয়া ব্যাপৃত থাকাই তো সুবুদ্ধির কার্য্য।

অধিকাংশই এইরূপ কেরাণী পুঙ্গব; শুধু নূতন ছোকরা কেরাণীদের বিভিন্ন দর্শন। দেখা যায়, তারা খদ্দর পরে, শরৎ, রবীন্দ্র চর্চ্চা করে, জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষের চাঁদা তোলে, লোকেদের অসুখে বিসুখে বিপন্নাবস্থায় সাহায্যার্থ আগু হয়। আবার নানারূপ আনন্দোৎসবেও সকলের অগ্রণী।

বাবুদের গৃহলক্ষ্মীগণ চিরাচরিত পদ্ধতিতেই চলেন। তাহাদের সহজ সংস্কার ঠিক আছে; অপরাপর নারী সমাজে যেরূপ চাল চলতি, পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, দেমাক ঠম এদেরও তাহাই আছে। এ সবগুলির আয়োজন প্রয়োজন বাবুদের সামলাইতে হয়। তারা যথাসাধ্য হাসিয়া কাঁদিয়া এ সব দাবী ঠেলিয়া ঠাসিয়া, এবং রাখিয়া আসেন। অনেক দিন এমনি ভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে এই সমাজটা চলিয়া আসিতে-ছিল। চারিদিকের নারীজাগরণ বার্ত্তা ক্ষণে ক্ষণে এখানেও আসিয়া পৌছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনো চাঞ্চল্যের কারণ এযাবৎ ঘটে নাই।

কিন্তু এরি মধ্যে কবে একটা অজ্ঞাত উপদ্রবের অকাল বোধন হইয়া গেল।

কলিকাতা হইতে কয়েকটী বেথুন কলেজের মেয়ে এখানে নূতন কেরাণীবধূ হইয়া আসিয়াছিল। তারা একটা মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া ফেলিল। নবীনারা সকলে উহার মেম্বর হইয়া গেল; মোটা গিন্নীদের সমবেত করণার্থ এক দিন একটা বিরাট পান দোক্তার পার্টি বসিল। এই সূত্রে তাহারাও

অচিরাৎ ঐ সমিতিতে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ফিরিলেন। পুংবাবুরা শ্রুত হইলেন, সমিতির উদ্দেশ্য নারীপ্রগতি, যার মোটামুটি মর্ম্ম এই যে এখন থেকে মেয়েরা স্বাধীন, পুরুষের অত্যাচার আর সহিবে না।

বাবুরা এদিকে বিশেষ মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন এটা মেয়েদের খেয়ালের একটা suspense balance,—সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন নভেল লেখা। বেচারীরা কি লইয়াই বা দিন কাটাবে, সিন্ধার ভোয়ার্কিনের কল ঘাঁটিয়া কাঁহাতক ভাল লাগে? কিছু দিনের মধ্যে account closed হইবে—সর্ব্বত্র যেমনটী হইয়া থাকে।

কিন্তু উপদ্রবটি স্বয়ং দেখা দিলেন শীঘ্রই হিন্দু মহিলা সমিতির বার্ষিক উৎসবটী ঘটা করিয়াই হইল। কলিকাতার একজন মহিয়সী বিদুষী গ্রাজুয়েট ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন, তিনিই সেদিন সভানেত্রী হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাঁর ইতিবৃত্ত জনরবে এইরূপ জানা গেল,—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, বিয়েটা ঘটে নাই। বহুবার ব্যারিষ্টার আই-সি-এস্‌দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াও ফেল হইয়া গিয়াছেন। অপরাপর অযোগ্যাদের হাতের বরশী বিদ্ধ হইয়া সবগুলি ডাঙায় উঠিয়া গেল তাহারি চোখের সামনে। তাই বিবাহে বিতশ্রদ্ধ, শ-ইবসেন misquote করেন, অধুনা নারী-প্রগতিতে যোগ দিয়াছেন।

সভাস্থলে প্রথমে তিনি মাসিক পত্রে প্রকাশিত "বাংলামেয়ে" নামক একটী কবিতা উচ্চমধুর কণ্ঠ কড়ি মধ্যমে তুলিয়া আবৃত্তি করিয়া গেলেন। তার কয়েকটি ছত্র এই—

"ঘরের কোণে দুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস নারী
পরিল কেন যুগল পায়ে অধীনতার শিকল ভারি?

* * * * *

পর্দ্দানশীন পতিব্রতা লক্ষ্মীসতী বাংলা মেয়ে
চিরকালই অন্ধতা এই রইবে তোমার জীবন ছেয়ে?

* * * *

জীবন তোমার পীড়ন সয়ে চুপটী করে শুধুই কাঁদা
ঝাঁট দেওয়া আর ঘর নিকানো চচ্চরী শাক ছেঁচা
রাঁধা?" ইত্যাদি

অতঃপর এর ব্যাখ্যান ও বক্তৃতা হইল। অনেক অনেক কথা তিনি বলিয়া গেলেন, যথা,—"আমরা Doll's Houseএ পুতুল বনিয়া খুসী থাকি, এদিকে 'বিশ্বময় বিবর্ত্তনের দোল' চলিতেছে, তার খবর রাখিনা। পুরুষ দুর্জ্জন স্বার্থসাধন জন্য বলে, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, '—পবিত্র তুমি নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী'—আর আমরা শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাই। Inferiority Complex ভূতের মত আমাদের কাঁধে চাপিয়া বসিয়া আছে।

"হে পর্দ্দানশীন পতিব্রতা লক্ষ্মী সতী বাংলা মেয়ে" আসলে আমরা কি? Child bearing machine ছাড়া কি? তার জন্য যত্ন আদর তা কি কোনোদিন মিলিয়াছে? পুরুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পুরা মাত্রায় চাই, আমাদের বেলা কোনো দরদ নাই! পুরুষ চাকুরী করে নিজের হকে, মুখে বলে, তোমাদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলি। এদিকে ঘরের কোণে অন্ধকারে বসিয়া নোংরা বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মেয়েরা আমরা পায়ের ঘাম মাথায় তুলি। আমরা ওদের নর্ম্মসঙ্গিনী মাত্র, কর্ম্মসঙ্গিনী কোথাও নই। আমাদের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকিতে প্রেম ঘটিতে পারে না।' ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে প্রেম! তোমার আমার ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা—তেমনি প্রেম তো?"

কথাসূত্রে সভানেত্রী কয়েকটী পুরাণো সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিলেন,—যেগুলি স্ত্রীকুৎসায় ভরা অতীব ইতর কথা; অনুস্বার বিসর্গের ফোঁটা তিলক পরিয়া দেবভাষার মন্দির অপবিত্র করে। ঐ গুলি সালঙ্কার অতএব অশুদ্ধ অনুবাদ করিয়া তার কর্ত্তৃত্বাপরাধ চাপাইয়া দিলেন আজকালকার নিরীহ স্বামীদের উপর।

বক্তৃতার উপসংহার এইরূপ—"হে বাংলার মায়েরা, তোমরা এবে জাগো। দারুণ মোহজাল মেয়েদের আচ্ছন্ন করে রয়েছে; চচ্চরী আর ছ্যাঁচড়া রেঁধে জীবনটা কাটিয়ে দিওনা।"

বক্তৃতা শেষ হইল; পাখার বাতাস খাইতে খাইতে তিনি রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। এতক্ষণ সভামধ্যে শিশু-গণ স্বধর্ম্ম পালন করিতেছিল; হঠাৎ ঘন করতালিধ্বনি শুনিয়া তারা চুপ হইয়া গেল। একটি চশমা চোখে মেয়ে সভানেত্রীর

সঙ্গিনী ; আর্ট-প্রেসে ছাপানো কতগুলি কাগজ সভায় বিতরণ করিয়া গেল। তাতে পুরুষের অত্যাচার অবিচার অনাচার বিষয়ে বহু স্পষ্ট কথা ছিল ;—এটা বাড়ীর পুংপক্ষকে সজ্ঞান করিবার জন্য।

বিদুষী মহিলার এই জ্বালা করাল উদ্গিরণের ফলে হিন্দুর পারিবারিক শান্তি স্বস্তির উপর দিয়া নারীপ্রগতি কপিল মুনির নায়িকার মত বিচিত্র বেশে নরী নৃত্য করিয়া গেল। পুরুষসমাজ উদাসীন তটস্থ রহিলেন না, বেশ কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিল। কয়েক দিন আফিসেও কাজ কর্ম্মের মধ্যে কলম চালনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে এর আলোচনা চলিতে লাগিল।

অবশ্য কিছু দিনের মধ্যেই আলোড়নের বেগটা কমিয়া আসিল ; যা কিছু রহিল সেটাও গা সহা হইয়া গেল। আপদ বিদায়টাও কপিল মতেই হইল,—পুরুষের দৃষ্টিগোচর হইলেই নটী অন্তরালে সরিয়া যান। সেটাই আজিকার বক্তব্য।

সে দিন আফিসের টিফিন ঘরে মস্ত কমিটি বসিয়া গিয়াছিল ; পুরুষ সমাজে নারীপ্রগতির ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা হইতেছিল, পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে কয়েকটি পুরাতন কেরাণী আছেন, বৃদ্ধ বলিলে তাহারা রুষ্ট হন না। তাদের ঘরে এই নবীন প্রগতির ঢেউ লাগিয়া কি কি অসুবিধা ঘটাইয়াছে তাহারই গল্প হইতেছিল।

জীবন মুখুয্যের বয়স ষাটের উপর, অধুনা তার তৃতীয় পক্ষ সংসার, তা লইয়া দিব্যি মানাইয়া চলিতেছেন। এবারে নাতিনীর এবং নিজের একই সঙ্গে ছেলে হইয়াছে।

মুখুয্যের বাড়ী তারকেশ্বর ; কিন্তু বরাবর এখানেই সপরিবারে থাকেন। গৃহত্যাগের কারণটা এইরূপ শোনা যায়, নবলব্ধ তৃতীয় পক্ষ লইয়া যখন বাড়ীতে ছিলেন, একদিন নাকি মোহান্ত মহারাজ মুখুয্যের কুটিরে পাল্কী বেহারা পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট জানা গেলনা, কিঞ্চিৎ ঘোরলোই হইবে। তদবধি তিনি বাড়ী ছাড়া, এই বারো তের বছর আর ঘর মুখো হন নাই।

মুখুয্যে মশাইর গলার আওয়াজখানা স্বাভাবিক বাজখাঁই ; গান কাল আল্ল করিয়া এ আসরে সুর কিঞ্চিৎ নামাইয়া বলিতেছিলেন ;—"আর ভাই নারীপ্রগতি,—সে দিন ঐ সভা থেকে ফিরে গিয়ে গিন্নী বলেন, তোমারা নাকি বরাবর আমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে আসছো ? এ আর সইবোনা। রোসো, কালই ছেলে নিয়ে যাচ্ছি তারকেশ্বর।"

ভাল ফ্যাসাদ রে বাপু ! বাবার নাম শুনেই তো ভাবি আঁতকে উঠলুম। বুঝলুম একখানা নতুন গয়না আদায়ের ফন্দি, নইলে অমনি কি আর বাবার নাম হয় ? আমি তাড়াতাড়ি তাই কবুল ক'রে গিন্নীকে ঠাণ্ডা করি। বুঝিয়ে বলেছি, বাবার নামটী কস্মিন কালেও মুখে এনোনা সতী লক্ষ্মী। আরও কত ঠাকুর দেবতা আছেন, সাক্ষাৎ আমি বিদ্যমান যত খুশী ভজনা কর।

চরণ রায় বেজায় টেরা ; ত্রুটিটুকু সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সজাগ, সারিয়া লইবার চেষ্টায় মাথা বাঁকা করিয়া চাহেন। তিনি বলিলেন, 'আমিও ভাই বুঝিয়ে বলেছি ; ও ছুঁড়িদের সঙ্গে মিশোনা লক্ষ্মীটি। ওদের বয়স আছে :—ডাইনে নিতাই বাঁয়ে গোরা—একটা ছেড়ে আর একটা পাবার ভরসা রাখে। তোমার কোন সুবিধা হবে। আমি ছাড়া ঐ পোড়া মুখীকে নিয়ে কে ঘর করবে ?—বিনয় বচন শুনে গিন্নী যা গাল পাড়ল ভাই,—আমার যে বক্রদৃষ্টি (অর্থাৎ [illegible] তিলোত্তমার মত দেখি না)—সেটা স্মরণ করিয়ে দিলু এক-বিংশ বার। সাক্ষাৎ পরশুনীতা।"

নফর বাবুকে সবাই বলে তোতলা দাদা, নামেই গুণ পরিচয়। ইনি কেরাণী কুলে বাটপাড়, অমন কাজ ফাঁকি দিতে আর কেউ পারে না ধরা পড়িলে হন একেবারে গোতস্কর। তিনি তার বাড়ীর 'রায় বার' বর্ণনা করিলেন।

ব্রাহ্মণীর বাঁ পায়ে বাত, হাটিতে কষ্ট হয়। তবু নবীনাদের পাল্লায় পড়িয়া সভায় গিয়াছিলেন,—নাচিতে নাচিতে ; পায়ে ব্যথা কিনা ? বক্তৃতার নীরভাগ বুঝিতেই পারেন নাই ক্ষীরভাগ গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। সেটুকু এই—পতিজাতি দেবতা নয়, নেহাৎ হতভাগা আর লক্ষ্মীছাড়া। তাদের বেশ কড়া শাসনে রাখতে হয়, নতুবা অকাণ্ড কুকাণ্ড করে, যেমন দেশে ব্রাহ্মণীর নিজের ভাইরা।

শুনিয়া নফরবাবু খুসী হইয়া কুতুর লেলাইয়া দিয়াছেন ; অর্থাৎ সায় দিয়া বলিতে গিয়াছিলেন 'লেহ্য কথা'। লে-

লে-লে-লে বলিতে মধ্যপথে ব্রাহ্মণীর ধমক খাইয়া থামিতে হইয়াছে।

মিত্তির মশাই মধ্যমাকৃতি নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ। দ্বন্দ্ব কলহে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ থাকেন। মধ্যম পরদায় কণ্ঠস্বর এবং (স্বীয় গৃহে ছাড়া অন্যত্র) আহারে মধ্যম পাণ্ডব! সবাই এর নাম রাখিয়াছে মাঝারি মিত্তির। ইনি মাঝারি ধরণের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কাজ কি ভাই গোলেমালে, গিন্নীর সব কথাতেই মাথা দুলিয়ে বলেছি নিশ্চয়, নিশ্চয়, এতো ভাল কথাই। জানি যে দুদিন বাদেই জ্বরের টেম্পারেচার নামবে, ডিলিরিয়মও থেমে যাবে। কথা কয়ে কি লাভ? বেগচ্ছন্দ কথাটি বলেছ কি মরেছ। ওদিকে রেতের বেলা অন্দরের ঘরে পড়বে খিল, থাকো শালা বাইরে। আমার আবার যে ভূতের ভয়, বাইরে থাকা—ও বাবা! ওর মধ্যে আমি নেই দাদা, বড় সাবধানে থাকতে হয়।'

ভটচাজ মশাই বাখরগঞ্জ নিবাসী, দৈর্ঘ্যে অতিশয়, আর প্রস্থে অকিঞ্চিৎ। কটি থেকে শীর্ষভাগ ঐ দীর্ঘায়তনের এক তৃতীয়াংশের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। মানুষটী রোখা চোখা সরল, কথা বার্ত্তায় এমনি তো সামলাইয়া চলেন, eloquent হইতে গেলেই দিশি বুলি বাহির হইয়া পড়ে। তার বাড়ীর বিদ্রোহ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিছু বিচিত্রতর হইয়াছিল তাহাই বর্ণনা করেন।—

"সেদিন বেলা হৈয়া গেল। ত্বরাত্বরি নাওয়া সারিয়া খাইতে গিয়া বইছি, ব্রাহ্মণী কন 'পোলা ধরো, নইলে ভাত দিতে পারুমনা।' এদিকে আফিসের টাইম হইয়া যায়,—নাকে মুখে গুঁইজা দৌড় ছাড়ুম,—'পোলা ধর' মধুর বচন শুন্যাই প্রাণটা হইলেন ঠাণ্ডা। বোঝলাম এ সেই নারীপ্রগতি। একখান ছাপানো কাগজে দেখলাম, সন্তানের দায় ইস্ত্রী পুরুষে ভাগ করা নেও না। হুঁ—দেখাই তোমার প্রগতির পোলা ধরা। পিঁড়ি থেকে উঠ্যা ছাওয়ালটারে ধরলাম ঠিক, আর টিপ কইর‍্যা বসাইয়া দিলাম পোলার মায়ের পিঠের উপুর। গড়ান দিয়া পোলা হইলেন ভূমিস্যাৎ আর গলা ফাটাইয়া কি চৈচান। ঠাকুরাইন হাতা ফেলাইয়া উইঠা কাঁসীর পোলার বাবারে সব তীর্থস্থানে পাঠাইতে লাগলেন। বোঝলাম অদেষ্টে আইজ অনাহারে আফিস প্রগতি; রও, তবে ঘরের পরগতিখান ছাড়াইয়াই দেই।

একটানে জলভরা বালতিটা তুইলা লইয়া দিলাম শ্বশুর-কন্যার মাথায় ঢাইলা। রান্নাঘরের মধ্যেই মায়ে পোএর স্নান হৈয়া গেল! পোলাধন প্রাণপণে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন,—যে ঠাণ্ডা জল। আমি বাইর হইয়া ছোট্লাম আফিসে।

বিকালে গিয়া দেখি শান্তশিষ্ট ছাওয়াল ঘুমাইছে, ঘরের লক্ষী অতি ভব্য-সভ্য; খাবার আনিয়া দিলেন! পান দেবার বেলা উক্তি করলেন,—তোমাগো রাগ না চণ্ডাল, সারাটা দিন না খাইয়া রইছো, আমারও উপোস গেল। ...দেখলা নি এক বালতি জলেই ঠাকুরাইন ঠাণ্ডা হইছে।"

কমলকৃষ্ণ বাবু বেলুড়ের মহারাজদের প্রজা, কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে বৃটিশ সরকারে কাজ করেন। দেহখানি অতি খর্ব্ব আর অতি স্থূল, তদুপরি অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তুল অর্থাৎ মাথা। উভয়ের সংযোগস্থলে গলদেশ নামক স্থান দুর্লভ। ক্ষুদ্রমুখে সর্ব্বদা বড় বড় পরমার্থের ঢেকুর উঠে; একালে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা থাকিতেও লোকেরা সেটা গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া তিনি সদাই শোক করেন।

আজ কিন্তু তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করিতেছিলেন না। মুখের তত্ত্ব প্রদীপ নির্ব্বাপিত শুধু চুরটের সাদা ধূম দেখা যাইতেছিল। তার আশু বিষাদের হেতু এই যে নারী প্রগতির প্রকোপে তার গিন্নীটি বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

ব্যাপারটা অন্যের মুখেই শোনা গেল। কমলবাবুর স্ত্রীটি রুগ্না, বয়স বেশী নয় ২৬।২৭ বৎসর মাত্র। এর মধ্যে অন্যূন দশবার বেচারীকে সূতিকামন্দিরে হাজির হইতে হইয়াছে। দুতিনটী হতভাগ্য ছাড়া আর কোনো সন্তানই ধরাধামে থাকিতে চাহে নাই। কমলসাধু বলেন, ঠাকুরের লীলা, স্ত্রী বলেন, তোমারী লীলা; শরীর আমার ভেঙ্গে গেল, আফিসের ভাত দেওয়া, ছেলেমেয়ে সামলানো আর পারি না। টানাটানির সংসার, ঠাকুর চাকর চলে না আরও বছর বছর টান লাগছে। একটা বছর আমায় বিশ্রাম দেও, বাপের বাড়ী গিয়া থাকি। কমলবাবু বলেন কিন্তু, অকাৎ

ঠাকুরের ইচ্ছা ;—আরও একটা কিন্তু আছে। ফলে বাবু তাকে ছুটি দেন না। এবারে ঐ মহিলা সমিতি থেকে ফিরিয়া গিন্নী জিদ ধরিলেন, তিনি এক বছরের ফার্লো নেবেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিলে বাবুর আফিস থেকে ছুটি মেলে, তার বেলা মিলিবে না কেন? ছুটী মঞ্জুর হউক আর না হউক, কাল থেকে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাবেন।

কমলবাবুর ঠাকুরের ইচ্ছা আর খাটিল না, ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় দুই একদিনের মধ্যেই তিনি স্ত্রীপুত্রাদি কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিয়া বিষাদযোগ অবলম্বন করিয়া আছেন।

কাহিনী শুনিয়া বন্ধুরা কহিল, কাঞ্চনের দায় আমাদের কোনোকালেই নেই ভাই, ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় তোমার কামিনী ত্যাগটা ঘটে গেল।

দেখা গেল, এই প্রগতি-বিপত্তি অনেকের ভাগ্যেই অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল ;—কিন্তু নবীন দলের সুবোধচন্দ্রের বেলা ব্যাপারটা কিছুদূর গড়াইল।

সুবোধ ফিলসফিতে এম-এ, এখন কেরাণী ; গোবেচারা মুখচোরা মানুষ। আফিসের লেজার ঠিক দিতে দিতে এখনও মনে মনে ভাবে, ক্যাণ্ট হেগেল, আর কেরাণী কর্ম্ম—যেমন পাখোয়াজের বোল আর ধোপার কাপড় কাচার তাল। স্ত্রী কমলা আসলে মেয়েটা ভাল, কোমল সরল স্বভাব ; তবে ডেপুটীর মেয়ে এবং ম্যাট্রিক পাস বলিয়া একটু ঝাঁঝ ছিল। এখানে কেরাণীবধূ হইয়া আসিয়া যারা মহিলা সমিতি স্থাপন করেন, কমলা তাদেরি অন্যতমা। এতদিনকার ঘরকন্না বেশ শান্তিতে চলিয়াছে : ইদানীং দুষ্ট ছেলেটাকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া নারীর অধিকার বনাম পুরুষের অত্যাচার সম্বন্ধে সে সচেতন হইতেছিল।

দুই একদিন ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটিও হইল। আরম্ভে ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু শাস্ত্রের আরম্ভের মত একটা "অথ" আছে। কমলার দুই একটা ছোট খাট অসুবিধার কথা ; প্রত্যুত্তরে সুবোধের পরিহাস। খোঁচা খাইয়া এদিকে ওঠে কিঞ্চিৎ উষ্ণ বাষ্প, আর ওদিক থেকে ওঠে এক কুলো ছাই। সর্ব্বত্রই এইরূপ "অথ"।

মাস দুই আগেকার কথা। একদিন সুবোধচন্দ্র আফিস থেকে রাঙামুখো সাহেবের তাড়া খাইয়া আসিল। মনটা ছিল তিক্ত। খোকাকে সামলানো উপলক্ষ করিয়া কমলা নিজের অসুবিধার কথা যেটুকু কীর্ত্তন করিয়া গেল, তার মধ্যে নারীপ্রগতির সুর ছিল ; অন্ততঃ সুবোধের কানে সেই-রকমই ঠেকিল। সে চটিয়া কয়েকটি স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিল। ম্যাট্রিক পাস ডেপুটির মেয়ে উত্তর করিল, দুটো খেতে দেওয়ার বড়াই নাকি? যাচ্ছি আমার মায়ের কাছে,—এ জন্মে আর ফিরছি না। আত্মীয় অনাত্মীয় কত লোক আমার বাপের খেয়ে মানুষ।

সুবোধ চুপ করিয়া গেল। রাগের মাথায় কড়া কথা বলিয়া সে অনুতপ্ত হইয়াছিল। রাঙামুখো সাহেবের ইতিহাস শুনিয়া ডেপুটির মেয়েও পুনরায় কেরাণী-বধূ হইয়া ছেলে কোলে করিল।

আবার কিছুদিন নিস্তরঙ্গ চলিল। তারপরে মহিলা সমিতির উৎসবের বক্তৃতা ; শুনিয়া কমলার শান্ত মনটা আবার কিঞ্চিৎ বিগড়াইয়া গেল।

কমলা মনোযোগ দিয়া বক্তৃতাটা শুনিয়াছিল। আবহমান-কাল থেকে পুরুষের হস্তে নারীদুর্গতি সুরু হইয়াছে, এতকাল কোনো আসান হয় নাই, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নারীরা শিক্ষিতা হইয়াও অন্ধপ্রায় সহিয়া যাইতেছেন, ইত্যাদি কত সাংঘাতিক সংবাদ।

কয়েকটা কথা লইয়া সে মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশী সেবা—সেও তো তাই বরাবর করিয়া আসিতেছে ; শিক্ষিতা পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা মহিলা হইয়াও এটা এতদিন খেয়াল করে নাই। আশ্চর্য্য! এখন হইতে ক্রমে সামলাইতে হইবে। নারীর মর্য্যাদা স্বামীকে সমঝাইয়া দিতে হইবে, তারপরে প্রকৃত ভালবাসা হইবে।

আর একটা কথা ; বক্তা চলিত বিবাহ ব্যাপারের নিন্দা করিলেন,—পরস্পর প্রেম না জন্মিলে বিবাহটা অসঙ্গত। আচ্ছা, যেরূপটা ঘটিতেছে তাতে উভয় পক্ষের ভাল পরিচয় আদৌ ঘটে না, তাহা হইলে তো পুরুষের যে কোনো একটা মেয়েমানুষ হইলেই বিবাহ ও ঘরকন্না চলিয়া যায় দেখিতেছি।

কমলা ভাবিতেছিল, স্বামীর কাছে সে ছাড়া অন্য কো মেয়ে হলেও হত নাকি? এরূপ ভাবিতেই সে ব্যথা পাইল

মনে মনে জানে সেটা কখনও হয় না, হতেও পারে না। কমলার যে আর কাহারও সঙ্গে বিয়ে হতেই পারতো না, বিধাতার কল্পনায়ও অসম্ভব, অদ্ভুত—অন্যায়! ভাবিতেই ছি!

আবার আশ্চর্য্য কথা—সন্তান নাকি হবে ভাগের; একা মা কেন তাদের ঝক্কি সামলাতে যাবেন? কমলার একথা মোটেই মনঃপুত হইল না; বুলুকে কি কেহ তার কাছ থেকে দাবী করিয়া নিতে পারে? স্বামী পালন করবেন! হুঁঃ—ছেলে আগলাইবার যা ছিরি!

সমিতির উৎসবান্তে সুবোধচন্দ্রের গৃহে আবার নারী-প্রগতি ভাংচি কাটিতে লাগিল। একত্র ঘর করিতে হইলে নানাবিধ ক্ষুদ্র নগণ্য বিষয়েই তো পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতা, সহানুভূতি চায় এবং পায়, এটা সহজ সংস্কাররূপে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। প্রতি পদে যদি অভিসন্ধি ও অর্থ খুঁজিতে যাওয়া হয়, তবে এই সামান্য বিষয়গুলিই কলহের পক্ষে অসামান্য হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সুবোধের তত দোষ ছিল না, সে খোঁচা খাইতে খাইতে সব ব্যাপারেই ভূতপ্রগতি দেখিতে লাগিল, এমন কি খোকা তার সামনে কান্না জুড়িয়া দিয়েছে আর কমলা রান্না নিয়া ব্যস্ত আছে, এর মধ্যেও। ওদিকে পুরুষের অত্যধিকার অনধিকার পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল।

সেদিন কমলা রান্না করিতেছে এমন সময়ে খোকা বিছানা থেকে নীচে পড়িয়া গেল। সুবোধের অপরাধ যে সে বারান্দায় ক্ষৌর কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত ছিল, খোকার দিকে নজর দেয় নাই। উভয়ের মধ্যে বাক্ কলহ হইল না কিন্তু বেশী কিছু হইল। কমলা খোকাকে তুলিয়া কঠিন স্বরে বলিল, আমাকে কালই পাঠিয়ে দাও। সুবোধ নির্ব্বিকার জবাব দিল, 'কোনো আপত্তি নাই, তবে দুদিন পরে অনিল যাচ্ছে, তার সঙ্গে গেলেই সুবিধা।'

পাশের বাড়ীতে শ্রীনাথবাবু থাকেন, সুবোধ তার স্ত্রীকে বৌদিদি বলে। এই বৌদি আই-এ পাস এবং সবজজের মেয়ে শুনিয়া কমলা তাকে মান্য করিত। তিনি সুবোধের কাছে কলহের কথা শুনিলেন। কমলাকে ডাকিয়া আদর করিয়া অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কমলা গোঁ ধরিয়া রহিল। তিনি বলিতেছিলেন, "অধিকারটা যে কি এবং তার কতটুকুই আমাদের গেছে, আর যদি গিয়ে থাকে তো ওদের দোষে না আমাদের দোষে, সে সব একবারটী ভেবে দেখেছিস? সেই লেডী মহামহোপাধ্যায় বল্লেন, কাগে কান নিয়ে পালালো আগে কানে একবার হাত দিয়ে ছাখ। দেখতে তো পা[ই] সব জায়গায়, বাবুরা মাসকাবারে আমাদের কাছে মাইনে ফেলে দিয়ে বলেন, যা হয় করগে এ দিয়ে। কত ব[ড়] অধিকার ছাখ দেখি। সব দিক দেখতে শুনতে হয় আমাদে[র] ওরা আবার নিজেরা চলতে পারে নাকি? ওদের আবা[র] অধিকারটা কোথায়—অন্ধ আতুরের সেবা পাবার অধি-কার,—সেটুকু মাত্র। আমরা যত্ন করি, তাই ওরা আছে আর অধিকার চেয়ে নেবো কিনা? যা পাই তাই-ই [...] রাখতে পারি না। তা আবার বেচারারা খেটে খুটে আসে তাদের দুটো মিষ্টি কথা না ব'লে কিনা নারীর অধিকারে[র] বাক্যি শোনাচ্ছ বুঝি রোজ? ভারি অন্যায় তো!"

কমলা নীরবে কথাগুলি শুনিল। ন্যায়ই হউক অন্যায় হউক, একটা কিছুর বাড়াবাড়িকে সে বরাবর ভয় করিয়া আসিয়াছে, এমনটী তাদের মধ্যে না হইলেই হইত। কিন্তু যখন সে জিদ করিয়া বলিয়াছে, চলিয়া যাইবে, তখন তা[কে] যাইতেই হইবে; সন্ধি করিতে তার অভিমানে আঘা[ত] লাগিতেছিল। এমনি ভাবে উপেক্ষা ও ক্ষমা করিতে করিতেই তো মেয়েরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে দাসী বনিয়া যায়। চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিল না; বৌদি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে ভাবিলেন মজাটা টের পাবে।

পরের দিন অফিস ছুটি ছিল। কমলা দেখিল, বিকাল বেলা সুবোধচন্দ্র একটা দেশী কোলজাতীয় মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। ছুঁড়ীটার বয়স পনের ষোল, মিস কালো রং, তবে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য আছে, খোঁপায় রাঙা ফুলের বাহার দুহাতে কনুই পর্য্যন্ত কাঁসার চুড়ি বেড়ি। বিশেষ করিয়া কমলার চোখে পড়িল, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া চলিবার কোনো চেষ্টাই এর নাই—এটা কোলদের জাতিগত প্রকৃতি।

সুবোধ একটু কাসিয়া বলিল, 'পরশু তো চলে যাচ্ছ, এই [ঝি] টাকে ঠিক করেছি; পাঁচ টাকা মাইনে। খাওয়াটা মেসেই চলবে

অন্যান্য সব কাজ এই ঝি করবে।' কমলা আড়চোখে দেখিতেছিল, কথা কহিল না।

সুবোধ কর গণিয়া কাজের হিসাব দিতে লাগিল,—'ঘর দোর বাসন ধোওয়া, কাপড় ধুয়ে শুকুতে দেওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, আর যখন যা দরকার—কেমন পারবি ত ?'

ছুঁড়ী বাঁকা দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'সব করে লিবো বা।'

সুবোধ আবার কাসিয়া কহিল, 'এ দুটা দিন তুমি ওকে একটু শিখিয়ে দিয়ে যেও।'

ঝি দেখিয়া কমলার চক্ষু স্থির! এই সোমত্ত বয়সের মেয়েটা, তাতে ইতর অসভ্য, এমনি যে গায়ে বুকে কাপড় নাই—স্বামী একলা থাকিবেন, তার কাজ করিবে একা নিরালা বাসার মধ্যে! এত সব কথা এবং আরও কত কি অকথ্য কথা তার মনের মধ্য দিয়া ঘোড়দৌড় করিয়া গেল। সে আর কথা না বলিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেল।

সুবোধের ইঙ্গিত পাইয়া ঝি ছুঁড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞি কোন কাজটি করবো মায়ীজে ?'

মায়ীজে খামকা ধমকাইয়া বলিলেন, 'ও কি নে, জিজ্ঞেস কর তার বাবুকে!' ঝিটা রক্তদন্ত বাহির করিয়া হাসিল দাঁতগুলায় কমলার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

সুবোধ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে জবাকুসুম তৈলের সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল, কমলা তার পাশে গিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সত্যি সত্যি এই ঝি রাখবে নাকি ?'

সুবোধ মাথা তুলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'তার মানে ? তুমি কি নিজেই বাসন কোশন ধুয়ে নেবে নাকি ? কোনো দিন করতে দেখেছ ? পারিতো না-ই আর সময়ও হবে না।"

কমলা বলিল 'ঐতো মনিয়ার মা আছে, ওকে ঠিক করে। কেন ? আমি বলে দিচ্ছি।'

সুবোধ উত্তর করিল 'ক্ষেপেছ—ও বুড়ীটা সব কাজ করবে তবে ? আর রাত বিকালে চা জল গরম দরকার হ'লে ওর মাকে কোথা পাব বল, সে তো সন্ধ্যার আগেই চলে যায়। এই নতুন ঝি রাত দশটা নাগাদ কাজ করতে বাজি। কত সুবিধা!'

রাত দশটা! কমলার চোখের উপর দিয়া কত কি ছবি সব চলিয়া গেল, তার নাম রূপ কেউ জানেনা। মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, 'এই বয়সের মাগীকে ঝি রাখা চলবে না তোমার, বলে দিচ্ছি ;—হারামজাদীকে এখনি বিদায় করছি।—'

সুবোধ অতিকষ্টে হাসি গোপন করিল। চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, 'বল কি, আপত্তি কিসের ?'

আপত্তিটা যে কোথায় সেটা কমলা কোনো ক্রমেই পরিষ্কার স্বীকার করিল না, গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবখানা যেন 'ঐ যে মামদো না তাড়িয়ে সে নড়িবেনা। সুবোধ শান্তশিষ্ট মানুষ, কমলাকে বিদ্রূপ করিতেও তার মন সরিতেছিল না। তবু বৌদিদির হুকুম, দু-একটা কড়া কথা শুনাইতে হইবেই। সেটা যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিবার চেষ্টায় মথা নাড়িয়া কহিল, "হুঁ, তবে ব্যাপারখানা বোঝা গেল। আমরা তো দেখি বয়সের পুরুষ চাকর বাসায় বেশ সারাটা দিন দিব্যি নিশ্চিন্তে আফিসে কাটাই, তোমরা আমাদের বেলা তেমনটি পার না বুঝি। এটা বুঝি সমানাধিকারের বাইরে কিছু ? এই মন নিয়ে নারীপ্রগতি কর ? থাক সে তর্ক,—তোমাদের প্রগতি, তোমরা জানো। আমার খুশী ওকে রাখবোই, এই পরশু থেকেই—"

বাধা দিয়া কমলা বলিল,—'আমার খুশী আমি রাখবো না, তো দেখি কে আমাকে পাঠায়।'

যে অভিযোগ তুলিয়া সুবোধ ভূমিকা করিয়াছিল সেটা ফাঁকতালে পড়িয়া রহিল ; সেটা এতই অসঙ্গত যে কমলা তার কোনো জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করে না।

আর ছল আভিনয়ের প্রয়োজন ছিলনা। সুবোধ এতক্ষণ সামলাইয়া ছিল, এবারে কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দুর্দ্দিন নিমেষে কাটিয়া গেল, দেখা গেল সে হাসির প্রতিচ্ছবি যথাস্থানে দেখা দিয়াছে।

তারপরে—একটা কিছু—। তারপরে কমলা খোকাকে কোলে তুলিয়া সরিয়া গেল। সে বেটা দুজনের সংঘর্ষে পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল, হয়ত ভাবিয়াছে, এবার বুঝি বা মারামারি!

অনতিবিলম্বে নবাগতা ঝি অঙ্গভঙ্গি করিয়া গাহিতে গাহিতে বিদায় হইল,—"ছেউয়ার মায়ের লাজ নাহি লাগে-এ-এ-এ।" তার কাঁধে কমলার একখানি ভাল সাড়ী, চুক্তিভঙ্গের দরুণ ক্ষতিপূরণ।

সুবোধের বাড়ী নারীপ্রগতি এ যাবৎ আর দেখা দেয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে"

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি মহুয়ার কবিতা—
"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।"
ঈষৎ এলায়িত তোমার তনুদেহ
অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি,
মন ভেসে গেছে কোন্ গভীর রহস্যের সন্ধানে।

বারান্দার পশ্চিম কোণে ছায়া-স্নিগ্ধ বকুল গাছ
তার পাতাগুলি চাঁদের আলোয় রূপালি,
দূরে কাঁসাই নদীর ক্ষীণ শুভ্র জলধারা,
দিগন্তে সারি সারি বাতির মালা,
তন্দ্রামগ্ন বসুন্ধরার মুখে
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ স্বপ্ন।

কাবগুরুর এই কবিতার মধ্য দিয়ে
ভেসে এল যে স্মৃতি
বহুযুগের বহু শতাব্দীর পার হতে—
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু গুঞ্জনে,
এই তারায় ভরা রাত্রির নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মতো—
বলতে দাও তাই তোমার কানে কানে।

পশুত্বের গণ্ডী এখনো পার হয়নি
গিরিগুহা[illegible] মানুষ,
চোখে দেখার, কানে শোনার অতীত কোনো বার্ত্তাই
পৌঁছায় না মনে।
প্রয়োজনের দাবী মেটাতে প্রচণ্ড বাহুবল
প্রতিদ্বন্দ্বীদের [illegible]র প্রাচীর
[illegible] আনি তোমায়।

সেদিনকার সে হিংস্র মূর্ত্তি
আঁকা আছে আজো সুনিবিড় বনভূমিতে
গিরিকন্দরে
অসভ্যদের দেশে।

তারপর রোমাঞ্চিত চেতনায়
একদা উদয় হল মানব জীবনের কৈশোর।
চেয়ে দেখি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে
ফুলে ফলে ভরে ওঠে পৃথিবী,—
মানুষের সম্পদের প্রসূতি।
তেমনি ত তুমিও!
ওগো নবজীবন দাত্রী
তোমা হতেই প্রাণের প্রবাহ
আবহমান প্রাণের ধারা তুমিই রেখেছ সঞ্জীবিত।
সেদিন কৈশোরের বাকলি দিয়ে
তোমার জন্যে যে স্তবগান করেছি রচনা
সে আমার অপরিণতির দৈন্যে
মুগ্ধ ললিত গীতিকার তোমার মন ভোলাবার করুণ প্রয়াস।
অনেক মন্ত্রে অনেক তন্ত্রে
সাড়ম্বরে করেছিলাম তোমার পূজার আয়োজন
অথচ বর্বরতার মোহ তখনো কাটে নি,
তাই তোমাকে দেখেছিলাম
খুব বড় ক'রে এবং খুব ছোট করে।
তোমার সত্যরূপে নয়।
ধরণীর ধূলিতে স্বর্গ খেলনা খেলেছি,—
স্বর্গও ভেবেছি তোমায়,
খেলনাও ভেবেছি।

বিচিত্রা

অন্ধমুনি ও মুনিপত্নী

শ্রীমহিতোষ বিশ্বাস

ফাল্গুন, ১৩৪৩

সহসা নবকুসুমের উগ্র সৌরভে
বসন্তমদির বনবীথিতে অতি চঞ্চল রক্ত স্রোতে
দ্রুত সঞ্চারিত হল প্রথম প্রণয়ের বেদনা।
প্রণয়ভীরু মন,
বাস্তবের অভিজ্ঞতা নেই, আছে শুধু কল্পনার অলীক সঞ্চয়,
তাই মোহময় স্বপ্ন দিয়ে
পঞ্চশরের বেদনামধুর বাসর রাত্রির করল রচনা।

এল একদা-যৌবনের পরিপূর্ণ বেগ
শিরায় শিরায় উৎসারিত হল
পৌরুষের সাধনা দৃঢ় আত্মনির্ভরতার সঙ্কল্প।
নিজেকে জানলাম।
জানলাম অর্দ্ধান্ধকার গৃহকোণে
ধ্যানস্তিমিত দীন ভক্তের আসন আমার নয়।
তুমি আর প্রয়োজনের দাবী মেটাবার পথচারিণী
সঙ্গিনীমাত্র রইলে না
স্বপ্নচারিণী দেবীও নয়।
সেইদিন প্রথম হলে তুমি প্রিয়া
হলে তুমি প্রেয়সী।
মরলোকের দেহপিণ্ডমাত্র নয়
সুরলোকের সুদুর্লভ দেবতাও নয়,
প্রিয়া, প্রেয়সী।
জানলাম আমার অন্তরের শক্তিতে
আমি রুক্ষ দিনের দুঃখকে করব জয়
জরাপঙ্কিল নিষ্ক্রিয় শান্তির পাশকে করব ছিন্ন,
অশান্তির খরস্রোতে নির্ভয়ে ভাসাব আমার তরী।
বিপদের নদী পার হতে যদি ভাঙে হাল
ছেঁড়ে পালের কাছি
তবু আমি নির্ভয়।
যদি মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায়
যাবার সময় দিয়ে যাব এই বাণী তোমার কানে
আমাদের প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।
উদাস হাওয়ায় উৎসাহময় বাজবে এ বাণী—
কিসের ভয়, তুমি আছ আমি আছি।

জীবনের গৌরব মৃত্যুর চেয়ে কম নয়
ভুলিনি এ কথা।

তোমার প্রেম অর্জন করতে বহুকালের বহু প্রয়াসের পথ
এক নিমেষে অতিক্রমের উন্মত্ততায়
দৈববলের জন্যে লালায়িত হব না কোনোদিন।
প্রতিদিনের অটুট উদ্যমে, ধৈর্য্যশীলতায়
তিলে তিলে জয় করে চলা মরুপথের তাপ সইব দুজনে
তুমি আর আমি, আমি আর তুমি।
আমাদের প্রেম ফসল ফলাবে যে মরুদ্যানের মাঝে
কোনো সুলভ মরীচিকা দেখে ভুল করব না তাকে।
তোমার সত্যরূপ নেব চিনে
আমারো সত্যরূপ দেখাব তোমায়।
কোনোদিন প্রতারণা করিনি কেউ কারো কাছে
এই হবে আমাদের নিবিড়তম পরিচয়।

হয়ত এ পথের শেষ হবে এ জীবনে
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
হয়ত বা হবে না।
না হয় দুঃখ যেন না করি কোনো দিন।
সিদ্ধির চেয়ে সাধনাও ত ছোট নয়।
পথের শেষ হোক্ বা না হোক
পথের মাঝে সঙ্গ যে তোমায় পেলাম
এতেই হলাম ধন্য।
পথে চলার এই যে গান
এই যে মোদের নববেদ,—
যে ঋষি দিলেন এ গান তাঁকে প্রণাম করে তোমায় বলি-
'এ বাণী প্রেয়সী হোক্ মহীয়সী, তুমি আছ আমি আছি।

ছায়াস্নিগ্ধ বকুল গাছের
চাঁদের আলোয় রূপালি পাতায়,
কাঁসাই নদীর জলধারায়
দিগন্তের সারি সারি বাতির মালায়
আমার মনের প্রদীপশিখা ভাসিয়ে দিলাম
তোমার মনের দেউল পানে।
আলোকে তার চির-নির্ভয়
জয়যাত্রার বাণী বাজে—
কিসের ভয়, কিসের ভয়
তুমি আছ আমি আছি।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

শ্রীঅরবিন্দের যোগ *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অনুবাদক—শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

শ্রীঅরবিন্দ যখন বলিয়াছিলেন—"আমাদের যোগ আমাদের জন্য নহে, মানবজাতির জন্য," তখন অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে এই মহা-পুরুষটিকে, যাহা হৌক, পৃথিবী একেবারে হারায় নাই; ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে সন্ন্যাসীগণের জন্ম দিয়া আসিতেছে—সম্ভবতঃ ভারতের নিজের, মানব জাতির, (অথবা এমন কি তাঁহাদের নিজেদেরও) বিশেষ কোন লাভ তাহাতে হয় নাই—তাঁহাদের দীর্ঘ তালিকায় সংযোজিত হইবার আর একটি নাম তাঁহার নহে। লোকে মনে করিয়াছিল যে তাঁহার যোগ মানব জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত আধুনিক এক সাধনপন্থা। মানব জাতির সেবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার মর্ম্মকথা না হইলেও অন্ততঃপক্ষে উহা তাহার সফল পরিণাম ও পরিপূর্ত্তি। তাঁহার যোগ যেন একপ্রকার স্কুমার শিল্প যাহা অদৃশ্য কতকগুলি শক্তির আবিষ্কার ও প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সার্থকভাবে মানব জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ—কেবল যুক্তিপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন যে তাঁহার উক্তির এই সাধারণ ব্যাখ্যা দ্বারা লোকে তাহার শিক্ষার মূল সত্যটি হইতেই বিচ্যুত হইতেছে। সুতরাং তিনি তাঁহার কথাগুলি পরি-বর্ত্তিত করিয়া বলিলেন—"আমাদের যোগ মানব জাতির জন্য নহে, ভগবানেরই জন্য।" কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই যে নূতন পরিবর্ত্তন ইহা অনেকস্থলে সাদরে গৃহীত হয় নাই; কারণ উহাতে তাঁহাকে দেশের বা বিশ্বের কাজের জন্য ফিরিয়া পাইবার সমস্ত আশা তিরোহিত হয় এবং লোকে আবার তাঁহাকে স্বপ্নালু দার্শনিক—জাগতিক ব্যাপারসমূহ হইতে সুদূরে অবস্থিত অক্ষর ব্রহ্মেরই মত—বলিয়া মনে করিতে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ যে আদর্শের জন্য যত্ন করিতেছেন তাহার স্পষ্টতর একটা ধারণার জন্য, তিনি আমাদিগকে যে দুইটি মন্ত্র দিয়াছেন ঐ দুইটি সম্মিলিত করিয়া লইয়া বলিতে পারি তাঁহার উদ্দেশ্য মানব জাতির মধ্যে ভগবানের উপলব্ধি ও প্রকাশ। মানব জাতির সেবা তিনি এই হিসাবেই করিতে চাহেন অর্থাৎ মানব জাতির ভিতর তিনি ভগবানকে প্রকট ও শরীরী করিয়া তুলিতে চাহেন। তাঁহার লক্ষ্য বৃহত্তর ঋদ্ধি মাত্র নহে; পরন্তু একটা পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর সাধন—মানব জাতির ভাগবতায়ন।

এখানেও কতকগুলি সম্ভাব্য ভুলধারণার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। মানব জীবনের রূপান্তর বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে না যে সমগ্র মানব জাতিই দেব জাতিতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইতেছে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর একটা মানবগোষ্ঠীর বিবর্ত্তন বা আবির্ভাব ঘটিবে—যেমন মানুষ ক্রমবিকাশের পথে পশুত্বের স্তর হইতে উন্নততর একটা জীবের স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, এমন নয় যে সমস্ত পশু রাজ্যটাই মানবজাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ একটা পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ইহা যে কেবলমাত্র সম্ভব তাহা নহে, ইহা অনিবার্য্য। মনে রাখিতে হইবে যে, যে শক্তি এই পরিণতি আনিয়া দিবে এবং যাহা ইতিপূর্ব্বেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে

* The Four Arts Annual, 1935 এ প্রকাশিত "Sri Aurobindo's Yoga" হইতে অনুদিত।

উহা কোন ব্যক্তিগত মানবীয় শক্তি নহে—তাহা যত বড়ই হৌক না কেন—কিন্তু ভগবান স্বয়ং ; ভগবানের আপন শক্তি এই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পরম পরিণতির জন্য ক্রিয়াপর হইয়াছেন।

এইখানেই রহস্যের মর্ম্ম—সমস্যার সন্ধান নিহিত আছে। অতিমানব বা দেবজাতির অভ্যুদয় যতই বিস্ময়-জনক ও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হৌক না কেন উহা বস্তুতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার যথার্থ কারণই হইল এই যে, কোন মানবীয় প্রতিনিধি নয়, ভগবান স্বয়ং তাঁহার পরম সামর্থ, জ্ঞান ও প্রেমে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানের অবতরণ এবং তাহার বিশুদ্ধি ও রূপান্তর সাধনপূর্ব্বক সেখানেই অবস্থান ইহাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধনার সম্যক তথ্য। সাধককে হইতে হয় শুধু প্রশান্ত ও আত্মস্থ ধীর অস্পৃহাপরায়ণ ও উন্মুক্ত, সম্মতিশীল ও গ্রহণক্ষম। তাহার নিজের কোনও কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, করা উচিতও নয়, তাহার যাবতীয় কর্ত্তব্যের ভার ঐশী গুরু ও পথপ্রদর্শকের উপরই ন্যস্ত করিতে হয়। অতীতে অন্য সব যোগপন্থা বা অধ্যাত্ম অনুশীলন চেতনার ঊর্দ্ধে আরোহণ, ভাগবত চেতনায় তাহার উদ্‌গতি এবং পরিশেষে উহার মধ্যে তাহাকে মিলাইয়া, বিলোপ করিয়া দেওয়ার উপরই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল। কর্ম্মমুখী ও ব্যবহারিক মানুষী প্রকৃতিকে ভগবানের সুস্পষ্ট আবাসস্থানরূপে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার জন্য ভাগবত চেতনার অবতরণের কথা পূর্ব্বে আলোচিত যদি হইয়াও বা থাকে, অতীতের সাধনা ও সিদ্ধির উহা প্রধান বিষয় ছিল না। অধিকন্তু এখানে যে অবতরণের কথা বলা হইতেছে তাহা ভগবানের চেতনা-বিশেষের অবতরণ নহে—কেননা, ভাগবতচেতনার বহু স্তর-ভেদ আছে—তাহা হইতেছে সত্যাত্মক-শক্তি-বিধৃত ভগবানের আপন চেতনার অবতরণ ; কেননা উহাই প্রত্যক্ষভাবে এই যুগের যে বিবর্ত্তনশীল রূপান্তর তাহা সংসিদ্ধ করিয়া চলিয়াছে।

অবতরণের প্রকৃত অর্থ কি, কিরূপে তাহা ঘটে, তাহার কাজের ধারা সব কেমন, কি কি ফল উহা আনিয়া দেয়, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু বলিব অবতরণের সাধারণ কথাটি—অবতরণ প্রকৃতই অবতরণ। ভাগবত আলো প্রথমতঃ মনে নামিয়া আসিয়া সেখানে শুদ্ধির কাজ আরম্ভ করে—যদিও অন্তঃহৃদয়ই (inner heart) প্রথমে ভাগবত স্পর্শকে চিনিয়া লয় এবং ভাগবত কার্য্যে তাহার সম্মতি দান করে—কারণ মন অর্থাৎ ঊর্দ্ধতর মনই (higher mind) হইল সাধারণ মানব-চেতনার শীর্ষভূমি এবং উপর হইতে যে দিব্য জ্যোতিঃপ্রবাহ সব নামিয়া আসে উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সত্বর গ্রহণ করিতে পারে। মন হইতে সেই আলো আবেগ ও বাসনার স্থূলতর ক্ষেত্রসমূহে জীবনে ও কর্ম্মে, কর্ম্মমুখী প্রাণে, সর্ব্বশেষে পাশব জড়ের মধ্যে, কঠিন তিমিরাচ্ছন্ন নিরেট স্থূল শরীরে প্রবেশ করে, কারণ উহাকেও আলোকিত, সেই পরা জ্যোতির রূপায়তন ও মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। অবতরণমুখী করুণার আধার ভগবান সেই দিব্যস্থপতি—যিনি ধীরে ও অব্যর্থভাবে মানবপ্রকৃতি ও মানবজীবনরূপ এই বহুপ্রকোষ্ঠময় ও বহুতল-বিশিষ্ট ইমারৎখানি ভাগবত সত্যের পরিপূর্ণ লীলা ও ছন্দে গড়িয়া তুলিতেছেন। কিন্তু, বিষয়টি গূঢ় ও জটিল—ইহার অন্তরঙ্গ আলোচনা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সাধক যোগ রহস্যের মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে ও নব-দীক্ষিতের পক্ষে প্রাথমিক অপরিহার্য্য বিষয়গুলি অধিগত করিয়াছে।

অন্য একটি প্রশ্ন যাহা সাধারণ মানুষের মনকে পীড়িত ও বিহ্বল করিয়া তোলে তাহা হইতেছে কাজটি সম্পন্ন হইতে কত কাল লাগিবে—ইহজন্মে, না, এখন হইতে সহস্র বৎসর পরে অথবা উপমাস্বরূপ যেমন কেহ বলিয়াছেন—সুদূর ভবিষ্যতে, কোনও জ্যোতিষিক মাপের পরে—যখন সূর্য্য শীতল হইয়া যাইবে, তখন ? কাজের গুরুত্বের তুলনায় এই কথা বলিলে যুক্তিসঙ্গতই হইবে যে আমাদের সম্মুখে সমগ্র অনন্তকাল পড়িয়া রহিয়াছে এবং শতাব্দী এমন কি সহস্র বৎসরও যদি এইরূপ কাজে প্রয়োজন হয় তবে তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবার কিছুই নাই ; কেননা অতীতের অগণিত সহস্র সহস্র বৎসরের বিপর্য্যয়সাধন এবং সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের পুনর্গঠন ভিন্ন এ কার্য্য আর কিছুই নহে। যাহা

হৌক, আমরা যেমন বলিয়াছি—যেহেতু ইহা ভগবানের আপন কাজ এবং যেহেতু যোগের অর্থ কাজের একটা সংক্ষিপ্ত (concentrated) ও অন্তর্লীন (involved) ধারা যাহা, স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হইতে গেলে হয়তো বহুবর্ষ লাগিত এমন কাজ মুহূর্তে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে, সেই কারণে বিলম্বে নয়, যথাসম্ভব শীঘ্রই এই কাজ সংসিদ্ধ হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক আদর্শ হইতেছে "এখন এবং এখানেই"—এইখানে এই পৃথিবীতে, পার্থিব অবস্থানেরই মধ্যে এবং বর্তমানে, ইহজীবনে, এই শরীরেই—পরকালে বা অন্যত্র নয়। সেই কাল কত দীর্ঘ তাহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, কিন্তু বর্তমান জীবন বলিতে কয়েক বৎসর এ দিকে বুঝি বা ও দিকেই বুঝি তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই দিব্য সংসিদ্ধির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আবার বলি যে একথাটি আসল বিচার্য্য বিষয় নয়। পরিমাণ নয়, পদার্থ লইয়াই কথা। যদিচ ইহা ক্ষুদ্র একটা কেন্দ্রই (nucleus) বা হয় তবে তাহাই যথেষ্ট—অন্ততঃ প্রারম্ভের পক্ষে—অবশ্য যদি তাহা প্রকৃত ও খাঁটি জিনিষ হয়—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এ সকলের প্রমাণ কি—লোকে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে কিনা, কপোল কল্পনাকে অনুসরণ করিতেছে কিনা, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? আমরা বাইবেলের ভাষায় বলিতে পারি যে খাদ্যের প্রমাণ নির্ভর করে খাওয়ারই উপর।

উপসংহারে, স্পষ্টতঃ সুকুমার শিল্পের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থে এই কথা কয়টি অন্তর্ভুক্ত করিবার সপক্ষে একটি কথা আমার বলিবার আছে। কারণ, আধ্যাত্মিকতাকে অন্যতম চারু বিদ্যা (Art) হিসাবে কি করিয়া গণ্য করা যায় অথবা এই রাজ্যে সম্মানজনক একটা স্থান কি করিয়া তাহাকে দেওয়া চলে? এক দিক হইতে দেখিতে গেলে, মূল ও আভ্যন্তরীণ সত্যগুলির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আধ্যাত্মিকতা যাবতীয় চারু বিদ্যার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও তাহাদের ভিত্তিস্বরূপ বটে। সুকুমার শিল্পের যদি উদ্দেশ্য হয় বস্তুর অন্তরাত্মাকে প্রকাশিত করিয়া ধরা এবং যেহেতু বস্তুরাজির সত্য অন্তরাত্মা তাহাদের ভাগবত সত্তা, তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে সজ্ঞান সংস্পর্শে আসিবার যে অনুশীলন, তাহাকে সুকুমার শিল্পের রাজ্যে রাজোচিত আসন দিতে হয়। তদব্যতীত, এক হিসাবে আধ্যাত্মিকতা সমুদয় সুকুমার শিল্পের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠই এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—কেননা ইহা জীবন-শিল্প। জীবনকে সৌন্দর্য্যে অনবদ্য, ছন্দে নির্দ্দোষ, শক্তিতে পরিপ্লুত, জ্যোতিতে ভাস্বর, আনন্দে স্পন্দিত—এককথায় ভাগবত বিগ্রহ করিয়া গড়িয়া তোলাই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে আধ্যাত্মিকতা—যে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দ করিতেছেন তাহা—শিল্পের পরম পরাকাষ্ঠা।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত
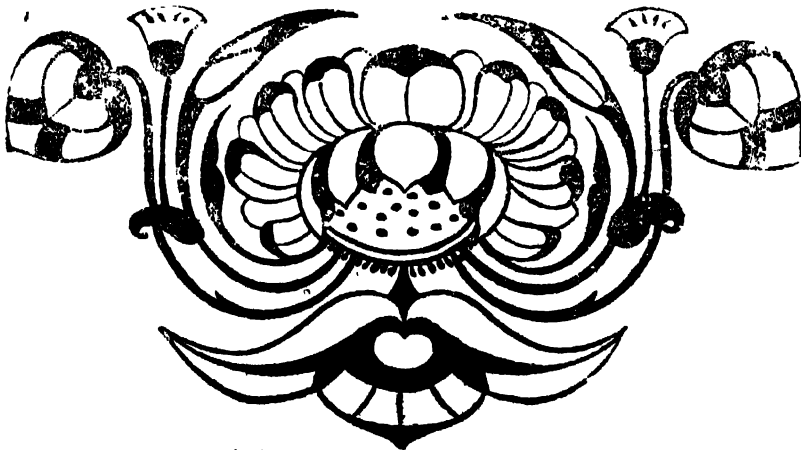
কুরুক্ষেত্র

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্-এ

একদল স্কুলের ছেলে স্বাভাবিক মিহি-গলা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল, ভোট—ফর—। আর পেছনে তাদের নেতারা তাদের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বাকিটা পূরণ করে হাঁক দিলে, ন-রে-ন-বাবু—। আশে পাশে বাড়ীগুলোর জানালার খড়খড়ি চঞ্চল হয়ে উঠল উৎসুক দৃষ্টির আগ্রহে। পাড়ার বারোয়ারী কুকুরগুলো সহসা সজাগ হয়ে একসঙ্গে হাঁকাহাঁকি সুরু করে দিলে। ছোট ছেলে মেয়ের দল বাইরে এসে ভিড় করে তুললে। তাদের অভ্যস্ত জীবনে এ রকম ঘটনা নিতান্ত অপরিচিত।

কোলকাতা থেকে সাড়ে সাত ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে ছোট্ট নগর। নগরের কিছুই নেই কিন্তু নাগরিক জীবনের আছে সব। ইংরেজী বিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার রেলচত্বর, সুবৃহৎ বক্তৃতাঘর,—ছোট্ট একটি মিউনিসিপ্যালটিও। রাজধানীর আশেপাশে এই সব সহর গ্রামগুলো কোলকাতার যেন বস্তিবিশেষ। এদের মধ্যে আছে কেবল রাজধানীর মধ্যবিত্ত কেরাণী, কারবারী ঠিকেদারের বসতি। বিদেশী বণিকরাজের এরাই সবচেয়ে বড় বাহন। বছরের ৩৬০ দিন বাইশঘণ্টা এদের বৈচিত্র্যহীন জীবন একটানা, মামুলি স্রোতে ক্ষীণগতিতে বয়ে যায়। এত ক্ষীণগতি যে তা' সহজে কারো চোখে পড়ে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এরা যেন বুজে যাওয়া, সরু খালের বুকে নিস্তেজ, নিশ্চল, শৈবাল।

যে অল্প কয়টা দিন এদের জীবনে ডেকে ওঠে, ভাদ্রের বান নিষ্প্রভ আকাশে জ্বলে ওঠে, পূর্ণ চাঁদ, অন্তরের কোনে স্তিমিত-মান দীপ শিখাটি সহসা হেসে ওঠে,—তাদের একটি হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সানের দিন। শিবনগরের নাগরিক জীবনে তাই জেগে উঠেছে বসন্তের চাঞ্চল্য। কাল শনিবার মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সান।

মাসাবধিকাল শিব গ.র। সংখ্যা তিন মিউনিসিপ্যাল বিভাগে মাতামাতির আর অন্ত নেই। মাত্র একটি আসনের জন্যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন আটজন। কিন্তু অসুবিধা দেখে ক্রমে ক্রমে সকলেই সরে পড়েছেন। বাকি আছেন কেবল দুজন। কাল এঁদের মধ্যেই হবে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটু ইতিহাস আছে। ইলেকসান আবেষ্টনের বাইরে তার সূত্রপাত।

এমন একদিন ছিল যখন শিবনগরের ছেলেবুড়ো সকলের কাছেই মনে হত ভবেশ আর নরেনের বন্ধুত্ব জলহাওয়ার মত স্বাভাবিক ঘটনা। ভবেশ জমীদারের ছেলে আর নরেনের বাবা ছিলেন গ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ভবেশ অন্ততঃ নরেনের চেয়ে বছর ছয়েক ছোট। তবু এই দুটি অসমবয়সীর মধ্যে শিশুকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল সুনিবিড় মৈত্রী। তা আরও ঘণীভূত হয়ে উঠল যখন নরেনদার আদর্শ অনুসরণ করে বিদ্রোহী ভবেশ কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে বাবার একান্ত অমতে স্বরাজ সাধনায় যোগ দিলে। শেষে দুজনেরই একসঙ্গে হল জেল।

মুক্তির পর ভবেশ দেশে ফিরে এসে দেখলে, দেশের ভাগ্যে স্বরাজ মেলেনি বটে সে কিন্তু হয়ে পড়েছে অগাধ ঐশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর। ইতিপূর্ব্বেই তার বাপ মারা গেছেন। নরেনও যথাসময়ে গ্রামে ফিরে এল। কিন্তু তার মাথার মধ্যে রয়ে গেল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং জাতির উন্নতির চিন্তা। সে আজ প্রায় তের বছর আগেকার কথা। তারপরও বহুদিন নানা সুখদুঃখের মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। সম্পূর্ণ বিভিন্ন কাজে থেকেও কোনদিন বিচ্ছেদ ঘটেনি। বরং অন্তরঙ্গদের মধ্যে বলাবলি হত, নরেন না থাকলে ভবেশকে আর জমীদারী করতে হতনা। মনে আর

রেগে শেষ হয়ে যেত। কথাটা সত্যি। অভিভাবকহীন ভবেশের জীবনে ইতিমধ্যে একদিন উচ্ছৃঙ্খলতার একটা ছোট্ট কলুষিত পরিচ্ছেদ এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু নরেনের কৌশলে ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে পায়নি। ভবেশ এর জন্যে চিরকৃতজ্ঞ। একদিন নরেনকে গদগদ কণ্ঠে বলেছিল, 'জীবনে কারো কাছে যদি ঋণী থাকি, সে শুধু তোমার কাছে নরেনদা। তোমার মত বন্ধু লোকে পায়না।'

কিন্তু গোলযোগ বাঁধল বছর দুই আগে। ভবেশের পিতৃপুরুষের দানে গ্রামের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাগীরথীর তীরে বিশাল প্রাঙ্গনের মধ্যে বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য অট্টালিকা ওরই কোন পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি। এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশে দেশে। এখন আর জমীদারের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। প্রতিষ্ঠানটি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। ভবেশের এতে আনন্দ বই দুঃখ নেই। তার কাছে বংশের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কীর্ত্তি হিসাবে এ বড় যত্নের জিনিষ। কিন্তু সরকারী সেটেল্‌মেণ্টের কাজ সুরু হতেই সমস্যা উঠল, বিদ্যালয়ের জমি এবং বাড়ীর অধিকারী কে? ভবেশের পক্ষ থেকে দাবী এল, 'বিস্তৃত জমীর উপর এই আমার পিতৃপুরুষেরা বাস করবার জন্যে তৈরী করিয়েছিলেন। বাড়ী কিংবা জমী কিছুই বিদ্যালয়কে পাকাপাকি যে নিঃসর্ত্তে দান করা হয়নি! শুধু বিনাভাড়ায় স্থানদান করা হয়েছিল মাত্র। এ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী আমি শ্রীভবেশ রায়।'

নরেন তখন জেলা কংগ্রেসের নায়ক। কংগ্রেস কর্ম্মী হিসাবে বাংলাদেশে তার নাম সুপরিচিত। গ্রামের নানা সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভবেশের ইচ্ছানুক্রমেই সে ঐ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিল। ভবেশের অন্যায় দাবীর কথা শুনে সে অনেক বোঝালে কিন্তু গঙ্গার তীরে অমন স্বাস্থ্যকর স্থানে বহুমূল্য সম্পত্তি হাতছাড়া করতে জমীদার ভবেশ কিছুতেই রাজী হলনা। গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা একজোট হয়ে রাহুর গ্রাস থেকে সাধারণের সম্পত্তি উদ্ধার করার ব্যবস্থা করলেন। সত্যের খাতিরে নরেনকে গ্রহণ করতে হল তাদের নেতৃত্ব।

সেই থেকে ঝগড়ার সূত্রপাত। ওদের সেদিনকার বন্ধুত্ব ছিল যেমন নিবিড়, আজকের শত্রুতা হয়ে পড়েছে তেমনি ধারাল। দুপক্ষের অজস্র অর্থব্যয়ের পর মোকদ্দমার জের মিটল কিন্তু এদের শত্রুতার আর শেষ হল না। ফলে দুজনকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রাম্য দল গড়ে উঠল। নেতাদের চেয়ে তাদের শত্রুতা আরো ধারাল। আত্মকলহের বিষে শিবনগরের সামাজিক জীবন গত দুবছর ধরে বিষাক্ত হয়ে পড়েচে।

সংখ্যা তিন বিভাগের মিউনিসিপ্যাল আসনটির জন্য যারা কাল পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের একজন ভবেশ আর একজন নরেন। কালকের ভোটযুদ্ধের পরিণাম দেখার জন্য গ্রামের অনেকেই উৎসুক হয়ে আছে। কারণ, অন্যান্য বিভাগে দু-পক্ষের যে-কেউ হোক একজন জিতবেই। তাতে ঔৎসুক্যের আকর্ষণ নেই। কিন্তু সংখ্যা তিন বিভাগে শিষ্যপ্রশিষ্যদের চক্রান্তে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে দু-দলের দুই দলপতি। এদের সাফল্যের উপরেই আসন্ন মিউনিসিপ্যাল সমিতিতে সভাপতি নির্ব্বাচণ নির্ভর করবে। দু-দলই খুব উৎসাহশীল। শক্তিতে কউ কারো চেয়ে হীন নয়। একদিকে আছে অতুল সম্পত্তির প্রভাব আর একদিকে অকুণ্ঠিত দেশসেবার প্রতিপত্তি। অবশ্য এত কথা সাধারণ লোকেরা ভাবেনা। সকালে অসময়ে যাহোক দুটি মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে এরা কোলকাতার কর্ম্মস্থলে যায়। তারপর সমস্তদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়ী এসে আর কিছুতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেবার মত উৎসাহ ও শক্তি এদের অনেকেরই থাকে না। এদের এই ঔৎসুক্য খুব হাল্কা ও ফিকে। দুদলের যে-ই দাঁড়াক না কেন, এই ইলেকসানের পর নতুন ইলেকসান আবার আসন্ন হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাদের খুব কমই থাকবে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ভবিষ্যৎ পরিণামের চিন্তায় তারা উৎসুক নয়। কালকের রণস্থলে হয়ত অনেকে উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু কালকের কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগ-পর্ব্বে মাসাবধিকাল ধরে গ্রামের মধ্যে যে কুৎসা, কলহ ও কেলেঙ্কারির অন্ত নেই, তার মধুর নেশা জনসাধারণকে চঞ্চল করে তুলেছে।

ভবেশের কাছে আজকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন জীবন মরণ সংগ্রাম। বিদ্যালয় সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তার হার হয়েছিল। কালকের কুরুক্ষেত্রেও যদি পাণ্ডবেরা জেতে তাহলে তার পক্ষে গ্রামে বাস করা শুধু দুরূহ হয়ে উঠবে না তার জীবনও হয়ে উঠবে মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ। ধীরে ধীরে বেশ সুন্দরভাবে তার রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠছিল। পরিচিত অনেকের আশা হয়েছিল, বাংলাদেশের দরবারী জীবনে একজন হোমরাও চোমরাও সে হবেই হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উন্মাদনায় সময়ে সময়ে ভবেশ অস্থির হয়ে উঠত—ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, কংগ্রেস এবং রাজদরবারে প্রতিপত্তি ব্যক্তিগত মেধা কিছুই তার কম ছিল না। অথচ হঠাৎ কোথা থেকে এল এই কালরাহু? ভবেশের ধারণা, নরেন না থাকলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মোকদ্দমা করতে কেউ সাহস করত না। বন্ধুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে ভবেশ মাঝে মাঝে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

আজ সন্ধ্যায় সুরু হয়েচে ভবেশের বৈঠকখানায় শেষ উদ্যোগ সভা। সদলবলে অনেকেই এসেছে। সুকুমার সেন ফুটবল সমিতির সম্পাদক। বিজন ব্যাটবল কেন্দ্রীয় অভিনয় সংঘের সভাপতি। 'শনিবারের মিলনমণ্ডপ' সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মিঃ একলব্য আচারিয়া। তাছাড়া, শশীশেখর, হীরেণ, পরেশ এরা ত' ভবেশের ডান হাত।

হাড়কালি বাঁড়ুজ্যে গ্রামের একজন মাতব্বর বিশেষ। তার হাতে অনেকগুলো ভোটার ছিল। তার পুরোনাম কালিচরণ বাঁড়ুজ্যে। শরীরে হাড় কখানির উপর মিশমিশে কালো চামড়া ছাড়া আর কিছু না থাকায় লোকে নামকরন করেছিল হাড়কালি বাঁড়ুজ্যে। কিছু দিন আগে এক বিধবার সম্পত্তি ঠকিয়ে নেবার জন্যে ও জমিদার ভবেশের সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু ভবেশ রাজী হয়নি। সেই রাগে আজ ও যোগ দিয়াছে কংগ্রেসের পক্ষে। তারই বিরুদ্ধে আলোচনা চলছিল।

পরেশ চড়াগলায় বললে, স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে হাড়কালি বাঁড়ুজ্যে আমাদের বিরুদ্ধে কি খিস্তিখেয়ুর না করচে। ইচ্ছে হল, দিই দুটো চড় গালে বসিয়ে। পরেশ রাগের দাপটে শূন্য বাতাসের বুকে চড় মারার অনুকরণ করে।

সুকুমার বললে, আস্তে দাদা আস্তে। এখনো লোক চিনতে পারলে না। কেন অত গালাগাল পাড়ছে তা কি জান? ও সব লোকঠকাবার জন্য। এ কম্ম করে করে হাড় আমার পেকে গেল। আজ সকালে মাকের ওপর ওষুধ দিয়ে এসেছি, দাদা,—ও আর পালাবে কোথায়? বেশী নয়, স্রেফ পঞ্চাশটি টাকা হাতে গুঁজে দিলুম। ব্যস্। আমার সামনে ওর লোকজনকে বলে এল স্থাখ, কংগ্রেসের মটরে যাবি, কিন্তু, ভোট দিবি রাজাবাবুকে। আমায় বললে, তারা নরেনদের আমি চট'তে চাই নে। রাজাবাবুকে বলো, যদি একটু খিস্তিখেয়ুর করি সে শুধু ওদের চোখে ধুলো দিবার জন্য। এটুকু তিনি যেন কানে না তোলেন।

—তাই নাকি? সকলেই সুকুমারের বুদ্ধির তারিফ করলে। শশী বললে, তাহলে তুমি ত' বাঘ বশ করে এসেছ ভায়া!

এদিকে ভবেশের কানে কানে দ্বিধাজড়িত গলায় বিজন জিজ্ঞেস করলে, আপনি ত জানেন, আমাদের সব কটা ভোট আপনার বাঁধা। একটাও বাহিরে যাবে না। ক্লাব থেকে আমরা রেজোলিউসান পাশ করে নিয়েছি। আর কাল ত' নিদেন পক্ষে পঁচিশ জন ষণ্ডা ষণ্ডা স্বেচ্ছাসেবক পাঠাব। তবে আজ সকালে কেউ কেউ বলছিল, আপনি দয়া করে আমাদের সমিতিতে যা দান করবেন বলেছিলেন তার আধেকটা যদি আজ দেন ত' গত পূজোর সময়কার দেনাটা এখ্খুনি মিটিয়ে ফেলতে পারি।

ভবেশের মুখের উপর একখানি ক্রূর হাসি ভেসে উঠল। সে রূঢ় কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেকে সংযত করে কৃত্রিম মিষ্টস্বরে জবাব দিলে, নিশ্চয়ই। এতে আর আপত্তি কি? আপনাদের যদি দেনাটা শোধ হয়ে যায় ত' যাক না। ওহে শশী দিয়ে দাও ত' এঁদের প্রাপ্যটা।

শশী তখন পরেশের কাছে কাজের হিসাব নিচ্ছে—চাষাপাড়াটায় আর একবার ঘুরে এলে ত?

—নিশ্চয়ই। ওত' হাতের পাঁচ, ধরে রেখে দিন না। তারা সকলেই বললে রাজা ছেড়ে প্রজারা যাবে কোথায়?

—আর চট কলের বস্তিগুলো?

—ওরা সব এককাট্টা হয়ে আছে। মোমীন সর্দার ত'

রুখে বললে, হুজুর কংগিরিশের কেউ বস্তির মধ্যে ঢুকলে আর ফিরবে না। মর্দ্দলে কের এক বাত।

—আর কায়স্থ পাড়া?

—ঐ এক কথা। তবে দু চারজন লুকিয়ে স্থকিয়ে ওদের দিকে দেবে। তা দিক। নাহলে গরীব নরেনদার আবার জমার টাকাটা মারা যাবে যে! কপট সহানুভূতিতে পরেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

হীরেন রুখে উঠে বলে, টাকা মারা যাবে না ত শাস্তি হবে কি? তুই দেখে নিবি পরেশ, নরেনদাকে রাম ভোটে না হারাইত' আমার নাম নেই। এত বড় একটা শপথ রাজাবাবু স্বকর্ণে শুনতে পেলেন কিনা, তা জানবার জন্যে হীরেন ব্যগ্রভাবে ভবেশের মুখের দিকে চাইলে।

ভবেশ এ সব কথায় বিশেষ বিচলিত হয় না। সে জানে বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে মানুষের শয়তানিকে নিয়ে কারবার করতে হয়। তাই মিথ্যা তোষামোদে যেমন সে চঞ্চল হয় না, মানুষের নীচতা, বিদ্বেষ এবং দুষ্টবুদ্ধিকে নিজের কাজে লাগাতেও তেমনি দ্বিধা করেনা। সে জানে, নরেনের প্রতিপত্তি কম নয়। তবু ইলেকসানের পঙ্কিলতার মধ্যে শুধু সাধুতার পাশপোর্ট দিয়ে কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না। তাই জয় তার সুনিশ্চিত তবু সাবধানীর মার নেই।

একলব্য এবার তার অব্যর্থ তীর ছুড়লে—অহীভূষণের কি বিষ মশাই! য়ুনিভারসিটিতে পড়ে বড় তিলিয়ে উঠেছে। আজ সকালে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গাধার মত চেঁচাচ্ছিল, পূর্ব্ব পুরুষের দান করা সম্পত্তি জনসাধারণকে ঠকিয়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে যে জমীদার সেই রক্তচোষা শকুনিকে ভোট দেবেন আপনারা—

একলব্যের কথা আর শেষ করা হল না। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে সর্ব্ববিজয় সর্ব্বাধিকারী চিৎকার করে উঠল, শশীদা, পরেশদা, শিগ্‌গিরশিগ্‌গির, এখুনি একবার সদল বলে পণ্ডিত-রত্ন পাড়ায় যেতে হবে। আমি নিজে দেখে এলুম নরেনদা পণ্ডিতদের বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে প্রচার করছেন, সমাজ যে একেবারে রসাতলে গেল। যে লোক স্ত্রী বর্ত্তমানে ডোমের মেয়েকে বাড়ীতে—নাঃ, ভবেশবাবুর সামনে সে কথা উচ্চারণ করতে পারব না। আরে ছিঃ ছিঃ। বোকা বামুনরা কিন্তু বিশ্বাস করেচে। বলে, এমন পি-শাচকে আমরা কিছুতেই ভোট দেবনা। তোমরা এখুনি না গিয়ে পড়লে হয়ত কমসে কম পঁয়ত্রিশটা ভোট হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবেগে সর্ব্বাধিকারীর যেন দম বন্ধ হয়ে যায়।

ভবেশের মুখ রক্তিম। ওর শিরায় শিরায় উত্তেজনা স্ফীত হয়ে ওঠে। বলে, ঠিক দেখে এসেছ? নরেন নিজে এ কাজ করছে?

ঘণ্টাখানেক পরে ভবেশের গোপন কক্ষে শশীনাথ এসে হাজির হল। বললে, সর্ব্বাধিকারীর কথা ঠিক। নরেনদা নিজে একাজ করেছেন।

ক্রুদ্ধ, বিচলিত ভবেশ বললে, নরেন নিজে?

শশী অম্লানমুখে সর্ব্ববিজয়ের স্বরচিত মিথ্যার পুনরুক্তি করলে, হ্যাঁ নিজে। কিন্তু তিনিই করুন বা অপরে করুন তার জন্যে এখন ভাবনার কথা নয়। ভাবনা এখন পণ্ডিতদের আবার হাত করা যায় কেমন করে! একটা দুটো ত' নয় অন্ততঃ চল্লিশটা ভোট।

ভবেশ নিজের ঠোঁট কামড়ে বললে, ওষুধ আমার কাছেই আছে। নরেন আজ বড় সাধু সেজেছে না? ভণ্ড মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর!—শশী, তুমি জাননা বোধ হয় ওর বিয়ের রহস্য?

শশী উৎসুক হয়ে বললে না, না। সে আবার কি?

—তোমরা কেউই জাননা। কি করেই বা জানবে? এক আমি আর ও। হ্যাঁ, আর একজন জানত—গোবিন্দ। গোবিন্দ আমাদের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়ে সে বন্ধুত্ব আরও জমে ওঠে। ওর বাড়ী ডায়-মণ্ডহারবারের দিকে। বাড়ীতে ছিল বিধবা মা আর এক সুশ্রী বিধবা ছোট বোন। আমরা অনেকবার ওদের বাড়ীতে গেছি। কিছুদিন ত'—একবার আমি—হ্যাঁ ওর মা সকলকেই বড় যত্ন করতেন। কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য ভবেশ চুপ করে রইল—কয়েকটি দ্বিধাজড়িত ভীরু মুহূর্ত্ত।

শশী দ্বিগুণ উৎসাহে জিজ্ঞেস করলে তারপর?

—গোবিন্দ তখন জেলে। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে থাকার জন্যে একটা মামলায় পড়ে ওর জেল হয়েছিল ছ'বছর।

নরেনই তখন ওর মা-বোনকে দেখা শোনা করত। আমরা তখন কোলকাতায় থাকি। একদিন হঠাৎ খবর এল, ওদের গাঁয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ওর বোন লীলা সন্তান-সম্ভবা। নরেন আর আমি শোনবামাত্রই ডায়মণ্ডহারবার গেলুম। যে এই কুকীর্ত্তির জন্যে দায়ী সে সরে পড়েছিল। গাঁয়ের মাতব্বরেরা জানালে, গাঁ থেকে ওরা উঠে না গেলে ঘরের চালে আগুণ লাগিয়ে দেবে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর শেষে নরেন নিজের মন স্থির করে ফেললে। আজ ওর স্ত্রী সেই লীলা।

শশী বিস্মিত হয়ে বললে, বলেন কি ?

—হ্যাঁ, এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এতদিন কারোকে বলিনি। বললে আমাদের গাঁয়েও ওর জায়গা হত না। তোমরা পণ্ডিতরত্নদের একবার এই কাহিনীটা শুনিয়ে দাওগে, যাও। এর প্রমাণ আমার হাতেই আছে। গোবিন্দ জেলে বসে সব শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নরেনকে প্রথম যে চিঠিখানা লিখেছিল—সেখানা আমার কাছেই পড়ে আছে।

শশী লাফিয়ে উঠে বলে, তাই নাকি ; চিঠিখানা এখুনি বার করুন। এখুনি পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে আসি। তারপর আজ রাত্তিরেই চাঁদ ওঠবার আগে চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে তিনরঙা বিজ্ঞাপনী ছাপিয়ে দেশময় মেরে বেড়াব। ওঃ, নিজের এই কীর্ত্তি অথচ ভীমরুলের চাকে ঢেলা মারা! বলিহারি যাই !

এদিকে নরেনের বৈঠকখানা তখন খালি হয়ে গেছে। সমস্ত দিন ধরে শোভাযাত্রার পর তার লোকেরা জয়ের সুনিশ্চিত আশায় আড্ডা ভেঙে চলে গেছে। কেবল বসে আছে নরেনের ছেলেবয়েসের বন্ধু বিজয়। বিজয় নয়াদিল্লীর সরকারী দপ্তরখানায় মোটা মাইনের কাজ করে—ছুটিতে বাড়ী এসেছে। তাই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে নরেনের ভোটোন্মত্ত অনুচরদের ভীড়ে ভাল করে কথাবার্ত্তা বলতে পারেনি। তারা বিদায় নেবার পর নিভৃতে দুই বন্ধুর আলাপ চলছিল। ক্লান্ত নরেন ম্লান এক টুকরা হাসি হেসে বললে, রোগা রোগা দেখাবে না, বল কি ? আজ একটা মাস ধরে বনের মোষ তাড়ানো হচ্ছে।

বিজয় হেসে জবাব দিলে, কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোমাকে ? কেন এই ভূতের বেগার খাটা ? এতে দেশের সত্যিকার মঙ্গল কতটুকু হবে ?

—অনেকটা। চিরদিন বড়র নিষ্পেষণে পঙ্গু আমাদের মন। আর কিছু না হোক ডেমক্রেসির শিক্ষাটা ত' হবে। যে লেখাপড়া কিছু জানেনা তারও ভোটাভুটির ফলে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারবোধ জাগছে।

—ছাই জাগছে ! স্বায়ত্তশাসন না আত্মীয়শাসন ? এতে অধিকার বোধ কারো মনে জাগে না—বাড়ে শুধু পাড়াপড়শী পরস্পরের মধ্যে ঝগড়ার উত্তেজনা। কাল রাত্তিরে যখন শুনলুম তোমাতে আর ভবেশে ভোট-যুদ্ধ হবে, আমিত' অবাক হয়ে গেলুম। নরেন, ভাবো দিকিন পাঁচ বছর আগে এরকম একটা দিনের কল্পনাও করেত পারতে তুমি ? যে ভবেশকে হাতে গড়ে মানুষ করেছ—এই ত' সেদিনের কথা—আজ তুমিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী ! আর তাও সামান্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হবার জন্যে ?

—কি হে ভবেশের এজেণ্ট নাকি তুমি ? নরেনের মুখে বিদ্রূপের রুক্ষ হাসি।

—না ভাই। তোমাদের কারো জন্যে ভোটের দালালি করার মত সৌভাগ্য আমার নেই। কাল সবেমাত্র দেশে এসেছি এখনও ভবেশের সঙ্গে দেখাও করতে পারিনি। কিন্তু যাই বল, একদিন যারা অন্তরঙ্গ ছিল আজ তাদের মধ্যে ভোট-যুদ্ধ,—একথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর নরেনের মুখের স্বাভাবিক দীপ্তির উপর একটা ক্লান্তির ছায়া পড়েছিল—যেন মেঘঢাকা উষার ম্লান পাণ্ডুরতা। তবু দেশনায়ক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে অপরের সঙ্গে তর্ক করা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। বিজয়ের কথা শুনে সে জবাব দিলে—কণ্ঠে তার উত্তেজনার রেশ—দেশের কাজে ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজনের বিচার করিনা। করলে কোন বড় কাজই সম্ভব হয় না।

গভীর রাতে নিজের ঘরে একলা বসে ভবেশ একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সামনের টেবিলের উপরে পড়েছিল একখানা পুরোনো বেরঙ কাগজ। একটা বড় কিছু করার

আনন্দ ওর মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। কাল জয় তার সুনিশ্চিত। এ কাহিনী শুনেও হিন্দুসমাজ নরেনকে সহ্য করবে—এত বড় ঔদার্য্য ভারতবর্ষে একান্ত বিরল। ভবেশের মনে হল, এতদিন একথাটাকে মনের কোণে পুষে রেখে ও নিতান্ত অবুদ্ধির কাজ করেছে। এর কত আগেই না ও নরেনকে দেশছাড়া করতে পারত! শুধু দেশ ছাড়া? অচিরে ওর সুখের সংসারে আগুন জ্বলে উঠত। কারণ, সমাজে কোথাও ওর আশ্রয় মিলত না। ভবেশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগামীকালের দৃষ্টিমধুর ছবিটি। এত দেশসেবা,—এত আত্মত্যাগ,—এত পরোপকার কিছুতেই আর রক্ষা নেই। কাল সন্তান আর স্ত্রীর হাত ধরে নরেনকে পথে নামতেই হবে। এ গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ হয়ে গেল। ভবেশ স্পষ্ট দেখতে পেলে, পথে নামা নিরুপায় নিঃসহায় ওদের পেছনে পেছনে তরুণদল ঢেলা মারছে। জনসাধারণ মর্ম্মান্তিক টিটকিরি দিচ্ছে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের দল অভিশাপ দিচ্ছে। বন্ধু নেই, সঙ্গী নেই, আত্মীয় নেই। যে-পথে হয়ত দির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে সসম্মানে শোভাযাত্রা করে যেতে পারত কাল সেই পথেই স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে অসম্মানের গালি কুড়ুতে কুড়ুতে হেঁটমুখে হাঁটতে হবে।

ভবেশ টেবিল থেকে বেরঙ চিঠিখানা তুলে আর একবার আগাগোড়া পড়লে। তার মুখে একফালি ক্রূর হাসি ভেসে উঠল। মরণান্ত যার হাতে তার সঙ্গে শত্রুতা! ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, শয়তান! উত্তেজনার মোহে ভবেশ ভুলে যায় যে নরেন তার সামনে উপস্থিত নেই। সে যেন আসামী নরেনকে সামনে পেয়েছে—একেবারে মুখোমুখি!

—হ্যাঁগা, করেছ কি?—স্ত্রী অমলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বললে। নির্জ্জন ঘরে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ভবেশ একমনে ভাবছিল। হঠাৎ অমলার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। বললে কি করেছি?

—কেন, লীলাদির সর্ব্বনাশ?

—সর্ব্বনাশ কিসের? দুষ্কর্ম্ম করতে পারে আর তা বললেই আমাদের যত দোষ!

—দুষ্কর্ম্ম করে থাকে সে করেছে। তাতে তোমার ত' কোন ক্ষতি করেনি?

—আমার ক্ষতি করেনি?—ভবেশ রুখে ওঠে: জান, আমার নামে পণ্ডিতরত্ন পাড়ায় কি রটিয়ে ভোট ভাঙিয়েছে?

—সে যদি কেউ করে থাকেন ত' করেছেন নরু-ঠাকুরপো। তাঁর ওপর আক্রোশ করে দিদিকে শাস্তি দিলে কেন? নরুঠাকুরপো পুরুষমানুষ—লোকে তাঁকে আজ না হয় কাল মাপ করবে। কিন্তু লীলাদির কি করলে? সমাজে কেউ তাকে নেবে না।—বাড়ীতে নরুঠাকুরপোর মা'বোনরাও আর তাকে আশ্রয় দেবে না। ঘরে বাইরে কেউ আজ আর তার আত্মীয় নেই। কেন সেই নির্দ্দোষী অভাগীকে এই মর্ম্মান্তিক শাস্তি দিলে?—আবেগে অমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। দরদী-মনের ব্যথা চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে থাকে।

ভবেশ রুখে উঠে বলে, যাও তুমি। শোওগে যাও। মেয়ে-কান্না শোনবার এখন আমার সময় নয়। এই বলে সে বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীচেয় নেমে গেল।

বৈঠকখানা ঘরে এসে ভবেশ যেন আপন মনকে বোঝাতে থাকে। বলে, বেশ করেছি, ওদের বিবাহিত জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। সেই ত' চাই। একের অপরাধে অন্যের কঠিন শাস্তি—এ ত' জগতে প্রতিনিয়ত ঘটছে। লীলা?—নিরপরাধ সে? হোক সে নিরাপরাধ। সে যে নরেনের স্ত্রী। নরেন যে তাকে ভালবাসে। এই ত' চাই। নরেনের মায়ামমতার স্নিগ্ধ আশ্রয়গুলো ঘুচে যাক কঠিন আঘাতে। জীবন তার দুর্ব্বিষহ হোক। প্রাণের জ্বালায় সে উন্মত্তের মত ছুটে বেড়াক। সে যেন ছুটে বেড়াল, কিন্তু লীলা? মা-বোনের পীড়াপীড়িতে লীলাকে যদি নরেন ত্যাগ করে? নরেনকে সমাজ হয়ত দুদিনমাত্র ধিক্কার দেবে কিন্তু লীলাকে ত্যাগ করলে সমাজের স্নেহাশ্রয়ে আসতে তার লাগবে শুধু একটা প্রথাগত প্রায়শ্চিত্তের অভিনয়। তারপর? তারপর জগতে মত দুঃখিনী আর কে আছে? নরেনের আর সেই প্রথম যৌবনের সাহস নেই। সমস্ত সমাজ এবং আত্মীয়বন্ধুর বিরুদ্ধে একলা দাঁড়িয়ে লীলাকে আশ্রয় দিতে পারবে না। দুঃস্থা, পরিত্যক্তা, অসহায়া লীলার ম্লান, লজ্জানত অশ্রুমুখী মূর্ত্তি ভবেশের বিস্ফারিত চোখের সামনে ভেসে উঠল! তার মনে পড়ে যায়, লীলা গোবিন্দর বোন।

অবাধ্যতার জন্য ধনী বাপের কাছে লাঞ্ছিতা হয়ে যেদিন সে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে চলে গেছল—এই গোবিন্দ সেদিন পরম যত্নে তাকে দিয়েছিল আশ্রয়। আর সেদিনের কিশোরী লীলা—তার ভীরু চোখ দুটীতে ছিল কাজল মেঘের মমতা! সেদিন লীলা ছিল মুক্ত, বন্ধনহীন, দুর্লভা। ভবেশের তরুণ মনের গোপন কোনে সেদিন তার পায়ের চিহ্ন—নাঃ। বহুদিনের বিস্মৃত একটা মোহাবেশ ভবেশকে মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল করে তোলে—একটি সুনিবিড়, আত্মহারা মুহূর্ত্ত!

কিন্তু লীলার দুর্গতির দিনে কোথায় ছিল ভবেশের এই গুপ্ত প্রেম! সেদিন সমাজের ভয়ে দুর্ব্বলচিত্ত সে নির্ভীকভাবে তার প্রিয়াকে বলতে পারেনি, তুমি যাই হও, তবু আমার কাছে তুমিই প্রিয়। সেদিন স্ত্রীর সম্মান দিয়ে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছিল নরেন। অথচ কোনদিন সে কুমারী লীলাকে লেশমাত্র ভালবাসেনি। কোন রমনীকে কখন সে ভালবেসেছিল কিনা সন্দেহ। একান্ত করুণায়,—শুধু করুণায়—নরেন অসহায়া লীলাকে সেদিন স্ত্রীর আসন দিয়েছিল।

উত্তেজিত অন্তরে যখন প্রতিক্রিয়া সুরু হয় তখনো মানুষ শান্ত হয়ে ভাবতে পারে না। একদিকের উত্তেজনা সমান বেগে বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। ভবেশের তাই হল। তার মনে হল, নরেন লীলাকে বিয়ে করে মহা পৌরুষের কাজ করেছে। এত বড় আত্মত্যাগ, এত বড় বন্ধুপ্রীতি এ যুগের ইতিহাসে খুবই বিরল। অনুতপ্ত ভবেশের চিত্তের গোপনতল থেকে কে যেন বলে উঠল, উত্তেজনার মোহে বড় অন্যায় করে ফেলেছ ভবেশ, এর প্রায়শ্চিত্ত কর, এর প্রায়শ্চিত্ত করে দেবতার অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

ভবেশের মাথার মধ্যে উষ্ণরক্তের বন্যা বয়ে যায়। সে উঠে সামনের জানালাটা খুলে দিলে। বাইরে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের কনকনে ঘনীভূত ঠাণ্ডা। এক ঝলক হিমশীতল বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। টং টং করে ঘড়িতে চারটে বাজল।

নাঃ, এর একটা কিছু শেষ করবেই সে। মনের এই বিষাক্ত জ্বালা আর সহ্য করা যায়না। যা হয়ে গেছে তাত' আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। নাঃ, ভবেশ প্রায়শ্চিত্ত করবে। এমন একটা কিছু করবে—যাতে মনে হয় সে অনুতপ্ত হয়েছে। একবার মনে হল, কালকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াই। কিন্তু পরক্ষণেই মনের ভিতরকার লুব্ধ মানুষটা ক্ষেপে ওঠে। এত বড় ত্যাগ! কালকের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাড়ানো মানে ত' শুধু কালকের সুনিশ্চিত জয় পরিত্যাগ করা নয়। এর মানে রাজদরবারে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—তার জীবনের সব চেয়ে বড় স্বপ্ন নিজের হাতে চিরদিনের জন্যে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া!...

ভবেশ হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, তাই হোক।—কণ্ঠে তার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। আজ প্রথম ট্রেনেই কোলকাতা চলে যাব। নিজেকে আর বিশ্বাস করিনা। কম্পিত হস্তে সে একখানা চিঠিতে নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার আবেদন লিখে টলতে টলতে চাকরদের কামরার দিকে সবেগে চলে গেল।

শীতের দিনে অত ভোরে ষ্টেশনে বিশেষ যাত্রী থাকেনা। তবু ভবেশ রেলচত্বরের উপর দিয়ে খুব সন্তর্পনে এগিয়ে চলল। কোলকাতা যাবার আগে দেশের কারোকে সে মুখ দেখাতে চায় না। একটু দূরে যেতেই ও দেখতে পেলে দূরে জনহীন চত্বরে ও পাশের আসনে কে একজন আপাদমস্তক শালমুড়ি দিয়ে বসে আছে। কম্পিতপদে এগিয়ে আসতেই নরেনকে দেখে ও চমকে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে ওর মনে গ্লানি আবার জেগে ওঠে। রুক্ষ বিদ্রূপের সুরে বলে, কি, নরেনদা, তুমি যে আজ এখানে চোরের মতন বসে? লাইনগুলোর কাছে ভোট ভিক্ষে করছ নাকি?

নরেন প্রস্তুত ছিল না।—ভবেশকে এখানে দেখতে পাবে, এ যে আশাতীত। ব্যগ্রভাবে দাঁড়িয়ে ও ভবেশের হাত দুটো ধরে বলে—কণ্ঠস্বরে মমতার জড়তা,—ভাই ভবা, আমায় মাপ কর। আমি নাম উইথড্র করে নিয়েছি। কাজ নেই এই বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়ায়...

বিস্মিত ভবেশের কম্পিত কণ্ঠ থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে আসে,—সে কি, আমিও যে...

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

মধুমাসে

শ্রীফাল্গুনী রায়

গরবী করবী আঁকে কার ছবি হিঙুল হাসিটি হেসে
শিথানে তাহার রঙিন নিশান উড়িছে,
কনকচাঁপার অলক সোনালী দোলে কত ভালোবেসে-
ব্যাকুল-বকুল আকুল পুলকে ঝুরিছে!
মাঠের বুকেতে বাটের বুকেতে পলাশ শিমুল ঝলে,
এখানে সেখানে কমল কোমল আঁখিতে
চাহিয়া রয়েছে গাহিয়া গীতালি শীতল নিতল জলে,
সরম ধরম চাহেনা কিছুতে ঢাকিতে!
সজিনা-সবুজ অবুঝের মত ঝালর ঝুলায় খালি
রাখাল মাতাল সারাটি সকাল ঘুরিয়া,
মউল বনেতে বাউল বাতাসে দেয় শুধু করতালি,
সন্ধ্যা নামে যে বন্ধ্যা বাসনা পুরিয়া!

গোলাপী গোলাপ প্রলাপ বকিছে, কলাপী কলাপ তোলে
সরসা বরষা এখনো আসেনি হরষে,
মাতিতে দেখিছে সকলে আজিকে—ক্ষণে ক্ষণে সে যে ভোলে,
তাই সে নাচিছে ফুলের দুলের পরশে!
আমরা নাচিব আমরা গাহিব বিজন নিজন ঘরে
কুজনে দুজনে কাটিয়া যাইবে রাত্রি,
হাজার ফাগুন জ্বালাক আগুন আকাশ পড়ুক ঝরে-
—পৃথিবীতে মোরা ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রী!!

———

রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী'

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিশ্র বি-এ

ভারতবর্ষের সাধনা—মিলনের সাধনা। সে মিলন অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, একের সঙ্গে বহুর, অংশের সঙ্গে সমগ্রের ও ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের। সে মিলন-সাধনা দ্বারা যে সত্য অনুভূত হইয়াছে, তাহা জগতের পরম ও চরম সত্য। "সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সে সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব্ব-মানবের নিত্য-ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্য তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন।"

সে সত্য-সাধনার মূল-মন্ত্র কি? আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে উপলব্ধি কর।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—

> অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ
> দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
> বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যপদ্ভ্যাং
> পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

অগ্নি অর্থাৎ স্বর্গ-লোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহার নয়ন-যুগল, দিক্-সমূহ ইঁহার শ্রবণদ্বয়, প্রকাশিত বেদ-সমূহ ইঁহার বাক্য; বায়ু ইঁহার প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, ইঁহার চরণ-যুগল হইতে ধরিত্রী অর্থাৎ মৃত্তিকা উৎপন্না হইয়াছে—ইনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা।

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব,
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো (বহিশ্চ)॥

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হয় অর্থাৎ দাহ্যবস্তুভেদে বহুবিধ হয়, সেইরূপ এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হয় অর্থাৎ জগতে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয় (এবং বাহিরও হয়)।

উপনিষদের উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ও জগতে বহুরূপে বিদ্যমান। এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ও জগতে বহুরূপে বিরাজিত ব্রহ্মের যোগে বিশ্বের সমস্তের সঙ্গে নিজের আত্মাকে যোগ-যুক্ত করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ সমগ্রভাবে উপলব্ধি করাই আত্মোপলব্ধি।

বিশ্বের মধ্যে আত্মার ব্যাপ্তিই তাহার বিকাশ; নিজের মধ্যে তাহার সুপ্তিই তাহার বিনাশ। "যে মাছ সমুদ্রের, সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে ক্ষীণ অন্ধ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের আত্মার যে স্বাভাবিক বিহার-ক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দ-লোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত খণ্ডিত ছোঁওয়া-খাওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে।"

'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।' কারণ—সে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া সার্থক হইতে পারিতেছে না। সেইরূপ মানুষ যখন বিশ্ব-বিমুখ হইয়া স্বার্থ-অহঙ্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকে—'সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গুপ্ত গৃহ-বাসে,' তখন তাহার জীবনেও বাজিয়া উঠে ব্যর্থতার করুণ ক্রন্দন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', সে তো মানবাত্মার স্বপ্নভঙ্গ। বিশ্বের উদার আলোক-স্পর্শে যখন সুপ্ত মানবাত্মার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন সে ক্ষুদ্রতার ও সঙ্কীর্ণতার 'পাষাণ-কারা' চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া 'পাগল-পারা' বাহিরে ছুটিয়া আসে—অসীম বিশ্বপ্রাণ-সমুদ্রের সঙ্গে নিজের প্রাণের ধারাকে মিশাইয়া দিয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে।

এই যে নিজেকে সকলের মধ্যে জানা, এই যে ব্যক্তি-জীবনকে বিশ্ব-জীবনের মধ্যে বিলীন করিয়া অখণ্ডরূপে জানা, ইহাই বিশ্ববোধ। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব (central idea)।

এই কবিতায় কবি নিজেকে প্রবাসী বলিয়াছেন। প্রবাসী কে? যে নিজের ঘর, দেশ ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-প্রীতি-মধুর আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্-এক অপরিচিত দূর-দেশে বাস করে। সেইরূপ কবিও এই বিশাল বিশ্বে, 'এই চির-জনমের ভিটাতে' স্বজন-স্বগৃহ স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

কবি এই বিশ্ব-চরাচরকে এক বৃহৎ পরিবার বলিয়া মনে করেন। তরু-লতা ফুল-ফল জীব-জন্তু সমস্তই এই বিশাল বিশ্ব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ যেমন পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া জানে, কবিও তেমনি এই বিরাট বিশ্ব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থকে আত্মীয় বলিয়া অনুভব করেন। এখানে কেহই পর নয়, সকলেই আপন। এই নিখিল জগতের সমস্ত ঘরই মানুষের এক-ঘর, সমস্ত দেশই তাহার এক-দেশ; "সকল দেশের মধ্য দিয়াই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবী-ধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।" এই বিশ্বব্যাপী ঘর-দেশ আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কবি 'আপনার বাঁধা বাসাতে' যেন প্রবাসীর মত বাস করিতেছেন।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পর-বাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

বসন্ত আসিয়াছে। কুসুম-সৌরভে আকাশ-বাতাস মধুর হইয়াছে। কিন্তু বসন্তের এই ফুল-গন্ধ-খচিত সৌন্দর্য্য-সুষমা কবির চিত্তে বিরহ জাগাইয়া তুলিতেছে। কাহার বিরহ? বিশ্বের বিরহ। বিশ্বের ঘরে ঘরে তাঁহার কত আপনার জন, কত আত্মীয়-স্বজন! তাহাদের আপনার করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেছেন না বলিয়া কবির চিত্ত তাহাদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। "এই বিশ্বের বিরহটি প্রত্যেক মানুষের ভিতরকার সামগ্রী। আমরা প্রত্যেক জগতের একটি অংশে আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ হইয়া আছি—কিন্তু সমস্তকে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার সীমা নাই।"

বহিয়া বহিয়া নব-বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ-লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশি-দিশি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে॥

কবি বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মার জীবনময় যোগ অনুভব করেন। তিনি যেন বিশ্বের এই 'সাত-মহলা ভবনে', এই 'চির-জনমের ভিটাতে' 'স্থলে জলে' 'হাজার বাঁধনে' 'গিঁঠাতে গিঁঠাতে' বাঁধা। তিনি তাঁহার একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন—"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে'। এই তৃণ-গুল্ম-লতা, জল-ধারা, বায়ু-প্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্ক-দলের প্রবাহ, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী-পর্য্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ আছে।"

পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার এই যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ইহা যেন যুগ-যুগান্তরের ও জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়।

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,

সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে॥

বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এই চিরন্তন পরিচয়ানুভূতির কথা কবি তাঁহার আর একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন—"এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শোনা! বহু যুগ পূর্ব্বে যখন পৃথিবী সমুদ্রগ্রাস থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধ জীবনের গূঢ় পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটতো, নব পল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে।"

পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার এই যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধবোধ ইহা তাঁহার কাল্পনিক অত্যুক্তি বা স্বপ্ন-মাত্র নহে; ইহা তাঁহার সত্যানুভূতি (no mere fantastic dream, but based on sanity, on a most assured and reasonable philosophy—Prof. Shairp)।

ইহা দ্বারা সে সত্য সূচিত হইয়াছে, তাহা এই যে, মানুষের বর্ত্তমান জীবনটাই তাহার একমাত্র ও সমগ্র জীবন নহে; ইহা সুদূর অতীতকে আকর্ষণ করিয়া ও অনাগত ভবিষ্যতকে বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহা জন্ম জন্মান্তরের বিচিত্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—পরিপূর্ণতার মহাসমুদ্রাভিমুখে। সুতরাং ইহাকে একটা আকস্মিক ও অসংলগ্ন জিনিষ মনে করা চলে না। এ সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবন-ধারার মাঝখানে এই মানব-জন্মটা একেবারেই খাপ-ছাড়া জিনিষ; ইহা আগেও এমন কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনও হইবে না; যে কারণবশতঃ জীবনটা বিশেষ দেহ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ করিয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে—এইটিই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।" বস্তুতঃ মানব-জীবন অনন্তপথের পথিক (Pilgrim Soul W. B. Yeats) Tennyson এর In Memorium-এ আছে—

Eternal process moving on
From state to state the spirit walks.

বিশ্ব-জগতের 'ধূলারেও' 'আপনা' মানিয়া 'ছোট বড় হীন সবার মাঝারে" 'চিত্তের স্থাপনা' করিতে পারিলেই কবি তৃপ্ত নহেন। তিনি চাহেন একেবারে জল-মাটি-তৃণ-ফুল-ফল হইয়া 'জীবনসাথে' পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে। তিনি চাহেন এই বিশ্ব-জগৎকে তাঁহার 'আমি'-র বিস্তার বলিয়া অনুভব করিতে। তিনি চাহেন তাঁহার ক্ষুদ্র আমিকে বিশ্ব-আমি বা অনন্ত-আমিতে রূপান্তরিত করিয়া আমি এবং আমি না এই দ্বৈতবোধ একেবারে লুপ্ত করিয়া দিতে।

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে ভ্রমি ধরাতল
কিছুতেই নাহি ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা॥

বিশ্ববোধের আলোক-স্পর্শে উদ্বুদ্ধ কবির চিত্ত বহির্জ্জগতের আকর্ষণ অনুভব করিতেছে, এ আকর্ষণ নিত্য-স্পন্দমান বিশ্বহৃদয়ের চির-সজীব চিরমধুর আকর্ষণ। যাহার হৃদয় আছে, সে-ই অনুভব করিতে পারে—'অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন', সে-ই উপলব্ধি করিতে পারে—'ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত' "হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান, এত হাবভাব, এত আভাস ইঙ্গিত, এত সাজ-সজ্জা কেন? হৃদয় যে ব্যবসাদারীর কৃপণতায় ভোলে না, সেই জন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে স্থলে আকাশে

পদে পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত, তবে আমরা নিতান্তই ছোট হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম; আমাদের হৃদয় কেবলই বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যে বসে ভরিয়া উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই।"

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হ'তে
প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি তুই আমারে কি চাস্?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস?
নিশ্বাসে বু'কে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে॥

যে পৃথিবীতে জন্মিয়া কবি সকলকে আপনার ও আপনাকে সকলের করিয়া জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, সে পৃথিবী ধন্য এবং সেখানে জন্মে জন্মে আসিয়া তিনিও ধন্য।

ধন্যরে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী,
ধন্য এ মাটী, ধন্য সুদূর
তারকা-হিরণ-বরণী।

মায়াবাদীরা এই জগৎকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু কবি এই জগতের ধূলি-কণাটিকেও সত্য জানিয়া তাহার দিকে চিত্তকে প্রসারিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তিনি এই জগৎকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব দ্বারা আবৃত জানিয়া সকলের সঙ্গে মিলনের মধ্যে নিজেকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাছে সমস্তই সত্য, সুন্দর ও সার্থক। বস্তুতঃ সে এইভাবে সকলের সঙ্গে যোগোপলব্ধি দ্বারা অন্তরে বাহিরে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহার কাছে কোন কিছুই মিথ্যা, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর নহে। তাহার কাছে সমস্তই সুনিশ্চিত সত্য ও অনির্ব্বচনীয় মহান্ ভাবের ব্যঞ্জনা-পূর্ণ। তাই সে বলিতে পারে—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

কবি এই 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহুদিবসের সুখে দুখে আঁকা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা সুন্দর ধরাতল'কে ভালবাসেন,—সন্তান যেমন মাতাকে ভালবাসে। তাই তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—'চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে ভালবাসিয়াছি ধূলি-মাটি তোর।' জগৎকে এত নিবিড় ও গভীর ভাবে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি মরিতে চাহেন না। তিনি চাহেন এই সুন্দর পৃথিবীতে অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে। তাই তিনি তাঁহার 'প্রাণ' কবিতায় বলিয়াছেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।

যাহারা সংসার-বন্ধনকে ব্রহ্মলাভের অন্তরায় মনে করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লয়, কবি তাহাদের দলভুক্ত নহেন। তিনি বলেন—'যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে' অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহেন যে, এই জগতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। এ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম---সমস্তই ব্রহ্ম। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর আলপনা-আঁকা বরণ-বেদীটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে, সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম আনন্দ-রূপে অমৃতরূপে বিরাজ করচেন।"

বস্তুতঃ তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী, যাহারা এই জগতের সমস্তের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সকলকে আত্মবৎ দর্শন করেন। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিশ্ব-জগৎকে বিষ্ণুর অর্থাৎ ভগবানের বিস্তার বলিয়া জানিয়া জগতের সমস্তকে আত্মবৎ দর্শন করেন।

মুক্তি? কবি বলেন যে, মুক্তি এই জগতেই মিলিবে। মুক্তি কি? বিকাশের পরিপূর্ণতা। বীজ মুক্ত হয় কখন? যখন সে ফুল-ফল সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়। সেইরূপ মানুষও মুক্ত হয় তখন, যখন সে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশ্বের সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ক্ষুদ্রত্বই বন্ধন, বিশালত্বই মুক্তি। তাই যে অল্পকে বর্জ্জন করিয়াও ভূমাকে গ্রহণ করিয়া নিজের অন্তরে ও বাহিরে ভূমানন্দকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে-ই মুক্ত। সুতরাং ভূমার অধিষ্ঠান ভূমি এই অসীম বিশ্ব ভিন্ন অন্য কোথায় মানুষের মুক্তি মিলিবে?

নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে,
আছে তাঁরি পায়ে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।

কবির এই অসাধারণ পৃথিবী-প্রীতি তাঁহার বস্তুতন্ত্রের (realism-এর) চরম নিদর্শন। তিনি জানেন যে, আকাশে ফুল ফুটিতে পারে না। তাই তিনি এই পৃথিবীর মাটির উপরে তাঁহার কাব্য-কুসুম ফুটাইয়াছেন। কারণ পৃথিবীর প্রাণরস ব্যতীত কাব্য বা সাহিত্য বাঁচিতে পারেনা।

তাঁহার কবি-মন অসংযত কল্পনার (wild imagination-এর) রথে আরোহন করিয়া Shelleyর Skylark-এর মত জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে কোন এক অদৃশ্য সীমাহীন শূন্য-লোকে উত্থিত হইবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না; সে চাহে Wordsworth-এর Skylark-এর মত স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন-ক্ষেত্রটিকে বিশ্বস্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে—True to the kindred points of Heaven and Home. তাই আমরা দেখি যে তাঁহার কাব্য বাস্তব ও কল্পনার, সসীম ও অসীমের অপূর্ব্ব মিলন-প্রতীক (Symbol of unity in diversity)।

শেষ কথা এই যে, এই কবিতাটি একটি ভাবের খনি। ইহা একটু-কিছু বলিয়া অনেক-কিছু বলিয়াছে, বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন আভাসে ইঙ্গিতে অনেক-কিছু বলে। বস্তুতঃ ইহাই শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ। তাই জনৈক রসজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন—About the best poetry there floats an atmosphere of infinite suggestion. Suggestion is the indirect evocation of an idea in the mind as a starting point of a process of thought and feeling.

ইহা যখনই পড়ি তখনই আমাদের মনের উপর দিয়া হোমহবির্গন্ধ-পুলকিত পবিত্র তপোবনের বাতাস বহিয়া যায়; আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার জন্মস্থান তপোবন, যেখানে মানুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতি অভিন্ন ছিল; যেখানে মানুষ বিচিত্রের মধ্যে পরম একের তপস্যা দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

হে তপোবনের সাধক কবি, তোমার সাহিত্যে তপোবনের সাধনা যে অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিশ্র

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১৮

লতা তরুর আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া থাকে, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। যে যাহাই বলুক, নারীজাতির স্বভাবধর্ম্মই এই যে, তাহারা একটা আশ্রয় পাইয়াই তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করে। কে একজন মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতই নাকি বলিয়াছেন,—"নারী পুরুষের কর্ত্তৃত্বই ভালবাসে—মানুষ যেমন দেবতার করে, নারীরাও তেমনি পুরুষকে, দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করে, পুরুষের কাছে শত প্রার্থনা শত কামনা করে।" কথাটা অবশ্য পুরুষেই লিখিয়াছে বলিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠতাই উহাতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মানুষ যখন সিংহের চিত্র অঙ্কিত করে, তখন সে সিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেছে বলিয়াই চিত্রিত করে। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই নারীপ্রগতি সত্ত্বেও কথাটা আংশিক সত্য বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে।

দীপ্তির জীবনে এই নির্ভরতা নিশ্চিন্ততার একান্ত অভাব ছিল। পুরুষের কর্ত্তৃত্ব কাহাকে বলে সে জানিত না। পিতার জীবিতকালেও সে স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। বিশেষতঃ, তাহাদের সংসারে নিকট সম্বন্ধের আত্মীয়ার অভাবই ছিল সকলের চেয়ে বড় অভাব—নারীসুলভ দয়া কোমলতা স্নেহ মমতা প্রভৃতি মধুরতার অভাবে তাহার শুষ্কপ্রায় নারীহৃদয় সত্তাই স্নেহপ্রেমের যত্ন আদরের জন্য বুভুক্ষু ছিল। অনুক্ষণ গ্রন্থকীটের মত লেখাপড়ায় মগ্ন থাকিয়া অথবা বড় জোর পুরুষ উকীল মোক্তার এবং নায়েব গোমস্তাদের সহিত বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহার হৃদয় প্রায় পুরুষোচিত গুণগ্রামেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যেন সাহারার ধূ ধূ মরুভূমি—শান্তির শীতল প্রস্রবণ স্বরূপ স্নেহমমতার জন্য তাহার নারী-হৃদয় যে অনুক্ষণ একটা অভাব অনুভব করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না।

এই সময়ে বিধাতার অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে সে বন্ধু ও সতীর্থ নীহারবালার সাংসারিক ঘরকন্নার সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে নীহারের শান্তি তৃপ্তির মূল কারণ ধরিতে পারিতনা—সে বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের শিক্ষাও কখনও হয় নাই। তথাপি নীহারের সহিত তর্ক বিতর্ক-কালে সে যেন কখনও কখনও অন্ধকারে একটা আলোক দেখিতে পাইত। আর সেটা কি জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুলও হইত।

এই যোগাযোগের সঙ্গে আরও একটা অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় যোগাযোগ ঘটিয়াছিল তাহার কেন্দ্র রেখা। এই সুন্দরী সুভাষিনী মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি সে তাহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল—সে ছিল স্বয়ং সৌন্দর্য্যের পূজারী। তাই যখন সে তাহার জেঠামণির মন ভিজাইয়া বহু কাকুতি মিনতি করিয়া দুই চারিদিনের জন্য রেখাকে আপনার কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল, তখন তাহার শুষ্ক বুভুক্ষু মন যেন সম্মুখে শীতল প্রস্রবণ পাইল। সে তাহাকে কি খাওয়াইবে পরাইবে, কি প্রসাধন করিয়া দিবে, কি উপহার দিয়া তুষ্ট করিবে, কিরূপে তাহাকে আপনার অফুরন্ত স্নেহ নিবেদন করিবে,—তাহা ভাবিয়া পাইত না। রেখাও তাহার অফুরন্ত আদরযত্নে ও স্নেহমমতায় তাহার প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

একদিন সে রেখাকে একখানি ভাল ছবি দেখাইবার জন্য এক টকি-হাউসের একটি বক্স ভাড়া করিল। স্বহস্তে রেখাকে সাজাইতে সে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিত, তাই সেদিন অপরাহ্ণে প্রদর্শনীর বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে সাজাইতে বসিয়াছিল। এটা-সেটা, নানা প্রকারের বস্ত্রালঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়া কিছুতেই তাহার মনঃপূত হয় না। রেখাকে সে একটি অফুটন্ত পুষ্পকোরকের সহিত মনে মনে

তুলনা করিতেছিল। নিষ্পাপ পবিত্র সরল সুন্দর এই বালিকার দেহ মন—ইহার স্পর্শসুখ যেন চন্দনের স্পর্শেরই মত। ইহার স্পর্শে যেন পৃথিবীর আবিল পঙ্কিল মলিনতা এক দণ্ডেই মুছিয়া যায়। যে সংসারের সকল বিষয়েই বিরক্ত, মানুষের কুটিল কপট ব্যবহারে যে মনুষ্যজাতিরই উপর আস্থাহীন, সেও এই পবিত্রতার সংস্পর্শে আসিলে পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানুষকে ভালবাসিতে শিখে। সংসারের দুঃখ কুটিলতা সঙ্কীর্ণতা মলিনতার পাপ ইহাকে স্পর্শ করে নাই—এ ত স্বভাবতঃই সুখী। মানুষ ভাল হইলেই যে সুখী হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু যে মানুষ সুখী সে ভাল হইবেই—দেবতার মত সে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র। রেখা যদি বারো মাস তাহার কাছে থাকে!···তাহার হয়!···

রেখা তাহার দীপ্তিদিদির আদরযত্নের আতিশয্যে অতিমাত্র হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে বালিকা হইলেও তাহার স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা ছিল না। তথাপি তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ছাপাইয়া উঠিল; সে অনুযোগের সুরে বলিল, "ও দীপ্তি দি, কখন যাবে বল না—আর সাজাতে হবে না।"

দীপ্তি তাহাকে টিপ পরাইতেছিল, হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলি! এই ত সবে সাড়ে পাঁচটা, এখনও আরম্ভ হ'তে ঢের দেরী—আধ ঘণ্টার উপর।"

রেখা বলিল, "তা হোক, এইবার তুমি কাপড়-চোপড় পরে নাও।

দীপ্তি বলিল, "আমার আবার কাপড়-চোপড় কি? এই ত ফর্সা কাপড় পরে নিয়েছি; কেবল চুলটা একবার আঁচড়ে নেওয়া বৈ ত নয়!"

রেখা বলিল, "বা-রে, তুমি বুঝি পাউডার স্নো মাখবে না, টিপ কাটবে না?"

দীপ্তি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আমি? তা হ'লেই হয়েছে! এত বয়সে নাকি টিপ কাটে, পাউডার মাখে! বোসো ভাই এই সোফাটার উপরে, জুতোটা পরিয়ে দিই।"

রেখা সসম্ভ্রমে ক্ষুদ্র পা'দুখানি টানিয়া লইয়া বলিল, "কখ্খোনো না, কখ্খোনো তোমায় জুতো পরাতে দেবো না। ছিঃ!"

দীপ্তি রেখার চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তা হলে তুমি আমায় পর মনে করো বুঝি!"

রেখা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তা কেন,—তুমি হলে দি-দি—"

দীপ্তি বলিল, "তা বড়তেই ত সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। ঐ বুঝি মোটরের হর্ণ দিচ্ছে—এই যে সৌদামিনী, গাড়ী এসেছে ফটকে?"

সৌদামিনী বলিল, "হাঁ দিদিমণি—আর নীচে এই দিদিমণির দাদা ডাক্তারবাবু বসে রয়েছে—তোমার সাথে তেনার কথা আছে বল্লে।"

রেখা সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "দাদা? দাদা যাবে নাকি? ও দীপ্তি দি তুমি ত আমায় বলনি?"

মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্তির মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "না বলিনি। তার কারণ, আমিই জানি না, তিনি আসবেন কিনা। বলেছো সৌদামিনী আমরা সিনেমায় যাচ্ছি? বেশ। এসো রেখা।"

নিচের বৈঠকখানায় হিমাংশু অস্থিরভাবে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল এবং আপন মনে কক্ষপ্রাচীর সংলগ্ন চিত্রগুলি দেখিতেছিল। কখন দীপ্তিরা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারে নাই। সোপান ও কক্ষের পুরু কার্পেটের উপর তাহাদের কোমল পাদুকাস্পর্শের শব্দ তাহার কর্ণে পৌঁছে নাই। কাজেই দীপ্তি যখন মৃদুস্বরে বলিল, 'আপনি কতক্ষণ এসেছেন? খবর দেননি কেন?' তখন সে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিতনেত্রে রেখা ও দীপ্তির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই আপনার অশিষ্টতার কথা স্মরণ করিয়া দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল। রেখা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং হর্ষভরে বলিল, "তুমি যাবে বুঝি দাদা? তুমি জানলে কি করে আমরা সিনেমা দেখতে যাবো?"

দীপ্তি হিমাংশুকে কোন উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "সময় নেই রেখা এখন আর। কিছু বিশেষ দরকার আছে কি আপনার?"

হিমাংশু এইবার অবসর পাইয়া বলিল, "ওঃ আপনারা সিনেমা যাচ্ছেন? একটা কথা ছিল, তা—"

রেখা বাধা দিয়া তাহার দাদার অঙ্গুলী ধারণ করিয়া বলিল, "চল না দাদা, সবাই যাই আমরা। জানো, দীপ্তি দি একটা রথ নিয়েছে?" সে হিমাংশুকে একরূপ টানিয়া লইয়া ফটকের দিকে দীপ্তির অনুসরণ করিতে লাগিল।

হিমাংশু হাসিয়া বলিল, "না রেখা, আমার কাজ আছে, সে না হয় আর একদিন যাওয়া যাবে এর পরে।" তাহার পর দীপ্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখুন, বাবা কাল দেশে যাচ্ছেন, তাই রেখাকে নিয়ে যেতে এসেছিলুম আজ—"

দীপ্তি রেখাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজেও উঠিতেছিল। হঠাৎ অতর্কিতভাবে যেন সম্মুখে কালভুজঙ্গ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আজই? তার মানে?"

হিমাংশু অপ্রতিভভাবে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিল, "হ্যাঁ, আপনাকে আগে খবর দেওয়া হয়নি বটে; কিন্তু হঠাৎ বাবার যাওয়ার ঠিক হ'ল আজ—"

দীপ্তি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখখানি হঠাৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, নিতান্ত ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "তাই হবে, কালই নিয়ে যাবেন। আপনাকে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না বলে বোধ হয় খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন? খুবই অভদ্রতা হ'ল বটে, কিন্তু সময় নেই। আজ রেখাকে নিয়ে যেতে পারি কি?"

এ কি বেদনা, না অভিমান-আহত কণ্ঠ? সেই স্বর যেন বাষ্পরুদ্ধ, কম্পিত।

হিমাংশু অতিমাত্র অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, সে বিনীত কণ্ঠে বলিল, "এ কি কথা বলছেন আপনি? রেখাকে এ কয়দিনে আপনি যে যত্ন করেছেন—"

বাধা দিয়া অভিমানাহতকণ্ঠে দীপ্তি পুনরায় বলিল, "রেখা কি কেবল আপনাদের, আমার কেউ নয়?"

গাড়ী ষ্টার্ট দিল ও নিমেষে বায়ুভরে অদৃশ্য হইয়া গেল। হিমাংশু হতবাক অবস্থায় তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

১৯

দিগন্তব্যাপী পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাহার পশ্চাতে আরও পাহাড়। তুষারকিরীট তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাচলের মত নহে, ছোট ছোট খর্ব্বাকৃতি লতা পাদপমণ্ডিত সবুজের স্তূপ, একটির পর একটি, শ্রেণীর পর শ্রেণী, মাঝে মাঝে একএকটি ঈষদুন্নত শৃঙ্গ—যাত্রীরা অল্প সময়ে সে পাহাড় অতিক্রম করিয়া এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চলিয়া যায়।

গভীর নিশীথে যখন স্রোতস্বিনীর তটে বাহকেরা ডুলি ফেলিয়া পলাইয়া যায়, তখন হিমাংশু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, কি ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মশকের তীব্র দংশনে যখন জ্বালায় ছটফট করিয়া পূর্ণমাত্রায় জাগরিত হইয়া উঠিল, তখন বুঝিল, ডুলি স্থিতিশীল হইয়া ভূমির উপর আসন গ্রহণ করিয়াছে। অদূরে ঘোর রোলে গর্জ্জন করিয়া পার্ব্বত্য-নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। গত দুই দিনের অজস্র ধারাবর্ষণে শীর্ণকায়া নদী স্ফীতোদরা হইয়া উভয় পার্শ্বের বালুকার চর নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে। নিশুতি নিঝুম রজনী কেবল নিশীথ ঝিল্লীর রবের সহিত মশকের অবিশ্রান্ত ব্যাণ্ডবাদ্য সেই বনানীবেষ্টিত পার্ব্বত্যপথের দারুণ নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছে।

অতি দুঃসাহসিক মানুষের প্রাণও বিহার-মানভূমের এই লোকালয়বর্জ্জিত ভীষণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই অবস্থায় আতঙ্কে কম্পিত হয়। হিমাংশুরও বক্ষস্থল মুহূর্ত্তের জন্য গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল। বাহকরা কি তাহাকে অসহায় অবস্থায় এই ঘোর অরণ্যানীবেষ্টিত নির্জ্জন পার্ব্বত্য নদীতটে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে?

ভয়ঙ্কর শীত। সর্ব্বাঙ্গ মোটা কম্বলে আচ্ছাদিত থাকিলেও তাহার বক্ষের কম্পন প্রশমিত হইতে চাহেনা। ডুলির পর্দ্দা অপসরণ করিয়া সে একবার বাহিরে চাহিয়া দেখিল। দুই দিন বর্ষণের পর আকাশ মেঘমুক্ত চন্দ্রকিরণে মানভূমের জলস্থল কি অসম্ভব উজ্জ্বল দেখায়, তাহা অভিজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। হিমাংশু মুগ্ধনেত্রে দেখিল, রজতধারার মত সুধাংশুর সুধাধারায় বসুন্ধরা প্লাবিত হইতেছে, আর দূরে পার্ব্বত্য তটিনীর জলস্রোত গলিত রজতসূত্রেরই মত অনুমিত হইতেছে। মনোমুগ্ধকর শোভা! কিন্তু অকরুণ, প্রাণহীন!

অকস্মাৎ গাঢ় নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া দূরে বনান্তরালে ফেরুর করুণ ক্রন্দন আকাশমার্গে উত্থিত হইল। রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে বাতাসে সেই আর্ত্ত রব ধ্বনিত

প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হিমাংশুর সমস্ত শরীরের রক্তও যেন সেই সঙ্গে জল হইয়া গেল! সঙ্গে সামান্য একটা অস্ত্রও নাই, কেবল ভ্রমণের যষ্টি। এই মনুষ্যসঙ্গবর্জ্জিত ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে গভীর নিশীথে হিংস্র শ্বাপদের গ্রাস হইতে তাহার নিস্তারের উপায় কি?

এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও হিমাংশুর শুষ্ক রক্তস্রোত আবার প্রবাহিত হইল, অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। তখন বাহকদের কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। অশিক্ষিত নিরক্ষর অদৃষ্টবাদী গ্রাম্য সাঁওতাল কোল দিনমজুর—সামান্য মজুরীর লোভে প্রাণটি হাতে লইয়া এই বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য জঙ্গলে ডুলী বহিতে আসে। তাহারা দূর হইতে যদি ফেরুর আর্ত্তনাদ অথবা সম্মুখে দুস্তর নদীর তরঙ্গ-গর্জ্জন শুনিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা ডুলী ফেলিয়া পলাইবে না কেন? এখানে ত এখনও রাত্রি প্রভাতের জন্য অন্যূন তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। অনর্থক তাহারা মশকদংশনের তীব্র জ্বালা ভোগ করিবে কেন? ব্যাঘ্র-প্রবরের উদরগহ্বরে ভোজ্যপদার্থেই পরিণত হইবার আশঙ্কা মাথায় লইয়া এই জনহীন স্থানে অপেক্ষা করিয়া তাহাদের লাভই বা কি? প্রভাতে যখন তরুণ অরুণচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত আলোকিত হইবে, যখন বনের কাঠুরিয়া ও গোময় আহরণকারী পথচারীরা বন্যপথে দেখা দিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহারা ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় পাইবে। সুতরাং তাহারা যে নির্ভয়ে রাত্রি যাপনের জন্য নিকটেই কোন লোকালয়ের সন্ধানে গিয়াছে এবং নিকটেই যে লোকালয় আছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

হিমাংশু এসব কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া টর্চ্চ-লাইটটা প্রজ্জলিত করিয়া পর্দ্দা অপসারণের পর ডুলী হইতে অবতরণ করিল। এক হস্তে আলোক এবং অপর হস্তে যষ্টিটি দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে প্রথমে নদীতটাভিমুখে অগ্রসর হইল।

জ্যোৎস্নায় নদী স্নান করিতেছে, নদীর তট সেই জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গল,—ওপারেও তাই। কেবল নদীর তটই একটু ফাঁকা। সেখানে গিয়া হিমাংশু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পাহাড়ে কনকনে হাওয়া, হিমাংশুর মোটা সোয়েটার, কোট ও অলষ্টারও সেই শীতের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইতেছিল, দস্তানা আঁটা হাত দুইটি কাঁপিতেছিল। মুখমণ্ডলে কেবলমাত্র নাসিকাটি বাহির হইয়া ছিল, সেই হেতু যেন সেইটি খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল।

এই দারুণ শীতে মানভূমের এই বিজন পার্ব্বত্য জঙ্গলে হিমাংশুর আগমনের কারণ কি? সে নিজেই তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। সে যে রাগের মাথায় হঠাৎ কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে; এজন্য এখন তাহার মনে অনুশোচনা হইতে লাগিল। রাগ? কাহার উপরে? যাঁহা হইতে জগতে তাহার আরাধ্য দেবতা কেহ নাই, সুখে দুঃখে যিনি একাধারে পিতা ও মাতারূপে বুকের রক্ত দিয়া মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের পালন করিয়াছেন, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা ভিন্ন অন্য মঙ্গলচিন্তা যাঁহার নাই,—সেই পরম গুরু পরম প্রিয় পরম দেবতা পিতার প্রতি ক্রোধ? মনে পড়িল তর্পণের কথা;—পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ। অধম অকৃতি পাতকী সন্তান সে না হইলে এই পৃথিবীতে সম্মুখে দেবতা পাইয়াও দেবতাকে সে চিনিতে পারিল না কেন?

অস্থির হইয়া হিমাংশু নদীর শুভ্র সৈকতে পাদচারণা করিতে লাগিল, তখন তাহার শীত গ্রীষ্ম কোন কিছুরই অনুভূতি হইতেছিল না। দুই দিনের বারিপাতে সৈকতের বহুলাংশ জলমগ্ন হইয়াছে, অবশিষ্টাংশও নদীগর্ভ গ্রাস করিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহা হইতে জল সরিয়া গিয়াছে, ধূ ধূ বালুকা বিস্তার জলসিক্ত হইয়া চন্দ্রকরে ঝিকমিক করিতেছে। হিমাংশুর পট্টু, গরম মোজা ও বুট পরিহিত পদদ্বয় যে একেবারে অনার্দ্র অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তাভারগ্রস্ত হিমাংশু এমনই তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবারই অবকাশ ছিল না।

হিমাংশু ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না, পিতার উপর তাহার অভিমান, না ক্রোধ? পিতা স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির রাসভারী লোক, এ কথা সত্য, প্রকাশ্যে তাহার ও তাহার ভগিনীর প্রতি অন্তরের স্নেহ-মমতার উচ্ছ্বাসের পরিচয় তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইত

না, একথাও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের যত কিছু আবদার বাহানা অভিমান অনুযোগ,--সকলেরই লক্ষ্যস্থলই ত তিনি। তাহাদের মনের কথা কখনও খসাইতে হয় নাই, তাহাদের সকল অভাবই তিনি পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইয়া পূর্ণ করিয়াছেন। তবে কেন সে তুচ্ছ কারণে তাঁহার মুখের উপর কটুকথা বলিয়া চলিয়া আসিল? এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? অনুতাপানলে হিমাংশুর অন্তর পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

অকস্মাৎ রজনীর গম্ভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পেচকের কর্কশ আরাব বাতাসে ভাসিয়া আসিল, হিমাংশুর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সম্মুখে চাহিতেই সে দেখিল, নদীর যে বাঁকের মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পরেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলমণ্ডিত দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ। এ সে কোথায় আসিল? পার্ব্বত্য পথ সে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে?

হঠাৎ একটা বিকট বন্য দুর্গন্ধে স্থানটা ভরিয়া গেল। হিমাংশু সভয়ে দেখিল, সম্মুখের ঝোপের মধ্যে দুইটি চক্ষু জ্বল-জ্বল করিতেছে তাহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। এই গভীর অরণ্য, লোকালয়শূন্য গিরি ও নদীতট, হিংস্র বন্য-পশুর অবস্থিতি বিস্ময়ের বিষয় নহে, সুতরাং অতি বড় দুর্জ্জয় সাহসীরও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। ক্ষিপ্রগতিতে হিমাংশু টর্চ্চ লাইটটার সুইচ টিপিয়া ধরিল,—উজ্জ্বল আলোকমালায় ঝোপজঙ্গলের ঘনান্ধকার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একটা করুণ আর্ত্তরব করিয়া বন্যজন্তুটা নিমিষে ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। হিমাংশু পায়ে পায়ে পশ্চাদাবর্ত্তন করিয়া কতকটা নদীসৈকত অতিক্রম করিয়া আসিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত অনাবৃত স্থানে আসিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি অগ্রসর হইল।

পথের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া হিমাংশু আপন মনে হাসিল। বিপদের মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে মানুষের মনে একটা স্বস্তির ভাবের উদয় হয়, হিমাংশুর হাসিও যে সেই স্বস্তির হাসি, তাহাতে সন্দেহ নাই। হাসিতে হাসিতেই সে আপন মনে বলিল, "আজ যদি ঐ চিতাবাঘটার হাতে আমার প্রাণ যেতো তা হলে পাপের ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হোতো।"

ফাঁকা নদীসৈকত—অদূরে পথের উপর নরযানখানি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। মনুষ্যসঙ্গবর্জ্জিত হইলেও হিমাংশু যেন তাহাতেও আপনাকে নিরাপদ ও সঙ্গীপরিবৃত বলিয়া মনে করিল। মানুষ মানুষের সমাজ বর্জ্জন করিয়া কয়দিন বাস করিতে পারে? ক্রোধের বশে—আত্মসম্মান আহত হইয়াছে মনে করিয়া সে রাজধানীর ভোগবিলাস ও আত্মীয়-স্বজনের সুখ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুদূর মানভূমের এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে সামান্য বেতনে চাকুরী লইয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখন সেমুহূর্ত্ত অতীত,—বাস্তব জীবনে এখন সে যাহা দেখিতেছে, তাহাতে সে ত সুধাপাত্র ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে বিষপাত্র গ্রহণ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। পার্ব্বত্য জঙ্গলের এক নিরক্ষর ভূস্বামীর ভবনে কঠিন পীড়ার চিকিৎসার্থ সে সারা অপরাহ্ন রেলের শাখা লাইনে ভ্রমণের পর সন্ধ্যা হইতে নরযানে বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। শেষ রাত্রিতে জমিদার ভবনে পৌঁছিবার কথা, কিন্তু মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইতেই সে নদীতটে বাধা-প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। বাহকরা দয়া করিয়া দেখা না দিলে তাহার কোথাও যাইবার উপায় নাই। অজানা অচেনা দুর্গম পার্ব্বত্য জঙ্গলপথ—কে তাহাকে নদীপারে পথ দেখাইয়া দিবে? নদীই বা সে পার হইবে কিরূপে? এই বিপদসঙ্কুল অবস্থার জন্য দায়ী ত সে নিজেই।

দায়ী নয়? কেন সে তাহার বংশানুক্রমিক গুরুর প্রতি উদ্ধত অসংযত বাক্যপ্রয়োগ করিল? এখনও তাহার সেই ঘটনা মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করিতেছে! সেদিন গুরু তাহাদের দেশের পৈতৃক ভবনে পদার্পণ না করিয়া তাহার ভবানীপুরের বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ কালটা সে ভূতের মত খাটিয়া সবেমাত্র বাসায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে, এমন সময় (অথবা অসময়ে) গুরুদেবের অকস্মাৎ আবির্ভাব! তখনও তাহার গায়ের ঘাম মরে নাই। ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হিমাংশু বলিয়াছিল, "তা এখানে কেন, বাড়ীতে বাবার কাছে না গিয়ে?" গুরুর কৈফিয়ৎ,—হাওড়ার ছোট লাইনে মাত্র দুইটা ষ্টেশন দূরে তিনি শিষ্যবাড়ী হইতে আসিতেছেন অকালে, কলিকাতায় তাঁহার এত বড় শিষ্য থাকিতে কোথায় যাইবেন? মাসিক

দ্রুব্যটা ঐ স্থান হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন। হিমাংশুর মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে অতিরিক্ত ঝাঁঝের সহিত জবাব দিয়াছিল যে, 'পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইলে বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, নতুবা পৈতৃক জমিদারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এটা ত আর তাহা নহে। আর প্রতিমাসে তাহার পিতাকে বিরক্ত না করিয়া তিনি এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লউন না যাহাতে তাঁহার সংসারযাত্রা চলিয়া যায়। কিছু জমিজমার দানপত্র লিখাইয়া লইলেই ত হয়।" গুরুদেব একথায় অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিতেছিলেন। তখন হিমাংশুর চৈতন্য হয়, সে তাড়াতাড়ি অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া ও হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে বলে যে, সে সেই মাসের সমস্ত রোজগারই তাঁহাকে দিয়া দিবে, তাহাতে তিনি সম্ভবতঃ তাহার দেশে কিছু ধান জমি কিনিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ অতঃপর সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু কথাটা কর্ত্তাবাবুর কানে উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি এজন্য তাহাকে দেশে লইয়া যান এবং অত্যন্ত অনুযোগ করেন :- এই ব্যবহার—সম্মানভাজন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের প্রতি বিদেশী বিদ্যার্জ্জনের ইহাই ফল? তাঁহারাও ত সে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইত্যাদি।

পিতার সেই রুদ্র মূর্ত্তির কথা, সে আজিও ভুলিতে পারে নাই; এখনও তাহার মনে সেদিনের ভর্ৎসনা গঞ্জনার কথা উদয় হইতে লাগিল। প্রকারান্তরে তাহার পিতা এমনই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, যতদিন সে তাঁহার ভবনে বাস করিবে বা তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিবে, ততদিন তাহাকে তাহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতি সম্মানার্হগণকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে, অন্যথা সে তাহার নিজের স্থান বাছিয়া লইতে পারে। এই মর্ম্মান্তিক বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়াই না সে এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় বিদেশে চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল। এবং সেই দরখাস্তের ফলেই না তাহার এই পার্ব্বত্য জঙ্গলে আগমন অবস্থিতি এবং জমিদার-ভবনে চিকিৎসার্থ যাত্রা?

সে নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং তদ্দণ্ডেই ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে ধরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি ত তাহার পিতা তাহাকে অপমান লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই। সে বিদেশে চাকুরী গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলেও তিনি ত বাধা দেন নাই। তাঁহার এ ক্রোধের মাত্রাও ত অল্প নহে। অনুতপ্ত পুত্রকে ক্ষমা করিবারও কি কিছু নাই?

ডুলীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হিমাংশু আরও ভাবিল, গুরুর প্রতি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করিয়াছিল, পিতা যে তবে কেবল সেই জন্য তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন তাহা কখনই হইতে পারে না, নিশ্চিতই তাঁহার ক্রোধের অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে—সেই ক্রোধ তুষানলের মত তাঁহার মনে বহুদিন হইতে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। এই ক্রোধ তাহার ডাক্তারখানার বে-বন্দোবস্ত সম্পর্কিত। পিতা দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে ঐ সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন এবং ডাক্তারখানার সম্পর্ক হইতে উহার ম্যানেজার ও বিল-সরকারকে অপসারিত করিতে কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন—তাহাদের কাহারও সরল হিসাব-নিকাশ নাই। বিল-সরকার ত বিল ভাঙ্গিয়া খাইয়া হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছে,—ডাক্তারখানার মালিক হইয়া হিমাংশু কি এতদিন নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিয়া ঘুমাইতেছিল? ম্যানেজার অবশ্য সাধু সাজিয়া বিল সরকারকে ধরাইয়া দিতেছে, কিন্তু উহার কোন গলদ আপাততঃ ধরিতে পারা না গেলেও উহার উদ্দেশ্য যে সাধু নহে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অতএব উহাকেও অপসারণ করা কর্ত্তব্য। হিমাংশু এজন্য ক্রমাগত সময় চাহিতেছিল, অথচ তিনি আর এক মুহূর্ত্তও সময় অপব্যয় করিতে সম্মত ছিলেন না। পিতা পুত্রে যখনই এই ঘোর মনোমালিন্য উপস্থিত, ঠিক সেই সময় ধূমকেতুর মত তাহার জীবনের আকাশে উদয় হইল পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপে অতিমাত্র উৎগ্রীব গর্ব্বিত ধনবলদর্পিত জমিদার কন্যা দীপ্তি—সে আসিয়া দাঁড়াইল পিতাপুত্রের মধ্যস্থলে। বিশেষতঃ সে তাহার ভগিনী রেখাকে তাহার কাছে অধিক দিন রাখিয়া দিতে সম্মত হয় নাই বলিয়াই সে তাহার প্রতি হইল জাত-ক্রোধ—সেই ক্রোধের অভিব্যক্তি হইল ডাক্তারখানার ব্যাপারে তাহার কুমন্ত্রণার মধ্য দিয়া!

গর্ব্বিতা?—ডুলীর প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াও হিমাংশু আবার নদীসৈকতের দিকে অগ্রসর হইল—তাহার চিন্তাধারা তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে দিতেছিল না, সে নিজেই দীপ্তিকে গর্ব্বিতা এবং অনর্থক পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারিণী বলিয়া মনে মনে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল,

আবার আপনিই আপনার মনে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি গর্ব্বিতা? পিতা ত তাহা বলেন না, নীহার ত তাহা স্বীকার করে না, রেখাও ত সে কথা বলিলে তুমুল আপত্তি করে! রেখা যে কয়দিন তাহার কাছে ছিল, সে কয়দিন সে কি আদর যত্নই না পাইয়াছে তাহার কাছে!—বোধ হয় রেখা এ বয়স পর্য্যন্ত কোথাও তাহার শতাংশের একাংশও প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার জন্য তাহার দীপ্তি দিদি স্বহস্তে নানা রকমের অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিয়াছে,—স্বক্ত ঘণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য মাংস পলান্ন মিষ্টান্ন, সে ত সকল রকমেরই ভোজ্য প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত। এ প্রমাণ সে নিজেও পাইয়াছে, কারণ রেখাকে আনিবার দিন সে স্বহস্তে তাহাকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়াছে এবং রেখার কাছে সে শুনিয়াছে যে, সেদিনের সমস্ত অন্নব্যঞ্জন সে স্বহস্তেই প্রস্তুত করিয়াছে। পরিবেষণ কালে সে দেখিয়াছে, পরিশ্রমে তাহার কপোল দুইটি আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ললাটের স্বেদবিন্দুতে চূর্ণকুন্তলগুলি জড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে তখন বাঙ্গালীর ঘরের কি সুন্দর অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতেই সে দেখিয়াছিল! যে অতিথি-অভ্যাগতকে এমন করিয়া রন্ধন করিয়া ও ভোজন করাইয়া পরিতোষ লাভ করে, সে কি গর্ব্বিতা?

আরও দেখিয়াছে সে, বৃদ্ধ ম্যানেজার যদুগোপালবাবুর রোগশয্যাপ্রান্তে বসিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে রোগীর সেবা পরিচর্য্যা করিতেছে। পরে অবশ্য ভাড়াটিয়া নার্স আসিয়াছে, কিন্তু প্রথম দুই চারিদিন সে স্বয়ং যে সেবা করিয়াছে, তাহা শিক্ষিতা নার্সদেরও অনুকরণযোগ্য। এ সহিষ্ণুতা যাহার স্বভাবজ গুণ, সে কি গর্ব্বিতা হইতে পারে?

আবার একটা পেচক কর্কশধ্বনি করিয়া হুস হুস করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। হিমাংশু দ্রুত পাদচারনা করিতে লাগিল। নদীতটে উপস্থিত হইয়া জলস্রোতের দিকে চাহিয়া সে আবার ভাবিতে লাগিল, তবে সে পরের কাজে কথা কহিতে আসে কেন? সে নারী—বালিকা—বালিকার মতই থাকিবে, তাহার এই পুরুষোচিত ঔদ্ধত্য কেন? যেদিন সে পিতার আদেশে রেখাকে আনিবার জন্য তাহার ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেদিন আহারান্তে বিশ্রামকালে তাহাদের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহার একটি বিন্দুবিসর্গও ত সে ভুলে নাই। সত্য বটে সে শিক্ষিতা, কিন্তু তাহা হইলেও যে বিষয়ে তাহার গভীর জ্ঞান অথবা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোন সুযোগ হয় নাই, যে বিষয়ে সে প্রামান্য কোন কথার অবতারণা না করিয়া তর্কে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এত নির্ব্বন্ধপরায়ণতা দেখাইয়াছিল কেন? তাহার এই ঔদ্ধত্য যেমন অমার্জ্জনীয়, তেমনি পরের সাংসারিক অথবা ব্যবসায় ব্যাপারে তাহার অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইয়া দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতাও অসহ্য! সে যদি তাহার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না যাইত, তাহা হইলে তাহার পিতার সহিত আজ এই মনান্তরের অবকাশ ঘটিত না অথবা তাহারও আজ আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে এই নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতে আসিতে হইত না। কেবল গুরুঠাকুরের সহিত সামায়ক বচসা ত পিতার সহিত মনোমালিন্যের একমাত্র কারণ নহে?

যতই হিমাংশু মনের মধ্যে আপনিই এই সমস্ত অসন্তোষ ও অশান্তির ইন্ধন যোগাইতে লাগিল, ততই কোন বাধা না পাইয়া সেগুলি তাহার ক্রোধ ও বিরক্তির অগ্নি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। সে হস্ত বদ্ধমুষ্টি করিয়া দ্রুতপদে আবার পরিত্যক্ত নর-নারীর দিকে অগ্রসর হইল।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা কথা তাহার মনোমধ্যে অন্ধকারে আলোকের মত ঝিকমিক করিয়া উঠিল। কথাটা অন্য কথাপ্রসঙ্গে তুলিয়াছিল নীহার। সে বলিয়াছিল, কেন দীপ্তি এত লোক থাকতে তাহার (হিমাংশুর) সাংসারিক অথবা ব্যবসায়িক কথার সংস্পর্শে আসিতে এত আগ্রহ প্রদর্শন করে, হিমাংশুদাদা কি তাহা কখনও একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

না, সে তাহা কখনও ভাবিয়া দেখে নাই? কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার ইহাতে কি আছে? দীপ্তিকে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মনে করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা হইতে অনুক্ষণ দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে। তবে দীপ্তি তাহার সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহ প্রকাশ করে কেন?

হিমাংশুর বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইল—ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। সে আবার দ্রুতপদে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ ঘন বনানীর অন্তরাল ভেদ করিয়া দূরে ধূমরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইল—তাহারই সঙ্গে বৃক্ষপত্র সমূহের মধ্য দিয়া জলন্ত পাবকের অগ্নিশিখা লক্লক্ করিয়া উঠিল। তবে কি নিকটেই লোকালয় বনানীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে?

হিমাংশু আর মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিল না। সঙ্কীর্ণ জঙ্গলপথ ধরিয়া অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া লোকালয়ের সন্ধানে যথাসম্ভব দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীসুশীলকুমার বসু

নূতন ব্যাবস্থাপক সভার কার্য্যসূচী

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল দল নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে ...তীর্ণ হইয়াছিলেন, সংবাদ পত্রের মারফত তাঁহাদের ...ত্যেকেই আপন আপন কার্য্যসূচী প্রচারিত করিয়াছিলেন। ...রা স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের ...সূচী সংবাদ পত্রের মারফত প্রচার করেন নাই বলিয়া ... জানি। অবশ্য স্ব স্ব নির্ব্বাচনক্ষেত্রে ভোটারগণের ...খে তাঁহারা কিছু বলিয়া থাকিতে পারেন।

এবার ভোটারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্র ...সাধারণের অনেকে ভোটের অধিকারী হওয়ায় প্রত্যেক ...ের কার্য্যসূচীতেই দরিদ্র জনসাধারণের সেবার কথা ছিল। ... হইলেও নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ প্রত্যেক দলই যে জন-...রণের যথার্থ কল্যাণকামী বা প্রত্যেক দলই যে নির্ব্বাচনের ...ক্কালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এরূপ ...শা আমরা করি না, কেননা জয়লাভ করিবার নির্মিত্ত ...চনের প্রাক্কালে প্রার্থীরা সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুই ...য়া থাকেন, এবং রক্ষা করিবেন না জানিয়াও অনেক ...শ্রুতি দিয়া থাকেন। যাহা হউক তবুও আমরা আশা ... এবং নির্ব্বাচিত সদস্যদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা ...সাধারণের সেবা করিবার যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ...লি যেন পূর্ণ হয়।

বিভিন্ন দল নিজেদের যে কার্য্যসূচী দিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিই আশু প্রয়োজনীয় এবং ঐ সকল সংস্কার ...তে শীঘ্রই সাধিত হয় তাহাও বাঞ্ছনীয়।

নূতন ব্যবস্থাপক সভা ও কৃষককুল

ভোটাধিকারের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি ঘটায় দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ কৃষকেরাও বহু সংখ্যায় ভোটদানের অধিকারী হইয়াছেন এবং পল্লীকেন্দ্র সমূহের সদস্যপদপ্রার্থীদের ইঁহাদের নিকট ভোট ভিক্ষা করিতে হইয়াছে ও ইঁহাদের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত বহুবিধ প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে অন্য কোনও ক্ষেত্রেও কল্যাণ যেমন শুধুমাত্র বাহির হইতে আসিতে পারে না, তাহাকে উদ্যম ও প্রচেষ্টাদ্বারা লাভ করিতে হয়, কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের দ্বারা তেমনই কৃষকদের দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে না; তাঁহারা যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারেন, নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার ও তাহাকে নিজেদের পক্ষে কল্যাণকর করিয়া গড়িয়া তুলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন তবেই তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় কৃষকদের সত্যকারের কল্যাণকামী যাহারা গিয়াছেন তাঁহারা সচেষ্ট হইলে, কৃষকদের মঙ্গলের জন্য হয়ত কিছু কিছু করিতে পারিবেন। কৃষকদের নানাবিধ দুঃখের তালিকা সম্পূর্ণ করাই হয়ত শক্ত ব্যাপার। তাঁহাদের অজ্ঞতা, খাদ্য পানীয়ের অভাব, বস্ত্রের অভাব, চিকিৎসার সুযোগের অভাব, গৃহ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব, অপরের শোষণ ও নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচার, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ প্রভৃতি বিষয়ে আইন সভার মধ্য দিয়া

ইহাদের কিছু কিছু উপকার করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও কৃষকদের বড় উপকার করা হইবে যদি কৃষক আন্দোলনকে, কৃষকদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়াসকে, তাঁহাদের রাষ্ট্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা গঠনের ও তাহা প্রকাশের চেষ্টাকে নূতন ব্যবস্থাপক সভার কৃষক প্রতিনিধিরা রক্ষা করিতে পারেন।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

নূতন শাসনতন্ত্রের অধীন যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে বঙ্গদেশে তাহার নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস যে কয়জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ২১ জন বাদে সকলেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, মন্ত্রীত্বের লোভ প্রভৃতি নানা কারণে কংগ্রেস মোট সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের অধিক প্রার্থী দাঁড় করাইতে পারেন নাই। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিপুল ভোটাধিক্যেই জয়লাভ করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই সাফল্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বা কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের বিশ্বাস ও নির্ভর বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরঞ্চ বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

বিহার, আসাম ও উৎকলেও কংগ্রেস নির্ব্বাচনে প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়াছে। ঐ সকল প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বঙ্গদেশের ন্যায় তীব্র না হওয়ায় এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দ্বারাও কংগ্রেসের শক্তি বিশেষ হ্রাস না পাওয়ায়, অনুপাতে কংগ্রেসীদলের প্রার্থীগণ অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিহারে ও উৎকলে অন্য সকল দলের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত ও স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যের সম্মিলিত সংখ্যা অপেক্ষাও কংগ্রেসীদলের নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অধিক। দুই একটি ভিন্ন অন্য সকল প্রদেশেও কংগ্রেস অনুরূপ সাফল্য লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। নির্ব্বাচনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা কংগ্রেস পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিহীন হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, এবং উহা মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে বা কংগ্রেসের সর্ব্বজনমান্য নেতাদিগকেও অপমান করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন না, কংগ্রেসের এই নির্ব্বাচন সাফল্যে তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে।

কংগ্রেসের এই সাফল্য হইতে বুঝা যায় কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের যে আস্থা আছে অন্য কোনও দলের উপরই তাহা নাই এবং কংগ্রেসকে দেশের লোক যথার্থই নিজেদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে। উপরন্তু নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে যদি জনসাধারণের মতামত নির্দ্দিষ্ট করা সমীচীন হয়, তবে বলিতে হয় দেশের জনসাধারণ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহনীয় নহে এই মতই প্রকাশ করিয়াছে।

নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে নারীগণ

নূতন ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনের অন্যতম বিশেষত্ব হইতেছে যে, এবার নারীদেরও ভোট দিবার অধিকার আছে। এবং সকল প্রদেশেই এই অধিকার চর্চ্চায় নারীরা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শণ করিতেছেন, সকল স্থানেই নির্ব্বাচনের সময়ে নারীদের ভিতর বিশেষ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখা যাইতেছে।

যুগ যুগ ব্যাপী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচার, নিষ্পীড়ন ও অশিক্ষাও যে নারীদের নিষ্পেষিত করিয়া একেবারে জড়পিণ্ডে পরিণত করিতে পারে নাই, নির্ব্বাচন ব্যাপারে নারীদের ভিতর এই উত্তেজনার চাঞ্চল্য তাহারই পরিচায়ক।

কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতাতেও নারীরা সাফল্য লাভ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অন্যতম উদারপন্থী নেতা ও প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সি, ওয়াই চিন্তামণি যুক্ত প্রদেশে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জনৈকা মহিলার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। নারীদিগকে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষেরাও পুরুষের অপেক্ষা যোগ্য মনে করিতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে নারীদের এইরূপ জয় নারী আন্দোলনের বিশেষ সহায়ক হইবে।

যুক্ত নির্ব্বাচনে বাংলার কৃষকদের এবং প্রধানতঃ মুসলমানদের লাভ হইত

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তে যদি যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথার সুবিধা নূতন শাসনতন্ত্রে থাকিত তাহা হইলে অন্য যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় অপেক্ষা কৃষকেরা এবং মুসলমানেরা (অন্ততঃ বাংলা দেশে) অধিকতর লাভবান হইতেন।

দেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষক বা কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া, ইঁহাদের আশানুরূপ সংখ্যা ভোটার হইতে না পারিলেও, মোট ভোটারদের মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যদি প্রত্যেক সদস্য-পদ প্রার্থীকে নিজ নির্ব্বাচনকেন্দ্রের সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভোটারের সাহায্যের প্রয়োজন হইত তবে, ভোটারদের মধ্যে যাঁহাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সেই কৃষকদের প্রতিনিধিরাই মাত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। ইহাতে কৃষকদের, এবং মুসলমানদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যানুপাত হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী হওয়ায় বিশেষ করিয়া মুসলমানেরা লাভবান হইতেন।

কিন্তু, নির্ব্বাচকমণ্ডলী ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে বিভক্ত হওয়ায় এই সুবিধা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে কৃষক প্রায় নাই বলিলেই হয়। কাজেই ইঁহাদের প্রতিনিধিদের কৃষকদের কথা ভাবিবার দরকার হয় নাই। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে অকৃষক বর্ণহিন্দুদের ভোটের ফলেই নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন। অবশ্য যে সকল স্থলে কংগ্রেস মনোনীত লোকেরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সে সকল স্থলে অকৃষকদের ভোটের জোরে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলেও, তাঁহারা হয়ত কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল কাজই করিবেন। মুসলমানদের মধ্যেও যাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও কল্যাণের দোহাই দিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, যুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইলে তাহাদের জয়ের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যাইত। সেরূপ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা একেবারেই বাদ দিয়া নির্ব্বাচকদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের যাহা স্বার্থ তাঁহাদিগকে সেই সকল কথাই বলিতে হইত এবং এই শেষোক্তদের প্রতিনিধিদেরই নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকিত। মুসলমানদের মধ্যে প্রজাদলের উদ্ভব এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহাদের জয়লাভের ফলে হয়ত সাম্প্রদায়িক অন্ধতা অনেক পরিমাণে কমিয়াছে এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে—অবশ্য যদি এই দল অর্থনীতিক ভিত্তির উপরই কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচনের জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে কংগ্রেস ও প্রজাদলের অস্তিত্ব ও কার্য্যের ফলে তাহার আংশিক সংশোধন হইলেও, পূর্ণ সংশোধন কখনই সম্ভব নহে।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী যুক্ত হইলে এবং শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে দল গঠিত হইলে প্রতিনিধিরা যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের লোকই হইতেন না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না।

একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদানের অধিকার পুনাচুক্তিকে অনেকাংশে ব্যর্থ করিয়াছে

রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিভাগ কৃত্রিম ও কল্যাণকর বলিয়া হিন্দুরা বা মুসলমানেরা অথবা উভয়েই যদি শক্তিশালী সম্প্রদায় হইয়া গড়িয়া উঠেন তবে তাহাতে আমাদের রাষ্ট্রিক লাভ কিছু হইবে এমন মনে হয় না। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পৃথক করিয়া দিবার যে কুফল আমরা ভোগ করিতেছি সাম্প্রদায়িক এবং উপসাম্প্রদায়িক সীমারেখাকে অবলম্বন করিয়া আরও ভাগের দ্বারা যাহাতে আমাদের আরও খণ্ডিত করিয়া সেই কুফলকে আরও বাড়াইয়া দিতে কেহ না পারে সেদিকেও আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের দুইভাগে ভাগ করিয়া শুধু যে হিন্দুসমাজেরই ক্ষতি করা হইয়াছিল তাহা নহে। হিন্দু ও মুসলমানকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেশের যে ক্ষতি করা হইয়াছে, উপসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হিন্দুদের আবার ভাগ করিয়া সেই ক্ষতিকে আরও বাড়ান হইয়াছিল। পুনাচুক্তির ফলে ইহার আংশিক সংশোধন হইয়া থাকিলেও, একজন ভোটারের দেয় একাধিক ভোট একই প্রার্থীকে দিবার বিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ায় পুনাচুক্তির সুফল অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সজাগ না হইলে হিন্দুসমাজ উপসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অনেকটা বিভক্তই হইয়া থাকিবে। আমাদের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকিত এবং বিশেষ বিশেষ আদর্শ, নীতি এবং কর্ম্মতালিকা অনুযায়ী দল গঠিত হইত তাহা হইলে এই বিধানের ফলে উক্তরূপ অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু হিন্দুসমাজের উভয় প্রান্তের মধ্যে ভেদজ্ঞান ও বিভাগ পূর্ব্ব হইতেই আছে এবং তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঈর্ষার ভাবও আছে। এইরূপ অবস্থায় একই

ভোটারের দেয় একাধিক ভোট একজনকে দিবার সুবিধা পাওয়ায় সাধারণত তপশীলভুক্ত জাতিরা তাঁহাদের দেয় একাধিক ভোট তাঁহাদের শ্রেণীর প্রার্থীকে এবং বর্ণ-হিন্দুরা তাঁহাদের দেয় ভোট তাঁহাদের শ্রেণীর প্রার্থীকে অনেক স্থলেই দিয়াছেন। যদি একটি ভোটের বেশী একজন প্রার্থীকে দেওয়া না যাইত, তাহা হইলে উভয় দলের দুইজন প্রতিনিধি একরূপ চুক্তিতে সহজেই আবদ্ধ হইতে পারিতেন এবং কার্য্যত হইতেনও যে, নিজ নিজ প্রভাবাধীন ভোটারদের অতিরিক্ত ভোটটি অপর সঙ্গীকে দেওয়াইবেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিভাগের রেখাটি অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু, প্রবর্ত্তিত বিধানে প্রভাবাধীন ভোটারদের সবই ভোট নিজে লইবার সুবিধা থাকার একরূপ আর সম্ভব হয় নাই। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভোটারদের উপরই সাধারণত প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এই অনুসারে কাজেই ভোটাররা বিভক্ত হইয়াছেন।

হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা

হিন্দুদের মধ্যে সকল রাজনীতিক দলের লোকেরাই সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিয়া থাকেন এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইহার ক্ষতিকর প্রভাবের কথাও বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সাম্প্রদায়িকতা শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নহে। হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর যে স্বাতন্ত্র্য বোধ তাহাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং নানা রাষ্ট্রিকক্ষেত্রেও ইহার ক্রিয়া লক্ষিত হয়। গত নির্ব্বাচনে তপশীলভুক্ত জাতিরা ও অন্যান্য হিন্দুরা অনেকটা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রার্থীদের ভোট দিয়াছেন, অর্থাৎ আদর্শ হিসাবে মুখে অন্য কথা বলিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়াছেন। কিন্তু আরও শোচনীয় কথা এই যে, ভোটারেরা শুধু এই বড় দুইটি ভাগ অনুসারেই ভোট দেন নাই আরও ক্ষুদ্রতর খণ্ডত্ববোধও তাঁহাদের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে। হিন্দুরা যে বড় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন তাহার প্রত্যেক ভাগেই অনেকগুলি করিয়া জাতি আছে। উভয় বিভাগের মধ্যেই অনেক ভোটার অন্যান্য কথা বাদ দিয়া স্বজাতীয় প্রার্থীদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের প্রমাণ দিয়াছেন। মুসলমানদের মধ্যে উপসাম্প্রদায়িক বিভাগ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টনী অঙ্কিত না থাকায় তাঁহাদের ভোট অনেকটা দলের প্রতিশ্রুত নীতি ও কর্ম্মতালিকা অনুসারেই হইয়াছে। হিন্দুসমাজে জাতিভেদ দূর না হইলে এই সব স্বাতন্ত্র্যবোধও নষ্ট হইবে না এবং রাষ্ট্রনীতিও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে না।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমস্যা

সকল প্রাদেশিক সভার নির্ব্বাচন শীঘ্রই শেষ হইবে। তৎপরে, কংগ্রেসদলের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সহযোগে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমস্যার সমাধান করিবেন।

এই 'মন্ত্রীত্ব' গ্রহণ সমস্যার উৎপত্তি হইতেই আমরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছি। এখনও আমাদের অভিমত, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করিলে কংগ্রেসের অভিমান হয়ত বজায় থাকিতে পারে, কিন্তু রাজনীতির দিক হইতে উহা মস্ত ভুল হইবে। মন্ত্রীত্ব বর্জনের মূলে আসল যুক্তি কিছুই নাই। অবশ্য এমন ভয় যদি থাকে যে, যাঁহারা কংগ্রেসীদলের পক্ষ হইতে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন তাঁহারা দু'চার দিন লাট বেলাটের সহিত খানা খাইয়া ও তাঁহাদের পিঠ চাপড়ানিতে ভুলিয়া কংগ্রেসের দলত্যাগ করিয়া সরকারের দলে ভিড়িবেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

অবশ্য কংগ্রেস তথা দেশের সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে তাহার তুলনায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ একটি লঘু সমস্যা। কিন্তু তাহা হইলেও স্বাধীনতা অর্জ্জনের নিমিত্ত কংগ্রেস যে কার্য্যক্রমই গ্রহণ করুন ও যে ধরণের সংগ্রামই চালান তাহার নিমিত্ত কংগ্রেসকে শুধু নিজেদের শক্তিশালীই করিলে চলিবে না, বিপক্ষদলের শক্তি উৎসসমূহও তাহাকে অধিকার করিতে হইবে। এমন কি জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতিও যাহাতে কংগ্রেস পক্ষীয় লোকের দ্বারা অধিকৃত হয় তাহার চেষ্টাও হওয়া উচিত। উহাতে দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারেরও যেমন সুবিধা হইবে, অন্যদিকে তেমনি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তথা দেশের

স্বাধীনতা অর্জ্জনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সকল বাধা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে তাহাদের বোধ হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে হয়ত বঙ্গদেশে কংগ্রেসীদল কর্ত্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সম্ভব হইবে না, কিম্বা কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের নিমিত্ত কংগ্রেসীদলের পর্য্যাপ্ত শক্তি থাকিলেও হয়ত কংগ্রেসী লোকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে অহ্বান করা হইবে না। কিন্তু যে সকল প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সম্ভব ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে কংগ্রেসকে আহ্বান করা হইবে সে সকল প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাই উচিত হইবে।

বঙ্গভাষায় 'পি, এচ-ডি'র থীসিস

পাটনা বি, এন, কলেজের অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় গবেষণামূলক পুস্তক লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সান্যাল মহাশয় বাঙ্গলা টাইপ-রাইটারে এই গ্রন্থের অনুলিপি করিয়া দেন।

বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ গবেষণামূলক গ্রন্থাদি লেখা বর্ত্তমানে সম্ভবপর না হইলেও ইতিহাস, সাহিত্য বিষয়ক গবেষণামূলক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করা অসম্ভব নহে। তবে এতদিন যে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিগুলি পান নাই তাহার কারণ উদ্যমাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বঙ্গভাষায় লেখা থীসিস পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺শশাঙ্ক দাস তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 'বাণীমন্দির' বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচিত হইতে পারিত তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ঐ পুস্তক তাঁহাকে ইংরেজিতে লিখিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহারও মনে কোন সময়ে ঐ ইচ্ছাও উদিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি বঙ্গভাষায় ঐ পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গভাষার প্রতি নিজের অসামান্য প্রীতির পরিচয়ই রাখিয়া গিয়াছেন।

রাশিয়া কি নিরীশ্বর বাদী

সকল ধর্ম্মেই মানবপ্রীতি, মানবসেবা, ন্যায়, সুবিচার পরোপকার, দয়া অপরের দুঃখদূর, সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা, অহিংসা প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম্মের ধর্ম্মগুরুরা ও সাধুপুরুষেরা এই সকল গুণকে ধর্ম্মের মূলবস্তু বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেও, মুখে যাঁহারা ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন দিয়া থাকেন এমন লোকদের ব্যবহারিক জীবনে এই সকল গুণের সম্পর্ক বড় বেশী দেখা যায় না কিন্তু এজন্য অধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহারা জনসমাজে নিন্দিতও হন না। অপর পক্ষে এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াও যদি কেহ অদৃশ্য অজ্ঞাত রহস্যময় কোন শক্তির কাছে নত হইতে না চাহেন তবে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া তাহাকে নিন্দা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। খৃষ্টভক্ত ইওরোপীয় জাতিগুলির কার্য্যাবলীর পশ্চাতে যীশু-প্রচারিত ধর্ম্মের প্রেরণা কতটা রহিয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এজন্য ইহাদের কেহ ধর্ম্মদ্রোহী বলে না। অপর পক্ষে যদিও খৃষ্টধর্ম্মের মূলনীতিগুলি রাশিয়ার রাষ্ট্রে ও সমাজ জীবনে অনুসৃত হইতেছে, মানবপ্রীতি সাম্য ন্যায় ও সর্ব্বসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যকেই সকল কাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইতেছে এবং ইহার নিয়ন্তাগণ নিজেদের স্বার্থের পরিবর্ত্তে জনসাধারণের স্বার্থের জন্যই কাজ করিতেছেন তবুও রাশিয়া ধর্ম্মদ্রোহী ও অখৃষ্টান। রাশিয়া সম্বন্ধে লোকের সম্মুখে যে ভয়াবহ চিত্র আঁকা হইয়া থাকে, তাহার একটা প্রধান ভয়াবহ অংশ এই যে রাশিয়া ঈশ্বর মানে না, সেখানে ধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। অথচ সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেই যেসকল উপদেশকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা হইতে সমাজে যে সম্ভাবিত সুফল আসিতে পারে বলিয়া আশা করা হইয়াছে, নিরীশ্বরবাদী হইয়াও রাশিয়ার জনসাধারণ সেই সকল সুফলের অধিকারী হইয়াছে। ইউনিটি পত্রিকায়

Victor S. Yarres রাশিয়ার ধর্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন ;—"....কোন কোন সাধু খৃষ্টধর্ম প্রচারক দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও বুর্জ্জয় ব্যবস্থা অপেক্ষা রাশিয়ার ব্যবস্থা এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি খৃষ্টধর্মের মূলবস্তুর অধিকতর অনুগামী। সকলের জন্যই প্রাচুর্য্যের কল্পনায়, বৃদ্ধ বয়সের জন্য বৃত্তি ও বেকার অবস্থার জন্য বীমার ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য দ্রব্য উৎপাদনের আদর্শে, নরনারীর পরিপূর্ণ সাম্যে, শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ফলপ্রদ ব্যবস্থায়, নগরে ও গ্রামে শিক্ষার প্রসারে, কার্য্যক্ষম প্রতি ব্যক্তিকে কাজ দিবার এবং এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এবং শ্রমশিল্পে ও জীবনে অপব্যয় নিবারণের সর্ব্বপ্রকার সম্ভবযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করায় অধার্ম্মিকতা বা নাস্তিকতার কিছু আছে কি ?...সেবা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং সত্যকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তির উপর রাশিয়া গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে এবং সেজন্য চেষ্টা করিতেছে।"

ধর্ম ও ঈশ্বর না মানিয়াও রাশিয়া প্রকৃত অর্থে অধর্মের পথে যাত্রা করিয়াছে কিনা এবং সেখানকার অবস্থা সেজন্য সত্যই ভয়াবহ হইয়াছে কিনা তাহা আমাদেরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতবর্ষে ভারতীয়ের অপমান

ইউরোপের কোন কোন দেশে ভারতীয়দের ঘৃণা করা হয় বলিয়া শুনা যায়। ইংলণ্ডেও অনেকগুলি রেঁস্তরাতে ও সন্তরণ করিবার ক্লাবেও নাকি ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য ভারতীয়েরা শিক্ষায় রুচিতে হীন এই অজুহাতে নয়, ভারতীয়রা ভারতবাসী বলিয়াই—কতকটা বর্ণের অহঙ্কারে, কতকটা বা রাজনৈতিক কারণের জন্য, ভারতীয়দিগকে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হয়। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ইউরোপের সর্ব্বত্র পুরুষভারতবাসী মাত্রই ইউরোপীয় পরিচ্ছদই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষেও কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সরকারী চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রেলে ভ্রমণ প্রভৃতি নানা ছোটখাটো সাধারণ নাগরিক অধিকার ও সুখ সুবিধাতেও ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে ভারতবাসীর পক্ষে হীনতা ও অপমানজনক পার্থক্য প্রতিপালিত হইত। এতদভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে সাহেবরাও এমনকি সরকারী চাকুরেরাও ভারতবাসীদের এরূপ অপমানের সহায়ক ও উৎসাহক হইতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা সাহেবদের সম্মুখে নিজেদের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ না করিলে, উঁহাদের হস্তে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইতেন, ইদানীং রাজনৈতিক কারণে ও ভারতবাসীগণ কিয়ৎপরিমাণে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও এইরূপ হীন ও অপমানজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়াতে এইরূপ পার্থক্য ও ব্যবহারের মাত্রা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে ভারতবাসীরা ভারতীয় বলিয়াই নিজদেশে শ্বেতাঙ্গদের হস্তে অপমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। এরূপ অপমানের মাত্রা কমিয়া যাওয়াতে, যখনই এদেশে শ্বেতাঙ্গের হস্তে ভারতবাসীর অপমানের কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় তখনই আমরা ইহাকে, পূর্ব্বে আমাদের পক্ষে যে হীন ও অপমানজনক পার্থক্য প্রতিপালিত হইত, তাহারই একটা অংশ মনে না করিয়া ইহাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমানকারীর পক্ষে সাধারণ সৌজন্য লঙ্ঘন বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের বিগর্হিত রুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। কিন্তু আসলে এরূপ মনে করা ভুল। এই সকল অপমান, পূর্ব্বে আমাদের পক্ষে যে সকল অপমানজনক ব্যবস্থা ছিল বা পার্থক্য প্রতিপালিত হইত তাহারই অংশ। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের লাঞ্ছিত হওয়াতে অপমানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণ সৌজন্য ও মার্জ্জিত রুচির অভাব সূচিত হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবহার যখন পূর্ব্বে সকল ভারতীয়দের পক্ষেই জাতিগতভাবে, (অবশ্য দু'একজন সদাশয় ব্যক্তির কথা ভিন্ন) যে অপমানজনক ব্যবহার করা হইত, তাহারই সহিত সম্পৃক্ত, তখন এরূপ অপমানকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের রুচিবিকার বা অহমিকার দৃষ্টান্ত মনে করিলেই চলিবে না। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষে, ভারতবাসীকে ভারতবাসী বলিয়াই কাহারও অপমান করিবার

ইচ্ছা থাকিলেও সে ইচ্ছা দমন করিতে যাহাতে সে বাধ্য হয়, এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একখানি ব্রিটিশ রণতরী আসিয়াছিল এবং একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে উহা দর্শন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু দেখাইবার ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের হস্তে যে সকল ভারতীয় দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা যে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চৌরঙ্গী মহলের কোন কোন হোটেলে ভারতীয়েরা খানাপিনা করিতে পারিলেও কোট প্যাণ্ট না পরিয়া নাচ-গানের আসরে বসিতে পান না। এবং ইহারই বিরুদ্ধে সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তির একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের অপমান অর্থে আমাদেরকেই অপমান। এবং নানা কারণে করিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমাদেরকে যে অপমানটা হোটেলের কর্ত্তারা করিয়া উঠিতে পারেন না, ধুতি চাদরের মারফত সেই অপমানটাই আমাদের পৌঁছিয়া দেওয়া হয়।

পত্রলেখক তাঁহার পত্রে কোন্ কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ধুতি পরিয়া কি কি বিখ্যাত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন! কিন্তু এরূপ তালিকার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ঐ সকল বিখ্যাত ব্যক্তি যদি ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিধান নাও করিতেন, তাহা হইলেও ভারতবর্ষে ভারতীয় পোষাকে হোটেল রেঁস্তরাতে যাইবার এবং সেখানকার সকল প্রকার আমোদ প্রমোদে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকা একান্তই উচিত হইত।

বোম্বাইতে কোন কোন ক্লাবে, যেমন 'বাইকুলা' ক্লাবে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষের আর কোথাও এরূপ ব্যবস্থা আছে কি না জানি না।

আমাদের দেহের বর্ণের জন্যই হউক, রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্যই হউক বা পোষাক পরিচ্ছদের বিভিন্নতার জন্যই হউক কোন কোন ব্যক্তি বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা হোটেল আমাদেরকে সহ্য করিতে পারে না। এরূপ ঘৃণা বা অপমান যেমন ঘৃণাকারীর বিকৃত রুচির পরিচায়ক, তেমনি যাহারা এইরূপ অপমান সহ্য করে তাহাদেরও চারিত্রিক হীনতা ও দীনতার পরিচায়ক।

মোসলেম্ লীগ, প্রজাপার্টি, কংগ্রেসীদল ও অন্যান্য নির্ব্বাচিত সমস্যদের, এইরূপ অপমানজনক ব্যবহার যাহাতে অন্ততঃ বঙ্গদেশে ভারতবাসীরা না পায় সে জন্য আইন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে বেকারদের সংখ্যা গণনা করিবার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও, বেকার সমস্যা যে একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যা যে হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সমস্যার প্রাধান্য শিক্ষিতদের মধ্যেও যেরূপ, নিরক্ষরদের মধ্যেও তদ্রূপ। তবে তফাৎ এই শিক্ষিত বেকারদের শতকরা ৯৯জনই সম্পূর্ণভাবে বেকার, পক্ষান্তরে নিরক্ষর বেকারদের অধিকাংশই আংশিক ভাবে বেকার—অর্থাৎ প্রত্যেকেরই আয় ভয়াবহরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আমরা সচেতনও নহি। এই জন্যই লোকে আমাদের দেশে বেকার বলিতে শিক্ষিতদেরই বুঝিয়া থাকে এবং যখনই বেকার সমস্যা আলোচনা করা, তখন শিক্ষিত বেকারদের সমস্যাই আলোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং কিছুদিন হইতে একটা রব উঠিয়াছে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাই দায়ী। কিন্তু এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার সহিত বেকার সমস্যার যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই একথা আমরা কয়েকবার বলিয়াছি। তবুও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা লঘু করিবার জন্য নানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী জুটাইয়া দিবার ও ব্যবসায় সম্পর্কিত নানাপ্রকার কাজ শিখিবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য নূতন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহার কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যার অনুপাতে অবশ্য এই প্রচেষ্টা সমস্যা

সমাধানে বিশেষ সফল হইবেনা এবং কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার না হইলে দেশের সকল বা অধিকাংশ বেকারকে কাজ দেওয়া সম্ভব নহে।

উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ

সম্প্রতি রায়বাহাদুর কে, এন, দীক্ষিত এম, এ ডেপুটী ডাইরেক্টার জেনারেল অব্ আর্কিওলজি হইতে ডাইরেক্টার জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত ছাত্র-জীবনে মেধাবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কর্ম্মজীবনেও তিনি নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র বঙ্গদেশের ডেপুটী ডাইরেক্টার হইতে ডাইরেক্টার অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ পদে উন্নীত হইয়াছেন। শিক্ষিতবেকারদের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধন কল্পে সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্ট হইতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সরকারের ঐ বিভাগ বর্ত্তমানে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র এই বিভাগে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিজে দশহাজার টাকা দানও করিয়াছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে তিনি 'Recovery Plan for Bengal' নামক একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে বঙ্গদেশের বেকার সমস্যার সমাধানের নানা তথ্য ও বিচারপূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস ও ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিল। অন্যদের কথা বাদ দিয়া শুধুমাত্র ইহাঁদের কথা আমরা এইজন্য উল্লেখ করিলাম যে, ইহাঁরা যে কারণে এই উৎসব বর্জ্জন করিয়াছেন তাহার উদ্ভব শুধুমাত্র ইহাঁদেরই নিজস্ব কোন অভিযোগ হইতে হয় নাই—বা ইহাঁদের কার্য্যের ফলাফল এই কলেজেরই চতুঃসীমার মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকিবে না। সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির যে আত্মঘাতী লীলা চলিয়াছে ইহা তাহারই অংশ বলিয়া এবং আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের ভবিষ্যতকে ইহা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রভাবিত করিতে পারে বলিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে

'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলমোহরে ও পতাকায় অঙ্কিত পদ্মের ছবি মূর্ত্তিপূজাসূচক বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা এই উৎসব বর্জ্জন করিয়াছেন (অন্ততঃ এইগুলি অন্যতম প্রধান কারণ)।

ইসলামধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার মত জ্ঞান বা অধিকার আমাদের নাই। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে যে কথাটা বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় যে, যে-ধর্ম্ম বহু বিরুদ্ধতার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জ্ঞান, সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যে যাহা একদিন জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তিন মহাদেশের নানাভাষাভাষী, নানা আচার ও রীতি-নীতি বিশিষ্ট বহু কোটি লোকের মধ্যে যে ধর্ম্ম ব্যাপ্ত, নানা দেশের নানা মতের ও বিশ্বাসের বহু জাতির সংস্পর্শে যাহাদের আসিতে হইয়াছে ও কাজকর্ম্ম করিতে হইয়াছে, বহু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া যাহাদের চলিতে হইয়াছে, এবং এখনও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা পরিগণিত তাহা ভঙ্গুর ও ছুঁৎমার্গী হইতে পারে না। উদার এবং শক্তিশালী ভিত্তির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা এবং আত্মরক্ষার জন্য আনুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতা হিসাব করিয়া স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া চলিবার প্রয়োজন তাহার হইতে পারে না। কোন জিনিসের প্রকৃত মর্ম্ম ও তাহার দ্বারা লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে তাহা বাদ দিয়া তাহা ধর্ম্মবিরোধী ও বর্জ্জনীয় কিনা তাহা দেখিবার জন্য যদি তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া উৎপত্তিগত ও আক্ষরিক অর্থ লইয়া টানাটানি করা হয় তবে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। শুচিতা ভাল হইলেও যেমন শুচি-বায়ু-গ্রস্ততা ভাল নহে এবং এদুটি একও নহে তেমনই ধর্ম্মনিষ্ঠা ভাল হইলেও স্পর্শ-দোষ-ভয়গ্রস্ততা সমর্থনযোগ্য নহে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে তাহা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা হইলেও সাম্প্রদায়িকতার প্রবল প্রবাহ আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধকে (হিন্দু মুসলমান উভয়েরই) এতটা অস্বাভাবিক রকমে তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছে যে পাছে আমাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়ও অনুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছি, এবং শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও (যাহা আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছতার উর্দ্ধে) এই অস্বাভাবিক ব্যাপারকে স্বাভাবিক মনে করিয়া নিত্য নানাপ্রকারের অসঙ্গত আচরণ করিতেছি।

আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি শিল্প, তাহা কোন কিছুই শুধুমাত্র বর্ত্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। দূর অতীতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং কালের সূত্র ধরিয়াই তাহারা বর্ত্তমানের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। যে অবস্থা যে প্রয়োজন এবং যে আবেষ্টনের মধ্যে সেসকলের সৃষ্টি হইয়াছিল সে অবস্থা এবং আবেষ্টনের ছাপ এখনও তাহাদের বাহিরের রূপে রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা প্রয়োজন ও আবেষ্টনে তাহারা যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে সে অর্থ ও উদ্দেশ্যে বাদ দিয়া তাহাদের স্বরূপ বুঝিবার ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যদি অতীত ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করা যায় তবে এক দিকে যেমন তাহাদের উপর সুবিচার করা হয় না অপরদিকে তেমনই মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় প্রদান করা হয় না।

বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ, সাহিত্যের অনেকের রচনা, শিল্পের অনেকের সৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলে, তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস উদঘাটিত করিলে দেখা যাইবে যে কোন দেবদেবীর নাম-কাহিনীর সহিত তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে, হয়ত বা বিশেষ কোন দেবদেবীর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে হইতে তাহারা বিশেষ কোন অর্থ পাইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ ইহার পশ্চাতে বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রপুষ্ট হিন্দুমনের ক্রিয়াশীলতা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, বর্ত্তমানে যে সকল অর্থে ইহাদের ব্যবহার হয়, মানুষের মনের উপর তদতিরিক্ত ইহাদের আর কোন ক্ষমতা নাই এবং ইহাদের ব্যবহারকারীরাও পৌত্তলিক হইয়া পড়ে না।

কিন্তু বাংলাসাহিত্য লইয়া কিছুদিন হইতে এই প্রকারের টানাটানি চলিতেছে এবং অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে ইহার অস্বাভাবিকত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতেছে। তবুও, এই ব্যাপার লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানদিবসের অনুষ্ঠান বর্জ্জন যুবক এবং তাহাও আবার ছাত্রদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া নৈরাশ্যের কারণও এখানে সমধিক ; কারণ, বর্ত্তমান অবস্থার অবসান তাঁহাদের দ্বারাই হইতে পারে লোকে এরূপ আশা ও বিশ্বাস করিয়া থাকে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবেদন

নিখিলভারত ছাত্রসংঘ হইতে পৃথক করিয়া নিখিলভারত মুসলিম ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়া আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতাহীন মনোভাবের জন্য পূর্ব্বেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস অনুষ্ঠান বর্জ্জন সম্পর্কে বাংলার ছাত্রদের নিকট তাঁহারা নিম্নোক্ত আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনটি ওখানকার প্রধান প্রধান ছাত্রদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে :—

'আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের নিকট আবেদন করিতেছি, যেন তাঁহারা তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হস্তের ক্রীড়ণক হইয়া না পড়েন। তীব্র সাম্প্রদায়িকতার জন্য আমাদের দেশ যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও মুসলিম ধর্ম্মের নামে জনসাধারণকে বহু শোষণ করা হইয়াছে ; আজ আমরা দেখিতে চাই, যাহাদিগকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহকর্ম্মীদের সহিত দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার ন্যায় জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে সেই মুসলমান ছাত্রেরা এই সকল চিৎকারে বিপথে চালিত না হন।.........তাঁহাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশ অপরের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসনের অধীনে রহিয়াছে ততক্ষণ কেহই নিজ ধর্ম্ম বা সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে পারে না। দাসত্বে চিরনিমজ্জিত করিবার জন্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এরূপ ধুয়া স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা তুলিয়া থাকে।............বাংলার মুসলমান ছাত্রদের একথা মনে রাখা দরকার যে, যাঁহারা চিরদিন বাংলার মুসলমান কৃষকদের বঞ্চনা করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের সম্পর্কেও অকপট হইতে পারেন না। সাম্প্রদায়িকতা যে আকারেই দেখা দিক না কেন, তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আবেদন জানাইতেছি।...........'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীতকে স্থানদান করিলে তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের কি লাভ হইতে পারিবে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার একজন মুসলমান ছাত্রেরও এরূপ উদ্দেশ্য নাই। তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহাদিগকে নিখিলবঙ্গ ছাত্রসংঘে যোগদান করিয়া ইহার সমীপে তাঁহাদের সাধারণ

অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাদের কাছে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন রাজনীতির এবং অর্থনীতির বাস্তব সমস্যা-সমূহের কথা চিন্তা করেন।"

স্পেনের গৃহযুদ্ধে বর্ব্বরোচিত নৃশংসতা

যুদ্ধে কোথায়ও যে কোমল ও উচ্চ হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা হয় না, নরহত্যা নির্যাতন এবং মনুষ্যত্ব বিরোধী সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যই যে যুদ্ধের একমাত্র বিশেষত্ব এবং গৃহযুদ্ধেই যে নিষ্ঠুরতা সাধারণতঃ চরমে পৌছিয়া থাকে সে সব কথা সত্য। কিন্তু, স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহীরা যে বর্ব্বরোচিত নৃশংসতার পরিচয় দিতেছে ইওরোপের ইতিহাসে তাহা উপমাবিহীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রোগী, আহত বা বন্দী কাহারও প্রতি ইহারা কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছে না। নিরস্ত্র, অসহায় পলায়নপর জনতাকে জলস্থল আকাশ হইতে সর্ব্বপ্রকার মারণাস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিবার কথা, মরণাহতদের পলায়ন চেষ্টায় রাস্তা রক্তপ্লাবিত হওয়ার কথা, ক্রীড়ারত শিশুদের হত্যার কথা সত্যই মনে নৈরাশ্য ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। ফ্যাসিস্টদের হস্তে পতিত হইতে দেওয়ার চেয়ে, আহত পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানদের শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করাও শ্রেয় মনে করিতেছে।

স্পেনীয় যুদ্ধের একদিকে এই ফ্যাসিস্ট বর্ব্বরতা যেমন তুলনাহীন, অন্যদিকে স্পেনের জনসাধারণের মৃত্যুপণ দৃঢ়তা, স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সামরিক এক নায়কত্বের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য নরনারী নির্ব্বিশেষে নিঃশেষ আত্মদান ও অপরিসীম বীরত্বও তেমনই অতুলনীয়।

শ্রীসুশীলকুমার [illegible]

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবনের রাজপথের ঠিক উপরেই প্যারীর 'কাফে'গুলি। কাফেতে বসে বসেই প্যারীর সমস্ত জীবনটার একটা বেশ সম্পূর্ণপ্রায় ও সংলগ্ন আভাস পাওয়া যাবে। কবি, শিল্পী, ছাত্র, আমোদপ্রার্থী, বিরামসন্ধানী, সাধারণ লোক সবাই এখানে আসবে, পানপাত্রের উপর দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন আলাপ, আলোচনা, পরিচয়ও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে এসে নিজের নির্দ্দোষ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে চলে যাওয়াও সহজ। পাত্রটা শূন্য হয়ে গেলেই 'বিল' এসে হাজির হবে না অর্থাৎ উঠে যাবার তাগিদ নেই। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের সমাপ্তি বা উৎসবচঞ্চল রাত্রির আরম্ভ যদি এখান থেকেই করা যায় 'আ লা মোদ' অর্থাৎ কায়দামাফিক হবে না এমন ভয় নেই; বরং বিদেশীর কল্পনায় সেটাই আমোদের। 'কাফে' হচ্ছে ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ না থাকলে ফরাসী জীবনের উৎস এত স্বতঃস্ফুরিত হওয়া বোধ হয় সহজ হত না।

এখানে বসে বসে জীবনের শোভাযাত্রা দেখা যাক। একটী আমেরিকান ধনী এসে বসেছে, তার চোখে এই হচ্ছে পৃথিবীর কামরূপ; একটী জাপানী ছাত্রকে দেখা যাচ্ছে, সে এসেছে গণিতবিদ্যার কাশীতে; একটী পেরুর যুবকের সঙ্গে আলাপ হল, তার কাছে এই হচ্ছে চিত্রবিদ্যার রৌপ্য আকর। এখন বাকী লোকদের চিনিনা; কিন্তু একটী পাগড়ী দেখে ইয়োরোপের 'ফ্ল্যাপার'রা যা মনে করে আজকাল আমারও সে সন্দেহ হচ্ছে—অর্থাৎ, মহারাজা। (ভাগ্যে বাঙ্গালীর শিরোভূষণ নেই!) এ জগতের গৃহদেবতা হিসাবে রাখা উচিত ভিঞ্চির চিত্র—ব্যাকাস।

কি বৈচিত্র্যময় সে শোভাযাত্রা! কত দেশের, কত বয়সের কত উদ্দেশ্যময় নরনারী, বিভিন্ন বেশে, ভূষায় ভঙ্গীতে আসছে যাচ্ছে। কারো মুখে সবিস্ময় আগ্রহ, কারো সকরুণ অতৃপ্তি; কেহ বা এসে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে; কেহ এমন আনন্দক্লান্ত (blasé) যে কিছুই লক্ষ্য করছে না। কিন্তু কাকে 'লোরলাই'-এর মত মোহিনী; তার আহ্বানে সাড়া দিতে

ব্যাকাশ—লুভর্

হবে সবাইকে। কোন কাফেতে যাও নি? তবে প্যারিতেই সম্ভবত যাও নি। একথার উত্তর নেই।

ইংরেজের ঐতিহাসিক হোমের অভাব লণ্ডনে বড় অনুভব করতে হয় তবু ইংরেজকে ও ইংরেজত্বকে এত

পথে ঘাটে প্রকট দেখি যে 'হোম' যে কোথাও আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্যারির বিলাসকেন্দ্রে প্যারীর আসল অধিবাসীকে আত্মপ্রকাশ করে থাকতে বড় একটা দেখিনা। যাকে দেখা যায় সেই বিদেশী; বুঝি বিদেশীই এখানে অধিবাসী। আর সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে? প্যারি হচ্ছে বিশ্বের মোহিনী। যত বিলাসী, ধনী, শিল্পী, স্বপ্নদ্রষ্টা প্যারি সবাইকে অহরহ ডাকছে, আশ্রয়ও দিচ্ছে। যে ক্রোড়পতি অর্থ উপার্জ্জনের জ্বর থেকে

'Bohemienne'

শান্তি পাবার জন্ম এখানে এসেছে ও যে রাজনীতিক নেতার মস্তকের উপর মূল্য নির্দ্ধারিত করা আছে তারা দুজনেই সমানভাবে এখানে আশ্রয় পাচ্ছেন। যে রাজা হৃতসিংহাসনের শোক ভুলতে ও যে 'demi monde' তার উপযুক্ত লীলা নিকেতন পেতে চায় তাদের উভয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে এখানে। সবাই এখানে আসতে পারে, এমন কি যে গত-যৌবনার শঙ্করাচার্য্য-বর্ণিত অবস্থা হয়ে এসেছে এবং লুভরের ক্রানস হালসের চিত্রটীর প্রতিলিপি মুখে বহন করছে সেও এখানে এসেছে। আর এসেছে সাধারণ বিদেশীরা যারা এই বিচিত্র পারাবত-কুলায়ের বহুবিধ কূজন আলাপন অন্তত বাহির থেকেও হোক না দীনভাবে শুনে যেতে চায়।

এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে প্যারিতে ফরাসী নেই। যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু অংশ বিশ্বের বিনোদনে ব্যাপৃত। ফরাসীর নিজের শিল্পধারা ও বিদেশীকে পরিতৃপ্ত করবার প্রণালীদুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদেশী হচ্ছে সুখের পায়রা, আসে বিলাস ও তৃপ্তির জন্য; তাকে ফরাসী যা দেয় তা পণ্য হিসাবে, প্রীতির সহিত নয়। সে Folies এ সাজিয়েছে বিপনী, আপনি কিন্তু তাতে মজেনি। নিজের জন্য আছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'অপেরা' থিয়েটার প্রভৃতি। ইংরেজ ব্যবসাদার হয়েছে রক্তের টানে; ফরাসী রুচির বৈশিষ্ট্যে।

এটুকুই ফরাসীর বিশেষত্ব। সে নিজে 'শকুড্' হয় না কিছুতে। তার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্য যে শিক্ষা আবহমান কাল থেকে দিয়ে আসছে তা বাহিরের কাছে রোমাঞ্চকর, কিন্তু রুচিসঙ্গত নয়। কিন্তু নিজে ফ্রান্স তার জন্য অসুবিধায় পড়েনি। তার শিল্পরস মাত্র দেহবিশ্লেষ নয়, দেহবিকাশ। যা দেখে ভারতবর্ষীয় সনাতন মানদণ্ড সঙ্কোচে কুঞ্চিত হয়ে যাবে, তার মধ্যে ফরাসী খুঁজবে আনন্দ-সৃষ্টি, কিন্তু একটুও আত্মবঞ্চনা নেই তাতে। শিল্প ও শ্লীলতাকে বিশ্লেষণ করে এমন করেনি যাতে সুন্দরও অশ্লীল হয়। সুন্দরকে সত্য বলে স্বীকার করে শিল্প-কৌশলে হৃদয়াবেগে সুষ্ঠু রচনায় ফরাসী শিব বানিয়েছে। আমরা তাকে দেখি শুধু প্রস্তরবিশেষ। জোলা, ব্যালজাক, পল বুর্জে প্রভৃতির দেশে, কাসিলো দ্য প্যারি প্রভৃতির দেশে, আশ্চর্য্যের বিষয় বিদেশীরা খবর নিয়ে দেখে না যে সম্ভোগ স্বাধীনতা স্বত্বেও ফরাসী গৃহজীবন শুধু যে সংযত তা নয়, তা সংরক্ষণশীল।

আসল কথা ফরাসী বৈঠকখানা সাজাতে জানে। ইয়োরোপে অল্পবিস্তর সবদেশেই সাধারণ লোকেরও কিছু রুচিজ্ঞান থাকে, সৌন্দর্য্য বোধ থাকে। লণ্ডনে ত সন্ধ্যাবেলা গৃহাভিমুখিনী ফুল না নিয়ে গৃহে ফেরে না। কিন্তু সে হচ্ছে তার নিজের ঘরের সজ্জা। ফরাসী সাজাবে বাড়িটী,

লোককে ডাকবার জন্য। কোথায় কোন্ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বা রোমান অধিকারের যুগে একটা দুর্গ ছিল; তার ধ্বংসাবশেষকে ইংলণ্ডের মত ধ্বংসের সাক্ষী করে সাজিয়ে রাখবে না; তাকে পুনর্নির্ম্মাণ করবে সেই প্রাচীন যুগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে। তার পাশের প্রাকার ও পরিমাণ পর্য্যন্ত প্রাচীনতার সৌরভ ছড়াবে, তা না হলে ইতিহাসপ্রিয় ছাড়া অন্য বিদেশী না-ও আসতে পারে। বিলাসীকে আকর্ষণ করবার জন্য ক্ষুদ্র নগরটীতে 'কার্নেশন' ফুলের মেলা লাগিয়ে দিবে; ধার্ম্মিকের জন্য কোন মধুর স্মরণের সপ্তাহ। গিরিদুর্গশোভিত, পুষ্পভূষিত দক্ষিণ এ ত রাজপথ নয়, এ যে রাজোদ্যান। স্পেনের সহরে সহরে একটা পথ আছে যার সার্থকতা বৈকালিক ভ্রমণে; এই 'রামব্লা' গুলিতে বিচরণের মধ্যে একটা সম্ভ্রমময় আনন্দঘন সামাজিকতা আছে। প্যারির রাজপথ গুলির পিছনে সামাজিকতার বালাই নেই আছে স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য। আর কি এদের প্রসার! চৌরঙ্গী ত তুলনায় সুড়ঙ্গ মাত্র।

কিন্তু এক হিসাবে এই পথগুলিতে ফরাসীকে মানায় না। এদের একটা জাতিগত ধারণা আছে যে ফ্রান্স হচ্ছে জগতের কেন্দ্রস্থল। মনোরথের এই বিকার রাজপথের প্রসারের সঙ্গে খাপ খায় না। ফরাসী বিদেশের ভাষা বা ইতিবৃত্ত
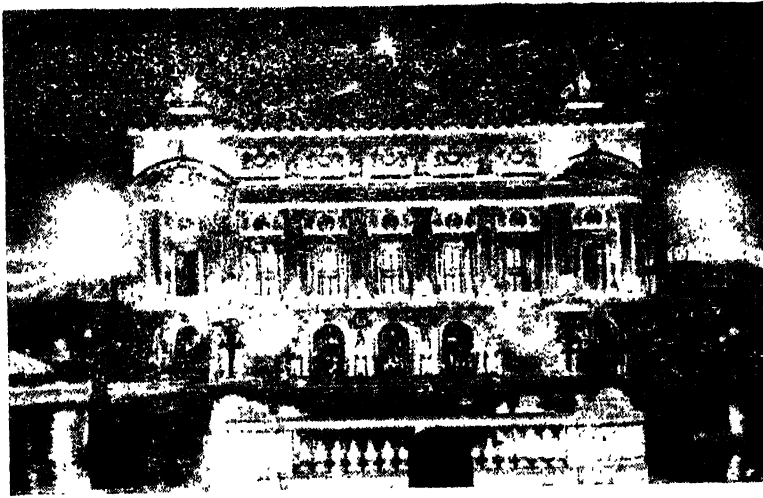
অপেরা—রাত্রের দৃশ্য

ফ্রান্সের একটা সহর কার্কাসণে দেখলাম ঠিক এমনি একটা ব্যাপার। এফেল টাওয়ারকে রাত্রে বিদ্যুতের মালাতে সাজান হয় ঠিক এমনি রুচির প্ররোচনায়। নতুবা মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপন আরো অনেক উপায়ে হতে পারত। প্যারির বিশাল সুরম্য রাজপথগুলি সৃষ্টির মূলেও অনেকটা এই ইচ্ছা।

যাক্ সে কথা। যে জন্যই তৈরী হোক 'শাঁজে লিসীর' অদ্ভুত কৃতার্থ। এই রাজপথটী না থাকলে অনেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ, সুখময়, বিলাসবিহারটী অসম্পূর্ণ থেকে যেত। শিখতে বিশেষ উৎসুক হয় না। তার ফলে যে ফরাসী জানেনা তার অন্য কোন ইয়োরোপীয় দেশে গেলে তত অসুবিধা হয় না যত হয় ফ্রান্সে। কন্টিনেণ্টে ধীরে ধীরে ইংরেজীর প্রচার যে ফরাসীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা ফরাসী এখনো বুঝতে পারেনা। ফরাসী নাগরিক বুদ্ধিমান, কিন্তু সে নিজের বাহিরে বিশেষ কিছু বুঝতে ব্যাকুল নয়। তার জীবনের ভারকেন্দ্র, ধ্যানের কিছু হচ্ছে প্যারি। এমন কি বিদেশী টুরিষ্টে চঞ্চল অথচ বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য আবহাওয়ায় বিচিত্র প্যারিও নয়, কেবল প্যারির হালফ্যাশন,

আদবকায়দা। তার ফলে সারা ইয়োরোপে বিশেষতঃ নারীরাজ্যে যখন হলিউডের ছাপ পড়ছে, হলিউডের হাবভাব, বিলাসভঙ্গী সকলে অনুকরণ করছে তখনো তার লক্ষ্য একমাত্র প্যারি।

এ অবশ্য ভালই। জগতে ছায়াচিত্রের কল্যাণে পোষাকী জীবনে বিশিষ্টতা অবশিষ্ট থাকছে না। একটী স্থানে তা সৃষ্ট হয়ে আত্মঘোষণা করুক, পৃথিবী তাতে সমৃদ্ধতরই হবে।

Fetishism যাকে বলে তা ফরাসী মনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মনের দিক দিয়ে তার ফল বিপুল কিন্তু বৈচিত্র্যবিহীন। এর দ্বারা একটা রাজতন্ত্র চালান যায়; একটা সেনাসংঘও চলে চমৎকার; কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়, উপযুক্ত ত নয়ই। ফরাসী রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন। তা না হলে রাজনৈতিক তরণী অনির্দ্দিষ্টকাল কাণ্ডারীবিহনে চলে কি করে? ফ্রান্সের রাষ্ট্রটি আছে শুধু সিভিল সার্ভিসের কল্যাণে। প্রধান মন্ত্রীরা যায় আর আসে; কিন্তু টেনিসনের ঝরণাটার মত সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মস্রোত অক্ষুণ্ণভাবে উৎসারিত হয়ে যাচ্ছে। তবু রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রনীতির কর্ণধার নেই। ফ্রান্সে হিটলার না হোক একজন রুজভেল্টও নেই। এদেশে সবদিকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। ফ্রান্সে অভা[ব] ব্যক্তির।

কেহ কেহ ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ গণ[না] করেন ফরাসী বিদ্রোহ থেকে। এ সম্বন্ধে বলা বাহুল্য না[না] মুনির নানা মত হতে বাধ্য। সম্ভবত কোন ভবিষ্য[ৎ] ঐতিহাসিক গত রুষবিপ্লব থেকেই বর্ত্তমান কাল গণ[না] করবেন। তা হলে আমাদের সমবয়সীদের জন্ম হয়ে[ছে] মধ্যযুগে এবং মৃত্যু হবে বর্ত্তমানের শুভ আহ্বানের প[র]। কিন্তু বর্ত্তমান কাল যে চিরকালই এগিয়ে এগিয়ে নূতন নূ[তন] বর্ত্তমানে রূপান্তরিত হবে সে সম্বন্ধে তর্ক না করলেও চি[র] ও রাজনীতির জগতে ফরাসী বিদ্রোহের দান অসামান্য। সে বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চ ছিল এই প্যারি। এখনো সাহিত্য ও ইতিহাসের পাতায় পরিচিত পথে পথে ঘুরবার সময় কোন কল্পনাভারাক্রান্ত অন্ধকার রাত্রে 'ত্যুলেরি' বা ব্যাস্তি[লের] ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানবাত্মার বিপুল নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি [যেন] শুনতে পাওয়া যাবে। কী বিরাট সে প্লাবন যার স্রোতে পরাক্রান্ত বুর্বনের (Bowrbon) সিংহাসন ভেসে গেল; রূপসী রাণী মারী আঁতোয়ানেৎের সুচারু কেশরাশি এক রাত্রিতে শ্বেত হয়ে গেল। মানবের জাগরণের রঙ্গমঞ্চ [এই] প্যারি। তার সঙ্গে সঙ্গে কত রক্তস্রোত ও যুদ্ধবিগ্রহ গেল

কার্কাসণ

এর উপর দিয়ে; প্যারির চোখে কতদিন নিদ্রা নেই; গৃহ-দ্বারে শত্রু দুবার হানা দিয়েছে। তবু প্যারী চিরকুচিরা। অন্তর তার শিল্পরসাপ্লুত। ফ্রান্সকে হারিয়ে বিসমার্ক হরণ করলেন অর্থ ও দেশ; যার জের গত মহাযুদ্ধেও কাটল না। কিন্তু ইটালিকে পরাজিত করে নেপোলিয়ঁ আনলেন মূল্যবান শিল্পসম্পদ যার জন্য ইটালী নিশ্চয়ই ক্ষমতা থাকলেও তখন আর যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না। দস্যুতা যদি করতে হয় এমন রত্নই হরণ করতে হয় যা গলার হার হয়ে, কণ্ঠের কণ্টক হয়ে নয়, বিরাজ করবে। কর্সিকায় জন্মগ্রহণ করলেও নেপোলিয়ঁর হৃদয় ছিল ফরাসী; ফরাসীরা তাঁকে হৃদয়েই

শেষ বিদ্যাটুকুর জন্ত আসতেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানের আলো যে যুগে ছিল অস্ফুট ও প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ, ধর্ম্ম যে যুগে বিদ্যাকে ক্ষুণ্ণ ও আচ্ছন্ন করতে দ্বিধা করত না তখনো এখানে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হতে বিদ্যার জন্ত জনসমাগম হয়েছে। প্যারীর বিশ্ববিদ্যালয় ইয়োরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

অনেক দূরে হলেও ভার্সাইকে প্যারি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজসমারোহ ও বিলাসের দিক দিয়ে ভার্সাই ছিল প্যারির সম্পূরক। এখানকার বিরাট প্রাসাদের চারদিকে দিগ্বলয় যে শ্যাম অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে
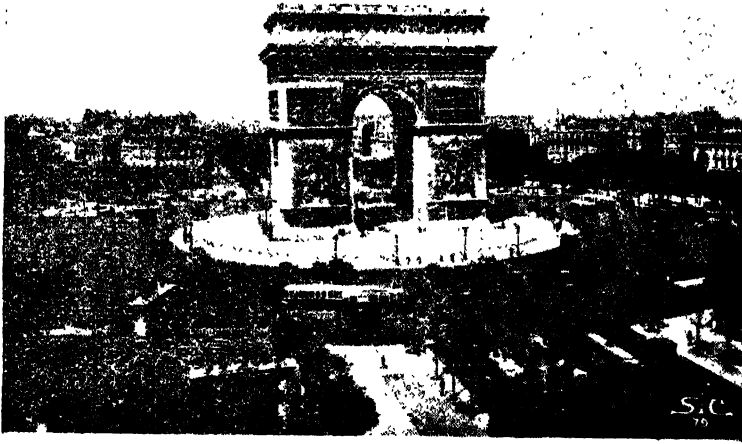
রাজপথ-কেন্দ্রে বিজয়তোরণ

রেখেছে। লুভ্র্ তিনি তৈরী করেননি; কিন্তু একে শিল্পের স্বপ্নকানন করে গেছেন তিনিই।

লুভ্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোটখাট অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত চিত্রশালা বা বিদ্যাপীঠেরও অভাব নেই এখানে। লুক্শাঁবুর্গে যে বিদেশী যায় না, সে ঠকে বলতে হবে। এমনি আরো কত আছে। ত্রকাদেরোর উপর অনেকের নজর প্রথম পড়ে যখন রাত্রের আলোয় তা বিকশিত হয়। আমাদের দেশে Sorbonne এর নাম অনেকে জানেন না, অথচ ইয়োরোপের কত মনিষী এখানে

আচ্ছন্ন তার মধ্যে যে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে। এত রূপ ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও ষড়যন্ত্র, বিলাস ও বিফলতা বুঝি ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। কত সুন্দরীর নৃত্যচটুল চরণাঘাতে এ প্রাসাদের মর্ম্মর এই মাত্র বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছিল; কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যেতে বাতাসে কলহাস্যের আভাস এমনি ভেসে আসতে পারে; লালসার অতৃপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুঝি এই ক্ষুধার্ত্ত পাষাণে লেলিহান শিখা বিস্তার করে স্পর্শ রেখে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে শাহজাহানের দিল্লির কথা মনে পড়ে। রাজরোষ ও

রাজপ্রসাদ ছিল দিবসের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় সংবাদ। বংশ-সম্ভ্রম বা পরাক্রম তার তুলনায় নগণ্য ছিল। সমারোহ ও রাজসম্মান ছিল জীবনে ধ্রুবতারা। সমরকুশলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রিয়তা বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশগুলির ভিতরে ঘুণ ধরে জাতীয় জীবন যাচ্ছিল অধঃপাতে। তাই বিলাসে, শিল্পকলাতে, সমারোহের উজ্জ্বলতায় যে গরিমার প্রকাশ ছিল তা অন্তরাগ মাত্র। ভার্সাই তারই দীপ্তি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাষ্ট্র বলতে বুঝাত রজা। এবং চতুর্দ্দশ লুই ছিলেন "বুর্বন" ফ্রান্সের শাহ্‌জাহান।

শতগুণ বেশী অনুভব হল মনে, সহস্রগুণ পরিচয় হল স্বপ্নে। ফরাসী যাকে বলে Flarer সেই লীলা বুঝি প্যারির বাতাসে ভেসে আসে; ক্ষণিকের অতিথিকেও তার চঞ্চলতা সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়।

লুভ্‌র্ থেকে একবার মোনা লিসার ছবিটী চুরি গিয়েছিল। ফরাসী জাতির এতবড় সর্ব্বনাশ আর কিছুতে হয়নি এমন ধরণের তাতে তোলপাড় হয়েছিল। পরে সেটীকে পাওয়া গেল, কিন্তু ছবির অধরোষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোরের অদ্ভুত মনোবৃত্তির কথা বাদ দিয়েও বুঝতে পারা যাবে এ অত্যাচারটা শিল্পীর চিত্র-

ত্রকাদেরো

সার্থকতার প্রতি কতবড় সম্মান। এই গল্প লুভ্‌রের একজন চিত্রকর যশঃপ্রার্থীর মুখ থেকে শ্রদ্ধার বাণীর মত শুনাল। মনোবিকারের ভিতর দিয়েও চোরের শিল্পরসিকতা লোপ পায়নি। এ চোর নিশ্চয়ই ফরাসী। ফরাসীর অন্তরের বাহিরটা বড় মুক্ত, বড় উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে আন্তরিক বন্ধু হতে পারে না সহজে কিন্তু বন্ধুত্বের উত্তাপ তার মধ্যে আছে। এই চিত্রকর গিয়োকোন্দার যে প্রতিকৃতি আঁকছিলেন তার জন্য বিদেশীর একটী সামান্য কবিতাও গ্রহণ করলেন।

কখন হাসিয়া গেছ একবিন্দু আনন্দের হাসি
ভুবনে অতুল,
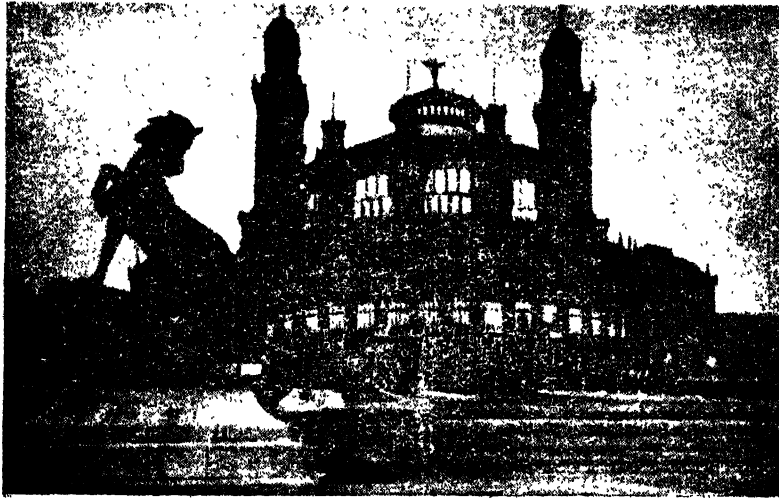
প্যারিকে চিনে রাখা খুব সহজ। ভিক্তর হ্যুগোর পাতায় পাতায় তার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে তা কি ভুলবার? বা তাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে? 'নোতর্ দাম'কে কে না চিনতে পারবে ও তার ঘণ্টানির্ঘোষ একবার শুনলে দূরান্তরে সে ধ্বনি কার কানে না প্রতিধ্বনিত হবে সময়ে সময়ে। যে সীন নদী সর্পিল গতিতে নগরীকে বেষ্টন করে রেখেছে, যে প্রশান্ত উদ্যান ও প্রশস্ত রাজপথ তার সম্পদ তাদের কোন বিদেশী ভুলে যাবে? এমন কি যার পরিচয় মাত্র এক রাত্রির চিন্তাহীন উৎসবের ভিতর দিয়ে সেও একে চিরদিন স্মরণে রাখবে। চোখে যা দেখা হল তার চেয়ে

আজিও পড়িছে তাহা কতরূপে কত নবভাবে
কবি শিল্পীকুল,
কখন মুছিয়া যায় আমাদের সুখশান্তিভরা
ছুদিনের হাসি,
তোমার হাসিরে ঘিরে আজিও এ তৃপ্তিহীন ধরা
উঠিছে উচ্ছ্বাসি।
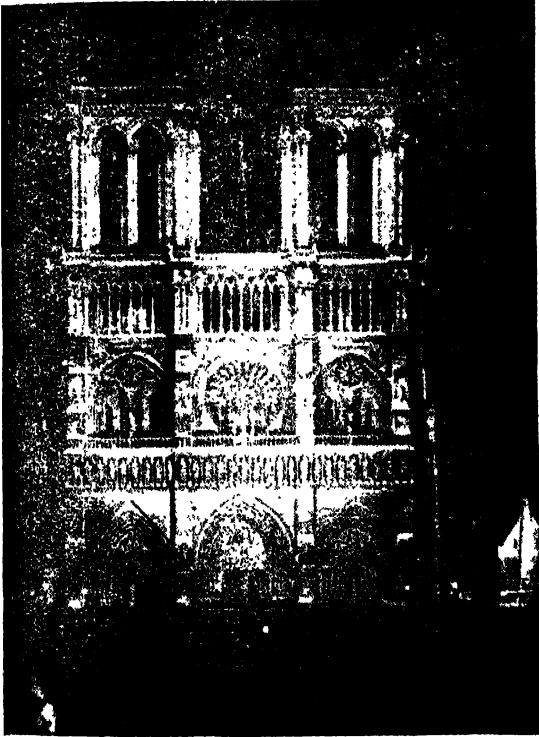
নোত্র্ দাম

স্নান চন্দ্রালোক ও কুয়াশায় মাখা রাত্রের প্যারির, অবকাশ। মৃত্যু আলোকে একটা রহস্যময় হাসির কথা মনে পড়ছে। সে হাসি একটা চিত্রে আবদ্ধ না হোক সমস্ত নগরীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। একি আনন্দ না বিষাদ? এ ত শুধু প্যারি নয়, এ যে অপ্সরী। "তুমি কারে কর না প্রার্থনা"—স্বর্গের অপ্সরারই মত। তোমার তীর্থে কত বিভিন্ন রসাস্বাদনের জন্য মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লোক আসছে আবহমান কাল থেকে—কিন্তু তাদের কারো পরিচয় বা হিসাব তুমি রাখ না। অনিত্য জীবনের পাত্রে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিত্যকাল যে সুন্দরী সুধা ঢেলে চলেছে তার কারো দিকে তাকাবার সময় কোথায়? তাই প্যারিতে শুধু অগণন পথিক আসে আর যায়; কিন্তু প্যারি কারো সন্ধান রাখেনা। ঐ তীর্থে কখনো লোকাভাব হবে না।

মোনা লিসা

"তোমার নয়ন জ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

সুনন্দা

শ্রীকালীপ্রসাদ বিশ্বাস, এম-এ

সহরের হাওয়ায় যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসে। ইহার কুৎসিত কোলাহল মাথার প্রতি স্নায়ুতে আসিয়া লাগে, এ কলরবে না আছে প্রাণের চিহ্ন, না আছে অনুভবের বেদনা। যেন এক বৃহৎ যন্ত্র অহর্নিশি চলিতেছে, মানুষের এখানে কিইবা দরকার।...তাই ভাবিতেছিলাম যে এই অসহ্য প্রাণহীন কোলাহল ছাড়িয়া যাইব। জীবনের বহুমূল্য বৎসরগুলি ইহার ভিতর বৃথা অপচয় করিয়াছি, প্রতিদিবসের ব্যস্ততার মধ্যে আপনাকে কবে যে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিয়াছি তাহা আজ ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। তাই ভাবিয়াছি যে শেষদিনগুলি আর এমন নিরর্থক নষ্ট করিব না, এইবার নিজেকে খুঁজিয়া ফিরিব। প্রভাত-জীবনের যে কঙ্কাবতী জনারণ্যের কোলাহলে মরিয়া গেছে তাহারি জন্য আজ জীবনের অপরাহ্ণে ঘুরিয়া ফিরিব।

কঙ্কাবতী যে চিরদিনের জন্য মরিয়া গেছে এ কথাটা ট্রেনের কামরায় বসিয়া বারংবার মনে হইতেছিল। কঙ্কাবতী সত্যই হারাইয়া গেছে, জনারণ্যের মধ্যে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইব না। আকাশে ছায়া নামিয়াছে এবং এই যে ছায়ান্ধকার পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া ঘুরিয়া চলিতেছি তাহাতে শুধু ইহাই মনে হইতেছিল যে আমরা মাদ্‌মোয়াসেল মোপাঁর মত অনন্ত কাল ধরিয়া অপরিচিতের উদ্দেশ্যে চলিলাম,. কিন্তু যে ছিল এত জানা, যার সাথে পরিচয় ছিল সুনিবিড় সে আমাদের সবার অলক্ষ্যে চলিয়া গেছে, আমরা জানিতেও পারি নাই।

অন্ধকারের ভিতর নিঃশব্দ রাত্রিতে যে হাওয়া মাঠের উপর দিয়া ফিরিতেছে, খোলা জানালা দিয়া সে আমার শ্রান্ত কপালখানি ছুঁইয়া গেল, হঠাৎ যেন আমার মনের উপর হইতে চল্লিশ বৎসরের নিষ্ঠুর স্বার্থপর ব্যস্ততা, অতিসংসারী বিচক্ষণতা কোথায় মিলাইয়া গেল, যেন বহু বৎসর পূর্ব্বের সেই আদিম সুকুমারতা ফিরিয়া পাইলাম।

সুনন্দাকে যেন এই মুহূর্ত্তে বড় বেশী করিয়া মনে পড়িয়া গেল। কঙ্কাবতী মরিয়া গেছে এমন মিথ্যা কি করিয়া ভাবিলাম ? বিস্মৃতির অন্ধকক্ষে সে উদাস হইয়া ফিরিতেছিল, এইত' তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। যে কঙ্কাবতী মরিয়া গিয়াছিল সেইত' সুনন্দা হইয়া ফিরিয়া গেছে, ধরিতে পারি নাই।

কিন্তু সে কথা যাক। এই যে একটি দিন যাহাকে এইক্ষণে মনে হইতেছে যেন হাতের ভিতর পাইয়াছি সেই দিনটি চোখের সামনে অতি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। বেশ মনে পড়িতেছে সেদিন আকাশে মেঘ ঘন হইয়া আসিয়াছিল, হাওয়া চারিদিকে সোঁ সোঁ করিয়া বহিতেছিল, এবং সমগ্র অশ্রুভারাক্রান্ত গগনমণ্ডল আমার মনের সাথে একটি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। এমন দিনে হয়ত' বসিয়া 'মেঘদূত' অথবা 'লেডি-অব-শ্যালট' পড়িতাম, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া সেই শ্যালটদ্বীপবাসিনী অভাগিনী রমণীর কথা ভাবিতাম, এবং যে নারী একদা তাহার দয়িতের উদ্দেশ্যে সমস্ত সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল অথচ প্রাণের বিনিময়েও তাহাকে পাইল না—তাহার কথা ভাবিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতাম। কিন্তু সেদিন আর তাহা হইতে পারিল কই ? আমাকে যক্ষবনিতার অলকা ছাড়িয়া অপর পথে বাহির হইতে হইল এবং সুনন্দাও কি সেদিন সমস্তক্ষণের মধ্যে সেই কল্পলোককে ভাবিতে পাইয়াছিলে ?

সে রাত্রিতে যখন ট্রেন নিস্তব্ধ পৃথিবীর উপর দিয়া চলিতেছিল তখন বারংবার সুনন্দার মুখখানি চোখের সামনে পড়িয়াছে। যাওয়ার আগে সে একটি কথাও কহে নাই, এবং এই যে বিদায় লইয়াছি সে মুহূর্ত্তেও তার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল না। কিন্তু ইহা ত' বেশ জানিতাম যে আমার পশ্চাতে একজোড়া উৎসুক চোখ অনিমেষ তাকাইয়া আছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গাড়ীর চলার শব্দ মিলাইয়া গেল ততক্ষণ সে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় নাই।

সুনন্দার কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ যেন মনে হইল সে আমার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দুইটি কাতর চোখ মেলিয়া

আমাকে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু আমি যেন ফিরিতে পাইতেছিলাম না, কেবল তাহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুধু ট্রেনখানি দ্রুত ছুটিয়াছে এবং নিঃশব্দ রাত্রিতে দুইটি ম্লান তারা করুণ নেত্রে চাহিয়া আছে।...

পথে সুনন্দার স্মৃতিই আমাকে বার বার পীড়িত করিয়াছে। কতবার মনে হইয়াছে যে ফিরিয়া যাই, ফিরিয়া যাই। সুখ-মধুর যে দিনগুলি পিছনে পড়িয়া রহিল তাহারা মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসে, দু'হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিতে চায়।...মনে পড়ে দার্জ্জিলিঙএ তাহার সহিত প্রথম পরিচয়। সেইখানেই ত' সুনন্দাকে পাইয়াছিলাম। ওভার-কোট গায়ে চড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং প্রত্যুষে জনবিরল পথে তাহার দেখা মিলিয়াছিল। কেমন করিয়া যে দুজনে আলাপ জমিল তাহা ভালো মনে পড়ে না। হয়ত ফগের কথা কহিয়াছিলাম, কিম্বা দীর্ঘ.রথ পাইন গাছের দিকে তাকাইয়া ছিলাম, অথবা ইউরিপিডিস এর 'ইফিগেনাইয়া"র বন্দীনিরা সমুদ্রের দিকে চাহিয়া যে নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে সঙ্গীতরূপ দিয়াছে, হয়ত তাহাই আবৃত্তি করিতেছিলাম। আমাদের প্রথম দিনের অল্প পরিচয় কত বিচিত্ররূপে গাঢ়তর হইয়াছে। এবং সেই অল্পভাষিণী সুনন্দা শেলি-কীটসের কথা কহিতে গিয়া কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। কতদিন কার্টরোড দিয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িয়াছি এবং কথা কহিতে কহিতে কেমন করিয়া যে সমস্ত রাস্তা শেষ হইয়া যাইত তাহা মনেও পড়ে না। অতি খারাপ ওয়েদারেও আমরা ঘরের বাহির হইয়া পড়িতাম এবং হাওয়া ও বাদলে জীবনকে পরমানন্দে উপভোগ করিয়াছি। কোনোদিন হয়ত' দুপুরে যখন চারিদিক নিঃশব্দ নিঝুম হইয়া থাকিত তখন যাইয়া দেখিয়াছি সুনন্দা তাহার শেলী খুলিয়া বসিয়াছে এবং মুক্ত প্রমিথিয়ুসের স্বপ্ন পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত ও কণ্ঠ উদ্দীপনায় ভরিয়া যাইত।...এক রাত্রিতে বাহিরে বাদল নামিয়াছে। আমি ঘরে বসিয়া মনমোহন ঘোষের "Rider of the White Horse" পড়িতেছিলাম।—ঝড়ের রাত্রিতে কবি তাঁহার প্রিয়াকে লইয়া বাহির হইয়াছেন। বন্ধুর পথ পাথরে পাথরে পায়ে আঘাত দেয়। অন্ধকারে ঝড় দুর্ব্বার হইয়াছে। কবি কত করিয়া প্রিয়াকে ধরিয়া রাখেন, তবু সে ঢুলিয়া পড়ে। তখন আসিল সাদা ঘোড়ার সওয়ার। পড়িয়া যাইতেছিলাম কেমন করিয়া সে তাহাকে তুলিয়া লইল,—

"She is sick, tired. Your load,
A few miles of the road,
Give me to weather."
He took as 'twere a corse
Her fainting form perforce.
In the rain rider, horse,
Vanished together.
'Come back, dear love, Come back !—I cried...

...চাহিয়া দেখি সুনন্দা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মৃদু আলোক তাহার মুখে, তাহার গায়ে, তাহার বিপর্যাস্ত কেশপাশে এবং যে শালখানি সে জড়াইয়া আসিয়াছে তাহাতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দুই চোখে জল আসিয়াছে, সাদা ঘোড়ার মৃত্যুর দূত ইহার সুমুখে বিদায় লইয়া গেল।...

কোনোদিন যখন বাহিরে বরফ পড়িত তখন ফায়ার-প্লেসের সামনে বসিয়া দুজনে ডল-এর কবিতা অথবা বার্টনের Anatomy of Melancholy পড়িতাম। সেই যে সপ্তদশ শতাব্দীর—কাব্যের মত মনোরম, গল্পের মত বিচিত্র—আমাদের মন তাহাতে ক্রমঃসঞ্চারিত হইয়া যাইত। আমাদের কল্পনার রাজ্যে কোনো সঙ্কীর্ণ চিত্ত তাহার সীমারেখা টানিয়া দিতে পারে নাই। প্রভাঁস (Provence) এর ত্রুবাদুরের সহজিয়া সুর হইতে অতি আধুনিক কবি, রুদকি ও হাফিজ ও ওমর খৈয়াম, কালিদাস ও ভবভূতি আমাদের সমান মুগ্ধ করিত। সেই যে রাজকন্যা নদীর তীরে তীরে কাঁদিয়া ফেরে, অন্ধ রুদকির সুখ-দুঃখের গান, রামগিরি পর্ব্বতের বিরহী যক্ষের দীর্ঘশ্বাস—তাহা কেমন করিয়া ভুলিলাম, সুনন্দা ?...

সমুদ্রপারে যেদিন নামিয়াছি সেইদিনই মহানগরী আমাকে গ্রাস করিল এবং সেই নিষ্ঠুরার নাগপাশ হইতে আর মুক্তি পাইলাম না। কাজ, কাজ, সারাদিন কাজ—ইহার দুর্ব্বার বেগের সাথে ছুটিয়া চলি। ইহার বিরামহীন কোলাহলের মধ্যে কল্পনা কোথায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ধূলা হইয়া গেল সে খবর রাখিবার অবসর কোথায় ছিল। অবশেষে একদিন সুনন্দা যে কোথায় হারাইয়া গেল তাহা মনেও নাই। সময় বিষাক্ত তীরের মত তীব্র, সে কাহারো জন্য একটি বেদনার নিঃশ্বাসও ফেলেনা। একদা যে হৃদয় সহজ এবং মধুর আনন্দে ভরিয়াছিল, সে আকাশ সঞ্চারী অতি বিচক্ষণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার [illegible] চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই আজ যখন পুনরায় নিজেকে খুঁজিয়া ফিরিতেছি তখন সুনন্দার কথাই সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িয়া গেল।

শ্রীকালীপ্রসাদ বিশ্বাস

হংসদূত—রূপ গোস্বামীকৃত সংস্কৃত 'হংসদূত' কাব্যের সচিত্র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, পৃষ্ঠা—৮+৬০+৮ আকার ডবল ক্রাউন ৮ পেজি, মূল্য ২৲।

বৈষ্ণব সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে প্রেমতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু এঁর 'উজ্জ্বল নীলমণি" প্রভৃতি রচনা! কিন্তু, আজও অধিকাংশ বাঙালী এঁর সকল রচনার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হ'তে পারেন নি!—কারণ, রূপ তাঁর রসধারাকে প্রবাহিত করে গেছেন সংস্কৃত ভাষার নির্ঝর স্রোতে। কাজেই, খাঁটি বাঙলার গীতকবি চণ্ডীদাসের সঙ্গে যেমন বাঙালী সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় অতি সহজেই স্থাপিত হয়েছিল, রূপের সঙ্গে তাঁদের সে অন্তরঙ্গতা ঘটেনি। রূপ ছিলেন কেবলমাত্র বিদগ্ধ সজ্জনের অধিগম্য। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল তাঁর রসের প্রচার সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত' কাব্যখানি আগাগোড়া অমর কবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুকরণে রচিত হওয়ায়, কাব্যামোদী রসিক সমাজকে এ বইখানি তেমন বিস্ময় বিমুগ্ধ করতে পারেনি,—যেমন বৈষ্ণব কবি জয়দেবের "গীত গোবিন্দ" করতে পেরেছিল! কারণ জয়দেব কারুর অনুকরণ করেন নি! যদিও, রসের দিক থেকে 'মেঘদূতে'র পাশে একমাত্র 'হংসদূতে'রই স্থান হতে পারে, তথাপি, মৌলিক রচনার অকৃত্রিম সম্মানর' লাভ করা এর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না! রূপ গোস্বামীর সেই কালিদাসানুসৃত প্রেমকাব্য 'হংসদূত'কে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে হীরেন্দ্রবাবু রসপিপাসু বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

হংসদূতের বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কাতরা শ্রীরাধা ও গোপাঙ্গনাদের বিরহ বিধুরতার বিচিত্র আলেখ্য! কিন্তু শক্তিশালী লেখক রূপের ভক্তিরসাশ্রিত প্রেমমধুর কল্পনা কালিদাসের 'মেঘদূতের' আদর্শ প্রভাবে এই সাধারণ ব্যাপারকেই এক অপূর্ব্ব ভাবরূপের রসরাজ্যে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন! 'হংসদূত' আদ্যোপান্ত সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে রচিত। অনুবাদকার হীরেন্দ্রবাবু সংস্কৃত সংস্কৃতছন্দের অনুকরণ না ক'রে বাংলা কাব্য সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দ সংস্কৃত ভাষারই উপযোগী, বাংলা কাব্যের অন্তঃপুরে তাকে মানায় না! হীরেন্দ্রবাবু অতি সহজ সরল বাংলা ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে এই দুরূহ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ আমাদের উপহার দিয়েছেন। বিবিধ বাংলা ছন্দে তিনি এই বৈষ্ণবকাব্যের বিচিত্র রসমাধুর্য্য ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই দুঃসাধ্য প্রয়াস যথার্থই প্রশংসনীয়। আমরা এখানে তাঁর রচনার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি,—এ থেকে বোঝা যাবে হীরেন্দ্রবাবু তাঁর অনুবাদে কেমন নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম থেকেই সুরু করা যাক। মূল সংস্কৃত কাব্যে আছে:—

দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতালদ্যুতিহরং
জবাপুষ্প-শ্রেণীরুচি-রুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঞ্চিতমুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ॥

হীরেন্দ্রবাবু অনুবাদ করেছেন:—

দলিত হরিতাল দ্যুতি নিন্দিত পীত বসনধারী,
উজ্জ্বল নব রক্তজবা রঞ্জিত রাঙা চরণচারী!
কৌতুকলীলা লাস্য ভরে মঞ্জরে হাসি বিম্বপুটে,
তমালশ্যাম নিত্য সে-রূপ চিত্ত-আকাশে উঠুক ফুটে।

সপ্তবিংশতি শ্লোকে শ্রীরাধা যেখানে ব্যাকুল হ'য়ে হংসদূতকে পথে বিশ্রাম নেবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন—

স্বমাসীনঃ শাখান্তরমিলিতচণ্ডত্বিষি সুখং
দধীথা ভাণ্ডীরে ক্ষণমপি ঘনশ্যামলরুচৌ।
উতো হংসং বিভ্রন্নিখিলনভসশ্চিক্রমিষয়া
স বর্দ্ধিষ্ণুং বিষ্ণুং কলিতদরচক্রং তুলয়িতো॥

হীরেন্দ্রবাবুর অনুবাদ :—

ঘন-শ্যামল ভাণ্ডীরেতে ব'সবে ক্ষণকাল,
নীল শাখে যার সোনালি রোদ নাচে সমুজ্জ্বল;
ছায়া-মেদুর সেই কাননের কোমল পরশে
চিত্ত তোমার উঠবে দুলে বিপুল হরষে।
শ্বেত পতাকা উড়িয়ে যবে চলবে পুনঃ ধেয়ে,
শঙ্খপাণির মূর্ত্তিখানি ফুটবে আকাশ ছেয়ে।

বাহুল্যভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করলেম না। তবে একথা বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে যে হংসদূতের ১০৪টি শ্লোকের সবগুলিরই অনুবাদ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। তা' হয়ও না। কেননা ভাষা থেকে ভাষান্তরিত করবার সময় লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকেনা। তবু, হীরেন্দ্রবাবু হংসদূতের নানাস্থানে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে প্রকাশকদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ডবল-ক্রাউন আকারের মোটা এন্টিক কাগজে ৬'রঙের কালিতে সুন্দর ছাপা, অসংখ্য একবর্ণ ও অনেকগুলো ত্রিবর্ণ চিত্রযুক্ত এই উপহার উপযোগী বৃহৎ পুস্তকখানি তাঁরা মাত্র দুটাকা মূল্যে দিয়ে এই দরিদ্র দেশের সকলকেই এই দুষ্প্রাপ্য মধুর কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এর চারু চিত্রগুলি অঙ্কিত করেছেন। তাঁদের এই প্রয়াস জয়যুক্ত হোক।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

লেনিনের সহিত—ম্যাক্সিম গর্কী হইতে মণিলাল শ্রীমাণী এম-এ, বি-এল দ্বারা অনুদিত। প্রকাশক শ্রীকল্যাণময় শ্রীমানী, ২০ নবীন সরকার লেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন পৃঃ ৯০; মূল্য এক টাকা।

লেনিন বর্ত্তমান যুগের লোক, অদ্ভুত এবং করিৎ-কর্ম্মালোক। দুঃখী দীর্ণ জীবন কী করে সফলতায় উজ্জ্বল হ'তে পারে তার আদর্শ। আধুনিক জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশেই এক এক জন করে Superman মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁরা আপনাদের আন্তরিকতায়, সহৃদয়তায়, কার্য্যনিষ্ঠায় চরিত্রে এবং অধ্যবসায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছেন। তবে সকলেরই চরিত্র মহিমান্বিত হয়েছে আমার মতে আন্তরিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কেননা ভণ্ডামী করে বর্ত্তমান জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশা সুদূর-পরাহত, নিজেকে 'মুক্তধারা'র রাজার ন্যায় আভিজাত্যের 'অস্পৃশ্যপঙ্ক্তি' শ্রেণীভুক্ত করে রাখলে চলবেনা। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

'নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।'
সেই পরম দেবতা আজ সবাই
'রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে'

লেনিনের জীবনে এই ধূলার পরে নেমে আসবার সাধনা দেখি। মধ্য যুগে জন্মালে তিনি হতেন হয়ত পয়গম্বর, অথবা অবতার অথবা ধর্ম্মধ্বজী, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগ তাঁকে করেছে লৌহমানুষ, কার্য্যে, উৎসাহে, গঠনে এবং নিষ্ঠুরতায়।

লেনিনের প্রতিকৃতির ভিতরেও কি একটা অমানুষিক ভাব বর্ত্তমান রয়েছে, প্রস্তরবৎ কাঠিন্য নরকঙ্কালের ভয়াবহতা, শ্মশানচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর চক্ষুর্জ্যোতি এবং বৌদ্ধ শ্রমণের নিশ্চিত নিশ্চলতা। লেনিন মধ্যএশিয়ার সৃষ্টিধ্বংসী চেঙ্গিস এবং হালাকুর উত্তরাধিকারী। এই দুর্দ্দান্ত তাতারায় মহাদানবদল বহু প্রাণ, প্রাণী, এবং সভ্যতার চিহ্ন অবনী হতে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। লেনিনকে দেখেও ভয়,—বিশাল রাশিয়ায় যেন একটী অতিকায় অশ্বত্থামা জারজর্জ্জরিত জীবন হ'তে উৎপত্তি লাভ করে, উৎপীড়িতের অস্থিমাংস, ঐশ্বর্য্য প্রতাপ প্রভৃতি হজম করে নীলবর্ণ হয়েছে! প্রাচীনকালের [illegible] ন্যায় আধুনিক লেনিনের দুর্বিসহ নিষ্ঠুরতা তত ভয়ঙ্কর নয়—
'In its (Mongol Invasion's) suddenness, its devostating destruction, its appalling ferocity, its pass'onless and purposeless cruelty, its irrestible though short-lived violence, this

outburst of savage nomads, hitherto hardly known by name even to their neighbours, resembles rather some brute cataclysm of the blind forces of nature than a phenomenon of human history. The details of massacre, outrage spoliation and destruction wrought by these hateful barbarians who, in the space of a few years, swept the world from Japan to Germany would, as d' Ohsson observes, be incredible were not confirmed from so many different quarters. P 427 (Vide Literary History of Persia Vol II by Professor E. G. Browne London 1920).

আমাদের ভয় হয় লেনিনের প্রভাবে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতা, প্রাচীনকালে মুসলমান সভ্যতার ন্যায় উৎপাত না হয়ে যায়!

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেনিনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে একটা ভূমিকা জুড়ে দিলে ভাল হত। অনুবাদ অত্যন্ত অক্ষম এবং অচল। মুদ্রণ এবং বাঁধাই বটতলার উপযোগী। বাংলা সাহিত্যের এই সুদিনে এই অনুবাদ কলঙ্কস্বরূপ।

জরীন কলম

বৈজ্ঞানিক ভোজ—শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম-এ ডি-লিট প্রণীত। প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য আট আনা।

প্রথম গল্পটির নামে পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত "অচেনা সই" "ভাবী রায় বাহাদুর" ও "ফুলের পরী" আর তিনটি গল্প পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আছে। পুস্তকখানি বিশেষভাবে কিশোর ও কিশোরীর জন্যে রচিত হইলেও, বয়স্কেরাও এই পুস্তক পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন এমন কি শিশুরাও প্রথম গল্পে টেলিফোনে, 'হ্যালো পুরুত মশাই" "কাটলেটের গাড়ীটা গড় গড় করিয়া চলিয়া গেল" চিত্র দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। পুস্তকখানি রস-বৈচিত্রে, বর্ণনার ভঙ্গীতে ও চিত্রসম্পদে সুন্দর ও মনোহারী হইয়াছে।

প্রথম গল্পে বিশালবপু প্রফুল্লমুখ বৃদ্ধ হিমাচলবাবুর আমরা সাক্ষাৎ পাই। বিজ্ঞান চর্চ্চাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজ ও সরল করা যায়, অহর্নিশি তিনি এই চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। কন্যার বিবাহে তিনি ইহার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে উৎসুক হইলেন। ফলে বিবাহের প্রীতি উপহার ফুলের মালা বিতরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ সভা দেখা, পুরোহিতের মন্ত্র শুনা প্রভৃতি সকল ব্যাপার, ছাদের উপর বসিয়া খাইবার ব্যবস্থার আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইল। বৈজ্ঞানিক ভোজে অপচয় নিবারণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। লেখক সুনিপুণ শিল্পির ন্যায়, সাধারণ বুদ্ধি বর্জ্জিত পণ্ডিতদের যে দুর্দ্দশা ঘটে, কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যে যে কিরূপ প্রভেদ তাহা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিমাচলবাবু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে, বরকর্ত্তার 'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বিবাহের ভোজনের ছাদে না করিয়া ল্যাবরটোরিতে করা অধিকতর প্রশস্ত' এই মন্তব্য শুনিয়াও হাল ছাড়িয়া দিলেন না। অপ্রতিভ হইয়াও তিনি বলিলেন "না, না, কি জানেন, একটু ভুলের জন্য এই কাজটা হয়ে গেল।" গল্পটির সকরুণ হাস্যকর পরিসমাপ্তি বিশেষ উপভোগ্য।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম "অচেনা সই।" এই গল্পে চিঠিতে দুই সই কিরূপে পরস্পর পরস্পরের পরিচিত হইল, অবশেষে তাঁহাদের মিলন এক অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে বিকাশলাভ করিল তাহারই চিত্তাকর্ষক মনোজ্ঞ বিবরণ।

তৃতীয় গল্প "ভাবী রায়বাহাদুর" "রায় সাহেব" উপাধি পাইয়া তৃপ্ত না হইয়া "রায়বাহাদুর" খেতাব লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উমেদারী করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া যখন শুনিলেন, "বাবু তুমি একদম্ ইংরেজী বলটে পারো না টুমি রায় বাহাদুর কেমন কোরে হবে" তখন তিনি নিজ পুত্রকে ইংরাজী বিদ্যায় লায়েক করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। কিন্তু নিদারুণ বিধি তাহাতে বাদ সাধিল, ইহার বর্ণনা সকৌতুক রঙ্গরসে সমুজ্জ্বল।

শেষ গল্পটি "ফুলের পরী"। যদিও জাপানী রূপকথার ছায়া অবলম্বনে রচিত তথাপি ইহা অনুকরণ বলিয়াই মনে হয় না। লেখক ঝরঝরে ভাষায় স্বপ্নরাজ্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে কৃত্রিমতার ছাপ কোথাও নাই। ফুলের রূপ রস গন্ধে এই গল্পে ফুল যেন মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পনার অপরূপ ভাবসম্পদে এই গল্পটি শিশু চিত্তকে এক অপার্থিব রাজ্যে লইয়া যাইবে।

আমরা শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত ২ [illegible] প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি। সুতরাং শিশুদের সহিত অভিভাবকরাও যে এই বইখানি পাঠ করিয়া লাভবান হইবেন তাহা জোর করিয়া বলিলাম।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২ই অক্টোবর—চঙ্গু। প্রভাতে যথাসময়ে গাইড-কুলতিলক পিঞ্জু এসে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করলেন ও "চা প্রস্তুত" এই সুসংবাদ দিয়ে গেলেন। কন-কনে শীত। বাহিরের তাপ তখন ৪২° ডিগ্রি। শীতের প্রকোপে কারও মুখপ্রক্ষালনাদির আগ্রহ দেখা গেল না। ড্রেসিং গাউন, ওভারকোট, কম্বল যার যা সম্বল ছিল গায়ে জড়িয়ে সবাই বসে গেলেন চায়ের টেবিলে। চা পান করে শরীর একটু চাঙ্গা বোধ হলে প্রসাধনাদির সাহস হল। সাজ-সজ্জা করে বেলা ৯টার সময় যাত্রা করলাম পরবর্ত্তী ডেরা চঙ্গুর উদ্দেশে।

কার্পোনাং হতে চঙ্গুর এই দশ মাইল উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপর সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যেতে যেতে হিমালয় ভ্রমণের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা যায়। যত বা আনন্দ, তত বা বিস্ময়, ততই উত্তেজনা—মন যেন অসাড় হয়ে থাকে। যে পাহাড়ের গায়ে কার্পোনাং-এর ডাকবাংলা বাঁধা হয়েছে তার পায়ের গোড়ায় এক সরু উপত্যকা। পর পারে উত্তরে যে নীল সবুজ ঘন বনে ঢাকা উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায় তারই অঙ্গ বেয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে ফিরে চড়ে গেছে এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। দূরবীন দিয়ে সেই পাঁচ মাইল পথের শেষ ভাগ এখান হতেই দেখতে পেলাম। তখনও কেউ বুঝিনি যে এই পাঁচ মাইলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কত ছোট ছোট সুন্দর মনোরম স্থান। কত নির্ঝরিণী ও জলপ্রপাত পার হলাম। জায়গায় জায়গায় উপলখণ্ডময় জলস্রোতের মধ্য দিয়েই পথ চলে গেছে। কোথাও বা পথ বৃক্ষলতাবিহীন নগ্ন পর্ব্বতগাত্রে সরীসৃপ গতিতে চড়েছে নেমেছে। কোথাও কোথাও বা পাথরের চাজড়া মাথার উপর এমনি ঝুঁকে পড়েছে যে কোন রকমে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথাটাকে বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছিল। রাস্তার বাঁকের এক পাশ হয়ত নিস্তব্ধ, নীরব, শান্ত, আবার মোড় ফিরলেই হয়ত চারিদিক জলপ্রপাতের মধুর সঙ্গীতে মুখর। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতে পথ আবার একটা বাঁক ফিরল। আবার সব নিঝুম। কখনও পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ এসে সমস্ত অন্ধকার করে দিচ্ছে। আবার দেখতে দেখতে প্রখর রোদের ঝলকে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। পর্ব্বতের উপরকার প্রখর সূর্য্যকিরণ হতে চোখ বাঁচাবার

সিকিমের পথে

জন্য পথিককে নীল চশমা পরতে হয়। এই মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মাঝে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল

"স্থানে স্থানে খণ্ড মেঘগণ, পড়ে আছে
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন, শিখর আঁকড়ি।"

এই রকম যাচ্ছি হঠাৎ মিউল সর্দ্দার চীৎকার করে আপন ভাষায় কি হুকুম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মিউলের সহিস এসে যে যার পশুর মুখের বলগা ধরলে। খবর নিয়ে জানলাম সামনের পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল।

আতঙ্কে কেউ কেউ মিউল হতে নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু পিণ্টু ও মিউল সর্দ্দার আশ্বাস দিলেন যে কোন ভয় নাই। ধীরে সন্তর্পণে বন্ধুর পথে অগ্রসর হতে হতে বেরোলাম এক সঙ্কীর্ণ তাকের উপর। মাত্র

সিকিমের পথিমধ্যস্থ ঝরণা

দুই হাত চওড়া, এক দিকে তার দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড় অন্যদিকে গভীর অতলস্পর্শী খাদ, পাশে লোহার রেলিং। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অসমতল পথ চলে গেছে প্রায় আধমাইলের উপর। এইখানেই প্রকৃতি মানবের কাছে পরাজিত। নগ্ন প্রস্তরময় পর্ব্বতগাত্র কেটে এই বিচিত্র পথ তৈরী। নীচে পাথরের থাম ও ব্রাকেট দিয়ে তাকে মজবুত করা হয়েছে। শূন্যে ঝুলছে যেন এক দোদুল্যমান সেতু। সমস্ত সিকিম রাজ্যের মধ্যে নাকি এমন সুন্দর অথচ বিপদজনক পথ আর নেই। তখন মনে হয়েছিল যে আর কিছু না দেখি শুধু এই পার্ব্বত্যপথ নির্ম্মাণের কৌশল দেখবার জন্য এ দুর্গম প্রদেশে আসা সার্থক। শুনলাম সিকিমদরবার এই পথ নাকি আজ পাঁচ বৎসর হোল নির্ম্মাণ করেছেন। আগে নাথু-লা যেতে হলে অনেক ঘুর পথে যেতে হোত অত্যধিক landslipএ নাকি সে পথ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বৃটীশ ভারতের সীমানা হ'তে তিব্বত প্রদেশের মুখ, অর্থাৎ জেলাপ-লা বা নাথু-লা পর্য্যন্ত যে সব পথ সিকিমরাজ্যের ভেতর দিয়ে গেছে, সেগুলো যাতায়াতের উপযোগী করে রাখবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সিকিম দরবারকে বাৎসরিক লক্ষ মুদ্রা করে দেন। এই জন্যই বোধ হয় আমরা সিকিমের মধ্যে কোনও পথই অসংস্কৃত পাইনি। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ আবার বাংলার গভর্ণর বাহাদুরের দল, ঠিক সাতদিন পূর্ব্বে এই সমস্ত পথ দিয়েই গেছল। রাস্তাঘাটের সুসংস্কৃত অবস্থা দেখে এটা আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পাঁচ মাইল শেষ হবার কিছু পূর্ব্ব হতেই, আমরা দূরে বহুনিম্নে দেখতে পাচ্ছিলাম গ্যাংটক সহর ও কার্পোনাংএর ডাকবাংলা। এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল আমরা কোন দিক দিয়ে এসেছি। যে পর্ব্বতশ্রেণীর গা বেয়ে আমরা এতক্ষণ আসছিলাম, তার অপর পার্শে, অর্থাৎ তার অপরদিক উত্তরে

সিকিমের পথিমধ্যস্থ ঝরণার পার্শ্বে

এবার আমরা চলতে লাগলাম। রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তনের মতো এখন ক্রমশঃ চোখের সামনে ভেসে উঠল গিরিরাজের রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি। তরুলতাপূর্ণ শ্যামল বনরাজি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এলো। তার পরিবর্ত্তে দেখলাম, পাহাড়ের গায়ে,

পশুদের বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সিকিম দরবারের Reserved Forest-এর জঙ্গল কাটা আরম্ভ হয়েছে। বড় বড় গাছ কেটে কাঠ চেরা হচ্ছে। প্রায় এক মাইল যাবার পর একটি চায়ের গদীতে মিউলরক্ষীরা
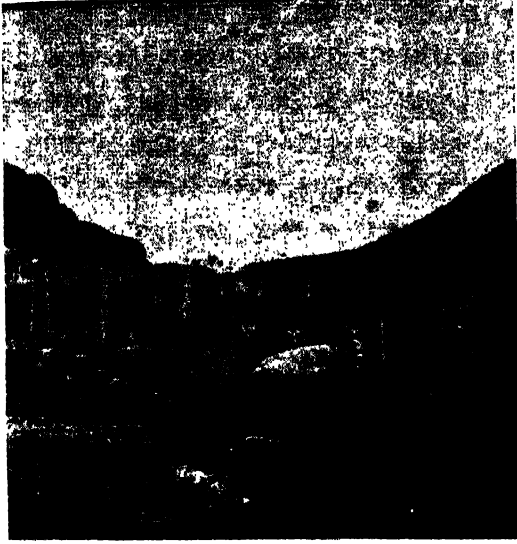
চঙ্গুর পথ

বিশ্রাম করতে বসল। আমরাও পনের কুড়ি মিনিট আরাম করে নিলাম। আবও মাইলখানেক রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে চলল। এখানে আমরা পাথরে ভরা কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ী চটি পার হলাম। প্রত্যেকটির ওপরেই কাঠ বা পাথরের পুল বাঁধা হয়েছে, তার পর থেকেই রাস্তা তাকে তাকে আরও উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করলে। আমাদের পথপ্রদর্শক দূরে দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মিলনস্থল দেখিয়ে বললেন, ঐখানে আমাদের উঠতে হবে। সম্মুখে পর্ব্বতমালা যেন উচ্চ প্রাচীরের মতো পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দুই মাইল রাস্তা আমাদের এ পর্য্যন্ত সবচেয়ে বন্ধুর বলে মনে হয়েছিল। যদিও তিব্বতের পথঘাট দেখে ফেরার পথে এই সঙ্কীর্ণ রাস্তাকেই আমরা প্রশস্ত রাজপথ বলে মনে করেছিলাম। বড় বড় অসমান পাথরের চাঙড় সাজিয়ে প্রায় সিঁড়ির মত এই দুই মাইল পথ তৈরী হয়েছিল। তবে মধ্যে মধ্যে সংস্কার হওয়াতে আমরা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিনি। এই পথে উঠতে উঠতে এক জায়গায় হঠাৎ আচম্বিতে ভেসে উঠল আমাদের দৃষ্টিপথে, নয়নমুগ্ধকর চঙ্গু হ্রদ। আচম্বিতে বলছি এই জন্যে যে এক আধ মাইল আগে থেকে নয় বা দশ পনের মিনিট আগে থেকেও নয়, হ্রদ যখন প্রথম আমাদের নজরে পড়ল, তখন আমরা একেবারে হ্রদের তীরে। শঙ্খাকৃতি এক মাইল দীর্ঘ হ্রদ। তার অপর পারে চঙ্গুর ডাকবাংলা দেখে মনে হোল, যেন হ্রদ বক্ষে ভাসমান একটি বজরা। চারিদিকে ১৩ হাজার ফুট উঁচু বিচিত্রবর্ণের পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝে এই বিস্তীর্ণ জলাশয়—প্রশান্ত, স্থির। তার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে প্রতিফলিত নানা বর্ণের ছটা, যেন কোন যাদুকরের কাঠির পরশে আমাদের চোখের সামনে সহসা ভেসে উঠল। আমরা কয়টি প্রাণী নির্নিমেষ নয়নে, নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই অপরূপ শোভা দেখতে লাগলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার

চঙ্গু হ্রদ
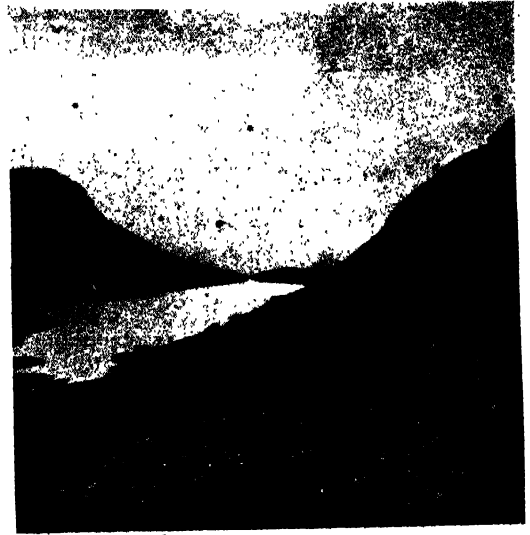
বিচিত্র সৃষ্টিকৌশলের কথা স্মরণ করে, নীরবে তাঁর চরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। প্রায় মাইলখানেক সমতল পথ হ্রদের তীরে তীরে, তারপর ডাকবাংলোর দিকে চলল। বেলা ঠিক দুটোর সময় আমরা পৌঁছিলাম, চঙ্গু

ডাকবাংলোতে। রান্নাঘর, স্নানের ঘর ছাড়া, সুসজ্জিত দুটি শয়নকক্ষ ও একটি খাবার ঘর এখানে ছিল। ঘরগুলি আয়তনে ছোট। আমরা সামনের কাঁচে ঘেরা বারান্দায় বসে হ্রদের শোভা উপভোগ করতে লাগলাম। চঙ্গু ১২৭০০ ফিট

হ্রদ

উঁচু। বেলা ২টার সময় তাপ দেখলাম ৫৪° ডিগ্রী। পৌঁছবা-মাত্রই চৌকীদার ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। পিঙ্কু আহার্য্যের ব্যবস্থা করতে গেলেন। তরুণেরা অক্লান্ত। তাঁরা বাক্সবিছানা খুলে তক্ষুনি শয্যারচনা ও জিনিষপত্র গোছগাছ করতে লেগে গেলেন। কার্পোনাং ছেড়ে অবধি আর স্নান কি কাপড়ছাড়ার বালাই বড় একটা ছিল না। কোন রকমে রাত্রে শোবার সময়ে ওপরের প্যাণ্ট ও কোট খুলে কম্বলের ভেতরে ঢোকা। জলযোগ সমাধা করে তরুণের দল খানিকটা পাহাড় চড়তে বেরোলেন। মতলব যে আরও উঁচু থেকে হ্রদের শোভা দেখবেন। আমরা দুজনে বারান্দায় বসে হ্রদের বুকে মেঘ ও পর্ব্বতের ছায়া, অস্তগামী সূর্য্যের কিরণের খেলা, তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম। ভাবছিলাম যে ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন পথের সমস্ত ক্লান্তি সার্থক। কি সুন্দর রং! মিনিটে মিনিটে বদলে যাচ্ছে। যেন এক স্বপনের রাজ্য! আমার ক্যামেরা সে রং কি করে ধরবে, চিত্রশিল্পীরও যে কাজ দুঃসাধ্য! পাঠকের জন্যে যে সে-অপূর্ব্ব দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা করব, সে-ও সাধ্যের অতীত! শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক! তোমরা এসে একবার এদেশে দেখে যাও! আমাদের সৌভাগ্য যে সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রখর কিরণে উজ্জ্বল, হ্রদের জলন্ত মূর্ত্তি দেখলাম। গোধূলিরাগে রঞ্জিত হ্রদের বুকে আকাশের প্রতিবিম্ব যেন আগুনের খেলা তাও দেখলাম। তারপর দেখলাম প্রদোষের আঁধারে শ্যামায়মান সেই বিশাল পর্ব্বতমালার মাথার ওপর কোজাগরীর চাঁদের উদয়। ধীরে ধীরে উপত্যকাভূমি স্নিগ্ধোজ্জ্বল জোৎস্নালোকে প্লাবিত হোল। হ্রদের কালো জলে শুভ্র চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হয়ে সমস্ত হ্রদটাকে যেন একখানি রূপার চাদরে ঢেকে দিলে। সে অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণনা করবার উপযোগী ভাষা আমার নেই। প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপ চিন্তা করতে করতে নৈশ আহার সমাধা করলাম, তারপর অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটু বসে গরম হয়ে নিয়ে যথাসময়ে

চঙ্গু উপত্যকা

শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিদ্রাদেবী সেদিন আর কৃপা করলেন না। যদিও প্রতি ডাকবাংলোয় চারপাঁচটি করে খাট থাকতো তবু সুধীরবাবুর ভয় ছিল যে খাটের তলা হতে হাওয়া ঢুকে শীতের প্রকোপ বাড়াবে। সেই জন্য অধিকাংশ ডাক-

বাংলোতেই আমরা কাঠের মেজের ওপর বিছানা পেতে শুতাম। সেদিন কিন্তু এতেও কিছু ফল হোলনা, শীত আর কমলনা। মধ্যে মধ্যে রাত্রে উঠে সবাই এক একবার অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দেহটা তাতিয়ে আসছিলাম। মনে হচ্ছিল অগ্নিও বুঝি তার উত্তাপদানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

এই চঙ্গু হ্রদের তাৎপর্য্য যে শুধু তার শোভার জন্য তা নয়। এই হ্রদের জল অচিরেই একদিন হয়তো সারা বাঙ্গলার অবস্থার পরিবর্ত্তন করে দেবে। প্রভূত ধনশালী কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানীর সঙ্গে সিকিম দরবারের এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার ও আলোচনা চলছে। তাঁদের প্রস্তাব এই যে এই হ্রদের জল ও চঙ্গু উপত্যকার কয়েকটি ঝরণার জল বেঁধে ফেলে এক বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করবেন, আর তার জোরে কল চালিয়ে সস্তায় বিজলী উৎপন্ন করবেন। সেইজন্য উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের সব পর্ব্বতমালার জরিপ নক্সা তাঁরা তাঁদের Engineer মারফৎ করে ফেলেছেন। শোনা যায় যে এই কৃত্রিম জলপ্রপাত নয় হাজার ফুট উঁচু হবে আর এর জোরে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে তার দ্বারা সারা বাংলাদেশকে এরা অতি সামান্য মূল্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সরবরাহ করতে পারবেন। এই জন্য সিকিমদরবারে তাঁদের এই চঙ্গু উপত্যকাকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর বলে মনে করেন।

চঙ্গুতে সন্ধ্যা হতেই সকলের অল্পবিস্তর পার্ব্বত্য ব্যাধির সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম সামান্য নিঃশ্বাসের কষ্ট বোধ হতে লাগল। অঙ্গ সঞ্চালন করলেই সে কষ্ট যেন বেড়ে যাচ্ছিল। কারও বা একটু একটু মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হোল, অসুখের জন্যেই হক বা বেশী শীত বলেই হোক কারও সে রাত্রে ভালরকম ঘুম হোল না! এই চঙ্গুতেই আমাদের প্রথম ঔষধের বাক্সের সদ্ব্যবহার হোল। নিজেদের মধ্যে কেউ কেউ aspirin ইত্যাদি খেলেন। পথে মিউল সর্দ্দারের এক দুর্ঘটনা ঘটে, তাই তাকেও ঔষধ দিতে হয়। কার্পোনাং হতে চঙ্গুর সেই বন্ধুর পথে যখন মিউলগুলোকে খুব সাবধানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একটা পশুর খুর তার একটা পায়ের আঙুলের উপর সজোরে পড়ে, ফলে সে বসে পড়ে। প্রায় ১০।১৫ মিনিট চলতেই পারেনি। আমরা প্রত্যেকে তাকে পালা করে মিউলের পিঠে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হোল না, বরাবর সেই একই ভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে চলল। পরে জানলাম যে লোকটা দরজীকে কথা দিয়েছিল যে দলের সঙ্গে সে বরাবর পদব্রজে যাবে। কাজেই মিউলে চড়া কি করে হতে পারে! একজন অশিক্ষিত পাহাড়ীর এই দৃঢ়তা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা কি আশ্চর্য্য জিনিষ নয়! চঙ্গুতে পৌঁছে, আমরা আপন গরজে হলেও অতীব আনন্দের সঙ্গে যথাসাধ্য তার পদসেবা করেছিলাম।

নাথু-লায় উঠবার নিকটস্থ পথ

১০ই অক্টোবর—শথু-লা। আগেই বলেছি যে নাথু-লা ও জেলাপ-লা ভারতবর্ষ হ'তে সিকিমের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে যাবার দুটি ঘাটী, বা প্রবেশ পথ। শথু-লা চঙ্গু থেকে ৬ মাইল। আমরা শুনেছিলাম যে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নাথুলা ও জেলাপ-লা প্রায়ই বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে। চঙ্গুতে অনিদ্রার জন্যও বটে আর, রৌদ্র প্রখর হবার আগে এই তুষারময় পথ উপভোগ করবার ইচ্ছাতেও বটে, আমরা খুব ভোরে উঠে, অগ্নিকুণ্ডে হাত পা গরম করে নিয়ে, চা খেয়ে যত শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম।

বাহিরের Temperature তখন ৩১° ডিগ্রী। সব ব্যবস্থা করে রওয়ানা হ'তে সাতটা বেজে গেল। চঙ্গু হতে নাথু-লার পথ এক গোলাকার পর্ব্বতের গায়ে ঘুরে ঘুরে এক মাইল উঠে, সেই পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করে অপর পার্শ্বে চলে গেছে। এই জায়গা হ'তে অবশিষ্ট পাঁচ মাইল পথের মধ্যে দুবার আমাদের মিউল থেকে নেমে হেঁটে যেতে হয়েছিল। কেন না দুবারই, রাস্তা হঠাৎ প্রায় সাত-আট শো ফিট নেমে আবার উঠেছে। নামবার মুখে পদব্রজে যাওয়াই সহজ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তাই আমরা ওই রকম করেছিলাম। দুবারই নীচে নেমে একটি প্রস্তরময়
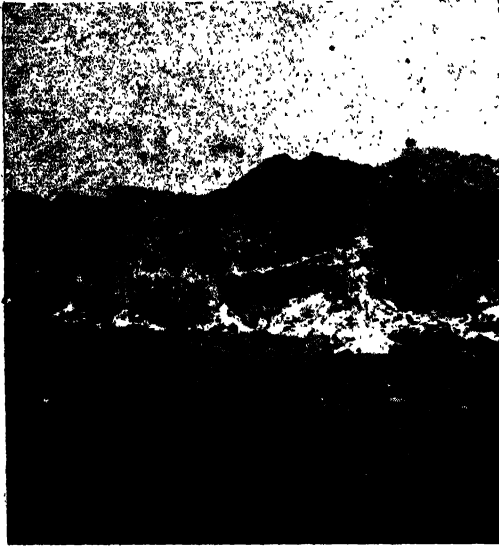
নাথু-লা

পাহাড়ী নদী পার হতে হয়েছিল। দুটি পার্ব্বত্য জলাশয়ের পাশ দিয়ে এই পথ গেছে। প্রায় ৪ মাইল দূর হ'তে নাথু-লা দেখা গেল। পৌঁছবার ঠিক এক মাইল আগে হতে পথ একেবারে খাড়া হয়ে গেছল। চঙ্গু থেকে এই ছ' মাইল পথ আসতে আমাদের সময় লেগেছিল ছ' ঘণ্টা। এই পথের মধ্যেই প্রথম দেখলাম যে ছোট ছোট নির্ঝরিণীর জল জমে স্বচ্ছ কাঁচের টুকরোর মত হয়ে রয়েছে। প্রথম বরফ দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তরুণের দল সেগুলিকে লাঠি দিয়ে ভেঙে হাতে কুড়োতে লাগলেন। ভাবটা, যেন সেগুলিকে বরফ দেখার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু সাথী পিন্টু বেশীক্ষণ বরফ হাতে ধরে রাখতে বারণ করলেন। কেননা, অত উঁচুতে, আগুনের জ্বলার মতো নাকি বরফের জ্বালাতেও আঙুলে ফোস্কা পড়ে যায়,—তাকে বলে, snow bite. বেলা ঠিক এগারোটায় আমরা পৌঁছলাম 'নাথু-লা'র গিরিপথে। এই পথের উচ্চতা ১৪৫০০ ফিট। যারা পাহাড়ে চড়তে যথার্থ ভালবাসেন, এমন অনেক পথিকের পরম তীর্থস্থান এই হিমালয় শিখরস্থ জেলাপ ও নাথু-লা ঘাট,—ভারতবর্ষ ও তিব্বত দুই অতি প্রাচীন ভূখণ্ডের মিলনক্ষেত্র। এই নাথু-লার মাথার ওপর পৌঁছবামাত্রই দেখলাম যে রাস্তা অপর পাশে অনেক নীচের উপত্যকাভূমি পর্য্যন্ত গড়িয়ে গেছে। আরও দেখলাম বহুদূরে চুম্বী উপত্যকার মাঝে, রুদ্ধদ্বার তিব্বতের প্রহরী স্বরূপ দাঁড়িয়ে তুষারকিরীট উত্তুঙ্গ চুম্বলহারী পর্ব্বত। নাথু-লায় পৌঁছেই পেলুম প্রবল বায়ুর বেগ। সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ ভেদ করে অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে বইছে সেই হাওয়া। হাড়ভাঙ্গা শীতের কথা যে শুনেছি, তা বোধ হয় একেই বলে। নাথু-লার ওপরে দেখলাম, দুই দেশের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশের জন্যে গড়া হয়েছে এক নীচু পাথরের প্রাচীর। এই প্রাচীরে তিব্বতের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ দুটি বাঁশের ফটক দেখলাম। তার উপর কয়েকটি জীর্ণ শীর্ণ তিব্বতরাজ্যের পতাকা উড়ছে। এই স্থানকে pass আখ্যা কেন দেওয়া হয়েছে জানি না। কারণ pass শব্দের অর্থ দুই উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ। নাথু-লা বা জেলাপ-লা সে রকম মোটেই নয়। নাথু-লা পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একটি জায়গা মাত্র। এই স্থানকে তুষারাচ্ছন্ন না দেখে আমরা বড় নিরাশ হয়েছিলাম। তবে নিকটস্থ গহ্বরকন্দরগুলির মধ্যে যেখানে সূর্য্যকিরণ তখনও পৌঁছয়নি, সেখানে সাদা তুলার রাশির মতো তুষারস্তূপ আমাদের নজরে পড়েছিল বটে। এই জায়গায় পার্ব্বত্য ব্যাধি বড় বেশী কাবু করেছিল সুধীর বাবুকে। পাথরের উপর প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করবার পর সব আমরা যাত্রা করলাম তিব্বতের পথে।

এই আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করতে করতে ভাবছিলাম গিরি-রাজ হিমালয়ের কথা। কি বিরাট, কি বিচিত্র এই মহা-

পর্ব্বত! প্রহরীর মত উত্তরে দাঁড়িয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে আমাদের এই দুর্ব্বল অক্ষম ভারতকে যেন আগলে রয়েছে। শিলিগুড়ি হ'তে আরম্ভ করে নাথু-লা পর্য্যন্ত পথের প্রকৃতির যে আশ্চর্য্য শোভা, আশ্চর্য্য সম্পদ দেখতে দেখতে এসেছি, তারই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এই হিমালয়ের আছে কি শুধু সৌন্দর্য্য, শুধু রূপমাধুরী? তা তো নয়! হিমালয় যে লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার! উর্ব্বরা উপত্যকা ভূমিতে স্তরে স্তরে সুন্দর সবুজ শস্যক্ষেত্র, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সহস্র চা-বাগান, পর্ব্বত গর্ভে লুকান নানা খনিজ দ্রব্যের গুপ্ত ভাণ্ডার। উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণীর গায়ে কত রকম বিচিত্র বৃক্ষলতা ও ফুল, কত অদৃষ্টপূর্ব্ব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ! দেখে মনে হয় যেন জ্ঞানে ও ধনে জগতের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে এই হিমালয় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কিন্তু সে দান নেবার উদ্যমও আমাদের নেই, আগ্রহও নেই! লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে, প্রাণ হাতে করে যে সব বিদেশী পর্য্যটক হিমালয় দেখতে আসেন তাঁরা তো শুধু ভ্রমণের সখ মেটাতে আসেন না। তাঁদের মধ্যে দেখতে পাই, ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণীতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক। এক একজন হিমালয়ের নিভৃত অরণ্যকন্দরে নূতনের সন্ধানে সাধকের একাগ্রতা নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাচ্ছেন। উদ্দেশ্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন কিছু দান, মানব জীবনের কিছু উন্নতি সাধন। কিন্তু কই, হিমালয়ের আপনার লোক যে আমরা, আমরা কি করছি! কই, আমরা সহরের সুখ ছেড়ে অরণ্যে বা মরুভূমিতে পর্ব্বত বা মহাসাগরে যেতে প্রস্তুত? একমাত্র

চিরতুষারধবলিত হিমাচল
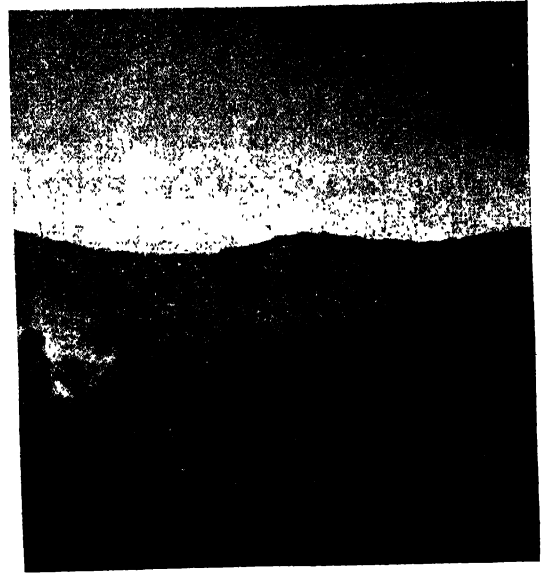
পরাধীনতার পেষণেই কি একটা সমগ্র জাতির এই দুর্দ্দশা হয়েছে? (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

চৈতালি হাওয়া পথ ভুলিয়াছে

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চৈতালি হাওয়া পথ ভুলিয়াছে জনহীন বালুচরে,
উদাসিনী নদী ব'য়ে চ'লে যায় ব্যাকুল কলস্বরে ।
কোনোখানে নাহি ছায়া—
মধ্যদিনের সূর্য্য-কিরণে হাসিতেছে মরুমায়া,
অভ্র-রেণুকা দীপ্তি হানিছে বহ্নি-কণার মত,
চক্রবাকের দূর-ক্রন্দন ভেসে আসে অবিরত।

মানুষের প্রেম নাহিকো হেথায়, নাহিক কুঞ্জবন,
বল্লী-বিতানে মধু-যামিনীতে প্রণয়-গুঞ্জরণ।
হেথায় মিলন-বাসক-শয়ন রচিবেনা কভু কেহ,
নাহিকো প্রিয়ার বাহু-বন্ধন, প্রিয়-পরিজন-স্নেহ ।
শ্রাবণ-কাজল-রাতে,
ঘন-জটাজাল বিসারি' গগনে, উচ্ছল পদ-পাতে,
বাদল যখন নৃত্য-মাতাল মাদলের তালে তালে,
তুমি দেখো তা'র নটিনীর রূপ প্রাসাদ-অন্তরালে।
তনু দেহে তা'র দোলে আভরণ, বাজে তা'র কিঙ্কিণী,—
—হেথা বালুচরে মেঘবেণী মেলি' কাঁদে সে বৈরাগিনী।
ব্যথাতুর তা'র রিক্ত-হৃদয়ে বিদ্যুৎ-লেখা জ্বলে,
ভৈরবী নদী উচ্ছুসি' ওঠে ফেন-তরঙ্গদলে !

হেথা শূণ্যতা, হেথা জীবনের পরম নির্ব্বাসন,
তবু অজানিত কে অতিথি আজ করিলে পদার্পণ !
বনানীর ছায়াপথ,
গৌরব-ভরে যেথা চলিয়াছে যৌবন-জয়রথ,
নব-জীবনের উল্লাসে কাঁপে চঞ্চল কিশলয়,
মুকুল-গন্ধে নেশা লাগিয়াছে কানন-কুঞ্জময়।
অশোকের শাখা হোলো অবনত সৃষ্টির অনুরাগে,
রাশি রাশি তার বর্ণ-বিলাসে নয়নেতে মোহ লাগে,
সেই পথে যেতে বসন্ত-দূত হোলো আজ পথভোলা,
রূপ-রস ভরা উত্তরী তা'র বালুচরে দিলো দোলা।

হে অতিথি, চাহ ক'ারে ?
ইঙ্গিতে তব কে বাঁধিবে সুর আপন বীণার তারে ?
নির্ব্বাণহীন লালসার মতো প্রখর রুক্ষ দিন,
দিকে দিকে ওড়ে তপ্ত-বালুকা মার্জ্জনা-দয়াহীন,
প্রাণলীলাময় সঙ্গীত তব হেথা শুনিবেনা কেহ,
শুধু মরণের মহা-মৌনতা, প'ড়ে আছে শবদেহ।
শোকাতুরা নদী কাঁদে তা'রে ঘিরে' দুঃসহ ব্যথাভরে,
চৈতালি হাওয়া পথ ভুলে' এলো নির্জ্জন বালুচরে।

পুরাণ-কথা

শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

পুরাকালের কথা লইয়া পুরাণ। পুরাণে স্পষ্টভাবেই আছে, পুরাণ ও ইতিহাস ব্যতিরেকে বেদজ্ঞান পরিপুষ্ট হয় না। এখানে পুরাণ ও ইতিহাস বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইয়াছে সুতরাং পুরাণ ও ইতিহাস এক নহে। ইতিহাস বলিলেই আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি পুরাণে তা আছে তদ্ভিন্ন আরও বহু বিষয়ও পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—যথা, খগোল-ভূগোল, সৃষ্টিতত্ত্ব-ভূতত্ত্ব ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে এস্থলে দুই চারিটি বিষয়ে মাত্র আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; তদ্দ্বারা পুরাণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা ধারণা করা যাইতে পারে এবং সেগুলির সম্যক আলোচনা সম্ভব হইলে পুরাণান্তর্গত অনেক তথ্যের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে।

আমরা মান্ধাতার নাম শুনিয়াছি এবং তাঁহাকে অতি প্রাচীনকালের অমূলক গল্প-কাহিনীর রাজা বলিয়াই জানি। কিন্তু ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলে ১১২ সূক্তের ১৩ শ্লোকে মান্ধাতার নাম পাই এবং পুরাণ হইতেই তাঁহার সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারি। মান্ধাতার সমসময়ে মথুরার অধিপতি ছিলেন লবণ-দৈত্য এবং এই দৈত্যের রণেই মান্ধাতা নিহত হন। পুরাণে অতিরঞ্জিত কোন কথা নাই তবে, পুরাণকারগণের লিখিবার ভঙ্গী ঠিক ধরিতে না পারিলে পুরাণ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ এবং দ্বিতীয়ত মনে রাখিতে হইবে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া পুরাণ লিখিত হয় নাই। পুরাণকারগণ ব্যাস নামে পরিচিত, তাঁহাদের নামের তালিকাও আছে এবং ২৮টি নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা স্ব স্ব সময়ে পুরাণের কলেবর বাড়াইয়া গিয়াছেন, ফলতঃ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনুর অধস্তন দশম পুরুষে বেনচক্রবর্ত্তী। তিনি উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু অসচ্চরিত্র ও প্রজাপীড়ক হওয়ায় ঋষিগণ তাঁহাকে খুঁচাইয়া মারেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র সদাচার সম্পন্ন প্রথিতনামা পৃথু নিষাদগণকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যলাভ করেন। সে সময় তাঁহার পূর্ব্বদিকের দেশে সুধর্ম্মা, দক্ষিণে সর্ব্বেশ্বর, পশ্চিমে কেতুমান ও উত্তরে হিরণ্যরোমা রাজত্ব করিতে-ছিলেন। বিহার প্রদেশে 'মরণ' তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তাঁহারই আহূত যজ্ঞসভায় পুরাণ গানের আরম্ভ। পৃথুর তুলনায় সূর্য্যবংশের রাজা মান্ধাতা অর্ব্বাচীন। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের মতে মান্ধাতা ৩৪৫৯, প্রচেতস্-দক্ষ ৩৮৮৯ এবং পৃথু ৪৮৯৫ খৃঃ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। প্রচেতস্-দক্ষের আদমসুমারী অনুসারে তাঁহার ৮০ কোটি প্রজা ছিল। ইহার মধ্যে অশ্ববানী, উষ্ট্রমুখ, ঋক্ষবক্ত্র প্রভৃতি দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রজাও ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু ম্লেচ্ছ যবনাদিও তাঁহার রাজ্যে বাস করিত। প্রচেতসগণের অগ্র পশ্চাৎ কোন সময়ে হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব নামক দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত দুই সহস্র ব্যক্তি বিবর্দ্ধমান প্রজাগণের বাসস্থান নিরূপণের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন "পৃথিবীর প্রমাণ জানিয়া পরে প্রজা সৃষ্টি করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা দিকে দিকে চলিয়া গেলেন। সমুদ্রগত নদীর ন্যায় অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই।" পুরাণে যাঁহাদের বিষয় এ রকম ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না; তাৎকালীন ধর্ম্মাদি বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। উপরন্তু তাঁহাদের অধিকতর উন্নত বলিয়াই প্রতীয়মান হয় নতুবা বাসস্থান নিরূপণ করিয়া পরে প্রজাসৃষ্টি করার ধারণা সম্ভব হয় না। ইঁহারা ঠিক কোন্ বৎসরে যাত্রা করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন; তাহা হইলেও পৃথুর আগে নয় ইহা ঠিক। এদিকে Cambridge British Foreign Bible Society হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Bible এ লিখিত Genesis

গাথা ৬০০৪ খৃঃ পূর্ব্বে রচিত।' এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে Genesis এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুইটি বাক্য স্পষ্টই পুরাণে রহিয়াছে। প্রথম বাক্যটি হইল "In the begining God created the Heaven and the earth" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলিয়াছেন "কপালমেকং দ্যৌস্তিস্তে কপালমপরং ক্ষিতিঃ॥ দ্বিতীয়টি হইল—"And the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit or God moved upon the face or the waters." ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে—"ব্রহ্মা তু সলিলে তস্মিন্ বায়ুর্ভূত্বা তদাসরৎ। নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্ কালে ততস্ততঃ। ততস্তু সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্। এই বাক্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য রহিয়াছে; হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্বগণ বিদেশে যাইয়া পুরাণ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন কিনা কে বলিবে?

এ রকমের আর একটি বিশেষ উদাহরণ দেখাইতেছি। মৎস্য অবতার ও জলপ্লাবনের কথা সকলেই জানেন। পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতে পুরাণকার এ ঘটনাটি বেবিলনদিগের নিকট পাইয়াছেন। কারণ বেবিলনদিগের একটি উপাখ্যান হইতে সপ্রমাণিত হইয়াছে, হিন্দু ভাবতে তাহা হয় নাই। ইহার উত্তরে প্রথমেও বলা যাইতে পারে যে, অদ্যাবধি ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিমে নৌবান্ধা পর্ব্বতে তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব দশাবতারের মধ্যে প্রথমটি যদি বেবিলন হইতে লওয়া হইয়া থাকে, কূর্ম্মাদির কল্পনার ভিত্তি কি ও কোথায় তাহাও জানা দরকার। তৃতীয়তঃ পুরাণে কেবল এই একটি জলপ্লাবনের কথাই যে আছে তাহাও নয়, তবে এই একটি মাত্র ঘটনার সহিতই মৎস্য অবতার সংশ্লিষ্ট। চতুর্থতঃ Ireland, North ও South America এবং জাপানেও এবম্প্রকারের জলপ্লাবনের কাহিনী প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ভারতের উত্তর পশ্চিমে নানান অনুসন্ধান চলিতেছে, এখনই বলা যায় না পুরাণ পাঠে ইহা কতদূর সাহায্য করিবে, তথাপি পুরাণোক্ত হিমালয়বাসী মহাবল মানবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া হিন্দুমাত্রেই আহ্লাদিত হইবেন।

পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাণকারগণ নানারূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের কল্পনা করিয়াছেন। স্রষ্টার নাম ব্রহ্মা এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় তাঁহার বৃত্তি। ইঁহার আর কয়েকটি নামও আছে যেমন ভব, প্রজ্ঞা ইত্যাদি। তিনি ভব, কারণ ভূতত্ব তাঁহাতে অবস্থিত এবং প্রজ্ঞা কারণ গ্রহগণ তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। অপর একটি নাম স্বয়ম্ভূ কারণ তিনি স্বয়ং অনুৎপন্ন ও সমুদায় পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রী ভাগবতে ইঁহার নীহারময় তনু কল্পিত হইয়াছে এবং মৎস্যাদি পুরাণানুসারে তিনি তমোরাশি অপসারিত করিয়া তড়িৎ প্রকাশের ন্যায় সহসা প্রাদুর্ভূত হন এবং তাঁহা হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই অণ্ড অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এই অণ্ডেরই অন্তর্ভূত। অনন্তর স্বীয় প্রভাবে ও ব্যাপ্তিক্রমে কিরণমালা সূর্য্যের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং স্বীয় তেজে প্রকাশমান ঐ অণ্ড মহাসিন্ধু মাঝে বিস্ফুরত্ব প্রাপ্ত হইল। ইতিমধ্যে সূর্য্য-আদিত্য প্রকাশ পাইয়াছেন। অনন্তর বালিকা পৃথিবী জলমধ্য হইতে নবীন দিবালোকের সহিত ঈষৎ মাথা তুলিয়া চাহিলেন। তৎকালে অক্ষোভ্য বায়ু বহিতেছিল; তাহাতে তরঙ্গায়িত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে বৈশ্বানর অগ্নি প্রকাশ পাইয়া বহু জল শোষণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ অণ্ড জগৎরূপে প্রকটিত হইল।

পৃথিবী সৃষ্টি কতকাল পূর্ব্বে হইয়াছে তাহাও পুরাণ হইতে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পুরাণকার নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া কল্পমন্বন্তরাদি নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। সরলভাবে পৃথিবীর আয়ু দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ব পরার্দ্ধ ও দ্বিতীয় পরার্দ্ধ। পূর্ব্ব পরার্দ্ধের নাম সনাতন কল্প, ইহা বহুদিন পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরার্দ্ধের নাম জন্মকল্প, এই কল্পের অন্তর্গত বরাহ কল্প এখন চলিতেছে। সনাতন কল্পের পর দেবপরিমাণে সহস্রযুগব্যাপী প্রলয়রূপী নিশা কাটিয়া যাইলে বরাহ দেব জলমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করেন। (এই বরাহ হইতে 'বরাহ' কল্প আরম্ভ, ইনি দশাবতারের অন্তর্গত তৃতীয় অবতার নহেন)। এখানে অন্তর উল্লেখ নাই, পৃথিবী বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা

যাইতেছে ইতিপূর্ব্বে পৃথিবী আকার লাভ করিয়াছিল। বরাহদেব পৃথিবী উদ্ধার করিলে ব্রহ্মা পুনরায় প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অতঃপর জীব সৃষ্টি; ইহার ক্রমধারায় প্রথম হইল নগ অর্থাৎ স্থাবর যথা—বনস্পতি, ওষধি, লতা ত্বক্‌সার, বীরুধ ও বৃক্ষ; পুরাণের মতে ইহাদের প্রাণ আছে। তৎপরে তির্য্যক্‌স্রোত অর্থাৎ সরীসৃপজাতি পক্ষী ও পশু; সরীসৃপের মধ্যেই মৎস্যাদি এবং পুরাণান্তরে দেখা যায় পূর্ব্বোল্লিখিত অণ্ড যখনও পৃথিবীর আকার লাভ করে নাই, গর্ভবেষ্টন চর্ম্মে অণ্ড আবৃত হয় নাই, তখন হইতেই জলজন্তুগণের বংশানুবন্ধ ঘটে। অনন্তর, উর্দ্ধস্রোত ও অর্ব্বাক্‌স্রোত এতদ্বারা দেবমানবাদি উপলক্ষিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ব্রহ্মার মানসপ্রজা, অসুরদের পিতৃ মনুষ্য রাক্ষস যক্ষ ও মাংসাশী সর্পজাতি ধৃত হইয়াছে। সনাতন কল্পের বিবরণে প্রথম স্থাবর সৃষ্টি এবং শেষে অধঃপ্রবিষ্ট আহারে জীবিত প্রাণী ও সনকাদি ঋষির কথা রহিয়াছে কিন্তু বরাহ কল্পের প্রথমে হইল অসুর এবং শেষে মানব-নরদেহী। বরাহদেব যখন পৃথিবীকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করেন তখন স্তবকারী ঋষিগণ উপস্থিত। সুতরাং পুরাণ অনুসারে মানবাদির সৃষ্টি প্রবাহ মধ্যেই কোন সময় পৃথিবী একার্ণবীভূত হইয়াছিল এবং বরাহদেবকে উপলক্ষ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারের ব্যাপার বুঝান হইয়াছে মাত্র। এখানে মৎস্যকূর্ম্মের অবতারণা করা হয় নাই, বরাহদেব কল্পিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার শৃঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীরূপ পদ্মকে উদ্ধার করেন। আধুনিক মতে, তুষারযুগের কোন সময়েই হিমালয় এখনকার রূপ উচ্চতা ও উত্তর ভারত বর্ত্তমানের আকার লাভ করিয়াছিল।

শ্লোকে তুষারযুগেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণ হইতে কয়েকটী ছত্র এখানে উদ্ধার করিলাম—শিত্যাদেকার্ণবে তস্মিন্ বায়ুনাপিহস্ত তাঃ॥ নিষক্ত যত্র যত্রাসংস্তত্র তত্রাহচলো ভবৎ। স্কন্ন চলত্বদচলাঃ পর্ব্বভিঃ পর্ব্বতাঃ স্মৃতাঃ॥ গিরয়োস্তিনিগীর্ণত্বাচ্চয়নাচ্চ শিলোচ্চয়াঃ।" বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদে আছে (জল সকল) শীতলতায় সংসক্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে অচলভাবে অবস্থিত ছিল, (বরাহদেব) তাহাদিগকে পুনঃ প্রকাশিত করিলেন। শুষ্ক হইয়া অচলভাবে অবস্থিত থাকায় পর্ব্বতের একটি নাম অচল। পর্ব্ব অর্থাৎ শৃঙ্গাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অপর নাম হইল পর্ব্বত এবং জলরাশি হইতে উত্তীর্ণ অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি। এখানে নূতন সৃষ্টির কোন কথা নাই। এতদসমুদায় জলে আবৃত ছিল, বরাহদেব সেগুলিকে জলমুক্ত করিয়া পুনঃরায় স্থাপন করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে জলসমূহ শীতলতায় সংসক্ত অর্থাৎ কঠিন হইয়াছিল। আধুনিকভাবে এ কথাটি আমরা এই ভাবে লইতে পারি—বরাহদেব পৌরাণিক উপলক্ষ্য মাত্র। বাকী অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে, সে সময় শীতের অত্যন্ত প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জলসমূহ কাঠিন্য লাভ করিয়াছিল এবং পর্ব্বত সকল তাহাতে আবৃত হইয়াছিল। আর এক কথা এই যে, পুরাণের বর্ণনায় একার্ণব পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পুরাণেও একার্ণবের অর্থে বেগহীন বিশাল জলরাশি বলা হইয়াছে। এই বিশাল জলরাশি শীতলতায় কাঠিন্য লাভ করিয়াছিল, ইহাতে Glacier ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। এ সকল কথাই তুষারযুগের বর্ণনার মত শোনায়, পুরাণকারগণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই পরোক্ষের বিবরণ দিয়াছেন (বায়ু পুরাণ) কিন্তু ঠিক কোন প্রমাণের বলে এতৎসমুদায় লিখিয়াছেন আমি তাহা বলিতে অক্ষম। তথাপি উত্তর ভারতের Glaciation সর্ব্ববাদীসম্মত। পৃথিবীবক্ষে সর্ব্বসমেত চারিবার হিমপাত হইয়াছিল। পুরাণে তাহার শেষটি ধৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে কেননা শেষবার তুষার পাতের সময়ে পৃথিবীতে মানব বর্ত্তমান ছিল। পুরাণও এই কথা বলিয়াছেন এবং সেদিন Yale-Cambridge এর প্রতিনিধি Drummond সাহেবও তাৎকালীন মানবের তৈজস পত্রাদির সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মানবের ক্রমোন্নতির ধারাও যে পুরাণে সংগৃহীত হয় নাই তাহা নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতীত কল্পে প্রজানিচয়ের যে নামরূপাদি নির্দ্দিষ্ট ছিল পরবর্ত্তী কল্প সমূহেও প্রায়ই তাহারা সেইরূপ নামরূপ লইয়া জন্মিয়া থাকে। স্থানান্তরে একথাও স্পষ্টরূপে রহিয়াছে, প্রাজ্ঞকল্পের পর মানকল্প এবং সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু যোনি ভ্রমণান্তে জীব প্রথমাদিক্রমে কুব্জ কুৎসিত, বামন চণ্ডাল ও বুক্ক আদি জীবন ভোগ করিয়া অবশেষে নরদেহ লাভ করে। এ কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার কি না জানি না, Sivapithecus

নামক অর্দ্ধমানবের কঙ্কাল শিবালিক পর্ব্বতমালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু man-ape বা ape-man এর কোন চিহ্ন তথাপি পাওয়া যায় নাই।

পুরাণ বলিয়াছেন—আদি মানবেরা সকলেই হৃষ্টাত্মা ও মহাবল ছিলেন। তাঁহাদের শীতোষ্ণাদি জন্য দুঃখ উপস্থিত হয় নাই এবং কোন নিকেতনেও বাস করিতেন না। শিলাদি বাসস্থান ছিল। তাঁহারা অসংস্কৃত শরীরেই স্থির যৌবনশালী ছিলেন এবং সকলেরই জন্ম ও রূপ সমান ছিল, মৃত্যুও সমভাবে ঘটিত। সে সময় পাপপুণ্য বিভাগ বর্ণ ও আশ্রমাদির ব্যবস্থা বা বর্ণসঙ্করাদি ছিল না; প্রত্যেকেই ইচ্ছা দ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়া প্রত্যেকের সহিত ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা চিন্তামাত্রেই বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইতেন। পরস্পরের প্রতি লিপ্সা বা অনুগ্রহ করিবার আবশ্যক হইত না। পরবর্ত্তী যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লক্ষণ সমূহ বিনষ্ট হয়। এই যুগে শীতাতপ বাধার প্রবল পীড়নে শরীরের আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া আপন আপন ইচ্ছানুসারে পর্ব্বতে, নদীতটে প্রভৃতি সর্ব্ববিধস্থানে বাস করিতে থাকিলেন এবং বৃক্ষজাত বস্ত্র, আভরণ ফল ও মহাবীর্য্যপ্রদ অমাক্ষিক মধু ব্যবহার্য্য হইল। উক্ত নিকেতন ক্রমে পুর, অন্তঃপুর, গ্রাম, নগর, পল্লী, প্রদেশ সন্নিবেশ প্রভৃতিতে পরিণত হইল। পুনশ্চ কয়েকটি দুর্গও নির্ম্মিত হইল তন্মধ্যে তিনটি দুর্গ স্বাভাবিক এবং একটি কৃত্রিম। তৎপরে বৃক্ষগণের শাখা সমূহের আদর্শে ঊর্দ্ধ ও তির্য্যকভাবে বিস্তৃত গৃহসমূহ গঠিত হইল এবং তাঁহারা স্ব স্ব বলানুসারে নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ গুল্ম ওষধি প্রভৃতি অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় প্রজাসমূহ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য স্বয়ম্ভু প্রজাপতির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ধান্য, যব, গোধূম, তিল, মাষ, মুগ, মসুর, চনক প্রভৃতি জন্মিতে থাকিল। প্রথমে এতৎ সমুদায় অকৃষ্ট ভূমিতেই উৎপন্ন হইত কিন্তু কালান্তরে তাহা হইল না, তখন কৃষ্টপথ্যরূপে সৃষ্ট হইল। পুরাণান্তরে আছে আদি যুগের প্রজাদের মধ্যে মনুষ্য কপাল ও শিল পাত্রাদির ব্যবহার ছিল; তাঁহাদের কেহ লতামণ্ডপে কেহ পর্ব্বতকন্দরে কেহ নদীতীরে কেহ সমুদ্র কূলে বাস করিতেন এবং এই গ্রন্থানুসারে কৃষিকার্য্যের পূর্ব্বে মানবের আহার্য্য স্বরূপ ফল মূল ও মধুর পর ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে মৃগ ঋক্ষ বরাহাদি শীকারলভ্য মাংসাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন দেবলোকে অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তখন নর্ম্মদাতটে ধীবর মৎস্যাদি শীকারে ব্যস্ত। ক্রমশঃ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর পার্শ্বে পিণাকধারী শিবমূর্ত্তির আসন রচিত হইল, দশভুজাকে শঙ্খ চক্র খড়্গ শূল ধনুর্ব্বাণাদি দিয়া সাজান হইল।

শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

নির্ব্বাসন

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

"ওরে মাঝি—এই মাঝি—এই মাঝি—থামাও থামাও, —নৌকা থামাও—," দুই হাত তুলিয়া মানব উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে লাগিল,—'ফেলে গেলি, ফেলে গেলি রে মাঝি—"

মাঝি শুনিল না। দুগ্ধশুভ্র পাল বাতাসে ফুলাইয়া তীর বেগে নৌকা রক্তদহের বিলের ওপারে বক্সীগঞ্জের বাঁকে মিলাইয়া গেল। দূর হইতে অস্পষ্ট বিকট হরিধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল—,—"বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি—"

একা—একেবারে একা! ভীতনেত্রে মানব চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, সহসা কোথা হইতে এক ঘোর কৃষ্ণ যবনিকা দুলিতে দুলিতে ছুটিয়া আসিল; পলক ফেলিতে না ফেলিতে ঘন অন্ধকাররাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া প্রবলবেগে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। একটা আর্ত্তনাদ করিয়া মানব সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিল।...দূরে—দূরে—দূরে,—আরও দূরে,—শেষে এক অন্ধকার মহাসমুদ্র! কুয়াসাচ্ছন্ন, বরফের মত ঠাণ্ডা! সেই কুজ্ঝটিকাময় মহাশূন্যে মানব লক্ষ্যহারার মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।...চারিদিক হইতে যেন একটা চাপা কান্না উঠিতেছে,—বুক ঠেলিয়া ঠেলিয়াও কান্না উঠিতে লাগিল।—কোথায় গেল সেই দেশ? কোথায় গেল সেই মাটি? ওগো কোথায়—কোথায় গেল সেই তাহারা সব? আর কি তাহাদের কাছে ফিরিয়া যাওয়া যায় না? কোন মতেই না?...কে বুঝি কাঁদে!...কে বুঝি চীৎকার করিয়া কাঁদে, "কোথায় তুমি, কতদূরে তুমি গো—"।...পাগলের মত মানব চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সহসা আর এক প্রবলতর স্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।...

... ...

পৃথিবী—পৃথিবী—পৃথিবী,—আবার সেই সোনার পৃথিবীর,—সোনার আলোর, আনন্দের!—মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় মর্ত্ত্যের দুয়ার খুলিয়া গেল। দলে দলে কায়াহীন প্রবাসীরা নিঃশব্দ কোলাহলে ধরণীর জ্যোৎস্নালোকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল।

বাতাসের আগে মানব ছুটিয়া চলিল।—এতক্ষণে উহারা বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, না? না না, ঘুমাইবে কেন, কান্নার শব্দ শুনিলাম যে, কাঁদিতেছে নিশ্চয়। আমাকে হারাইয়া বড় ব্যথা পাইয়া কাঁদিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝি!

সারাটা বাড়ী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। চারিদিকে কেমন একটা অলক্ষুণে ভাব। মানব চুপি চুপি আপনার শয়ন-কক্ষে ঢুকিল।

ঘরটা যেন খালি। খালি তক্তাপোষ, বিছানা নাই, জানালা দিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া ব্যঙ্গ করিতেছে।

কিন্তু সে কোথায় গেল? মানব খুঁজিতে লাগিল।—ওই যে, ওই তো! আহা আহা আহা, এক গাছি ম্লান বকুলমালা ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। থান কাপড় পরা, চোখ মুখ কালি হইয়া গিয়াছে দুই গালে অশ্রুবিন্দু। ঘুমাইতেছে,—না না, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিতেছে,. দেখিতেছ না কেমন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে।

বুকটার মধ্যে হায় হায় করিয়া উঠে।—তুমি তোমার বুক ভরা প্রেম দিয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিলে না কেন গো, কেন আমাকে যাইতে দিলে! তুমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলে কেহ কি আমাকে লইয়া যাইতে পারিত!··নিঃশ্বাস ফেলিয়া মানব বধূর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।—এখন বড় কষ্ট পাইতেছে ও, না? এই কচি বয়সে এত দুঃখ

কেমন করিয়া সহিবে?—স্পর্শে স্নেহ ঢালিয়া মানব বধুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

সহসা বধূ চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। একবার বিহ্বল চোখে চারিদিকে চাহিয়া খোলা জানালায় বাহিরের দিকে তাকাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"কোথায় গেলে, কোথায় গেলে গো তুমি,—ওগো আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কোথায় গেলে—"

মানব চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।—এ দুঃখ তো আর দেখা যায় না!! ওঃ, মুহূর্ত্তের জন্য যদি পূর্ব্বদেহ পাওয়া যাইত, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলা যাইত, আমি যাই নাই, তোমারই জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি—

মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বধূ কাঁদিতেছে,—"তুমি এসো, তুমি এসো,—আর যে আমি পারি না গো, আর যে আমি স'হতে পারি না! আমাকে এত ভালবাসতে তুমি, আজ কি তুমি তা' ভুলে গেলে গো? এসো এসো—"

...হইতে কি পারে না,...সূক্ষ্ম শরীর কি আর ঘনীভূত হইতে পারে না?...ইচ্ছা যদি করা যায়...তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে...তবে...আর একটু...আর একটু...আ-র...এ-ক-টু...

ঠক্।

শব্দ হইতেই বধূ মুখ তুলিয়া চাহিল,—সম্মুখে অস্পষ্ট ছায়ার মত মানব দাঁড়াইয়া। কিন্তু বধূ হাসিল না তো! কেমন করিয়া যেন চাহিয়া আছে! বিশ্বাস হইতেছে না বুঝি? ও কি ওকি, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে,—ভয় কিসের; ছিঃ! মৃদু হাসিয়া সস্নেহে দুই হাত বাড়াইয়া মানব বধূর দিকে অগ্রসর হইল।—তোমাকে ছাড়িয়া কি আমি থাকিতে পারি গো,—তোমার কান্নাতেই তো ছুটিয়া আসিয়াছি আমি।..

চীৎকার করিয়া বধূ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

—ও বৌ, বৌ—

—ও মা, আবার কি হ'লো ছাখো এসে গো—

—জল নিয়ে এসো—জল, পাখা নিয়ে এসো,—এঃ একেবারে দাঁতি লেগে গেছে যে—

ওধারে ঘরের পিছনের বাগানে মানব অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—কি করা যায়, কি করা যায়, কি করা যায়—।...

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্লান্ত বধূ গোঙাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিয়া থামিয়া গেল। বাড়ীর সকলে যে যেখানে পারিল আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

আবার নিস্তব্ধতা। প্রলোভন সামলান বড় দায়। মানব আবার চুপি চুপি ঘরে ঢুকিল।

ওই কুঠরিতে খালি চৌকিটার উপর কে পড়িয়া?—ও, মা। মা মা, আশী বছরের বুড়ী মা, পুত্রশোকে মন তাহার নিশ্চয় ভাঙিয়া গিয়াছে। তুমি আমাকে কেন ধরিয়া রাখিলে না মা? তোমার আশী বছরের স্নেহের বন্ধনে আমাকে তোমার বুকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে না কেন? তুমি দুর্ব্বল, অক্ষম, অসহায়,—তোমার দিকে যে চাহিতে পারি না মা গো!

"মা!"

বৃদ্ধা চমকিয়া চোখ মেলিলেন। নড়'-চড়া করিবার শক্তি নাই, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন।

আহা আহা, কেমন অসহায়ের মত তাকান!—মানব আবার ডাকিল,—"মা, মাগো—"

চোখ রগড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে বৃদ্ধা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। চোখে মুখে সন্দেহের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

গলা দিয়া একটা চাপা শব্দ বাহির হইতেছে। মানব আবেগের সহিত ডাকিল,—"মা, মাগো, আমার মা—"

বৃদ্ধা আবার চারিদিকে চাহিলেন। কিন্তু আনন্দ দূরে থাকুক ভয়ে তাঁহার শরীর আড়ষ্ট হইয়া গেল। চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ—"।

পিঠে যেন এক সঙ্গে দশ ঘা চাবুক মারিয়াছে। ব্যথাহত মানব তাড়াতাড়ি মার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল—তুমিও, তুমিও আমাকে চাও না মা!

এখন! এখন আর তবে কি! নতমুখে ছল ছল চোখে মানব উঠানে নামিয়া আসিল।

কিন্তু, ও হ্যাঁ, খোকাটা,—খোকাটাকে দেখা হইল না তো! ঠিক।...

আবার মানব ঘরে ঢুকিল। পা কাঁপিতেছে, কিন্তু খোকাটাকে না দেখিয়া যাওয়া হইবে না।

বধূর ঘরের খোলা দরজার পাশে এই কুঠরিতে খোকা ঘুমাইতেছে। কাছে ঘুমাইতেছে ও কে? খোকার মাসী বুঝি। আগে হইলে কত হাস্য পরিহাস করিত. কিন্তু এখন! ...থাক্। এ পাশ হইতে খোকাটাকে একটু দেখিয়া যাই।

মাথার কাছে একটা ছোট্ট বালিশ, দুই পাশে ছোট্ট কোল বালিশ দুইটা, তাহার উপরে একটা অয়েলক্লথ। আহা, একটা কাঁথাও দেয় নাইরে, খালি অয়েলক্লথে ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে! ...কিন্তু থাক্।

খোকা ঘুমাইতেছে। ছোট্ট বুকখানা ঘন ঘন উঠিতেছে পড়িতেছে, পরম নিশ্চিন্তে খোকা ঘুমাইতেছে।...দেখ দেখ, এক একবার ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদে, আবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে!—ভারী দুষ্টু হইবে ছেলেটা, না?

খোকার সারা গায়ে মানব স্নেহদৃষ্টি বুলাইয়া দিতে লাগিল।—পায়ের তলা দুইটা কেমন লাল টুকটুকে! হাত-পা গুলি গোদা গোদা, গাল দুইটা ফুলা ফুলা, পাতলা পাতলা ঠোঁট, নাকটা বোঁচা, কপালটা উঁচু—ভারী ইচ্ছা করে কপালে একটা চুমা খাইতে!—খাইবে? একটা—একটা মাত্র—খুব আস্তে আস্তে!...

...মুখ নীচু করিয়াই মানব চমকিয়া উঠিল,—খোকার কপালে একটা কালির ফোঁটা!!!...

...ওঃ! বুকের উপরে কে যেন প্রচণ্ড হাতুড়ির ঘা মারিল,—চাহেনা, চাহেনা, কেহ আর তাহাকে চাহে না! উত্তেজনায় উত্তেজনায় মানব থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল...

...খোকাটা হাসিতেছে। রকম সকম দেখিয়া দুষ্টু খোকাটা আবার হাসিতেছে!—প্রাণের মধ্যে কিসের স্রোত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে? না না, আর তো পারা যায় না,—দুর্নিবার লোভ, দুরতিক্রম্য আকর্ষণ...

...খোকার পাতলা ঠোঁট দুইটার উপর সবলে এক চুমা দিয়া ঝড়ের মত মানব ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল।...

...ছুট্ ছুট্ ছুট্—মানব প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। খোকাটা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বধূর মর্ম্ম-ছেঁড়া আর্ত্তনাদ কানে আসিতেছে—"কোথায় গেলে, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে নিষ্ঠুর—"

...ছুট্ ছুট্ ছুট্—কে যেন পিছন হইতে তাড়া করিয়া আসিতেছে,—ছুট্ ছুট্ ছুট্—। ছুটিতে ছুটিতে আবার সেই বক্সীগঞ্জের বাঁকে।...

...সম্মুখে পাণ্ডুবর্ণ দিগন্তবিসারী রক্তদহের বিল, পশ্চাতে স্বর্ণডালা স্বপ্নঢালা সুন্দর পৃথিবী। চাহিয়া চাহিয়া চোখ জলে ভরিয়া গেল।—

...বিদায়, বিদায়, সোনার পৃথিবী বিদায়! তোমার এই হাসিকান্নার হীরাপান্নার বিচিত্র লীলা-উৎসব হইতে আজ আমি বিদায় লইলাম। আমার মাটির মা গো! আদিহীন অন্তহীন লক্ষ্যহীন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার কোলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, আদরে তুমি বুকে টানিয়া লইয়াছিলে; স্নেহে প্রেমে মমতায় তুমিই দিয়াছিলে আমাকে প্রাণ, আজ তুমিই তাহা অস্বীকার করিলে, তাই নিষ্প্রাণ আমি আবার অনন্তের পথে ভাসিয়া চলিলাম।...বিদায়, বিদায়, হে জ্যোৎস্নাস্নাত ধরণীর মুগ্ধ নরনারি! বিদায়, বিদায়, হে প্রাণবান পরিপূর্ণ পত্র পুষ্পলতা! তোমরা সুখে হাসিয়ো, তোমরা সুখে কাঁদিয়ো, তোমরা সুখে ভালবাসিয়ো,—তোমাদের সহিত আনন্দ করা আজ আমার শেষ হইল! বিদায়, বিদায়—

জ্যোৎস্না পাতলা হইয়া ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছিল—রক্তদহের বিলের উপর দিয়া দমকা হাওয়াটা হাহাকার করিয়া ছুটিয়া গেল।

প্রমোদরঞ্জন সেন

চিচিং ফাঁক

শ্রীতারাপদ মুখটী

বাক্সবন্দী সঞ্চিত ধন ফাঁক করিয়াছে চোরে ;
শিরে কর হানি' কুসীদজীবী চেঁচায়ে উঠিল ভোরে।
জীবনের রুজি—বন্ধকী খত, কবালার কবুলতি,
তমস্সুক ও রেহানী হুণ্ডী, তাড়াবাঁধা শত নথি ;—
যতনে গোছানো একধারে ঠাঁসা লহনার মুচলেখা,
তামাদি তারিখ লোহিত আখরে যা'র'পরে যেতো দেখা,—
রাতারাতি কেউ স্বপনের মতো করি' গেছে রাহাজানি !
খাতক পাড়ায় বেঁধেছে জটলা,—চাপাহাসি কানাকানি।
কত রাত তা'র হয়েছে কাবার সুখের অঙ্ক ক'যে ;
যখের মতন দৈবী রতন রয়েছে আগুলি' ব'সে !
হীরা জহরৎ, জড়োয়া গয়না, মণি মুকুতার মালা,—
বিলাতো নয়নে সুখের আমেজ খুলিলে পেঁট্রা-ডালা।
থাকে থাকে ছিল আন্‌কোরা নোট—পড়ে নাই মসীদাগ,
থোক্ দেয়া রোক্ টাকা রেজগীর বিবিধ সাজোনো ভাগ—
দেখে মনে হ'ত কুবেরের পুরী বাঁধিয়া রেখেছে ঘরে
লৌহ প্রাচীর, সজাগ সান্ত্রী প্রহরী ছিল যে গড়ে।

কত মহাজনী বোঝাই কিস্তি বাঁধা ছিল তা'র ঘাটে,
উৎখাত করি' কত জমিজমা ডাকিয়া নিয়াছে লাটে !
নারীর এয়োতি, পোয়াতীর নথ, বিধবার পতি-চিন
সিঁদুর মাখানো সিন্ধুকে তা'র একসাথে ছিল লীন।
বহু বাড়া-ভাত ছোঁয় নাই হাত তাহার ঋণের তাঁবে ;
জানিত সবাই কবলে পাইলে সব ভিটেমাটি যাবে।
কপিকল সম পাইলে নাগাল বারেক কুয়োর জল
চক্রবৃদ্ধির বালতি ভরিয়া শুষিত অতল তল।
বুদ্ধি তাহার অতি খরধার, নজর তীক্ষ্ণ ভারি !
ধোঁকা যে দিয়াছে, কেড়ে নেছে তা'র সাত পুরুষের বাড়ী।
বিনা অছিলায় দা'ন-খয়রাৎ, অহেতুকী কৃপা, ধার—
ছিল না এ'সব মুফৎ হরফ অভিধানে লেখা তা'র।
যে-হাতে লুটিয়া করেছে ফলার পরের বিষয় বিত্তে,
তা'রি হাতছানি ফেলিয়াছে চার চোরের লোলুপ চিত্তে।
পাষাণে খোঁদানো বিধির ঈষিকা অতি চারু পরিপাটি,
রিপুর রন্ধ্র রিফু করিবারে গড়িয়াছে সিঁধকাঠি।
খোয়ায়েছে সব, সেজেছে ভিখারী, তাতে তা'র দুখ নাই ;
বাক্স খুলিয়া বিস্ময় মানে আহা ! কী হাত সাফাই !

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করবার সময়ে পরলোকগত'র গোত্র জানবার প্রয়োজন হ'ল। অমরেশ পারুলকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের কি গোত্র?"

পারুল বললে, "তা ত জানিনে।"

"আপনারা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?"

"ব্রাহ্মণ।"

"আপনার বাবার উপাধি কি? চাটুযো, বাঁড়ুযো, লাহিড়ী, ভাদুড়ী—এই সব উপাধির কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

পারুলের মুখে বিমূঢ়তার ছায়া সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল; ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে বললে, "আমি যখন খুব ছোট, তখন বাবার মৃত্যু হয়,— উপাধির কথা ঠিক বলতে পারিনে।"

"বুঝেছি।" ব'লে শ্মশান-পুরোহিতকে সম্বোধন ক'রে অমরেশ বললে, "যথাগোত্র ব'লে কাজ সারুন।"

দাহকার্য্য সমাপন হ'লে অমরেশ পারুলকে কুশাবর্ত্ত ঘাটে নিয়ে গিয়ে যখন গঙ্গায় মাতার অস্থি উৎসর্গ করালে তখন অপরাহ্ণ কাল। দাহকারী স্বেচ্ছাসেবকেরা শ্মশান হ'তেই নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেছিল। কুশাবর্ত্ত ঘাটের কার্য্যাবসানে পুরোহিতও পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পর বিদায় গ্রহণ করলে।

উদাস নিষ্পলক নেত্রে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে পারুল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে অচিন্তিতভাবে যে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘ'টে গেল তার আকস্মিকতা এবং নিদারুণতার আঘাতে ক্রমশ যেন দেহ এবং মনের সমস্ত অনুভূতি স্তম্ভিত হ'য়ে এসেছিল। এমন কি, বর্ত্তমান জীবনের সঙ্কট এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা পর্য্যন্ত তার অক্রিয় চিত্ত-পটে চিন্তার মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে পারছিল না। অবিলম্বেই কিন্তু মনটা অনেকখানি সাড়া দিলে অমরেশের এক প্রশ্নের তাড়নায়।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এবার আপনার কি ব্যবস্থা করব বলুন? এখান থেকে আপনি কোথায় যেতে চান?"

উৎকণ্ঠায় পারুলের মুখ মলিন হ'য়ে উঠল; বললে, "সেই কথাই মনে মনে ভাবছিলাম। আমার ত এখানে কেউ নেই।"

অমরেশ বললে, "হরিদ্বারের কথা ঠিক জিজ্ঞাসা করছিনে, এখানকার এক-আধ দিনের যা-হয় একটা ব্যবস্থা হ'য়েই যাবে। কিন্তু তারপর কোথায় যাবেন? কলকাতায়?"

"হ্যাঁ, কলকাতায়ই।"

"সেখানেই আপনাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিকানা কি?"

পারুলের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; একটু ইতস্তত:ভাবে বললে, "গরাণহাটা ষ্ট্রীট, গাইয়ে বিনির বাড়ি।" তারপর কলিকাতার গৃহ সম্বন্ধে উক্তিটা যথোচিত সংশোধিত করবার অভিপ্রায়ে বললে, "সমস্ত বাড়িটা কিন্তু আমাদের নয়, শুধু দুখানা কামরা আমাদের ভাড়ায় আছে।"

সে কথায় কোনো মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে অমরেশ বললে, "আপনার মার কাজ ক'রে আপনার তৃপ্তি হয়েছে ত?"

কৃতজ্ঞতায় পারুলের দুই চক্ষু ছলছল করতে লাগল; কম্পিতকণ্ঠে বললে, "মার পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যি ছিল, তাই আপনার হাতে তার কাজ শেষ হ'ল!"

অমরেশ বললে, "আচ্ছা চলুন, এবার আমরা ভূমানন্দ-

জীর আশ্রমে যাই, তিনি নিশ্চয় আমাদের জন্তে চিন্তিত হ'য়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে পরামর্শ করলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

পথ চলতে চলতে কথোপকথনের মধ্যে পারুল এক সময়ে অনুনয়ের কণ্ঠে বললে, "আপনি কিন্তু আমাকে আপনি বলে ডাকবেন না।"

পারুলের প্রতি সহজ শান্ত দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে অমরেশ বললে, "তবে কি ব'লে ডাকব?—তুমি ব'লে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তাই না হয় বলব। বয়সের এতখানি তফাৎ, তুমিইত বলা উচিত। তবে হঠাৎ কাউকে তুমি বলতে সাহস হয় না, পাছে কেউ ভুল ক'রে সেটা অনাদরের লক্ষণ মনে করে।"

পারুল এ কথার কোনও উত্তর দিলে না। একটা অস্বস্তিকর চিন্তা মনের মধ্যে উৎপন্ন হ'য়ে তখন তাকে অতিশয় কষ্ট দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে তার প্রতি অমরেশের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং সদয় ব্যবহার, এর ভিত্তি যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল; এর সমস্তটাই হয়ত তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হ'ত যদি না তার প্রকৃত পরিচয় অমরেশের কাছে অবিদিত থাকত; এ যেন চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা অমরেশের প্রসাদ লাভ করা!

এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হ'তে মুক্তিলাভের জন্য মনে মনে বদ্ধপরিকর হয়ে সে বললে, "দেখুন, আপনি যদি আমার আসল পরিচয় জানতেন তা হ'লে হয়ত আমি আপনার কাছ থেকে এতটা দয়া পেতাম না!"

অমরেশ বললে, "দয়ার কথাটা না হয় পরে হবে, কিন্তু যদি আপত্তি না থাকে ত তোমার আসল পরিচয়টা কি বল শুনি?"

আরক্তমুখে স্খলিত কণ্ঠে পারুল বললে, "আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে নই, আমি বেশ্যা!"

শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বললে "আচ্ছা, জানলামই না-হয় তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে নও, তুমি বেশ্যা। কিন্তু বেশ্যা বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ব'লে মনে করিনে, এত বড় দুর্ব্বৃত্ত আমি, তা তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পারুল নিঃশব্দে অমরেশের পাশে পাশে পথ চলতে লাগল। এত বড় কথার সমীচীন উত্তর কেমন করে কোন্ কথা উচ্চারিত ক'রে দিতে হয় তা ই হয়ত সে জানে না; কিন্তু এ কথা শোনার পর তাকে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে যে উদ্গত অশ্রু তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে হ'ল তা যে শুধু মাতৃবিয়োগের শোকেই নিঃসৃত হয়নি, তা বুঝতেও অমরেশের বিলম্ব হল না। কিন্তু যে বেশ্যা-প্রসঙ্গের অবকাশে কৃতজ্ঞতা অনুভবের এই অভি-ব্যক্তিটি পরিস্ফুট হ'ল, হাস্য-কৌতুকের কৌশলে তার অনতিবর্ত্তনীয় বেদনাটুকু অপসারিত করবার জন্য অমরেশের দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ উদ্যত হয়ে উঠল।

"পারুল!"

সকৌতূহলে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পারুল বললে, "আজ্ঞে?"

"তুমি গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য মানো; অর্থাৎ, গঙ্গার জলে স্নান করলে, বিশেষতঃ হরিদ্বারের মতো হিন্দুদের মহা-তীর্থ স্থলে গঙ্গাস্নান করলে, আমাদের সব পাপ তাপ ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে যায়, এ কথা স্বীকার কর?"

একটুখানি মনে মনে কি চিন্তা করে পারুল বললে, "করি।"

"কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। বেশ্যাবৃত্তিকে পাপ মনে করো তুমি?"

এবারও পারুল একই উত্তর দিলে; বললে, "করি।"

মৃদুস্মিত মুখে অমরেশ বললে, "বেশ কথা। তা হ'লে তুমি যে এই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আর কুশাবর্ত্ত ঘাটে দুবার গঙ্গাস্নান করলে তাতে তোমার সে পাপ নিশ্চয়ই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ত?"

পারুল একবার অপাঙ্গে অমরেশের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "কিন্তু আমার যে পাপ অনেক!"

অমরেশ উচ্চস্বরে হেসে উঠল; বললে, "অর্থাৎ কি-না তুমি বলতে চাইছ যে গঙ্গাজল এমন কিছু জোরালো জিনিস নয় যাতে সমস্তটা পাপ ধুয়ে যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা কি তা জান? আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে গঙ্গাজলের যে রকম গুণকীর্তন

আছে তা যদি সত্যি হয় তা হ'লে পাহাড় সমান পাপও তাতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে যাবার কথা। কিন্তু সে সব গুণকীর্ত্তন যদি মিথ্যে হয় তা হ'লে এক বিন্দুও ধুয়ে যাবার কথা নয়। এখন তোমার কি মনে হয় তা বল। গঙ্গাজলে মাহাত্ম্য আছে ? না নেই ?"

পারুলের মুখে ক্ষীণ হাস্যপ্রভা স্ফুরিত হ'ল ; বললে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা যদি থাকে, তা হ'লে হিন্দু-ধর্ম্ম মতে তুমি একেবারে নিষ্পাপ ; বেশ্যা ব'লে সঙ্কুচিত হবার কোনো কারণ নেই তোমার। পণ্ডিতেরা সকলেই শিশু অবস্থায় মূর্খ থাকে ; তাই ব'লে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হওয়ার পর আর তাদের মূর্খ বলা চলে না।" ব'লে অমরেশ হাসতে লাগল।

পথটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্য অমরেশ এবং পারুল মাঠের উপর দিয়ে পাকদণ্ডী (পায়ে হাঁটা পথ) অবলম্বন ক'রে চলেছিল, সাধারণ পথের নিকটবর্ত্তী হয়ে তারা দেখলে অদূরে অসীমানন্দ স্বামী তাদের দিকেই আসছেন।

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে অসীমানন্দ বললেন, "তোমাদের বিলম্ব দেখে চিন্তিত হ'য়ে ঘাটের দিকে চলেছিলাম। দু-জনের শরীর বেশ সুস্থ আছে ত ?"

অমরেশ বললে, "তা আছে মহারাজ, কিন্তু দেশে পাঠাবার আগে এ মেয়েটির থাকবার ব্যবস্থা কি করা যায় ? এই সদ্য শোকের অবস্থায় সাধারণ জেনানা ওয়ার্ডে না রাখতে পারলেই ভাল হয়।"

অসীমানন্দ বললেন, "আচ্ছা, সে বিষয়ে সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করা বোধ হয় বিশেষ কঠিন হবে না। তোমরা উভয়ে আমার আশ্রমে যাও, সেখানে তোমাদের পানাহারের ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। গঙ্গাদিত্য তোমাদের সেবার জন্য অপেক্ষা করছে। পরিশ্রম হয়েছে, আহারান্তে একটু বিশ্রাম কোরো। সন্ধ্যার পরই আমি উপস্থিত হব, তারপর প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা হবে।"

অসীমানন্দর আশ্রমের দিকে অগ্রসর হ'য়ে পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি স্বামীজীর আশ্রমেই থাকেন ?"

"না, আমার বাসা স্বতন্ত্র।"

"সেখানে কি আমার একটু স্থান হয় না ? অন্ততঃ আজ রাত্রে শুয়ে থাকবার মতো ?"

লোকালয় হ'তে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গৃহের সামান্য একটু অংশ নিয়ে প্রায় মাসাবধি অমরেশ হরিদ্বারে বাস করছে। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কৌতূহল নিবারণের জন্য সাধুসঙ্গ করা তার উদ্দেশ্য। বাসায় তার অংশে মাত্র দুইখানি ঘর, তার মধ্যে একটিই শয়নের উপযুক্ত। সেখানে পারুলের বাসের ব্যবস্থা সমীচীন এবং সুবিধাজনক হবে কি-না ভাবতে ভাবতে অমরেশ বললে, "আচ্ছা, স্বামীজী আসুন, তারপর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা যা-হয় ব্যবস্থা করলেই হবে।"

সন্ধ্যার পর কিন্তু কথাটা যখন অসীমানন্দর কাছে উঠল, তিনি পারুলের প্রস্তাবই অনুমোদিত করলেন ; বললেন, "সেই কথাই ভাল। যদি অসুবিধা হয় অমর না হয় আমার এখানে এসে শুয়ো।"

স্থির হ'ল বিজয়লাল এবং ভজুয়ার সঠিক সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত পারুল হরিদ্বারে অবস্থান করবে, এবং তাদের কোনো প্রকার সন্ধানের অভাবে অপর কোনো ব্যবস্থা সম্ভব না হ'লে ৩০শে চৈত্র কুম্ভের প্রধান স্নান হ'য়ে যাওয়ার পর সে অমরেশের সহিত কলিকাতায় ফিরে যাবে। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অমর পৃথিবী

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

একটা কথা তোমরা সবাই মনে রেখ—রেখ—
এই পৃথিবীর বয়েস কোন নাই,
বয়েস সে যে তোমার আমার নবা এবং **গবার**
মহেশ খুড়োর ক্ষ্যান্ত মাসির ভাই।
তোমার আমার মহেশ খুড়োর দন্ত নড়ে পড়ে,
চুলের গোছা শুক্ল হ'য়ে শিথিল হ'য়ে ঝরে,
দেহের যত রোমের কূপে মৃত্যু বাসা গড়ে,
ভোরোনফের সাধ্য নাই—নাই—
সেই মরণে ঠেকিয়ে রাখে চিরকালের তরে
ওরাংওটাং-গ্রন্থিরসে ভাই।

এই পৃথিবীর বয়েস নাহি দুঃখ নাহি কোন
তোমার আমার মহেশ খুড়োর মত,
তাহার হাসি তাহার গানে ক্লান্তি নাহি জানে
শান্তি তাহার নয় রে জীবন-ব্রত।
মান্ধাতা সে কোথায় কবে ছিলেন রাজা হয়ে,
সেই থেকে এ পৃথিবীটা আসছে ব'য়ে ব'য়ে
ইতিহাসের নব নব বোঝার বোঝা স'য়ে,
বক্ষ তাহার হয়নি আজও নত,
গোপন তাহার মর্মতলে চলে সহজ হ'য়ে
প্রাণের ধ্বনি তেমনি অনাহত।

এই পৃথিবীর বয়েস নাহি জরা মরণ নাহি
ওরাংওটাং-গ্ল্যাণ্ডে দেহ ঠাসা,
বুকের তাহার রসের ধারা হয় না কভু বাসি
অনাদ্যন্ত প্রাণটা চির ডাঁসা।
ফিরে ফিরে তাইতে শরৎ বাজায় মধু বাঁশি,
বারে বারে ফাগুন আনে ফুলের হাসি রাশি,
নবীন মেঘের বুকে বাজে পৌনঃপুনিক ফাঁশি
চাতক চাতকিনীর মধু আশা,—
মোদের শরৎ কেবল ওঠে একটি ঋতু হাসি,
এক ফাগুনেই ক্লান্ত প্রাণের ভাষা।

তোমার আমার মহেশ খুড়োর বিদায়-পালা আসে
পৃথ্বী তবু শূন্য নাহি থাকে,
মহেশ খুড়োর ক্ষ্যান্ত মাসির যাবার সাথে সাথে
রমেন রমা দাঁড়িয়ে পথের বাঁকে;
রমেন রমা রণেন্ রাণু শূন্য আসন' পরে
আবার এসে দাঁড়ায় হেসে নবীন ওষ্ঠাধরে,
উজল দুটি চোখের তারা, নবীন বাঁশি করে
নবীন সুরে নবীন খেলা ডাকে,
মহেশ খুড়োর ক্ষ্যান্ত মাসির যখন প্রাণের ঘরে
মৃত্যু শুধু "জলদি, চল" হাঁকে!

তেমনি ক'রে আবার হাসে এই ধরাটা পুন
যেমন ক'রে সেদিন হেসেছিল
যেদিন শুভা বিভার চোখে উজল আলো হেরে
তোমার আমার প্রাণটা ভেসেছিল ;
এই পৃথিবী আবার হাসে আবার মেতে ওঠে,
বিদায়ীদের তরে কোথাও দুঃখ নাহি মোটে,
আবার নব নবীন-নবীনাদের চোখে ঠোঁটে
আলোক লাগে—যেমন লেগেছিল
তোমার আমার চোখে ঠোঁটে—তেমনি পুন ফোটে
গোলাপ যূথী যেমন ফুটেছিল।

তেমনি মধুরতম-তম আবার কোকিল ডাকে
যেমন ক'রে ডেকেছিল আগে,
বকুল বেলা অশোক চাঁপা আবার ওঠে ফুটে
পৃথিবীটার নবীন অনুরাগে :
তেমনি মধুর তেমনি সহজ জ্যোৎস্না-নিশি হাসে,
তেমনি লঘু মেঘের ভেলা আকাশ-গাঙে ভাসে,
তেমনি নবীন চোখে চোখে গোপন কথা আসে
নবীন মধু নবীন হিয়া ভাগে—
তোমার আমার মহেশ খুড়োর দারুণ হুতাশ্বাসে
কোথাও কোন অশ্রু নাহি জাগে।

তেমনি ক'রে মৌমাছিরা বেড়ায় দলে দলে
ফাগুন মাসে আমের বনে বনে
খঞ্জনেরা পুচ্ছ নাচায়, দোয়েল-শিসে-শিসে
পুলক লাগে তেমনি অকারণে ;
খুশির স্রোতে তরুণ যত আবার গানে মাতে,
সরম-ছায়া আবার লাগে আঁখির পাতে পাতে
তরুণীদের, আবার তারা মোহন মালা গাঁথে
বাদল-বাতে গোপন মনে মনে,
নবীন আশা নবীন ভাষা স্বপন সাথে সাথে
পুলক আনে আবার ক্ষণে ক্ষণে।

এই কথাটা তোমরা সবাই মনে রেখ—রেখ—
এই পৃথিবীর বয়েস কোন নাই,
বয়েস সে যে তোমার আমার নবা এবং গবার
মহেশ খুড়োর ক্ষ্যান্ত মাসির ভাই।
তোমার আমার মহেশ খুড়োর দন্ত নড়ে পড়ে,
চুলের গোছা শুভ্র হ'য়ে শিথিল হ'য়ে ঝরে—
পৃথিবীটার মর্ম্মতলে আবার কে যে গড়ে
নবীন আশা নবীন ভাষার ঠাঁই—
তোমার আমার সাঙ্গ শুধু—এবার খেলাঘরে
সঙ্গে কভু নাই রে নাই—নাই !

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক অনুষ্ঠিত

পঞ্চম অধিবেশন

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমরা যে পত্র পেয়েছি সাধারণের অবগতির জন্য তার সারাংশ নিম্নে মুদ্রিত করলাম।

'আগামী মহরম ও গুডফ্রাইডের অবকাশে (২৪শে মার্চ্চ বুধবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা সভাপতিগণের নাম নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত।

(খ) বিজ্ঞান শাখা— " শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায়।

(গ) শিশু-সাহিত্য— " শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

(ঘ) মহিলা শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

প্রবন্ধ দি তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে ১৪ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

তালতলা পাবলিক্ লাইব্রেরী মন্দিরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮৷৷০ ঘটিকার মধ্যে শুভাগমন করিলে, সাহিত্য সম্মিলনের সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ন্যূনপক্ষে দুই টাকা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা দুই টাকা চাঁদা তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ২০শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।"

ডক্টর মরিস্ উইন্টারনিট্জ্

প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক মরিস্ উইন্টারনিট্জের মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি ভিন্ন ভারতবর্ষে অপর কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতের খ্যাতি অধ্যাপক উইন্টারনিটজের চেয়ে অধিক ছিল না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তাঁর ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করার সময়ে অধ্যাপক উইন্টারনিটজের বিশেষ ভাবে সহায়তা গ্রহণ করেন, এবং অধ্যাপক উইন্টারনিটজ এই কার্য্যের অবসরে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করবার প্রচুর সুযোগ লাভ করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধ্যাপক মহাশয়ের সম্পর্ক প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে, যখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ধারাবাহিক অভিভাষণ প্রদানের জন্য একজন রীডার নিযুক্ত হন। Geschichte der indischen Literature নামক গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডের ইংরাজি অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় তৃতীয় খণ্ডেরও অনুবাদ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে। তিনি ১৮৮৭ সালে

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র ও ১৮৯৭ সালে আপস্তম্বীয় মন্ত্রপাঠ সম্পাদিত করেন। এই দুইখানি গ্রন্থেও তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গবেষণা এবং পরিশ্রম অধ্যাপক মরিস্ উইন্টারনিটজকে ভারতবর্ষীয়ের নিকট চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে।

কুমারী জাহান-আরা বেগম চৌধুরী

এবার লক্ষ্ণৌতে 'যুক্ত প্রাদেশিক শিল্প প্রদর্শনী" নামক যে ভারত বিখ্যাত প্রদর্শনী হয়েছিল তার চারু কলা-বিভাগে [কুমা]রী জাহান-আরা বেগম চৌধুরী সূচী-চিত্র ও অন্যান্য

কুমারী জাহান-আরা বেগম চৌ

সূচী-শিল্পে (Pictorial Embroidery & Needle work) প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেও বাংলা এবং বিহারের বহু প্রদর্শনীতে অনুরূপ গৌরব অর্জ্জন করেছেন। এই বাঙ্গালী মুসলিম কিশোরী বাংলার মহিলা-পরিচালিত একমাত্র বার্ষিকী বিখ্যাত "বর্ষ-বাণী"র সম্পাদিকারূপে ইতিমধ্যেই সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট যশস্বিনী হয়েছেন এবং লেখনী পরিচালনাতেও তিনি তাঁর সূচী-চালনার ন্যায়ই দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর

গত ১লা মাঘ পুলিস কোর্টের খ্যাতনামা অবসর প্রাপ্ত সরকারী উকিল রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি, আই, ই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৯ বৎসর হয়েছিল। তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের নিরবসর ব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ভোলানাথের ভুল, ঋণ-শোধ, মহামায়ার অবসান প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক তিনি রচিত ক'রে গেছেন।

বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা

ব্যায়াম সমিতি হ'তে প্রাপ্ত অনুষ্ঠানের বিবরণী আমরা নিম্নে মুদ্রিত করলাম।

"ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা গত আট দিন ব্যাপী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিনই ইহা দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হইত। এই প্রতিযোগিতা দেখিয়া মনে হয় বাঙ্গলায় সৌখিন কুস্তিগীরের স্তর অন্য কোন প্রদেশের তুলনায় কম নয়। এই প্রতিযোগিতা বাঙ্গালার কুস্তিগীরদিগের মধ্যে একটি সাড়া আনিয়া দিয়াছে। ৩১শে জানুয়ারী রবিবার মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র মুখার্জ্জী কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এই প্রতিযোগিতাটী উদ্বোধন করেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত কুস্তিগীর ক্ষেত্র গুহ মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত মনীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার বিচারকের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত দ্বীজেন্দ্রনাথ বাগচী রেফারীর কার্য্য করেন। দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় মেজর পি, কে, গুপ্ত ও ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র দাস বিচারকের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ভি, এন, গুইন,

শ্রীযুক্ত জে, কে, শীল, শ্রীযুক্ত পি. কে, ঘোষ ও শ্রীযুক্ত এন, আর মুখার্জ্জী সময় রক্ষকের কার্য্য করেন।

নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল দেওয়া হইল :—

৭ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

রাজকুমার মল্লিক (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি)।

বিজিত

মাধু দাস (ব্যায়াম সমিতি)।

৮ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

বলাইচন্দ্র দে (দর্জ্জিপাড়া তরুণ সঙ্ঘ)।

বিজিত

প্রভাস চ্যাটার্জ্জী (শাঁকারিটোলা মানিক বাবুর আখড়া।

৯ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

ঘনশ্যাম দাস (ব্যায়াম সমিতি)।

বিজিত

ভোলা হালদার (দর্জ্জিপাড়া তরুণ সঙ্ঘ)।

১০ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

অনিল বসু (ব্যায়াম সমিতি)।

বিজিত

সুধীর ঘোষ (গরিফা)।

১১ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

সুধীর সাহা (পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি)।

বিজিত

অমর ঘোষ (শাঁকারিটোলা মানিক বাবুর আখড়া)।

১২ ষ্টোন বিভাগ

বিজয়ী

ফণি বিশ্বাস (চাঁপাতলা ইয়ং জিঃ ক্লাব)।

হেভী বিভাগ

রঞ্জিৎ রায় চৌধুরী (আন্ এটাচ) মুরারি বসু (ব্যায়াম সমিতি)।

দৈহিক সৌন্দর্য্যে—বিজয়ী ঘনশ্যাম দাস (ব্যায়াম সমিতি)।

ক্লাব চ্যাম্পিয়ানসিপ—বিজয়ী—(ব্যায়াম সমিতি)।

বিজিতদিগের মধ্যে ভাল লড়ার দরুণ বিশেষ পুরস্কার :—

৭ ষ্টোন বিভাগে

সুনীল দত্ত (দর্জ্জিপাড়া তরুণ সঙ্ঘ)।

৮ ষ্টোন বিভাগে

নারায়ণ দত্ত (জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতি)।

৯ ষ্টোন বিভাগে

অভয় দাস প্রামাণিক (ব্যায়াম সমিতি)।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

Eight Portraits—First Series.

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিয়ো নামক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্লক প্রস্তুত-প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয় Eight Portraits নাম দিয়ে একটি আলেখ্য-পুস্তক প্রকাশিত করেছেন। গ্রন্থটিতে নিম্নলিখিত আট জন স্বনামধন্য ব্যক্তির আলেখ্য এবং সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আছে :—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, মদনমোহন মালব্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আলোচ্য গ্রন্থটি আলেখ্যগ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড, সুতরাং ক্রমশ-প্রকাশ্য পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পরিচয় সন্নিবেশিত হবে। শীঘ্রই এই পুস্তকটির অবিকল বাঙ্গলা সংস্করণ প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পুস্তকটির আকার বৃহৎ—১১½ ইঞ্চি × ৮¾ ইঞ্চি। অতিশয় পুরু আর্ট পেপারে আলেখ্য, এবং বহুমূল্য কার্ট্রিজ পেপারে আক্ষরিক অংশ মুদ্রিত হয়েছে। মূল্যবান রেক্সিনে এবং সোনার জলে বাঁধাই অতিশয় পরিপাটি। সমস্ত গ্রন্থটি আভিজাত্যের সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ। সে হিসাবে দুই টাকা, পুস্তকের মূল্য, যথোচিতই হয়েছে। আলেখ্যগুলি বৃহৎ এবং সুদৃশ্য।

কাজের লোক এবং সৌখীন সংগ্রাহক উভয়েরই নিকট গ্রন্থটি আদৃত হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Indubhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা, ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা চার আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য মায় ডাক মাশুল তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম দেশের বাহিরে বার্ষিক মূল্য দশ টাকা ও ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা। মূল্যাদি "সত্ত্বাধিকারী বিচিত্রা নিকেতন লিঃ"—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন। উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে নিষেধ-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কুপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয় জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত কবিতা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথবা এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতি স্থান-বিশেষে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'বর্জ্জাইস্'-অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ১ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ ⅛ পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ২৭৪৪

দশম বর্ষ, ৩য় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৪৩	২য় সংখ্যা

দুঃখের মূল্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

কলকাতায় থাকতে যেদিন তোমার চিঠি ও সাবান প্রভৃতি পেয়েছিলুম, সেই দিনই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম, কেন পাওনি কিছুই বুঝতে পারচিনে। তারপর শেষদিন পর্য্যন্ত আমার কাজের অন্ত ছিলনা। অবশেষে নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে এখানে পালিয়ে এসেচি।

জীবনে গুরুতর দুঃখের সঙ্গে আমার বার বার পরিচয় হয়েচে। দুঃখের কারণ যে কষ্ট দেয় তার থেকে পালাবার উপায় কারো হাতে নেই। কেবল এই আশা যে, সেই কষ্ট একেবারে ব্যর্থ হয় না। গাছের উপরে যে সূর্য্যের তাপ এসে পড়ে সেই তাপকে গাছ নিজের প্রাণভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে পারে। দুঃখও আমাদের ঐশ্বর্য্য হয়ে ওঠে যদি আমরা তাকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি। অবস্থার একান্ত দাস হয়ে পড়বে মানুষের এটা মনুষ্যত্ব নয়। তার আত্মা অবস্থাকে অতিক্রম করে জয়ী হবে এইটেই হচ্ছে মানুষের লক্ষণ। দুঃখ যখন আমাদের মারতে থাকে তখনো তাকে অস্বীকার করতে পারি এমন শক্তি আমাদের আছে। বস্তুত সেইটেই মানুষের বীরত্ব। ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য দিন, বল দিন, তোমার সকল দুঃখকে গভীর ভাবে সার্থকতা দিন, এই আমি কামনা করি।

দুর্গাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। বিশ্বের সকল অমৃত, সকল আরোগ্যের ভাণ্ডারী যিনি, মনে মনে তাঁর কোলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে দুর্গা যেন অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠার সহিত বার বার জপ করে বলতে পারে, আমার কোন রোগ নেই, কোন রোগ নেই।

তোমাদের তরল সাবান এখানে সকলেরই ভাল লেগেচে। গগন জানতে চেয়েছিলেন এ সাবান বাজারে বের করেচে কি? সেই বোতলটাও বেশ কাজের। রথী সেই রকম বোতল কিনতে চান।

ইতি ২৪শে ভাদ্র ১৩৩০।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

অর্হণা

বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি

আজি ফাল্গুনের শেষে ওগো কবি, অযুত-ফাল্গুনী,
তোমার আহ্বান-রব শুনি'
আমরা এসেছি তব শান্তরসাস্পদ তপোবনে,
শুনিব তোমার বাণী দিব্যকান্তি হেরিব নয়নে,
তোমার মহিম্ন স্তব বক্ষে বক্ষে ওঠে গুঞ্জরিয়া।
হে গাঙ্গ-প্রবাহ, তব গঙ্গোদক লব আহরিয়া
গাগরি ভরিয়া।
শ্রদ্ধানম্র শিরে তব পূত পদধূলি
লব মোরা তুলি।

তোমার অন্তরলক্ষ্মী বিশ্বভারতীয়া মূর্ত্তি ধরি
এ আশ্রম আছে পূর্ণ করি।
হেথায় ঢেলেছ তুমি অকৃপণ প্রাণ-ঋদ্ধি তব,
হিমাদ্রিশিখরে যথা জলদসম্ভার রাখে নভ
অমল তুষারপুঞ্জে ; সেথা হতে নির্ঝরিণী নামে
বিতরিয়া অবিরল পূত ধারা দক্ষিণে ও বামে
কভু নাহি থামে।
সে বদান্য প্রাণোল [illegible] ধারা
পায় যে সাহারা !

মোরা সেই মরুবাসী, পাই তব অজস্র কল্যাণ,
—প্রেম বিগলিত তব ধ্যান।
উৎসবে ব্যসনে দৈন্যে দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে
ভিক্ষাপাত্র লয়ে মোরা দানসত্রে দাঁড়াই নীরবে।

যে যা পারে লয়ে যায় অকুণ্ঠিত তোমার অর্পণা,
বর্ষে বর্ষে করি বটে হে কবি, তোমার সম্বর্দ্ধনা,
তোমার প্রেরণা
জাগে না নিথর বক্ষে, বহে না প্রবাহ,
—তুমি যাহা চাহ।

যে আদর্শ বক্ষে ধরি' প্রতিষ্ঠিলে শিক্ষা-আয়তন,
আরণ্যক যুগ প্রবর্ত্তন
চাহিয়াছ করিবারে এ উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে
যন্ত্রের যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিতে প্রাণবান্ নরে,
যে বিভূতি ধরা হতে তিলে তিলে শেষ হয়ে আসে,
যে নিখিল মৈত্রীমন্ত্র আশ্রমের আকাশে বাতাসে
নানা সুরে ভাসে,
—সে সম্পদ সে সঙ্গীত এ দুর্ভাগা দেশে
লুপ্ত হবে শেষে?

তোমার পতাকা মোরা পারিব না রাখিতে উড্ডীন,
সত্য কি আমরা এত হীন?
এ মহৎ প্রতিষ্ঠান প্রতীচ্যের নবতীর্থভূমি
রহিবে না কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়ি যবে চলি যাবে তুমি
আলোক-কুলায়ে তব? আমরা কি র'ব নিরুদ্যমে
ক্ষুদ্র স্বার্থ হিংসাদ্বেষে যাব ভুলি' তোমার আশ্রমে
ভ্রমে অসংযমে?
দীক্ষা দাও গতিমন্ত্রে, হে অধিনায়ক,
চিরপ্রবর্ত্তক!

যে রবি উদয়াচলে দেখা দেয়, পুন অনুদিন
দিবাশেষে অস্তাচললীন,
সত্য হোক মিথ্যা হোক, শুনিয়াছি বৈজ্ঞানিকী বাণী,
সে নাকি আকাশ হতে রাশি রাশি উল্কাপিণ্ড টানি'
জোগায় ইন্ধনভার তাই তার বহ্নি নিত্য জ্বলে।

জীবনের যজ্ঞকুণ্ডে হে সবিতা, তুমি আত্মবলে
রক্ষিছ অনলে।
মোরা দিতে পারি নাই সমিৎ-সম্ভার
চরণে তোমার।

মোরা শুধু নিতে জানি, কিছু হায় পারি না ত দিতে!
কী পেয়েছি অকৃতজ্ঞ চিতে
থাকে না ত সে ঋণের নিদর্শনী কোনো চিহ্নলেখা,
পাষাণহৃদয়ে তাই ফুটিল না তব লিপিরেখা।
তব যজ্ঞবেদী হতে নিজ নিজ দীপগুলি জ্বালি
নিতে যদি পারি মোরা দীপ্তিহারা আলোক-কাঙালী,
জ্বলিবে দীপালি
তব বিশ্বভারতীর উদার মন্দিরে
আসন্ন তিমিরে।

আজি 'রবি বাসরের' অন্তর্গূঢ় শ্রদ্ধা অর্ঘ্যভার
নিবেদিনু চরণে তোমার।
শুনিয়াছি মৃতজড় বিদ্যুতের কণা বিকীরিয়া
লভে নব রূপান্তর, আপনারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
তোলে সে নূতন করি। আমাদের প্রাণের বৈদ্যুতি
সত্যের স্ফুলিঙ্গে যেন সমুজ্জ্বল করে এই স্তুতি
লভি দিব্যদ্যুতি।
হৃৎপিণ্ডে প্রাণস্পন্দ দিক আজি আনি
তব আশীর্ব্বাণী।

রবিবাসর, শান্তিনিকেতন
৩০শে ফালগুন, ১৩৩৩

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

'স্বপ্ন' কি ?

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

হাসিকান্নার মতই ঘনিষ্ঠ, তবুও যেন চিররহস্যময় এই স্বপ্ন। জীবনের অঙ্গে অঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছে, কিন্তু অচেনা। অগণিত বার আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, অথচ তাহার পরিচয় সম্বন্ধে একটী কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। ঘুমন্ত অবস্থার ওই প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্বপ্ন যে কি এবং কেন ও কেমন করিয়া হয়, এ কথা ভাবিতে আমাদের ধাঁধা লাগে।

স্বপ্ন-অলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণ অনেক কথা বলিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু থিওজফিক্যাল তত্ত্বের চিন্তাধারার সহিত প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুদর্শনের মতবাদগুলি মিলাইয়া নিজস্ব বক্তব্যে শেষ করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীযুত বসু মহাশয় অধ্যাপক ফ্র্যয়েড্‌কে অনুসরণ করিয়া বিস্তৃতভাবে 'স্বপ্ন-বিশ্লেষণ' আলোচনা করিয়াছেন ; আর শ্রীযুত ঘোষ মহাশয় মনোবিজ্ঞান-মূলক বিশ্লেষণের সহিত বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক উদাহরণের সমাবেশ করিয়া বিষয়-বস্তুটীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও দুই একজন পণ্ডিত এ বিষয়ে অল্পবিস্তর অনুশীলন করিয়াছেন ; তবে স্বপ্ন-আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা স্বপ্ন অপেক্ষা পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতামত আলোচনাই অধিক করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চিন্তাশীলগণের লেখা হইতে আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়াছি ; বহু তথ্যপূর্ণ বিষয়ের রহস্য আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু মনের ক্ষুধা না মিটিয়া তাহাতে যেন প্রশ্নই বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন কেন হয় ও স্বপ্নে মানব চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক্ কিভাবে পরিপ্রেক্ষিত হয়—সে প্রশ্নের উত্তর হয়তো অনেকটা পাইয়াছি। অথচ স্বপ্ন কি, এবং স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্বন্ধ কতটুকু,—সে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 'স্বপ্ন-সন্ধান' অপেক্ষা 'স্বপ্ন-বিশ্লেষণ'ই (analysis) বেশী করিয়াছেন। বিশ্লেষণে স্বপ্নের রীতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ ওই একই প্রশ্ন মনে জাগিয়া থাকে যে—স্বপ্ন কি এবং কেমন করিয়া হয় !

পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মতামতের সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু, "স্বপ্ন কি"—তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। স্বপ্ন কেন হয়, কোন জাতীয় চিন্তাধারা বা স্পৃহা স্বপ্নে পরিস্ফুট হয়, এবং স্বপ্নের ভিতর দিয়া মানুষের গভীরতম চরিত্র কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধাদি হইতে আমরা অনেকটা জানিয়াছি। কিন্তু স্বপ্ন নিজে কি (What the dream itself is) বা মনের কোন অবস্থা, তাহা বুঝি নাই। স্বপ্নের বিষয়-বস্তুকে জানিলেই স্বপ্নকে জানা হয় না। কারণ তৎ তৎ বিষয়বস্তু স্বপ্নে আমাদের মানসচক্ষে উদিত হয়, এ কথা জানা সত্ত্বেও "স্বপ্ন কি" এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট 'কিন্তু' থাকে।

অনেকে বলেন যে, পূর্ব্ব-চিন্তিত বা আলোচিত বিষয় নিদ্রামধ্যে আমাদের মনে উদিত হইয়া স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

হিন্দু দর্শণের প্রচলিত মতে বলা হয়—আমরা যখন নিদ্রিত থাকি (অর্থাৎ স্থূল স্বরূপ যখন সুপ্ত থাকেন) তখন সূক্ষ্ম সত্তা (সময় বিশেষে) ইচ্ছানুযায়ী পরিক্রমণ করেন ; এবং এই পরিক্রমণকালে বিবিধ বস্তু, ঘটনা, দেশ ও কালের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সূক্ষ্ম দেহের এই উপলব্ধিই স্বপ্নরূপে আমাদের মনে আরোপিত হয়।

উপনিষদ্‌কার বলেন—সুপ্তিকালে "প্রাণাগ্নয় এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি .....এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং (ইন্দ্রিয় সমূহ) পরে দেবে মনস্যেকীভবতি।"

প্রঃ উপঃ ।৪-২ ॥

"অত্রৈষ দেবঃ (মন) স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশ দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতঞ্চানুভূতঞ্চ সচ্চাসচ্চ সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥" ৪-৫ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

অর্থাৎ 'সুক্তিকালে এই শরীরে প্রাণবায়ুরূপ অগ্নিসমূহ জাগরিত থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ মনে বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থায় মন কখনো কখনো বিভূতি অনুভব করে; পূর্ব্বে যাহা যাহা দেখিয়াছিল আবার তাহাই দেখে, যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহাই শোনে, দেশান্তর ও দিগন্তরে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিল আবার সেগুলিকে অনুভব করে; এবং দৃষ্ট-অদৃষ্ট, শ্রুত-অশ্রুত অনুভূত-অননুভূত ও সৎ-অসৎ সমস্তকেই দর্শন করে ও সমস্ত হইয়া দর্শন করে।' মনের এই উপলব্ধি বা অনুভূতিই "স্বপ্ন"।

যুগ দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন Subconscious mindএর ছবি। নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের Conscious state যখন নিষ্ক্রিয় থাকে Subconscious regionএর সঞ্চিত চিন্তাধারা অনুভূতির পর্য্যায়ে ভাসিয়া উঠে। আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—দমিত প্রবৃত্তি বা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অবস্থান্তরিক বিকাশই স্বপ্ন।

যাহাই হোক্, সাধারণতঃ স্বপ্ন বলিতে আমরা বুঝি—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বস্তু ও ঘটনা সম্বন্ধে ঘুমন্ত অবস্থার অনুভূতি। অর্থাৎ নিদ্রা-মধ্যে মাঝে মাঝে যে সব ঘটনা বা তজ্জাত ছবি আমাদের মানসপটে ফুটিয়া উঠে তাহাই স্বপ্ন। স্বপ্নের স্বপ্নত্ব এইখানে যে, সুপ্তির মধ্যে আমরা চেতনার ছবি দেখি; অথচ সুপ্তির সঙ্গে চেতনার ব্যবধান অতি বিরাট। একটী অজ্ঞাত সীমারেখা চিরদিনই পরস্পরকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

জীবনের স্থূল ব্যাপ্তিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; 'চৈতন্য' আর 'সুপ্তি'। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে আরো একটী অবস্থা আমরা পাই,—যথা—'সমাধি'। জীবন যখন কর্ম্মরত থাকে,—অর্থাৎ গমন, ভোজন, মনন, দর্শন ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মের সঙ্গে জড়িত থাকে, তখন তাহার ব্যাপ্তিটুকুকে 'চৈতন্য', এবং চৈতন্যহীন বিশ্রাম অবস্থাকে 'সুপ্তি' বলা যাইতে পারে। অপর অবস্থা সমাধি। যৌগিক সমাধির কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আসে না। কিন্তু যৌগিক সমাধি বা ভাব-সমাধি ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাধির ব্যাপ্তি আছে। নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন আমাদের চেতনা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসে, তখন মন সুপ্তি ও চেতনার মধ্যবর্ত্তী এমন একটী অবস্থায় আসে যাহাকে চেতনাও বলা চলে না, সুপ্তিও নয়। এই ক্ষণটীতে মন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অথচ জাগ্রত থাকে। ইন্দ্রিয়-গুলি শিথিল হয় বলিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধগ্রন্থি জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্যে বিশেষভাবে উত্তেজিত না করিলে বহিঃসম্পর্কীয় কোন অনুভূতিই আর তখন মনে জাগে না। মনের এই শূন্যতাময় অবস্থাকে সমাধি (Hollow mood) বলা যাইতে পারে। সমাধিস্থ মন সম্পূর্ণ নিরালম্ব থাকে।

চেতনার রাজ্যে যখন আমরা বিচরণ করি, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চিত্তবৃত্তিকে যাহা অধিকার করিয়া থাকে তাহাই 'বাস্তবতা'; আর সুপ্তিলোকে বিশ্রামকালে মাঝে মাঝে আমাদের চিত্তপটে চলচ্চিত্রের ন্যায় যে সব কাল্পনিক ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহাই স্বপ্ন। চেতনাবস্থায় আমরা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বিষয়, বস্তু ও ঘটনাদির প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞান লাভ করি; এবং স্বপ্নে মানসচক্ষে বিচিত্র ঘটনা, বস্তু ও কর্ম্মের অভিজ্ঞতা লাভ করি। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতার পার্থক্য কেবলমাত্র উপলব্ধির স্বপ্নত্ব জ্ঞানে। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কিন্তু অনুভূতির সত্যতা সমান। তবে বাস্তব জ্ঞান স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট; কারণ সম্পূর্ণ সক্রিয় সংবিদের সাহায্যে উপলব্ধ বস্তু ও বিষয়কে বিশেষভাবে বিচার করিয়া আমরা অনুভূতিগুলি চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ দ্বারা সম্যকরূপে অর্জ্জন করি।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিই আমাদিগকে কর্ম্মজগৎ বা বাস্তব জগতের সঙ্গে মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখে। আমরা যতক্ষণ অনিদ্রিত থাকি, ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন থাকে,—

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্‌ প্রভৃতি জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত থাকে; এবং তাহার সাহায্যে যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর অনুভূতি পাই। যখন বিষয় ও বস্তুর সমষ্টি হইতে নিজকে টানিয়া লইয়া কেবলমাত্র বিষয় কিম্বা মননের বা চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করি, তখন ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে আমাদের মনের যোগসূত্র একটু শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু নিজের মধ্যে নিজকে লইয়া জাগ্রত থাকি বলিয়া কল্পনা, মনন ও চিন্তা প্রভৃতি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রীড়া করে। সুতরাং জাগ্রত অবস্থায় আমাদের যে সকল অনুভূতি হয় তাহার কতক বাস্তব এবং কতক মানসিক।

কিন্তু যখন আমরা নিদ্রিত হই, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিৎশক্তি উভয়েই অসাড় হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক নিদ্রার মধ্যে বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি কিম্বা কল্পনা, মনন ও চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ক্রীড়া আমাদের মধ্যে হয় না। অথচ ওই নিদ্রার মধ্যেই আমাদের স্বপ্নানুভূতি হয়। জীবনের একটা প্রধান অংশ সুপ্তি; স্বপ্ন সেই সুপ্তির মধ্যে একমাত্র চৈতন্যানুভূতি। কিন্তু সুপ্তি ও চেতনার ব্যবধানগণ্ডী ভাঙ্গিয়া নিদ্রা মধ্যে ওই চৈতন্যানুভূতি স্বপ্ন কিরূপে আসিয়া পড়ে, তাহাই সমস্যা।

আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, চেতনা ও সুপ্তির মধ্যে বাস্তবতা ও স্বপ্নকে লইয়া মন সমভাবেই কাজ করে। বিভিন্ন হইলেও দুইটা অবস্থার অনুভূতিতেই মনের সক্রিয় অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। ঠিক জাগ্রত অবস্থার মতই আমরা স্বপ্নে যাহা দেখি ও শুনি তাহার উপলব্ধিও পাই মনেই। সুতরাং উভয় অবস্থাতেই যে মন সক্রিয় থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। চেতনায় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সজাগ থাকে বলিয়া মনের অবলম্ব (objects) ও দীপকের (stimulii) অভাব থাকে না; জগতের সঙ্গে মন ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া থাকে। কিন্তু সুপ্তিকালে জগতের সঙ্গে মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া যায়; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় মুহ্যমান থাকে। সুতরাং স্বপ্নে এক মন ব্যতীত অন্য কোন প্রজ্ঞা-শক্তিই থাকে না। আর স্বপ্নের সেই মন যে চেতনার মন হইতে স্বতন্ত্র নয়, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝি। কারণ স্বপ্নের অনুভূতি চেতন হইলেও মনে থাকে এবং স্মৃতি ও অনুভূতির ভাণ্ডারে সমান অধিকার লইয়াই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং মনের সঙ্গে স্বপ্নের সম্বন্ধ বাস্তব উপলব্ধির মতই অচ্ছেদ্য; এবং স্বপ্নকে জানিতে হইলে মনের সন্ধানই প্রকৃষ্ট পথ।

মনের স্তর দুইটি:—(১) চৈতন্যময় (Conscious)—(২) মগ্ন-চৈতন্যময় (Subconscious), (ক) প্রাক্‌-চৈতন্যময় (Preconscious)।

সক্রিয় মনের অবস্থাগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে:—

(১) চিন্তা (Thinking), (২) অনুভূতি (Feeling) ও (৩) ঈপ্সা (Willing)।

মনের ওই যে সাধারণ তিনটা অবস্থা, উহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধযুক্ত। চিন্তার সঙ্গে অনুভূতি ও ঈপ্সা জড়ীভূত, অনুভূতির সঙ্গে চিন্তা ও ঈপ্সা, এবং ঈপ্সার সঙ্গে চিন্তা ও অনুভূতি জড়িত।

সমাধির মধ্যে ওই তিনটা অবস্থাই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, তবে প্রকট সক্রিয় অস্তিত্বে নয়—potential stateএ বা সুপ্ত-শক্তিতে।

চিন্তার অধিকার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—ত্রিকালের বিষয়-বস্তুর উপর সমভাবে ব্যাপ্ত। অতীতকে লইয়া চিন্তা যখন কাজ করে, তখন স্মৃতির পাতাগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া আবৃত্তি করে, এবং অনুভূতি ও ঈপ্সা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। বর্ত্তমানকে লইয়া যখন কাজ করে তখন বাস্তবতার সঙ্গেই চিন্তার অধিক সম্বন্ধ। আর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে স্মৃতি ও বাস্তবতা (ভূত ও বর্ত্তমান)—এই দুইকে আশ্রয় করিয়া মন কল্পনা করে। এই কল্পনা যে কেবল ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেই করে, তাহা নয়। কল্পনা মনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর শক্তি, এবং অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মন অবাধে কল্পনার জাল বুনিতে পারে। এই কল্পনাই Imagination। পূর্ব্বার্জ্জিত বস্তু ও বিষয়জ্ঞানের 'কল্প' বা 'সদৃশ'কে (Image) অবলম্বন করিয়া মন এই ক্রীড়া করে।

মন কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় না, একথা মনস্তত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেন। আবহমান মানবমনের মাঝে

মাঝে যদি নিষ্ক্রিয়তা ও অসংযোগ থাকিত, তাহা হইলে বিভিন্ন কালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত মনের যোগসূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইতাম না। উপনিষদকারও বলিয়াছেন যে নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রেষ্ঠ দ্যুতিমান মনে বিলীন হইয়া যায়· অর্থাৎ মন নিজে সক্রিয় থাকে, বিলীন হয় না।

ঘুমন্ত অবস্থায় মন সক্রিয় থাকিলেও, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান-দ্বারগুলি বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্রাম করে এবং সংবিৎ নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া মনের সহিত বাস্তবতার সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এ অবস্থায় বাস্তবকে লইয়া ক্রীড়া করা মনের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তখন তাহার একমাত্র অবলম্বন হয় স্মৃতি-ভাণ্ডারের সঞ্চয়টুকু। মনের সক্রিয়তা যদি মন্থর ও সূক্ষ্মতর স্তরে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মন শুধু স্মৃতির কল্পগুলিকে অসংশ্লিষ্টভাবে নাড়াচাড়া করে, গঠনে হাত দেয় না। কিন্তু যখনই স্নায়বিক কারণে সংবিৎ (Consciousness) ঈষৎ সক্রিয় হইয়া মনকে স্পর্শ করে, মনে সৃজনশক্তির সঞ্চার হয়। তখন আর সে কেবল কল্পের ব্যষ্টিগুলিকে (Units) নাড়াচাড়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সমষ্টি ও সমাহারের দিকেও হাত বাড়ায়; কল্পগুলির মালা গাঁথিয়া বিষয় ও বস্তুর সমন্বয় করে। বহিঃসম্পর্কহীন মনের কল্পনাশক্তিই এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও অবাধ হইয়া উঠে; এবং মন তাহারই সাহায্যে পূর্ব্ব সঞ্চয়ের স্তূপ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘটনা সংগঠন করে, কখনো পূর্ব্বোপলব্ধ ঘটনার অনুরূপ—কখনো বা অভিনব। নিদ্রিত অবস্থায় সংবিৎ সংস্পর্শে মনের এই কাল্পনিক সৃষ্টি আমাদের অন্তরানুভূতিতে প্রতিভাত হয়। ইহাই স্বপ্ন। অর্থাৎ স্বপ্ন আমাদের ঘুমন্ত অবস্থার কল্পনা বা Imagination.

স্বপ্নে আমরা এমন কোন বিষয় বা বস্তু দেখি না, যাহার মৌলিক কল্প (Image) আমাদের স্মৃতিতে নাই। বাস্তব জ্ঞানার্জ্জিত কোন ঘটনার সহিত সম্যক সাদৃশ্য না থাকিলেও, অবিকল বস্তু-সাদৃশ্য আছে। কল্পনা সেই বস্তু-সাদৃশ্যগুলিকে লইয়া বিষয় সৃষ্টি করে। কিন্তু মৌলিক বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বপ্নে আমরা 'আকাশ কুসুম' বা 'সোনার পাহাড়' দেখিতে পারি, যদিও বাস্তব জগতে ঐ দুইটির অস্তিত্ব কখনো দেখি নাই। কারণ 'আকাশ' ও 'কুসুম' এবং 'সোণা' ও 'পাহাড়' সম্বন্ধে আমাদের মনে পূর্ব্বার্জ্জিত বস্তু-কল্প আছে। কিন্তু স্বপ্নে আমরা এমন কোনও জিনিষ দেখিতে পারি না, যাহার বস্তু-কল্প মনের মধ্যে নাই। যাঁহারা জাত-অন্ধ তাঁহারা জীবনে কখনই রূপ-জগতের স্বপ্ন দেখেন না। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা বাস্তব জগতের যে যে বস্তুর সহিত যে-ভাবে পরিচিত হইয়াছেন, ঘুমন্ত অবস্থায়—স্বপ্ন দর্শনেও তাঁহাদের উপলব্ধি সেই সেই অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দর্শন (Vision) ব্যতীত সব অনুভূতিই তাঁহারা স্বপ্নে পান; কেন না, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ইত্যাদির বস্তু-কল্প তাঁহাদের মধ্যে আছে। যাঁহারা জন্মাবধি বধির, তাঁহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। জাত-বধির স্বপ্নেও কখনো শব্দানুভূতি পান না। স্বপ্ন সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন করায় তাঁহারা এই উত্তর দিয়াছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীর যে যে বস্তুকে যে ভাবে অনুভব করেন, স্বপ্নে তাহা অপেক্ষা স্পষ্টতর অনুভূতি কোন বস্তু সম্বন্ধেই পান না। কোন জন্মান্ধকে প্রশ্ন করায় লিখিয়াছেন— 'I have often been asked what my dreams are like. People often want to know whether I see them in dreams. No, I no more see them in my dreams than I do in real life." "জন্ম-বধিরের নিকট শব্দানুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠিক এই প্রকারের উত্তরই পাওয়া গিয়াছে; অর্থাৎ শব্দ তাঁহার নিকট সচেতন অবস্থাতেও যাহা স্বপ্নেও তাহাই। তবে যাঁহারা জন্মান্ধ বা জন্ম-বধির নহেন, বাস্তব জীবনে এক সময় রূপানুভূতি ও শব্দানুভূতি পাইয়া পরে অঙ্গহীন হইয়াছেন; তাঁহারা স্বপ্নে দর্শন ও শ্রবণ করেন,—কারণ মনে পূর্ব্বসঞ্চিত রূপ ও শব্দের কল্প আছে।

স্বপ্ন পূর্ব্ব-চিন্তিত বিষয়ের পুনঃ প্রকাশ নয়। কারণ আমরা এমন অনেক স্বপ্ন দেখি যাহা জীবনে কখনো মনে উদিত হয় নাই।

স্বপ্ন যদি কেবলমাত্র সূক্ষ্মদেহের পরিক্রমণজনিত অনুভূতি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে আমরা কখনো না কখনো অন্ততঃ একটী অভিনব বস্তুর জ্ঞানও লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু

আমরা কখনই তাহা পারি না। উপরন্তু, তত্ত্ববাদিগণের মতে এই সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ হইতে সম্পূর্ণ অন্য। ইহা স্বচ্ছতর সত্তা। স্থূল বাস্তবতার (Gross materialism) সঙ্গে স্থূল দেহেরই অধিক সম্বন্ধ। কিন্তু সে সম্বন্ধের অধিকার সীমাবদ্ধ। সূক্ষ্ম দেহ অনেক বেশী অবাধ ও স্বাধীন। স্বপ্ন সেই সূক্ষ্ম দেহের পরিক্রমণজনিত অনুভূতি হইলে, জন্মান্ধ স্বপ্নে অন্ততঃ আংশিক দর্শনানুভূতিও পাইতেন; কেন না, অন্ধত্ব শুধু তাঁহার স্থূল দেহের অঙ্গবিকার মাত্র, সূক্ষ্ম দেহের নয়। আর স্বপ্ন যদি কেবল মাত্র Subconscious region বা মগ্ন চৈতন্যময় স্তরের সঞ্চিত ভাব ও চিন্তাধারার বিকাশই হইত, তাহা হইলে অভিনব ঘটনার সমাবেশ স্বপ্নে ঘটিত না। Conscious mindএর সাহায্য ব্যতীত Subconscious mind বিষয় সৃষ্টি করিতে পারে না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা (Repressed passions) মূলক বিষয়-বস্তুর সমাবেশ স্বপ্নে অনেক সময় হয় সত্য; কারণ, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত হইলেই প্রবলতর হয় এবং তজ্জন্য মনের উপর আধিপত্য পাইয়া কল্পনার পর্য্যায়ে আত্ম-বিস্তার করে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিতে গেলে সকল স্বপ্নে আমরা ওরূপ ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া পাই না। যাবতীয় অর্থে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মিলাইবার চেষ্টা করিলে, বড় জোর এক-তৃতীয়াংশ স্বপ্নে repressed passionএর ছায়া পাওয়া যায়। মন যদি বিভূতি অনুভব করিয়া স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে স্বপ্ন দর্শনের সীমা অত গণ্ডীবদ্ধ হয় কেন? সম্পূর্ণ অদৃষ্ট, অননুভূত ও অজ্ঞাত বিষয়-বস্তু, যাহার কোন প্রকার মৌলিক কল্পই আমাদের মনে নাই, তাহা লইয়া আমরা কখনই স্বপ্ন দেখি না।

স্বপ্নের কথা আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বপ্ন নিদ্রিত অবস্থার কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। পূর্ব্বার্জিত বস্তু-কল্পগুলিকে অবলম্বন করিয়া মন অবাধে কল্পনা করে। সংবিদের সংযোগানুযায়ী কল্পনার শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা হয়। আমরা যে প্রকার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক স্বপ্নই দেখি, জাগ্রত অবস্থায় সে প্রকার কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বদাই সম্ভব। তবে জাগ্রত অবস্থায় সংবিৎ ও ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় থাকে বলিয়া কল্পনা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। স্বপ্ন দর্শন কালে যে সংবিৎ মনকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক সময় পাই। কখনো কখনো স্বপ্ন মধ্যেই আমরা অনুভব করি যে 'স্বপ্ন দেখিতেছি'। তাহা ছাড়াও, নিদ্রিত ব্যক্তির আংশিক সংবিৎ উদ্দীপ্ত করিয়া যে তাহার মনে স্বপ্ন সঞ্চার করা যায়, তাহা আমরা দেখি। ইচ্ছা করিলে নিদ্রিত ব্যক্তিকে অল্প-বিস্তর স্বপ্ন দর্শন করানো যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কাহারো কানের কাছে মৃদুস্বরে কথা বলা হয় কিম্বা চোখের সম্মুখে আলোক সঞ্চালিত করা হয় বা ত্বকে অতি মৃদু অনুভূতির সঞ্চার করা হয়,—যাহাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবে না অথচ সংবিৎ ঈষৎ সক্রিয় হইয়া উঠিবে,—তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি অল্প-বিস্তর স্বপ্ন দেখিবেন। সংবিৎ স্পর্শেই মন গঠনশক্তি (Creativity) লাভ করে ও কল্পনা নিয়ন্ত্রিত করে।

স্বপ্নে আমরা অনেক সময় এমন ঘটনাদি দেখি, যাহা পরে সত্য সত্যই আমাদের জীবনে ঘটিয়া থাকে; এবং এমন অনেক স্থান ও বিষয় স্বপ্নে আমাদের মনে আসে, যাহা বাস্তবের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা সম্ভব। এরূপ আশ্চর্য্য সমাবেশ সর্ব্বদাই হয় না, কচিৎ ঘটে। নিদ্রিত অবস্থায় মন বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে বলিয়া জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছ ও আত্মস্থ থাকে। স্বচ্ছ মনে সত্য-প্রতীতি স্পষ্টতর ভাবে প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হইতে পারে। মন এই সময় কল্পনার ভিতর দিয়া যাহা অনুমান করে তন্মধ্যে কোন কোনটী আশ্চর্য্যরূপে নির্ভুল হয় ও বাস্তবের সহিত মিলিয়া যায়। জাগ্রত জীবনেও আমরা অনেক সময় এরূপ কল্পনা বা অনুমান করি, যাহা ভবিষ্যৎ ঘটনার সহিত কিম্বা বাস্তবের সহিত অবিকল মিলে। ঐরূপ পরিকল্পনা বা বিষয় উদ্ভাবন মনের পক্ষে খুব অসম্ভব কার্য্য নয়। তবে স্বপ্নে আমরা কখনো কখনো দৈব ঔষধ, প্রত্যাদেশ প্রভৃতি পাইয়া থাকি; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় কল্পনাতেও সেরূপ পাই না। সজ্ঞান কল্পনায় দৈব ঔষধাদি না পাইলেও অনেক সময় ব্যাধি ক্লিষ্ট হইয়া একথা মনে হয় যে, 'হায় যদি···দেবতা প্রদত্ত কোন ঔষধ পাইতাম—ইত্যাদি'। কিন্তু সংবিৎ সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে বলিয়া মন তাহার অধিক কিছু আয়ত্তে আনিতে পারে না। সংবিৎ যতক্ষণ অনাবৃত

থাকে, মন কোনরূপ অলৌকিক পরিস্থিতি সৃজন করিতে পারে না। সংবিৎ প্রক্ষেপণের (Projection) পথে বাধা দেয়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায়, যখন সংবিদের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মন একান্তে সরিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার hallucination বা projectionএর পথে বাধা দিবার কেহই থাকে না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, পূর্ব্ব দৃষ্ট দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে প্রাণ আরোপ করিয়া (Project) প্রক্ষেপণ করার পথে আর কোন বাধা বিপত্তি থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় মন 'হায় যদি দৈব-ঔষধ পাইতাম—ইত্যাদি' ভাবিতে গিয়া বিরত হইয়াছে, কারণ 'দৈব'কে সে সজ্ঞানে নির্দিষ্ট কোন 'রূপ' দিয়া সম্মুখে আনিতে পারে নাই। কিন্তু স্বপ্নে দৈব'কে সে পূর্ব্ব দৃষ্ট দেব দেবীর মূর্ত্তি-কল্পের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে প্রক্ষেপ (Project) করে। মনের সঙ্গে তখন সংবিদের সম্পর্ক হয় বটে, কিন্তু প্রক্ষেপণে বাধা দিবার মত প্রাবল্য সংবিদের থাকে না। দৈব-ঔষধ প্রাপ্তির স্বপ্নে 'দৈব'কেও রূপ দেয় মন, ঔষধও নির্দ্দেশ (Suggest) করে মন। ইহা মনেরই কল্প ক্রীড়া। দ্রষ্টা এমন কোন ঔষধ স্বপ্নে পান না, যাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অল্প বিস্তর জ্ঞান ছিল না কিম্বা যে লতাগুল্ম ও দ্রব্যের সহিত তিনি পূর্ব্বে আদৌ পরিচিত ছিলেন না।

অব্যাহত মন কল্পনার ভিতর দিয়া অনুমান, প্রক্ষেপণ ও নির্দ্দেশের সাহায্যে ওই রূপে অনেক কিছু অলৌকিক সংঘটন করে; এবং তখন তাহার একাগ্রতা বাড়িয়া যায় বলিয়া এমন বহু বিষয়ের তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলে যাহা জাগ্রত অবস্থায় আমরা সব সময় পারি না।

আর এক প্রশ্ন—স্বপ্ন সঞ্চরণ (Somnambulism) বা নিশির ডাক। স্বপ্ন দেখিয়া অনেক সময় ঘুমের ঘোরে মানুষ বিছানা হইতে উঠিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ চলিয়া যায়; এবং অনেক কঠিন কঠিন কাজ করিয়া বসে।

স্বপ্নের ক্রিয়া যে দেহের উপর ব্যাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ আমরা পাই। স্বপ্নে কথা বলা, কাঁদিয়া উঠা ও অঙ্গ চালনার চেষ্টা করা প্রভৃতি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানসিক অবস্থা দেহের উপর ক্রিয়া বিস্তার করে। স্বপ্ন মধ্যে অনেক সময় রতিবিলাস হয়, এবং সেই সম্ভোগানুভূতি কেবল মনেই আবদ্ধ থাকে না, স্নায়ুমণ্ডল ও দেহে পরিস্ফুট হয়। আমাদের দেহে যে সব স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুগুলি আছে, স্বপ্নের ক্রিয়া ও তজ্জাত উত্তেজনা প্রথমতঃ সেইগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়, পরে অন্যান্য স্নায়ু ও শিরা উপশিরায় ছড়াইয়া পড়ে। নিষ্ক্রিয় দেহ ও সক্রিয় মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার (action & re-action) সম্বন্ধ স্থাপন করে এই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুগুলি। যে সব স্বপ্নে মানুষ বিছানা হইতে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায় বা দিক্-বিদিকে চলিয়া যায়, সে স্বপ্ন দর্শনকালে মানসিক অবস্থা হইয়া উঠে অত্যন্ত প্রখর এবং সংবিৎসংযোগের আধিক্য ঘটে। ফলে, কল্পনা যে ভ্রান্ত ধারণাটুকু সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার ক্রিয়া পর্য্যাপ্তভাবে সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে এবং স্নায়ু ও পেশিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তোলে। সাধারণ স্বপ্ন দর্শনকালে সংবিদে যে পরিমাণ সক্রিয়তা থাকে, সঞ্চরণ-মূলক স্বপ্নে তাহার যথেষ্ট আধিক্য ঘটে। স্নায়ু ও পেশিমণ্ডলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথ উন্মুক্ত হওয়ার পর সংবিদের আধিক্য মনে দেহপরিচালনার শক্তি সঞ্চার করে। স্বপ্নদ্রষ্টা ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন। সংবিদের আধিক্য থাকিলেও বিচারবুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিয়া ভ্রান্ত ধারণাটুকু বিদূরিত করিবার শক্তি মনের আয়ত্তে থাকে না।

স্বপ্ন সঞ্চরণকালে স্নায়ু ও পেশি এমন সক্রিয় হইয়া উঠে যে ইন্দ্রিয়গুলি অনেক সময় বহির্জগতের অনুভূতি গ্রহণে সমর্থ হয়; কিন্তু সংবিৎ বা চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে নিদ্রামুক্ত হয় না বলিয়া বাস্তবতার সহিত ইন্দ্রিয়াদির আংশিক সংযোগ ঘটিলেও মনের ভ্রান্তি অপনোদিত হয় না।

স্বপ্নে আমরা যাহা কিছু দেখি ও শুনি, তাহার মূল ভিত্তি যে কল্পনা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মন সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর ও প্রবল শক্তি; ছন্দোময় সাবলীল গতি জীবনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অনায়াসে ছুটিয়া বেড়াইতে পারে। মানবমনের লীলা এত গতিশীল যে, এই ধূলিধূসর পৃথিবীর বুক হইতে পলকে সুদূর নক্ষত্র-লোকে ধাবমান হয়। সেই প্রবল শক্তির প্রবলতম পর্য্যায়—কল্পনা। বিভিন্ন স্থান কাল ও বিষয়বস্তু লইয়া কল্পনা অবলীলাক্রমে যে রহস্যজাল বুনিয়া চলে, তাহাতে মাঝে মাঝে আমরা স্তম্ভিত হই। জাগ্রত জীবনেই কল্পনা অনেক সময় এমন অদ্ভুত কথা ভাবিয়া বসে যে, তাহার কারণ ও কৈফিয়ৎ সন্ধান করিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। তবে জাগ্রত অবস্থায় কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তিগুলি সম্পূর্ণ সবল ভাবে কাজ করে বলিয়া কাল্পনিক সৃষ্টি বিশেষ অসংবদ্ধ বা অলৌকিক হইতে পারে না। কিন্তু নিদ্রাকালে কল্পনা সম্পূর্ণ বাধাহীন থাকে, সুতরাং সে অবস্থার সৃষ্টিতে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু স্বপ্নে আমরা যাহা দেখি ও শুনি, কল্পনায় তাহার প্রত্যেকটিই সম্ভব। স্বপ্ন মনেরই রহস্যময় কল্পক্রীড়া।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রেমতীর্থ

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

পথে চলেছিলাম আশ্বিনের ভোরবেলায়।
চোখে ছিল রঙীন স্বপ্ন, প্রাণের বয়লারে ছিল
উদ্দাম গতির বাষ্পসঞ্চয়।
কণ্ঠে ছিল গান, আর ছিলেন প্রিয়া
উদাসিনী শ্লথবেশা, নির্ব্বাক্ কুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী।
দৃষ্টিতে ছিল স্নেহের তৃষ্ণা—
বন্ধুরা হেসে বলতেন স্বপ্নের ঘোর কাটেনি এখনো।

তারপরে কত আশ্বিনের ভোরবেলা এল আর গেল চ'লে,
কত বিদায়গীতির গুঞ্জরণ, কত ভাবনা—কত ক্ষয়-ক্ষতি-লাঞ্ছনা—
বাইরের পোষাকের অদল বদল হ'ল কত,
কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদার জন্যে যাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম
সে একটি সুকুমার দেবশিশু!
আমার চোখ থেকে সে স্বপ্নের মায়াঞ্জন
মুছিয়ে দেয় নি এক মুহূর্ত্তের জন্য।

আকাশ বাতাস ছিল মধুক্ষরা;
প্রশ্ন ছিল না মনে;
কোথায় একটি সংশয়হীন নির্ভরতা ছিল।

তারপর একদিন নাম্‌ল এসে বিধাতার অভিশাপ
আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গরাজ্যের 'পরে—
তাকিয়ে দেখি যতদূর দৃষ্টি যায়—এক বাক্যহীন মহাশূন্যতা।
মনের মধ্যে আসে না প্রশ্ন,
গতিতে থাকে না স্বাচ্ছন্দ্য,
হৃদয়ের জড়তা যেন কাটেনা কিছুতেই।

মনের তলায় তলিয়ে আছে যে মন,
তাঁকে বললাম, জাগো—গান গাও আর চলো।
মন সাড়া দিল, পথ চলল, গানও গাইলে,
কিন্তু সে গানের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ পেলাম না।
কাঙালের মত ঘুর্‌লাম পথে পথে,
অনুদিন অনুক্ষণ ডেকে ডেকে বললাম—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি?
প্রাণের সেই গাঢ় অমাবস্যার মধ্যে
উত্তর মিল্‌ল—জোনাকির মত জ্ব'লে উঠ্‌ল একটি মৃদু আলো।
মনে হ'ল এ আলো দেখেছি কতবার
নির্জ্জন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে,
ঝিল্লীঝঙ্কৃত কৃষ্ণপক্ষের রাতে।
যখন নিপীড়িত, আর্ত্ত স্মৃতির মূর্ত্তিগুলি একসঙ্গে উঠেছে হাহাকার ক'রে
অতি ক্ষীণ সে স্পর্শ, তবু মন ব'লে উঠ্‌ল, পেয়েছি, পেয়েছি।

তারপর প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় অন্ধকার রাত্রির অস্পষ্ট গুঞ্জনে
সেই এতটুকু স্পর্শের উপরে চল্‌ল স্বাভাবিক স্বপ্নের অনুরঞ্জন।
তাকেই অবলম্বন ক'রে চল্‌ল আমার বিড়ম্বিত জীবনের প্রাণক্রিয়া।

মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়—
কা'রা যেন হাহাকার ক'রে বলে
কি সে স্পর্শ পেয়েছ, আমরা তাই পেতে চাই!
প্রশ্নের পর প্রশ্ন—সমস্যার পর সমস্যা,
তবু সেই এতটুকু স্পর্শ অম্লান ক'রে রেখে দিতে ইচ্ছে করে

সেইটুকুকে অবলম্বন ক'রে মন আমার পাড়ি দেয়
আমার বিস্মৃত জগতে,
যেখানে মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে শ্যামলতার গন্ধ
ঘুঘুর উদাস কণ্ঠস্বরে, নিদ্রালস মধ্যাহ্নের করুণ সুরে
বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় মাধুরীতে
আর, অপার্থিব অনুভূতির মিশ্রণে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বাউল

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

আজকাল প্রায়ই বাউল গানের কথা শোনা যায়। নানা ভাবে আমাদের শিক্ষিত মন এবং চিন্তার সঙ্গে বাউল-জগতের পরিচয় সাধনের জন্য যাঁর কাছে আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী, তিনি হলেন বাঙলার ভাবুকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। বাউল ছিল আমাদের চোখের আড়ালে, মনের অগোচরে, আমাদের মার্জ্জিত সমাজের বাইরে। তার ভাষা নিয়ে, ভাব নিয়ে, গান নিয়ে, প্রান নিয়ে, একাকী আপন নিঃসঙ্গ সাধনায় আত্মমগ্ন, একমনে তার একতারাতে, একটি যে তার সেইটি বসে বসে বাজাচ্ছিল। সে সুর—গ্রামের পথে, ধানের ক্ষেতে, নদীর ধারে, সেখানকার অশিক্ষিত, গ্রাম্য মনের অজ্ঞতাসৃষ্ট অবহেলার শূন্য আকাশে, লঘু শরৎমেঘখণ্ডের মত দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; সাধক, ভাবুক, তাকে দিনান্তে শিক্ষিত চিত্তাকাশে এনে, প্রাণের রঙে অনুরঞ্জিত করে তুললেন। এখন সর্ব্বত্রই বাউল গানের কথা শোনা যায় এবং চর্চ্চাও কিছু হয়ে থাকে। আজকাল পল্লীসাহিত্য এবং সঙ্গীতের জন্য চারিদিকে একটা দরদ, সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে থাকায়, শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে সে সকল জিনিষ সহজেই প্রবেশ লাভ করে এবং অল্পায়াসেই আপনার স্থান করে নেয়; শিক্ষিত সমাজও এখন তাদের সে ন্যায্য এবং প্রাপ্য অধিকারটুকু ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষিত মনের এই আনুকূল্য লাভ এবং শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা তাদের পক্ষে একান্ত দুরূহ ছিল। তখন চাষার এবং 'চাষাড়ে' গান বলে তাদের দূর থেকে বিদায় করে' দেওয়া হ'ত, সাহিত্যের বা সঙ্গীতের মার্জ্জিত আসরে ত স্থান ছিলই না। তাদের 'জলচল' করে নিলেন প্রথম রবীন্দ্রনাথই। সেই থেকে তারা সাহিত্য-সমাজে পাংক্তেয়ে পরিগণিত হল। রবীন্দ্র-প্রতিভা ভিন্ন একাজ হওয়া কঠিন ছিল, কারণ কোনো রকম খণ্ড আলোচনা, আন্দোলন বা বক্তৃতার দ্বারা এ সম্ভব নয়; একটা ধারাবাহিক এবং অখণ্ড সৃজনী-প্রতিভার রস-সৃষ্টির মাধুর্য্য ব্যতীত এমন জিনিষে আস্বাদ দান করা যায় না, এবং সেইজন্য সাধারণের আনুকূল্যে তাকে পৌছান দুষ্কর। কিন্তু রসসৃষ্টির নানা কৌশলে এবং সৌন্দর্য্যে, মনের দরজা আপনি খুলে যায়। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সঙ্গীতে, কবিতায়, দর্শনে ভাবুকতায় এমন অনির্ব্বচনীয় এবং সরসভাবে বাউলের প্রতি-নিধিত্ব করেছেন, যে বাউলের প্রতি মন অতি সহজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে, তাকে অতিশয় ভাল লাগতে থাকে; সে তার ঢিলে আলখেল্লার আবরণে অপরূপ রহস্যময় এবং রঙীন হয়ে দেখা দেয়। আজ বাউলের গানের প্রতি আমাদের যে এত অনুরাগ, এর মূলে রবীন্দ্রনাথ, সে কথা ভুললে চলবে না। তাঁর নানা রকম রচনা এবং প্রতিভার ভিতর দিয়ে তিনি বাউলকে চিনিয়ে দিয়েছেন, এবং তার সাথে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। তাঁর কাজ চুকেছে, এখন আমাদের দায়িত্ব আছে; যাকে তিনি চিনিয়ে দিলেন, এখন আমাদের বুঝতে হবে তাকে ভাল করে, বিশদ করে'।

বাউল শব্দটি এসেছে হিন্দি 'বাউর' থেকে,—বাউল অর্থ পাগল। বাউলকে পাগল বলবারও অর্থ আছে। বাউল আপনার ভাবের নেশায় ভিতরের দিকে মেতে আছে, বাইরে নজর কম। বাইরের আচার বিচার নিয়ম-কানুন বা সামাজিকতায় লক্ষ্য নেই তার, সে হল ভাবের ক্ষ্যাপা। এই জন্যই তাকে বাউল নামে ডাকা হয়।

বাউল একটা শ্রেণীর মানুষ, একটা সম্প্রদায়ের একজন, অর্থাৎ তার একটা সাম্প্রদায়িক পরিচয় আছে, যদিও সেটা তার জীবনের একটা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। তবুও ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়, তার পরিচয় সম্পূর্ণ করতে হলে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

বাউলদের মধ্যে, গৃহস্থ এবং গৃহত্যাগী, দুই শ্রেণীরই লোক আছে। গৃহত্যাগী অর্থ সন্ন্যাসী নয়; কৃচ্ছ্র অভ্যাস বা বৈরাগ্য সাধনের শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে বাউলের জীবনতরু কোনো প্রেরণার রস সংগ্রহ করতে পারে না, তারা চায় আনন্দের রসধারা, সেই আনন্দের স্রোতে গৃহের বাঁধন ভাসিয়ে দিতে। তারা হল আনন্দের বাউল, কৃচ্ছ্রসাধনের সন্ন্যাসী নয়।

তাদের কোনো শ্রেণী বা বর্ণ নেই। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদির মত সামাজিক উচ্চ নীচ বা ভেদাভেদ তাদের মধ্যে কিছু নেই। সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে লোক এসে, তাদের মধ্যে অতি সহজে সকলের সাথে সমান স্থান পেয়ে থাকে। মানব সমাজের নিজের হাতে তৈরী ছোট বড় ও আরো নানারূপ ভেদাভেদের কৃত্রিম রেখাগুলি এখানে এসে সব মুছে গিয়েছে এবং শুধু এক অখণ্ডিত উদার মনুষ্যত্ব, সকল মানুষকে, আপন বৃহৎ আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়ে একাকার করে দিয়েছে। মনুষ্যত্ব যেখানে কোনো রকম জাতিগত বা সমাজগত ভেদাভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, বাউল, মানুষকে সেই বৃহৎ বিস্তারের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। বাউলের সাধনা, মানুষের সাধনা, এদিক দিয়েও সে কথার একটা মস্ত বড় অর্থ আছে। এইখানে চণ্ডিদাসের দুটি পংক্তি, এই অর্থে বড় সুন্দর শুনায়:—

> 'শুনহে মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।'

বাউলদের এই সাম্যবাদ, শুধু কোনো বিশেষ ধর্ম্ম বা সমাজের সীমানার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নয়; তাদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সমান ভাবে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি এসে, বাউল জীবনের বিরাট সাম্যের মহাসমুদ্রে মিশে' একাকার হয়ে গেছে। এখনো আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিক্ষুব্ধ জীবনের পাশে, এই উদার জীবনের সাম্য এবং শান্তি, একান্তে অলক্ষিত পড়ে রয়েছে, আমরা লক্ষ্য করি না। বাউলরা দেউল, দরগা, তীর্থ বা ঐ ধরণের কোনো কিছুর পক্ষপাতী নয়। কোনো রকমের পূজা পার্ব্বণও তাদের মধ্যে নেই; তার কারণ, তারা কোনো রকমের বন্ধনকেই মানতে রাজী নয়। সকল রকম আচার অনুষ্ঠান এবং বিধি ব্যবস্থার মধ্যেই একটা পরিসরের অভাব আছে, তারা যেন জীবনকে কেবলই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে টেনে রাখতে চায়, তার মুক্ত এবং সহজ অভিব্যক্তিতে বাধা দেয়। জীবনের মধ্যে যা সহজ বাউলরা তারই অনুগত; সেইজন্য তাদের এই অর্থে সহজিয়া বলা চলে। তারা সাধারণ স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো সাধকের সাধন পীঠকে সযত্নে রক্ষা করে থাকে, কিন্তু সেখানে কোনো রকম বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা, তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। বাউলরা চুল, দাড়ি, গোঁফ, এ সব ছেদন করে না। দীর্ঘ কেশ এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু, গায়ে প্রকাণ্ড ঢিলে আলখেল্লা, এই হল তাদের আকৃতি,—হাতে একতারা।

গুরু-শিষ্যরূপ একটা ব্যবস্থা (System) বাউল সমাজের দেহে মেরুদণ্ডের মত কাজ করছে। গুরু, তাদের জীবনে শুধু একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তাঁর গুরুত্ব আরো বেশী, একটী ভাব বা তত্ত্বরূপে বাউলরা তাকে উপলব্ধি করে। ব্যক্তির মধ্যে এই অশরীরি ভাব বা তত্ত্বই শরীর গ্রহণ করেছে মাত্র।

বাউল সম্বন্ধে অনেকের অনেক অদ্ভুত রকমের ধারণা আছে। সে সব ধারণা যাদের সম্বন্ধে চলে, তারা প্রকৃত বাউল নয়। নানা রকমের ঘৃণ্য আচার অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব এবং সহজিয়া আন্দোলন বিকার-গ্রস্ত হয়ে যখন পচে উঠল, তখন এই সব পৈচাশিক দলের সৃষ্টি হয়; এদের সঙ্গে মরমী বাউলের লেশমাত্র মিল নাই।

বৈষ্ণব এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন তত্ত্বগুলি প্রথমে মার্জ্জিত মন ও বুদ্ধির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে, যেমন ঘটে থাকে, সেগুলি যখন অপ্রবুদ্ধ এবং অশিক্ষিত বুদ্ধিতে প্রবেশ করল, তখন তার চেহারা গেল বদলে, সৃষ্টি হল আউলের দল, নেড়ানেড়ীর দল, কর্ত্তাভজার দল। বাউলকেও অনেকে সেই দলের লোক বলে জানে, কিন্তু কায়া এবং ছায়ার মধ্যে যে প্রভেদ, প্রকৃত বাউল এবং এই সব আউলে-বাউল বা কর্ত্তাভজা বাউলের মধ্যে সেই প্রভেদের দূরত্ব আছে। এ বাউল সে বাউল নয়; এদের প্রাণ মন এবং বুদ্ধিবৃত্তি এমন ভাবে মার্জ্জিত এবং শিক্ষিত, যা'তে জীবনের শ্রেষ্ঠ মরমীদের সঙ্গে এরা একই পংক্তিভুক্ত হয়েছে। এরা সত্যিকারের ভাবুক, কবি, দার্শনিক এবং যোগী। আমরা ক্রমে ক্রমে

দেখাব, শ্রেষ্ঠ ভগবত্তত্ত্ব, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ দর্শন পরিবেষণ করছে,-এই বাউলের বাণী।

বাউলের সাধনা শুধু মাত্র ধর্মসাধনা নয়, তাদের সাধনায় সমস্ত জীবনের কথা আছে, এ একটা মস্ত বড় সমন্বয়ের ব্যাপার। শুধু ভগবত্তত্ত্ব বা ভক্তি নয়, শুধু প্রেম নয়, তার মধ্যে অখণ্ড জীবন, তার বিচিত্র আলোড়নে স্পন্দিত হচ্ছে। অনেকের ধারণা, শুধু ভগবত্তত্ত্ব নিয়েই বাউলের কারবার, কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; বাউল জীবনেরই দূত, তাদের একতারার একটি তার থেকে সেই বিচিত্র জীবনসঙ্গীত মানুষের দ্বারে দ্বারে পরিবেষণ করছে। সে সব সঙ্গীতে ভগবানের কথা, ভক্তির কথা, আসক্তি হীন, অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, নির্লিপ্ত জীবনের শান্তি ও আত্মসমাহিত তৃপ্তির কথা, প্রয়োজনাতীত সত্যের কথা, ত্যাগের কথা, অতীন্দ্রিয় ভোগের কথা, ইত্যাদি সকল কথাই আছে।

মানুষ জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করতে পারে না বলে নানা দুঃখ ভোগ করে' থাকে, বাসনায়, বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। জীবনের শিল্পে সে অনভিজ্ঞ বলেই তার এ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। জীবনকে যে নূতন অর্থে ও অভিপ্রায়ে, শান্ত ছন্দে, নূতন ভাবে ও ভাষায় সুন্দর করে সৃষ্টি করতে পারে, এই মানবসংসারের বিচিত্র দশা-বিপর্য্যয়ের কবল থেকে শুধু সেইই তাকে অক্ষত রাখতে সক্ষম। জীবনের এই শিল্পরহস্যের নামই যোগ, যোগী সেই রহস্য জানে, সে হল সেই জীবনশিল্পী। যোগের দ্বারাই জীবনকে প্রাত্যহিক এবং ব্যবহারিক সংসারযাত্রার মলিন অবস্থা থেকে, সঙ্কীর্ণ বাসনা ও বেদনার গ্লানি থেকে, এবং নানা শোচনীয় পরিণামের গ্রাস থেকে মুক্ত করে'—বৃহৎ সৌন্দর্য্যের শুভ্র দেবমন্দিরে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। জীবনের মধ্যে তখন নূতন আশা, নূতন ভাষা, নূতন দেখা ও নূতন শোনা নূতন অনুভব ও নূতন অর্থ জন্ম নিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলে। সেই অপরূপের শিল্পী হল যোগী, সে হল জীবনশিল্পী। এই শিল্পের নানা সূত্র আছে। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কার ও সাধনার বৃহৎ বনস্পতি, এই মূল সূত্রগুলির শিকড় দিয়ে জীবনীরস সঞ্চয় করে বেড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের সনাতন এবং Classical সাধনধারার সঙ্গে বাউল সাধনার একটা নাড়ীর যোগ আছে। বাউল গ্রামের হতে পারে কিন্তু গ্রাম্য নয়।

ভারতের আধ্যাত্মিক জীবন একটা বৃহৎ ব্যাপার; নানান্ ধারা, নানাদিক থেকে এসে সেখানে মিলিত হয়েছে। সে একটা বৃহৎ সমন্বয়; তার মধ্যে আছে, বৈদিক যুগের জীবনসাধনা, উপনিষদের অতিজীবন তত্ত্ব—এবং ব্রহ্মবাদ, গীতার জীবনশিল্প এবং যোগ, মধ্যযুগের বৈষ্ণব রসতত্ত্ব এবং জীবন তত্ত্ব ইত্যাদি।

বৈদিক যুগের সাধনার মধ্যে একটা বস্তু ছিল, সেটা হল জীবনের প্রতি অনুরক্তি। জীবনকে বৈদিক মানুষ ভালবেসেছিল, সেইজন্য তাকে সুন্দর করতে এবং সুন্দর দেখতে তাদের ভাল লাগত। তারা এই জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং জীবনের মধ্যে আনন্দকে আস্বাদন করেছিল,—বৈদিক মন্ত্রগুলিতে তার অভিব্যক্তি আছে। জীবনের প্রতি এই ভালবাসা আমরা বাউলের মধ্যে পাই। বাউল, এই জগতের নানা সৌন্দর্য্য ও আনন্দ এবং জীবনের বিচিত্র রসে অবগাহন করে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। সে মায়াবাদী নয়, জীবনের সহজ ভোগ ও প্রেরণাকে অস্বীকার করে তার দিন চালান ভার। তার কাছে এই জগৎ এবং জীবন মিথ্যা বা নিরর্থক নয়, এর অতি গভীর সার্থকতা ও নিগূঢ় অর্থ আছে। এই জীবনের আশ্রয় হল মানুষ। মানুষের মধ্যেই জীবনের লীলা স্বতস্ফূর্ত্ত। এই সৌন্দর্য্য, আনন্দ, ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি বিচিত্র রসে রসান্বিত জীবন, মানুষের অবলম্বনেই আপনাকে সম্ভাবিত করেছে। সেইজন্যই বাউল মানুষিকতার পরিধিকে অতিক্রম করে যায় নি। মানুষ তার প্রিয়,—মানুষ ভাবহীন নির্গুণ সত্য বা ব্রহ্মসাধনার ফাঁকা মরুভূমিতে সে বিচরণ করে না, অথবা এই জগৎ এবং জীবনকে মায়াবাদের মরীচিকা ঠাওরায় না। তার গানে বারে বারে ফিরে ফিরে এই মানুষেরই হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। কিন্তু বাউলতত্ত্বে মানুষ-সংজ্ঞাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, মানুষ শব্দের সাধারণ ভাবের সঙ্গে সেটাকে গুলিয়ে ফেল্লে ভুল হবে। বাউলসাধনার মধ্যে একটা সাধারণ মানুষী ভাব আছে, গোড়ায় সেই সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু জানা দরকার, বিশেষ অর্থের অবতারণা পরে করবে।

নানারকম ভাবেই বাউল আমাদের থেকে একটু দূরে বাস করছে। তার সামাজিক এবং ভৌগোলিক জীবনযাপন-

পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা আমাদের আধুনিক সভ্যতার নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে। তার আচার বিচার, চলাফেরা, ভাবভাষা সবগুলিই সে তার নিজের জীবনের বিশেষ অর্থের দ্বারা চিহ্নিত করেছে; সেইজন্যই তাকে বুঝতে হলে একটা তুলনামূলক এবং ক্রমিকপদ্ধতির সহায়তা নিলে, সেটা অনেকটা সরল হয়ে আসে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাউল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি-নিধিত্ব একটা খুব মূল্যবান ও খাঁটি বস্তু। সাধনার মানুষী রূপ সম্বন্ধে, বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভয়ানক মিল, শুধু মিল নয়, এইখানে রবীন্দ্রনাথ বাউল। এই জায়গায় রবীন্দ্র-ভাব, বাউলমূর্তি নিয়েছে। কিন্তু এই মানুষী ভাবটিকে ভাল করে' হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, এখানে রবীন্দ্র-আদর্শ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপরিহার্য্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যজগতের একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে 'মানুষ'।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' শীর্ষক, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি আছে :—

'থাকো স্বর্গে হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,—
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা,—যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন
যত পাপী তাপী মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে, বাঁধিবারে চায়
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ড গুলি।'

মর্ত্ত্যপ্রীতির রস এই কবিতাটির হৃদয় থেকে ক্ষরিত হচ্ছে। বস্তুত সমস্ত রবীন্দ্রসাধনা এই মানুষী রসে রসায়িত। আমরা দেখতে পাব, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ভাবুকতায়, তত্ত্বালোচনায়, বহুরূপে, বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এই মানুষের জগতের সত্য ও সৌন্দর্য্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

দুটি বিষয় রবীন্দ্রহৃদয় সহ্য করতে পারেনি, প্রথম—শুষ্ক পাণ্ডিত্যপ্রসূত তত্ত্ব, দ্বিতীয় মায়াবাদ। আমরা দেখতে পাই যৌবনের অতি গোড়ার থেকেই—তাঁর মধ্যে এই জগতের বিচিত্র ও সহজ সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রতি, মানবহৃদয়ের—স্নেহ প্রেম, সুখ দুঃখের প্রতি, জীবনের নানা আনন্দ ও রসের প্রতি একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা জন্মগ্রহণ করেছিল। জীবন তাঁর কাছে অতি প্রিয় এবং সে অতি গভীর অর্থ বহন করে' থাকে। স্নেহ, ভালবাসা, সুখ দুঃখ দিয়ে গড়া মানুষের জগৎ তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য ব্যাপার এবং মানুষছাড়া জীবন ছাড়া কোনো শূন্য সত্য, তাঁর কাছে নিরর্থক ও নিষ্ফল। এই জন্যই হৃদয়রসহীন, সৌন্দর্য্যরসহীন কোনো শুষ্ক তত্ত্বকে তাঁর মন কোনোদিনই আপন করে নিতে পারেনি। জীবনকে মায়া বলে' উড়িয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে আরো কঠিন। তাঁর নানা রচনায় সেইজন্য মায়াবাদী এবং তাত্ত্বিকের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধ মনোভাব, নানাভাবে লক্ষ্যগোচর হয় :—

'হারে নিরানন্দ দেশ পরি' জীর্ণজরা
বহি' বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা—
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।

* * * *

লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা—
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা!'

ভারতের জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনার বৃহৎ ইমারতে—নানা মশলার মিশাল আছে। কত জাতির, কত জীবনের সত্য এবং সাধন-প্রতিভা, কতকাল ধরে' ধীরে ধীরে তার মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে! যুগে যুগে, কালে কালে, এখানে যারা এসেছে, তারা এর অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, তারা এখানে দেওয়া নেওয়া করেছে; সেইসব দান প্রতি-দানের নিরন্তর উত্তর ও প্রত্যুত্তরে, ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের বনস্পতি, নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ক্রমশঃ আপন বিস্তারের সীমা বর্দ্ধিত করেছে। শঙ্কর-বেদান্তের যে মায়া-বাদ, সে এই বৃহৎ বনস্পতির একাংশ মাত্র,—এরই একটি শাখা বা প্রশাখা পরিগণিত হতে পারে। ভারতীয় সাধন-

ব্যাপারের সেই শুষ্ক অঙ্কটাতে রবীন্দ্রনাথের স্পৃহা নাই। বৈরাগ্যের এবং মায়াবাদের সুর তাঁর কাণে বড় বেসুরো ঠেকেছে, সেইজন্যই বলেছেন :—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

শঙ্করের 'মোহমুদ্গার' তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি। জীবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অমৃতের আস্বাদ পেয়েছেন, সেইজন্য বৈদিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সব সাধনধারা, জীবন ও মানুষের স্পর্শে সরস, সেই সকল সাধনায় তাঁর রুচি আছে, তৃপ্তি আছে আনন্দ আছে!—সে সব সাধনধারার সঙ্গে তিনি আপন সত্যের এবং বাণীর যোগাযোগ অনুভব করেছেন।

এই জীবনতত্ত্ব বিশেষ করে বাঙ্লার জিনিস। গৌড়ীয় প্রতিভার মূলে, এই তত্ত্বই কাজ করছে। বাঙ্লার সাধনা জীবনমূলক। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতি সকল সাধকের বাণীই অল্পবিস্তর জীবনের বার্ত্তা বহন করছে।

এই ত গেল জীবনের কথা, মানুষের কথা; কিন্তু এবার প্রশ্ন হচ্ছে কোন জীবন এবং কোন মানুষ?—বস্তুত দেখবার ভঙ্গীতে বিষয়ের নানা চেহারা চোখে পড়ে। জীবনের ভিতরের দিক থেকে, অন্তরের আভ্যন্তরিক উপলব্ধির ছাঁচে বস্তুকে একরকম দেখায়, আবার বাইরের থেকে, প্রতিদিনের অভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকে অন্যরকম দেখায়। একই বিষয়কে দেখবার এই দুটি দৃষ্টি আছে,—একটি সাধারণের দৃষ্টি, আটপৌরে জীবনের অধিবাসী সাংসারিকের দৃষ্টি, অন্যটি সাধকের দৃষ্টি, মরমীর দৃষ্টি। এ দুটির মূল্য নির্ণয়ের সময় এখন নয়, শুধু ঘটনার বর্ণনা হচ্ছে মাত্র, অর্থাৎ ব্যাপারটা এছাড়া আর কিছু নয়। এই ভিতরের দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা দেখেন, তাঁরা হলেন সাধারণের বাইরে; তাঁরা এই প্রাত্যহিক পৃথিবীর নন; তাঁরা এই পৃথিবীকেও করেছেন অপার্থিব; এর নগণ্য ধূলিমাটি, এক অপূর্ব্ব মহিমার মহার্ঘতা অর্জ্জন করেছে তাঁদের চোখে। তাঁদের অন্তরের রসে রসায়িত হয়ে, এখানকার যা কিছু, এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্য লাভ করেছে, এক গভীর অর্থে সমৃদ্ধ হয়েছে। এখানকার সবই মূল্যবান, সবই সত্যের, ফেলে যাবার মত কিছুই মেলে না। সুখে, দুঃখে, আশায় আনন্দে জড়ান এই জীবন, এই মানুষ, এই জগৎ, এর তুলনা হয় না, অনেক সাধনার ফলে এই মর্ত্ত্যলাভ ঘটে থাকে। এইসব মরমীদের সাধনা স্বর্গের জন্য নয়, মানুষের জন্য, মর্ত্ত্যের জন্য, এই পৃথিবীর ধূলিমাটির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের অমৃতরসের জন্য। এই যে অতীন্দ্রিয় 'মানুষের জগৎ', এই হল, জীবন-মরমীদের লক্ষ্য। কিন্তু এ বড় সহজ কথা নয়, এই সীমার মধ্যে অসীমের লীলা ও আনন্দকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করা, এ কম সাধনার কথা নয়। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি'—উপনিষদের এই উপলব্ধির সুউচ্চ মহিমা এবং দুষ্প্রাপ্যতায়, আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যস্ত, ব্যবহারের জগৎ হ'তে দূরে থেকে, সে সাধনা, আপন মহার্ঘতায় মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করছে। মানুষের মধ্যে অমৃতকে উপলব্ধি করা, এই হল এ সাধনার শেষ কথা।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

পাশ্চাত্য মরমী মেটারলিঙ্ক যে 'নীলপাখী'র কথা বলেছেন, সে এই আনন্দ; এই জীবনের, এই মানুষের জগতের, এই সীমার মধ্যে যে অসীম খেলা করছে তারি আনন্দ। রবীন্দ্রনাথও বহুভাবে, বহুস্থানে, এই আনন্দের, এই মর্ত্ত্যের অমৃতের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এই সব মরমী, সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের অতীত এক নিগূঢ়, অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত জীবনের তত্ত্বকেই উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁরা একদিকে যেমন প্রাকৃত জীবনকে বর্জ্জন করলেন, অন্যদিকে তেমনি মায়াবাদকেও অস্বীকার করেছেন। এঁরা এ দুয়ের মধ্যস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন, জীবনকে স্পর্শ করে' আছেন, কিন্তু প্রাকৃত ভাবে নয়, অতীন্দ্রিয় জীবনই এদের আশ্রয়। সেইজন্য এঁদের মধ্যপন্থী বলা যায়। প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পাশ্চাত্যের মেটারলিঙ্ক, কার্পেণ্টার, হুইট্‌ম্যান, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি, এই শ্রেণীর সাধক ও ভাবুক। বাউল ঠিক এই দলেরি মরমী এবং এই অর্থেই তার সাধনা মানবী, অর্থাৎ তার সাধনায় জীবনের রসগুলিকে ত্যাগ করা হয়নি।

কিছুদিন পূর্ব্বে, পাশ্চাত্যে Positivism, Pragmatism, Humanism ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্ত মত-বাদের মধ্যে সত্যকে মানুষী এবং মানব সম্বন্ধযুক্ত করে দেখবার

প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে। Positivismএর প্রবর্ত্তক Comte, মানব সমাজের হিত এবং কল্যাণের আদর্শের দ্বারা সত্যের প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট করছেন। Pragmatismএর পুরোহিত William James, মানব জীবনে কার্য্যকারিতার দ্বারা সত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছেন। Humanismও তদ্রূপ। কিন্তু একটা কথা, এখানে সত্যকে মানুষী করে' তোলা হয়েছে ঠিক, কিন্তু সে মানুষ সামাজিক এবং ব্যবহারিক জগতের প্রাকৃত মানুষ, সাধক বা মরমীর মানুষ নয়। তাই সত্য হয়েছে সেখানে ব্যবহারিক এবং প্রাকৃত

জীবনের মধ্যে, জগতের মধ্যে অমৃতলাভ করবার সাধনা আছে। সে সাধনার নানা সূত্র, সেইসব সূত্র নিয়েই বাউলের জীবনদর্শন গঠিত

পূর্ব্বেই বলেছি, ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মসাধনার বিশাল ক্ষেত্র, বিচিত্র সাধন-তত্ত্বের শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ, বিচিত্র সাধনজীবনের বিবিধ ফলে পরিপূর্ণ। এই সাধনজীবনগুলিকে আমরা, বৃহত্তর ভাবে দুই ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি—একটি দিক আছে জীবনকে ত্যাগ করে,—অন্যদিকে আছে জীবনকে আশ্রয় করে। অদ্বৈতের সাধনধারা, এই জীবনকে ছেড়ে দেওয়ার দিক; এইখানেই নির্ব্বাণবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতির জন্ম। অন্যদিকে আছে জীবনকে বুকে করে; সেদিকে বৈষ্ণব, সহজিয়া ইত্যাদি তত্ত্বের জন্ম। এই সীমার জগতে, এই মানবজীবনের সহজরসের ভিতর দিয়ে যে অসীমের অমৃতরসকে উপলব্ধি করা, সেই হল বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতির তত্ত্ব। রবীন্দ্র-সাধনা ও কবীর, দাদু, মীরাবাই, নানক প্রভৃতি সাধকগণের সাধনধারাও এইদিকেরই বস্তু। জীবনের সহজ রসের মধ্যে এইসব সাধনার জন্ম বলে' এগুলিকে আমরা সাধারণ ভাবে সহজিয়া নামেও ডাকতে পারি। বাউল এই হিসাবে সহজিয়া।

জীবনের দর্শনে বাউলসাধনা সমৃদ্ধ। জীবন সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শনগুলি থেকে বাউলের তত্ত্ব লেশমাত্র পিছনে পড়বে না। বাউলের এই জীবনদর্শনের নমুনা কিছু কিছু দেখাবার চেষ্টা করা যাক্।

(১) এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে বাউলের সাধনা শুধুমাত্র ধর্ম্মের সাধনা বা তত্ত্ব নয়, সমগ্র মানবজীবনটাই তার অন্তর্গত, এই মানবজীবনের বিচিত্র রসে তার প্রাণের পেয়ালাকে সে ভরে নিতে চায়, কিন্তু প্রাকৃত ভোগমোহের ছাকনিটুকু বাদ দিয়ে। এই ছাকনি বাদ দিয়ে, জীবনের নির্ম্মল বিশুদ্ধ অমৃতটুকু পান করবার একটা কৌশল আছে, সাধারণের আয়ত্তের বাইরে সেটি, তার চাবি আছে, সাধকের হাতে, কবির হাতে, মরমীর হাতে, বাউলের হাতে। স্থূল ভোগ মোহে এবং আশা নিরাশার, পাওয়া না পাওয়ার নানা দ্বন্দ্বে মানুষের ভালবাসা বিক্ষুব্ধ এবং বিক্ষিপ্ত। সে বহির্মুখী ভালবাসা সেই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, তাতে অনন্তের উদার তৃপ্তি নাই; সঙ্কীর্ণ হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্যে সে অস্থির, এবং দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের আঘাতে সে বিক্ষুব্ধ; নানা বিরুদ্ধ পরিণাম বিপর্য্যয়ে সে বিপর্য্যস্ত। ভালবাসা যেখানে নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত ও অন্তর্মুখী, সেখানে সে, সকল দান প্রতিদানের অতীত উর্দ্ধে উঠে গেছে; সেখানে সে অপরাজেয়, সেখানে অসীম, শান্ত, আত্মপরিতৃপ্ত। পাওয়া এবং না পাওয়া, আশা এবং নিরাশার কোনো ঢেউ বা দ্বন্দ্ব সেখানে পৌঁছায় না; সে স্থির সে অচপল, সে আত্মপরিপূর্ণ! সীমাহীন তার প্রসার, সকল বিরোধ এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের সেখানে চরম এবং সার্থক অবসান ঘটেছে। এই ভালবাসাকে বাউল 'নিহেতু প্রেম' বলেছে:—

'মহাভাবের মানুষ হয় যেজনা
তারে দেখলে যায়রে চেনা।
ও তার আঁখি দুটি ছল ছল
মুখে মৃদু হাসিখানা।
সদাইরে তার শান্তরতি
হৃদকমলে জ্বলছে বাতি
রসিক সুজনা,
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল ধরে না
দেখলে যায়রে চেনা।
ফুলের আশা করে না যে
ফুলের মধু পান করে সে
রসিক সুজনা।
ও সে অনুরাগের ঘরে কপাট মেরে
নিহেতু প্রেম বেচা কেনা।
দেখলে যায়রে চেনা।

এ কথা বড় সহজ কথা নয়। জীবনের মধ্যে খুব গভীরে না তলালে, এসব তত্বের মনিমুক্তা আহরণ করা সম্ভব নয়। বাউলকে, জীবনসমুদ্রের ডুবুরী বলা চলে, সেখানে গভীর তলদেশে তার অবাধ সঞ্চরণ, নানা রহস্যের উদ্ঘাটন তার কাজ।

(২) ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতীত অখণ্ড সত্যের কথা :—

আমাদের মানবজীবনের এটা একটা মস্ত বড় গলদ যে আমরা সাধারণত জীবনের কোনো অতিব্যবহারিক অখণ্ড সত্যকে বা তত্বকে, বহু সময়ে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা খণ্ড উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করে থাকি,—সত্যকে তার নিজস্ব, নিরপেক্ষ, অখণ্ড মহিমায় দেখতে পারি না, তাকে বৃহত্তর জীবনের স্বর্গলোকে প্রয়োজনাতীতের রত্নসিংহাসন থেকে টেনে মাটিতে এনে মলিন করে ফেলি, ব্যবহারিক বা আটপৌরে জীবনের আশুপ্রয়োজনের তাগিদে সত্যকে ছোট কাজে লাগিয়ে তাকে একটা কাজচলা গোছের জিনিষ করে তুলি। বাউল বলছে :—

'নিঠুর গরজী
তুই কি মানসমুকুল
ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফ‍ুটাবি বাস ছুটাবি,
সবুর বিহনে।—'

(৩) তারপর ভোগের কথা :—

জীবনকে ভোগ করবার মস্ত বড় সাধনা আছে। তার রহস্য না জানলে ভোগ হয়ে ওঠে দুর্ভোগ। সেই ভোগের তত্ব আছে বাউলের রসতত্বে।

'কুসারের এত যে রস রসিক জানে,
ফল হলে কি সুখ হত রে ?

জীবনে প্রকৃত ভোগের আনন্দ অর্জ্জন করতে হলে, ভোগকে অন্তর্মুখী করতে হবে; বাইরের স্থুল ধরাছোঁয়ার এবং মোহের কবল থেকে রক্ষা করে, তাকে নিয়ে যেতে হবে অন্তরের অন্তঃপুরে, হৃদয়ের সুকুমার স্নেহস্পর্শের জন্য, সেইখানে লালিত হয়ে সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

এইবার বাউলের সাধনতত্ব এবং ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমেই আসে 'মানুষের' কথা। বাউলের এই 'মানুষ' সংজ্ঞাটির বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন; এর মধ্যে অনেক ভাব ঢাকা দেওয়া আছে। মানুষ শব্দটির মোটামুটি তিনটি বাউল অর্থ আছে :—

১। ঈশ্বর ২। অন্তর্য্যামী ৩। অক্ষর পুরুষ বা সাক্ষীসত্তা (Transcendental self)।

ঈশ্বর এবং অন্তর্য্যামী :—এই দুটি তত্বের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ঈশ্বর হলেন সকল জীবের আশ্রয়স্থল, তিনি সর্ব্বসাধারণের। কিন্তু তাঁকে যখন আমার অন্তরের নিভৃত অন্তঃপুরের একান্তে, নিতান্ত আমার একার করে' পাই, তখন তিনি অন্তর্য্যামী। আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার আশা আমার নিরাশা, আমার দেখা আমার শোনা, যা কিছু নিতান্তই আমার, তাদের নিয়েই আমার অন্তর্য্যামীর কারবার। বাহিরে যিনি সর্ব্বসাধারণের, তিনি যখন কেবলমাত্র আমার একলার হয়ে ওঠেন, তখনই তিনি আমার জীবনে অন্তর্য্যামীরূপে আবির্ভূত হন। 'চিত্রায়' রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্য্যামী' শীর্ষক যে কবিতাটি আছে, তা'তে আভাসে এই সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে তিনি অন্তর্য্যামীকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাতে তিনি শুধুমাত্র কবির জীবনের নিভৃত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি বাহিরের নন, আর কারো নন, কেবলমাত্র কবির সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী এবং নিয়ন্ত্রী।

'অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ—
মিশায়ে আপন সুরে।'

এই অন্তর্য্যামীকে বাউল, 'মনের মানুষ' সংজ্ঞা দিয়েছে।

অক্ষর পুরুষ :—আমাদের যে ব্যক্তিত্ব, তার দুটি স্তর আছে, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দুটি 'আমি' আছে—একটি ব্যবহারিক, অপরটি অতি ব্যবহারিক। ব্যবহারিক যে 'আমি', সে সংসারযাত্রার নানা খণ্ড সুখ দুঃখের দ্বারা বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত, আলোড়িত ও আবর্ত্তিত; বস্তুর ও জীবনের গভীর অর্থের মধ্যে তার প্রবেশ নাই। যে 'আমি' জীবনের সকল পরিণামের মধ্যে স্থির, যে নির্লিপ্ত, সকল ব্যাপারের ভিতর

থেকে তাদের গভীর অর্থটি সংগ্রহ করছে, সেই হল অতি ব্যবহারিক 'আমি',—অক্ষর পুরুষ বা সাক্ষীসত্তা (Transcendental self বা Spectator)। এই অর্থেও বাউল, 'মানুষ' শব্দের ব্যবহার করেছে।

অন্তর্য্যামী অর্থেই বাউলতত্ত্বে, 'মানুষ' শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী প্রচলিত। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠে এই যে অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর বা অক্ষর পুরুষ, এঁদের 'মানুষ' নামে অভিহিত করবার তাৎপর্য্য কি ?—সে কথা বলতে গেলে, তার সঙ্গে আরো কিছু বলা দরকার, সেটি হচ্ছে 'সহজিয়া' তত্ত্বের কথা। বাউল সাধনা ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে ভাল করে' কিছু বুঝতে হলে, 'সহজিয়া' সাধনা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। খুব সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয়, সহজিয়া সাধনা, বাংলার একটি বিশেষ সাধনধারা। সহজিয়া অর্থাৎ সহজের অনুরক্ত। সহজের যাঁরা সাধক, তাঁরাই সহজিয়া। আমাদের কাছে সব চেয়ে নিকট এবং সবচেয়ে সহজ, আমাদের এই জীবন, এবং জীবনের বিচিত্র রস। এই রসের দিকটাই আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে সবচেয়ে সহজ বস্তু ;—কৃচ্ছ্রসাধন, বা বৈরাগ্য বা অতিমানবিক কোনো তত্ত্ব বস্তু নয়। আমাদের ভারতবর্ষে নির্ব্বাণ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি সাধনপদ্ধতির ধারা, এবং মোক্ষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি অতিমানবিক তত্ত্বস্তুর আদর্শ প্রচলিত আছে। তারি পাশে ভক্তির, প্রেমের, রসের সাধনাও চলে আসছে ;—বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটি প্রবাহিত। রসের দিকটা সহজ, কিন্তু সেটা আরো সহজ হয়ে ওঠে, যখন সে রস মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়। মানুষের ভালবাসা এবং মানুষের প্রেমে, যে রস হৃদয়ে এবং জীবনে স্বতঃপ্রবাহিত হতে থাকে, সেই রসই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ রস, কারণ এ জিনিষটি মানুষের পক্ষে সহজাত (instinctive); এই মানুষী প্রেমকে অতিমানুষী sublimation করে তোলাই, এক কথায় সহজিয়া সাধনা।

এই জীবনের এবং মানুষের জগতের নানা পরিণাম এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ের হাত থেকে এড়াবার উদ্দেশ্যে, ভারতবর্ষের সাধনজগতে বহু চেষ্টা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সহজিয়া কিন্তু সেই মানুষকেই আঁকড়ে ধরেছে, মানুষের মধ্যেই সে অমৃতকে আস্বাদ করতে চায়, মর্ত্ত্যেই সে স্বর্গলাভ করবে। মানুষকে ছেড়ে অন্য কোনো স্বর্গ, মুক্তি, নির্ব্বাণ, এ সব কিছুই তার কাম্য নয়। বাউল সাধনা সহজিয়া সাধনার একটা উপধারা, সহজিয়া সাধনার সংজ্ঞা শব্দগুলি তাতে রয়ে গেছে, যদিও অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মানুষ শব্দের ব্যবহার, 'সহজিয়া'তে মানুষী অর্থে ঘটেছে। কিন্তু বাউল প্রধানত অন্তর্য্যামী বা ভগবদর্থে শব্দটির ব্যবহার করেছে। অবশ্য মানুষী অর্থের ব্যবহারও তার মধ্যে আছে।

বাউল সাধনা, কতকগুলি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে ; এখন আমরা সংক্ষেপে সেই তত্ত্বগুলির আলোচনা করে আমাদের প্রবন্ধ শেষ করব।

বাউল তত্ত্বগুলির একটা তালিকা এই ভাবে দেওয়া যেতে পারে :—

(১) রূপতত্ত্ব (২) মানুষতত্ত্ব (৩) গুরুতত্ত্ব (৪) রসতত্ত্ব (৫) রসিক তত্ত্ব (৬) সহজতত্ত্ব।

রূপতত্ত্ব ঃ—

'অধরাকে ধরবি যদি
ধরার সঙ্গ কর।'

বাউলের, এ অতি মস্তবড় দর্শন। অধরা হল, যাঁকে ধরা যায় না, যিনি অরূপ, অসীম। ধরা হল, যাকে ধরা যায়—এই রূপের জগৎ, সীমার জগৎ, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টি। অপরূপ যিনি, অসীম যিনি, সীমার মাঝেই তাঁর লীলা, তিনি সীমাকে ছেড়ে নেই, সীমারূপ হল তাঁর রসমূর্ত্তি। বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথাই এই।

'সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর।' (গীতাঞ্জলি)

এই সীমার জগতের আনন্দকে উপলব্ধি করা চাই, এই হল রূপতত্ত্ব।

মানুষতত্ত্ব :—

বাউলের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হল, 'মানুষ' তত্ত্ব। 'মানুষ'লাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের অন্তর্য্যামীই হলেন এই 'মানুষ'। এইখানে একটা কথা ;—ঈশ্বরকে, আমরা সাধারণত দূর থেকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, পূজা করি ; সেই পূজাতার দূরত্বকে অতিক্রম করে',—তিনি আমাদের দীন.

ঘরের দুয়ারে, একান্ত নিকটের হয়ে নেমে আসতে পারেন না; যতই করি, আমাদের আপন পূজাই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখে, ব্যবধান রচনা করে, দূরে সরিয়ে রাখে।

'দেবতা বলে দূরে রই দাঁড়ায়ে
বন্ধু বলে দুহাত ধরিনে।' (গীতাঞ্জলি)

বৈষ্ণবের মত, রবীন্দ্রনাথের মত, বাউল তার মানুষকে অন্তরের অতি নিকটে টেনে এনেছে, সখারূপে, বন্ধুরূপে আপনার করে' নিয়েছে। তাঁকে শুধু 'মানুষ' রাখেনি, তাঁকে সে অন্তরের রসে রসায়িত করে' 'মনের মানুষ' করে' নিয়েছে। সে 'মানুষ' বন্ধু, সাথী।

'আমার মনের মানুষ কে রে,
আমি কোথায় গেলে পাব তারে।
হারায়ে সেই মানুষে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

এই 'মনের মানুষের' সন্ধানেই বাউল বাউল হয়ে ফিরছে।

দেহতত্ত্ব

দেহতত্ত্ব বিষয়টি খুব ব্যাপক, এক কথায় সেরে দেওয়া চলে না; কথাটির নানা অর্থ আছে।

দেহতত্ত্ব, প্রথমত আমাদের এই মানবদেহের ভিতরকার পরিচয় এবং অসীম রহস্য ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। আমাদের দেহ ও মনের স্বরূপ, তার প্রকৃতি, ক্রিয়া, অর্থ ইত্যাদির বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা নিয়ে এর এক অধ্যায় রচিত হয়েছে।

'সে ঘরের আট কুঠুরী
দরজা সারি সারি,
বলিহারি কুদরত তাঁর,
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
সে ঘরের দিলে কোঠা
সপ্ততালায় আয়না আঁটা
তার রূপের ছটা চমৎকার—!
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
মাণিক মুক্তা লাল জওহারা
সেই ঘরে আছে পুরা
ষোলজন দেয় পাহারা
দুইজনে তাঁর চৌকীদার।
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।'

এই গেল তার ভিতরের নানা ব্যাপার এবং অবস্থার বর্ণনা। আবার তার প্রকৃতি এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে:—

'আছে চাঁদ মেঘে ঢাকা,
চাঁদের নীচে বিন্দুসখা।
মেঘের আড়ে চাঁদ রয়েছে
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা
সেডা কেবল কথার কথা।'

এখানে, আমাদের এই সাধারণ প্রাকৃত দেহের ভিতর যে অপ্রাকৃত এবং দিব্য অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, এবং সেই সৃষ্টির যে art বা কৌশল,—তারি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই মানবদেহের মধ্যেই সেই মানুষ বাস করছেন; তিনি দূরে, বাহিরের কোনো দেবমন্দিরে নেই, আমাদের এই দেহই তাঁর মন্দির, এইখানেই তিনি অহর্নিশি বর্ত্তমান। আমরা অনর্থক পাগলের মত, উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে, তাঁকে বাইরে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে হয়রাণ হচ্ছি। তিনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে আছেন

'আছে যার মনের মানুষ মনে
সে কি জপে মালা।
অতি নির্জ্জনে বসে' বসে'
দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চস্বরে
কোন্ পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকরে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত
ডলামলা।
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ
মনে তোলা।'

ঠিক এই কথাই এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রাজা' বা 'অরূপরতনে'।

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন তারায়
আলোক ধারায়
তাই না হারায়
তাই হেরি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।'

গুরুতত্ত্ব :—

সহজিয়া, বাউল ইত্যাদি সাধনা, গুরুমুখীসাধনা, অর্থাৎ এ সব সাধনা শাস্ত্রের অক্ষরের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নয়, এসবের সকল সংকেত গুরুর কাছ থেকে নিতে হয়, শাস্ত্রাকারে কোথাও লিপিবদ্ধ নেই ; গুরুর কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে লাভ করবার জিনিষ।

'মন লওরে গুরুর উপদেশ
জানতে পার সহজে।'

আমাদের ভারতীয় সকল সাধনধারাতেই গুরুর জন্য একটা মস্তবড় আসন নির্দ্দিষ্ট করা আছে। গুরু এখানে শুধু একজন ব্যক্তিমাত্র নয়, গুরু একটা তত্ত্ব। প্রত্যহের সাংসারিক জীবনের নানা আলোড়নের দ্বারা আমাদের জীবন বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত, আলোড়িত এবং মথিত হচ্ছে। নানা বাসনা, বেদনা এবং খণ্ড স্বার্থের মলিনতায় আমাদের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে ওঠে, সত্যের বিশুদ্ধ রূপ আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের আপন ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, বাসনা, স্বভাব, ক্রিয়া ইত্যাদির দ্বারা সত্যের রঙ্ আমরা বদলে দিয়ে থাকি, তাকে আমাদের নিজেদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে মনের মত করে' তৈরী করে' নিই, তার নিজস্ব রূপ বা শুদ্ধস্বরূপে তাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। যে সত্য আমাদের ব্যক্তিত্বের অতি ঊর্দ্ধে বিচরণ করছে, এ ভাবে তাকে জীবনের মধ্যে লাভ করা যায় না। একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় (Passive) করে', ভিতরটাকে একেবারে আলোড়নবিহীন করে' সেই সত্যের কাছে সমর্পণ করা, সেই সত্য যাতে অবাধে জীবনের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। ভিতরের আলোড়ন বন্ধ না হলে সে সম্ভব নয়। আপনাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বর্ত্তমানের শ্রীঅরবিন্দের সাধন-পদ্ধতিতে এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একে তিনি 'আত্মসমর্পণ যোগ' আখ্যা দান করেছেন, তবে তার রূপ একটু ভিন্ন ধরণের। গুরুতত্ত্বের গূঢ় এবং গভীর অর্থটি হল এই। আধ্যাত্মিক জীবনে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে 'সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করে' না দিলে, তাঁর সত্তাটি আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে প্রবেশ করবার দ্বার পায় না, আমাদের নিজের মনের চিন্তা, ভাবনা, বাসনা ও নানা আলোড়নের দ্বারা অহরহ বিকৃত ও ব্যাহত হতে থাকে।

বাউল-গুরুতত্ত্বের দ্বিতীয় মর্ম্ম এই যে, সেই পরম পুরুষই হচ্ছেন পরমগুরু, তাঁর আনুকূল্য ভিন্ন জীবনে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।

'গুরুরূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
কিসের আবার ভজন সাধন লোকজানিত করে।
* * * *
অধীন লালন বলে গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে—
এই ভবে নিরূপ মানুষ ফেরে।'

রসতত্ত্ব :—

বাউল সাধনা রসের সাধনা। আমাদের দেশে নানা সাধনপদ্ধতির প্রচলন আছে, কোনোটা বা কৃচ্ছ্রসাধন এবং বৈরাগ্যের পথ ধরে চলেছে, আবার কোনোটা বা রসের, প্রেমের, আনন্দের ধারায় অভিব্যক্ত। বাউল সাধনা—রসের সাধনা, 'জ্ঞানের' বা কৃচ্ছ্রের সাধনা নয়, সেইজন্য এরা নিজেদের 'অনুরাগী' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে।

'অনুরাগ লইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন মুখের কর্ম্ম,
ও দেখ তার সাক্ষী চাতক হে,
অন্য বারি খায় না সে।'

আবার

'মরি রাগে অনুরাগের বাতি
জ্বালগে নিজ ঘরে,
কোন্ ধামেতে আছে মানুষ
চিনে নেও গে তারে।'

বাউল, রসোপলব্ধির ভিতরেই, তার জীবনের সার্থকতা খুঁজেছে।

রসিকতত্ত্ব :—

রসতত্ত্ব এবং রসিকতত্ত্বের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। রসতত্ত্বের কথা হল, রসের পথেই পরমের সন্ধান করা, রসিকতত্ত্বে আছে রসের স্বরূপ নির্ণয়। রস ত হল, কিন্তু কোন্ রসকে আশ্রয় করতে হবে? বিশুদ্ধ প্রেমরস ; অর্থাৎ স্থূল ও ঐন্দ্রিয়িক ভোগমোহ নয়।

'প্রেমের সন্ধি আছে তিন
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন।'

অন্তরা

'গুরু-শিষ্য রসিক হলে
তবে অধর মানুষ মেলে
রূপ নেহারে গোল করিলে
এসে মানুষ যায় ফিরে।
কতজন পার হব বলে
বসে আছে নদীর কূলে
হঠাৎ করে' নামতে গেলে
ধরে' খায় কাম-কুম্ভীরে।'

প্রকৃত যে রসিক, সেই শুধু এই অনির্ব্বচনীয় প্রেমের অপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ লাভ করে থাকে, ইতরসাধারণ, একান্ত ঐন্দ্রিয়িক ভোগমোহের মধ্যে জড়িত হয়ে সে অমৃত থেকে বঞ্চিত হয়। সংক্ষেপে এই হল রসিকতত্ত্ব।

সহজতত্ত্ব :—

বাউলের কাছে সহজ শব্দটির একটি বিশেষ এবং বাউল অর্থ আছে। বাউলের সাধনা সহজের সাধনা, সেইজন্য এরা সহজিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু বাউলের এই সহজতত্ত্বটি কি ?—

(১) সহজতত্ত্বের প্রথম অর্থ হচ্ছে এই যে, বাউলদের ধর্ম্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়। তাদের, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি কোনো রকম সাম্প্রদায়িক চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না, অন্তরের সহজধর্ম্মই তাদের ধর্ম্ম। প্রকৃতপক্ষে বাউলদের হিন্দুমুসলমান নেই, ধর্ম্ম যেখানে জাতি, ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর অতীত, যেখানে তা' মানুষের অন্তরের সহজ বস্তু, সেইখানেই বাউলের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সমাজ সম্প্রদায় জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মই বাউলের ধর্ম্ম।

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে—,
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।'

(২) দ্বিতীয়ত, বাউলরা, কোনো বিধি নিয়ম বা আচার অনুষ্ঠানের বন্ধন স্বীকার করে না। কোনো চিহ্নিত সমাজের বা সম্প্রদায়ের, কোনো বিশেষ ক্রিয়াকলাপ বা আচার অনুষ্ঠানের অনুগত এরা নয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, এদের ধর্ম্ম কোনোরকম শাস্ত্রের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যে ধর্ম্ম মানুষের সহজাত ধর্ম্ম, অর্থাৎ হৃদয়ের সহজ অনুপ্রেরণায় যার জন্ম, এদের ধর্ম্ম সেই সহজ ধর্ম্ম।

(৪) শেষতঃ, এরা কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী নয় ; শরীর ও মনকে নিপীড়িত করে এদের সাধনা নয়। রসের পথে, প্রেমের পথে, সহজ আনন্দের পথে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের উপলব্ধিই এদের চরম লক্ষ্য। এই সব অনুবিধের বিভিন্ন অর্থে, এরা সহজিয়া অর্থে অভিহিত হয়ে থাকে।

আমাদের বাঙলার নিরক্ষর পল্লীতে, এই গভীর মরমী-সাধনা, শিক্ষিত লোকচক্ষু এবং লক্ষ্যের অগোচরে, একান্তে, নিভৃতে, তার অমূল্য সম্পদ নিয়ে অবস্থান করছে। দেখে মন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয় যে, এমন একটি অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীসাধনার মধ্যে, জীবনের শ্রেষ্ঠতম, সূক্ষ্মতম, উচ্চতম এবং আধুনিকতম তত্ত্ব এবং সত্যগুলি, এমন সহজে, সরস সৌন্দর্য্যে পুষ্পিত হয়ে আছে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

সংগ্রাম

শ্রীসুবোধ বসু
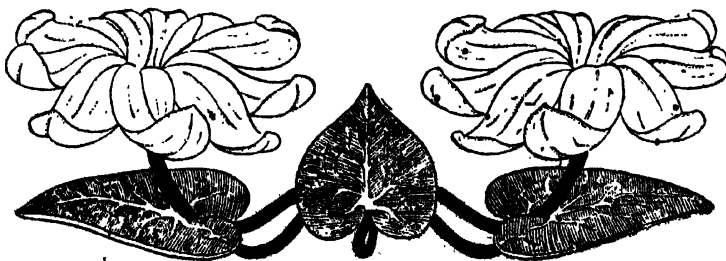
প্রশান্তের বাড়ির নিচতলা ভাড়া হয় না। ভাড়াটিয়াদের দোষ নাই,—এ আসে, সে আসে। কিন্তু প্রশান্তের স্ত্রীর কাহাকেও পছন্দ হয় না। কাহাকেও তার উগ্রস্বভাব মনে হয়, কাহাকেও মাতাল সন্দেহ হয়, কাহাকেও মনে হয় স্ত্রীর সঙ্গে কলহপরায়ণ। অমার্জ্জিত রুচি, গ্রাজুয়েট নয়, ধুতি অপরিষ্কার, হাতে উল্কি আছে প্রভৃতি কারণে অনেককে ফিরাইতে হইয়াছে। পত্নী-বৎসল প্রশান্ত যদিও ভাড়া মারা যাওয়ায় গভীর অস্বস্তি বোধ করিয়া মরিতেছে, তবু স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া লইবার মত কঠোর হইতে পারে নাই। তবে আজকাল একটু আধটু অর্দ্ধ-স্বগত বিলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু স্ত্রী সুষমা প্রকৃত আদর্শবাদিনীর মত উপযুক্ত ভাড়াটিয়ার আশায় অপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত। ভাড়া মারা যাওয়ার কথাটা তার কাছে মুখ্য নয়। কোনও বাড়ির কর্ত্তার যদি সম্পূর্ণ এক হাত গোঁপ থাকে বা সারাক্ষণ বাড়িতে ঝগড়া ঝাটি হওয়ার সম্ভাবনা হবু-ভাড়াটিয়ার মুখে স্পষ্ট দেখা যায়, যদি প্রৌঢ় হইয়াও রঙিন ছিটের শার্ট পরিয়া আসে বা সময়ে অসময়ে নাকের ছেঁদায় মুঠা মুঠা নস্যি গুঁজিয়া পঙ্কিল রুমাল বাহির করিয়া ফ্যাচফোঁচ্ করে বা বিড়ি টানিয়া ছাই সুষমার বসিবার ঘরের মেঝেতে ফেলে বা হাঁই তুলিতে হইলেই সমস্ত মুখবিবর ও ছ্যাতলা-পড়া দাঁতের সারি দেখায়, তবে একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন মহিলা কী করিয়া আর তাকে ভাড়াটিয়া করিতে পারে? কাজেই প্রশান্তের বাড়ি ভাড়া হইতেছে না।

· · ·

সুষমা কলেজে-পড়া মেয়ে। চারুকলার উপর গভীর তার প্রীতি। ফুল, কবিতা, জ্যোৎস্না, ছবি, গান প্রভৃতি বস্তুনিচয় তার কাছে একমাত্র সত্য ও সার্থকতাপূর্ণ মনে হয়। টাকাকে সে একটা মহৎ কিছু মনে না করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। তাই অত্যন্ত অবহেলা-ভরে সে খরচ করিয়া যায় এবং হিসাব নিকাশ ও সরবরাহ করিবার সমস্ত দায় প্রশান্তের উপর ছাড়িয়া দেয়।

এদিকে প্রশান্ত বেচারীর বাড়ি ভাড়া হওয়া সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই। এমন কি, টাকা-খরচ সম্বন্ধে অবহেলা যতই তার স্ত্রীর বেশি তীব্র হইয়া ওঠে, ততই বাড়ি ভাড়া না হওয়ার জন্য প্রশান্তের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া ওঠে। এ-কে তাকে আনিয়া বাড়ি দেখায় এবং প্রথমতঃ সুষমার ভাড়াটিয়া অপছন্দ হওয়ায় স-নিঃশ্বাসে বিদায় দেয়।

এমন যখন সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক অবস্থা তখন একদিন সুষমার ভাই শম্ভু আসিয়া কহিল—দিদি, তোদের নিচতলা ভাড়া দিবি, ভাল লোক আছে?

'মানুষ সব শুদ্ধ কজন?'

'সাড়ে তিনজন। স্বামী স্ত্রী আর বছর আট-নয়েকের এক ছেলে।'

'তুই জানিস্ তাদের?—রাগী বা নোংরা বা ডিস্‌পেপটিক্ নয় তো? নিশ্চয়ই গ্রাজুয়েট, আর বেড়াল আর পাখী-টাকি পোষবার বদ্ অভ্যেস নেই।'

'না, বেশ কালচার্ড পরিবার। আর যেমন মা তেমনি ছেলে গান করে। চমৎকার! এমন মিউজিক্যাল পরিবার আর দেখা যায় না। আট বছরের ছেলে,—গান গেয়ে মেডেল পেয়েছে এক ডজন। শীগ্‌গিরই গান রেকর্ডে উঠ্‌বে।'

'তা হলে তো বেশ'—সুষমা খুসির সঙ্গে কহিল।

'চমৎকার এক গানের আবহাওয়া এদের পরিবারে। মহিলাটিই বা কী চমৎকার গান গান্—মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।'

'বাঃ!'

'একেবারে আদর্শ পরিবার। ঝগড়া নেই, হাঁকাহাঁকি নেই। তাদের বদলে ভৈঁরো, রামকেলী, পিলু, পূরবী, বাগেশ্রী...'

'বেশ, আসুক তারা, আমার কিছু আপত্তি নেই'—সোৎসাহে সুষমা কহিল।

এক কোণায় প্রশান্ত চুপ করিয়া ঈজি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। সুষমার পছন্দের পরে কোনও কথা বলিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিবার মানুষ সে নয়। তবু মৃদু প্রশ্ন করিল,—কি করেন ভদ্রলোক?

তার কাছে টাকা আদায় হওয়াটা একটা মস্ত কথা।

'আর্টিষ্ট'—শম্ভু কহিল।

'ভাড়াটারা আদায় হবে তো?'

'নাম করা আর্টিষ্ট.—বিস্তর পয়সা পায় ছবি এঁকে। সর্ব্বত্র ওর নাম, এ কি আনাড়ি চিত্রকর?'

সুষমা কহিল—ভারি কালচার্ড পরিবার তো! স্বামী আর্টিষ্ট, স্ত্রী গায়িকা, ছেলে গায়ক। বাঃ, বেশ হবে। তুই তাদের বলে দিস্, শম্ভু, ওরা এসে থাকেন যেন।

প্রশান্ত উদ্বেগ-দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস চাপিয়া চুপ করিল।

শিল্পী পরিবার যথাসময়ে আসিয়া প্রশান্তের বাড়ির নিচতলা দখল করিল।

একদিনের মধ্যেই আর সন্দেহ রহিল না যে এরা গানের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে। উচ্ছ্বসিত সুষমা প্রশান্তকে পরিচয় দিতে লাগিল,—এই কানাড়া, এই খাম্বাজ, এই পিলু, বাঁরোয়া, পরজ, গাম্বার, ছায়ানট, কেদারা ইত্যাদি।

কিন্তু ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, সঙ্গীত আরম্ভ করিবার পক্ষে এদের যেমন উৎসাহ, বন্ধ করিতে তেমনি অনুৎসাহ। ভৈরবী দিয়া প্রভাতের আরম্ভ হয়, তারপর দিনের নানাক্ষণ অনুযায়ী সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুমোদিত নানা প্রকার রাগ ও বহু প্রকার রাগিনী গীত হইয়া গীত-শিল্পীগণ নিতান্ত শারীরিক পীড়া বোধ না করিবার পূর্ব্বে আর থামে না।

ভোর হইবার পূর্ব্বেই প্রশান্তের নিদ্রা দূর হইল। চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখে সুষমাও জাগিয়াছে। কহিল—নাঃ পারলুম না আর। কার সাধ্যি ঘুমোয় তোমার পূরবী রাগিনীর জ্বালায়!

'ওটা ভৈরবী',—সংক্ষেপে সুষমা কহিল।

'তা যেটাই হোক্', প্রশান্ত কহিল, 'শত্রুতা এও কিছু কম করে না। রোজ রোজ এমন শেষ রাত্তিরে ঘুম ভাঙলে স্বাস্থ্য থাকে কি করে?'

সহসা সরু গলার ভৈরবী থামিয়া গিয়া মোটা গলার সুর সাধনা সুরু হইল। সাতঙ্কে প্রশান্ত কহিল—ও আবার কে ঐ রকম করছে। বাতের ব্যথায় কাত্‌রাচ্ছে মনে হচ্ছে না?'

'ও বাড়ির বাবু গলা সাধছেন,'—সুষমা জানাইল।

'তিনিও গান করেন? কই, কখনো শুনিনি তো।'

'দুপুরে বাড়ি থাকো না কিনা, তাই শোনো নি।'

তবে শুধু সারা সকাল, সারা বিকাল ও সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধ রজনী মাত্র নয়, দুপুরেও সুর সাধনার বিরতি হয় না!

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া প্রশান্ত সহর্ষে আবিষ্কার করিল যে নিচের তলার সদর দরজায় তালা বন্ধ। সুষমার কাছে শুনিল, ভাড়াটিয়ারা গেছে ব্যারাকপুরে, আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াইতে। শুনিয়া একটা গভীর তৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস নাক হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইল।—অন্ততঃ আজ রাতটা আরামে ঘুমাইয়া লওয়া যাইবে।

শীঘ্রই খাওয়া দাওয়া সারিয়া প্রশান্ত শুইয়া পড়িল। অধুনা যে-রকম নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে তাতে শরীর অসুস্থ হইয়া না পড়িলে হয়। ঘুম নাকি সর্ব্বরোগহর, কিন্তু তার স্ত্রী ঘুম ভাড়া দিয়া দিয়াছে!

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মধ্যরাত্রে প্রশান্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল,—একশত ভূতপ্রেত যেন শ্যাওড়াগাছের ডালে ডালে এক বিকট চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। ঘুম ভাঙিলেও সেই চীৎকার কানে আসিতে লাগিল এবং তখন বুঝিল নিচতলায় গান হইতেছে। ইহাও বুঝিল, ব্যারাকপুর হইতে ইতিমধ্যে সকলে ফিরিয়াছে।

'নাঃ, কিছুতেই আর ঘুমোতে দেবে না দেখছি',—

বিরক্ত প্রশান্ত সঙ্গীতের উদ্দেশে কহিল, 'লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা অমন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে কেন? বাপ চাবকাচ্ছে নাকি?' 'কি যে বলো',—সহসা সুষমার মন্তব্য শোনা গেল, 'মধ্যরাত্রেই তো বাগেশ্রী গাইতে হয়,—খুব উঁচুদরের রাগিনী এটা।'

'তবে তুমিও জেগে',—প্রশান্ত কহিল, 'আর না জেগে উপায় কি,—কার সাধ্যি এতে ঘুমোয়।'

দিনের পর দিন অমনি চলিতে লাগিল। ভোর সাড়ে চার হইতে সাড়ে দশ, এগারো হইতে এক, দেড়টা হইতে সাড়ে চার ও তারপর পাঁচটা হইতে সুরু করিয়া ব্যক্তিগত অভিরুচি, চন্দ্রের অবস্থান ও নিদ্রাহীনতার পরিমাণ অনুসারে রাত্রি বার, এক ও দেড়টা পর্য্যন্ত সঙ্গীতচর্চ্চা হইয়া থাকে। পুত্র, মা, কখনও বা বাবা,—তারপর ওস্তাদ আসিয়া প্রতিরাত্রেই কণ্ঠের ওলটপালটকরা শিক্ষা দেয়, বন্ধুবান্ধব আসিয়া হার্মোনিয়াম লইয়া পড়ে। দিনের যতটুকু ফাঁক থাকে গ্রামোফোন-সঙ্গীতে ভর্ত্তি করা হয়—যাকে বলে গানের আবহাওয়া।

রাগিয়া প্রশান্ত বলে,—আর পারিনা, নোটিশ দিয়ে দিই।

'ছি, সে কি ভাল দেখাবে'—সুষমা কহিল।

'ভাল নয় কেন? এমন আর কিছুদিন চললে আমি খুন করে ফেলতে পারব।'

'সেদিন ডেকে আনা হল, আর আজই চলে যেতে বলা, কেমন দেখায় বলতো?'

'দেখাকৃগে। কিন্তু ধা নি সা ধা নি সা শুনলে আমারও যে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতে হয়, তার কি?'

'সে কথা তো আর ওদের বলা যাবে না।'

'যাবে না কেন?'

'কি ভাব্‌বে—'গান সহ্য করতে পারে না', 'সুরবোধ নেই'। আর লোকের কাছে এসব বলে বেড়ালে সেও কি কম অপবাদ?'

'এই গানের মধ্যে এনে ফেলে দিলে স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত স্বর্গে গিয়ে অভিনান্স করে গান বন্ধ করে দিতেন, তা জান?'

'কিন্তু লোকে শুনলে আমাদেরই ঠাট্টা করে বেড়াবে। হয়তো কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হতে পারে,—তখন সভ্যসমাজে মুখ দেখান ভার হবে।'

পত্রিকাকে প্রশান্ত বড় ভয় করে—বড় দমিয়া গেল। যদি কাগজ খুলিয়া একদিন দেখিতে পায়—'এবার হিন্দু গৃহস্বামীর সঙ্গীতবিদ্রোহ: কলিকাতার বাড়িঅলার লজ্জাকর কাণ্ড: সঙ্গীতসাধনার অপরাধে ভাড়াটিয়ার উপর নোটিশ'—তবে সত্যি তার অবস্থাটা কেমন হয়? তখন কি করিয়া সে ক্রুদ্ধ পাঠকসাধারণকে বুঝাইবে,—এ সঙ্গীত শুনিলে নিতান্ত বধিরও আপত্তি জানাইত, মড়াও কবর হইতে উঠিয়া শাসাইয়া যাইত।

কাজেই ভাড়াটিয়ারা নিশ্চিন্তমনে সঙ্গীতসাধনা করিয়া চলিল।

অফিস হইতে ফিরিয়া প্রশান্ত দেখিল তার স্ত্রী ছোট একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। প্রশান্তকে দেখিয়া কহিল,—'এটিই নিচতলার ছেলে,—যে গান গায়।'

এই সে?—যাকে শম্ভু অর্দ্ধেক লোক বলিয়া উপহাস করিয়াছিল এবং প্রতিশোধ-স্বরূপ যে উপরতলার জীবন কণ্ঠছুরিকা দিয়া ছিন্নভিন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে? সবিস্ময়ে তার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত কেবলই ভাবিতে লাগিল,—এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়?

প্রশান্ত কহিল,—'সারাক্ষণ তো তোমরা গান করো খোকা,—পরিশ্রম হয় না?'

'কিচ্ছু না।'

'বেশি গান করলে গলা খারাপ হয়ে যায়।'

'তা আর হতে হয় না, রোজ ভোরে গলার জন্য আমরা ওষুধ খাই।'

'নিত্যি নিত্যি চিরকাল এমনি গান কর?'

'হ্যাঁ—তবে কাল থেকে একটু বেশি হবে। মামাবাবু আসচেন কিনা। নামজাদা কালোয়াত তিনি, দিনে চারঘণ্টা শুধু গলাই ভাঁজতে হয় তাঁকে; আর আমাদেরও বেশি গায়িয়ে নেন।'

তবে কালোয়াত মামা কালই আসিতেছেন!

সময় সম্বন্ধে প্রশান্তের কোনও উদ্বেগ নাই। কারণ মামার জন্ত দিন তো আর চব্বিশ ঘণ্টার বেশি বাড়িয়া যাইবে না। তবে কালোয়াতের কণ্ঠ যে আরও বলিষ্ঠ, সুরসাধনা যে আরও ভৈরব এবং রাগরাগিণী যে আরও বিচিত্রতর হইবে সে আশঙ্কায় প্রশান্তের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

মামা আসিল এবং সঙ্গে আসিল তানপুরা, তবলা ও তবলচি এবং মামার শিষ্য এক ছোকরা ক্লারিওনেট-বাদক। এবং এতদিনে সুষমা স্বামীর জন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে প্রশান্ত লাফাইয়া ওঠে। চক্ষু লাল, চুল আলুথালু, মুখে হিংস্রতা, মুষ্টিবদ্ধ হাত। মামার আলাপ-বিস্তারের সঙ্গেই প্রশান্তের মধ্যে জিঘাংসার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, কিন্তু মধ্যরাত্রে যখন ক্লারিওনেট আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্ত সিঙ্গা ফুঁকিয়া বাহির হয় তখন প্রশান্তকে ধরিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে। বলে,—'ছাড়, ওর মাড়িটা ঘুষিয়ে ভেঙে দিয়ে আসি।' হাবভাব দেখিয়া সুষমার আশঙ্কা হয় যে প্রশান্ত কথামত কাজ করিয়া আসিতে পারেও বা।

ললিতকলার উপর এমন হইলে কার আর ভক্তি থাকে। 'ওদের বাড়ির কর্তাকে', সুষমা কহিল, 'একটু বলেই এস না হয়, সারাক্ষণ এমনটা হলে বড় অসুবিধা হয়।'

প্রশান্তের যা মানসিক অবস্থা তাতে অনুরোধের চাইতে বলপ্রয়োগ করিতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে-হেতু মারামারি আর সত্যই করা যায় না সেই জন্ত নোটিশ দিতে পারিলে তবু সে সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু পত্রিকার ভয়, ভদ্রসমাজে কলারসজ্ঞানহীন বলিয়া দুর্নামের আশঙ্কা প্রভৃতি কারণে ভাড়াটিয়াকে অনুরোধ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই,—দয়া করিয়া সুরের অনুশীলন যদি একটু কমায়।

আর্টিষ্ট হইলেও ভদ্রলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাচ্যকলানুরূপ মোটেই নয়। বরঞ্চ মনে হইতে পারিত তিনি সার্কাসের আর্টিষ্ট,—পেশল দেহ, পুষ্ট খাটো ঘাড়ের উপর আধ কামানো এক মাথা, আধ হাত লম্বা গোঁপ, হাতে উল্কি পরিয়া চিত্রানুরাগের ইন্‌জেকশান লইয়াছেন। অর্থাৎ বিখ্যাত চিত্রকর ও সঙ্গীতপ্রিয় পরিবারের কর্তা না হইলে সুষমা কদাচ এমন লোককে বাড়িতে স্থান দিত না।

কুণ্ঠিত অনুনয়ের সুরে প্রশান্ত কহিল—সারাক্ষণ আপনারা গান করাতে আমাদের বড়ই অসুবিধে হয়।

'তা আমরা কি করবো, মশায়। গান বন্ধ করে দেব নাকি?' চিত্রকর ঝাঁঝাইয়া কহিল।

'গানের তো সময়ক্ষণ আছে,—সময় মত গাইলে কারুরই অসুবিধে হয় না।'

'গানের সময় অসময়? নতুন কথা শুনলাম! আচ্ছা বেরসিক বাড়িঅলা আপনি যা হোক।—আমার বাড়িতে গান হবেই।'

'বিরাম হবে না?'

'বিরাম হবে না। আমি একজন বিখ্যাত আর্টিষ্ট তা জানেন? চারদিকে সারাক্ষণ গানের আবহাওয়া না হলে আমার ছবি আঁকা হয় না,—আপনার জন্য ব্যবসা বন্ধ করবো নাকি? বেশ আক্কেল তো।'

'তবে মশায়ের যদি সুবিধে হয়, এ-মাসেই আমার বাড়িটা ছেড়ে দেবেন দয়া করে,'—প্রশান্ত গম্ভীর হইয়া কহিল।

'সুবিধে আমার মোটেই হবে না। বললেই গেলুম আর কি? সেদিন তবে সেধে আনা হয়েছিল কেন?'

সুষমার ভাড়াটিয়া নির্ব্বাচন যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে প্রশান্তের আর সন্দেহমাত্র রহিল না।

নোটিশ দেওয়া হইল এবং একমাস পরেও তাহা অবজ্ঞাত রহিল। লাভের মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চার কাল ও উচ্চতা বৃদ্ধি পাইল মাত্র। এবার প্রশান্ত কী করিবে? আদালত? শান্তিভঙ্গের জন্য পুলিশ? ভাড়াটিয়ারা অবশ্যই সম্পূর্ণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আদালত করিলেও কেলেঙ্কারি এবং পত্রিকা ও কলারসিক জাতির ধিক্কার। অথচ সঙ্গীতের এই কারখানায় সারাদিন সারারাত্রি যাপন করা যে কি দুর্ব্বিষহ যাতনা তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায় পাওয়া যায়।

সুষমার কলাপ্রীতি সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। স্বামীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সে বেজায় চিন্তিত হইয়া উঠিল। ইহার জন্য দায়িত্ব যে সম্পূর্ণই তার সে কথা সে বিস্মৃত হয় নাই।

অপার সঙ্কটে পড়িয়া প্রশান্ত হাবুডুবু খাইতেছে। এই সঙ্গীতের মধ্যে আর কিছুকাল থাকিতে হইলে তাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে। অথচ সে করে কি? বক্রি ভাড়া প্রশান্ত চায় না,—অমনি দয়া করিয়া এরা উঠিয়া গেলে বাঁচে। কিন্তু যাওয়া দূরের কথা, নিচের মাটীতে ওরা নিত্য নতুন ফুলগাছ ও পুঁইয়ের চারা লাগাইতেছে।

প্রশান্ত কহিল—'নাঃ আমি পাগল হয়েই যাব।'

'আদালতই কর না হয়'—সুষমা পরামর্শ দিল।

'কিন্তু খবরেব কাগজ?—'বাড়িঅলার সঙ্গীত বিদ্রোহ: গান গাহিবার অপরাধে ভাড়াটিয়া তাড়িত'—এ সবের কি হবে?'

'তাও তো বটে।'

সুষমার ভাবনার আর অন্ত রহিল না।

অবশেষে পশ্চিমের দেশীয় ভাষা ও ইংরেজি ভাষার নানা খবরের কাগজে একদিন বিজ্ঞাপন বাহির হইল—'দুইজন ওস্তাদ আবশ্যক। গলার তীব্রতা, উচ্চতা ও রুক্ষতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুপারিশ। মৃদু কোমল কণ্ঠের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।'

শীঘ্রই দুইজন উপযুক্ত ওস্তাদ জোগাড় হইল। গলা নরম বলিয়া বাঙালীর আবেদন গ্রাহ্য হইল না। লু-তপ্ত যুক্তপ্রদেশ ও মরু-তপ্ত রাজপুতানা হইতে দুই সঙ্গীতবীর বাঙলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পিলু গাহিয়া প্লীহা চমকাইয়া দিতে ও কদরপিয়া ঠুংরিতে কোদণ্ডটঙ্কার তুলিতে পারে। অন্যজন সুরের গামা,—পেশীবহুল সঙ্গীতের যেন রুদ্রভীষণ সংগ্রাম সুরু হইয়া যায়, সহস্র বৈশাখের মিলিত ঝড় ধ্রুপদে হুঙ্কার আরম্ভ করে, নিচতলার ক্লারিওনেট কণ্ঠস্বরের নিকট ডুবিয়া ধিক্কৃত হইয়া চুপ করে। বলা বাহুল্য সুষমা এদের নিযুক্ত করিয়াছে। উপরতলায় সুরের সাইক্লোন, সুরের ভূমিকম্প, সুরের আগ্নেয়গিরিস্রাব নিরন্তর ভয়ঙ্করতর হইয়া হইয়া উঠিল। সুষমারা যাইয়া আশ্রয় লইল হোটেলে।

বেশিদিন লাগিল না, এক সপ্তাহের পরই সপুত্রপরিবার আর্টিষ্ট, মায় মামাবাবু ও ক্লারিওনেট-বাদক একদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ছাড়িয়া পালাইল,—দিনের আলোয় মুখ দেখাইবার সাহস পর্য্যন্ত পাইল না।

শ্রীসুবোধ বসু

গদ্য কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ বলেছিলেন, 'সহিত' হতে সাহিত্য শব্দের উদ্ভব। 'সহিত' শব্দের মানে নৈকট্য অর্থাৎ সাহিত্য বলতে এমন কিছু বোঝায় যার মধ্যে আমরা অর্থহীন শব্দের রাশি পাইনা, পাই শুধু শব্দের মালা, যার অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু যুগে যুগে বিদগ্ধেরা বলে এসেছেন যে সাহিত্য শব্দের এ অর্থ সঙ্গত নয়—বা সঙ্গত হলেও সম্পূর্ণ নয়। পশুর শব্দের মধ্যে যে অর্থ আছে তা অস্বীকার করতে দুঃসাহসিকতার প্রয়োজন—কিন্তু তা বলে পশুর শব্দকে সাহিত্যের রাজ্যে জায়গা দিতে অতিবড় ভীরুও রাজি হবেন না। সেই জন্য আর এক আলঙ্কারিক বিজয়ধ্বজ তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বলেছিলেন যে 'সহিত' শব্দের মানে পাঠক ও লেখকের হৃদয়কে নিকটে আনা—দু'জনের মনের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন। টলষ্টয় এক সময় বলেছিলেন যে সাহিত্য মানে Contamination of joy—এও ঠিক সেই কথা। সেই জন্য আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন তার শব্দ আর শব্দগত অর্থ নিয়েই তুষ্ট থাকি না, আমরা তার সঙ্গে পাই সাহিত্যিকের মনের নিবিড় অনুভূতি। আমরা যে আনন্দ বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই—অথচ সন্ধান পাইনা, কবি সেই লোকাতীত আনন্দের দ্বার নিজের মনের মাঝে খুলে দেন—কবির মাঝে আমরা পাই সেই অনুভূতি—তাই সাহিত্য পাঠে আমাদের আনন্দ। শব্দের মধ্যে যে সাধারণ আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আরও কিছু আছে সেইটে আস্বাদ করে আমাদের মন ওঠে খুসী হয়ে। এই আরও কিছুটা হচ্ছে রস। শব্দ শুধু সেই রসজগতের দূত, অর্থ শুধু সেই রসের রংমহলের দ্বারী। যিনি রংমহলে যেতে চান, তাঁর দূত বা দ্বারীকে নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় নেই—কাজের শেষে তাদের বকশিশের আশা আছে—এই পর্যন্ত।

এই মাত্র বলেছি বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্য হলেই কাব্য। অর্থাৎ এই রসের রংমহলে যেখানে সাহিত্য-রাজা বসে রয়েছেন—তাঁর দরজায় রয়েছে অর্থ, তাঁর দূত হচ্ছে শব্দ। কিন্তু এই দ্বারী আর দূত নিয়েই একটা রাজসংসার সম্পূর্ণ নয়—সেখানে আরও অনুচরের প্রয়োজন আছে। তাই আমাদের রসে পৌঁছুতে হলে শব্দ অর্থ ছাড়াও আরও কিছুর দরকার। গানের সুর ও কাব্যের ঝঙ্কার এর মধ্যে প্রধান। যেখানে শব্দ আর অর্থ ধীর পায়ে চলেছে সেখানে সুর আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়—আমাদের যাত্রাপথ সহজ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কেবা শুনাইল শ্যামনাম" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোন এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এটুকু বলিবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে পশে তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক বেশী আদায় করে নিতে হয়।' এ আদায় করবার ভার পড়েছে সুরের পরে। 'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' এর মধ্যে ছন্দের ঝঙ্কার নেই, অত্যন্ত সহজ কথাটী, কিন্তু সুর একে পৌঁছে দিয়েছে রসজগতে। তেমনি যখন কবিতায় এই সহজ সুরটা লাগে না তখন তার ঝঙ্কার আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় রসজগতে। যেমন 'বর্ষশেষ' কবিতাটী। ঐ যে "ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর নৃত্য হোক তবে"—এর মধ্যে শব্দে শব্দে আঘাত লেগে যে ঝঙ্কার বাজছে সেই ঝঙ্কারেই একটা সুরের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সুরই কাজ করছে রসের অন্যতম উপকরণ হিসেবে।

এইখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে ঝঙ্কার রসের উপকরণ, তার রূপ দ্বিবিধ—এক আমাদের আবেগের ভিতর দিয়ে তার স্বরূপ ফুটে ওঠে, আর এক,—যা আমাদের

বুদ্ধির ভিতর দিয়ে রসসৃষ্টি করে, যেমন—

চল চপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ—

এর মধ্যে যে লঘুপদক্ষেপে ছন্দগুঞ্জরণ করে গিয়েছে আর তার ফলে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বেজে উঠেছে তা রসের সৃষ্টি করছে আমাদের Sense বা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। এ যেন জয়দেবী ছন্দের চাল—এর মধ্যে ঝঙ্কারটা খুব সুস্পষ্ট—আমাদের মনকে গাঢ় মিষ্টরসে দেয় ভরে—যা বেশীক্ষণ চলে না। কিন্তু এমন ঝঙ্কারও আছে যার মধ্যে এই ঝঙ্কার সুস্পষ্ট নয়, যার ছন্দের দোলার ফাঁকে ফাঁকে নিগূঢ় ঝঙ্কার আবিষ্কার করে আমাদের মন ওঠে খুসী হয়ে—কবিতা পড়বার সময় আমাদের কানের সঙ্গে মনের খেলা চলতে থাকে—ফলে সৃষ্টি হয় আরও বিচিত্র রসের, যেমন—

Our brains ache, in the merciless iced east winds
that knife us
Wearied we keep awake because the night is
silent···
Low drooping flares confuse our memory of
the salient
Worried by silence, sentries whisper,
curious, nervous
But nothing happens

—Wilfred owen—'Exposure'

ঐ যে silent ও salientএর মিল—তা চল চপলার মতো সুস্পষ্ট নয়—এর মধ্যে আমাদের sense বা অনুভূতি ছাড়া বুদ্ধি বা intellect এর কাজ যথেষ্ট রয়েছে তাই এই ঝঙ্কারে যে রস সৃষ্টি হয়েছে সে রস আরও বিচিত্র কারণ বৈচিত্র্যই বুদ্ধির ধর্ম্ম।

কবিতার ভাষা রসের আর এক উপকরণ। যখনি আমাদের মনে ভাবের প্রবল বন্যা দেয় দেখা, তখনই আমাদের ভাষায় দেখা দেয় উত্তেজনা! যেমন মেঘনাদের প্রথম কয় লাইন যদি চলতি ভাষায় লেখা হোত তা হলে বিষয়-বস্তুর সাম্য থাকলেও রসের পার্থক্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতো। যথা—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোলো বীর বাহুবীর যবে
বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলে মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই। কও মা স্বরস্বতী
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রঘুকুলের নিধি।*

এ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখানে বীর রসের বদলে হাস্য রসের সম্ভাবনাই বেশী।

রসের সব চেয়ে প্রচলিত উপকরণ ছন্দ। সুর যেমন কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেয়, ছন্দও তেমনি কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় উন্মুখ রবীন্দ্রনাথের কথায়—সেতারের তার বাঁধা বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। যেমন ত্রৈমাত্রিক ছন্দে লেখা—

বিংশতি কোটী মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে—পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা

এর মধ্যে যেমন শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা দিয়ে একটা বেগের সৃষ্টি করছে·· যে বেগে আমাদের মনে উৎসাহ ওঠে জেগে—যদি এটাকে জোড়ামাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা হয় তবে তার বেগটা পাব না—ফলে ঘটবে রসের বিচ্যুতি। যেমন—

যেথায় বিংশতি কোটী মানবের বাস
সেই তো ভারতবর্ষ যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে।

. কিন্তু যাঁরা বিদগ্ধ তাঁরা বলবেন—কাব্যজগতে "এহো বাহ্য"—অর্থাৎ শব্দ, অর্থ, সুর, ঝঙ্কার, ছন্দ ও ভাষা এই কয়টাই রসের সৃষ্টি করে বটে কিন্তু বহুমুখীন রসের প্রকাশ এর দ্বারা সম্ভব নয়, যুগে যুগে দেখা গেছে যে—যখনই মানুষের মনে একমুখীন ভাবধারায় সাড়া বাজতে থাকে তখনি এই কয়টী উপকরণের পরে ঝোঁক পড়ে যথেষ্ট—অর্থাৎ রোমাণ্টিক কাব্যে এই কয়টীর পরেই প্রাথমিক নির্ভর। পৃথিবীর

* রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ'

রূঢ় ঘাত প্রতিঘাতে কবি যখনই তাঁর স্বপ্নলোকে চলে যেতে চান তখনি তাঁর বাহন হয় ভাষা, ছন্দ, ঝঙ্কার। যখনই কবির সেই অপরূপ ছন্দোঝঙ্কার বাজতে থাকে তখনি আমাদের মন এ বাস্তব জগত ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। যেমন কবি বর্ষার কথা বলছেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভরভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা—
শ্যাম গম্ভীর সরসা......ইত্যাদি।

যেমন কবির বীণার তারে তারে বেজে উঠ্‌ল স্বরের ঝঙ্কার তেমনি বর্ষার বীভৎসতা ছেড়ে আমাদের মন উধাও হয়ে গেলে সেই কল্পলোকে, যেখানে কেবল সজল সমীরে যূথীপরিমল আস্‌ছে ভেসে, তমালকুঞ্জ তিমিরে দাদুরীর ডাক-ধ্বনিত হয়ে উঠছে, যেখানে তরুণীরা ঝুলন উৎসবে মগ্ন—যেখানে

কুসুম পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে—

এই যে ভাবধারা এটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে তীব্রতা আছে বৈচিত্র্য নেই। কবির মনে বর্ষার সজল মেঘ যে নিবিড় রস ঘন আনন্দের জোয়ার জাগিয়াছে—কবি সেই জোয়ারে তরণী ভাসিয়ে কল্পলোকে চলে যেতে চান—তাঁর এই যাত্রা পথের সহায়ক তাঁর ভাষা ছন্দ ও ছন্দোঝঙ্কার। সেই জন্যে আমরা যুগে যুগে দেখেছি রোমাণ্টিক কাব্যে এই সবের প্রাধান্য। Epipsychidion এর মধ্যে শেলী একথা স্পষ্টই বলেছেন

The winged words on which
my soul would pierce
Into the height of Loves rare Universe.

কিন্তু কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে সে রোমাণ্টিক অনুভূতির তীব্রতা কমে গিয়েছে, আমাদের মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে কেবল একমুখীন ভাব নিয়ে মানুষের সত্তার সম্পূর্ণতা নয়। মানুষের মনের মাঝে চেতন অবচেতন ও অচেতন স্তরে যে নানা বৈচিত্র্য আলো অন্ধকারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে একটা কথায় বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যদি আমরা শেলীর মতো কেবল প্রেম দিয়ে এই বিচিত্র চরিত্রকে বুঝতে চেষ্টা করি—তা হলে বাস্তবিক পক্ষে আমরা হয়তো একটা দিককেই রূপ দিতে পারবো—কিন্তু মানুষের মাঝে যে নানা প্রবৃত্তি সংঘাত সৃষ্টি করে মানবচরিত্রকে ক্ষণে ক্ষণে রহস্যময় করে তুলছে—যে রহস্যকে আমরা সব সময়ে দার্শনিক মাপকাঠী দিয়ে মাপতে পারি না,—সেই বিচিত্র প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ আমাদের হবে না। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রোমাণ্টিক কাব্যে হাস্যরসের অভাব। কবি তাঁর নিজের অনুভূতি নিয়ে এত ব্যস্ত যে তখন মানুষের মধ্যে যে সমস্ত বৈচিত্র্য আছে সে দিকে তাঁর দৃকপাত নেই।

কিন্তু যখন ক্রমশঃ সাহিত্যে এই রসবৈচিত্র্য স্বীকৃত হোলো, তখন রসের এমন কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হোলো যার মধ্য দিয়ে এই বৈচিত্র্যের প্রকাশ সম্ভব। তখন ঐ প্রচণ্ড আবেগময় ভাষা—যা কেবল চঞ্চল আবর্ত্তে ফেনিয়ে উঠে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এক অদ্বৈত রূপকে,—সে ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষার খোঁজ পড়লো, অন্য ছন্দের প্রয়োজনও হয়ে উঠ্‌লো সুস্পষ্ট। সহজ কথায় বল্‌তে গেলে রসের দ্বৈতীভাব স্বীকার করে তাকে কাব্যে রূপায়িত কর্‌বার চেষ্টা হতেই গদ্য কাব্যের উদ্ভব।

রসের দ্বৈতীভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পেতে চায় বহু উপায়ে। এর সব চেয়ে সহজ (crude) পন্থা হচ্ছে নাটকত্ব। নাটক মানে আমাদের জীবনের একটা অখণ্ড ছবি, তার মধ্যে হাস্য করুণ বীভৎস মধুর প্রভৃতি নানা রস ঢেউ তুলে যাচ্ছে। তাই কবি কখন কখনো এই নাটকীয়ত্বের আশ্রয় নেন কাব্যের মধ্যে তাঁর অনুভূতির বৈচিত্র্য প্রকাশ করার জন্যে। কিন্তু কবি যখন আরও সাহসী হয়ে ওঠেন তখন নাটকের আশ্রয় ছেড়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসেন তাঁর ভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে। যেমন Whitman বল্‌লেন—

One hour to madness and joy !
O furious ! O confine me not !
(What is this that frees me so in storms ?
What do my shouts amid lightnings
and raging winds mean ?)

যে আনন্দের তীব্র বেগ এসে কবিহৃদয়কে নাড়া দিয়েছে—প্রথম লাইনে সেই তীব্র বেগই প্রকাশ পেয়েছে চঞ্চল ভাষা ভঙ্গীতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চেতনতা ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর আবেগের স্বরূপটা জানতে। অর্থাৎ কবি তাঁর উচ্ছ্বাসের এক দিক দেখেই তৃপ্ত নন—সেই সঙ্গে তাঁর অন্যদিকে নজর রয়েছে পুরোমাত্রায়—এইখানেই তাঁর বিচিত্রতা।

কিন্তু পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে—কবির সুরটি সহজ স্বাভাবিক নয়। তাই কবির রস যখন গাঢ়তর হয়ে আসে—তখন কবি এ রকম সহজ প্রশ্ন করেন না—তখন তাঁর অনুভূতি-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় Condensed imagery এবং রূপক অর্থাৎ symbol এর মধ্য দিয়ে। ঐ একটা উপমার মধ্যেই কবি বুঝিয়ে দিলেন যে একসঙ্গে তাঁর চিত্তপটে রামধনুর কতো রঙ খেলে যাচ্ছে—তাঁর মনোবীণায় একসঙ্গে কতকগুলি সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। হপকিন্সের কবিতা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু আমাদের রসসমুদ্র নাড়িয়ে তুলতে রূপকের ক্ষমতা আরো বেশী, সুরের সহজ গতিতে যেমন আমাদের সমস্ত অন্তর একটা তারের মতো ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তেমনি রূপকের ব্যবহারে আমাদের মনের আঁধার কোণে লুকানো হাজারো অচেতন অবচেতন স্মৃতি হঠাৎ নাড়া খেয়ে আমাদের মনের মধ্যে নানা সংঘাত জাগিয়ে তোলে,—ফলে বিচিত্র আবেগের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে পদ্য কাব্যের রসের উপকরণ ভাষা ছন্দ প্রভৃতি। কিন্তু রসের বৈচিত্র্য স্বীকার করা হ'তেই যে গদ্যকাব্যের উদ্ভব তার মাঝে ভাষা নাটকত্ব, বা রূপক প্রভৃতিরই প্রাধান্য বেশী হওয়া স্বাভাবিক। আবার কবিতার বিষয়বস্তু যখন এই আকার ধারণ করে তখন পদ্য ছন্দ হতে পৃথক আর একটা ছন্দের প্রয়োজনও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পদ্য ছন্দের যে ঝঙ্কার সেটা আমাদের আবেগ অর্থাৎ sense এর মধ্য দিয়ে কতোগুলি রসের সৃষ্টি করে যার মধ্যে তীব্রতা আছে বৈচিত্র্য নেই। অথচ গদ্যে আমরা পাই কেবল বুদ্ধি বা intellect এর রাজত্ব যার মধ্যে কবিতার প্রবেশ নিষেধ। কাজেই যে বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যের তীব্রতা আছে অথচ তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই সে এমন একটা বাহনের প্রয়োজন বোধ করে যার মধ্যে ঐ অনুভূতি ও বুদ্ধি, sense ও intellect এর একটা সুষ্ঠু মিলন ঘটেছে—যেটার মধ্যে ঝঙ্কারটা সুস্পষ্ট নয় অথচ যার মধ্যে একটা নিগূঢ় ঝঙ্কার আছে—যেটাকে বার করে আমাদের মন ওঠে খুশী হয়ে। তাই গদ্য কবিতার মধ্যে যদি পদ্য ছন্দের তাল এসে দোলা দেয় তা হ'লে সেটা গদ্য কবিতা হবে না, অথচ তার যদি একটা অন্তর্গূঢ় সামঞ্জস্য না থাকে তা হলে সেটা গদ্য হবে, কাব্য নয়। সেই জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আমরা বলতে পারি "পদ্যের কাছ ঘেঁসে যেটা দাঁড়ালো, অথচ পদ্যের সমস্ত শাসন মানলো না, তাকে বলি Free Verse বা মুক্ত ছন্দ। আর যেটা দাঁড়ালো গদ্যের গা ঘেঁসে তাকে বলা চলে ছন্দোময় গদ্য rhythmed prose. আবার এ দুয়ের মাঝে দাঁড়ালেন আর একজন যাকে বলা যেতে পারে গদ্য কবিতা, prose poem"এর মধ্যে বাঁধাধরা সামঞ্জস্য থাকবে না সত্য কিন্তু "শব্দ সমষ্টির এক একটা পর্ব্বের পুনরাবর্ত্তন বা ক্রমিক অনুসরণ (graded sequence) দ্বারা ছন্দোবোধ গড়ে উঠবে।"

তা হোলে দেখা যাচ্ছে যে গদ্য কাব্যও এক রকম কাব্য—যার বিষয়বস্তু বিচিত্র, যার লক্ষণা রূপক প্রভৃতি; বহুবিধ, যার বাহন Free Verse ও rhythmed prose এর মাঝামাঝি একটা কিছু। এইখানে আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে যদি এরোপ্লেন বা কলকারখানা সম্বন্ধে একটা কবিতা লেখা হয় তাহলেই যে সেটা গদ্য-কবিতার ভাল বিষয় হবে—আর একটা গোলাপফুল কেবল রোমান্টিক পদ্য কবিতার বিষয় হবে—এ মতবাদটা মোটেই সঙ্গত নয়। গদ্যকাব্যের একমাত্র সুবিধা এ নয় যে এটা "ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মত প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে পরিহার না করেও চলতে পারেবে,"—বরং "পথের ধূলাবালিকে কাব্যের সীমানার মধ্যে নিয়ে আসাই যে তার একমাত্র কাজ নয়, এর মধ্যেও যে গভীর ভাবের প্রকাশ সুন্দর হ'তে পারে" এবং সেটা পদ্যকাব্যের চেয়ে নূতনতর ও বিচিত্রতর ভাবে হতে পারে এইখানেই গদ্যকাব্যের সার্থকতা। আসলে কাব্যের যা প্রাণবস্তু অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের অন্তরের মধ্যে নৈকট্য আনা—এ পদ্য ও গদ্যকাব্য উভয়ের মধ্যেই থাকা

চাই কারণ তা না হলে সেটা কাব্যশ্রেণীতে আসন পাবে না। দুয়ের পার্থক্যটা প্রাথমিকভাবে বাহ্য অঙ্গেরও নয় বা বস্তুগতভাবে (Objectively) বিষয়বস্তুরও নয়—তফাৎটা কেবল ব্যক্তিগত (Subjective) দৃষ্টির—I. M. Parsons এর কথায় It is changes in attitude, not subject matter which affect the course of poetry.

আমরা গদ্যকবিতার স্বরূপ, লক্ষণ ও বাহনের পরিচয় জেনে এইবার রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

'লিপিকার' মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সব প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা গদ্যকাব্যে। কিন্তু তার মধ্যে কবির গদ্যকাব্যের ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠছে মাত্র; তাই আমরা 'পুনশ্চ' ও 'পরিশেষের' যুগ থেকে আরম্ভ করব।

'পুনশ্চের' ভূমিকায় কবি তাঁর গদ্য কাব্যের তত্ত্ব বল্‌তে চেয়েছেন—সেইজন্য সেটা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কবি বল্‌ছেন্—

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেচি……এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বল্‌বার আছে। পদ্য কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস……।

আরো পরের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদিও এ রবীন্দ্রনাথের মতের মিল নেই তথাপি 'পুনশ্চের' কাব্যতত্ত্ব যে এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এ কথা আমরা অসঙ্কোচে মেনে নিতে পারি। ভূমিকাটী পড়লে দেখা যাবে যে এর মধ্যে দুটী কথা খুব স্পষ্ট—(১) প্রথমতঃ এই যে কবিতাগুলি তা কেবল পরীক্ষা অর্থাৎ experiment মাত্র এবং (২) শুধু ছন্দের বন্ধন ভাঙা ছাড়াও পদ্যরীতির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীকে ত্যাগ না করলে উঁচুদরের গদ্য কাব্য হওয়া সম্ভব নয়। কবি কিন্তু এখানে মনে রাখেননি যে গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ কি জন্যে কাব্য শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, গীতাঞ্জলির কাব্য ত'র বাহ্য অঙ্গের পরে সম্পূর্ণ তো নয়ই—আংশিক ভাবেও কতটা নির্ভর করে সেটা বিচার সাপেক্ষ। বস্তুতঃ গীতাঞ্জলির পদ্য বিষয়বস্তুই তাকে কাব্যশ্রেণীতে আসন দিয়েছিল তার বাহ্য অঙ্গ নয়। কবি কিন্তু এখানে এমন এক কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যার মধ্যে গীতাঞ্জলির পদ্যরস থাকবে না—অথচ থাকবে তার বাহ্য অঙ্গ, এবং এই যে সৃষ্টি এটাও কবির পরীক্ষামূলক

'পুনশ্চ' কাব্যখানি ভালভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে—এই পরীক্ষার ফলে দু'রকম কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে—এক, যার বাহ্য অঙ্গ গদ্যকবিতার মতো মিলবিহীন হলেও জিনিষটা খাঁটী পদ্যকাব্য—এবং আর এক, যার মধ্যে সত্য গদ্য কবিতার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ছুটী' বা 'সুন্দর' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা, যেমন 'ছুটী' কবিতাটী—

> দাও না ছুটী
> কেমন করে বুঝিয়ে বলি
> কোন্‌খানে।
> যেখানে ঐ শিরীষ বনের গন্ধপথে
> মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা,
> যেখানেতে মেঘভাসা ঐ সুদূরতা;
> জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
> সন্ধ্যা তারা উঠার মুখে;

যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্ গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদল রাতে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কবির অনুভূতি এখানে খাঁটি রোমান্টিক—তার মধ্যে পূর্ব্ব-কথিত বৈচিত্র্য নেই, আছে একমুখীনতা; ঐ যে কবি ছুটী নিয়ে জগতের ধূলিমলিন রঙ্গমঞ্চ থেকে এমন জায়গায় যেতে চাচ্ছেন যেখানে প্রতিদিনকার অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো খোঁচা দিয়ে ওঠে না, যেখানে অতীতের দুঃখস্মৃতিকে কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে—যেখানে সারাদিন মৌমাছিদের কলগান নদীর জলো-চ্ছ্বাস। আবার বাহ্য অঙ্গ বা ছন্দের দিক থেকে * দেখ্‌লেও দেখা যাবে যে এর মধ্যে গদ্যকাব্যের ছন্দ ঠিক ফোটেনি —যে সমবৃত্ত ছন্দ এখানে নেচে চলেছে সেটা পদ্য ছন্দেরই নামান্তর। যথা—দাওনা ছুটী I কেমন করে I বুঝিয়ে বলি I কোন্ খানে I যেখানে ঐ I শিরীষ বনের I গন্ধ পথে I মৌমাছি দের I কাঁপছে ডানা I সারা বেলা II এর মধ্যে শুধু যে পর্ব্বের ঐক্য আছে তা নয়, মাত্রারও ঐক্য আছে—. রবীন্দ্রনাথের ভাষার চাল ও চলন (ছন্দ—১৩ পৃষ্ঠা) উভয়েরই সাম্য আছে—এবং এই সাম্যে এ জিনিষটা পদ্যছন্দে পরিণত হয়েছে কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের মতেই গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন থাকবে না *

(মাত্রাসংখ্যা, যেমন মুদ্রিত: দাওনা ছুটী ২ ১, কেমন করে ২ ১, বুঝিয়ে বলি ২; কোন্ খানে ১ ২, যেখানে ঐ ১ ১, শিরীষ বনের ১ ২, গন্ধ পথে ১ ২; মৌমাছি দের ১ ২, কাঁপছে ডানা ১ ২, সারা বেলা ১ ২)

কিন্তু 'পুনশ্চের' মধ্যে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যার মধ্যে পদ্যবস্তু বা পদ্যছন্দ এতোটা প্রবল হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীকে আবার দুভাগে ভাগ করা চলতে পারে। প্রথম, সেই শ্রেণীর কবিতা যেটা শুধু 'পুনশ্চে' নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষের যুগে প্রাধান্য লাভ করছে—যার মধ্যে কবি তাঁর অনুভূতিকে বৈচিত্র্য দেবার জন্য নাটকীয়ত্ব বা নাটকোচিত গল্পের কথাবস্তু অবলম্বন করেছেন—অর্থাৎ যার মধ্যে কবি সহজ প্রকাশকে দূরে রেখে নাটকীয়ত্বকে ডেকেছেন তাঁর গদ্যকাব্যের সহায্য করবার জন্য। এ শ্রেণীর মধ্যে পড়বে 'ক্যামেলিয়া', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'প্রথম পূজা' ইত্যাদি। কিন্তু এ ছাড়াও কতকগুলি কবিতা আছে যার মধ্যে কবি নাটকত্ব পরিহার করে সহজ মানুষ ও সহজ প্রকৃতির অনাড়ম্বর বর্ণনা দিতে চেয়েছেন—যেমন 'কোপাই', 'খোয়াই', 'দেখা', 'শেষদান' প্রভৃতি। প্রথমে ধরা যাক নাটক শ্রেণীর কবিতা—যেমন 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি,' কবিতাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—সুনৃতার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে অনিলের। কিন্তু কারুর বাবার মত নেই। সুনৃতা ঠিক করেছিল তার বন্ধু অমুর বাড়ী থেকে বিয়ে হবে, এমন সময় অনিলের চিঠি এল—

বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে
হোলোনা না কিছুতেই
কাজেই—

সুনৃতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তাকে তার বাবা নিয়ে গেলেন হোসেঙ্গাবাদে। এ দিকে অনিলের বিয়ের দিন অনিল লুকিয়ে দেখতে এল সুনৃতার—ঘর হুহু করে উঠল মনটা—
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,

---

* ছন্দ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত অনুসরণ করেছি। সংক্ষেপে গদ্যছন্দ সম্বন্ধে তার মতটা এই—পদ্যে যেমন ছন্দ নির্ণয় হয় মাত্রার সংখ্যা ও যতির অবস্থান অনুসারে, তেমনি গদ্য ছন্দে মাত্রা ও শব্দ সংখ্যার বদলে একটা phrase বা অর্থবাচক সমষ্টিই হচ্ছে rhythmic unit বা ছন্দের উপকরণ, পদ্যে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু গদ্য কবিতায় মাত্রাসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নয়। পদ্যের পর্ব্বে যেমন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রাসমষ্টি, গদ্য কবিতার প্রতি পর্ব্বে পাই অর্থবাচক শব্দসমষ্টি। এই প্রকারের পর্ব্বের পুনরাবর্ত্তন বা ক্রমিক অনুসরণ (graded sequence) দ্বারা ছন্দোবোধ জন্মে। অর্থের সম্পূর্ত্তি অনুসারে কয়েকটা পর্ব্ব নিয়ে একটি স্তবক, আবার কয়েকটি স্তবক নিয়ে একটা কবিতা সম্পূর্ণ। কিন্তু সাধারণ গদ্য থেকে তার যে একটা কিছু পার্থক্য থাকবে সেটা যতিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

* এর সঙ্গে 'প্রবাহিনীর' একটা গান তুলনা করলে দেখা যাবে যে দুয়ের মধ্যেই একমাত্র পদান্তে মিলছাড়া পর্ব, মাত্রা, ছন্দের চাল বঙ্কার—কিছুরই তফাৎ নেই—

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,
সাগর মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটী তুলে।
প্রবাহিনী ১২ পৃষ্ঠা

মূর্চ্ছিতের নিঃশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের, না শুকনো ফুলের,
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—

টেবিলের নীচ থেকে—ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি তুলে নিয়ে অনিল দেখলে

ঝুড়ি ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে—
অনিলেরই হাতে লেখা,
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফটোগ্রাফ,
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটী ফুল, লাল ফিতের বাঁধা
মেডেন হেয়ার পাতার সঙ্গে,
শুকনো প্যানসি আর ভায়োলেট।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন যে 'পুনশ্চের' এই শ্রেণীর কবিতায় 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যাহা নগন্য, যাহা বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে তাহাকে কবি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। কিন্তু এ কবিতায় আমরা যে বিষয়বস্তু পাই সেটা—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নগণ্য তো নয়ই—এ বিষয়বস্তুর ছন্দোবদ্ধ কাব্যে হয়তো আরও ভাল প্রকাশ লাভ করা অসম্ভব নয়, কারণ কবি নাটকীয় ভাবে কবিতার মাঝখানে সুনৃতার জীবনে হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দিয়ে অনিলের জীবনের কথা আরম্ভ করেছেন—সেটা আপাতত: নাটকীয় হলেও বস্তুতঃ নাটকীয় নয়। যেখানে নাটকের পূর্ণমাত্রায় সাফল্য সেখানে আমরা একমুখীন রস পাইনা পাই বহুমুখীন রস যার মধ্যে কবি কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নি। যদিও ব্রাউনিং আধুনিক গদ্যকবি ন'ন, তথাপি তাঁর নাটকত্বের সাফল্য অবিসম্বাদিত। তাঁর ঠিক এই একই বিষয়বস্তুর কবিতা In a Gondola যদি আমরা পড়ি তা হলে আমরা দেখতে পাব যে যেখানে নর নারীর প্রেম চরমে উঠছে—পুরুষস্পর্শে নারীর হৃদয় ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রেমিকার ছুরীতে প্রেমিক নিহত হ'ল। এই যে বৈচিত্র্য, এটাকে ব্রাউনিং সফল করেছেন নাটকের দ্বারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে নাটকত্ব এখানে টেনে এনেছেন সেটা তাঁর অনুভূতির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ দেবার জন্যে নয়—কারণ এখানেও তাঁর অনুভূতি একমুখীন সেটা কেবল তার বাহ্য অঙ্গকে ঠিক রাখবার জন্যে, যাতে পাঠকের মন তাঁর অনুভূতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ঐ কথোপকথনের দিকেই দৃষ্টি রাখে।

সব শেষে কবির সহজ কবিতায় এলেও আমরা সেই একই কথার অন্তরূপে পুনরুক্তি দেখতে পাব। এর মধ্যে আমাদের সব চেয়ে চোখে পড়ে 'কোপাই' কবিতাটী, যাকে কবি প্রথম আসন দিয়েছেন। অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত বলেছেন "এই কবিতাটি সর্ব্বতোভাবে অনবদ্য এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।" তাঁর এই উক্তিকে তিনি সমর্থন করেছেন সাধারণ ভাবে সমস্ত রবীন্দ্র গদ্য কাব্যকে—ও বিশেষ ভাবে এ কবিতাটিকে তিন দিক দিয়ে বিচার করে, এক এর 'সহজ সরল অভিব্যক্তি ও দ্বিতীয় এর 'নিসর্গ বর্ণনা', এবং তৃতীয়তঃ এর মধ্যে 'প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে' স্বীকার করার দিক থেকে। কিন্তু 'কোপাই' কবিতাটী ভাল করে পড়লে আমরা দেখতে পাই যে—এখানে সহজ সরল অভিব্যক্তি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে স্বীকার করার মধ্যে সংঘাত বেধে গিয়েছে—দুয়ের মিল হয় নি।' কবি আরম্ভ করেছেন—

পদ্মা কোথায় চলেচে বেয়ে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
একপারে বালুর চর,
নির্ভীক সে, কেননা নিঃস্ব নিরাসক্ত—
অন্যপারে বাঁশবন আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে;
অনেক দিনের গুঁড়ি মোটা কাঁঠাল গাছ—
পুকুরের ধারে শর্ষে ক্ষেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিৎ,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিন রাত উঠছে মর্ম্মরধ্বনি।

* *

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী,
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার
অনার্য্য তার নামখানি

কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষায় সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ
আর এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।
* * * * * *
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া মাতাল মেয়ের মতো,—

পাঠক লক্ষ্য করবেন কবি দ্বিতীয় লাইনেই স্বীকার করছেন যে পদ্মার বা কোপাইএর এই যে ছবি এর মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে তিনি স্বীকার করেননি', যে ছবি তিনি দিয়েছেন সেটা তাঁর 'মনে মনে' দেখা ছবি—তার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্বন্ধ কম।...কবি পদ্মার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যেও কবি ঝোঁক দিয়েছেন বহু পুরানো আমবন কাঁঠালবনের পরে—দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিতের পরে, যার ফলে আমাদের নদী বাস্তব নদী না হয়ে আমাদের কল্পনা রাজত্বের নদী হয়েছে, যে নদী—

লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।

লোকালয়ের প্রাত্যহিক জীবন অস্বিকার করাই যার ধর্ম্ম। কাজেই যদি এর মধ্যে সহজ অভিব্যক্তি হয়েও থাকে তা হলেও সেটা সম্ভব হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনকে স্বীকার করা হয়নি বলে অর্থাৎ এ কবির কল্পনারাজ্যের সহজ অভিব্যক্তি বাস্তব রাজ্যের নয়। বাস্তবিক এ কথা কবি 'পুনশ্চে'র মধ্যেই স্বীকার করেছেন।

এই দিন দূরকালের আর-কোন একটা দিনের মতো।
* * * * * * *
বর্ত্তমানের নোঙর ছেঁড়া ভেসে যাওয়া এই দিন।
* * * * *
যে কাল সকল কালেরই ধরা ছোঁওয়ার বাইরে
তেমনি এই যে......আষাঢ়ের দিন
—'সুন্দর'
মন বলে আমার এই দেখার টুকরো
চাইনে হারাতে
—'দেখা'

অর্থাৎ কবি জীবনের সমগ্রতাকে, তার হাস্যকরুণ বীভৎস প্রভৃতি রসবৈচিত্র্যকে স্বীকার না করে কেবল এক একটা প্রিয় মুহূর্ত্তকে দেশকালের বাইরে নিয়ে গিয়ে অমর করবার চেষ্টায় নিযুক্ত;—যে-চেষ্টা কবির 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে আরম্ভ করে 'ক্ষনিক মিলন' 'মেঘদূত' 'সোনার তরী' 'ক্ষণমিলন' 'আবির্ভাব' প্রভৃতি বহু ছন্দোবদ্ধ অতুলনীয় কাব্যে প্রকাশ পেয়ে এসেছে তা আজ গদ্যছন্দের আকার ধারণ করতে গিয়েছে। কিন্তু তার সাফল্য কতখানি সেটা বিচার করবার জন্য আমি ছন্দের প্রমান দাখিল করছি—

পুরাণে প্রসিদ্ধ। এই নদীর নাম
মন্দাকিনীর প্রবাহ। ওর নাড়ীতে,
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে। চলে যায়,

এই শেষ লাইনটা ধরুন, 'স্বতন্ত্রের' পরে দেহটা এত সম্পূর্ণ যে তার পরে বাকী কথাগুলিতে ছন্দের rhythm একেবারেই নেই—এ একেবারে সহজ গদ্য। পাঠক এখানে যতি বসাতে গিয়ে লক্ষ্য করবেন যে সুবিধা মতো সুন্দর যতিভাগ কিছুতেই হয় না, কারণ এতে গদ্যছন্দের কোন চিহ্ন নেই। এই ধরণের লাইন এ কবিতায় প্রচুর—যথা—

তার। এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে

যতি কোথায় পড়বে—'সঙ্গে' ও 'ওপারের' পরে, না খালি 'সঙ্গে'র পরে না খালি 'ওপারের' পরে? যেখানেই যতি থাক অস্বাভাবিক হবে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে সহজ গদ্য—দায়ে ঠেকে 'আজ' ও 'ছন্দকে'র পরে যতি দিতে হয়—তেমনি—

শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,

—শেষ সপ্তকের সঙ্গে তুলনায় দেখা যাবে যে কবির গদ্য-কাব্যের মাপকাঠিতে গদ্যের দিকে এটা বেশী ঝুঁকেছে, কাব্যের দিকে ততটা নয়। তৃতীয়তঃ নিসর্গবর্ণনার দিক দিয়ে দেখতে গেলেও পাঠক দেখবেন যে কবি রসের বহু উপকরণের মধ্যে কেবল ভাষা ও শব্দের সাহায্য নিয়েছেন—রূপক সাঙ্কেতিক প্রভৃতি দূরে সরে রয়েছে। উপমাও সেখানে আছে, সে উপমা ছত্রে ছত্রে বিস্তৃতি লাভ করে—আলঙ্কারিক (ornamental) ও বর্ণনাশীল (descriptive) হয়ে উঠেছে—সাঙ্কেতিক (symbolic) হয়নি'।

এই প্রসঙ্গে 'পত্রপুটের' কবিতাগুলিও বিচার্য্য। 'পুনশ্চের' মধ্যে আমরা যে দোষগুলি দেখতে পেয়েছি 'পত্রপুটে' আমরা তার একটা অন্যরূপে পুনরুক্তি পাই, 'পত্রপুট' পড়লে পাঠকের যেন মনে হয় যে কবির অনুভূতির বৈচিত্র্য তো নেই-ই, কিন্তু 'পুনশ্চের' কোন কোন কবিতায় যে তীব্রতা ছিল সে তীব্রতার অভাব যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ফলে ঘটেছে অলঙ্কার (rhetoric) এর প্রাধান্য উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করছি,-

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগলো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্য্যাস্ত—সীমার রঙীন পাঁচিল ডিঙিয়ে—
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়লো মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুনলাগা হাতীশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে,—

* * * * *

এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
বাতাসের ঝটকা আসে
...ঘন আঁধির ভিতর থেকে উঠছে ঘরহারা গরুর
উত্তরোল ডাক
দূরে নদীর ঘাটে হৈ হৈ রব।
...কাকগুলো পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে মাটীতে

এর সঙ্গে পাঠক তুলনা করুন "বর্ষশেষে'র একটী ছত্রের—

ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি
পশ্চিমে বিচ্ছিন্নমেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

দেখা যাচ্ছে দুই জায়গাতে একই বিষয়বস্তু কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে: ঐ গরুর ডাক, ঐ পাখীর উৎকণ্ঠা, ঐ সন্ধ্যা মেঘের পাটকিলে রং—এই একই জিনিষ দুই জায়গাতেই বর্ণিত হয়েছে—এবং তাও কোন নূতনভাবে নয়, পুরাতন ভাবেই কারণ একমাত্র চলতি ভাষা ছাড়া এ দুয়ের মধ্যে বিষয়বস্তু বা রসলক্ষণার কোন পার্থক্যই খুঁজে পাচ্ছিনা।

'পত্রপুটের' সঙ্গে কবির পূর্ব্বের কাব্যের আঙ্গর অনুভূতির সমতাও দুষ্প্রাপ্য নয়। যেমন তেরো নম্বর কবিতায় কবি তাঁর জীবনের নানা বিচিত্র মুহূর্ত্তের বর্ণনা দিতে দিতে বলছেন—

এই চির চঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্ম্মরধ্বনি
উধাও করে দেয় আমার জাগ্রৎ স্বপ্নকে
চিল উড়ে যাওয়া দূর দিগন্তে
জলহীন মধ্যদিনে মৌমাছির গুঞ্জন-মুখর অবকাশে।

* * * *

এদেরই মৃদু বীজন এসে লাগে
শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিত দয়িতার—
নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের চেলাঞ্চলে।
প্রিয়-প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে
শিহর লাগাতে থাকে এদেরই দোলায়িত কম্পনে।

পাঠক এই সঙ্গে তুলনা করুন 'লীলাসঙ্গিনীর' একছত্র, দেখবেন শুধু যে বিষয়বস্তু বা বর্ণনা এক তা নয়—ঐ পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি কবির মনে যে সাড়া জাগিয়েছে—সেটী পর্য্যন্ত এক—

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি।—
কল্পনা-পটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখার পুষ্পধূলিণ
আবার নিভৃতে হবেকি রচিতে
মানসপ্রতিমাগুলি

৩

কবির কিন্তু সব গদ্য কাব্যই পরীক্ষামূলক নয়। কবি

সেদিন তাঁর এক অভিভাষণে বলেছেন—"অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হ'তে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোন ছন্দে বলতে পারতুম না।" *

অর্থাৎ কবির পক্ষে এখন গদ্যকাব্য পরীক্ষা মাত্র নয়— তাঁর মনে এখন এমন একটা ভাবের স্রোত এসেছে যেটা গদ্যকাব্য ছাড়া অন্য কোন বাহনকে আশ্রয় করে প্রকাশ লাভ করতে পারে না। 'শেষ সপ্তকে'র কবিতাগুলি আলোচনা করলেই তা প্রমানিত হবে।

'শেষ সপ্তকের' মধ্যে কবি বেশ স্পষ্ট ভাবেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে এ পর্য্যন্ত কবি যে মোহে ছিলেন এখন আর তা নয়। জীবনের এক মুহূর্ত্তের লাভ লোকসান নিয়ে থাকলেই তাঁর চলবে না, instant made eternityর মধ্যেই তাঁর সম্পূর্ণতা নয়—জীবনের নানামুখী প্রবৃত্তির সংঘাতকে স্বীকার করাই তাঁর ধর্ম্ম। তাই কবি বলছেন চার নম্বর কবিতায়—

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুনিমার ম্লান অবশেষ;—
যাক কেটে এর আবেশটুক;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর ভাঙা চোখ,

—সেই নিরাবিল চোখ নিয়ে কবি তখন
যাব লক্ষ্যহীন পথে
সহজে দেখা সব দেখা
শুনব সব সুর

কবি কেবল দেখার টুকরো নিয়ে ব্যস্ত নন—তিনি এখন দেখতে চান জীবনের সমগ্রতাকে—যার মধ্যে যুগে যুগে সুখ দুঃখ, ভাঙন গড়ন, জীবনমৃত্যু লীলায়িত হয়ে উঠছে—

চারিদিক থেক অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙা গড়নের উপর দিয়ে—

কবির সেই দৃষ্টি পড়েছে সমগ্রতার দিকে, অমনি কবি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন সেই শুভ দিনটার জন্যে যেদিন কবির জীবনও নানারসে ভরপুর হয়ে উঠবে

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
* * * *
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ?—(১৩ পৃষ্ঠা)

কবি বুঝতে পারছেন এই যে বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত সমগ্র যে জীবন তার আকাশে আলো ও ছায়া দুই নৃত্য করছে তা হ'তে নানা বেদনার রঙীন ছায়া চিত্তভূমিতে ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে জিনিষটা এমন যে কেবল শব্দ আর অর্থের ভিতর দিয়ে তাকে বর্ণনা করা যায় না—শব্দ ও অর্থে যেটুকুর পরিচয় দেওয়া সম্ভব তাতে তার যথার্থ পরিচয় হয় না। তাই কবি বলছেন

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা
...যাকে বলতে পারি আমার সবটা
তার নাম দেওয়া হয়নি,
...নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,—
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা। (২৬ পৃষ্ঠা)

কবির কাছে এই যে হঠাৎ অখণ্ড অনুভূতি এসেছে এটা তাঁর সমস্ত অন্তরকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছে—তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যে সব চিন্তা অচেতন অবচেতন স্তরে আত্মগোপন করে বসেছিল তাদের সে আজ দিনের আলোয় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে চমকে দিয়েছে। বাল্যকাল হ'তে কবির

* 'আমার কাব্যের গতি'—প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৩।

মনে আমাদের বাস্তব জীবনের পরে যে ভীতি ছিল আজ অনুভূতির গভীর বৈচিত্র্যে সে ভয় লোপ পেয়েছে—কবিতার মধ্যে স্থান পেয়েছে সেই বস্তু জনশ্রুতির হাতের দাগে মলিন তাই কবি বলছেন—

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে,
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যা'র রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে,
দেখা দিল সে অনির্ব্বচনীয়তায়, (৭৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ যেটার পরে পরিচিতের মলিন ছাপ এত দিন পড়েছিল আজ কবির সমগ্র সত্তার মাঝে তা'র সে মলিন ছাপের ভিতর হতে তার নগ্ন আদিম সৌন্দর্য্য দিয়েছে দেখা—ব্যবহারিক জগতেই যে তার সম্পূর্ণ মূল্য নয়—কাব্যজগতেও যে তার মূল্য আছে,—একথাটা আজ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 'কোপাই' প্রভৃতির মধ্যে কবি প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কল্পলোকে চলে গিয়েছেন তার কারণ তার মধ্যে আছে পরীক্ষামূলক ভাবে 'প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে' কাব্যের সীমানার মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা; কিন্তু 'শেষ সপ্তকে' অকৃত্রিম ভাবে কাব্যে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী সুষ্ঠুরূপ ধারণ করেছে তার কারণ কবির সত্তার সমগ্রতার 'পরে দৃষ্টি, তার কারণ কবির অনুভূতি গভীর তার কারণ কবির রস বিচিত্র।—

গদ্যকাব্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে মনোবৃত্তি সেইটে নিয়ে কবি যখন যাত্রা করেছেন তখনি তাঁর—সাফল্য অবিসম্বাদিত—এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পাই 'শেষ সপ্তকের' মধ্যে। বিষয়বস্তু ও ছন্দ উভয় দিক্ থেকেই বিচার করলে এর প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যাবে, বিষয়বস্তু, বর্ণনা ও রসলক্ষণার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাই যে 'শেষ সপ্তকের' এক একটি কবিতা যেন ঝলমল করচে—এতো তাদের সৌন্দর্য্য। এগারো নম্বর কবিতায় দেখা যাচ্ছে যে কবির মনে এমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এসেছে—যে কবি অনুভব করছেন যে সেই বিরাট আনন্দের মধ্যে সারা পৃথিবীর নানা ঘটনা প্রাণরসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। ঐ সকাল থেকে কোকিলের ডাক, হাটের ভীড়, হাঁসের কলভাষার আলাপ এ সমস্তের মাঝেই সেই আনন্দরসের সাড়া বাজছে। মৃত্যু কবির মনে একটা ছায়াপাত করছে সত্য, কিন্তু 'সমস্তের মাঝে মগ্ন' কবির মন আজ মৃত্যুর রহস্য পর্য্যন্ত ভেদ করতে চাচ্ছে। সাত নম্বর কবিতায় কবি এই মৃত্যুলীলার স্বরূপটা খুঁজে পেয়েছেন—যে লীলায় যুগে যুগে নূতন নূতন বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, আবার কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কবি কিন্তু এই বিরাট কল্পনার আনন্দে এখানে মগ্ন হন নি, কবি এর আড়ালে সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সেই নির্ম্মম মহাকালের সন্ন্যাস দীক্ষার মাঝে যেখানে জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া ও হারোনোর মাঝখানে বিরাজ করছে বিরাট শান্তি,—

ছন্দের দিক্ থেকেও 'শেষ সপ্তক' কবির অন্য গদ্য কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শেষ সপ্তক' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যে কবিতাটার ছন্দ লিপি দিয়েছিলেন, সেটাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ—

১ ২ ১ ২
ফুল বাগানের । ফুল গুলিকে

১ ২ ১
বাঁধবনা আজ । তোড়ায়

১ ২ ১ ২
রং বেরঙের । সুতোগুলো থাক্

১ ২ ১ ২
থাক পড়ে । ঐ জরির ঝালর

'পুনশ্চের' 'ছুটী' কবিতাটীতে যেমন পর্ব্ব, মাত্রা এবং প্রায় অক্ষরেরও মিল ছিল এখানে তা নেই। প্রথম লাইনে পর্ব্ব দুটী, প্রত্যেকটীতে মাত্রাও দুটী, কিন্তু প্রথম পর্ব্বের দ্বিতীয় মাত্রায় আছে চারটী অক্ষর, দ্বিতীয় পর্ব্বের দ্বিতীয় মাত্রায় আছে তিনটী, প্রথম পর্ব্বে যে লঘু উচ্চারণ হচ্ছে, সেইটে ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে তিন অক্ষরের শান্ত উচ্চারণে। আবার দ্বিতীয় লাইনেও পর্ব্ব দুটী, প্রথমটীতে দুই মাত্রা, শেষেরটীতে এক। ক্রমশঃ বড় হতে আরম্ভ করে শেষে ছোট পর্ব্বে এসে শেষ হয়ে এখানে একটা ক্রমিক

অনুসরণ বা graded sequence হয়েছে যার ফলে একটা নিগূঢ় ছন্দ গড়ে উঠেছে; তেমনি তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনেও মাত্রার মধ্যে অক্ষরের ওজন ও ঝঙ্কারের বৈচিত্র্যে একটা ছন্দ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে।……'কোপায়ের' মধ্যে যেমন আমরা গদ্য লাইন পেয়েছি—যার মধ্যে সহজ ও সুন্দর যতিভাগ সম্ভব নয় বা যার মধ্যে বড় হতে ক্রমিক ভাবে ছোট পর্বে আসার পরিচয় নেই বরং একই লাইনে বড় হতে ছোটতে এসে আবার বড় পর্ব্বে যাওয়ার চিহ্ন আছে—সে ধরণের লাইন এতে নেই। কবির কথায় এটা পদ্য নয়, কিন্তু এটা গদ্যও নয়, কিন্তু এর ছন্দে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাতে এটা গদ্য কবিতার আসন দখল করতে পেরেছে। এর প্রত্যেক লাইনে গদ্য কবিতার ঝঙ্কার নেই কিন্তু এমন একটা বিশেষ ঝোঁক ও বিশেষ ভঙ্গী আছে যেটা গদ্যের সম্পত্তি নয়। এই জন্যই 'শেষ সপ্তকের' মধ্যে আমরা কি ভাব-রসের দিক্ দিয়ে কি আঙ্গিক উপকরণের দিক্ দিয়ে প্রকৃত গদ্যকাব্যের সন্ধান পেয়েছি বলে মনে হয়।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

গোধূলি

শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু

দিগন্তে শ্যামায়মান নামে সন্ধ্যাছায়া
রক্তিম গগনে লীন হ'ল ক্লান্ত রবি,
মুমূর্ষু বালুকাতট প্রান্তরের ছবি,
কাজল দীঘির বুকে ঘনাইছে মায়া;
পাণ্ডুর বিশীর্ণ চাঁদ দূর নভোভালে
শ্রান্তগতি, বিছাইছে কুহেলীর জাল
দৃশ্যেরে ঘেরিয়া ধীরে, স্তব্ধ মহাকাল,
স্থূল বিশ্ব লুপ্ত আজি সন্ধ্যা-অন্তরালে।

বাহির ফেলেছে ছায়া চিত্ত-কিনারায়
উদাস অন্তর ম্লান চরাচর ত্যজি'
বিদেহী ছুটিতে চায় নক্ষত্র-সভায়
ঊর্দ্ধলোকে, দিগ্‌ভ্রষ্ট আপনারে খুঁজি
গভীর আঁধারে কাঁপে আশার আবেগে,
রিক্তের বেদন বুঝি নাহি শান্ত হবে॥

সাসারামে কয়েক ঘণ্টার জন্য

শ্রীগুরুপদ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমের প্রবাসী জীবন যখন প্রায় বাসিন্দায় পরিণত হয়ে এসেছে—আমার এই এক ঘেয়ে এক টানা কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের মাঝে যখন আর এতটুকু অবসর খুঁজে পাচ্ছিলাম না,—এমনি একদিন প্রভাতে বাইরের ঘরে চায়ের টেবিলে বন্ধুর অনুরোধে বিশেষ কিছু না ভেবেই শের শাহের সমাধি দেখতে সাসারামে যেতে রাজী হয়ে পড়লাম।

এ সংবাদ অন্দর মহলে প্রচার হতেও বেশী দেরী হলো না। মেয়েরাও সহযাত্রী হতে চাইলেন। ইতিহাসে পঠিত বীর-কেশরী শের শাহ্‌র সমাধি ক্ষেত্র যে এত কাছে তা হয়ত ওঁদের জানা ছিল না, অথবা জানা থাকলেও তা দেখবার সুযোগ এতদিন হয়নি। তাই দুর্দ্দমনীয় লোভ ওঁদের পেয়ে বসলো। জীবনে এ সুযোগ কটা আসে; এ কি ছাড়া যায়? বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের ভ্রমণেচ্ছা এবং পুণ্য কামনা যে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী এ প্রমাণ আমি আরও অনেক বার পেয়েছি। কিন্তু যাক সে কথা।

ঠিক হলো পরদিন। সকালেই ৭-৩০ মিনিটের প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সকলে রওনা হবো, সঙ্গে থাকবে শুধু ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য সামান্য কিছু খাবার, আর বাদ বাকী আমরা সকলেই দু'তিন ঘণ্টার মত সামান্য কিছু খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়বো। কারণ ডিহিরী থেকে সাসারাম মাত্র বারো মাইল রাস্তা।

সম্পূর্ণ অপরিচিত না হলেও, একেবারে গতিবিধি নেই বলেই এই সামান্য বারো মাইল রাস্তাও আমার কাছে যথেষ্ট দূর এবং অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিলো। তবুও শুনলাম আমাকেই হতে হবে ওঁদের একমাত্র পথ প্রদর্শক এবং নির্ভর-যোগ্য সঙ্গী।

প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করা আমার অভ্যাস। অদূরেই ষ্টেশন, ব্যস্ততার কিছুমাত্র কারণ ছিল না। তবুও কি জানি কেন রাত্রে সুনিদ্রা তেমন হলো না এবং পূর্ব্বাকাশ ভাল করে পরিষ্কার না হতেই বার হয়ে পড়লাম।

খুশীমনে মনে শিস দিতে দিতে আধ ঘণ্টার পথ পনেরো মিনিটে অতিক্রম করে এসে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম—সুখ-নিদ্রায় তখনো জাগরণের সাড়া পড়েনি।

বন্ধুর উপর রাগ করতে গিয়ে হঠাৎ কেন জানি না
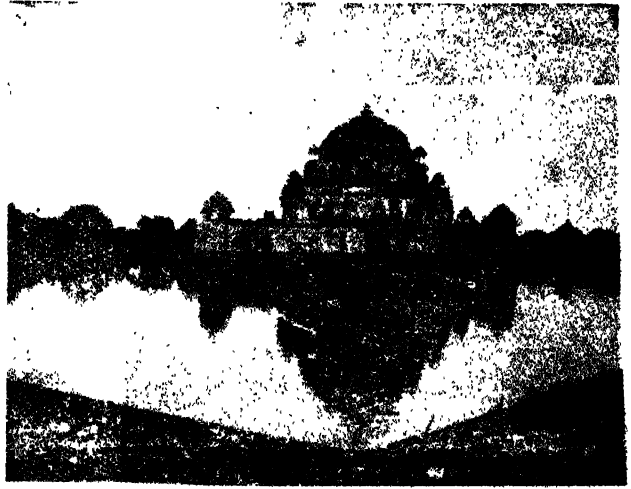
সাসারামে শের শাহের সমাধি মন্দির

আমার নিজের মনই খারাপ হয়ে গেলো। দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে তাই হয়ত এ নীরবতার কারণ কতকটা অনুমান করতে পেরেছিলাম।

'ছোট্ট একটী মেয়ে দরজার ওপাশ থেকে আধখান মুখ বার ক'রে বল্লে—'আমাদের যাওয়া হবে না। দাদুর নিষেধ।'

সংক্ষিপ্ত এবং বেশ স্পষ্ট উত্তর। কিন্তু এতেই মনে হলো

অকস্মাৎ কে যেন অদৃশ্য হস্তে, আমার বুকে একখানা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে গেলো। শক্তি নেই যে তা উপেক্ষা করি। প্রভাতের হাওয়া, পাখীর কূজন মুহূর্ত্তে সব যেন আমার কাছে তিক্ত হয়ে উঠলো। বন্ধু অরুণকুমারকে ডাকবার ইচ্ছাটুকুও আর রইলো না। কারণ আমি নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছিলাম যে আজ আর আমাদের যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না। তাই নীরবে চুপ করে বসে রইলাম।

অরুণ উঠলেন বেশ খানিকটা দেরী করে, এটা তাঁর নৈমিত্তিক ব্যাপার, কাজেই তিনি লজ্জিতও হলেন না। হাই তুলতে তুলতে বল্লেন—"ছোট্‌দির শরীরটা খারাপ কিনা তাই—"

শের শাহের কবরের প্রবেশ পথ

মেয়েদের আগ্রহ যে কত বেশী সে তো আর আমার অজানা নেই। তাদের বাদ দিয়েই বা কোন প্রাণে বলি,—"চলুন—আমরাই ঘুরে আসি।" তাই নিঃশব্দেই বসে রইলাম।

কিন্তু হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে দিক্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মত বন্ধু বল্লেন—"বলুন না হয় আমরাই আজ ঘুরে আসি।"

যেন কোন বাধাই আর মানতে চান না।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে বল্লাম—"ওঁদের বাদ দিয়েই—"

"তা আর কি হয়েচে। আর একদিন না হয় তখন—"

তার পর চা পান ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্মগুলি যথাসম্ভব দ্রুত এবং নিঃশব্দেই শেষ হয়ে গেলো। আবার তেমনি নিঃশব্দে মাথা নীচু করে, পাছে নজরে পড়ে যাই এমনি ভাবে প্রাঙ্গনে এসে নামলাম। যেন অভিশপ্ত পাপী দেবমন্দিরে প্রবেশ করছে।

ষ্টেশনে গিয়ে আর আমাদের বেশীক্ষণ দেরী করতে হয়নি। ফাল্গুনের শেষ। শীত আর বলতে গেলে নেই। নব পল্লবিত বৃক্ষশাখায় বাসন্তিকার আহ্বান লক্ষিত হয়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আম্র মুকুল ও মহুয়া ফুলের গন্ধে দিক্ আমোদিত। বন্ধুর হাসিমুখ ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিতেই অরুণবাবু সন্তর্পনে ওঁর পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত সিগারেটের টিনটা বার করে নিজে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে আমার সামনে ধরলেন।

আঃ বাঁচা গেলো। কতদিন যে গাড়ীতে চড়িনি। সামনের বেঞ্চিটাতে পাদুটো তুলে দিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

অভ্যাস না থাকলেও সিগারেট একেবারে যে কখনো খাইনি তা নয়, কিন্তু কোন দিনই ভাল লাগেনি আজও লাগলো না তবুও টেনে চলেছি—অসীম আনন্দে।

গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। রেল কোম্পানির নির্দ্দিষ্ট "সাতাশ জন বসিবেক" স্থলে আমরা মাত্র দুটী প্রাণী সমস্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক কোনে প্রায় গায়ে গা মিলিয়ে বসে আছি। প্রাণে এক নূতন অজানা অব্যক্ত ভাবের আবেশ, কিন্তু দুজনেই নীরব।

আমার মন কোথায় ছিল ঠিক মনে নেই। কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরে গ্রাম-সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়শ্রেণীর উপর। এ পার্শ্বে শের সাহের অমর কীর্ত্তি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ছায়াভরা সুন্দর রাস্তাটা এঁকে বেঁকে পেশোয়া পর্য্যন্ত চলে গেছে। গাছ পালা পাখীর ডাক সবটা মিলিয়ে বাংলা মায়ের নির্ব্বাসিত সন্তানের কাছে এক নূতন জগৎ নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিলো।

খুসীভরা উৎসুক ব্যগ্র মনে পাথরের নুড়িটী গাছ পালাটী লক্ষ্য করচি। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বন্ধু বললেন—'কি দেখচেন, পাহাড় ? ও দেখতেই যা মনে হ'চ্ছে কাছে, আসলে তা মোটেই নয়। ওরা শুধু দূর থেকেই ভুলায়—পাহাড় আর মেয়েরা।

বন্ধুর কথায় যেন ব্যথার সুর ফুটে উঠলো। কিন্তু এ কথায় উত্তর আমার কিছুই জানা ছিল না। পাহাড়কে শুধু পাহাড়ই দেখি, ভালোও লাগে যথেষ্ট, কিন্তু তাকে নিয়ে কবিত্ব সৃষ্টি করতে পারিনি কখনো।

বাঁ দিকের পাহাড়শ্রেণীর উপর কুয়াসার ফাঁকে সূর্য্য দেখা দিলো। আনন্দের আবেগে দ্রুতগামী গাড়ীর দরজা খুলে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়েরইলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ নহে তার পরই আমাকে চমকিত ক'রে সাসারাম ষ্টেশনে ভ্যাকম ব্রেক কষে চলতি গাড়ী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো।

গাড়ী থেকে নেমে কিন্তু মনটা আমার আর তেমন ভাল ছিল না। প্রভাতের বিহগ-কাকলি, বালারুণ—দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল ক্ষেত্র, এর কাছে কি আর সমাধি-ক্ষেত্র ? তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়ের মূল্যটুকু যে বোঝে তার ভাগে পড়ে অমৃত, আর বিষের জালায় জ্বলে মরে সেই, যে সময়কে উপেক্ষা করে শুধু জিনিষের লোভেই অস্থির হয়ে ওঠে।

প্লাটফরমের বাইরে এসে দেখলাম অগণিত এক্কাগাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর খদ্দের মাত্র আমরা দুটী প্রাণী। তাই এক্কাওয়ালা চার আনাতেই শের শাহের সমাধিস্তম্ভ (Tomb) এবং বাজার ঘুরিয়ে এনে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে সহজেই রাজী হয়ে গেলো।

ষ্টেশন হতে Tomb মাত্র দশ মিনিটের রাস্তা। সোজা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় ঘুরতেই চারদিকে জল-বেষ্টিত Tombটী প্রথম দর্শনে যেমন সুন্দর তেমনি রমণীয় মনে হয়। এককালে এই জলটুকু হয়ত স্বচ্ছই ছিল কিন্তু এখন Tomb-এর আরও অনেক জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে জলটুকুও পচা পানা এবং শেওলাতে মজে আছে। তার মাঝে একটী ক্ষুদ্র রাস্তা,—দুধারের খানিকটা জায়গা নিয়ে কয়েকটী খেজুর গাছ বিশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জনমানবের সাড়া শব্দ কোথাও কিছু নেই। ক্ষুদ্র রাস্তাটী দিয়ে আমরা Tombএ গিয়ে উঠলাম।

প্রায় মিনিট তিন চার পরে, একটী লোক দরজা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

বন্ধু ভিতরে প্রবেশ করে ক্ষুণ্ণ হলেন।

বাস্তবিক ক্ষুণ্ণ হবারই কথা। স্বীয় ক্ষমতাবলে যে বীর সামান্য দাস থেকে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিলেন—যাঁর কীর্ত্তি পৃথিবীর
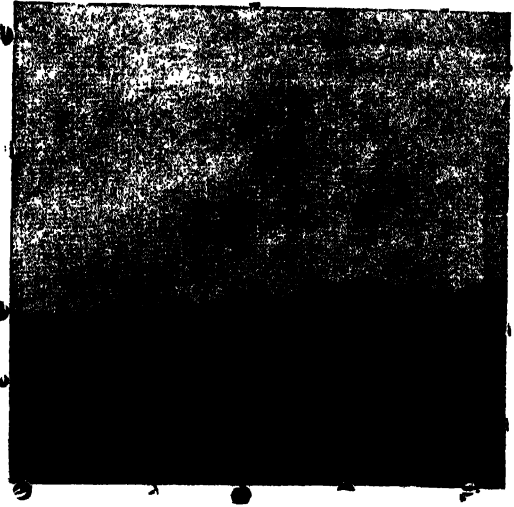
স্মৃতিসৌধের উপর থেকে সাসারামের দৃশ্য

যে-কোন মনীষীর চেয়ে হীন নয়—ঘোড়াক্ ডাক ও পাট্টা কবুলতি যাঁর আদর্শ—প্রজার এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনাই ছিল যাঁর সাধনা—সেই স্বর্গগত বীরশ্রেষ্ঠ শের শাহের সমাধি মাত্র একখানি জীর্ণ ছিন্নবহুল বস্ত্র দ্বারা আবৃত। আর তা নির্ভর করচে বোধ হয় ঐ অশিক্ষিত অপটু লোকটার উপর, যে এবিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। সমাধির উপর একটি তৈল বিহীন মৃন্ময় প্রদীপ দেখলাম। দৈবাৎ কখনো বোধ হয় ওতেই সাঁঝের বাতি জ্বালা হয়। আপাততঃ তা দিয়ে আবৃত বস্ত্রখানি চাপা দেওয়া আছে। এই ভাবে পৌরজন বেষ্টিত ভারত সম্রাট শের শাহ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

আজ শের শাহের সমাধির দিকে চাইলে ভারতের অতীত গৌরবের অনেক কথাই মনে পড়ে। আজ আমরা

নিতান্ত নিরুপায়, একেবারে অসহায় পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের সত্যিকার দাবীটুকুও মুখ ফুটে চাইবার অধিকার পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন ভারত ধনে জনে শৌর্য্যে ও বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী ছিল। তখনকার দিনেও শের শাহ নিজের সমাধিস্তম্ভ তাঁর জীবদ্দশায় নির্ম্মাণ করে গেছেন এমনি আড়ম্বরহীন ভাবে কেন? একথা ভাবতে গেলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। কোন ঐতিহাসিক লিখে গেছেন :—'Sher Shah was a great road-maker, one of his roads ran from the Bay of Bengal to Rahtas on the Jhelum with caravanserais every miles for travellars, and with well and fruits along its sides"

স্মৃতিসৌধের উপর থেকে সাসারামের অপর এক দিককার দৃশ্য

যে বীর সামান্য পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে বাংলা দেশ থেকে সুদূর পাঞ্জাব পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাদে, আরও অনেকগুলি সুন্দর এবং সুব্যবস্থাপূর্ণ রাস্তা নির্ম্মাণ করতে পেরেছিলেন,—তাঁর পক্ষে স্বীয় সমাধিস্তম্ভ আড়ম্বরপূর্ণ করা, কিছুমাত্র অসম্ভব এবং বেমানান ছিল না। কিন্তু প্রকৃত কারণ বোধ হয় তা নয়। এই আড়ম্বরহীন সমাধিস্তম্ভে তাঁর মহৎ অন্তঃকরণেরই পরিচয় মাত্র।

শের শাহই প্রথম বুঝেছিলেন—শরীরকে অনশনে রেখে মস্তক বড় হ'তে পারে না। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ উপেক্ষা করে নিজের ভোগ বিলাসই রাজনীতি নয়। কথিত আছে এই সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ কালে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, অথবা প্রথমেই দেখা দিয়েছিল তারপর সহৃদয় শের শাহ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সাহায্যার্থ এই সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। শের শাহ মুক্তহস্ত ছিলেন কিন্তু অলসতার প্রশ্রয় দিতেন না।

বন্ধু বল্লেন—"কি ভাবচেন? আপনি এই দেখেই এমন করচেন, তা হ'লে আগ্রার তাজমহল দেখলে তো আপনি দেখচি—"

আমিও সত্যিই তাই ভাবছিলাম। তাজমহলকে স্মরণ করে কত কবি কত ভাবে কেঁদেছেন শুধু তার বাইরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে। আর ত্যাগী শের শাহ বহু গুণের অধিকারী হয়েও চিরদিনই বোধহয় উপেক্ষিত হয়ে রইলেন—তার বাইরের চাকচিক্য নেই বলে। আর ভাবছিলাম কালের এ-কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। যেখানে একদিন বাদশাজাদী সাজাদীর নূপুর সিঞ্চনে সর্ব্বদা মুখরিত থাকতো—সেই সমাধির সকল সৌন্দর্য্যের ভার নির্ভর করছে এখন ঐ লোকটির উপর যে—এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ী। "শের-শার্দ্দুল দীর্ঘায়ু হতো যদি, মোগল-সিংহ কখনো পেতকি দিল্লীর রাজগদি?"

নীরবে কায়মনে স্বর্গগত বীরের আত্মার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিঃশব্দে বন্ধুর অনুসরণ করলাম।

Tomb এর উপরের দৃশ্যটী সত্যিই মনোরম।

নজর কোথাও বাধা পায়না। সামনেই সাসারাম বাজার, তার মাঝে ক্ষুদ্র গলিগুলি এঁকে বেঁকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল কিছুই আর ঠাহর করা যায় না। একা গাড়ীগুলি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়েই আবার বড় বাড়ীগুলির সীমান্তে হারিয়ে গেল। এখানে সেখানে কোথায়ও বা প্রাচীন প্রাসাদ ভূমির জীর্ণ প্রাচীর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বাড়ী। তা ছাড়া যেদিকে নজর যায় বেশীর ভাগই দেখা যায় শুধু খেজুর গাছ। বিহারে এক সঙ্গে এত খেজুর গাছ এর পূর্ব্বে কখনো আমার নজরে পড়েনি। অদূরে পাহাড়, গাছে গাছে পাখীর ডাক—সবটা মিলিয়ে বেশ লাগে।

বন্ধুর কাছ থেকে আবার তাগিদ এলো—"চলুন, ফেরা যাক।"

নিঃশব্দে নীচে নেমে এলাম।

Tomb-এর ভিতর দেয়ালগাত্রে আরবী ভাষাতে (কোরান শরীফ থেকে) কিছু লেখা আছে দেখলাম; কিন্তু আমরা তা পড়তে পারিনি। লোকটী যদিও মুসলমান, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে বলেছিলো—সে অল্পবিস্তর হিন্দি পড়তে পারলেও ও ভাষা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

ও-পাশে ইংরিজিতে লেখা রয়েছে :—

"This Tomb himself built by Sultan Fariduddin Ser Shah, Emperor of India wherein he was buried Annodomini 1545, was repaired by the British Government, during the Vice Royalty of George Fredrick Samuel Robinson, Marquis of Ripon, under the Governorship of the Hon'ble Augustas Rever Thomson, Lieutenant Governor of Bengal, Annodomini 1882."
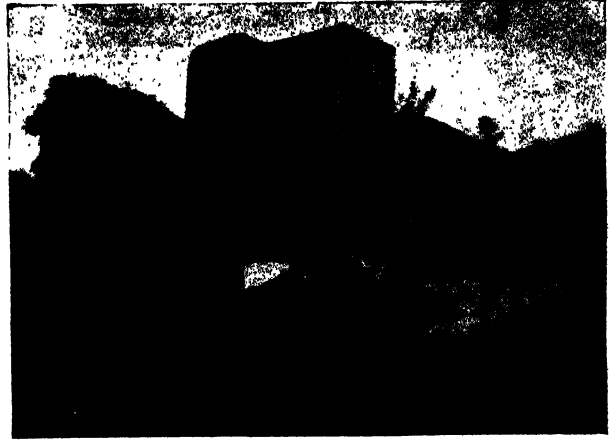
লোকটী আর একবার সেলাম ঠুকতেই তাকে কিছু বকশিস দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সাসারাম সহরটী যেমন অপরিষ্কার তেমনি শ্রীহীন। শের শাহের রাজত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না এতে। সামান্য দু'একটী গলি পার হতেই বন্ধু নাসিকা কুঞ্চিত করে বল্লেন—"চলুন ফেরা যাক, আর না।"

মহানগরীর বাসিন্দার চোখে এ সহর অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, পশ্চিমের প্রবাসী জীবনে আমাদের এই টুকুই সান্ত্বনা।

ছুটীর দিনটাতে সাসারাম পর্য্যন্ত আসবার সুযোগ না হলেও ডিহিরীর বাজার অথবা ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপরই পায়চারী করে ফিরতে হয়। মন প্রফুল্ল থাকলে বড় জোর না হয় শোন নদ অথবা এনিকাট (Anycut) পর্য্যন্ত যাওয়া চলতে পারে। তা না হলে গড়ের মাঠ অথবা মনুমেণ্ট পাবো কোথায়? আমাদের চোখে এ তেমন খারাপ কিছু লাগেনা। কিন্তু তা বলে কারও ভাল লাগা না লাগার উপরও তো জোর চলে না। তাই নীরবে চুপ করেই বসে রইলাম।

বেশ একটু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিলো। সামনেই দেখলাম চায়ের দোকান (Tea stall); কিন্তু বন্ধুর এ ভাবের স্পষ্ট মতবাদের পর সেখানে গিয়ে বসতে আর ভরসা হলোনা। পকেট থেকে একখানা পুরনো চিঠি বের করে তাতেই মন দিতে চেষ্টা করলাম।

শের শাহের পিতার আদি বাড়ী—সাসারাম

হঠাৎ বন্ধুর কি খেয়াল হলো, আমাকে বাদ দিয়েই সোজা কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হারে waterfall ইঁহাসে কেতনা দূর পড়েগা?

'হারে' তখন আপন মনে গান করছিল, আর মাঝে মাঝে তাগিদ দিচ্ছিল, 'বাবু জলদী কীজিয়ে, গাড়ীকো বকত হোগিয়া হ্যায়।' চার আনা পয়সার ভাড়া পেয়ে বেচারা তেমন প্রসন্ন ছিল না। বন্ধুর প্রশ্নোত্তরে সোল্লাসে বল্লো, 'চলিয়ে না হুজুর, নজদিক মেত হ্যায়। বারো আনা পয়সা দিজিয়েগো।'

বলে সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই গাড়ী জোরে চালিয়ে দিলো। বন্ধু প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"কি বলেন? এলামই যদি—"

গাড়ী যথাসম্ভব দ্রুতবেগে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর

দিয়ে ছুটে চল্লো। অনেকক্ষণ পরে সত্যিই আবার আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জীবনে অনেকগুলি জল-প্রপাতের শুধু নামই মুখস্থ করেছি, ভূগোল এবং মানচিত্রের দৌলতে তাদের অনেকের সঙ্গেই পুঁথিগত ভাবে পরিচিত, কিন্তু তা চোখে দেখবার সংযোগ আজও পর্য্যন্ত ঘটেনি। আজ স্বচক্ষে তাদের একটীরও অন্ততঃ স্বরূপ দেখতে পাবো, একথা ভাবতেই মন আমার কোন এক অজানা পুলকে ভরে গেলো। বন্ধুর কাছ থেকে তার সিগারেটের টিনটা এবার আমি নিজেই টেনে নিলাম।

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের অসমাপ্ত সমাধি মন্দির—সাসারাম

পথে যেতে যেতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, যেদিকে দু'চোখ যায় যা কিছু দেখি সবই সুন্দর বলে মনে হয়। কল্পনার মনশ্চক্ষে নায়গ্রা এবং ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাতকে আনবার চেষ্টা করছিলাম। গল্পে ও কথাবার্ত্তায় কতক্ষণ কেটে ছিল ঠিক মনে নেই, সহসা কোচম্যানের ডাকে সচেতন হয়ে দেখলাম গাড়ী ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠচে।

"বাবু আগিয়া।"

'আগিয়া'? এক লাফে গাড়ী হতে নেমে পড়লাম। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বিস্মিত হয়ে দেখলাম মনের সে প্রফুল্লতা আর আমার এক তিলও নেই।

সামনেই বন্ধ জলা। অসংখ্য মশা সেই দূষিতপ্রায় নীলাভ জলের উপর বসে আছে। দুএকটী পল্লীবধূ সেই জলা থেকে জল নিয়ে কলসী কাঁকে ঘরে ফিরচে, কেউ বা স্নান সারচে। ওধারে এক পাশে একটি শিবমন্দির। কতকগুলি লোক তাড়ি খেয়ে সেখানে মাতলামী করচে আমগাছের পাতার ফাঁকে দু'একটী ঘুঘুর ডাক কদাচিৎ শোনা যায়। বেলা তখন প্রায় দশটা।

বিরক্তিতে সারা মন আমার বিষিয়ে উঠলো। কোথায় জল-প্রপাত আর কোথায় পচা ডোবা।

কিন্তু কোচম্যানকে কোন কিছু বলবার পূর্ব্বেই বন্ধু বাধা দিয়ে বল্লেন—"ও বেচারাকে দোষ দেওয়া মিথ্যে। আমারই বোঝাবার ভুল হয়েচে দেখচি। Waterfall না বলে জল-প্রপাত বল্লে আর হয়ত এমন হতোনা। কিন্তু তা আর দুঃখ করে কি হবে বলুন? চলুন ফেরা যাক, আর এক দিন তখন—আজতো আর সময়ও নেই, গাড়ী এসে গেলে প্রায়।"

গম্ভীর হয়ে বল্লাম,—"না, তা হয়না; Waterfall দেখতে যাবই তা সে যত দেরীই হোক না কেন।"

বন্ধু শঙ্কিত হয়ে বল্লেন—'কিন্তু দেরী করে ফিরলে মাসীমা আবার কত কী ভাববেন। আর তা ছাড়া আপিসেও তো আপনি কিছু বলে আসেননি! না বলে কামাই করাটা—"

বাধা দিয়ে বল্লাম—"মাসিমার কথা জানিনে, কিন্তু আপিস আমার আজ না করলেও কিছু এসে যাবে না আপনি চলুন।"

কিন্তু বন্ধুকে কিছুতেই রাজী করা গেলো না। সেই এক কথা "দেরী করে ফিরলে মাসিমা আবার ব্যস্ত হবেন।"

বল্লাম "বেশ তো তাতে ক্ষতি কি? মাসিমা কত কি ভাববেন শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা আপনার খোঁজে লোকই পাঠিয়ে দেবেন। এমনি সময় রুক্ষচুলে শুষ্ক মুখে মাসিমার সামনে গিয়ে হাজির হবেন। ভাবুনতো একবার, কেমন কবিত্ব পূর্ণ মজা হবে এতে। নিজে না কাঁদলে কি আর পরকে কাঁদান যায়? অথচ পরকে কাঁদিয়েই না কত সুখ।"

অবশেষে ফিরতেই হ'লো।

পরে জানতে পেরেছিলাম—সাসারাম থেকে আরও তিন চার মাইল দূরে তারাচণ্ডি পাহাড়ে গেলে waterfall দেখা যায় বটে কিন্তু বর্ষাকাল ভিন্ন তা ভাল বোঝা যায় না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ফিরে আসা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

গাড়ী সেই রাস্তা দিয়ে আবার ঠিক তেমনি ভাবেই ষ্টেশনের দিকে ফিরে চল্লো, কিন্তু পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখতে পেলাম না। এই সামান্য ক' মিনিটের মধ্যেই কে যেন নিয়তির মত কঠোর হস্তে প্রকৃতির বুক থেকে তার সকল সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছে নিয়ে—পরিবর্ত্তে ঢেলে দিয়েচে বিষাদের গাঢ় কালিমা তার সারা অঙ্গে। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতির একি অদ্ভুত আমূল পরিবর্ত্তন!

Waterfall দেখতে যাবার পথে সামান্য কৃষক বালককে কেন্দ্র করেই নানা গল্প জমে উঠেছিল। কিন্তু ফিরবার পথে মহুয়া গাছের ডালে বসন্তের কোকিলকে প্রাণ খুলে চীৎকার করতে দেখেও আর কথা বলবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। অদূরে ভ্রমনরতা আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা দুটী তরুণীকে দেখিয়ে বন্ধু বল্লেন—"শাস্ত্রে লিখেচে—পথে নারী বিবর্জ্জিতা—কিন্তু সেটা সকল সময়ে খাটে না। ঐ যে দেখচেন,—ওরা কারো সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। ওদের নিয়ে পথ চলে দেখবেন—চাই কি Everast Expeditionএ যান, কোন বেগই পেতে হবে না আপনাকে।"

আমি অন্যমনস্কভাবে শুধু একটী 'হুঁ' বলে বন্ধুর হাতে সিগারেটের টিনটী ফিরিয়ে দিলাম।

বন্ধু বোধ হয় একটু আশ্চর্য্য হলেন। বল্লেন—"ওকি? কি হলো আপনার? সিগারেট আর খেলেন না যে বড়ো? ভালো লাগচে না? তাতো হবেই, অভ্যাস নেই কিনা। প্রথম প্রথম ওরকম সকলেরই হয়ে থাকে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলে তিনি নিজেই একটী সিগারেট মুখে তুলে নিলেন। বাকী পথটুকু নিঃশব্দেই কেটে গেলো। ডিহিরী না আসা পর্য্যন্ত আর কোন কথাই হলো না। ডিহিরী পৌছে বন্ধুকে ক্ষুদ্র একটী নমস্কার জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

শ্রীগুরুপদ মুখোপাধ্যায়

বেদনার ছন্দ

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ঠন্ ঠন লোহা পরে হাতুড়ির ওঠে গান
পিটুনীতে কামারের ক্ষয় করি দেহখান।
দুম দুম দুরমুজে মাটী কাঁপে থর থর
শ্রমিকের দেহে ঝরে শ্রমজল ঝর ঝর।
হাড় ভাঙ্গা বোল বাজে রিক্‌সার ঘণ্টায়
মানুষেরে টেনে টেনে মানুষের জান যায়।
ঝাঁপতালে দাঁড় টেনে হাঁফ লাগে মাল্লার
সকরুণ স্বরে তারা নাম করে আল্লার।
কলঘরে উঠে ভীম যন্ত্রের গর্জ্জন
কত শত শ্রমিকের হাড় করি চর্ব্বন।
পাঁচতলা 'পরে ওঠে কর্নির ঝঙ্কার
চৈত্রের খররোদে বৃষ্টিতে বর্ষার।
করাতের ওঠে ধ্বনি খস্ খস্ ঝর্ঝর
টানে টানে পিষে দিয়ে করাতীর পঞ্জর।
কাঠ পরে ঠক্ ঠক্ কুড়ালের ওঠে তান
প্রতি কোপে কুড়ুলীর হাঁস্ ফাঁস্ করে প্রাণ।
গাইতীর ওঠে রোল খাদ মাঝে অনিবার
ধ্বস্ প'ড়ে কুলী মরে গহ্বরে আঁধিয়ার।
এত নয় মধুময় সেতারের ঝঙ্কার
আনে যাতে আঁখি পাতে সুখাবেশ তন্দ্রার।
ছন্দ এ বেদনার তুলিতেছে অনুখন
দুর্গত দীনহীন যত সব অভাজন।

ভৈরবী-ভৈরু কার্ফা

ফাগুন আজি কেন, রাঙিল মধু লাজে
মলয় চেনে তারে, গোপন রহে না যে।
না-বলা কোন বাণী, সুরভি দিল আনি,
কাঁকণ কণ কণ কেন যে কাঁদি বাজে।

ঝরকা কেন তারি রয়েছে আধ খুলি,
লুকাতে পারিল না চাঁপার অঙ্গুলি।
পুলকে লাজে মাখা, নীরবে চেয়ে থাকা
জাগিছে ছবি মোর, প্রভাতী সুরে বাজে।

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

×　　　　　　　　　২　　　　　　　　　×　　　　　　　　　২
I সা -ঋা জ্ঞরা -জ্ঞা | জ্ঞসা জ্ঞঋা সা -ন্া I সঋা -সপা মা -া | -া -া -া -া I
ফা ০ গু০ ০ | ন আ জি ০ কে০ ০০ ন ০ | ০ ০ ০ ০
ম ০ ল ০ | য় চে নে ০ তা০ ০০ রে ০ | ০ ০ ০ ০

পদা -মা পা -দা | র্সণা র্সণা দা -া I পণা -দপা -মগা -মপা | মজ্ঞা -া মা -পদা
রা ০ ঙি ০ | ল ম ধু ০ লা ০০ ০০ ০০ | জে ০ ০ ০
গো ০ প ০ | ন র হে ০ না ০০ ০০ ০০ | যে ০ ০ ০

দপা -মা -জ্ঞরা -জ্ঞা | জ্ঞসা জ্ঞঋা সা -ন্া I সঋা -সপা মা -া | -া -া -া -া II
ফা ০ গু০ ০ | ন আ জি ০ কে০ ০০ ন ০ | ০ ০ ০ ০
ফা ০ গু০ ০ | ন আ জি ০ কে ০০ ন ০ | ০ ০ ০ ০

II না -া না -া | না না না -র্সা I র্সা -া র্সর্সা -জ্ঞর্জ্ঞা | র্স-নর্সা -া -া -া
না ০ ব ০ | লা কো ন ০ বা ০ নী০ ০০ | ০০ ০ ০ ০
পু ০ ল ০ | কে লা জে ০ মা ০ খা০ ০০ | ০০ ০ ০ ০

র্সমা -া মা -া | পা পমা পা -া I পদা প-দা -পা -া | পদা প-দা প-মা -া I
সু ০ র ০ | ভি দি ল ০ আ ০ ০ ০ | নি ০ ০ ০
নী ০ র ০ | বে চে য়ে ০ খা ০ ০ ০ | কা ০ ০ ০

মজ্ঞা -রা মজ্ঞা -রজ্ঞা | জ্ঞসা জ্ঞঋা সা -ন্া I সঋা -সপা মা -া | -া -া -া -া I
কা ০ ক০ ০০ | ণ ক ণ ০ ক০ ০০ ণ ০ | ০ ০ ০ ০
জা ০ গি ০০ | ছে ছ বি ০ মো০ ০০ র ০ | ০ ০ ০ ০

পদা -মা পা -দা | র্সণা র্সণা দা -া I পণা -দপা -মগা -মপা | মজ্ঞা -া মা প-দা I
কে ০ ন ০ | যে কাঁ দি ০ বা০ ০০ ০০ ০০ | জে ০ ০ ০
প্র ০ ভা ০ | তী সু র - মা০ ০০ ০০ ০০ | ঝে ০ ০ ০

দপা -মা জ্ঞরা -জ্ঞা | জ্ঞসা জ্ঞঋা সা -ন্া I সঋা -সপা মা -া | -া -া -া -া II
ফা ০ গু০ ০ | ন আ জি ০ কে০ ০০ ন ০ | ০ ০ ০ ০
ফা ০ গু০ ০ | ন আ জি ০ কে০ ০০ ন ০ | ০ ০ ০ ০

× ২ × ২
II সা -জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞ-রা I সা -রা সা -রসা | গ-জ্ঞা -া -া -া I
ঝ ০ র ০ | কা কে ন ০ তা ০ রি ০০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞা -া জ্ঞা -ঋা | ঋা ঋা ঋসা -ন্া I সা ঋা মা -া | -া -া -া -া I
র ০ য়ে ০ | ছে আ ধ ০ খু ০ লি ০ | ০ ০ ০ ০

মজ্ঞা -মপা পা -া | পা পা পা প-মা I মপা প-র্সা প-র্সা প-দা -া | -া -া -া -া I
লু ০০ কা ০ | তে পা রি ০ ল ০ ০ না ০ | ০ ০ ০ ০

পমা -ণা ণা -া | ণপা মগা মা -া I মঋা -া -া -া | -সা -া -া -া IIII
চাঁ ০ পা ০ | র অ০ জু ০ লি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

রবি-বাসরের অভিভাষণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের সম্বন্ধে যখন স্তুতিবাদ শোনা যায়, বিশেষ যখন সে স্তুতিবাদ আপনার জনের কাছ থেকে আসে, তখন তার মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে, তেমনি একটা পীড়াও থাকে। তাই সেই স্তুতিবাদ সদয়ভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। কিন্তু এই দুঃখ এই লজ্জা আমাকে বরাবরই সহ্য করতে হয়েছে। এ আমি সত্য কথাই বলছি। আমি যে ইচ্ছে করে আপনার জনের কাছ থেকে এ রকম স্তুতিবাদ গ্রহণ করি তা যে সত্য নয়, তা আপনারা জানেন। কিন্তু যখন তা এসে পড়ে তা উপেক্ষা করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তাই আমাকে তা শুনতেই হয়, গ্রহণ করতেই হয়। তবে অন্তরে মধ্যে যে সঙ্কোচ ও বেদনা জাগে তা ভুলবার নয়। আমি দেশ-বিদেশ থেকে যে সমাদর লাভ করেছি, তাতে আমার কোন সঙ্কোচ আসে নি। তখন মনে ভেবেছি এবং এখনও ভাবি যে, সে সম্মান আমাকে উপলক্ষ্য করে, আমার দেশকেই বাইরের লোকেরা দিয়েছে, তাতে আনন্দের কারণই ঘটেছে, কোন সঙ্কোচ বা মনঃপীড়ার কারণ ঘটবার কিছুই তাতে ছিল না।

আজ এইটুকু স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, অল্প বয়সে সম্মান লাভ করলে যে গর্ব্বের ভাব আসে, তাতে যে অনিষ্টের কারণ হতে পারে, এ বয়সে তার আর কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যখন কেউ ঘরে এসে অভিনন্দন জানান তখন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে তা গ্রহণ করতে হয়। আমি আপনাদের রবি-বাসরের সদস্যগণকে এখানে আহ্বান করে এনেছি, আপনাদের কাছ থেকে কোন স্তুতিবাদ শোনা যে আমার কাছে কতটা সঙ্কোচের কথা তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না।

আপনারা যে সকলে এই আশ্রমে এসেছেন, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি; কিন্তু আপনাদের যথাযোগ্যভাবে সমাদর করবার মত ভোজ্য পদার্থ এই পল্লীগ্রামে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। আমরা এখানে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, নাগরিক আপনারা, আপনাদের কাছে যে তা প্রশংসা পাবার মত হবে না তা আমি জানি। আমার যদি শরীর সুস্থ এবং বয়স অল্প থাকত, তা হলে যা করতে পারতাম এখন আমি তা পারিনে। আমার সে শক্তি নাই। অন্তরে মধ্যে যে আনন্দ ও উৎসাহ রয়েছে, অপটু দেহের জন্য আমি তার অনেক কিছুই প্রকাশ করতে পারিনে। আমাদের এখানে যদি আপনাদের কোনরূপ যত্নের ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তা আপনারা দয়া করে গ্রহণ করবেন না, মার্জ্জন করবেন এবং আপনারা পরস্পরে আমাদের ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন, আমাদের ক্ষমা করবেন।

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে আমি কি ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করিনে। আমার এই কার্য্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্ম্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্ম্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কি করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ, উৎসাহ, সাহিত্য সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেক দিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩ শান্তিনিকেতনে রবি-বাসরের অধিবেশনে প্রদত্ত কবির অভিভাষণ।

আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ, দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত, এই যে এরা খাদ্য হ'তে বঞ্চিত, এই যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হ'তে বঞ্চিত এর কি প্রতিকারে কোন উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হ'তে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কিভাবে কেমন করে এদের এই মরণ দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজী-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর, যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব, সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্ম্মাণ করবে। পল্লী-জীবনকে উপেক্ষা ক'রে এ কি করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি।—সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি হ'ল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন, আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন—আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন—আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলিনি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দ্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—বিচলিত করেছিল—আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হ'তেই সুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রাম-সংস্কারের আভাষ সে সময় হ'তেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত, তখন দুধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে সুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে? পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে?—সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মত এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল, যত বড় দায়িত্বই হ'ক না কেন, তাই গ্রহণ করবো এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোন সঙ্কোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্ম্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হ'ল, মনে হ'ল শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করবো। এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন—করুণা করেননি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্য্যের ভিতর। আবার মনে হ'ল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে

যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়ত হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন—মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও—এদের যদি খুসী করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উঁহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্ম্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবি-চিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, কোন ধারণাই ছিল না। আমি তাদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা কিছু সামান্য সম্বল ছিল, তাই নিয়ে একাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসেনি যে, কত বড় দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোন কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশঃ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীরুর মত ফেরবার সম্ভাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোন উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার। আমি এই ভাবেই বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলেছিলাম। পৃথিবীর সব দেশের লোক, ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোক এখানে এসেছে, শুধু আসেননি আমাদের দেশের বড়লোকেরা। আসেননি, এমন কথা বলতে পারিনে। বিপদে পড়ে অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁরা স্মরণ করেছেন এবং বিপন্মুক্তির পথের সন্ধানও পেয়েছেন।

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন; আপনাদের সহজে ছাড়ছিনে,—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ মায়ের তাড়ান সন্তানের মত এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে কত বড় কর্ত্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে! এদের দাবী পূর্ণ করবার শক্তি নেই—আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কি আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনও আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনী সন্তান—দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না,—এ অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্রনারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন, যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে, পদ্যে, ছন্দে অনেক কিছু লিখেছি, তার কোনটার মিল আছে, কোনটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক বা না থাক, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানিনে, বুঝিনে, পল্লী উন্নয়নের কোন সন্ধানই জানিনে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজী নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব্ব প্রকাশ করবার মত আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তারপর এ কাজ একার নয়। এই কর্ম্ম বহু লোককে নিয়ে। বহুলোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য রচনা একলার জিনিষ। সমালোচনা তার দূর হ'তেও চলে। কিন্তু এই যে ব্রত, এই যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি—তার সমালোচনা দূর হ'তে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড় দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লী প্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য্য, তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কি শোচনীয়, কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয় কর্ম্মীরূপে এবং সে কর্ম্মের পরিচয় আপনারা এখনি দেখতে পাবেন।

এই যে কর্ম্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্ত্তন করেছি, এই কার্য্যের এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়? বাঙ্গালী স্বভাবতঃই অশ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁরা সব জিনিষকেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তাই আমার এ দায়িত্ব যে কতবড় গুরুতর, এ যে কতবড় কঠিন কাজ তা তাঁরা অনুভব করতে পারেন না—চোখে কিছু না দেখেই নিন্দা করেন। বিশ্ব-বিখ্যাত Sir John Russell সম্প্রতি এখানে এসেছিলেন। তিনি এই অনুষ্ঠান দেখে সত্যিকার অভাব কোথায় তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে বোঝাবার কোন প্রয়োজন হয় নি। আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্ম্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্যে আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাঙ্গালার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বারবার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্ম্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন—তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

রবি-বাসরের সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

চৈতালী

শ্রীগোপাল বটব্যাল

চৈতালী! চৈতালী! চৈতালী হে!
তব জয় গায় পাখী বৈতালীকে।
মেঘহীন আকাশের ললাটে লেখা
আগমন বারতার রূপালী-শিখা।
সন্ন্যাসী! তোমা লাগি কামনা পুড়ে,
গৈরিক অঞ্চল বাতাসে উড়ে।
ক্ষীণ ওই ওষ্ঠেতে কুটিল হাসি,
বন্ধুর মাঠে বাজে রাখালী-বাঁশী।

মুখে তব আঁকা দেখি ত্যাগের বাণী,
নির্ম্মম সুন্দর বরণ খানি।
বরষের বিদায়ের দ্বাদশ ফুলে
মালা হয়ে ওই তব গলেতে দুলে।
হে বিরাট! হে মহান! তোমারে স্মরি
শাখে শাখে জাগে ফুল কানন ভরি।

সুশান্ত সা'

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এট্-ল

৪

এখন ভাবি, জীবনটাকে আমি কোনও দিনই চিনতে পারিনি। সেই সব দিনের কথা ভাবলে, এখন খালি মনে হয়—জীবনটার পরিচয় যদি একটু নিবিড় ভাবে পেতাম, তাহলে হয়ত জীবনের সোজা পথ খুঁজে নিতে পারতাম। জীবনটার দিকে চেয়ে চেয়ে তারই নেশায় চোখ দুটো আমার হয়ে উঠেছিল ঘোলাটে। আর ঠিকরূপে তাকে দেখলামই না কখনও। বড্ড বেশী ভাল লেগেছিল জীবনটাকে, তাই, বড্ড বেশী আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম। তাই পদে পদে ঘট্‌ল বাধা, পদে পদে লাগলো বিরোধ। জীবনটা যে প্রকাণ্ড একটা মায়া—ধরা দেয় না, খালি জড়ায়, একি ছাই একবারও কোনও দিন ভেবেছি। জলে তেলের মত, জীবনে ভেসে ভেসে প্রাণটাকে নির্লিপ্ত স্বতন্ত্র রাখতে পারলেই জীবনের সঙ্গে সমান যোঝা পড়া সহজ হয়ে ওঠে, তার গতির সঙ্গে সমান তালে চলে যাওয়া যায়, অথচ তার ভিতরের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না—একথা যে ছাই আজকেই বুঝতে পারছি।

তুষার বল্‌লে মুকুন্দর মনোভাব তার প্রতি ভাল নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা কাল বৈশাখীর রুদ্র নাচন লাগলো। একটা প্রচণ্ড লড়াইয়ের জন্য প্রাণ মন শরীর হয়ে উঠল উন্মুখ। সকল দিক দিয়ে জীবনটাকে, অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে, এমন করেই বাঁধতে চেয়েছিলাম, যে কোথাও কোনও দিকে এতটুকু ফস্কে গেলে, একটা বিরাট পরাজয়ের গ্লানিতে অস্থির হয়ে উঠতাম। জীবনটাকে বাঁধা, সে যে অসম্ভব—এ কথা ত একবার ও মনে হয়নি। আমি আজ এসেছি, কাল চলে যাব। জীবনটা ত চিরদিনই আছে, চিরকালই রইল। তাকে কি বাঁধা যায়। বন্ধন ত নয়, মুক্তির মধ্য দিয়েই অনন্ত শান্তি—এ কথা ত আজই বুঝতে পারছি। সেদিন ত একবারও ভাবিনি জীবন রহস্যের কোনও অজানা লীলায় যদি মুকুন্দর মনে বিকৃতিরই সৃষ্টি হয়ে থাকে - লড়াই করে ত তাকে পরাস্ত করা যাবে না। লড়াই করতে গেলে সেই বিকৃতির ঘূর্ণিপাকে আমিও নিজেকে হারিয়েই ফেল্‌ব।

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আর আমার কিছুই নেই—তাই বোধহয় এসব কথা অতি সহজ হয়ে উঠেছে আমার প্রাণে। সেদিন ত সবই ছিল। জীবন যুদ্ধে একটী একটী করে সবই হারালাম। ফাঁকা—আজ চারিদিকে একটা বিরাট ফাঁকা। চোখ চেয়ে দেখার ত কিছুই নেই। আকুল হয়ে নিজের দিকেই ফিরে ফিরে চাই। তাই কি পেলাম মুক্তি ?

* * * *

তুষারবালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়ার পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল—প্রাণখানা তখন একটা প্রচণ্ড ক্রোধে ভরা। রাগটা ষোল আনা মুকুন্দর উপর। এত বড় অপমান সে আমাকে করলে। আমারই স্ত্রীর প্রতি কুৎসিত তার মনোভাব! আমার এত বড় বিশ্বাসের এতটুকু মূল্য সে দিলে না—এত বড় বিশ্বাসঘাতক। সাহসও ত' কম নয়। সেই মুকুন্দ, আমার চিরকালের অনুগত মুকুন্দ', তার আজ এতবড় স্পর্দ্ধা! সমস্ত শরীর যেন আমার রাগে জলে জলে উঠতে লাগল।

পরদিন সকাল বেলায় তুষারবালার ব্যবহার প্রত্যেক পদে পদে আমার প্রতি হয়ে উঠল অত্যন্ত মধুর। আমার মনের

প্রত্যেক প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রদ্ধায় মাথায় তুলে নেওয়ায় জন্য সে যেন আকুল হয়ে উঠেছে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ার আগে, লেপের নীচে শুয়ে শুয়েই বললে, "আমার একটা কথা রাখবে ?"

বললাম "কি ?"

বললে, "আজ এক কাজ করা যাক্ ; বিকেল বেলা একটা নৌকা ঠিক কর,—চল আমরা দুজনে নদীতে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।"

বললাম, "আজ আমার অনেক কাজ—আজ হবে না।"

বললে "তোমার কাজ কর্ম্ম শেষ হলে ? আজ ত চাঁদের আলো আছে।"

বললাম "বড্ড শীত, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ—তা বটে। তবে থাক্। তোমার সঙ্গে নিরিবিলি বেড়াতে কেমন যেন ইচ্ছে করছে। অনেকদিন ত ওরকম বেড়ান হয়নি।"

তুষারবালা একটু পরেই উঠে গেল। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলাম। মনের মধ্যে তখন আমার আকাশ-পাতাল চিন্তা। এতবড় অপমান নীরবে সইব ? কখনই না। এ অপমান নীরবে সহ্য করা মনের একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা—মোটেই পুরুষোচিত নয়। আমি যদি পুরুষ হই মুকুন্দকে উচিত শিক্ষা দেওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু কি করা যায় ? একটা চাবুক হাতে করে, মুকুন্দর বাড়ীতে গিয়ে দশজনার মধ্যে তাকে চাবুক মারাই বোধহয় তার উচিত শাস্তি। কিন্তু কেমন যেন একথায় মন সায় দিল না। ব্যাপারটার বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যেই যেন তার সবটুকু শেষ হয়ে যায়—ভিতরের ক্রিয়ার লঘুত্বই প্রকাশ পায় আর কিছু নয়। এবং কেমন যেন মনে হল মোটের উপর ব্যাপারটা কুৎসিত—আমার মত শিক্ষিত লোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অথচ তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কি করা যায় ? ভাবলাম,—না অসংযমের পরিচয় দিয়ে, মুকুন্দর এই কুৎসিত মনোভাবের প্রতি আমার প্রাণের তীব্র ঘৃণার অমর্য্যাদা করব না। শান্ত সংযত ভাবে মুকুন্দকে জানিয়ে দেব তার মনের এই কুৎসিত দৈন্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করবার শক্তি আমার আছে। বলে দেব সে যেন আর কখনও আমাদের বাড়ীতে না আসে—তুষারবালা তার মত ঘৃণ্য লোকের মুখও দেখতে চায় না। তারপর, এ জীবনে আর তার সঙ্গে কথা কইব না, তার মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব না।

মোটের উপর এই রকম ধরণের একটা মীমাংসায় মন সায় দিল। মুকুন্দকে ঠিক কি রকম ভাবে, কি কি কথা বল্‌ব—বারে বারে মনের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা করতে করতে সবই যেন কেমন সহজ হয়ে গেল প্রাণের মধ্যে। মনটা ক্রমে বেশ হাল্‌কা বোধ করতে লাগলাম। হঠাৎ খেয়াল হল—অত্যন্ত বেলা হয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘাটের পারে গিয়ে মুখ হাত ধুতে ধুতে, ক্রমে একটা যেন তৃপ্তি, এমন কি একটা যেন আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম প্রাণে। গায়ে এসে শীতকালের সকাল বেলার রোদটুকু লাগছিল আর আমার মনে হচ্ছিল—জীবনের কোথায় যেন কি একটা আকুল ভেসে যাওয়ায় আজ কুল পেয়েছি। মনে হ'ল ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই করেন। আজ যেন তুষারবালাকে ঠিক চিনেছি। এই এত বড় আঘাত না পেলে তুষারবালাকে ঠিক চিনতেই পারতাম না কোনদিন। ভগবান "ঘা" দিয়ে চিনিয়ে দিলেন—তুষারবালা আসলে খাঁটী সোনা। তার বাহিরটা সময় সময় যতই রুক্ষ হয়ে প্রকাশ পাক্ না কেন তার ভিতরের সত্যটুকু অচল, অটল, দৃঢ়। যে মুকুন্দকে তুষার এতখানি স্নেহ করত, সত্যের পথ থেকে সে যেমন এতটুকু বিচলিত হল—অমনি তুষার তাকে ক্ষমা করলে না,—দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। কতখানি দৃঢ়তা, কতখানি তেজ, কতখানি নিষ্ঠা, প্রকাশ পেয়েছে কাল রাত্রে তুষারবালার ঐ দুটো চারটে কথায়। এই ঘটনাটার মধ্য দিয়ে আমার সহিত তুষারের সত্যিকারের বন্ধন যেন দৃঢ় হ'ল—চিরদিনের জন্য। মুকুন্দ ! অতি তুচ্ছ সে—নিমিত্ত মাত্র। দুটো চারটে কথায় তাকে জীবন থেকে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেব—কি এমন কঠিন কাজ।

একটা হালকা উৎফুল্ল প্রাণ নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ফিরে এসে চাকরকে ডেকে বললাম "চা—শীগ্‌গীর চা নিয়ে আয়।"

নীচের বারেন্দায় একটা কেরাসিন কাঠের বাক্সর উপর বসে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় তুষারবালা এক হাতে পেয়ালায় চা ও আর এক হাতে একটী রেকাবীতে কিছু হালুয়া নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। তুষারবালার দিকে চেয়ে যেন নতুন করে মুগ্ধ হলাম আজ। সদ্য স্নান করে এক-খানি কাল চওড়া লতা পেড়ে মিহি সাড়ী পরিধান করে মাথার উপর ঘোমটা দিয়েছে তুলে। ঘোমটার ডান দিক দিয়ে, একটু হেলিয়ে একরাশ চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের উপরে। কপালে পরেছে সিঁদুরের টিপ্। মুখের মধ্যে একগাল পানে ঠোঁট্ দুটী রাঙা হয়ে উঠেছে। বললে "এত বেলায় উঠেছ কেন? আমি কখন থেকে চায়ের জল ফোটাচ্ছি।"

বললাম "তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি?

বললে "বেশ ত কথা। তুমি খেলে না, আমি আগে থাকতে খেয়ে বসে থাকব? সেই রকমই ভাব বুঝি আমাকে?"

বললাম "না—না। মুখে পান রয়েছে তাই ভাবলাম তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি।"

তুষার একটু হেসে বললে "ওঃ সেইজন্যে? জান ত—"

এই বলে একটু হেসে ঈষৎ মাথা দুলিয়ে চাপা গলায় সুর করে বললে,

"নাইয়া উঠ্যা যেবা নারী গালে খায় পান,
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমারও সমান।'

তুষারের সমস্ত ভাবেভঙ্গীতে একটা কথাই প্রকাশ হচ্ছিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। জীবন যেন চলেছে সহজ সরল সচ্ছন্দ গতিতে, কোথাও তাতে যেন এতটুকু বাধা নাই। তুষারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে বলতেই যেন তার প্রাণের ছোঁয়া লাগ্‌ল আমার প্রাণে। মনে হল যা কিছু দ্বন্দ, যা কিছু বিকৃতি আমার প্রাণের মধ্যে এসেছিল সবই অতি তুচ্ছ —তার যেন কোন মূল্যই নাই। মুকুন্দর বিষয় যা ঠিক করে-ছিলাম, তুষারকে জানিয়ে দেওয়ার একটা প্রবল আগ্রহ হল।

বললাম "তা হলে ত, স্বয়ং লক্ষ্মী হয়ে উঠেছ আজ সকাল বেলা। তা লক্ষ্মীদেবী! একটা বুদ্ধি দাও ত।"

বললে "আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব! তবেই হয়েছে! লক্ষ্মী কেন স্বয়ং ভগবতী হলেও সে শক্তি আমার কখনও হবে না।"

বললাম "না—না। তুমিই ঠিক বলতে পারবে। আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না।"

বললে "যাই হোক—ব্যাপারটা কি শুনি?"

বললাম "কাল রাত্রে যা বলেছিলে না—সে বিষয় কি করি বলত? মুকুন্দকে কিছু বলা দরকার না?"

সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর দিলে "সে আমি কি জানি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েই খালাস।"

এই বলে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই বললাম "যাচ্ছ কোথায়। একটু বস না। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করি।"

বললে "না—না, এখন বসতে পারব না। সকাল থেকে মার শরীর বড্ড খারাপ হয়েছে। শুয়ে আছেন, ওঠেন নি।"

বললাম "সে কি?"

বললে "মার বিষয় ত কোনও খবর রাখবে না। দিন দিন যে মার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার কি কোনও ব্যবস্থা করছ?"

মার প্রতি তুষারবালার এই রকম দরদমাখান কথা আগেও দু একবার শুনেছি। কিন্তু কেমন যেন কোন দিনই বিশ্বাস হয়নি যে মার প্রতি তুষারবালার এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা আছে। যখনই শুনেছি তখনই ভেবেছি ওসব একান্ত মুখেরই কথা। পাঁচজনার মধ্যে, কি শরীরের দিক দিয়ে কি মনের দিক দিয়ে নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা তুষারবালার যথেষ্ট ছিল—এসব কথা তারই অভিব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু আজ যেন কেমন বিশ্বাস হল। কেমন যেন মনে হল—ভিতরে ভিতরে তুষারবালার মনটা সকলের জন্যই দরদে ভরা। বাইরেটা রুক্ষ, তাই সব সময় ঠিক ধরা যায় না। ক্রমেই খুসীতে ভরে উঠতে লাগল প্রাণ।

বললাম "সেকি? আজ এখনও ওঠেন নি?"

তুষার বললে "আমি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি। ক্রমেই ওঁর শরীর যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওঁকে একজন ভাল ডাক্তার দেখান দরকার।"

বললাম "ওষুধ পত্র ত খেতেই চান না। নিয়ম মত কদিন বদ্যি কবিরেজের ওষুধ খেলেও ত হয়।"

বললে "যত্ন কবরেজের ওষুধে ছাই হবে। আমি বলি এক কাজ কর, তুমি সকাল সকাল স্নান করে দুটী খেয়ে নিয়ে সদরে চলে যাও। দেখে শুনে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এস

বললাম "দেখি মার সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা করতেই হবে

এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বললে "মা হয়ত বারণ করবেন, সে কথা শুনলে ত চলবে না।"

বললাম, "তা অবশ্য। একজন ভাল ডাক্তার দেখানর কথা তুমি মন্দ বলনি।"

বললে "আমার কথা যদি শোন, তুমি নিজে গিয়েই ডাক্তার নিয়ে এস। তুমি যেমন বুঝে সুঝে ভাল ডাক্তার নিয়ে আস্‌তে পারবে আর কেউ তা পারবে না। আর মার জন্য করা--যে করবে তারই মঙ্গল।"

বললাম "কিন্তু আজকে আমার পক্ষে যাওয়া ত সম্ভব হবেনা। আজ সেরেস্তায় বড্ড কাজ।"

একটু উত্তেজিত স্বরে বললে "মার চেয়ে কি অন্য কোনও কাজ বড় হতে পারে। দেরী করা একেবারেই উচিত নয়। আজই যাওয়া উচিত। দিন দিন ওঁর যে রকম শরীর হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ একটা ভাল মন্দ কিছু হলে আপশোষের সীমা থাকবে না। ওঁর শরীরকে আমার ত আর এতটুকুও বিশ্বাস হয় না।"

* * *

মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বাইরে যেতে যেতে মনে হল তুষার যতটা ভয় পেয়েছে, অতটা ভয় পাওয়ার কিছুই হয়নি। তবুও ঠিক করলাম দুচার দিনের মধ্যেই সদর থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে মার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

বৈঠকখানা বাড়ীতে দোতালার উপরে বাবার যে ঘরে সেরেস্তা ছিল, আমি এখন সেই ঘরে বসেই জমীদারীর কাজ কর্ম্ম দেখি। ঘরে সরঞ্জাম বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার বসবার চেয়ারের সামনে একখানা টেবিলের অপর দিকে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল, এবং একপাশে ছিল একখানা তক্তাপোষ এবং তার উপর একখানি সাদা চাদর বিছানো থাকত। ঘরের এক কোণে একটা তালা দেওয়া আলমারী ছিল—জরুরী কাগজপত্র থাকত এবং দেয়ালের গায় লাগানো আর এক পাশে ছিল একটা লোহার সিন্দুক।

এই ঘরে গিয়ে দেখি আলীমিঞা তক্তাপোষের উপর বসে নিবিষ্ট মনে কি একখানা চিঠি পড়ছেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে বললেন "পীরতলা থেকে একটা লোক এসেছে—একখানা জরুরী চিঠি নিয়ে।"

আমি গিয়ে আমার চেয়ারে বসলাম। আলীমিঞা আমারই টেবিলের অপর দিকে বেঞ্চির উপর বসে হাতের চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "চিঠিখানা পড়ে দেখুন বাবু!—কি সব ব্যাপার।"

চিঠিখানা ছোট ছোট জড়ান বাংলা হাতে লেখা—পুরো চার পৃষ্ঠা। নীচে নাম সই রয়েছে "শ্রীভৈরব চরণ ঘোষাল।"

জিজ্ঞাসা করলাম "এই ভৈরব ঘোষাল লোকটা কে?"

আলী মিঞা বললেন "কেন আপনি ত চেনেন বাবু। আমাদের পীরতলা মহলের গোমস্তা।"

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়লাম। আলী মিঞা কে জিজ্ঞাসা করলাম "ভৈরব ঘোষালের এ-সব কথা কি সত্যি?"

আলী মিঞা বললেন "সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ নাই। পীরতলা আমাদের একটা ভাল মহল। আমি যতদূর জানি সেখানকার প্রজারাও খারাপ নয়। অথচ নবীনমুন্সী পীরতলার নায়েবী নেওয়ার পর থেকেই পীরতলার আদায় তহশীল ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। গত দুই বৎসর পীরতলা থেকে ত বিশেষ কিছুই আমদানী হয়নি।"

আমি বললাম "আপনি নায়েবের কাছে কৈফয়ৎ চাননি? আদায় তহশীলের হিসাব পাঠায়নি সে?"

আলী মিঞা বললেন "হিসেব গত দুবছর থেকে সে দেয়নি। একবার? পঞ্চাশবার কৈফিয়ৎ চেয়েছি। ঐ এক কথা, দেশের অবস্থা খারাপ, ধান চালের অবস্থা খারাপ—প্রজারা খাজনা দেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ দেখুন এই

আমি বললাম "তা ভৈরব ঘোষালের কথা যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কি? হয়ত নায়েব নবীন মুন্সীর সঙ্গে কোনও বিবাদের দরুণ সে এই রকম চিঠি লিখেছে।"

আলী মিঞা বললেন "না বাবু! ভৈরব ঘোষাল বুড়ো মানুষ, অতি সজ্জন লোক। আর সে ত সেধে এ চিঠি লিখেনি। নবীন মুন্সীর কাজে কর্ম্মে, আমার মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ এসেছিল। তাই আমি চুপি চুপি মহলের ঠিক অবস্থা জানবার জন্য ভৈরব ঘোষালকে চিঠি দি। বিশেষ করে অভয় দিয়েছিলাম যে সত্য অবস্থা জানালে তার ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না তাই সে আমাকে এই লিখেছে।

একটু বিবেচনা করে বললাম "তা বটে। জানে ত তারা সবাই এ বছর মাঘ মাসেই আমার মহল দেখতে বেরুবার কথা। এসব কথা মিথ্যে হলে যে হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু নবীন মুন্সীর ভরসা ত কম নয়। দুদিন বাদেই আমি মহলে গিয়ে হাজির হব। তখন—"

আলী মিঞা বললে "আপনি যাবেন বলেই অবস্থা এতটা জটিল হয়ে উঠেছে। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা কড়ি ত বরাবর রীতিমত আদায় করে খেয়ে বসে আছে। এখন আপনি স্বয়ং গেলে কিছু টাকার বুঝ আপনাকে দিতে পারলে অবস্থাটা কতকটা আপনার সামনে সামলে নিতে পারবে। এই ভাবছে।"

আমি বললাম "তাই প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায়ের জন্য, তাদের উপর এই সব অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে।"

আলী মিঞা খানিকক্ষণ চুপ করে নতমুখে মাটীর দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন "এ জিনিষ এখুনই বন্ধ করা দরকার। নইলে পীরতলা মহলটা চিরদিনের জন্য মাটি হয়ে যাবে। ভৈরব ঘোষালও লিখছে—প্রজারা "জোট" করবে মনস্থ করেছে। নায়েবের নামে থানায়ও দু-একটা ডায়রী হয়েছে, তবে দারোগাকে কিছু টাকা খাইয়ে হাত করে রেখেছে বলে বিশেষ কিছুই হয়নি।"

আমি বললাম "তা আপনার মতে এখন কি করা উচিত?"

আলী মিঞা তৎক্ষণাৎ বললেন "আমার মতে? আমার মতে আপনার স্বয়ং এখনিই একবার পীরতলা মহলে যাওয়া উচিত। যদি কাল রওনা হতে পারেনত পরশু না করাই ভাল। হঠাৎ চলে যান, সেখানে কোনও খবর না দিয়ে। সেখানে গিয়ে ভৈরব ঘোষালের সাহায্যে গ্রামের মাতব্বর প্রজাদের ডাকিয়ে পাঠান। ডাকিয়ে তাদের সব জিজ্ঞাসা করুন। ব্যাপারটার তদন্ত করুন। তারপর যদি ব্যাপারটা সত্য হয়, সকলের সামনে নবীন মুন্সীকে বরখাস্ত করে আপাততঃ ভৈরব ঘোষালকে নায়েবী দিয়ে আসুন। প্রজাদেরও জানিয়ে দিয়ে আসুন—এ বছর তাদের আর একটি পয়সাও দিতে হবে না। তাহলেই দেখবেন প্রজাদের "জোট" করাত দূরের কথা তারা আপনার গোলাম হয়ে পড়বে। ঘটী বাটী বিক্রী করেও আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করতে তারা পিছপাও হবে না। আর ভৈরব ঘোষাল! তাকে একটু অভয় দিলেই সে আপনার জন্য প্রাণ দেবে। সে নেমকহারাম নয়।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আলী মিঞার কথার মধ্যে যে যুক্তির অভাব ছিল না সেটা বোঝা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। কিন্তু কালই মফঃস্বল রওয়ানা হওয়ার পক্ষে আমার মন প্রস্তুত ছিল না। তাই ভাবছিলাম —আমি না গিয়ে আর কোনও দিক দিয়ে কোনও করা যায় কিনা। অথচ কিছু করবার আগে একটা তদন্ত করা দরকার। সেখানে না গিয়ে তদন্তই বা হয় কি করে।

বললাম "আমাকে ত এই পৌষ মাসটা গেলেই সব মহল দেখবার জন্য মফস্বল বেরুতেই হবে। এতদিনই গেছে, এই কটা দিন দেরী করলে কি বিশেষ ক্ষতি হবে?"

আলী মিঞা বললেন "না বাবু! প্রজারা একবার ক্ষেপে গেলে আর তাদের ফেরান যাবে না। প্রজারা যদি একবার খাজনা দেবনা বলে "জোট" বাঁধে—তখন মহলটাই একেবারে উচ্ছন্নে যাবে। আমাদের সোণার মহল পীরতলা।"

বললাম "আচ্ছা, আপাততঃ আপনি গেলে হয় না?"

বললেন "না। অন্য কোনও মহল হলে আমি অনায়াসে যেতে পারতাম। আপনি পরে গেলেও হত। কিন্তু এখানে নয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

বললেন "নবীন মুন্সী যে ও বাড়ীর ছোটবাবুর সম্পর্কে কি রকম শালা হন। তাই ত তার এতখানি সাহস। অন্য কেউ হলে ত আমি কোন কালেই—"

আলী মিঞা হঠাৎ চুপ করে গেলেন, না বাকী কথা আমার

কালে গেল না—ঠিক মনে নাই। মনে আছে কথাটা শোনা মাত্র আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন তড়িৎ খেলে গেল। নবীন মুন্সী মুকুন্দর শালা—ছ-আনি অংশের বড় কুটুম্ব—তাইতেই তার এতখানি আস্পর্দ্ধা—।

* * * *

ঠিক করে ফেললাম কালই পীরতলা রওয়ানা হব। পৌষমাস বলে মা আপত্তি করবেন? কিন্তু পৌষমাসের মধ্যেই ফিরে এলে ত পৌষমাসে রওয়ানা হতে কোনও বাধা নাই। যাওয়া আসা, এবং সেখানে দু একদিন থাকা—মোটের উপর পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব।

দুপুর বেলা স্নান করে খেতে বসে মাকে পীরতলা যাওয়ার কথা বলাতে মা পৌষ মাস বলে কোনই আপত্তি করলেন না। অবশ্য মাকে বলেছিলাম পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব।

খেয়ে উঠে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম। তুষার তখনও খেয়ে আসেনি। শুধু মুকুন্দ নয়, মুকুন্দর শ্যালকেরও যে কতখানি স্পর্দ্ধা হয়েছে—তুষার এলে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে দেওয়াই উচিত। এবং সমস্ত ব্যাপারটা তদন্তের পর যদি সত্য হয়, নায়েব নবীন মুন্সীকে দশজনার মধ্যে অপদস্ত করে, মুকুন্দকে কিছু না জানিয়ে, তাকে বরখাস্ত করতেও আমি এতটুকু দ্বিধা করব না—এ সমস্তই তুষারকে খুলে বলবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে তুষার ঘরে এল। রূপার পানের ডিবায় এক ডিবা পান হাতে নিয়ে। এসে খাটের উপর বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে "হাঁ করে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কি ভাবছ?"

আমি তাকে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। চুপ করে সমস্ত কথা শুনে তুষার বললে "ঠাকুরপোকে না বলে তার আত্মীয়কে অমন করে বরখাস্ত করলে ঠাকুরপো রেগে যাবেন না?"

উত্তেজিত হয়ে বললাম "আমার বয়েই গেল। তাই ত আমি চাই। সে বুঝুক প্রয়োজন হলে তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করবার শক্তি আমার আছে।"

তুষার আবার বললে "ঠাকুরপোরাওত মালিক! ঠাকুরপো যদি বলেন আমি ওকে বরখাস্ত করব না।"

বললাম "বরখাস্ত না করেন, তিনি রাখুন তাঁর ছ আনির জন্য। বর্ত্তমান কাছারী বাড়ী আমাদের। করুন তিনি আলাদা ছ-আনি কাছারী ঘর পীরতলায়। তারপর দেখা যাক!"

এসব কথাই সকাল বেলা চারিদিক থেকে আলী মিঞার সঙ্গে আলোচনা হয়ে গেছে। আলী মিঞার মতেও মুকুন্দ বা তার বাপকে এখন কিছুই বলা সমীচীন নয়। আমার একলা গিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত। প্রথমতঃ তা হলে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং ফলে প্রজারাও খুসী হবে। এবং দ্বিতীয়তঃ আমি গিয়ে এখন যদি মহলে একটা সুবিচার করি প্রজারা আমাকেই চিনবে, ফলে দশ আনিরই বাধ্য হবে বেশী। এবং সর্ব্বোপরি আলী মিঞার মতে, ছ আনির সঙ্গে জমিদারী ব্যাপারে আমার দিক দিয়ে একটু দৃঢ়তা দেখান অনেক দিন আগেই উচিত ছিল।

"কি জানি বাপু! তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান।"

এই বলে তুষার এক রাশ চুল মাথার বালিশে ছড়িয়ে দিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে আমার মানসক্ষেত্রে আর একটী নতুন রসের ধারা কখন যে বইতে সুরু হয়েছিল, আমি নিজেই জানি না। আজ দুপুরে তুষার হঠাৎ আমার পাশে শুয়ে পড়া মাত্র তারই স্পর্শের শিহরণে সেই রসধারা প্রাণের দুকূল ছাপিয়ে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে একটী চাঞ্চল্যের পুলকে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। হঠাৎ যেন নতুন করে, বড্ড বেশী আপনার করে পেতে ইচ্ছে হল তুষার বালাকে। যদিও সে আমার, একান্তই আমার, তবুও যেন তাকে ধরে রাখতে হবে সমস্ত প্রাণ দিয়ে, অন্তর দিয়ে, শরীর দিয়ে—নইলে যেন তাকে ধরে রাখাই যাবে না। বাহির হতে আর একজন তাকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আমার বুক হতে। আর একজন তাকে চেয়েছে তাই কি সে আজ এত মধুর এত মোহিনী হয়ে উঠল আমার প্রাণে প্রাণে?

সকাল থেকেই তাকে আজ একটু যেন বিশেষ করে ভাল লাগছিল। কিন্তু সকাল বেলা থেকে, মুকুন্দর প্রতি মনো-

ভাব, ভৈরব ঘোষালের চিঠি,—প্রভৃতি নানান ব্যাপারের বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতে প্রাণের এই নতুন রসটুকু প্রাণের মধ্যেই ছিল চাপা। এই শুব্ধ দুপুরে বাইরের টানা-টানির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে একান্ত নিরিবিলি কাছে পাওয়ার মূল্যটা, একটা নতুন ভাবে বড্ড বেশী প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম আজ।

হঠাৎ খেয়াল হল—পীরতলায় তুষারবালাকেও সঙ্গে নিয়ে যাইনা কেন? বেশ ত হয়। কোনও ত অসুবিধা নেই। প্রকাণ্ড সবুজ আমাদের বজরাতে, লোকজন সমস্ত বন্দোবস্তই ত থাকবে আমার। ৫।৭ দিন নদীতে নদীতে তুষারবালাকে নিয়ে বেড়ান, এর চাইতে বেশী আনন্দ, সেদিন দুপুর বেলা আমার পক্ষে কল্পনাও করা ছিল অসম্ভব।

বেশী কিছু বিবেচনা না করেই বললাম "তুষার! কালই ত পীরতলায় যাচ্ছি। চলনা তুমিও আমার সঙ্গে।"

কথাটা শুনে আনন্দে সে যেন নেচে উঠল।

বললে "সত্যি! নিয়ে যাবে আমাকে?"

আমি বললাম "বাধা কি? কোনই ত অসুবিধে হবে না তোমার।"

* * *

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ব্যথা। কেন যে এ বেদনা, হঠাৎ কিছু ঠিক করতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠে চুপ করে খানিকক্ষণ জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে সমস্ত প্রাণখানা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন চোখ পড়ল প্রাণের নিভৃত কোণে আহত জায়গাটুর উপর। মুকুন্দ—মুকুন্দ শেষটা আমায় এমন দাগা দিলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুর ঘাটে এসে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। প্রাণ মন শরীর সবই যেন একটা নিদারুণ আলস্যে ভরা। চারিদিকে শীতকালের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপরাহ্নের রৌদ্রটুকু। তাও যেন বড় নিরলস, বড় নির্জ্জীব—যেন আমারই প্রাণের সুরে বাঁধা।

সকাল বেলার সেই প্রচণ্ড রাগ তখন আমার মনে একেবারেই নাই। বরং মুকুন্দকে এ রকম একটা কুৎসিত ব্যাপার নিয়ে কিছু বলতে মন যেন আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে মনে হল এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার কিছু বলতে যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা দৈন্য আছে। এটা ত তুষারের ব্যাপার. সেই যদি সতর্ক হয়ে, একটু কঠোর ইঙ্গিতে মুকুন্দকে সাবধান করে দিত—তাহলে ব্যাপারটা মোটের উপর সহজ হত—শোভন হত। তাহলেই মুকুন্দ নিজের লজ্জায় সমঝে চলবার পথ পেতনা। তারপর সব সহজ হয়ে গেলে আমাকে চুপি চুপি যদি সব বলত,—কিছুই যেন আমার কানে আসেনি আমার কানে পৌঁছবার পক্ষে এ ব্যাপার অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণ্য—এই রকম একটা উদার গর্ব্বিত মনোভাব নিয়ে মুকুন্দর সঙ্গে ব্যবহারে সহজতা রক্ষা করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হত না। আমার আত্মসম্মানও বজায় থাকত।

কিন্তু ততখানি বুদ্ধি, ততখানি আত্মশক্তি তুষারের কাছে আশা করা চলে না। মনে হয়েছিল, আসলে তুষার অতিশয় সরল, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত তার মন। তাই যা ঘটেছে, আমাকে বলেই সে খালাস—প্রতিবিধানের ভার এখন সম্পূর্ণ আমারই উপর। তাইত এখন আমার কিছু করা দরকার। নইলে মুকুন্দকে শিক্ষা দেওয়া হবেনা, তুষারের কাছেও আমার পুরুষোচিত গর্ব্বে লাগবে বিষম ঘা।

এই রকম ধরণের নানান চিন্তায় অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি মুকুন্দ আসছে আমাদের বাড়ীর দিকে। মুকুন্দকে দেখেই বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

মুকুন্দ ঘাটের কাছে এসে আমার দিকে চেয়ে বললে "একি শান্তদা! অমন চুপ চাপ বসে এখানে? এই ঘুম থেকে উঠলে বুঝি?"

ঠিক সেই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে চাকর এসে আমাকে বললে "চা অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে বাবু! জুড়িয়ে গেল। বৌঠাকরণ আপনাকে এখুনিই ভেতরে ডাকছেন।"

গম্ভীর ভাবে বললাম "আচ্ছা যা। যাচ্ছি।"

মুকুন্দর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, "মুকুন্দ! বোস ঐখানে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

মুকুন্দ সত্যিই যেন একটু অবাক হল। চুপ করে গিয়ে বসল—আমার থেকে খানিকটা দূরে। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সেও কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না।

হঠাৎ বললাম "পরের স্ত্রীর সঙ্গে মেলা মেশায় সব সময়ই একটা সীমা থাকা উচিত, তা সে স্ত্রী যতই নিকট আত্মীয় হোক না কেন।"

মুকুন্দ যেন একটু চম্‌কে উঠল। একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে।

বললে "তার মানে?"

বললাম 'আমি সব শুনেছি। তুষার তোমার মতন পুরুষের মুখ দেখতেও ঘৃণা বোধ করে।"

কথাগুলি বলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল। পুকুরের জলের দিকে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে চেয়ে রইল। পরে বললে "তোমার মন যে এত নীচ, এত সংকীর্ণ তাত জানতাম না।"

শরীর জ্বলে উঠল। আবার আমাকেই অপরাধী করতে চায়। আশ্চর্য্য বেহায়া। উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম "আমার মনের বিচার করতে তোমাকে কেউ ডাকেনি এখানে। আর সে যোগ্যতা তোমার মত জঘন্য লোকের এ জীবনে কখনও হবেনা।"

মুকুন্দ একটু স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল—বলল না। হন্ হন্ করে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিদায় বন্ধু, বিদায়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

উদয়-তারারে ভালবেসেছিনু বন-জ্যোৎস্নার রাতে
স্নিগ্ধ নয়নে স্বপন-আবেশ, শেফালির মালা হাতে,
ভালবেসেছিনু ভোরের হাওয়ায় নিমীলিত আঁখি দুটি,
অলক-কুসুমে না জানি কখন ভরেছিনু দুই মুঠি।
তুমি সাথে ছিলে পথের সঙ্গী, তাই পড়িতেছে মনে
গোধূলির ম্লান ছায়ায় কখন হারানু আপন জনে।
ঘন বনপথ পারায়ে দেখিনু সমুখে বিস্মরণী,
অপরিচয়ের আড়ালে লুকাল সুন্দর এ ধরণী।
কাছে গেলে তুমি চিনিতে পারনা, দূর হতে চেয়ে থাক,
সন্ধ্যামণিরে ভুলাইতে গিয়ে চামেলিরে বুকে রাখ।
বন্ধু তোমারে জানাব কি তবে বিদায়-সম্ভাষণ?
পথের ধূলায় এমনি লুটাবে হৃদয়-সিংহাসন?
দেবতা ফিরিয়া গিয়াছে হেলায়, মন্দিরে কিবা কাজ
পূজার বাদ্য-উতরোলে আজ বাড়িতেছে শুধু লাজ!
ছায়ারে ঘিরিয়া আরতির দীপ জ্বলে আর নিভে যায়,
এ নিরানন্দ ধূপের গন্ধ তোমারে খুঁজে না পায়;
মালতী-বিতানে কচি কিশলয় শুকাল কুঞ্জবনে
পূরবীর সুর গুমরিয়া ওঠে ভ্রমর-গুঞ্জরণে,
ফুলের কলিরে যদিই বা দেখি, ফুল হয়ে ফোটেনাক,
না-ফোটার ব্যথা রাঙা হয়ে ওঠে যত তারে ঢেকে রাখ।
ফুলের ফসল শেষ হয়ে গেছে,—উষর ভূমির দেশে
আজি ভাবিতেছি সেদিনের কথা,—কোথায় দাঁড়ানু এসে?
তোমার আমার মনের মাধুরী ফুটাল কত না ফুল,
দেবতার পায়ে দিলাম অর্ঘ্য সুগন্ধ-সমাকুল।

রঙে রঙে তার রঙীন আকাশ, রঙীন মনের দেশে
কল্পনারাণী বীণা হাতে ক'রে দেখা দিল বধূবেশে,
ঝঙ্কারে তার মনের গহনে উঠিল যে মূর্চ্ছনা,
বীণা থেমে গেছে তবুও কেমনে করি তারে বঞ্চনা?
তুমি ভুলিয়াছ, আমিত ভুলিনি সেদিনের আহ্লাদ,
আপনারে শুধু ভুলায়ে ভুলায়ে আনিয়াছ পরমাদ।
তুমিই নিজেরে চিনিতে পার কি? দেখ দেখি ভাল করে'
চিত্ত-ফলকে কিবা লেখা আছে স্বর্ণ অক্ষরে;—
নয়ন মুদিয়া পশ্চাতে চাও, চাও অন্তর তলে,
জেলেছিলে দীপ আপনার হাতে, সেকি আজও
সেথা জলে?
হোক্ নিবু নিবু তবু তারি শিখা ক্ষীণ জ্যোতি-মহিমায়
অপরাহ্নের এ অবসন্ন আঁধারের সীমানায়
আলোর আভাসে আনে প্রত্যাশা দুরাশার মাঝখানে।
জীবন-তরণী তবু ভেসে যায় উজান স্রোতের টানে।

আজিকে আমারে দেখিতে পাওনা, যেন তুমি কত দূরে—
মনের মিনতি আলেয়ার পিছে শুধু মরিতেছে ঘুরে,
তোমারে ঘিরিয়া ওঠে কোলাহল, জনতার ঠেলাঠেলি,
অবুঝ মনেরে বুঝাইয়া ঘরে ফিরে যাই বেলাবেলি।
দূর হতে শুনি উতলা রজনী প্রলাপ বকিয়া চলে,
শুষ্ক রজনীগন্ধার মালা তুমি কি পরালে গলে?

তোমার পথের নিশানা ধরিয়া যত আমি ঘুরে মরি
মিছিল তোমার আনপথ দিয়ে তত যায় দূরে সরি।
কাগজের ফুল নয়নে তোমার আঁকে মোহ-অঞ্জন,
গন্ধবিহীন ধূপ দহি' তব করে মনোরঞ্জন।
আতসবাজীতে বিস্ময় লাগে পূর্ণিমা-রজনীতে
অঢেল জ্যোৎস্না আজিকে তোমারে কিছু কি
পারে না দিতে?
রঙমশালের ক্ষণিক আলোকে বাড়িছে অন্ধকার,
পাপিয়া ছাড়িয়া ভক্ত হয়েছ খাঁচার চন্দনার।
আপনারে তুমি ভুলায়ে ভুলায়ে ভুলেছ আপন জন
আমারে ঘেরিয়া তাই লোকালয়ে রচিতেছি নির্জ্জন।
দাক্ষিণ্যের দুয়ারে দাঁড়ায়ে করুণা ভিক্ষা করা
সেই লজ্জায় ঘন কুয়াসায় লুকাইতে চাহে ধরা।
—সেও সহে প্রাণে, সহে না জীবনে প্রণয়ের মাধুকরী
উপযাচকের বিড়ম্বনায় করঙ্ক ওঠে ভরি।

তাই চাহিতেছি বিদায় বন্ধু, চরণ চলে না আর,
পথ ভুলে যাই, নয়নের জলে ঘনায় অন্ধকার!
অন্তর হ'তে দিয়েছ বিদায়, বাহিরে লৌকিকতা,
সিংহ-দুয়ারে সজাগ প্রহরী, রজনী তন্দ্রাহতা;
সেই অবসরে দস্যু পশিয়া লুটিল রত্নরাজি,
তাইত আমার বিদায় বেলার ঘণ্টা উঠেছে বাজি,
বিদায় বন্ধু, বিদায় এবার, রাত্রি ঘনায়ে আসে,
—তোমার তরণী ভাসিয়া চলুক খরস্রোত উচ্ছ্বাসে।

লীলাসঙ্গিনী

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম-এ

স্কুলের মাইনে এক টাকা বেড়ে যাওয়া মাত্র রেণুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। খুব যে কিছু ক্ষতি হোলো তাতে তা নয়—অন্তত রেণু যে পরিমাণ চেঁচামেচি কান্নাকাটি করলে সে তুলনায় তো নয়ই। বাংলা কোনো বই পড়তেই তার আটকায় না, ধোপার বা বাজারের হিসেব সে এক রকম নির্ভুল ভাবেই করতে পারে, কুড়ি অবধি নামতা তো তার কণ্ঠস্থ, মিশ্র যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবই সে জানে। অতএব জেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানীর নাম কি, বা আমেরিকায় আলু উৎপন্ন হয় কি না, না বলতে পারলে বাঙালীর মেয়ের কীই বা এসে যায়! ইংরিজী যেটুকু সে শিখেছে সেটুকু তো ভবিষ্যৎ জীবনে সযত্নে ভুলে যাবার জন্যেই, কাজেই রাজা আলফ্রেডের অধ্যবসায়ের গল্প ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নাই বা সে মুখস্থ করলে? সে তো আর বি, এ, এম, এ পাশ করতে যাচ্ছে না; বড় জোর না হয় বিয়ের আগে পর্য্যন্ত স্কুলে পড়তো—তার এখন যা বয়স তাতে তার তো একটা পাশ দেওয়াও ঘটে উঠতো না।

যাই হোক, কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেও যখন রেণু দেখলে কর্ত্তৃপক্ষ অটল, তখন চোখ মুছে সে ভবিতব্যকেই মেনে নিলে। তাই বলে পড়াশুনো সে ছেড়ে দিলে একথা মনে করা ভুল। বরং 'পাস পোর্ট' পেয়ে গেছে মনে করে (তার বিয়ের কথাবার্ত্তা পুরোদমে সুরু হয়েছিল) সে রাজ্যের নাটক নুভেল নির্ব্বিচারে পড়ে শেষ করে ফেল্লে। বিয়ের কথা সে এত বেশী শুনতো যে ক্রমে ক্রমে তার ধারণা দাঁড়িয়ে গেল বাপের বাড়ীতে সে দু'দিনের জন্যে অতিথি হয়ে এসেছে। তার নিজের বাড়ী অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অবিশ্যি তার নেই, তবু সেইটেই তার আসল বাসস্থান, সেইখানকার লোকেরাই তার আপনার লোক—এটা তার সহজাত সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেল। এমন কি—কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—সে ছোটো ভাই বোনগুলোর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করা রীতিমত কমিয়ে দিলে, তাদের ওপর তার স্নেহ, দরদ হঠাৎ উথলে উঠলো। আহা, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওদের জন্যে বড্ডো মন কেমন করবে! অনভ্যাসের দরুণ লজ্জা করলেও সে মাঝে মাঝে তার ছোটো ভাই বোনেদের আদর করতেও সুরু করলে:

সখীদের কাছে শোনা গল্প আর বইয়ে পড়া গল্পের নায়িকার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কল্পিত নায়কের কল্পিত আদর সোহাগে সে একলা ঘরে বসেও লজ্জায়, আনন্দে, সুখাবেশে আকণ্ঠ রাঙা হয়ে উঠতো। এম্নি করে সুরু হোলো তার এক নতুন জীবন রঙীন্ স্বপ্নে-ভরা, পুলক শিহরিত যৌবনোন্মেষ। জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে দেখতে তার দয়িতের একটা সুস্পষ্ট রূপ সে মনে আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু এইখানেই সে বারে বারে বিফল হয়। তার বর যে ঠিক কী রকম সে কিছুতেই সঠিক কল্পনা করতে পারে না। কীরকম যে হবে না তা বরং সে বলতে পারে! নির্দ্দিষ্ট একটা আকার সে তার বরকে দিতে পারে নি সত্যি—তাই বলে তার কল্পনা-সম্ভোগে যে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটতোনা এ-ও সত্যি।

২

অমল রেণুর চেয়ে বছর চারেকের বড়ো। সেদিন অবধি এই জ্যেষ্ঠত্বের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় খাটাতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। এখনো যে করে তা নয়, তবে বিশেষ সময় পায় না। পড়াশুনো (বি, এস, সির পড়া যে চাট্টিখানি কথা নয়, এ আর কে না জানে?) আর খেলা ধুলো নিয়ে সে এত ব্যস্ত থাকে যে কারণে অকারণে রেণুর সঙ্গে খুনসুটী করে তাকে রাগাবার অবকাশই সে পায় না। তার ওপর সে একজন 'জেণ্টলম্যান' হয়ে উঠেছে, কলেজের ছোকরা

প্রফেসরেরা 'আপনি' বলে কথা বলেন—এখন কি আর তুচ্ছ রেণুর ওপর মনোযোগ দেওয়ার তার অবসর আছে? তার ওপর মেয়েগুলো অল্প বয়সেই এমন জ্যাঠা হয়ে ওঠে—যে সহ্য করাই দায়। এই তো সেদিন—মা বল্লেন, "ওরে রেণুর মায়ের জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম, যা তো দেখে আয় কেমন আছে।" অমল মাসীমার (পাড়া সুবাদে) ঘরে খানিকক্ষণ বসে জিজ্ঞেস করলে, "রেণু কোথায়—মাসীমা? একটু কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারে না?"

মাসীমা বল্লেন, "এতক্ষণ তো বসেই ছিল, এই মাত্র আমার সাবু করতে উঠে গেল। খাও না, অমল, চা খাও তো ওকে বলো গে, করে দেবে।"

চায়ে অমলের অরুচি ছিল না কোনোদিনই। সে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে উঠলো। রেণু তখন আঁচল দিয়ে ধরে উনুনের ওপর থেকে সাবুর বাটি নামাচ্ছে। আগুনের আঁচে তার ফরসা মুখখানা টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। অমল বলে উঠলো, 'ওরে বাবা, রেণুও পাকা গিন্নি হয়ে উঠলো? কালে কালে কতোই দেখতে হবে! উঁহুঃ, ভুল হয়ে গেছে—এখন চটানো নয়। জয় হোক, গিন্নি ঠাকরুণ। এক কাপ চা পাই—অধম তৃষ্ণার্ত্ত।"

রেণু সাবুতে চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্লে, "বোসো না পিড়েটা টেনে নিয়ে। বাবুর যে আজ গণ্ডা কতক বন্ধুর সঙ্গে জুটে বেরুনো হয় নি? আচ্ছা, অমলদা ঠিক করে বলো তোমার কতোগুলো বন্ধু আছে। বাবাঃ, নিত্যই নতুন মূর্ত্তি! কেউ ডাকেন বাজখাই সুরে 'অমল, কেউ বা অতি মিহি মেয়েলি গলায় 'অ...ম...ল'—যেন জলতরঙ্গ বাজিয়ে গেলেন! কারো চুল কদম ছাঁট, কারো বা কোঁকড়া চুল কাঁধ অবধি এসে পড়েছে, মেয়েছেলে কি ব্যাটাছেলে চেনাই দায়! মনে ভাবেন বোধ হয়, 'কী অপরূপই না জানি দেখাচ্ছে আমায়।' দেখলে হাড় অবধি জ্বলে যায়। আমি হলে, ও রকম সং যে সাজে তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতুম না—বন্ধুত্ব তো দূরের কথা।"

অমল তাড়া দিয়ে বল্লে, "নে, নে, জ্যাঠামি করতে হবে না। চা খাওয়াবি কি-না বল, নয়তো উঠি। তোর সঙ্গে বক্ বক্ করবার মতো অফুরন্ত সময় আমার নেই।"

"ঈঃ! কী কাজের লোক! আড্ডা দিয়ে তো রোজ ন'টার সময় বাড়ী ফেরা হয়; জানিলে যেন কিছু! দাঁড়াও, মাকে সাবুটা দিয়ে আসি।"

ফিরে এসে রেণু দেখে অমল চায়ের কেটলি উনুনে চড়িয়ে দিয়ে বসে হাওয়া দিতে-সুরু করেছে।

"ও-মা! ও কি? তুমিও গিন্নিপণা সুরু করলে? নাও, খুব হয়েছে—সরো।" বলে রেণু তার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। কেটলির ঢাকনি খুলে দেখে রেণু খিল খিল করে হেসে উঠলো, "মাগো, অমলদা, তুমি কি এক গামলা চা খাবে নাকি? কতোক্ষণে ফুটবে ও জল?"

অমল অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "আন্দাজী দিয়েছিলুম খানিকটা জল। তাছাড়া তুইও তো খাবি?"

"খেলেই বা, তাই বলে এক কেটলি!" রেণু কেটলি নামিয়ে অনেকটা জল ফেলে দিয়ে আবার কেটলি বসিয়ে দিলে। অমল দমবার পাত্র নয়। গম্ভীর ভাবে ব'সে বসে ঠিক কতোটুকু উত্তাপ পেলে জল বাষ্প হতে সুরু করে—মানে ফোটে—আর সেই উত্তাপে অন্য জিনিষ—যথা তামা, পেতল, লোহা ইত্যাদি—কতোটা গরম হয়ে ওঠে, রেণুকে বোঝাতে লাগলো। রেণু চুপ করে শুনছিল, কিন্তু তার রাঙা ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি খেলে বেড়াচ্ছিল যে অমলের কেমন সন্দেহ হোলো রেণু কথাগুলো মোটেই শোনবার যোগ্য বিবেচনা করছে না—নেহাৎই করুণাপরবশ হয়ে চুপ করে আছে।

অমল রেণুর করা চায়ে চুমুক দিয়ে মন্তব্য করলে, "এ-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝবার মতো মস্তিষ্কই যদি মেয়েদের থাকবে, তাহলে—হুঃ।" কথাটা শেষ না করে সে ঘন ঘন পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলো। একেবারে পেয়ালা খালি করে সে তৃপ্তিসূচক শব্দ করলে, "আঃ।'

৩

গোল বাধালে বন্ধুর দল। সেদিন তিথিটা কি ছিল ঠিক মনে নেই, তবে চাঁদ প্রায় পূর্ণতার দিকেই ঘেঁষেছিল। জ্যোৎস্নায় সেদিন ফিনিক ফুটছিল। পার্কের পুকুরের জলে তারাভরা নীল আকাশের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি গ্যাসের আলোর

উদ্ধত প্রতিবিম্বের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চাইছিল। পুকুর পাড়ে ঘাসের ওপর ৫।৬ জন বন্ধুর জমাটি আড্ডা বসেছে। বিষয়টা ছিল 'প্রেমে পড়া'। প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বলছিল—মানে সত্য, অর্দ্ধ-সত্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা মিলিয়ে একটা কাহিনী তৈরী করে বেশ শ্রুতিরোচক করে বলছিল। যার বর্ণনার ক্ষমতা যতো বেশী তার কাহিনী ততো সত্যি বলে মনে হচ্ছিল।

বেচারা অমল পড়েছিল ফাঁপরে। বন্ধু মহলে বোকা বিষয়েই পেছিয়ে থাকতে সে একান্ত নারাজ। অথচ প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতা তার নেই মোটেই। এ কথাটা সর্ব্বসমক্ষে সে প্রচার করে কোন্ লজ্জায়? বিশেষ ক'রে চেরোর মতো হাঁদাটাও যখন···নাঃ। এমন চাঁদের আলো, মিঠে হাওয়ার মধ্যে বসে সে কিছুতেই বলতে পারবে না যে কোনো নারীর হৃদয় জয় করতে সে আজো পারে নি।

সকলে যখন অমলকে তার অভিজ্ঞতা বলবার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে, তখন অমল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে, 'ভাই বলতে পারি। কিন্তু আগে কথা দিতে হবে যে তোমরা 'মেয়েটি কে?' জানতে চাইবে না, আর ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবে না। কারণ এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সঞ্চয় একে আমি ভারি পবিত্র মনে করি।"

সকলে একবাক্যে সম্মতি দিয়ে উৎসুক হয়ে অমলকে ঘিরে বসলো। অমল জলের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে ধীরে ধীরে মেয়েটির রূপবর্ণনা সুরু করলে। দৈহিক বর্ণনার খুঁটিনাটি শেষ করে তার চলন, তার কথা বলবার ভঙ্গী, তার হাসি ও চাউনির বিশিষ্টতা কিছুই সে বাকী রাখলে না। বর্ণনা এমন জীবন্ত হোলো যে বন্ধুরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অমল তখন মনশ্চক্ষে রেণুকেই দেখছিল।

এইবার প্রেমের পালা। অমল বলতে লাগলো, "ভাই, এমনি এক জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে আমরা পরস্পরের কাছে আত্মনিবেদন করি।" (তার গলার স্বর রীতিমত গাঢ় হয়ে উঠ্লো) "তার ফুলের মতো হাত দু'খানি ছিল আমার হাতের মধ্যে। সন্ধ্যাতারার নির্নিমেষ দৃষ্টি এসে পড়েছিল আমাদের মুখে। ক্ষ্যাপা দখ্নে হাওয়া তার এলোচুলের রাশ আমার চোখে মুখে এনে ফেলছিল। বেল, জুঁই, হাস্নুহানার একটা মিশ্র সুগন্ধ বাতাসকে সুরভিত করে তুলেছিল। রাত্রির আকাশের সব রহস্য যেন পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তার কালো চোখদুটিতে। আকাশের চাঁদকে, সাঁঝের তারাকে সাক্ষী রেখে আমরা পরস্পরের কাছে সত্যবদ্ধ হই—চিরদিন পরস্পরকে ভালবাসবো, মিলন আমাদের হোক আর নাই হোক। দূরে কোন বাড়ীতে একটা পোষা কোকিল ডেকে উঠ্লো—যেন মঙ্গল শঙ্খধ্বনি আমাদের মিলনকে পূত করে দিলে। তারপর আমি তার রক্তিম অধরে একটা নিবিড় চুম্বন এঁকে দিলুম। মুহূর্ত্তের জন্যে তার হৃদ্‌স্পন্দন আমি অনুভব করলুম আমার বুকে। তারপর নীচে থেকে ডাক এলো। আমরা নেমে গেলুম।"

খানিকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা ফুটলো না। একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো জায়গাটাতে। তারপর চারু জিজ্ঞেস করলে, "তারপর?"

ম্লান একটু হেসে অমল বল্লে, "তারপর আর নেই।"

আড্ডা আর এরপর জম্লো না। সকলে উঠে যে যার বাড়ীর পথ ধরলে। অমলের ওপর শ্রদ্ধায় সকলের মন একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠ্লো। হ্যাঁ, প্রেমিক বটে! আর হবে না-ই বা কেন? কী সুন্দর চেহারা!······শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু হিংসের ভাবও যে অনেকের মনে উঁকি মারেনি, এমন কথা বলা যায় না।

কাহিনীটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তবু বলবার সময় অমলের মনে হচ্ছিল সে যেন যথাযথ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। তার কিরকম যেন একটা নেশা লেগে গিয়েছিল। কল্পনায় সে ব্যাপারটা এত স্পষ্ট দেখছিল যে অতিরঞ্জনটাও তার মনে হচ্ছিল সত্যি ঘটেছে। সেদিন বাড়ী ফিরে সে পড়াশুনায় মন দিতে পারলে না।

পরদিন সকালে যখন প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে অমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দেখলে রেণু তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তাকে চোখ চাইতে দেখে রেণু ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্লো, "বাবাঃ, আচ্ছা লোককে মাসীমা তুলে দিতে বলেছেন! বলি, ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে?

সাড়ে আটটা যে বাজে! মাসীমা বলেছেন এইবার চায়ের কেট্‌লি বার করে দেবেন—খেয়ো তখন কোথেকে চা খাবে। হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছো কি? ঘুম ছাড়েনি এখনো? আমায় চিনতে পারছো না? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো।" বলে রেণু তার কাঁধ ধরে আর একটা ঝাঁকানি দিলে।

রাত্রের মোহ দিনের আলোয় নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়েছিল। রেণু তার প্রিয়া! হাঃ হাঃ! রেণুকে যদি সে গদগদ ভাবে বলে, "রেণু তুমি আমায় ভালবাসো?" (ভাবতেও হাসি পায়,) রেণু অম্লানবদনে মাথা নেড়ে হয়তো বলবে, "হুঁ-উ; খু-উ-ব। অমলদা, মাসীমার আচারের হাঁড়ি থেকে এট্টুখানি চুরি করে আনোনা, ভাই। অনেকদিন খাইনি, সত্যি।"

অমল আলিস্যি ভাঙতে ভাঙতে জড়িতস্বরে বল্লে, "সকালবেলাই জ্বালাতে এলি?"

"বেশ করেছি এসেছি। তোমায় তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? ভালো করলুম কিনা! আমার আর কি? না উঠ্‌লে তুমিই চা খেতে পেতে না।" বলে টেবিলের ওপর এটা ওটা একটু নাড়াচাড়া করে রেণু বোঁ করে একটা ঘুরপাক খেয়ে নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতি-পরিচিত, অতি-প্রকাশিত রেণু। তার সঙ্গে খেলা করা চলে, খুনসুটী করা চলে। কিন্তু প্রেম—ছিঃ!

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য

কবে সে কবে—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেন

গানে গানে মোর এ ক্ষীন কণ্ঠ,
ধ্বনিত হবে,
কবে সে কবে ?
ঘুচিবে আলোয় তিমির বন্ধ,
সচকি উঠিবে জীবন ছন্দ,
ফুটিবে সে সুর
হাসি অশ্রুর
মহোৎসবে ;—
কবে সে কবে ?
বিশ্বের যত কল কল্লোল
বক্ষে আমার হবে উতরোল
নব নব গানে
সুমিলিত তানে
বিপুল রবে ;—
কবে সে কবে ?
হারাল যে সুর জীবনের তীরে
কণ্ঠে আমার গাঁথিব সেটিরে
ভরে' দেব তায়
মোর সাধনায়
বিপুল ভবে ;—
কবে সে কবে ?
এ দীন গীতির ধরি ক্ষীণ বীণ
পদতলে তাঁর দাঁড়াব সেদিন,
যদি হয় স্থান
মোর সেই গান
শোনাব তবে ;—
কবে সে কবে ?

মধুমাসে

শ্রীশান্তি পাল

ওরে ছাড়্ ছাড়্—
তোরা ছাড়্ ;—
ভ্রমর এসেছে আমার দুয়ারে
কি বারতা দিতে তার !
অশোক ফুটেছে, ফুটেছে শিমুল
মধু-মালঞ্চে ধরেছে বকুল
মাধবিকা তার দোলায় দুকূল
খুলেছে দখিন দ্বার।
তোরা ছাড়্ ছাড়্,—
তোরা ছাড়্।
কেশর পরাগ লাগে চোখে মুখে,
রাঙায়ে দিয়াছে অনুরাগ সুখে—
কেমনে পরিব শূন্য এ বুকে
মালতীর ফুলহার।
ওরে ছাড়্ ছাড়্,—
তোরা ছাড়্।
কোকিল কুশরে বনবীথি 'পরে
ফাগুন মুকুল মুঞ্জরি ঝরে,
কচি-কুবলয় শ্যাম সরোবরে
আরতির সম্ভার।
তোরা ছাড়্ ছাড়্,—
তোরা ছাড়্।
ব্যাকুল বাতাস হু হু বয়ে যায়,
মৌমাছি যত গুঞ্জরি' ধায়—
তমাল কুঞ্জে কে বাঁশী বাজায়,—
ঝঙ্কার চপলার ?
ওরে ছাড়্ ছাড়্—
তোরা ছাড়্।
গোপের গেহিনী শিঙার রচিতে
অর্থের পুলকে ছুটে চারিভিতে
আরতি বিথারে উঠে ইঙ্গিতে
গলিত কবরীভার।
তোরা ছাড়্ ছাড়্—
তোরা ছাড়্
চরণ ফেলিতে চিত চঞ্চল
পরাণ-সায়রে নামিয়াছে ঢল
ছলকে ছলকে কল-কল্লোল
উচ্ছল জলধার।
ওরে ছাড়্ ছাড়্,—
তোরা ছাড়্।
নয়ন-পহরী নিশি দিশি ঝরে
ঘোম্‌টা কাড়িতে রহিব না ঘরে
প্রণতি আমার নিবেদয়ি তোরে
সহেনা বিরহ আর।
ওরে ছাড়্ ছাড়্,—
তোরা ছাড়্।
ভ্রমর ছুটেছে কাননে কাননে
উন্মাদ অভিসার !

জাপানের শিল্প-পরিচয়

কাগজ ও তামাক

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর বি-এ

জাপান ক্ষুদ্র দেশ হইলেও সে দেশের অধিবাসীরা অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। জাপানী জিনিষে আজ কেবল বাঙলা দেশ নয়—বিশ্বের বাজার ভরিয়া গিয়াছে। আমেরিকা বা ইউরোপ নয়, চীন, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, আফ্রিকা, ইরাক প্রভৃতি দেশেও জাপান তাহার বাণিজ্যসম্ভার লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। ১৯৩৫ খৃঃ অব্দের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, জাপানের সমগ্র রপ্তানির ১৬% অংশই এশিয়ার পশ্চিমাংশের দেশসমূহে রপ্তানি হইয়াছে।

কাগজ

রুষ-জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানের কাগজ-শিল্প বিশেষ উন্নত হয় নাই এবং তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাইবার উপায় নাই। এই যুদ্ধের পর হইতে কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই জাপানী কাগজ-শিল্পের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময় যুদ্ধের জন্য ইউরোপে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ কমিয়া যায় ও রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই সুযোগে জাপান তাহার উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে। অনেক নূতন কল এই সময় স্থাপিত হয় এবং পুরাতন কলের কার্য্য বিশেষ ভাবে প্রসারিত হয়। তাহার ফলে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ যুদ্ধের আগের হিসাবে দেখা যায়, উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ ৩৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে এই পরিমাণ বাড়িয়া ২০৫ কোটী পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

ইহা ব্যতীত জাপানী ধরণের কাগজ আছে, তাহা কোজো, মিৎসুমাটা প্রভৃতি গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার বিস্তৃত হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। এই কাগজ কৃষকেরা অবসর সময়ে গৃহ-শিল্প হিসাবে প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৯২৬ খৃঃ অব্দের পর ইহার হিসাব আদৌ পাওয়া যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে, উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ প্রতি বৎসরই কমিতেছে। বর্ত্তমানে এই প্রকারের কাগজ বৎসরে ১½ কোটী হইতে ২ কোটী পাউণ্ড প্রস্তুত হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

জাপানে কাগজ প্রস্তুতকারীদের একটা সমিতি আছে—তাহার নাম Japan Paper Manufacturers' Association। এই সমিতির অধীনে ১১টী কল আছে। জাপানের সমগ্র উৎপন্ন কাগজের ৯৬% অংশ এই সব কলেই উৎপন্ন হয়। জাপানের সর্ব্ববৃহৎ কাগজের কল Oji Paper Manufacturing Company, এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে সমগ্র উৎপন্ন কাগজের ৮৩% অংশ এই কলেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমিতির হিসাব মত বর্ত্তমানে জাপানের মিল সমূহে ৭৬টী কল চলিতেছে এবং তাহাতে মাসিক প্রায় ৬½ কোটী পাউণ্ড কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া মাত্র উহার ৫৬% অংশ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। জাপানে বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইলেও, সংবাদপত্র ছাপাইবার ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাপিবার কাগজই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। জাপান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার বিস্তৃতিই ইহার কারণ। Kraft paper বা প্যাকিং কাগজ পূর্ব্বে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইত, বর্ত্তমানে উহা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে (১৯৩৫) সমগ্র উৎপন্ন কাগজের ১২·৪% অংশই এই কাগজ।

ভাল কাগজ প্রস্তুতের জন্য এখানকার কলে সাধারণতঃ

কাঠের মণ্ড (wood pulp—94·7%), বাজে কাগজ, বিচালী খড়, কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্প ব্যবহারের মাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৮১ টন পাল্প ব্যবহৃত হইয়াছে।

কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুতের জন্যও কাঠের মণ্ড প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। কাগজ ও সিল্কের জন্য পাল্প ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া উহার আমদানীও বাড়িয়া বর্ত্তমানে ২৬ লক্ষ ৯ হাজার ৯২৩ টনে দাঁড়াইয়াছে। এই আমদানী পাল্পের ৪০·৪% অংশ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ হইতে এবং বাকী অংশ সুইডেন, নরওয়ে, ক্যানাডা ও অন্যান্য দেশ হইতে আসিতেছে।

এখন জাপান নিজেও প্রচুর পরিমাণে পাল্প প্রস্তুত করিতেছে। নিজ জাপানের Hokkaido ও সাখালিয়ন দ্বীপেই উহা প্রস্তুত হয়। সাখালিয়নের বনে প্রচুর পাইন ও ফার জাতীয় গাছ আছে—তাহা হইতেই পাল্প প্রস্তুত হয়। মাঞ্চুকোর (Manchoukou) আরণ্য সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ এখনও লিখিত হয় নাই। তবে সেখানে পাল্প প্রস্তুতের উপযোগী গাছ থাকিলেও তাহা এত দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত যে, তাহা দ্বারা ব্যবসায়ের কোন সুবিধা হইবে না। তবে জাপানকে অদূর ভবিষ্যতে এইদিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে, কারণ সাখালিয়নের বনের পরিমাণ খুব বেশী নয় এবং সেখানকার উপাদানে জাপানের বেশীদিন চলিবে না।

বড় বড় মিলে একই সঙ্গে পাল্প ও কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহাতে কাজের যেমন সুবিধা হয়, তেমনি কম পড়তায় জিনিষ উৎপাদন করাও সম্ভব হয়। সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ এইজন্য প্রচুর পরিমাণে একই রকমের কম মূল্যের কাগজ আবশ্যক হয়। এই প্রকারের কলের মধ্যে Oji কাগজের কল বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই 'মিলটী' ১৮১৮ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হয় পরে Fuji Paper Mill ও Karafuto Kogys Co. নামে দুইটী বড় কাগজের কল ব্যতীত আরও প্রায় ৩০টীকে নিজের সহিত মিশাইয়া লইয়া ইহা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানে কাগজের কলে যে মূলধন খাটিতেছে, তাহার ৬৪·৮% অংশই এই 'মিলে' আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশের উৎপন্ন মালের ৮১·২% অংশ এই কলেই প্রস্তুত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পাল্প ও সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত এই কলেরই একচেটিয়া। কাগজ রপ্তানি ব্যাপারের সমস্ত কর্তৃত্বও এই 'মিল' করিয়া থাকে।

১৯২৯ খৃঃ অব্দের পর বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সময় জাপানী কাগজের চাহিদা ও মূল্য কমিয়া যাওয়ায়, যাহাতে কম খরচে কাগজ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হয়। তাহার ফলে ১৯৩২খৃঃ অব্দে দেখা যায় যে, কাগজের উৎপাদন খরচ প্রায় ২৯% কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানে মিনিট প্রতি ৪০০ ফিট ছাপিবার কাগজ ও ১০০০ হইতে ১২০০ ফিট সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সব সাধারণ বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ ব্যতীত অনেক প্রকারের উৎকৃষ্ট ও বিশেষ কাগজ জাপানে প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ইনসিউলেটেড পেপার, ওয়াল পেপার, সালফেট পেপার প্রভৃতি কয়েকটীর নাম করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে জাপানে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী কাগজ আমদানী হইত। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে আমদানী কাগজের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়, সে বৎসর ১৭ কোটী ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৬৭ পাউণ্ড কাগজ আমদানী হয়। তাহার পর কমিতে কমিতে ১৯২৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ৭½ কোটী পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে আমদানীর পরিমাণ উহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে এবং নরওয়ে, সুইডেন ও ক্যানাডা হইতে আবার ছাপিবার কাগজ আসিতেছে।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কাগজ রপ্তানি প্রায় বন্ধ হওয়ায়, জাপান নিজের কাগজ চারিদিকে চালান দিতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের পর আবার ইউরোপীয় মাল বাজারে বাহির হইলে জাপানী মালের কাটতি কমিয়া গেলেও ১৯২২ খৃঃ অব্দের পর হইতে ধীরে ধীরে জাপানী কাগজের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩০ খৃঃ অব্দে জাপান ২২ কোটী ৬৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১৭ পাউণ্ড কাগজ রপ্তানি করিয়াছে—যুদ্ধের আগের হিসাবের সহিত তুলনা করিলে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৮ গুণেরও বেশী হইবে। তবে জাপানের এই কাগজ ইউরোপ বা আমেরিকায় বেশী বিক্রয় হয় নাই; সমগ্র

রপ্তানির ৮৮·১% অংশ পূর্ব্ব-এশিয়া, বিশেষতঃ চীন ও মাঞ্চুকোয় বিক্রয় হইয়াছে।

উৎপন্নকারীরা সমবেতভাবে সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের উন্নতি ও স্বার্থ সংরক্ষনের চেষ্টা এখন সকল বিভাগে করিলেও কাগজ প্রস্তুতকারীরা ইহার পথ প্রদর্শক। এইজন্য ১৮৮০ খৃঃ অব্দে সেই সময়ের কলের কর্ত্তৃপক্ষরা Paper Mills Association নামে এক প্রতিষ্ঠান করেন। ইহাই পরে ১৯১৩ খৃঃ অব্দে Japan Paper Manufacturers' Association নাম গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সমিতির অধীনে ১১টী 'মিল' ও ৪৬টী কারখানা আছে। এই কারখানায় মধ্যে Oji কোম্পানীই ৩২টীর মালিক। জাপানের কাগজের কলসমূহে ১৯৩২ খৃঃ অব্দে ১৬৭৭৬ জন শ্রমজীবি কাজ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ১২৮৭৭ জন Oji কোম্পানীর কলে কাজ করিয়াছে। নিজেদের কলে পাল্প প্রস্তুত করে মাত্র Oji এবং Hokuetsn Paper Mills; অন্য সবাই উহা ক্রয় করে। Paper Association এর সভ্য নয় এমন কতকগুলি কল জাপানে আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাহারা অতি অল্প কাগজই উৎপন্ন করে। তাহাদের কার্য্যের বিবরণ পাইবার সম্ভাবনা নাই। Paper Associationই জাপানের কাগজের বাজারে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করে এবং এই সমিতির বর্ত্তমান কাজ উৎপন্ন কাগজের মূল্য নির্দ্ধারণ ও উৎপাদন সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া চাহিদা অনুযায়ী কাগজ উৎপন্ন করা।

তামাক

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি তামাক জাপানে প্রবেশ করে। পরে ১৬০৫ খৃঃ অব্দে পোর্ত্তুগীজরা সর্ব্বপ্রথম জাপানে তামাকের বীজ আনে। ইহার কিছুদিন পরে আবার স্পেন দেশীয় জাহাজে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে তামাকের বীজ জাপানে আনীত হয়। যাহা হউক, জাপানী সভ্যতার সহিত তামাকের চাহিদা বাড়িয়া চলে এবং শীঘ্রই ইহা বিলাসিতার জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হয়। তখন ইহা সরকারী শুল্ক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীন-জাপান যুদ্ধের পর সামরিক বিভাগের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে Tobacco Monopoly Law পাশ হয়। সেই সময় মাত্র পাতা তামাকের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইত। কিন্তু পরে তামাকজাত সমস্ত দ্রব্যের উপরেই শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। সম্প্রতি, ১৯৩১ খৃঃ অব্দে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত অধিকারই গবর্ণমেণ্টের হাতে গিয়াছে।

এই একচেটিয়া ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের আয় অনেক বাড়িয়াছে। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ৪ কোটী ৭০ লক্ষ ইয়েন (১ ইয়েন=২ শিলিং ½ পেন্স) মূল্যের তামাক Monopoly Bureau কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছিল। ১৯৩৫-৩৬ খৃঃ অব্দের বাজেটে উহা ৩০ কোটী ইয়েন ধরা হইয়াছে। ইহা তামাক বিক্রয়ের আনুমানিক পরিমাণ হইলেও, প্রতি বৎসরই নীট আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কর্পূর, লবন প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য একচেটিয়া জিনিষ হইতে তামাকের আয় অনেক বেশী।

জাপান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই তামাক চাষ সম্ভব নয় নিজ জাপানের প্রায় সর্ব্বত্র ও ফরমোজা দ্বীপ ব্যতীত অন্যত্র এই চাষ হয় না। দেশের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী তামাক উৎপন্ন হইতেছে না, তদুপরি, ১৯২৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে চাষের জমির পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও Monopoly Bureauর বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় চাষ ও শুকাইবার পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় উৎপন্ন তামাকের পরিমাণ এখন বাড়তির পথে। দেশের চাষীরা তামাক উৎপন্ন করিয়া তাহা শুকাইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে কিনিয়া লন। এই নির্দ্ধারিত মূল্যের কোন স্থিরতা নাই, বৎসর বৎসর তাহার পরিবর্ত্তন হয়।

জাপানে প্রচুর পরিমাণে তামাক বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ১৯১৩ খৃঃ অব্দের হিসাবে দেখা যায়, ঐ বৎসরের মোট আমদানী ৬০২৫ মেট্রিক টনের মধ্যে, ২৩৮৮ টন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে, ১০৩৮ টন ভারতবর্ষ হইতে, বাকী অংশ ম্যানিলা, চীন, তুরস্ক ও কোরিয়া হইতে আমদানী। আমেরিকা হইতে আমদানীর পরিমাণ পর পর কমিয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ, ম্যানিলা ও চীনের পরিমাণ বাড়িতেছে।

বৎসরে প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন তামাক জাপান হইতে রপ্তানি হয় এবং তাহার প্রধান অংশই চীন ও ইজিপ্টে যায়। জাপানী তামাকের দাম কম বলিয়াই এই সব দেশে ইহার চাহিদা বেশী।

১৯০৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের Monopoly Bureau যখন সিগারেট প্রভৃতি প্রস্তুত আরম্ভ করেন, তখন পাইপওয়ালা (mouth piece) সিগারেটই বেশী উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমানে দেশবাসীর রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, বিনা পাইপ সিগারেটই বেশী প্রস্তুত হইতেছে। সিগারের দাম বেশী বলিয়া উহা বেশী প্রসার লাভ করে নাই। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে পাতা তামাক ৪০৪৭১ মেট্রিক টন ব্যবহৃত হইয়াছিল। মাঝে (১৯৩১) বাড়িয়া উহার পরিমাণ ৯৬৬৭০ টনে দাঁড়ায়; বর্ত্তমানে (১৯৩৩) উহার পরিমাণ ৫৮০০০ টন। সিগারেট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ১৯২৩ খৃঃ অব্দে ১৬০০০ কল ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমানে উহা কমিয়া ১০৭০০ হইয়াছে। যন্ত্রপাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে মাত্র ২২০০০ শ্রমজীবি তামাকের কারখানায় কাজ করে। শ্রমজীবিদের মধ্যে স্ত্রী শ্রমজীবিদের সংখ্যাই বেশী কমিয়াছে। পূর্ব্বে শ্রমজীবিদের ৭৫% স্ত্রীলোক ছিল; উহা কমিয়া ৬৮তে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩ খৃঃ অব্দের পর হইতে তামাকের কারখানার কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে শ্রমজীবির সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তামাক বা তামাক হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানি Monopoly Bureauর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এই লেন দেনের পরিমাণও বেশী নয়। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ যে মাল রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ৬০ লক্ষ ইয়েনের কাছাকাছি এবং তাহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব এশিয়া—চীন, মাঞ্চুকো প্রভৃতি স্থানেই হইয়া থাকে। জাপানে তামাকের উপর আমদানী শুল্ক খুব বেশী, সেজন্য অল্প পরিমাণ তামাক জাপানে প্রবেশ করিতে পারে। তবুও ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে ৪০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের তামাক জাপানে আমদানী হইয়াছে।

চীন ও মাঞ্চুকো হইতে জাপানে তামাক আমদানী হয়, কিন্তু ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে প্রচুর পরিমাণে জার্ম্মাণ সিগারেট আমদানী হওয়ায়, তাহার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণী বাদে ইংলণ্ড, আমেরিকা বেলজিয়াম হইতেও সিগারেট আমদানী হয়। আমদানী সিগারের মধ্যে ম্যানিলা সিগারের সংখ্যাই খুব বেশী—তবে ফরমোসা ও হাভানা হইতেও কিছু চুরুট আসে। কাটা তামাক কেবল ইংলণ্ড হইতেই আমদানী হয়।

উপরের বিবরণ হইতে জাপানের কাগজ ও তামাক-শিল্পের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিবরণ পাওয়া যাইবে। তবে প্রবন্ধটীকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিবার জন্য আমদানী রপ্তানির বিস্তৃত হিসাব প্রভৃতি বাদ দেওয়া হইয়াছে। সে দেশের এই দুইটী শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিবার জন্য যেটুকু আবশ্যক তাহাই বলা হইয়াছে।

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর
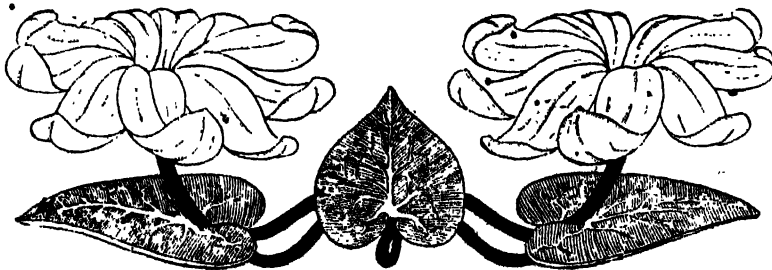
'রবিবাসরের' সর্ব্বাধ্যক্ষ

শ্রীজলধর সেনের ৭৮ বৎসরের জন্মদিনে

বয়োবৃদ্ধের অন্ত নাহিক ভবে,
'দাদা' তারা নয় সবে।
সরস প্রাণের সুমধুর রসায়নে
না জানি কি যাদু উপজয় দরশনে,
সেই গুণে তুমি সকলের বরণীয়,
অজাত-বৈরী সুহৃদোত্তম প্রিয়,
সবাকার সুরে প্রাণটি তোমার বাঁধা,
সার্ব্বজনীন দাদা।

সখের দলের সুশাসক অধিকারী,
বর্ম্মা সিগারধারী।
আইন কানুন তোমার মুখের বাণী,
বিধি নিষেধের আর কিছু নাহি জানি।
ইচ্ছা তোমার এষণা যে আমাদের,
সহজিয়া রীতি, নাই কোনো হেরফের।
পরাণ তোমার যেন দুধে ধোওয়া, সাদা,
তাই এজমালি দাদা।

আটাত্তরের চৌকাঠে আজি এলে,
ওই দুটি বাহু মেলে
ডাকিলে মোদেরে তোমার দেহলি পরে,
পঞ্চাশী দল ছুটে আসে তব ঘরে।
পয়লা চৈত্রে একি মৈত্রীর মেলা,
শ্রদ্ধা পরাগে অভিনব হোরি খেলা!
চরণে তোমার বাঙলার ধূলি কাদা,
শিরে তুলি দাও দাদা।

১লা ফাল্গুন ১৩৪৩
অষ্টসপ্ততিম জন্মদিনোৎসবে
পঠিত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জন্ম-অপরাধী

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম্‌-এ, বি-টি

মধ্যাহ্নকাল। স্কুলের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে দলে দলে বালকেরা বেরিয়ে আস্‌তে লাগল জলের স্রোতের মত—হুড়ো হুড়ি ক'রে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। সকলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে ব্যস্ত। অন্যদিন তারা স্কুল থেকে বেরিয়েই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে—যে যার বাড়ীতে টিফিন খেতে চ'লে যায়। কিন্তু আজ তারা কয়েক পা গিয়েই দাঁড়াল—সকলে মিলে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রতে লাগল। ব্যাপারটা হ'চ্ছে কি, সাইমন ব'লে একটি ছেলে সেদিনই প্রথম তাদের স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছে। ছেলেরা সকলেই বাড়ীতে তার মা'র কথা শুনেছিল। পাড়ার অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলেই এই মেয়েটিকে অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পার চক্ষে দেখত—যদিও প্রকাশ্যে কেউই তাকে সমাদর ক'রতে ত্রুটি ক'রত না। এই মনোভাবটি বোধ হয় মা'দের কাছ থেকে ছেলেদের মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়েছিল—নিজেদের অজ্ঞাতেই। সাইমনের সঙ্গে কারুরই পরিচয় ছিল না, কারণ সে কোনদিনই বড় একটা বাড়ীর বাইরে, গ্রামের রাস্তায় অথবা নদীর ধারে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে আসত না। কাজেই তার সঙ্গে ভাব ক'রবার কারুরই সুযোগ ঘটেনি। আজ ছেলেরা সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে বিস্ময়জড়িত আনন্দের সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে কেবলই বলাবলি ক'রতে লাগল—"সাইমনের কোনও বাবা নেই।" এদের মধ্যে চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি ছেলেই ব্যাপারটা সমস্ত ভালো ক'রে জানত। সেই পরম বিজ্ঞের মত মুখ চোখের অপরূপ ভঙ্গী ক'রে দলের মধ্যে কথাটা প্রথম প্রচার করে।

যথাক্রমে সাইমনও আজ বেরুবার জন্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বয়স তার সাত আট বছরের বেশী হবে না—বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডুর—বেশ ফিট ফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভাবটি যেন ভীত, সঙ্কুচিত। বালকের দল এতক্ষণ পরস্পর ফিস্ ফিস্ করছিল—একটা বিশ্রী রকমের তামাসা করবে ব'লে নিজেদের মধ্যে ফন্দি আঁটছিল। তারা তাই নিষ্ঠুর কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্তক্ষণ সাইমনকে লক্ষ্য করছিল। সাইমন যেই বাড়ী যাবে ব'লে পিছন ফিরেছে অমনি তারা চারিদিক্ থেকে তাকে ঘিরে ফেল্‌ল। বিস্মিত হতভম্ব হয়ে সাইমন তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতেই পারল না তাকে নিয়ে এরা কি করতে চায়। যে ছেলেটি খবরটা প্রথম সকলকে দিয়েছিল সে এখন বিজয়গর্ব্বে প্রশ্ন ক'রল "তোমার নাম কি?"

উত্তর হ'ল—"সাইমন।"

অমনি সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—"সাইমন কি?"

বালিকাটি থতমত খেয়ে আবার উত্তর দিল—"সাইমন।"

প্রশ্নকর্ত্তা চীৎকার করে উঠল—"সাইমনের পরে একটা কিছু ত' থাকবেই। ও আবার একটা নাম হ'ল নাকি?"

ছেলেটি তখন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে আবার বলল—"আমার নাম সাইমন।"

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। সেই ছেলেটি তখন বিজয়োল্লাসে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"তোমরা দেখলে ত' এখন, সত্যিই ওর কোনও বাবা নেই।" তারপর সকলেই নীরব—কারও মুখে কোনও কথা নেই। একজনের বাবা নেই—এই অদ্ভুত অভাবনীয় কথা শুনে সকলেই খুব অবাক্ হয়ে গিয়েছে। তাকে তাদের এক অতি বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক জীব ব'লে মনে হ'ল—তাদের অমনি মনে পড়ল সাইমনের মার প্রতি তাদের নিজেদের মাদের সেই রহস্য-জনক অনুকম্পার কথা। সাইমন একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যা'তে সে টাল সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে না যায়। সে সেখানে স্তব্ধ, নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে

রইল—যেন এক নিষ্করুণ দুর্দ্দৈবের নিদারুণ কশাঘাতে সারা অঙ্গ তার বিবশ, নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে—সে যেন চলচ্ছক্তি রহিত হ'য়ে পড়েছে। সে একবার ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে চাইল, কিন্তু মুখে তার কোনও কথা যোগাল না—তাদের কথার কোনও প্রতিবাদ সে করতে পারল না। সত্যিই ত তার কোনও বাবা নেই। শেষে কোন কিছু না ভেবেই সে চীৎকার করে ব'লে উঠল—"হ্যাঁ, আমার বাবা আছে বই কি।"

বালকটি প্রশ্ন ক'রল—"বল, কোথায় তোমার বাবা ?"

সাইমন অমনি নির্ব্বাক হ'য়ে গেল—কি যে ব'লবে ভেবে পেল না। গভীর উত্তেজনায় বালকেরা সকলে চীৎকার ক'রতে লাগল। এই ছেলেরা সব অশিক্ষিত শ্রমিকদের সন্তান—নিষ্ঠুরতায় এদের আর ইতর প্রাণীদের মধ্যে বড় বেশী তফাৎ নেই। যেমন কোন একটি পাখী আহত হলে দলের অন্য পাখীরা সকলে মিলে তার প্রাণ নিতে ব্যস্ত হয়, এই ছেলেদের মধ্যেও আজ তেমনি একটা আদিম হিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। সাইমনের হঠাৎ চোখ প'ড়ল একটি ছোট ছেলের উপরে। সে এক বিধবার ছেলে—তার মার সঙ্গে সর্ব্বদা সে একাই থাকে। সাইমন অমনি ব'লে উঠল—"বাঃ তোমারও ত' কোন বাবা নেই।"

ছেলেটি ব'লল—"নিশ্চয়ই আমার বাবা আছে।"

সাইমন জিজ্ঞেস করল—"কোথায় তোমার বাবা ?"

পরম গম্ভীর ভাবে বালক উত্তর দিল—"আমার বাবা গোরস্থানে আছেন।"

দলের অপরাপর দুর্ব্বিনীত বালকদের মধ্যে থেকে অমনি এক অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল—তারা সকলেই সমস্বরে তাকে সমর্থন করল যেন যার বাবা গোরস্থানে আছে তার কাছে যার কোন বাবাই নেই তাকে হার মানতেই হবে। অথচ এই দুষ্ট ছেলেদের বাবারা অনেকেই হয় ত' ক্রিয়'-সক্ত, চোর, মদ্যপ ও অত্যাচার পরায়ণ।...ছেলেরা পরস্পর ঠেলাঠেলি ক'রে সাইমনের যত কাছে পারল স'রে এল যেন এই বৈধ, আইনসম্মত সন্তানেরা তাদের চাপে একটা অবৈধ জারজ সন্তানকে পিষে মারতে চায়। সাইমনের পাশের ছেলেটি হঠাৎ সকৌতুকে চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা নেই, বাবা নেই"—ব'লে। সাইমন দুই হাতে তার চুলের মুঠি ধ'রে তার দু'পায়ে অনবরত লাথি মারতে লাগল—তারপর খুব জোরে তার গাল কামড়ে দিল। খানিকক্ষণ ধ'রে বালক দুটির মধ্যে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌ল। সাইমন শেষে হেরে গেল—তার কাপড় চোপড় সব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। সে সেই বিজয় গর্ব্বোৎফুল্ল, উল্লসিত ছেলেদের মাঝখানে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তার পরণের ছোট জামাটি ধূলোয় মলিন, ধূসর হ'য়ে গেল। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রচালিতের মত হাত দিয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে লাগল। একটি ছেলে অমনি চীৎকার করে ব'লে উঠল—"যাও, তোমার বাবাকে বলে দাওগে যাও।"

গভীর বিষাদে ও নৈরাশ্যে সাইমনের ছোট্ট বুকটি ভরে গেল। তার চেয়ে এদের সকলের গায়ের জোর বেশী—এরা সব তাকে হারিয়ে দিয়েছে। সে এদের কথার একটা জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারল না। কারণ সে জান্‌ত সত্যিই তার কোন বাবা নেই। কিন্তু তবুও সে অসীম গর্ব্বভরে উদ্গত অশ্রু সংবরণ ক'রতে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে লাগল। তারপর আর নিজকে সাম্‌লাতে পারল না—তার যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। তার আততায়ীদের মধ্যে তখন একটা নির্ম্মম নিষ্ঠুর আমোদের বাসনা জেগে উঠেছে। ভয়াবহ উৎসবমত্ত বর্ব্বর লোকদের মত তারা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে গোল হ'য়ে তাকে ঘিরে নাচ্‌তে লাগল আর গানের অন্তরার মত মাঝে মাঝে—"বাবা নেই, বাবা নেই"—ব'লে চীৎকার ক'রে উঠতে লাগল। হঠাৎ সাইমনের কান্না থেমে গেল—সে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠল। তার পায়ের কাছে কতগুলি পাথর ছিল। সে সেগুলো তুলে তুলে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল অত্যাচারীদের গায়ে। সেগুলো গায়ে পড়তেই দু' তিনজন ছেলে চীৎকার ক'রতে ক'রতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। অন্য ছেলেরাও খুব ভয় পেয়ে গেল। ক্রোধোন্মত্ত মানুষকে দেখে উপহাসনিরত জনতা যেমন ভয়ে পালিয়ে যায় তারাও তেমনি ভীরুর মত দল ভঙ্গ হ'য়ে একে একে পালিয়ে গেল। পিতৃহীন শিশু সাইমন যখন

দেখল সে সেখানে একা প'ড়ে র'য়েছে সেও তখন মাঠের দিকে দৌড়াতে লাগল। একটা কথা তার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—যা' স্মরণ ক'রে তার মনে আজ এক দৃঢ় সঙ্কল্প জেগে উঠল। সে স্থির ক'রল সে আজ জলে ডুবে ম'রবে। তার মনে পড়ল দিন আষ্টেক আগেকার কথা—কেমন ক'রে এক দুর্ভাগ্য কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক অভাবের তাড়না, অনশনের যাতনা সহ্য ক'রতে না পেরে জলে ডুবে ম'রেছিল। লোকেরা যখন তার মৃতদেহ জল থেকে টেনে বা'র ক'রল সাইমন তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই লোকটির চেহারা সেদিন তার চোখে যেমনি বীভৎস তেমনি মর্ম্মান্তিক ঠেকে-ছিল। দৃশ্যটি আজও যেন তার মনের মধ্যে আঁকা র'য়েছে। লোকটির বর্ণহীন পাণ্ডুর গণ্ডদ্বয়, তার দীর্ঘ জলসিক্ত শ্মশ্রু, শান্ত উন্মীলিত চক্ষু দুটি আজও যেন তার চোখের সামনে ভাসছে। দর্শকেরা সকলেই ব'লল—"লোকটা ম'রে গেছে।" অমনি তাদের মধ্যে থেকে একজন ব'লে উঠল—"আহা, বেচারা ম'রে বেঁচেছে—শান্তি পেয়েছে।" সেই লোকটি সেদিন যেমন অন্নাভাবে ডুবে মরেছিল সাইমনও আজ তেমনি পিতার অভাবে ডুবে ম'রবে ঠিক ক'রল। সে জলের কাছে এগিয়ে গেল—একদৃষ্টে চেয়ে রইল জলের স্রোতের দিকে। পরিষ্কার, স্বচ্ছ জলের মধ্যে কতগুলি মাছ ছুটোছুটি ক'রছে—তারা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে জলের উপরকার মক্ষিকাদি ধ'রতে যাচ্ছে। সাইমন মাছ দেখতে দেখতে কান্না ভুলে গেল—মাছের এই খাওয়া দেখতে তার ভারী মজা লাগছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের পরে প্রবল বায়ুর বেগ যেমন গাছপালা সব উপড়িয়ে ফেলে শেষে ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে যায় তেমনি সাইমনের বেদনাবিক্ষুব্ধ অধীর অন্তরও যখন—ঝটিকান্তে স্তব্ধ শান্ত প্রকৃতির মত—একটু সুস্থির হ'ল তখন গভীর বেদনানুভূতির সঙ্গে এই চিন্তাই বার বার তার মনে আসছিল—"আমার বাবা নেই ব'লেই আজ আমায় জলে ডুবে ম'রতে হ'চ্ছে।"

প্রসন্ন সুন্দর দিনটি—খুব শীতও নয়, খুব গরমও নয়। স্নিগ্ধোজ্জ্বল রবিকরে মাঠের ঘাসগুলি অনতিতপ্ত হ'য়ে উঠেছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ, নির্ম্মল জল দর্পণের মতই ঝক্ ঝক্ ক'রছে। ক্রন্দনাবেগের পরে যে সুগভীর শান্তিময় অবসাদ আমাদের দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সাইমন কয়েক মুহূর্ত্ত ধরে তাই উপভোগ ক'রতে লাগল। তার ইচ্ছা হ'ল সে সেই আতপ্ত মধ্যাহ্নে সেখানে সেই ঘাসের উপরেই ঘুমিয়ে প'ড়ে। তার পায়ের তলা থেকে ছোট্ট একটা সবুজ রঙের ব্যাঙ হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। সে অমনি সেটা ধ'রতে গেল, কিন্তু পারল না। সে তখন ছুটল তার পিছন পিছন তাকে ধরতে। তিনবার সেটা পালিয়ে গেল। অবশেষে সাইমন তার পিছনের একটা ঠ্যাং ধরে ফেললে। পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যাঙটার আপ্রাণ প্রয়াস দেখে তার ভারী হাসি পেল। বড় দু'টো ঠ্যাংএর উপর সে তার সমস্ত জোর দিতে চাইল—তারপর মস্তো বড় একটা লাফ দিয়ে হঠাৎ পা দু'টো ছড়িয়ে লৌহ শলার মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে পড়ে রইল। দুটি গোলাকার সোনালিরঙের বৃত্তের মধ্যে তার গোলা চোখ দুটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—সামনের পা দু'টো দিয়ে সে শূন্যে আঘাত ক'রতে লাগল। সাইমনের মনে প'ড়ে গেল একটা খেলনার কথা—তা'তে কতগুলি সোজা কাঠের টুকুরোকে আঁকা-বাঁকা ভাবে একটার উপরে আর একটাকে কাঁটা দিয়ে মেরে এমনি উপায়ে কতগুলি সৈনিকের অঙ্গচালনা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল।......তারপর তার বাড়ীর কথা মনে প'ড়ল—তার মা'র বিপন্ন করুণ মুখচ্ছবিও অমনি তার মনের কোণে ভেসে উঠল। গভীর দুঃখে সে আবার কাঁদতে লাগল। আবেগে তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। প্রতি-দিন ঘুমোতে যাবার আগে সে যেমন ক'রে নতজানু হ'য়ে ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানায় এখনও তেমনি ক'রে সে প্রার্থনা ক'রতে লাগল। অধীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ল যে তার প্রার্থনা আর শেষই হ'ল না। তার মন থেকে অন্য সব চিন্তাই যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল—আশপাশের কোন কিছুতেই তার আর খেয়াল রইল না। সে কেবলি কাঁদতে লাগল—তার দুই চোখ ছাপিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝ'রতে লাগল।

হঠাৎ কে যেন একটা ভারী হাত তার কাঁধের উপর রাখল—রুক্ষ, কর্কশ স্বরে কে যেন তাকে প্রশ্ন ক'রল—"বা'ছা, তুমি এত কাঁদছ কেন? তোমার কি হ'য়েছে? আমায় বলবে না?"

সাইমন ফিরে তাকাল—দেখল একজন দীর্ঘকায় পুরুষ তার দিকে স্নেহার্দ্রনয়নে চেয়ে আছে। লোকটিকে দেখে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ব'লেই মনে হ'ল। তার কালো চুল ও দাড়িগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া। সজল নয়নে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সাইমন উত্তর দিল—"আমার বাবা নেই ব'লে সকলে আমায় মেরেছে।"

স্মিতহাস্যে লোকটি বলল—"সে কি? বাবা ত' সকলেরই আছে।"

বেদনাবিধুরচিত্তে অতি করুণভাবে বালক উত্তর দিল—"কিন্তু আমার—আমার—কোনও বাবা নেই।"

শুনে লোকটি গম্ভীর হ'য়ে গেল—বুঝতে পারল ছেলেটি কে। যদিও এ পাড়ায় সে বেশী দিন আসে নি তবুও এর মধ্যেই সে এর মা'র ইতিহাস ভাসাভাসা কিছু কিছু শুনেছিল। তারপর সে ব'লল—"তা' হোক গে'। তুমি সেজন্যে দুঃখ ক'রো না। আমার সঙ্গে তোমার মা'র কাছে চল। তোমার মা তোমায় একজন বাবা দেবেন।" তারা দু'জনে চ'লল রাস্তা দিয়ে—বয়স্ক লোকটি ছেলেটার একটা হাত ধ'রে চ'লতে লাগল। লোকটার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। এই ছেলেটার মা'র সঙ্গে দেখা করতে যা'বার সুযোগ পেয়ে মনে মনে সে আজ বেশ খুসীই হ'ল। কারণ সে আগেই লোকমুখে তার রূপের খ্যাতি শুনেছিল। সে শুনেছিল ওরকম সুন্দরী নাকি এদিকে খুব কমই আছে। হয়ত' বা তার গোপন অন্তরে এই আশাই উঁকি মারছিল—একবার যার পদস্খলন হয়েছে, একবার যে একটা ভুল করেছে তার আর একটা ভুল ক'রতে কতক্ষণ। তারা একটী ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীর সামনে এসে দাড়াল। ছেলেটি অমনি বলে উঠল—"এটাই আমাদের বাড়ী।" তারপর সে 'মা' 'মা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলে। একটি দীর্ঘকায়া রমণী ম্লান, বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই লোকটির হাসি মিলিয়ে গেল। সে বুঝল এই নারীর কাছে কোন প্রগল্‌ভতা বা অশিষ্টাচার খাটবে না। মেয়েটি গম্ভীরভাবে তার বাড়ীর দরজা আগলিয়ে দাঁড়াল; একজন পুরুষ একদিন তাকে প্রতারণা ক'রেছে—তার নারীত্বের অবমাননা ক'রেছে। কিন্তু তাই ব'লে সে আর কোনমতই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার গৃহের পবিত্রতা কলুষিত করতে দেবে না। এমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক তার মুখের ভাব। লোকটি টুপীটি খুলে হাতে নিয়ে ভয়েথতমত খেয়ে ব'ললে—"দেখুন আপনার ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে নদীর ধারে দেখতে পেয়ে আপনার কাছে ফিরিয়ে এনে দিলাম।" সাইমন অমনি দুই বাহু দ্বারা জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করে কাঁদতে কাঁদতে ব'লল—"না, মা, আমি জলে ডুবে ম'রতে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা নেই ব'লে স্কুলের ছেলেরা সব আমায় মেরেছিল।"

মেয়েটির গণ্ডদ্বয় এক জ্বালাময়ী রক্তিম আভা ধারণ করল। বেদনাবিদ্ধ অন্তরে আবেগভরে সে তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরল—দু'চোখ থেকে তার দু'গণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝ'রতে লাগল। লোকটিও এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত, মর্ম্মাহত হ'ল—কেমন ক'রে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে ভেবে না পেয়ে সে সেখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সাইমন হঠাৎ দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বল্‌ল "তুমি আমার বাবা হবে?"

তারপর এল এক গভীর মৌনতার পালা। সাইমনের মা ক্ষোভে, লজ্জায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—হাত দু'খানি বুকের উপর রেখে। বালক কোনও উত্তর না পেয়ে আবার ব'লল—"তুমি যদি আমার বাবা হতে না চাও ত' আমি এখনি জলে ডুবে মরতে চল্‌লাম।"

লোকটি সমস্ত ব্যাপারটা পরিহাসচ্ছলে নিয়ে হাসতে হাসতে ব'ল্‌ল—"নিশ্চয়ই চাই।"

সাইমন ব'ল্‌ল—"তোমার নামটা কি তা'হ'লে? ওরা সব তোমার নাম জিজ্ঞেস্ ক'রলে আমি কি ব'লব?"

লোকটি উত্তর দিল—"ফিলিপ।"

সাইমন মুহূর্ত্তের জন্য চুপ ক'রে রইল—নামটা মনে মনে বেশ ভালো ক'রে আয়ত্ত করে নিল। তারপর আশ্বস্ত হ'য়ে নিজের হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌ল—"আচ্ছা, ফিলিপ, তুমিই তা'হ'লে আমার বাবা।"

ফিলিপ তাকে কোলে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার দুই গণ্ডে দু'টি চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে স্থান থেকে প্রস্থান করল।

তারপরের দিন সাইমন স্কুলে গেলেই সকলে তাকে দেখে একটু অসূয়াসূচক হাসি হাসল। ছুটীর পরে ছেলেরা যখন তাকে আবার ক্ষ্যাপাতে শুরু করবার উপক্রম করল, সাইমন তখন যেন দেওয়ালের সঙ্গেই কথা বলছে এমনি করে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ল—"আমার বাবার নাম ফিলিপ।"

চারিদিক থেকে সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল।

"ফিলিপ কে? ফিলিপ কি? সে কি কাজ করে? তাকে আবার তুমি কোত্থেকে পেলে?"

সাইমন কোন কথার উত্তর দিল না। নিজ বিশ্বাসে সে অচল অটল। দুই চোখ দিয়ে তার সে যেন সকলকে সগর্ব্ব উপেক্ষা জানাতে চায়। সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তবু সে ভীরুর মত রণে ভঙ্গ দেবে না। এই সময় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এসে পড়াতে সে রক্ষা পেল—সে বাড়ীতে মা'র কাছে ফিরে গেল।

তারপর মাস তিনেক কেটে গেল। ফিলিপকে প্রায়ই সাইমনদের বাড়ীর কাছে ঘুরতে দেখা যেত। সাইমনের মা জানালার কাছে বসে সেলাই ক'রছে দেখতে পেলে কখনও কখনও সে সাহসে ভর ক'রে তার সঙ্গে কথাও বলত। মেয়েটি ভদ্রভাবে শুধু তার কথার উত্তর দিয়ে যেত—সর্ব্বদাই নিজের গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রে চলত, তার সঙ্গে কখনও কোন হাস্যালাপও ক'রত না কিংবা তাকে বাড়ীতেও ঢুকতে দিত না। তা সত্ত্বেও, মানুষের মনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃই বোধ হয় তার মনে হ'ত যে মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে।

খ্যাতি জিনিষটা এমনি ক্ষণভঙ্গুর যে কারও নাম একবার খারাপ হ'লে তার পক্ষে সুনাম রক্ষা ক'রে চলা বড়ই কঠিন হ'য়ে পড়ে। সাইমনের মা নিজেই লজ্জায় বড় একটা কারও সঙ্গে মিশত না। কিন্তু তবুও পাড়ার লোকেরা তাকে নিয়ে কাণা-ঘুষা করতে ছাড়ত না।

এদিকে সাইমন তার নতুন বাবাকে খুবই ভালোবেসে ফেলল। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলায় কাজ কর্ম্ম সারা হ'য়ে গেলে সে তার সঙ্গে বেড়াতে বেরুত। সে রোজ নিয়মিত স্কুলে যেত—সেখানে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খুব গম্ভীর ভারিক্কী চালে মিশত। কেউ কোন কথা বললেও সে তার জবাব দিত না।

যে ছেলেটি তাকে প্রথম আক্রমণ করেছিল সে একদিন তাকে ব'লল—"তুমি মিথ্যে কথা ব'লছ কেন? ফিলিপ ত' তোমার বাবা নয়।"

সাইমন অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে প্রশ্ন ক'রল—"কেন?"

ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে ছেলেটি উত্তর দিল—"কারণ—তোমার বাবা থাকলে সে তোমার মা'র স্বামী হ'ত।"

সাইমন এই যুক্তির সত্যতা খণ্ডাতে না পেরে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তবুও সে জোর ক'রে ব'লল—"ফিলিপই আমার বাবা।"

ঘৃণাভরে বালকটি ব'লে উঠল—"তা হতে পারে। কিন্তু ওকে বাবা হওয়া বলে না।"

সাইমন মাথা হেঁট ক'রে ভাবতে ভাবতে চ'লল ফিলিপের কামারখানার দিকে।

চারিদিকে গাছ পালায় ঘেরা এই কামার খানাটিতে আলো প্রায় ঢোকে না বললেই হয়। এখানে একটি মাত্র প্রকাণ্ড হাপর। তারই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার লাল আলোতে পাঁচজন কর্ম্মকার একসঙ্গে ব'সে কাজ করছে—তারা ভীষণ খটাখট শব্দ ক'রে হাতুড়ী পিটছে। সেই প্রদীপ্ত আলোকের লোহিতাভা তাদের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়াতে তারা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে জ্বলন্ত লৌহ চূর্ণ করছিল তখন তাদের দানবের মতই অদ্ভুত রহস্যময় ব'লে মনে হ'চ্ছিল। হাতুড়ীর সেই ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো কত চিন্তাই যে তাদের মনের মধ্যে আসছিল কে জানে!

সাইমন যখন সেখানে এসে ঢুকল তখন কেউই তাকে দেখতে পায়নি। সে আস্তে আস্তে এসে তার বন্ধুর জামার আস্তিনটা ধ'রে টান্‌ল। ফিলিপ ফিরে তাকাল। অম্‌নি সমস্ত কাজ হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। সকলের দৃষ্টি তার উপরে পড়ল। তারপর সেই অস্বাভাবিক নীরবতার মাঝখানে শোনা গেল সাইমনের বালকণ্ঠের বাঁশীর মত আওয়াজ—

"ফিলিপ, তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও—একটি ছেলে

এক্ষুণি আমায় যা' ব'ল্‌ল—তুমি নাকি আমার সত্যিকারের বাবা নও।"

"কেন ?"

বালকটি অতি সরল ভাবে উত্তর দিল—"কারণ তুমি আমার মা'র স্বামী নও।"

একথা শুনে কেউই হাসল না। ফিলিপ দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই মস্তো বড় হাত—যা' দিয়ে সে হাতুড়ীর বাঁটটা নেহাই-এর উপর সোজা ক'রে ধরে রেখেছিল—তারই উপর আস্তে আস্তে নিজের কপালটা রাখল। সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেল। তার অপর চার জন সঙ্গী কাজ ভুলে তাকেই দেখতে লাগল। এই দৈত্যাকার মানুষগুলির মাঝখানে ছোট্ট সাইমন অধীর আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগল! হঠাৎ একজন কর্ম্মকার সকলের হ'য়ে ফিলিপকে ব'লল—"ফিলিপ, তুমি জান না, সাইমনের মা খুব ভালো মেয়ে। যদিও ভাগ্য বিড়ম্বনায় তার এই দশা হয়েছে, তবুও সে ভেঙ্গে পড়ে নি। তারপর থেকে সে নিজেকে ঠিক রাখতে—সৎপথে চ'লতে—প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। তোমার মত সচ্চরিত্র লোকের উপযুক্ত স্ত্রীই হতে পারবে সে।"

আর সকলে অম্‌নি ব'লে উঠল—"ঠিক, ঠিক।"

কর্ম্মকারটি ব'লে যেতে লাগল—"যদি একবার কোন সময় তার পদস্খলন হয়েই থাকে, তাহ'লে সেটা কি শুধু তারই দোষ? তাকে একজন কাপুরুষ বিয়ে করবে ব'লে আশ্বাস দিয়েছিল ব'লেই ত'—। আমি এমন অনেকের কথা জানি যারা আজও সমাজে পাঁচজনের কাছ থেকে মান সম্মান পাচ্ছে অথচ তাদের অপরাধ এর চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।" অপর তিনজনও অম্‌নি সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—"ঠিক।" সে আবার বলতে লাগল "বেচারী ছেলেটাকে মানুষ ক'রবার জন্যে, তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কত কষ্টই না করেছে! কত চোখের জলই যে তার পড়েছে তা শুধু বোধহয় একমাত্র ভগবানই জানেন। সে ত' এক গির্জ্জে ছাড়া আর কোথাও বড় একটা যায় না।"

আর সকলে প্রতিধ্বনির মত ব'লে উঠল—"সত্যি।"

তারপর আর কিছুই শোনা গেল না—কেবল হাপরে বাতাস দেবার অবিরাম গর্জ্জনধ্বনি। খানিক পরে ফিলিপ মাথা নীচু ক'রে আস্তে আস্তে সাইমনকে বলল—"তোমার মা'কে গিয়ে বল আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।" তারপর সস্নেহে ছেলেটির কাঁধ ধরে তাকে ঘর থেকে বা'র করে দিয়ে সে নিজের কাজে ফিরে এল।

আবার এক সঙ্গে পাঁচটা হাতুড়ী নেহাই-এর উপর প'ড়তে লাগল—খটাখট্। এই রকম ক'রে এই বলিষ্ঠ দৃঢ়কায়, প্রসন্নচিত্ত মানুষগুলি সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত পরম পরিতোষের সঙ্গে কাজ করল। যেমন কোনও মহোৎসবের দিনে কেথিড্রালের ঘণ্টাধ্বনি অন্য ঘণ্টা-নিনাদকে ছাপিয়ে ওঠে, তেমনি ক'রে আজ ফিলিপের হাতুড়ীর আওয়াজ অপর সকলের হাতুড়ীর শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। নেহাই-এর উপর হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল—একটার পর একটা। সেই শব্দে যেন কানে তালা ধরে যায়। আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিলিপ আজ দৃঢ়পণে তার নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল—কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে।

সে যখন গিয়ে সাইমনদের বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল তখন নৈশ আকাশের গায়ে অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করছে। সে এর মধ্যে পোষাকটাও বদলিয়ে নিয়েছে, দাড়িটাও একটু পরিষ্কার ক'রে আঁচড়িয়ে নিয়েছে। সেই যুবতী রমণীটি ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ব্যথিত কুণ্ঠাজড়িত স্বরে তাকে ব'লল—"দেখুন এখন বেশ রাত হয়েছে। আপনার এ সময় আমার বাড়ীতে আসাটা কি ঠিক হয়েছে?"

ফিলিপ উত্তর দিতে চাইল। কিন্তু তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে শুধু চুপ ক'রে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

স্ত্রীলোকটি আবার বলতে লাগল—"আপনি খুব ভালো ক'রেই জানেন, আমি মোটেই চাই না যে লোকে আমার সম্বন্ধে আবার পাঁচ কথা বলে—আমায় আবার বদনাম কুড়াতে হয়।"

ফিলিপ তখন ব'লে উঠল—"তুমি যদি সত্যিই আমার

বিবাহিত স্ত্রী হও, তাহ'লে ত' আর লোকে কোনও কথা বলতে পারবে না।"

সে একথার কোনও জবাব পেল না। শুধু তার মনে হ'ল সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ কি যেন একটা জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। সে অমনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল। সাইমন তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই সে টের পেল তার মা তাকে চুম্বন ক'রে আস্তে আস্তে কি যেন ব'লল। তারপর চোখ খুলেই সে দেখল যে তার বন্ধু ফিলিপ তাকে তার প্রকাণ্ড প্রসারিত দুই বাহু দিয়ে তুলে ধরেছে। সে শুনল ফিলিপ তাকে চীৎকার ক'রে বলছে—"শুনছ, স্কুলে গিয়ে তোমার সঙ্গীদের বলো যে কামার ফিলিপ রেমীই তোমার বাবা। সে তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। কেউ তোমার কোনও অনিষ্ট করলে সে তার কাণ ম'লে দেবে।"

তার পরের দিন যখন স্কুলের ছেলেরা সব এসে গিয়েছে এবং ক্লাসে পাঠ আরম্ভ হ'বার সময় হয়েছে, ছোট্ট সাইমন পাংশু বিবর্ণ মুখে উঠে দাঁড়াল—কম্পিত অধরে, স্পষ্ট স্বরে বলল—কামার ফিলিপ রেমীই আমার বাবা। সে ব'লেছে কেউ আমার কোন অনিষ্ট করলে সে তার কাণ ম'লে দেবে।"

এইবার আর কেউ হাসল না, কারণ সকলেই ফিলিপ কর্ম্মকারকে জানত ও শ্রদ্ধা করত। তার মত এমন একজন বাবা পেলে সেখানে যে-কেউ বোধ হয় নিজেকে ধন্য মনে করতে পারত। *

উষা বিশ্বাস

* মোপাসাঁর "Simon's Papa" শীর্ষক গল্প হইতে অনূদিত।

গেঁয়ো নদী

কে, এম, শমশের আলী

অনাদি কালের প্রাচীন তাপস হিমালয় শির হ'তে
কোন অমরার পীযূষ বহিয়া পূত জাহ্নবী-স্রোতে
চলিয়াছে বেয়ে চির আনমনা স্বচ্ছ তটিনি অয়ি!
পতিত-পাবনি! শান্তি-দায়িনি! চির কল্যাণময়ী!
সৃষ্টি-প্রভাতে জন্ম হয়ত, সেই আদি যুগ হ'তে
আপনা ভুলিয়া সঁপিলে জীবন শুধু পরহিত-ব্রতে।
কুল্ কুল্ কুল চলিয়'ছ গেয়ে কত গ্রাম, পথ ছাড়ি'
কত যে নগর কত বন-ভূমি প্রান্তর দিয়া পাড়ি।
বিটপী গুল্ম ব্রততীতে ঘেরা তোমার উভয় তীর'
প্রণাম জানায় অশ্বত্থ বট বিনয়ে নোয়া'য়ে শির।

কোথাও দু'পাশে কুঞ্জ কানন, শ্যামল বেতস-বনে
শ্যামা তরুণীর আঁচড়ানো চুল দুলে মৃদু সমীরণে;
বন-মালতীর শুভ্র নহর দুলাইয়া কম' গলে
আল্‌তা-রাঙানো যুগল চরণ রেখেছে কমল-দলে।
শ্যামল আঁচল তট হ'তে তার বুঝিবা তোমার জলে
দুষ্টু সমীর ছড়াইয়া দিছে পুলক-কৌতুহলে।
কেশের সুরভি পাগল করেছে ভাহুক বুঝিবা তাই
সারা দিনমান কি যেন কি খোঁজে কী যেন তাহার নাই

শাল্মলী-সাথে রয়েছে বসিয়া মাছরাঙা একমনে,
ব্যগ্র চাহনী চৌ-দিকে হানে অপলক দু'নয়নে।
পানিকৌরী সে কখনো ডুবিছে উঠিছে কভু বা ভেসে,
ডুব দিয়া পুনঃ চলে যায় কোন্ গহীন অতল দেশে।
কনক বরণ কোন্ মেয়ে সে যে পলাশের মাঝে ধীরে
মুখ বাড়াইয়া ছবি দেখে তার স্বচ্ছ তোমারি নীরে।
তট-ভূমে কোথা শত দ্রোনফুল ধবল মুক্তারাশি,
বুঝিবা তোমারি জোয়ারের সনে আসিয়াছে তারা ভাসি'।

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গাঙচিল কত সারা দিনমান ধরি',
বটগাছ-শিরে কত শত পাখী রহিয়াছে বাসা করি'।
অনেক দিনের বালুচরভরা কাশের বনের মাঝে
খরগোস আর খেঁকশিয়ালীরা ছুটে ফিরে প্রান্তে-সাঁঝে
তারি পাশ দিয়া মাঠে যাইবার সরু পথখানি ধ'রে
রাখালছেলেরা গরু নিয়া যায় হরষে নিতুই ভোরে।
মিঠেল সুরেতে বাঁশের বাঁশীটি বাজায় সে নানা মতে
তারি মিঠে সুর যেন ভেসে চলে তোমার-ই সোঁতে সোঁতে।

গাঁয়ের মেয়েরা জল নিতে যায় শূন্য কলসী কাঁখে,
হয়ত কাহারো উদাস বাঁশরী হয়ত কারেও ডাকে।
শূন্য গাগরী ভরাইতে গিয়া দেরী হয় শুধু তার,
সঙ্গী মেয়েরা বলে—'ছি ছি ওলো, একি তোর ব্যবহার ?
সন্ধ্যা নেমেছে আঁকা বাঁকা পথে যাইতে হইবে দূরে,
আনমনা ওলো, মন ছুটে তোর কোন্ সে মায়ার পুরে ?'
পিছে পিছে ধীরে চলে সে তরুণী অদূরে পথের বাঁকে
কে যেন তাহারে হাতছানি দিয়া বারে বারে শুধু ডাকে।
শিথিল চরণ অবশ তাহার কোন মতে যায় বাড়ী,
ভাবে বুঝি তার হৃদয়ের ধন পথ-বাঁকে এল ছাড়ি'।

ম্লান সায়াহ্নে মেঘের খাঁড়ায় প্রতিচীর বেদী-মূলে
দিবসের শির নভঃ-অঙ্গনে লুটায়ে পড়িল ধূলে।
নৃমুণ্ড-মালিনী তারকার হারে ভূষিতা রুদ্রা শ্যামা
বিকট হর্ষে রক্ত-লোলুপা নাচিছে ভয়াল বামা।
তরাসে তাহার প্রাণীকুল সবে ধাইছে গৃহের পানে—
ভূচর খেচর যত জীব আদি শঙ্কা-ব্যাকুল প্রাণে।
আর্ত্ত তনয়ে ধীরে নিশীথিনী বক্ষে লইলা টানি',
সোহাগ-পরশে ঘুমাইল সবে শুনিয়া অভয় বাণী।

জটাধারী যোগী বসিয়া থাকিত তব 'জোড় গাছ'-তলে,
সে-ই বসাইল 'যোগীর হাট' যে শুনা যায় তপ-বলে।
আজো শুনা যায় ঘোর অমা রাতে নীরব নিশীথে কেহ
হাটের প্রান্তে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছে বিশাল দেহ।
দু' নয়ন তার আগুনের মত ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে যেন,
দৃষ্টি-প্রভাবে ভস্ম হইবে বুঝিবা সকলি হেন।
শনি মঙ্গল কিবা অমা-সাঁঝে তাই 'জোড় গাছ'-তলে
'ভোগ' দিয়া কেহ 'ফাড়া' কেটে যায় দুধ কলা পাকাফলে।

লক্ লক্ লক্ চিতার আগুন জ্বলিছে কোথাও ধূ ধূ,
কত হৃদয়ের বুক-ফাটা শ্বাস শ্বসিছে পবনে হু হু;
বাঁধহারা বারি দু' নয়ন হ'তে ঝরিছে অনর্গল
তিতিয়া বক্ষ, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া শ্মশান-স্থল।
স্মৃতি মন্দির গড়িল কেহবা, কেহবা দাহন শেষে
ফিরে গেল শেষ স্মৃতি নিয়া শুধু অশ্রু-সলিলে ভেসে
অবগাহি তব পূত ও জলে।—দেখি' সব নিরবধি
চলিয়াছ বেয়ে চির আনমনা, একমনে অয়ি নদি!

বর্ষা-বসন্ত ভেদ নাই তব চলেছ সদাই বেয়ে,
সেই অবিরাম কুল্ কুল্ কুল্ কুল্ কুল্ কুল্ গেয়ে।
ভরা যৌবনে জোয়ার আসিয়া ফিরে যায় পুনরায়,
প্রেমিকে তোমার তবু নাহি পাও বিরহীনি চির হায়!
শাশ্বত প্রেমে জীবন সঁপিয়া তাই কি পরের হিতে
যা' কিছু সকলি বিলায়িয়া দিচ পরম হৃষ্ট চিতে ?
পার্থিব কিছু নহে কো কাম্য তাই লো আপন হারা,
যুগ যুগ ধরি' বিলাইছ শুধু বুঝিবা পীযূষ ধারা।

কে, এম, শমশের আলী

পথের পাঁচালীর দেশে

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

কল্‌কাতা থেকে নিশ্চিন্দিপুর অনেকখানি দূর পথ, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই জায়গাটা দেখে আসা যায়। রূপকথার মধ্যে যদিও তার স্থান তবু সেটা নিতান্ত রূপকথার দেশ নয়, সে দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের বন-বাদাড় ঘেরা সেই অপরূপ পল্লীভূমি ইচ্ছামতীর তীরে এখনো তেমনি রূপেই দেখা যেতে পারে যেমন বইয়ে পড়া যায়। সেখানে সত্য সত্যই সেই রহস্যময় কুঠীর মাঠ আছে, সেই সোঁদালির গন্ধ আছে, সেই হরেক রকমের বনফুলও ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে আছে। "পথের পাঁচালী"তে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের পরিচয় আছে, সেগুলো নিতান্ত কাল্পনিক নয়। অনেকদিন থেকে এই কথা শুনে শুনে জায়গাটা দেখবার অত্যন্ত লোভ জন্মেছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে মোটর যোগে সেই নিশ্চিন্দিপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

বাংলাদেশের পল্লী আমরা অনেক দেখেছি, বাঙালীর কাছে এটা কিছু নতুন জিনিষ নয়। সকল পল্লীগ্রামেরই প্রায় এক রকম মূর্ত্তি,—সেই নদীর ধার, কাশের বন, বাঁশের ঝাড়, ম্যালেরিয়ার মশা, ভাঙা বাড়ী, কুঁড়ে ঘর, ধানের ক্ষেত, আর মানুষের মুখে রোগ দারিদ্র্যের চিহ্ন,—পশ্চিম বাংলার প্রায় সব গ্রামেই এ জিনিষগুলো আছে। সুতরাং যে কোনো একটা গ্রামকেই নিশ্চিন্দিপুর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই ছিল আমাদের ধারণা। বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক,—শ্যামবর্ণা, প্রগল্‌ভা, যত তুচ্ছ সম্পদ জড়ো করে নিয়ে তার লীলা, অকেজো [illegible]ল আর অজানা ফুল নিয়েই তার খেলাঘর পাতা, আর পাখ্‌পাখালির কিচির মিচির দিয়ে তার অনাবশ্যক অবিরাম কলোচ্ছ্বাস। পাড়াগাঁয়ের স্বরূপ পাড়াগাঁয় বাঙালী মেয়ের মত, তার গতিও হয় না, উন্নতিও হয় না,—এর মধ্যে আবার বৈচিত্র্য কি থাকতে পারে? কিন্তু তবু পথের পাঁচালীর লেখক নিশ্চিন্দিপুর সম্বন্ধে এমন এক মোহ জাগিয়ে তুলেছিলেন যে সুযোগ যখন উপস্থিত হোলো তখন সেখানে না গিয়ে থাকতে পারলাম না।

আমরা সদলবলে যাত্রা করলাম। দুইজন মহিলা, নীরদ বাবু, দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, একটি পাকা সাহিত্যিক বিভূতি বাবু, একটি কাঁচা সাহিত্যিক বিনায়ক বাবু এবং আমি,—মোটের উপর আমরা এই কয়জন যাত্রী। সময়,—মধ্যাহ্ন। কাল,—শীতের প্রারম্ভ।

যশোর রোড বড় সুন্দর রাস্তা। পথে বেশী লোকজন চলে না, গাড়ী ঘোড়ার ভিড় নেই। রাস্তাটি বরাবর পীচ্‌ দেওয়া, গাড়ী যাবার কোনো কষ্ট নেই। দুধারে ঘন গাছের সারি এই বীথিপথটিকে মনোরম করে তুলেছে, গাছের
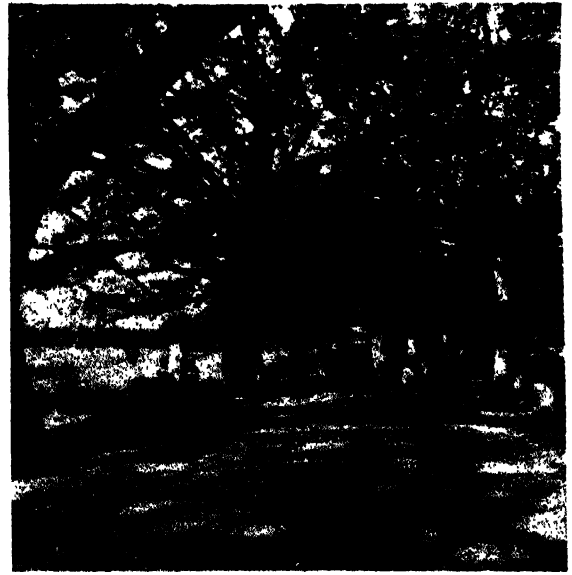
যশোর রোড

ডালপালাগুলো দুধার থেকে ঝুঁয়ে পড়ে পথিককে রৌদ্রতাপ হতে রক্ষা করছে। রৌদ্রের [illegible] এই মসৃণ পথের ওপর

আলোছায়ার জাল বুনে যায়, বহুদূর বিস্তৃত এই জালবোনা দেখতে দেখতে পথিক পরমানন্দে পথ চলে। পথের ওপর স্থানে স্থানে কোথাও বা বাব্‌লা ফুল বিছিয়ে থাকে, কোথাও বা লাল রংএর পাকা বটফল ছড়িয়ে থাকে। দুদিকের মাঠে মাঠে কোথাও বা সর্ষেফুলের ক্ষেতগুলো বর্ণে আর গন্ধে দিক আমোদ ক'রে রেখেচে, কোথাও বা আখের ক্ষেতে লম্বা লম্বা পাতা দুলচে, কোথাও বা সর-গাছের ঝোপের মাথায় মাথায় অসংখ্য সরপুচ্ছ চামরের মত উঁচু হয়ে উঠেচে। এমন পথে গাড়ী চালিয়ে যেতে আরাম আছে। যাত্রার মধ্যে কোনো বাধা নেই, বৈচিত্র্য নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় দুএকটা গরুর গাড়ী, বাঁশ বোঝাই গাড়ী, মাল বোঝাই লরি, কখনো বা একপাল গরু ছাগল। গাড়ী দেখে তারা আপনারাই একপাশে সরে দাঁড়ায়।

প্রচুর ধূলো উড়িয়ে এবং ফূর্তি উড়িয়ে আমরা এই পথ বেয়ে চল্‌লাম। অনেক গ্রাম পার হ'য়ে যাচ্ছি একটা বিশেষ রকমের গ্রাম দেখতে। মাকোব গ্রাম, বারাশত,

ইছামতীর ওপারে বনগাঁয়ের হাট

দোগেছে, দত্তপুকুর, হাব্‌ড়া.—বহু গ্রাম অতিক্রম করে যখন বনগাঁয়ে পৌঁছলাম তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বনগাঁয়ের বাজারের মধ্যে গাড়ী থামলো। সেখানে অনেক লোক, অনেক কলরব। দুপাশে সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান। সেদিন হাটের দিন, হাট বসেছে ইচ্ছামতীর এপারে ওপারে। খেয়া নৌকায় হাটের জিনিষপত্র পার করা হচ্ছে, অনেক লোক সাঁকো পার হয়ে যাতায়াত করচে। এই বুঝি সেই নবাবগঞ্জের বাজার? শুনলাম নিশ্চিন্দিপুর এখান থেকে ১৷০ ক্রোশ পথ। আমরা বাজার থেকে আমাদের রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে আবার অগ্রসর হলাম।

কিছুদূর গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বেঁকে একটা নাতিপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তায় নামলাম। এই রাস্তার মোড়ের মাথায় একটা ঝুরি নামানো প্রকাণ্ড বটগাছ। দেখলেই বোঝা যায় গাছটা প্রাচীন। এই কি সেই বারু রায়ের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ যেখানে পূর্ব্বকালে কত নরহত্যা হ'য়ে গেছে? ঐ যে ঝোপঝাপ ঘেরা দিগন্তপ্রসারী মাঠ দেখা যায়, ঐ কি সেই সোনাডাঙার মাঠ? আর ঐ যে দূরে একটি ছোট গ্রাম উঁকি মারছে, ঐ বুঝি সেই ধঞ্চে-পলাশগাছি? কাউকে এসব কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করা যায় না, মনে মনেই একটা আন্দাজ করে নিলাম।

ধূলোর ভরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে গাড়ী অগ্রসর হয়ে চল্‌ল বাঁশবনের কঞ্চির ডালগুলো দুপাশে ঠেলে দিয়ে, পথকে পড়া পথিকের কৌতূহলী দৃষ্টিকে তৃপ্ত হবার অবসর না দিয়ে। মন আমাদের নতুন অনুভূতির প্রতীক্ষায় উগ্র হ'য়ে উঠলো। মনে করলাম এইবার গ্রাম আরম্ভ হবে, প্রথমেই দেখা যাবে আতুরী বুড়ীর চালা, তার পর দেখা যাবে পথের দুধারে সারি সারি কত লোকের বাড়ী। কিন্তু যতই অগ্রসর হই, কেবলই বাঁশবন আর খেজুরবন, কেবলই ছায়ানিবিড় ঝোপ ঝাড়,—তেমন লোকই বা কৈ, তেমন ঘরচালাই বা কৈ। ক্বচিৎ দু একটা মেটে ঘর দেখা যায়, ক্বচিৎ দু একটি মানুষ মোটরের শব্দ শুনে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে গাড়ী থেমে গেল। শুনলাম গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছেছি, এবার নামতে হবে।

একেবারে এই জঙ্গলের মধ্যেই? সভয়ে গাড়ী থেকে নেমে দেখি নিতান্তই জঙ্গল নয়, দু'চারটে ঘর বাড়ী দেখা

যাচ্ছে। ভরসা পেয়ে জঙ্গল ভেঙে সেদিকে অগ্রসর হলাম। ডাইনে একটা বাঁশবন, বাঁয়ে একটা জামগাছের তলায় ছোট্টো একটা মজা ডোবা, তার পরে একটা সুনিবিড় বকুলগাছ,—তার পরে উঁচু দাওয়া দেওয়া একখানি চালাঘর। একটি বিধবা মেয়ে ঐ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, বিভূতি বাবুকে দেখেই আনন্দে তার মুখখানা একেবারে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে দুখানা মাদুর বের করে আনলে। আমি ভাবতে লাগলাম মেয়েটি কে? এই বুঝি সেই রাণুদি! ঐ হচ্ছে যেন রাণুদিদের জামগাছতলা, আর ঐ হচ্ছে সেই প্রসিদ্ধ বকুলতলা যেখানে অপুরা সারাদিন ধরে বসে বসে মালা গাঁথতো। মনের মধ্যে যে বই পড়ার অস্পষ্ট ছবি ছিল তার সঙ্গে যেন একটু একটু মিল আছে বলে বোধ হতে লাগলো।

ইঁট বের করা ভাঙা রকটার ওপর আমরা উঠে বসলাম এবং তৎক্ষণাৎ চা প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে
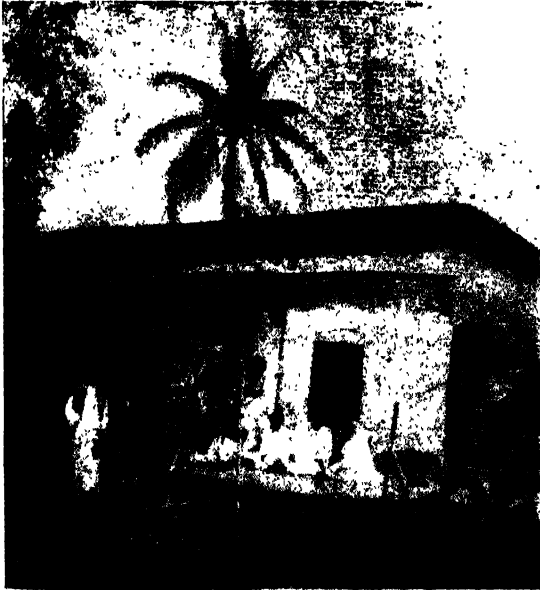
রাণুদিদের রকের ওপর চায়ের ব্যবস্থা

উঠলাম। এতটা দূর পথ আসা গেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণার অপরাধ নেই। অবিলম্বে মুড়ি সহযোগে চা পান করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। কিন্তু তারপর কি করা যায় ভাবচি এমন সময় বাড়ীর পেছন দিক থেকে হঠাৎ এক যুবক হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে এসে হাজির। আমাদের দলের অন্যান্য সকলে কথায় বার্ত্তায় ব্যস্ত হ'য়েছিলেন, আমিই তাকে প্রথমে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি অপু? আমরা তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি। তা দেখবার তো কিছুই নেই বাপু, কেবলই জঙ্গল। কি আর এখানে দেখবো?

—অনেক জিনিষ দেখবার আছে। আসুন আমার সঙ্গে।

এই ব'লে অপু আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল্লো। বাঁশগাছের ঘন বনের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা সুঁড়িপথ। খানিকটা দূর গিয়ে এমন এক জায়গায় পড়লাম যেখানে আর পথ নেই, উঁচু নীচু মাটির ঢিবি, সাবধানে পা ফেলতে হয়, বন বাদাড়ের মধ্যে কোথায় পা দিচ্ছি তার ঠিকানা পাওয়া যায় না, গাছের ডাল আর বাঁশের কঞ্চি মুখের সামনে অবরোধের সৃষ্টি করে, দু'হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ জঙ্গলে ভরা একটা উঁচু ঢিবির ওপর উঠে গিয়ে অপু বললে,—"এই দেখুন আমাদের আগেকার বাড়ীর ভিটে।"

আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে অপু আবার বললে—"বুঝতে পারচেন না? এইখানেই আমাদের বাড়ী ছিল, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এইখানেই আমার মা সর্ব্বজয়া আমাকে মানুষ করে তুলেছিলেন। ঐ দেখুন আমাদের রান্নাঘরের ভিটে, ঐ দেখুন সেই রান্নার কড়াখানা, গাঁ ছেড়ে যাবার সময় ঐ কড়াখানা মা ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল। বাড়ীঘর কবে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু ঐ কড়াখানা এখনো তেমনি মাটির মধ্যে বসানো রয়েচে।"

সত্যিই তাই। একটা ভাঙা কড়া মাটির মধ্যে বসানো রয়েছে, তার মধ্যে বৃষ্টির জল আর পাতা পচা জমে আছে। এদিকে ওদিকে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়িকুড়ি। একপাশে গরুর জাব খাবার একটা ভাঙা মাটির নাদা, পাতা ও মাটিতে বোঝাই। টুকরো টুকরো ইঁট ইতস্ততঃ ছড়ানো। চারিদিকের জঙ্গলের নীচে নীচে এই দিনের বেলাতেও অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। অপুর মায়ের ঘরকন্নার

স্মৃতি, তার বাল্যকালের জীবন, তার দিদির আদরের ডাক, তার কত কি বিচিত্র কাহিনী ঐ পোড়ো ভিটের জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লতা পাতার মৃদু গন্ধ এসে নাকে লাগলো, গাটা শীত শীত করতে লাগলো।

অপু কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ালো না, আমাকে ভাবার অবসর না দিয়েই বল্‌লে—"চলুন আপনাকে কুঠীর মাঠ দেখিয়ে আনি।"

চল্‌লাম তার পিছু পিছু। দ্রুতবেগে সে পথ চলে, আমি পেছিয়ে পড়ি, তখন আবার সে একটু পিছু ফিরে দাঁড়ায়। অনেক দূর গিয়ে আমরা একটা জনবিরল মাঠের মধ্যে এলাম। লোকে যাকে মাঠ বলে, অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রান্তর, এ ঠিক সে রকম খোলা মাঠ নয়। বড় বড় ঝোপ জঙ্গলে ভরা একটা বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা আছে বটে, কিন্তু তাতে একটা ফুটবল গ্রাউণ্ড হ'তে পারে কি না সন্দেহ। গাছ গাছড়াই অনেক। এখানে অনায়াসে লুকোচুরী খেলা যেতে পারে, একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেই আর দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই। অপু বল্‌লে—এই সোনাডাঙার মাঠ কিংবা কুঠীর মাঠ।

তখন বেলা প্রায় পড়ো পড়ো, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মধুর অপরাহ্ন। রোদ আর তেমন নেই, চারিদিকে ছায়া পড়ে আসচে শীতের প্রথম আমেজ মধ্যে মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। নিস্তব্ধ প্রান্তর, মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই, একটা মৌন মায়া যেন আকাশে বাতাসে স্নেহের হাসির মত মাখানো।

অপু কিন্তু একটুও চুপ করে থাকে না, অনবরত বক্ বক্ করচে। কেবলই আমাকে নানারকমের গাছ চেনাচ্ছে, ফুল চেনাচ্ছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কোনো জিনিষটা আমার নজর এড়িয়ে না যায় সেজন্যে যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। ঐ দেখুন সোঁদালি, ঐ ঘেঁটুর বন, ঐ ছাতিম্ গাছ, ঐ কেলেকোঁড়ের গন্ধ, এই দেখুন চষা মাটির কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। তার এই প্রকৃতি-পরিচয় শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল। শুনতে শুনতে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌছলাম যেখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে অনেকটা পর্য্যন্ত ভূমি তার বিচিত্র বনশোভায় যেন ছবির মত দেখতে পাওয়া যায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপু বল্‌লে—"এমন একটা প্রাকৃতিক রচনা, যেখানে মানুষের হাত একদম পড়েনি, এ-রকম আর কোথাও দেখতে পান কি?"

আমি বল্‌লাম—"তা সত্যি। প্রকৃতির এ-রকম স্বচ্ছন্দ মুক্তির রূপ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। এই একই জিনিষ তুমি বরাবর দেখে আসচো, তোমার কাছে কি এগুলো পুরোনো হ'য়ে যায় নি? এখনো কি তুমি এর মধ্যে নতুনত্বের আস্বাদ পাও? না এ কেবল আমাকে দেখাবার জন্যেই বলছো?"

অপু বল্‌লে—"না না, তা মনে করবেন না। দিনের পর দিন এর মধ্যে নতুনত্বের জন্ম হতে থাকে; চেয়ে দেখুন না, এও একটা স্বতন্ত্র রকমের সংসার। দিনের পর দিন এখানে ফুল থেকে ফল হয়, ডাল থেকে পাতা জন্মায়। ঋতুতে ঋতুতে এর রূপ বদ্‌লায়, রং বদ্‌লায়, পোষাক বদ্‌লায়। হঠাৎ দেখলে কিছু বোঝা যায় না বটে, তার কারণ এর রহস্য কিছু গভীর, সন্তর্পণে ঢুকতে হয়। নির্জ্জনে বসে কিছুক্ষণ এর দিকে চেয়ে থাকলে ক্রমশঃ বুঝতে পারা যায় এর মধ্যে কত বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত, কত রস আছে।"

আমি বল্‌লাম—"প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন দেখতেই বুঝি তোমার খুব ভালো লাগে?"

অপু বল্‌লে—"কেবল ভালো লাগে নয়, আমি বিস্মিত হ'য়ে যাই, মুগ্ধ হ'য়ে যাই। দেখুন এর মধ্যে অনেক কথা আছে। সব কথা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। গাছ-পালার জগতের সব আলাদা ব্যাপার। ওদের একটা স্বতন্ত্র রকমের নিজস্ব ভাষা আছে। ওরা কোনো কথা কয় না, কিন্তু ছবি দেখিয়ে মনোভাব ব্যক্ত করে। আমরা সে কথা বুঝতে পারি না, কিন্তু কিছু কিছু হয়তো টের পাই, তাই এই সব বনজঙ্গলের দিকে চাইলেই মনটা কেমন একরকম হয়ে যায়, চৈতন্যের একটা নতুন দিকের দরজা যেন খুলে যায়। তখন মনটা খুব উঁচুতে ওঠে, খানিকটা বুঝতে পারা যায় যে আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো ক-

তুচ্ছ আর এই বিশ্বপ্রকৃতি কত বড় বিশাল। সেই জন্যেই আমি এ সব এত ভালবাসি। সব সময় যে ভালো লাগে তা নয়, মাঝে মাঝে আমি কল্‌কাতায় যাই, ভাগ্যের সঙ্গে খানিকটা লড়াই করি, আবার হাঁপিয়ে উঠ্‌লেই এখানে পালিয়ে আসি। এসেই দেখি আমার অনুপস্থিতির মধ্যে প্রকৃতির অনেক নতুন খবর জমে উঠেছে। এমনি করেই আমার দিন কাটে, আমার আনন্দ কখনো ফুরোয় না।"

আমি বল্‌লাম—"তা হ'লে তো দেখ্‌চি তোমার মানুষের সঙ্গ পাবার কোনোই দরকার নেই, বন জঙ্গল নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারো!"

অপু হেসে বল্‌লে—"মানুষ চাই বৈ কি, নইলে তো আমি নাগপুরের বনে অমরকণ্টকেই পড়ে থাকতাম, দেশে কি আর ফিরতাম? চলুন আমার সঙ্গে, সবই ক্রমশঃ দেখতে পাবেন।"

তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম নদীর দিকে। অনেক দূরে একখানা নৌকা দেখা গেল। অপু হাঁক দিয়ে ডাকলে—"কার নৌকো হে?" জবাব এলো—"আমি উপিন।" অপু আবার ডাক দিলে—"নৌকোটা এখানে ভিড়িয়ে আনো।"

কিছুক্ষণ পরেই নৌকা এসে তীরে লাগলো। একখানা জেলেডিঙ্গি, মাছ ধরবার জন্যে বেরিয়েছে। অপু বল্‌লে, 'আমাদের রায়পাড়ার ঘাটে পৌছে দাও।'

নৌকায় চড়ে আমরা অদূরবর্ত্তী ঘাটের দিকে রওনা হলাম। খরস্রোতা নাতিপ্রশস্ত ইচ্ছামতী। দুএকখানা মাল বোঝাই নৌকো বিপরীত দিকে বেয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ধারে সারি সারি বিচিত্র ঝোপ ঝাপ জলের উপর নুয়ে পড়েচে। অপু চিনিয়ে দিলে,—"ঐ দেখুন সাঁইবাব্‌লার গাছ। ঐ দেখুন বন্যেবুড়োর গাছ। বন্যার সময় এগুলো একেবারে জলে ডুবে যায়, আবার জল সরে গেলে জেগে ওঠে, তাই ওর নাম হয়েছে বন্যেবুড়ো।"

রায়পাড়ার ঘাটে গিয়ে আমরা উঠলাম। ঘাট নয়, সেটা নিতান্তই আঘাটা। অতি সাবধানে পাড়ের ওপর উঠলাম, কিন্তু অপু অবলীলাক্রমে তিন লাফে উঠে এলো। হাসতে হাসতে বল্‌লে—"আপনাদের এসব অভ্যেস নেই কি না!"

আবার বন জঙ্গল ভেদ করে সুঁড়িপথ দিয়ে আমরা এঁকে বেঁকে চল্‌লাম। বেলা প্রায় ডুবে গেছে, চারিদিক ম্লান হয়ে এসেছে, নীড়ে ফেরা পাখীদের দল গাছের মাথায় মাথায় জড়ো হয়ে তুমুল কলরব করচে। আবার আমরা অপুদের পোড়ো ভিটে পার হয়ে রাণুদিদের বাড়ীর দিকে ফিরে চল্‌লাম।

সুমুখে একখানা ছোটো কুঁড়ে ঘর। ঘরখানা খড় দিয়ে ছাওয়া, কাঁচা মাটি আর দর্মা দিয়ে তার দেয়াল তৈরী। একখানি মাত্র ঘর তাও অসম্পূর্ণ। একটি দরজা আছে কিন্তু জানালা নেই, দুদিকের দেয়ালে খানিকটা করে ফাঁক, সেখান

এই দেখুন আমার "শ্যামলী"

দিয়ে অনায়াসে ভেতরে ঢোকা যায়। চারিদিকে বন, দু'একটা গরু বাছুর নিশ্চিন্ত মনে সেখানে চরছে। অপু সেই ঘরখানার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হাসতে হাসতে বল্‌লে—"এই দেখুন আমার শ্যামলী। নিজের থাকবার জন্যে এই ঘরখানি নতুন করেছি। পুরোনো ভিটেটায় হাত দিতে ইচ্ছা করে না, পাছে ওর স্মৃতিচিহ্নগুলো লোপ পেয়ে যায়। অনেক পুরোনো ইতিহাস ওখানে জমা করা আছে,—সেই বেলগাছটা, দিদির সেই খেজুর গাছ, সেই বাঁশবন,

সেই আমতলা,—ওই সব গাছের একটাও আমি কাউকে কাটতে দিইনা। তাই নিজের জন্যে এই আলাদা ঘরখানা করেছি।"

কৌতূহলী হ'য়ে আমি দেয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। ঘরের মধ্যে কোনই আসবাব পত্র নেই, আছে মাত্র একখানা ভাঙা তক্তপোষ। এ ঘরে যে কোনো লোক বাস করে তা দেখে বিশ্বাস করা যায় না। অপুর বাস করার ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। ও-কি ঘর পেতে বসবাস করবার মত মানুষ? কোনো রকমে এইখানে রাত্রিবাসটা করে এই পর্য্যন্ত; খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি হয় রাণুদির আশ্রয়ে, আর দিন কাটে প্রকৃতির মুক্ত আঙিনায়।

এই ঘরের অনতিদূরেই সেই পূর্ব্ববর্ণিত বকুলগাছ। সেই দিকে যেতে যেতে দেখি একটি অনূঢ়া তন্বী কিশোরী

কুমু বকুলতলা থেকে বেরিয়ে আসচে

তার উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বকুলতলা থেকে বেরিয়ে নাপিতদের বেড়ার গা ঘেঁসে দ্বিধার সঙ্গে আমাদের দিকে আসচে। তাকে দেখেই অপু বল্লে—"ঐ দেখুন কুমু আপনাদের দেখতে আসচে।"

কুমুদিনীকে আগে কখনো দেখিনি বটে; কিন্তু আগের থেকেই তাকে চিনি। (আপনারাও তাকে চেনেন। পথের পাঁচালীর সময় সে জন্মায়নি, কিন্তু সম্প্রতি "অরন্ধনের নিমন্ত্রণ"-এর মধ্যে এই কিশোরীর যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছেন।) এই সেই কুমুদিনী? পরণে একখানি নীলাম্বরী, হাতে দুগাছি কাঁচের চুড়ী, কপালে একটি কাচপোকার টিপ্। তার গা ধোওয়া হয়ে গেছে, চুল বাঁধা হয়ে গেছে, ঘষা মাজা মুখখানি যেন কালো দীঘিতে কুমুদফুলটির মত ফুটে উঠেচে, চোখের দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ যে দেখলেই কেমন মায়া হয়। পল্লীপ্রকৃতির সমস্ত ছবিটা যেন ঘণীভূত হয়ে এই একটি মাত্র বালিকার মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করতে এলো, এতক্ষণে যেন আমাদের কাছে এসে ধরা দিলে। এই যেন নিশ্চিন্দিপুরের প্রতীক, ওর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে আর বাকি রইলো না নিশ্চিন্দিপুরের বিশেষত্বটা কি প্রকারের। মানুষ দেখলেই যে তার দেশকে চিনতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কোনোই ভুল নেই। মাটির রস দিয়ে কেবল গাছপালারই গড়ন হয় না, মানুষেরও গড়ন হয়। এখানকার মাটিও যত নরম, মানুষও তত নরম। এখানকার গাছ পাতার রংও শ্যামল, মানুষের রংও শ্যামল।

আমি একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে আছি, কিন্তু অপুও একেবারে নির্ব্বাক। এতক্ষণ সে অনবরত বক্ বক্ করছিল, এখন তার কি হোলো? তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হঠাৎ যেন সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বল্লে—"আপনি ওর সঙ্গে কথা টথা ক'ন, আমি ততক্ষণ আপনাদের খাবার দাবার যোগাড় করি।" এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি রাণুদির বাড়ীর দিকে চলে গেল।

কুমু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিন্তু দেখলাম বেশ সপ্রতিভ। যে কথাই জিজ্ঞাসা করি সেই কথারই চমৎকার উত্তর দেয়। বুদ্ধিও বেশ। আমাকেই উল্‌টে প্রশ্ন করতে লাগলো। "আমাদের দেশে এলেন তো কুঠীর মাঠ দেখলেন না? ইছামতী দেখেচেন? এত অল্প সময়ের মধ্যে কি আর দেখলেন, এখন তো সন্ধ্যে হয়ে এলো। দু একদিন যদি থাকেন তা হলে অনেক জিনিষ দেখতে পারেন। এখানে অনেক চমৎকার দেখবার জিনিষ আছে, অপুদা সে সব কথা আপনাকে বলেনি? চড়ক তলার

কথা বলেছে? নাল্‌তাকুঁড়ির জোল, খল্‌সেমারীর বিল, এই সব জায়গার কথা বলেছে? অপুদার বড় ভোলা মন, সব কথা বলতে ভুলে যায়।”

কথা কইতে কইতে আমরা রাণুদিদের দালানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। সেই বিধবা মেয়েটি, যাকে আমরা রাণুদি বলছি, তিনি রন্ধনের কাজে লেগে গেছেন, অপু হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে আলো জ্বালার জন্যে বিপুল উৎসাহ দেখাচ্ছে, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ বা গল্প করচে, কেউ বা পাড়া বেড়াচ্ছে, কেউ বা গান ধরেছে, আর বকের নীচে পাড়ার কয়েকজন উৎসুক নরনারী নবাগত আগন্তুকদের দেখবার জন্য এসে জড়ো হয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা জামগাছতলায় ডালপাতা নিয়ে খেলাঘর পেতে খেলা সুরু করে দিয়েছে। দেখেই মনে হোলো অপুরাও ছেলেবেলায় এই গাছতলাতে এমনি খেলা করতো।

কুমুদিনী দালানে উঠেই হৈ হৈ-এর দলের মধ্যে বেমালুম মিশে গেল এবং মেয়েদের সঙ্গে হাসিতে গল্পে মুখর হয়ে উঠলো, এত কথাও সে বকতে পারে! আর অপুর দিকে চেয়ে দেখি এই জিনিসটা সে দস্তুরমতো উপভোগ করচে। লণ্ঠন জ্বালবার অপটু ব্যস্ততা তার ছলনা মাত্র, ক্ষণে ক্ষণে সে কুমুদিনীর কার্য্যকলাপই কেবল লক্ষ্য করচে এবং হাসিটাকে গাম্ভীর্য দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করচে।

রাত্রি হোলো। জ্যোৎস্না উঠলো। সুবিমল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। এখানকার জ্যোৎস্না যেন সর্ব্বভেদী, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন তাতে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, নারকেল পাতার কাঁপনের ভেতর দিয়ে, বাঁশবনের পত্রজটিলতার ভেতর দিয়ে সে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ে, পাতাগুলো চিক চিক করে ওঠে। সে জ্যোৎস্না এতই পর্যাপ্ত যে বাইরের আগন্তুক তাই দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, লোকজনের মধ্যে বসেও সে অন্যমনস্ক হয়ে এলোমেলো ভাবতে সুরু করে।

খানিকটা সময় আমার এমনি অন্যমনস্কে কেটে গেল। কার সঙ্গে কার আলাপ হোলো, কি কথাবার্ত্তা হোলো কি গান বাজনা হোলো কিছুই মনে নেই। কতটা সময় কাটলো তাও জানি না। যখন শুনলাম খাবার প্রস্তুত তখন চৈতন্য হলো।

রাণুদির হাতের অন্নব্যঞ্জন কলাপাতায় করে খাওয়া। ব্যঞ্জন মাত্র একটি, তরকারী দিয়ে চিংড়ির ঝোল, কিন্তু তারই কি আস্বাদ! হাতেরই গুণ না তরকারীগুলোই মিষ্টি, না জলেরই গুণ, কে জানে! সেই ভাত তরকারী আর কৎবেলের চাটনি সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে। রাণুদি করছিলেন পরিবেশন আর কুমুদিনী করছিলো তদারক। আমি কিন্তু অন্যরকম কথা ভাবছিলাম। ওদের দুজনের মধ্যে একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া। একজনের জীবনের ভবিষ্যৎ একেবারে ফুরিয়ে গেছে, আর একজনের ভবিষ্যৎ এখনো অনাগত। কিন্তু দুজনের মধ্যে তেমনি বিশেষ তফাৎ কোথায়? বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের মেয়েদের এই একই রকম ইতিহাস, প্রথম বয়সে ওরা কুমুদিনী থাকে, শেষ বয়সে হয় রাণুদি। এ-দেশেতে বিধবার সংখ্যাই বেশী। আর যদিও বা শেষ বয়স পর্য্যন্ত সধবা থাকবার সৌভাগ্য হয়, তাদেরই বা কেমন সুখ কি? ঐ তো, একজন সধবা মেয়ে এসেছিল, সঙ্গে তিন চারিটি ছেলেমেয়ে, তাদের পেট-জোড়া পীলে, একটি তো জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে মায়ের সঙ্গে এলো। নিত্য রোগের সেবা আর রান্নাঘরের হাঁড়ি নিয়েই ওদের দিন কাটে। গতানুগতিক জীবন, কোনো আশা নেই, কোনো আমোদ নেই, কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নেই। জীবনকে ওরা উপভোগ করে না অতিক্রম করে? এই সব জীবনের পরিণতি কোথায়? যুগ যুগ ধরে এদেশে সেই একই রকমের কুমুদিনী জন্মায়, একই রকমের রাণুদি দেখতে পাওয়া যায়, এবং তাদের ব্যর্থ জীবনগুলো একই রকম ভাবে শেষ হয়। নতুনত্ব কিছুই নেই। তবু এরা বেশ নিশ্চিন্তই আছে। দেশটাও যেমন বনে জঙ্গলে ভরা, মানুষের মনগুলোও তেমনি বনে জঙ্গলে ভরা, কর্ষণ করার উপায় নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমিও একটু পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি ঘরের ভেতর থেকে যেন সুর করে কবিতা আবৃত্তির

মত একটা আওয়াজ আসছে। সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। চেয়ে দেখি অপু একটা তক্তপোষের ওপর বসে খুব মশ্‌গুল হয়ে দুলে দুলে কি একটা কবিতা আবৃত্তি করচে, রাণুদি নিবিষ্টমনে বসে বসে তাই শুনছে, আর কুমুদিনী একটু তফাতে একটা দরজার আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম এ কোন অজানা কবির কবিতা, সূর্য্যমুখী ফুলের সঙ্গে তিনি নারীহৃদয়ের তুলনা করেছেন, সূর্য্যের মুখ চেয়েই সে ফুল কেমন করে ফোটে তাই বর্ণনা করেছেন। সেখানে অপর কেউ শ্রোতা নেই, প্রত্যক্ষ শ্রোতা কেবল রাণুদি আর পরোক্ষ শ্রোতা কুমুদিনী। ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় কবিতাটা ওরা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে।

আমি ওদের অগোচরেই থাকলাম। আবৃত্তি শেষ হোলো। তারপর সুরু হোলো রীতিমত কাব্যচর্চ্চা। সব কথা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম কাব্য ও কবি সম্বন্ধে বেশ বড় বড় কথাই হচ্ছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম চণ্ডীদাসের নাম, রজকিনী রামীর নাম, জয়দেবের নাম, রবীন্দ্রনাথের নাম, মাঝে মাঝে দু'চার লাইন কোটেশন। বক্তা কেবল অপুই একা নয়, রাণুদিও দু'এক লাইন বলছে, কুমুদিনীও মাঝে মাঝে দু'একটা কথা জুগিয়ে দিয়ে তার স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করচে। ব্যাপার কি? এই দুই অশিক্ষিতা মেয়ে এত কাব্যচর্চ্চা করে কোথা থেকে? বুঝলাম অপুই এদের মুখে মুখে এমন কাব্যামোদী করে তুলেছে। ওরা আর এখন অশিক্ষিতা নেই, যথেষ্ট মনের প্রসার হয়েছে।

আমার খুব আমোদ হোলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম আর কি কথা হয়। কিছুক্ষণ পরে দেখি, কাব্যকথা থেকে অন্য কথা এসে পড়েচে। রাণুদি খুব হাসতে হাসতে বলছে—"হাঁরে অপু, চাঁড়ালবুড়ীকে তুই একখানা নতুন কাপড় দিয়েছিস?"

অপু বল্‌লে—"হাঁ, বুড়ী বড় গরীব, আমাকে গোপাল ব'লে ডাকে, তাই একখানা নতুন কাপড় তাকে পরতে দিয়েছি।"

রাণুদি বললে—"সে আজ কি কাণ্ড করেচে জানিস্? সেই নতুন কাপড়খানা প'রে আজ আমাদের এখানে এসে হাজির। বলে,—আমার গোপাল কোথায় গেল? তোমরা আমার গোপালের বিয়ে দাও না কেন?"

অপু যেন বিব্রত হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে—"না না, তোমরা বুড়ীকে ও রকম আস্কারা দিওনা।"

কুমুদিনী তখনই বাইরের দিকে বেরিয়ে এলো দেখে আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

কিছুক্ষণ পরে অপুও বাইরে বেরিয়ে এলো। আমি একা বেড়াচ্ছি দেখে সে আমার কাছে এগিয়ে এলো।

আমি তখন অপুকে বল্‌লাম—"দেশের প্রতি তোমার কত গভীর আকর্ষণ তা বুঝেচি। তা তুমি এমন ভবঘুরের মত থাকো কেন, বিয়ে থা করে এখানেই সংসার পাতো না?"

একটু হেসে অপু বল্‌লে—"তা হয় না। ও আমার ধাতে সইবে না।"

আমি বল্‌লাম—"কেন? মেয়েদের সঙ্গ তো তোমার ভালোই লাগে?"

অপু আবার একটু হাসলো। বল্‌লে—"ওদের সবাই ভালো। ঐ কুমুদিনীও ভালো, রাণুদিও ভালো, অপর্ণা ছিল সেও ভালো। এই জীবনে আমি অনেক মেয়ে দেখলাম, সবাই ওরা স্নেহময়ী প্রেমময়ী করুণাময়ী। দুঃখে দারিদ্র্যে ক্ষুধায় যখন আমি কাতর হয়েচি তখনি ওরা আমাকে কল্যাণামৃত পরিবেশন করে বাঁচিয়েছে। আমি চিরকাল ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কল্যাণময়ী নারীর দেখা না পেলে আমি বাঁচতাম না। কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা আছে, সে সব আবিষ্কার করবার সখ আমার নেই। আমার এই রকম ভাসা ভাসা জীবনই ভালো।"

আমি বল্‌লাম—"কিন্তু তাতে তো তোমার জীবনের সুখগুলো ভোগ করা হবে না! দুঃখের মাত্রাই বেশী হ'য়ে যাবে, আর সুখের মাত্রা হবে কম!"

অপু বল্‌লে—দুঃখকে তো আর বাদ দেবার উপায় নেই, তখন ওর কমা বাড়াতে কি যায় আসে? সুখে দুঃখে মানুষ যখনই যেমন অবস্থায় থাক, জীবনের তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। জীবন যদি কারো তুচ্ছই হয় তাতেও

কোনো ক্ষতি নেই। জীবন মাত্রই খুব বড় একটা রোমান্স, বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স,—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।"

আমি বল্লাম—"কিন্তু এ রকম জীবন কি ব্যর্থ বলে তোমার মনে হয় না?"

অপু বল্লে—"হয়তো কখনো কখনো তা মনে হ'তে পারে, কিন্তু সব সময় নয়। ব্যর্থতার মধ্যেও একরকম সার্থকতা আছে, সেটা সবাই ঠিক টের পায়। সবাই অন্তরে অন্তরে জানতে পারে যে, কোনো সৃষ্টিই ব্যর্থ হয় না, সামান্য মাকাল ফলটাও ব্যর্থ নয়। সবাই জানে এই জগতেই সব জিনিষের শেষ হয় না। এর পিছনে যে আর একটা জগৎ আছে, তার তালীবনরেখা মধ্যে মধ্যে নজরে পড়ে তবেই তো মানুষ সারাজীবন ধরে দুঃখসমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে! কিন্তু কথাগুলো বেজায় বড়ো বড়ো শোনাচ্ছে। একটা সামান্য কথাই বলি। এই যে নিশ্চিন্দিপুরের বন জঙ্গল, এই যে জ্যোৎস্না,—বিচার করতে গেলে এর সার্থকতা কোথায়? তাই বলে কি এগুলো ব্যর্থ? আজ কি এই চিরকেলে তুচ্ছ জিনিষগুলো আপনার প্রাণে কোনো নতুন আনন্দ জাগায় নি? এই ব্যর্থ দেশ কি আপনার কাছে আজ সার্থক নয়?"

আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এ আমি কার কথা শুনছি? এ-কি কেবল অপুর মুখের কথা, না নিশ্চিন্দিপুরের অন্তর্যামীর কথা? এ দেশে কেবল কুমুদিনীই জন্মায় না, রাণুদিই জন্মায় না, অপুও জন্মায়। নইলে দেশপ্রকৃতির তো কোনো ভাষা নেই, সে চুপ করেই থাকে, সে অপেক্ষা করে। বহুকাল পরে হয়তো সে একজন অপুর জন্ম দেয়, তখন আর মনের কথা কিছুই অন্তরালে থাকে না, দেশে দেশে তা জানাজানি হ'য়ে যায়। নিশ্চিন্দিপুরের বন জঙ্গলের আর কিছু বিশেষত্ব নেই, সে যে অপুকে সৃষ্টি করতে পারে এইটেই তার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। যে দেশের এই বিশেষত্বটুকু আছে সে দেশ বনজঙ্গলে ঢেকে গেলেও কখনো মরবে না—সে দেশ অপরাজিত।

আর কথা কইবার অবকাশ হোলো না। গাড়ী প্রস্তুত, বিভূতি বাবুরা ব্যস্ত হ'য়ে আমাকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। গাড়ীতে উঠে বসলাম। অপু সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো। কুমু আর রাণুদি রকের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বাঁচিবারে চাই

বনচারী

আমি বাসিয়াছি ভাল তোমাদের মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা।
এরি বুকে বাঁধিয়াছি বাসা,
—মরুর বালুর কণা যাবো কোথা মরুরে ছাড়িয়া!—
মাটির মানুষ মোরা,
অপূর্ণ কামনা কত বুকে কাঁদে,
--অতৃপ্তির জ্বালা ধিকি ধিকি পুড়ায় অন্তর।
পাপ আছে,--আছে পঙ্কিলতা।
সবার উপরে তবু
তড়াগের বুকে-ভাসা পঙ্কজের মত
অন্তরের দিকে দিকে উঠিছে উদ্বেলি'
পূর্ণতার লাগি সদা ব্যাকুল বেদনা।
সৃষ্টি আর স্রষ্টারে মিলিয়া
ঘনায়েছে যে দুর্ভেদ্য রহস্য অপার,
তাহা ভেদিবারে ব্যর্থ প্রচেষ্টার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কত!
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মাঝে নাই নাই সাফল্যের
চরম হতাশা।--আছে শুধু তৃপ্তি ব্যর্থতার।
জীবের অপূর্ণতারে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
চলিয়াছে মানুষের নিরুদ্দেশ জয়যাত্রা
যুগ হতে যুগে।
গতির আনন্দ তার ব্যর্থতারে করিয়াছে
কামনার ধন।
বিচিত্র এ জীবনেরে নিয়ত-লুণ্ঠন-লোভী,
সুদুর্গম পথবাহী,
হে মানুষ ভাই, তোমাদেরি মাঝে
তোমাদের সুখদুঃখ, আশাদ্বন্দ্ব, ব্যর্থতারে নিয়ে
আমি বাঁচিবারে চাই

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

পুরাতন বালিগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে শৈলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশস্ত অট্টালিকা। শৈলনাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্থাৎ মিষ্টার এস্ এন্ চ্যাটার্জি, 'ভারত এঞ্জিনীয়ারিং সিণ্ডিকেটের' চীফ্ এঞ্জিনীয়ার এবং সীনিয়ার পার্টনার। এই বৃহৎ এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান হ'তে মাসিক বরাদ্দ এবং মুনফার অংশে শৈলনাথ যে অর্থ অর্জ্জন করেন তা অনেক ধনীর পক্ষেই কামনার বস্তু। দক্ষিণ ভারতের একটা দুরন্ত বেগবতী নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হচ্ছে; দিন পনেরো ধ'রে তার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা ক'রে দিন-দুই হ'ল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। কিন্তু ইত্যবসরে কলিকাতা অফিসের কাজ এত জ'মে গেছে যে, মফঃস্বলের নিরবসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর একটু যে বিশ্রাম ভোগ করবেন তার উপায় নেই। প্রত্যহই সাত আট ঘণ্টা ক'রে অফিসে রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা তক্তাপোষের উপর শৈলনাথ গোটা দুই তিন তাকিয়া এবং একটা ধূমায়িত পাইপের সাহায্যে খানিকটা আরাম পাবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময়ে গৃহিণী অপর্ণা এসে উপস্থিত হলেন।

একটুখানি স'রে গিয়ে অপর্ণার বসবার মতো একটু স্থান ক'রে দিয়ে শৈলনাথ বল্‌লেন, "বোসো।" অপর্ণা উপবেশন করলে বল্‌লেন, "খবর কি বল?"

অপর্ণা বল্‌লেন, "খবর বলবার সময় কোথায় যে বল্‌ব? দেশ-দেশান্তরে ত' পুল বেঁধে বেড়াচ্ছ, সংসারের ওপর একটা পুল বাঁধ্‌তে পার না? যাতে মাঝে মাঝে তোমার নাগাল পাওয়া যায়?"

অপর্ণার কথা শুনে শৈলনাথ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "সে পুল কি এখনো বাঁধবার অপেক্ষায় আছে অপু? সে ত' বহুকাল হ'ল তোমার বাবা বেঁধে দিয়েছেন। তুমিই ত আমার সংসার-নদীর সেতু।"

"তা হ'লে সে সেতু অকেজো হয়েছে—আর একটা নতুন সেতু কর!"

সহাস্যমুখে মাথা নেড়ে শৈলনাথ বল্‌লেন, "তার আর সম্ভাবনা নেই। এই বুড়ো অকর্ম্মণ্য এঞ্জিনীয়ারের টেণ্ডার আর কোনো কন্যাদায়গ্রস্তই গ্রাহ্য করবেনা।"

স্বামীর বয়স যে জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বশতঃ আপামর সাধারণের সহিত বার্দ্ধক্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এই অখণ্ডনীয় সত্যটা অপর্ণা খুব সহজে স্বীকার করতে চাইতেন না। চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "দিনরাত মুখে বুড়ো বুড়ো শব্দ! অমন ক'রে সদাসর্ব্বদা আয়ুর নিন্দে করতে নেই! কি তোমার এমন বয়েস হয়েছে শুনি?"

অপর্ণার কথা শুনে গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে শৈলনাথ বল্‌লেন, "রামচন্দ্রঃ! ও ব্যাপার আমার কেন হ'তে যাবে? আমার শত্রুর হোক্; আমার বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীদের হোক্! কিন্তু এসব ত হ'ল অবান্তর কথা, আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

অপর্ণা অভিমান করলেন; ক্ষুণ্ণগম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লেন, "তোমার কাছে কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল তা কেমন ক'রে জান্‌ব বল?"

শৈলনাথও অপর্ণার গাম্ভীর্য্যের সহিত সমান তাল রেখে গম্ভীর মুখে বল্‌লেন, "এ অবশ্য একটা ভাববার মতো কথা। কিন্তু আমার বিষয়ে তোমার যদি সুনিশ্চিত ধারণা না থাকে, তা হ'লে না-হয় তোমার কাছে যে-টা আসল, তার কথাই বল।"

"ব'লে কোনো ফল আছে কি ?"

"গীতার উপদেশ হচ্ছে—মা ফলেষু কদাচন। সুতরাং ফলের প্রত্যাশা না ক'রেও বল্‌তে পার।"

শৈলনাথের উত্তরের ভঙ্গীতে অপর্ণার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিলে; ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "আচ্ছা, ঠাট্টা তামাসা ছাড়া তোমার মুখে কি কাজের কোনো কথা জোটেনা ?"

সহাস্যমুখে শৈলনাথ বল্‌লেন, "জুটবেনা কেন ? অবশ্য জোটে। অক্টেভিয়াস্ ষ্টীল্ কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে জোটে, মার্টিন কোম্পানীর কেশিয়ারের সঙ্গে জোটে, টাটা আয়রান্‌-এর সেল্‌স্ ম্যানেজারের সঙ্গে জোটে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর তোমার মতো আর দু-চার জনের সঙ্গে কথা কইবার সময়ে জোটে তুমি যাকে বলছ ঠাট্টা তামাসা, অর্থাৎ সাধুভাষায় যাকে বলে কৌতুক পরিহাস।"

"আমার মতো আর দু-চার জন কারা শুনি ?" চক্ষে পূর্ব্ববৎ ভ্রুকুটির লীলা।

শৈলনাথ বল্‌লেন, "সাংঘাতিক জেরায় পড়লাম দেখ্‌ছি! ওগো, ভয় করবার তেমন কিছুই নেই, তারা সবাই তোমার সহোদরা বোন,—তৃতীয় পক্ষের বোন একজনও নেই। কিন্তু বাজে কথা যথেষ্ট হয়েছে,—এখন একটু কাজের কথা হোক্। তুমি যা বল্‌তে এসেছ, আমি তা জানি। বলব, শুনবে ?"

কোনো কথা না ব'লে নির্ব্বাক কৌতূহলে অপর্ণা স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অর্থ,—বলনা, দেখাই যাক্ কতটা তোমার দৌড়।

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে শৈলনাথ বল্‌লেন, "বাসনার বিয়ের কথা। বল, ঠিক বলেছি কি-না!"

সহসা একরাশ হাস্যে অপর্ণার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লেন, "ঠিক ত বলেছ! আচ্ছা, কি ক'রে বুঝলে ?"

"অনুমানে।"

"শুধু অনুমানে ?" মুখের দীপ্তি খানিকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল।

শৈলনাথ বল্‌লেন, "শুধু অনুমানে। যোগ বলে নয়, থট্ রীডিং-এর সাহায্যেও নয়। কিন্তু তার জন্যে দ'মে যাচ্ছ কেন অপু ? অনুমান ত' প্রখর বুদ্ধিরই লক্ষণ।"

অপর্ণা বল্‌লেন, "আচ্ছা স্বীকার করছি তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। এখন সেই বুদ্ধির একটুখানি খরচ ক'রে সামনের বোশেখ মাসে বাসুর বিয়েটা দিয়ে ফেল দেখি।"

একটা শলা দিয়ে পাইপটা খোঁচাতে খোঁচাতে শৈলনাথ বল্‌লেন, "কিন্তু বাসুর বিয়েটা ঠিক বুদ্ধি পরিচালনার অভাবে আটকে নেই।"

"তবে কিসের জন্যে আট্‌কে আছে ?"

"বিবেচনার অনুরোধে। বি-এ পাশ করবার আগে বিয়ে হয়, এ তোমার মেয়ের একেবারেই ইচ্ছে নয়। এখন তার বয়েস হয়েছে, একেবারে ছেলেমানুষটি নয়, তার কথাটাও ত' একটু ভাবতে হয়।"

অপর্ণার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—"বল কি গো! তোমার মেয়েরই বয়স হয়েচে, আর আমার বয়স হয় নি ? আমার কথাটা একটুও ভাবতে হয় না ? আচ্ছা, মেয়ের বয়েস হ'লে, তার বিয়ে দেওয়া বেশি দরকার, না বি-এ পড়া বেশি দরকার ?"

শৈলনাথ বল্‌লেন, "প্রশ্ন কঠিন। ভেবে দেখ্‌বার জন্যে সময় চাই।"

অপর্ণা তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লেন, "কিচ্ছু সময় চাইনে, বোশেখ মাসের মধ্যে বিয়ে দিতেই হবে।" তারপর সহসা কণ্ঠের স্বর উদারায় নামিয়ে দিয়ে কোমলকণ্ঠে বল্‌লেন, "আহা, ছেলেটার দুঃখু ত আর চোখে দেখা যায় না! সর্ব্বদা যেন ধড়ফড় করছে!"

কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে শৈলনাথ বল্‌লেন, "সে কি কথা ? লক্ষণটা মোটেই সুবিধের নয়! কে আবার সর্ব্বদা ধড়ফড় করছে ?"

শৈলনাথের কথা শুনে অপর্ণার বিরক্তির সীমা রইল না; বল্‌লেন, "তাও তোমাকে নাম ধ'রে বল্‌তে হবে, তবে

বুঝ্‌বে না-কি? কেন, নরেনের কথাটা তোমার কিছুতেই মনে পড়ল না?"

শৈলনাথ বল্‌লেন, "হয়ত' মনে পড়ত, কিন্তু ধড়ফড় করার কথা ব'লে তুমি সমস্ত গোলমাল ক'রে দিলে। সাধারণতঃ ওটা বেরিবেরি রোগের লক্ষণ, নরেনের যে ও রোগ নেই তা—"

শৈলনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অপর্ণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "দেখ, মিছেমিছি চালাকি করোনা! বাসুর সঙ্গে শীগ্‌গির বিয়েটা হ'য়ে যায় সে জন্যে নরেন কত ব্যস্ত তা তুমি জাননা?"

কপট গাম্ভীর্য্যের স্বরে শৈলনাথ বল্‌লেন, "আহা হা, ব্যস্ত হ'তে পারে, কিন্তু তা ব'লে ধড়ফড় করবে কেন? আমাদের সময়ে এ-রকম অবস্থায় আমরা বড় জোর ছটফট্ করতাম, কিন্তু কই ধড়ফড় করতাম ব'লে ত মনে পড়ে না!"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে অপর্ণা বল্‌লেন, "ধড়ফড়ানিতে আর ছটফটানিতে কি এমন তফাৎ আছে শুনি?"

বিবাহব্যগ্রাতুর মনের উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার পার্থক্য নির্ণয়ের যথোচিত সময় পাওয়া গেল না; কারণ দেখা গেল এই আলোচনার সর্ব্বপ্রধান উপলক্ষ—বাসনা—অদূরে আবির্ভূত হয়েছে।

বাসনা শৈলনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা, থার্ড-ইয়ার বি-এ ক্লাসের মেধাবিনী ছাত্রী, দেখ্‌তে সুন্দরী এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী। স্বভাবত একটু চঞ্চল, তার্কিকতায় পটু এবং প্রতিবাদে অসহিষ্ণু। কিন্তু তার চঞ্চলতায় বর্ষা-স্রোতস্বতীর কর্দ্দমতা নেই, আছে স্বচ্ছ গিরিনদীর গতিবেগ। উপরে অপর্ণা কর্ত্তৃক উক্ত নরেনের সহিত তার বিবাহের কথা একরকম স্থিরই হ'য়ে আছে

নরেন, অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একজন বিলাৎ-ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার। বৎসর দুই হ'ল গ্লাস্‌গো থেকে এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটা বড় রকম উপাধি অর্জ্জন ক'রে দেশে ফিরে সে 'ভারত এঞ্জিনীয়ারিং সিণ্ডিকেটে' যোগদান করেছে। এখনও সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী, কিন্তু বাসনার সহিত বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে যে একজন অংশীদারও হবে, সে কথাও স্থির হ'য়ে আছে। নরেন উচ্চবংশীয় ধনবান যুবক, সুতরাং সর্ব্বতো-ভাবে কন্যাপক্ষের কামনার সামগ্রী।

পিতামাতার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বাসনা বল্‌লে, "মা, শ্যামপুকুর থেকে গাড়ি এসেছে।"

অপর্ণা একটু চিন্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ এ সময়ে গাড়ি এল যে?"

"মামীমা লিখেচেন, পরশু থেকে দাদামশাই আবার আরম্ভ করেছেন, কেউ থামাতে পারচেনা।"

অপর্ণার মুখখানা ঈষৎ ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লেন, "আমিও ঐ-রকমই একটা-কিছু মনে করছিলাম। আচ্ছা, যাও তা হ'লে। কিন্তু আজ রাত্রেই ফিরচ ত?"

এ কথার উত্তর দিলেন শৈলনাথ; বল্‌লেন, "এই রাত্রে যাচ্ছে, আজই কি আর আসতে পারবে। কাল কিন্তু সকালেই চ'লে এস বাসু।"

"তাই আসব বাবা।" ব'লে বাসনা দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

বাসনার মাতামহর নাম গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর পাঁচেক হ'ল ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্‌স্ জজের পদ হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন। কার্য্যকালে একজন অতিশয় রাশ-ভারি হাকিম ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্দর মহলে যাদের সঙ্গে পরিচয় তারা জানত গগনবিহারীর মত সরস ও সহৃদয় ব্যক্তি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বয়সের কঠিনতাকে সহজে অতিক্রম করবার উপযুক্ত এমন শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল যে, অবলীলার সহিত তিনি বার্দ্ধক্য এবং শৈশবের যোগে একটা রাসায়নিক মিলন ঘটাতে সক্ষম হতেন। ধবধপে গৌরবর্ণ দেহ, নাসিকার তীক্ষ্ণতায় এবং বক্রতায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কেশহীন চিক্কণ মস্তকের পিছন দিকের খানিকটা অংশে পাৎলা এবং বিরল কেশের নিরর্থক জীবন-প্রচেষ্টা। সমস্ত মিলিয়ে বাঙলা দেশের খাঁটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মতো আকৃতি।

পেন্সন গ্রহণের বৎসর খানেক পরে গগনবিহারীর পত্নী-বিয়োগ হয়। দীর্ঘকালের জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে প্রথমে তিনি অতিশয় শোকাতুর হয়েছিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন ভোগের মধ্য দিয়ে এই শোকের বাহিরের অভিব্যক্তি যখন

ক্রমশ শান্ত হ'য়ে এল তখন দেখা গেল তিনি মদ্যপান আরম্ভ করেছেন। পূর্ব্বে কোনো দিন তাঁকে মদ্য স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে কেউ দেখেনি, সুতরাং সকলেই মনে করলে শোকের তীব্র দংশন হ'তে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই উপায়ে অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করা। হয়ত সেই কথাই ঠিক, কিন্তু গগনবিহারী তা স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, মনোযন্ত্রের সমস্ত তন্ত্রীগুলো এক সুরে বেঁধে যখন পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়নিরোধের একটা স্তব্ধ আনন্দ উপভোগ করবার বাসনা হয় তখনই তিনি সুরার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গগনবিহারীর মদ খাওয়ার মধ্যে একটু অসাধারণত্ব ছিল। তিনি কখনই নিয়মিতভাবে মদ্যপান করতেন না। চার পাঁচ মাস অন্তর হঠাৎ একদিন পান করতে আরম্ভ করতেন, কিন্তু আরম্ভ যখন করতেন তখন তিন চার দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত তার পালা চলত। তৎকালে সাধারণ পানাহার এক রকম বন্ধই থাকত এবং হোয়াইট সীল হুইস্কি এবং সোডাওয়াটারের মুহুর্মুহুঃ যোগান দিতে দিতে দীনু খানসামাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হোত। সে সময়ে গগনবিহারী এমন একটা গভীর-গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করতেন যে তাঁকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে কেউ তাঁর সম্মুখীন হ'তে সাহস করত না। একমাত্র যে সাহস করত এবং সক্ষম হ'ত সে তাঁর আদরের দৌহিত্রী বাসনা। সকল বিষয়ে, মায় এই অত্যন্ত খামখেয়ালী মদ্যপানের ব্যাপারেও, গগনবিহারী বাসনার বশ্যতা স্বীকার ক'রে চলতেন। তাই প্রয়োজন হ'লেই মাতুলালয়ে তার তলব পড়ত। এবারেও সেই কারণেই এই ডাক।

গাড়িবারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে মোটরে চ'ড়ে ব'সে বাসনা বল্‌লে, "বিপিন ?"

ড্রাইভার পিছনদিকে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, "মা-মণি ?"

"জ্ঞান-ট্যান আছে ত ?"

"আজ্ঞে, তা আছে। তবে এবারকার রোক্‌টা একটু বেশি মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা চল।"

গেট হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে মোটর দ্রুতবেগে শ্যামপুকুরের অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহত্ত্ব

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

কমল কহে, 'মৃণালে কাঁটা'
বলুক সর্ব্বজন,
তথাপি আমি সুবাস সবে
করিব বিতরণ

———

শান্তিনিকেতনে রবি-বাসর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

রবি-বাসরের অধিনায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলিকাতা হইতে শত মাইল ব্যবধানে, তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত শান্তিনিকেতনে, গত ৩০শে ফাল্গুন রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেখানে কবির আদর, অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় এবং তাঁর অমৃতময়ী বাণীর মধ্য দিয়া তাঁহার অভিজাত ও উদারহৃদয়ের যে অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। সেখানকার এখানে কেবল সেই বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধের চেষ্টা করিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ সভায় অভিভাষণ প্রদানের জন্য কবি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ৭ই ফাল্গুন তারিখে সকালে তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাটী হইতে টেলিফোনে খবর আসিল যে, এখনই একবার কবির সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি এই মাসের শেষেই

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ গৃহে রবিবাসরে সভ্যবৃন্দ—মধ্যস্থলে: অধিনায়ক শ্রীরবীন্দ্রনাথ

সকল কথা সম্পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করি। মাননীয় "বিচিত্রা" সম্পাদক মহাশয় রবি-বাসরের সদস্যদের সেই পুণ্যতীর্থ ভ্রমণের একটি বিবরণ আমায় লিখিবার ভার দিয়াছেন। আমি শান্তিনিকেতনে রবি-বাসর আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছেন। অতি আনন্দের সংবাদ, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া নয়টার

মধ্যেই কবিভবনে উপস্থিত হইলাম। সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে বহুলোক অপেক্ষা করিতেছেন। কবির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ কবির বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ইনিও রবি-বাসরের অন্যতম সদস্য, পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমরা তিনজনে ঘরের বাহিরে দক্ষিণের বারান্দায় যাইয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কবি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমদিগকে আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কবি ঘরের মধ্যে গিয়া আসন গ্রহণ করিতেই লেডি আর্থার ও একজন দেশীয় মহিলা দেখা করিতে আসিলেন।

সুবিধাজনক। সোমবার আফিস করার পক্ষে কাহারও কোন অসুবিধা হইবে না। উপেন্দ্রবাবু কবিকে বলিলেন, "আমরা শনিবার সন্ধ্যার পর যাত্রা করিব এবং বর্দ্ধমানে আহার সারিয়া, অধিক রাত্রে বোলপুর পৌঁছিব। অত রাত্রে আপনাদের আর আশ্রমপীড়া ঘটাতে চাইনা, আপনি কেবল আমাদের শয়নের স্থানের ব্যবস্থা করিবেন।" কবি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সে হতেই পারেনা। আশ্রমপীড়ার বদলে যে তোমরা বর্দ্ধমানের দুষ্পাচ্য খাবার খেয়ে নিজেদের পীড়া ঘটাবে, আর আমি সকলের ওষুধ যোগাব, তা হতে পারেনা। রাত্রে গিয়ে তোমাদের ওখানেই খেতে হবে, যা জোটে।" বিশ্বভারতীর অন্যতম সচিব শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

শ্রীরবীন্দ্রনাথের "শ্যামলী" গৃহের সম্মুখে রবিবাসরের কয়েকজন সদস্য এবং শান্তিনিকেতন স্কুলের তিনজন ছাত্রী

৫।৭ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলে, আমাদের ডাক পড়িল। আমরা যাইয়া কবির নিকটে আসন গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ নানা কথাবার্ত্তার পর রবি-বাসরের অধিবেশনের কথা উঠিল। ৩০শে ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে অধিবেশনের দিন স্থির হইল। আমরা জানাইলাম যে রবিবার যাইয়া সোমবার সকালে ফিরিয়া আসার অপেক্ষা, শনিবার রাত্রে যাইয়া রবিবার রাত্রে ফিরিয়া পৌছানই

"কি খেতে দেবে?" সুধাকান্ত বাবু ফর্দ্দ দিলেন, "গরম গরম খিচুড়ি, ভাজা বাঁধাকপির তরকারী, আলুর দম, আর একটা চাটনী।" কবি হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "আবার চাটনীও দেবে? সেই সঙ্গে একটা মিষ্টিও দিও।" খাওয়ার ফর্দ্দ লইয়া খানিকক্ষণ হাসাহাসি চলিল। সুধাকান্তবাবু আমাদিগকে সন্ধ্যার ট্রেনের পরিবর্ত্তে, বেলা আড়াইটার পাকুড় প্যাসেঞ্জারে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

এবং ঐ ট্রেনে যাওয়ার সুবিধার কথা বুঝাইয়া দিলেন। আমরা তাঁহার কথামতই ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলাম। এই সময় খবর আসিল যে. দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইন রিপাব্‌লিক হইতে একজন সাহেব দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমরা বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলে, কবি আর একটু বসিতে বলিলেন।

বিদেশী ভদ্রলোক আসিয়া কবিকে অভিবাদন জানাইলেন, কবি তাঁহাকে নিকটেই একটী চেয়ারে বসিতে বলিলেন। সাহেব কবির হস্তে একখানি পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়া, সসম্ভ্রমে বলিলেন যে, তিনি ভাল ইংরাজি জানেন না, অনুমতি পাইলে ফরাসী ভাষায় কথা কহিবেন। কবি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ইংরাজী তাঁরও বিদেশী ভাষা, তিনিও ভাল ইংরাজী জানেন না। (একথা অবশ্য অস্বীকার্য্য) একারণ ইংরাজীতে কথা কহিতে কাহারও কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। তারপর ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া উভয়ের কথা চলিতে লাগিল। আমরা বসিয়া রহিলাম।

ভোজন-কক্ষের মধ্যস্থলে পদ্মের আলিপনা ও পুষ্পপাত্র

সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলে, আরও কিছুক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিল। মহর্ষির সময়ে অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নের কথা শুনিলাম। বেলা সাড়ে দশটার পর আনন্দ-উৎফুল্লহৃদয়ে আমরা কবির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাটীতে ফিরিয়া আমার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল, রবি-বাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ, আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় দাদা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কে এই আনন্দ সংবাদ পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করা। দাদা তখন অসুস্থ শরীর লইয়া পুত্রের কর্ম্মস্থলে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইয়া লিখিলাম যে, তিনি যাহা আদেশ করিবেন, সেই মতই ব্যবস্থাদি আমি করিয়া রাখিব, এজন্য তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিছুদিন থাকিয়া স্বাস্থ্য-লাভ করিয়া শান্তিনিকেতনে যাত্রার মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে আসিলেই চলিবে।

তিনদিন পরেই দাদার পত্র আসিয়া পৌঁছিল, তিনি পরের সপ্তাহেই আসিতেছেন। রবি-বাসরগত প্রাণ অশীতিপর বৃদ্ধের অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আমি সাগ্রহে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে তাঁহার নির্দ্দেশ মত আয়োজন চলিতে লাগিল। ১৬ই ফাল্গুন তারিখে অধিবেশনের নিমন্ত্রণপত্রে সদস্যগণকে কবির রবি-বাসর আহ্বানের এই আনন্দের সংবাদ জানাইয়া দেওয়া হইল।

আমার অত্যন্ত ইচ্ছা থাকিলেও, শান্তিনিকেতনে রবি-বাসরের অধিবেশনের সংবাদ পূর্ব্ব হইতে পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতে কবি নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, যেন ঐ দিনে অযথা অধিক লোকের সমাগম শান্তিনিকেতনে না হয়। তিনি সেই দিন কেবল রবি-বাসরের সদস্যদের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু রবি-বাসরের পত্র দ্বারা ও লোকমুখে শান্তিনিকেতনে অধিবেশনের সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়ায়, সম্পাদক হিসাবে আমাকে একটু বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। রবি-বাসরের সদস্য নহেন এমন বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত অনেকে আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাকে কিন্তু বাধ্য হইয়া সকলকে এ বিষয়ে নিজ অক্ষমতা জানাইতে হইয়াছিল।

দাদা আসিয়া পৌঁছিলেন। রেলকোম্পানী সদস্যদের একসঙ্গে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী পৃথক কম্পার্টমেণ্টের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

শনিবার, ২৯ ফাল্গুন তারিখে কবির নিমন্ত্রিত শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া আমরা মোট ৪০ জন বোলপুরের যাত্রী হইলাম।

গাড়ীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্যদের অন্তরের আনন্দের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শিশুভারতীর সম্পাদক প্রবীণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম আনন্দের আবাহন করিলেন। তারপর কবি বিজয়লাল আবৃত্তি করিলেন। কবি গিরিজাকুমার বসু একাই পর পর চারিটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। উৎসাহী কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা গাড়িতেই একটী কবিতা রচনা করিয়া এবং তাহা পাঠ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। তরুণ কবি সুনির্ম্মল বসুও আবৃত্তি করিলেন। প্রবীণ অতি-প্রবীণ কেহই বাদ গেলেন না। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, এমন কি শুনিলে হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সকলের সঙ্গে মিলিয়া গাড়ির মধ্যে আনন্দের তুফান বহাইয়া দিলেন। দাদা দুর্ব্বল শরীরে অধিকাংশ সময় শুইয়া কাটাইলেও, আনন্দের আতিশয্যে উচ্চকণ্ঠে তিনবার কবি সার্ব্বভৌমের জয়ধ্বনি করিলেন। অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিলেন।

আমরা কিছু বিলম্বে রাত্রি প্রায় আটটার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে বিশ্বভারতীর সচিব সুধাকান্ত বাবু ও কবির সেক্রেটারী অনিলবাবু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। কয়েকখানি মোটরকার ও একটী বাসে করিয়া দুই তিন বারে সদস্যগণকে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া হইল।

প্রশস্ত অতিথিশালা ভবনের দ্বিতলেই আমাদের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, জলের কল ও আধুনিক ধরণের শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। দলের তিনজন নিকটবর্ত্তী পান্থশালায় এবং দুইজন নিজেদের আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় লইলেন। নবাগতের চক্ষে রাত্রির স্বল্পালোকে সমস্ত শান্তিনিকেতন যেন মায়াপুরীর মত বোধ হইতেছিল।

আমরা নয়টার মধ্যে অতিথিশালায় পৌঁছিয়াছিলাম। হাত মুখ ধুইয়া এবং নিজ নিজ বিছানার ব্যবস্থাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেই, দশটা আন্দাজ আহারের ডাক পড়িল। আমরা অতিথিশালার অধ্যক্ষের সহিত অদূরবর্ত্তী ভোজনশালায় উপস্থিত হইলাম। কক্ষের মধ্যে অর্দ্ধেক অংশেই আমাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হইয়া গিয়াছিল। আহার্য্যের আয়োজন প্রচুর দেখিলাম। পোলাও, লুচি, মাংস কিছুই বাদ ছিল না। সুধাকান্ত বাবু সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "এই কি আপনার খিচুড়ি আর ভাজা?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কথা তাই ছিল বটে, তবে এখন ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির ভাবটা কেটে যাওয়ায় একটু বদল করে দিয়েছি!" ভোজনশালার কর্ত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর তত্ত্বাবধানে এবং সুধাকান্ত বাবু ও অনিলবাবু প্রভৃতির উপরোধ-অনুরোধে সদস্যগণের অনেকেরই সেরাত্রে একটু গুরুভোজন হইয়া গিয়াছিল।

সমস্তরাত্রি অধিকাংশ সদস্যই একরকম জাগিয়াই কাটাইয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা, গল্পগুজব ও হাস্যকৌতুকের অন্ত ছিল না। মশকের দংশনভয়ে কয়েকজন মশারী খাটাইয়াছিলেন, কেহ কেহ মশার-ধূপেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সে রাত্রে আদৌ মশকের প্রাদুর্ভাব ছিল না। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় নানারূপ গল্প করিয়া এবং উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি গান গাহিয়া শেষরাত্রি পর্য্যন্ত সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। ভোরের দিকে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া একটু ঠাণ্ডা পড়ায়, সকলে অল্পক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া পড়েন।

৩০শে ফাল্গুন অতি প্রত্যূষেই শান্তিনিকেতনের নিয়মিত ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সকলে জাগিয়া উঠেন। অতিথিশালা আবার কোলাহল মুখরিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বরাত্রে কথা হইয়াছিল যে, প্রাতে চা ও জলযোগের পরই কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের সুরুল লইয়া যাইবেন। সেখানে শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাদি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, একটু বেলায় রবি-বাসরের অধিবেশন হইবে। কিন্তু সকালেই খবর আসিল যে, কবি সকলের সঙ্গে মিলিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আগেই রবি-বাসরের অধিবেশন হইবে, তাহার পর সুরুল যাত্রা।

সদস্যগণের অনেকেই কাছাকাছি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। কয়েকজন শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ পাঠাগার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সকলকে খবর দিয়া আনান হইল। অতিথিশালার অধ্যক্ষ মহাশয় চায়ের সহিত প্রচুর জলযোগেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে সবের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া, আমরা সকলে একত্রে কবির 'উত্তরায়ণ' ভবনের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় সকলের পুরোভাগে চলিলেন।

সকালে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর লাগিতেছিল। বৃক্ষাদি বেষ্টিত সুন্দর পথের নিকটে ও দূরে স্থিত বিভিন্ন আবাসগুলির পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতে আমরা ধীরে

ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা অতি বিস্তৃত প্রাঙ্গণযুক্ত প্রাসাদতুল্য সুদৃশ্য "উত্তরায়ণ" ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ভবনের মধ্যস্থ মনোরম সুবৃহৎ কক্ষে সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সভাস্থলে যাইয়া সদস্যগণ সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ, শান্তিনিকেতনের কর্ম্মীবৃন্দ, সেবক-সেবিকা, বয়স্ক ছাত্রছাত্রী ও মহিলাগণের আগমনে সভাস্থান পূর্ণ হইয়া গেল।

সভার প্রারম্ভে সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় ও সম্পাদক একে একে কবির সহিত প্রত্যেক সদস্যের পরিচয় করাইয়া দিলেন। যাঁহারা কবির বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের নাম উল্লেখ মাত্রই কবি হাসিয়া বলিলেন, "এঁদের আর পরিচয়ের দরকার নেই।" অসুস্থতাবশতঃ সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ও অনিবার্য্য কারণে সদস্য অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুপস্থিতের কথা সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় সভায় উল্লেখ করেন। বিশ্বভারতীর কয়েকটী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগে কবির "শুভকর্ম্মপথে" এই সঙ্গীতটী অতি সুন্দর ভাবে গান করিলেন। গান শেষ হইলে, সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় রবি-বাসরের পক্ষ হইতে অতি আবেগভরে কবিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তাঁহার নিবেদনের মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন—"পূজনীয় কবিবর, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকগণ, ছাত্রগণ, বালকবালিকাগণ, আশ্রমের তরুলতা-গুল্ম সকলকে আমার প্রিয় রবি-বাসরের হয়ে প্রণাম জানাচ্ছি। বিশ্বের কবি, ভারতের কবি, বাঙ্গলার কবি, আমার কবি, আপনাকে প্রণাম করি। আজ আপনি স্নেহভরে রবি-বাসরের অধিনায়করূপে আমাদের এই তীর্থ-স্থলে আসবার জন্য যে আহ্বান করেছেন, তাতে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে অভিভূত হয়েছে। কবিবর, আমরা কলকাতা থেকে এখানে আসিনি আপনাকে প্রবন্ধ, কবিতা এসব শোনাতে, আমাদের এতবড় দুর্ব্বুদ্ধি হয়নি। কলকাতা থেকে কয়লা নিয়ে রাণীগঞ্জে বিক্রয় করতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি এই পবিত্রতীর্থে, এই পুণ্য আশ্রমে, এই পবিত্র স্বর্গে নিজেদের পবিত্র করতে, সার্থক করতে আর আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে। আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন বাণী নিয়ে যাব, যে বাণী হবে আমাদের জীবনের পরম সম্বল।"

সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর, রবি-বাসরের সদস্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা দুইটী সময়োচিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে কবি রবি বাসরের সদস্যগণকে তাঁহার বাণী প্রদান করেন।

রবি-বাসরের অন্যতম সদস্য শিশুভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সমস্ত অভিভাষণ সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাহা সম্পূর্ণভাবে এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

বক্তৃতার পর বহুক্ষণ ধরিয়া কবি সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে আলোচনা করেন। বাঙ্গলা পত্রের পাঠ-লিখন প্রণালী, নামের পদবী, নিজের নামের পূর্ব্বে শ্রী দেওয়া, ইংরাজীর প্রতিশব্দরূপে 'বাধ্যতামূলক' 'কৃষ্টি' প্রভৃতি কয়েকটী ভুল কথার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে দশটায় সভা ভঙ্গ হয়।

সভাভঙ্গের পরে "উত্তরায়ণে"র সম্মুখভাগে, কবিগুরু সহ রবি-বাসরের সদস্যগণের একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। এই ফটোগ্রাফ লওয়া সম্পর্কে এখানে একটী কথার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইতিপূর্ব্বে কয়েকস্থলে রবি-বাসরের অধিবেশনে সদস্যগণের ফটো লইতে গিয়া আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সভায় উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রলোকেরা নবীন ও প্রবীণ সকলের অগ্রে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এবং সেই ফটোগ্রাফ দেখিয়া সদস্যরা আনন্দিত হইতে পারেন নাই। শান্তিনিকেতনের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সভায় অন্যান্য বহুলোকে যোগদান করিলেও, একজনও ফটো লইবার সময় আমাদের নিকটে আসেন নাই। কিন্তু ফটো লওয়া শেষ হইবার পর মুহূর্ত্তেই অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী আসিয়া সদস্যদের নাম সহি লইবার জন্য ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। কবি-সদস্যেরা দুই চারি লাইন করিয়া কবিতা লিখিয়া দিয়া এবং শিল্পীরা ইচ্ছামত চিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাদের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

তৎপরে সদস্যগণকে মোটরযোগে দুইমাইল দূরবর্ত্তী সুরুল শ্রী-নিকেতনে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় এবং তাঁহার সহকারীগণ পল্লীসেবা বিভাগের কার্য্যাদি সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। বীরভূম জেলায় বিস্তৃত পরিসরে অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এই পল্লীসেবা কার্য্য চলিতেছে। যে সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। শ্রী-নিকেতনের শিল্প বিভাগের তাঁতশালায় বর্ত্তমানে মোট ২৫টি তাঁত চলিতেছে। ইহাতে রেশম ও সূতির নানারূপ ধুতি, সাড়ি, সতরঞ্চি, কার্পেট ও আসন ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। সুন্দর চিকনের কার্য্যের নানারূপ নমুনাও শিল্পাগারে দেখা গেল। বস্ত্র রঞ্জন ও

সুন্দর ছাপের কার্য্য শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। গালার কার্য্য করা যে সকল খেলনা, ফুলদান, চায়ের ট্রে, টেবিল ল্যাম্প ও ছোট বাক্স, কৌটা ইত্যাদি তৈয়ারী হইতেছে সেগুলি অতি সুন্দর। অলঙ্কার প্রস্তুত বিভাগের মীনার কাজ করা রৌপ্য নির্ম্মিত ইয়ারিং, ব্রোচ, বালা ও হার প্রভৃতি সুন্দর ও সুলভ। চর্ম্মশিল্প বিভাগের প্রস্তুত চেয়ারকুশন, মহিলাদের হাত ব্যাগ, মনিব্যাগ, পুস্তকের মলাট প্রভৃতির গঠন ও উপরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। মহিলা ও পুরুষদের ব্যবহারের উপযোগী নানাপ্রকারের পাদুকাও প্রস্তুত হইতেছে। কাঠের কাজ বিভাগে খরিদ্দারের পছন্দ অনুযায়ী নানাপ্রকারের আসবাবপত্র তৈয়ারী চলিতেছে। এই সকল ব্যতীত ছাত্রদের বইবাঁধার কাজ, কার্ড বোর্ডের বাক্স, রাইটিংকেশ, ব্লটিংপ্যাড ইত্যাদি তৈয়ারীর কাজ, তাম্র, পিতল ও লৌহ নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রী-নিকেতনের গো-পালন এবং পক্ষীপালন শিক্ষা দানের জন্যও ছাত্র গ্রহণ করা হয়। এখানকার গোশালা ও পক্ষীপালনাগার দর্শনযোগ্য।

পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনা এবং তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য কবিগুরু শ্রীনিকেতনে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছি। এখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে শুধু মহাকবি নন, তাঁহার মহাকর্ম্মিরূপও আমরা দর্শন করিয়াছি। কবির বিষয়ে আমাদের অনেকের ধারণার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমরা দেশবাসীকে ইহা জানাইতে চাই যে, তাঁহাদের প্রিয় কবি একজন মহাকর্ম্মী; জন্মভূমির প্রকৃত হিতসাধনে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টার তুলনা নাই।

শান্তিনিকেতনের মত শ্রীনিকেতনেও বৈদ্যুতিক আলো এবং কলের জলের ব্যবস্থা দেখিলাম। শিল্পাগারেও বৈদ্যুতিক শক্তিতে যন্ত্রাদি চালিত হইতেছে। কার্য্যের সুবিধার জন্য শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে টেলিফোন সংযোগ রহিয়াছে। কর্ম্মিদের বাসের জন্য অনেকগুলি আবাস প্রস্তুত হইয়া স্থানটী একটী নূতন পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পাগারের পার্শ্বেই একটী নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিতে প্রায় বেলা একটা হইয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক আসিল। আমরা পুনরায় উত্তরায়ণে কবির ভবনে একত্র হইলাম।

প্রাতে যে সুসজ্জিত বৃহৎ কক্ষে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যেন কোন পূজামন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রত্যেকের আসনের সম্মুখে আলিপনার উপর ভোজন পাত্রাদি রক্ষিত রহিয়াছে। মধ্যে সুবৃহৎ আলিপনার উপর পূর্ণকলস, তদুপরি পুষ্পসম্ভার, ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আমরা নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করিলাম। কবি পুরোভাগে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। পরিবেশন আরম্ভ হইল। গৃহকর্ম্মী, কবির পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী অদূরে দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কবির গৃহের বালিকারা এবং সুধাকান্ত বাবু পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজ্যের বিপুল আয়োজনে আমরা বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম। বিবিধ ব্যঞ্জন, মৎস্য মাংস, পোলাও এবং মিষ্টান্নাদির সমাবেশ সকলের পক্ষেই গুরুভার হইয়া পড়িল। পরিবেশক পরিবেশিকাদের উপরোধ রক্ষা করা কাহারও পক্ষে আর সম্ভবপর রহিল না। এই বিপুল আয়োজনে এবং কবির আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রীতে ও কথাবার্ত্তায়, আমরা তাঁহার অভিজাত উদার হৃদয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম।

আহারে বসিয়া সদস্যদের মধ্যে কেহ বিশেষ কোন মন্তব্য প্রকাশ করা শোভন মনে করেন নাই, একরূপ বিনা কথা-বার্ত্তায় ভোজন পর্ব্ব সমাধা হইতেছিল। তবে দুইটী হাসির কথা, সেইসময় যাহা সকলে উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। গোড়ার দিকে উপেন্দ্র গাঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আহার্য্য দ্রব্যের প্রশংসা-কালে "ডালটা অতি উত্তম হয়েছে" বলিয়া ডালটার বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেন। আহারের শেষদিকে উপেনবাবু যখন সদস্যদের লক্ষ্য করিয়া

বলেন—"বড় দুঃখের কথা যে, শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা বইয়ের সংখ্যাই কম। জগতের নানা দেশের লোকেরা রাশি রাশি বই এখানে উপহার দিচ্ছেন, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রকাশকেরা ও গ্রন্থকাররা এখানে তাঁদের বই পাঠান কর্ত্তব্য মনে করেন না। কলিকাতা ফিরে গিয়ে এর যথাসম্ভব ব্যবস্থা আমরা করব।" সেই কথায় কবি সঙ্গে সঙ্গেই উপেন বাবুর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া উত্তর করেন—"ভালটা তা'হলে সত্যিই ভাল হয়েচে দেখচি!" কবির কথায় সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। দাদার এককালে 'ভাল খাইয়ে' বলিয়া সুনাম ছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বলশরীরে তিনি কিছুই সুবিধা করিতে পারিতেছিলেন না। শেষের দিকে যাহাই আসিতেছিল, তাহাতেই তিনি না বলিতেছিলেন। ভোজন পর্ব্ব শেষ হইলেই যেন তিনি নিস্তার পান। এমন সময় সুধাকান্ত বাবু আসিয়া বলেন, "দাদা আর কি চাই?" দাদা মুখ তুলিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"পালাবার পথ চাই!" শুনিয়া কবিবর ও সকলে হাসিয়া উঠেন। উত্তরটা কিন্তু সে সময় আমাদের সকলেরই মনের মত হইয়াছিল।

আহারের পর সদস্যগণ কিছুক্ষণ আবার কবিবরের সহিত আলাপের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সময় পুনরায় কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নামসহি সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। নামসহি সম্পর্কে একটি হাস্যকর ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। সভার অধিবেশনের পর, সুরুল যাত্রার পূর্ব্বে যখন ছাত্রীরা দাদাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, তখন তিনি বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দাদা চেয়ারে বসিয়া ঘাড় নিচু করিয়া লিখিয়া যাইতেছেন, ছাত্রীরা একটীর পর একটী খাতা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেছেন। দাদা নাম সহির সঙ্গে 'চির সুখী হও' 'ভাল মা হও' 'গৃহলক্ষ্মী হও' প্রভৃতি এক একটী আশীর্ব্বাণী লিখিয়া দিতেছিলেন। কাহার খাতায় কি লিখিতেছেন, তাহা ঘাড় তুলিয়া দেখার অবসরও তাঁহার মিলিতেছিল না। প্রথম দলের সহিত দাদাকে অগ্রে সুরুল পাঠাইয়া দিয়া, আমরা কয়েকজন গাড়ী ফিরিয়া আসার জন্য উত্তরায়ণেই অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেই সময় একটী ছাত্র আসিয়া বিষণ্ণমুখে অনুযোগ করিল যে, দাদা তাহার খাতায় "তুমি ভাল মা হও" এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া আমরা কেহ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উপেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন,—"তোমার পক্ষেত মা হওয়া সম্ভবপর নয়! তুমি এক কাজ কর! ঐ মা লেখার পাশে আর একটা মা লিখে নাও, তাহলেই অন্ততঃ নিজের শ্রেণীতে ফিরে আস্‌তে পারবে।" আমাদের মধ্যে একটা হাসির বন্যা বহিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বেই কবির মৃত্তিকানির্ম্মিত পূর্ব্ব বাসভবন "শ্যামলী"র ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পার্শ্বেই আবার "পুনশ্চ" নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত এরূপ সুন্দর বাসভবন পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। কবি বর্ত্তমানে 'পুনশ্চ'তেই বাস করেন। আহারের পর কবির সঙ্গে যাইয়া কয়েকজন এই দুইটী দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। আড়াইটার পর সদস্যগণ কবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া অতিথিশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

অতিথিশালার অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বেলা ৩টায় আমরা শান্তিনিকেতন হইতে বিদায়গ্রহণ করিলাম। বোলপুরে উপস্থিত হইতেই ষ্টেশনমাষ্টার সুরেনবাবু খবর দিলেন যে, আমাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট ঠিক আছে। যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে সুরেনবাবু নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত জিনিষপত্র উঠাইয়া দিয়া আমাদের সহায়তা করিলেন। ষ্টেশনে সুধাকান্ত বাবু এবং অনিলবাবুও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলের সৌজন্যমুগ্ধ আমরা তাঁহাদের বিদায় অভিবাদন জানাইলাম। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

এই প্রবন্ধের ফটোগুলি কলিকাতার প্রসিদ্ধ আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

গল্প নয়

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম্-এ

মিশনারী কলেজ।

ছোট ছোট বাগিচা, খেলা ধূলার মাঠ, সুইমিং ট্যাঙ্ক, প্রফেসর-কোয়ার্টার্স, ছেলেদের হোষ্টেল, মেয়েদের dormitory, গথিক ষ্টাইলে গড়া চার্চ প্রভৃতি জুড়ে কলেজের সুবৃহৎ কম্পাউণ্ড।

টেনিসকোর্টের পাশ কাটিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিরঞ্জন উপরের বারান্দার কোণটায় এসে দাঁড়াল।

—May I come in?

একবার, দুবার। কোন সাড়া নেই।

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। একটু ইতস্ততঃ ক'রে নীল পর্দাটা সরিয়ে সে ঢুকে পড়ল।

রোদে-ভেজা কুঞ্চিত কেশগুলো ছড়িয়ে ইজি চেয়ারে গুটি হয়ে শুয়ে একটি তরুণী। হাতে একটা magazine, পড়তে পড়তে ঘুমে কখন চোখ জড়িয়ে এসেছিল।

স্থাণুর মত নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে। গুরুতর অপরাধে কাঠ-গড়ার আসামী।

—Excuse me—

—আপনি কাকে চান্? বেশ সহজ স্পষ্ট সপ্রতিভ প্রশ্ন।

—Rev. Montier.

গালে হাত দিয়ে মেয়েটী কিছুক্ষণ ভেবে হেসে বল্লে—আপনি বোধহয় address ভুল করেছেন। তাঁর নাম ত কোনদিন শুনিনি—।

নিরঞ্জন পড়ল ফ্যাসাদে। address ভুল?…সেদিনও এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছে।

—Sorry, কিছু মনে করবেন না।

নিরঞ্জন দরজার দিকে এগিয়েছে।

—শুনুন্।…বাবা বোধহয় তাঁকে চিন্‌তে পারেন। আমরা এই কদিন হোল এখানে এসেছি।

—আপনার বাবা কোথায়?

—লাইব্রেরীতে।

নীচে সিঁড়ির কোণেই লাইব্রেরী। হঠাৎ চারপাঁচজন ছেলে হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে কথা কইতে কইতে বেরিয়ে গেল।

অনেকখানি সাহস নিয়ে সে ঘরে ঢুকেছে;

—কে?

কাঁচাবাঁশ ফাটার মত কঠিন আওয়াজ।

শীতের রাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়াচ্ লেগে নিরঞ্জনের সারা দেহ যেন কেঁপে ওঠে।

কী বিশ্রী চেহারা! কাল পাথরে গড়া একটা আস্ত বনমানুষ। মাথায় মস্ত টাক্, মুখে ঝুনো গোঁফ্, বয়সের গাছ-গাছড়া anthropologistদের ভাববার বিষয়।

ইনিই মেয়েটির বাবা Dr. Julian Ghosh. বই থেকে মাথা তুলে কালো goggles দুটোর ফাঁক দিয়ে নিরঞ্জনের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখ্ছেন।

—বসুন।

তারপর পরিচয় হোয়ে গেল মামুলী ধরণের। নিরঞ্জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টুডেণ্ট, Rev Montier-এর কাছে French lesson নিতে এসেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাহিরের রূপটায় ভদ্রলোকের সত্যিকারের মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আলাপ-পরিচয়ে অনেকটা ঘনিষ্টতা এসে পড়ল।

—আপনি প্রফেসর Stephen এর ষ্টুডেণ্ট?… আমারই, পুরান বন্ধু। Edinburgh য়ুনিভার্সিটিতে doctorateদেবার সময় একসঙ্গে থাকতুম। সে কি আজকের কথা—কতদিন হোয়ে গেল! * * *

নিরঞ্জন বলে—আজকাল আবার তিনি spiritualism নিয়ে বিস্তর নাড়াচাড়া ক'রছেন। "He is a true

thinker" বুঝ্‌লেন কি না, তবে "Life after Death," "Next World," এসব যেন আমাদের কেমন কেমন লাগে!

—হুঁ! এটাত তোমরা জান যে বেতারবার্ত্তার মতই কোন উপায়ে soulsদের ভেতরেও বাণীর আদান প্রদান হোয়ে আস্‌ছে।—

—তা বটে। পৃথিবীর অত বড় মনীষী Conan Doyle, Oliver Lodge প্রভৃতিকে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই।

—নিশ্চয়ই Annie Besantও সেদিন ওপার জগৎ থেকে message পাঠিয়েছিলেন। Spiritualistরা বলেন শুধু একটা জগৎ নয়, সাত সাতটা জগতের রূপ-রস-গন্ধটুকু উজাড় করে আমরা চলেছি সত্যের সন্ধানে। জান, জগতের কত বড় বড় পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এই spiritualism-এর ভক্ত!

নিরঞ্জন প্রশ্ন করে···Spirit রা এখানে আস্‌তে পারে?

ডাঃ ঘোষ বিজ্ঞের মত ঘাড়নেড়ে বল্‌লেন:—The dead are round about us, but we are mostly blind and deaf to them. Like the wireless waves which are also an affair of the aether they exist in the air—

নিরঞ্জন চুপ্‌।

বাহিরের রোদটা অনেকটা প'ড়ে এসেছে। ঘোষ সাহেব ড্রয়ারটা খুলে একরাশ কাগজপত্র বের কচ্ছিলেন। আলমারী-ভরা গাদা-গাদা বই, দেওয়ালে যীশুর নানাপ্রকার ছবি, একটা দামী বড় ঘড়ি। দিনের সব আলো ও বাতাস-টুকু বন্ধ কোরে সার্সীগুলো আড়াল ক'রে আছে। এই ঘরেই তবে যত সব অশরীরী জীবদের আনাগোনা হয়!—ভাবতেই নিরঞ্জনের প্রাণটা ছ্যাঁৎ কোরে উঠ্‌লো।

একখানা ভারী খাতা নিরঞ্জনের সাম্‌নে ধরে ডাঃ ঘোষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—এটা আমার রেকর্ড। Spirit কেমন দেখ্‌তে, তাদের পরিচয় সব খুঁটিয়ে এখানে লেখা আছে। Good spirits দের auraর জ্যোতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর evil spiritsদের aura খুব কুচ্‌কুচে কাল, তারা পাপী······আজকাল এদেশে Spiritualism নিয়ে কত লোকই মাথা ঘামায়। কিন্তু আমার মত কেউ বোঝে, না জানে?

—তা সত্যি।

—হুঁ, আমি জানি লোকে আমার সুখ্যাতি করে। কিন্তু আশ্চর্য্য হবে তুমি শুনে যে St. John কলেজের Principalটা আমায় পাগল ঠাউরে resign দিতে বাধ্য করেছিল। চোখের সাম্‌নে Spirit দেখাতে গেলুম, গোঁড়া পাদ্রী কিনা, Spirit বিশ্বাস করতে চায় না।

নিরঞ্জন আস্তে বলে—আচ্ছা, planchette—

চেঁচিয়ে ডাঃ ঘোষ বল্‌লেন—সর্ব্বনাশ! যত evil spirits নিয়ে নাড়াচাড়া। কখ্‌খনো কোরো না, একেবারে plain cheat!

ডাঃ ঘোষ পাইপ ধরালেন।

একটু জিরিয়ে বড় খাতাটা নিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে বল্‌লেন, পড়। এক দুই করে অনেকগুলি পৃষ্ঠাই সে পড়্‌ল। ছোট ছোট অক্ষরে মেয়েলী ছাঁদে চিঠিপত্র, Spirit-এর ঘটনায় পরিপূর্ণ Type-written কপি, দেশী ও বিদেশী কাগজে নিজের যাবতীয় article ইত্যাদি।

বৃহৎ খাতা থেকে অনেক কষ্টে এইটুকু সে উদ্ধার কর্‌ল, ডাঃ ঘোষ একজন নামজাদা Spiritualist। মায়া-নিবিড় সংসারের হাত থেকে যারা মরে বেঁচেছিল তাদেরও সুখের আশায় বালি। শুধু তাঁর একটু মাত্র ইঙ্গিতে, এই ছোট ঘরটায় অন্ধকার জীবদের ভরে উঠ্‌তে কতক্ষণ!

নিরঞ্জন খাতাটা ফিরিয়ে দিল।

বল্‌ল—অনেক কিছুই পড়্‌লুম। বেশতো একটা বই লিখে ফেলুন, তা না হলে লোকে কেমন করে এদের কথা জানবে?

-আমিও সেই কথাই ভাব্‌ছিলুম। সেই জন্যই আবার বিলেত যাচ্ছি।···আমার প্রিয়তমা Rosyর জন্মভূমি—

একটা অতীতের বেদনায় ডাঃ ঘোষের হাড়গুলো ন[illegible] উঠ্‌লো। অনেক দূরের পথ···কত অশ্রুভেজা ঝাপ্‌[illegible] স্মৃতি······

ডাঃ ঘোষ চুপ করলেন।

টেবিলের উপর রূপালী ফ্রেমে বাঁধা একখানা ফটো, বোধ হয় মিসেস্ ঘোষের ছবি। বিবাহের সময় তোলা, হাতে বড় একগোছা ফুলের তোড়া, পরণে সাদা আর পিঙ্ক রংঙের লং স্কার্ট।

—নিরঞ্জন—ভাঙা গলায় ডাঃ ঘোষ শুধোলেন।—Rosyর মৃত্যুর দিন বোকা পাদ্রী এসেছিল ধর্ম্মকথা শুনাতে।… Rosyকে দেখ্‌বে?

—না, আজ থাক্—

—ভয় পাচ্ছ?

ডাঃ ঘোষ চোখমুখ খিঁচিয়ে উঠ্‌লেন।

কোন উত্তর নেই।

চেঁচিয়ে বল্‌লেন,—মৃত্যুই চরম পরিণতি নয়। এর পরেও যে জীবন আছে, আমি, তা জেনেছি,—আমি……

ডাঃ ঘোষের বিকট হাসিতে ছোট ঘরটা কেঁপে উঠলো। মৌন পাথর হয়ে নিরঞ্জন হাঁ করে চেয়ে।

হঠাৎ ডাঃ ঘোষের হুঁস্ হল, চায়ের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

দুজনে চায়ের টেবিলে বস্‌লেন।

চায়ের পেয়ালায় একটু চুমুক দিয়ে ডাঃ ঘোষ বললেন,—মাসিয়ে মনটিগ্নার-এর ফ্রেঞ্চ ক্লাশ কেমন চলছে? গ্রামারের মত খুঁটিংনাটি…আর এক কাপ চা,—

নিরঞ্জন আপত্তি জানায়।

ডাঃ ঘোষ অবাক্। বল্‌লেন—দিনে কম করে ১৬।১৭ কাপ চা আমার চাই।

বেশ appetising—চাটুকু শেষ করে আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলেন।

অন্যমনস্ক ভাবে বয়ের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—জুলি কোথায়? এখনও যে চায়ে এল না? এ—ত দেরী—

—মিসি বাবা Y. M. C. A.—

একটু থেমে, আবার বল্‌লেন—গান বাজনা লেখা পড়ায় মেয়ে আমার marvellous—

টেলিফোনে কে একজন ডাক্‌ছে, নিরঞ্জনকে বস্‌তে বলে ডাক্তার ঘোষ উঠ্‌লেন।

চিলকোঠা আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্নের শেষ রোদ্‌টার ছোপ এখনও লেগে আছে।

দুটি মেয়ে এতক্ষণ টেনিস খেলছিল; এবার বোধহয় খেলা শেষ হল। দুটো টেবিলে ঘিরে ৭।৮টি চেয়ারে ছেলেমেয়েদের দল চা খেতে খেতে গল্প করছে।

শীতের সন্ধ্যা।

দূর দুরান্তে কাল ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ঝোপে ঝোপে আগত পাখীগুলির আনন্দ-কোলাহল, ঝিঁঝি পোকার শব্দ, একটা ছম্‌ছমে ভাব।

চেয়ারটায় বসে নিরঞ্জন আকাশ পাতাল ভাবে।… ডাক্তার ঘোষ পাগল, না,—

দরজাটা খুলে গেল। ডাঃ ঘোষ এলেন।

কাল স্যুট, কাল নেক্‌টাই, আরও কাল টপ্ হ্যাট।

আস্তে বল্‌লেন—আমার সঙ্গে এস—

এক জায়গায় এসে নিরঞ্জন থাম্‌ল।

কারপেট মোড়া ঘরটিতে কম করে দশবার জন বসে। একটা গুঞ্জন কানাকানি নিরঞ্জন ঘরে ঢুকতেই চুপ্ হয়ে গেল।

আজকের এই সন্ধ্যা-সভায় সে একজন important personage, সকলের গভীর দৃষ্টি তার প্রমাণ।

গম্ভীরস্বরে ডাঃ ঘোষ শুধোলেন—আজকের seance-এ নিরঞ্জনবাবু আমাদের medium। নিরঞ্জন—

এদের মধ্যে একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিরঞ্জনের আরও কাছে সরে এলেন।

—নমস্কার! এতদিন পর আপনার মত medium-এর দর্শন পাব এ আমার কতবড় সৌভাগ্য…শক্তি, সামার্থ্য, ভালবাসা আমরা কত কি না বড়াই করি; চোখের সামনে এমন সুন্দর ছেলেটি মারা গেল, বলুন—এ বুড়ো তাকে কি আট্‌কাতে পেরেছিল? শুধু বাপ্ হয়েই জন্মেছি। দিব্যেন্দু…

কান্নায় ভদ্রলোকের চোখের পাতা ভিজে এল।

—দাদা—

পাশের ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধস্বরে শুধোয়।

স্বপ্ন! শুধু অবাক্ নয় অভিভূতের মতন চুপ করে

নিরঞ্জন দেখে চলেছে তাকে নিয়ে এত বড় অভিনয়ের পালা।

একবার নিজের সত্যিকার পরিচয় দিয়ে এদের নিষ্ফল আশ'কে নিবৃত্ত করতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু সে তা পারেনি।

তুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভদ্রলোকটির কাঁধ ঘেঁসে বসে। ব্যাকুল হয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে। দাদা ফিরলেই বাড়ি নিয়ে যাবে। চঞ্চলতায় উস্‌খুস্ ক'রছে।

এত বড় মিথ্যা অভিনয়ের ভার মাথায় পেতে চুপ করে সে বসে। একটু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নেই; নিরঞ্জন যেন নির্জীব বোবা।

আলোটা কে নিবিয়ে দিয়েছে। ছোট্ট ঘরটা ঘন আবছায়ায় ডুবে। এখন দিব্যেন্দু এলেই হয়। সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

নিরঞ্জনের কানে আশ্বাস দিয়ে ডাঃ ঘোষ শুধোয় ভয়—ক'র না। Please একটু ঘুমতে চেষ্টা কর—

তুটো বৃহৎ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে তার কপালের রগ্‌গুলো চেপে ধরলেন। রক্ত চলাফেরার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। জলন্ত চোখে আগুনের ফিন্‌কি যেন পুড়িয়ে দেয়। নিরঞ্জন অবশ হয়ে আসে।

গম্ভীরস্বরে ডাঃ ঘোষ বল্‌ছেন—Sleep on! sleep on—দেয়ালের গায়ে সে হেলে পড়্‌ল।

—Hello—

একটি ফুটফুটে ছেলে নিরঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়াল।—চিন্‌তে পারছ না? আমি দিব্যেন্দু। বাবা মা সবই দেখছি এসেছেন…কি বল্‌লে? আমরা সুখী কি না?

তোমরাই বুঝি সুখে আছ! আমরা সকলেই শান্তির প্রয়াসী এবং সেইটিই এখানে এত প্রচুর…না, এ জগতের সব কথা প্রকাশ করবার নিয়ম নেই।

Laws of Natureকে অমান্য ক'রবে মানুষ? অসম্ভব!…তোমাদের কথা ভাবি কিনা? নিশ্চয়ই। কতবার তোমাদের কাছে আসি; বুঝতে পারি না তোমরা কেন চিন্‌তে পার না!…ঐ একটা spirit আসছে। [illegible] বিদায়…

হাস্‌তে হাস্‌তে কাল কুচ্‌কুচে একটি ছেলে হাজির হ'ল। ডাঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—Have you come

—Yes.

—বেশ, বেশ। তোমার পরিচয় একটু দাও।

—বিশ্বাস হচ্ছে না? Presidency College-এ পড়তুম—শ্যামবাজার অঞ্চলে বাড়ি—তিন চার মাস আগে মারা যাই বোকা ডাক্তার কিন্তু রোগ ধরতে পারে নি আমি যাই—

ব্যাকুলস্বরে দিব্যেন্দুর বাবা শুধোলেন—বাবা দিব্য এতদিন পরে এলি একটু ব'স; তোর মার তুএকটা কথা—

নিরঞ্জন চুপ।

কঠিন সুরে ডাঃ ঘোষ বল্‌লেন—Who are you?

উত্তর পেলেন—আমি Mrs. Ghose।

অন্ধকার ঘরে ফিস্ ফিস্ আওয়াজ।

—Evil sprit, I will kill you—

রাগে ডাঃ ঘোষের কালমুখখানা আরও বেগুনি হয়ে উঠে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিরঞ্জনের কপালটা চেপে ধরলেন লজ্জায় ও ঘৃণায় চোখের জলন্ত তারাগুলো কাঁপছে।

ঘরের আলো জ্বলে উঠেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় নিরঞ্জন মাথা তুল্‌তে পারছে না। কে যেন দশ মন হাতুড়ি পিঠ্‌ছে।

কিছুক্ষণ পরে চোখে মেলে দেখে একটি শুভ্র নরম হাত অডিকলোন জল দিয়ে কপালটায় বুলিয়ে দিচ্ছে।—এখনও কি যন্ত্রণা হচ্ছে? উঠ্‌বেন না, একটু ঘুমোন—

নিরঞ্জন নির্ব্বাক।—সে জুলি।

পাশের ছোট্ট ছেলেটি আব্দার করে বলে—কই বাবা দাদা এলনা?

কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন—আমি জানি সে আর আসবে না…

বেদনায় নিরঞ্জনের সারা অন্তর কেঁদে উঠে।

…সে আবার চোখ বুজল।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

শ্রীসুশীলকুমার বসু

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে অনেক অসামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং ইহাতে পূর্ব্ব ঘোষিত নীতি খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। কংগ্রেস বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না সর্ব্বপ্রকারে ইহার বিরোধিতা করিয়া ইহাকে অচল করিয়া তুলিবেন এই কথাই তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন এবং আলোচ্য প্রস্তাবেও তাঁহারা সে কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। এই নীতির সহিত মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কোন বিরোধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু, মন্ত্রীরা যতক্ষণ নূতন শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিবেন ততক্ষণ গবর্ণর যে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন না—অথবা মন্ত্রীদের পরামর্শ বাতিল করিবেন না তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার চেষ্টার সহিত শাসনতন্ত্র বর্জ্জন করিবার চেষ্টার সামঞ্জস্য কোথায় তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। যখনই নূতন শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবার কথা ইঁহারা স্বীকার করিতেছেন এবং গবর্ণর যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন সেই প্রতিশ্রুতি চাহিতেছেন তখনই একথা তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে অন্ততঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসনতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং শাসন তন্ত্রের মধ্য দিয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবেন। ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বঘোষিত নীতির অনুগামী নহে। আইন সভার মধ্য দিয়া গঠনমূলক কাজের ফলে আপাত লাভ হয়ত কিছু হইতে পারে কিন্তু, তাহা যে ভবিষ্যতের 'বৃহত্তর' লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে তাহা আমরা পরবর্ত্তী আলোচনাটিতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

কংগ্রেস যেখানে সম্ভব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এবং যেখানে সম্ভব নহে সেখানে না করিয়া যদি সর্ব্বত্রই বাধাদানের নীতির অনুসরণ করিতেন তবে ভারতবর্ষের সব প্রদেশে তাঁহাদের কর্ম্মনীতির ঐক্য থাকিত। কিন্তু আলোচ্য প্রস্তাব গ্রহণের ফলে যে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাধিক আছেন সে সকল প্রদেশে যদি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারা শাসন কার্য্য চালাইতে থাকেন এবং যে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাল্প সে সকল প্রদেশে তাঁহারা শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিতে থাকেন তবে একদিকে যেমন তাঁহাদের কার্য্যধারার ঐক্য নষ্ট হইবে অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন প্রদেশে শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হইবে।

যে নীতিতেই হউক, কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসীদল কিছুদূর পর্য্যন্ত সরকারপক্ষের সহিত সহযোগিতার সূত্রে এক হইবেন এবং অন্য কোন কোন প্রদেশে সরকার পক্ষের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ হইবে অবিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধতার। পৃথক ব্যবহারের মধ্য দিয়া এই উভয় দল সরকার সম্বন্ধে পৃথক ধারণায় উপনীত হইবেন এবং ইহার প্রভাব কংগ্রেসেও পতিত হইবে। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস আইন পরিষদের মধ্য দিয়া গঠনমূলক কাজ করিবেন সেকল প্রদেশের লোক কতকগুলি আপাত সুবিধা নিশ্চয়ই পাইবেন। এই সকল আপাত সুবিধার লোভ সাধারণ লোককে আকৃষ্ট করিবে। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিবেন সে সকল

প্রদেশ হয় এই সকল সুবিধা আদৌ পাইবে না অথবা কংগ্রেসের বিরোধিতা স্বত্বেও অন্য কোন বা কোন কোন দলের চেষ্টায় পাইবে। ইহাতে এই সকল প্রদেশে কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাইতে পারে না যদি সর্ব্বত্রই কংগ্রেস ছোট খাট সুবিধা লাভের যে ক্ষতি তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন তবে ইহার আশঙ্কা কমিয়া যাইত।

বাধাদানের নীতি

[আলোচনাটি কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মতিদানের পূর্ব্বে লিখিত। যদিও এখন কংগ্রেস কিছু পরিমাণে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে তবুও ছোট খাট সুবিধা গ্রহণের ফলে যে ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা হয় নাই। লেখক]

নূতন শাসনতন্ত্রের সহায়তা করিলে এবং ইহার মধ্য দিয়া যতটা সম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর কোন কিছুই যে ইহার মধ্য দিয়া করা যাইত না তাহা নহে এবং যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধতা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও যে এ কথাটা বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে। যদিও ইঁহাদের বিরোধিতার প্রকৃতিটা কি হইবে তাহা এখনও জল্পনার বিষয় রহিয়াছে।

কিন্তু, কোন কিছু কল্যাণকর কি অকল্যাণকর তাহা বিবেচনা করিতে গেলে তাহার সমগ্র ফলাফলের বিচার করিতে হয়। এই বিচারে যদি হিত অপেক্ষা অহিতের দিক ভারী হয় তবে, তাহার হিতকর অংশটার লোভ করিতে গেলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইবে; কারণ একটা অংশকে গ্রহণ করিলে অপর অংশটাও অস্বীকার করা যাইবে না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

এ কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই যে, যেসকল দুঃখ ও বেদনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে তাহাদের সকলের গোড়াতেই কোন মূলগত ত্রুটি আছে এবং আমাদের অভিযোগগুলি তাহারই এক একটা লক্ষণ মাত্র। যদিও মূলগত অসামঞ্জস্যের কথা ভুলিয়া এই সকল অভিযোগকেই আসল ব্যাধি বলিয়া আমরা ভুল করিয়া থাকি এবং পৃথকভাবে ইহার প্রত্যেকটির প্রতিকার সম্ভবও মনে করি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মূল কারণ দূরীভূত না হইলে ইহার কোনটিরই প্রতিকার সম্ভব নহে। যদিও একথাও মিথ্যা নহে যে, আমাদের যে সকল দুঃখ কষ্টকে মূল রোগের লক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইল, মূল কারণে হাত না দিয়াও ইহার প্রত্যেকটির প্রতিকারের চেষ্টা করিলেও ইহাদের আংশিক প্রতিকার হয়ত সম্ভব এবং ইহাদের প্রতিকারের চেষ্টা মূল কারণ হইতে আমাদের দৃষ্টি সরাইয়া না দিলে হয়ত মূল কারণের অপসারণেও ইহা সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু এই চেষ্টার ত্রুটি এই যে আপাত কিছু লাভের সম্ভাবনা আমাদিগকে লুব্ধ করিয়া তুলে এবং মূল কারণ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেশে সর্ব্বব্যাপী অশিক্ষা আছে। এই অশিক্ষা যে আমাদের সকল উন্নতির অন্তরায় অনেক দুঃখের মূল তাহা স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন। দেশে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার ঘটে এজন্য সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। শিক্ষা ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতির সহায়তা করে, লোককে মান মর্য্যাদা দান করে, আধুনিক জগতে আত্মরক্ষায় সক্ষম করে, লোকের এই বিশ্বাস আছে বলিয়াও দেশে শিক্ষার দাবী জাগিয়াছে। বিদ্যার যে একটা নিজস্ব মূল্য আছে, ইহা যে মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে ইহার আর্থিক মূল্য বাদ দিয়াও যে ইহার অন্য জাগতিক মূল্য আছে, এমন বিশ্বাস ত অনেক লোকের আছে। এইরূপ নানা কারণের সমবায়ে এটা লোকের একটা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে যে দেশের মঙ্গলের পক্ষে শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য্য। কাজেই যাহা শিক্ষার প্রসারকে কিছুমাত্র সহায়তা করিবে তাহা বহুসংখ্যক লোকের দ্বারা অভিনন্দিত হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের যদি নানাদিক দিয়া গুরুতর ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারে তাহা কিছু সহায়তা করিতে পারে তবে শিক্ষার অল্প কিছু প্রসারের দ্বারা লোককে মুগ্ধ করিয়া রাখা এবং ইহার সাহায্যে ক্ষতিকর দিকগুলি আবৃত করিয়া রাখা সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে।

আমাদের আগামী আইনপরিষদ সম্পর্কেও এই দৃষ্টান্তটির সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সভায় অবৈতনিক

সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস হইতে পারে। যদিও তেমন সম্ভাবনা নাই তবুও ধরিয়া লওয়া যাক যে ইহার জন্য নূতন কোন করও ধার্য্য হইবে না। এখন শিক্ষাবিস্তারের এই যে সুযোগ অনেকে ইহা ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন না এবং বলিবেন আরও ভাল জিনিস যাহাতে আমরা পাই, এমন কি স্বাধীনতা পাই তাহার জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকিব এবং বর্ত্তমান সুবিধাও গ্রহণ করিব। বরং এই সুবিধা ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে শিক্ষার যে প্রসার ঘটিবে তাহা মুক্তি-আন্দোলনকেও শক্তিশালী করিবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-শিক্ষা-প্রসারের কথা আমরা বলিতেছি এবং যাহার লোভ পরিত্যাগ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হইবে না, শিক্ষাসম্পর্কেও তাহা অনেকটা ফাঁদে পা দিবার মত কাজ করিবে। কারণ, শিক্ষাকে যদি সম্পূর্ণ কর ভারহীন ও অবৈতনিক করা এবং জনসাধারণকে ইহার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এমন কি আইন দ্বারা লোককে শিক্ষালাভ করিতে যদি বাধ্য করাও হয় তবুও, বহুল পরিমানে ইহা নিষ্ফল হইয়া থাকিবে। সমাজের যে স্তরে আজও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই সেখানে যে লোকে কি নিদারুণ দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট ভোগ করিতেছে এবং তাহা যে কতটা বহুব্যাপক তাহা যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের পক্ষে কল্পনাতীত। জীবিকার সংস্থানের জন্য যাহাদের পাঁচবৎসরের শিশুকেও কাজ করিতে হয়, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া বা কাজের ব্যর্থ চেষ্টায় যাহাদের অনশনে বা অর্দ্ধাশনে ৭ দিন কাটাইতে হয়, শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। শিক্ষাকে যদি আবশ্যিক করা যায় তবে হয় তাহাদের দারিদ্র্য বাড়িবে, না হয় উদরান্নের জন্য আরও বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। যদি আইনের সাহায্যে শিশুশ্রম রহিত করা যায় তবে, এই নিরন্নদের উপর অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা করা হইবে। এসব সত্ত্বেও যদি দেশের অধিকাংশ ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত করা যায় তাহা হইলেও এইরূপ ভয়াবহ দারিদ্র্যের অবস্থায় বিদ্যালাভ করা বা তাহা হইতে কোন প্রকার সুফল লাভ করা সম্ভব নহে। দারিদ্র্যের সহিত অশিক্ষার সম্পর্ক যেরূপ নিকট তাহাতে দারিদ্র্য দূর না হইলে অশিক্ষাকে কখনই দূর করা যাইবে না। অথচ, দারিদ্র্যের সহিত রাষ্ট্রিক অবস্থা ও আর্থিক বিধান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ইহার আমূল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি না হইলে কোনপ্রকার খুচরা ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে না।

অথচ দেশের অধিকাংশ লোকের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় বর্ত্তমানে নূতন শাসনতন্ত্র। কারণ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃত্রিম স্বার্থবোধের সৃষ্টি করিয়া, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া ও প্রগতি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া ইহা বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার আয়োজন করিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধী কাল্পনিক স্বার্থবোধ জাগ্রত করা ইহা ঐক্যের পথে যে বাধা সৃষ্টি করিবে এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ভিত্তিতে দলগঠনের পক্ষে যে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে তাহা আমাদের রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে একটা প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

ইহা যাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাদের স্বার্থ দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির বিপরীত দিকে। এদেশের জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হইয়াছে এবং তাঁহাদের সচেতনতা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। এই সচেতন জনমন সহস্রবিধ দুঃখদুর্দ্দশার ও হীনতার ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে। এবং সকলের প্রতিকারের জন্য তাহার দাবী ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এমন প্রমাণেরও আজ আর অভাব নাই যে এই সকল অভাব অভিযোগের সূত্র ধরিয়া, সকল অভাব অভিযোগের মূল যেখানে গণচেতনা সে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষার অভাবের সহিত দারিদ্র্য বেকার সমস্যা প্রভৃতির নিকট সম্পর্ক এবং ইহার সকলগুলির মূল কারণ দেশের অসঙ্গত রাষ্ট্রীক ও আর্থিক অবস্থা। এই উভয়বিধ ব্যবস্থার অনুকূল পরিবর্ত্তন না হইলে শিক্ষার সার্ব্বজনীন বিস্তার কখনই হইবে না। অথচ, এই মূল কারণটি অনেক পশ্চাতে থাকিলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যাঁহাদের

জ্ঞান আছে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেও সাধারণ লোকে এই পরোক্ষ কারণটা সহজে বুঝিতে পারে না। তাহাদের মনে শিক্ষা না পাইবার জন্য ক্ষোভ জাগে (অন্যান্য অভাব সম্বন্ধেও এই কথা সত্য) এবং শিক্ষা পাইবার জন্য তাহারা আন্দোলন চালাইতে থাকে এবং সকল ব্যবস্থার ক্ষমতা যাহার হাতে সেই শাসন ব্যবস্থার উপর লোকে অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। শাসন ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে থাকে তাঁহারা বুদ্ধিমান হইলে সম্ভবমত কিছু কিছু শিক্ষা পাইবার মত ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। ইহার ফলে শিক্ষার অভাবজনিত ক্ষোভ লোকের মন হইতে অনেক পরিমাণে চলিয়া যায় এবং অসন্তোষ জমিয়া শাসকদের স্পর্শ করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না, আমাদের অবস্থাও মোটামুটী এইরূপ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার কখনই সম্ভব নহে। তাহার জন্য যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নূতন শাসনতন্ত্রের আশ্রয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে এবং সাধারণের অসন্তোষকে দূর করিবার জন্য কিছু কিছু সুবিধা পাইবার সুযোগ দিতেছে। শিক্ষার কিছু বিস্তার এবং অভাব অভিযোগের আংশিক প্রতিকারের সম্ভাবনা এই সুযোগের অন্তর্গত। আমরা যদি শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আংশিক সুবিধা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হই তবে এই শাসনতন্ত্রের অসারতা লোকে বুঝিতে পারিবে না। কাজেই শিক্ষার সত্যকারের বিস্তার ও অন্যান্য অভাব অভিযোগের প্রকৃত প্রতিকারের পথ কোন দিন উন্মুক্ত হইবে না।

আমাদের পক্ষে এই সকল সুবিধা গ্রহণ করিতে যাওয়া এই কারণে আরও বিপজ্জনক হইবে যে অল্প যে সকল সুবিধা আমরা পাইব তাহার ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিরত মনোমালিন্য থাকিবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে আমাদিগকে শুধুমাত্র কৃত্রিম দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাই নহে; ইহা কাহাকেও কিছু কম, কাহাকেও কিছু বেশী দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিয়া এই বিভাগকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। আমরা যে সকল সুবিধা পাইব তাহাও অনেক স্থলেই এই পথের অনুসরণ করিবে এবং মনোমালিন্য বাড়াইয়া তুলিবে।

হয়ত অনেকে বলিবেন যে, দেশে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়াছে তাহার মূলেও ইংরাজী শিক্ষা পাশ্চাত্যের সহিত সংস্পর্শ এদেশে বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্ত্তন প্রভৃতির প্রভাব রহিয়াছে এবং এ সকলের মিলিত প্রভাব ব্যতীত এই রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ সকলও আমরা পাইয়াছি খুচরা সুবিধার মধ্য দিয়া এবং অন্য উদ্দেশ্যে কৃত জিনিষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া। অতীতে এই প্রকার জিনিষ গ্রহণ করিয়া যদি আমরা লাভবান হইয়া থাকি এবং তাহা আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনাকে চাপিয়া না দিয়া জাগ্রত করিয়া থাকে তবে বর্ত্তমানেই বা আমরা এই প্রকারে লাভবান হইতে পারিব না কেন। এই লাভ এখনও হয়ত হইতে পারে এবং এই সকল পরোক্ষ লাভের ফলে জাতীয় জীবনে যে শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহাও একদিন পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্রের অভাবে অসন্তোষ সঞ্চয় করিবে এবং রাষ্ট্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার আকারে দেখা দিবে। কিন্তু তাহা দীর্ঘ দিনের কথা। লাভ লোকসান সব সময়েই আপেক্ষিক। যেটা বেশী লাভের সেটা ছাড়িয়া কম লাভেরটা গ্রহণ করাকে ক্ষতিই বলিতে হয়। অতীতে যখন কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, তখন এই প্রকার পরোক্ষ উপায়ের উপর নির্ভর করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার চাপে সঞ্চিত শক্তি নষ্ট হইতে পারে।

একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইহার ব্যতিক্রম

ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে বাধা দান নীতি সম্পর্কে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে সম্ভবতঃ একটি মাত্র ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমেও সুফল পাওয়া যাইতে পারে। ছোট ভাল কাজের আবরণে বড় অহিতকে ইহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে বলিয়াই তাহার লোভ করিতে যাওয়া বিপজ্জনক হইবে। কিন্তু যাহা আমাদিগের স্বাধীনতাকে অপেক্ষাকৃত প্রসারিত করিবে সেই প্রকার কোন বিধান সম্পর্কে ঐ যুক্তি প্রযোজ্য নহে। আমাদের কোন রাষ্ট্রিক চিন্তা বা কার্য্য যাহাতে আমাদের শাসকদের অবাঞ্ছিত পথে যাত্রা করিতে না পারে তাহার দিকে

লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে অনেক নাগরিক অধিকার কখনও প্রদান করা হয় নাই এবং পূর্ব্ব প্রদত্ত অনেক অধিকার হইতে সম্প্রতি বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া সংঘবদ্ধ ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তা, কার্য্য, গতিবিধি বাক্য প্রচার প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আমাদের অধিকার নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এ সকলের যতটা প্রসার ঘটিবে আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির পথ ততটা বাধামুক্ত হইবে। এই জন্য অন্যান্য সুবিধাজনক বা হিতকর ব্যবস্থার সহিত ইহা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যাঁহারা বাধাদানের নীতি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা কি উপায়ে কাজ করিবেন এবং কি ভাবে বাধা দিবেন তাহা আজও জানা যায় নাই। অধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হইবে কি না, তাহাও অজ্ঞাত।

ইংরাজীর কৌলিন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পদবী-সম্মান-বিতরণ সভায় ছাত্র সম্ভাষণের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দুর্ভাগা দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে সেই দিনে স্বতঃ-স্বীকার্য্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়।" বাংলা দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়া উচিত এই সহজ সত্যটাকে যে বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইতেছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য কবি কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে, বলিতে গেলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মাতৃভাষাকে বরণ করিয়া লইবার স্বতঃ-স্বীকার্য্যতাকে আমরা অস্বীকার করিয়া চলিয়াছি। শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজী বর্জ্জনের বিরুদ্ধে যেসকল বিতর্ক উপস্থিত করা হয় এসব ক্ষেত্রে সে সকল বিতর্কেরও স্থান নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিনেটের সভা-সমিতির এবং অন্যান্য কার্য্যাবলী পরিচালনার জন্য বাংলাভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে। দেশের বহুবিধ বে-সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাদেশিক সকল প্রকার সভা সম্মেলন ও বৈঠকাদিতে বাংলাভাষা ব্যবহার না করা স্বাভাবিক নহে। সরকারী কাজকর্ম্মসমূহেও অনেক স্থানে বাংলা ব্যবহারের অসুবিধা নাই। যেসকল ব্যাপারের সহিত ভারতসরকারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই বা যাহার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ সে সকল স্থানে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার না হওয়া অস্বাভাবিক।

ইচ্ছা করিলেই ইহার সকল ক্ষেত্রে বাংলার প্রবর্ত্তন আমরা করিতে পারি না; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে যে পারি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং চেষ্টা করিলে ও আন্দোলন করিতে থাকিলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ দূরবর্ত্তী না হইতে পারে।

ইহার পথে প্রধান বাধা হইতেছে যে আলোচ্য ক্ষেত্রসমূহে বাংলা ব্যবহার না করিবার অস্বাভাবিকতা সম্পর্কেই আমাদের মন সচেতন নহে। অন্য প্রকার মৌখিক উক্তি সত্ত্বেও একথা সত্য যে ইংরাজীর কৌলিন্য ও নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে আমাদের মনের সংস্কার এখনও সুদৃঢ়। বাংলার ব্যবহারকে আমরাই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে অমর্য্যাদাসূচক বলিয়া মনে করিব এবং বাংলা প্রবর্ত্তনে বাধা দিব।

ইংরাজীর ব্যবহার যে বিদ্যাবত্তার পরিচয় এবং বাংলার ব্যবহার যে বিদ্যার অভাবের প্রমাণ এমন ধারণার হাত হইতেও আজও আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে এবং আমাদের সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টির পথেও ইহা বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের এমন বহু জিনিষ আছে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সুযোগ থাকিলেই, করা লাভের। ভারতের ও ভারতের বাহিরের অনেক বক্তৃতা ও আলোচনা প্রভৃতি মূল ইংরাজীতে পড়িবার প্রয়োজনও অনেকের হইতে পারে। কিন্তু এসকল অপরিহার্য্য ক্ষেত্র ব্যতীত আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজীতে দৈনিক যে লেখাপড়া করিয়া থাকেন তাহার পরিমাণ অল্প নহে। ইঁহারা এসকল কাজ বাংলায় চালাইলে বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার ও অনেক পুস্তকের কাটতি অনেক বাড়িয়া যাইত এবং ফলে সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি বৃদ্ধি পাইত।

ইংরাজীর কৌলিন্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আরও প্রমাণ আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিমুহূর্ত্তেই মিলিবে। কথাবার্ত্তা বলিবার সময় আমরা ইংরাজী শব্দ ও ইংরাজী বাক্য

বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা এজন্য করি না যে বাংলাভাষায় এই সকল শব্দের অভাব রহিয়াছে। ইংরাজী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারে বিদ্যা ও আভিজাত্যের প্রমাণ দেওয়া হয় এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ইহা করি। অনেক-স্থলে অবশ্য অভ্যাসের জন্য আমরা ইংরাজীমিশ্রিত বাংলা বলিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ অভ্যাসের উৎপত্তি হইয়াছে ইংরাজী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণা হইতে। কথাবার্ত্তায় এইরূপ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবার ফলে যে সকল শব্দের আমাদের নিত্য কথাবার্ত্তায় স্থান থাকা উচিত ছিল তাহারা অপ্রচলিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। অনেক সময় ইহাদের অনেকের অর্থবোধের জন্য ইংরাজী প্রতিশব্দ খুঁজিবার প্রয়োজন হয়। আধুনিক জগতের সহিত আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান পরিচয়ের সহিত অনেক নূতন শব্দের প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু ইংরাজীর সাহায্যে আমরা কাজ চালাইয়া লই বলিয়া তাগিদের চাপে যে নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতে পারিত তাহা আর হইতে পারে না। কথাবার্ত্তায় অত্যধিক ইংরাজী-শব্দের ব্যবহার এইরূপে শুধু যে আমাদের লজ্জার কারণ মাত্র হইয়া আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের অনেক অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ ঘটাইতেছে।

প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে প্রদেশিক ভাষার ব্যবহার

বাংলাদেশের অন্যান্য যে সকল ব্যাপারে বাংলাভাষা ব্যবহারের স্বাভাবিকতা ও উপযোগিতার কথা বলা হইয়াছে বাংলার আইন পরিষদে (এবং অন্যান্য প্রাদেশিক আইন পরিষদেও প্রাদেশিক ভাষা সমূহের ব্যবহার) বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ত তদপেক্ষাও বেশী। সহায়তা করিবার জন্যই হউক অথবা বিরুদ্ধতা করিবার জন্যই হউক সকল রাজনীতিকদলের লোকেরাই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন এবং এখানে তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগের ফল দেশের উপর অনুভূত হইবে।

ইংরাজীর জ্ঞান ভোটার হইবার পক্ষে আবশ্যকীয় নহে। কাজেই, কোনও সদস্য যে ইংরাজী জানিবেনই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ভোটার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইলে, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আরও অধিক সংখ্যায় আইন সভায় যাইবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজী না জানা সদস্য কেহ কেহ থাকিবেন, এমন সম্ভাবনা আছে। এবারও কেহ কেহ আছেন কিনা জানি না। ইংরাজী জানা যাঁহারা যাইবেন তাঁহারাও যে সকলে ইংরাজীতে বক্তৃতা, বিতর্ক প্রভৃতি করিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা প্রভৃতি করিবেন তাঁহাদেরও অনেকে যে ইংরাজী অপেক্ষা বাংলায় ভাল করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইংরাজীতে বক্তৃতা করাই প্রথা বলিয়া সুবিধা থাকিলেও কেহ বাংলায় বক্তৃতা করিতে চাহিবেন না কারণ, তাহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হ্রাসের আশঙ্কা থাকিবে। ফলে অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের পূর্ণপ্রভাব প্রয়োগ করিতে পারিবেন না এবং নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিবেন না। বাংলাভাষায় বক্তৃতা দিবার প্রথা যদি সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়ায় এবং ইংরাজী বক্তৃতায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহারা যদি বাংলায় বক্তৃতা করিতে থাকেন তবে বাংলা সম্বন্ধে অন্যেরা অধিকতর সাহস অবলম্বন করিতে পারিবেন।

যে সকল প্রদেশে একাধিক ভাষার প্রচলন আছে সে সকল স্থানে প্রাদেশিক ভাষা চালাইতে গেলে হয়ত কিছু কিছু জটিলতার সৃষ্টি হইবে কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে বাংলায় সে সম্ভাবনা নাই। বাংলায় এমন নির্ব্বাচনকেন্দ্র অল্পই আছে যেখানকার নির্ব্বাচনমণ্ডলীর সকলের বা প্রায় সকলের ভাষা একমাত্র বাংলা নহে।

আইন পরিষদের সরকারী ভাষা বাংলা হইলে, সরকার পক্ষের ইওরোপীয়ানদের এবং বাংলা প্রবাসী অন্যান্য প্রদেশীয়দের কিছু কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের লোক সম্পর্কে এইপ্রকার দোহাই এক ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য আর কোন দেশে চলিতে পারিত না। আমাদের দেশে যে এই ব্যবস্থা চলিতে পারে এবং তাহাকে আমরা অপরিহার্য্য মনে করি, তাহার মূলে আমাদের আত্ম অবিশ্বাস রহিয়াছে।

যথাযথ রাজনীতিক শব্দের অভাবের জন্য প্রথমতঃ বাংলভাষায় তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতাদির অসুবিধা হইতে

পারে। কিন্তু এইপ্রকার প্রয়োজনের চাপ হইতেই মাত্র ভাষার এই দৈন্য ঘুচিবে এবং প্রয়োজনীয় রাজনীতিক শব্দ ও বাক্যাংশ সমূহের সৃষ্টি হইবে।

বিদেশী ভাষা ব্যবহারের আরও একটা অসুবিধা

ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে, বিদেশীরা দেশের অধিবাসীদের ভাষা না জানিয়া তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার সুবিধা পান না। কিন্তু আমরা ইংরাজীর সাহায্যে বিদেশীর এই প্রয়োজন চালাইয়া দিয়া থাকি। বিদেশী যেখানে ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোক হন সেখানে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা কতটা সমান থাকে। কিন্তু যেখানে এই বিদেশী ইংরেজ (এবং যে সকল বিদেশীর সংস্পর্শে আমাদিগকে আসিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই বেশী) হন সেখানে ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজী জানিলেও কথাবার্ত্তায় মনের ভাব যথাযথ ভাবে চটপট প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। কাজেই কোন ইংরেজের সংস্পর্শে যখন ইহাঁদের আসিতে হয় তখন দৈন্য গোপন করিবার জন্য ইহাঁদের বোকা বলিতে হয়। ইংরাজী ব্যবহারের আংশিক অক্ষমতার জন্য ইহাদের কথাবার্ত্তায় যে জড়তা থাকিয়া যায় তাহা বুদ্ধির জড়তা বলিয়া বিদেশীর পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে যে সকল ইংরেজ চাকরী লইয়া আসেন সাধারণতঃ তাঁহারা উপরিওয়ালা হইয়া আসেন এবং অধীনস্থ লোকদের ত্রাসের কারণ হইয়া পড়েন। এই ত্রাস ভাষার অক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেয় এবং এই সকল বিদেশী এদেশীয়দের সম্পর্কে সত্য সত্যই খারাপ ধারণা লইয়া যান এবং ইহাঁদের মধ্য দিয়া সেই ধারণা অন্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ব্যক্তিগত অধিকারের একটা দিক

আইন পরিষদগুলিতে কংগ্রেসীদল নিরবচ্ছিন্ন বাধা দানের নীতি গ্রহণ করিবেন কিনা এবং করিলে সফল হইবেন কিনা, তাহা এখনও দেখিবার বিষয়। কিন্তু ইহাঁরা ব্যতীত সব প্রদেশেই সহযোগিতা করিবার লোক থাকিবেন এবং কোন কোন প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাধিক হইবেন। ইহাদের অধিকাংশ লোক বা দল নিজ নিজ বিশ্বাস এবং নীতি ও কর্ম্মতালিকা অনুযায়ী হিতকর কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহারা নির্ব্বাচনের সময় জনসাধারণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পালনের দায়িত্ব তাঁহাদের আছে তাহা ব্যতীত আরও বহু বিষয় তাঁহাদের বিবেচনা জন্য উপস্থিত হইবে এবং আরও বহু বিষয় তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের যে সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া আছে এবং যাহার সহিত সরকারের কোন সম্পর্ক নাই সে সকল ক্ষেত্রে ইহারা চেষ্টা করিলে সুফল পাইতে পারেন। তাহাতে নানাক্ষেত্রে কাজ করিবার ব্যক্তিগত অধিকার অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই সকল ক্ষেত্র অরাজনীতিক হইলেও ইহার ফল রাজনীতিক জীবনেও প্রতিফলিত হইবে।

আমরা সমাজে এই জন্য নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতা চাহিতে পারি না যে, তাহাতে প্রত্যহই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিতে পারে। প্রতি নিয়ত একজনের কার্য্য আর একজনের অধিকারের সীমার মধ্যে অবিরতই গিয়া পড়িতে পারে। এই জন্য রাষ্ট্রীয় আইন সামাজিক প্রথা লৌকিক আচার প্রভৃতির দ্বারা সব দেশের মানব সমাজই ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কাজের বা শৃঙ্খলায় জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতার যতটুকু মাত্র সঙ্কোচসাধনের প্রয়োজন সব দেশেই ব্যক্তি স্বাধীনতা তদপেক্ষা অনেক বেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে। সব দেশেই মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা সংঘ শক্তির সহিত লড়িয়া প্রসারিত করিতে হইয়াছে। ইহার কারণ সংঘশক্তির নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের হাতে পড়িয়াছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াই ইহারা নিজেদের অধিকারের সীমা বিস্তৃত রাখিয়াছেন।

কিন্তু, যে দেশে সভ্যতায় যত অগ্রসর যেখানে রাষ্ট্রশক্তি যত সুসংহত সেখানে সমাজের সংঘশক্তি ততই রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রকে সবদেশে

হিমাংশু ঘামিয়া উঠিল। দীপ্তি হাসিয়া শ্লেষের সুরে বলিল, "এইমাত্রই ত উনি বললেন যে, ওঁদের সম্বন্ধে আমার খুব খারাপ ধারণা, তা হলে পালাবেন না কেন?"

হিমাংশু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি বলেছিলুম এইমাত্র? কি বলেছিলুম? ওঃ ঐ কথা? তা মিথ্যেত কিছু বলিনি। যথার্থই কি আপনি মনে করেন না যে, আমি জীবন সংগ্রামে একটা মস্ত ফেলিওর?--খুবই হাল্কা? কোন কিছুতে মনস্থির করে কাজ করতে পারিনি?"

দীপ্তি গম্ভীরভাবে বলিল, 'আপনার সম্বন্ধে কে কি ভাবে না ভাবে, তাত দেখছি আপনি অনুমানে বেশ ঠিক করে ফেলেছেন!" পরে কিঞ্চিৎ শ্লেষভরে বলিল, "দেখছি এ বিষয়ে আপনাদের পুরুষদের আত্মম্ভরিতাটা খুবই বেশী, অথচ আপনারাই নারীদের আত্মম্ভরিতার দোষ দেখিয়ে প্রায়ই ঠেস দিয়ে কথা বলে থাকেন।"

হিমাংশুর আত্মসম্মানে কথাটা যেন চাবুকের মত কাটিয়া বসিল। সে যথাসাধ্য নারীর মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিয়া থাকে। মনে পড়িল, একদিন এই নারীই তাহাকে তাহার পিতার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া যারপর অপমানিত করিয়াছিল। সে কেন—কি যোগসূত্রে আবার তাহার সংশ্রবে আসিল? পিতার আদেশ? না,—কেবল তাহা নহে ত। তবে? এই গর্ব্বিতা অহঙ্কারদীপ্তা নারীর নিকট অপমানের কশাঘাত সহিয়াও তাহার সঙ্গলীপ্সা লোভনীয় বলিয়া মনে হয় কেন? এ দুর্ব্বলতা পুরুষের পক্ষে অমার্জ্জনীয়!

তীব্রকণ্ঠে কশাঘাতের উত্তরে হিমাংশু বলিল, "সত্যি কথা যদি বলতে বলেন, তা হলে বলতে হয় যে, আপনাদের আত্মম্ভরিতার সীমা পরিসীমা নেই। আমি মজদুর সমিতির হয়ে কি করি না করি, তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার অথবা তাই নিয়ে একটা হৈ চৈ করবার কি দরকার, তা ত বুঝতে পারিনি। যাক্, আমি চল্লুম—সন্ধ্যার আগেই আসবো'খন, রেখা যেন ঠিক হয়ে থাকে।"

হিমাংশু বহির্গমনের জন্য পদপ্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু দীপ্তি বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "দাঁড়ান। যখন কথাটা পাড়লেন, তখন তার জবাবটাও আপনাকে শুনে যেতে হবে।"

হিমাংশু বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রেখাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া উভয়ের দিকে ফেল ফেল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়াছিল। কিন্তু সে যথাসাধ্য অন্তরের ক্রোধ বহ্নি দমন করিয়া প্রশান্ত শ্লেষাত্মক সুরে বলিল, "দেখুন, আপনি মজদুর সমিতিতেই লেকচার দিয়ে বেড়ান বা তাদের জন্যে জেলে যান, তাতে আমার কেন, কারু মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই, অতি বড় মুখ্‌খুও একথা বলবে সন্দেহ নেই। এ কথাটা এর আগে নীহারের সঙ্গে আমার হয়েছিল। তারা আপনার নিজের লোক। তারা আপনার মজদুরের সঙ্গে এ রকম মেলামেশা ভালবাসে কিনা বলতে পারি না। তবে জেঠা মশাই—রেখার বাবা—এই সম্পর্কে তাঁর ডাক্তারখানা সম্বন্ধে আমার কাছে খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন বলে আমি এতে হয় ত একটু মাথা ঘামিয়েছিলুম। হতে পারে এটা আমার অপরাধ। কিন্তু সত্যিই বলুন ত, আপনার মত একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত প্রোফেসানাল মানুষের এমনি করে মুটে মজুরদের সঙ্গে হো হো করে বেড়ানটা কি খুবই ভাল, না ওটা আপনার প্রোফেসানের পক্ষে খুবই সুনামের জিনিষ?"

হিমাংশু রুদ্ধ ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইতেছিল। কথাটার শেষ পর্য্যন্তও সে ভাল করিয়া শুনিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দীপ্তির একটা কথা তাহার কর্ণকুহরে শেলসম বাজিতেছিল—"মুটে মজুরদের সঙ্গে হো হো করে বেড়ান।" স্পর্দ্ধার একটা সীমাও কি নাই? এই ধনমদগর্ব্বিতা, অহঙ্কারোদ্ধতা জমিদার কন্যার আজ যেমন করিয়া হউক চৈতন্যের উদ্রেক করিয়া দিবার অদম্য লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না। সে ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "বসুন। আপনি আমায় আজ অনেক কথা বলে ফেলেছেন, কাজেই আমার পক্ষ থেকে এর জবাবও শুনতে হবে—যেমন এই কিছু আগে আপনি আমায় জবাব শুনিয়ে দেবার জন্যে দাঁড়াতে বলেছিলেন। কথাগুলো খুব মিষ্টি লাগবে না বোধ হয়—তাতে রাজী আছেন?"

তাহার কণ্ঠস্বরও শ্লেষাত্মক।

প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "কি বলবেন বলুন,—মিষ্টি

অমিষ্টি সবই সহ্য করার অভ্যাস আছে আমার। ওমা রেখা, ঘুমে যে ঢুলে পড়ছিস ভাই, নে শুয়ে পড় ভাল করে সোফাটার উপর। হাঁ, কি বলতে চান বলুন।"

হিমাংশু বলিল, "বলতে পারেন, আপনারা কাদের পয়সায় মোটর চড়ে বেড়ান, কাদের পয়সায় জমিদারী চাল চালেন?"

দীপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন আমাদের নিজের পয়সায়। যা আমাদের বাপ পিতামো বুদ্ধি বিদ্যে খরচ করে উপার্জ্জন করে গিয়েছেন—তার উপর নির্ভর করে। আপনি কি বলতে চান, ডাকাতি করে পয়সা উপার্জ্জন ক'রে?"

হিমাংশু বলিল, "কতকটা তাই বটে। বাঙ্গলার কতক জমিদার যে ডাকাত ছিল, বোম্বেটে ছিল, ইতিহাসেই তার প্রমাণ রয়েছে। বারো ভুইঞারা কি ছিল? যাক্, আপনিই কি আর আপনার পূর্ব্বপুরুষরাই বা কি, এই মুটে মজুরদের উপর ডাকাতি করে জমিদারী ভোগ করছেন না? ওদের মাথার ঘামে যে টাকাটা ফসলের ভিতর দিয়ে বা কারিকরীর ভিতর দিয়ে উঠছে, তার পনেরো আনা কি আপনারা শুষে খাচ্ছেন না?—আর ওদের কি ফাঁকী দিয়ে আসছেন না বরাবর ওদের ন্যায্য পাওনা থেকে?"

দীপ্তি ঘৃণামিশ্রিত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ সব ত আপনার পুরো কম্যুনিজমের কথা। ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয় যে, এটা রাসিয়া নয়—এই বাঙ্গলার জমিদাররা ছিল দিকপাল, প্রজাপালক, তারাই বাঙ্গলার পথঘাট করে দিয়েছে, পুকুর কাটিয়েছে, সদাব্রত জলসত্র দিয়েছে, প্রজাদের তারাই ছিল জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আইন আদালত।"

হিমাংশু বাধা দিয়া বলিল, "থাক, ওসব ঢের শুনেছি। আগে কি ছিল, তা কেউ দেখতে চায় না, যা আছে তারই কথা হচ্ছে। আপনারা কি যাদের পিঠে চড়ে গাছের ডগায় উঠে ফল পেড়ে খাচ্ছেন, কাজ উদ্ধার হলে তাদের পায়ে ঠেলে ফেলে দেন নি?"

দীপ্তি বলিল, "তার মানে?"

হিমাংশু বলিল, "তার মানে এই যে, যাদের মাথার ঘামের পয়সায় আপনারা মোটর চড়ে বেড়ান, তারা ছেঁড়া টেনা পরে কোমর জলে দাঁড়িয়ে ফসল বুনে পাট কেচে বা মোট বয়ে দু'বেলা পেটের ভাত জোটাতে পারে কি না তা আপনারা দেখবার দরকার আছে বলে মনে করেন না।"

দীপ্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "জানেন আপনি যা বলছেন তার এক বর্ণও সত্যি নয়? ও সব বাইরে বললে আইনে ঠেকতে হয়? জমিদাররা যদি ভেড়ী বেঁধে না দেয়, বাঁধ বেঁধে না দেয়, পোল কপাট করে আবাদ রক্ষে না করে, ত কে করে? তারা যদি গ্রামের ঢুলি ব্যায়রা বাজীকর বাজনদার না পোষে, তবে তারা বাঁচতো কি করে? আপনার একটা কথারও যুক্তি নেই। যান!"

ক্রোধে দীপ্তির আর বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। সহসা হিমাংশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হস্তে তাহার করপল্লব দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া সমান ওজনে বলিল, "যাচ্ছি এখনি, কিন্তু যাবার আগে আমার কথাটা না বুঝিয়ে যাবো না। আমি বোধ হয় আগে একবার বলেছি যে, আমি যা চাই—আমি যা ধরি—তা না পেয়ে ছাড়িনে—আমার স্বভাবই হচ্ছে এই। আমি তোমায় আমার দিক দিয়ে কথাটা না দেখিয়ে ছাড়বো না। শুনবে না? চেয়ে দেখো আমার দিকে, দীপ্তি! চাইবে না? দীপ্তি, কেন বলদিকি আমায় ঘৃণা কর? আমি তোমার কি করেছি?"

দীপ্তি এজন্মে বোধ হয় এমন বিস্মিত ও শুম্ভিত কখনও হয় নাই। সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হিমাংশুর মুষ্টিবন্ধন হইতে তাহার হস্তদ্বয় মুক্ত করিতে পারিতেছিল না, অথবা দৃষ্টিও উন্নীত করিতে পারিতেছিল না, তাহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া কম্পিত হইতেছিল। হিমাংশুর করস্পর্শ অন্য সময়ে তাহার নারীত্বের আত্মসম্মানে আঘাত করিত—সে সাহসও হিমাংশু করিত না। কিন্তু আজ তাহার কি হইয়াছে? এ করস্পর্শ ত তাহাকে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা বিষণ্ণ অথবা অপমানিত করিতেছে না! এ স্পর্দ্ধার স্পর্শ তাহার সমগ্র অন্তরে এ কি অপূর্ব্ব পুলক—শিহরণ আনিয়া দিতেছে?

হিমাংশুর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "ও: কথা শুনবে না। আচ্ছা, তাই হোক। কিন্তু একটা কথা তোমায় শেষ বলে যাচ্ছি, হয়ত আর সুযোগ হবে না, দেখাও হবে না। নিজের দেশ, নিজের জাত, নিজের ভাই

বলে একটা কথা আছে, তা মানো ত? এই যাদের মুটে মজুর বলো?—তারা?"

দীপ্তি অস্ফুট স্বরে বলিল? "কে মানছে না?"

হিমাংশু বলিল, "এই তোমরা—যারা স্বদেশ স্বরাজ বললেই নাক উলটে থাকো।"

দীপ্তি এতক্ষণে মোহমুক্ত হইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "স্বদেশ, স্বরাজ? কোথায় স্বরাজ? ওটা যাদের কাছে শিখেছেন আপনারা, তারাই জানে ভাল। তারা স্বজাতকে কেমন ভালবাসে জানেন ত? কেবল স্বজাত কেন, তারা স্বজাত বিজাত সকলেরই গুণের আদর করতে জানে। জানেন না আপনারা, আপনারা জানেন মুখে বক্তৃতা করতে। ওদের গভর্ণমেণ্ট, চাকরেদের বুড়ো বয়সে বসিয়ে খেতে দেয়, ওদের মার্চ্চেণ্টদেরও পুরোণো অকর্ম্মণ্য চাকরদের বসিয়ে খেতে দেবার বন্দোবস্ত আছে। আর আপনাদের স্বরাজী-স্বদেশীদের? যাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিয়ে বড় হন আপনারা, অকর্ম্মণ্য হলে তাদের কমলা লেবু চুষে ছিবড়ের মত ছুড়ে ফেলে দেন বুড়ো বয়সে। এই ত আপনাদের স্বরাজ!"

হিমাংশু অতিমাত্র বিস্মিত হইল। সে বিহ্বলের মত বলিল, "একি কথা বলছো, দীপ্তি? তোমার মুখে একথা শুনবো বলে কখনও স্বপ্নেও মনে করিনি। তুমি ত আমার কথারই সায় দিচ্ছো। তোমরা জমিদাররা প্রজাদের অমনি করে ছিবড়ের মত ফেলে দাও বলেই ত আমার যত অভিযোগ অনুযোগ। সাহেবরা গুণের মর্য্যাদা করে, এ ত আমি স্বীকার করি। করে বলেই জগতে এত বড় হয়ে রয়েছে তাও জানি। তবে আমাদেরও সুযোগ দিতে হবে, একদিনেই ত সব দোষ যায় না। তোমরা জমিদাররা কেন পথ দেখাও না? তা না; তুমি আমায় মুটে মজুরদের মোড়ল বলে ঘৃণায় কেবল মুখ সরিয়ে নিচ্ছো।"

দীপ্তি অস্ফুটস্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ঘৃণা?"

হিমাংশু ব্যথিতস্বরে বলিল, "হাঁ, ঘৃণা। তুমি যদি জানতে, তোমায় আমি কত—থাক সে কথা, আমি যত ইতরই হই, যতই ছোট লোকের সঙ্গে মিশি, আমি তাদের আমার খুবই আপনার জন বলে মনে করি—এতে যদি"—

দীপ্তি এত কাঁপিতেছিল যে, সে বুঝি আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে সময়ে তাহার নেত্র-যুগলের অন্তরালে তখন যে নীরব ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল হিমাংশু যদি তাহা পাঠ করিতে পারিত তবে হয়ত এইখানেই আখ্যায়িকার যবনিকা পাত হইয়া যাইত। কিন্তু দীপ্তিময়ীর কম্পিত হস্তের স্পর্শে সেখানে তাহার প্রতি ঘৃণার অভি-ব্যক্তিরই সন্ধান পাইল। অভিমানাহত হইয়া সে তাহার করকমল বিষবৎ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিল। ঈষৎ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"তোমার আর আমার মধ্যে তোমার গর্ব্ব হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! যাক, দেখছি আমি তোমার ধারণা কিছুতেই উলটে দিতে পরবো না—তুমিও তোমার অহঙ্কার ছাড়বে না"—

দীপ্তিও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "আপনি ভুল বুঝেছেন, হিমাংশু বাবু। আপনার এখন বোধ হয় মাথার ঠিক নেই, নইলে এভাবে কথা কইতেন না। যাক, আমিও হয়ত আপনাকে ভুল বুঝছি। কাজেই আমাদের দুজনের এর পর কারু কথায় না থাকাই ভাল—।"

হিমাংশু আবার যেন এই দীপ্তিতে পূর্ব্বের সেই অহঙ্কার-দৃপ্তা তেজোগর্ব্বময়ী দীপ্তিকে দেখিতে পাইয়া মর্ম্মাহত হইল। ঈষৎ করুণ কণ্ঠে বলিল, "ওঃ ঝোঁকের মাথায় হয়ত আপনার মর্য্যাদা রেখে কথা কইতে পারিনি, সেজন্যে মাপ করবেন। হয়ত যা ভেবেছিলুম তা স্বপ্ন। যাক, আপনার কথাই থাকবে। এর পর আপনার আমার মধ্যে কারুরই কারুর কথায় থাকবার দরকারও বোধ হয় হবে না, কারণ হয়ত এইটেই আমাদের মধ্যে শেষ দেখা। আমি চল্লুম, আপনি রেখাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হিমাংশু চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও দেখিল না। দীপ্তি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বলিতে-ছিল কি না, সেই বলিতে পারে, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও নির্গত হইল না, তাহার দৃষ্টি কার্পেটের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

সোপানের উপর হিমাংশুর পদশব্দ যেন তাহার বিক্ষিপ্ত মনকে আঘাতের পর আঘাত দিতে লাগিল। হঠাৎ দীপ্তি

তাহার দুই বাহু প্রসারিত করিল। তাহার নয়নকমলে যেন বর্ষার বন্যা নামিয়া আসিল. চোখের জলে সে সমস্ত জগৎ যেন ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমাত্র প্রকৃতিস্থ হইয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিল, একি আশ্চর্য্য দুর্ব্বলতা। পূর্ব্বের মত মনের উপর সেকি আধিপত্য হারাইয়া ফেলিতেছে? পুরুষ গর্ব্বভরে বলিতে পারে, সে যাহা চাহে তাহা না পাইয়া ছাড়ে না, নারী কি তাহার ক্রীড়নক? কিন্তু তাহার অভিমানাহত ছল ছল নয়ন? দীপ্তির প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। দূরে—কতদূরে—সে চলিয়া গেল—মধ্যে রহিল দুর্লঙ্ঘ্য বিরাট অভিমানের ব্যবধান। এই কি বিধিলিপি? দীপ্তি টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

২১

কল্পনাদেবী যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বাস্তবে পরিণত হইল। যে মানুষ মনে গুমরিয়া মরে, আবদার অভিমানের অভিব্যক্তির স্থান পায় না, সে স্বভাবতঃ সহজ পথের পথিক হইলেও পরিণামে ভয়ঙ্কর পথের যাত্রীরূপে দেখা দিতে পারে। মন্মথনাথের অবস্থা হইল তদ্রূপ। সে ছিল স্বভাবতঃ সহজ পথের মানুষ, ভীরু ও কাপুরুষ; আরামের জীবন যাত্রাই ছিল তাহার স্বাভাবিক। অল্প বয়স হইতে সঙ্গ দোষে সে বিপথে যাইতে বাধ্য হইলেও যতটা সম্ভব পাপ ও প্রলোভনের পথকে ও তথা বিপদের পথকে এড়াইয়া চলিত। তাহার মনটাও ঠিক মিঃ সানিয়্যালের মত পোড় খাইয়া খাঁটি ইস্পাতের কাঠিন্যে পরিণত হয় নাই,—দয়া মমতা ন্যায় ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ তাহার মনের একটা কোণে একটু স্থান করিয়া রাখিয়াছিল।

কল্পনাদেবীর কুহকে পড়িয়া. এবং বাণীদেবী ও শশাঙ্ক মোহনের সরেশ সাহচর্য্যে থাকিয়া সে ক্রমশঃ ইস্পাতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল বটে, কিন্তু কল্পনাদেবীর স্নেহ আদরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতায় যখন 'মর্কট' শশাঙ্কমোহন আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া, তখন তাহার মনোভাবের গতির মোড় কতকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল, সে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিতই হিংসার জ্বালায় রাসবিহারী এভেনিউ-এর 'আর্টিষ্ট পার্টি'র' উপর বিরূপ এবং ভীষণ শত্রু হইয়া পড়িল। অবশ্য প্রকাশ্যে সে শশাঙ্কমোহনের প্রতি শত্রুতা করিতে ইতস্ততঃ না করিলেও তখনও কল্পনা দেবী অথবা বাণীদেবীর অনিষ্ট চিন্তা তাহার মনে স্থান লাভ করে নাই।

কিন্তু একদিন এমন অবস্থার উদ্ভব হইল, যে দিন কেবল শশাঙ্কমোহনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাহাকে সে চিন্তার পথেও অগ্রসর না করিয়া দিয়া ছাড়িল না। যে দিন শশাঙ্ক মোহন ষ্টুডিওতে তাহাকে মুষ্টির আঘাত করিতে নিজেই মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শশাঙ্কমোহন তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ককে মন্মথ নাথের সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত রাখিতে তৎপর হইলেন। তিনি ছিলেন সময় ও সুবিধাবাদী পাকা খেলোয়াড়। মন্মথ নাথের মত প্রকাশ্যে কোনরূপ ক্রোধ বা বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া ভিতরে ভিতরে এমন কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, অতিবড় বুদ্ধিমতী বাণীদেবী অথবা কল্পনাদেবীরও সাধ্য রহিল না সে চক্রান্তের কূট রহস্যজাল উদ্ভিন্ন করিতে।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, চন্দ্রমাধব বাবুর নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক কিছুদিন বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও ডাক্তার খানার বিলের যে হিসাব কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছিলেন না, তিনি আবার অতি অল্প দিনে অতি সহজে বিল আদায়ে গলদের অনেক সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন,—তাঁহার প্রধান অস্ত্র হইল দুই একখানি বিনামা পত্র।

যখন তিনি কেবলমাত্র ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশের হদিস পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ ডাক্তার হিমাংশু মিত্র কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন,—সুতরাং হিসাবের কার্য্যে স্বভাবতঃ বাধা পড়িল। চন্দ্রমাধব বাবুরও মনের মধ্যে একটা ওলট পালোট হইয়া গেল, তিনি সাময়িক ভাবে ডাক্তারখানার হিসাব শেষ করার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দিলেন এবং বাধ্য হইয়া ম্যানেজার মিঃ সানিয়্যালের উপর কিছুকাল বেতন দিয়া অন্য ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া ডাক্তারখানা চালাইবার ভার দিলেন। মিঃ সানিয়্যাল এবং বাণীদেবী ও কল্পনাদেবী এই সুযোগই অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। যে গাছটির সমস্ত শাখা প্রশাখায় কুড় পাড়িয়া

তাঁহারা প্রায় সার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এইবার সেইটির অবশিষ্ট ফলগুলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সরিয়া পড়িবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল। শশাঙ্কমোহন দিব্য অবসর পাইয়া বিষম উৎফুল্ল হইলেন এবং এখন হইতেই লভ্যাভাগের যোগ বিয়োগ কষিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার গণনায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল। যে মস্তিষ্কহীন মেরুদণ্ডহীন মন্মথনাথকে তিনি গণনার মধ্যেই আনয়ন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই, সেই মন্মথনাথ তাঁহার কল্পনারাজ্যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠার সমস্ত চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া দিল। মন্মথনাথ ঠেকিয়া শিখিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। বিশেষতঃ সে শশাঙ্কমোহনকে ঘরসন্ধানী বলিয়া সন্দেহ করিত। ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার বাবুও শশাঙ্কমোহনের কঠোর কর্ত্তৃত্বে মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাজেই তিনিও গোপনে মন্মথনাথের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। মন্মথনাথ তাঁহারই নিকটে ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহার বিলের টাকা তছরুপাত করার গুপ্ত কথা শশাঙ্কমোহনই বিনামা পত্রের দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিল। কারণ শশাঙ্কমোহনকে সে তথ্য আবিষ্কার করিতে প্রথমে কম্পাউণ্ডার বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ঘটনার যোগাযোগের এমনই বৈচিত্র্য যে, যাঁহারা একযোগে ডাক্তার হিমাংশুর সর্ব্বনাশের চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই আত্মকলহ উপস্থিত হইল।

মন্মথনাথ এখন মদ ধরিয়াছে। মদ যে সে খাইত না তাহা নহে, তবে অল্প স্বল্প। এখন কিন্তু নিত্য তাহার মদ না হইলে চলে না। এজন্য তাহাকে নিত্য কুসুমের দ্বারস্থ হইতে হইত, সে প্রায়ই রাত্রিতে বাড়ী আসিত না। বাড়ী বলিতে লেডি আর্টিষ্ট ও পামিষ্ট এবং লেডি ডাক্তার ও মিড-ওয়াইফের ষ্টুডিওকেই বুঝিতে হইবে, কারণ মন্মথনাথের বাড়ী বলিয়া মাথা গুজিবার অন্য কোন স্থান ছিল না। বাণী দেবী ইদানীং তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে একবারে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শশাঙ্কমোহন। কিন্তু কল্পনাদেবী ইহাতে আদৌ সম্মত ছিলেন না। কল্পনাদেবী জানিতেন যে, মন্মথনাথ তাঁহাদের চক্রান্তের মধ্যে থাকিলেও ছোট খাটো চুরি-চামারীর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল, শশাঙ্কের মত তাঁহাদের দেড়মনি কাৎলা গ্রেফতারের ব্যাপারে ছিল না; সুতরাং সে মরিয়া হইয়া তাঁহাদের চক্রান্তের কথা শত্রুপক্ষকে বলিয়া দিতে পারে; ধরা পড়িলে তাহার না হয় বড় জোর দুইমাস জেল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের হইবে সর্ব্বনাশ: জেল ত হইবে নিশ্চিতই দুই বৎসর, তাহার উপর ষ্টুডিওর সুনামের সহিত জুয়াচুরি ব্যবসায় জন্মের মত রসাতলে যাইবে; অতএব মন্মথনাথকে না ঘাটাইয়া যতটা সম্ভব বরদাস্ত করিয়া চলা যুক্তি সঙ্গত। বাণীদেবীও যে সে কথা বুঝিতেন না তাহা নহে, কারণ তিনি ছিলেন এই বৃহৎ কারবারের প্রধান মস্তিষ্ক; তবে তাঁহারও শশাঙ্কের মত কেমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, মন্মথনাথের মেরুদণ্ড নাই, সে সহসা কোনরূপ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। যাহা হউক, উভয় 'ভগিনীর' অনুমতি ক্রমে এখনও সর্ব্বদা ষ্টুডিওতে মন্মথনাথের অবারিত দ্বার ছিল। তবে তাহার আদর অভ্যর্থনার বহর সেখানে যে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল তাহা সে স্বয়ংই বুঝিতে পারিত।

ডাক্তার হিমাংশুর মানভূমের জঙ্গলে যাত্রার পর একদিন রাত্রিতে ষ্টুডিওর পরামর্শ কক্ষে তিনজনে গভীর পরামর্শ হইতেছিল। বলা বাহুল্য, সেই তিনজন বাণীদেবী, কল্পনাদেবী এবং মিঃ সানিয়াল। মন্মথনাথ তৎপূর্ব্বদিন হইতে গৃহে পদার্পণ করে নাই। এমন অনেক দিনই হইয়াছে সম্প্রতি। এবং সে জন্য অপর কাহারও মাথাব্যথা ছিল না।

ঠুনঠুন গেলাসের আওয়াজের সঙ্গে স্বাভাবিক স্বরেই পরামর্শ চলিতেছে। ভৃত্য-পরিজনের উপরের তলে থাকিবার হুকুম নাই, না ডাকিলে অথবা জরুরী কাজ না থাকিলে তাহারা কেহ দ্বিতলের সোপানে পদার্পণ করিতে সাহসও করে না। কাজেই ত্রিমূর্ত্তির প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

মিঃ সানিয়াল স্বভাবজ স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন, "এবার ? ওঃ এবার যে জাঁতিকল পেতেছি, বাছাধনকে তা থেকে আর হাড় কখানা নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। কি লাভলি ব্রেণ !"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "লাভলি ? কি লাভলি ?"

মিঃ সানিয়্যাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "লাভলি বুঝলে না ? এই ব্রেণের জাইগ্যানটিক স্কীম।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের মাথায় আঙুলের একটি টোকা মারিলেন।

উভয় ভগিনীই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "কি রকম ?"

মিঃ সানিয়্যাল আর এক পেগ গ্রহণ করিয়া প্রফুল্ল-মনে পা দোলাইয়া শিষ দিতে লাগিলেন। কল্পনাদেবী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কি ন্যাকামি করছো! হেঁয়ালিটা ভেঙেই বল না। ঐ ইডিয়টটাকে কলে ফেলতে আবার ব্রেণের দরকার হয় নাকি ?"

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, "বাই জোভ, একটু দরকার হয় বৈ কি! অনেক টাকা খরচ করে পাশের পর পাশ দিয়ে, অনেক মেডেল আর প্রাইজ পেয়ে ডাক্তার হয়েছে,—"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ওঃ তাই বল, ডাক্তার হিমাংশুর কথা বলছো, আমি বলি—"

মিঃ সানিয়্যাল বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি কার কথা ভাবছো ? দ্যাট পিগ হেডেড্ ডন্‌কি ? হাঃ হাঃ! ও সব চুনো পুঁটিতে সানিয়্যাল হাত দিয়ে ফর-নাথিং হাত নোংরা করে না। হাঃ হাঃ ঐ ফুল !"

বাণীদেবী বলিলেন, "ঠিক কথা! তোর যেন কি হয়েছে কল্পনা—তুই ঐ গাধা মোনোটার ভয়েই গেলি! আরে ওটার আছে কি ? অপদার্থ! হাঁ, কি মতলব ঠাওরেছো এবার ডাক্তারটাকে ঘাল করতে ?"

মিঃ সানিয়্যালের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি আর ধরে না। আপনার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দেখাইয়া তাহাতে আত্মপ্রসাদলাভ করে না কে ? হয় সে অতিমানব, না হয় দেবতা। মিঃ সানিয়্যাল আর এক পেগ চড়াইয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, "জানই ত, এর আগে ওদের ঐ মজদুর না কম্যুনিষ্ট না কি ন্যাষ্টি দলের ভিতর একটা ডিভিসন করে দিয়েছি—একদল তাদের বিপক্ষদলকে পেলে মার্ডার করতে পারে। হাঃ হাঃ! ওতে কি কম ব্রেণ খেলাতে হয়েছে! ওঃ !"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তারপর ? আঃ কেবলই গেলাসের জন্যে হাত বাড়াচ্ছো, অমন করলে ওসব তুলে ফেলবো বলে দিচ্ছি। আসল কথাটা পড়ে রইলো, কেবল পঁয়তাড়াই কসৃছো !"

মিঃ সানিয়্যাল উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চহাস্যের রোল তুলিয়া বলিলেন, "ওঃ হাউ হ্যাপি এন এক্‌স্‌প্রেশান! কি পঁয়তাড়া ? হাঃ হাঃ !"

তাঁহার রকম সকম দেখিয়া বাণীদেবীও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কল্পনাদেবী কিন্তু বিষম ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ সাট আপ! কি ওসব ভাল লাগে না! ডাক্তারের কি করলে বল—"

বাণীদেবী সায় দিয়া বলিলেন, "আর ডাক্তারখানার ?"

মিঃ সানিয়্যাল একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কথাটা কি জান, একেই ইডিয়ড্‌টা নিজের মরবার পথ নিজেই বানিয়েছে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজেই নিজেকে ব্যানিস্‌ড করেছে জঙ্গলে—আমার খুবই ডাউট্ হয়, ওর কেডিলাভের সঙ্গেও ওর একটা টিফ হয়েছিল—ওঃ ঐ একটা থরণ! উঃ একটা মিয়ার গ্যাল—কি জাইগ্যানটিক ব্রেণ !"

কল্পনাদেবীর মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া বাণীদেবী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হাঁ, জঙ্গলে ত গিয়েইছে, তারপর তুমি কতদূর কি করলে ?"

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, "ওঃ জানই ত ঐ ইডিয়ট ডাক্তারটার এগেনস্‌টে ওদের মজদুরদের ভিতরে একটা পার্টি খাড়া করা গেছে ? তা, বেহারে ঐ পার্টিটাই হয়েছে পুরু—ওরা সেখানে ওর এগেন্‌ষ্টে খুব প্রোপাগাণ্ডা করছে। ওরা মজদুরদের ভিতরেও বেহার ফর বেহারিজ স্লোগানের ধুয়ো তুলেছে। এরই মধ্যে নিউজ এসেছে, ওরা ওকে একটা মিটিংয়ে অপমান করে চেয়ার থেকে নামিয়ে দিয়েছে—তাই নিয়ে একটা ক্র্যাক্‌ডাউনও হয়ে গিয়েছে। এইবার ওরা ওকে সেক্রেটারীসিপ থেকে ডাউন করে দেবে বলে জঙ্গলের জমিদারদের ওখানে ফলো করেছে। ওরা নাছড়বান্দার দল,—একটা কিছু সিরিয়াস করবেই করবে।"

বাণীদেবী বলিলেন, "তাই নাকি ? তবে ত মজাই হয়েছে। ওটা যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, একটা কিছু না হয়ে যাবে না দেখছি।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "আর ফান্ অফ্ দি থিং এই যে, এই পার্টি ডিভিসনটা করিয়ে নিয়েছি তোমাদের ঐ নিরেট ডন্‌কিটিকে ইন্‌স্ট্রুমেন্ট করে। হাঃ হাঃ।"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "কাকে? মোনাকে দিয়ে? কি রকম?"

মিঃ সানিয়াল আবার নিজের মাথায় আঙুলের টোকা মারিয়া বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন, "থ্যাঙ্কস টু দিস ব্রেণ! ঐ ডনকিটাকে ভয় দেখিয়ে পার্পাস সার্ভ করে নেওয়া যদিও একটা মস্ত কাজ নয় এই ব্রেণের পক্ষে। কি জানি কেন, ওর রাগটা চড়েছিল আমার উপরে একবার ক্লাইম্যাক্সে তাই সে রাগটাকে ডাইভার্ট করে দিলুম দোসরা চ্যানেলে।"

বাণীদেবী বলিলেন, "অন্য চ্যানেল মানে ত ডাক্তার হিমাংশু?"

মিঃ সানিয়াল এক রাশ সিগারের ধূম ছাড়িয়া বলিলেন, "আরে না না, তা কেন? সে ত হ'ল কাঁচা কাজ; একবারে র'। ও যখন আমার উপর মারমুখো হয়েছিলো,—তখন ওকে বুঝিয়েছিলুম যে, আমাদের মধ্যে সিভিল ওয়ার হলে ডাক্তারের পার্টিই এড্‌ভানটেজ নেবে, তার চেয়ে ওদের পার্টিকে ডাউন করতে পারলে ডাক্তারটা ঐ নিয়েই এন্‌গেজড থাকবে, আমরাও ঐ সুযোগে কাজ গুছিয়ে নিয়ে গুড টাইমে সরে দাঁড়াবো—নইলে দুজনেরই নির্ঘাত জেল—একবারে কিংস গেষ্ট! হাঃ হাঃ!"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ও কি করলে? টোপ গিললে?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "ওঃ এক্সসিওর এজ-এনিথিং! ক্লাব ইডিয়ট কি না! ও বুঝলে ডাক্তার অন্য দিকে এন্‌গেজড হয়ে থাকলে জেলের ভয় থাকবে না, কাজেই মজুরদের ভিতর দল-ভাঙাভাঙিতে কোমর বেঁধে লেগে গেল। ও যে একেবারে জেটিতে এন্ট্রা কাজ করার কথাটা মিথ্যে বলেছে তা নয়, সত্যিই নাইট ডিউটিতে ও সেখানে কিছু কিছু পায়, তাতে মদের খরচ না চলুক, চাটের খরচ চলে যায়।"

বাণীদেবী বলিলেন, "তাতেই বুঝি জেটির মজদুরদের সঙ্গে ওর জানাশোনা হয়েছে?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "হাঁ তাই। কিন্তু গাধাটা ত জানে না, মজদুররা রাগলে কি অফুল হয়! লেটেষ্ট নিউজ জঙ্গলের কি, শুনেছো তোমরা? যারা ফলো করেছে ডাক্তারকে, তারা ওকে ঐ জঙ্গলের মধ্যেই নাকি এমন লেস্‌ন্ দেবে যাতে করে ওকে সিক্সমান্‌থস উঠতে হবে না—ওকি? কি একটা আওয়াজ হোলো না?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "কি আবার শব্দ হবে? গেলাসের পর গেলাস' খেয়াল দেখছো নাকি?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "গ্লাস? গ্লাসে কি হতে পারে? হাঃ হাঃ! বরং বটল হলে ছিল কথা"—

বাণীদেবী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বটলেই বা কি হবে? পিঁপে টিপে হলে বরং কিছু হতে পারতো। কি বল?"

মিঃ সানিয়াল অপরূপ কটাক্ষভঙ্গী করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ সাওয়ার অফ ফ্লাওয়ার এণ্ড স্যাণ্ডাল অন ইওর মাউথ দিদি! তোমার মুখে যা বেরুলো তা কি এই পুওরম্যানের কপালে জুটবে কখনও? একদিন না হয় চ্যারিটিই করে দাও না"—

কল্পনাদেবী বলিলেন, "সে তখন হবে'খন এক সময়ে। আগে ত দায় থেকে উদ্ধার হওয়া যাক্। এস, এবার ওঠা যাক।"

বাণীদেবী বলিলেন, "এরই মধ্যে? খাবে না কিছু?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "কেন, পেটে কি রাক্ষস এসেছে নাকি? এই ত সন্ধ্যার পর ক্লাবের এট্ হোমে এক পেট গিলে এলে"—

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "বাট হোয়াট এবাউট দিস্ পুওর ডেভিল?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ওঃ তাও বটে। তবে দরকার হবে কি আর কিছু বোতলের পর? ঘরে ত আজ খাবার বারণ—তা যাও না দিদি ওকে নিয়ে এভেনিউ হোটেলে—এখনও বন্ধ করে নি বোধ হয়।"

বাণীদেবী বলিলেন, "তুই যাবি নি?"

কল্পনাদেবী আড়ামোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "না, পেটটা ভার আছে। তুমি খাবে বল্‌ছিলে না? যাও, আমি শুইগে।"

মিঃ সানিয়াল বাণীদেবীর অনুসরণ করিতে করিতে

ফিরিয়া আসিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "ওয়েট ফর মি ডিয়ারি, আমি এখনই আসছি ফিরে, সো লং!" সঙ্গে সঙ্গে একখানি দশ টাকার নোট মিঃ সানিয়্যালের পকেট হইতে কল্পনাদেবীর হস্তে স্থানান্তরিত হইল।

কল্পনাদেবী আপনার শয়নকক্ষে গিয়া বিজলী বাতির সুইচ টিপিয়া কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। টেবিল-আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার কেশ প্রসাধন করিয়া লইলেন, তাহার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে একটি লোক নিঃশব্দপদ সঞ্চারে তাঁহাদের মন্ত্রণাকক্ষের পার্শ্বস্থ ষ্টুডিও রুম হইতে বাহির হইয়া সোপান বাহিয়া কয়েক পদ নামিয়া গিয়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে সোপানে জুতার আওয়াজ করিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল—সে মন্মথনাথ।

কল্পনাদেবী বিস্মিত হইয়া শয়নকক্ষ হইতে মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কল্পনাদেবী বলিলেন, "একি, তুমি কতক্ষণ? তোমার চোখ জবাফুলের মত লাল, চুল রুক্ষ;—খুব মদ খেয়েছো বুঝি?"

মন্মথনাথ গম্ভীরস্বরে বলিল, "হুঁ, মদ খেয়েছি!"

কল্পনাদেবী তাহার ভাবগতিক দেখিয়া ভীত হইলেন, বলিলেন, "ওকি, অমন করে চেয়ে রয়েছো কেন? কি হয়েছে তোমার?"

মন্মথনাথ দুইপদ অগ্রসর হইয়া কল্পনাদেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ উচ্ছ্বাস ও আবেগভরে কল্পনাদেবীর হাত দুখানি ধরিয়া গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিল, "বল কল্পনা, তুমি ঐ মর্কটটাকে আর ঘরে ঢুকতে দেবেনা—তুমি ত বলেছিলে, ওকে তাড়িয়ে দেবে—"

কল্পনাদেবী মন ভুলানো হাসি হাসিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "তা ত দেবোই মোনো—তবে আর দুচারটে দিন—"

মন্মথ আরও দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "না, আর একটা দিনও না। হারামজাদ শয়তান! উঃ পরম উপকারীর কি অনিষ্ট চেষ্টাই না করছে! ওর রক্তদর্শন না করলে শান্তি যায় না। উঃ!"

কল্পনাদেবী ঈষৎ উষ্ণস্বরে বলিলেন, "আঃ কি কর, হাতে লাগে যে! ছেড়ে দাও বলছি। লক্ষ্মীটি, আজকের মত ঘরে গিয়ে শোও, কাল মাথা ঠিক হলে"—

মন্মথনাথ বাধা দিয়া বলিল, "না, তা হবে না, আজই জবাব চাই, হয় ও থাকুক আমি দূর হয়ে যাই, না হয় আজই ওকে দূর করে দাও কল্পনা।"

কল্পনাদেবীর নজর তখন দেরাজের টানার উপর স্থির ছিল, সেখানে তখনও মিঃ সানিয়্যালের তাজা নোটখানা বিরাজ করিতেছিল। তিনি কপট ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন, "একি হুকুম দিচ্ছ আমাকে? জোর দেখাচ্ছো?"

মন্মথনাথ বলিল, "জোর না, অনুরোধ। এই তোমার পায়ে ধরছি কল্পনা, ঐ বদমাস জুয়াচোরটাকে আর ঢুকতে দিওনা বাড়ীতে, ও আমাদের সকলকে ফাঁসাবে, ওকে জান না, তোমরা—"

কল্পনা বিস্মিত হইয়া বলিল, "ফাঁসাবে? তার মানে?"

মন্মথনাথ বলিল, "সব জানো, তবুও না জানবার ভান কর কেন বুঝতে পারিনে। হিমাংশুবাবু—ডাক্তার বাবু—আমরা ওর যতই সর্ব্বনাশ করি না, ও আমাদের কি উপকার না করেছে বল দিকি? আমাদের কি বিশ্বাসই না করেছে ও? আর এই মর্কট তার যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে—এখন আবার প্রাণে মারবার চক্রান্ত করেছে—ওর সঙ্গে জড়িয়ো না কল্পনা—ওকে বিশ্বাস কোরো না—এখনও বলছি ফেরো। যা করেছো করেছো, চল এই বেলা আমরা ওর সম্পর্ক ছেড়ে কোথাও চলে যাই"—

কল্পনাদেবী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হুঁ। তারপর?"

মন্মথনাথ বলিল, "তারপর আর কি? আবার কোন খানে গিয়ে আমরা নতুন করে সংসার পেতে বোসবো—সেখানে শশাঙ্ক থাকবে না, পুলিসের ভয় থাকবে না, জেলের ভয় থাকবে না—"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "তা বলতে পারো বটে তুমি—তোমার ঐ ভয়টা খুব বেশীই বটে। কিন্তু ডান হাতের ব্যাপারটা চলবে কি করে বলত? দুবেলা সেটা যোগাবে কে তোমার আমার?"

মন্মথনাথ বলিল, "সে কোন রকমে জুটে যাবে—জীব দিয়েছেন যিনি আহারও দেবেন তিনি। কিন্তু এমন করে

ভয়ে ভয়ে আর দিন কাটাতে পারিনে।" তাহার পর অত্যন্ত মিনতি ভরা করুণ কণ্ঠে মন্মথ কল্পনার হাত ধরিয়া আবার বলিল, "চল কল্পনা, আমরা দুজনে এ পাপ পুরী ছেড়ে পালিয়ে যাই—"

কল্পনাদেবী হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলেন, "ইচ্ছে করে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে ত কেউ বলেনি তোমায়—ইচ্ছে করলেই ত তুমি সে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারো।"

মন্মথ বলিল, "কি রকম?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "ঘরের ঝগড়া বন্ধ করে আপনাদের মধ্যে ঠিক থাকলেই পারো। শশাঙ্ককে বিষ বলে মনে করো কেন? তুমিও যেমন, সেও তেমন, দুজনেই আমাদের কারবারের প্রাণ. কেউ ত ফেলনা নয়। আমাদের মধ্যে যদি মিল থাকে তা হলে কার সাধ্য কি করিতে পারে?"

মন্মথনাথ চীৎকার করিয়া বলিল, "মরে গেলেও তা' হবে না—ঐ মর্কট, ও কোথা হতে এসে জুড়ে বসলো—ওকে আমি লাথি মেরে দূর করে দেবো—ওকে আমি খুন কোরবো—ওর—"

অতিমাত্র উত্তেজনা বশে মন্মথর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কল্পনাদেবী তাহার ভাবান্তর দেখিয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলেন, বহুদিনের রুদ্ধ ক্রোধ আর সংযত করিতে পারিলেন না, ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ফণা উদ্যত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বটে? যত কিছু না বলি, তত স্পর্দ্ধা বেড়ে যায় বটে? এক ফোঁটা বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর? তুমি তাকে তাড়াবার কে এ বাড়ীতে? আমার যা খুসি তাই কোরবো. ইচ্ছে হয় এখানে এসো, না হয় চুলোয় যাও।"

রাগে গর গর করিতে করিতে কল্পনাদেবী শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। একদিন এমনি ভাবে তিনি শশাঙ্কমোহনকে বাড়ী হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন বাণীদেবী নিবারণ করিতে গেলে তিনিই মন্মথ হইতে ভয়ের কারণ আছে বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। আর আজ? মানুষের ক্রোধই পরম রিপু, ক্রোধের বশে মানুষ যদি ভুল না করিত, তাহা হইলে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানের সার্থকতা কোথায় থাকিত?

মন্মথনাথ মুহূর্ত্তকাল শয়ন কক্ষের দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিল, "এতদূর? আচ্ছা!"

সে আর ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল না, ঝড়ের মত নীচে নামিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আর একটি গৃহদাহ

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী এম্-বি

১

শরৎ চাটুয্যের "গৃহদাহ" পুস্তকখানির সম্প্রতি ছায়াচিত্র দেখিয়া আমার গৃহিণীর অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আর কিছুতেই পল্লীগ্রামে বাস করিবেন না।

আমি অনেক করিয়া বুঝাইলাম—পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে আজকাল বড় বড় নেতারা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশন পল্লীগ্রামে হওয়াতে পাড়াগাঁয়ের গৌরব সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, কিছুদিনের মধ্যেই ইহার গুণপণা টের পাইবে।

গৃহিণী সহুরে মেয়ে—খাস কলিকাতায় তাঁর বাপের বাড়ী; কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন, এবং যদিও দৈনিক "আনন্দবাজার" পড়েন, তবু সহরের প্রতি প্রীতি তাঁহার কিছুমাত্র কমিল না।

আজ তিন বৎসর হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে ইতিমধ্যে আড়াই বৎসর তিনি পিত্রালয়ে ছিলেন; মধ্যে একবার দুই মাসের জন্য এবং তারপর আর একবার একাদিক্রমে চারিমাস দেশে অবস্থান করিয়াছেন—কিন্তু মন টিকে নাই। কেন টিকে নাই, তাহারই ইতিহাস সংক্ষেপে বলিব।

যখন বিবাহ করি, তখন আমি বি-এ পড়িতেছিলাম, এবং কলেজের একটি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া পরিচিত ছিলাম। "ফিউচার প্রস্‌পেক্ট" আছে জানিয়া, এবং কলিকাতাস্থ আর কাহারও স্কন্ধে কন্যারত্নটির ভারার্পণ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, শ্বশুর মহাশয় আমাকেই উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিলেন। তখন আমিও নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করি নাই—বি-এটি ভাল করিয়া পাশ করিলেই, একটি ভাল রকমের চাকুরী পাইয়া যাইব, এ ভরসা আমার ছিল। কাজেই শ্বশুর শ্বাশুড়ী শ্যালক-শ্যালিকা মায় সে বাড়ীর বামুন চাকর পর্য্যন্ত যখন আমায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, তখন আমার সন্দেহ করাই বোকামি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, কেবলমাত্র অকর্ম্মণ্য হিন্দু ছেলে বলিয়াই যখন সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়াও একটি বৎসর শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস ব্যতীত অন্য কিছু কাজ জোগাড় করিতে পারিলাম না, তখন গৃহিণীর পিত্রালয়ের সকলেই আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু সন্দিহান হইয়া পড়িলেন।

নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত যখন এরূপ অবস্থায় শ্বশুর-বাড়ী এবং আফিস-বাড়ী টাল খাইয়া ফিরিতেছিলাম, সেই সময় একদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; অর্থাৎ আমি পঞ্চাশ টাকা বেতনে মার্চেন্ট আফিসে একটি চাকুরী পাইলাম। কিন্তু আশালতার (উহাই আমার স্ত্রীর নাম) আশা মিটিল না। কারণ পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলিকাতা বাস যে অসম্ভব, সেটুকু জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছিল

কহিলাম, "অয়ি, আশা কুহকিনী, এবার পল্লীবাসিনী হইবে চল। দেশের বাড়ীতে তুমি সকাল-বেলা রাঁধিয়া বাড়িয়া দিবে, এবং আমি ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করিব।—তারপর তোমার সুদীর্ঘ অবসর; বই পড়িয়া এবং গল্প-গুজব করিয়া কাটাইবে। ইচ্ছা করিলে দুই-চারিটি কবিতাও লিখিতে পার।"

সে-সময় বড় বড় কবিদের লেখা, এবং বড় বড় নেতা এবং অভিনেতাদের মুখে বলা পল্লী সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম;—সেগুলি তিনি মন দিয়া শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হইলেন।

২

আমাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে মাইল ত্রিশ, এবং গ্রাম্য ষ্টেশন হইতে মাইল তিনেক দূরে। দেশের বাড়ীতে আমার পরিবারে একমাত্র বৃদ্ধা পিসিমা ব্যতীত আর কেহ

নাই—একটি ঝি আছে, তাহারও তিন কুলে কেহ নাই, বয়সেও পিসিমার-ই মত; কাজেই উভয়ে খান, দান, গল্প করেন, এবং দিন কাটান।

এক্ষণে আরও তিন-টি প্রাণী জুটিলাম—আমি, আমার পত্নী আশালতা, এবং পুত্র চঞ্চলকুমার। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার "ফিউচার প্রস্‌পেক্টের" একটি সুফল ফলিয়াছিল—তাহা এই পুত্ররত্ন।

চঞ্চলকুমার তাহার মাতার অঞ্চল-নিধি। তাহার সম্বন্ধে যথাযথ বিধিব্যবস্থা করিতেই আমার শনি ও রবি বারের ছুটী ফুরাইয়া যায়; অন্য অন্য দিনগুলিতে ব্যবস্থা-পরিষদ বসে না, কারণ সকাল ৭টায় বাহির হইয়া ৮টায় ট্রেণ ধরি, ১০টায় আফিসে বসি, এবং কাজ সারিয়া রাত ন-টায় বাড়ীতে ফিরি।

প্রথম ধাক্কা খাইলাম—জলের ব্যবস্থা লইয়া। আমাদের বাড়ীর পিছনেই (এবং গ্রামের অনেকের বাড়ীর পিছনেই) একটি খিড়কীর পুকুর বা ডোবা, আছে। প্রত্যেকের বাড়ীতেই, জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত যাবতীয় জলের কাজ নির্ব্বিবাদে উহাতেই সুসম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আপত্তি তুলিলেন শ্রীমতী আশালতা দেবী। তিনি সহরে মেয়ে, উপন্যাস পড়িয়াছেন, কাজেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতে ওস্তাদ্‌। নিজের নালিশগুলি তিনি অনবরত খোকার নামে চালাইতে লাগিলেন। কহিলেন, "এ-জল যদি খোকা খায়, তো কলেরা না হয়েই হায় না, আর এতে স্নান করালেও তার সর্দ্দি-কাসি ও ম্যালেরিয়া অনিবার্য্য—অতএব, ভাল জলের জোগাড় কর।"

কোথা হইতে ভাল জল পাই? এস্থান হইতে দেড় মাইল দূরে অন্য-গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী,—তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নে তিন-টি টিউব ওয়েল গলাগলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু এ গ্রামে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রচলন হয় নাই। সনাতনী পুষ্করিণীর অনেক সুখ্যাতি করিয়া কহিলাম, "আমার পিসিমাতার চৌদ্দ পুরুষ এবং আমার পনর পুরুষ এই জল ব্যবহার করেছেন,—অতএব এই বিশুদ্ধ পানীয়ের প্রতি তোমার সশ্রদ্ধ ব্যবহার করা উচিত।"

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আশালতার নিকট কোন আশা ভরসাই পাইলাম না। অতএব, একটি লোক স্থির করিলাম,—সে প্রেসিডেণ্টের বাড়ীর টিউব-ওয়েল হইতে অন্ততঃ এক জালা জল প্রত্যহ সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

এই জলের কথা যদি জলের মতোই শেষ হইয়া যাইত তো কোন হাঙ্গামাই ছিল না। কিন্তু অচিরাৎ গ্রাম্য-সমিতির বৈঠক বসিল, এবং আমার পত্নী যে খিড়কীর পুকুরের প্রতি অসম্মান করিয়াছেন, এবিষয়ে প্রত্যহ ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ আসিতে লাগিল; দুঃখের বিষয় আমারই কোর্টে তাহার বিচার—এবং আমিও কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী ক্রমাগত দিন ফেলিতে লাগিলাম, এবং রায় প্রকাশ করিতে দেরী করিতে লাগিলাম।

গ্রামে দুই চারিদিনেই গৃহিণী "মেম সাহেব" আখ্যা লাভ করিলেন। ইহার একটি অতিরিক্ত কারণও ছিল; তিনি দুই একদিন পৈত্রিক স্যাণ্ডেল্ জোড়াটি পরিয়া পল্লী পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন। ইহাতে গ্রাম্য নরনারীর হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও উদ্বেগের সঞ্চার করিল। স্ত্রীলোকে যে জুতা পরার মতো অধর্ম্ম কাজ করিতে পারে, একথা তাঁহারা শুনিলেও অনেকেই স্বচক্ষে দেখেন নাই। যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করা মাত্র বহু লোকের ভোটে পরাস্ত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

দুই চারিদিন শ্রীমতী আশালতা গ্রাম্য বধূদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়া বুঝিলেন, সকলেরই প্রধান বক্তব্য বিষয় রান্না-বান্না; দ্বিতীয় বক্তব্য—শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতির মুণ্ড-চ্ছেদন। "আনন্দবাজারের" এবং "বিচিত্রা"র বিচিত্র সংবাদগুলি শ্রীমতী প্রকাশ করিতে গেলে, তাহা অকালে মিলাইয়া যায়। কাজেই তিনি দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণ-তালিকা ক্রমে ক্রমেই ছোট করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

৩

ইহার পরের চিত্রটি বড় করুণ। কারণ শ্রীমান চঞ্চলকুমারের অসুখ করিয়াছে—কাজেই গৃহিণীর চাঞ্চল্য বাড়িয়াছে, এবং আমাকে আরও বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামে যে-সব চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের চিকিৎসায় বিশ্বাস করিলেও চলে না, অথচ না করিলেও চলে

না। দুই মাইল দূরে একজন আধা পাশকরা ডাক্তার আছেন; তাঁহাকে কেহ আমোল দেন না, কারণ তিনি কল বসাইয়া জ্বর দেখেন এবং বুক দেখেন—অথচ গ্রামের চক্রবর্ত্তী-মহাশয় কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া রোগের সঠিক বিবরণ বলিয়া দিতে পারেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম করিতেই গৃহিণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং আমাকে একদিন অফিস কামাই করিয়া আধা-পাশকরা সুকুমার ডাক্তারের সন্ধানে যাইতে হইল। তিন দিন জ্বর-ভোগের পর শ্রীমানের সর্ব্বাঙ্গে হাম দেখা দিল; কিন্তু বুকে সর্দ্দি সাঁই-সাঁই করিতেছে।

এরূপ অবস্থায় পিসিমা কহিলেন, "মার অনুগ্রহ হয়েছে, এখন মার চরণামৃত খাওয়ানই ঠিক।"

বিজ্ঞ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন,—"এক মাত্রা করিয়া মকরধ্বজ খাওয়ানই শ্রেয়।"

আরও অনেকে অনেক রকম বলিলেন। কেহ কহিলেন, তেল-পড়া, কেহ কহিলেন জল-পড়া, কেহ কহিলেন হাত-চালা, কেহ কহিলেন অমুক পাতার রস, কেহ কহিলেন—হোমিও-প্যাথি।

গৃহিণীর জেদে পড়িয়া কোন ব্যবস্থাই টিকিল না। সেই সুকুমার ডাক্তারই আসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হাম থেকে নিউমোনিয়া—কাজেই বিশেষ চিন্তার কারণ।"

চিন্তার কারণ সম্বন্ধে কাহারও মত-ভেদ রহিল না। দিন-দিন খোকার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং গ্রাম্য সমালোচনাও রঙীন হইতে লাগিল। গৃহিণী ডাক্তারের সম্মুখেই ছেলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন, এবং রোজ এক পেয়ালা চা দিতেন। ইহাতে সুকুমারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল—তিনি একবারের স্থলে মাঝে মাঝে দুইবার আসিতে লাগিলেন; এবং গ্রামের লোকেরও উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল—কেন ডাক্তার দুইবার আসেন।

ডাক্তার সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ বক্রোক্তি যাহা শুনিলাম, তাহা গৃহিণীর নিকট প্রকাশ করাতে, তাঁহার মনটা দমিয়া গেল। রোগের উপশমও কিছু হইতেছে না, এবং নির্ভর করিবার মত ডাক্তার সুকুমারও নহেন। তিনি কহিলেন, "খোকাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া যায় না?"

সেরূপ ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা আছে সন্দেহ নাই। তিন মাইল পথ গোরুর গাড়ীতে যাওয়া, এবং তারপর রেলযাত্রী-দিগের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছান কিছু কষ্টকর—তারপর রাস্তার মাঝখানে যদি একটা কিছু হয়, তো কেহ দেখিবারও নাই।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "অমুক স্থানের বসন্ত-চিকিৎসক রাইচরণ কবিরাজ এবিষয়ে ধন্বন্তরী। তাঁহার হাতে পড়িয়া এপর্য্যন্ত কোন রোগীই ইহলোকের কোন কষ্ট পান নাই।"

অনেক চেষ্টায় গৃহিণী রাজী হইলেন। ধন্বন্তরী মহাশয় তিন চার দিন আনাগোনা করিলেন। রোগের স্বধর্ম্মেই হোক, কিংবা কবিরাজ মহাশয়ের গুণেই হোক, হাম মিলাইল বটে, কিন্তু জ্বর ও বুকের সর্দ্দি পাল্লা দিয়া বাড়িয়াই চলিল।

অবশেষে এক সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া এবং ধন্বন্তরীকে নমস্কার করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে পরদিন কলিকাতা যাওয়াই স্থির করা গেল। কিন্তু সেদিনকার শেষ রাত্রি আর কাটিল না। দেবীর ক্রোধে পড়িয়াই হোক, বা চড়া ওষুধের গুণেই হোক, খোকা বাঁচিল না। আহা, দিব্য ফুটফুটে ছেলেটি হইয়াছিল, ভাবিতে গেলে এখনও কান্না আসে!

৪

শ্রীমতী আশালতা নিরাশ হৃদয়ে কলিকাতা চলিলেন। আর যে কোন দিন তিনি গ্রামে ফিরিবেন, এমত ভরসা আমারও ছিল না, গ্রামবাসীর তো নয়ই; কিন্তু দীর্ঘ দেড় বৎসর পর আবার তাঁহাকে ফিরিতে হইল—কারণ ৫০৲ টাকায় কলিকাতার বাসা-খরচ চলে না, এবং পিত্রালয়েও মেয়ে জামাইএর চিরদিন থাকা পোষায় না।

এবার গ্রামে ফিরিলাম—কিন্তু সঙ্গে সেই চির-চঞ্চল চঞ্চলকুমার নাই। সুদীর্ঘ দিনের দীর্ঘ প্রহরগুলি গণনা করা ছাড়া শ্রীমতী আশালতার কোন আশা ভরসাই নাই। জলের বিশুদ্ধতা লইয়া এবার তিনি কোন ওজর আপত্তি তুলিলেন না, এমন কি খিড়কীর ঘাটের সহিত তাঁহার অসহযোগ নীতি অনেকটা শিথিল হইয়াছে দেখা গেল। তবু যেন তিনি কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

তখন বর্ষাকাল। বাইরের ঝটকা হাওয়ার সাথে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট খোলা জানালা দিয়া ঢুকিয়া শ্রীমতীর মুখ চোখ সিক্ত করিয়া দেয়!—তবু তিনি জানালাটি বন্ধ না করিয়া সুদূরবিস্তৃত খোলা মাঠের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলিয়া, কোন ভবিতব্যতার দিকে যে চাহিয়া থাকেন, তাহা তিনিই জানেন। কখনও কখনও দেশের আশা ভরসা স্কুল তরুণের দল বিপুল উৎসাহে গান গাহিয়া চলিয়া যায়, কখনও বা কোন চাষীর ছেলে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে পথ চলে,—গৃহিণী তাহা লক্ষ্য করিয়াও করেন না।

সেদিনকার রাত্রি আজিও ভুলিবার নয়। সন্ধ্যা হইতে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—চতুর্দ্দিক অন্ধকার। সেই দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিলাম। শ্রীমতী শশব্যস্তে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এমন করে' কষ্টভোগ করতে আর কিছুতেই দেব না—যেমন করে' হোক্, চল কলকাতায় যাওয়া যাক্, আমি যেমন তেমন করে' সংসার চালিয়ে নেব।"

আমি কহিলাম, "সেই ভাল"—

আহারান্তে অনেক আলোচনার পর স্থির হইল বেতন আরো কিছু বাড়িলেই, এ পোড়া-দেশ ছাড়িতেই হইবে। তন্দ্রাতুর ক্লান্ত নয়ন দুটি ক্রমে ক্রমে মুদিয়া আসিতে লাগিল; সেই সময় গৃহিণী একবার ডাকিলেন,—"ওগো"—

—"কেন?"

—"একটু দাঁড়াও না, আমি একটু বাইরে যাইব—"

আমি আলস্য ভরে কহিলাম, "আমি জেগেই আছি, তুমি ঘুরে' এস—"

পর মুহূর্ত্তেই, হঠাৎ "মাগো" শব্দের সে কি করুণ আর্ত্তনাদ! আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিলাম, দশবারো জন লোক (তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন পরিচিত) আমার স্ত্রীকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি ঝাঁপ দিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িলাম—কিন্তু পরক্ষণেই মস্তকে এক প্রচণ্ড লাঠির আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম, আর কিছুই জানিতে বা করিতে পারিলাম না।

যখন জ্ঞান হইল তখন তীব্র দিবালোক। ভীতিসঙ্কুল ছায়াচিত্রের স্বপ্নঘটনার মতো অস্পষ্ট অসংলগ্ন একটি কাহিনী মনে পড়িতেছিল, কিন্তু ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারিতেছিলাম না। অনেক কষ্টে চোখ মেলিয়া দেখিলাম, অদূরে প্রাঙ্গণের একধারে মৃতকল্পা ধূলিমলিন ছিন্নবস্ত্রা একটি নারী মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে—বুঝি আশালতা!

তারপর ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতে লাগিল—আধা পাশকরা সুকুমার ডাক্তার অভিজ্ঞ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলেই আসিয়াছেন। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তাহার শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয়, সামাজিক, অসামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারিবারিক ব্যবস্থার ফন্দ ক্রমাগত প্রস্তাবিত এবং প্রত্যাহৃত হইতে লাগিল। কিন্তু ভোটে একটি বিষয়ে সকলে একমত যে, আমার এবং আমার বধূর সহুরে আদব কায়দাই এ সমস্ত অনাচারের মূল কারণ। —প্রমাণ, আর কাহারও বাড়ীতে এরূপ ঘটনা কেন হইল না!

একটু সুস্থ হইলে অভিজ্ঞ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি উপদেশ দিলেন,—

"দেখ বাবাজী, মেয়েটাকে কোন রকমে বাপের বাড়ী ফেলে রেখে পালিয়ে এস, আর ওদিক মাড়িও না—এখানকার গাঁয়েরই একটি যোগ্য মেয়ের সাথে তোমার সম্বন্ধ আমি দু' দিনেই ঠিক করে' দিচ্ছি।"

আমি কহিলাম, "আপনার আদেশই শিরোধার্য্য—কিন্তু কোন প্রকারে কলকাতায় পার করার ব্যবস্থাটাই করে' দিন।"

ব্যবস্থা হইতে দেরী হইল না।

তার পরদিনই দুর্গানাম স্মরণ করিয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম এবং দুই চারিদিনেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটা ছোট-খাট বাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীমতীকে লইয়া একটি পুলিশ-কেস হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে বারোজনের মধ্যে দশজন খালাস পাইল —এবং দুইজনের তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল।

কলিকাতার ছোট্ট বাড়ীখানিতে, এই মামলার সূক্ষ্ম বিচার বিষয়ে "আনন্দ বাজারের" সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়িতে পড়িতে আমরা কাঁদিব কি রাগিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। সুখের বিষয় আমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া বড় সাহেব আমার বেতন দশ টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন—এবং আমার গৃহি[illegible] যাট টাকাতেই গৃহ সাজাইয়া তুলিয়াছেন।—কিন্তু সেই দিব্য সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি।—আহা, তাহার কথা মনে পড়িলে, চোখের কোণে পল্লীগ্রামের সুখের চিহ্ন দুই ফোঁটা জল জমিয়া উঠে!

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী
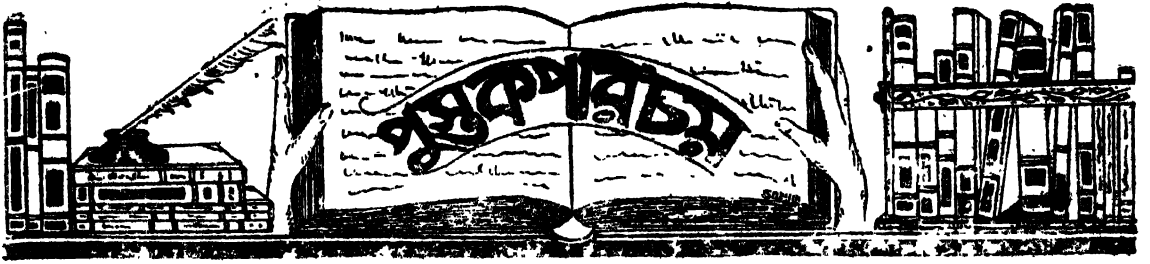
জীবনসঙ্গিনী—প্রথম খণ্ড—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অরূপের মূর্ত্তি ব্যঞ্জনায় যে আনন্দ, অন্তর্লোকের বাহ্য প্রকাশেও তাই—যে রূপ দেয় ষোল আনা তাহার হইলেও, দ্রষ্টারও কম নয়। খাদহীন আত্মকাহিনী আনন্দ-ধারার স্পর্শে দীপ্তিময়ী। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতি বাবুর গ্রন্থখানি এই পর্য্যায়ভুক্ত। সাধন-পথে পথিকের পূর্ব্বের পরিচয় ও পরের—অনাড়ম্বর ও সরল বর্ণনায় মধুর। সুরচিত সরস উপন্যাস পাঠে যে আগ্রহ ও আবেগ মনে বাসা বাঁধে, ইহাতেও তাহার প্রাচুর্য্য। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও প্রসাদগুণে বর্ণিত কাহিনী এক নিশ্বাসে শেষ করিতে প্রবল বাসনা জাগে। সাধারণ মানুষের ত্রুটী-বিচ্যুতি, দুঃখদৈন্য, প্রলোভনের মোহ এবং উচ্চস্তরের ঐশ্বর্য্য—পরোপকার-স্পৃহা, শ্রীঅরবিন্দকে প্রতিকূল অবস্থায় আশ্রয়দান, জীবনসঙ্গিনী পত্নীর প্রতি প্রথম জীবনে সাময়িক নির্ম্মম আচরণ এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠার বিবরণ মনে অকলঙ্ক ছাপ রাখিয়া যায়। মেকির সম্পর্কহীন বেদনা ব্যথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম ও সাধনামূলক আখ্যানের খাঁটী পরিবেশনে পুস্তকখানি বস্তুতই অনবদ্য। ইহা জাতক-গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধদেবের সাধন-জীবনে 'মারের' প্রলোভন-জাল বিস্তার প্রভৃতি বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অধিনায়ক রুশোর আত্মকাহিনীও মানসপটে ভাসিয়া উঠে, আর উঠে মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী।

বলা বাহুল্য, জীবনসঙ্গিনী গ্রন্থকারের অশেষ গুণবতী পত্নী—কি বৈষয়িক ব্যাপারে, কি সাধন-মার্গে আদর্শ সহধর্ম্মিণী। তাঁহারই পূত স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বিরচিত। বাংলা সাহিত্যে ইহা নূতন ধারার ইঙ্গিত দিয়াছে,—পাঠে পাঠকপাঠিকাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিবেন, অকপটে বলা চলে।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

টাকাকড়ি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। মূল্য ১॥০ টাকা।

পণ্যেই পুণ্য—অবশ্য ঐহিকের। পণ্যের দোসর টাকা। টাকার কথা লইয়া ধনবিজ্ঞান। এতকাল এই শাস্ত্র ছিল অনাদৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন—উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করিয়া। কিন্তু মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাস করিয়াই খালাস। দেশের শ্রী ও সম্পদ বাড়াইতে হইলে চাই সাধারণের মধ্যে ইহার ব্যাপক প্রচার। প্রচারের অন্তরায় সুলিখিত পুস্তকের অসদ্ভাব। গ্রন্থকার সেই অভাব মোচনের সহায়তা করিয়াছেন। এরূপ জটিল বিষয় সকলেয় বোধগম্য করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। রচয়িতা রবীন্দ্র বাবু সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল। আলোচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভাণ নাই। বিষয়বস্তু সুপরিস্ফুট ও সহজবোধ্য। টাকাকড়ির কাজ ও বৈশিষ্ট্য, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কৌশল, কাগজী মুদ্রা, ব্যাঙ্কের কাজ, বাজার দর, সরকারী কর্জ্জ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা ও গবেষণা ইহাতে আছে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। দুইশত পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

পল্লী-প্রদীপ (মাসিক পত্রিকা)—চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা। সম্পাদক—শ্রীনলিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

আকারে ছোট হইলেও সমাজ সংস্কারমূলক ইহার মন্তব্য-গুলি উপেক্ষনীয় নয়। প্রবীন ও নবীন লেখকদের রচনা ইহাতে থাকে। কবিতারা কিছু বাহুল্য। হুগলী জেলায় এই ধরণের মাসিক পত্রিকা আর নাই। আমরা ইহার স্থায়িত্ব কামনা করি।

রিয়্যালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা। নবজীবন সংঘ-এর ছাপানো। মূল্য একটাকা।

রবীন্দ্রনাথকে রিয়্যালিষ্ট বলতে শুনলে স্বভাবতই মনে একটু আতঙ্ক জাগে। কারণ, য়ুরোপের সাহিত্য জগতে 'রিয়্যালিষ্ট' এবং 'রিয়্যালিজ্‌ম্' আখ্যাগুলোর একটা বাঁধাধরা, বিশেষ মানে দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্য করে এই শব্দগুলোর অপপ্রয়োগ অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু বিজয়বাবুর বইখানি পড়তে সুরু করলে মনের আতঙ্ক দূর হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষার এমন একটা আকর্ষণশক্তি আছে যে পাঠক সহজেই ভুলে যায়, সাহিত্য-বিচার পড়ছি। বইখানির মধ্যে কবির 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'বাঁশরী', 'চার অধ্যায়', এবং 'শেষের কবিতা'র বিচার আছে। লেখক বলেছেন, 'এবারে কবির লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেবল মনোসিকলনতত্ত্বের দিক থেকে।' কিন্তু বইখানি পড়তে পড়তে কেবল তত্ত্বান্বেষী বিজয়লাল নয়—কবি বিজয়লালেরও সন্ধান মেলে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বইখানি স্থান পাবে,—আশা করি।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

লাফিং গ্যাস—শ্রীবিমল দত্ত, এম-এর লেখা। চারু সাহিত্য-কুটীর-এর ছাপানো। মূল্য আট আনা।

বইখানি ছেলেদের জন্য লেখা। তারা পড়ে খুব আনন্দ পাবে। সাধারণতঃ, এ ধরণের শিশুপাঠ্য বইয়েতে অন্যদেশের ছাপ দেখা যায় কিন্তু এই বইখানির কায়া বিদেশী গল্পের ছায়া দিয়ে রচনা করা হয়নি। তাই এর হাসি যেমন ঝরঝরে তেমনি মিষ্টি। শিশুসাহিত্যে লেখকের প্রতিষ্ঠা হোক্—কামনা করি।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ছন্দ-বীণা—শান্তি পাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

লেখক বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে ইহার দুখানি কবিতা পুস্তক পাঠক সমাজকে আনন্দ দান করিয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তকে উনিশটা কবিতা আছে, সবগুলিতেই আমরা পাই গতির একটা সজীবতা ও সুন্দর সুনিপুণ খেলা। প্রথম কবিতা 'মাতন' ছন্দের দিক হইতে যেমন গতিশীল, ভাষার সহজ ও সরল ভঙ্গিতে তেমনি হৃদয়গ্রাহী। লেখক বিখ্যাত সাঁতারু, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে জীবনের অন্যপথে ইনি যেরূপ সাহস ও ক্ষিপ্র বিচার-ক্ষমতা প্রকাশ করিবার যোগ্যতা রাখেন বা রাখিতে অভ্যস্ত, কবিতা রচনার মধ্যে সে সাহসের খানিকটা না আসিয়া পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :—

আজকে কি বার?
—বেষপতি বার,
ফিফ্‌টিন্ হানড্রেড মিটার শেষ?
তাই বুঝি আজ পুকুর পাড়ে
হাজার লোকের সমাবেশ?
ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে—
কষ্টুম পরে সাঁতরে সাজে
কলার-ডেকো, ডেকেই সারা!
—মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কারা?
—জাজেস্ যারা?

এই কয়েকটী ছত্রের মধ্যে এমন একটা সলীল স্বাচ্ছন্দ প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাকে শুধু সাহস বলিলেই যথেষ্ট বলা হইবে না, ইহা ছন্দের উপর সহজ অধিকারেরও পরিচায়ক। স্পোর্টস-এর কবিতা হিসাবে এইটী ও "সাত মাইল" কবিতাটি

সত্যই বড় ভাল লাগিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ ব্যাপার লইয়া কবিতা রচনা করিতে কেহ অগ্রসর হয় নাই বলিয়াই যে ইহার নূতনত্ব তাহা নয়, তাহাকে লইয়া তিনি যেরূপ খেলাইয়াছেন, তাহা নিপুণ খেলোয়াড়ের কাজ।

প্রকৃতিকে দেখিবার চোখ লেখকের আছে। এই পুস্তকের অনেকগুলি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাল বোশেখী' 'বরষায়' 'পল্লীবর্ষা' কবিতাগুলিতে পল্লী প্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষন ও সরল বর্ণনা লেখকের মনের আর একদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। শুধু ফটোগ্রাফি নয়, প্রকৃতির সংস্পর্শ কবির মনে যে ধরা ছোঁয়ার অতীত একটী অনির্দ্দেশ্য অনুভূতি জানাইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুটী লাইনে—

'এই ধান ক্ষেত এইখানে এলে সব কথা ভুলে যায়
রাখাল কিশোর বাঁশরী হারায়ে বাউলের মত চায়।'

আশা করি বাংলায় পাঠকসমাজে এই কবিতাগুলি আদৃত হইবে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে যা জানা দরকার

ডাঃ আর, বিশ্বাস

খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য ভিষকগণ যক্ষ্মারোগের সহিত পরিচিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই রোগের নিদান, নির্ণয় ও উহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশবিষয়ে য়ুরোপে কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লেনেক (Laennec) শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া এ ব্যাধি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার মতে ফুস্‌ফুসে্ দানা (Tubrcle) হইতেই টিউবার কিউলো-সিস নামের উৎপত্তি। পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পণ্ডিত কক্ (Koch) যক্ষ্মাবীজাণু আবিষ্কার করিয়া যক্ষ্মারোগের কারণতত্ত্ব মীমাংসা করেন। আমাদের দেশেও প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র—যেমন চরক সুশ্রুতে এই ব্যাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যক্ষ্মার প্রাথমিক লক্ষণগুলি আমাদের জানা থাকিলে আমরা প্রথমাবস্থায় সাবধান হইতে পারি। ভারতীয় প্রাচীন ভিষক, গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস, একই শয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন, একই বস্ত্র পরিধান, অতিরিক্ত স্ত্রী সংগম, অতিব পরিশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়, এরূপ কারণ দর্শাইয়াছেন। বড় বড় সহরে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহুলোকের একত্রবাস, দুর্গন্ধ, দূষিত ধূলিশ্বাস গ্রহণ, পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ, রোগ গোপন করিয়া বিবাহ, রোগগ্রস্ত পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীর সাহচার্য্য রোগ সংক্রামণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। দূষিত বাসন পত্রদ্বারাও রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে।

যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইবামাত্র আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অল্প অল্প কাশি, সন্ধ্যাকালীন জ্বর, বক্ষে বেদনা, অল্পতে ক্লান্তি বোধ, শরীর ক্ষয়, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ দেখা মাত্র বিজ্ঞানসম্মত মতে চিকিৎসা করা উচিত। প্রথমেই চিকিৎসা আরম্ভ করিলে এ ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। য়ুরোপে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইলে, সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত গবেষণাগারে সিরোলিনের প্রথম আবিষ্কার হয়। অধুনা সুইজারল্যাণ্ডের ও অন্যান্য যক্ষ্মানিবাসে সিরোলিন প্রতিষেধক ও রোগনাশক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হইতেছে। বিজ্ঞ-চিকিৎসকমণ্ডলী যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় সিরলিন রচি ব্যবস্থা দিয়া বহু নরনারীকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

যক্ষ্মারোগের নির্ম্মম পেষণ হইতে জাতীকে মুক্ত করিতে হইলে দেশের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে দেশের জনসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া দেশ ক্রমে গৌরবময় হইয়া উঠিবে।

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ কল্প—তিব্বত

বহু শতাব্দী ধরে অন্যান্য জাতির কাছে অপরিচিত এই রহস্যময় দেশে এবং এর রুদ্ধদ্বার রাজধানী লাসা নগরীতে বাহিরের লোকের প্রবেশ অতি দুঃসাধ্য ছিল। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলে যেন পথিকের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। চিরতুষারে আচ্ছন্ন এই দেশের আয়তন প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল। গড়ে ১৫০০০ ফুট উঁচু এক বিস্তীর্ণ মালভূমি তার চারিপাশে দুর্লঙ্ঘ্য বিশাল পর্ব্বতমালার প্রাচীর, এই হচ্চে এর চেহারা! সেই তিব্বত প্রদেশে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হোল এই নাথু-লা হতে। মনের উল্লাসে পার্ব্বত্য ব্যাধির কথা ভুলে গিয়ে আমরা ছয়টি বাঙ্গালী অশ্বতর ছেড়ে পদব্রজে তিব্বতের প্রবেশ পথে যাত্রা করলাম। নাথু-লার আগে যেমন দুই মাইল পথ একেবারে খাড়া উঠতে হয়েছিল, তিব্বতের দিকেও তেমনি একেবারে সোজা নীচে নামতে হোল, এক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর তীর অবধি। প্রায় ১০০০ ফুট এই রকম অত্যন্ত বন্ধুর পথে নেমে, আবার মিউলে চড়লাম,—আমাদের পরবর্ত্তী ডেরা চম্পিটাং ডাক বাংলো আর তিন মাইল দূরে। পথ আবার ঘন বনের ভেতর দিয়ে উঠতে আরম্ভ হোল! এই বন প্রধানতঃ দেবদারু বা পাইন গাছের। হিমালয়ে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায় যে কোথাও বা গভীর অরণ্য, আর কোথাও বা নগ্ন প্রস্তরময় প্রদেশ! চঙ্গু হ'তে আরম্ভ করে নাথু-লার নীচে পর্য্যন্ত এই আট মাইল পথ আমরা নীরস প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়েই এসেছি। কিন্তু এখন আবার আরম্ভ হোল, এই সুন্দর সবুজ বন। আমাদের বাংলা দেশের বন জঙ্গলের মতই সুন্দর সবুজ! কিন্তু এই তিন মাইল পথ যেতে যেতেই আমাদের তিব্বতের রাস্তা ঘাটের প্রতি অনুরাগ একেবারে অন্তর্হিত হোল। এই পথ দিয়ে বাংলার গভর্ণর বাহাদুর কয়েক দিন আগেই গিয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বত সরকারের বাঙ্গলার লাটের প্রতি কোন দরদের পরিচয়ই এখানে পেলাম না। পথ যতদূর সম্ভব বিশ্রী অবস্থায় রয়েছে! যেখানে সেখানে ঝরণার জল পাহাড়ের গা বেয়ে পথের ওপর দিয়েই ব'য়ে যাচ্ছে। পথ কাদা হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে মিউল

চঙ্গু ডাকবাংলো

নিয়ে যাওয়াও কঠিন! যেখানে নিতান্তই পুলের দরকার সেখানে কোন রকমে দু'টো গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। সে সব জায়গা অতি সন্তর্পণে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই রকম করে আমরা ঠিক বেলা একটার সময় চম্পিটাং ডাক বাংলোতে পৌছলাম। ডাক বাংলোটি তৈরী

হয়েছে একটি ঘন জঙ্গলের মাঝে। চম্পিটাং ১৩৭০ ফিট উঁচু! বেলা পাঁচটায় তাপ দেখলাম ৪৪° ডিগ্রী!

চজু থেকে চম্পিটাংএর পথেই আমরা প্রথম দেখি একদল চমরী গাই। এদের লোম সাদা কালোয় মিশানো, এবং
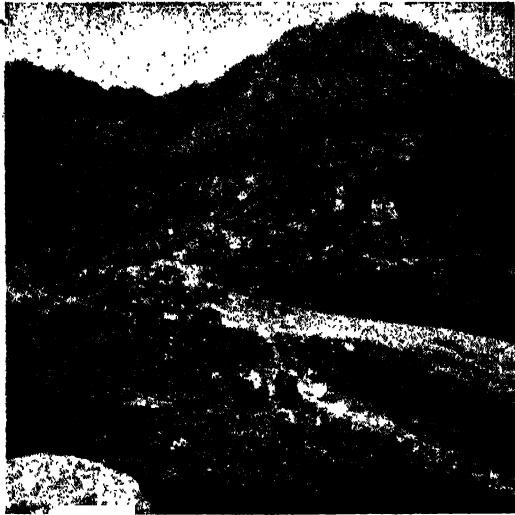
তিব্বতে পদার্পণ

এদের প্রধান সৌন্দর্য্য পুচ্ছগুলিতে। তীব্বতী ভাষায় এই চমরী গাইকে বলে ইয়াক। এদেশে এই পশু সর্ব্বত্র দেখা যায়, বন্য এবং গৃহপালিত দুই-ই। এদের পায়ে ও জিভে একটা বিশেষত্ব আছে। পর্ব্বতের ঢালুর উপর চলাফেরা করতে হয় বলেই হয়তো এদের খুর পাথরের মত কঠিন। আর নানারকম শক্ত পাহাড়ী গাছপালা খেয়ে থাকতে হয় বলে এদের জিভ অত্যন্ত কর্কশ। তিব্বতীয়রা এদের মাংস খুব খায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইয়াকের দুধ অনেকে খায় না। তারা দুধকে গোমুত্রের সামিল বলে মনে করে। তবে সেই দুধ হতে তৈরী মাখম তারা খুব ব্যবহার করে। পনীরের মত শুকনো মাখমের চাপ, প্রতি দোকানে হাটে বাজারে বিক্রী হয়। আমরা খেয়ে দেখেছি যে ইয়াকের দুধ অত্যন্ত সুস্বাদু ও গাইদুধের চেয়ে অনেক ঘন। তিব্বতের ভিতরে এই ইয়াককে আবার ভারবহনের কাজেও লাগান হয়। শীতের প্রকোপ হতে আত্মরক্ষা করতে হয় বলে এই দেশের ছাগ, মেষ, ঘোড়া, কুকুর এই সব জন্তুরই গায়ে খুব বেশী লোম হয়।

চম্পিটাং এ পৌঁছে সকলেরই পার্ব্বত্য ব্যাধি অত্যন্ত বেড়েছিল। লক্ষণের মধ্যে অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা ও নিশ্বাসের কষ্ট। নড়াচড়া করলেই মাথার কষ্ট বেশী। ঔষধ স্বরূপ সকলেই দুটি করে Aspirin Tablet খেলাম। রাত্রে শোবার আগেও কেউ কেউ আবার Veramon খেয়েছিলেন। পরদিন নিদ্রাভঙ্গে সকলেই অনেকটা সুস্থবোধ করেছিলাম।

১৪ই অক্টোবর—কাজু গুম্ফা। আজ প্রাতে চম্পিটাং থেকে রওয়ানা হয়ে আমাদের শেষ গন্তব্যস্থান ইয়াটুং পৌঁছিবার কথা। সেখানে পৌঁছে এই যাযাবর জীবনের ক্লান্তি হ'তে অন্তত তিনটি দিনের জন্যেও বিশ্রাম করার আশায় সকলেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। বেলা আটটায় আমরা যথাবিধি চম্পিটাং ডাকবাংলো থেকে যাত্রা করলাম।

তিব্বত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না সে দেশের

পথের দৃশ্য

কোনও ধর্ম্মমঠ বা তার অধিবাসী লামাদের দর্শন করা হয়। তিব্বত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমঠে পরিপূর্ণ। এর লোকসংখ্যার চারি ভাগের একভাগ এই সন্ন্যাসীদল। 'লামা' মানেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তিব্বতের সামাজিক রাজনৈতিক

ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর ওদের পূর্ণ প্রভাব। যাঁহাকে 'দলাইলামা' বলা হয় তিনি দেশ শাসকও বটেন, এই লামা সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্তও বটেন। এই দলাইলামার পদ বংশপরম্পরাগত নয়; আবার জনসাধারণ কর্ত্তৃক
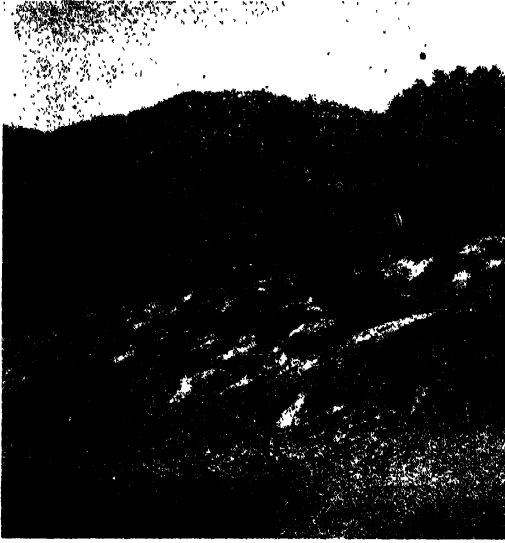
চমরী গাভীর দল

নির্ব্বাচিতও হন না, এঁর নির্ব্বাচন প্রণালী একটু বিচিত্র রকমের। ধর্ম্মের চক্ষে ইনি বুদ্ধের অবতার, অতএব চিরন্তন। কোন দালাইলামার মৃত্যু হ'লে অল্পদিনের মধ্যেই লামাদের প্রধান মন্ত্রণা সভা নূতন দালাইলামার আবিষ্কার ঘোষণা করেন। তখন সকলে মেনে নেয় যে মৃত দালাইলামার আত্মা এই নূতন শিশু দালাইলামার দেহ মধ্যে প্রবেশ করেছে। কোন কোন সময়ে দালাইলামা স্বয়ং মৃত্যুর পূর্ব্বে বলে যান, যে তিনি কোথায় কোন বংশে পুনর্জন্মগ্রহণ করবেন। এতে মন্ত্রীদের অনেকটা কার্য্য সংক্ষেপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন পূর্ব্ব হ'তে কোনও আদেশ পাওয়া যায় না, বা মন্ত্রীসভায় মতভেদ হয় তখন বিলিতী প্রথায় লটারী করিয়া দেবতা নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হয়। শুধু যে দালাইলামার নির্ব্বাচন এই প্রথা অনুসারে হয় তা নয়। মঠের প্রধান মোহান্ত নির্ব্বাচনেও এই প্রথাই অবলম্বন করা হয়।

তিব্বতীয়েরা মঠকে 'গুম্ফা' বলে। এক একটি গুম্ফা এক একটি গ্রাম বা নগর বিশেষ। মধ্য-তিব্বতের যে 'ড্রে-পাং' 'সেরা' ও গাডেন' নামে গুম্ফা আছে তার এক একটিতে প্রায় দশ হাজার লামা বাস করেন। সমস্ত তিব্বতে প্রায় ষাট হাজারেরও বেশী লামার বাস। চম্পিটাং হ'তে ইয়াটুংএর পথে এই রকম একটি গুম্ফা গ্রাম দেখলাম। তার নাম 'কাজু গুম্ফা'। তাতে প্রায় দু'শো লামা থাকেন। সিকিমে যে ছোট ছোট দুটি গুম্ফা দেখেছিলাম তাদের তুলনায় এটা অনেক বড়। তা ছাড়া সেখানে আমাদের লামাদের 'Devil Dance' দেখাবার জন্মে 'রেণক কাজি' রাণী চুনী দরজীর অনুরোধে প্রধান লামাকে এক পত্র দেন। পিণ্টু সেই পত্র নিয়ে ভোর বেলা পাঁচটার সময় চলে গেলেন। আমাদের নিয়ে যাবার ভার দিলেন মিউল-সরদারকে। প্রায় চারি মাইল গিয়ে আমরা রাস্তা ছেড়ে, একটি পাহাড়

কজুগুম্ফা— উপর হইতে

বেয়ে নামতে আরম্ভ করলাম। অনেক নীচে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ইঁটের টুকরোর মত কতকগুলি বাড়ী নজরে পড়তে লাগল। মিউল সর্দ্দার বললেন ঐ কাজু গুম্ফা। প্রায় আট নয়শো ফুট হেঁটে নামলাম। উপর হ'তে এক

বিকট ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে আসতে লাগল। ঠিক যেন উড়ো জাহাজের আওয়াজ। এ রকম জায়গায় এরোপ্লেন কোথায়! চারিদিকে চাইতে লাগলাম। যতই নীচে নামতে লাগলাম, শব্দ আরও বিকট হ'তে লাগল। শেষে

কাজুগুম্‌ফার অভ্যর্থনা

বুঝতে পারলাম শব্দটা আসছে গুম্‌ফা থেকে। বোধ হোল কোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাজছে। গুম্‌ফার দ্বারের কাছাকাছি এসে দেখি যে পাচজন লামা তিব্বতীয় বাজনা বাদ্য নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান। পিঞ্চু এসে আমাদের বলে দিলে যে আমাদের দলনায়ক যেন সম্মুখে থাকেন। সুধীরবাবুকে এগিয়ে দিয়ে আমরা সবাই পেছনে পেছনে চললাম। তোরণদ্বারে দেখি যে উপর হতে দুজন লামা প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একরকমের শিঙ্গা বাজাচ্ছেন, তিব্বতের নানা অদ্ভুত বাদ্যের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। দ্বারে লামারা দুই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, প্রধান লামা তিব্বতীয় প্রথা অনুসারে এক নূতন সরু চাদর (Scarf) সুধীর বাবুর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন। এদেশে ফুলের মালার বদলে গলায় এই রকম শুভ্রবস্ত্রখণ্ড পরিয়ে অভিনন্দন করাই রীতি। শুধু অতিথি কেন দেবতাকেও Scarf পরিয়ে সম্মান দেখান হয়। যখন আমরা মন্দিরের ভেতরে দেবতার সামনে উপস্থিত হলাম, তখন প্রধান লামা মহাশয় সুধীর বাবুর হাতে এই রকম একটি দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দেবতার গলায় পরিয়ে দিতে বললেন। তারপর আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে গেলেন গুম্‌ফার সভামণ্ডপে বা নাটমন্দিরে, সেখানে টেবিলের উপর তিব্বতীয় পাত্রে নানাপ্রকার খাবার দাবার সাজান দেখলাম। লামাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমাদের দোভাষী পিঞ্চুর মারফৎ হতে লাগল। আমরা নিতান্ত সাধারণ পথিকের মত যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা সম্মান ও অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। জলযোগের পর আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দির প্রার্থনাগৃহ পাঠাগার প্রধান লামার ও লামাগণের আবাসস্থান মায় রান্নাঘর পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

প্রত্যেক গুম্‌ফার নির্ম্মাণকৌশল মোটামুটি একই।
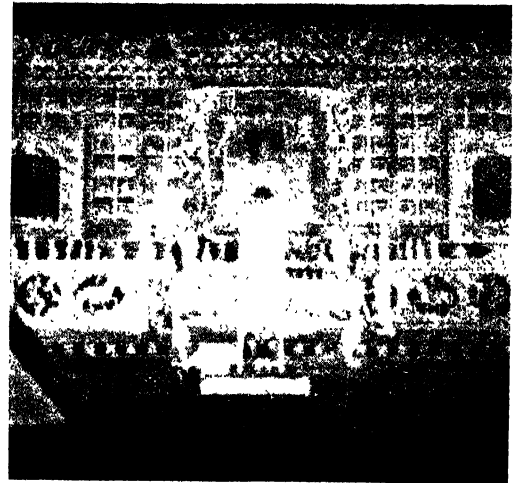
কাজুগুম্‌ফার অভ্যন্তর

সমচতুর্ভুজ এক গর্ভমন্দিরদ্বারের সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে তিনটি গভীর কুলুঙ্গীর মধ্যে বেদীর উপর ধ্যানী বুদ্ধের প্রকাণ্ড নানা বর্ণে রঞ্জিত মূর্ত্তি। এ ছাড়া অন্য নানা দেবমূর্ত্তিও আছে। সম্মুখে নিত্যপূজার জন্য সাতটি পবিত্র জলপাত্র, প্রজ্জলিত দীপ, অমরবৃক্ষ ও ধূপধূনার পাত্র।

তিব্বতে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার প্রথা নেই। অনেকে দেবতার চরণে প্রস্তরখণ্ড নিবেদন করেন। ঘরে দুটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, যা হ'তে অতি সামান্য আলোই ভেতরে প্রবেশ করে। বহুদূরে ঘরের কোনে এক উঁচু বেদীর ওপর প্রধান

কাজুগুম্ফায় লামাগণের দানবনৃত্য

লামার বসবার আসন, এবং অন্যান্য লামারা পূজার সময় ঘরের মাঝখানে প্রধান দেবমূর্ত্তির সামনে দুই সারিতে বেঁধে বসেন। দেওয়ালের গায়ে নানা ছোট ছোট কোটরে বহু পুঁথি ও ধর্ম্মগ্রন্থ রয়েছে। আমরা যে সময়ে দেখলাম তার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর এই মঠের বাৎসরিক উৎসব। সেই উপলক্ষে বহু লামা বাহিরে গেছলেন, ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে। এই মঠের লামাশ্রেণীর মধ্যে সপ্তমবর্ষীয় শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত রয়েছে দেখলাম। প্রবেশদ্বারের দুই পাশে থাকে মন্দিরের বাদ্য ও পবিত্র বারির পাত্র। মন্দির ও গুম্ফার ভিতরে সর্ব্বত্র বেশ অপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলাম। তিব্বতীয়েরা নিজেরা যথেষ্ট অপরিচ্ছন্ন, জীবনে কখনও স্নান, মুখপ্রক্ষালন বা অঙ্গধাবন করে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাদের এই মঠ ও মন্দির যে কত পরিষ্কার তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কেউ কেউ বলেন যে অত্যধিক শীতই নাকি এদের এই অপরিচ্ছন্নতার কারণ। গায়ে এক পরদা ময়লা থাকলে নাকি শীত কম লাগে। সারা মাঠটি দেখে আমরা বাহিরের উঠানে "ভূতের নাচ" দেখবার জন্য উপস্থিত হলাম। এই নাচ লামাসম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি অঙ্গবিশেষ। প্রত্যেক গুম্ফায় এইজন্য পোষাক পরিচ্ছদের এবং সাজসজ্জার ভাণ্ডার থাকে। নর্ত্তকেরা সুন্দর নানা রংএর কাজকরা রেশমী ও পশমী পোষাকে সজ্জিত হয়ে ভীষণ কিম্ভূতকিমাকার মুখোস পরে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাচতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একদল লামা নানারকম অদ্ভুত বাজনা বাজিয়ে থাকেন। এবং এই বাজনারই তালে তালে নৃত্য চলতে থাকে। এই Devil Dance কে লামারা তামাসা বা আমোদ প্রমোদ বলে মনে করেন না। তাঁদের চোখে এটা একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান। বাস্তবিক, মঠে এই নৃত্য দেখে আমরা বড় আনন্দিত হয়েছিলাম, আর

চমরী গাভী

নিজেদের ধন্য মনে করেছিলাম। নানা ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত জগৎ দৈত্যদানবপূর্ণ। জীবনে সামান্য কিছু ভুলচুক ঘটলেই দানবেরা মানুষের ওপর চড়াও হয়, এই এদের বিশ্বাস। তাই প্রত্যেক বাড়ী প্রত্যেক গুম্ফা নানা কিম্ভূতকিমাকার দৈত্য

দানবের চিত্রে ও মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। লামাদের স্বর্গে বিশ্বাস কম। নরকেরই ভয় বেশী। এই নরকের ত্রাস হ'তে রক্ষার জন্য

ইয়াটুং সহর

তাঁরা সারা জীবন এই গুম্ফায় নির্জ্জনবাসই প্রশস্ত মনে করেন। পরলোকে বিশ্বাস তিব্বতীদের অস্থিমজ্জাগত। যাতে মৃত্যুর পর এই দৈত্য দানবের হাত হ'তে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন, এইজন্য এঁরা সারাজীবন নিজেদের প্রস্তুত করেন। নৃত্য দর্শনের পর লামারা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের করমর্দ্দন করলেন। প্রধান লামার হাতে প্রণামী বলে পনেরোটি টাকা দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

কাজুগুম্ফা থেকে আরও সাত আট শো ফিট নীচে হেঁটে নেমে আমরা চুম্বী উপত্যকায় আমো-চু নদীর তীরে রিনচিংপং গ্রামে উপস্থিত হলাম। এই খানেই রাস্তা জেলাপ-লা হয়ে এসে Kalimpong Lhasa Trade Route এর সঙ্গে মিশেচে। এখান হতে ইয়াটুং চার মাইল। উপত্যকাভূমিতে আমো-চু নদীর তীর দিয়ে সমতল পথ বরাবর চলে গেছে। মিউলের দল খুব ছুটল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা চার মাইল পথ অতিক্রম করে বেলা একটার সময় ইয়াটুং সহরে পৌছলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়
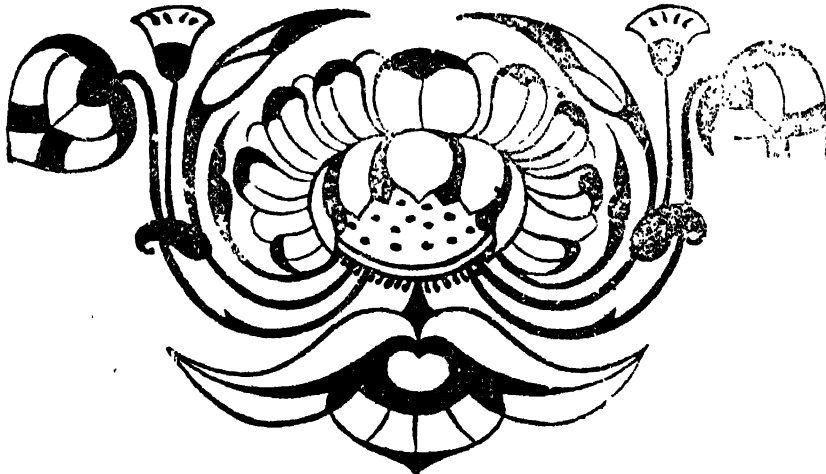
হস্তলিপি ও নিয়তি

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

'মানুষ তার ভাগ্যকে গঠিত করে তোলে'—একথা কবির অলস কল্পনা নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়—জীবনের এ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। জীবন ধারণ করাই যদি মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হোতো তা হলে মানুষের নিকট মানব সত্তার দৃশ্যমান রহস্য চিরকালই জ্ঞানের যবনিকার অন্তরালে থেকে যেত; কিন্তু বাস্তব পার্থিব জগতের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং নিয়তি মানুষের জীবনের শেষ স্তরকে আদর্শময় করে তোলে। যদিও সমগ্র জীবন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে চল্‌তে বাধ্য হয় তবুও চলার পথ থেকে যে নিন্দা সম্মান, লাভ ক্ষতির অভিজ্ঞতার পাথেয় সংগ্রহ করে নিল, তার জন্য দায় এবং ধন্য সে স্বয়ং।

হস্তলিপি অনুশীলন (graphology) দ্বারা একথা যথার্থ ভাবে প্রমাণ করা সম্ভবপর হয়েছে যে মানুষের চরিত্রের ছাপ মানুষের হাতের লেখার উপর চিত্রিত হয়। নিয়তির উপর মানুষের চরিত্র যতখানি প্রভাবজাল বিস্তার করতে পারে, চরিত্রের উপর নিয়তির সে পরিমাণ প্রভাবের ছাপ পড়ে না। যদি কোনও ব্যক্তির প্রাণসূচক চরিত্র ভাব হস্তাক্ষরে ধরা পড়ে তা হলে সহজেই সে ব্যক্তি সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ বাণী করা চলে যে তার চরিত্রের এই সজীবতা তাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে পারে; অবশ্য মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রেই সাফল্য দাবী করতে পারে যেখানে তার পেছনে আছে ক্রিয়াশীল মনের একটা শক্তি।

একথা বল্‌লে ভুল করা হবে যে একজন graphologist-এর বিধাতার তুল্য যোগ্যতা আছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই একজন হস্তাক্ষরবিশারদ মানুষের চরিত্রের নির্দ্দিষ্ট গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে, একটা মোটামুটি আভাষ দিতে সক্ষম, এই পর্য্যন্তই graphologist এর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। বাস্তব কর্ম্মজগতে মানুষের সুখ এবং শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে তা'র মানসিক বৃত্তি ও সংগঠনের উপর। মনের গঠন সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছে হাতের লেখার উপর এবং এই জন্যই আজকাল হস্তাক্ষরের সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে।

বর্ত্তমান যুগে মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করা। জীবন সংগ্রামের এই প্রধান উদ্দেশ্য, যা'র সাহায্যে বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতি বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ এবং সুখের প্রধান এবং সাংঘাতিক অন্তরায়। কারণ যান্ত্রিক, materialistic উন্নতির মূলে আমরা দেখতে পাই—বিরাট উৎসর্গের অস্তিত্ব।

Graphology চর্চ্চার সাহায্যে অনাগত জীবনের সম্পূর্ণ সংবাদ জানা যেতে পারে না, যা আমরা জান্‌তে পাই তা আংশিক। এ'র সাহায্যে আগামী কালের সম্ভবপর জীবনের কথা জ্ঞানের গোচরে আনা যায় কিন্তু খুঁটিনাটি ভাবে নয়। Will power বা ইচ্ছাশক্তির একটা পারগতি আছে, মনের দৃঢ় আদেশের একটা ভিত্তি আছে, এই দুইটির উপরই বাস্তব জগতের সাফল্য নির্ভর করছে। হস্তলিপির সাহায্যে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অমুক ব্যক্তি অতি সহজে বিচলিতচিত্ত বা তার একটা দৃঢ় মতবাদের ভিত্তি আছে এবং এই সিদ্ধান্ত অনুগমন করে আমরা এই বলতে পারি যে যে সহজে বিচলিতচিত্ত তা'র সূক্ষ্ম অনুভূতিময় মন তাকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যাবে; কিন্তু মনের নিষ্ক্রিয়তা, আলস্যতা অবনতির পরিপন্থী ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনি ভাবেই একজন graphologist মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন।

দেখা যায় অনেক স্থলে graphologist হাতের লেখার সাহায্যে মানুষের অমঙ্গলসূচক জীবনের আভাষ

দিতে সক্ষম হয়; কারণ অনেক সময়ে মানুষের মনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব, বিষণ্ণতা হাতের লেখাতে ধরা পড়ে; বলা বাহুল্য মনের এই অবস্থিতি চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মহাকবি শেক্সপিয়ার বলেছিলেন—"I, me and my affairs, that way madness lies!" একজন দুর্ব্বলচিত্ত বা অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি তার পার্থিব বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা বাধা এবং সে তার আত্মার মহৎ শত্রু।

ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে একটা প্রবল ক্রিয়াশীল ক্ষমতার (creative ability) অস্তিত্ব থাকে, মানুষের বস্তুগত বিকাশ এবং সাফল্য এই অস্তিত্বের পরিমানের উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির বিকাশকে পরিচালক শক্তি (leading force) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই শক্তি ক্রিয়াবান হয় না যতক্ষণ না will force তাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

নিম্নতর শ্রেণীর বুদ্ধিবিশিষ্ট একজন ব্যক্তি আনন্দ ও সুখের স্মৃতিকে অস্তিত্বশালী করতে প্রয়াস পায় না। সামাজিক জীবন-সোপানের নিচু স্তরে এই শ্রেণীয় ব্যক্তিদের বিচরণ। এদের মনের কার্য্যকারিতা যেমন অল্প পরিমাণ, স্বাচ্ছন্দ এবং অনুভূতির গতিও তেমনি অল্প এবং অদ্রুত। কারণ দুঃখের কারণকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মনের কোণে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কতকগুলি redeeming ক্ষমতাবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উচ্চস্তরের সামাজিক জীবনের সাথে যোগস্থাপন করতে এরা অভ্যস্ত নয়।

হস্তাক্ষর অনুশীলনের জন্য মানুষের মনস্তত্ত্বকে তিন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে—সর্ব্বোচ্চ মধ্যবিধ এবং নিকৃষ্ট। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভা (genius)কে মাত্র ধরা হয়েছে; এই প্রতিভা এমন ব্যক্তিতে বিদ্যমান, সৃষ্টিক্ষম মনোবৃত্তি যাঁর মনে উত্তেজনা সঞ্চালন করে; এবং প্রতিভাবান তাঁকেই বলা হয় যাঁর কাজে আমরা এক প্রকার psychic forceএর আভাষ পাই। এই মানসিক উদ্যমকে মনোবিজ্ঞান যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না। একমাত্র স্বরূপ প্রকাশ ছাড়া আর কোনও বিষয়ে সাধারণের সাথে প্রতিভা যোগসূত্র রাখেনা।

মধ্যবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে গণ্য করা হয়েছে। এইরূপ মস্তিষ্ক নিজস্বরূপে কিছু সৃষ্টি করবার দাবী রাখে না; কোনও বিষয় বা অবস্থাকে উন্নত মার্জ্জিত করে তোলবার ক্ষমতা আছে তা'র; এতে আমরা যান্ত্রিক সম্পূর্ণতা পাই। প্রতিভাবানের মতো মনের উত্তেজনা সঞ্চারিণী ক্রিয়া নাই, যা'র একমাত্র অধিকারী প্রতিভা।

একজন অপকৃষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মানসিক বৃত্তির ক্ষেত্র আরো ক্ষুদ্র আরো সঙ্কীর্ণ। তা'র মন কেবল মৌলিকত্ব পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু করতে অক্ষম কারণ মানবের আদিম বর্ব্বর পশু প্রবৃত্তি তা'র উপর প্রভাব বিস্তার করতে প্রয়াস পাচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানের নির্দ্দেশক (index) ছাড়াও, মানুষের চরিত্র এবং ভাগ্য নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে হস্তলিপি অনুশীলনের (graphology) পৃথক মূল্য আছে এবং আশা করা যায় হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এর চর্চ্চা নূতন রূপ পাবে। *

শ্রীরণজিৎ সান্যাল

* এই প্রবন্ধের কঙ্কাল H. A. Newell. F. R. G. S প্রণীত "Your Signature" নামক বই থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা এবং ভারতীয় পরিচ্ছদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত উপাধি-দান সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙলা ভাষায় লিখিত তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। উপাধি-দান সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধিনায়কের পরিবর্ত্তে একজন বাহিরের লোকের দ্বারা বক্তৃতা দেয়ানো, এবং বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, দুই ব্যাপারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম।

চন্দননগর সাহিত্য-সম্মিলনের সভামণ্ডপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্বোধন সম্ভাষণ প্রদান করছেন

যে কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তদ্দেশীয় ভাষার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার অধিকার অবিসম্বাদী। সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার পর আজ বাঙলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তার সেই অধিকারের স্বীকৃতি লাভ করায় আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটেছে। নূতন অধিকার লাভ গৌরবজনক নিশ্চয়ই, কিন্তু হৃত অধিকারের পুনরুদ্ধারও কম গৌরবজনক নয়।

দেশের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকার্য্যে দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহারেরও মানুষের ঠিক তেমনি স্বাভাবিক অধিকার আছে। এ বৎসর উপাধি গ্রহণের সময়ে ছাত্রগণকে ভারতীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করবার অধিকার দান ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের লোকের সেই স্বাভাবিক অধিকার স্বীকার করেছেন।

এই সকল গ্লানিক্ষয়কর সংস্কার সাধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য এবং জনপ্রিয় ভাইস্ চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের লোকের নিকট হ'তে সুগভীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় পিতা আশুতোষ যে কার্য্যের সূচনা করেন, আমরা আশা করি তিনি তার উদ্‌যাপন করবেন।

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ স্বনামধন্য বাঙালী স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সামান্য বেতনে ভূপেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে কেরাণীগিরি আরম্ভ করেন। কিন্তু অপূর্ব্ব প্রতিভা এবং অর্থনীতি বিষয়ে অসাধারণ শক্তির বলে তিনি ক্রমশঃ সামরিক হিসাবের কনট্রোলার, মিলিটারী অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল, ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য এবং অবশেষে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার হন।

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ অতিশয় সহৃদয় এবং অমায়িক প্রকৃতির

ব্যক্তি ছিলেন এবং বহু বাঙালীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালীর যা ক্ষতি হ'ল তা সহজে পূরণ হবার নয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

ত্রিংশ অধিবেশন

গত ১৩৩৬ সালে কলিকাতা ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ছয় বৎসর, সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক কারণে অথবা উপযুক্ত উদ্যোক্তার অভাবে, এই সম্মিলন বন্ধ থাকে। চন্দননগরের স্বনামখ্যাত অধিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

পরিশ্রমে এবং যত্নে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রিংশ অধিবেশন অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের ঝড় বৃষ্টি হেতু বিঘ্ন সত্ত্বেও মোটের উপর এই সাহিত্য অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করেছিল বলা যেতে পারে।

চন্দননগর গঙ্গা তীরবর্ত্তী 'জাহ্নবী-নিবাস' নামক শেঠ মহাশয়ের সুরম্য ভবনে সুদৃশ্য এবং সুবৃহৎ সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল 'জাহ্নবী নিবাস' ভবনের নিম্নতলে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হরিহরবাবু এবং তাঁর সহযোগিগণের আদর আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণটি একটু দীর্ঘ হয়েছিল, কিন্তু চন্দননগরের সাহিত্য এবং শিল্প বিষয়ক ঐতিহাসিক বিবরণে বহু জ্ঞাতব্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। অভিভাষণটি ঐতিহাসিকগণের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ হয়েছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ। পূর্ব্ব থেকে উপস্থিত হ'য়ে গঙ্গাবক্ষে তিনি তাঁর বজরার মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন, যথাসময়ে সভায় আগমন ক'রে উদ্বোধন সম্ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর বাচনিক সম্ভাষণটি অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তার কিয়দংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করলাম।

"একদা এই সহরের এক প্রান্তে এক জীর্ণপ্রায় বাড়িতে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তারপর মোরান সাহেবের হর্ম্ম্যেও কিছুকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরেরই এক প্রান্তে আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেই সময়ে আমি প্রথম অনুভব করি যে বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের প্রাণের বাণী বহন করে। * * বাঙলার নদী আমাকে ডাক দিয়েছিল এতদিন আমার সেতার ছিল প'ড়ে। তার তার বাঁধা হয়নি তাতে সুর ওঠেনি। এই সময়ে আমি বিশ্বের সুরে আমার সেতারের সুর বেঁধে নিয়েছিলাম। গঙ্গার তীরে আমি আমার জীবনের প্রথম মুক্তি পেয়েছিলাম, তাই নিজেকে আমি গাঙ্গেয় মনে করি।"

সাহিত্য ধারার আদর্শ সম্বন্ধে কবি বলেন, "সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সকল দেশে আদর্শ আশা-আকাঙ্ক্ষা রসপুষ্ট হয়েছে আমাদের দেশেও তার ভূমিকা হয়েছে—বিকার যেন এরে

নষ্ট না করে। সমস্ত পৃথিবীর বাতাসে আজ কলুষ, পরম দুঃখে মানুষ তার আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস হারিয়েছে। আমরা, যারা সেই ধারা থেকে দূরে আছি, তাদের মধ্যেও যদি সেই বিকৃতির সংক্রমণ লাগে তবে তা থেকে আমাদের মুক্তি পাবার চেষ্টাই করতে হবে। যুদ্ধের সঙ্গে বিদেশে মানুষের যে চিন্তাবিকৃতি ঘটেছে তাতে তারা সাহিত্যকে নামাবার চেষ্টা করছে ভূমিতলে, যাকে বলে তারা বাস্তবতা। কীটের যা বাস্তবতা পশুর যা বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতাও কি তাই ?"

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু—কাব্য-সাহিত্য, (৪) স্যর যদুনাথ সরকার—ইতিহাস, (৫) অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার—দর্শন, (৬) অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লকুমার মিত্র—বিজ্ঞান, (৭) অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—অর্থনীতি, (৮) ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস—চিকিৎসা, (৯) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—সুকুমার কলা, (১০) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শিশুসাহিত্য, (১১) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক সাহিত্য, (১২) অধ্যাপক ডাক্তার মহম্মদ শহীদুল্লাহ—বানান আলোচনা।

চন্দননগর সাহিত্য-সম্মিলনে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ

অধিবেশনের মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রদ্ধেয় সুধী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁর অভিভাষণটি বেশ সুচিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং তরুণ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগের সুর একটু যেন বেশি মনে হয়েছিল।

নিম্নলিখিত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাখায় সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। (১) শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্য, (২) শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী—কথা-সাহিত্য, (৩)

কৃষ্ণলাল দত্ত

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ স্বনামধন্য কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭৮ বৎসর বয়স হয়েছিল।

এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কৃষ্ণলাল সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি আরম্ভ করেন, কিন্তু স্বীয় মেধা এবং প্রতিভার বলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হন। কালক্রমে তিনি

মাদ্রাজের একাউন্টেন্ট জেনারেল, ডাক-বিভাগের কনট্রোলার প্রভৃতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

সরকারী চাকরী হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে বৎসর দুই কৃষ্ণলাল বাবু মহীশূর রাজ্যে রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রণাদাতার কার্য্য করেন। ১৯১৯ সালে তিনি লণ্ডনে রয়েল করেন্সী কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ইংলণ্ড হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে কিছুদিন তিনি পাতিয়ালা ষ্টেটে চাকরী করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সে চাকরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন

ব্রহ্মদেশের ডাক ব্যয়ের বৃদ্ধি

এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের ডাক ব্যয় ভারতীয় ডাক ব্যয়ের সমানই ছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্তর্গত দুই স্থানের মধ্যে ডাক ব্যয় যা ছিল, ব্রহ্মদেশ হ'তে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষ হ'তে ব্রহ্মদেশের ডাক ব্যয় ঠিক তাই ছিল। ব্রহ্মবিচ্ছেদের ফলে আগামী ১লা এপ্রিল হ'তে ব্রহ্মদেশের ডাক ব্যয় ইংলণ্ডের ডাক ব্যয়ের সমান হ'ল। ১লা এপ্রিল হ'তে ব্রহ্মদেশে, কিম্বা ব্রহ্মদেশ হ'তে, একটি পোষ্ট কার্ড পাঠাতে হ'লে আর তিন পয়সা ব্যয়ে হবে না, দু আনা ব্যয় করতে হবে।

ব্রহ্মদেশে ডাক-বিভাগের পরিচালনায় বার্ষিক ১৬।১৭ লক্ষ টাকা লোকসান পড়ছিল। সেই টাকাটা পূরণ করবার অভিপ্রায়ে এই ডাক মাশুলের হার বৃদ্ধি। কিন্তু এই হার বৃদ্ধির ফলে আয় আড়াই গুণ বৃদ্ধি লাভ করবে, কি ডাক-ব্যবহার তিনগুণ হ্রাস পাবে তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। চালের দাম দ্বিগুণ হ'লে আধ পেটা খাওয়া চলে না, কিন্তু ডাক ব্যবহার এমন একটা ব্যাপার যার মধ্যে ব্যয়-সঙ্কোচের যথেষ্ট সুযোগ আছে। ইতিমধ্যেই ব্রহ্মদেশীয় সংবাদপত্রের এজেণ্টগণ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে কি উপায় অবলম্বন করলে ডাক ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা যায় তদ্বিষয়ে পরামর্শ করছেন। কিন্তু জবরদস্তি ডাক ব্যয় কমিয়ে রাখতে গেলে ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ পরিচালনায় চোট পৌঁছবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। সভ্যতার বিস্তারের সহিত দেশ-বিদেশের মধ্যে সংবাদাদি আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি হয়েছে, সেই সুযোগাদির আংশিক প্রত্যাহরণে আদিম কালের দিকে খানিকটা পেছিয়ে যাওয়া হবে না কি?
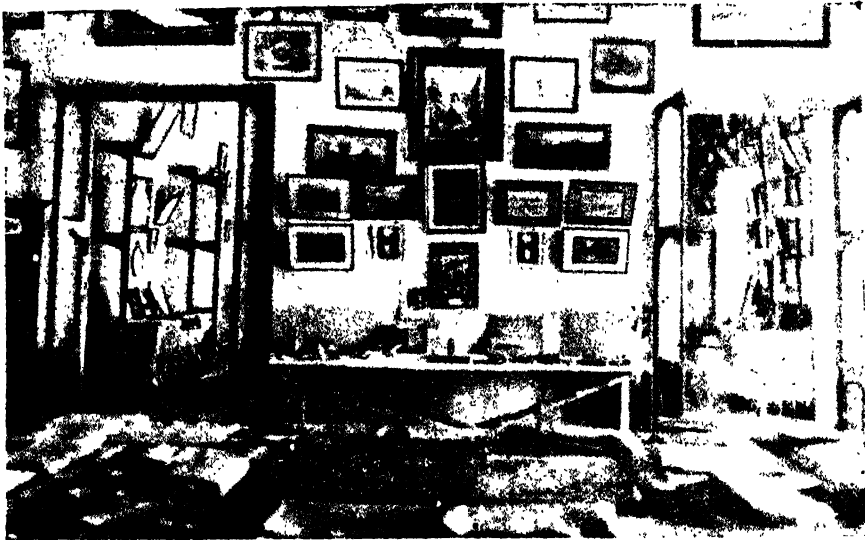
চন্দননগর সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদর্শনীর একটি অংশ

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane Calcutta and Published by Indubhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিশ্রামের শান্তি!
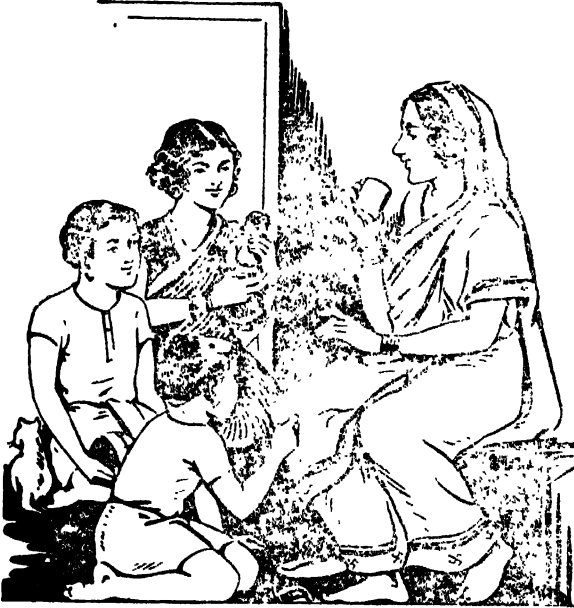
ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে খুব ভাল লাগলেও খানিকবাদে ক্লান্তি আসে বই কি! ছোটদের শক্তি ও উৎসাহ যেন ফুরোতে চায় না—কিছুতেই তারা হায়রান হয় না। তারা চায় তাদের মা সব কিছুতেই যোগ দিক কিন্তু সব সময় মা কি আর তা পেরে ওঠেন? তাই তারা নিরাশ হয়। কিন্তু সকলে মিলে খুসী থাকার একটা উপায় আছে।

খানিকক্ষণ এক জায়গায় বসুন; বসে কয়েক পেয়ালা চা খান। দেখবেন আপনার শ্রান্তি তক্ষুনি দূর হয়ে গেছে। এখন আবার আপনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে পারেন।

বিশ্রামে শান্তি দিতে ভারতীয় চায়ের তুলনা নেই। চা খাওয়া অভ্যাস করলে অচিরেই তার উপকারিতা বুঝতে পারবেন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী
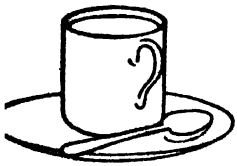
টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন।
প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন।
জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন;
তার পর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

IK. 30 RB

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা, ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা চার আনা ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য মায় ডাক মাশুল তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম দেশের বাহিরে বার্ষিক মূল্য দশ টাকা ও ষাণ্মাসিক পাঁচ টাকা। মূল্যাদি "সত্বাধিকারী বিচিত্রা নিকেতন লিঃ"—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন। উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে নিষেধ-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কুপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয় জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত কবিতা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথবা এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতি স্থান-বিশেষে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'বর্জ্জাইস্'-অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ঃ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ ⅛ পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ২৭৪৪

বিচিত্রা　　মিলনের সাক্ষী　　এনায়েত হোসেন
বৈশাখ, ১৩৪৪

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪৪ | ৪র্থ সংখ্যা

অনাদৃতা লেখনীর পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকী তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহিরে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিম্বা পদ্যে।
দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুনগুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে'
ভেসে বেড়ায় ধীরে,
মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
সজনেগুচ্ছ সাথে।

লেখনী মোর ডেস্কে থাকেন
একলা বিরহিণী ;
দৈবে যদি কবি হতেন তিনি

বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নিম্নলেখার ছাঁদে আমায়
দিতেন জানিয়ে :—

বিনয় সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,—
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে,
অচলকূটের নির্ব্বাসন সে কেমন ক'রে স'বে?
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান?
স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন?
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিম্বা ক্ষীণ?
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিম্বা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন পাপে?
পত্রপটে অক্ষররূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনেরাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে।
নীলকালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্ত্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা

ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে
গোমুখী সে রইল নীরব, খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামী,
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাইনে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় টেবিল পরে লুটি'
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম,
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্ত্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জ্জনায় বিসর্জ্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী

র

"বৈজ্ঞানিকের চশমা"

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু ডি. এস-সি

গীতায় শ্রীভগবান্ বল্‌চেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এই আটটি তাঁর অষ্টবিধা প্রকৃতি। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিকের energy, matter, mind সবই পড়ল। বিজ্ঞান শাস্ত্রটা এই প্রকৃতি নিয়েই অনাদিকাল হোতে গড়ে উঠ্‌ছে; তবে এর মধ্যে প্রধান কথা এই যে প্রথম পাঁচটি স্থূলভূত হোল জ্ঞেয় বস্তু—object, এবং মনবুদ্ধিঅহংকারে গড়া স্বয়ং বৈজ্ঞানিক হলেন জ্ঞাতা—subject. বিষয়ী এবং বিষয় এই দুটী আছে, অতএব দ্বৈতবোধ থাকবেই। জ্ঞানীরা বল্‌চেন এই প্রকৃতিই হোল মায়ারূপী অক্টোপাস্, পরমবস্তু মায়াতীত।

এমন সব বিজ্ঞানের সেবক আছেন যাঁদের চালচলন্ পুরোপুরী জড়বাদীর মত। তাঁদের মুখে পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, বা কোন ultimate realityর কথা একেবারে শোনাই যায় না; যদি বা কচিত্ কখন যায় সেটা ভূতের মুখে রামনামের মতই। যাঁদের মাপকাঠিতে দৃশ্যমান্ জগত্‌টাই মাত্র জ্ঞানের বস্তু, তাঁরা scientific phenomenalism কাটিয়ে গিয়ে অধ্যাত্ম বিদ্যায় ডুবে যেতে পারেন তা স্বপ্নের অতীত। বৈজ্ঞানিক চায় ফিজিক্স, মেটাফিজিক্স নয়। বিষয়গুলা যেমন-যেমন ভাবে ইন্দ্রিয়ের পর্দায় ধাক্কা দেয় সে গুলার অভিজ্ঞতা নিয়ে তার জীবন তৈরী, তার বেশী যেতে সে একান্তই নারাজ। ইন্দ্রিয়ের অতীত যদি-বা কিছু থাকে, সেটা এক্সপেরিমেণ্ট দ্বারা বোধ্য না হোলে গ্রাহ্য মোটেই নয়, এবং তা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার তার অবকাশ মোটেই নেই। সাগরের ছোট-বড় ঢেউ গোণায় যার তৃপ্তি তার সাগরগর্ভে অধিবাসী জীবের তল্লাসে কোন সার্থকতা নেই। নীলোর্মিমালা সৌরকিরণের মুকুট মাথায় দিয়ে কিরূপ অপরূপ শোভা বিস্তার করে তায় আনন্দ পিয়াসী হোতে যাওয়া তার কাছে পাগলামির নামান্তর। অভিনব কোন কৌশলে রচা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা প্রয়োজন, যেটা অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত স্পন্দন প্রতিবিম্বিত করতে সমর্থ; নিসর্গসুন্দরীর কোন সুগুপ্ত বক্ষস্পন্দন স্পষ্ট রেখাঙ্কিত হোয়ে উঠবে তাতেই সে ভরাট আনন্দে বিভোল। কাল ও দেশের বেড়া চারিদিকে উঠেছে; তার মধ্যে ঘটনা ঘটছে। যে-যে ঘটনা যে-যে রূপ নিয়ে বাহ্য-যন্ত্র, ইন্দ্রিয়, এবং সর্বশেষে মনের কোষে রেখাপাত করছে তারই কতকটা হিসেব-নিকেশে সে সদাই সচেষ্ট, উন্মুখ ও সজাগ। একটা নূতন কিছু 'দেখা' তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু ও অপার উৎফুল্লতার কারণ। জ্ঞাতার সজাগ দৃষ্টি যতই প্রখর ততই সে বড় বৈজ্ঞানিক। তবে হুজুরে হাজির হওয়া চাই, নচেৎ কোন কিছুর বাস্তবতা স্বীকার্য নয়। এটাই সায়ান্সের নীতি বা পলিসি। তত্ত্ব-টত্ত্ব বাদ দিয়ে যা-কিছু মনের খোরাক প্রকৃতি যোগায় তাই সায়েন্সের গণ্ডীর মধ্যে।

ফ্যারাডের যুগ থেকে ফিজিক্স ঝোঁক দিলে বস্তুকে ছেড়ে বস্তুর আশে-পাশের শূন্য দেশটার উপর। বস্তুর চারিদিকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অতীত এমন কি বস্তু থাক্‌তে পারে যেখানে শক্তির (energy) লীলা প্রকট, এবং মনে হয় যেন ঘটনা সেখানেই ঘটছে। সেই "দেশে" গোপনে কি এমন ঘটছে যার ধর্মাধর্ম স্ফুরিত হোয়ে উঠছে "বস্তুর" মধ্য দিয়ে, এবং বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রিয় ও পরীক্ষার গ্রাহ্য হোয়ে অপরূপ বেশে অভিজ্ঞতার মন্দিরে আত্মপ্রকাশ করছে। শূন্যগর্ভ

দেশকে নিয়ে পরীক্ষা চল্‌ল না ; চল্‌ল গর্ভস্থ বস্তুকে নিয়ে। বস্তুতে যে ধর্ম আরোপিত হোল, অনুমানে দেশের ধর্মও সেই সঙ্গে অনুমিত হোল। আশ্চর্য এই, যে কতকগুলা খণ্ডিত (discontinuous) বস্তুর ধর্ম থেকে একটা বিরাট অবিরাম (continuous) মূল পদার্থের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার প্রচেষ্টা সুরু হোল। এডিংটন্‌ বলচেন, সায়েন্স "প্রদর্শক মাত্রা" (pointer-readings) নিয়েই ব্যস্ত আছে। কথাটা সত্যিই। সূর্য বা তারকার দূরত্ব জানতে হোলে একটা "ক্রমাঙ্কিত বৃত্তের" (graduated circle) রিডিং নিতে হয় ; নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদান জানতে হোলে বর্ণচ্ছত্র-রেখার সন্নিবেশ বুঝতে হয় একটা 'ক্রমাঙ্কিত মানফলকের" (graduated scale) উপর ; বিজলীপ্রবাহ মাপ্‌তে গেলে galvanometerএর reading নিতে হয় ; তাপ জানতে হোলে থার্মোমিটারের reading ; ইত্যাদি ইত্যাদি। মাপামাপি, বা সংখ্যায় প্রকাশ করা, সায়েন্সের একটা প্রধান অঙ্গ হোলেও সায়েন্সের মূলসূত্রে আরও অনেক অভিজ্ঞতা অনুস্যূত হওয়া দরকার। সায়েন্স মানে যদি নৈসর্গিক জ্ঞান বোঝায় তবে মাপামাপির যুগ সুরু হবার বহু পূর্বযুগ হোতেই মানুষ সে জ্ঞান কিছু কিছু লাভ কোরে আসছে। কিন্তু ঐ মানফলকের পাঠকগণকে যদি প্রশ্ন করা যায় নিসর্গ রাজ্যের কোন গভীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনারা কিছু বলতে পারেন কিনা, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই এই উত্তর দেবেন. "মহাশয়, বস্তু বিষয়ে কোন মতামত জারী করবার আগে আমরা একটা মাপজোক নিয়ে quantitative জ্ঞান খাড়া করতে চাই, অতঃপর দেখ্‌তে চাই যে, কোন একটা গাণিতিক সমীকরণের ছকে সে জ্ঞানকে ফুটিয়ে তোলা চলে কিনা।"

এই যে মাপামাপি, এডিংটনের "pointer-readings," এটাই কি আসলে সায়েন্স ? সায়েন্স মানে কি, তবে পরিমাপের নব-নব কৌশল রচনা করা ? বস্তুর বস্তুত্ব কি ঐ বাইরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ রূপ নিয়ে ? খানিকটা সত্য এর মধ্যে থাকলেও সব সত্য নিশ্চয় নেই। টাইকোব্রাহির মাপামাপি থেকেই ত কেপ্‌লার জ্যোতিষে একজন বড় বৈজ্ঞানিক বোলে প্রতিপন্ন হোলেন, গ্রীনউইচের মানমন্দিরের অগ্রদূত হোল ঐ টাইকোব্রাহির পরিমাপফল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে ত মাপামাপি। দূরবীক্ষণ, spectroscope, interferometer এবং অন্যান্য যন্ত্র বিহনে তা সম্ভব হোত না। গুণাত্মক জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানের সুরু, এবং পরিমাণাত্মক জ্ঞান দিয়েই কি চরম পরিণতি ? মাপেরও ত গলদ বেরোয় ! আমার মাপ, তোমার মাপ, বোসের মাপ, আইনস্টাইনের মাপ, এডিংটনের মাপ, হাইজেনবের্গের মাপ, এ সবেতে তফাৎ হবেই। মাপের চাইতে ঘটনা (phenomena) ঢের বেশী মৌলিক জিনিষ। সায়েন্স যদি নিসর্গ জ্ঞান হয় তবে তা "metrical knowledge" হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মনোজগতের খানিকটাও জড়জগতের অন্তর্ভূক্ত কোরতে হবে। প্রাকৃতিক জ্ঞানে দর্শনতত্ত্বের খানিকটা যোগসূত্র থাকবেই। ঐ যে তফাৎ, এ ত সম্বন্ধ জ্ঞানে হোয়েচে ; বিষয়ীর কাছে বিষয় নানা ছাঁদে ধরা দেয়। মূলসূত্র ত বিষয়ীর উপর নির্ভর করে না। জগতের মূলসূত্র যা, তা এক অদ্বয়তত্ত্ব। সর্বত্র সমান। কালাকালের অপেক্ষা রাখে না। দেশের আবেষ্টনীর মধ্যেও গণ্ডীবদ্ধ নয়। বিষয়ীবিষয়ের, জ্ঞাতাজ্ঞেয়ের আপেক্ষিকতার বালাই তাতে নেই। বৈজ্ঞানিকের জগৎ, দার্শনিকের জগৎ, কবির জগৎ, রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের জগৎ, ব্যবহারাজীবের জগৎ, অর্থনীতিজ্ঞের জগৎ, সবই আলাদা। কিন্তু জগতটার বাস্তবতা স্বতন্ত্র নয়। সম্বন্ধে বহু, সম্বন্ধের রাহিত্যে এক। বহুত্বের ভেতরে যে-একটা অচল-প্রতিষ্ঠ একত্ব আছে সে একত্বের দ্বারমুখী হোয়ে কি সায়েন্স ছুটেছে ? এখনও বোঝা যায় না। যুগ এসেছে। ধারা বদলাতে হবে। লক্ষ্য বড় করা দরকার। জ্যোতির্বিদ বলছেন জগতটার পরিধি বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিধিও বাড়াতে হবে, নচেৎ ছন্দ থাকবে না। বেতালা হোয়ে থাকা মানে সুরের ভঙ্গীকেও খর্ব করা। শোন্‌, গণ্ডকী, ঘর্ঘরা, যমুনা, বিভিন্ন জনপদ ভেদ করে গঙ্গার স্রোতেই মিশবে। রস নানা আধার আশ্রয় করে বৈচিত্র্য প্রকাশ করবার জন্যে, কিন্তু আসলে তা অখণ্ড, একোমুখী।

গতিবিজ্ঞানের মূল আইডিয়া হোল "বলে"র (force) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বলের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ছু-টুকরো জড় পদার্থের মধ্যে। আবার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমপরিমাণ হওয়ায়, 'বল' জিনিসটা 'চাপে'রই (stress) একটা উপাংশ (component) হিসাবে গণ্য করা গেল, এজন্য বল জিনিসটার আইডিয়া স্বতন্ত্র ভাবে না ধরাও চলে। এক সময়ে সবজিনিসই বলরূপে ধরা হোত, সবই vis. যেমন রসায়ন বিদ্যায় Priestleyর পূর্বে ও তাঁর সময়েও গ্যাসমাত্রেই 'বায়ু' নামে অভিহিত হোত। এখন 'বল' জিনিসটার প্রকৃতিগত অর্থ করা হোয়েচে পেশীর মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ঐন্দ্রিক বোধ হোতে। কিন্তু গতিবিদ্যায় (kinetics) বল নিরূপিত হোয়ে থাকে ভর-ত্বরণ (mass-acceleration) দ্বারা; এটাই আবার নিউটনের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু স্থিতিবিদ্যায় (statics) এরূপ আইডিয়া প্রকাশ করা চলবে না, অনেক গোলোযোগের সৃষ্টি হবে। কেন না, বলের দ্বারা সব সময়ে বস্তুর গতি নাও হোতে পারে, যেমন বল সমুদায়ের স্থিতি (equilibrium) উপস্থিত হোলে; তখন আর বেগবৃদ্ধি হবে কোত্থেকে? এখানেই নিউটনের প্রথম প্রতিজ্ঞার সারকথা লুকিয়ে আছে। আবার বলের মুখ্য ক্রিয়া হোল দুই বস্তুর পরস্পর সংস্পর্শ হোতে; যদি বস্তুদ্বয় গতিবিশিষ্ট হয় ত ভরবেগ (momentum) সমান সমানই পাবে। এখানেই নিউটনের তৃতীয় প্রতিজ্ঞা অন্তর্নিহিত রয়েচে। সমান ভরবেগ তুল্য বলেরই অভিব্যক্তি, এবং এই তুল্য বল বিপরীত দিক্‌বিশিষ্ট হবে ও একটা চাপের দুটো বিরুদ্ধ দিক্‌ই দেখিয়ে দেবে। এগুলো থেকেই শক্তির নিত্যতা (conservation of energy) স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এইরূপ, আলোক, শব্দ, তাপ—সবই মনোগত সংজ্ঞা (mental terms) বোলে প্রতীয়মান হয়, যদিও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা এক একটার দেওয়াও চলে। এগুলা এমন জিনিস যা আমরা প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করি, ব্যাখ্যা যেরূপেই করা যাক্ না কেন। যেমন বায়ুর কম্পন হোতে শব্দের উৎপত্তি, ইথরের কম্পন হোতে আলোকের উৎপত্তি, কণিকার সঞ্চরণ—locomotion হোতে তাপের উৎপত্তি। কিন্তু "বল" জিনিসটার কি ব্যাখ্যা হোতে পারে?—আন্বেষণ শক্তিকে—cohesion—না হয় বলা গেল বৈদ্যুতিক অথবা চৌম্বক আকর্ষণের বাকী বকেয়া (residual) চিহ্নস্বরূপ। কিন্তু বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ আবার কিরূপ? ভাল ব্যাখ্যা না হোলেও বলা যেতে পারে তারা দেশেরই ক্রিয়া (functions of space), বা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের ধর্ম। এখন 'ক্ষেত্র' মানে আবার কি? শষ্প-তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ক্ষেত্র বুঝি, ফুটবল-ক্রীকেট্ প্রভৃতির ক্রীড়াক্ষেত্র বুঝি, মানুষের কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর কোন স্থান বুঝি, দেবতার স্থান কোন পীঠকে ক্ষেত্র বললে বুঝতে পারি, যুদ্ধক্ষেত্র বুঝি, জগন্নাথ বা শ্রীক্ষেত্র বুঝি, ক্ষেত্র মানে দেহ তাও জানি, স্ত্রী হয় তাও জানি, কিন্তু এ আবার কোন "ক্ষেত্র?" এ ক্ষেত্র হোল একটা দেশভাগ—a region of space; কিন্তু সেটা এরূপ বিকৃত (modified) হোয়েছে যে কোন বস্তুর উপর যখনই তার সীমান্ত স্পর্শ করে তখনই একটা বলপ্রয়োগ করে। এটাই যে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হোল তা নয়, তবে যতদূর দেখা গেছে এইরূপই ঘটে থাকে। ক্ষেত্রের প্রকাশে বস্তুর অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক হোয়ে পড়ে; বস্তু না থাকলে ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা যেত না, এটা একেবারে সত্যি।

বস্তুর যা সারভাগ তা শূন্যে বা ইথরে বা দেশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অনন্ত দেশ-সাগরে দ্বীপ স্বরূপ যেন বস্তুগুলা ভাসছে! মধ্যগত মিডিয়মের মর্ম ভেদ কোরে বল বিকশিত হোয়ে উঠছে বস্তু-পৃষ্ঠে। বলের যা বৈশিষ্ট্য তা ঐ medium-এর প্রকৃতির উপর ভর কোরে আছে, সেটাই যেন দেশের ধর্ম। তা হোলে 'বল' হোল 'দেশে'র একটা সীমান্ত ধর্ম—boundary condition।......বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সীমান্তে বিজলিকণা (electric charge) স্ফুরিত হোয়ে উঠবে; আধারমধ্যস্থ গ্যাসের আণবিক ক্ষমতার (molecular activity) পরিণাম সীমান্তে দেখা দেবে চাপ (pressure) রূপে। প্রতি ক্ষেত্রের কোন-না-কোন সৈমান্তিক বৈশিষ্ট্য থাকবেই থাকবে। বস্তুর গতি আলোকের বেগ প্রাপ্ত হোলে আর বস্তুর বস্তুত্ব নেই, তা 'বিচ্ছুরণে' (radiation) পরিণত হোয়ে যায়; ইথরে তরঙ্গের বৈচিত্র্য

দেখা দেয়; বিচ্ছুরণ ক্ষেত্রেও চাপ পরিস্ফুট হোয়ে উঠে। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রেও তাই। তবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের একটা চারিত্রিক বিশেষত্ব এই যে এ ক্ষেত্রের কোন সীমা নেই; ইহা অসীম। বস্তুর অন্তর ভেদ কোরে চার পাশেই এর ক্রীড়া-ক্ষেত্র প্রসারিত। এজন্য বৈজ্ঞানিকরা এই ক্ষেত্র নিয়ে কারবার করতে বেশ বেগ পাচ্ছেন, কেননা এ ক্ষেত্র বড় সোজা চিজ নয়। আমাদের এই ধরিত্রীর আশে পাশে এই মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র বিস্তৃত। দিগন্তবিস্তৃত দেশে ধরিত্রীরূপ একটা বস্তুর স্তূপ বর্ত্তমান থাকায় দেশটাও কিছু বিকৃত হোয়েছে; এবং সেই দেশে অবস্থিত এক এক খণ্ড বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। বস্তুখণ্ডটা নিরবলম্ব হোলেই বল দ্বারা তাড়িত হোয়ে বেগবৃদ্ধি লাভ ক'রে পৃথিবী বক্ষে নির্ব্বাণ লাভ করবে। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের কায (effect) হোল ঐ অসমতুলিত বল—unbalanced force—তৈরী করা; যে বল ভর-ত্বরণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ও বস্তুর গতি ও বক্রতা প্রাপ্ত হোয়ে থাকে। সূর্যের অবস্থিতি হেতু দেশের আরও একটু বিকৃত অবস্থা হোয়েছে, তার জন্য এমন একটি বলের সৃষ্টি হোল যা অসমতুলিত, এবং তার কায হোল পৃথিবীটার গতিকে সূর্যের চারদিকে ঘুরান, এজন্য পৃথিবীর গতিটাও বক্র হোল।

এ সব ত গেল ব্যাখ্যা করবার কথার মারপ্যাচ। জটিল নৈসর্গিক ঘটনাগুলা বুঝাতে গেলে সুবিধারকম বাক্যজাল সৃষ্টি কোরে বোঝান, "ফরমুলা"র সাহায্যে বিশদকরা, এ হোল সায়েন্সের লক্ষ্য; সত্য উপলব্ধি সায়েন্সের লক্ষ্য আর হয় কই? পঁয়কার, ম্যাক্ প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ এই দিকটা ভাল বুঝেন। কলহ ও নির্দ্দোষ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কখন যে সায়েন্স নিজের আদর্শটাকে পিছু হটিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নেমে পড়ে সব ক্ষেত্রে হুঁস থাকাও সম্ভব হয় না। গণিত, গাণিতিক মেটাফিজিক্সে পরিণত হোয়ে যায়। লক্ষ্য যখন সত্যের সন্ধান তখন পলিসিরও নড়চড় হয়। সায়েন্স কি ছিলেন, কি হোয়েচেন,—তা থেকে ধারা বোঝা যায়; কিন্তু কি যে হবেন তা বলা কঠিন। নিসর্গের ধারাটা নানা পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে লীলা কোরে চলেছে, সায়েন্স পিছু-পিছু ছুটেছে গতিভঙ্গীর মানদণ্ড নিয়ে। কি হবেন, তা বলা কঠিন, কারণ সে গতি যে রোধ মানে না। রুদ্ধ হোলে তবে ত প্রতি অঙ্গের measurement নেওয়া চলে। অনেক অবয়ব এক সাথে মিলিত হোলে তবে পুরো রূপটি দেখা যায়। কেবল রাজ্যের ভাঙা-গড়াই চলেছে, কিন্তু সদ্‌বস্তুর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, পেলে ত বহুত্বের বহুত্ব অন্তর্ধান করত। সদ্‌বস্তু বোধ হয় মজা দেখছেন! একেবারে নির্ব্বাক্; ব্যোম ভোলানাথ শবটি হোয়ে পড়ে আছেন, তাঁর বুকের উপর দিয়ে রণরঙ্গিনী ভীমা শক্তি নৃত্য কোরে চলেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য-নূতন রাজ্যের সীমানা লক্ষ্য করচে। আলেয়ার রঙীন নেশায় যুক্তিবাদের পরিচ্ছিন্নতা, মাপামাপির আপেক্ষিকতা বৈজ্ঞানিক বুঝেও বুঝছে না। ভারি আশ্চর্য! প্রকৃতি সুন্দরীর কি মোহিনী শক্তি! এখন নব্যতন্ত্রীর কাছে আইনস্টাইনের নিসর্গবিজ্ঞান ও পরমাণু-অতীত বলবিজ্ঞান কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে, দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হোয়ে আস্‌ছে।

সায়েন্স "নেতি-নেতি"র পাণ্ডা; "ইতি-ইতি" হোলেই ত ছোটা বন্ধ হোয়ে যায়। কার্ল পিয়ার্সন তাঁর "বিজ্ঞানের ব্যাকরণ" প্রবন্ধে বলেছেন যে, সত্যের মন্দিরে পৌঁছুতে গেলে সায়েন্সের দরজা ছাড়া আর দ্বিতীয় দরজা নেই; ঘটনার সন্নিবেশ ও বিভাগ-রূপ যে কাঁকুরে পথ তৈরী হোয়েছে সেই পথ ধর, যুক্তি প্রয়োগ কর, এ ভিন্ন সত্যে উপনীত হওয়া যাবে না। মুখে বল্‌লেন বটে, কিন্তু কাযের বেলায় মেটা-ফিজিক্সের আশ্রয় নিতে গেলেন। সম্বন্ধবাদের ত প্রায় ডজন খানেক পরিকল্পনা বেরুলো, তাতে জ্ঞানের পরিধি যেমন বেড়েছে, অন্তর্দৃষ্টিও বেড়েছে বই কমেছে না। সম্বন্ধ-বাদের বল প্রকাশিত হোচ্ছে নির্বিকল্পকে, absoluteকে, খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায়। বস্তুতে যা লক্ষিত হোচ্ছে সবই আপেক্ষিক; বাস্তবিক যা ঘটছে তা phenomenaর বাইরের জিনিস, এবং সেটা ঘটছে শূন্যাকাশে (empty space), কিন্তু সে আকাশ, সে দেশ (space) বিষয়ে জ্ঞান ত বেশী দূর পৌঁছায় নি। যখন সেই দেশের ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হবে তখন গণিতবিৎ নিশ্চয়ই তুরীয় জ্যামিতির

(hyper-geometry) কোন "ছকে" তার মানদণ্ড নিঃশেষে প্রকাশ করতে কসুর করবেন না। এতাবত্‌কাল জানা গেছে যে "কোন-একটা-কিছু" কোনও কিছু করচে। বিশুদ্ধ গণিতের বিশেষজ্ঞগণ নানান্‌ ছকে সেই "করা"টাকে রূপায়িত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন, কিন্তু আঁধারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ! সত্যকে বেঁধা যাচ্ছে না; কোন্‌ শরটা পেটে গিয়ে লাগবে নিশানা ঠিক হোচ্ছে না। যে যাই বলুক, অধ্যাত্ম-দৃষ্টির একটা প্ল্যাটফরম না থাকলে দৃষ্টিটা ভাল ফোকাস করা যায় না। জড়-বৈজ্ঞানিক আত্মাকে ভুলেছে। "আত্মানং বিদ্ধি" —বেদবাক্য ভুলে অবিদ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। জড় থেকে প্রাণ উদ্ভূত হোয়েছে। প্রাণ থেকে মন, বুদ্ধি, অহংকার। কি কোরে হোলো emergent evolutionistরা কোন সন্ধান পাচ্ছে না। জড়-বৈজ্ঞানিক এক পেশে জ্ঞান নিয়ে ছুটেছে। আইনস্টাইন্‌ বললেন যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ-বেধ-নিমিত দেশ, কাল, বস্তু, এ সবই পঞ্চায়তন ক্ষেত্রের ছায়ামাত্র। কোত্থেকে বললেন, নিশ্চয়ই prioari, বিষয়ীগত জ্ঞান থেকে। তবে কান্তের idealism ত বাজে কথা নয়! Radiation যদি বস্তুতে পরিণত হোতে পারে, তবে সেই radiation এর কোন বিকার হোতে কি প্রাণ (life) আসতে পারে না?

আবার প্রাণ থেকেই ত ধাপে ধাপে মন হোয়েছে, বোধ হোয়েছে, বিচার-বুদ্ধি এসেছে, এবং একটা "অহং"ও গড়ে উঠেছে। কিন্তু কি প্রণালীতে, তা প্রাণীবিত্‌ এখনও জানতে পারে নি, জানলেও তা গণিতের সমীকরণে এখনও মাপা যায় নি। জড়-বৈজ্ঞানিক প্রাকৃত তত্ত্বের সবটুকু এখনও মিলিয়ে দেখে নি। সত্যের সন্ধানে পুরো অবয়বটা নিয়ে এগুতে হবে; পঙ্গু যে, তার বেগ তেমন জোরাল হবে না। আইনস্টাইনের পঞ্চায়তন ক্ষেত্রে জ্ঞাতার মানসিক-ক্ষেত্রের কোন যোগাযোগ নেই। সে এমন কোন্‌ দেশ, কোন্‌ space, কোন্‌ ব্যোম, যার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলে প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে space এর আয়তন (dimension) কতগুলি? কে তা গণনা করবে? বিজ্ঞান তার দ্বারে ঘেঁসতে পারবে না। সে absolute space, পরম ব্যোম; পরম ব্যোমনাথ সেখানে নিদ্রিত; সে ব্যোম অনন্ত নাগের অনন্ত দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, নিস্তরঙ্গ! তাঁর ইচ্ছায় ব্রহ্মরূপী radiation জগতকে গড়ে, ভাঙ্গে; মহামায়ার জাল বিস্তৃত হোচ্ছে,—evolution চলেছে; জাল গুটাচ্ছে—involution চলেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অবিরাম চক্র (cycle) বিঘূর্ণিত হোচ্ছে; equilibrium বলে কোন অবস্থা জগতে নেই; স্বভাবে সবই অনিত্য। নিত্য যা তাই সদ্‌বস্তু; একমাত্র সত্য—অদ্বৈত, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।"

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান-শাখায় ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, তারিখে পঠিত।

নব বর্ষ

শ্রীরমা দেবী

নব বরষের পুণ্য তোরণ-দ্বারে
পুরাতনে দিই অতীতের ফুলডালা;—
নূতনের সুরে পুরাতনে বরি লব
নিবিড় আবেগে পরায়ে নবীন মালা।

সুশান্ত সা

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল

মুকুন্দর সঙ্গে কথা হ'ল সোমবার দিন বিকেল বেলা। মঙ্গলবারটা মাঝে গেল; মঙ্গলবার রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গে, বুধবার ভোরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমি বজরা যোগে রওনা হলাম পীরতলা অভিমুখে।

"মঙ্গলের ঊষা বুধের পা,
যথায় ইচ্ছা তথায় যা।"

এই বচনটা আউড়ে মা বিধান দিয়েছিলেন যে যদি ২।১ দিনের মধ্যে আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতেই হয় ত মঙ্গলবারের রাত্রি পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই আমার রওনা হওয়া উচিত। "ঊষা" কথাটার অর্থও মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

"ডাকে পক্ষী না ছাড়ে বাসা,
তারেই বলে শ্রীশ্রীউষা।"

ছেলে বেলা থেকেই মার এই সব কথার উপর আমার কেমন যেন একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। কেমনই মনে হত, জীবনের সকল কর্ম্মে, মার ইচ্ছা মান্য করে চল্‌লে, আমার মঙ্গলই হবে। যুক্তি তর্ক বিচার দিয়ে মার ইচ্ছা যাচাই করার প্রবৃত্তি আমার কোনও দিনই মনে আসে নি, যেন তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। মঙ্গলের উষায় যাত্রার যথার্থই কোনও শুভযোগের কারণ ছিল কিনা—এ প্রশ্ন আমার মনে একবারও ওঠেনি। মা যখন বিধান দিয়েছেন, মার যখন ইচ্ছা আমি মঙ্গলের উষায় রওয়ানা হই, তখন আর অন্য বিচারের প্রয়োজনই বা কি! আমার মনের দিক দিয়ে শুভযাত্রার পক্ষে সেইটুকুই ছিল যথেষ্ট অনুপ্রেরণা।

পীরতলা অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু তুষার সঙ্গে যায় নি। সোমবার দিন দুপুরবেলা হঠাৎ কেমন একটা খেয়ালের মাথায় তুষারকে সে কথাটা বলাই অন্যায় হয়েছিল। এই ৬।৭ বৎসর ত আমার বিবাহ হয়েছে। এর মধ্যে তুষারের সম্পর্কে নানান অশান্তিতে জর্জ্জরিত হয়ে কতবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমার প্রত্যেক কথাটা বিশেষ বিচার ও বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া উচিৎ। তার সঙ্গে বেফাঁস কথার ফল বেশীর ভাগ সময়ই দারুন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবুও ছাই, তার সঙ্গে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় বিশেষ কিছু বিবেচনা না করে হঠাৎ একটা একটা কথা বলার অভ্যাস আমার তখনও যায় নি।

ফলে এবারও বেশ একটু অশান্তি ঘট্‌ল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুতে গিয়ে প্রথমেই তুষারকে মুকুন্দর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল বিস্তারিত সবই বল্‌লাম। তুষার চুপ করে শুন্‌ল, কোনও কিছু উচ্চবাচ্য করল না। সমস্ত কথা শেষ হওয়ার পরেও সে যখন চুপ করেই রইল তখন আমিই তাকে প্রশ্ন করলাম—

"কি বল? কাজটা ঠিক হয়েছে ত?

"কি জানি! আমি ওসব বুঝিনা!"

এই বলে পাশ বালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে রইল।

তুষারের ব্যবহারে মোটের উপর আমি একটু হতাশ হলাম। জীবনের এত বড় ব্যাপার, এবং বিশেষ করে যার সঙ্গে সেই অত নিবিড় ভাবে জড়িত, তার প্রতি তুষারের এই উদাসীন তাচ্ছিল্যে বোধ হয় আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম। বোধ হয় একটু উত্তেজিত সুরেই বলেছিলাম—

"তার মানে কি? তোমাকে নিয়েই ব্যাপার, তোমার সঙ্গেই ত এ বিষয় আলোচনা-হওয়া উচিত।"

"এর আবার আলোচনার কি আছে। বলেছ, বেশ করেছ। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

এই বলে পাশ ফিরেই চুপ করে শুয়ে রইল। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। মনটা ক্রমেই বিরক্তিতে ভরে উঠতে লাগল। বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বললাম—

"আলোচনা কর আর নাই কর, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রেখে দি। মুকুন্দদের বাড়ীতে আর তোমার না যাওয়াই ভাল।"

কেমন যেন একটা অবহেলার সুরে বললে "বেশ গো বেশ।"

আবার একটু চুপ করে রইলাম। তুষারের ভাবভঙ্গী দেখে মনটা ক্রমেই যেন জলে উঠছিল। হঠাৎ আবার বললাম—

"কথাগুলো কাণে গেল?"

কোনও কথা কইলে না। একটু ঠেলে বললাম "কথা কইচ না যে—কথাগুলো শুনলে ত?"

একটু বিরক্তির সুরে বললে—

"আমি ত কালা নই। ঘুমুতে দেবে না নাকি?"

"এর মানে কি? তুমি এরকম ব্যবহার করছ কেন আমার সঙ্গে?"

"কি ব্যবহার? আমি কী খারাপ ব্যবহার করলাম তোমার সঙ্গে?"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। মন কিন্তু কিছুতেই শান্ত হল না। বোধ হয় একটু 'ঘা' দেওয়ার জন্যই গম্ভীর ভাবে বললাম—

"হ্যাঁ, একটা কথা বলি। তোমার পীরতলায় যাওয়া হবে না।"

"সে আমি জানতাম।"

"তার মানে?"

"মানে আবার কি?"

"কিসে জানলে?"

"তুমি যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না সে আমি জানি। তোমাকে ত আমি চিনি।"

"ছাই চেন।"

"বেশ তাই।"

এই বলে চুপ করে রইল। আসল কথাটা হচ্ছে তুষারকে সঙ্গে করে নিয়ে পীরতলা যেতে আমার মনের দিক দিয়ে কোনও বাধা ত ছিলই না, বরং দুপুরবেলার একান্ত আগ্রহটা ঠিক সমান ভাবে না থাকলেও মোটের উপর নদীপথে বজরায় তুষারের সঙ্গ কল্পনা করতে আমার ভালই লাগ্‌ছিল। কিন্তু বাধা ছিল বাইরের দিক দিয়ে। প্রথমতঃ মার শরীর ভাল নয়, তিনি একলা বাড়ীতে থাকবেন, আর ঘরের একমাত্র বউ বজরায় আমার সঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে—জিনিষটা মনের মধ্যে কেমন যেন অশোভন বলে মনে হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত বাবা কিংবা আমাদের পূর্ব্বপুরুষে কেউ কখনও স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে মহল পর্য্যবেক্ষনে মফস্বল যান নি, তাই হঠাৎ সস্ত্রীক মহলে বেরুলে জিনিষটা সমাজের দিক দিয়েও বিশেষ কটু দেখাবে—এ বিষয় যতই ভাবতে লাগলাম ততই আমার মনে আর কোনও সন্দেহই রইল না। এবং সব চেয়ে বড় কথা, কেমন যেন মনে হচ্ছিল, এ বিষয় মা কখনই মত দেবেন না। এবং আমার বিশেষ পেড়াপীড়িতে মুখে 'না' না বললেও মনে মনে যে খুসী হবেন না এটা নিশ্চিত। তাই দুপুর বেলা তুষারকে কথটা বলার পর সন্ধ্যে থেকে এই সব নানান দিক বিবেচনা করে তুষারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল।

কিন্তু তুষারকে একবার আশা দিয়েছি, এখন তাকে আবার নিরাশ করি কেমন করে। তুষারকে ত আমি চিনি। দুপুরবেলা কথাটা শোনা মাত্র সে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, "না" বললে সে তেমনি রাগে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে; কোনও কথা শুনবে না, কোনও যুক্তি মান্‌বে না। তাই মনে মনে যখনই ঠিক করে ফেল্‌লাম যে তুষারকে সঙ্গে নেওয়া চলেই না তখন থেকেই সহজ সরল ভাবে তুষারের মনটাকে বিক্ষিপ্ত না করে, কেমন করে তুষারকে আবার কথাটা বলা যায়, সারা সন্ধ্যাটা কেবল সেই চিন্তাই করেছি। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কথাটা তুষারকে বলা কোনও দিক দিয়েই সহজ বলে মনে হয়নি।

এই সব কারণে রাত্রে যখন শুতে গিয়েছিলাম, প্রাণের

মধ্যে যে আমার আতঙ্ক একটুও ছিল না—এমন নয়। কিন্তু মুকুন্দর বিষয় কথা বল্‌তে বল্‌তে তুষারের ভাব ভঙ্গীতে মন ক্রমে আপনা থেকে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে—যে কথাটা বল্‌তে প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছিল অতি সহজভাবে বেশ জোরের সঙ্গেই তুষারকে সেই কথাটা জানিয়ে দিলাম। কারণটাও শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। বল্‌লাম—

"মার শরীর ভাল না। তিনি একলা বাড়ীতে থাকবেন, আর তুমি বজরায় আমার সঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে—এ অত্যন্ত অন্যায়।"

বেশ একটু তীক্ষ্নস্বরে বললে—

"তোমার ন্যায় অন্যায় নিয়েই তুমি থাক। এখন আমাকে একটু রেহাই দাও—দোহাই তোমার।"

আমার মাথায় কেমন যেন সেদিন সুবুদ্ধি এল—আমি আর কিছু বললাম না। নইলে বিরোধটা ক্রমেই কুৎসিত কলহে পরিণত হয়ে একটা দারুণ অশান্তির আগুনে জ্বলে উঠ্‌ত— পুড়িয়ে ছাই করে দিত প্রাণখানা।

পরের দিন, সমস্ত দিনটা তুষারের ব্যবহারে সেই একটা উদাসীন তাচ্ছিল্য, আননে সেই একটা মর্ম্মভেদ বিরক্তি ও বিষাদে ভরা নিরলস চাহনি, যেরূপ পূর্ব্বে বহুবার দেখেছি।

সংসারে সমস্ত কাজই করে যাচ্ছে, এমন কি আমার কাপড় চোপড় গোছান থেকে আমার যাত্রার কোনও আয়োজনই বাদ দেয়নি—কিন্তু সকল কর্ম্মের মধ্যেই পদে পদে ফুটে উঠছিল একটা নির্লিপ্ত অবহেলা, যেন এ সব কোনও কাজেরই এতটুকু মূল্য দিতে তার প্রাণ একেবারেই বিমুখ।

রাত্রে শুতে গিয়ে বিশেষ সাবধানে তুষারের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা সুরু করলাম—মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, যেমন করেই হোক, কোনরূপ কলহ দ্বন্দ আজ এড়িয়ে চলতেই হবে, কেননা রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গেই ত আমার যাত্রার সময়। এবং বোধ হয় মনে মনে একবার স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিলাম, যখন দেখলাম, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষারের ব্যবহার বেশ সহজ হয়ে উঠ্‌ল। একবার শুধু অভিমানের সুরে বললে "যদি নিয়ে নাই যাবে, আশা দিলে কেন? আশা দিয়ে নিরাশ কর—বড় নিষ্ঠুর তুমি। আমি ত সেধে যেতে চাইনি।"

পীরতলায় একলা যাইনি। সঙ্গে গিয়েছিলেন—দাদা।

মঙ্গলবার দিন সকালবেলা দাদা হঠাৎ আমাকে বললেন "সুশন! তুই নাকি ৪।৫ দিনের জন্য মহলে যাচ্ছিস? আমিও যাব।"

আমি অবাক হলাম। দাদা নিজে ইচ্ছে করেই জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখা ছেড়ে দিয়েছেন; অনেক অনুরোধ করেও মহলে দাদাকে পাঠান যায়নি। সেই দাদা হঠাৎ স্বইচ্ছায় মহলে যেতে চাইছেন—কিছুই মানে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—

"তোমার হঠাৎ এ সুবুদ্ধি হল?"

"মনটা অনেক দিন ধরেই কি রকম যেন হাঁপিয়ে উঠছে। একটু বেরুতে ইচ্ছে করছে। আর তোর সঙ্গে একটু বিশেষ পরামর্শও আছে।"

"কি বিষয়?"

"সে বলব এখন।—একটু নিরিবিলি সময়ের দরকার। তোর সঙ্গে গেলে বেশ হবে।"

দুপুরবেলা খেতে বসে মাকে যখন কথাটা বললাম, মা খুসীই হলেন। বললেন "বেশ ত। ভালই ত। প্রসুন যদি আবার একটু কাজে কর্ম্মে মন দেয়—সে ত অতি সুখের কথা। আহা বেচারী! আপন মনে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়—ওর মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়।"

দাদার কথা ভাবলে, দাদার বর্ত্তমান অবস্থায়, আমি কিংবা মা কেউই মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতাম। আপন মনে সংসারের কোণে কোণে পাশ কাটিয়ে, কোনও রকমে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিল—কী ভাবে, কী করে, তার সঙ্গে পরিবারের কারও কোনও যোগই ছিল না। কি সংসারের কি সমাজের ছোট বড় কোনও কাজেই কেউই দাদাকে কোনও বিবেচনার মধ্যেই নিতনা—যেন ওর অস্তিত্বটার কোন মূল্যই নেই ইহজগতে। তাই মার কথাগুলিতে আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিল এবং দাদাকে সঙ্গে নিয়েই আমি রওয়ানা হলাম।

শীতকালের সকালবেলা। চারিদিকে তাজা সোণালী রোদটুকু ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বজরাখানি বেগবতী নদী দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে পূর্ব্বমুখে। মুখ হাত ধুয়ে,

আমি ও দাদা বজরার ছাদের উপর একটা ফরাস পাতিয়ে নিয়ে তার উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছিলুম। মাধবপুর গ্রাম অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি, আর কিছু দূর এগিয়ে গেলেই সামনে বড় নদী।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি একটা পরামর্শ ছিল না তোমার আমার সঙ্গে?"

দাদা বললেন "হ্যাঁ সেই কথাটাই ভাবছি।"

"কি কথা?"

একটু চুপ করে থেকে দাদা বললেন—

"আমি একটা বই লিখছি।—"

একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললাম "তুমি বই লিখছ? কি বই?"

স্কুল ছাড়ার পরে বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়ে দাদা বাংলা ভাষাটা বেশ ভালই শিখেছিলেন এ খবর আমি জানতাম। শুধু তাই নয়, আমি যখন কলেজে পড়ি, ছুটীতে বাড়ীতে এলে দাদা একবার তাঁর একখানি রচনার খাতা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশীর ভাগই পদ্য এবং কয়েকটী গদ্য রচনা। খাতাখানির একটী কবিতা, সে বয়সে আমার কিন্তু বেশ ভালই লেগেছিল এবং সে কথা দাদাকে আমি বলেছিলামও। কবিতাটী সে বয়সে পড়ে পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আজও কয়েক লাইন মনে আছে।

আঁধার আঁধার বিশ্ব সবি অন্ধকার
আঁধারেই গড়া এই জগৎ বিমান।
সূর্য্যখানি এসে শুধু আলোকে তাহার
আঁধার ডুবায়ে দেয়, আবার যেমন
সবিতা ডুবায়ে যায় আলোক তাহার
সবি অন্ধকার।
সোণার কিরণ লয়ে আসে চাঁদখানি
ক্ষণেক জাগিয়া ওঠে বিশ্ব প্রকৃতি।
নিমেষের তরে হাসে তড়িৎ যেমনি
ধরণী জাগিয়া ওঠে; আপন মুরতি
আপনি ফিরিয়া পায় তখনি আবার
আবার আঁধার।

তবে কেন কাঁদ তুমি অভাগা মানব,
শান্তি নাই সুখ নাই মোদের জীবনে?
আঁধারে মোদের ঘর, আঁধারেই সব
আঁধার আপন তব, আলোক এখানে
অতীতের স্মৃতিটুকু, ওপারের ছায়া
দেবতার মায়া।
এ জীবনে তাই কিগো যা কিছু মলিন
যা কিছু করুণ যাহা অশ্রু দিয়ে ঘেরা
আমার আপন যেন, হাসিত দুর্দ্দিন—

তারপর আর মনে নাই। তবে এটুকুও স্পষ্ট মনে আছে, কবিতাটী টুকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে এক মাসিক পত্রে পাঠিয়েছিলাম—কিন্তু ছাপান হয়নি।

যাক, সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। ইতিমধ্যে দাদার সাহিত্য চর্চ্চা কিছু ছিল বলে আমার জানা ছিল না। তাই হঠাৎ আজ সকালে দাদা বই লিখছেন শুনে আমি সত্য সত্যই অবাক হয়েছিলাম।

দাদা বললেন "বইখানির নাম এখনও কিছু ঠিক করিনি। বিবাহ ও সামাজিক সমস্যা'—এই রকম ধরণের একটা নাম দেব।"

আমি বললাম "ও—তাহলে কবিতার বই নয়!"

বললেন "না। বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা করে বইখানি আমি লিখেছি। কিন্তু একটা বিষয় আমার দারুণ সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে। তুইত অনেক লেখাপড়া করেছিস্—তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।"

কৌতুহল হল। জীবনের কোন জটিল সমস্যায় বা চিন্তা-জগতে দাদার যে কোনও দখল আছে এ আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"সমস্যাটা কি শুনি?"

বললেন "প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস বিবাহ জিনিষটা শুধু পুরুষ ও স্ত্রীর একটা সামাজিক বন্ধনই নয়, এ সম্পর্কের মধ্যে যথার্থ একটা ধর্ম্মের বন্ধনও আছে। এবং এ বিষয় আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শই খাঁটী আদর্শ।"

"বেশ তারপর?"

"এবং আমার আরও বিশ্বাস, ভগবান যখন পুরুষ তৈরী

করেন, তারই যথার্থ উপযোগী একটা রমণীও সৃষ্টি করেন এবং তাদের পরস্পরের মিলনের মধ্য দিয়েই উভয়ে জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করে।"

"বুঝলাম। তারপর?"

"এখন কথা হচ্ছে পুরুষের জীবনের দিক দিয়ে প্রথমবার বিবাহে যদি কোনও রকম অমিল হয়, অর্থাৎ যদি যথার্থ সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে মিলন না হয়, তবে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে কোনও বাধা নেই আমাদের হিন্দুধর্ম্মে। এবং শুধু বাধা নেই নয়, আমার মতে করাই উচিত। কেননা নিজের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।—কেমন?"

"বলে যাও—শুনি।"

"কিন্তু রমণীর জীবনের দিক দিয়ে ত এ নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। রমণীর জীবনে ত একাধিক বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করবার অধিকার তাদেরও ত আছে।"

"এই তোমার সমস্যা?"

"হ্যাঁ। আমি অনেক দিক দিয়ে জিনিষটা চিন্তা করে দেখেছি। কিন্তু কোনও দিকেই কোনও কূল কিনারা পাচ্ছিনা।"

"কেন, এ সমস্যার সমাধান ত অতি সোজা। তোমার গোড়ার কথাগুলো যদি সব সত্য হয়—অবশ্য আমি সেগুলি সব মেনে নিচ্ছি না—তাহলে রমণীদেরও সে অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম বিবাহে যদি তাদের মিলন সার্থক না হয়, যদি তাদের জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে বাধা হয়, তবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ওদের দেশের মত সে প্রথা আমাদের সমাজেও চালাতে হবে।"

"না—না। সেত একেবারেই অসম্ভব।"

"কেন? অসম্ভব কেন? একবার মন্ত্র পড়ে দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে, সে মিলন সত্যই হোক বা মিথ্যাই হোক চিরকাল সেটাকে মেনে চলতে হবে' তারই বা কি মানে আছে? এই রকম একটা মিথ্যা বন্ধনের মধ্য দিয়ে সত্যকারের ভাল ভাল জীবন যে কি রকম ধ্বংস হয়ে যায় তারও ত দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে আমার সত্যিকারের মনের কথা সেদিন সকালে দাদাকে ঠিক বলেছিলাম কিনা—এখন আমার মনে নাই। এবং দাদার গোড়ার দিককার কথাগুলির মধ্যে যে সমস্ত ভুল আমার মতে স্পষ্ট ভাবে ধরা যাচ্ছিল, তা নিয়েও কোন তর্ক তুলিনি। বিবাহ যে ইহকাল পরকাল নিয়ে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন—এ বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না। এবং সহধর্ম্মিনী না হলে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে বাধা ঘটে, এ বিষয়ও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু তবুও এ সব নিয়ে কোনও তর্ক তুলিনি। কেন না দাদার মনের দিক দিয়ে এ সব নিয়ে তর্ক করার কোনও সার্থকতা ছিল না। দাদার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দাদার অগাধ অন্ধবিশ্বাসে কোনও দিক একটু 'ঘা' মেরে দাদার মনটাকে সামান্য একটু মুক্তি দেওয়াও যায় তাহলেই দাদার সত্যিকারের উপকার করা হবে। এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে দাদার সমস্যায় দাদার মনের চিন্তাধারার অনুসরণ করে যেখানে তাতে বাধা পড়েছে সেইখান দিয়েই তার গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই যেখানে দাদার সমস্যা সেইখান দিয়েই তর্কটা তুললাম—বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

বললাম "যদি নিজের মন সায় না দেয়, কোনও কিছুর প্রতিই অন্ধ বিশ্বাস ভাল নয়। হিন্দু শাস্ত্র অবশ্য আমার ভাল পড়া নেই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যদি বারণও করে থাকে তবুও আমি বলব—বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা সমাজে থাকাই উচিত। তাতে সমাজের মানুষের মঙ্গলই হয়।"

দাদা বললেন "কিন্তু—"

বললাম "এর মধ্যে কোনও 'কিন্তু' নাই।" কিন্তু থাকতে ও পারে না। তোমার ও 'কিন্তুটা' আমাদের একটা বহুকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারের ছোট একটা 'কিন্তু' মাত্র। ও 'কিন্তু'র পিছনে যুক্তি নেই।

"কিন্তু—মেয়েদের সতীত্ব যে একটা মস্ত বড় ধর্ম্ম।"

"সে কথা ত আমি একবারও অস্বীকার করছিনা। কিন্তু সতীত্ব কথাটার প্রতি অন্ধ অচলা ভক্তিতে আমার আপত্তি আছে। ভক্তির আগে সতীত্ব জিনিষটা যে কী সেটা ভাল করে বোঝা দরকার। না বুঝে ভক্তিইত অন্ধ ভক্তি।"

"তার মানে ?"

"আমি বলতে চাই সতীত্ব তখনই বড় ধর্ম্ম যখন সেটা কায়মনোবাক্যে খাঁটী—অর্থাৎ তার মধ্যে কোনও ভেজাল নেই। মনের মধ্যে ঘোর অমিল, কিন্তু, বাইরের দিক দিয়ে ষোল আনা সতীত্ব বজায় রেখে চলার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, ধর্ম্ম নেই।"

"কথাটা ঠিক বুঝলাম না।"

"আমার কথা হচ্ছে সতীত্ব ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ বা মেয়েদের পুনর্ব্বার বিবাহের কোনও বিরোধ নেই। তুমিই ত বলছিলে বিবাহ বন্ধনটা সব সময়েই যে ঠিক সত্য হয়ে ওঠে তার মানে নাই। যেখানে তুমি পুরুষদের পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহণের বিধি দিচ্ছ, আমি বলি মেয়েদের বেলায়ও তাই। কথাটা হচ্ছে বিবাহ বন্ধন যদি সত্য হয় তখন প্রাণের নিষ্ঠা দিয়ে তাকে কায়মনোবাক্যে সার্থক করে তোলা, সুন্দর করে তোলার নামই সতীত্ব। কেন—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী, এই পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়— এই কথাই ত হিন্দুশাস্ত্রে বলেছে না ?"

দাদা খানিকক্ষণ চুপ করে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন। যেন আকাশ পাতাল কি সব ভাবছেন। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ভাবলাম—এ রকম ভাবে দাদার সঙ্গে কখনও কথা কইনি। এই রকম ভাবে আলোচনায় দাদার মনের অন্ধ সংস্কার যদি কিছুমাত্রও দূর হয় সত্যই দাদার মনের অনেক উপকার হবে। দাদার বিষয় ভাবলে আমার কেমনই মনে হোত, দাদার ভিতরের কিছুই জীবনে পরিস্ফুট হলনা। কতকগুলি অন্ধ সংস্কারের চাপে। কিছুক্ষণ পরে বললাম "আচ্ছা দাদা! তোমার মতে ত সহধর্ম্মিনী না হলে জীবন পরিপূর্ণ হয় না কেমন ?"

বললেন "হ্যাঁ। ভগবানই ত মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—পুরুষ ও রমণী। এদের মিলনের মধ্য দিয়েই মানুষের পূর্ণতা লাভ হয়।"

একটু ইতস্তত করে বললাম "তাহলে—তাহলে তোমার আবার বিবাহ করা উচিত।"

ভেবেছিলাম কথাটা এই দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে হয়ত বা দাদাকে আবার বিবাহ করতে রাজী করানও যেতে পারে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটু আশাও হয়েছিল, —দাদা নিজেই যখন বিবাহের বিষয় এত চিন্তা করেছেন, পুরুষের একাধিক বিবাহে যখন তাঁর এত আগ্রহ হয়ত বা নিজের বিষয় চিন্তা করে বিবাহ করতে এখন তিনি রাজী। একটু চুপ করে থেকে শান্ত সুরে দাদা বললেন

"আমার কথা স্বতন্ত্র। প্রথমবার বিবাহেইত আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়েছিল—ষোল আনা। সইল না। ভগবান সে পরিপূর্ণতা ছিন্ন করলেন স্বহস্তে। আমার জীবন যে অভিশপ্ত। আর কোনও উপায় নেই।"

এই কথা কয়টী বলে দাদা কেমন যেন একরকম করুণ হেসে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার বুকের মধ্যটা দুলে উঠল।

* * * * *

পীরতলার কাজ আমার একবেলায়ই শেষ হল। পীরতলা গিয়ে আমাদের বজরা নোঙর ফেল্‌ল শেষরাত্রে—ভোরের একটু আগে। সকালবেলা উঠে মুখ হাত ধুয়ে পীরতলার কাজটুকু শেষ করতে বেলা ১১টা বাজল। গোমস্তা ভৈরব ঘোষালের কাছে শুনলাম নায়েব নবীন মুন্সী কাছারী বাড়ীতে নেই। আমরা যেদিন পীরতলা পৌঁছলাম, তার আগের দিন বিকেলে তিনি হঠাৎ দেশে রওনা হয়ে গেছেন। নবীন মুন্সী না থাকার দরুন কাজটা সহজই হল। ভৈরব ঘোষালের কাছ থেকে সমস্ত অবস্থাটা শুনে, খাতা পত্র দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম ভৈরব ঘোষালের কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। দুচার জন মাতব্বর প্রজাকে ডাকিয়ে তাদের সামনে নবীন মুন্সীর বরখাস্তনামা লিখে দিয়ে চারিদিকে ঘোষণা করে দেওয়ার কথা বললাম। এবং আলী মিঞার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রচার করে দিলাম—এ বছরের মত পীরতলা মহলের প্রজাদের খাজনা মাফ করা হল।

ছোট একটী নদীর তীরেই কাঁচা চার চালা একখানা বড় ঘরে আমাদের কাছারী বাড়ী। ঘরটাতে দুখানি কামরা, সামনে একটী বারান্দা। ঘরটীর মাটীর দেওয়ালে চুনকাম করা—মেঝে পাকা। কাছারী বাড়ীর পিছনেই বেশ বড় একটা পুষ্করিণী এবং তারই কিনারায় একটী দোচালা রান্না ঘর। পুষ্করিণীটির চারিদিকে তরী তরকারী ফলের বাগান।

আমাদের কাছারী বাড়ীর কিছুদূরে নদীর ধারে ধারে খান কয়েক দোকান ঘর। এ ছাড়া আশে পাশে আর কোনও বাড়ী নেই। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চষা ক্ষেতের মাঠ। এবং মাঠের ওপারে দূরে দূরে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী-মণ্ডিত ছোট বড় সব ঘর দেখা যায়—ঐ খানেই গ্রাম।

কাজ শেষ করে আমি ও দাদা কাছারী বাড়ীর পুষ্করিণীতে নেমে স্নান করে কাছারী বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করলাম। দুপুর বেলা একটু বিশ্রাম করার পর সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলে পড়লে আমাদের নৌকা ছাড়া হল। বিকেলের দিকে রওনা হয়ে আসার পূর্ব্বে অনেক প্রজা কাছারী বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল এবং যাত্রার পূর্ব্বে বরকন্দাজটা 'দুম্ দাম্' দুচারটে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করল এবং প্রজাদের কাছ থেকে "নজর"ও পাওয়া গেল মোটামুটী মন্দ নয়।

ফিরবার পথেও দাদার সঙ্গে অনেক বিষয় নানান রকম আলোচনা করতে করতে ফিরলাম। রাত্রে দারুণ শীতে বোটের জানালাগুলি সব বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় বসে দাদার সঙ্গে গল্প সুরু হ'ল। একথা ওকথার পর দাদা বললেন—

"তোর সঙ্গে দুদিন কথা বলে আমার মনে হচ্ছে ইংরাজী লেখাপড়া শিখলে আর কিছু হোক আর না হোক বুদ্ধিটা নানান দিকে খেলে।"

বললাম "অন্ততঃ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক চোখ বুজে কিছু নেয় না। সব জিনিষই যাচাই করে দেখে। যাচাই করলেই ত প্রত্যেক জিনিষের ঠিক মূল্য ধরা যায়।"

"তবে ইংরাজী লেখা পড়ায় মনটা কেমন যেন একটা বিদেশী ভাবাপন্ন হয়ে যায়। আমাদের সনাতন আদর্শের প্রতি আস্থা হারায়।"

"জানি না। আদর্শটা আসলে খাঁটী কিনা একবার পরখ করে দেখে—এই মাত্র।"

"আমাদের যে সব সনাতন আদর্শ, তার মধ্যে পরখ করবার কিছুই নাই। সেকালের মুনি ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না বা আমাদের চেয়ে বুদ্ধি তাঁদের কোন অংশেই কম ছিল না।"

"ওটা ত একটা নিতান্ত মামুলী কথা। তাঁরা মূর্খ ছিলেন একবারও ত বলছি না। তাঁদের শিক্ষা বুঝতে হবে, প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে—তবেই ত সেটা আমার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়াবে।"

"তাত বটেই।"

"তবে ? বুঝতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁদের দেওয়া কোনও আদর্শে যদি আমার প্রাণ সায় না দিল তবে অন্তত সেটা আমার কাছে সত্য হল না।"

"সত্য যেটা সেটা চিরকালের সত্য, সকলের জন্যই সত্য। আমার কাছে যেটা সত্য সেটা তোমার কাছে নয়,—এ কথার কোনও মানে নাই।"

কথাটা শুনে মনে মনে খুশী হলাম। এসব কথা নিয়ে দাদা যে ঠিক এ রকম ভাবে কথা কইতে পারেন—এ আমি কোন দিনই ধারণা করি নি।

বললাম "তাত বটেই। সত্য নিয়েত বিবাদ নয়, বিবাদ হচ্ছে সত্যের উপলব্ধি নিয়ে। কোনও সত্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাছে ধরা না দিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার হল না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে মানলে নিজের কাছেই নিজে অবিশ্বাসী হতে হয়। ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যে তাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে বলেই সেটা সত্য তারই বা বিশ্বাস কি ?"

দাদা চুপ করে ভাবতে লাগলেন। কোনও উত্তর দিলেন না।

বললাম "যাক্ ও সব বড় বড় কথা। তোমার সমস্যার মীমাংসা হল ?"

বললেন "আমার সমস্যার মীমাংসা যে ভাবে তুই করেছিস্, যুক্তির দিক দিয়ে মন তাতে সায় দেয়। কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি ?"

"কিন্তু সতীত্ব কথাটা বলতে তুই যা বুঝিস, তাতে মন কি রকম সায় দেয় না।"

"কেন ? সায় না দেওয়ার মধ্যে সংস্কার ছাড়া কোনও যুক্তি আছে কি ?"

"মেয়েদের দেহেরও ত একটা পবিত্রতা আছে।

"আছে অবশ্য। সেই জন্যই বেশ্যাদের জীবন এত ঘৃণিত। কিন্তু দেহের পবিত্রতা রক্ষা শুধু মেয়েদেরই ধর্ম্ম নয়। পুরুষদেরও। এবং একাধিক বিবাহে কি পুরুষ কি রমণী কারুরই দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয় না।"

দাদা আবার চুপ করে ভাবতে লাগলেন। আমিও কিছুক্ষণ কোনও কথা কইনি। খানিকক্ষণ এই ভাবে কাটল। বংশী চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করলে—

"রান্না হয়েছে। খাবারেরর ব্যবস্থা করব কি?"

দাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কি বল? খাবে এখন?"

দাদা বললেন "দিক্।"

বংশী চলে গেল।

বল্লাম "আসল কথাটা কি জান—পবিত্রতাই বল, ধর্ম্মই বল, সে সব দেহে নয়, মনে। যেখানে মন পবিত্র, খাঁটী, সেখানে অপবিত্রতা দেহকে স্পর্শ করতে পারে না। আর মনই যদি অশুচি হয়, খোলসটাকে পবিত্র রাখার মূল্য বেশী কিছু নয়। মেয়েদের সতীত্ব কথাটা নিয়ে আমাদের দেশে চিরকালই একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাতে মোটের উপর লোকসানই হয়েছে—লাভ হয় নি।"

* * * * * *

যেদিন রওয়ানা হলাম তার পরের দিন রাত আটটা আন্দাজ বাড়ীর ঘাটে এসে নৌকা লাগল। মোটের উপর তিন দিনেই পীরতলা ঘুরে এলাম। এত শীঘ্র যে ফিরে আসতে পারব এটা আমরা কেউই আশা করি নি। সবাই ভেবেছিলাম—পীরতলা গিয়ে কাজ কর্ম্ম সেরে ফিরে আসতে অন্ততঃ ৫ দিন লাগবে।

অন্দরে গিয়ে মার সঙ্গে প্রথমে দেখা হ'ল। মা অবাক হলেন।

বললেন "এর মধ্যে ফিরে এলি?"

বললাম "কাজ হয়ে গেল ফিরে এলাম মোটের উপর ২৪ ঘণ্টা ত যেতে লাগে।"

মা আর কোনও কথা কইলেন না। আমি এদিক ওদিক নজর দিয়ে ওপরে শোবার ঘরে গেলাম—কিন্তু তুষারকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কাপড় ছেড়ে খানিকটা চুপ করে শোবার ঘরে বসে রইলাম। তুষার এল না। একটু অবাক হলাম—কোথায় কি এমন কাজে ব্যস্ত যে আমি এলাম, আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে এল না। আবার নীচে এলাম। এ ঘর ও ঘর—চারদিকটাই একবার ঘুরে এলাম। কোথাও নেই। এর মানে কি? এত রাত্রে গেল কোথায়?

নীচে বারান্দায় মার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। মা রান্না ঘরের দিক থেকে ফিরে আসছেন মা জিজ্ঞাসা করলেন—

"এখন খাবি ত? ভাত দিতে বলি—কেমন? তোর দাদা এখন খাবে ত?"

বললাব "হ্যাঁ। দাদা ত সন্ধ্যা আহ্নিক বোটেই সেরে এসেছেন।

মা রান্না ঘরের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছেন দেখে ডাকলাম "মা!" মা ফিরে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম "বউ কোথায়?"

মা জবাব দিলেন "ও বাড়ী গেছে।"

"ও বাড়ী" বলতে মুকুন্দদের বাড়ীই বোঝায়। আমার শরীর হঠাৎ কেমন শিউরে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

মা তেমনি নির্লিপ্ত সুরেই জবাব দিলেন "মুকুন্দর বউয়ের নাকি কি অসুখ করেছে।"

মার গলার সুরে এবং কথা বলার ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা গেল তুষারের ওবাড়ী যাওয়ার দরুণ কোথায় যেন কি একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে মার মনে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম "কি অসুখ?"

বললেন "বুধবার দুপুর থেকে জ্বর হয়েছে। এমন বিশেষ কিছু নয়!"

"কখন গেছে?"

"এই তিন দিন ধরে বেশীর ভাগই ত সেইখানেই থাকে। আজও ত দুপুর বেলা খেয়ে উঠেই গিয়েছিল। বিকেলে ফিরে এসে কাপড় চোপড় কেচে সন্ধ্যাবেলা আবার গেছে। কত রাত্রে ফিরবে কে জানে।"

"ওর যাওয়ার এত কি দরকার?" আমার গলার সুরে যে ঠিক কি ভাব প্রকাশ হয়েছিল আমার এখন আর ঠিক মনে নাই।

মা বললেন "তার নাকি সেবা করবার লোক কেউ নেই।"

হঠাৎ কেন জানি না জিজ্ঞাসা করলাম—

"রাত্রে আলো নিয়ে লোক যাবে বুঝি আনতে?"

"কখন আসবে তার ত ঠিক নেই। মুকুন্দই আলো নিয়ে পৌঁছে দিয়ে যায়।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। মা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রান্না ঘর অভিমুখে চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে মাকে বললাম—

"থাক্ মা! খাবার একটু পরেই দেবে। আমি মুকুন্দর স্ত্রীর খবরটা নিয়ে আসি।"

এই বলে তখুনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

মুকুন্দর বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ মনে কেমন যেন একটা দ্বিধা হ'ল। যে মুকুন্দকে দু দিন আগে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—জীবনে মুখ দেখব না বলে, আমিই চলেছি তার বাড়ীতে! একথা বাড়ী থেকে বেরুবার সময় ত মনে হয়নি, পথে চলতে চলতেও একবারও মনে আসে নি। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন প্রাণ নিয়ে হন্ হন্ করে চলে এসেছি—মুকুন্দর বাড়ীর দিকে।

একটু থমকে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম—না, যাব না। বাড়ী ফিরে গিয়ে একটা লোক পাঠিয়ে তুষারকে ডেকে পাঠাই। আবার মনে হল—মিথ্যা আমার এ অভিমান। এ অভিমান রাখবার ঠাঁই নেইত আমার এ জগতে। সোজা হেটে মুকুন্দদের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। এক তালার বাইরের বড় ঘরটায় কোনও লোকজন ছিল না। দু একজন গোমস্তা যারা বাড়ীতে থাকে তারা বোধহয় খেতে ভেতরে রান্না বাড়ীতে গিয়েছিল, ঘরে একটা আলো কমান ছিল মাত্র।

ঘর পেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠতে লাগলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উপরের বারান্দা এবং তারই পাশে পাশাপাশি তিনখানা ঘরের শেষেরটায় মুকুন্দর শোবার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উপরের কোনও মানুষের সাড়া শব্দ পেলাম না। খানিকটা উঠে উপরের কাছাকাছি হওয়া মাত্র মুকুন্দর গলা পেলাম "কে?"

উপরের বারান্দায় কোনও আলো ছিল না। মুকুন্দর শোবার ঘরে একটা হ্যারিকেন কমান ছিল, তারই একটা ক্ষীণ রশ্মি বারান্দার অন্তদিকে একটা রেখাপাত করেছিল মাত্র। মুকুন্দর ঘরের সামনে বারান্দার একটী অন্ধকার কোণে একখানি খাট পাতা ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে মনে হল মুকুন্দ তারই উপর বসে আছে।

তুষার কোথায়? অন্ধকারে ঐ খাটেই বসে আছে না কি? ভাবতে শরীর কেমন যেন কেঁপে উঠল। তবে বোধ হয় না। মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখ যখন, নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে তার স্ত্রীর পাশে বসে তার সেবা করছে। মুকুন্দর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সটান চলে গেলাম একেবারে খাটের কাছে।

তুষার খাটের উপরেই গা এলিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল—আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

আশ্চর্য্য হয়ে মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ওমা! তুমি কখন এলে? খবর দাও নি কেন?"

সেই প্রথম, স্পষ্ট মনে আছে, জীবনে সেই প্রথম, প্রাণে প্রচণ্ড একটা ঘা লাগল। মনে হল, প্রাণের একটা দিক গেল ধ্বসে। নতুন আলোয় একটা অন্ধকার দিক যেন স্পষ্ট হয়ে সজাগ হয়ে উঠল।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলাম

"খুড়োমশাই কোথায়? খুড়ী মা কোথায়?

কাকে যে প্রশ্ন করলাম জানিনা।

মুকুন্দকেত নয়ই—তুষারকেও নয়। তুষারই উত্তর দিল। বললে "খুড়োমশাই খেতে গেছেন—খুড়ীমাও সঙ্গে গেছেন। এই ত গেলেন। খুড়ীমা আমাকে বসিয়ে রেখে গেছেন, তিনি এলেই আমি যেতাম।"

একটু চুপ করে থেকে বললে "তা আমি এখন যাই ঠাকুরপো। এই ত একটু আগে Temperature নিলাম। জ্বর যখন এখনও আসেনি, তখন আজ আর আসবে না।"

দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বললে "না—বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।"

উঠে দাঁড়িয়ে খাট থেকে গায়ের কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে "চল"। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললে,

"খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে বুঝি?"

কিছুই বললাম না। চলতে লাগলাম। তুষারও আমার সঙ্গে চললো। বাড়ী থেকে বেরিয়ে, পথে চলতে চলতে মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখের কথা, সেবার দিক দিয়ে খুড়ীমার অপদার্থতার কথা—কত যে কি সব বলে যেতে লাগল, কিছুই আমার কাণে গেল না। তবে এইটুকু মনে আছে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত্রে সেই নির্জ্জন পথে ২।১ বার আমার গা ঘেঁসে এগিয়ে এসেছিল, আমি কেমন যেন চমকে সরে গিয়াছিলাম—কোনও কথা বলিনি। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বাসন্তিকা

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

হে বাসন্তী, দক্ষিণের বাতায়নে উড়াইয়া দিলে যবে
রাণীর গৌরবে
বক্ষ হতে খুলি তব শ্যামায়িত যৌবনের আতপ্ত অঞ্চল,
ছত্রভঙ্গ পালাইল শীতসৈন্যদল,
শাল-শিরীষের বনে সর্ব্বদিক দিয়া
বিজিতের পদধ্বনি পলায়িত শুষ্কপত্রে উঠিল ক্রন্দিয়া।

অসুন্দর অঘ্রাণের আঘ্রাণের শঙ্কায় বিহ্বল
দলে দল
বনে বনে বনপুরবধূ
যৌবনের যতো বক্ষ-মধু
গুপ্ত করে রেখেছিল অবরুদ্ধ অন্তঃপুর তলে
মলিন গুণ্ঠনে জীর্ণ দুঃখের অঞ্চলে;

সহসা তোমার মত্ত মলয়-আহ্বানে
গানে গানে
গুণ্ঠন খুলিয়া গেলো অন্তঃপুর পানে।
আম্রবন মঞ্জরিল গুঞ্জরিল অলি,
কথার কাকলী তোলে কাঞ্চনের কলি,
পুষ্প ভারে ভারে
মাধবী মুখর হোলো যৌবন-জোয়ারে,
লতাইয়া জড়াইয়া শালের শাখায় তন্বুলতা
গরবী চাহিল লাজে প্রণয়-আনতা।
দিকে দিকে প্রচ্ছদের পট গেলো খুলি।—
দারা-মুদারা ভঙ্গে বৃক্ষেরা তুলিল রঙ্গে অঙ্কুর-অঙ্গুলি,

তৃণদল
প্রান্তরে প্রান্তরে দিল বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মহুয়া-শিরীষ-শাল-বীথি
আকাশে উর্ব্বশীলোকে পাঠাইল প্রণয়ের লিপি
গন্ধগীতি।

বাসন্তীর মায়ামন্ত্র মদির পরশে
দৈন্য-দীর্ণ জরা-জীর্ণ আজি যবে হিল্লোলিয়া
উঠিল হরষে,
বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে সঙ্গীতে ভঙ্গীতে
প্রাণের আনন্দবানে তরঙ্গে রঙ্গিতে,—
আমি কিগো রুদ্ধ ঘরে লয়ে রুগ্নপ্রাণ
ক্রন্দন করিব শুধু দারিদ্র্যের গান?
ফেলিব কি ব্যর্থতার উষ্ণ অশ্রুজল,
বিছাব কি বর্ণহীন বেদনার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল?
ক্ষণিকার বর্ণ টুটি যাবে—
বসন্ত উৎসব তাই ব্যর্থ হবে বাষ্পের বিলাপে!

তবে হে বাসন্তী, জাগো, তুমি জাগো,
জাগাও আমার বক্ষে উদ্দাম যৌবন,
দিকে দিকে ছড়াইয়া দাও তব রক্তমাখা
মকরকেতন,
বক্ষে বক্ষে দাও ঘন দোল,
ফাগুনের আগুন কল্লোল
উদ্দীপিত করো মোর জীবনের শাখায় শাখায়;
বিতান বিছায়ে দিক প্রজাপতি দিকে দিকে
স্বপ্নের পাখায়,
মধুর সৌরভে
মত্ত হোক বসুন্ধরা অপূর্ব্ব গৌরবে।
রজনীর কান্না যতো রক্তের ক্রন্দনে যাক ডুবে
পশ্চিমে ও পুবে,
ছিন্ন হোক ধরণীর রোগ শোক অতৃপ্তির ক্লিষ্ট
কুহেলিকা,
সৃষ্টির আনন্দে আজ ভাগ্যপটে চলুক তুলিকা।
যাহা পিছে হোক মিছে, নীচু হোক নীচু,
ছিন্ন হোক ধূলি পরে দৈন্য যতো কিছু,
হস্তের সঞ্চয়পাত্র ভগ্ন হোক, পুরাতন পাক
আজি ত্রাণ,
বসন্ত উৎসবে আজ নূতনের জাগুক আহ্বান।

বসন্ত বিলীন হবে বৃক্ষে বৃক্ষে নিদাঘের নিষ্ঠুর
নিশ্বাসে,
মরণ ক্রন্দসি যাবে শষ্পে ঘাসে ঘাসে,
আকাশ বাতাস
বসন্তসমাধি পরে শুষ্কপত্রে ছড়াইবে তীব্র
উপহাস,—
তবু হে বাসন্তী, তুমি একবার দাও যদি ধরা,
সঞ্জীবি উঠিবে বীর্য্যে জীবনের যতো মৃত্যু-জরা,
সারা চিত্তপুরে
ছন্দিয়া উঠিবে নিত্য বসন্তের বৈজয়ন্তী সুরে।

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে গগনবিহারী শয়ন ক'রে ছিলেন। ঠিক ঘুম নয়, একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, এমন সময়ে পথে মোটর থামার শব্দে চক্ষু উন্মীলিত করলেন।

"দীনো!"

অদূরে দীনবন্ধু বারান্দার রেলিং-এর ধারে নিঃশব্দে ব'সে ছিল, গগনবিহারীর আহ্বানে সত্বর উঠে এসে বললে, "কর্তা?"

"একটা গাড়ি এসে যেন লাগ্‌ল। দেখ্‌ ত কে এল।"

ব্যাপারটা দীনবন্ধুর পুরেপুরিই জানা ছিল, তবু না জানার ভান ক'রে বললে, "আজ্ঞে দেখি।"

গগনবিহারী যখন সাতক্ষীরায় মুন্সেফি করেন তখন পনের ষোল বৎসরের বালক-ভৃত্য রূপে তাঁর সংসারে দীনবন্ধুর প্রথম প্রবেশ। সে আজ প্রায় বিশ বাইশ বৎসরের কথা হবে। ছুটির দিন, বারান্দায় তক্তপোষের উপর বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে গগনবিহারী মোকর্দ্দমার রায় লিখছিলেন, এমন সময়ে দীনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ডিক্রী-জারীর পেয়াদা নটবর দাস হাজির হ'য়ে গগনবিহারীর পদধুলি গ্রহণ করলে, তারপর দীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, 'নে গড় কর। পায়ের ধূলো নে।' দীনবন্ধু যথোচিত আদেশ পালন ক'রে উঠে দাঁড়ালে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে নটবর?' হাত জোড় ক'রে বিনয়-নম্র কণ্ঠে নটবর বল্‌লে, 'আজ্ঞে, এ আমার বাপ-মা-মরা ভাগনে দীনবন্ধু বটে। এতদিন আমার কাঁধে ছিল, আজ হুজুরের ছিচরণে এনে দিলাম।' দীনবন্ধুর আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ ক'রে গগনবিহারী বল্‌লেন, 'তা যেন এনে দিলে, কিন্তু ছিচরণ আঁচড়ে কামড়ে নেবে না ত?' জিহ্বার কিয়দংশ বাহিরে নির্গত ক'রে মাথা নেড়ে নটবর বলেছিল, 'আজ্ঞে না হুজুর, খুব শান্ত শিষ্টো, সে সব কিছু করবে না। তবে ছোটোনোক ত' নয় আসল কায়েত-বাচ্ছা কি না, জেতের একটু ঝাঁজ আছে।' শুনে গগনবিহারী সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'সে কি নটবর? তুমি নাপিত, আর তোমার ভাগনে কায়েত বাচ্ছা কি করে হয়?' একমুখ হাসি হেসে নটবর উত্তর দিয়েছিল, 'আজ্ঞে হুজুর, আমাদিগের জেতে হয়, এর চল্‌ আছে। আমি নাপিত বটি, কিন্তু আমার বুন ত আর নাপিত নয়।' কিন্তু কেন যে নয়, গগনবিহারী সে রহস্য ভেদ করবার আর কোন চেষ্টা করলেন না। সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত দীনবন্ধু বরাবর গগনবিহারীর সংসার-ভুক্ত হয়ে আছে। পিতৃমাতৃহীন ত' ছিলই, বিবাহও সে কোনো দিন করে নি; সুতরাং একদিনেরও জন্য অন্য কোথাও য'বার প্রয়োজন হয় নি। আত্মীয়তা-রস-বর্জ্জিত শুষ্ক মনের কঠিন ভালবাসা দিয়ে সে এ পর্য্যন্ত নিরন্তর গগনবিহারীর সেবা করে এসেছে। একদিনের জন্য তাতে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেনি।

রেলিং-এর ধারে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দীনবন্ধু বললে, "কর্ত্তা, বালিগঞ্জ থেকে মা-মণি এসে থাকবেন; গাড়িখানা আমাদেরই ত বটেক্।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিকৃত মুখে গগনবিহারী দীনবন্ধুর কথার স্বর অনুসরণ ক'রে বললেন, "আমাদেরই ত বটেক! হারামজাদা নিজে গাড়ি পাঠিয়ে এখন সাধু সাজছে!"

গগনবিহারীর এই মন্তব্য শুনে দীনবন্ধুর রাগ হ'ল; বললে, "বাড়ির ভেতর বউদিদিমণি থাক্তে আমি কেন গাড়ি পাঠাতে যাব, বুঝতে নারলাম কর্ত্তা।"

গগনবিহারী তর্জ্জন ক'রে উঠ্লেন, "বুঝতে নারাচ্ছি তোমাদের! কাল সকাল বেলা বৌদিদিমণিকে বাপের বাড়ি চালান দিয়ে তারপর জলস্পর্শ! এখন দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি বোতল-টোতলগুলো আলমারীর মধ্যে তুলে ফেল।" মনে মনে বললেন, যে রাগী মেয়ে ও-সব খুনে জিনিষ হাতের কাছে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়।

পাশে একটা ছোট গোল টেবিলের উপর এক বোতল হুইস্কি, বোতল দুই সোডা ওয়াটার আর মদ্যপানের একটা কাঁচের গ্লাস ছিল। সেগুলোকে নিচে একটা বেতের ট্রের উপর নাবিয়ে রেখে দীনবন্ধু টেব্‌ল্ ক্লথটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে ঝাড়তে আরম্ভ করলে। তার এই নিরাকুল নিশ্চিন্ততার সহিত অনাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দেখে গগনবিহারীর পিত্ত জ্বলে উঠ্‌ল; তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, "ওটা তুলে ঝাড়বার এখন কি এমন দরকার পড়ল? বোতল-টোতলগুলো তার হাতে তুলে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেনা বুঝি?" তারপর বারন্দার প্রান্তভাগে দৃষ্টি পড়বা মাত্র চেয়ারের উপর একটুখানি সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে বললেন, "আসুন! আস্তাজ্ঞে হোক্!"

পিছন ফিরে বাসনাকে আসতে দেখে দীনবন্ধু তার হাতের টেবল্ ক্লথটা টপ ক'রে বেতের পাত্রটার উপর ফেলে দিলে, তারপর সন্তর্পণে পাত্রটা দুহাতে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলে। এ অবশ্য সে করলে কেবল মাত্র গগনবিহারীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য; বাসনার দৃষ্টি হ'তে ব্যাপারটাকে গোপন করবার কোনো সাধু উদ্দেশ্যই তার ছিল না।

নিঃশব্দে মন্থর গতিতে বাসনা গগনবিহারীর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালে, তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার ধারে গিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

গগনবিহারী ডাকলেন, "বাসু!"

কোনো উত্তর না দিয়ে বাসনা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"বাসনা!"

এবারও বাসনা কোনো উত্তর দিলে না।

"বাসনা দিদি!"

ইত্যবসরে দীনবন্ধু গগনবিহারীর ইজি-চেয়ারের নিকট বাসনার বসবার জন্য একটা চেয়ার স্থাপন ক'রে গিয়েছিল। বাসনা ধীরে ধীরে এসে সেই চেয়ারে উপবেশন ক'রে বললে, "কি বলছ?"

"রাগ করেছ?"

"না।"

"অভিমান হয়েছে?"

"না।"

বাসনার বাম হাতখানা দুই হস্তের মধ্যে গ্রহণ ক'রে গগনবিহারী বললেন, "তবে মুখচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে এমন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলের আবির্ভাব কেন?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বাসনা বললে, "একটা কথার উত্তর দেবে দাদামশায়?"

গগনবিহারী বললেন, "দয়া ক'রে যখন এসেছ তখন রাত বারোটা পর্য্যন্ত তর্ক চলবেই। সুতরাং অনেক কথাই বলতে হবে। কি তোমার কথা শুনি?"

বাসনা বললে, "আচ্ছা, শরীরের ওপর এই অত্যাচারটা না করলেই কি নয়?"

বাসনার কথা শুনে গগনবিহারী ধীরে ধীরে শিরশ্চালনা ক'রে বললেন, "শরীরের ওপর এ অত্যাচার কি না তা জানিনে বাসু, কিন্তু মনের ওপর এ যে সদাচার তা নিশ্চয় বলতে পারি। মনটা যখন একদম বেসুরা মেরে যায় তখন একমাত্র যে বস্তু তাকে সুরে ফিরিয়ে আনতে পারে তা এই সুরা। স্বর্গে সুরগণ এই শক্তিরূপিণী সুধা সেবন

করেন ব'লে এর নাম সুরা হয়েছে। তুমি এর নিন্দে ক'রোনা।"

তিক্তকণ্ঠে বাসনা বললে, "এবার থেকে তা হ'লে যত সব মদখোর মাতালদের দেবতা ব'লে পূজো করব!"

বাসনার কথা শুনে গগনবিহারী উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন, বললেন, "মদ খেয়ে যারা মাতাল হয় সেই অর্ব্বাচীনদের না হয় পূজো কোরোনা, কিন্তু মদ খেয়ে যে-সব মহাপুরুষ তুরীয় আনন্দ অনুভব করে, তাদের পূজো করলে আমি আপত্তি করব না। মদের দুটি অর্থ আছে জান ত?"

সবেগে মাথা নেড়ে বাসনা বললে, 'না, আমি জানিনে!"

গগনবিহারী বললেন, "জান না যখন, আমি ব'লে দিই শোনো। মদের প্রথম অর্থ হচ্ছে হর্ষ, আনন্দ; আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মত্তা।"

বাসনা বললে, "মদের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে লিভার পেন, লিভার অ্যাব্‌সেস্; আর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।"

জিভ কেটে গগনবিহারী বললেন, "তোমার এ মন্তব্য ঐ পবিত্র পদার্থের প্রতি blasphemy হচ্ছে বাসু। সাগর পারের পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা হুইস্কিকে Water of Life বলেছেন, আর আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে আসব নামে এর প্রশংসা আছে। এর দ্বারা মৃত্যু হয় না, মৃত্যু নিবারিত হয়।"

গগনবিহারীর হুইস্কি-প্রশস্তি শুনে বাসনা হেসে ফেললে; বললে, "তোমার এই Water of Life এর পরিণাম কিন্তু Death of Body দাদামশায়। এরই মধ্যে ভুলে গেছ ছোট-মেশো মশায়ের বাবার কথা? এই Water of Life দিয়েই পেট ভরতে ভরতে তিনি মারা যান নি কি?"

গগনবিহারী বললেন, "তা গিয়েছিলেন, কিন্তু হরকুমারের কথা স্বতন্ত্র। তিনি মদ খেতেন না, মদ তাঁকে খেতো। সবই মাত্রার কথা বাসু। তিল প্রমাণ যে ওষুধ খেলে জীবনী শক্তি ফিরে আসে, সেই ওষুধ তাল প্রমাণ খেলে মানুষে মারা যায়।"

"কিন্তু তুমি ত' তাল প্রমাণই খাও।"

"তা খেলেও সেটা আমার পক্ষে মারাত্মক মাত্রা নয়। এ তুমি ঠিক জেনো, মদ খেয়ে যারা কোনদিন মাতলামি করে নি তাদের কেউ কখনো লিভার-অ্যাব্‌সেসে মারা যায় নি। যে-পরিমাণ মদ চৈতন্য সহ্য করে, সে-পরিমাণ মদ লিভারও সহ্য করে। তা ছাড়া আমার মনে হয় বাসু, হুইস্কি হজম করবার পক্ষে আমার একটা জন্মগত শক্তি আছে। ন-মাস ছ-মাস অন্তর যে পরিমাণ মদ খেয়ে আমি খাড়া থাকি, নিয়মিত যারা খায় তারাও বোধকরি তেমন পারে না। এ কথা তুমি মানো কি না?"

বস্তুতঃ একথা খানিকটা না মেনে উপায় ছিল না। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন, এমন কি দু-চার জন ডাক্তারও মনে করতেন গগনবিহারীর মদ পরিপাক করবার পক্ষে তেমনি একটা কোনো শক্তিই আছে। বাসনা কিন্তু সে কথা আদৌ স্বীকার করলে না; বললে, "যে জিনিস তোমার নিত্য না খেলে চলে, সে জিনিস ন-মাসে ছ-মাসেই বা খাও কেন?"

"কেন খাই তা ত তুমি জান। প্রয়োজন হ'লেই খাই, বিনা প্রয়োজনে খাইনে।"

"তা হোক্, এ তোমাকে ছাড়তেই হবে।"

গগনবিহারী সহাস্য মুখে বললেন, "তা হ'লে তোমাকেও ঘর ছাড়তে হবে বাসু। কিষ্কিন্ধ্যা পরিত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে বসবাস করতে হবে।"

সবিস্ময়ে বাসনা বললে, "কেন? আমাকে ঘর ছাড়তে হবে কেন? আর কিষ্কিন্ধ্যা বৃন্দাবনই বা কি তা'ও বুঝলাম না!"

গগনবিহারী হাসতে লাগলেন; বললেন, 'এত বুদ্ধি ধর ভাই, আর এটা বুঝতে পারলে না? আমার বলবার উদ্দেশ্য বালীগঞ্জ ছেড়ে তোমাকে শ্যামপুকুরে থাকতে হবে। কিষ্কিন্ধ্যা ত' কপিরাজ বালীর রাজ্য ছিল, সুতরাং বালীগঞ্জ কিষ্কিন্ধ্যার নামান্তর মাত্র। আর যে অঞ্চলে শ্যামপুকুর শ্যামবাজার প্রভৃতি পাড়া বর্ত্তমান তা বৃন্দাবন নয় ত আর কি?''

গগনবিহারীর ব্যাখ্যা শুনে বাসনা হাসতে লাগল; বললে, "অ চ্ছা, কিষ্কিন্ধ্যা বৃন্দাবন না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাকে ঘর ছাড়তে হবে কেন?"

গগনবিহারীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে সহসা একটা ছায়াপাত

হল। ঈষৎ গভীর কণ্ঠে বল্‌লেন, 'তা হবে বাসু, বাপের বাড়ী ছেড়ে তোমাকে দাদামশায়ের বাড়ীতে থাকতে হবে। তোমাকে দেখলে আমার মদ খাওয়ার নেশা লোপ পায়, তা জানি; আর তুমি কাছে থাকলে আমার মদ খাওয়ার লোভ জন্মাতেই পারবে না বলে বিশ্বাস করি। কেন জান?"

স্মিতমুখে বাসনা বল্‌লে, "বোধ হয় আমাকে ভয় করেন ব'লে।"

"ভয়ত ত করি, কিন্তু কেন করি?"

হাসিমুখে বাসনা বল্‌লে "বোধ হয় ভালবাসেন ব'লে।"

গগনবিহারী বল্‌লেন, "সে কথাও সত্যি, খুবই ভালবাসি তোমাকে; কিন্তু আসল কথা বলি শোন। তোমার দুটি চোখে যখন অসন্তোষের ভ্রুকুটি ফুটে ওঠে তখন তোমার দিদিমার কথা মনে পড়তে এক মুহূর্ত্তও দেরি হয় না। তোমার শান্ত চোখে তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাইনে, কিন্তু চোখ দুটি যখন উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে তখন তার মধ্যে আশ্চর্য্য মিল! মনে হয় তোমার চোখের ভিতর দিয়ে সে-ই যেন শাসন করছে!"

বাসনা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না; তার স্নেহময় মাতামহর হৃদয়ের নিগূঢ় কাহিনী শুনে সমবেদনায় সে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। দাদামহাশয় এবং নাতনীর নিরবগ্রহ প্রীতি-ব্যবহারের মূলে যে রসায়ন-বস্তুটি এতদিন একপক্ষের দ্বারা অনুক্ত এবং অপর পক্ষের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, আজ তার এই অবিপ্লুত প্রকাশের আঘাতে ক্ষণকালের জন্য উভয়ে চকিত হয়ে রইল।

"বাসু!"

"দাদামশায়?"

"কোন্‌খানে আমার দুর্ব্বলতা আজকের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা তোমাকে ব'লে ফেল্‌লাম। তোমার খরধার অস্ত্রের সন্ধানও তোমাকে দিলাম। কিন্তু আশা করি তাই বলে এখন থেকে অসময়ে অপ্রয়োজনে আমার ওপর তোমার অস্ত্র চালনা করবে না!" ব'লে গগনবিহারী হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

অপ্রতিভ স্মিতমুখে বাসনা বললে, "আমার ত' ভয় হয় দাদামশায়, ঠিক উল্টোই হবে। এতদিন যে অজানা অস্ত্র আপনা-আপনিই চল্‌ত, এখন থেকে প্রয়োজনের সময়েও তা ঠিক-মত চল্‌তে পারবেনা।"

গগনবিহারী বল্‌লেন, "তা হ'লে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তই হব। আমার মতো কোনো-কোনো বেয়াড়া লোক আরামের নিরুদ্বেগের চেয়ে আঘাতের উত্তেজনাই বেশি পছন্দ করে তা ত বোঝো বাসু।"

বাসনা বল্‌লে, "তা ত' খুবই বুঝি দাদামশায়। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি এক গোত্র। কিন্তু আঘাতের উত্তেজনা বেশি পছন্দ করি ব'লে লোকে আমাকে ঝগড়াটে বলে।" ব'লে সে হাস্‌তে লাগল।

গগনবিহারী বল্‌লেন, "লোকের কথা ধোরোনা ভাই, সংসারের অধিকাংশ লোকই অরসিক। তারা জানে না কোন্ ভাঁড়ের মধ্যে কোন সুধা সঞ্চিত থাকে। তোমার জীবন-পথে যে পথিক-সঙ্গীটি শীঘ্রই তোমার দক্ষিণ পাশে এসে দাঁড়াবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে সর্ব্বদা আঘাতের আনন্দে উত্তেজিত ক'রে রেখো, তোমার প্রতি এই আমার উপদেশ।"

গগনবিহারীর পরিহাসে ক্ষণেকের জন্য বাসনার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল, তারপর মৃদু হেসে সে বললে, "তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ দাদামশায়, কিন্তু জীবনে যে তোমার উপদেশ খাটাবার মতো অবস্থা ঘটবেই তার কোনো মানে নেই।"

কপট বিস্ময়ের সুরে গগনবিহারী বল্‌লেন, "কেন? মানে নেই কেন? শ্যামের লাগিয়া সব তেয়াগিয়া তুমি কি যোগিনী হবে? অথবা, বিবাহ যে সব স্ত্রীলোককে নিশ্চয়ই করতে হবে, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধ-চারিণী হ'য়ে এ কথা বলছ?"

গগনবিহারীর কথা শুনে বাসনা হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "আচ্ছা, এর মীমাংসা তোমার সঙ্গে পরে হবে দাদামশায়, এখন মামীমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।" ব'লে উঠে দাঁড়াল।

গগনবিহারী বল্‌লেন, "আচ্ছা যেয়ো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। পরীক্ষা ত হ'য়ে গেল, কেমন দিলে?"

ধীরে ধীরে চেয়ারে পুনরায় উপবেশন ক'রে মাথা নেড়ে

বাসনা বললে, "খুব ভাল দিতে পারিনি। কি ক'রে হবে, শেষ কালটা ত' মাষ্টার মশায়ের সাহায্য একেবারেই পেলাম না।"

"অমরেশ কি এখনো আসেনি?"

"না, আসেন নি ত' বটেই, লিখেচেন কুম্ভ যোগের শেষ স্নানটা না শেষ হ'লে আসবেন না।"

"সে এত বড় ভক্ত হোলো কবে?"

বিস্ময়ের সুরে বাসনা বললে, "ভক্ত? তবেই হয়েছে! বোধ হয় ঠিক তার উল্টো। যাবার সময় আমাকে ব'লে গেছেন কুম্ভস্নানে ডুব দেবার সময়ে পুণ্যকামীদের নিশ্চয় মুটো-মুটো ক'রেই হাত থাকবে; ডুব দিয়ে ওঠবার পর তাদের সেই মুটো-মুটো হাতই থাকবে, না আরও মুটো করে বেশি নিয়ে উঠবে, তাই দেখতে যাচ্ছি। আচ্ছা, শুনুন ত কথা!"

গগনবিহারী বললেন, "নাঃ, কথাটা শোনবার মতই বটে। এ যেন একেবারে পরাশর দি সেকেণ্ড!"

"সত্যিই তাই দাদামশায়। মাষ্টার মশায় বলেন, বিদ্যেটা বৃহস্পতির কাছ থেকে আদায় করা ব'লে মুনিঋষিদের মধ্যে একমাত্র পরাশরেরই বুদ্ধি বিবেচনা ছিল। মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করলে তার আত্মার যদি পেট ভরে তা হ'লে বিদেশে কোনো লোক গেলে খাবার জন্যে তাকে পয়সা না দিয়ে প্রত্যহ বাড়িতে একজন ক'রে ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেই ত' বিদেশে সেই আপনার জনের পেট ভরতে পারে। মাষ্টার মশায় বলেন পরাশরের এই যুক্তির কাটান নেই।"

গগনবিহারী হাসতে হাসতে বললেন, "সত্যি, একেবারে অকাট্য। কিন্তু যাই বল বাসু, মাষ্টারটি যে আমি তোমাকে দিয়েছি সে সত্যিকারের একজন পণ্ডিত লোক।"

প্রসন্নমুখে বাসনা বললে, "না, সে কথা এক'শ বার সত্যি। পাণ্ডিত্যের থৈ নেই! কোনো একটা বিষয় যখন পড়ান তখন আগুনের সামনে বরফ যেমন দেখতে দেখতে গলে জল হয়ে যায়, তেমনি তাঁর ব্যাখ্যার সামনে সেই বিষয়টার অত্যন্ত কঠিন অংশগুলো দেখতে দেখতে জল হয়ে যায়। মনে হয় আশ্চর্য্য, এই সহজ জিনিসগুলো আগে কেন বুঝিনি।"

গগনবিহারী বললেন, "সেই জন্যই ত তিনি তোমার বিদ্যেবুদ্ধির নিন্দে করেন।"

"কি বলেন শুনি?"

"বলেন, কঠিন জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারে।"

হাসি চেপে বাসনা বললে, "তা বুঝিয়ে দিলেও যদি না বুঝতে পারব তা হ'লে অত মাইনে দিয়ে তাঁকে রাখব কেন? আর, না বুঝিয়ে দিলেও যদি বুঝতে পারতাম তা হলেই বা মিছিমিছি রাখতাম কেন?"

গম্ভীর মুখে গগনবিহারী বললেন, "সত্যিই ত! এ যুক্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই।" তারপর একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আর কি বলেন জান?"

"কি বলেন?"

"বলেন, এত ছেলে মেয়ে পড়িয়েছি কিন্তু বাসনার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না।"

"বুদ্ধিতে, না বোকামীতে?"

বিমূঢ়তার ভঙ্গী সহকারে গগনবিহারী বললেন, "এই দেখ, সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি! আচ্ছা, এবার এলে জেনে নিয়ে তোমাকে বলব।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বাসনা বললে, 'আচ্ছা, তাই বোলো। আমি এখন ভেতরে চললাম।" ব'লে উঠে পড়ল।

গগনবিহারী বললেন, "বাসু, বৌমাকে বোলো তোমার খাবার যেন আমার সঙ্গে বাইরে দেন।"

"না বললেও তিনি তাই দেবেন দাদামশায়। আচ্ছা, তবু বলব।" ব'লে বাসনা অন্দর মহলের অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

বাসনা চ'লে গেলে দীনবন্ধু গগনবিহারীর নিকট এসে বললে, "কর্ত্তা, আপনকার কাছে একটা নিবেদন আছে।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে গগনবিহারী বললেন, "এরই মধ্যে তোমার আবার কি নিবেদনের কথা মনে হ'ল?"

"মা-মণিকে আর ছেড়ো না তুমি---এ বাড়িতে রাখবার বন্দোবস্ত কর।"

গগনবিহারী ধমক দিয়ে উঠলেন, "তাতে তোমার কি উপকার হবে শুনি? হারামজাদার পেটে পেটে দুষ্টুবুদ্ধি, সব আড়ি পেতে শুনেছে।"

গভীর বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে দীনবন্ধু বললে, "এই দেখ! ভাল কথা বললাম, তবু খামখা গালমন্দ আরম্ভ করলে!"

গগনবিহারী বললেন, "গালমন্দ দেবে না, ওঁর স্তবগান করবে! যা, টেবুলের উপর আমাদের দুজনের খাবার জোগাড় কর শিগ্‌গির।"

গজর গজর করতে করতে দীনবন্ধু প্রভুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্থান করলে।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বৈশাখী পাখী

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

বজ্রদীপ্ত পাখা মেলি' এসেছে বৈশাখ –
নহে বর্ষ, নহে মাস, শুধু অগ্নিপাখী,
জ্যোতির্ময় চঞ্চুখানি মেখেছে পরাগ
বিদ্যুতের পুষ্প হ'তে। জ্বলে রক্ত-আঁখি
কোন্ দিব্য আবেশের সুধায় মাতাল!
উন্নত ভঙ্গিমা সহ গ্রীবা ঊর্ধ্বে তুলি'
খর তাপে দগ্ধ করে তমসা-কঙ্কাল,
সহসা ঝলসি' উঠে ম্লানতম ধূলি।

এ-ভৈরব অতন্দ্রিত অনন্ত-পীড়নে
বিলোল বাসন্তী কাঁদে শুষ্ক বীথিকায়,
স্তম্ভিত শ্মশান-পদ্মে শবের আসনে
নিশ্চল তপস্বী জাগে তিমির-ছায়ায়।
সেই রুদ্র সন্ন্যাসীর ভস্মরেণু মাখি'
চলেছে আগ্নেয় ছন্দে বৈশাখের পাখী
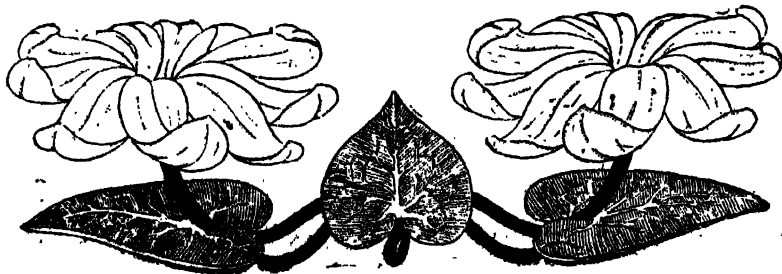
সাহিত্য-সম্মিলন

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করবার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা প্রীতিবশতঃ এই কাজের অগ্রণী করে আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, আমি তাতে নিজেকে ধন্য মনে করি। আমি এ সম্মানের উপযুক্ত কিনা তাই নিয়ে সমারোহে বিনয় প্রদর্শন করে অযথা আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। এই নির্ব্বাচনের দায়িত্ব আমার নয়। এই অপকর্ম্মের জন্য যদি কোন প্রকার জবাবদিহি করা আবশ্যক হয়, তবে যাঁরা নির্ব্বাচন করেছেন, তাঁদেরই তা করতে হবে। অতএব সে সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। এ কথা সত্য যে, বহুকাল পূর্ব্বে, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে সবুজপত্রের আবির্ভাবের সময়ে কিছু লেখা লিখেছিলাম—সে সব লেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট কারণে অমরত্ব লাভ করে নাই—সুতরাং বন্ধুদেরও তা স্মরণ থাকবার কথা নয়। তারপর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, বীররস ভিন্ন অন্য কোন রসচর্চ্চা করবার অবসরও আমার বড় একটা ঘটে নাই—তাই সন্দেহ হয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেছি, তারই জোরে আজ এই অনধিকার চর্চ্চা করবার সুযোগ পেয়েছি। তবে যোগ্যতার কথা ছেড়ে দিলে আন্তরিকতার দিক থেকে আমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নাই—সেখানে আমি কারো কাছে হার মানতে রাজী নই। আমি সেই ভরসায় এখানে উপস্থিত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কিছুকাল থেকে আমাদের দেশে যে ভাবে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হচ্ছে, তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। সভা-সমিতি করে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না, একথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে রস-পরিবেশনের প্রকার ছিল ভিন্ন। কীর্ত্তন হ'ত, কথকতা হ'ত, পালা গান হ'ত; তাতে রসিক জনের সমাগম হ'ত। কিন্তু এই প্রকারের সাহিত্য-সম্মিলন ছিল না। ভারতের অনেক প্রদেশে এখনও কবি-সম্মিলনী হয়—যাকে বোধ হয় 'মুশেইরা' বলে,—তাতে কবিরা আসেন—কাব্য-রসিকেরা কবির মুখে কাব্য আবৃত্তি শুনতে পান। কিন্তু সভাপতি সম্পাদক কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন, বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় তর্ক বিতর্ক, প্রস্তাব উত্থাপন ও ভোটাধিক্যে গ্রহণ—সাহিত্য-সভায় এ সব আমার নিকট একটু অশোভন বলেই মনে হয়। ইউরোপেও কোথাও কখনও এই ভাবে সাহিত্য-সম্মিলন হয় বলে শুনি নাই। সেখানে হয়ত কোনও একজন বড় সাহিত্যিককে বিশেষ উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করা হল—তিনি উপস্থিত সকলের আগ্রহে স্বরচিত কোনও রচনা পড়লেন বা তাও পড়লেন না। আমার মনে হয় আসলে আমাদের দেশের সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথা রাজনৈতিক সভা-সমিতির আদর্শে প্রচলিত হয়েছে। তাতেই রাজনৈতিক সভা যে ভাবে পরিচালিত হয়—সাহিত্য-সম্মিলনও সেইরূপ নিয়ম-কানুনে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেই কারণে কখন কখন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যিক-রাজনীতি বড় হয়ে ওঠে।

অবশ্য আমি একথা বলি না যে সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য গোষ্ঠির বা সঙ্ঘের কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে যে ভাব বিনিময় হয়, আলোচনা হয় তাতে লেখকেরা উৎসাহ পান, প্রেরণা পান। সাহিত্য রচনার পক্ষে এর আবশ্যকতা আছে। তবে এই প্রকারের সংঘ, সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের জন্য—কেবল মাত্র চাঁদা দিয়ে এতে যোগ দেওয়ার অধিকার পাওয়া যায় না। বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রায় এই ধরণের সাহিত্য-সংঘের আদর্শ

তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। বিচিত্রায় কবির মুখে যাঁরা কাব্য আবৃত্তি বা গল্প পাঠ শুনেছেন তাঁরাই জানেন যে এ-যুগের সাহিত্য-রসিকেরা কালক্রমে কতখানি রসে বঞ্চিত হয়েছেন। Yes, we once saw Shelley plain.

এখনও নানা যায়গায় ছোট বড় সাহিত্য-গোষ্ঠি আছে বলে শুনেছি কিন্তু নানা কারণে সেগুলি সম্ভবতঃ তত খ্যাতি লাভ করেনি। তার একটা প্রধান কারণ ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় এবং বিশেষ কারণ আমাদের অভাব-অভিযোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে—অবসর ও সুযোগও নাই, আশা নাই উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই—এমন কি অনেক সময় সাহিত্যিকদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি মমতা নাই শ্রদ্ধাও নাই।

আমি যে ধরণের সাহিত্য-সম্মিলনের কথা বল্লাম—সে ধরণের সম্মিলনের মূলে একটা সাহিত্যিক আভিজাত্য থাকা দরকার। আমি জানি বর্ত্তমান উন্নতিশীল যুগে আভিজাত্য কথাটা সব স্থানেই বিশেষভাবে নিন্দিত হয়ে থাকে, তবু এ কথা সত্য যে অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার স্থান নাই। সাহিত্য সৃষ্টিতে মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার নাই—এ কথা স্বীকার করাই ভাল। অধিকার আছে শুধু তার ভগবান যাকে তাঁর সৃষ্টির সহচর করে পাঠিয়েছেন। বিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের বাধে না—কিন্তু দেখতে পাই সাহিত্য আলোচনার সময় আমরা সকলেই নিজেদের অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে করি। তাই সাহিত্য-সম্মিলনে সকলেই সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখি—যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি বিজ্ঞান উপলক্ষ করে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন, যিনি অর্থনৈতিক তিনি Statistics অবলম্বন করে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন, যিনি সমাজের দুর্নীতির সংস্কারক তিনি তাই নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে যান, যিনি সমাজ সংস্কারক তিনি সেই বিষয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন, ফলে এই সকল সাহিত্য-সম্মিলনে অনেক সময়েই সাহিত্যিকরা উপেক্ষিত হন, এবং অসাহিত্যিকরা সাহিত্যিক বলে সম্মান পান। গত কয়েক অধিবেশনের বিবরণীতে দেখা যায়, সাহিত্য-সম্মিলনে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিজ্ঞ, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, বৈদান্তিক, রাজনৈতিক সকলেই সভাপতিত্ব করেছেন কিন্তু যাঁরা সত্যকার সাহিত্যিক তাঁদের সেরূপ সম্মান দেওয়া হয় নাই। বোধ হয় তার একটা কারণ সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কোন্ বিষয় যে সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে এবং কোনটাই বা পড়ে না—সে বিষয় আমাদের সূক্ষ্ম ধারণা নাই। সংযম শিক্ষা, ভক্তিযোগ, পারিবারিক প্রবন্ধকেও সাহিত্য বলি—আবার বিষবৃক্ষ, চতুরঙ্গ ও পথের পাঁচালিকেও সাহিত্য বলি। তাই সাহিত্যের পাঠ্য নির্দ্ধারণ করবার সময় পণ্ডিতেরা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকেও পাঠ নির্ব্বাচন করেন আবার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকেও পাঠ নির্ব্বাচন করেন। আমার মনে হয় আমাদের দেশে ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব বা দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের আজ এতটা উন্নতি হয়েছে এবং সে সকল বিষয়ের অনুশীলনের জন্য এতটা বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে যে, এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য পৃথক সম্মিলন হওয়া উচিত। তাতে এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সার্থক হতে পারে এবং সাহিত্যও তাহলে তাদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আর একটা বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে আজকাল সাহিত্য-সম্মিলনের যাঁরা সভাপতি হন তাঁরা এক-দিকে যেমন স্বর্গীয় লেখকগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান কর্ত্তব্য মনে করেন- বর্ত্তমান লেখকদের প্রতি নির্ব্বিচারে অশ্রদ্ধা দেখানও তেমনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। বর্ত্তমান সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের অনেকের লেখাই আমি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং আনন্দও পেয়েছি। এই বইগুলি শ্লীল কি অশ্লীল, সুনীতিপূর্ণ কি দুর্নীতিপূর্ণ, সেগুলি আবালবৃদ্ধবণিতা পুত্র-কলত্র এক সঙ্গে পড়তে পারে কি না—এইরূপ যেসব বড় বড় তর্ক বর্ত্তমান সাহিত্যের নামোল্লেখমাত্রই এসে পড়ে, সেই সকল পুরাতন তর্কের অবতারণা আমি করতে চাই না। বৈষ্ণব-সাহিত্য, ভারতচন্দ্র, বীরাঙ্গনা-কাব্য প্রভৃতি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট কি না সে তর্কও আমি করব না। অবশ্য একথা সনাতন সত্য বলে' আমি মানি যে কদর্য্যতা আর্ট নয়। তবু বলি

সাহিত্যের সফলতা বা বিফলতা আর্ট হিসাবে সুন্দর বা অসুন্দরের উপর নির্ভর করে—অন্য সকল বিচার অবান্তর মাত্র।

প্রাচীন কালে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবু এ কথা আজ গোপন করে লাভ নাই যে পূর্ব্বকালে খ্যাতি অর্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তার কারণ সকল বিষয়েই পাঠকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না, তাঁরা অতি সরল ও সাধু ছিলেন, পৃথিবীর নানাদেশের কাব্য সাহিত্যেও পাঠকদের জ্ঞান ছিল স্বল্প। কথার সঙ্গে কথা মিলাতে পারলেই কবি এমন কি মহাকবি বলে পরিচিত হওয়া যেত। যে-কোনও কষ্ট-চিন্তা গভীর চিন্তা বলে সমাদর লাভ করত। এক বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে উপন্যাস বা প্রবন্ধ লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এমন খুব কম লেখক আছেন যাঁদের লেখা স্মরণ রাখবার যোগ্য। আধুনিক যুগের লেখকদের সঙ্গে তুলনা করতে হ'লে—মধুসূদনকে বাদ দিতে হবে,—কারণ, তিনি কাব্যে নোতুন যুগের প্রবর্ত্তক ছিলেন, বঙ্কিমকেও বাদ দিতে হ'বে, কারণ তাঁর সার্ব্বভৌম প্রতিভা বাঙলা ভাষাকে সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্রনাথের কথাও স্বতন্ত্র, তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য এখনও "পরিশেষ' 'পুনশ্চ' প্রকাশ করছে। এঁদের তিন-জনকে বাদ দিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান কালে যাঁরা লিখছেন, কি প্রকাশভঙ্গীতে, কি ভাষার সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতায়, কি ভাবের বৈচিত্র্যে, কি নরনারীর মনের রহস্য-বিশ্লেষণে তাঁদের লেখা প্রাচীন লেখকদের চাইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তবে নবীন লেখকদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁরা যদি সস্তায় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার লোভ ত্যাগ করতে পারেন এবং যে বিষয়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি নাই, সে বিষয়ে যদি লেখার চেষ্টা না করেন এবং কেবল বই পড়ে যদি বই না লেখেন তাহলে হয়ত নিন্দার কারণ অনেকটা কমে যাবে। আমার মনে হয় এই শ্রেণীর দু' একজন লেখকের জন্য—অধিকাংশ নবীন লেখকই আজ অকারণে নিন্দিত হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে শুধু আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য আজ শেষ করব। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রধান অভাব হয়েছে সমালোচনার। প্রকৃত সমালোচনার অভাবেই বাংলা সাহিত্যে লেখকদের মূল্য নির্ণয় হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে ভাল লেখকদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ পাচ্ছেন না, আর যাঁরা আত্মপ্রচারে নিপুণ তাঁরা একপ্রকার খ্যাতি লাভ করছেন।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে—আমি আর আপনাদের সময় নেবো না। সাহিত্যপ্রসঙ্গে যে কয়টি কথা আমার মনে উঠেছে সংক্ষেপে তাই আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনায় আমি প্রবৃত্ত হই নাই, কারণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সে কাজ নয়। তাছাড়া আমি নিশ্চিত জানি যে সভাপতি মহাশয় নিজে এবং এখানে যে সকল সুধীবর্গ উপস্থিত আছেন, তাঁরাই সে কাজ করবেন। আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে আমি আবার আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং বাংলার সাহিত্যসেবীদের বিশেষ করে বলি তোমরা স্মরণ রেখো—"Of all materials for labour, dreams are the hardest; and the artificer in ideas is the chief of workers, who out of nothing will make a piece of work that may stop a child from crying or lead nations to higher things. For what is it to be a poet? It is to see at a glance the glory of the world, to see beauty in all its forms and manifestations, to feel ugliness like a pain, to resent the wrongs of others as bitterly as one's own, to know mankind as others know single men, to be thought a fool, to hear at moments the clear voice of God." আমরা জানি, অভাবের দিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণার দিনে, দ্বেষহিংসা কাড়াকাড়ির দিনে কবিকে লোক উপেক্ষ করেই—কাড়াকাড়ি হানাহানিতে যে নেতৃত্ব করে, মানুষ তাকেই বড় বলে সম্মান করে, কিন্তু যখন কাড়াকাড়ি শেষ হয়ে যায়, দ্বেষহিংসা শান্ত হয়, তখন কবিকে মনে পড়ে—বলে—বলো তোমার তেপান্তরের কথা, মেঘান্ধকার আকাশের নীচে পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপর ধাবমান রাজপুত্রের কথা—হাতীর দাঁতের পালঙ্কে নিদ্রিত রাজকন্যার কথা—কারণ শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষের আসল খোঁজা তারই জন্যে। বলে, বলো তুমি—প্রথম সন্ধ্যায় আকাশে শুকতারা জ্বালিয়ে কে প্রতীক্ষা করে—কার জন্যে প্রতীক্ষা করে? গভীর রাত্রে আকাশ থেকে অকস্মাৎ বৃষ্টির ধারা কার ঝরে? অন্ধকার রাত্রে তারার অক্ষরে আকাশে কি লেখা লেখে, পূর্ণিমার চাঁদ ও পৃথিবী কেন মুখোমুখী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে,—বল তুমি,—কেবল তুমিই এ রহস্যের সন্ধান জান!—

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়

মায়াপুরী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কোঁচড় ভরিয়া বৈঁচি লইয়া বাড়িতে ঢুকিবার মুখে কথাটা গেল মিণ্টুর কাণে। অত্যন্ত উৎসুক ভাবে বাইরে দাঁড়াইয়াই ও শুনিতে লাগিল,—বহু কষ্টে এবং অত্যন্ত যত্নে সংগৃহীত বৈঁচিগুলির কথা আর মনেই রহিল না ওর।

দুরন্ত ছেলে মিণ্টু। পাড়াগাঁয়ের অপূর্ব সতেজ শ্যামলতায় পূর্ণ, দুষ্টামি-চঞ্চল উজ্জ্বল মুখশ্রী। তালপুকুরের জল আলোড়িত করিয়া ও পদ্ম তুলিয়া আনে, বর্ষার ভরা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ও সাঁতার কাটে, 'চকের' শালুক বন ঠেলিয়া ডিঙি বাহিয়া ও মাছ মারিতে যায়। তা' ছাড়া মালিকের বিনা অনুমতিতে গাছের ফল পাকড় এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রথম-কাটা খেজুর গাছের রসের হাঁড়ি নামাইয়া আনিতে তার কৃতিত্ব অসীম।

এ হেন ছেলে মিণ্টু।

এই তো একটু আগে বৈঁচি সংগ্রহ করিতে গিয়া করিয়া আসিল একটা কাণ্ড! কোনো একটা বিশেষ গাছের অধিকার লইয়া কামার বাড়ীর মাখনের সাথে বাধিল ঝগড়া এবং অবশেষে ব্যাপারটা গড়াইয়া গেল বাহুবলে। দু'জনের ক্ষাত্র-তেজের যখন প্রবল পরীক্ষা চলিতেছিল, ঠিক এম্‌নি সময় অদূরে গাড়ু হাতে আবির্ভাব হইল ওদের স্কুল মাষ্টার শশী বাবুর এবং ব্যাপারটার উপরে যবনিকাপাতও হইল সঙ্গে সঙ্গে। হারিল না কেউই, বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ গা ভরিয়া কাঁটার আঁচড় এবং কোঁচড় ভরিয়া বুনোফল লইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাপের অনুগত ছেলে বলিয়া সুযশ ওর কোনোদিনই নাই এবং শোনা যায় বড় দুঃখেই হতাশ হইয়া হলধর চক্রবর্ত্তী ওর সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন; কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, এ কথা একেবারে সত্যি নয়। শাসনের অধিকার ছাড়িলেও প্রহারের দাবীটা এখনো হাতে রাখিয়াছেন তিনি।

মিণ্টু ভাবিতেছিল, বাবার নজর এড়াইয়া বাড়ীতে ঢোকা যায় কী করিয়া; কিন্তু হঠাৎ বাইরের ঘর হইতে এমন কয়েকটা কথা ভাসিয়া আসিল যে ওর পা গেল একেবারে অচল হইয়া।

হলধর বলিতেছিলেন, "হাঁ, কলকাতা গেলে মিণ্টুকেও সাথে নিয়েই যাব। কোনোদিন বাইরে বেরোয় নি' তো, একবার সব দেখে শুনে আসবে।"

পাড়ার বিপিন ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হলে যাওয়া ঠিক হ'ল কবে?"

জবাব আসিল, "পরশু। বড়গিন্নী ঠাকরুণ ব্যস্ত হয়ে প'ড়েচেন, চিঠিও দেওয়া হয়েছে ওঁদের শ্যাম বাজারের গোমস্তার কাছে।"

বিপিন বলিল, "তা যদি যাও ভায়া, তা'হলে দুটো টাকা আমি দেব, পূজো দিয়ে দিয়ো কালীঘাটে। বোঝোই তো, কলমের বাগানের ওই মোকর্দ্দমাটার জন্য আহার নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম হ'য়েচে। কিন্তু আমিও তোমায় ব'লে রাখচি হলধর, যদি ওই মাম্‌লায় হারি, তা'হলে হাইকোর্ট অবধি না গড়িয়ে আমি থামব না—কোনো মতেই না।"

আর শোনার দরকার হইল না।

খিড়কি দুয়ার দিয়া মিণ্টু এক লাফে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ডাকিল,—"মা—"

মা তখন একরাশ ঘুঁটে লইয়া ব্যস্ত, চটিয়াই ছিলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "হতভাগা, ছিলি কোথায়? পড়ার বইয়ের সাথে এতটুকুও সম্পর্ক নেই, দিনরাত্তির আছেন কেবল এ পাড়া আর ওপাড়া। আজ তোর ভাত বন্ধ, বাঁদর!"

মিণ্টু বিচলিত হইল না, কারণ এটা প্রাত্যহিক সম্ভাষণ। চট্ করিয়া একতাল গোবর হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ঘুঁটে দিয়ে দেব, মা?"

মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—"হতচ্ছাড়া, রাখ্ রাখ্, শিগ্‌গীর হাত ধুয়ে' ফ্যাল্! ছেলে আমাকে কাজ দেখিয়ে খুসী ক'র্‌তে এসেচে রে! যা' বল্‌চি—যা'—"

বকুনি খাইয়া মিণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর অত্যন্ত উৎসাহভরে বলিল, "জানো মা, কল্‌কাতা যাচ্চি আমরা—"

মা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "কোথায়?"

—"কল্‌কাতায়। বাবা বিপিন কাকাকে বল্‌ছিল-"

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পাইল না। হলধরের খড়মের ঠকাঠক্ শব্দ কাণে যাইতেই মিণ্টু ধাঁ করিয়া অদৃশ্য হইল খিড়কির পুকুরের দিকে, হয়তো হাত ধুইবার জন্যই হইবে।

হলধর প্রবেশ করিলেন।

বয়স চল্লিশ পার হয় নাই, রগের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে। আর দশজন সাধারণ পল্লী-গৃহস্থের মত চেহারার কোনো বিশেষত্বই লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। পাশের গাঁয়ের রায়চৌধুরী জমিদার বাড়ীতে গোমস্তাগিরি করেন। পৈতৃক জমি জমা আছে, বাড়ীঘরের অবস্থাও একেবারে মন্দ নয়। মোটের উপর সম্পন্ন গৃহস্থ বলা যাইতে পারে।

বলিতে বলিতেই ঢুকিলেন, "দ্যাখো, পরশু বড়-গিন্নী যাচ্চেন ক'ল্‌কাতা, কালীঘাট-দর্শন আর গঙ্গাচান ক'র্‌তে। তা' আমাকে ডেকে ব'ল্‌লেন, 'হলধর, তুমি তো বিচক্ষণ লোক, কল্‌কাতার পথঘাট সবই তোমার জানা, তুমিই না হয় চল আমার সাথে। ছেলেদের তো এদিকে কাজকর্ম্ম ফেলে' ন'ড়বার উপায় নেই, ওদিকে কদ্দিন থেকেই ভাব্‌চি মাকে একবার দর্শন ক'রে পূজো দিয়ে আস্‌ব।' আমিও ব'লেচি, তা বেশ তো, চলুন।"

—"পরশু যাচ্চ?"

—"হ্যাঁ, শুন্‌চি তো তাই-ই, এখন দেখি। আর ভাব্‌চি ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব, একবার না হয় ঘুরেই আসুক। কর্ত্রী নিজেই ব'ল্‌লেন, 'আদ্দেক তো ভাড়া, তা' উনিই দিয়ে দেবেন। মন্দ কি, কি বলো?"

মিণ্টুর মা হাসিলেন, "না, মন্দ আর কি!"

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মিণ্টু আসিয়া বসিল খিড়কীর পুকুরের পাড়ে।

বাঁশের বনের ছায়ায়ঢাকা পুকুর, গভীর কালো ঠাণ্ডা জল। এখনো বর্ষার ধারা-বর্ষণ নামে নাই, বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝরিয়া পচিয়া উঠিয়াছে। কল্‌মি-লতার আত্ম-বিস্তারে অধিকাংশই আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, শুধু ঘাটের কাছের খানিকটা জল প্রত্যহের আলোড়নে অনেকটা পরিচ্ছন্ন।

ছায়া-নিবিড় নিরালা বাগান, আম, কাঁঠাল, বাঁশ সবাই একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে। একটা আম-গাছের গুঁড়ির উপরে মিণ্টু আসিয়া বসে।

ওর স্বপ্নের কলিকাতা, রূপকথার মায়াপুরী। এখানকার পথ ঘাট বনজঙ্গলের সাথে তার কোনোখানে এতটুকু সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না হয়তো। বিস্ময়কর, বিচিত্র কলিকাতা! পথের দু'ধারে ঠেলিয়া উঠিয়াছে অসংখ্য আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী, দিনরাত ছুটিয়াছে সারি সারি মোটর। আকাশে ভোঁ ভোঁ করিয়া এরোপ্লেন উড়িয়া বেড়াইতেছে পাখীর মতো ডানা মেলিয়া।

অবিনাশদা'র কাছে কত গল্পই তো শুনিয়াছে ও! গঙ্গার ঘাটে বড় বড় জাহাজ, দেশ-বিদেশ হইতে আসে মানুষ লইয়া, জিনিষ-পত্র লইয়া। কিন্তু জাহাজ দেখিয়া ও আশ্চর্য্য হইবে না, জাহাজ ও দেখিয়াছে বৈকি! প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় ওদের গ্রামের প্রান্ত-চারিণী ছোট নদীটি যখন গেরুয়া রঙের জল লইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, ওপারের মাঠ ডুবাইয়া, তরমুজ-পটলের ক্ষেত ভাসাইয়া, এ পারের কাছারী-বাড়ীর ছাতিম গাছটার তলা পর্য্যন্ত জলে ভরিয়া যায়, তখন সহর হইতে রূপনাথগঞ্জ পর্যন্ত একখানা ষ্টিমার এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। কী জোরেই যে চলিতে পারে! হালে শোঁ শোঁ করিয়া জল কাটিতে থাকে, বিরাট লোহার হুইল্ দুইটার পাকে পাকে বড় বড় ঢেউ জাগিয়া ওঠে, দুই পারের হোগ্‌লা বনের মধ্যে, বেত-ঝোঁপের গায়ে, ভাঙনের মুখে ঝুলিয়া পড়া গাছের শিকড়ে শিকড়ে ফেনিল জল আসিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি খায়। জেলে-নৌকাগুলি এই ভোবে তো এই ওঠে!......

......কিন্তু কলিকাতায় গেলে ও নিশ্চয় চিড়িয়াখানা

দেখিবে, যেখানে সব জীবজন্তুরা থাকে। সেখানে বাঘ আছে, সিংহ আছে, ভালুক আছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে না, লোহার খাঁচায় আটকাইয়া রাখিয়াছে ওদের। তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিলে নাকি 'হালুম' করিয়া ভয় দেখায় ওরা। আর আছে হরিণ, জিরাফ্, তা'রা নাকি মানুষের হাত হইতে গলা বাড়াইয়া ছোলা লইয়া খায়, এতটুকুও ভয় পায় না। কত রকমের বাঁদর, রঙ্ বেরঙের পাখী, তার আর সীমা সংখ্যা নাই।

অন্যমনস্ক ভাবে কোঁচড় হইতে এক একটা বৈঁচি লইয়া ও মুখে ফেলিতে থাকে।

এতদিন গল্প শুনিয়াছে কত, এবার সব নিজের চোখে দেখিয়া আসিবে। এয়ারগান্ একটা কিনিবে নিশ্চয়। সেনদের বাব্‌লুকে ওর বাবা সহর হইতে একটা এয়ারগান্ আনিয়া দিয়াছে, সেইটা লইয়া ওর জাঁক কত! বন্দুকটা কাঁধে ফেলিয়া বাগানে বাগানে ও বীরের মতো ঘুরিয়া বেড়ায় পাখী শিকার করিবে বলিয়া, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটাও শিকার করিতে পারে নাই কখনো। একবার গুলি লাগিয়া একটা শালিক পাখী মাটিতে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ধরা যায় নাই। ওরা কাছে যাইতে না যাইতেই পাখীটা চিঁ চিঁ করিয়া উড়িয়া গেল। তাই লইয়া আবার বাব্‌লুর কী অহঙ্কার, যেন কী-ই না একটা করিয়া বসিয়াছে! মিণ্টুর যদি বন্দুক থাকিত, তবে ও এতদিনে খরগোস, পাখী, কত কী যে শিকার করিয়া ফেলিতে পারিত।

ঘাসের বনের মধ্য হইতে ঝুপ করিয়া একটা বড় কোলা ব্যাং জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ওর চেতনা হয় বেলা উঠিয়াছে কত,—এখনি ইস্কুলে যাইতে হইবে যে,—তা'হোক,—বেলার অপরাধকে আজ ও ক্ষমা করিবে, মনটা ওর ঔদার্যে ভরিয়া গেছে।

দেখিতে দেখিতে পাড়ায় খবর রটিয়া যায়।

ছেলেরা আসিয়া ওকে ঘিরিয়া ধরে, "সত্যি ?"

মিণ্টু গম্ভীর হইয়া বলে, "সত্যি না তো কী! বাবার সঙ্গে যাব—রেলে চড়ে'—"

ওর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করিতে ইচ্ছা হয় ছেলেদের।

কিন্তু সবাই হার মানিতে চায় না, বিশেষ করিয়া বাব্‌লু। কারণ, একটু আগেই এয়ারগান লইয়া ওর ঝগড়া হইয়া গেছে মিণ্টুর সঙ্গে। বলে, "ভারী তো, যা না তুই কল্‌কাতায়, আমরা বুঝি আর যেতে জানিনে? বাবা বলেছে, এখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলেই আমাকে কলকাতা প'ড়তে পাঠাবে।

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাব্‌লু সদলে চলিয়া যায়।

ছেলেরা চলিয়া গেলে আসে গিরিশ কাকার মেয়ে রেণু।

বলে, "তুমি কল্‌কাতা যাবে মিণ্টু দা?"

মিণ্টু মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলে, "যাবই তো! আচ্ছা রেণু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

রেণু সাগ্রহে বলে, "যাব, নিয়ে চলো না আমাকে?"

মিণ্টু গম্ভীর হইয়া চিন্তা করে। বলে, "না, তুই এখনো বড্ড ছোট যে! গাড়ী ঘোড়া, লোকজন, নিশ্চয় হারিয়ে যাবি। তখন ভা-রী মুস্কিল হ'বে তোকে নিয়ে।"

রেণু জোর করিয়া বলে, "ইঃ, আমি হারাবো না, কক্ষনো না।"

বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িতে থাকে ও।

—"তুই তো জানিস্‌নে রেণু—"

রেণু তর্ক করিতে চায়,—"আর তুমিই বুঝি সব জানো?"

—"বাঃ, জানিনে? বাবা আমাকে বলেচে যে! চড়কের মেলা দেখেছিস তো?"

রেণু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, ও দেখিয়াছে।

—"কলকাতার রাস্তায় অমনি ভীড়। তুই নিশ্চয় হারিয়ে যাবি, নইলে গাড়ী চাপা পড়বি! জানিস্, অবিনাশ দা' বলেচে, ওখানে কত লোক এমনি গাড়ী চাপা প'ড়ে মরে যায়।"

রেণু চিন্তাকুল হইয়া ওঠে।

মিণ্টু ওকে সান্ত্বনা দেয়, "কিন্তু দুঃখ করিস্ নে তুই, তোর জন্যে আমি মস্ত একটা পুতুল কিনে আন্‌ব। কী পুতুল নিবি বল্‌তো? ডল পুতুল? রেল ?.. আচ্ছা—"

ওদিকে হলধরও যে উৎসাহী হইয়া ওঠেন নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে।

সেই ক-বে গিয়াছিলেন দশ বছর আগে, সে স্মৃতি আজ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। তবু তারই পাথেয় লইয়া রাজধানী ভ্রমণের বৃত্তান্ত লোকের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইয়াছেন; কিন্তু সংপ্রতি মুখুয্যেদের অবিনাশ আসিয়া তাঁহার চিন্তাধারায় দিয়াছে বিপর্যয় ঘটাইয়া।

তিন কোশ দূরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে থার্ড ডিভিশানে ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়া অবিনাশ গিয়াছিল কলিকাতায় পড়িতে, মতান্তরে বাপের টাকার খানিকটা সদ্ব্যয় করিতে। কিন্তু তিন বছর ধরিয়া দুই দুই বার ইণ্টারমিডিয়েটের রুদ্ধ দুয়ারে প্রতিহত হইয়া একজামিনারদের গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়াছে, সঙ্গে লইয়া প্রচুর চালিয়াতি এবং প্রচুরতর চুলের কায়দা। গ্রামের বখা যুবকদের হইয়াছে সে আদর্শ, ছেলেদের বিস্ময় ও জ্ঞানবৃদ্ধেরা বয়াটে বলিয়া নিন্দা করিলেও মনে মনে ওর সহরের অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা না করিয়াই পারেন না।

সন্ধ্যার পর মস্ত মজলিশ বসিয়াছে হলধরের বসিবার ঘরে। কথায় কথায় উঠিয়া পড়ে ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জ্জুনের অভিনয়!

অবিনাশ হাসে, করুণার হাসি। বলে, "ছোঃ, তুমি সেই দশ বছরের আগেকার ধারণা নিয়ে ব'সে আছো চক্কোত্তি মামা! সে সব দিন কী আর আছে এখন। আজকাল প্রায় সব থিয়েটার বাতিল, ষ্টার তো উঠেই গেছে। এটা হ'চ্ছে টকির যুগ—সমস্ত—সমস্ত সহরটা একেবারে ছেয়ে গেছে শো-হাউসে।"

হলধর বলেন, "হাঁ, হাঁ, শুনেচি বটে, কল্‌কাতায় বায়োস্কোপের খুব হিড়িক আজকাল।"

অবিনাশ হাত নাড়িয়া বলে, "যে-সে বায়োস্কোপ নয় মামা, একেবারে টকি, অর্থাৎ কিনা কথা বলা ছবি। সেখানে ছবিতে কথা কয়, গান গায়, কামানের শব্দে কাণে তালা ধ'রে যায়। একেবারে তাজ্জব!"

শ্রোতারা হাঁ করিয়া শোনে।

বিপিন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, সহরে মোকর্দ্দমা করিতে গিয়া সদ্য এক ভ্রাম্যমান টকি কোম্পানীর ছবি দেখিয়া আসিয়াছে সে। বলে, "হুঁ।"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাতের হুঁকোটা ঘোষাল ঠাকুরদার দিকে বাড়াইয়া দিয়া হলধর বল্লেন,—"কী কলই ইংরেজের, দু'দিন বাদে অসম্ভব ব'লে কিছু থাকবে না আর।"

কথাটা কাড়িয়া লয় অবিনাশ, "না মামা, কিছুই থাকবে না আর।"

বার্মিজ স্যাণ্ডালটা আল্‌গা ভাবে পায়ে গলাইয়া অবিনাশ চাঁদের-আলোয় বাহির হইয়া আসে। Evening Paris-এর একটা উগ্র গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সযত্ন বিন্যস্ত স্যাম্পু করা চুলগুলি একবার মাথায় একটা ঝাকুনি দিয়া খেলাইয়া লয়, তারপর গুণ গুণ করিয়া বাঙলা ছবির একটা সস্তা বাজে গান ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করে—

"এমন রজনী প্রিয় যায় যে বৃথাই—"

ওর গতিপথের দিকে চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘোষাল ঠাকুর্দা বলেন,—"আছে বেশ!"

রেণু আসিয়া খবর দেয়, "তোমাকে মেজদি ডেকেচে মিণ্টু দা।"

—"ডাকচে? কেন রে?"

—"আমি জানিনে, তুমি চলো।"

রেণুর মেজদি বিদ্যুৎ। তন্বঙ্গী সুশ্রী মেয়েটি, বয়স আঠারো উনিশের বেশী হইবে না। চোখে মুখে একটা সকরুণ বিষণ্ণ শ্রী। মিণ্টুকে ভারী ভালোবাসে, সামান্য দু' একটা টুকরো উপকারের বিনিময়ে ওকে কত যে খাবার খাওয়াইয়াছে, তা'র আর ইয়ত্তা নাই, সুতরাং ওর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা যাই-ই বলো মেজদির উপর একটু বেশী থাকিলে সেটা অন্যায় নয়।

বিদ্যুৎ মিণ্টুর জন্যই প্রতীক্ষা করে হয়তো।

ওর হাত ধরিয়া বলে, "তুই আমার সঙ্গে আয় ভাই একবার, গোটা কয়েক কথা বল্‌বার আছে তোকে।"

নিজের ঘরে আসিয়া বিদ্যুৎ দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, "তোরা কাল কল্‌কাতা যাচ্ছিস, না-রে?"

মিণ্টু ঘাড় নাড়ে, "হাঁ, বাবা তাই বলেচে।"

বিদ্যুৎ গলার স্বর আরো নামাইয়া আনে,—"তুই আমার একটা কাজ করতে পারবি মিণ্টু ?"

—"কী মেজদি ?"

বিদ্যুৎ কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকে, বেদনায় যেন ওর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। আস্তে আস্তে বলে, "শুনেচি, উনি এখন কলকাতায়ই আছেন, কী একটা চাকরী করচেন। যদি তুই তাঁর দেখা পাস, তা' হলে আমি একখানা চিঠি দিলে দিতে পারবিনে ?"

মিণ্টু কৌতুহলী হইয়া বলে, "কে আছেন কলকাতায় ? জামাই বাবু ?"

বিদ্যুতের চোখে জল টলমল করে, গালের পাশ দিয়া এক ফোঁটা গড়াইয়াও পড়ে। আঁচলের খুট দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া মাথা দুলাইয়া বলে, 'হাঁ, পারবিনে ভাই এই কাযটুকু ?'

সোৎসাহে ও বলে, "নিশ্চয় পারব মেজদি, তুমি দাওনা চিঠি লিখে।"

মেজদি সস্নেহে ওর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলে, "তবে তুই বোস ভাই, আমি লিখে দিচ্চি।"

কালি কলম লইয়া বিদ্যুৎ চিঠি লিখিতে বসে।

এইখানে একটু ইতিহাস আছে।

গিরীশ চক্রবর্ত্তী ভালো ঘর বর দেখিয়াই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যুতের কপালে সুখ আর ঘটিয়া উঠিল না। ছেলে একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ, চরিত্র দোষও ছিল বলিয়া শোনা যায়। স্ত্রীকে প্রায়ই মারধর করিত। একদিন রাত্রে লাঠি মারিয়া স্ত্রীর মাথা ফাটাইয়া হইল অদৃশ্য, সঙ্গে সঙ্গে মহাজন বাপের সিন্দুক হইতে শ' খানিক টাকার পাথেয় লইয়া যাইতেও ভুলিল না। সেই হইতে বিদ্যুৎ বাপের ঘরেই দিন কাটাইতেছে।

গিরীশ চক্রবর্ত্তী পয়সাওয়ালা লোক, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অমন জামাইয়ের আর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না। লোকে বলে, তাঁহার সঙ্কল্পিত উইলে তাঁহার মেজো মেয়ের নামে একটা বড় অংশই লেখা থাকিবে।

কিন্তু বিদ্যুৎ তাতে খুশী হইতে পারে নাই।

বাঙালির মেয়ে, মাটির মতোই সর্ব্বংসহা স্নেহশীলা। নরপশু স্বামীকে ও ভুলিতে পারে নাই, তাই অনেক বিনিদ্র রাত্রেই চোখের জলে ওর বালিশ ভিজিয়া গেছে। যাহার নিষ্ঠুরতার অত্যাচারে ওর সমস্ত জীবন দুর্ব্বহ, তাহার স্মৃতি বহন করিয়াই ও অশ্রুসিক্ত পথে যাত্রা করিয়াছে।

ওর এখনো আশা আছে, স্বামী আসিবেন, ওকে গ্রহণ করিবেন। তারই প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে ও। বাপের অজস্র স্নেহে আচ্ছন্ন থাকিয়াও সমস্ত অন্তরটা রহিয়া রহিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।

আঁকাবাঁকা অশুদ্ধ অক্ষরে লিখিতে থাকে—

".........দাসী তোমার পায়ে এত কি অপরাধ করিয়াছে যে তুমি এত নিষ্ঠুর হইতে পারিলে ? তুমি ফিরিয়া এসো, বাপের ঘর দু'পায়ে ঠেলিয়া আমি তোমার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইব, যেখানে তুমি আমাকে লইয়া যাইতে চাও সেইখানেই। থাকুক দুঃখ, থাকুক অভাব, তবুও তোমায় পায়ে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলেই আমার স্বর্গলাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।........."

চিঠিটা খামে আঁটিয়া বলে, "কিন্তু এর কথা কাউকে বলতে পারবিনে ভাই, ঘুণাক্ষরেও না। বুঝ্‌লি ?"

—"বুঝেচি মেজদি।"

মেজদি ওর হাতে দু'টো টাকা দেয়, বলে এই নে মিণ্টু, তোর যা ইচ্ছে কিনিস ভাই কল্‌কাতা থেকে। কিন্তু চিঠিটা ওঁকে দেবার—"

খুঁজিয়া বাহির করার সম্ভব অসম্ভবের মাত্রা জানেনা বলিয়াই মিণ্টু জোর গলায় বলে, "নিশ্চয় দেব মেজদি, তুমি এতটুকুও ভেবো না

মিণ্টু চলিয়া যায়।

বিদ্যুৎ জানালার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়।

আকাশ ঘিরিয়া আষাঢ়ের মেঘ নামিয়াছে, ধূসর হইয়া আসিয়াছে দূরের বনশ্রেণী। এখুনি হয়তো বৃষ্টি নামিবে। বুকের জমাট বেদনা দুই চোখের কোণ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া নামিয়া আসে।

হলধর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

—"আমার কাপড়খানা কেচে ফেলেচ তো ? আর বিছনার চাদর দু'টো ?.........না, এ জামাটা বড্ড নোংড়া হ'য়ে পড়েচে, সাবান দিয়ে একটু কাচতেও পারোনি ছাই। কী ক'রে নিয়ে যাই এটা বলো তো ?"

একদিন আগে হইতেই গোছানো চলে।

—"কী কী আনতে হ'বে, একটা ফর্দ করে' দাও না হয়। অতো কী আমার মনে থাকে। আচ্ছা তুমি ব'লে যাও,

আমি লিখে' নিচ্ছি। হাঁ, পানের বাঁটা, খুকীর দুধ খাবার ঝিনুক, বার্লি,—তারপরে ?".

মিন্টু মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে থাকে।

ওর স্বপ্নের কলিকাতা— রহস্যময় মায়াপুরী যেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী, পথে পথে গাড়ী ঘোড়ার সমারোহ —আকাশে বাজপাখীর মতো উড়ো জাহাজ উড়িয়া বেড়ায়, পথে ঘাটে যেন দিনরাত চড়কের মেলা বসিয়াছে। সেখানে ছবিতে গান গায়, কথা বলে, বন্দুক দিয়া বাঘ শিকার করে— কল্পনাও হার মানিয়া যায় তা'র কাছে।

কিন্তু তাই বলিয়া মেজদির চিঠি ও ভুলিতে পারে নাই। সেখানা রাখিয়াছে সযত্নে, ওর রং-চটা টিনের তোরঙ্গটায় লুকাইয়া।

সন্ধ্যাবেলা হলধর জমিদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন। বলিয়া যান, "দেখে আসি ওদিকের বন্দোবস্ত সব কতদূর।"

ফেরেন অনেক রাত করিয়া।

মিন্টুর মা জিজ্ঞাসা করেন, "এত রাত হল যে ?"

হলধর সে কথার জবাব না দিয়াই ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন "কলকাতা যাওয়া টাওয়া আর হ'বে না।"

—"কেন আবার হ'ল কি ?"

তেমনি সুরেই জবাব আসে, "কেন কি আবার, বড়-লোকের খেয়াল তো! গিন্নী মা বললেন, 'হলধর আমার ভাইপো ভবানী এসেচে পাটনা থেকে, সে আজ কলকাতা যাচ্চে, তার সঙ্গেই যাব। তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।' কর্তাও সায় দিয়ে বললেন, 'সেই ভালো, এখন কিস্তির সময়, তুমি গেলে মহালে আদায়ের ক্ষতি হ'বে, এখন ছাড়তে পারি না তোমাকে।' কাযেই—"

—"আহা, ছেলেটা এত আশা ক'রে—"

অকারণেই বিশ্রীভাবে খিঁচাইয়া ওঠেন হলধর। "আশা ক'রে! তা আমি করব কি? গরীবের ছেলের অত আশা না ক'রলেও চলে। কিন্তু বিছানাটা খুলে ফ্যালো, অনর্থক বেঁধে রেখে লাভ কি ?"

মিন্টু তখন জাগিয়া নাই। রং-চটা টিনের বাক্সটা বুকের কাছে লইয়া মায়াপুরীর স্বপ্নই দেখিতেছে বোধ হয়।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভোরের ঘুমে

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ বিদ্যাবিনোদ, কবিশেখর

যবে সুরের লহর তুলে ভোরের পাখী,—
কেন ঘুমায় হেলায় কেহ অলস-আঁখি ?
তার অবশ শরীর তবু শয়ন মাগে
যবে পূবের আকাশ জাগে অরুণ-রাগে।
তার এলায় চিকুর, কাঁপে শিথান 'পরে
মধু ভোরের বায়ুর মৃদু পরশ তরে।
যেন কাহার প্রেমের কম পরশ নিয়ে
কাঁপে লীলায়, দোলায়, তারে সোহাগ দিয়ে।
তা'রি মৃদুল শিহর লাগে নয়নতলে,
কাঁপে কাজল আঁখির তারা খেলার ছলে।
যেন মোহন স্বপন মাঝে মধুর খেলা
করে অলস-নয়ন দু'টি ভোরের বেলা।
তার সরস মানস বঁধু স্বপন-কায়া
আনে আঁখির পাতায় যেন মদির মায়া।
ভূমে লুটায় আঁচল্ তা'রি আসন পাতি'
গেছে যাহার আশায় জাগি' বৃথায় রাতি।
দেহে শিথিল নিচোল কাঁপে তাহার লাগি'
গেছে নিশীথ যাহার লাগি' বৃথায় জাগি'।
লাগে আঁখির পাতায় তা'রি আবেশখানি
দিতে অঘোর ঘুমের মাঝে স্মরণ আনি'।
তাই, ভোরের আলোয় থাকে অলস ঘুমে,
পেয়ে বিফল রাতের শেষে স্বপন-চুমে।

বাঙ্গালী জাতি ও তাহার সাহিত্য

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নিজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, প্রতিভা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিন্তু তার দেশকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে চাই জাতির প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য এই ব্যষ্টির সমষ্টি লইয়াই জাতি। কোন বিশেষ ব্যক্তি জাতির উপদেষ্টা হইতে পারে, তার আশা আকাঙ্খার উদ্গাতা হইতে পারে কিন্তু তার জাতিকে একটি বিশেষ ধর্ম্ম লইয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। সেই ধর্ম্মের দ্বারাই বিশ্বের সামনে তার পরিচয় দিতে হয়। যেমন ইংরাজ জাতি। ইংরাজ জাতি বলিলে আমরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কোন সম্প্রদায়মাত্রকে বুঝি না, কেননা কেবলমাত্র সেইটুকুই তাদের পরিচয় নয়। ইংরাজ-জাতি বলিলে আমরা বুঝি স্বাবলম্বী আত্মবিশ্বাসী নির্ভীক দেশপ্রিয় সদাসচেতন বুদ্ধিপ্রধান ডিসিপ্লিনধর্ম্মী এক ধরণের মানুষ যারা পৃথিবীর অনেক দেশের উপর রাজত্ব করিতেছে। এই গুণগুলির দ্বারাই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সামনে প্রতিনিয়ত তাদের আত্মপরিচয় কায়েম রাখিতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভূভাগে যে সকল বিচিত্র সমস্যার অহরহ উদ্ভব হইতেছে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া নিজেদের চিন্তা এবং কার্য্যের দ্বারা ইংরাজজাতিকে সর্ব্বদা সেই সকল অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সম্পদ না থাকিলে আজকালকার দিনে এই সকল পরীক্ষায় টেঁকা দায়। যে জাতির এই সকল গুণ ও সম্পদ আছে সেই জাতিই আজ পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী। অপর জাতিরা কালের নিয়মে আপনা আপনিই সরিয়া গেছে।

উপরে জাতির যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই হিসাবে বাঙালী জাতি বলিয়া কোন জাতি আছে এমন মনে হয় না। যে সকল চারিত্রিক গুণে মণ্ডিত হইলে জাতি বিশ্বের দরবারে আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দেওয়ার অধিকারী হয় বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্ত অভাব। অপর পক্ষে বাঙালীজাতি বলিলেই এমন একটি চিত্র কল্পনায় ভাসিয়া উঠে যাহা অগ্রগতিশীল জাতির বাটখারায় নিতান্ত অচল। মনে হয় ন্যুব্জদেহ তৈলচিক্কন বক্তৃতাবাগীশ ভয়ধর্ম্মী একদল মানুষ পিপীলিকার ন্যায় মাটির উপর হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, কাজের আহ্বান আসিলে যাদের নিশ্চিত দেখা মিলিবে না। দুই দশজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী বাঙালীজাতি সম্বন্ধে আমি যে অত্যুক্তি করিতেছি না সে কথা জাতির দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইলে সকলেই স্বীকার করিবেন। এ জাতির সেন্টিমেণ্ট অত্যন্ত প্রবল—সুতরাং সেন্টিমেণ্টের দোষ এবং গুণ দুই-ই এ জাতি পুরামাত্রায় পাইয়াছে। ইহারা তীক্ষ্ণধী—চট্ করিয়া একটা জিনিষ ইহারা যেমন বুঝিতে পারে এক মান্দ্রাজী ব্যতীত অপর কেহ এত তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারে না। ইহাদের কল্পনাশক্তিও প্রখর—কোন নূতন তথ্য কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠিতে বিন্দুমাত্রও দেরি হয় না। কিন্তু সোডার বোতলের ঊর্দ্ধায়মান ফেণ-পুঞ্জের ন্যায় স্তিমিত হইয়া যাইতেও মুহূর্ত্তের অবকাশ যথেষ্ট। বহুবার বাঙালীর চরিত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। এক সিগারেট বর্জ্জনের উদাহরণই ধরা যাউক। যেদিন উক্ত বস্তু বর্জ্জন করিবার শপথ গ্রহণের প্রয়োজন হইল সেদিন এক ম্লান অপরাহ্নে সকল বাঙালী অবলীলায় এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিল যে জীবনে তারা আর উক্ত দ্রব্য পান করিবে না। বাকি ভারতবর্ষ তখনো এই কার্য্যের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কয়েকদিন কলিকাতার পথে ঘাটে আর সিগারেটের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। এই বস্তু বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে যে বিরাট অর্থরাশি রপ্তানি হইয়া যায় তার সকরুণ চিত্র এক মুহূর্ত্তেই বাঙালীর কল্পনায় রং ধরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙালীর স্বভাব পাঁকাল মাছের গায়ের মত—তার স্বভাবে কোন বস্তুই

আটকাইয়া লাগিয়া থাকে না। অতএব সিগারেটের নির্ব্বাসনও যেমন সহজে হইয়াছিল, অভ্যাগমও তেমনি সহজে নিষ্পন্ন হইল। আবার গোলদীঘির পরিক্রমার পথ সিগারেটের ধূমে সুগন্ধি হইয়া উঠিল, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ যেন পাল্লা দিয়া সিগারেট চালাইতে লাগিল। অথচ ভারতবর্ষের এই যুক্তপ্রদেশেই ইহার অন্যথা দেখিলাম। শপথ গ্রহণ করিতে তারা দেরি করিয়াছিল নিঃসন্দেহ, সেকারণে তাদের তীক্ষ্ণধী বলিব না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যারা শপথ গ্রহণ করিয়াছিল তারা সেদিনও যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল আজও তেমনি করিতেছে। একটা গল্পের কথা মনে পড়িল। অশিষ্ট আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া কোন শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিয়াছিল যে সে বাহির হইয়া যাইবার মাত্র আদেশ পাইয়াছে, পুনঃপ্রবেশ রুদ্ধ হইবার ত কোন আদেশ পায় নাই। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক শিষ্যের চাতুর্য্য দেখিয়া খুশী হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে এই পুনঃপ্রবেশনীতিকে বাঙালীজাতি এমন সমাদরে নিজেদের চরিত্রে গ্রহণ করিবে।

ইংরাজ জাতির দেশপ্রিয়তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাহার বিশদ ব্যাখ্যাকল্পে আমি নিজেই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। তখন বড়দিনের ছুটি। বড়দিনের ছুটির মধ্যে একটি দিন আছে day of license—সেদিন পল্টনের সৈন্যদের উপর হইতে পানাহারের এবং পরিভ্রমণের স্থানাস্থানের বিধিনিষেধ তুলিয়া লওয়া হয়। সেই দিনের সন্ধ্যার প্রাক্কাল। জনৈক গোরা সৈনিক এত মদ খাইয়াছে যে তার পা টলিতেছে, কোন গতিকে সে হাঁটিতে পারিতেছে মাত্র। এমন অবস্থায় টলিতে টলিতে কোন গতিকে সে এক জামা কাপড়ের দোকানে ঢুকিল এবং একটি গেঞ্জি খরিদ করিতে চাহিল। দোকানদার দেখিল জাপানী মালের বিক্রয় বাড়াইবার এই একটি সুযোগ। সে বাছিয়া বাছিয়া সস্তা দরের দেখিতে সুন্দর জাপানী গেঞ্জি সৈনিকটির হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল। সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া গেঞ্জিগুলি ফেরৎ দিল এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত মাল চাহিল। অবশেষে প্রায় ডবল দাম দিয়া একটি বিলাতি গেঞ্জি কিনিয়া সে দোকান ত্যাগ করিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে এ জাতি রাজত্ব করিবে না ত রাজত্ব করিবে কে? ভোগের আদর্শকে ইহারা জীবনে আমল দিয়াছে সত্য কিন্তু তার মধ্যেও কর্ত্তব্যের পথ ইহাদের দৃষ্টি হইতে এক চুলও সরিয়া যায় নাই। তাই জাপানী মাল দেখিয়া সৈনিকটি হৈ চৈ করিল না, দেশপ্রেমের বক্তৃতাও দিল না কিন্তু সেই নেশাচ্ছন্ন অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থাতেও চড়া দামে নিজের দেশের জিনিষটিই ক্রয় করিল।

শুধু রাষ্ট্রিক জীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও আমরা ছন্নছাড়া। সেখানেও আমাদের কোন ঐক্য নাই। এখনো ভট্টপল্লী নিবাসী গঙ্গাতীরবাসী একদল সনাতনী সমাজপন্থী আছেন যাঁরা হিন্দুর আচার হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতে চাহেন না, যাঁরা ধর্ম্মের স্পিরিট অপেক্ষা তার বাইরেকার অনুষ্ঠানকে বড় এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যের সংখ্যাও কম নয়। আবার আর একদিকে একদল আছেন যাঁরা হরিজনদের মন্দির-প্রবেশ লইয়া গলা ফাটাইতেছেন, যাঁরা জাতিভেদ প্রথা নির্ম্মূল করিবার পক্ষপাতী, অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ দেশে প্রচলিত করিতে যাঁরা বদ্ধপরিকর। ইহাদের কোন দলকেই ভ্রান্ত বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এই কথাটি বলিতে চাহি যে এই দুই বিপরীতমুখী মতবাদের যোগসূত্র কোথায়? অগণিত ছাত্রসমাজ এই দুই ভিন্নধর্ম্মী মতবাদের দোটানা আবর্ত্তে পড়িয়া ভগবানকে ছাঁটিয়া ফেলাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছে। কলেজে হষ্টেলে কিম্বা ছাত্র-পরিচালিত মেসে কোথাও ধর্ম্ম, ভগবান, আচার, অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন কিছুরই অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এজন্য ছাত্র-সমাজকে দোষ দিতে চাহি না। যে দেশের বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিরা মতের বৈষম্য লইয়া পরস্পর বিবদমান সে দেশের ছাত্রবৃন্দের মত স্থিতিলাভ করিবে কোথায়? কিসের জোরে?

মতের বৈষম্য লইয়া আদর্শের মধ্যেও দ্বন্দ বাধা স্বাভাবিক। এক দল মনে করিতেছেন পুরাকালে আমাদের যাহা ছিল সবই

শ্রেয়ঃ, বর্ত্তমান সভ্যতার সমস্তই অনিষ্টকর। আমাদের পুনরায় অতীতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আর একদল মনে করিতেছেন যাহা অতীত তাহার কোন প্রভাব আমাদের উপর নাই। অতীতের মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান লইয়াই আমাদের কারবার এবং বর্ত্তমানকে সত্যভাবে নিজেদের ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে তবেই ভবিষ্যৎ আমাদের করায়ত্ত হইবে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অতীত বা ঐতিহ্যের প্রভাব জাতির উপর নাই ইহা উন্নতিশীল কোন জাতিই মনে করিতে পারে না। কোন লেখক নাকি বলিয়াছিলেন যে, যে জাতির অতীত নাই সে জাতির ভবিষ্যৎও নাই। কথাটা খুব সত্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতির চরিত্রেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই ঘটনার আলোকসম্পাতে সম্রাটের মহানুভব চরিত্র যেমন একদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল অপর দিকে তেমনি জাতির চরিত্রের দৃঢ়তা এবং ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাও প্রতিপন্ন হইল। ঘটনাটি সত্যভাবে অনেক স্থলে বিবেচিত হয় নাই বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। কেহ বলিয়াছেন তুচ্ছ নারীর জন্য সিংহাসন ত্যাগ সমীচীন হয় নাই। আবার কেহ বলিয়াছেন সম্রাটকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পত্নী নির্ব্বাচন করিতে না দিয়া তাঁর হৃদয়বৃত্তির উপর জুলুম করা হইয়াছে। এই উভয় মতই আমার মনে হয় আপাত দৃষ্টির পরিচায়ক। ঘটনাপরম্পরার তাৎকালিক মূল্য অতিক্রম করিয়া সুদূরপ্রসারি ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে কি অমিততেজা এই ইংরাজ জাতি, কি দুর্দ্ধর্ষ ইহার প্রাণশক্তি! যে জাতির মধ্যে এমন সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন, এমন প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর উপযুক্ত সহকারী জন্মগ্রহণ করেন সে জাতি বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া জগতের সমক্ষে গৌরবদীপ্ত ভালে দাঁড়াইবে না ত দাঁড়াইবে কে? এত বড় আদর্শের সংঘর্ষ কেবলমাত্র জাতির মুখের দিকে চাহিয়াই না কি সহজে মীমাংসিত হইয়া গেল! সম্রাট স্বীকার করিতে চাহিলেন না যে জাতি তাঁহার হইয়া সম্রাজ্ঞী নির্ব্বাচন করিয়া দিবে—নিজের একান্ত অধিকারে অপরের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে তাঁর স্বাধিকারপ্রবণ চিত্ত কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু তাহা লইয়া তিনি হৈ চৈ করিলেন না, ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করিয়া আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন না, জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া স্বাধিকারপ্রবণতার চরম মূল্য দান করিলেন—একনিষ্ঠ প্রেমের রথশীর্ষে বিজয়মাল্য পরাইতে গিয়া রাজসিংহাসন পরিবর্জ্জনের পরম ত্যাগ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অপর দিকে জাতীয় চরিত্রের দার্ঢ্য ও বিস্ময়ের বস্তু। মিঃ বল্ডুইন নিজেকে সম্রাটের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার উপর ইংলণ্ডের রাজা ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের মহিমান্বিত সম্রাট—তাঁর রাজ্যাধিকার সুদূরবিস্তৃত। ব্যক্তিগত গুণাবলীর সদ্ভাবে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড আপামর সাধারণের প্রিয়। কিন্তু তথাপি দেখা গেল ইংরাজ জাতি তাহাদের যুগযুগবাহী ঐতিহ্যকে অসম্মান করিতে চাহিলনা, —রাজার মুখের দিকে চাহিয়াও নয়, বন্ধুত্বের দাবিতেও নয়, তাঁহার জনপ্রিয়তার শক্তিতেও নয়।

তাই বলিতেছিলাম বাঙালী জাতি বলিয়া কিছু নাই এবং উপরে উক্ত দোষগুলি নিরাকৃত না হইলে বাঙালী জাতি বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনাও কম। জাতির চরিত্রে এই কারণেই জাতীয়তা-বোধ সুষ্ঠুরূপে উদ্বুদ্ধ হয় নাই—সাহিত্যেও তাহার প্রকাশ অপরিসর। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে" ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল কিন্তু তারপর ইহার প্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ "গোরা" উপন্যাসে দেশপ্রেমের অবতারণা করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ব সেখানে দেশকে গ্রাস করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন যুগের স্বদেশী গানগুলি অবশ্য জাতীয়তার ভাণ্ডারে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলির এই সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি। বিশ্বপ্রেমের মর্য্যাদা দিতে আমি পরাঙ্মুখ নহি কিন্তু যাহারা নিজের জাতিকে চিনিল না, নিজের দেশকে ভালবাসিল না তাহারা বিশ্বকে ভালবাসিবে কোন সম্পদের জোরে তাহা বোঝা শক্ত। মহামতি গোর্কি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁর লেখার শক্তি আজ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি বিশ্বপ্রেমের কিছুই বুঝিতেন না এ কথা আশা করি কেহ মনে করেন না, যদি চ সে বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করেন

নাই। তিনি জন্মভূমিকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, আজীবন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই দেবীরই সেবা করিয়া গিয়াছেন—তাহার ফলাফল আজ ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

তাই আজকাল যখন দেখি আধুনিক কথা-সাহিত্যে এমন সব বস্তু আত্মপ্রকাশ করিতেছে যাহা ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শের, ঐতিহ্যের এবং সংস্কৃতির বিরোধী তখন দুঃখ বোধ করিলেও আশ্চর্য্য বোধ করি না। কেননা জানি এই ফলই অবশ্যম্ভাবী। যার জাতি নাই, জাতীয়তা বোধ অপরিপুষ্ট দেশপ্রাণতা অবাস্তব তার সাহিত্য উন্মার্গগামী হইতে বাধ্য। কেননা যথেচ্ছ মসীচালনার দ্বারা কোন্ আদর্শকে কতটা ক্ষুণ্ণ করা যায় কোন্ আঘাত কিসের মধ্য দিয়া কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে সে সম্বন্ধে লেখকের কোন হুঁস নাই, কোন দরদ নাই। লেখক হইতে হইলে যে বেদনার হোমানলে নিজেকে আহুতি দিতে হয়, দেশমাতৃকার বেদীমূলে পাঠগ্রহণ করিতে হয়, তাহার জন্য প্রস্তুতি কই?

আধুনিক কথা-সাহিত্য ছাঁকিয়া তুলিলে দুইটি বস্তু চোখে পড়ে—একটি ক্ষুধা, অপরটি যৌন-ক্ষুধা। বলা বাহুল্য এই দুইটি বস্তুই জানোয়ারের। মানুষের মধ্যেও চিরদিন এই দুই প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে কিন্তু এই দুই বৃত্তিকে গৌণ করিয়া রাখাই মনুষ্যত্বের সাধনা। মানুষ চিরকালই জানিয়াছে যে সে এই উভয় ক্ষুধার অতিরিক্ত—ইহাকে অতিক্রম করিয়াই তাহার রুচি, তাহার আদর্শ, তাহার সৌন্দর্য্যবোধ, তাহার সাহিত্য। সাহিত্য-রচনা করিবার অমোঘ শক্তিতে যে বীরপুরুষ বলীয়ান তাঁহাকে জয় করিতে হইবে লালসা এবং পরভৃতত্ব, তাঁহাকে সাধনা করিতে হইবে শৌর্য্যের জ্ঞানের ত্যাগের এবং প্রেরণার। শপথ করিয়া বলা যায় সে সাধনা একদিন সার্থক হইবেই।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রার্থনা

৺কেতকী দেবী

তুমি যদি মম অন্তরে করো বাস,
সকল কামনা পুরায়ে আমার
ঘুচাও দীর্ঘশ্বাস।
ওগো অন্তরযামী অন্তরে থাকি
কত ব্যথা সে কি তুমি জানো না কি?
সকল বেদনা ভুলায়ে আমার,
প্রাণে দাও আশ্বাস।
চির-সখা মোর চির-সাথী হয়ে
অন্তরে করো বাস।
আমার ঘুচাও সকল আশ॥

এই কবিতাটি যেদিন প্রেরিত হয় সেই দিনই লেখিকা পরলোক গমন করেন।

অভিশপ্ত সাধনা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

হরিপদর ছিল অনেক মেয়ের সঙ্গে আলাপ, একথা সে দেখা হইলেই বলিত।

বয়স যখন অত্যন্ত কম, প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি, সেই সময়ই হরিপদর প্রেমালাপের গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমাদের পড়ার রীতিমত ক্ষতি হইত।

কমনরুমের কোলাহলের মাঝখানেও যদি কোন রকমে একপাশে একটা ছবির ম্যাগাজিন লইয়া বসিয়াছি, হরিপদ আসিয়া সুরু করিল —অ'জ যা ব্যাপার হয়েছে।

নারীঘটিত ঘটনা ছাড়া তার কাছে অন্য কোনো গল্প ছিল না, কতটা সত্য এবং কতটাই বা কাল্পনিক সে ধারণা করাও আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল।

তবু শুনিতাম এবং শুনিতে ভালোও লাগিত, কিন্তু সকল সময় সেই একঘেঁয়ে প্রেমচর্চ্চার কাহিনী যে শ্রুতি সুখকর হইত এমন বলিতে পারি না।

সে বলিত, হরিপদ চট্টরাজকে দেখে যে-মেয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে সে-মেয়ে মেয়েই নয়।

ট্রামে কোন্ কুমারী তাহাকে দেখিয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিল এবং অবশেষে আলাপ করিয়া তবে নিষ্কৃতি, বন্ধুর কোন্ ভগিনী তাহাকে মাঘোৎসবের প্রীতি-উপহার পাঠাইয়াছে, একজিবিশানে কোন্ তরুণী তাহাকে বাড়ীতে যাইবার নিমন্ত্রণলিপি দিয়াছে, রোজ রোজ নূতন এমনি এক একটি রোমাঞ্চকর সংবাদ সে আমাদের আনিয়া দিত।

মেয়েদের সঙ্গে কেমন করিয়া আলাপ করিতে হয় সে কঠিন তত্ত্ব অবশ্য আমার জানা ছিল না, তাই আমি নিরতিশয় বিস্ময়ে ও ভক্তিগদ্‌গদ মুগ্ধমনে তাহার কীর্ত্তিকলাপের প্রীতিপ্রদ কাহিনী দিনের পর দিন শুনিয়া যাইতাম, এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম—হায়রে আমি যদি হরিপদ হইতাম।

হরিপদ একদিন একখানি চিঠি আনিয়া আমাকে ক্লাসের মধ্যেই দেখাইল,—একটি সদ্যপরিচিতা লিখিয়াছে। কবিতার কোটেশানে কণ্টকিত সেই ফুলের মত লিপিখানির সমস্ত সুষমা আঘ্রাণ করিয়া লইবার পূর্ব্বেই লজিকের কড়া প্রোফেসর How then বলিয়া গর্জ্জন করিলেন, কাজেই শেষ করা আর হইল না।

কিন্তু হরিপদ যে জবাব পাঠাইল সেটার খসড়া আমাকে দেখাইয়া লইল, ভাবে ভাষায় কল্পনায় সেদিনকার প্রথম দক্ষিণ সমীরণে সে এক অপূর্ব্ব জিনিস মনে হইয়াছিল।

হরিপদ সব করিল, কিন্তু পাশ করিতে পারিল না। ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গেল, যেখানে মেয়েদের সঙ্গে সহশিক্ষা চলিবার সম্ভাবনা আছে। পিতাকে জানাইল, প্রেসিডেন্সী কলেজ আর সে প্রেসিডেন্সী কলেজ নাই।

কোন কোন দিন পথে আসিতে দেখিয়াছি, হরিপদ কোন বান্ধবীর সঙ্গে বাসে কিম্বা ট্রামে উঠিতেছে, কোন দিন বা রাস্তায় দাঁড়াইয়াই হাসিয়া হাসিয়া কি জানি কত কি কথা কহিতেছে, আমার সঙ্গে দেখা হইয়া গেলে এক চোখ মুদ্রিত করিয়া অপরূপ এক ভঙ্গী করে, ভাবটা যেন, দেখো আমার 'এলেম্'টা একবার!

হরিপদর চেহারায় এমন কিছু ছিল না যাহাতে মনে করিতে পারা যায় যে কোন মেয়ে তাতে আকর্ষণের কিছু দেখিতে পারে; কিন্তু নারীর অন্তর সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আমার না থাকায় হরিপদর ভাষায় অগত্যা মানিয়া লইতেই হইত, 'চেহারায় কি করে!'

হরিপদ সাইকেল চড়িত অনেকটা জিনে পা দিয়া ঘোড়ায়

চড়ার মত, এবং যে-কোন অবস্থায় যে-কোন রকমেই হোক বাইকচালানো তাহার পক্ষে পায়ে-চলার চেয়েও যেন সোজা ছিল। রুক্ষ চুলগুলা পিছনের দিকে হাওয়ায় উড়িতেছে, সিগারেট একটা সকল সময়ই মুখে আছে, ঝড় জল শীত রৌদ্রে তাহাকে কত পথে কত রকমে দেখিয়াছি,—ক্রিং ক্রিং বেল বাজাইয়া চলিয়াছে, কত না রকম কায়দা দেখাইয়া। মুখ দিয়া আপনি বাহির হইয়া যাইত 'বাহাদুর ছেলে'! মাণিক বলিত—ছেলে একখানা!

বি-এ পড়িবার সময় আমার একদিন হইল এক সমস্যা। কলিক্ পেনের জন্য ছত্রিশ টাকা নগদ খরচ করিয়া এক মাদুলী ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার এই সর্ত্ত ছিল—মঙ্গলবার দিন ভাত খাওয়া চলিবে না, ফলমূল ও লুচি— এবং সেদিন কোন নারীর আঁচলের বাতাস গায়ে লাগিবে না।

এম্‌নি তিনমাস করিতে হইবে।

এই অবস্থার মধ্যে দেওঘরের এক মহিলা—তাঁহার সঙ্গে আমাদের সেখানে একবার আলাপ হইয়াছিল,—কলিকাতায় আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল মঙ্গলবার, হয়ত বিশেষ জরুরী কাজ আছে মনে করিয়া আমি বাহির হইলাম এবং মনকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলাম, বর্ষীয়সী মহিলার আঁচলের বাতাস হঠাৎ গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। যাই, একটু দূরে বসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিলেই হইবে।

তিনি বাড়ীর কুশলপ্রশ্ন সারিয়া প্রস্তাব করিয়া বসিলেন তাঁহার কুমারী মেয়েটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিবার আব্দার ধরিয়াছে, একবার দেখাইয়া আনিতে হইবে।

বুঝুন বিপদ, আমি মেয়েটিকে লইয়া গেলে কত না পরিচিত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইয়া যাইতে পারে এবং কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও মুস্কিল, না জিজ্ঞাসা করিয়া যা হোক কিছু কল্পনা করিয়া লইলেও ততোধিক বিপদ্।

সকলের চেয়ে বড় কথা আমার ৩৬৲ টাকার মাদুলীর গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে, এক কথায় ছত্রিশটা টাকাই জলে, কারণ পাশে বসিয়া যাইবে অথচ আঁচলের বাতাস লাগিবে না, এ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু মেয়েটির চাবি ছিল না, সুতরাং আঁচল কেমন করিয়া হইবে?

যাহা হউক তাঁহারা ব্রাহ্ম এবং শিক্ষিতা, আমি রাজী না হইলে পাছে হিন্দু পরিবারের ছেলেদের নিতান্ত পশ্চাৎবর্ত্তী মনে করেন, এবং সন্দেহ করেন ছুঁৎমার্গের কুসংস্কার আমার মধ্যেও আছে এই ভয়ে শেষ অবধি রাজীই হইতে হইল।

ট্রামে উঠিয়া আমি তাহাকে এক বেঞ্চে বসাইয়া অন্য বেঞ্চে নিজে বসিলাম, যতটা দূরত্ব বজায় রাখিয়া যাওয়া যায়! মেয়েটি ফিক করিয়া একটু হাসিল।

তারপর কেমন করিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাইলাম সে ঠিক মনে পড়িতেছে না, কারণ এক ঘর হইতে আর এক ঘরে শুধু ঘোড় দৌড় করাইয়া লইয়া ঘুরিয়াছি এবং ভাবটা দেখিয়া মেয়েটিরও হয়ত মনে হইতেছিল, কাজটা কুইনাইন গেলার মত হইতেছে।

মামা এবং পিসে এবং খুড়া অনেকের সঙ্গেই পথে চোখোচোখি হইয়া গেছে এবং সর্ব্বনাশটা পুরা করিতে যেন হাজির হইল হরিপদ সশরীরে।

হরিপদ আমাকে দেখিয়া শুধুই যে কেবল শ্লেষ করিয়া বলিল,—'আছ ভালো!'—তা নয়, অধিকন্তু সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিল।

হরিপদকে সরাইয়া কোন রকমে বাস ধরিলাম এবং মেয়েটিকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে মেয়েটির মা বলিয়া দিলেন তাহার নাকি অত্যন্ত ড্রয়িং শিখিবার সখ, আমার ত' ছবি আঁকা আসে, আমি যদি সময় মত আসিয়া একটু আধটু—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাইতে সুরু করিলাম এবং মাদুলীর গুণ যে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তা কলিক না কমাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

তাহাকে অবশ্য বেশী দিন শিখাইতে হয় নাই। কিন্তু বি-এ পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুটি বান্ধবী আমার ছাত্রী হইয়া গেল, কিছু টাকাও আসিতে লাগিল হাত খরচ চলিবার মত।

তারপর সুরু হইল কর্ম্মজীবন—একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি মেয়েকেই ম্যাট্রিক হইতে কলেজের পড়া তৈরী করাইয়া দিতে হইল—পড়ানোই হইল আমার উপজীবিকা, এবং মেয়েদের সার্টিফিকেট সম্বল করিয়া অন্য ছাত্রী যোগাড় করা আমার পক্ষে হইয়া গেল সহজ, যেহেতু মেয়েদের পড়াইতে হইলে চরিত্রের প্রশংসাপত্রই সব চেয়ে মূল্যবান জিনিস, এবং আজকালকার দিনে অচেনা লোককে দিয়া মেয়েদের পড়ানো লোকে নিরাপদ মনে করে না। কিন্তু বয়সে এবং সদ্গুণে ছাত্রজীবনের সকল চঞ্চলতা যেন কোথায় চলিয়া গেল, এখন বরঞ্চ ছাত্রীদের দেখিয়া কবির ভাষায় 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভ'রে!'

এম্‌নি সময়ে—আবার একবার হরিপদর সঙ্গে দেখা—সে বলিল ব্যবসাটা বুঝে সুজে ধরেছ ভালো। হিংসে হয়।

বলিলাম—হিংসে করবার মতন কিছু নেই, কোন রকমে দিন চ'লে যায়।

হরিপদ বলে—এ রকম সুযোগ পেলে হাইকোর্টের জজও জজিয়তী ছেড়ে দিয়ে আসে! সেক্সপিয়র পড়াতে পড়াতে এন্টোনি সেজে বসো না ত?

বলিলাম—আমার ছাত্রীদের সম্বন্ধে ওরকম চিন্তা আমার আসে না, আমার নিজের মেয়ে নেই কিন্তু মাকে দেখেছি।

হরিপদ একটু দমিয়া গেল, সে হয়ত একটু সরস আলোচনা শুনিবার আশা করিয়াছিল। বলিল—যাক্, এখন কল্যাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারো ত' বুঝি। মেয়েটার ওপর আমার ভারী fancy!

কল্যাণীর রূপ সত্যই দেখিবার মত, কিন্তু আমার সে ছাত্রী, বলিলাম—হবে না।

হরিপদ বলিল, আচ্ছা দেখা যাবে।

রাগিয়াছে!

সেদিন প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, ওয়াটার প্রুফ গায়ে চড়াইয়া তবু বাহির হইতে হইল, সাধ্যপক্ষে কামাই করি না।

কল্যাণীদের বাড়ীতে গিয়া দেখি রীতিমত গোলমাল, তার দাদার কর্কশ কণ্ঠস্বর—ইউ ব্লাডি সোয়াইন—চাবকে লাল ক'রে দোব—পুলিশে দোব—

একটা লোককে খুব মারা হইতেছিল, ছাড়াইয়া দেখি আমাদের হরিপদ।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম—সে আসিয়া নাকি বলিয়াছিল, আমাকে অবিলম্বে ছাড়াইয়া তাহাকে শিক্ষকের পদে বাহাল করিতে, অভিভাবকেরা রাজী না হওয়াতে শাসাইয়াছিল—সমস্ত স্ক্যাণ্ডাল বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিবে, মেয়েটার কেমন করিয়া বিবাহ হয় সে দেখিবে।

কথায় কথায় বচসা এবং এইসব কাণ্ড! বুঝিলাম হরিপদর মনের ও মাথার অবস্থা ইদানীং ভালো যাইতেছে না, নহিলে ভদ্রলোকের বাড়ী বহিয়া আসিয়া এ রকম 'সীন' তৈয়ারী করার কি প্রয়োজন ছিল!

আমার অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়াই দেওয়া হইল, তাও গলাধাক্কা দিয়া এবং সে যাইবার সময় হাঁকডাক করিয়া বলিল, এখনো বলছি, ভয় করিনা, হরিপদ চট্টোরাজ কেমন ক'রে শোধ দিতে হয় জানে!

প্রহারটা সেদিন বোধ হয় হরিপদর বরাতেই ছিল, নহিলে রাত্রে যখন আমি ঠিকানা খুঁজিয়া দেখা করিতে গেলাম, দেখি, মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, এবং একটি স্ত্রীলোক ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছে

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার কি হল?

বলিল, কাবুলীওলা ঠেঙিয়ে গেল। সব এই শালীর জন্যে—বলিয়া মেয়েটিকে সে লাথি মারিল।

আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—তুমি ভাবতে পারো বরুণ, এই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে হরিপদ চট্টোরাজ—যার জন্যে সহরশুদ্ধ মেয়ে পাগল? তুমি জানো ঐ কল্যাণী আমাকে চায়, শুধু ওর দাদারা আমায় আটকাচ্ছে? আর এই পেত্নীটাকে একদিন আমি চোখের নেশায় বিয়ে করেছি! গান শুনিয়ে খাইয়ে কি রকম যে মোহে ফেললে মাইরী, নইলে এই আম ব্লাডিকে—বলিয়া হাত তুলিতেই মেয়েটি

সরিয়া গিয়া বলিল, চুপ ক'রে বসবে না কি খালি তেড়ে তেড়ে উঠবে? লোক দেখলে তোমার জেদ বাড়ে! আড়ালে যা করো তা করো, ভদ্রলোকের সামনে ভদ্রলোক হয়ে বসতে পারো না! আর ফেট্টি না বেঁধে দিলে বড্ড রক্ত পড়ছে যে!—

হরিপদ একটু শান্ত হইল, তার স্ত্রী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করিল।

হরিপদ বলিল—বরুণকে একটু চা ক'রে এনে দাও।

তার স্ত্রী আমার দিকে চাইতেই আমি বলিলাম—চা খাইনা আমি।

সে হাসিয়া বলিল—বাঁচিয়েছেন আমায়, ঘরে আজ চাও নেই, দুধও আসেনি। যদি বলতেন খাই, ভারী মুস্কিলে পড়তাম।

হরিপদ স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়া বলিল—পান দেনা, পান দিতে পারিস না।

স্ত্রীর প্রতি অকস্মাৎ এরূপ কঠিন হওয়ার কারণ কি, আমি বুঝতে পারিলাম না, সে ত অভিযোগের কিছুই করে নাই।

আমার অস্বস্তি হইতেছিল, উঠিয়া পড়িলাম। যেন আমার নিজেরই লজ্জা।

পরদিন বিকালে কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া দিল তার স্ত্রী। বলিল, উনি ত নেই, বেরিয়েছেন।

বেড়িয়েছে? কাল অতটা বাড়াবাড়ি দেখলাম!

হ্যাঁ, শোনবার লোক! বললুম ত কত, বেরিয়ো না, বললেন কাজ আছে, না গেলেই নয়। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসবেন না?

না, ও যখন নেই, যাই।

বসুন না একটু, এসে পড়তেও পারেন।

ঘরে গিয়া বসিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, বলিলাম, আপনার প্রতি ও অত দুর্ব্ব্যবহার করে কেন?

এই ত' কে বলে! বাইরে অপমান হয়ে আসেন, আমার ওপর যত ঝাল ঝাড়েন। কাল আপনি প্রথম এলেন, ছি-ছি আপনার সাম্‌নেই কি রকম করতে লাগলেন, দেখলেন ত? এ রকম ছিলেন না, অভাবে—বুঝতেই পাচ্ছেন!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—বারবার বলেন আমাকে ওঁর পছন্দ হয় না। কিন্তু একথা ভুলে যান কেন, একদিন ভালোবেসেই দুজনে দুজনকে বিয়ে করেছি। সে মোহ ওঁর যদি চ'লেই যায়, আমি কি করতে পারি! একথা বুঝছেন না যে আমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। অথচ একদিন বলেছিলেন, আমাকে না পেলে উনি বিষ খাবেন। আমি ভাবি আর হাসি।

মেয়েটির সহ্যশক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারিতেছিলাম না।

আমাকে মুগ্ধ শ্রোতা পাইয়া আবার সুরু করিল—আমি কিন্তু সব প্রমাণ রেখে দিয়েছি, সেদিনকার একখানি চিঠিও আমি নষ্ট করি নি। ফার্ষ্ট ইয়ারে যখন পড়তেন তখন থেকে আমার সঙ্গে আলাপ। যখন বড্ড কষ্ট হয়, তখন চিঠিগুলো বার ক'রে পড়তে বসি, আবার যেন পুরোন দিন ফিরে আসে, চিঠিগুলোই যেন আমাকে সান্ত্বনা দেয়। সে দিনের আদরের কথা মনে ক'রে আজকের রাগ আমার চ'লে যায়। আমি তাই ভাবি পুরুষেরা নিজেদের উচ্চারণ করা কথা এতও ভুলে যেতে পারে!

আমার যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, বলিাম—আপনার নাম কি শিপ্রা?

আমার নাম শিপ্রা। আপনি কি ক'রে জানলেন?

কলেজে থাকতে ও নাম ওর জপমালা ছিল।

তবেই বুঝুন। আপনি ত জানেন কিছু কিছু।

এম্‌নি সময়ে দরজার কাছে জুতার শব্দ হইল, হরিপদ আসিয়া হাজির। বলিল বাঃ, বেশ, চলুক চলুক,—বেশ চলছিল।

মেয়েটি থতমত খাইয়া গেল। আমি বলিলাম, চলবে আবার কি?

প্রেমালাপ। বলিয়া হরিপদ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, তারপর ভীত চকিত স্ত্রীর কাছে গিয়া ঠাস্‌ করিয়া এক চড় মারিল, সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

একটু সামলাইয়া লইয়া বৌটি বলিল—আপনি চ'লে যান বরুণবাবু, আপনি থাকলে উনি আরো বাড়বেন।

ক্ষুণ্নমনে পাষণ্ডের হাতে অসহায়া মেয়েটিকে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

পরদিন কাগজে পড়িলাম হরিপদ চট্টোরাজ তাহার স্ত্রীর ছিন্নমুণ্ড লইয়া থানায় গিয়া বলিয়াছে যে সে খুনী।

তাহার স্ত্রীর ছিন্নমুণ্ড!—একটি ক্লান্ত কোমল মুখচ্ছবির সুমিষ্ট শুভ্র হাসি এবং বেদনাকাতর কথা আমার মনের বিবর্ণ স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিল, এবং ভাবিতে লাগিলাম, ভালো করি নাই, তাহাকে একলা ফেলিয়া আসিয়া ভালো করি নাই। বাঙলাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডে যে শতকোটি আশ্রয় বিকীর্ণ হইয়া আছে তাহার কোন একটিতে তাহার স্থান হইলেও হইতে পারিত! কিন্তু শিপ্রা, সেকি তার বিকৃতবুদ্ধি স্বামীকে ছাড়িয়া সত্যই আসিত? স্ত্রী-চরিত্র ভালো জানি না, বলিতে পারি না।

হরিপদর হইয়া গেল দ্বীপান্তর, কিন্তু আমার মনে পড়িল কত রমণীয় রাত্রি নিদাঘনিশীথে গোলদীঘির পূর্ব্ব উপকূলে অনধিকার সঙ্কুচিত মন লইয়া তাহার পরকীয়াতত্ত্ব রসিয়া রসিয়া উপভোগ করিয়াছি এবং শিপ্রা-শিপ্রা নাম করিয়া বিদগ্ধ-হৃদয় হরিপদ কত না কাব্য মুখে মুখে রচনা করিয়াছে, রজনী গভীর হইয়া গেছে তাহার দুর্জ্জয় সাধনার কথা তবুও সমাপ্ত হয় নাই!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

অনাদি কালের বুকে

শ্রীনিখিল সেন

অনাদি কালের বুকে মহামরণের ডাক শুনিতে কি পাও?
রাত্রির আঁধার মাঝে তারাদের দিকে তুমি তাকিয়ে কী চাও?
নিশুতি আকাশ পটে তাহাদের নিশব্দ ক্রন্দন
উদ্বেলিত অন্তরের অবিরাম বুকের কম্পন,
কান পাতি শুনিয়াছ তুমি?
তোমার ওপরে কাঁদে দিনান্তের নৈশ নভো ভূমি।
কাঁদে হিম শকুনিরা আর দেয় ডানা ঝাপটানি,
তুহিণ শীতল ডানা—মোর কানে করে কানাকানি!
তারা যেনো ডাকিছে আমারে—
ডাকিতেছে ইসারায় সীমাহীন নিবিড় আঁধারে।
সেথা মোরে যেতে হবে, যেতে হবে আঁধার গুহায়;
তাই তুমি কাঁদিয়োনা, কাঁদিয়োনা বিরহ ব্যথায়—
ফেলিয়োনা এক ফোঁটা জল;
ভারী করিয়োনা ওগো তুমি আমার বিদায় পল।
দিবসের প্রদীপ্ত রবিরে তুমি শুধু জানাইয়ো নতি,
আলোময় পৃথিবীতে তোমারে পেয়েছি আমি যে, আরতি!

প্যাগোডার দেশে দিন পনেরো

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় বি-কম

এবার পূজার ছুটিটা রেঙ্গুনে কাটাই। যাবার পাঁচ ছ'দিন পূর্ব্বে আবহ বিভাগ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে বঙ্গোপসাগর থেকে শীঘ্রই ভীষণ একটা সাইক্লোন উঠ্‌বে। সত্যি সত্যি নির্দ্ধারিত দিনের দু'একদিন পূর্ব্ব হ'তেই আকাশ মুখ ভার করে ব'সল; তারপর মুষলধারে বৃষ্টির সাথে সাথে কেমন একটা এলোমেলো ঝড় ঘোর হুঙ্কার ছেড়ে গাছের মাথায় তাথৈ নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। বাইরের অন্ধকার আকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল—না জানি সমুদ্রযাত্রায় কি দুর্ভোগই ভুগতে হয়। ছেলেবেলায় শরৎবাবুর শ্রীকান্ত পড়েছিলুম—ভাবনাটা আরও বেড়েছিল এইজন্যে। একটা সাইক্লোন হওয়ায় প্যাসেঞ্জার সব নাকি সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো হয়ে গিয়েছিল, আর বমি ও অনুরূপ প্রক্রিয়া দুটোও হ'য়েছিল প্রচুর। আমিও যাচ্ছি সেই রেঙ্গুনের জাহাজে, ঠিক্ তেম্‌নি সাইক্লোনের মুখে। প্রথম বারের সমুদ্রযাত্রার যে রঙীন ছবিটি কল্পনায় এঁকে-ছিলুম, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল তমিস্রা রজনীর সমাগমে রংবেরঙের সন্ধ্যাকাশেরই মতো।

ম্যাকিনন ম্যাকিঞ্জির আফিসে ধড়াচুড়াধারী এক ভদ্র-লোকের নিকট সাগরের অবস্থা অনুসন্ধান করে যে উত্তর পেলুম তা' আশাপ্রদ হ'লেও একেবারে যে আশঙ্কাশূন্য সে কথা বল্‌তে পারি না। তাঁর বক্তব্য এই যে—সাইক্লোন থেমেছে বটে, এখনও তার জের মেটেনি, সমুদ্র শান্ত হ'তে এখনও কিছু সময় লাগবে।

যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম পরদিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আউটরাম ঘাটে পৌঁছে দেখি যে অধিকাংশ যাত্রীই আমার বহুপূর্ব্বেই সেখানে হাজির হ'য়ে যে যাঁর মোট ঘাট, বাক্স পেটরা ও পোঁট্‌লা পুঁটলি আগ্‌লে বসে আছেন; আর কাস্টমসের কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত। একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক সপেয়াদা আমার পার্শ্ববর্ত্তী যাত্রীর বাক্স বিছানা অনুসন্ধান করছিলেন; আমি তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালুম। পরীক্ষার আগে জাহাজে মালপত্র তুল্‌তে দেওয়া হয় না। নম্বর-আঁটা সব বি, আই, এস, এন কোম্পানির কুলি। এদেরই একজন জাহাজ ঘাটে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গেই, জাহাজে ভাল একটা স্থান অধিকার করার আশ্বাস দিয়ে আমার একখানা সতরঞ্চ ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল, যথাসময়ে সুটকেস্ ও বিছানাটি নিয়ে উধাও হল।

শোয়েডাগনে শালবৃক্ষতলে শায়িত বুদ্ধ

তারপর "ডগ্‌দরিব" পালা। ডাক্তারবাবু মিনিটে ৫০।৬০ জন আরোহীর পরীক্ষা শেষ করে তাঁর কর্ত্তব্য সারতে লাগলেন। এইবার জাহাজে উঠতে হ'বে। ভগবৎ-প্রদত্ত কনুই নামক অস্ত্র দু'খানির সাহায্যে আরোহীর ব্যূহ ভেদ করে আমার সহযাত্রীরা বহুপূর্ব্বেই যাঁর যাঁর মনোমত স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ঐ অস্ত্র দু'খানির ওপর তেমন আস্থা আমার ছিল না—পেছনে পড়া ছাড়া উপায় নেই। জাহাজের ওপর বিশাল জনসঙ্ঘ দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম; কুলিকে খুঁজে বের করা অসম্ভব মনে হ'ল। জাহাজের সব ক'টা তলায় প্রায় সর্ব্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও যখন আমার কুলি বা তল্পীতল্পার সন্ধান পেলুম না, তখন

হয়ত ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কুলির নম্বরটাই কিন্তু আমার মনে পড়ছিল সবার আগে। একটু সতর্কও রইলুম যেন স্মরণ পথ থেকে অতর্কিতে ওটা সোজা চম্পট না দেয়। একস্থানেই ঘুরে ফিরে কতবার যে যাতায়াত হ'ল ঠিক নেই। কারুর বিছানার পাশ দিয়ে, কারুর পেঁটরা ডিঙিয়ে ভিড় ঠেলে চলেছি ইপ্সিত বস্তুর সন্ধানে, কিন্তু মিলে কৈ? হঠাৎ "বাবু ইধর হ্যায়" শুনে ফিরে দেখি আমারই সেই কুলি। Eureka ব'লে লাফিয়ে না উঠলেও, একটু যে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুম তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমার পাশেই দেখি ঘনকৃষ্ণ একখানি দাড়ি—দাড়ির মালিক একজন বাঙ্গালী, সঙ্গে একজন ছাত্রও রয়েছে। মনটা প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। থাকবার স্থানটাও হয়েছিল বেশ—বসে বসে সমুদ্র দেখার কোনও অসুবিধা হ'বে না। কুলিকে একটা আধুলি দিতেই প্রায় বত্রিশটি দাঁত বের করে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে প্রস্থান করলে—মনে মনে হয়ত আমার Bon voyageও কামনা করে গেল। ভদ্রলোকটিকে চেনা চেনা বোধ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।" "আমি শান্তিনিকেতন থেকে আসছি" উত্তর করলেন তিনি। "ও আপনি প্রভাতবাবু, শান্তিনিকেতনেই গেল বছর দেখেছি।" বেশ অমায়িক ও মিশুক লোক তিনি, আলাপ জমে উঠল সহজেই। তারপর "ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে"'র ভেতর দিয়েও প্রীতিটা এগিয়ে চল্‌ল দ্রুতগতিতে। সত্যিকারের একজন পণ্ডিতলোকের সাহচর্য্যে সারাটা রাস্তাই কেটেছিল বেশ।

বেলা আটটায় জাহাজ ছাড়ল। মা জাহ্নবীর দুই কূলের শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। গার্ডেন রিচ ছেড়ে জাহাজটিকে প্রায় বেলা দশটা পর্য্যন্ত নোঙর কর্তে হয়েছিল, জোয়ারের প্রতীক্ষায়। এ লাইনের মধ্যে এখানি একটি বড় জাহাজ, ধরে নিন রাইটার্স বিল্ডিংটা কিছু ছাট কাট দিয়ে, কল কব্জা বসিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলের নীচেও নাকি প্রায় হাত কুড়ি। খালাসী প্রভৃতি নিয়ে কর্ম্মচারী প্রায় শ' আড়াই; আড়াই হাজার তিন হাজার যাত্রী এক সঙ্গে যেতে পারে।

চার দিকেই দেখি সারি সারি ঘন কৃষ্ণ দাড়ি—উর্ব্বর ক্ষেত্র পেয়ে প্রচুর জন্মেছে। বোগদাদী নয়, খোরাসানী নয়, তুর্কী ওনয়, পারসিক নয়—খাস ভারতীয় দাড়ি! এত সব এক জাতীয় দাড়ির একত্র সমাবেশ হল কি করে! বলিষ্ঠ, উন্নত এদের দেহ, হাতে বালা, মাথায় এক একখানা চিরুণি—পরিচয়ের জন্যে গবেষণা করে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না, পরিচয় পত্র যেন কপালে লেবেল এঁটে রাখা হয়েছে। জাহাজের বারো আনা যাত্রীই এরা। অনেকেই ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা বা কলকারখানায় কাজ করেন। বাকী চার আনার মধ্যে জবড়জঙ্গ সাজ-ধারী কাবুলী, ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী, বটুয়াধারী, তাম্বুল রক্তোষ্ঠাধর উৎকলবাসী, ব্যবসাদার গুজরাটী, ভাটিয়া প্রভৃতি আছেন। সুদূর যাভা ফিজিতেও কেউ কেউ ব্যবসা করেন শুনলুম। বাঙ্গালীর মতন চাকরীকেই এরা "জীবনেরি ধ্রুবতারা" করেন নি। এ ছাড়া কিছু বাঙ্গালীও আছেন।

কাছাকাছি যে ক'জন বাঙ্গালী ছিলেন আলাপ করে নেওয়া গেল। আমাদের পাশের গাঁয়ের একটি ছেলের সাথেও দেখা হ'ল; রেঙ্গুণ থেকে নতুন ডাক্তারী পাশ করে ডিস্‌পেন্‌সারী খোলার চেষ্টায় যাচ্ছে। আর একটি যুবক অন্য তলায় ছিলেন, আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ জমালেন। তিনি বিহারের একজন ইনকাম্‌-ট্যাক্স অফিসার। আমার একজন বিহারী সতীর্থের নাম করায় বল্লেন, "বেশ চিনি তাঁকে, তিনি আমার সহকর্ম্মী।" ভদ্রলোকটীর রেঙ্গুন যাবার উদ্দেশ্য নিছক বেড়ানো। দার্জ্জিলিং সিমলা প্রভৃতি অনেক শৈল-বিহার তিনি করেছেন, এবং দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি ভারতের অনেক জায়গাতেই বেড়িয়েছেন, এবার রেঙ্গুণ গিয়ে সমুদ্র যাত্রার কিছু আভাস পেতে চান। রেঙ্গুণে মাত্র দু' একদিন থাকবেন, প্রথম যে জাহাজ ছাড়বে তাতেই আবার ফিরবেন। অর্থের অভাব নেই, একটু ফুরসুৎ পেলেই একদিকে বেরিয়ে পড়েন। সত্যিকারের একজন 'ভবঘুরে'র সন্ধান পেয়ে একটু আনন্দই হ'ল। ঐ ভাবটা তো নিজের মধ্যেও যখন তখন উঁকি মারে, তবে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" আরও দু' একটি বাঙ্গালী পরিবারের সাথে আলাপ হয়েছিল।

বাংলার বাইরে পা দিচ্ছি এই প্রথম; বাঙালীর সাহচর্য্যের জন্যেই মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। দূর প্রবাসে আত্মীয়তার গণ্ডী শুধু নিজের পরিবার বা জন কয়েক আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রসার লাভ করে সারা দেশবাসীর ওপর,—তখন তারাই হয় আপনার জন, নিতান্ত অন্তরঙ্গ।

জাহাজের কোথাও চলছে তাস, কোথাও গ্রামোফোন, কোথাও রাসভ বিনিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীতচর্চ্চা, কোথাও মজলিশ ও খোশ গল্প, আর কোথাও বা নাসিকাধ্বনি সহযোগে গভীর কুম্ভকর্ণী নিদ্রা। এক জায়গায় কয়েক জনে মিলে একটা লোককে ধরে আগুনের ছেঁকা দিচ্ছে, আর লোকটা অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করছে—শুনলুম ভূত ছাড়াচ্ছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীদেরই শুধু ভূতে পায় না, বিনা মাশুলে জাহাজে চড়ে যাত্রীদের ঘাড় মটকাতেও এরা সিদ্ধহস্ত।

একটি মহিলা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রূপো সংগ্রহ করে গাত্রে অলঙ্কার রূপে ধারণ করেছেন তাঁর শ্যাম অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্যে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ গুরুভারে তিনি কিছুমাত্র কাবু নন, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—যেন একটা চলন্ত রূপোর খনি। আশে পাশে কোথাও কেহ আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে একটি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে অপূর্ব্ব হিন্দী বাতচিৎ করে এই তথ্য সংগ্রহ করা গেল যে মহিলাটি কাশী অঞ্চলের। তিনি আরও বলছিলেন "ইহ্ ক্যা দেখতে হেঁ বাবু, দো মন চাঁদী নহন্‌নেসে ঔরৎ লোগ্ ঘাবড়াতী নহী।" দ্বিতীয়তঃ তিনি একটি নথ পরিধান করেছেন, যার পরিধি স্কুলের ছেলেদের কাঁটা কম্পাসে মাপা অসম্ভব। দৈবক্রমেই নথ যদি কাশীবাসী বেচারী স্বামীর গলায় আটকে যায়, তবে ওর ফাঁসীর মৃত্যুতে কাশীপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সুদর্শনচক্রের ন্যায় ঐ বিরাট নথের ব্যবহার অচিরেই বে-আইনী বলে ঘোষণা করা উচিত, নতুবা ঐ নথের দেশে অপমৃত্যু ও বৈধব্যের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে উঠবে।

আরও একটি মাড়োয়ারী মহিলা দেখলুম, যাঁর দৈহিক আয়তনের সঙ্গে যে বস্তুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে তা' হচ্ছে বিপুলাকারের ঢাকাই জালা, পৃথিবীর সব চেয়ে ওজন বেশী বলে যিনি সম্মান লাভ করেছেন, সে সম্মান তাঁর ভাগ্যে ঘটত না নিশ্চয়ই যদি ইনি হ'তেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। জালাটি গড়িয়ে গড়িয়ে চলাফেরাও করছেন, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আবার সমুদ্র দেখারও সখ আছে। এই অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি করেছে রূপো নয়, তাল তাল সোণা। এটা দেশের পক্ষে লাভই সন্দেহ নেই, নতুবা এতখানি মূল্যবান ধাতু কোন্ সাগরপারে পাড়ি দিত কোন দিন!
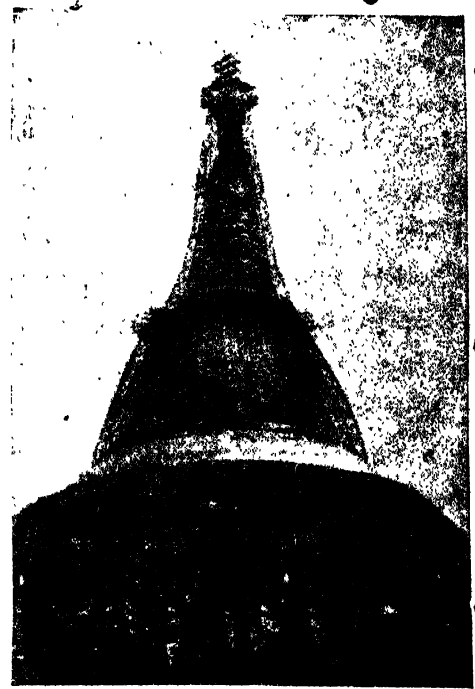
শোয়েডাগন প্যাগোডা—সংস্কার চলছে

"চাই সোডা লিমনেড!" একি, জাহাজেও ফেরিওয়ালা! ফেরিওয়ালা জাহাজেরই একজন খালাসী—অবসর সময়ে সোডা, লিমনেড, কলাটা, শশাটা বিক্রী ক'রে দুটো অতিরিক্ত পয়সা রোজগার করে থাকে। খালাসীদের প্রায় সকলের দেশই নোয়াখালি, কুমিল্লা বা চট্টগ্রাম জেলায়। মুসলমানেরা জাহাজে একটা হোটেলও খুলেছে, সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুদের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা এরা বেশ পায়। নিষিদ্ধ পক্ষীমাংস সহযোগে অমন মোগলাই খানার

লোভটা স্মৃতি, শ্রুতি বা ভট্টপল্লীর পণ্ডিতদের অনুশাসনের চেয়ে অনেক বড় নিশ্চয়ই!

শুয়ে, বসে, গল্প করে, চয়নিকার পাতা উল্টে সময় কেটে যাচ্ছিল মন্দ নয়। বেলা প্রায় চারটে হ'তেই নদীর মুখ ক্রমেই প্রশস্ত হ'তে লাগল। প্রথমে দুই পাড়ের গাছপালা ঝাপ্সা ও অস্পষ্ট হয়ে আস্‌ছিল, তারপর সুন্দর বনের শ্যামল বনরেখা দূরতটপ্রান্তে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দৃষ্টির বাইরে—আর সম্মুখে কূলহীন, বিশাল বারিধি আমাদের আহ্বান করছিল জলদগম্ভীরমন্ত্রে। ক'দিনের জন্যে তীরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, বিদায়ব্যথাটা হৃদয়ের এক নিভৃত তন্ত্রীকে আঘাত করছিল বেহাগের একটা করুণ সুরের মতো।

এইবার সমুদ্রে পড়েছি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়; পাতলা পাতলা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল এদিক ওদিক। সাগর দোলার দোল আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে; জাহাজখানা দুলছে ঢেউয়ের ওপর ঠিক মোচার খোলার মতই। ঝড় সামান্য, তা'তেই সমুদ্রের রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটার কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বড় বড় জীবন্ত ঢেউগুলি মাথা তুলে ছুটে চলেছে একটার পর একটা, সহজ, লীলায়িত নৃত্য-ছন্দে বেশ বনিয়াদি চাল—নদী, খাল, বিলের ঢেউয়ের মতো ছ্যাব্‌লা নয় এরা।

চারিদিকেই শুনি "ওয়াক ওয়া ওয়া"। সমুদ্রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একি কাণ্ড! দোল সহ্য করতে না পেরে প্রায় সকলেই শয্যা নিয়েছেন, বড় বড় বীর পর্য্যন্ত ধরাশায়ী। লেবু জাতীয় জিনিষগুলির ব্যবহারও চল্‌ছে খুব। একটা ডেক চেয়ারে শুয়ে ক্ষুব্ধ, চঞ্চল, বিশাল কূলহীন বারিরাশির দিকে তাকিয়ে ছিলুম. সন্ধ্যা হয় হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গাং চিল ঘণ্টা চারেক ধরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা ক'রে। জাহাজের ধাক্কা খেয়ে ছোট ছোট মাছ উঠছে ভেসে, আর চিলগুলি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় প্রতিবারেই এক একটা ধরে খাচ্ছে। জীবন-সংগ্রাম এদেরও কম নয়। পোড়া পেটের দায়ে জীবন-মরণ দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই এদের করতে হয়। সাগর-পারের ক্ষুদ্র পাখীদের কত শক্তি ঐ ছোট্ট ডানা দু'খানিতে, আর কেমন করেই বা কূলহীন সাগরের পথ চিনে ফিরে যাবে তারা তাদের নিজ নিজ সুখ-নীড়ে!

সন্ধ্যার সময় একটু সমুদ্র পীড়ার মতো বোধ করছিলুম, তবে তা' বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। মাঝে মাঝে দু' একটা ভাসমান আলোক-স্তম্ভ মিট্‌মিট করে জল্‌ছিল সাগরের বুকে, আমাদের পথ দেখাবার জন্যে। দোল খেতে খেতেই সারা-রাত কাট্‌ল। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি জাহাজের দু'পাশের ড্রেন গুলি সমুদ্র পীড়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাত্রির প্রথম ভাগেই আমরা "কালাপাণি"তে পড়েছি শুন্‌লুম। জলের রং বদ্‌লে গিয়ে একেবারে পি. এম্. বাগচির কালিতে পরিণত হয়েছে; জলকে আর জল ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। যে দিকেই চোখ পড়ে জল, জল, শুধু গাঢ় কৃষ্ণ জল—কূল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই। ছেলেবেলায় পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলের কথা প'ড়ে বিশ্বাস হ'ত না—এতজল সাগরে আছে কে জান্‌ত! চারদিকে সাগরজোড়া নিখুঁত. একটা বৃত্ত দেখা যাচ্ছে—কেন্দ্র দর্শকের চোখ আর পরিধি অন্তহীন দূরের আকাশ যেখানে জলকে ছুঁয়ে আছে। জাহাজ যত বেগেই চলুক না কেন, বৃত্তটা থেকে যাচ্ছে একে-বারে নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ—যেন কাঁটা কম্পাস দিয়ে আঁকা। মাথার ওপরের আকাশ আর নীচের জল এই দুই মিলে বিরাট একটা অৰ্দ্ধ গোলকের সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট দু'একটা উড়ো মাছ ঝপ করে জল থেকে উঠেই খানিক দূরে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, অতল জলের মাঝখানে। কখনো বা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, গাঢ় নীল জলের ওপর দিয়ে। সমুদ্রটাকে মথিত, দলিত করে, তার কালো বুকখানা চিরে জাহাজটা ছুটে চলেছে একটা বিরাট দৈত্যের মতো—দুই দিকে রাশি রাশি শুভ্র মুক্তা ছড়িয়ে। গাঢ় নীল জলের ওপর দিয়ে আমরা ভেসেই চলেছি, মাথার ওপর মুক্ত, উদার, অসীম নীল আকাশ—নীচে উদ্দাম চঞ্চল, ক্ষিপ্তোন্মত্ত, বিপুল, নীল বারিরাশি। প্রাণভরে কূলহীন কালো জল দেখতে দেখতে চলেছি—কখনো এর মূর্ত্তি ক্ষুব্ধ, ভীষণ প্রলয়ঙ্করী—আবার কখনো বা স্থির, শান্ত, গম্ভীর। অসীম নীল আকাশের তলে, গভীর অকূল নীলজলের দিকে চেয়ে চেয়ে, কিছুতেই

সাধ মেটে না, কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে দু'দণ্ডের জন্যও নিজেকে ভুলে যেতে হয়—মর্ম্মে লাগে এক অনবদ্য পুলকপরশ, প্রাণ ভরে উঠে একটা গভীর তৃপ্তির অব্যক্ত আনন্দে! অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সমুদ্র প্রাণের ভিতর একটা মহা অনন্তেরি আভাস দিচ্ছিল। সাগর দেখার আনন্দ ভাষায় বোঝান চলে না—এটা অনুভূতির জিনিষ। ভগবানের বিভূতির পূর্ণ বিকাশ এই সাগরে; "সরসামস্মি সাগরঃ।" এই উক্তির সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলুম।

সাগরজলে উষাস্নান করে সূর্য্যদেব রক্তাম্বর প'রে উঁকি মারেন দূর দিগ্বলয় থেকে, আবার সমস্ত দিনের জ্বালা ও ক্লান্তি জুড়াতে সন্ধ্যাবেলা নেমে যান অতল জলের অন্তরালে—যেখানে সুদূর পশ্চিমের আকাশ সাগরের সাথে মিশে আছে। দু' বেলাই উদয়াস্ত উৎসব হয় ঘোর সমারোহ ক'রে—রং বেরঙের মেঘেরা হোলির মাতনে মেতে ওঠে কত বিচিত্র রং ছড়াবার নেশায়। তারই মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানা সোনার থালা ধীরে ধীরে জল থেকে মুখ বাড়ায়, আবার সন্ধ্যাবেলা আশ্রয় নেয় সাগরের শীতল বুকে। কী সুন্দর, মহান্ সে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য, কী ধীর, প্রশান্ত সে সূর্য্যাস্তের ছবি। টাইগার হিলের অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখে মুগ্ধ, বিহ্বল ও অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, সাগরের স্নিগ্ধ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শনে একটা শান্ত, গভীর প্রসন্নতায় চিত্ত ভ'রে উঠেছে।

জাহাজের খানা খাওয়ার অভ্যাস কোন দিনই নেই, তাই সঙ্গে নিয়েছিলুম প্রচুর ফল, পাঁউরুটী, মাখন, চিঁড়ে, চিনি প্রভৃতি। দু'টি চাল ডালও সঙ্গে নিয়েছিলুম, যদি ফুটিয়ে নেবার সুবিধে হয়। সমুদ্র-পীড়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে জাহাজের ডাক্তারকে আগে থেকেই খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তাঁর উপদেশ, "খান আর বমি করুন, কখনও খালি পেটে থাকবেন না।" এই উপদেশ আমার মনঃপূত হয় নি। 'কিছু যদি না খাই, বমি হ'বে কোথা থেকে' ভেবে একরূপ উপোসের ব্যবস্থাই ক'রেছিলুম, ছিলুমও বেশ, জানি না কি কারণে। সারাটা রাস্তা প্রায় অর্দ্ধাশনেই কেটেছিল। দ্বিতীয় দিন জলযোগের উদ্যোগ করেই দেখি কিছু কিছু ফল পচে উঠেছে। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ৪।৫ দিনের গ্যারাণ্টি-দেওয়া বর্ত্তমান কলাগুলি ও কিছু আঙ্গুর অগত্যা সমুদ্রকেই উপহার দিতে হ'ল।

ইন্‌কাম্-ট্যাক্স অফিসারটি আমার বিছানাতেই শুয়ে-ছিলেন। বেলা দু'টো আড়াইটার সময় হঠাৎ দেখি তাঁর দাঁত লেগে গেছে, আর তিনি হাত পা ভীষণ ভাবে ছুড়ছেন; ওদিকে পাশের ছাত্রটীর ১০৩।১০৩॥০ ডিগ্রী জর। ডাক্তার
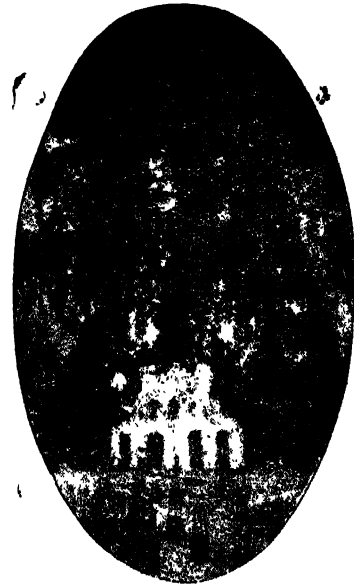
শোয়েডাগনে প্রাচীন বিরাট বৃক্ষ

বাবু ছেলেটিকে নিজের কাছেই নিয়ে গিয়েছিলেন, আর প্রভাত বাবু ছিলেন পরিচর্য্যায়। তাড়াতাড়ি দাঁত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম। ডাক্তার এসে বল্লেন, "Epileptic fit, Sea-sickness থেকেই হয়েছে।" পূর্ব্বে ভদ্রলোকটির এই অসুখ কোনও দিন ছিল না। সকাল থেকেই তিনি খুব বমি করতে আরম্ভ ক'রেছেন, কখন অসহায় অবস্থায় ফিট হয়ে পড়ে গিয়ে কপালটাও কেটে গেছে। যুবকটি খুবই স্বাস্থ্যবান, অথচ সারা রাস্তাটাই তিনি এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন যে আর মাথা তুলতে পারেন নি, যদি কখনও তুলতেন সে শুধু বমি করবার জন্যে। ঢেউ কিন্তু দ্বিতীয় দিন দশটার পর থেকেই একেবারে থেমে গিয়েছিল। তাঁর বিছানাপত্র আমাদের কাছেই আনাবার ব্যবস্থা করলুম। সমুদ্র-পীড়াটা যে

কী ভীষণ বস্তু তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। জাহাজে উঠে যাদের দেখেছি সুস্থ, সজীব, হাস্যময়, তাদের অনেকেই মুষড়ে পড়েছে দিন শেষের নেতিয়ে-পড়া ঝরা ফুলের মতো। সমুদ্রের সামান্য বিক্ষোভেই এই অবস্থা দেখেছি, বড় বড় ঝড়ে না জানি কি কাণ্ড হয়! শুনলুম ক'দিন পূর্ব্বে সাইক্লোনে যাত্রীদের একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছিল, ওরকম ঝড় এবছর নাকি একদিনও হয় নি।

দিন কাটল নানান কাজে, অকাজে—আর বিশাল বারিরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে চারদিকে চক্রবালে জলের ওপর সাদা, কালো, ধূসর, তামাটে ও আরও কত রঙের মেঘের খেলা দেখে। পুরো দু' দিন ভাত খাই নি, বাঙ্গালীর পক্ষে সুস্থ দেহে একি সোজা ব্যাপার! সন্ধ্যায় ভাতের কোনও ব্যবস্থা হয় কিনা দেখতে বেরিয়ে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের একটা রুটী-পরোটার দোকান আবিষ্কার করা গেল; খাবারওয়ালা দু'টি ভাতে ভাত নামিয়ে দিতে রাজী হ'ল, তবে দক্ষিণা একটি সিকি। আলু ও মুগের ডাল ভাতে কিছু মাখন সংযোগে যে তৃপ্তি সেদিন দিয়েছিল, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের মধ্যেও সে তৃপ্তি বহুদিন পাই নি।

একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি জাহাজের অভ্যর্থনায় এল ঝাঁকে ঝাঁকে গাং চিল; বুঝলুম তীর ৫০।৬০ মাইলের মধ্যেই হ'বে। কয়েক ঘণ্টা পরে হঠাৎ শুনলুম, "ঐ তীর, ঐ তীর।" বহু দূরের গাছ পালা অতি ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। বাইনাকুলার একটা সঙ্গে নিয়েছিলুম, ভাল ক'রে দেখে নেওয়া গেল। ক্রমে ইরাবতীর মুখে পড়লুম, এখান থেকে রেঙ্গুণ প্রায় ত্রিশ মাইল। নদীর মুখ বেশ প্রশস্ত। দুই পাড়ের গাছ পালার মাঝে মাঝে দু' একটা মন্দির মাথা তুলে আছে। বি, ও, সি কোম্পানীর বহু রিসার্ভয়র নদীর এক পাড়ে চোখে পড়ল। এই কোম্পানীর কলকারখানাগুলি আশ্রয় ক'রে ছোটো খাটো একটা সহর গড়ে উঠেছে—নাম শিরিয়াম। খনিজ পদার্থের দিক্ দিয়ে অনন্ত সম্পদ রয়েছে এই ব্রহ্মদেশে।

এইবার রেঙ্গুণ শহর দৃষ্টিপথে পড়ল। ইরাবতীর দু' ধারে কলের চিম্‌নিগুলি আকাশের গায় সগর্ব্বে মাথা তুলে আছে, আর তার বুকে কত রকম বেরকমের জাহাজের অরণ্য। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশের বাণিজ্য-পোতই আছে, প্রতিনিধি পাঠাতে কেউ ভুল করে নি। উদার ভারত স্থান দিয়েছে সবাইকেই, অতিথিকে বিমুখ সে করতে পারে না, নিজের পেটে অন্ন থাক্ আর নাই থাক্। রেঙ্গুণের ইরাবতী কল্‌কাতার গঙ্গার মতই প্রশস্ত। দু' পাড়ের কল কারখানা আর জাহাজের বহর কল্‌কাতার গঙ্গার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

রেঙ্গুণ বন্দরটি বেশ বড়। নদীতে ছোট ছোট বহু ডিঙ্গি নৌকা দেখা গেল,—এগুলিকে শাম্পান্ বলে। নৌকাগুলির গঠন প্রণালী সাধারণ নৌকা অপেক্ষা একটু ভিন্ন রকমের, গলুই ও পশ্চাদ্ভাগ একেবারে উর্দ্ধমুখী। খেয়া পারাপার, মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে এই নৌকাগুলির ব্যবহার হ'য়ে থাকে। চালক অধিকাংশই চট্টগ্রামবাসী মুসলমান।

রেঙ্গুণ পৌঁছতে দিন চারেক লাগে। ক' দিনের জাহাজের ক্লেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের মতো মনের অবস্থা ছিল না। কোনও রকমে জাহাজ ছাড়তে পারলেই বাঁচি। এখানেও কাস্টম্‌স ও ডাক্তারীর উৎপাত তো আছেই, উপরন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী মোতায়েন আছেন। নাম, ধাম ও গন্তব্যস্থানের ঠিকানা দিতে হ'ল। রেঙ্গুণে যতদিন ছিলুম এঁরা আমার কোনও খোঁজ খবর নেন নি দেখে ভেবেছিলুম যে সরকারী চাকুরী করি ব'লেই হয়ত এটার আবশ্যক হয় নি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে জানা গেল—থানা থেকে বাড়ীতে দারোগা এসে আমি কি করি না করি, কি উদ্দেশ্যে রেঙ্গুণে যাই প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল সংবাদই নিয়ে গিয়েছিলেন। ফাঁকি দিয়ে সরকারের পয়সা নেয় এ অপবাদ মহাশত্রুও এঁদের দেবে না।

আমার ভাই উপেন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, বিকেলের দিকে বাসায় পৌঁছুলুম। আমার এক ভগ্নীপতিও বর্ম্মা সরকারে চাকরী করেন। ভাই ও বোন নিজ নিজ বাসায় আমাকে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা করলুম দু'বেলা দু'বাসায়—একেবারে সূক্ষ্ম বিচার।

রেঙ্গুণ শহরটি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। রাস্তাগুলি জ্যামিতির সরল রেখার মতো, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত দেখা

যায়। নদীর তীর থেকে পাঁচটি বেশ প্রশস্ত রাস্তা সমান্তরাল-ভাবে চ'লে গেছে; উত্তর দক্ষিণেও আড়াআড়ি ভাবে এমনি বহু সমান্তরাল রাস্তা বেরিয়েছে—1st. Street, 2nd. Street, 3rd. Street ইত্যাদি। সমস্ত শহরটা প্ল্যান ক'রে তৈরী। নগর পরিকল্পনাও বেশ, সর্ব্বত্রই একটা সিমেট্রি র'য়েছে। পিচের তৈরী সুন্দর সুন্দর, তকতকে, ঝকঝকে প্রশস্ত সব পথ আর তার দুই পাশে বড় বড় গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন শহরটি—ঠিক ছবির মতো। কর্পোরেশনের বন্দোবস্তও অতি সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে আবর্জ্জনা ফেলার ব্যবস্থা আছে। আবর্জ্জনার স্তূপগুলির পাবলিক রাস্তায় রাস্তায় ডিমনস্ট্রেশন হয় না, নিরালা পথ দিয়েই এগুলি লোকালয় থেকে বিদায় নেয়। রাস্তায় নোংরা মোটেই জমে না।

শহরের বুকে ট্রাম বাসগুলি হরদম্ ছুটোছুটি করছে, দু'পয়সাতেই বেশ খানিকটা ঘুরে আসা চলে। বাসগুলিতে চিংড়ীমাছ, ঘোড়ার মাথা, এরোপ্লেন প্রভৃতি আঁকা; প্রতীকগুলি দেখেই যাত্রীরা গন্তব্য স্থান বুঝে নেয়। এরোপ্লেন আঁকা বাসখানি এরো-ড্রোমের পথ দিয়ে চলাফেরা করে, চিংড়ীমাছ আঁকা বাসখানি পোজান ডঙ্গে যায় (বর্ম্মা ভাষায় পোজান ডঙ্গ মানে চিংড়ীমাছ) ইত্যাদি।

বাড়ীঘর অধিকাংশই কাঠের। সেগুন, লোহা প্রভৃতি ভালো ভালো কাঠ ব্রহ্মদেশে জন্মে প্রচুর, সস্তাও বেশ। সকল বাড়ীরই শোবার ঘর, রান্না ঘর, কল পায়খানা প্রভৃতি একই ছাঁচে তৈরী; একখানা দেখলেই একশো খানা দেখা হয়ে যায়। অনেক বাড়ীতেই আলো বাতাসের অভাব, তবে সুখের বিষয় এটা স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ, এদেশের মেয়েদের এক হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে অষ্ট-প্রহর থাকতে হয় না। বাঙ্গালী মেয়েরা পর্য্যন্ত বাইরে বেরুতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না, একটু ফুরসুৎ পেলেই বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তার দুধারের বাড়ীগুলির উচ্চতা প্রায় এক। অনেক শহরের বিরাট প্রাসাদের পাশে জীর্ণ খোলার বাড়ীর মতো এগুলি চোখকে পীড়া দেয় না। কাঠের বাড়ী ছাড়া, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট আফিস, একাউন্টেন্ট জেনারেলের আফিস, পোর্টকমিশনারের আফিস প্রভৃতি ইটের তৈরী বহু পাবলিক ও প্রাইভেট বিল্ডিংও আছে। ফেরো কংক্রীটের অনেক বাড়ী আজকাল তৈরী হচ্ছে। ক'লকাতার চেয়ে এখানে থাকা খাওয়ার খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী।

শহরের পশ্চিম অঞ্চলে যে চীনাদের বাস তা' গাছপালার মতো হরপের বিচিত্র সাইনবোর্ডগুলি দেখলেই বোঝা যায়। এদের সংখ্যাও খুব। পূর্ব্বভাগে পোজানডঙ্গে বর্ম্মা পল্লী। এছাড়া শহরের সর্ব্বত্রই যেখানে সেখানে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সকলকেই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু এক পাড়াতে নয় একই বাড়ীতে চীনা, বর্ম্মা, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতির বিচিত্র, সংমিশ্রণ সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীর

রসি উদ্যান থেকে কোকাইন লেক

এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ আর কোনও শহরে আছে কিনা জানিনা।

দু'চারখানা বাড়ীর পর পরই রেস্তোরাঁ। অধিকাংশ বর্ম্মাদের বাড়ীতেই হাঁড়ি চড়ে না, খাওয়া দাওয়া রেস্তোরাঁ-তেই হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক খাবার দোকানেই লাউড স্পীকার বসানো—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত হট্টগোলের শেষ নেই। সারাটা শহরে গমগম্ করছে, কান একেবারে ঝালাপালা হ'য়ে যায়।

বিকেল হলেই রাস্তায় রাস্তায় খোলা খাবারের দোকান ব'সে যায়। চাল, ময়দা, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির তৈরী

বিচিত্র সব খাদ্যদ্রব্য। পচামাছের তৈরী "ঙাপ্পি" বর্ম্মাদের অতি প্রিয় খাদ্য—একটু পেলে দুথালা ভাত খেয়ে ফেলবে। ফুটপাথের ওপরেই সব খেতে ব'সে গেছে। এই খাদ্য দ্রব্যের তালিকার সাথে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—ভগবান বুদ্ধের এই মহাবাক্যের সামঞ্জস্য কোথায় জানিনা। শিঙ্গী, মাগুর, কই প্রভৃতি জ্যান্ত মাছগুলির নিধনের ভার ধীবরদের হাতে—নিজে হাতে না মেরে খেলেই অহিংসাধর্ম্ম পালন করা হ'ল। মানুষ চিরকালই সুবিধাবাদী ধর্ম্মের বেলাতেও গোঁজামিল দিয়ে সে মনকে চোখ ঠারে।

শহরটির আকারের অনুপাতে টকি, সিনেমা প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী—ভিড়ও খুব। এটা Anglicised শহর, একটু ফিট ফাটে থাকার ঝোঁক অল্পবিস্তর সবারই আছে। বাইরে থেকে এখানে এসে অনেকেই একটু বাবু হ'য়ে পড়েন।

শহরে তিন চারটি মাত্র পার্ক, একটা মেয়েদের জন্যে। লোকের অনুপাতে পার্কের সংখ্যা কম মনে হ'ল। তবে শহরের এক মাইলের মধ্যে সুদৃশ্য রয়েল লেকটি থাকায় পার্কের অভাব তেমন বোধ হয় না। অতি মনোরম এই হ্রদটি। পিচের কালো, সুন্দর, চওড়া রাস্তা আঁকা বাঁকা হ্রদটির চার দিকে চ'লে গেছে, তার দুই পাশে পাম ও কত নাম-না-জানা গাছের দীর্ঘ সারি। মাঝে মাঝে বাগান-ঘেরা, চূড়াওয়ালা, সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ী। এই ধরণের ঘর বাড়ীই বর্ম্মাদের নিজস্ব জিনিষ। হ্রদের সবটা অংশ একেবারে চোখে পড়ে না; আঁক বাঁকগুলি খুবই বেশী। বালিগঞ্জের হ্রদের চেয়ে অনেক সুন্দর এই হ্রদটি, আয়তনেও অনেক বড়। য়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্যে দু'টো বোট ক্লাবও এখানে আছে। বেড়াবার পক্ষে সুন্দর এ স্থান, একবার পায়ে হেটে ঘুরে আসতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। আনন্দের হাট ব'সে যায় এখানে রোজ বিকেল বেলা—শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ, তরুণী—সবারই বেড়াবার মহাধূম পড়ে যায়। হ্রদের নির্ম্মল বায়ু সেবন ক'রে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের লোভে দলে দলে বিপুল উৎসাহে রুটিন-মাফিক রাউণ্ড দিচ্ছে। কোথাও নিরালা ঝোপে ঝাপে ব'সে বন্ধুরা প্রাণের বিনিময় করছে, কোথাও এলিয়ে দিয়েছে তাদের দেহগুলি হ্রদের ধারে সবুজ ঘাসের ওপর, আর কোথাও বা মজলিশের হাস্যে লাবণ্য মুখরিত হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশ বাতাস। হ্রদের বুকে দামাল ছেলেরা দাপাদাপি করছে—দাঁড় টেনে, বোট রেস দিয়ে। কী অফুরন্ত প্রাণলীলা এই তরুণদের!

রেঙ্গুণের লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ; তন্মধ্যে হিন্দু এক লক্ষেরও ওপর, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রায় এক লক্ষ, মুসলমান আধ লক্ষেরও ওপর, বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক। নতুন সেন্‌সাসে অঙ্কগুলির কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকবে।

অধিবাসীদের মধ্যে ভারতবাসী বহু আছেন; বাসিন্দাদের দেখে মনে হয় ভারতেরই কোনও শহরে এসে পড়েছি—ব্রহ্মদেশের রাজধানীতে নয়। মাদ্রাজীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। মাদ্রাজী কুরুঙ্গিরা লাঙ্গা (রিক্স) টানে। খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক এরা। লঙ্গাতে চড়ার পূর্ব্বে দরদস্তুর করতে হয় না, খুশী হয়ে যা দেওয়া যায় তাতেই তৃপ্তি। কুরুঙ্গিদের অদ্ভুত এক রকম নাচও দেখেছি। সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যাবেলা এরা ৮।১০ জন মিলে রাস্তার ওপর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেরই দু' হাতে দু' খানা লাঠি—নাচে, গান করে আর লাঠি বাজিয়ে তাল দেয়। টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা মাদ্রাজী চেট্টিদের হাতে। এরা শহর ছেড়ে ব্রহ্মদেশের সুদূর গ্রামে গ্রামেও তাদের ব্যবসা ফেঁদেছে। অতি উচ্চহারে এরা চাষীদের ধার দেয়, ক্রমে যথাসর্ব্বস্ব এদের হাতে এসে পড়ে। চাষীদের অনেকেরই মাথা এদের কাছে একেবারে বিকিয়ে আছে। মাদ্রাজীদের বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত কয়েকটি মন্দিরও রেঙ্গুণে আছে, তন্মধ্যে রাজা রেডিয়ায় নির্ম্মিত মন্দিরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মাদ্রাজী মুসলমান "কাকা"দের মুদীর দোকান ও অন্যান্য ব্যবসাও আছে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অন্যান্য ভারতীয়ের অনুপাতে খুবই কম। বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৩।১৪ হাজারের কম নয়, পূর্ব্ববঙ্গের লোকই বেশী মনে হ'ল। বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও বেঙ্গল একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গা পূজায় খুবই ধুমধাম দেখলুম। এখানে ৬।৭ খানা পূজো হয়, সবই বারোয়ারী। দুর্গা বাড়ীর

জাঁক জমক দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাংলা দেশেরই কোন রাজা বা বড় জমিদার বাড়ীর পূজো দেখছি। বাজনার শব্দে আকাশ ফাটে, বাজীতে চোখ ঝলসে দেয়! রাস্তায় লোকের ভীষণ ঠেসাঠেসি, ভিড় সামলাতে পুলিশ ও ভলান্টিয়ারের দল হাঁপিয়ে উঠছে।

প্রতিমা বিসর্জ্জন হয় ইরাবতীতেই। তারপর ৺বিজয়ার আলিঙ্গন ও "মিষ্টি-মুখে"র পালা। প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাড়ীতেই প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ, রসগোল্লা ও ফল ফুলুরির বন্দোবস্তই থাকে। এজন্যে দু'টো দিন ঠিক থাকে, প্রথম দলে পুরুষেরা তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদের বাসায় গিয়ে মিষ্টিগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে আসেন, আর দ্বিতীয় দিন মেয়েদের পালা। অনেক অবাঙ্গালীও বাঙ্গালীদের বাড়ীতে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হন। বোনেদের পাশের বাসাতেই থাকেন এক মাদ্রাজী শিক্ষয়িত্রী। কি ব'লে ইংরেজীতে নিমন্ত্রণ করতে হয় দাদার কাছে বাগিয়ে নিয়ে বোনটি মুখস্ত করতে করতে বেরিয়ে পড়ল তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে। বিজয়ার শেষে এতটা ব্যাপক ভাবে "মিষ্টিমুখের" এই বিপুল আয়োজন বাংলায় কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

রেঙ্গুণের বাঙ্গালীদের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও প্রাণখুলে মেলা মেশাটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। যতটা সম্ভব একে অন্যের সাথে পরিচিত হ'য়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক বাঙ্গালীর ভেতরেই লক্ষ্য করেছি। সাগর পারের এই দূরদেশে প্রবাসই এই যোগসূত্রটি এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

খাওয়া ছোঁওয়ার বাছ বিচার এখানে নেই বল্লেই চলে। বাঙ্গালীদের মেস্, বোর্ডিংগুলিতে যে কোনও জাতের একজন হিন্দু পাচকের কাজ করছে। ছুঁতমার্গ তুলে দিতে এদেশে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণপাত আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নি, কি একটা অদৃশ্য যাদুমন্ত্রে আপনা আপনি ওটা দেশ থেকে লোপ পেয়েছে।

আমার দু'জন সতীর্থ (অক্ষয় বসু ও জিতেন্দ্র দাসগুপ্ত) এখানে চাক্‌রী করেন। এঁদের পেয়ে শুধু যে বেড়াবার পক্ষেই সুবিধে হ'য়েছিল তা নয়, দিন কয়েকের জন্যে ছাত্র-জীবনটাও আবার নতুন করে ফিরে পেয়েছিলুম। কাজ ছিল সারাদিন বেড়ানো, নিত্য নতুন জায়গা দেখা, আর বিভিন্ন দেশের লোকের, বিশেষ করে বর্ম্মাদের চালচলন, রীতিনীতির সাথে পরিচিত হওয়া। কখনও হয় ত টার্মি-

ক্যান্টনমেন্ট উদ্যান

নাসের টিকিট কিনে ট্রামে চ'ড়ে বসেছি। ৫।৬ মাইল চ'লে একদিন শহরতলীতে যেয়ে ক্যামেনডাইন, এ্যালেন প্রভৃতি স্থান দেখে এলুম। বর্ম্মা স্ত্রীলোকদের চুরুট তৈরী এখানে এসেই প্রথম দেখি। নদীর ধারে ধারে বহু কাঠ-চেরাইয়ের কারখানা, একটির ভেতর যেয়ে দেখে শুনে আসা গেল। ফিরবার পথে ডাফ্‌রিন হাসপাতাল দেখে আসি। প্রকাণ্ড হাসপাতাল, বন্দোবস্তও অতি সুন্দর। এক সঙ্গে বহু নবজাত শিশু হাসপাতালটিকে স্বর্গে পরিণত ক'রেছে। ট্রেণে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরি।

উপেনের এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে একদিন রেঙ্গুন থেকে ৫।৬ মাইল দূর কামায়ুটে যাই। এখানে ৬০।৬৫ ঘর বাঙ্গালীর বাস, অনেকে বাড়ী ঘরও ক'রেছেন। সকলেই শহরে চাক্‌রী করেন। পাশের এক বর্ম্মা বাড়ীতে গ্রামোফোন চল্‌ছিল, ভাইয়ের বন্ধুটি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। পুরুষেরা কেউ বাড়ী ছিলেন না। ছেলে পিলে সহ দু'টি স্ত্রীলোক আমাদের বসতে অনুরোধ জানিয়ে পান খেতে দিলেন। ভিন্ন দেশীয় এই আগন্তুকদের সাথে অতি সহজ

ভাবেই এঁরা কথাবার্ত্তা বলছিলেন, কিছুমাত্র সঙ্কোচ দেখলুম না। দু'টি ছোট মেয়ের নাচও দেখা গেল। প্রত্যেক বর্ম্মা মেয়েকে ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার সাথে সাথে নৃত্য শিক্ষাও দেওয়া হয়, এটাও একটা শিক্ষার অঙ্গ। গান-বাজনার সখ এদের বেশ; এদের ভেতর ভাল গাইয়ে-বাজিয়েরও অভাব নেই। কালাবসতি, ওচিন, যোগান, খিনানজং প্রভৃতি সহরতলীতে আরও অনেক বাঙ্গালী বাড়ী অথবা বাসা ক'রে বাস করছেন

রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়টি শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে; য়ুরোপের অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজের আদর্শে গড়া। এটি

সুলে প্যাগোডা ষ্ট্রীট—রেঙ্গুন

Residential University। কলেজ বিল্ডিং, হষ্টেল কোয়ার্টার্সগুলি বহুস্থান ব্যেপে আছে। স্থানটি নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ; শহরের হট্টগোল না থাকায় জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণ বিভাগ ছাড়া মেডিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং, ফরেষ্ট, টীচার্স ট্রেণিং প্রভৃতি বিভাগও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশাল, সুদৃশ্য কোকাইন হ্রদের তীরে অবস্থিত; চারদিকেই জানা-অজানা, ছোট বড় গাছের সারি চলেছে। এখানেও একটি Rowing Club আছে। বিকেলে হ্রদের তীরে বসেছিলুম। কয়েকটি যুবক একখানা নৌকা জলে ভাসিয়ে দাঁড় টেনে তীরবেগে অদৃশ্য হ'ল। একটি শ্বেতাঙ্গ যুগল—হয়ত দম্পতি অথবা প্রেমিক প্রেমিকা—একখানা নৌকা চড়ে পাল তুলে দিলেন, তরুণীটি হালে বসেছিলেন। "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি!" শ্বেতাঙ্গ যুবকটি ব'সে ব'সে ভাবছিলেন কি না জানিনা।

হ্রদের ধার দিয়ে পিচের বাঁধানো উঁচু নীচু পার্ব্বত্য রাস্তা এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে; রাস্তায় কিছু কিছু চড়াই-উৎরাইও আছে। গভীর কালো জলের মাঝখানে গাছ পালায় ঘেরা দ্বীপ। হ্রদটির দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম! মোটরে হ্রদটি একবার প্রদক্ষিণও ক'রেছিলুম, প্রায় আট মাইল পথ—মাঝে মাঝে লতায় পাতায় ঘেরা ছবির মতো সব বাড়ী, আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিবি। নির্জ্জন হ্রদের নিরালা পথের উপর বাংলো ধরণের সুদৃশ্য, ছাড়া ছাড়া বাড়ীগুলি বাস্তবিকই রমণীয় স্নিগ্ধ শান্তির আগার! হ্রদের অনতিদূরে সুদৃশ্য চিঙ চঙ প্রাসাদ, রূপকথার রাজ-পুরীর মতো দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছিল ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ হয় নি।

ব্রহ্মদেশে ব্যাপক ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং তার ফলে অধিবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য দেব দেবীর পূজা এঁরা করেন না। যে মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয় উহাই "ফায়া" বা প্যাগোডা (Pagoda) নামে অভিহিত হয়। একটি ইংরেজ লেখকের গ্রন্থে প'ড়েছিলুম যে এই দেশে প্যাগোডা ও "ফুঙ্গি" (বৌদ্ধ-ভিক্ষু) সমুদ্রতীরে বালুকণার ন্যায় অসংখ্য। বাস্তবিক লক্ষ্য করেছিও তাই। রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য ফুঙ্গি আর পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে নদীর তীরে তীরে, ঝোপে জঙ্গলে ও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় অগণিত প্যাগোডা আকাশের গায় মাথা তুলে আছে। মন্দিরের পাদদেশ হ'তে চূড়াটি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠেছে। শীর্ষ দেশের গঠন প্রণালী কতকটা ছত্রাকারের। একটা প্যাগোডা নির্ম্মাণ ব্রহ্মদেশবাসীর ধর্ম্ম জীবনের চরম লক্ষ্য।

শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিশ্ব বিশ্রুত শোয়েডাগন প্যাগোডা। সোনালি রংএর চূড়াটি বহু মূল্যবান মণি-রত্নাদি খচিত, উচ্চতা ৩৭০ ফিট। কারো কারো মতে খৃঃ পূঃ ৫৮৮ অব্দে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছে। কথিত আছে এই মন্দির স্থাপন কর্ত্তা (Two Talaing brothers) তপ-

বান বুদ্ধের আটটি পবিত্র কেশ থেঙ্গুথারা পর্ব্বতে নিয়ে আসেন এবং তার ওপর এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। আশে পাশে পাহাড়ের চিহ্ন না থাকলেও, মন্দিরটি যে পাহাড়ের ওপর নির্ম্মিত হয়েছে তা' এর উচ্চ ভিত্তি থেকেই বেশ বোঝা যায় - বহু দূর থেকে এই মন্দিরের চূড়া দৃষ্টি পথে পড়ে। মন্দিরে প্রবেশের চারদিকে চারটি পথ—সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠতে পা ধ'রে যায়। প্রধান প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে, এই পথেই বেশীর ভাগ লোক চলাচল করে। প্রবেশ পথের দু'দিকে বিরাটকায় দু'টি সিংহ মূর্ত্তি, উচ্চতা ১৫।১৬ হাতের কম নয়। দুদের কাজ হচ্ছে এই পবিত্র দেবালয়টিকে ভূত প্রেত ও দৈত্য-দানবের হাত থেকে রক্ষা করা। ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বর্ম্মাদের বিশ্বাস খুব, তাই মন্দির নির্ম্মাণেও এই ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

সিঁড়িতে ওঠবার পূর্ব্বে জুতো ছাড়তে হয়। জুতো পায়ে প্রবেশ করা একেবারে নিষেধ, হাতে নিয়ে মন্দিরের সর্ব্বত্র বেড়ানো চলে, কিছুমাত্র আপত্তি নেই। অনেক বর্ম্মাকে দেখেছি মন্দিরের ভেতর জুতো নিজের পাশে রেখে বুদ্ধ মূর্ত্তির অতি কাছে নতজানু হ'য়ে করজোড়ে স্তব করতে। সিঁড়ির দু' পাশে অনেক দোকান পশার ও অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারী। ফুলের মতো ফুট ফুটে মেয়েরা রং-বেরঙের ফুল ও মোমবাতির পসরা সাজিয়ে ষ্টল খুলে ব'সেছে। বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য দিতে হয় ফুল ও মোমবাতি, তাই এই সব দোকানের সংখ্যাই বেশী। ফুল কেনার জন্যে কী অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি—কিছু না কেনা পর্য্যন্ত কারুর নিষ্কৃতি নেই, কাতরতা-মাখা চোখের মিনতি এড়ানো ভার। সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ঐ মহাপুরুষের জন্যে খুশী হয়েই পুজোপচার নিয়ে যান।

এই ফুলওয়ালীদের সঙ্গে যে ইতিহাসটা বিজড়িত রয়েছে সেও একটু করুণ। এরা সমাজচ্যুত এবং এদের দেবদাসী (Pagoda slaves) বলা হয়। পুরাকালের কোনও যুদ্ধে পরাভূত বন্দীদের বংশধর এরা। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে কেউ এদের বিয়ে করুক, সমাজে সবংশে পতিত হ'য়ে তাদের দেবতার দাসত্ব করতে হ'বে এই নাকি বিধান।

আমা দু'য়ের ফুল ও মোমবাতি কিনে, জুতো ফুলওয়ালীর জিম্মায় রেখে আমরা ওপরে উঠতে লাগলুম। ছাদের নিম্ন ভাগে ও স্তম্ভের গাত্রে বিচিত্র স্থাপত্যের নিদর্শন—বিশেষ করে কাঠ খোদাই শিল্প অতি উচ্চাঙ্গের, দেখলে চোখ জুড়োয়।

প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে মন্দিরে প্রবেশ করে অর্ঘ্যপ্রদান করলুম। মন্দিরের কোনও ভৃত্য সম্ভবতঃ "শান্তিবারি" নিয়ে এল; উদ্দেশ্য সাধু—নবাগতদের কাছ থেকে দু'টো পয়সা উপার্জ্জন করা। প্রধান মন্দিরের পাদদেশ ঘিরে আছে বহু মন্দির; চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বেও বৃত্তাকারে মন্দিরের সারি চলেছে! শতাধিক বিঘে জমির ওপর

শোয়েডাগন প্যাগোডার একটি প্রবেশ পথ

শোয়েডাগন প্যাগোডা নির্ম্মিত। চারদিকে মন্দির গুলির অনুরূপ মন্দির ক'লকাতায় ইডেনগার্ডেনে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। প্রত্যেক মন্দিরে শত শত বুদ্ধমূর্ত্তি, হাজারে হাজারে রং বেরঙের মূর্ত্তি এই মন্দিরগুলিতে। ছোট, বড়, মাঝারি সব রকমের মূর্ত্তিই আছে। কোন মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কোনটি ধাতুর, কোনটি পাথরের আর কোনটি বা মার্ব্বেলের তৈরী। সাধারণতঃ উপবিষ্ট অবস্থায় বুদ্ধের ধ্যান-রত মূর্ত্তির

সাথেই আমরা পরিচিত কিন্তু এখানে কোন মূর্ত্তি উপবিষ্ট কোন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, কোনটি শায়িত আর কোনটি বা শিষ্য-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত। প্রকাণ্ড অভ্রংলিহ একটা শালগাছের কাছে, প্রায় কুড়ি হাত একটি শায়িত মূর্ত্তিও রয়েছে। প্রতি মন্দিরে রাশি রাশি ফুল ও মোম বাতি; পবিত্র গন্ধে মন্দিরগুলি ভরপূর।

কিম্ভূত কিমাকার বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত একটি চৈনিক মন্দিরও প্রাঙ্গনের এক অংশে রয়েছে। মন্দিরের শীর্ষদেশে অদ্ভুত জীব জানোয়ারের সব মূর্ত্তি—ভূতপ্রেতের হাত থেকে মন্দিরটিকে রক্ষা করবার মনস্তত্ত্ব এখানেও পরিস্ফুট।

একটা কাঠের ঘরে একস্থানে বিরাট একটা ঘণ্টা চোখে পড়লো। এর ওজন ৯৪,৬৮২ পাউণ্ড; ১৮৪০ সালে রাজা থারওয়াড্ডি প্যাগোডাতে এই ঘণ্টাটি উপহার দেন। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, কোনও বিদেশী যতবার এই ঘণ্টা বাজাবে ততবার তাকে এদেশে ফিরতে হ'বে। এত বেশী করে ঘণ্টা বাজালুম যে এর সত্য পরীক্ষার আর প্রয়োজন হ'বে না।

একটি কক্ষে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে হস্তীদন্ত ও স্বর্ণের কারুশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজরাজড়ারা এসব উপহার দিয়েছেন; প্রত্যেক জিনিষেই লেবেল আঁটা রয়েছে। মন্দিরের সর্ব্বত্রই তকতকে ঝকঝকে ধুলি মলিনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে পালাক্রমে এসে স্বহস্তে মন্দির-টিকে মার্জ্জনা ক'রে এর শুচিতা রক্ষা করেন

এই প্যাগোডাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে শুনে বেড়িয়েও কিছুমাত্র অবসাদ আসে না বেশ সময় কাটানো চলে। কোথাও দৈবজ্ঞ পাঁজিপুঁথি নিয়ে বসেছে—ভিড় জুটেছে সেথায়। কেউ দিচ্ছে দেবতার চরণে ফুল ও মোমবাতির অর্ঘ্য, কেউ বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে, কেউবা মূর্ত্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সরল প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, এদের প্রতি কাজে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই প্যাগোডার স্বরূপ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। মন্দিরের সর্ব্বত্র কত স্থাপত্যের নিদর্শন কত শিল্প-চাতুর্য্য কত ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য, কত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, যুগপৎ এই সবগুলি মনকে অভিভূত করে ফেলে, আনন্দে আত্মহারা হ'তে হয়। তাজমহলের মতই ভক্তদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই শোয়েডাগন!

আমাদের দেশের বারো মাসের তেরো পার্ব্বণের মতো ব্রহ্মদেশেও প্রতি মাসেই উৎসব লেগে আছে; উৎসবাদি সাধারণতঃ পূর্ণিমা তিথিতে হ'য়ে থাকে। এদের জীবনটাই যেন উৎসবময়; অক্টোবরের মাঝামাঝি প্রতি বৎসর বর্ম্মাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। এই থাডিন্‌জিউ উৎসব আমাদের দেশের দীপালির উৎসবের মতো। বর্ম্মা পল্লীর প্রতিগৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। আলোক সজ্জা প্রণালী অতি চমৎকার, আমাদের দীপালিকেও হার মানিয়ে দেয়। এই সময়ে প্যাগোডাগুলিতে অসম্ভব রকমের ভিড়। যে কয়দিন ধ'রে উৎসব চলে, বহুদূর থেকে শহরের বাইরের বহু লোক সমবেত হয়। সন্ধ্যার পর এই উৎসব দেখতে একদিন শোয়েডাগনে যাই। রাস্তা থেকে আরম্ভ করে মন্দিরের ভেতরে সর্ব্বত্র আলোর বান ডেকেছে, মন্দিরটার ভেতরে, বাইরে, চতুর্দ্দিকে, রাস্তার আশে পাশে, সকল সম্ভব ও অসম্ভব স্থানে অগণিত দীপ, মোমবাতি ও বিজলী বাতি! বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে দেশশুদ্ধ লোক যোগ দিয়েছে এই উৎসবে; দলের পর দল মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। ফুলের মতো ফুটফুটে বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা উৎসবের আনন্দে বিভোর হ'য়ে দলে দলে চলেছে হাল্কা হাসির হিল্লোল তুলে, বিহঙ্গের মতো মুক্ত এরা, মৃগ শিশুর মত চঞ্চল।

প্যাগোডার বাইরে অনাবৃত স্থানে বিরাট একটা মেলা ব'সে গেছে। বহু দোকান পশার—খাবারের দোকানই বেশী। বর্ম্মাদের ছোট বড় সকল উৎসবেই নাচ গান অপরিহার্য্য। ছোট একখানা ষ্টেজ বাঁধা—আর তার সামনে মাটীর ওপর নিজেদের আনীত মাদুর বা সতরঞ্চের ওপর স্ত্রী পুরুষ সকলে এক সঙ্গে বসে গেছে নাচ গান দেখবে বলে। ঐ অবস্থায় আহারও চলছে অনেকের। এই নাচ গানকে বলে "পোয়ে।" এটা কতকটা অপেরার মতো; Variety entertainment থাকে,—নাচ, গান, অভিনয়, হাসি, তামাসা প্রভৃতি। একজন করে ক্লাউনের অভিনয়, দর্শক মণ্ডলীতে ওঠে

হাসির হল্লা, আনন্দের উচ্চরোল! বলবার ভঙ্গী বা হাব ভাব খুব সুরুচিসঙ্গত মনে হ'ল না। নৃত্যই হ'ল 'পোয়ে'র বৈশিষ্ট্য। ছেলে মেয়ে, ও বয়স্থ লোক, সবাই মিলে পোয়েতে অভিনয় করে। নর্ত্তকীর পৃষ্ঠে পরীর মতো দু'খানা পাখা সংলগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী খুবই সুললিত ও চিত্তাকর্ষক, আর কতকগুলি অতি সাধারণ রকমের। পোজান-ডঙ্গে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ভিজে ভিজে একদিন পোঁয়ে দেখেছি, ওতে ডিগবাজি পর্য্যন্ত খেতে দেখেছি। কতকগুলি বেতের তৈরী গোলকের অদ্ভুত ক্রীড়াও দেখেছি ঐ পোয়েতে। পোয়ে বর্ম্মাদের অতি প্রিয়। শিশুর জন্ম উৎসব হয় পোয়ে নৃত্যে, তারপর কাণ ফোঁড়া, উল্কি পরা, বিয়ে, গার্ডেন পার্টি, প্যাগোডা তরী, প্রভৃতি সকল রকম সম্ভব ও অসম্ভব উপলক্ষেই, এমন কি অন্তিমের ডাক এলেও চলে পোয়ের অভিনয়। বর্ষা থেমে গেলে, রাস্তায়, রাস্তায়, পার্কে পার্কে চলে পোয়ে নৃত্য। সবটা রাস্তা জুড়ে সব ব'সে যায় পোয়ে দেখবে ব'লে, ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যায়, কারুর ভ্রূক্ষেপও নেই সেদিকে। শুনেছি পোয়ের বেশ ভাল ভাল দলও আছে এবং দু' একটা বিদেশেও গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন ভাল পোয়ের দল দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

প্রত্যেক প্যাগোডার সাথে সাথেই থাকে বৌদ্ধ বিহার। বিহারগুলি ভিক্ষুদের আবাসস্থল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বলে ফুঙ্গি। বৌদ্ধ বিহারগুলির ব্যয় সাধারণের দানে নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। প্রত্যেক বর্ম্মাকে জীবনে একবার, অন্ততঃ একদিনের জন্যেও বিহারে প্রবেশ করে ফুঙ্গীর জীবন যাপন কর্ত্তে হয়। ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কারের মতো এটাও প্রত্যেক বর্ম্মার অবশ্য করণীয় কাজ। রাস্তায় বেরুলেই গৈরিক বসন পরিহিত-মুণ্ডিত শীর্ষ অসংখ্য ফুঙ্গী চোখে পড়বে। বিহারের মধ্যে আগুন জ্বালা বা সূর্য্যাস্তের পর বিহার থেকে বের হওয়া নিষেধ। অতি প্রত্যূষে কাঠের তৈরী ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দলে দলে ফুঙ্গী ভিক্ষায় বেরোয়, সারাদিনের আহার্য্য সংগ্রহে, আর মেয়েরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি রান্না করা জিনিষ ঐ পাত্রে অর্পণ করে। আমাদের দেশের ভিখারীদের মতো নাছোড়বান্দা নয় এরা; আপন মনে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে, যে যা খুসী হয়ে দেয় তাতেই তৃপ্তি। ভিক্ষাগ্রহণের সময় মেয়েদের মুখের দিকে তাকানো নিষেধ, মেয়েরাও ছায়া না মাড়িয়ে ভিক্ষা দিয়ে এঁদের প্রতি সম্ভ্রম দেখায়। ফুঙ্গীদের ভিক্ষা না দেওয়া একটা লজ্জাকর ব্যাপার। ঘুম থেকে উঠেই বাড়ীর গিন্নীরা ফুঙ্গীদের ভিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কোনও ফুঙ্গী অন্যায় কাজ করলে তার গৈরিক বসন কেড়ে নিয়ে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। প্রত্যেক বিহারে ছোট ছোট ছেলেদের পড়াবার ব্যবস্থা আছে, ফুঙ্গীরা নেয় এই শিক্ষার ভার। এই শিক্ষালয়গুলিকে বলে চঙ। এই ক'রে প্রাথমিক
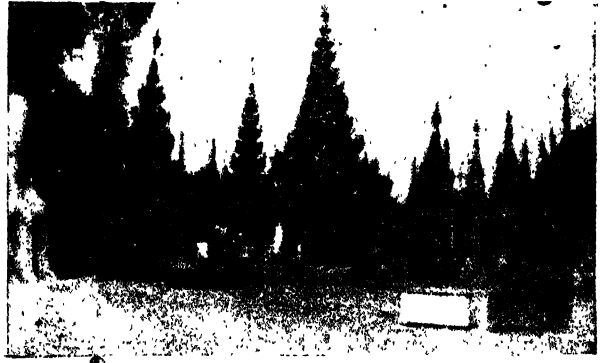
শোয়েডাগণ প্যাগোডার একসারি মন্দিরের অংশ

শিক্ষা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে এই দেশে। এ দেশের এই চঙগুলি আমাদের দেশের প্রাচীন কালের আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। টুঙ্গিতে যেয়ে এক চঙের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি আমাদের দেশের পাঠশালার মতো পোড়োর মতো ছেলেরা সুর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়াশুনা করছে। চঙেও জুতো পায়ে প্রবেশ নিষেধ। একটি শবাধারের পার্শ্বে গৈরিক বসন চোখে পড়লো, শুনলুম তিনমাস পূর্ব্বে একটি মৃত ফুঙ্গীর শব ওর মধ্যে রাখা হয়েছে, নির্দ্দিষ্ট দিনে সৎকার করা হ'বে। বিশিষ্ট ফুঙ্গীদিগকে মহাসমারোহে সৎকার করা হয়। কোন কোন ফুঙ্গীর মৃতদেহ এক বৎসরও রেখে দেওয়া হয়। শুনেছি মধুতে এই শবগুলি ডুবিয়ে রাখে। কুড়ি বাইশ হাত উঁচু রথের মতো বাঁশের মাচার উপর

শবটিকে রেথে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর ধূমধাম ক'রে বাজী পোড়ান হয়, আর নাচ গানও চলে খুব। প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয় এই সৎকার উৎসবে। টুঙ্গিতে যে বর্ম্মা গৃহস্বামিনীর বাড়ীর এক অংশে ছিলুম, তার মেয়ে দেখছিলুম একটি পুঁতির মালা গাঁথছে। শুনলুম ঐ ফুঙ্গীর সৎকারের জন্য যে পোষের দল গঠিত হয়েছে সে তার একজন সভ্য, মালাও গাঁথছে ঐ উৎসবের উদ্দেশ্যে।

রেঙ্গুণের বাইরে জীবনটার সাথে কিছু পরিচিত না হ'য়ে এ দেশটা ছাড়তে কিছুতেই মনটা সায় দিচ্ছিল না। স্থির করলুম পেগু যাব; রেঙ্গুণ থেকে পেগু প্রায় পঞ্চাশ মাইল। আমার ভাই তার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাথে সপরিবারে এক বাসাতেই থাকে, একেবারে এক হাঁড়ি। সুধীর বাবু সপরিবারে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন টুঙ্গিতে তাঁর দাদার বাসায়। সেখানে তাঁর একটা চালের কল আছে। টুঙ্গি পেগুর পথে পড়ে এবং রেঙ্গুণ হ'তে প্রায় তিরিশ মাইল। এই নিমন্ত্রণ পেয়ে ভালই হ'ল।

বাসায় তালা বন্ধ ক'রে সবাই ট্রেনে চড়লুম। ক্রমে শহর ছেড়ে মাঠে পড়লুম, দুই পাশে সবুজ ধানে মাঠ ভরে আছে। বর্ষা শেষে শরতের অপূর্ব্ব শ্যামল শোভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রান্তরে, কান্তারে, ধানের শীষে, গাছের পাতায়। মেঘ-নির্ম্মুক্ত, মুক্ত উদার, নীল আকাশের তলে দিগন্ত প্রসারিত চোখ-জুড়ানো হরিৎ ক্ষেত্র! "কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?" এই গর্ব্ব আর রইল না। এখানকার তৃণলতার শ্যামলিমা আরও বেশী, লতায় পাতায় তৃণগুল্মে সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। প্রচুর বৃষ্টিপাতে সর্ব্বত্র সবুজের ছড়াছড়ি, সারা দেশটা হয়ে উঠেছে শস্যশালী। চালই এই দেশের প্রধান খাদ্য, তাই ধানের চাষও অপর্য্যাপ্ত। কোটি কোটি টাকার চাল রপ্তানি হয় এ দেশ থেকে প্রতি বছর, ধানের কলেরও অভাব নেই। ভারত থেকে যে পরিমাণ চাল প্রতি বছর বিদেশে রপ্তানি হয়, তার নব্বুই ভাগই ব্রহ্ম দেশের। অরণ্যগুলি দিগন্তব্যাপী, ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপ শ্রেণীতে পরিপূর্ণ। হাতীর সাহায্যে কাঠগুলি নদীতে নিক্ষেপ ক'রে ব্যবসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রহ্মদেশের কাঠের ব্যবসা প্রসিদ্ধ। শহরে আসবাবের ঢের দোকান, সস্তাও বেশ। বরুণ দেবের কৃপায় ভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা; প্রকৃতি হাস্যময়ী।

রেলের দু'দিকে স্থানে স্থানে বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি; আর সারাটা রাস্তায়, ঝোপে জঙ্গলে, গাছ পালার ভেতর থেকে, পাহাড়ের ঢিবির ওপর দু'পাশে অসংখ্য প্যাগোডা মাথা তুলে রয়েছে। গাড়ীতে বর্ম্মা যাত্রীই প্রায় সব,

শোয়েডাগণ প্যাগোডার অতিকায় ঘণ্টা

প্রচুর কিচির-মিচির করছে। কেউ কারো ভাষা জানি না; আলাপের উপায় নেই। হিন্দী পর্য্যন্ত এদের জানা নেই যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলাপ করবো। শহরে বর্ম্মাদের কিন্তু হিন্দীটা রপ্ত আছে—পাঁচ জনের সংস্পর্শে আসতে হয় এদের। এক একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামছে আর ফেরীওয়ালারা চুরুট, ফল ফুলুরি, এমন কি মাছ ভাত পর্য্যন্ত বিক্রি করছে।

সুধীর বাবুর দাদা আমাদের প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে ছিলেন। এক বর্ম্মা বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, তিনি বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়েছেন। মা মেয়ে ও জামাই তিনটি মাত্র লোক এই বর্ম্মা পরিবারে। এক সময় এরা ছিলেন গাঁয়ের মোড়ল, এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এখানে বাড়ীঘর সবই কাঠের, ছাউনি কাঠ বা করোগেটেড টিনের। বাড়িগুলির উঠান ব'লে কোনও জিনিষ নেই। বড় একটা ঘরকে রান্না ঘর, শোবার ঘর বাথরুম প্রভৃতিতে ভাগ করা হয়েছে, রাস্তের জায়গাও অতি সঙ্কীর্ণ। ঘরের আশে পাশেই জঙ্গল।

এখানে বহু ক্যারেণের বাস। এরা অধিকাংশই খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। সাধুতা ও চরিত্রের খ্যাতি এদের আছে। সকলে মিলে চালের কলটি দেখে এলুম। আলাপে জানলুম ব্যবসা মন্দা ব'লে চাল কলগুলির অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে, কতকগুলি একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছে, যেগুলি চলছে তাদের অবস্থাও ভাল নয়।

সুধীর বাবুর দাদা বললেন যে, মাইল দুই দূরে নদীর ওপারে এক বাঙ্গালী যুবক সস্ত্রীক বাস করেন, বাঙ্গালীদের সাথে দেখা শোনা তাঁদের বড় একটা হয় না, আমাদের দেখলে খুবই খুশী হবেন তাঁরা, বিকেলের দিকে সবাই বেরুলুম অশ্বচালিত দু'খানা গো-যানের মতো গাড়ীতে। অসমতল বাঁধের ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি, দুই পাশে সবুজ ধানের মাঠ। মনে হচ্ছিল বাংলারই কোন মাঠের ভেতর দিয়ে চলেছি, কোন পার্থক্য নেই পথ, ঘাট, মাঠে। আমাদের পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন তাঁরা, উচ্ছ্বসিত আনন্দ যুবকটির চোখ মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। বহুক্ষণ গল্প গুজব চললো। ওখানকার পোষ্টমাষ্টার তিনি, পোষ্টাফিস ছেড়ে বাইরে যাবার একদিনেরও ফুরসুৎ নেই, একটিও বাঙ্গালীর মুখ দেখেন না, স্ত্রীর অবস্থা আরও কষ্টকর, একেবারে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কত দুঃখের কাহিনী! কিছু মিষ্টি মুখ না; করিয়ে ছাড়লেন না। স্থানটিও যতটা সম্ভব দেখে শুনে আসা গেল। রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর একই ধরণের। সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, তবে ঘরে ঘরেই যে খুব শান্তি আছে ব'লে মনে হ'ল না। গভীর দারিদ্র্যের ছাপ দেখলুম কয়েকটি পল্লীতে।

পেগু রওনা হলুম পরদিন। সঙ্গে উপেন ও সুধীর বাবু। শহরটির বুক চিরে চলে গেছে একটা নদী, পারাপারের জন্য মাঝে একটা কাঠের পোল। কয়েক বছরের পূর্ব্বে ভীষণ ভূমিকম্প শহরটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, লোকও মরেছিল হাজারে হাজারে। একটা সিনেমাতেই শুনলুম শ' পাঁচেকের জীবন্ত সমাধি হয়। বাড়ী ঘর একটাও দাঁড়িয়ে ছিল না, শহরময় ইট কাঠের স্তূপ। অজস্র অর্থ ব্যয়ে শহরটা পুনর্নির্ম্মাণ করা হয়েছে, তবে এর পূর্ব্ব গৌরব আর ফেরেনি। যতটা পারলুম লাহায় চ'ড়ে চক্কর দিলুম। দু' একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ও উকিলের সাইন বোর্ড চোখে পড়লো। ১০।১৫ বছর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী উকিল ও ডাক্তারেরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতেন এই দেশে। এখন আর সে কাল নেই। বাড়ী ফেরার পথে জাহাজে একজন ডাক্তারকে দেখলুম তল্পীতল্পা গুটিয়ে দেশে ফিরছেন। এখানে পেট চালানোই ভার। শিক্ষার ফলে বর্ম্মাদের মধ্যে এখন বহু উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, হাকিম, মাষ্টার ও কেরাণী। আগে চাকরী না পেলে অনেকে ছুটত রেঙ্গুণে—এখন বিদেশীদের চাকরী দেওয়া আইন ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; বর্ম্মা পেলে আর ভিন্ন দেশীয়দের নেওয়া হয় না। দু' একজন নিলেও হাঙ্গামা কত! বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষের বসবাসের খবর নিয়ে তবে চাকরী দেওয়া হয়।

রেঙ্গুণের শোয়েডাগণের মত পেগুর শোয়েমাডাও একটা বিখ্যাত প্যাগোডা। নির্ম্মাণ কালে মন্দিরটির উচ্চতা ছিল মাত্র ৭৫ ফিট। ক্রমে এর উচ্চতা পৌছায় ২৮৮ ফিটে। পাদ-দেশের পরিধিও ১৩৫০ ফিট। এই দেশের বহু রাজা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করছেন এর শ্রী ও সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে। ভূমিকম্পে প্যাগোডাটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। ফুল-ওয়ালীরা প্রবেশপথে এখনও তা'দের পশরা নিয়ে ব'সেছে, তা'দের ব্যবসা কিছুমাত্র মন্দা পড়েনি। ভাঙ্গা মন্দিরের দীর্ণ দেবতা ভক্তের হৃদয়ে আজও আগের মতই বিরাজ করছেন।

শহরের উপকণ্ঠে বিপুলকায় এক বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখি। মূর্ত্তিটি প্রায় একতলার মতো উঁচু একটি বেদীর ওপর কাত করে শোয়ান, মাথায় হাত দেওয়া, একখানা পাথর কুঁদে এই বিরাট মূর্ত্তিটি গড়া হয়েছে, শুভ্র গায়ের রং, কাপড় সোনালী রঙের। মূর্ত্তিটি প্রায় এক শো হাত লম্বা। এত বড় বুদ্ধ মূর্ত্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অতি সুন্দর এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব, কোথাও কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য বোধ হল না। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে—রুদ্র ধ্বংস লীলা কিছুমাত্র ছাপ আঁকতে পারেনি এর বুকে। বেদীর গায়ে বহু লেখা খোদিত রয়েছে। "Subscription is solicited" ছাড়া আর কোন ভাষাই আমাদের কাছে বোধগম্য হ'ল না।

রেঙ্গুণে ফিরে একদিন বেরলুম হলগা লেক দেখতে, সুরম্য

১৬।১৭ মাইল। সঙ্গে উপেন, আমার ৯।১০ বছরের এক বোন রাণী আর রেঙ্গুণের বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নিয়োগী মহাশয়দের বাড়ীর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী। এই প্রবন্ধের অধিকাংশ ছবিই এঁর হাতে তোলা। যথা সময়ে তাঁর মোটরে তিনি আমাদের তুলে নিলেন। মিংলাডনে নতুন তৈরী এরোড্রোম পথে পড়ল, নেমে দেখে এলুম। ১৩।১৪ জন আরোহীর উপযোগী একখানা প্লেন রয়েছে। এরোড্রোমের চার্জ্জে একজন বাঙ্গালী অফিসার। তিনি আমাদের কল-কব্জা গুলি কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

পিচের তৈরী কালো কুচকুচে, সুন্দর, প্রশস্ত পথ দিয়ে চলেছি—কিছু কিছু চড়াই উৎরাইও আছে। শত শত মাইল এরূপ সুন্দর রাস্তা পি, ডবলিউ, ডি তৈরী করেছেন, প্রশংসা না করে থাকা যায় না। দু পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত; পথে দু' এক জায়গায় রবারের চাষও চোখে পড়ল।

যখন হ্রদের তীরে পৌছলুম, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। প্রকাণ্ড এই হ্রদটি, এক কূলে দাঁড়িয়ে এর বিশালত্বের পরিমাপ করা চলে না। এখান থেকেই রেঙ্গুণের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। বাঁকা-চোরা তীর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে বেড়ালুম; ভেল্‌ভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা তীর, চারদিকেই সবুজ মাঠের ঐশ্বর্য্য। মাঠের ধারে ধারে গাছপালায় ঘেরা শান্ত গ্রামগুলি। অদূরেই মোষ গরু চরছে; রাখালেরা সিঠে, কাঁচাগলায় মেঠোসুরে গান গাচ্ছে। হ্রদের একখানা আলোকচিত্রও নেওয়া হয়েছিল, সেখানা নষ্ট হয়ে যায়। হ্রদের ধারে ধারে জমেছে শ্যাওলা আর নানান্ রকমের জলজগাছ, কোথাও কলমিলতার জড়াজড়ি। পানকৌড়ি আর বুনো হাঁসেরা মাতামাতি করছে হ্রদের নীল বুকে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী রোদ ঝিলমিল্ করছে হ্রদের জলে, গাছের মাথায়, দূরে একটা প্যাগোডার চূড়ায়। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। চারিদিকেই মধুর শান্তি ও স্তব্ধতা ও কেমন একটা উদাস ভাব। গভীর, স্বচ্ছ, কালো এই হ্রদের জল— যেন নীলাম্বরী-পরা কোন্ রূপসীর কালো নয়নের অনিমেষ চাউনি। মন চাইছিল না ছেড়ে যেতে এই মধুর স্থানটি। ফিরতে রাত আটটা হ'ল। কি বিশ্রী শহরের এই হট্টগোল, গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি আর বিজলী বাতিগুলি।

এই দেশের রীতিনীতির কিছু আভাস দিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ করব। বর্ম্মারা সাধারণতঃ অলস। কোন দেশের রীতি নীতি, স্বভাব চরিত্র প্রভৃতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর। ব্রহ্মদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বর এবং কৃষিজাত দ্রব্যও উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে। যে দেশে সামান্য পরিশ্রমেই মাটীতে সোনা ফলে, সে দেশের অধিবাসীদের অলস ও শ্রম-বিমুখ হ'য়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

রেঙ্গুণ ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বেশ স্বাস্থ্যকর। বর্ষা ঋতুটা বাদ দিয়ে এদেশটাকে চির বসন্তের দেশ বলা যায়,—লেপ, কাঁথা, গরম কাপড়চোপড়ের বালাই নেই। এখানকার গাঁয়ে গাঁয়ে ম্যালেরিয়া আর মানুষের পেটে পেটে পিলে নেই। স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করেছি। সাধারণতঃ বর্ম্মাদের রং খুব ফর্সা, আকৃতিও কিছু খর্ব্ব। চীনাদের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে, মঙ্গোলিয়া বংশ হ'তেই উভয় জাতির উদ্ভব।

"Eat, drink and be merry" হচ্ছে বর্ম্মাদের motto, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা জগদ্দল পাথরের মতো বুকে ব'সে এদের মুখের হাসি, প্রাণের আনন্দটুকু কেড়ে নেয় না। "খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর," "হেসে নাও, দু'দিন বৈ ত নয়" সদা এই ভাব।

তাস পাশা থেকে আরম্ভ করে—ফুটবল, ক্রিকেট হকি, বাচখেলা মুরগীর লড়াই প্রভৃতি, এদের উৎসাহের অন্ত নেই। ছেলেবেলা থেকেই এরা খেলাধূলায় অভ্যস্ত ব'লে এদের মাংসপেশী সুদৃঢ় ও সুগঠিত; জন্ম খেলোয়াড় এরা। ইষ্ট বেঙ্গল ফুটবল টিম নিমন্ত্রিত হ'য়ে খেলতে আসেন এই দেশে। দু'দিন আমি খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলুম, সুন্দর Stadiumটি। বর্ম্মাদের খেলার standard বেশ উঁচু, ক্ষিপ্রকারিতাটা এদেশের খেলোয়াড়দের বিশেষত্ব। খেলার মাঠে লোকে লোকারণ্য, বিড়িওয়ালা, রিক্সওয়ালা, ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত হাজির। খেলা দেখ্‌তে পয়সা খরচ করাটা এরা অপব্যয় মনে করে না। স্বপক্ষে এক একটা গোল হবার পর রুমাল, ছাতা, লাঠি ছাড়া সোডার বোতল পর্য্যন্ত আকাশে ওড়ে, টাম্-টোম্ মাম বাঁচিয়ে কেউ কেউ লুঙ্গি পর্য্যন্ত উড়িয়ে দেয়। বাঙ্গালীদের নয়, ভারতবাসীদের হারিয়েছে ব'লে বর্ম্মাদের গর্ব্ব দেখলুম। হকি, ক্রিকেট প্রভৃতিতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র নাম নেই,

যে সুনামটা ফুটবলে আছে তা'ও নষ্ট হতে দেখলে বাঙ্গালী মাত্রেরই কষ্ট হয়। এই টিম নিয়ে বিদেশে আসা উচিত হয় নি, অনেক রেঙ্গুণবাসী বাঙ্গালীকেই এই দুঃখ করতে শুনেছি।

জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বর্ম্মাদের আসক্তি কম নয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখেছি অসম্ভব রকমের জনতা। জুয়াখেলার জন্যে মাদ্রাজী চেট্টীদের কাছ থেকে ঋণ করে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়ে।

বর্ম্মাচুরুট স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখেই দেখেছি; সারা দেশটা চুরুটের ভক্ত। এক একটা চুরুট এত বড় যে পুলিশের রেগুলেশন লাঠি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

এদের মধ্যে কোর্টশিপও আছে। উৎসবে, পার্ব্বণে, পোয়ে, নৃত্যে, হাটে বাজারে, তরুণ তরুণীকে আর তরুণী তরুণকে ভদ্রভাবে বেছে নেবার সুযোগ পায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাও আছে। হুজুগ, হৈ চৈ, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে আমাদের সঙ্গে এদের বেশ সাদৃশ্য দেখলুম।

এই দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে আমার ভ্রমণ-কাহিনী অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এদেশের পুরুষেরা যেমন অলস, স্ত্রীলোকেরা তেম্‌নি পরিশ্রমী। এটা স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। রাস্তায় ঘাটে মেয়েরা অসঙ্কোচে বেরিয়ে সকল রকম পুরুষের কাজ করে। ব্যবসা বাণিজ্যেও এদের মাথা বেশ, রোজগারের নানান্ ফন্দী গজায় এদের মাথায়। হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ঘাটে, চোখে পড়বে স্ত্রীলোকেরা দোকান সাজিয়ে বসেছে, দর্জ্জির দোকান করছে, চুরুট তৈরী করছে, ফেরী করে জিনিষপত্র বিক্রি করছে। বড় বড় ব্যবসা পর্য্যন্ত এরা বেশ চালাচ্ছে। গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা টাকা উপায়ের জন্যে একটা কিছু না কিছু করছেই—ব'সে দিন কাটায় না। নানান্ রকম কুটীর শিল্প ক'রেও দেশের অনেক পয়সা এরা দেশেই রেখে দেয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির মঙ্গল কামনায় দু'টি কল্যাণ হস্ত সদাই ব্যস্ত।

বর্ম্মারা খুব বিলাসিতাপ্রিয়; পেটে না খেয়ে, ধার কর্জ্জ ক'রেও বাবুগিরি করা চাই। পোষাক পরিচ্ছদে ব্যয় বাহুল্য খুবই। মেয়েরাও পুরুষদের মতো লুঙ্গী ব্যবহার করে। ৪০।৪২্ টাকার দামী লুঙ্গী অবস্থার বাইরেও অনেকেই ব্যবহার ক'রে থাকে, তার পরে দামী সিল্কের জ্যাকেট, ব্লাউজ, ভাল ভেলভেটের স্লিপার, মানান সই অলঙ্কার তার সঙ্গে চাইই। ছেলে মেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে তরুণ, তরুণী, বুড়োবুড়ী সবারই বিলাসিতার দিকে ঝোঁক। মেছুনি সেজে-গুজে মাছ বেচতে ব'সে গেছে, দোকানওয়ালীরা ফুলবিবি সেজে দোকান খুলে ব'সেছে, ফেরীওয়ালীদেরও পারিপাট্যের অভাব নেই। মেয়েদের মাথার চুল আগুল্‌ফ-লম্বিত, মসৃণ, চিক্কণ, ঘন-কৃষ্ণ। রূপকথার "কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল" বলা যেতে পারে। খোঁপা বাঁধার ভঙ্গীও নানান রকমের—কোনটি টুপির মতো, কোনটির গঠন চূড়ার ন্যায়, কোনটি বা সাপের ফণার মতো। টুপির মতো খোঁপা-গুলিকে কালো ভেলভেটের টুপি ব'লে আমার ভ্রম হত—নতুন লোকের পক্ষে খোঁপা কি টুপি বোঝা শক্ত। মেয়েরা "তানাকা" (চন্দনের মতো একরকম অঙ্গরাগ) দিয়ে মুখমণ্ডল চিত্রিত করে, মাথায় ও কানে ফুল ভূষণ রূপে ব্যবহার করে। ফুল এদের অতি প্রিয়। রাস্তাতে রাস্তাতে ফুলওয়ালীরা হেঁকে বেড়াচ্ছে পাঁ পাঁ (ফুল ফুল)।

বাইরেও এদের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি আছে। একজন ইংরেজ লেখক এই দেশটাকে বলেছেন "The land of pagodas and fair ladies".

আমার এক বন্ধুও এদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে-ছিলেন আমাকে। দুধে-আল্‌তা গোলা রং আর চটকদার পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখে সুন্দরী বলেই এদের প্রথমটা মনে হয়, তবে চোখ মুখের বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই সুন্দরী শ্রেণীভুক্ত হবেন কিনা সন্দেহ।

নারী যে দেশেরই হোক না কেন, সে নারী—মা, বোনের জাত। স্নেহ, ভালবাসা, দয়ামায়া, অতিথি-পরায়ণতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলিরও এদের মধ্যে কিছুমাত্র অভাব নেই; আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনও এদের মধ্যে খুব। এই মহাজাগরণের দিনে এদেশের নারীরাও ঘুমে অচেতন নয়, পুরুষোচিত কাজ করতেও পিছপা নয়। আফিসে অনেক মেয়ে কেরাণী আছেন, পোষ্টাফিসেই বেশী। দু'একজন এ্যাডভোকেট পর্য্যন্ত হয়েছেন। আর পুঁথি বাড়াবো না, অনেক বিরক্ত করেছি পাঠকদের! দেশে ফিরলুম প্রবাসের মধুর স্মৃতিগুলি বুকে নিয়ে। বিদায় শোয়ে ডাগন, বিদায় রেঙ্গুণ!

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

নির্ভীক হিন্দু গুরুদাস*

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল

স্মরণীয় সার গুরুদাসের পিতামহ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ডায়মণ্ড-হারবারের নিকটবর্ত্তী বকগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নারিকেলডাঙ্গায় স্থায়ী ভাবে বাস করেন। তদবধি ঐ স্থানই তাঁহার বংশধরগণের আবাসভূমি হইয়াছে। তাঁহার পুত্র রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনা পূজা ও আহ্নিকে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তন্নিমিত্ত, তিনি তাঁহার কার্য্যস্থল কার কোম্পানীর আফিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ উহা জানিতেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ বিলম্বের জন্য কোন অনুযোগ করিতেন না। কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই সার গুরুদাসের পিতা ছিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার সপ্তমী তিথিতে সার গুরুদাসের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই সার গুরুদাস পিতৃহারা হন, তৎকালে তাঁহার বয়স মাত্র দুই বৎসর দশমাস ছিল। তাঁহার মাতা সোনামণি দেবী শোভাবাজার নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। তিনি পুত্রের শৈশব হইতেই তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষা বিধান করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে "মানুষ" করিয়াছিলেন। সেই মহীয়সী মহিলা কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পুত্রকে সুশিক্ষিত ও সুচরিত্র করিবার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অধ্যয়নে অনুরাগ, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা, সর্ব্ববিষয়ে লোভ-হীনতা, সংযম, চিত্তশুদ্ধি ও ফললাভে নিস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম করিবার অভ্যাস, সৎসাহস, সর্ব্বজীবে দয়া ও উদার ভাব—এই সকল মাতৃদত্ত শিক্ষার বীজ সার গুরুদাসের শিশুহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং উহা কালক্রমে সার গুরুদাসের মহনীয় চরিত্র সম্যকরূপে বিকশিত করিয়াছিল। সার গুরুদাস ইহার গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া জননীকে সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সতত তৎপর থাকিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। তিনি তাঁহার আদেশ ভগবানের আজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং জীবনে কখনও তাঁহার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করেন নাই।

পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে হেয়ার স্কুলে সার গুরুদাসের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে ঐ স্কুল কলুটোলা শাখা বিদ্যালয় নামে অভিহিত হইত। সার গুরুদাস মেধাবী, পরিশ্রমী ও প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনি সর্ব্বোত্তম ছাত্র বলিয়া পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৮৬০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উচ্চ পরীক্ষায় প্রতি-যোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারের গৌরব হইতে কেহ কখনও তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ১৮৬৬ সালে তিনি উকীল হইয়া প্রথমতঃ বহরমপুরে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ছয় বৎসর কাল তথায় সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া মাতার ইচ্ছা ও অনুজ্ঞাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং সাধু চরিত্রের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৮৯ সালে তিনি এদেশীয়-দের ভাগ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক পদ হাইকোর্টের বিচার-পতির আসন প্রাপ্ত হন এবং তদানীন্তন কালের নিয়মানুসারে বহু-দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক

* "সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট" কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত "নির্ভীক হিন্দু গুরুদাস" নামক প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় এই প্রবন্ধটি শীর্ষস্থান অধিকার করে।

না থাকিলেও ১৯০৪ সালে স্বেচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। ইহাতে একদিকে তাঁহার মানসিক বল ও অন্যদিকে নির্লোভতা সুপ্রকাশিত।

এই পদত্যাগের মূলে দুইটি কারণ বর্ত্তমান ছিল। অবসর-কালে তিনি স্বদেশের ও সমাজের নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অপর যোগ্য ব্যক্তির উন্নতি পাইবার পক্ষে তিনি অন্তরায় স্বরূপ হইয়া রহিবেন না এইরূপ বিবেচনা করিয়া সার গুরুদাস ঐ কার্য্য করিবার পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ লোভনীয় পদ অনায়াসে ও প্রফুল্লচিত্তে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সভ্য, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট ও অন্যান্য বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি আত্মমতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন। কি বিচারালয়ে, কি অন্যান্য স্থলে, যাহা তাঁহার নিকট ন্যায়ানুমোদিত ও বিবেকসম্মত বোধ হইত, তিনি তাহা নির্ভয় হৃদয়ে অনুসরণ করিতে কখনও ইতস্ততঃ বা দ্বিধাবোধ করিতেন না।

শান্তস্বভাব সার গুরুদাসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার এই নির্ভীক ভাব। তজ্জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় আকণ্ঠ নিমগ্ন হইলেও, রাজকীয় ও এ দেশীয় নানা সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও এবং সর্ব্বত্র যশের বিজয়মাল্য লাভ করিয়াও তিনি পাশ্চাত্য ভাবে প্রভাবান্বিত হন নাই। পাশ্চাত্য ভাব অনুকরণের প্রবল স্রোত তাঁহার বলিষ্ঠ চরিত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন, খাঁটি হিন্দু, খাঁটি ব্রাহ্মণ। তিনি বেশ ভূষায়, আচারে ব্যবহারে, নিত্য কৃত্যে হিন্দুত্ব হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। এই ইংরাজী শিক্ষার যুগে, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া, বর্ত্তমান অসংযমের কালে তিনি যে অসাধারণ চিত্তবলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা একান্তই দুর্লভ বলিলে কোনরূপ অতিরঞ্জন করা হইবে না।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার মদিরা পান করিয়া এবং আস্তিক্য বিশ্বাসহীন ডিরোজিয়োর স্বাধীন মতবাদের সংস্পর্শে আসিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারা এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ ও উহার ভুক্তাবশেষ প্রতিবাসীদের গৃহে নিক্ষেপ তাঁহাদের নিকট গর্ব্বের বস্তু ছিল। হিন্দুর আচার, কুসংস্কার, ও হিন্দুর ধর্ম্ম, পৌত্তলিকতার নামান্তর, এবং হিন্দুর শাস্ত্র, শিক্ষার অযোগ্য, এই ধারণা তাঁহাদের মনে জন্মিয়াছিল।

ধুতি-চাদরে সার গুরুদাস

অন্ধ বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী না হইয়া সকল বিষয় বিচার বিতর্কে স্থির করা তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু মাত্রাতিশয্যে ঐরূপ স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতায় এবং সংস্কার সমূল ধ্বংসে পর্য্যবেশিত হইয়াছিল।

আমাদের যাহা কিছু সকলই মন্দ, এবং পাশ্চাত্য যাহা কিছু সকলই উৎকৃষ্ট, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ তৎকালে দুইজন প্রসিদ্ধ ইউ-

রোপীয় পণ্ডিতের কথায় তাঁহাদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। তন্মধ্যে একজন লর্ড মেকলে এবং অপর জন খৃষ্টান মিশনারী ডফ সাহেব। সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও অদ্বিতীয় শক্তিশালী লেখক লর্ড মেকলে স্বভাবসিদ্ধ আত্মম্ভরিতা বশতঃ তাঁহার অত্যন্ত পল্লবিত ভাষায় যখন বলিলেন, "A single shelf of good European library is worth the whole native literarture of India and Arabia" অর্থাৎ আরবদেশের ও ভারতবর্ষের সমগ্র সাহিত্যের পক্ষের ইউরোপের কোন একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকাগারের একটি তাকই পর্য্যাপ্ত; এবং মিশনারী পণ্ডিত ডফ সাহেব মেকলে সাহেবর সুরে সুর মিলাইয়া গজনী রাজসভার প্রতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ফার্দ্দুসির অনুকরণ করিয়া যখন ব্যক্ত করিলেন যে গজনি রাজসভার ন্যায় প্রাচ্য ভাষা সমূহও সাগরের ন্যায় মহান্, অতুল ও অকূল, কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও ইহাতে মুক্তার সন্ধান মিলে না, তখন ঐ সকল কথা নব্য ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ধ্রুব সত্য বলিয়া জ্ঞান হইল এবং তাঁহারা স্বদেশীয় রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার সম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থে রত্নের সন্ধান না করিয়া ইলিয়াড, ইনিয়াস এবং ফিল্ডিংএর উপন্যাসাদিতে রত্নের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্লাবনের বেগ ঐরূপ দুর্নিবার হইয়াছিল। পরে সার গুরুদাসের সময়ে উহা কিয়দংশে মন্দীভূত হইলেও সাহেবিয়ানার মোহ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত হয় নাই।

তাঁহাদের আচার ব্যবহারে হিন্দুর ভাব, হিন্দুর নিষ্ঠা, হিন্দুর জীবন যাত্রার নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রকাশ পাইত না। তাঁহাদের জাতীয় ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষায় ডুবিয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে সার গুরুদাস একাকী অটল পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত নানারূপ বিপ্লব-তরঙ্গের প্রতিঘাত সহ্য করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই গুণে তিনি তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র ছিলেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতি মৃদু স্বভাব, উদারচেতা, বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহে ক্ষীণতনু দমগুণান্বিত ও সংযত কিন্তু অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী সার গুরুদাসের মত ব্রাহ্মণের আদর্শ আধুনিক কালে সুদুর্লভ।

সত্ত্বরজতমগুণাত্মিকা প্রকৃতি পুরুষের সহযোগে এই নিখিল চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পর, পুরুষ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আছেন এবং প্রকৃতি প্রযত্না ও ক্রিয়ারতা অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। ঋকবেদ সংহিতা হইতে আর হিন্দুর সকলশাস্ত্র ও পুরাণে এই গুণত্রয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় সত্ত্বগুণের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।"

অর্থাৎ "হে অনঘ, তাহার মধ্যে নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক ও অনাময় (অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য) সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের দ্বারা দেহীকে বিদ্ধ করে।" এই গুন বৃদ্ধি পাইলে, দেহী দেহান্তে অমর লোকের অধিকারী হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল। গীতায় সত্ত্বগুণের এই লক্ষণ দ্বরা সার গুরুদাসকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

মহাভারতে মোক্ষপর্ব্বাধ্যায়ে দমগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণে স্থিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া তপস্যা, ও সত্য দমগুণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দমগুণের দ্বারা লোকের তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয়।...অদীনতা, বিষয়ে অভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানতা, গুরু পূজা, অনসূয়া প্রাণীগণের প্রতি দয়া অকপটতা, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যা বাক্য পরিহার এই সমস্ত গুণ দম গুণ হইতে উৎপন্ন হয়।"

কালীসিংহের মহাভারত

বলা বাহুল্য এই সমুদয় গুণে সার গুরুদাস ভূষিত ছিলেন।

ঐ পর্ব্বাধ্যায়ে অন্যত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। "কেবল বেদাধ্যয়ন, গুরু শুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদয় বেদবক্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক ভূরি দক্ষিণা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাহা হইতে প্রাণী ভীত না হয়, এবং যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীকে ভয় না করেন, যাঁহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ না থাকে, এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় তাঁহার প্রিয়ভক্তের কথা বলিতে গিয়া ঐরূপ ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

• • • •

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

• • • •

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

ব্রাহ্মণ্যের ঐরূপ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সার গুরুদাস গীতোক্ত ভক্তের সন্নিহিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রকৃত হিন্দুত্ব গোঁড়ামিকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। যাহা মহান্ উদার ও শাশ্বত তৎপ্রতিই ইহার লক্ষ্য। প্রকৃত হিন্দু অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করেন না, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

সার গুরুদাস এইরূপ প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। সার্ব্বজনীন প্রীতি তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল, সেই জন্য তিনি বিভিন্ন মত ও ধর্ম্মাশ্রয়ীদের এত প্রিয় ছিলেন। যাঁহার মনে কপটতা নাই, তাঁহার মনে ভয়ের লেশ থাকিতে পারে না। সার গুরুদাস সত্যের উপাসক ছিলেন কাজে কাজেই তিনি এইরূপ তেজস্বী ও নির্ভীক হইতে পারিয়াছিলেন।

খর্ব্বক্ষীণকায় সার গুরুদাস, শান্ত মৃদুস্বভাব সার গুরুদাসকে দেখিলে তাঁহাকে কোমলতার আধার বলিয়া মনে হইত। তিনি সত্য সত্যই নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এই নিরীহ ভাব দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা জানিতেন না যে কাহারও মনে অকারণে ক্লেশ দেওয়া অনুচিত। হিন্দু ধর্ম্মের ইহা একটি প্রধান শিক্ষা। তাঁহারা জানিতেন না যে অন্যায়, অধর্ম্ম অত্যাচার দেখিলেই এই নিরীহ ব্রাহ্মণই তেজোদৃপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেন। মহৎ চরিত্রে ঐরূপ পরস্পর বিরোধী ভাবের সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। কবি ভবভূতি সত্য সত্যই বলিয়াছেন,

বিচারপতিবেশে সার গুরুদাস

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহিবিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

সার গুরুদাসের বাক্যে, লেখায় ও আচরণে কখন কখন তিনি কুসুম-কোমল কখন কখন বা তিনি বজ্রকঠিন হইতেন এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের এক সভায় Faculty of Arts হইতে সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য বহুলোকের নাম প্রস্তাবিত হইলে ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করা স্থির হয়। তাহাতে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন, যে

ব্যালটের কাগজ গণনা করিবার পূর্ব্বে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। সার গুরুদাস ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তেজোগর্ভ বাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে ঐরূপ ঘৃণিত কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়, এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ঐ কথা উত্থাপন না করিলে ভদ্ররীতির উপযুক্ত হইত। কোন আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ঐরূপ কথা কখনও নীরবে সহ্য করিতে পারে না। নিরীহ ব্রাহ্মণ সার গুরুদাসের এইরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ওয়েষ্ট-ল্যাণ্ড সাহেব যে কিরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সার গুরুদাসের সুলিখিত ও সুচিন্তিত "Abused India Vindicated" নামক প্রবন্ধে তিনি যেরূপ স্পষ্টভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার নির্ভীকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজের ও ভারতবাসীর ভাষা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এবং উভয়ের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তজ্জন্য ইংরাজের ভারতবাসীকে বুঝিবার অজ্ঞতা ও সহানুভূতিহীনতা স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা ভারতবাসীর চিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

এইরূপ মর্ম্মে সার গুরুদাস প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রাচীন গৌরব এবং কাহার দোষে তাহার এই বর্ত্তমান অধঃপতন ইহা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তির হীনতা সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় যে ভারতবাসী কোন বড় কাজ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সার গুরুদাস উহার প্রতিবাদ করিয়া ঐ প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন, "Generally speaking, we require some stimulus, some good result to follow from our troubles to make us work. Here students conscious of the disheartening truth that beyond a few prizes, scholarships and certificates, he is generally to expect no greater facilities and that when he will enter the world, he will be generally superseded by his more fortunate but not more able English subjects, that if he gets any preferment, he will nevertheless have the mortification to see others who began the race with him outstripping him whilst he by his irresistible fate will be tied down to the point from which he started."

ইহার ভাবার্থ এই :—"সাধারণতঃ কার্য্য করিবার ক্লেশ লইবার জন্য কোনরূপ উদ্দীপনা, কোনরূপ সুফল লাভের আশা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশের ছাত্রেরা এই নিদারুণ সত্য উপলব্ধি করে যে তাহাদের ভাগ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও বড় জোর কয়েকটি পুরস্কার বৃত্তি এবং প্রশংসাপত্র জুটিতে পারে, তদপেক্ষা আর কিছু পাইবার তাহাদের অধিকার নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তাহারা দেখিতে পায় যে শিক্ষায় কোন অংশে হীন না হইলেও সৌভাগ্যবান ইংরাজ যুবকের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয় এবং যদি দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে পদোন্নতি ঘটে, সমাবস্থাসম্পন্ন ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত তাহার এই প্রভেদ রহিয়া যায় যে তাহারা দ্রুত গতিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু তাহার সেই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।" সার গুরুদাসের এই মন্তব্য কঠোর হইলেও সত্য। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে এদেশবাসীরা যে সকল ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সুযোগ সুবিধার পথ অবরুদ্ধ করিয়া তোমরা অগ্রসর হইতে পার না বলা কি অদ্ভুত বিদ্রূপ করা হয় না?

শারীরিক শক্তিহীন বলিয়া বাঙ্গালীকে "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া অপবাদ দেওয়া হয়, সার গুরুদাসের মতে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শারীরিক চর্চ্চা করিত বলিয়া আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক, মাল, পাইক, লাঠিয়াল প্রভৃতি সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। ইহার অভাবে বর্ত্তমানে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। সামরিক বিভাগে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাঙ্গালীদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ, তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল ও ভীরু বলা কোনক্রমেই গভর্ণমেণ্টের মুখে সাজে না। ইহার জন্যও বাঙ্গালী দায়ী নহে, দায়ী গভর্ণমেণ্ট। এইরূপ

স্পষ্ট বাক্যে গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে সার গুরুদাস কখনও ভীত হন নাই।

যে স্থলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুবিধা বাঙ্গালী পাইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও সে স্থলে তাহারা তাহাদের বিপুল কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আইন ব্যবসায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যবসায়ে বহু গুণী ব্যক্তি, ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদায় ও সম্মানে দেশের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং তাহাদিগের দ্বারা দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশ অন্যদেশ হইতে কিছু না কিছু শিখিতে পারে। ইংলণ্ড ভারতকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখাইবার অধিকারী কিন্তু অধ্যাত্ম জগতের আলোক পাইবার জন্য ইংলণ্ডকে ভারতের নিকট শিখিতে হইবে। ভারতের সাহিত্য, ভারতের দর্শন, ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা, কিছুই উপেক্ষণীয় নহে।

ইংরাজগণ বলিয়া থাকেন যে ভারতবাসী মিথ্যাবাদী অসাধু ও বিশ্বাসঘাতক। সার গুরুদাস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, একটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে এইরূপ কলঙ্কারোপ করার মূলে কোন সত্য নাই। ইহার মূল কারণ এই যে কতিপয় দাম্ভিক ইংরাজ কয়েকজন দেশদ্রোহী ভারতবাসীর সহায়তায় এই বিপুল সাম্রাজ্য হস্তগত করেন। কয়েকজন ভারতবাসীর ঘৃণিত চরিত্র অবলোকন করিয়া সমুদয় ভারতবাসীই ঐরূপ হীনচরিত্রের বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদের অনুমান ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কুৎসা একবার আরম্ভ হইলে আর রক্ষা নাই। উহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে।

হিন্দুর সাকার উপাসনার মর্ম্ম বিদেশী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বুঝিতে অক্ষম। ঐ উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা তাহা হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ব্যাসদেবের শ্লোক হইতে সার গুরুদাস প্রমাণ করিয়াছেন।

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্।
স্তুত্যাহনির্ব্বচনীয়তাখিল গুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥"

"রূপ নাহি আছে তব, তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি, স্বরূপ তোমার।
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আছ সমভাবে।
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে।
করেছি এ তিন দোষ, আমি মূঢ় মতি,
ক্ষমা কর জগদীশ অখিলের পতি।"

মহিম্ন স্তোত্রের আর একটি শ্লোক হইতে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের উদার ও অসাম্প্রদায়িকভাব সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব এইরূপ ভিন্ন ভিন্নমত আছে যাহার যে মত তিনি সেই মতের প্রাধান্য লইয়া থাকুন মানুষের রুচি ভিন্ন এবং পথও ভিন্ন; কিন্তু নদী সকল যেরূপ এক সমুদ্রের উদ্দেশে মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ এক ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্ম সংকীর্ণ ও অনুদার, বিদেশীয়দের এই কল্পনাপ্রসূত উক্তি, উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে।

সার গুরুদাসের "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার পরিপক্ক বুদ্ধি, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। ঐ গ্রন্থে তাঁহার চিত্তের উদারতা ও স্বাধীনতা উভয়ই লক্ষিত হয়। তিনি উহাতে আমাদের শিক্ষা দীক্ষা বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, রাজা প্রজার সম্বন্ধ, হিন্দু মুসলমান মিলন প্রভৃতি বর্ত্তমান সমস্যাগুলিই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ঐ আলোচনায় একদেশদর্শী হন নাই। ঐ সকল বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি ধীরভাবে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপতির ন্যায় বিচার করিয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিতর্ক সমূহ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এবং হিন্দুর পক্ষে

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা করণীয় তাহাও অবধারণ করিয়া গিয়াছেন।

সার গুরুদাস যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কদাচ ভীত বা পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি শুধু বাক্যে স্বদেশী ছিলেন না, কার্য্যেও স্বদেশী ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়, আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হয়। সার গুরুদাস ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থার মূলে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন যে কার্য্যের ভার লইতেন, সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া সেই কার্য্য করিতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সৃষ্টিসাধনে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি কেবল নিয়মিতভাবে জাতীয় পরিষদে চাঁদা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই অধিকন্তু তাঁহার কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তাঁহার এক পৌত্রকে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং উহাতে জজের উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে শিক্ষকের কাষ্ঠাসন গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে ঐ কার্য্যে একদিবসের জন্য অনুপস্থিত বা অমনোযোগী দেখা যায় নাই। এ সম্বন্ধে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, "এই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি (সার গুরুদাস) বলিতেন আমাদের বালক ও যুবকদিগকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দিব। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই এবং কাহারও বাধা মানিতে আমরা বাধ্য নহি। চর্ম্মাবৃত শরীরে যেমন বর্ষা প্রবেশ করিতে পারে না, সার গুরুদাস কর্ত্তৃক অভিগুপ্ত শিক্ষাপরিষদকেও সেইরূপ আমলাতন্ত্রের তীব্র বাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার স্মরণ আছে একবার রাজপুরুষেরা কৈফিয়ৎ চাহিলেন যে, ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে এইরূপ প্রশ্ন কেন করা হইল যে, আকবরের সময়ে প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান অর্থসচিব কে কে ছিলেন এবং বর্ত্তমান আমলেই বা কে কে আছেন। ইহার উত্তরে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে মোগল বাদশাহের আমলে এই সকল দায়িত্বের পদে হিন্দু কর্ম্মচারী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু এ আমলে তাহার বিপরীত। এই কৈফিয়তের সার গুরুদাস যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রশ্নকারীর নিশ্চয়ই চক্ষু স্থির হইয়াছিল।"

সার গুরুদাস বাঙ্গালার ছাত্রবৃন্দের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং পুত্রের ন্যায় স্নেহে তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। তাঁহার সংসর্গে ছাত্রেরা নানারূপে উপকৃত হইত। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী "কবি সম্মিলনী"র সম্পাদকরূপে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"...তাঁহার চরিত্রের একটি মোহিনী শক্তি অনুভব করিতাম যে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তাঁহার নিকট গিয়া হাজির হইতাম, সততই সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই সস্নেহ সম্ভাষণ, কখনও এতটুকু বিরক্তি, অসৌজন্য, অনাদরের ভাব সেই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করি নাই। কত সময় কত বড় বড় লোক তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, কত বড় বড় জটিল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে নিমগ্ন দেখিয়াছি কিন্তু আমার মত সামান্য একজন ছাত্রকেও কখনও বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে, আলোচনার মধ্যে সামান্য অংশ দিতে ভুলেন নাই।"

সার গুরুদাস ছাত্রদিগকে এত ভাল বাসিলেও তাহারা যখন কোন অন্যায় কার্য্য করিত বা কোন অসংযমের পরিচয় দিত তাহা তিনি কদাচ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাদের মন ও জীবনযাত্রার প্রণালী ক্রমশঃ পাশ্চাত্যভাবে গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে দেখিয়া তিনি আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতেন এবং কিসে তাহাদের মঙ্গল হয় এই চিন্তায় দিবানিশি বিভোর থাকিতেন।

মাতা যেরূপ রুগ্ন পুত্রকে সুস্থ করিবার জন্য তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে বাধ্য হন, তদ্রূপ সার গুরুদাসও মিষ্ট ভর্ৎসনায় তাহাদিগকে সতত সংশোধনের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি গীতার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে বলিতেন, "তুমি নিজে সংযত হও, ধীর হও, শান্ত হও, তাহা হইলে কাহাকেও তোমার জয় করিতে হইবে না।" এ

কথা তিনি বলিতেন যে দোষ মানিয়া সংশোধন করা গৌরবের কাজ, স্বেচ্ছাচারিতার অর্থ স্বাধীনতা নহে। সুশিক্ষার ফল স্বার্থ।

পূর্ব্বে, গুরু শিষ্যের মধ্যে স্নেহ ও ভক্তির বন্ধন ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা এক্ষণে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পিতামাতার কথার অবাধ্য হওয়া আজকাল ছেলেদের মধ্যে সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে। তিনি এজন্য গভীর বেদনা অনুভব করিতেন এবং বাক্যে ও আচরণে তাহাদের পথ প্রদর্শক হইতেন।

আমাদের দেশে যে সকল রাজপ্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষ শাসনের জন্য আগমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী ও অক্লান্তকর্ম্মী-শাসক অল্পই দৃষ্ট হয়। লর্ড কার্জ্জনের তেজ ও গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না। লর্ড কার্জ্জনের সহিত সার গুরুদাসের একাধিকবার সংঘর্ষ হয়। প্রতিবারই লর্ড কার্জ্জন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই নিরীহ ব্রাহ্মণকে পদমর্য্যাদার মোহ বা স্বার্থ সিদ্ধির লোভ কখনও কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

একদিন এক সভায় লর্ড কার্জ্জন ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর নিন্দাবাদ করেন। ঐ সভায় সার গুরুদাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লর্ড কার্জ্জনের উক্তির যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে উহার অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং প্রাচীন ভারতে এই চিকিৎসার যে অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল তাহাও প্রমাণ করেন।

ভারত সম্রাট এডওয়ার্ডের উৎসবে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে সার গুরুদাসকে বিলাতে পাঠাইবার চেষ্টা করেন। হিন্দু গুরুদাস তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, "নায়ক" পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;—"তাঁহার নির্ভীক উক্তি এমন কোমলে কঠোরে, মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যে, বিনয়ে স্বপ্রতিষ্ঠায় এমন সমস্ত সম্মেলন মানব চরিত্রে দেখি নাই।"

লর্ড কার্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি পরিষদ গঠন করেন। সার গুরুদাস তাহার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি অন্যান্য সদস্যগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি আমাদের দরিদ্র দেশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ মত স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেন। সহযোগীদের বা কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি তাঁহার স্বাধীন আত্মমত বিসর্জ্জন দিবেন এইরূপ দুর্ব্বলতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলাররূপে কার্য্য করিবার সময় ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত একবার তাঁহার মতানৈক্য হয়। উহার ফলে, তেজস্বী সার গুরুদাস পদত্যাগ করেন। অনেক অনুনয় বিনয়, সাধ্য সাধনায় তিনি আর ঐ পদ লইতে সম্মত হন নাই।

সদাচারশীল ব্রাহ্মণের ন্যায়, তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, গঙ্গা জল পান, নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিকের কোন ব্যতিক্রম করিতেন না। স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর বিধি নিষেধ তিনি মান্য করিয়া চলিতেন। সার গুরুদাসের ন্যায় ঐরূপ উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আচরণ তাঁহার সমকালবর্ত্তী শিক্ষিত সমাজে এক অভিনব ব্যাপার। তাঁহার স্বধর্ম্মে এই নিষ্ঠা দেখিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক কেবল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রের এই নির্ভীক-তায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক অবনত করিয়াছিল। বিশ্ববিদিত ও বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে সার গুরু-দাসকে তাঁহার কল্পিত স্বদেশী সমাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ভাবাবেগে উচ্ছ্ব-সিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু সমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী, একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ, যাহাকে দেশের লোক যেমন শ্রদ্ধা করে, বিদেশী রাজ-পুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, যিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন অথচ যিনি আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই, নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত, নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধ সমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মানীয় কর্ম্মভার সমাধা করিয়া ঐশ্বর্য্যবান অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন, সেই স্বদেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই ধন

সম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি আমি এইখানে উল্লেখ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনা অপেক্ষাও আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিয়াছি। বুঝিতে পারিবেন নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার মতামত আচার বিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহিনা। আমার সমস্ত দেশের অভাব দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া, নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।"

সার গুরুদাসের চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় নির্ভীকতা দেখিয়া ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে বিরত হন নাই।

ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন তাঁহার পুত্র বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উকীল হইয়াও তাঁহার আদালতে কোন মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

ইহাকে কেহ কেহ তাঁহার হৃদয়দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাতে মনে হয় যে তাঁহারা নির্ভীক তেজস্বী সার গুরুদাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বিচারপতিরূপে সার গুরুদাস তাঁহার পুত্র বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উকীলস্বরূপে কার্য্য করিলে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন না; কিম্বা অন্য কোন উকীল অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ দিতেন না। কিন্তু তিনি মানবচরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, জনসাধারণ সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিচারপতির কোন আত্মীয়কে উকীল নিযুক্ত করিলে সুফললাভের অধিক সম্ভাবনা বলিয়া স্থির করে এবং তাহাকে শুধু ঐ কারণেই উকীল নিযুক্ত করিয়া থাকে। বিচারপতির পুত্র বা আত্মীয় বলিয়াই মোকর্দ্দমা প্রাপ্ত হইবে কর্ত্তব্যপরায়ন সার গুরুদাস এইরূপ লোভের বশবর্ত্তী ছিলেন না, তাঁহার উল্লিখিতরূপ নিষেধের ইহাই মুখ্য কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একবার তাঁহার এক পুত্র আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, সার গুরুদাসের মনে হয়, সুবর্ণপদক লাভ করিবার উপযুক্ত সংখ্যা পান নাই। সিণ্ডিকেট অনুমোদন করিলেও সার গুরুদাস ঐ পুরস্কার দিবার পক্ষে বিরোধী হইয়াছিলেন। স্নেহে কোমল হইলেও তিনি কর্ত্তব্যে দৃঢ় ছিলেন। ঐরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে কেহ তেজস্বী বা নির্ভীক হইতে পারে না।

বাহ্যাড়ম্বর, আত্মাভিমান ও ভোগবিলাস তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। পরলোকগত সার আশুতোষ চৌধুরী ভবানীপুর 'সাহিত্য সমিতি"র এক বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে সার গুরুদাস সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। একবার তিনি কাশী যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া দেখেন যে সার গুরুদাসও ঐ ট্রেণে কাশী যাইবেন। উভয়েই আনন্দিত হইলেন। সার আশুতোষের লোকজন, লটবহরের অন্ত নাই, ভারে ভারে স্তূপীকৃত জিনিষপত্র আসিতেছে, অথচ সার গুরুদাস একাকী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, "লোকজন, জিনিষপত্রের কোন হাঙ্গামাই নাই। সবিস্ময়ে সার আশুতোষ সার গুরুদাসকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলেন যে সার গুরুদাসের হস্তস্থিত একখানি গামছায় তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাঁধা আছে। সার গুরুদাস সহাস্যে সেই ছোট পুটুলিটি সার আশুতোষকে দেখাইলেন। সার আশুতোষ ইহাতে লজ্জা বোধ করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে আমরা কি নির্ব্বোধ, লোকচক্ষে বড়লোক সাজিবার ইচ্ছায় আমরা ইচ্ছা করিয়াই জীবনটাকে জটিল ও দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলি।

সার গুরুদাস বাড়ীতে খড়ম পায় দিয়া চলিতেন এবং কোচার খুঁট গায় দিয়া বসিতেন। অন্যলোকে কি ভাবিবে বা কি বলিবে সেদিকে তাঁহার চিন্তার অবসর ছিল না। নির্ভয় চিত্তে তিনি আপনার মতে চলিতে পারিতেন। এ যুগে এইরূপ মানসিক বলসম্পন্ন পুরুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

সার গুরুদাসের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর পূজা করিয়া আসিবার কাহিনী বাঙ্গালাদেশে এতই সুপ্রচলিত হইয়া আছে যে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেও

সার গুরুদাসের অমায়িকতার সহিত কর্ত্তব্যানুরাগ ও চিত্তের দৃঢ়তার একত্র সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়।

সার গুরুদাসের বৈচিত্র্যবহুল কর্ম্মজীবনে, সত্যই নিয়ামক ছিল। জীবনের শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বধর্ম্মের অনুশাসন কখনও লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহার নির্লোভ ভাব ও ভোগ লালসা শূন্যতা তাঁহার সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রবৃত্তি মার্গ পরিহার করিয়া শ্রেয়ঃ লাভের জন্য তিনি নিবৃত্তির পথ সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেন। কর্ত্তব্যে অবিচলিত, সংকল্পে দৃঢ়; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সার গুরুদাস চিত্ত সংযমে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে পার্থিব ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ও আকাঙ্খার অতীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গীতা ছিল সার গুরুদাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ। সার গুরুদাস ইহার অমূল্য উপদেশ অনুসারে আত্মচরিত্র গঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার, নিত্যশুদ্ধ স্বভাব, সংযমী, শুভাশুভে নির্ব্বিকার, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মফলাকাঙ্খা ও আসক্তি বিরহিত, সর্ব্বভূতহিতেরত মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পিত মহাত্মা এ জগতে দুর্লভ। এ জগত পান্থশালা, জীবন অনিত্য, মরণ ধ্রুব এই নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার হইয়াছিল। ভগবান জীবকে কর্ম্ম করিতে সংসারে পাঠাইয়াছেন, উহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা, সার গুরুদাস একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেন। ঐরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে মৃত্যু অদূরবর্ত্তী তখন প্রকৃত হিন্দু ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নারিকেলডাঙ্গাস্থ বাসভবন হইতে তাঁহার গঙ্গা তীরবর্ত্তী বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং শেষের সে দিনের জন্য নির্ভয়ে ও শান্তভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সাংসারিক চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মকথা, তত্ত্ব কথা ও পরলোকের কথার আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। তৎকালে তাঁহার ব্যাধি জনিত ক্লেশ তাঁহার শরীরকে যত ক্লিষ্ট করিতে লাগিল, তাঁহার মানসিক বল সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও তিনি পুত্রদিগকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এবং অবলীলাক্রমে তাঁহার শ্রাদ্ধে তাঁহার গৃহস্থিত কোন বিল্ব বৃক্ষ হইতে যূপকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেও যখন তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবং স্বহস্তে লিপিবার শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল, তখনও তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদ্বারা ইংরাজী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভাপতি মহাশয়ের পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ভাষা ও ভাবে সে পত্র অতুলনীয়। সে পত্র দেখিলে কে মনে করিতে পারে যে পত্রলেখকের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে? মনের শক্তি সার গুরুদাসের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

জীবনে সার গুরুদাসের যে নির্ভীকতা ছিল, মরণেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। মৃত্যুর করাল ছায়া ভগবৎ পরায়ণ সার গুরুদাসের হৃদয়ে কোনরূপ বিভীষিকা বা আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে নাই। মৃত্যুর শেষ দিবস পর্য্যন্তও চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধু বান্ধবগণ আসিলে সার গুরুদাস হাস্যমুখে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। উপনয়নের দিন হইতে তিনি যে ব্রাহ্মণের আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই কঠোর আচরণের তিলমাত্র পরিহার করেন নাই। ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হইয়াও সার গুরুদাসের ন্যায় আদর্শ হিন্দু, আদর্শ ব্রাহ্মণ আর একটিও মিলিবে কি না সন্দেহ!

তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় সুবিখ্যাত ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সে এক অপূর্ব্ব মহান্ স্বর্গীয় দৃশ্য! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সার গুরুদাস বলিলেন, "গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাও।" গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল। পূণ্যতোয়া প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথীর লহরী লীলা দেখিতে দেখিতে সার গুরুদাসের আনন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং কি এক স্বর্গীয় ভাবে সার গুরুদাস বিভোর হইয়া উঠিলেন। ক্লান্ত শিশু যেরূপ জননীর ক্রোড় দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সার গুরুদাসের মুখচ্ছবিতে সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। জীবনে সার গুরুদাস যেরূপ মহীয়ান ছিলেন, মৃত্যুতেও মহিমার ভাস্বর জ্যোতিঃ তাঁহাকে অমরত্বের পথে লইয়া গেল।

১৯১৮ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে মহাপুরুষ সার গুরুদাসের নশ্বর দেহের অবসান হয়।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেলা ৪ টার সময় হিমাংশুকে যখন চন্দ্রজানির ডাক বাংলোয় নামাইয়া দিয়া ডুলিবাহকরা পরদিন সকালে আসিয়া মহকুমার সদরে লইয়া যাইবে বলিয়া গ্রামে চলিয়া গেল, তখন স্থানটা মনুষ্য কোলাহল মুখরিত, বিস্তর নরনারীর যাতায়াতে সরগরম, যেন সেখানে একটা ছোট খাটো উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, রণোছোপার জমিদার সপরিবারে আজ দুই দিন ডাকবাংলোর একাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিশেষ জরুরী কাজে তিনি এই জমিদারী পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, নতুবা এই লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত ঘন জঙ্গলমধ্যস্থ ডাক বাংলোয় কচিৎ কখনও কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর শুভাগমন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা বিরল। জমিদার মুসলমান, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সদালাপী। তাঁহার সদালাপ ও সৌজন্যে হিমাংশু পরম প্রীতিলাভ করিল। বহু দূর দূরান্তর হইতে যাঁহারা জমিদারের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, কার্য্যান্তে একে একে তাঁহারা যান বাহন ও ভৃত্য পরিজন সমভিব্যাহারে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শাকশব্জী তরিতরকারীওয়ালা, ডিম্ব মাংসওয়ালা, ফলফুলুরিওয়ালা, দুগ্ধ মাখন ঘৃতওয়ালা আজিও তাঁহাকে মাল যোগান দিতে আসিয়াছিল,—কেহ ছয় ক্রোশ সাত ক্রোশ দূর হইতে, কেহবা আরও দূর হইতে। আজ তাহারা হতাশ মনে ফিরিয়া যাইতেছে, কারণ তিনি আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থান ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার যান বাহন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

প্রত্যুষ হইতে প্রায় সারাদিন ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ডুলি চাপিয়া আসিতে হিমাংশুর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাই সে এই নরকোলাহলময় ডাকবাংলোয় পৌছিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সে পূর্ব্বেই চন্দ্রজানির বাংলোর নাম জানিত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইবে বলিয়া শুনিয়াছিল। এ পথে সে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, সুতরাং ডাকবাংলোর নাম শুনিয়া সে স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, জঙ্গলের মধ্য হইতে সেটা নিশ্চিতই একটা মস্ত বড় আশ্রয়স্থল। রাত্রিকালে ডুলি চাপিয়া জঙ্গল পার হওয়ার অভিজ্ঞতা পূর্ব্বযাত্রাকালে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিল, কাজেই এই ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প সে আগেই করিয়া রাখিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে যেদিন গভীর রাত্রিতে পার্ব্বত্য জঙ্গলের নদী তটে ডুলিবাহকরা তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং যেদিন সে জঙ্গলের মধ্যে আলোকরশ্মি লক্ষ্য করিয়া লোকালয়ের সন্ধানে সাগ্রহে সঙ্কীর্ণ জঙ্গলপথ ধরিয়া আলোকের দিকে চলিয়াছিল, সেদিনকার অভিজ্ঞতা ত সে ভুলে নাই, উহা জীবনে ভুলিবার নহে। অরণ্যে মহুয়া ও শালবনের ঘন সন্নিবিষ্ট কুঞ্জ মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কৃত, আর সেইখানে সাঁওতাল কোল কাঠুরিয়াদের দুই চারি খানি পর্ণকুটীর—উহাই সদর্পে গ্রাম নাম বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই মধ্যে একখানি কুটীরে বাহকরা আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিয়া গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল! সে কুটীরের উপরে জীর্ণ পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিয়া চন্দ্ররশ্মি ঘরখানিকে আলোকিত করিয়াছিল, আর তাহার তিনদিক অনাবৃত, বাঙ্গলার একচালা ঘরেরই মত সেই ঘরখানি। হিমাংশু এই অতি দরিদ্র দিন মজুর ডুলিবাহকদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটায় নাই। সে তখন কেবল ভাবিতেছিল, প্রায় অনাচ্ছাদিত এই জীর্ণ কুটীরের ধূলি মলিন মেজের উপর কোন আবরণ

না দিয়া তাহারা কি পরম সুখেই নিদ্রা যাইতেছে। আর তাহার মত যাহারা ধনমদ ও সভ্যতার বড়াই করে, তাহাদের নয়নে নিদ্রা নাই! ইহারা দগ্ধোদর পূর্ণ করে কি সামান্ত উপকরণ দিয়া? আর তাহার মত যাহারা রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় উপভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের বারোমাসই অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লশূল লাগিয়াই আছে। নিস্তিয় ওজনে বিধাতার বিচার বটে! নিদ্রাভঙ্গের পর বাহকরা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল যে রাত্রিকালে যখন নদী পার হওয়ার উপায় নাই, আর পথের ধূলার উপরও যখন তাহাদের শয়নের সুবিধা নাই, তখন 'গ্রামের' পরিচিত আত্মীয়দের আশ্রয়ে গিয়া নিশাযাপন করা ছাড়া তাহাদের আর কি উপায় ছিল? হিমাংশু এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সে যে রাত্রিকালে নরযানযোগে কোথাও যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না, ইহা জানা কথা। তাই সে অপরাহ্নকালে চণ্ডজানির ডাকবাংলোয় নামিয়া ডুলিবাহকদের বিদায় করিয়া দিয়াছিল। তাহারই ঘণ্টা খানেক পরে লোক লস্কর লইয়া জমিদার বাবু ডাকবাংলো ত্যাগ করিয়া গেলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার অব্যবহৃত ফল ও ডিম্ব প্রভৃতি কিছু খাদ্য দ্রব্য হিমাংশুকে ব্যবহার করিবার জন্ম অনুরোধ করিয়া গেলেন আর বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে ঘরের দ্বার গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেলেন। কেবল মশকের উৎপাত নহে, বন্য হিংস্র জন্তুও নাকি মাঝে মাঝে দেখা দিয়া থাকে।

তখনও দিনমণির কিরণে জগৎ হাসিতেছে। হিমাংশু ভয়ের কথা শুনিয়া হাসিল। হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দার আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ডাক বাংলোর খানসামা বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিকালে বাবু কি আহার করিবেন, গ্রামান্তরে তাহার আত্মীয় গৃহে একটি উৎসবের নিমন্ত্রণে সে যাইবে, তন্মধ্যে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিমাংশু বলিল, প্রয়োজন নাই, কাল যা হয় হইবে। তাহার সঙ্গে প্রচুর আহার্য্য ও ফল মিষ্টান্ন ছিল।

ক্রমে দিনের আলোক নিভিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, আর মশক কুলের ব্যাণ্ড বাদ্য আরম্ভ হইল। হিমাংশু সে জন্ম প্রস্তুত ছিল, সে কতকগুলি মশক নাশা ধূপ জ্বালিয়া দিল। তখন ডাক বাংলো জনমানব শূন্য। এই যে ক্ষণপূর্ব্বে স্থানটি মানুষের হাঁক ডাকে ও হাস্য কোলাহলে মুখরিত ছিল, তখন যেন তাহা যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে জনমানবহীন ভীষণ কান্তারে পরিণত হইল। হিমাংশুর মনে হইল যেন, বিজয়া দশমীর দিনে বাঙ্গালীর চণ্ডী মণ্ডপের মত ডাক বাংলোখানা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সেখানে এক দণ্ড মন তিষ্ঠিয়া থাকিতে চাহিল না। মানুষ এমনই সমাজ বদ্ধ জীব বটে! হিমাংশু ক্রোধ ও অভিমানভরে মানুষের সমাজ ছাড়িয়া এই অরণ্যের জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই এই নিঃসঙ্গ জীবন ত আর ভাল লাগে না। মনুষ্য সমাজের সঙ্গ—আত্মীয় স্বজনের স্নেহ যত্ন—এ সবের ত অভাব ছিলই, আর তাহার মধ্যে একটা বড় অভাব মাথা খাড়া করিয়া দেখা দিয়াছিল। রহিয়া রহিয়া সেই অভাবের তাড়নায় সে কখনও কখনও উন্মত্তের মত অস্থির হইয়া বহুক্ষণ পাদচারনা করিয়া বেড়াইত। তাহার মনে হইল, যেন সে জীবনের একটা মস্ত বড় অমৃতের আস্বাদ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে—সে অভাব পূর্ণ করিবার এ জগতে কেহ নাই!

হিমাংশু বিকলচিত্ত মানুষের মত বারান্দায় পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মানসপটে ক্রোধশ্লেষ স্ফুরিতাধর একখানি সুন্দর মুখের চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। মানুষ রত্ন অন্বেষণ করে, রত্ন মানুষের খোঁজ করে না। অহঙ্কারে সে রত্ন পাইয়াও অনাদর করিয়াছে, এখন অনুশোচনায় ফল কি?

রত্ন লাভ করিয়াছে? সত্যই কি? তাহা হইলে তাহার পিতার সনির্ব্বন্ধ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হইল কেন?—তাহার কাণের ভিতর এখনও ত সেই সদম্ভ প্রত্যাখ্যানের সুর অহরহ ঝঙ্কৃত হইতেছে।

তবুও—পরে? সেত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে—মাঝে মাঝে গভীর নৈরাশ্যের

অন্ধকারে ক্ষীণ আলোকের মত সেই তাহাকে পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু—কিন্তু—

হঠাৎ খানসামার গম্ভীর কর্কশ আওয়াজে তাহার মোহ ভঙ্গ হইল, সে অতিমাত্র চমকিত হইয়া উঠিল। কখন খানসামা আসিয়া ঘরে ও বারান্দায় আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। খানসামা তাহার কাছে এই রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিতেছিল, তাহার এক হস্তে একটি হারিকেন লণ্ঠন, অন্য হস্তে দীর্ঘাকার পাকা বাঁশের লাঠি। সে গ্রামান্তরে যাইবে, তবে কোন ভয় নাই, চৌকিদার রাত্রিকালে হাক দিয়া যাইবে, আর তাহার যাত্রাকালে সে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের কৃষ্ণ আহিরকে আজ রাত্রির জন্য ডাক বাংলোয় আসিয়া শয়ন করিতে বলিয়া যাইবে। হুজুর তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ বকসিস দিলেই হইবে।

যতক্ষণ গাছপালার আড়াল হইতে পথচারী খানসামার লণ্ঠনের আলোক রশ্মি দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ হিমাংশুর মনে হইল সে লোকালয়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছে—তখনও তাহার কাছে একজন জীবন্ত মানুষ বিরাজ করিতেছে, নড়িতেছে, চড়িতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আলোক রশ্মি অদৃশ্য হইয়া যাইবামাত্র সে সান্ত্বনাটুকুও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। তখন সেই গভীর অরণ্য মধ্যে সে একা।

এমন একাকী অসহায় অবস্থায় সে যে কখনও অবস্থান করে নাই তাহা নহে। এই কয়েক দিন পূর্ব্বে বাহকরা যখন তাহাকে পার্ব্বত্য নদীতটে গভীর জঙ্গলে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখনও সে ছিল একা। তখনও তাহার দুর্জ্জয় সাহসী মন, অনিশ্চিত বিপৎপাতের আশঙ্কায় দমিত হয় নাই। কিন্তু আজ কি জানি কেন একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার মন ঈষৎ চঞ্চল হইল। একবার সে আপন মনে হাসিল। গভীর জঙ্গলে গভীর রাত্রিতে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিতে তাহার ভয় হয় নাই, আর আজ সে সুরক্ষিত ডাক বাংলোর আশ্রয়ে রহিয়াছে, তবুও কেন সে বিচলিত হয়? একটা কথা তাহার অনুক্ষণ মনে পড়িতেছিল। পূর্ব্বে পাটনায় এক সভায় এক দল লোক তাহাকে অপমানিত করিয়াছিল এবং সে তাহাদের সভা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে, তাহারা তাহার রক্তদর্শন করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। সে দলের কর্ত্তা বাঁকীপুরের এক নামজাদা গুণ্ডা। কিন্তু সে ত বহুকাল পূর্ব্বের কথা, আর রাঁচী হইতে বাঁকীপুরও ত বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং এখানে ভয়ের কারণ কি থাকিতে পারে? এই ভাবিয়াই সে হাসিয়াছিল।

এই ক্ষণপূর্ব্বে শৃগালে রজনীর প্রথম যাম ঘোষণা করিয়া গেল, রাত্রিত অধিক হয় নাই। কিন্তু কি অসম্ভব নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি, কেবল ঝিল্লীরবের সঙ্গে ভেকের মকমকানী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আর বৃক্ষপত্রের সর সর আওয়াজের সহিত দূর হইতে গ্রাম্য কুকুরের কর্কশ ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এমন নির্জ্জন নিঃসঙ্গ অবস্থা ত সেদিন ঘন জঙ্গল বেষ্টিত পার্ব্বত্য নদীতটের মুক্ত প্রান্তরেও অনুভূত হয় নাই!

চিন্তা ভারগ্রস্ত হিমাংশুর নয়নে নিদ্রা নাই। ইহারই মধ্যে সে শয্যাসঙ্গ উপভোগ করিবে কিরূপে? এ পর্য্যন্ত তাহার সে অভ্যাসই নাই, তাহার উপর চিন্তা! উঠিয়া সে বারাণ্ডায় অনবরত পাদচারনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার অতি সামান্য অংশই সে উপভোগ করিতেছে, অবশিষ্টাংশ আপনিই ছাই হইয়া যাইতেছে,—সেদিকে তাহার মনই নাই। এই অবস্থায় সে কতক্ষণ অবস্থান করিয়াছে তাহা জানিতেও পারে নাই। চিন্তা—চিন্তা—কেবলই চিন্তা! সে চিন্তায় দুঃখের অংশ অধিক থাকিলেও যেটুকু সুখের অংশ ছিল, তাহা তাহার বুভুক্ষু মনকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা দান করিতেছিল, মাঝে মাঝে তাহার গভীর চিন্তারেখাঙ্কিত গম্ভীর আনন মধুর হাস্যে সমুজ্জল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মানসী প্রতিমা, দূর হইতে সে এতদিন অন্তরের সমস্ত ভালবাসার নির্ম্মাল্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই তাহার তৃপ্তি, তাহাতেই তাহার আনন্দ। কেহ না জানিল তাহার অন্তরের অন্তরতম গোপনীয় কথা, তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আজ যদি এই নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভয়াবহ বনানীবেষ্টিত স্থানে তাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কেহ তাহার মনের কথা জানিতে পারিবে না,—এমন কথ

কবর

জীবনালোকই ত অজ্ঞাতে নিভিয়া যায়, সে দেহাবসান কেহ লক্ষ্য করে না, কেহ সেজন্য অভাব অনুভব করে না। কেহ হাহুতাস করে না। জগতে নিত্য এমন মরণ ত কতই ঘটিতেছে।

সত্যই কি তাহার অভাব কেহ অনুভব করিবে না? তাহার প্রেমময় পিতা? যিনি তাহাদের জন্য কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? ছি ছি অকৃতজ্ঞ সে, কেমন করিয়া তাহার মনে এ চিন্তা স্থান পাইল? আর রেখা? সে ত দাদা বলিতে অজ্ঞান। অন্যে যে যাহা বলে বলুক, দাদা তার এ জগতে সর্ব্বগুণের আদর্শ! নীহার ও সনৎ— কে তাহাদের মত তাহার মঙ্গলাকাজ্ঞী? আপনার বলিবার তাহার ত মানুষের অভাব নাই। আর—আর—না থাক—বৃথা মরীচিকার পশ্চাতে অন্ধ মৃগের মত ঘুরিয়া লাভ কি?

হঠাৎ অস্পষ্ট চন্দ্রালোক অদূরে বনানীর অন্তরাল হইতে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়াপাত হইল। হিমাংশু বিস্মিত হইয়া বলিল, কে? ছায়া মিলাইয়া গেল। হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া হিমাংশু দেখিল, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর! উঃ সে ত কিছুই জানিতে পারে নাই। এই গভীর রজনীতে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়াপাত,—এই বিজন জনবিরল স্থানে, আশ্চর্য্যের কথা বটে। বারান্দা হইতে নামিয়া গিয়া সে চন্দ্রালোক মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে ওখানে?" কেহ উত্তর দিল না। হয় ত দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু—

হিমাংশু ডাক বাংলোর মুক্ত প্রাঙ্গনে অবতরণান্তে কিছুদূর অগ্রসর হইল। ঠিক সেই সময়ে আবার শৃগাল রজনীর দ্বিতীয় যাম ঘোষণা করিল। ক্ষণপরেই অদূরে গ্রাম্য চৌকীদারের উচ্চ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিল। হয় ত সে-ই হাঁক দিয়া চলিয়া গেল। হিমাংশু বারান্দায় উঠিয়া আসিল। একবার সে ভৃত্যপরিজনের নিশাযাপনের কক্ষের দিকটা দেখিয়া আসিল, কেহ কোথাও নাই। খানসামা যাহাদের আসিবার কথা বলিয়া গেল, তাহারা কি আসিল না?

কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া হিমাংশু শয্যায় শুইয়া পড়িল। গভীর রজনী,—আহারে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শয়নের পূর্ব্বে সে কেরোসিন ল্যাম্পের 'উইক' নামাইয়া দিয়া কক্ষ প্রায় অন্ধকার করিয়া দিল। তাহার অলক্ষ্যে কখন নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার উপর ভর করিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। কতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছে, তাহাও সে জানিতে পারে নাই।

হঠাৎ একটা শব্দে তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, তাহার মনে হইল যেন কক্ষাভ্যন্তরে মানুষের সমাগম হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিতেই সে অস্পষ্ট আলোকে দেখিল, পার্শ্বের বাথরুমের মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি! শব্দ ঐ দিক হইতেই আসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এক ঝলক শীতল বায়ু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

মাল বৈদ্যের কটাক্ষের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে অজাগর যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনই মুগ্ধচিত্তে হিমাংশু মুহূর্ত্তকাল সেই মূর্ত্তির দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল—একটির পর একটি—মনুষ্যমূর্ত্তির শ্রেণী পর পর বাথরুম দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল—তাহাদের হস্তে দীর্ঘ দণ্ড এবং মুখমণ্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত।

হিমাংশু লম্ফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতেই সেই মূর্ত্তিগুলি অতর্কিতভাবে চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল। হিমাংশুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসার প্রশ্ন উত্থিত হইতে না হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে একই সঙ্গে অগণিত আঘাত বর্ষিত হইল।

তখন হিমাংশুর নিদ্রাঘোর সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই—সেও সশস্ত্র বা প্রস্তুত ছিল না, নতুবা এমনভাবে অতর্কিত আক্রমণেও সে সহসা বিধ্বস্ত হইত না। সে অসমসাহসী ও শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু সাহস ও শক্তি এসময়ে কোন উপকারে আসিল না। প্রথম মুখে হিমাংশুর প্রতি আক্রমণে অগ্রগামী দুই তিনটা লোক ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু তাহার পর একযোগে উপর্য্যুপরি আক্রমণে সেও সশব্দে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল—তাহার আর্ত্তনাদে নৈশসমীরণ কাঁপিয়া উঠিল।

তাহার পর ডাকবাংলো নীরব—যেন অসাড়ে নিদ্রা যাইতেছে! এত বড় একটা বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল, তাহার সাক্ষ্য আকাশের চন্দ্রতারকা ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

২৩

"মরি! মরি! কি চেহারাই হয়েছে! যেন উড়ছেন ডানা মেলে!"

নীহারের অনুযোগে দীপ্তির অধরকোণে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কেন, সবাইকেই বুঝি লেডী ডক্টর মিসেস বাণী দেবীর মত মোটা হতে হবে? মাগো, চারটে বাঘে খেতে পারে না।"

নীহার শ্বশুরালয়ে যাত্রার পূর্ব্বে বন্ধুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। দীপ্তির হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, "তা মিথ্যে বলিস নি বটে। উঃ কি মোটাই হয়েছে সে! আমার আঁতুড়ে এসেছিল কদিন, তা সিঁড়ি বয়ে উঠতেই এক ঘণ্টা—হাঁপিয়েই মরে। ওর বোনটা কিন্তু অমন ধারা না ত।"

দীপ্তি বলিল, "না, তা নয়ই বটে। তুই তাকে দেখলি কবে?"

নীহার আর দুইটা পানের খিলি গালে পুরিয়া দিয়া বলিল, "তোর দাদার সঙ্গে সেদিন সিনেমা দেখিতে গিয়েছিলুম—সেদিন আমাদের ওখানে ওর নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে ওদের দু' বোনকেও দেখেছিলুম। ওর ছোট বোনটি কিন্তু দিব্বি দেখতে। ওদের দুই জোটালি কোত্থেকে বল দিকি? হিমুদাই না তোর মামাবাবুর অসুখের সময় ঐ লেডী ডাক্তারটাকে ঠিক করেছিল? ভাল কথা, হিমুদার কোন খবর জানিস?"

দীপ্তি অবনত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "না!"

নীহার বলিল, "বারে বেশ লোক ত! বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কি বললি, ভাই?"

নীহার বলিল, "বললুম তোর মাথা। চোখে খোঁচা মেরে বলছিস চোখে জল কেন? হিমুদাকে দেশত্যাগী করলে কে রে বাঁদরী? এখন বলছিস কিছু জানিস না?"

দীপ্তি অবনত মুখ কিছুতেই উত্তোলিত করিতে পারিতেছিল না, ক্ষীণতর কণ্ঠে বলিল, "আমি দেশত্যাগী করলুম? বাঃ!"

নীহার শ্লেষের স্বরে বলিল, "আহা হা নেকী খুকী, কিছু জানেন না যেন! তোরই বাক্যির ঝাঁঝে দাদা আমার দেশত্যাগী হয় নি? একথা ত সবাই জানে। ওঁরা জানেন, হিমুদার বাবা জানেন—বেশী কথায় কাজ কি—রেখার মত কচি মেয়েও জানে।"

দীপ্তি কোন জবাব না পাইয়া বলিল, "রেখা?"

নীহার বলিল, "হাঁ, রেখা। সে তোর এখান থেকে যাবার দিন তোদের দুজনের কথা কাটাকাটি সব শুনেছিল। তোরা ভেবেছিলি ও ঘুমিয়েছে, কিন্তু ও বরাবর জেগে ছিল চোখ বুজে শুয়ে। তুই ও কম নাকি?"

দীপ্তি যেন মাটীর সহিত মিশিয়া যাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি ত তাঁকে কিছু বলিনি—"

নীহার বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "না, তা বলবে কেন? বলে—সারাদিন থামে বেঁধে জুতো মেরেছে, অপমান ত করে নি!"

অন্য সময় হইলে দীপ্তির নিকটে নীহারকে এই উক্তির জন্য—কঠোর ব্যঙ্গোক্তির বাণ সহ্য করিতে হইত; কিন্তু এই দীপ্তিতে যেন কি এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সে নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

নীহার তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "রাগ করলি, ভাই? হিমুদার কথা ভাবলে রাগে আমার দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না। বাপের এক ছেলে—ওর কিসের অভাব? অভিমান করে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কোথায় কোন জঙ্গলে গিয়ে চাকরী নিয়ে রয়েছে। রাগ হয় না, এতে?"

দীপ্তি তেমনি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথাও কহিল না।

নীহার আবার বলিল, "যাবার আগে ওঁরা অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। যেতে বারণ করেছিলেন। তাতে হিমুদা কি বলেছিল জানিস? বলেছিল, আর এদেশে ফিরে আসবে না—এদেশে তাকে ধরে রাখবার কোন কিছু নেই। রেখার কথা পাড়লে বলেছিল, বাবা রয়েছেন। অথচ জানিস ত, রেখাকে হিমুদা কত ভাল বাসে?"

দীপ্তি এতক্ষণে সুযোগ পাইয়া বলিল, "এ তাঁর অন্যায় নয়? জেঠামণি বুড়ো হয়েছেন, তিনি আর কদিন? এত রাগ কিসের জন্যে?"

নীহার পরুষ কণ্ঠে বলিল, "কিসের জন্যে তা কি তুমি জান না? দেখ, মনের অগোচর পাপ নেই। সত্যি করে বল্ দিকি, তাকে ভালবাসিস কি না?"

হঠাৎ এক ঝলক রক্তস্রোত দীপ্তির মুখখানিকে আরক্তিম করিয়া দিল, সে নত মুখ আরও নত করিয়া একেবারে লুকাইয়া ফেলিল। নীহার আরও আঘাত দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "তুই যতই তেজ দেখা না, ও কথা কিছুতেই আমার কাছে লুকুতে পারবি নি—আমি তোর নাড়ী নক্ষত্র সব জানি। তাকে যদি ভাল না বাসিস তা হলে রেখাকে বুকে করে রেখেছিলি কেন—আর রেখাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলে তাকে যা নয় তাই বলেছিলি কেন? তার জন্যে যদি ভেবে না মরবি—তা হলে এমন মড়ার আকার হবে কেন? তোর তেজই হয়েছে কাল!"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে অশ্রুবিন্দু নয়নপল্লবে মুক্তাবিন্দুর মত ঝল ঝল করিতেছিল, বড় বড় ফোঁটার পর ফোঁটার আকারে তাহা নামিয়া আসিল। নীহার সস্নেহে দীপ্তির মাথাটা তাহার বুকে টানিয়া লইল, দীপ্তি নীহারের বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল।

নীহার সস্নেহে তাহার কালো মেঘের মত কেশরাশির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ঐটুকুই ত আমাদের সুখ, ও ত কান্না নয় ভাই। দেখ, অনেক দিন আগে তোকে একটা কথা বলেছিলুম, তখন তুই সে কথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছিলি মনে আছে?"

শিশিরসিক্ত কমলদলতুল্য মুখখানি তুলিয়া দীপ্তি ধরা গলায় বলিল, "কি?"

নীহার বলিল, "পরশপাতর, লোহাকেও যা ছোঁয়ালে সোনা হয়। আমরা যতই তেজে মট মট করি না, আমাদের সে তেজ সে আব্দার সে রাগ সে অভিমান খাটে কেবল একজনের কাছে, আর কারু কাছে নয়। অধিকার নিয়ে আমরা যতই চুলচেরাচিরি করি না, একজনের মুখ চেয়ে না থাকলে—একজনের উপর আমাদের সবটা বিলিয়ে দিয়ে নির্ভর না করলে—আমরা বাঁচতে পারি না। তোর ভিতর যতদর্প যত তেজই থাকুক, তা সেই পরশপাতর ছুঁয়ে খসে গিয়েছে। তবে মিথ্যে অভিমানের মড়াটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছিস কেন? নিজের সুখের পথে—যাকে ভালবাসিস তার সুখের পথে, ইচ্ছে করে কাঁটা দিচ্ছিস কেন?"

দীপ্তি অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি করলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?"

নীহার হাসিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কিছু করতে হবে না, আগুন চিবুতেও হবে না, জলে ঝাঁপ দিতেও হবে না, কেবল তু বলে একটু ডাকলেই হবে, বুঝলি বাঁদরী? জানিস, দিদি তোকে কী ভালবাসে? পিসেমশাই বিয়ের জন্যে কত সম্বন্ধ এনেছেন ভাল ভাল, কিন্তু সে ত কোনটাতেই রাজী হয়নি—বলেছে বিয়ে করবে না। কত জন্ম তপস্যা করেছিলি বল দিকিনি! উঃ কেঁদে কেঁদে যে একেবারে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছি। আয়, একটু বেড়িয়ে আসি। কালীঘাটে যাবি?"

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "কালীঘাটে?"

নীহার বলিল, "হাঁ, মা কালীর মন্দিরে। আজ দয়া করে দয়াময়ী তোর চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, চল তাঁর পূজা দিয়ে আসি।"

নীহারের হাত ধরিয়া দীপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিল। মনের মধ্যে সে কি প্রার্থনা করিল তাহা তাহার অন্তর্যামীই বলিতে পারেন!

নীহারের মুখে আনন্দ ও সাফল্যের হাসি দেখা দিল; দীপ্তির মুখেও বহুদিন পরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বহুদিন পরে তাহার গুরুভারে অবসন্ন মন যেন অনেক হাল্কা হইয়া গেল।

নীহার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তার মাকে ফটকে গাড়ী হাজির রাখিতে আদেশ করিল। তাহার পর উভয়ে কালীঘাটে যাত্রা করিল।

সেদিন দীপ্তি সাশ্রুনয়নে ভক্তিনম্র মনে মায়ের চরণে অন্তরের কাতর নিবেদন জানাইয়া যে তৃপ্তিলাভ করিল, বোধ হয় জীবনে এমন অনুভূতি কখনও লাভ করে নাই। সে প্রায় বাল্যকাল হইতেই আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু আজ তাহা হইতে এক বহু উচ্চ মহান আশ্রয়দাত্রীর উপরে আপনার সুখদুঃখের চিন্তার গুরুভার অর্পণ করিয়া সে যেন অগাধ শান্তি লাভ করিল।

দেবস্থান হইতে ফিরিয়া নীহারকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া ও গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া দীপ্তি লাইব্রেরীতে একখানা বই লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে নিতাইচরণ আসিয়া সংবাদ দিল, একটি বাবু তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন, তিনি বলিতেছেন, তাঁহার খুবই জরুরী কাজ। বইখানি ইদানীং দীপ্তির নিত্য সহচর হইয়াছিল, সেখানি কম্যুনিজম সম্পর্কের বই। সুতরাং দীপ্তি একটু বিরক্ত হইল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিল, "এত রাত্রে? তাঁকে কাল সকালে আসতে বলে দাও, আজ দেখা হবে না।"

ভৃত্য তথাপি নড়ে না। দীপ্তি বিস্মিত হইল, এ বাড়ীতে তাহার মুখের একটি আদেশও অলঙ্ঘ্যনীয়। একটু রুষ্টস্বরে বলিল, "কি, শুনতে পেলে না? যাও।"

ভৃত্য মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "এজ্ঞে না, তা না দিদিমণি। বাবুরে সরকার মশাইদের ঘরে নিতে চেয়েছিলুম, তা তিনি বল্লেন, যে কথা বল্তে এসেছে, তা তোমারে ছাড়া"—

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "বলেছি ত আজ দেখা হবে না।"

নিতাই চরণ বলিল, "যাচ্ছি দিদিমনি। ভদ্রলোকটি বলছিলো, তানারা ভবানীপুরের ডাক্তার বাবুর বিল সরকার—তেনার সম্বন্ধে জরুরী খবর আছে।"

ভৃত্য চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ দীপ্তির আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হইয়া দীপ্তি অস্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিল "দাঁড়াও, তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি।"

দীপ্তি বসিবার ঘরে ত্বরিতপদে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি চান আপনি? কো'থেকে আসছেন?

দীপ্তির প্রশ্নে আগন্তুক চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল—সে মন্মথনাথ, বসিবার ঘরে সে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া দীপ্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, কোন মন্দ খবর এনেছেন আপনি?"

মন্মথনাথ অধীরভাবে বলিল, "মন্দ খবর? হয় ত এরই মধ্যে কি অঘটন ঘটে গেছে তা জানি না। ডাক্তার বাবুর কথাই বলছি—শুনেছি কল্‌কাতায় তাঁর আপনার আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই, কেবল আপনি—"

দীপ্তি একখানা চেয়ারের হাতল ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "তাঁর সম্বন্ধে কি বলছিলেন?—"

মন্মথনাথ বলিল, "তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলবার চেষ্টা—।"

দীপ্তির হাত পা কাঁপিতেছিল, সে প্রাণপণে স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, অস্বাভাবিক কঠিন স্বরে বলিল, "মেরে ফেলবার? কি বলছেন?"

মন্মথনাথ বলিল, "হাঁ মেরে ফেলবার। ঘোর শয়তানি—তিনি সরল শান্ত মানুষ—এ শয়তানির কোন খবরই রাখতেন না। শশাঙ্ক সান্ন্যাল আর লেডি ডাক্তার বাণী দেবী চক্রান্ত করে তাঁকে কারবারে নামিয়েছিল, তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নেবে বলে। গোড়ায় আমিও তাতে ছিলুম—তাঁর অনেক টাকা ভেঙেছি আমি—তবে আমার হাজার গুণ বেশী ভেঙেছে ওরা দু'জনে। মহাপাতকী আমি—তিনি আমার অনেক করেছেন, আমার কোন গুণ না থাকলেও কোন সুপারিশ না নিয়েই আমায় দয়া করে কাজে নিয়েছিলেন, বড় দয়ার শরীর তাঁর। ওরা আমায় জেলে দেবার চেষ্টা করেছিল, তিনিই দয়া করে বাঁচিয়েছিলেন, কেস করতে চান নি—"

দীপ্তি পুনরায় বাধা দিয়া বলিল, "তাঁর বিপদের কথা কি বলছিলেন? আপনি বলছেন শয়তানীতে আপনিও ছিলেন, তবে?"

মন্মথনাথ বলিল, "হাঁ বলছি—সবটা না বল্লে বুঝতে পারবেন না, তাই গোড়া থেকে বলছিলুম। শশাঙ্ক যখন দেখলে ওদের জাল জোচ্চুরী সব ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছে, তখন ঐ ধড়িবাজ শয়তান এক ফন্দী খাটিয়ে তাঁকে একবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার যোগাড় করলে। তিনি ছিলেন মজদুরদের দলের কর্ত্তা— তাঁর দলের মধ্যে বদমায়েস গুণ্ডা ঢুকিয়ে দিয়ে দল ভাঙাভাঙি করে দিলে। আর সুবিধে হয়েছে, তিনি মানভূমের কালা জঙ্গলে চাকরী নিয়ে গেছেন—"

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিল, "জানি। তার পর?"

মন্মথনাথ বলিল, "সেখানে তাঁকে রাতবিরেতে মফঃস্বলে যেতে হয়, হয় ত একলা অসহায় অবস্থায় যান—আর তিনি ভয় কা'কে বলে জানেন না—"

দীপ্তি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না, কেবল অস্ফুটস্বরে বলিল, "হুঁ।"

মন্মথনাথ আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "ওরা চক্রান্ত করেছে, উনি যখন এবার মফঃস্বলে যাবেন, তখন যারা ওঁর শত্রুর দলে দাঁড়িয়েছে তারা তাঁকে একলা পেলে এমন শিক্ষা দেবে যে, আর দলের মুড়ুলি করতে হবে না। সবাই মন্দ না, তবে কজন গুণ্ডা আছে, তাদের ঐ শয়তান শশাঙ্ক সান্ন্যাল টাকা খাইয়েছে, একটা না একটা অঙ্গহানি করে দেবে—"

একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া দীপ্তি আসনে বসিয়া পড়িল। কিন্তু মুহূর্ত্তপরে আপনিই আপনার ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া বলিল, "এসব আপনার মিথ্যে আশঙ্কা। এ মগের মুল্লুক নয়। ডাক্তারবাবু কোথায় আছেন এখন?"

মন্মথনাথ বলিল, "শুনেছি চন্দ্রজানিতে—রাঁচী থেকে পনেরো যোলো মাইল দূরে। ভাবছেন, আমি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে মিথ্যে বানিয়ে বলছি? এর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। আমার জেলে যেতে হয় যাবো, কিন্তু ডাক্তারবাবুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই করে যাবো—তাঁর মত গরীবের মা বাপ কে আছে? আপনি তাঁর বাপকে খবর দিন—আমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন না। আমি চললুম—পারি যদি তাঁর সন্ধানে রাঁচীর জঙ্গলেই চলে যাবো।"

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মন্মথ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দীপ্তি বহুক্ষণ নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত আসনে বসিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। এসব কি সত্য, না স্বপ্ন? যদি সত্য হয়?

দীপ্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের বাতাসে মাথাটা রাখিয়া দিল। নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ মৃদু আলোকসজ্জায় হাসিতেছে, তাহার উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরের বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত রাজপথে অগণিত যান বাহন ছুটাছুটি করিতেছে, মহানগরীর জীবন্ত অস্তিত্বের সাড়া পূর্ণ অনুভূত হইতেছে। কেবল সে এই মহানগরীর কোলাহল মুখরিত জনস্রোতের মধ্যে একা—তাহার প্রাণের অন্তস্থলের রুদ্ধ বেদনা জানাইবার কেহ নাই! আত্মপ্রত্যয়ী আত্মনির্ভরশীল সে, এযাবৎ তাহার অন্তরের কথা অন্তরেই রুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। তবে আজ সে নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছে কেন? আজ কাহারও কাছে অন্তরের কথা জানাইয়া মনের ভার লঘু করিবার—কাহারও উপর নির্ভর করিবার জন্য তাহার মন আকুলি বিকুলি করিতেছে কেন?

আর একজন তাহারই মত অসহায় অবস্থায় একাকী গভীর জঙ্গলে অনুক্ষণ প্রাণের আশঙ্কা মাথায় লইয়া বাস করিতেছে—সে আশঙ্কার কথা সে ত কিছুই জানে না। কে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেবে? কে এ বিপদে সহায় হইবে? যদি এই লোকের কথা সত্য হয়, যদি সত্যই তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে ইহার জন্য সে দায়ী নহে? এই সঙ্কটসঙ্কুল সন্ধিক্ষণে কে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যের কথা বলিয়া দিবে?

দীপ্তি লাইব্রেরীতে গিয়া টাইমটেব্‌ল খুলিয়া বসিল, ভৃত্যকে ডাকিয়া মামাবাবুকে পাঠাইয়া দিতে বলিল। তিনি আসিলে এই রাত্রিতে কল্যাণপুর যাইবার গাড়ী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় শেষ গাড়ী ছাড়িয়াছে, প্রভাতের পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই। কল্যাণপুর যাইতে হইলে মহকুমার সদরে মেল বা একসপ্রেস দাঁড়ায় না। দীপ্তি অধীর হইয়া সরাসরি কল্যাণপুর যাইবার জন্য একখানা ট্যাক্সী ভাড়া করিতে বলিল, ভাড়া যত চাহে ক্ষতি নাই। ট্যাক্সী না পাওয়া গেলে ঘরের সোফারকে ডাকিয়া আনাইতে হইবে, ঘরের মোটরে উপযুক্ত পরিমাণ পেট্রোল লইয়া কল্যাণপুর যাইতে হইবে।

যদুগোপালবাবু বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু একটি প্রশ্ন করিতেও সাহস করিলেন না, তিনি গৃহস্বামিনীর এইরূপ খাম-খেয়ালীতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁহাকে এই আদেশ পালন করিতে হইল না। সোফার নীহারকে তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় গৃহে ফিরিয়া যদুগোপালবাবুকে জানাইয়াছিল যে, সেই দিন চন্দ্রমাধববাবু কি একটা বিশেষ জরুরী কাজে কলিকাতায় আসিয়াছেন, সেখানে সনৎবাবুকে খুঁজিতে গিয়াছিলেন। সে আরও শুনিয়া আসিয়াছে যে, তিনি এখন কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবেন।

দীপ্তি তখনই মোটরযোগে নীহারদের বাড়ী চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

শ্রীমতী দুর্গাপুরী দেবী বি-এ, সাংখ্যতীর্থা

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

শ্রদ্ধাস্পদা সভানেত্রী মহোদয়া এবং ভগিনীগণ,

আজ আপনারা সকলে এখানে সমবেত হইয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের চরণে ভক্তি-অঞ্জলি নিবেদন করিবার যে গৌরব পাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে অভিবাদন জানাইতেছি, আর যাঁহারা তাঁহার লোকোত্তর জীবনচরিত জগৎবাসীকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে বর্ষব্যাপী আনন্দ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাঁহাদের আহ্বানে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এখানে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমি মনীষী নই, বাগ্মী নই, নূতন কিছু বাণী শুনাইবার ধৃষ্টতাও আমার নাই, কিন্তু তাঁহার পুণ্যকথা যত বেশী বলা যায়, যত বেশী শুনা যায়, ততই মধুর, ততই মঙ্গল, সেই পরমানন্দ মাধবেরই অপার করুণায় যিনি "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" তাঁহারই "শ্রবণমঙ্গল কথামৃত" কিছু নিবেদন করিব।

আজি হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে সেই অনাদি অনন্ত মহাপুরুষ নশ্বর নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জীবের কল্যাণে। সুজলা সুফলা বাংলামায়ের অখ্যাত পল্লীর এক নিভৃত কোণে দরিদ্রের কুটীরে তিনি ধরা দিয়াছিলেন। ধন্য বাংলাদেশ, ধন্য কামারপুকুর! আর ধন্য, নারীশিরোমণি শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী দেবী চন্দ্রামণি। তুমিই মা, যুগে যুগে নিজের স্তন্যসুধায়, নিজের স্নেহধারায়, নিজের পুণ্যমহিমায় জননীরূপে পুরুষোত্তমকে ধরায় লইয়া আইস। সন্তানের কল্যাণে, শক্তিরূপিণী মাতৃজাতির মহিমাকে আরও উজ্জ্বল করিতে, তোমার চরণে আমরা কোটী কোটী ভূলুণ্ঠিত প্রণতি জানাইতেছি।

তারপর, ত্রিভুবনতারিণী সুরধুনীর তীর, দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থ, ভবিষ্যতের বিশ্বমানবধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহামিলনক্ষেত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অসাধ্যসাধন করিলেন এই দক্ষিণেশ্বরে, সকল সাধনাকে আস্বাদন করিয়া সিদ্ধির গৌরব দিলেন, কিন্তু করিলেন অতি সঙ্গোপনে, নিজের দিব্যোন্মাদে যখন নিজেই পাগল হইয়া উঠিলেন, নিজের ঐশ্বর্য্যে যখন নিজেই দিশাহারা হইয়া পড়িলেন,—মৃগনাভির সৌরভে তখন দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মধুলোভে অলিকুল আসিয়া জুটিল। কেশব আসিলেন, বিজয় আসিলেন, বিবেকানন্দ আসিলেন, গৌরী মা আসিলেন, গিরিশ আসিলেন, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি ভাগ্যবান লীলাসঙ্গী-গণ একের পর এক আসিয়া মিলিত হইলেন। কত গৃহী আসিলেন, সাধক আসিলেন, কত পণ্ডিত আসিলেন, সংশয়ী আসিলেন, করুণার সাগর সকলকেই কৃপা বিতরণ করিলেন, পূর্ণানন্দের হাট জমিয়া উঠিল, কিন্তু দুদিনের জন্য, ধরা দিয়াও যেন দিলেন না, এবারকার বিচিত্র লীলা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি ভগবান স্বীকার না করিয়া সিদ্ধপুরুষ অথবা মহামানবের পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যায়, তথাপি তাঁহার জীবন-চরিত হইতে আমরা যে শিক্ষালাভ করি, তেমনটীর তুলনা কুত্রাপি মিলে না, আমরা সংক্ষেপে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের বিচার করিব।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, অগ্রজকে স্পষ্টকথায় বলিয়াছিলেন, "ও চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাই না" অথচ তিনি সকল শাস্ত্রের সার, সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব, নিজে উপলব্ধি করিয়া সকলকে

অতি অল্প কথায় সরল ভাষায় সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কথা এবং উপমা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ সংস্কার স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি সহধর্ম্মিণীকে কখনও ত্যাগ করেন নাই, সংসারও ত্যাগ করেন নাই, সংসারের মধ্যে বাস করিয়াই তিনি শিক্ষা দিয়া গেলেন,—সংযম, সাধনা এবং ব্যাকুলতা থাকিলে শেষ লক্ষ্যে যাওয়া যায়, বাহিরের ভড়ং কিছু নয়।

(৩) সমাজের সংস্কার মানিলেন বটে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীকে ভোগের সামগ্রী মনে করিলেন না, পত্নীকে শক্তি জ্ঞান করিলেন।

(৪) সুখৈশ্বর্য্যের মোহে তাঁহার মন কখনও কলুষিত হয় নাই। মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার তিনি কখনও গায়ে রাখিতে পারিতেন না, অর্থাদি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ইহাদের স্পর্শে তিনি বৃশ্চিক দংশনজনিত জ্বালা অনুভব করিতেন। নিজেকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিলেন, টাকা আর মাটী, মাটী আর টাকা তাঁর কাছে দুই-ই সমান। সরল জীবন এবং উচ্চ লক্ষ্য তিনি জীবনের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

(৫) তিনি কোন ধর্ম্মকে নিন্দা বা অবহেলা করেন নাই। কোন ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে বা সংস্কার করিতেও আসেন নাই, নূতন কোন সম্প্রদায় গড়িতেও তিনি আসেন নাই। সব ধর্ম্মেই সত্য আছে। বিচার এবং উপলব্ধি দ্বারা সত্যকে বাহির করিতে হয়। তিনি ইসলাম, খৃষ্ট, নারীভাব, তন্ত্রমন্ত্র বেদান্ত সন্ন্যাস সব কিছু সাধনা করিয়াছেন। বেদান্তবাদী তোতাপুরীর নিকট তিনি দীক্ষা এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বেদান্তবাদী গুরু ভক্তিপথের শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার গুরু নই বাবা তুমিই আমার গুরু। এইবার আমার শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান সরস হইল।"

(৬) সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বলিলেন, সেই সনাতন পুরুষ প্রকৃতপক্ষে এক, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং বিভিন্ন মতের লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছেন। সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া যায়, অরূপের মধ্যে রূপ দেখা যায়, যত মত তত পথ, প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম আচরণ করিবে। ধর্ম্মজগতে নিন্দাদ্বেষের স্থান নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সমন্বয়ের প্রতীক।

(৭) মাতৃপূজার সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজারী হইলেন। পুরোহিতের ব্যবসা তিনি শিখেন নাই। পূজার বিধিও বুঝি জানেন না। মনের সকল প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, পাপ এবং পুণ্য মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়া অন্তরের সুগভীর ব্যাকুলতাভরে, শিশুর মত সরল প্রাণে ডাকিলেন, "মা, সন্তানের পূজা গ্রহণ কর মা।" সৎ-চিৎ-আনন্দ-আলোকে মন্দির আলোকিত হইল, পাষাণী মূর্ত্তি হাসিয়া উঠিলেন। চিন্ময়ী-মূর্ত্তি অভয় দিলেন, সাধকের সাধনায় সিদ্ধি হইল। বিশ্ববাসীকে নিজের সত্যানুভূতি শুনাইলেন "পবিত্র দেহ মনে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিলে তাঁকে পাওয়া যায়। মানুষ যেমন মানুষকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় তেমনি তাঁকে দেখা যায়। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁকে জানাইয়াছি, তাঁকে পাইয়াছি। উপযুক্ত লোক পাইলে তাঁকেও দেখাতে পারি" ইহাতে কোন সংশয় নাই। অঙ্ক শাস্ত্রের মত সত্য, তাঁকে পাওয়া যায় "যদি ডাকার মত ডাকা যায়"।

(৮) রোগশয্যায় যখন দেহ পীড়িত, তখনও সংশয়ের মস্তকে দারুণ পদাঘাত করিয়া, চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ"। ইহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামানব কি অবতার এ বিষয়ে তর্ক করা অপ্রয়োজন।

নিজের জীবনে নিজের সত্যোপলব্ধি ছাড়া কোন বিভূতি বা ভোজবিদ্যা দেখাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কাহাকেও অবাক করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানিনা। তাঁহার মা তাঁকে বলিয়াদিয়াছিলেন, "ও সব অবিদ্যা, বিষ্ঠাতুল্য।" ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা মিলে না। তিনি সাধনার চরম উৎকর্ষ, সিদ্ধির জীবন্ত বিগ্রহ, তাঁর উপলব্ধির তত্ত্ব বাঙ্গালীর, হিন্দুর, বিশ্বের সকলের সনাতন ধর্ম্ম। কবির ভাষায়—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে॥"

তারপর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনা যায় কাঞ্চনের সহিত তিনি নাকি কামিনীকেও ত্যাগ করিতে

উপদেশ দিয়াছিলেন। নারীকে তিনি সাধনার অন্তরায় মনে করিতেন, নারীকে অবজ্ঞা করিতেন—এবম্বিধ আলোচনা লেখায় এবং বক্তৃতায় জানা গিয়াছে। এমন কথা সত্য হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবন অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিয়া যাইত। তিনি এমন কথা বলিতে পারেন না, যাহারা এমন কথা প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে সঠিক বুঝিতে পারেন নাই এবং অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করিয়াছেন। মানবহৃদয়ের কামনা-বস্তুকেই তিনি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, কামিনীকে নহে।

আমার এই যুক্তির সপক্ষে তাঁহার জীবনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়া গিয়াছে।

[১] প্রথমতঃ মায়ের গর্ভে যার জন্ম, এমন কোন জ্ঞানী মাতৃজাতির নিন্দা করিতে পারেন না, কোন জীবেরই অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

[২] দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করিলে সকলের বড় যে কথাটী মনে আসে তাহা, —"শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের পূজারী।"

[৩] নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের পুত্র সমাজের অবজ্ঞাত নারী ধনী কামারণীর স্বহস্ত প্রস্তুত আহার্য্যও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন অস্পৃশ্যা শবরীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রেমের দান ভক্ত বৎসল রাঘব সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[৪] নারায়ণ সাক্ষী করিয়া পঞ্চম বর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রীসারদামনি দেবীকে সহধর্ম্মিনীরূপে বরণ করিয়া লইলেন।

[৫] তারপর দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে কৈবর্ত্ত বংশীয়া পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরের পূজারীরূপে।

[৬] দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর আবির্ভাব হইল। ভৈরবী অসামান্যা রূপবতী, বয়সে প্রৌঢ়া, দেখিতে যুবতী। জহরী জহর চিনিলেন। কাহারও মনে দ্বিধা আসিল না, মা ও সন্তান সম্পর্ক হইল। তন্ত্রে ও শাস্ত্রে ভৈরবীর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া একখানা দুইখানা করিয়া চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধন সন্তানকে আয়ত্ব করাইলেন। এই নারীই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

[৭] শ্রীরামকৃষ্ণ নারীগুরু যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীকে শিষ্যার গৌরবও দিয়াছেন। অন্ততঃ একজনার নাম এখানে উল্লেখ করিব, তিনি চিরকুমারী তাপসী গৌরীমা, দক্ষিণেশ্বরে যখন গেলেন তখন গৌরীমাকে যুবতী বলা যাইতে পারে। অলোকসামান্যা সুন্দরী, অনাঘ্রাত পূজার ফুল, পিতা কন্যাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর সেবা-সঙ্গিনী করিয়া রাখিলেন। গৌরীমার সেবা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ইঁহারই সম্পর্কে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'কত ধ্রুব প্রহ্লাদের জন্ম দিতে পারে, জানিস ?"

[৮] আরও অনেক ভাগ্যবতী নারী—গোপালের মা, যোগীন মা প্রভৃতি তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন। ঠাকুর সকলকেই অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত স্নেহের সহিত দেখিতেন।

[৯] এমন কি সামান্যা পতিতা রমণীর মধ্যেও তিনি জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সমাধিস্থ হইতেন।

[১০] দক্ষিণেশ্বরে লীলাখেলার সময়ও পরমহংসদেব পত্নীকে ত্যাগ করেন নাই অথবা অবহেলা করেন নাই, বরং তাঁহাকে নিজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে নহবতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। নারীতে কামিনী বোধ তাঁহার কখনও ছিল না। সহধর্ম্মিণীকে স্ত্রী বোধও ছিল না। বিশ্বের যত নারী সকলেই শক্তিরূপিণী মা।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

এইবার মাতৃসাধনার পূর্ণাহুতি দিলেন, নিজের তরুণী ভার্য্যাকে, তথা শিষ্যাকে, জগজ্জননীরূপে ষোড়শোপচারে "ষোড়শী পূজা" করিলেন। পায়ে অঞ্জলী দিলেন, প্রণাম করিলেন। মায়ের মহিমায় সমাধিস্থ হইলেন। নারীকে এত সম্মান আর কেহ কোন দিন দেন নাই, এমন শ্রদ্ধা কেহ নিবেদন করেন নাই। গভীর ভক্তিতে এমন মাতৃপূজা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ পারিবেন না, তাই বলিতেছিলাম, নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ কোনই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, অবিচার করিয়াছেন শিল্পীরা, যাঁহারা তাঁহার চরিত্রকে এভাবে রূপ দিয়াছেন।

এবারকার লীলার নূতন রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহ নর-দেহ

ধারণের এক মহান নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাঁহার মহাসমাধির সহিত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই, তিনি কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে ক্ষণিকের দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন তাহা নহে। ভক্ত সঙ্গে আনন্দ মহোৎসবের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বসিয়া ভূভারহারী ঠাকুর কল কল নাদিনী জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে পাইতেন, পৃথিবীর উদ্বেলিত হাহাকার ক্রন্দন, যুগের পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান অভাব ও অভিযোগের বিগলিত স্রোত। তাহার করুণ হৃদয় জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিত, নয়ন বহিয়া স্রোত চলিত।

ঠাকুর তাঁহার নূতন ধর্ম্ম এবং অফুরন্ত শক্তি সম্পদ উপ্ত করিয়া গেলেন তাঁহার সন্তানদের হৃদয়ে। পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ রাজরাজেশ্বর পিতার অন্তর্ধানজনিত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

দলে দলে অসংখ্য শিক্ষিত এবং হৃদয়বান যুবক নবভারতের নবজাগরণের প্রচারকের পতাকাতলে সমবেত হইয়া গাহিলেন—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোক মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র দাও গো জীবন নব।
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে, চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।"

গুরু মহারাজের নাম লইয়া নবীন কর্ম্মিদল নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল যেখানে দৈন্য, যেখানে পীড়া, যেখানে দুর্ভিক্ষ বন্যা মহামারী। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করে তারা,—দুঃখ নাই, অবসাদ নাই। আবার কেহ ভারতের সভ্যতার আলোক লইয়া ছুটিল সুদূর দেশ বিদেশে। পৃথিবীর দরবারে অবজ্ঞাত ভারতের স্থান মিলিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। সুশৃঙ্খল বিরাট সেবা-প্রতিষ্ঠান বলিতে আজ একবাক্যে রামকৃষ্ণ মিশনকেই বুঝায়। এই সকলের মূলে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ, আর বিবেকানন্দের মস্তিষ্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবঘন পুরুষ, আর বিবেকানন্দ তাঁর কর্ম্মশক্তি প্রকৃতি।

আর একটি অধ্যায় যোগ না করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের দান অসমাপ্ত থাকিবে। নারীকে কেবল সম্মান দান ছাড়াও আরও কিছু স্থায়ী সম্পদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে একদিন একটী গাছতলায় জল ঢালিতে ঢালিতে বলিয়াছিলেন, "গৌরী আমি জল ঢালি তুই কাদা চটকা। সাধন ভজন তো অনেক হয়েছে এবার টাউনে বসে মায়েদের কাজ কর্ত্তে হবে।" ফলে, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম অর্থাৎ নারীর সুশিক্ষা এবং আশ্রয়। ইহা ছাড়া ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয় এবং আরও অনেক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নারীজাতির উন্নতিকল্পে প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন। আমি যদি এখন সাহসে ভর করিয়া বলি, করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং "পবিত্রতা স্বরূপিনী" মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী এবার বিশেষ করিয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব নারী জাতিকেই টানিয়া তুলিতে আসিলেন, তাহা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হইবে না।

ভগিনীগণ, ঠাকুরের কথা শুনিবার জন্য আপনারা আমাকে যে সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি এখন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার শিষ্যা গৌরীমাতার বাণীর একটি অংশ পাঠ করিয়া উপসংহার করিব।

"তাঁর কথা বলে' শেষ করা যায় না। ভাষা সেখানে নিস্তব্ধ হ'য়ে ফিরে আসে, ভাব কূল না পেয়ে তলিয়ে যায়। কত মত, কত পথ, কত বিপরীত ধারা সব এসে মিলেছে তার মাঝে। ভেদ নেই, দ্বেষ নেই, সংঘর্ষ নেই,—এক মহাসমন্বয়, এক বিরাট পূর্ণতা। আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবে সেই পূর্ণ পুরুষের কথা সকলে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করুন, তার কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম পুণ্যস্নান ক'রে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করুন।"

"আর যে মহীয়সী নারী অপূর্ব্ব ত্যাগ ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পতির ব্রতোদ্‌যাপনে সহায়তা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশেও আজ একটীবার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিন। সেই পূতচরিতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার আশীর্ব্বাদ সকলের অন্তরকে তপোভূমিতে পরিণত করুক।"

স্থাপকায়চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর "মহিলা সম্মেলনে" এলবার্ট হলে শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী বি-এ সাংখ্যতীর্থার অভিভাষণ।

অপরাধী

শ্রীদেবব্রত রেজ

১

"হ্যাঁরে কিছু হোল?—ওকি! দুধটা খেলিনে যে? যা শরীর হ'য়েছে। খাওয়াটাতেও অবহেলা করিস্‌নে।"

"না মা, খাওয়া হ'য়ে গেছে!…হ্যাঁ,…কোলকাতায় কিছু হোল না, যেখানেই যাই সব ভর্ত্তি, আমার জন্য কোথাও কোন ফাঁক নেই"

"আচ্ছা, এবার কোলকাতা যাবার সময় তোর সেই কলেজে পাওয়া মেডেলগুলো সঙ্গে নিয়ে যাস্ না।—"

"কিছু হবে না। বিয়ের বাজারে ও তক্‌মাগুলোর দাম থাকতে পারে, চাকরির বাজারে ওগুলোর কোন মূল্যই নাই।"

নরেন একটা খুঁটি ধ'রে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে দাওয়ার মাটী খুঁড়তে লাগ্‌ল।

"হ্যাঁরে, সমস্ত দিন ট্রেণে এসেছিস্ একটু জিরোবি না?"

"এই যাই মা,……ভেভি এ্যাসিয়োরেন্স কোম্পানী ব'লে একটা নূতন কোম্পানী খুল্‌বে—অবশ্য, এখন নয়, মাসখানেক পরে সম্ভবতঃ—তাই কাবেরীর পিসে মশায়কে ব'লে এসেছি আমাকে তার কর্‌তে যদি সুবিধা বোঝেন,…ভদ্রলোকের ওতে শেয়ার আছে কিনা।"

"তা ভালই, তুই এখন একটু গড়িয়ে নেগে যা।"

২

"ওরে নীরু, আজকে আর পড়্‌তে হবে না, সকাল সকাল শুয়ে' পড়।"

"শোব'খন, এইত' সন্ধ্যে হোল"

সন্ধ্যা অনেকক্ষণই হ'য়ে গেছে, পূর্ব্বদিকের জানালাটা দিয়ে জ্যোৎস্না আসছে।

নরেন উঠে' দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে জান্‌লার গোড়ায় দাঁড়ালো। প্রদীপটাকে ফু দিয়ে নিবিয়ে দিল।

ভালো লাগেনা প্রদীপ, ভালো লাগে না এই সব বই। জীবনের সব কিছুই তার কাছে প্রয়োজনহীন হ'য়ে পড়েছে। তার মনুষ্যত্বের ব্যর্থতার এই বিরাট গহ্বরটাকে পরিপূর্ণ ক'র্‌বে কিসে?

পার্‌তে পারে একজন!…না, না…জীবনটা কাব্য নয়! পৃথিবীতে প্রথম নেমে দেখেছে এই বিপুল জনাকীর্ণতায় তার স্থান নেই। এত পথ, এত বাড়ী, এত কাজ, এত সাধনা, এত প্রচেষ্টা, এত উল্লাস সব তাকে বাদ দিবে! কর্ম্মক্ষেত্রে সে আজ অস্পৃশ্য।

প্রথমে মনে হয়েছিল এতবড় পৃথিবী, এত তার কাজ, এত তার প্রয়োজন, নিজকে কোথাও না কোথাও সে খাপ খাইয়ে দেবে। কিন্তু এখন! সভ্যতার এই বিরাট যন্ত্র যেন একেবারে নিখুঁত, এতে কোন কব্জা, কোন স্ক্রুর অভাব নেই! চোখে কাব্যের নেশা হতাশার উষ্ণ অশ্রুতে একেবারে ধুয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে জীবনটা কাব্য নয়, জীবনটা কাব্য নয়!……..

বাঁশের ডালে-ডালে-বোনা জালের ভিতর দিয়ে দেখা যায় ত্রয়োদশীর চাঁদ। বাঁশের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো চিক্‌চিক্ করছে; ফণি মনসার কাঁটাগুলো যেন রূপার কাঁটা; ফুটন্ত কেয়াগুলো যেন স্বপ্নের ফুল!

কেমন একটা শিরশিরে হাওয়া………

সমস্ত জ্যোৎস্না যেন শিউরে উঠেছে… …..

সব নিস্তব্ধ……ঘরের বাইরে ঝি ঝি ঝি ঝি শব্দ… ঘরের মধ্যে কেমন এক ধরণের সূক্ষ্ম রী রী রী রী শব্দ…… কাবেরী! হঠাৎ তার মনপ্রাণ কেমন আলোয় যেন ভ'রে গেল। কা…বে…রী…

একী! এই বিশ্রী মনটাকে কিছুতেই আমলে রাখা যায় না! এই দীনতা এই দারিদ্র্যের মধ্যে দিনেরাতে একটু

ফাঁক পেলেই মোহের জাল বুনতে ব'সে যায়! নতুন যক্ষ্মা-রোগীর বুকের কোণে শ্লেষ্মার টুক্‌রোর মত মনের কোণে একটুক্‌রো স্বপ্ন লেগে থাকে।......না, কর্ম্ম ব্যতিব্যস্ত গৃহিণীর সিঁথির প্রান্তে সিঁদুরের টুকরোর মতো?

নরেন শুয়ে পড়্‌ল। এসব ভাবলে কেমন যন্ত্রণা হয়।

৩

বরদাসুন্দরী আহ্নিক সেরে' ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে দেখলেন নরেন সুটকেস্‌টা পাশে রেখে' পূবের খুঁটিটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাব্‌ছে; বাঁহাত দিয়ে চিবুকটা টিপে আছে।

"নীরু, আজকেই যাবি।"

"হ্যাঁ! এই যে মা,...আজকেই যেতে হবে, দশটার ট্রেণ, বেলা হ'য়ে এসেছে।"

"থাক্, থাক্,—'তা' শিগ্‌গির ফিরে আসিস্ নীরু। কোলকাতা গেলে তুই যেন আধমরা হ'য়ে যাস্।"

নরেন প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ মা, যত শিগ্‌গির পারি ফিরে আস্‌ব; এবার বোধহয় একটা কিছু হবে।"

"কাবেরী এসেছিল ভোরে। আমি চান কর্‌তে বেরিয়েছি দেখি কাবেরী এদিকে আসছে। আমাকে জিগ্যেস্ করলে 'নীরুদা এসেছে জ্যেঠাইমা?' আমি বল্‌লুম 'ঘুমুচ্ছে পূবঘরে' তারপর সেত' বাড়ী ঢুকল, তা' তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"কই না; আমাকেত' ডাকেনি।—তবে বিছনার ওপর চাঁপাটা সেইই জান্‌লা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল।"

"ওই এক পাগল! আমাকে ও সত্যিই ভালোবাসে; যদি জানত পৃথিবীতে ওর নীরুদা'র দাম কতটুকু! মানুষকে নাকি সম্পদে মাপা যায় না! তাই নাকি? বেশ চমৎকার আরাম দেওয়া কল্পনা!—মনটা হঠাৎ টল্ টল্ ক'রে উঠেছিল!

"মা বেলা হ'য়ে গেল, তুমি কিছু ভেবোনা, বেশীদিন হবে না।"

দুর্গা, দুর্গা ব'লে বরদাসুন্দরী ছেলের যাত্রাকে মাতৃহৃদয়ের পবিত্র আশীষে পূত ক'রে দিলেন।

* * * *

"বাবু, কুলী চাই?"

"না"

"এইসান্ বাবু!" কুলিটা ঠোঁট দুমড়ে ফট ক'রে ব'লে ফেল্‌ল।

নরেন একটু থমকে দাঁড়িয়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

এই হাওড়া ষ্টেসনটায় এলে সে যেন নিজকে খুঁজে পায় না। দিগ্‌দেশ হ'তে জনতার এক একটা স্রোত এসে হাওড়ায় একটা ঘুরপাক খেয়ে সারা কোলকাতা সহরটায় যে যার পথে ছড়িয়ে পড়ছে। ছেলেবেলাকার কথা—মনে পড়ে পঞ্চানন পুরোহিত হরির লুটের দিন মণ্ডা বাতাসা নাড়ু এক সঙ্গে মিশিয়ে দু'হাত দিয়ে সারা উঠানটাময় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

* * * *

৪

"বড়ই দুঃখিত, কিছু কর্‌তে পার্‌লুম না"

"কিন্তু......"

"কিন্তু?"

"মিঃ ঘোষ বোধহয় আমার সম্বন্ধে কিছু বোলে থাক্‌বেন, তা ছাড়া, আমি বোধহয় অনুপযুক্ত নই।"

"হ'তে পারে আপনিই সব চেয়ে উপযুক্ত, হোতে পারে আপনার রিকমেণ্ডেসন্‌ই সব চেয়ে ভাল, আরও অনেক কিছুই হোতে পারে; যখন আপনাকে কাজ দিতে পার্‌ব না তখন মিছামিছি তর্ক ক'রেত' কোন লাভ দেখিনে।......"

সাহেব নিজের কাজে মন দিলেন।

"ধন্যবাদ।"

বেরিয়ে এসেই কেমন যেন একটা আতঙ্ক হোল।

সব চেয়ে উপযুক্ত হোতে পারি, অথচ...নেবে না!

এর কোন মানে হয়? কার ওপর নরেন যেন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। মানে আছে ওর ওই ম্যানেজার হওয়াটার? মানে আছে এই এত বড় বাঙলার রাজধানীর? নির্ব্বিবাদ বেনিয়মে সব কিছু বেশই ত' চলে যাচ্ছে! উদোর পিণ্ডি বুদো বেশ অবলীলায় ব'য়ে চলেছে! এদেশের যেন কোন কিছুর মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ সব কিছুই ত বেশ চ'লে যাচ্ছে! মাথা আছে ত পা নেই, অথচ দেহের

কোথা হ'তে যে পা গজিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করে। পা আছে তো মাথা নেই অথচ কোনকালে হোঁচট খেয়েও পড়ে না! কেমন অবলীলায় চলে চলেছে দেশের এত শত ব্যবসা, 'এক শত ইন্সটিটিউশন্! এ এক অদ্ভুত ভূতে-পাওয়া দেশ!

বাঙ্গলার মাটী বটে! পৃথিবীর আগাছা এখানে পুঁতলে উত্তম ফসল হয়! কিন্তু স্বদেশী ওষধিরও শিকড় জ্বলে' যায়!

স্যুটকেশটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলতে আরম্ভ কর্‌ল।

জিজ্ঞাসা করলে নরেন বল্‌তে পার্‌ত না সে কোথায় চলেছে; ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, রিক্সার ঠঙ ঠঙ, বাসের বিকট আর্ত্তনাদ, জনতার কোলাহল কেমন একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যাতে মানুষের মনকে একেবারে চিন্তাহীন ক'রে দেয়। নরেনের পীড়িত বিধ্বস্ত মনটাও কেমন যেন নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছিল। রাস্তার উপর মানুষের ঝড় ব'য়ে চলেছে সাহারার ওপর সিমুমের মত।

টং টং ক'রে কোথায় পাঁচটা বাজ্‌ল। আর চল্‌তে ভালো লাগে না, পা' দুটো কেমন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, শরীরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে; সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই।

রেস্তোঁরায় গিয়ে কিছু খেয়ে আসা যাক ভেবে পকেটে হাত দিতেই হাতটা পকেটের তলায় বসে গেল; রুমালটা নেই! যাক্, ল্যাঠা চুক্‌ল! স্যুটকেশে একখানা কাপড়, একটা গামছা, আর গোটা কতক নিমের দাঁতন ছাড়া আর কিছুই নেই। আছে বটে একখানা ন্যূট হাম্‌সুনের "Hunger"!

পার্কের পশ্চিম দিকে একটা করবী গাছের তলায় একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, তার উপর নরেন বস্‌ল; করবী গাছটার দুই একটা কুঁড়ি ছাড়া লালিমার কোন আভাসই ছিল না।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। পার্কের পূবের লন্‌টায় তার ছাটা সবুজের উপর কতকগুলি যুবক টেনিস খেল্‌ছেন, অদূরে যুগ-প্রগতির অগ্রগামী একদল কুমারী হেসে উঠলেন—কে জানে কেন!—একজন তরুণ চকিত চকিত ভাবে সার্টের কলারটা 'স্মার্ট' কর্‌তে কর্‌তে চলেছেন।

সব বেশ! এ মদ একেবারে নির্ভেজাল। বাঙ্গলা দেশের মাটীর পাত্রেও বেশ চ'ক্ চ'ক্ কর্‌ছে!......

পেটটা কেমন কর্‌ছে; মাথাটা যেন একেবারে ফাঁক, বিশ্বের বাতাস যেন তার ফাঁকে আনাগোনা কর্‌ছে!

সাম্‌নে না-নীল না-কালো আকাশটার চাঁদ উঠেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে যেন কুষ্ঠক্ষত। কেমন অদ্ভুত তার রঙ, না লাল না হল্‌দে!

অদূরে টকী হাউস হ'তে গান ভেসে আস্‌ছে—

"আলো ছায়া দোলা উতলা ফাগুণে!......"

ফাগুণ কথাটা শুনে কেমন হাসি পায়! ফাগুণ!

পার্ক ফাঁকা হ'য়ে গেছে, সবুজ 'লন্' কখন কালো হ'য়ে গেছে; সব কিছুর উপর রাত্রির রহস্য নেমে এসেছে।...

নরেনের পৃথিবী তখন দুলে উঠেছে, কী এক রকমের বন্ধ যন্ত্রণা হ'চ্ছে তার শরীরে। শক্তিহীন শরীরটায় অনুভূতি যেন সূক্ষ্মতম হ'য়ে উঠেছে···পৃথিবীটা যেন তার সৌর আকর্ষণের দড়াদড়ি ছিঁড়ে শূন্যতায় হুস্ হুস্ ক'রে নেমে চলেছে···আর ভাবতে পারে না; চোখের উপর অদ্ভুত রঙ ভেসে ভেসে উঠছে...সমস্ত দেহের বাঁধন পড়েছে এলিয়ে! কেমন যেন টন্ টনানি, ঘুমে শরীর মন আচ্ছন্ন!

* * * * * *

হঠাৎ ঝাঁকানি খেতে তার ঘুমটা ছিঁড়ে গেল।

সকাল হ'য়ে গেছে·········,

নরেন চেয়ে দেখে সাম্‌নে এক পুলিস; তার পেছনে এক ভদ্রলোক, তার মুখে এক চুরুট, হাতে একখানা—ফটো হবে বোধ হয়!

"উঠিয়ে মহারাজ!"

নরেন কি বল্‌তে চাইল কিন্তু স্বর রাত্রির অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে; চোখ দু'টোকে সমস্ত ইচ্ছা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল;...তার হাতে একজোড়া শিকল পড়ল, আর সেই ভদ্রলোকের মুখে চুরুটটা তার ঠোঁটের সঙ্গে বার কতক নড়ে উঠল!.........

দেবব্রত রেজ

নববর্ষে

শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী

গত বছরের শবদেহ আর কঙ্কাল হ'লো ছাই ;—
নব বরষের দামাল শিশুটি হেসে উঠে খল খল।
চিতার আগুন নিভিয়া গিয়াছে ; জ্বলে ওঠে রোশনাই—
নতুন দিনের শিহরণে ভাসে উৎসব পরিমল।

কত পুরাতন কথা ও কাহিনী কত বিরহীর ব্যথা—
কত প্রেম আর সুখ আলাপন না-বলা কত যে কথা,
চাওয়া আর না পাওয়ার শোক সব পুড়ে হ'লো ক্ষয়,
গত বছরের সমাধির পাশে জাগে সে জ্যোতির্ম্ময়।

জ্বালে সে নতুন উৎসাহ-দীপ ভীরু অসহায় চোখে
কত প্রান্তর পার হয়ে যাবে,—কত লোক হ'তে লোকে
কত আশা আর কামনার রঙে ভরে ওঠে নভতল ;
নতুন নেশায় লাগে শিহরণ ; চোখ কাঁপে ছল ছল।

আবার এমনি কবরের তলে সব পড়ে যাবে ঢাকা,
চেনা দিন আর চেনা মুখ যত স্মৃতিপটে র'বে আঁকা—
এত উৎসব সমারোহ দীপ সব নিভে হবে ক্ষয় ;
তবু সে নতুন আবার আসিবে, আসিবে জ্যোতির্ম্ময়।

বছরের শেষে কালের পাতায় লেখা হ'বে ইতিহাস
যারা যাবে আর যারা পড়ে র'বে—যাহারা ফেলিবে শ্বাস ;
তাহাদের লয়ে নব উদ্যমে সুরু হ'বে অভিযান,—
বনমর্ম্মরে শুধু জেগে র'বে ঝরা পাতাদের গান।

মুক্তি

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলকনন্দা ছিল তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী। রূপের ঐশ্বর্য্যে তন্বী দেহলতা ছিল তার কানায় কানায় ভরা; আর ছিল দুটি কালো চোখ—যেমন প্রশান্ত. তেমনই গভীর—বুঝি পৃথিবীর সব চোখের চেয়েও সুন্দর!

নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের মুখে মুখে তার কথা; স্বয়ং মহারাজ প্রশান্তবর্ম্মা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার কমনীয় দেহবল্লরীর প্রতি লীলায় ফুটিয়ে তুলত সে নিত্য নূতন ভঙ্গিমা! তার চটুল চরণের প্রতি লীলায় জাগিয়ে তুলতো সে নিত্য নূতন ছন্দ! তার নিবিড় চোখের প্রতি চাউনিতে বুনে তুলতো সে নিত্য নূতন স্বপ্নের জাল। তার নৃত্যের মাঝে ছিল কী যেন এক প্রচ্ছন্ন যাদু; তার নূপুর-শিঞ্জনে ছিল কি যেন এক মদিরার আবেশ!

সে ছিল এক বসন্তোৎসবের সন্ধ্যা। পশ্চিমাকাশের মেঘের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়া রক্তরাগটুকু ক্রমে মিলিয়ে আসছিল পূব আকাশের সোণালী আলোর সহস্রধারায়। নগরীপ্রান্তে দূরে আকাশের গায়ে ভেসে উঠছিল পূর্ণিমার চন্দ্র, ধীরে ধীরে চুপে চুপে—লজ্জারাগজড়িতা নববধূর মতই।

ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় হেসে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত: প্রতি গৃহদ্বারে মঙ্গল কলস, প্রতি গৃহচূড়ে পতাকার মালা, পথে পথে হাসি, গান—সমগ্র নগরী যেন মেতে উঠেছিল এক উন্মাদ প্রাণের আবেগে। অলকনন্দার গৃহে ছিল সেদিন নৃত্যের আসর। প্রশস্ত কক্ষতলে সুরঞ্জিত ও সুকোমল গালিচা আবৃত করে বিছানো রয়েছে দুগ্ধফেননিভ আস্তরণ; ভিত্তিগাত্রে সুগন্ধি পুষ্পের স্তবক; সহস্র বাতিদানে জ্বলছে সহস্র উজ্জ্বল বর্ত্তিকা। স্থান ছিল না গৃহে আর। রাজ্যের যত ধনী নাগরিক এসেছে সেদিন অতিথি হ'য়ে; নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী পুরন্দর স্বয়ং সে উৎসবের হোতা। যন্ত্রীরা বাজিয়ে চলেছিল তাদের মৃদঙ্গ, মুরলী, বীণ্—নূতন সুরে, নূতন ছন্দে—অলকনন্দা নেচে চলেছিল "বসন্তের আগমনী" —নূতন ভাবে নূতন ভঙ্গিমায়। বর অঙ্গ ঘিরে তার বাসন্তী রঙের সাড়ী, মাথায় কাশ কেশরের চূড়া, কর্ণে তার রক্ত-অশোকের দুল। যেন ইন্দ্রের অমরাবতী—গল্পের মায়াপুরী! শ্রান্তিহীনা অলকনন্দা চলেছিল নেচে; দর্শকদল চেয়েছিল তার পানে মুগ্ধ, অপলক চোখে। ভুলে গেছে তারা তাদের হাতের মদিরা-পাত্রের কথা। সাড়া নেই, চঞ্চলতা নেই—শুধু যন্ত্রের ঝিম্ ঝিম্ আর নূপুরের রিণিরিণি!

এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী—মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘ ঋজু দেহ, অপূর্ব্ব গৌর কান্তি। গৈরিক বাস, গৈরিক উত্তরীয়, চক্ষে জ্ঞান এবং বুদ্ধির জ্যোতি। "ভিক্ষাং দেহি!" চমকিতা নর্ত্তকী গেল থেমে তার নৃত্যের মাঝে; বিস্মিত যন্ত্রীরা ফেললে হারিয়ে তাদের সুরের সূত্র; ক্ষুব্ধ দর্শকমণ্ডলী চাইল দ্বার পানে তাদের অসন্তোষ-ভরা চোখ তুলে। ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে সন্ন্যাসী বললে—"ভিক্ষাং দেহি।"

রুষ্ট শ্রেষ্ঠী সন্ন্যাসীর প্রতি এক বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তর করলে—"ভিক্ষা এখানে মেলে না, ভিক্ষা মেলে গৃহদ্বারে। যাও, সেখানে গিয়ে দাঁড়াও।" প্রতি কথায় যেন তার বিদ্বেষের তিক্ততা ভরা

অলকনন্দা ডাকলে, "বিনতা!" পরিচারিকা এসে দাঁড়াল এক পার্শ্বে কুণ্ঠিতপদে। পুরন্দর ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কে ওকে আসতে দিলে এখানে? এটা কি ভিক্ষা চাইবার জায়গা?"

পরিচারিকা ভয়ে উত্তর করল না। সন্ন্যাসী কথা কইল না, শুধু চেয়ে রইল তার প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে অলকনন্দার পানে। নর্ত্তকী পরিচারিকাকে বললে—"সন্ন্যাসীকে ভিক্ষে দিয়ে দে বিনতা! আর কখনো কাউকে এখানে আসতে

দিবি না, যা।" দাসী চলে যায় দ্রুতপদে, তিরস্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে; সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে থাকে স্থির, ধীর, গম্ভীর।

"ওকি, তুমি গেলে না যে ওর সাথে?" বিস্মিতা অলকনন্দা প্রশ্ন করে। সন্ন্যাসী বলে—"অর্থ আমি চাই না দেবী।"

"তবে কি চাই প্রভু? অলঙ্কার? নেবে আমার এই হীরার কঙ্কন?"

সন্ন্যাসী বলে—"না"; মুখের কোণে ফুটে ওঠে তার কৌতুকের হাসির রেখা।

"তবে কি চাই তোমার? মতির মালা?" বিস্মিত পুরন্দর চীৎকার করে ওঠে অসহ্য ক্রোধে। বিমূঢ়া নর্ত্তকী প্রশ্ন করে—"নেবে আমার গলার মুক্তার মালা?" সন্ন্যাসী আবার বলে "না"; আবার তার মুখে ফুটে সেই কৌতুকের হাসি। পুরন্দর হয়ে ওঠে যেন উন্মাদ। ক্রোধের আতিশয্যে তার গলার স্বর বিকৃত। সে চীৎকার করে উঠলো—"ও যা চায় তাই দিয়ে ওকে বিদায় করো অলকা! ওর চোখের চাউনি আমার গায়ে তপ্ত লোহার মত বিঁধছে যেন।" তিক্ত হয়ে ওঠে দর্শকদের মন তার এই অকারণ হাসির প্রবাহে—তারা ভাবে বিদ্রূপ। কৌতূহলী নর্ত্তকী বলে,—"তুমি জান না প্রভু, কি মহামূল্য হার এ। রাজার ভাণ্ডারে এ রত্ন নেই—এর বিনিময়ে বড় রাজত্ব পাওয়া যায়।"

সন্ন্যাসী উত্তর করে—"রাজ্যে আমার লোভ নেই, আমি চাই ভিক্ষা।" পুরন্দরের অন্তরঙ্গ জয়পাল ওঠে হেসে। "ভিক্ষাই যদি, তবে আবার দানের অত বিচার কেন শুনি?" প্রতি বর্ণে বর্ণে শ্লেষের তীব্র তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায় যেন। দর্শকদের মুখে মুখে ফুটে ওঠে তাচ্ছিল্যের হাসি।

রূপসী নটীও হাসে তার রক্ত-গোলাপের পাপড়ির মত দুটি ঠোঁটের ফাঁকে। জিজ্ঞাসা করে—"কি চাই তবে?"

সন্ন্যাসী বলে, "আমি ভিক্ষা চাই তোমায়।" কণ্ঠে তার অপরূপ দৃঢ়তা, চক্ষে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। সভা যেন বজ্রাহত। উন্মাদ এ ভিক্ষুক! সহস্র সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়েও যাকে এক লহমার জন্যে কাছে পাওয়া যায় না, যার মুখে হাসি ফোটাতে রাজার রাজকোষ উজাড় হয়ে যায়, যার করুণা লাভের আশায় নগরীর ধনী রূপবানের দল নিয়ত আশে পাশে বেড়ায় ঘুরে, তাকে চায় এই ভিখারী সন্ন্যাসী! এ যেন বামনের চাঁদ ধরার প্রয়াস! মূষিকের সমুদ্রলঙ্ঘন প্রচেষ্টা! উচ্চ হেসে ওঠে পুরন্দর, সাথে সাথে হাসির ঢেউ লেগে যায় দর্শকের দলে। নর্ত্তকীও হাসে; তবু জিজ্ঞাসা করে—"আমায় চাও? কেন?"

"ভগবান বোধিসত্ত্বের আদেশ।"

"তুমি—কে তুমি?"

"আমি সুদত্ত—ভগবান বোধিসত্ত্বের দীনতম সেবক।"

"কিন্তু, তুমিত সংসার ত্যাগী ভোগ সুখ রহিত সন্ন্যাসী!"

"তবু তোমায় চাই।"

"নর্ত্তকী আমি—আমার ধর্ম্ম কোথায়? বিলাস আমার অঙ্গ, লজ্জাহীনতা আমার ভূষণ। আমায় নিয়ে যে সম্পূর্ণ লোকসান হবে তোমার সন্ন্যাসী।"

"লাভ লোকসানের হিসাব আমরা করি না দেবী, আমরা যে সন্ন্যাসী। কর্ম্মে আমাদের অধিকার—ফলের আশা আমরা রাখি না।"

"তোমার ধর্ম্মচ্যুতি ঘটবে।"

"ধর্ম্ম ত নষ্ট হয় না কোনও কালে। ধর্ম নয় স্ফটিকের বর্ত্তুল যে সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে টুক্‌রো হয়ে যাবে। যে ধর্ম্মকে একবার পেয়েছি, তাকে হারাবার ভয় আর আমার নেই।" সন্ন্যাসী হাসে। বিস্মিতা হয়ে যায় অলকনন্দা তার বিশ্বাসের ও জ্ঞানের গভীরতা দেখে। সে প্রশ্ন করে—"কোথায় যাব আমি?"

"ভগবান শুদ্ধসত্ত্বের চরণতলে।"

"তাতে আমার লাভ?"

"মুক্তি।"

"মুক্তি! মুক্তি আমি চাই না, সন্ন্যাসী। জীবনের বহু কামনা এখনও আমার অতৃপ্ত, বহু বাসনা এখনও আমার অপূর্ণ। আমি সন্ন্যাস চাই না, সন্ন্যাসী! এই অতুল ঐশ্বর্য্য, উপভোগ, খ্যাতি—এ সব ছেড়ে গুহাবাসিনী হতে চাইব সে বাতুলতা আমার নেই।" তার কণ্ঠে বেজে ওঠে এক গভীর আর্ত্তনাদের ধ্বনি।

কি এক ভাব ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর দৃষ্টির মাঝে। সমস্ত

মুখ ভরে যায় বিশ্বজয়ী হাসির বন্যায়। সে হাসিতে ঘৃণা নেই, বিদ্রূপ নেই—আছে করুণার অফুরন্ত ধারা।

"বিলাসিতা আর উপভোগের আবরণে ঢেকে রাখা যায় না অন্তরের দীনতাকে। তুষের আগুনের মত ধীকি ধীকি জ্বলে পুড়িয়ে দেয় সমস্ত অন্তর, বাইরেটাকেও। তাই মানুষের দৈন্যের ছায়া ফুটে ওঠে তার চোখে, মুখে, সর্ব্ব দেহে। অন্তরের দীনতাকে ঢেকে রাখতে বিলাসের বাহ্যিক আবরণ খাড়া করে নিজকেই বঞ্চনা করেছ তুমি নিজে। মিথ্যা ও আবরণ দেবী! তৃপ্তি ভোগে নয়—তৃপ্তি ত্যাগে। কামনার শেষ কোনও কালে নেই, যতই করবে তুমি উপভোগ, ততই বাড়বে তোমার কামনা ঘৃতপুষ্ট অগ্নিকুণ্ডের মতই।"

উত্তর দিলে না অলকনন্দা; শুধু চেয়ে রইল সেই তেজোময় সুন্দর মুখের পানে। কোলাহল করে ওঠে রুষ্ট স্তাবকের দল সন্ন্যাসীর উপর নিষ্ফল আক্রোশে। সন্ন্যাসী বলে যায়—"দুঃখ, ব্যথা, শোকে ভরা এই জীবন তুমি কেন চাও নারী? তুমি এস আমার সাথে। আমি তোমায় দেব এমনই এক জীবন যাতে দুঃখ নেই, ব্যথা নেই, বিষাদ নেই—আছে সীমাহীন আনন্দ আর হাসি। এ সুখ নয়—এ দুঃখের ফাঁসি। মোহে অন্ধ তুমি, তাই, সুখ ভ্রমে সেই দুঃখের ফাঁসী পরেছ নিজের হাতে নিজের গলায়। এ নয় তোমার উপভোগ—এ তোমার আত্মহত্যা।" বিলাস আর ভোগের মাঝে হারিয়ে ফেলেছ তুমি তোমার সত্য পথ; তাই এসেছি আমি তোমায় সেই পথের সন্ধান দিতে—ত্যাগের দীক্ষা দিয়ে। খুলে ফেল তোমার বিলাসের উপকরণ ওই বসন অলঙ্কারের রাশি; মুছে ফেল চোখের ওই কামনার কৃষ্ণ-অঞ্জন! তুলে নাও দেহে ওই গৈরিক উত্তরীয়—দেখ তাতে কত শান্তি, কত তৃপ্তি।"

দূরে ফেলে দিল অলকনন্দা তার দুপায়ের নূপুর। লুটিয়ে পড়ল সে সন্ন্যাসীর চরণতলে—'তোমার কথাই সত্য হোক আমার এই জীবনে।" .

সন্ন্যাসী তাকে মৃত্তিকা থেকে তুলে নেয়—অপার স্নেহে। চোখে ফুটে ওঠে তার আনন্দ, মুখে ফুটে ওঠে তার গর্ব্ব।

সন্ন্যাসী অকুণ্ঠিতচিত্তে খুলে নিল তার দেহ হ'তে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার; অকম্পিত হস্তে তুলে দিল তার দেহে আপনার গৈরিক উত্তরীয়; পরিয়ে দিল তার ললাটে গৈরিক চন্দনের ফোঁটা; নগরীর শ্রেষ্ঠা বিলাসিনী সাজলো যোগিনীর বেশে।

স্তাবকের দল করে উঠলো হাহাকার—"চলে যেওনা তুমি অলকা, তাম্রলিপ্ত অন্ধকার ক'রে।"

"ফিরিও না বন্ধু আমায় আমার মুক্তিপথ থেকে। এ জীবনে পাইনি সে সত্যকে, আজ চলেছি তারই সন্ধানে। আমার যাত্রার পথে আর পিছু ডেকো না আমায়!"

সন্ন্যাসীর সাথে রাজপথে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসিনী অলকনন্দা।

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী চলেছে রাজপথ দিয়ে। অগণ্য নর-নারী চেয়ে থাকে তাদের পথের পানে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে; পথি পার্শ্বে পার্শ্বে খুলে যায় বাতায়নের সারি। এ যেন স্বপ্ন, এ যেন প্রহেলিকা! নগরের শ্রেষ্ঠা রূপসী বিলাসিনী চলে যায় সন্ন্যাসিনীর বেশে। কোমল চরণ যার মৃত্তিকা স্পর্শ করেনি কোনও দিন, সে আজ চলেছে নগ্নপদে উদ্গত-প্রস্তর রাজপথ দিয়ে। রাজার ঐশ্বর্য্য যাকে কিনতে পারেনি কোনও দিন একপ্রহরের জন্যে, সে আজ চলেছে স্বেচ্ছায় এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর সাথে।

এমনি এক বসন্ত সন্ধ্যায় এসেছিল কিশোরী অলকনন্দা ছিন্ন অঞ্চলাগ্রে আপনার প্রস্ফুট-যৌবন দেহ আচ্ছাদিত করে' নগরীর রাজপথ দিয়ে—দীনা ভিখারিণীর বেশে! আর আজ বসন্ত-সন্ধ্যায় চলে গেল নর্ত্তকী অলকনন্দা গৈরিকবাসে আপনার বরতনু আচ্ছাদিত করে' সেই পথ দিয়ে—দীনা সন্ন্যাসিনীর বেশে।

নগরীর দীপ হয়ে এল ম্লান—তার সারা বক্ষঃ করে উঠলো হায় হায়!

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

আলোকচিত্রশিল্পী—লেখক

. (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে ইংলণ্ডে থাকা উচিত। এপ্রিলের পদস্পর্শে সারাদেশ জেগে উঠছে বয়ঃসন্ধিকালের মত। কোন সকালে জেগে উঠে দেখব যে অলক্ষিতে এল্‌ম্ গাছের শাখায় কোথায় ছোট ছোট পাতা দেখা দিয়েছে আর আপেলের কুঞ্জে কোন পাখী প্রথম ডাকতে আরম্ভ করেছে। চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে; মনেও পড়েছে নাড়া। দিনের পর দিন কোথায় নূতন নূতন ফুল ফুটে উঠছে, কতটুকু বর্ণ পরিবর্ত্তন হল মাসের উপর, সে সন্ধানে নয়ন আপনি ঘুরতে থাকে। এপিংএর উপবনে বা রিচমণ্ডের উদ্যানে কোন্ কোণায় কোকিলের ডাক প্রথম শোনা গেল তার বিবরণ লোকের মুখে মুখে, কাগজের পাতায় পাতায়। প্রকৃতির জাগরণে সংস্কৃত কবিদের যে উল্লাস তারই আভাস পাই এই কর্ম্মব্যস্ত বিষয়ী ইংলণ্ডের জীবনে।

এরা প্রকৃতিকে দেখছে সংস্কৃত কবির আনন্দ দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়। এদের চোখ ও মন পৃথক; ব্যবহারিক জীবন দিয়ে তাকে অনুভব করতে চায়, ধরণীর ধূলিতে তার চরণস্পর্শ খুঁজে; আকাশের স্পর্শহীন প্রাপ্তির অতীত নীলিমায় নয়। মার্চ্চ এপ্রিলে এরা পদব্রজেই দিগ্বিজয় করতে বের হল, সাঁতার কেটে, নৌকা বেয়ে, মুক্ত প্রান্তরে নেচে, হেসে খেলে প্রকৃতির সম্বর্দ্ধনা করল; সঙ্গে সঙ্গে মাতল মন, জাগল জীবন। ঘরে ঘরে ফুলের শোভা দেখা গেল আর তার সঙ্গে বহির্ম্মুখী জীবনের লীলা। প্রকৃতি জেগেছে, তাই স্বতন্ত্রভাবে এরাও জাগল কিন্তু তার মধ্যে আত্মবিলোপ করল না। মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি, জীবনের উপমা এরা প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়ায় না। এরা প্রিয়ার হস্তে লীলাকমল, অলকে বালকুন্দ, কর্ণে শিরীষ ও মেখলাতে নবনীপের মালা সাজিয়ে দেয় না। ইউরোপা বড় জোর হরিণাক্ষী, অথবা মরালকণ্ঠী অথবা রক্তগোলাপ সদৃশ; কিন্তু তাকে ফুলসজ্জায় সাজিয়ে ফুলশয্যায় পাঠাবে না ইউরোপের কবি।

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিত হরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি।"

এমন কথাটা তার মনে আসবে না। তার মানসী মুকুরের সামনে মুখে মাখে রাসায়নিক গোলাপভস্ম, শুভ্র লোধ্ররেণু নয়।

আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে বিজড়িত করে প্রকৃতিকে ইউরোপ আপনার মনে করে না। শকুন্তলাবিরহকাতর বনভূমি ইউরোপের মাটীতে নেই। ভবভূতির রামের সান্ত্বনাস্থল হবে না এখানকার নিভৃত উপবনগুলি। এগুলি জীবনের উল্লাসের, অনুভবের নয়, বিহারক্ষেত্র। এখানে মানুষ প্রকৃতিকে সাজিয়েছে ও সম্ভোগ করেছে, তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মবিলোপ করেনি। তার সঙ্গে পরিচয় করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। তার কাছে আসে সাধকের বিনয় নিয়ে নয়, বিজয়ীর ভোগস্পৃহা নিয়ে।

প্রকৃতি পর্য্যাপ্ত হলেই প্রগতি সাধারণত আড়ষ্ট হয়। যা জয় করে নিতে হয় না যাকে হারাবার ভয় নেই তার জন্য কে কবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে? এবং যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিতে না হলে কেই বা আপনাকে সবল করে রাখতে চায়? তাই সুখের দান পেয়ে পেয়ে আমরা ভারতবর্ষে দুর্ব্বল ও অলস হয়ে গেছি। আমাদের উত্তাপের দেশে জন্ম হচ্ছে অগণিত; মানুষ গণনা করি কোটী দিয়ে; মনুষ্যেতরকে ত গণনাই করি না। তাই মানুষের জীবন

যেমন ক্ষীণ, মৃত্যুও তেমন সুলভ। বলতে কি, জন্ম ও মৃত্যু যেহেতু বিধাতার ব্যাপার, মানুষ তাতে হস্তক্ষেপই করতে চায় না। লক্ষ লক্ষ জন্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত, জীবনও লক্ষ্যহীন। ওপারের চিত্র কিন্তু অন্য রকম। প্রতি কীট পতঙ্গের জীবনের ধারা ও ইতিহাস লক্ষিত ও লিখিত হচ্ছে; প্রত্যেকটী ফুলের নাম, গন্ধ ও বর্ণ লোকে জানে; রুচি ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে তাদের স্থান অতি উচ্চে। আমাদের দেশের মত এদের সার্থকতা নির্ভর করে না শুধু কবিপ্রসিদ্ধির উপর। সার্থক জন্ম এদেশের ফুলের।

শুধু ফুল? সমস্তটা জীবনই ত ফুলের মত শোভা ও সুরভিতে বিকশিত করে তুলতে পারা যায়। চারদিকে হাসিমুখ, সুস্থ সবল দেহ, উৎসাহিত মন দেখতে পাই। পায়ে অপরূপ গতিভঙ্গিমা, চোখে স্বপ্ন ও মাথায় সোণার ঐশ্বর্য্য নিয়ে কতজনকে যেতে দেখছি। এই পূর্ব্ব উপকূলের তাঁবুর সহরটীতে একজনকেও দেখছি না যাকে মনে মনে কোন ফুলের নামে না ভূষিত করতে পারি। একটী শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মুখকে নাম দিলাম 'লিলি হোয়াইট'; একটী লাজুক কিশোরকে 'স্নোড্রপ'; আর আড়ম্বরময় একজনকে 'রোডোডেনড্রন'। শেষোক্তকে 'স্ন্যাপড্রাগন' বললেও চলে।

ক্যেম্টারে বসন্তের প্রথম মাদকতাটুকু উপভোগ করতে এসেছি কারণ এখানে ভারতীয় কেহ আসে বলে জানা নেই। পায়ের ও মনের শৃঙ্খল খুলে গেছে তাই হতে চাই মুক্ত, সব দিক থেকে, নিজের পরিচয়ের হাত থেকেও। অপরিচিতের সঙ্গে চাই পরিচয়, নিঃসঙ্গের সঙ্গে বিশ্রম্ভ আলাপ। আমার বাহিরে আমি আসব নিঃসঙ্কোচে কারণ কেহ আমার অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করবে না; ও অপরিচয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। ব্যবহারিক সভ্যতার মুখোস খোলার এই প্রশস্ত স্থল পেয়েছি।

সারি সারি ছোট ছোট তাঁবু খাটান আছে, এতখানি দূরে দূরে যেন নির্জ্জনতা না ভঙ্গ হয়। কোথাও বা পরিত্যক্ত ট্রামগাড়ী একখানা রয়েছে রথীবিহীন বিদ্যুৎরথের মত। তাতেও লোক থাকতে পারে। ঘরবাড়ীর বালাই নেই। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকতে হবে না। কবি ও কবি-বন্ধু 'বাহাত্তুরে' মাথু দুজনেই এখানে একবয়সী এবং পরস্পরের কাছে সংকোচহীন। আপাতত আমার তাঁবুতে তিনটী কিশোরের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে, এদের কাছে এটাই লুকোচুরি খেলার খুব সুবিধাজনক জায়গা।

আমার তাঁবু

মনে হয়েছে। এরা থাকে একটা ট্রামে মায়ের সঙ্গে, দিন কাটায় হৈচৈ ও স্ফূর্ত্তি করে; আমাদের 'হলিডে ক্যাম্পে' এদের কেই বা না চিনে?

এখানে সবরকম ও সবশ্রেণীর লোক এসেছে তাদের নিজ নিজ পরিচয় পিছনে ফেলে, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে, নিজের ইংরেজসুলভ স্বভাবের কোণীয়তা (angularity) ঘসে মেজে ঠিক করে নিয়ে। আত্মগোপনকারী রোমান্টিক ধনীসন্তান বা ক্যামডেন টাউনের কেরাণী যে কারো সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে চাই তা বর্ষার স্রোতধারার মত স্বত উৎসারিত হবে; তার কর্ম্মজীবনের মাহাত্ম্য বা লঘুতার পরিচয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। কেহ মনে করিয়ে দিবে না যে সে ব্রাহ্মণবংশাবতংস ও তার সঙ্গে কৌতুক অবাঞ্ছনীয়। এখানে যারা এসেছে তারা সকলেই মুক্ত মন ও স্বচ্ছ স্বভাব

নিয়ে এসেছে সাময়িকভাবে। উদার আকাশ ও অসীম সাগরের সঙ্গমস্থলের দৃশ্যের সামনে, কৃত্রিম সভ্যতার আরাম ও আবেষ্টনের বাহিরে আনন্দপূর্ণিমায় যারা মিলিত হয়েছে তাদের মধ্যে দাম্ভিকতা ও সংকীর্ণতার কথা আসতেই পারে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাবের স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়।

প্রাতরাসের পর থেকেই দিন যে কি করে কাটাব তার ঠিক পাই না। এতভাবে এত পথে তা কাটান যায়। জনতা ও বিজনতা উভয়েরই বাণী কাণে এসে পৌঁছায়। কোথাও একটা দল ফুটবল খেলছে, কোথাও অন্যান্য খেলা। বালুবেলায় ছেলেমেয়েরা রঙীন রবারের বল নিয়ে হাতাহাতি করছে ও আছাড় খেয়ে নাকাল হচ্ছে; স্নানপ্রিয়রা ঢেউয়ের তালে তালে জলে নাচছে। একটী দল বসনহীনতার প্রায় কাছাকাছি এসে (দিগম্বর নয়) নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান করতে করতে সাগর সম্মেলনে যাচ্ছে। তারা চায় জনতা। কেহবা একা একা রৌদ্রদাহ উপভোগ করছে; যত দগ্ধবর্ণ হবে সে ততই লণ্ডনে ফিরে গেলে আকর্ষণীয় হবে, সবাই ঈর্ষায় ও প্রশংসায় তার দিকে তাকিয়ে ভাববে যে সে দস্তুরমত একটা ছুটী উপভোগ করে এসেছে। দলে দলে লোক দূরে দূরে বালুকায় দেহ রক্ষা করে রৌদ্রের দান গ্রহণ করছে। এদেশে মাত্র চার পাঁচ মাস ভাল করে সূর্য্যদেবতা দেখা দেন, তাই তার কিরণধারা সঞ্চয় করে রাখবার এত আগ্রহ। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে ভারতীয়ের দেহে কি প্রচুর পরিমাণেই না সূর্য্যোত্তাপ সংগৃহীত আছে এবং সেজন্যই বুঝি গরম দেশ থেকে আসা সত্ত্বেও তার প্রথম প্রথম শীত করে কম।

সাগরপারে

আর যদি ইচ্ছা হয় ওই বিস্তীর্ণ বালুবেলায় একাকী উপলবন্ধুর পথে সাগরজলে স্পর্শ করতে করতে বহুদূর চলে যেতে পারব মনে মনে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আবৃত্তি করে। হয় ত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বিজনতা ভঙ্গ হবে না; হয় ত কেহ শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে নীরবে চলে যাবে; হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করবে "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" তখন হয়ত "চঞ্চল আলো আশারি মতন কাঁপিছে জলে।" অথবা কখনো হয় ত সাগরের কোলাহল ত্যাগ করে নগরের লোকালয় বেশী ভাল লাগবে। আপেলকুঞ্জ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত ইংলণ্ডের দৃশ্য দেখতে পাব ও মন পুলকিত হয়ে উঠবে। কত কবিতায় এর বর্ণনা; কত নিবিড় পরিচয়, কত সুকুমার সৌন্দর্য্য দিয়ে এ দৃশ্যকে সাহিত্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটী ভূমিখণ্ডের বর্ণনা দিয়ে তাকে অন্যটী থেকে পৃথক করে বেছে নিতে পারব কারণ এদেশের স্থানবর্ণনায় কবিপ্রসিদ্ধির বালাই নেই। এরা নিজের অন্তর দিয়ে নিজের দেশের স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্যটুকু দেখতে পারে, এমনিভাবে একটী লোকালয়কে দেখবার ইচ্ছা হল হয় ত কখনো।

"Sweet-William with his homely cottage-smell,
And stocks in fragrant blow;
Roses that down the alleys shine afar
And open, Jasmine-muffled lattices,

And groups under the dreaming garden trees,
And the full moon, and the white evening star"

Jasmine muttled lattices-এইটুকুতেই সৌন্দর্য্যময় সুশোভন ইংলণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে প্রাণময় হয়ে উঠে।

নর্ফোক ব্রড্সের নীতি হচ্ছে—"মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে"। জলে স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাবিহারের শ্রেষ্ঠস্থান হচ্ছে এখানে। পাল তুলে নৌকা (yatch) সপ্ সপ্ করে শান্ত স্বচ্ছ জলরাশির উপর দিয়ে চলে যাবে; দুধারে ধানের শীষের মত লম্বা লঘু জলঘাস, তার ভিতর দিয়ে সর্ সর্ করে বাতাস বয়ে নৌকার স্তব্ধ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। নৌকার পালের ছায়ায় বসে ডেকচেয়ারে একখানি বই নিয়ে অথবা উদার দিগন্তের দিকে আঁখি মেলে বা নিমীলিত রেখে দিনের পরদিন কাটিয়ে দিই। আহারের উপকরণের জন্য স্থলে যেতে হবে না, কোথাও না কোথাও জলেই নৌকার দোকান ভাসছে তীরে তরী এনে স্বপ্নভঙ্গ করতে হবে না। কোন তৃণাচ্ছাদনের মধ্যে একটী বক, কোন বাঁকের অন্তরালে প্রাচীন সময়ের চিহ্নস্বরূপ একটী উইণ্ড-সিল দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কল্পনায় পাল দিয়ে তাকে উদ্দামগতিতে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যে যত বেশী কর্ম্মক্লান্ত, যত বেশী অর্থের সন্ধান ও সাশ্রয়ে বিজড়িত, রক্তকরবীর রাজার মত যে যত বেশী স্বর্ণশৃঙ্খলিত সে সাময়িক মুক্তিকামী হলে তার কাছে এই ব্রড্স্ তত বেশী বিরামস্থল বলে মনে হবে। নিস্তরঙ্গ নির্ভয় জলরাশি যে শান্তিপ্রলেপ দেয় তার তুলনা সহজে মিলে না। সবচেয়ে ভাল লাগে সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা ও ব্যবহারিক সামাজিকতার অভাব। সেজন্যই যে সব ধনীরা এখানে আসে তাদের বিশিষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলতে হবে। এখানে যে রকম খরচ পড়েছে তাতে তারা সম্ভ্রান্ত বিলাসের স্থলে গেলেও পারতেন।

এখানে আসলে পূর্ব্ববঙ্গের জলভরা ধানক্ষেতের কথা মনে হবেই। এই জলরাশির মধ্যে বিজড়িত নেই দরিদ্র কৃষকের আশা ও আশঙ্কা এবং কুটীরবাসীর সামান্য কুটীরের নিরপত্তার সমস্যা! আর একটী অভাব আছে যার জন্য এই ব্রড্সকে যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্টিক মনে করতে পারলাম না। একটী চক্রবাক মিথুন এই সুকোমল শস্পরাজি ও স্বচ্ছ জলরাশিকে পরিপূর্ণ একটা রূপ দিতে পারত। সে কথা বিশেষ করে মনে হয় যখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেও নীচে নৌকার ভিতরে নেমে আসার প্রয়োজন থাকে না, সারাদিনের লক্ষ্যহীন ব্যাঘাতহীন জলবিহারের আনন্দের উপর একটা অকারণ ও পরিচয়হীন অব্যক্ত বিষাদ ছায়াপাত করে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটুকুকে, সমস্ত আকাশখানিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এই জলের উপরে যে শুভ্র শান্ত স্বপ্নপ্রায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে তাকেও অন্তরে না নিলে সারাটী দিনের উজ্জ্বল আলোকে সম্পূর্ণতা দান করা যাবে না।

Norfolk Broads-এ

সমস্ত দেশটার বসন্তকালটুকুকে স্পর্শ করে অনুভব করবার জন্য একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠছে। বইয়ের পাতা থেকে গাছের পাতার দিকে কতবার মন চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। লাইব্রেরীর বিজলী আলো থেকে চোখ বারবার বাইরের ঈষৎ সূর্য্যালোকের দিকে

আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সময়ে পরীক্ষার কথা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যেন অপরাধ, যেন অপবিত্রতা। ঘরের ও বাহিরের, কর্ত্তব্যের ও প্রকৃতির দোটানায় পড়ে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় হচ্ছে সন্ধিস্থাপন করা। আমিও তাই করলাম। সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন কাজ ও দেড়দিন অকাজ। দেশে থাকতে এতটা অকাজের কথা কল্পনা করতেও ভয় করত ও বহু হিতৈষীর হিতবচন ও বাক্যবর্ষণের ভয় থাকত। এখানে কেউ নেই; স্বেচ্ছা-বিহারের সুবিধা সুলভ, পথও প্রচুর। কাজেই শনিবার হলেই ছুটী ও বেরিয়ে পড়া। তার ফলে পড়াও ভাল হতে লাগল। পুরস্কার পিছনেই আসছে জানা থাকায় পরিশ্রমেও মাধুর্য্য পাওয়া যায়। আর ছুটীর পরে কাজে যে মনোযোগ ও উৎসাহ দেখা দিতে লাগল তা দেশে কখনো অনুভব করিনি। দেহেও ক্লান্তি রইল না, মনে রইল না অশান্তি।

কোন কোন দিন বেরিয়ে যেতাম অশ্বপৃষ্ঠে। লণ্ডনের বাইরে বহুদূর ট্রেণে গিয়ে একজায়গায় নেমে পড়া যেত। বনে বনে অশ্বারোহণের আনন্দ হল অপরিসীম, প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যেন নবযৌবন এনে দিত সর্ব্বদা। কখনো পথে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ; কখনো সারাদিন আমার বন্ধু একমাত্র এই চতুষ্পদ। বনের বিজনতা নগরের জনতার পরে বড় মধুর ঠেকতে লাগল। কখনো কয়েকজনে মিলে মটরে যাওয়া যেত। এমনি একটা অভিযান হল উত্তর ওয়েলসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে। কোন কোন জায়গায় শিলং পথের মত সংকীর্ণ চড়াই ও উৎরাই; কিন্তু সে পথের শ্যামসৌন্দর্য্য এখানে ছিল না। এখানে ছিল প্রস্তর-পথ আর রসহীন প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে অগণন ফুলের সৌন্দর্য্য। পার্ব্বত্য স্কটল্যাণ্ড ও পার্ব্বত্য ওয়েলসের রং বিভিন্ন। প্রথমটী শ্যামল ও অযত্নবর্দ্ধিত, দ্বিতীয়টী ধূসর ও সুসজ্জিত। ওয়েলস্ বেশী সভ্য ও কথা বলে কম।

সাধারণভাবে ভ্রমণও কম হতে লাগল না। প্রায় সপ্তাহেই পদব্রজে কোথাও না কোথাও যেতে পারতাম। অবশ্য সহরতলীর পর বেশ কয়েক মাইল ট্রেণে পার হয়ে যেতে হত কারণ ইংলণ্ডে নগর গ্রামকে ক্রমশঃ গ্রাস করছে ও ভবিষ্যতে গ্রাম বলতে সহরের সাধারণ সংস্করণ মাত্র বুঝাবে। কত ছোট ছোট অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রামকে নিজের আবিষ্কারের আনন্দে নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত দেখলাম। কত সামান্য হ্রদ, সাধারণ উপবন ও প্রাচীন গির্জ্জাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনুকরণে দেখতে চেষ্টা ও ইচ্ছা করলাম।

মটরপথে

"The joy of widest commoralty spread"—এর আনন্দ কত দিন কত তুচ্ছ জিনিষে অনুভব করলাম যা আর একসময়ে হয় ত হাস্যজনক মনে হবে।

একটী হ্রদের তটে

চোখের সামনে বিরাজ করছে। কতবার একথা মনে হয়েছে যে যেখানে ধর্ম্ম দয়াহীন, সমাজ ক্ষমাহীন ও মানুষ মানুষের প্রতি উদাসীন, বৈরাগ্য যেখানে আলস্যের আবরণ ও ক্ষমা দুর্ব্বলতার আভরণ সেখানে ইংলণ্ডের এত বেশী নিন্দালোচনা ঠিক শোভন নয়। বরং তার গুণাবলির দিকে বেশী মনোযোগ দিলে কিছু উপকার হতে পারে। সবচেয়ে বেশী একথা মনে রাখা উচিত যে যারা এত উন্নতি করেছে, যাদের এত পৃথিবী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য—এমন কি আমাদের সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের দেশের উপরেও—যাদের এত ঐশ্বর্য্য ও বিলাস, এত সাহিত্য ও সুকুমার কথা, সে জাতির এই উন্নতি অসচ্চরিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

দোষদর্শী হওয়ার চেয়ে গুণগ্রাহী হওয়ায় লাভ আছে।

আবার কটী দিন একটানা ছুটী কাটাতে বের হওয়া গেল। ভারতবর্ষীয় গ্রামোন্নতির জন্য একটী সমিতি আছে

মাঝে মাঝে অপ্রিয় প্রসঙ্গও উঠে পড়ত। একদিন একজন সঙ্গী মিস্ মেয়োর বইয়ের উল্লেখ করলে ও সে নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেল। তখন একথাও মনে পড়ল আমাদের দেশের কত অভিভাবক এদেশের 'মায়া-রাক্ষসীর' প্রভাবের জন্য সতত শঙ্কিত থাকেন। আমাদের কোন কোন লোক যদি ওদের সঙ্গে বিশিষ্ট অন্যায় ধারণা পোষণ করতে পারে, ওরাও তেমন ভুল ও অন্যায় করতে পারে। প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে তাদের শুধু দোষ দিলেই হবে না, সামাজিক অবরোধ ও অন্ধকার থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা ও তীব্র আলোকের মধ্যে তারা এসে পড়ে তাকেও দোষী করতে হবে। প্রদেশ ত আর 'মায়া-রাক্ষসী'তে পরিপূর্ণ নয়। কজনই বা এই কালো বিদেশীদের গিলে খাবার জন্য রসনায় ধার দিতে চাইবে? আমরা দেশে থেকে যে সব গল্প শুনে থাকি সেগুলি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। আর আমাদের মধ্যেই কি খারাপ আছে কম? বরং সেগুলি আরো বেশী নগ্ন, অসহায় ও অশোভনভাবে

সভাগৃহ

ইংলণ্ডে। তারই বার্ষিক অধিবেশন হবে। অবশ্য আমার উদ্দেশ্য গ্রামসভা নয়, গ্রাম্যশোভা। অতি সুন্দর একটী প্রাসাদে এই সভা হবে। সেখানে এসে নূতন করে গ্রামে থাকার আনন্দের সঙ্গে সহরের আরাম পাওয়া গেল।

কৃত্রিম পাহাড়

সৌন্দর্য্যপ্রিয়ের জাত এরা তাই সভার অধিবেশন হবে এমন সুন্দর গৃহে ও সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে। সকালবেলা থ্রাসের কূজন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায় আর কতদূরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবুজ প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ হয় ত একটী স্রোতস্বিনী মিলবে; কোথায় বৃহদাকার গরু চরছে; কোথাও একটী চাষা যাচ্ছে; একজায়গায় কাটা গাছের গুঁড়ির উপর একটী শিশু বসান হয়েছে। চারদিকে একটা সম্পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির আভাস পাই যার অভাব আমাদের দেশে বড় কষ্ট দেয়। কাছেই একজায়গাতে একটী কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করা আছে; তার ভিতর সুরঙ্গপথে ছোট রেলগাড়ী চলছে; কিছু পয়সা দিয়ে তাতে চড়া যায়। সারাদিন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকা সহজ; সমিতির কথা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না কারণ মন রয়েছে গৃহাভ্যন্তরে নয় মুক্ত প্রান্তরে। একটু আগে একজায়গায় গ্রাম্যসঙ্গীত শুনে এসেছি; গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেধে community singing করেছে; সহজ ভাব, সরল সুর সে সব গানের। তাদের সম্মান গ্রামে ও প্রকৃতির চোখে; নগরের সুশিক্ষিত গীতনিপুণ সুরশিল্পীর কাছে তাদের বিশেষ দাম নেই। কিন্তু সন্ধ্যার দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে এই গানগুলি আমার মনকে আকর্ষণ করেছে; ওয়ার্ডস্বার্থের হাইল্যাণ্ডবাসিনী একাকিনী কৃষকবালিকার গানের মত আমার মনকে কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনিয়েছে।

সেখানে তারা ভারতবর্ষীয় গান শুনতে চেয়েছিল; কিন্তু আমাদের পল্লীসঙ্গীত লোপ পাচ্ছে ও সহরে সামান্য কয়জন গীতকুশল হয় ও বাকী সকলে গীতহীন হয়। কাজেই ভারতীয় কণ্ঠ তাদের কোন আনন্দ দিবার অয়োজন করতে পারল না। আমাদের যে নিরানন্দের দেশ।

Community singing

এমনি করে হাফোর্ডশায়ারের সেই গ্রামটীতে আনন্দের মধ্যে এক একটী দিন সম্পূর্ণ শতদলের মত বিকশিত হতে লাগল। ফুলে ফুলে মাটী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 'ড্যাফোডিলের' স্নিগ্ধতায় অন্তর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। 'হেজের' লতাগুল্মের পাশ দিয়ে হাটতে গেলেই পাখী পিছন থেকে ডাকে, ঝোপের স্পর্শ যেন আটকিয়ে রাখতে চায়। গন্ধের সুবাসে রাত্রের অনিদ্রা আকুল করে ও নিদ্রা নিবিড় হয়ে উঠে বার বার বুঝতে পারি—

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

ক্ষণিকের সঙ্গিনী

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ক্ষণিকের সঙ্গিনী এসেছিলো ক্ষণিকের জন্য,
চরণে জানিয়েছিলো অসীম কালের মহা দৈন্য।
বসেছিলো মুখোমুখী,
যেন দুটি চকা-চকী,
হয়েছিলো চোখাচোখী,
তনু মন হয়েছিল ধন্য।
জীবনের মাঝখানে এসেছিলো ক্ষণিকের জন্য।

বাহু বন্ধনে তার রোমাঞ্চি উঠেছিলো অঙ্গ;
সলজ্জ অন্তর রাঙা হলো পেয়ে মধু-সঙ্গ।
অধরে স্বপন আঁকি,
কপোলে আবীর মাখি,
নয়নে নয়ন রাখি,
করেছিলো মোর যোগ ভঙ্গ
ক্ষণিকের পরশনে রোমাঞ্চি' উঠেছিলো অঙ্গ।

দুটি সুখ চুম্বনে তনু-লতা উঠেছিলো ছন্দি'
কী পুলকে বাহু দিয়া মোর দেহ করেছিলো বন্দী,
যা' দিয়েছি বেশী তার,
চাহেনি সে একবার,
আজি হায় বারবার,
স্মৃতি তার উঠিতেছে ক্রন্দি',
তার কথা, তার গাথা, উঠে আজ হিয়ামাঝে ছন্দি'।

তাহার তৃপ্তি মোর বাসনারে করেছিলো রুদ্ধ,
দুদিনের আলাপনে প্রাণ মোর হয়েছিলো মুগ্ধ।
আজি তার কথা স্মরি
কেঁদে মরে বিভাবরী,
দুটি আঁখিকোল ঝরি
ঝরে জল রহি রহি ক্ষুব্ধ;
জীবনের পথ-রেখা স্মৃতি তার করিয়াছে রুদ্ধ।

স্বধর্ম্মী

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল

হঠাৎ কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে যতীশদার সঙ্গে দেখা।

বড়দিনের বন্ধে কয়েকটা কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম—ইচ্ছা ছিল সেই অবসরে নাতিনীটার জন্য দুই এক জায়গায় বিবাহের কথাবার্ত্তাও সারিয়া আসি। ছোট নাতিটী বায়না ধরিয়াছিল, তাহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলাম। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে তাহার জন্য একটা বেলুন-বাঁশী কিনিতেছিলাম, সম্মুখে দেখি যতীশদা আসিয়া একটা বাঁশী দর করিতেছে। বহুকাল পরে দেখা, কিন্তু চিনিতে একটুও দেরী হইল না। ঠিক সেই রকমই আছে—তেমনি ছোট ছোট চুল, লম্বা টিকি, গায়ে চাদর,—কেবল ভ্রূ দুইটা যেন একটু পাকিয়া গেছে, আর মাথার মধ্যখানে টাকটা গ্যাসের আলোতে যেন একটু বেশী চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

ডাকিলাম,—'আরে যতীশদা যে!'

যতীশদা যেন অপ্রস্তুত হইয়া বাঁশীটা রাখিয়া দিয়া কহিল—'আরে ভায়া যে!'

প্রথম সম্ভাষণের পক্ষে এই যথেষ্ট। তারপর আরম্ভ হইল যতীশদার সেই অফুরন্ত বাক্যস্রোত! ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, একবার কথা কহিতে আরম্ভ করিলে আর থামিতে চায় না। একটা প্রসঙ্গ হইতে আর একটা প্রসঙ্গ অবিরত চলিয়া যায়—ক্লান্তি নাই। সেই যতীশদা—আজও ঠিক তেমনি আছে—তেমনিই বকিয়া চলিয়াছে। তবে তফাতের মধ্যে এই—আগে হইত শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা এখন তাহার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে! স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া যতীশদা অনর্গল একতরফা বকিয়া চলিল,—আধুনিক শিক্ষা—বিবাহ বিচ্ছেদ আইন—রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচি—ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের ভোটে পরাজয়—এই সব বড় বড় কথা! সব কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না—কিন্তু দাদার চোখ দুইটা উৎসাহে-উদ্দীপনায় জলজল করিতে লাগিল। দেখিলাম পাশে দুই চারিটী লোকও জড়ো হইয়াছে—কে একটা ছোকরা বলিয়া উঠিল,—'গোলদীঘিতে চলুন না।'

যতীশদাকে থামাইবার জন্য আমি একটু পাশে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম—'এখন কি করা হচ্ছে দাদা?' মৃদু হাসিয়া দাদা উত্তর দিলেন—'কি আর করব বল,—তোমরা ত আর গাঁয়ে থাকৃতে দিলে না—।'

অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম; আশঙ্কা হইল, পাছে আবার সেই বহু পুরাতন প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। পনেরো বৎসরের কথা প্রায়—ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তখন কি একটা দুর্ণাম রটিয়াছিল যতীশদার নামে। কথাটা তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই;—আর কেমন করিয়াই বা পারিব!…পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়—ঘরে সাত আটটী উপযুক্ত সন্তান—নিত্য-নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করে—সে কিনা একটা বাগ্‌দি মেয়ের সঙ্গে—ছিঃ ছিঃ তাহাও কি কখনো হইতে পারে! কিন্তু তাহার পর হইতে যতীশদা গ্রাম ছাড়িয়া আসে—বাগ্‌দির মেয়েটাকেও কেহ কখনো আর দেখে নাই। অমন নিষ্ঠাবান স্বধর্ম্মাব্রতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহকে আমি আমল দিই নাই। কিন্তু যতীশদার ছেলেরা প্রায়ই বলিয়া বেড়াইত, তাহাদের বাবা গ্রামে আসিলে তাহারা নাকি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।…পাছে সেই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ আবার আসিয়া পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম—'এখন কোথায় কাজ করছ যতীশদা?' যতীশদা হাসিয়া বলিল,—'সে একটা কাজ পাওয়া গেছে ভালো। 'ধর্ম্মস্থান' বলে একটা কাগজ আছে জানো ত?—এখন সেইটাই আমি চালাচ্ছি'।'

—'চালাচ্ছ'?

—'হ্যাঁ হে হ্যাঁ। মানে, সম্পাদক একজনকে করা গেছে বটে, কিন্তু আমিই সব করি। 'তীর্থস্বামী' নামে যে লেখক দিনের পর দিন 'ধর্ম্মস্থানে' লেখে সে কে জানো?—সে

এই শর্ম্মা।'—বলিয়া যতীশদা নিজের বুকে ডানহাতের বুড়া আঙুলটা ঠেকাইল।

মনে পড়িল বটে 'ধর্ম্মস্থান' কাগজে 'তীর্থস্বামীর' উদ্দীপনা-পূর্ণ প্রবন্ধগুলির কথা—ধর্ম্ম, সমাজ, সনাতন আচার—আর্য্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত আলোচনা।...

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুমি আবার লিখ্‌তে শিখ্‌লে কবে, যতীশদা?'

যতীশদা গম্ভীরস্বরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'আমি কি যে-সে লোক ভায়া! এখন আমায় সব সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে হয়। কোথাও কেনো 'এজিটেশন' বা 'প্রোপাগাণ্ডা'র, দরকার হলে—ডাক পরে এই যতীশ শর্ম্মার!—তা জানো?'

কেমন করিয়াই বা জানিব।—মফঃস্বলে থাকি, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কানে আসে না!—তাই চুপ করিয়া রহিলাম। যতীশদা বলিতে লাগিল,—'এই সে দিন কাগজে 'ফিরিয়া দেখ' বলে এমন একটা প্রবন্ধ লিখ্‌লাম যে চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল! দু' চারটে মনগড়া উদাহরণ দেখিয়ে, খুব করে আধুনিক শিক্ষাকে দিলাম গালাগাল। তার পরদিনই 'সুষমা দেবী'র ছদ্মনামে নিজের লেখার প্রতিপাদ নিজেই করলাম।'

ভালো বুঝিতে পারিলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—'নিজের লেখার প্রতিবাদ নিজে কেন করলে?'

যতীশদা বলিল—'আরে ঐ ত হল মজা! তারপরেই আবার লিখ্‌লাম,—'পথ কোথায়,' তারপর 'জাগো,'—তারপর—'সাঁঝের পিদিম'। এই আর যায় কোথা!—দেশে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল!—কেউ দিলে গালাগাল,—কেউ বা করলে সুখ্যাতি—খুব নামটা বেরিয়ে গেল।—প্রোপাগ্যাণ্ডারও সুবিধা হয়ে গেল।'

আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম। নাতির হাতে একটা কমলালেবু ছিল, তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। পাশে একজন কাগজ বিক্রেতা আসিয়া হাঁকিল,—'আজকের 'ধর্ম্মস্থান' পড়ুন বাবু,—জবর খবর!'

যতীশদা বলিল,—'একখানা 'ধর্ম্মস্থান' নাও হে!—আজকে 'মন্দির প্রবেশ' বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছি—গান্ধীর হরিজন আন্দোলনকে গাল দিয়ে। বুঝেছ ভায়া—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি—তার ওসব আন্দোলন-টান্দোলন সাজে না। আগে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া দরকার—তারপর সমাজ সেবা। ওসব হরিজন-ফরিজন বুঝি না ভাই,—বুঝি সনাতন ধর্ম্ম—জানি স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ।'

দেখিলাম যতীশদার ধর্ম্মপ্রীতি এখনো তেম্‌নি আছে—এখনো তেম্‌নি ধার্ম্মিক তেম্‌নি শুদ্ধাচারী। মিথ্যা লোকে একটা বদ্‌নাম দিয়া এমন লোকটাকে গ্রামছাড়া করিয়াছিল! গান্ধীর কথা বলাতে একটু তর্ক করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহা চাপিয়া গেলাম। ভাবিলাম, এই যে সত্যাশ্রমী ধর্ম্মব্রতী লোকটা সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে এমন করিতেছে—ইহাও ত ভাবিবার কথা!

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কাগজটা কি নিজেই বার করলে যতীশদা'।

যতীশদা হাসিয়া বলিল,—'দূর! আমার টাকা কোথায়! রাধানগরের মোহান্তকে গিয়ে বল্‌লাম,—'এই যে গান্ধী মন্দিরপ্রবেশ আইন করাচ্ছে। এটা পাশ হলে দেশের মোহান্তদের অবস্থা সঙ্গীন! সব তারকেশ্বরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে! আইনের বলে মোহান্তদের গদীচ্যুত করে হরিজনেরা মন্দির দখল করবে। খুব বুঝিয়ে দিলাম। মোহান্তটা ত আর ইংরাজী জান্‌ত না। একেবারে ভড়্‌কে গেল। বল্‌লে,—'কি উপায়?' আমি বল্‌লাম—'একটা কাগজ বার করুন, জনমত গঠন করতে হবে; সভাসমিতি করুন আন্দোলন চালান্‌—প্রোপাগাণ্ডা হোক্‌।—সে-ই ত টাকা দিলে।'

শুনিয়া কেমন দমিয়া গেলাম।

দাদা বলিতে লাগিল,—'দরকার পড়্‌লে সব রকমই করতে হয়। যে কাজ ভালো বুঝ্‌ব, তার জন্যে নী বাঁধন সব ক্ষেত্রে মেনে চল্‌লে হবে না। গীতাখানা পড়েছ ত?'

শুনিয়া মনে একটু আঘাত লাগিল। ভালোমন্দ জানি না, তথাপি বহুদিনের সংস্কারবদ্ধ মন কিসের আঘাত পাইয়া যেন নড়িয়া উঠিল। কিন্তু সেই অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল না। এমন সময় নাতি ধাক্কা দিয়া বলিল,—'বাড়ী যাবে না দাদু?'

সচকিত হইলাম ; বলিলাম—'আজ তা হলে চলি যতীশদা ! রাত হ'তে চ'ল্‌ল—ঠাণ্ডা পড়্‌ছে খুব। তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা দাও,—একদিন যাব।'

যতীশদা ব্যস্ত হইয়া বলিল,—'বাড়ী কেন ভাই ! তুমি 'ধর্ম্মস্থান' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো একদিন—সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকি।'

অগণিত লোকের ভিড়ের মাঝে যতীশদা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িল।

তারপর অনেকদিন আর কলিকাতায় যাই নাই। 'ধর্ম্মস্থান' কাগজ নিয়মিত পড়ি। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে ভালোই লাগে ;—মনটা ক্রমশঃ রক্ষণশীল হইয়া পড়িতেছে—প্রগতির কথা শুনিলে যেন আলস্যে স্থবির হইয়া আসে। আজকাল যতীশদা ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে খুব লিখিতেছে—পড়িতে পড়িতে ঋষি-ভারতের মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

নাতিনীর বিবাহের আশীর্ব্বাদ করিতে শ্রাবণ মাসে একদিন কলিকাতায় যাইতে হইল। ভাবিলাম যতীশদার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাই। ধর্ম্মস্থান অফিসে যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সেখানে একজন ছোক্‌রা বসিয়া প্রুফ্‌ দেখিতেছিল, বলিল,—'আজ তিনি আসেন নি, বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখ।'

স্ত্রী ? চমকিয়া উঠিলাম। যতীশদার স্ত্রী ত প্রায় কুড়ি বৎসর হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন,—আর সে আমাদের গ্রামেই—আমার সম্মুখে! সেই থেকেই ত যতীশদার ধর্ম্মে অত মতি !···ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; লোকটাও ঠিক বুঝাইতে পারিল না। বাড়ীর ঠিকানাটা লইয়া একবার দেখিতে গেলাম।

তালতলা অঞ্চলে ছোট একটা বাড়ী,—যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁতসেতে। বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় একপ্রকার দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। বৈঠকখানা দেখিতে পাইলাম না, দরজাটা একটু খুলিতেই অন্দরের বারান্দাটা চোখে পড়িল। বৃষ্টির জলে চতুর্দ্দিক ভিজিয়া আছে—খানিকটা অপরিষ্কার জল বাহিরের পথ খুঁজিয়া না পাইয়া দরজার পাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। দেখিলাম, যতীশদা বারান্দায় বসিয়া একটা বৎসরখানেকের ছেলেকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এটা কে যতীশদা' ?

নতমুখে ধীরে ধীরে যতীশদা বলিল,—'এটা আমার ছেলে ভাই ! বুড়ো বয়সে ঝঞ্ঝাট দেখো না !'-

গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বিয়ে করলে কবে ?' যতীশদা বলিল,—'সে আর বল কেন ভাই !—এক ব্রাহ্মণ সে এমনি ধরলে—যে আর 'না' বল্‌তে পারলাম না। স্বঘর—গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ—তার উপর মোহান্ত মহারাজের অনুরোধ—সে যে কি বিপদ !—আর আমাদের শাস্ত্রেই ত বলেছে—'

বাধা দিয়া বলিলাম,—'থাক্‌ আর শাস্ত্রের কথা বলো না। ছিঃ ছিঃ—ঘরে তোমার উপযুক্ত ছেলে মেয়ে—'

যতীশদা ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল—'সে যে কত বড় সমস্যায় পড়েছিলাম, তা তোমরা কল্পনায় আন্‌তে পারবে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে এই কাজ করতে হয়েছিল—একরকম আত্মহত্যা বল্‌লেই হয়। ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্ম সমাজ রাখ্‌বার জন্য কতবড় স্বার্থত্যাগ করলাম, তা ত তোমরা কেউ বুঝ্‌বে না !—'

মনে মনে বলিলাম, না বুঝাই ভালো। এই যতীশদাই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কত কথাই না রোজ লিখিতেছে। উঃ পয়সার লোভে মানুষ যে কতবড় ভণ্ডামীই করিতে পারে। গুণ্ডার গুণ্ডামী বুঝিতে পারি, কিন্তু এই শ্রেণীর সুবিধা-বাদীদের স্বরূপ বুঝা কত কঠিন। সনাতনধর্ম্মকে রসাতলে না পাঠাইয়া ইহারা ছাড়িবে না। ইহাদের কার্য্যে দেশের যুবকেরা আজ সনাতনধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।···

দুধ খাওয়ানো শেষ হইয়া গেল, ছেলেটাও অত্যন্ত চেঁচাইতে লাগিল। তাহাকে কোলে দোলাইতে দোলাইতে যতীশদা বলিল,—'বসো না ভাই ! সুষমার—মানে, এর মার বড় অসুখ কি না !'—সেই সুষমা দেবী !—ছদ্ম নাম ব্যবহার করিবার সময় এই নামই লিখিয়াছিল বটে।

ছেলেটার পানে চাহিলাম,—যেমনি রোগা তেমনি কুশ্রী—তাহার উপর কান্নার বিরাম নাই। বেলুনবাঁশী দর করিবার কথাটা চকিতে মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম—'থাক দাদা—আজ চলি।'

* * * *

মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন থামিয়া গেছে। 'ধর্ম্মস্থান' কাগজও বন্ধ হইয়াছে। ভাবিতেছিলাম যতীশদা না জানি আবার কি মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।

যতীশদার বড় ছেলে আসিয়া বলিল,—'কাকাবাবু, এই দেখুন এক উকীল চিঠি দিয়েছে; ইংরেজীতে লিখেছে, সব কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।'

পড়িয়া দেখিলাম, কলিকাতায় এক উকীল লিখিয়াছেন যে যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তদীয় পত্নী শ্রীমতী সুষমা দেবীর নামে উইল করিয়া গেছেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তিতে দখল লইতে হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।...

সব কথা পড়িতে পারিলাম না, চোখ ঝাপসা হইয়া গেল। ছেলেরা আজ পথের ভিখারী!

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:*:—

অন্ধের হাতী দর্শন

(যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা)

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কতগুলি জন্ম-অন্ধ বসি' এক ঠাঁই
গল্প করে একদিন কাজকর্ম্ম নাই ;
এমন সময় সেথা হাতী এক এল,
অন্ধ সবে একে একে দেখিবারে গেল।
একজন পায়ে তার বুলাইয়া হাত
"থামের মতন হাতী" বলে তৎক্ষণাৎ।
কাণে হাত দিয়ে বলে অন্য একজন,
"না রে ভাই, হাতীটাত কুলোর মতন।"
শুঁড়ে হাত নিয়ে পরে বন্ধু তার কয়,
"সাপের মতন হাতী মনে মোর লয়।"
যতটুকু যে দেখিল বলিল তেমন,
বিভিন্ন মতের শুধু হইল সৃজন।
অখণ্ড বিরাট রূপ দেখেছে যে জন,
সম্ভব তাহারি দ্বারা সমস্ত বর্ণন।

—:0:—

সাতদিনের স্মৃতি

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিনগুলোর মধ্যে যখন নূতনের আস্বাদ জাগে, আসে ক্ষণিকের পরিবর্ত্তন, তখন অন্তর মেতে উঠে আনন্দের নেশায়। মানুষ চিরদিন একই ভাবে কলের পুতুলের মত জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায় না—নূতনের নেশা তাকে চিরদিন পাগল কোরে তুলে, সে চায় একটু পরিবর্ত্তিত দিনে, একটু শান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচতে। —দৈনন্দিন রুটিন বাঁধা জীবন অতিষ্ঠ কোরে তুলে তাকে, সে হারিয়ে ফেলে গানের রেশ—অন্তর হ'য়ে ওঠে আনন্দহীন, সাহারা।

কলকাতার এমনি রুটিন বাঁধা দৈনন্দিন জীবনের মাঝে যখন শুনতে পেলাম আমাদের ইউনিভারসিটি পোষ্ট গ্রেজুয়েটের টেনিস ও ফুটবল দল এবার 'ওয়ালটেয়র' অভিমুখে যাত্রা কোরবে, তখন অন্তর উঠ্‌লো নেচে— চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় স্বপ্নছবি। মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম মাননীয় ভায়েস-চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়কে—যাঁদের অনুমতি ব্যতীত আমাদের 'ওয়ালটেয়'র-স্বপ্ন ব্যর্থ হ'তো। ঠিক হ'লো আমাদের সঙ্গে যাবেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়।

সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখ, রাত আট্‌টা। আমরা প্রায় বিশজন ছাত্র, সকলেই জড়ো হয়েছি হাওড়া ষ্টেশনে। একটা কোরে বেডিং আর স্যুটকেস সঙ্গে; হৈ চৈ পড়ে গেছে। ম্যাড্রাস মেল ছাড়তে আরও কিছু বাকি। একখানা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ রয়েছে (অবশ্যি একশ এগার নম্বর), একে একে গিয়ে সবাই চেপে বসলাম—যার যার বেডিং বিছিয়ে।

সময় হ'য়ে গেল। ট্রেণ ধীরে ধীরে হাওড়ার প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চল্লো। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের জয়ধ্বনিতে ভরে গেল কম্পার্টমেণ্টখানা। আমাদের সকলের অন্তরেই যেন কী এক আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল। এবার সত্যি তা' হ'লে চলেছি - ওয়ালটেয়রের পথে! এতদিনের আশা আজ সার্থক হ'তে চলেছে!

সুদূরপ্রসারিত চিল্কা হ্রদে ভোরের আলো ঝিল্‌মিল্ করছে।

রাতের অন্ধকার ভেদ কোরে ম্যাড্রাস মেল সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে চলেছে। আমাদের ভেতর কেউবা গান ধরেছেন, কেউবা বাঁশী নিয়ে মগ্ন—যেন মুক্তির পথে ছুটে চলেছি—অনন্ত বিশ্বের আনন্দ সুধার যেন সন্ধান পেয়েছি আমরা।

ক্রমশঃ রাত এলো ঘনিয়ে গভীর হয়ে, ঘড়ির কাঁটা

ঘুরে ঘুরে এলো ছু'য়ের কোঠায়, কণ্ঠ-কোলাহল এলো নিঝুম হ'য়ে। একে একে চোখে ঘুমের নেশা জড়িয়ে এলো, অচেতন হ'য়ে অনেকেই শয্যা-গ্রহণ করলেন। আমার চোখেও তার ছোঁয়া এসে লাগ্‌লো, চোখের পাতা এলো বুজে।

যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, দেখতে পেলাম সোনালী রোদ এসে ছুঁয়েছে আমার গা। অদূরে ওয়েষ্টার্ণ ঘাটের পর্ব্বতমালা অরুণ-আভায় রচেছে স্বপ্নমায়া। এদিকে সুদূর প্রসারিত চিল্কা হ্রদ ভোরের আলোর প্রথম পরশে ঝিলমিল করছে। মনে হ'লো রূপালী ওড়না উড়িয়ে চিল্কার এ অপূর্ব্ব শোভায় কতক্ষণ এমনি মগ্ন হ'য়ে ছিলাম জানি না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই যে এ পথের বৈশিষ্ট্য তাতে সন্দেহ নেই। পথের পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট মন্দির দেখ্‌তে পেলাম,—হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বনি নিয়েই যেন ওরা দাঁড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভেতর আত্মহারা হ'য়ে এতদূর পথ কাটিয়ে এসে বেলা দেড়টায় হাজির হ'লাম বিজয় নগরে। এখানেই প্রথমতঃ আমাদের নাব্‌তে হ'বে, এখানকার খেলাধূলা শেষ কোরে আমাদের রওনা হ'তে হ'বে ওয়ালটেয়ার অভিমুখে।
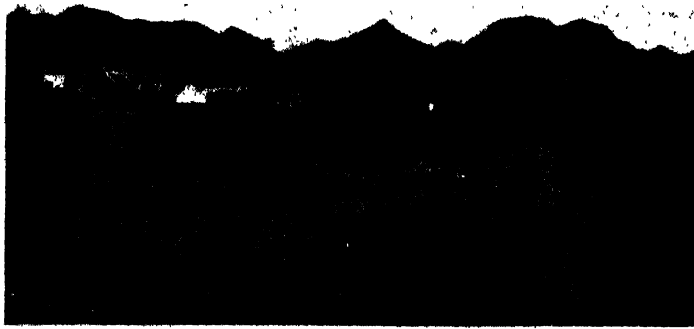
বিজয়নগরে প্রবেশ

প্রকৃতি দুলালী যেন কার ধ্যানে নিবিষ্টা। কী সুন্দর! নয়ন মন এক নিমেষে মুগ্ধ কোরে দিল।

—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর স্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্ম্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন পানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি';

—বিশ্ব-কবির লাইন ক'টি মনে হ'লো। এ যেন ঠিক তাই। দূরে—আরো দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল। চিল্কার পাশে পাশে ট্রেণ চল্‌লো হু হু কোরে, ওরও অন্তর যেন ভরে উঠেছে কোন এক অপূর্ব্ব আনন্দে।

বিজয় নগরে যখন এসে ট্রেণ থাম্‌লো—দেখতে পেলাম কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। ওভার-ব্রীজ পার হ'য়ে আমরা গিয়ে উঠ্‌লাম "ঝট্‌কায়" (ঘোড়ার গাড়ী) কারণ ষ্টেশন থেকে সহর যেতে প্রায় দু মাইল পথ।

আমাদের থাকবার জায়গা হ'লো কলেজ হষ্টেল, তাই সোজা গিয়ে সেখানেই ওঠা গেল। পথেই আমাদের আহারাদি সমাপন কোরে এসেছিলাম—তাই মাদ্রাজী বন্ধুদের আর বিশেষ কষ্ট দিতে হ'লনা। পথে কিন্তু স্নান করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি,—অতএব কিছু সময় বিশ্রাম কোরে আমরা স্নানটা সেরে নিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ওরা জলখাবার

ও চা নিয়ে এসে হাজির হ'লো। জলখাবার হ'লো—লুচি ও কোরা (তরকারী)—একেবারে মান্দ্রাজী প্রণালীতে প্রস্তুত। আমাদের ভিতর দু একজন তৃপ্তিসহকারে বেশ চালিয়ে দিল, কিন্তু অধিকাংশই তা' গ্রহণে নিতান্ত অসমর্থ হ'য়ে পড়লো। আমাদের ফুটবল ক্যাপ্‌টেন বিশঙ্কর বাবু মান্দ্রাজী ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে ঠিক করলেন যে, আজ আর ফুটবল খেলা হ'বে না। শুধু টেনিস ডবলস্‌টাই হ'বে। এ সংবাদে আনন্দই হ'লো। সকলেই পরিশ্রান্ত—যাক্‌, বাঁচা গেল!—

বল্‌লেন—সাড়ে সাতটার সময় হষ্টেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, আমাদেরও তাই খাওয়া সেরে বের হ'তে হ'বে। উপায় কি!—শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হ'লো।

রাত সাড়ে সাতটায় আমরা খেতে বসেছি। মান্দ্রাজী পাচকেরা পরিবেসনে ব্যস্ত। নিরামিশ পদ্ধতি। আহারে বসে দেখি—যেমন একদিকে লঙ্কার ব্যবস্থা তেমনি অন্যদিকে টকের আয়োজন। লঙ্কা যা খেতে পারে ওরা, দেখ্‌লে অবাক্‌ হ'তে হয়। আমরা যখন খেতে আরম্ভ কোরেছি তখন সেখানকার দু'-একজনা ছাত্র—যাঁরা আমাদের
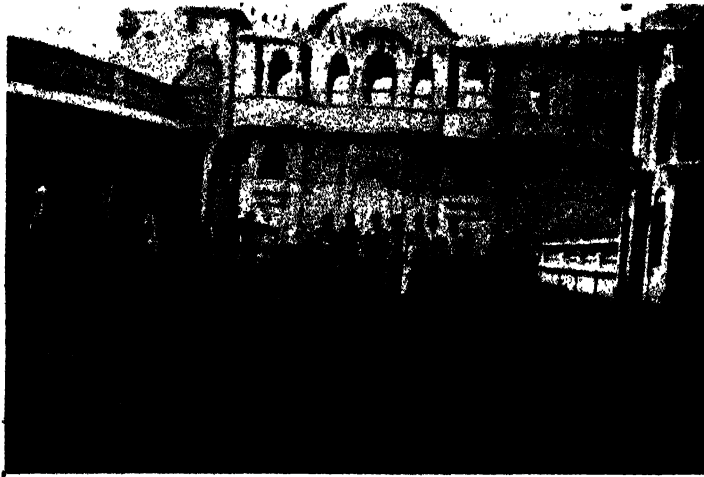
বিজয়নগরে দুর্গ দর্শন

বিকেল বেলা টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হ'লো,—আমাদের দলই জয়লাভ কোরে ফিরে এলো। মিঃ পি, আরসন্ সুরিটা ও সুকুমার মল্লিক তাঁদের উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়ে সকলকেই মুগ্ধ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সম্মান রক্ষা করেন। বিজয় নগরের পক্ষ থেকে খেল্‌লেন মিঃ সত্যনাথম্ আই, সি, এস্, বিজয়-নগর ষ্টেটের (Court of Wards) ম্যানেজার এবং মিঃ রাও। খেলা আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিযোগিতা-মূলক হ'য়ছিল।

খেলার শেষে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। সহর দেখ্‌তে বের হ'বো ঠিক করছি, এমন সময় অধ্যাপক হেমবাবু এসে

তত্ত্বাবধানে ছিলেন—বাইরে তারা গল্পগুজব করছিলেন। আমাদের মধ্যে একজনা 'নুন' চাইলে পাচকের কাছে, কিন্তু পাচক কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলে না, 'সল্ট' বলা হ'লো তাও বুঝ্‌তে পারলে না,—হয়তো ও লোকটা ইংরেজী জানে না। মহামুস্কিলেই পড়া গেল! পরে আর একজন 'নুন' দেখিয়ে বল্‌লে যে, এই জিনিষ দাও—তখন লোকটা হাস্‌তে হাস্‌তে 'নুন' নিয়ে এলো। প্রতিপদেই এম্নি বিঘ্ন আরম্ভ হ'লো। অন্যদিকে যাই হোক না কেন—খেতে বসে জিনিষ চাইতে হ'লে পাচককে বুঝাতে বুঝাতে অস্থির হ'য়ে ওঠা—সে বড় কম বিপদ নয়! একটা সমস্যা দাঁড়াল। ভবিষ্যতে আমাদের যাতে অসুবিধে ভোগ করতে না হয়

সেজন্য মিঃ অরবিন্দ ঘোষ জনৈক মাদ্রাজী ছাত্রকে ডেকে তেলেগু ভাষায় কতগুলো কথা নোট কোরে নিলেন—বিশেষ কোরে আহার্য্যবস্তুগুলির নাম।—যেমন—জল—মঞ্চনীলু, তরকারী—কোরা, মজ্জাগা—ঘোল, পপু—ডাল, অপু—নুন বা লবণ, অন্নম্—ভাত; অন্ততঃ কয়েকটা আমরা সকলেই মুখস্থ কোরে নিলাম। আহারান্তে সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসা গেল। সহরটা দেখতে মন্দ নয়। ছোট ছোট ঝিল ও জলাশয় মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কোরেছে অনেক। চতুঃপার্শ্বে গিরিবেষ্টিত এই শহরটি। রাতের বেলা মহারাজার প্রাসাদ বা বিজয় নগর ফোর্ট দেখা সম্ভব নয়—ঠিক হ'লো পরের দিনই দেখা যাবে।

পরের দিন বিকেল পাঁচটায় আমাদের ফুটবল খেলা— তাই প্রায় বেলা বারটার সময় আহারান্তে আমরা সদলবলে বের হ'য়ে পড়লাম ফোর্ট দেখ্‌বার আশায়। ফোর্টে প্রবেশ করবার অনুমতি পেতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না। জনৈক মাদ্রাজী ল' ক্লাসের ছাত্র আমাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন। ফোর্টের ভিতর প্রাসাদ সুসজ্জিত। কতগুলো সে-কেসের ভিতর বহু পুরাতন মুদ্রা আর দেয়ালের গায় ঝুলান বহুপ্রকার প্রাচীন অস্ত্রাদি দেখ্‌তে পেলাম। সেকালের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক যে সকল বর্ম্ম ব্যবহার হ'তো তারও চিত্র পেলাম সেখানে। এ ছাড়া অন্যান্য যা আসবাবপত্র সাজান আছে তা' আধুনিকতার পরিচয় দেয়, সেগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রাসাদটি 'গতিমহল' নামে পরিচিত।

ফোর্ট দেখা শেষ কোরে আমরা হাজির হলাম কলেজে। কলেজ ঘুরে দেখছি এমনি সময় একটি মাদ্রাজী ছাত্র এসে আমাদের ইংরেজীতে বল্লেন যে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাদের ডাকছেন। বাঙালীর সঙ্গে এখানে এসে অবধি দেখা হয়নি—তাই অকস্মাৎ এ সংবাদে আনন্দই হ'লো। আমরা সকলে হাজির হলাম অধ্যাপক দাশগুপ্তের কাছে। তিনি আমাদের দেখে হাসিমুখে ডেকে বসালেন। আমাদের নির্ম্মলবাবু বলে উঠলেন—"সার, এখানে এসে এই আপনাকে প্রথম বাঙালী পেলাম। এখানে আর বাঙালী নেই কি?" উত্তরে তিনি বললেন,—তিনি ছাড়া রেলে কাজ করেন আরও দু'তিন জন বাঙালী আছেন, এ ছাড়া আর বাঙালীর চিহ্ন এখানে নেই। অধ্যাপক দাসগুপ্ত আমাদের সঙ্গে নিয়ে কলেজের সমস্ত বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। অনতিবিলম্বে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'লো—কারণ বেলা ৫টায় আবার ফুটবল খেলা। কলেজটা বেশ বড়। পাথরের দ্বারাই তৈরী—স্কুলও সঙ্গেই রয়েছে। একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম মাদ্রাজী অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে। তাঁরা কচিৎ কেউ জুতো পরেছেন—অধিকাংশই জুতো বিহীন খালি পা।
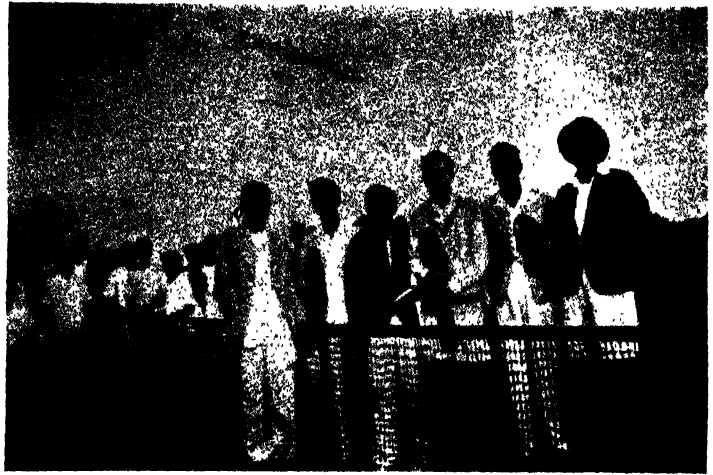
বিজয়নগরে আমাদের টেনিসদল

বিকেল বেলা ফুটবল খেলা শেষ হ'লো। আমাদের দলই দু' গোলে জয়ী হলো। আনন্দের মেলা বসে গেল আমাদের ভেতর। এবার ওয়ালটেয়রের দিকে আমাদের রওনা হ'তে হ'বে, উদ্যম ও উৎসাহে সবাই যেন ভরপুর। মিঃ নায়েক আমাদের এথেলেটিক সেক্রেটারী আগেই চলে

গিয়েছিলেন ওয়ালটেয়রে সকল বন্দোবস্ত করতে, গিয়ে যাতে কোনো অসুবিধে ভোগ করতে না হয়। রাতটা এখানে কাটিয়ে যেতে হ'বে ওয়ালটেয়র—গাড়ী ভোর ৮টার কিছু পরে। যাই হোক, রাতটা কাটাতে হবে বিজয়-নগরে—তাই বিশ্রামের আয়োজনে মনোনিবেশ করা গেল।

বিজয়নগর থেকে বিদায় নিয়ে ভোরের ট্রেনে আমরা রওনা হ'য়ে পড়লাম ওয়ালটেয়রের অভিমুখে। ট্রেন লেট হওয়ায় প্রায় বেলা ১১টায় উপস্থিত হ'লাম ওয়ালটেয়রে। ষ্টেশনে আমাদের এথেলেটিক সেক্রেটারী মি. নায়েক ও সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ওঁরাই একখানা 'মটর-বাস' ঠিক কোরে রেখেছিলেন, আমরা গিয়ে সেটায় চেপে বসলাম। মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে আমাদের যেতে হ'বে। কলেজটি ভিজিগাপটমে, এখান থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে। কিছুক্ষণ পরে হাজির হওয়া গেল মেডিক্যাল কলেজের কাছে। মেডিক্যাল কলেজের রীডিং রুমের গৃহে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হ'লো। এই গৃহটি উচ্চ হিলের উপর অবস্থিত, সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত নীল সমুদ্র!—দূরে বহু দূরে মনে হয় আকাশ পড়েছে লুটিয়ে মহাসমুদ্রে, এঁকে দিয়েছে একটি চুম্বন ওবি বুকে। ক্ষণে ক্ষণে তাই লজ্জায় ওর নীল জলে চলেছে পরিবর্ত্তনের লীলা,—নানা রঙের খেলা।

দক্ষিণে দেখা যায় সবুজ ওড়না জড়িয়ে ছোট্ট পর্ব্বত মালা।—ঠিক তারি নীচে নূতন ভাইজাগ বারবার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কোরেছে।

সমুদ্রের উর্ম্মিমালা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বার বার এসে তারি পদতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে—শতছিন্ন হ'য়ে লুটিয়ে পড়ছে। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো—কী সুন্দর! কী সুন্দর!—কিন্তু এ সৌন্দর্য্যকে কি কথার জালে বাঁধা যায় পরিপূর্ণভাবে? এর সৌন্দর্য্য যে অনুভূতি জাগায় অন্তরে—সে যেন নিয়ে যায় কোন অজানা লোকে, ভাষা যেখানে যায় হারিয়ে। 'কী সুন্দর!' এর বেশী বলবার সময় যেন আমাদের নেই—প্রতি মুহূর্ত্তে সমুদ্রের রূপে সবাই যেন আত্মহারা। থের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হ'লো—

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে, তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে

ওয়াল্টেয়ারের সাধারণ দৃশ্য

অসংখ্য চুম্বন করো আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

বেলা একটার সময় স্নান ও আহারান্তে একখানা 'বাস' ক'রে অন্ধ্র ইউনিভারসিটি দেখবার উদ্দেশে বের হ'য়ে পড়লাম—সবাই মিলে। কেবল মাত্র দু' মাইলের ব্যবধান আমাদের বাসস্থান থেকে—তাই সেখানে উপস্থিত হতে বেশী দেরী হ'লো না। অনেকটা স্থান জুড়ে বড় বড় বিল্ডিং, ইটের পরিবর্ত্তে পাথর দিয়ে তৈরী। এ অঞ্চলে সব

অট্টালিকাই এই প্রকার পাথরের সাহায্যে তৈরী দেখতে পেলাম। অন্ধ্র ইউনিভারসিটির সন্নিকটেই অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে নৃত্য করে চলেছে, ইউনিভারসিটির সৌন্দর্য্য তদ্দ্বারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিভারসিটি কোনোও কারণে ১৫ দিন বন্ধ থাকায় সেখানকার ছাত্রমহলের আনন্দ-কোলাহল থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'লো। লাইব্রেরীটি খোলাই ছিল। আমরা ইউনিভারসিটির অন্যান্য গৃহগুলি পরিদর্শন ক'রে—লাইব্রেরীতে প্রবেশ করলাম। লাইব্রেরীর কার্য্যপ্রণালী ও তার বিরাট আয়তন আমাদের সত্যি মুগ্ধ ক'রেছিল। সেখানকার লাইব্রেরীয়ান আমাদের সঙ্গে করে সব দেখালেন। শেষে লাইব্রেরী হলের ভেতর নিয়ে গেলেন আমাদের। সেখানে দেখতে পেলাম কতগুলো খোপ করা ঘরের মত রয়েছে এবং ঐ গুলো এক এক শ্রেণীর পুস্তকে পরিপূর্ণ। হ'লের ভেতর দু'চার জন ছাত্রেরও সাক্ষাৎ মিল্‌লো। দেখতে পেলাম, কয়েকটি ছাত্র উক্ত খোপগুলোতে সাজান বই থেকে দু'একখানা বের করে টেবিলে বসে পড়তে আরম্ভ করল, আবার অনেকে পড়া শেষ হ'লে বইগুলি যথাস্থানে রেখে চলে গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল যে, এ হ'লের ভিতর এসে ইচ্ছামত বই পড়া যায়—কোনো প্রকার খাতাপত্রে নাম লেখালেখি নেই। ছেলেদের সততার উপর নির্ভর। এর পর লাইব্রেরীয়ান আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। উপরে গিয়ে দেখতে পেলাম ছোট ছোট কতগুলো ঘর কেবিনের মত দু' পাশে লাইন ক'রে তৈরী, এগুলো রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্টদের জন্য,—এখানে তাঁরা—পড়াশুনা ক'রে থাকেন। এরপর আমরা—manuscript section (পুঁথি বিভাগে)এ গেলাম। নানাবিধ পুঁথি থাকে থাকে সুরক্ষিত। পুঁথিগুলোর জন্য বিশেষ ক'রে case বা খাপ তৈরী করা হ'য়েছে। আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথিগুলো লাল-কাপড় দিয়ে মাত্র জড়িয়ে রাখা হয়। কিন্তু অন্ধ্রইউনিভারসিটি পুঁথি যত্ন ক'রে রাখবার জন্য নিজেরাই পুরু কাগজের কেস তৈরী করিয়ে থাকেন। মাটির নীচে ঘরের ভিতর বুক-বাইণ্ডাররা কাজ করছে। কতগুলো পুঁথি দেখতে পেলাম,—সেগুলো কালি দিয়ে লেখা নয়, সূচের অগ্রভাগ দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা। পুরাণো পুঁথি নিয়ে জনৈক ভদ্রলোক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে দু'একখানা পাতা নিয়ে হরফগুলো দেখবার বৃথাই চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময়ে সেই ভদ্রলোক হঠাৎ একটু ফ্রেঞ্চ চক্‌ নিয়ে পুঁথির পাতায় ঘসে দিলেন এবং বল্‌লেন—এবার দেখুন। তখন সত্যই খুব পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হইতে

৫টায় ওয়ালটেয়র দলের সহিত আমাদের ফুটবল খেলা। কাজেই ফিরতে হ'ল। ফেরবার পথে সমুদ্রের পারের রাস্তাটি দিয়েই ফিরে এলাম। ছোট ছোট পাহাড় ও সমুদ্রের সমন্বয় সহরের সৌন্দর্য্য খুবই বৃদ্ধি ক'রেছে। রাস্তাঘাট ভালই বলতে হ'বে—তবে বালির উপদ্রব বেশী।

বিকেল বেলা ফুটবল খেলা শেষ হ'লো। আমরাই

জয়ী হ'লাম দু' গোলে। মাঠে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব হাফব্যাক্ দানিয়ার সঙ্গে দেখা। তিনি এসে আমাদের দলের মিঃ মহালানবিশের (ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব) সঙ্গে খুব আলাপ সুরু ক'রে দিলেন। অনেকদিন পরে বাঙলা মুলুকের পরিচিত লোকের দেখা পাওয়ার আনন্দ উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্ছিল।

হারানিধিকে। বালুর চর নীরব—তার কানে পৌছায় না সমুদ্রের করুণ প্রার্থনা। তবু সাগর এসে লুটিয়ে পড়ে বালুর তটে, বলে—আমায় ফিরিয়ে দাও! সমুদ্রের করুণ ক্রন্দন সত্যই সেইদিন শুনতে পেয়েছিলাম।

কতক্ষণ তন্ময় হ'য়ে বসেছিলাম জানিনা,—সমুদ্রের গানের প্রতি শব্দে উঠেছিল ব্যথার সুর।—দিনের আলোতে

ওয়ালটেয়ার—সমুদ্রসৈকত
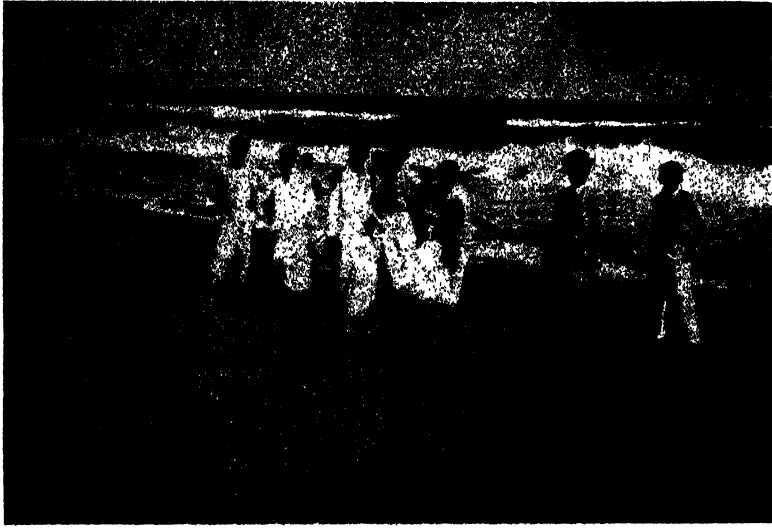
রাত আট্‌টায় আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে সমুদ্র-সৈকতে বসবার আশায় ছুটে চল্‌লাম দলবলে। আকাশে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে।—ম্লান-আলো চাঁদ যেন পাণ্ডুর চোখে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। রাতের সমুদ্র আমার অন্তরে এক নূতন ছবি এঁকেছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত আর এক উচ্ছ্বসিত সব হারানর করুণ গান সেদিন যা শুনতে পেয়েছিলাম সমুদ্রের বুকে, তা' আর ভুলতে পারবো না। মনে হ'লো, কে যেন তার হারিয়ে গেছে। যাকে সে অন্তরের আবরণে প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছিল সে যেন হারিয়ে গেছে—সমুদ্রের এ অনন্ত ক্রন্দন দিক্ ছাপিয়ে হাহা করে গুমরে উঠ্‌ছে—লুটিয়ে পড়ছে বালুর তটে, যেন চীৎকার কোরে বলতে চায়—'ওগো আমায় ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার অন্তরের

যা' পেয়েছিলাম ওর বুকে, রাতের আঁধারে তা মিলিয়ে গেছে, নিয়েছে নূতন রূপ। ইচ্ছে হ'লো সারারাত এমনি বসে থাকি সমুদ্র-সৈকতে, কিন্তু উপায় নেই। রাত অনেক খানি এগিয়ে গেছে। ফিরতে হ'বে!—

পরের দিন সমুদ্র স্নানের আয়োজন হ'লো। প্রায় একঘণ্টা কাল সমুদ্রের বক্ষে আমরা কাটিয়ে দিলাম। ভোরে টেনিস, দুপুরে ক্রীকেট এবং বিকেলেও টেনিস খেলা হ'লো। প্রত্যেক খেলাতেই আমরা সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এলাম। আজই ফিরে যেতে হ'বে আমাদের, তাই জিনিষ-পত্তর গোছগাছ ক'রবার সাড়া পড়ে গেল। আমাদের বাসস্থানের ঠিক পেছনেই একটি উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে ওয়ালটেয়র ও ভাইজাগের দৃশ্য শেষবারের জন্য দেখে নিলাম। মনে হ'লো, একটি সুন্দর

বাগানের ভেতর মাঝে মাঝে সুন্দর কতগুলো সাজানো বাড়ী—একটি তৈল চিত্রের মতই প্রতিভাত হ'লো।

রাত্রি নয়টায় ষ্টেশনে রওনা হ'তে হ'লো। আর একবার প্রাণভরে অনন্তশীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে নিলাম—কে জানে আবার কবে আসা হ'বে, হয়তো বা আসাই হ'বে না। আর এলেও এ দল, এত আনন্দ, তখন কি আর মিলবে!

রাত দশটা বেজে গেছে। —ট্রেণ ওয়ালটেয়র ছেড়ে ধীরে ধীরে ছুটে চললো—মাদ্রাজী বন্ধুরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে হাণ্ড-সেক শেষ হ'লো। হয়তো এঁদের সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হ'বে না। জীবনে এক একটি লগ্ন আসে যখন কতনা নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর আর এক লগ্নে সে সব উবে যায় কোথায়—কে জানে! এমনিই গতানুগতিকভাবে পৃথিবী চলেছে। তবু ক্ষণিকের মায়া!

ওয়াল্‌টেয়ার—সমুদ্রস্নান

কলকাতা ফেরার পথে কটকে আমাদের দু' দিন খেলার কথা ছিল—ফুটবল ও টেনিস। সেখানেও খেলা হ'লো। জয়ী হ'য়ে এবার কলকাতার পথে রওনা হ'লাম।

এক্সপ্রেস রাতের আঁধার ভেদ কোরে চলেছে। ধীরে ধীরে রাত গভীর হ'য়ে এলো। কেউবা বাক্সের উপর কেউবা বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে; কেউবা "তাসের" ঝোঁকে ব'সে। কলকাতা ছেড়ে যাবার বেলা আনন্দের যে উৎস দেখ্‌তে পেয়েছিলাম প্রত্যেকের অন্তরে, তা' যেন নিঃস্তেজ হ'য়ে এলো কলকাতা ফেরার পথে,—সবাই যেন কত শ্রান্ত। রাত ক্রমশই গড়িয়ে যাচ্ছে আর কতই বা বাকি! ভোরের বেলাও আবার সেই হাওড়া! মনে হ'লো, এই সাতদিনের ভেতর আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে এত কাছে এত আপনার কোরে পেয়েছিলাম,—দলবদ্ধভাবে প্রতি কার্য্যে যোগদান করার আনন্দ, তা' ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ত পূর্ণ হ'য়ে যাবে!

আর এমনি দিন আসবে কিনা কেই-বা—জানে! ভবিষ্যতে সুখ-দুঃখময় চলার পথে এই সাতদিনের স্মৃতি কতই না সান্ত্বনা দেবে। এমনিই হায়—সুন্দর দিনগুলোর আবিষ্কার হয়—আবার মিলিয়ে যায়! একদিন দূর ভবিষ্যতের পথে হয়তো এরই স্বপ্ন-ছবি চোখে ভেসে উঠ্‌বে—সেদিন আমরা ছিন্ন ফুলের পাপ্‌ড়ির মতনই কে কোথায় ছড়িয়ে থাক্‌বো—শুধু অন্তরের অন্তঃপুরে একটি ব্যথার সুর জেগে থাক্‌বে—তখন মনে হ'বে 'হারিয়ে-যাওয়া' দিনগুলোর কথা

সুরঞ্জন সেনগুপ্ত

* এর ফটোগুলো তুলেছেন শ্রীযুক্ত সুকুমার মল্লিক।

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৪ই—১৭ই অক্টোবর—ইয়াটুং

ইয়াটুং চুম্বী উপত্যকার আমো-চু নদীর তীরস্থ একটি ছোট্ট সহর। এই উপত্যকার ভূগোলে ও ইতিহাসে একটা বড় স্থান আছে। ভূগোলের দিক থেকে একে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। এই উপত্যকা তিব্বতের মালভূমি হতে নেমে বরাবর ভারতবর্ষের ভূটান সিকিম রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ অভিযান যায় তা জেলাপলা থেকে নেমে সোজা এই চুম্বী উপত্যকার ভেতর দিয়েই গেছল। Kalimpong-Lhasa Trade Route গেছে এরই মধ্য দিয়ে। ইয়াটুং ইতিহাসে স্থান পেলে। ১৯০৩ সনের এই Younghasband Expedition এর পর থেকে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধিপত্রের ফলে তিব্বত সরকার এখানে একটি ব্যবসাকেন্দ্র (Trade Mart) খুলতে বাধ্য হলেন। এবং সেই থেকে এখানে একজন British Trade Agent ও নিযুক্ত হলেন। পরে, তিব্বতীয়েরা সেই চুক্তিপত্র অমান্য করলে যখন লর্ড কার্জ্জন Sir Francis Younghasband-এর নেতৃত্বে যে সৈন্যদল দিয়ে তিব্বতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, তারা চুম্বী উপত্যকার এই ইয়াটুং সহরেই কিছুদিনের জন্য তাদের সেনানিবেশ স্থাপন করেছিল।

তিব্বতের মালভূমিতে এক যব ছাড়া অন্য কোনও শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এই উপত্যকার নদীতীরস্থ জমী অত্যন্ত উর্ব্বর। সেখানে সকল রকম শস্য ও তরী তরকারী জন্মায়। এখানকার আলু প্রভূত পরিমাণে কালিমপংএর বাজারে বিক্রী হয়। ইয়াটুংএর পাচ মাইল পূর্ব্ব হ'তেই সমতল পথ আমো-চু নদীর তীর ধরে কখনও এপারে কখনও ওপারে কখনও পুল পার হয়ে চলে গেছে। বেলা ঠিক একটায় আমরা পৌছলাম ইয়াটুং সহরে। ডাকবাংলোতে প্রথমে চা খেয়ে, চললাম ডাকঘরে। গ্যাণ্টক ছেড়ে অবধি চারদিন পথে ডাকঘর টেলিগ্রাফের সম্পর্ক ছিল না। ইয়াটুংএ ইংরেজের পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস আছে। শেষ ডেরাতে নিরাপদে পৌছবার শুভ সংবাদ নিজ নিজ বাড়ীতে দিয়ে গৃহে তিনখানি তার পাঠান হোল। পোষ্ট-বাবু একজন বেহারী। কাজ খুব কম। একেবারে একটি বাঙ্গালীর দল দেখে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন। ভেতরে গিয়ে দেখি একপাশে সুধীর বাবুর নামে কয়েকটি পার্শ্বেল রয়েছে। এইস্থানে এই রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে পার্শ্বেল পেয়ে আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম। পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় বললেন কাল বৈকালে ভূটান হ'তে রাজা দরজী পাঠিয়েছেন অনুমানে বুঝলাম, দ্রব্যের উপহার।

ইয়াটুং ডাকবাংলা

পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। আমাদের রসদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ফিরতি পথের আহার্য্য এইখানেই সংগ্রহ করার কথা। বন্ধুর কৃপায় ঠিক সময়েই জুটে গেল। ডাক-বাংলায় পৌছে পার্শ্বেল খুলে পাওয়া গেল, মাখম পাঁচ সের,

চাল দশ সের চিঁড়ে ও এক টুক্‌রী ফল। সেদিন ডাকবাংলায় আমরা বড় সুখে ছিলাম। ভোরবেলা উঠেই আবার পথে বেরোতে হবে না, পুরো তিনদিন বিশ্রাম করতে পাওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। ধীরেসুস্থে জিনিষপত্র গোছগাছ করলাম, গ্যাংটক থেকে বের হয়ে উপর্য্যুপরি চারদিন প্রত্যহ এই মালপত্র খোলা ও বাঁধার জ্বালায় সবাই হায়রাণ হয়ে গেছলাম। তিনদিনের ছুটিটা বড়ই মিষ্টি লাগল

ইয়াটুং ডাকবাংলার দলনায়ক ও লেখক

ইয়াটুংএ পৌঁছবামাত্রই আমরা পোষ্টমাষ্টারের কাছে থেকে খবর পেয়েছিলাম যে এখানে একজন বাঙ্গালী আছেন। সরকারী কর্ম্মচারী—নাম শৈলেন্দ্রনাথ বসু, মিলিটারী রসদ বিভাগের বাবু। অর্থাৎ ইয়াটুংএ যে পল্টন্ আছে তাদের খোরাক সরবরাহের ভার তাঁর উপর। এই সুদূর তিব্বতের পর্ব্বতশিখরে একজন স্বদেশবাসীর সন্ধান পেয়ে স্বভাবতই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে। সেইদিনই বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এলাম, তার পর রোজ প্রীতে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে আসতাম। ভদ্রলোক নির্ব্বাসিতের মতো একা একাই থাকেন। সরকার বাহাদুর দু'বছরের জন্য এক একজন কর্ম্মচারী পাঠান। তবে বেতন দেড়া হয়ে যায়, এই যা সুবিধা। ইয়াটুংএর সৈন্যসংখ্যা একজন অফিসার সমেত মোট পঁচিশজন। তাদের ব্যারাক আছে, খেলার মাঠ আছে, চাঁদমারি আছে, হাসপাতাল আছে, নিত্য-নিয়মিত কুচকাওয়াজও করতে হয়। আর পঞ্চাশটি সৈন্য থাকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে গিয়ান্-ৎসি-তে। এই পঁচাত্তরজন সৈনিকই এদেশে বৃটিশশক্তির ক্ষমতা ও প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য ও দরকার পড়লে তিব্বতের বৃটিশ প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা করবার জন্যে যথেষ্ট, এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস।

ইয়াটুংএ British Trade Agent-এর বাড়ী ও আফিস আছে। অতি সুন্দর বাগানের মাঝে বাড়ী। আমরা দেখতে গেছলাম। তবে British Trade Agent অধিকাংশ সময়ই গিয়ান্-ৎসিতে থাকেন। তার কারণ এই যে সেখানে আরও দু'একজন সাহেব কর্ম্মচারী থাকাতে তাঁদের একত্রে সময়টা কাটে ভালো। এই British Trade Agentএর পদ যদিও কাগজে কলমে ভারতের ব্যবসায়ীদের সুবিধা অসুবিধার ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্যই সৃষ্ট তবু এর যথার্থ উদ্দেশ্য দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ না হয় সেইদিকে নজর রাখা। ইনি প্রকৃতপক্ষে তিব্বত, সিকিম, ও ভুটানের পলিটিক্যাল অফিসারের সহকারী।

ইয়াটুংএর উচ্চতা ১০৩০০ ফুট। তবু এখানে শীত কম। প্রাতে উত্তাপ ৩৬° ডিগ্রী। গ্যাংটক হ'তে বেড়িয়ে কার্পোনাং, চম্বু, চম্পিটাং, সব ডাকবাংলাতেই আমাদের আগুন জ্বালাতে হয়েছিল, কিন্তু ইয়াটুংএ তিনদিন আমাদের আগুনের কোনও দরকার হয়নি। তিনদিনেই ইয়াটুংএর জলবায়ু ও তার অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের মন হরণ করেছিল। অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সহর। গ্রাম বললেই হয়। এর সবশুদ্ধ লোকসংখ্যা দু'শোর বেশী নয়। পঞ্চাশখানির বেশী বাড়ী নেই। এই সমতল উপত্যকাভূমি নদীগর্ভ বাদ দিলে, প্রস্থে দু'পাশে দু'শো হাতের বেশী হবে না। সৈনিক পল্টনের ঘরগুলি ছাড়া অন্য সব ঘর কাঠের তৈরী। ছাদ পর্য্যন্ত কাঠের। ডাকবাংলার বৈঠকখানা ঘরে বসে নদীপারের ক্ষেতে পাহাড়ী চাষা-চাষানীরা কাজ করছে দেখতাম।

সকাল সন্ধ্যায় দেখতাম গাঁয়ের মেয়েরা মাথায় পিঠে ঘড়া-কলসী নিয়ে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে। দূরে, দুপাশে যতদূর নজর যায় চুম্বী উপত্যকার শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী, মাথার ওপর শরতের নীল আকাশ, খরস্রোতা সঙ্গীতমুখরা নদী—দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন যেন নেশা লেগে যেত! সারা দুপুরবেলাটা ঝড়ের মতো এক প্রবল হাওয়া সেই দীর্ঘ উপত্যকাভূমিকে যেন ঝেঁটিয়ে যেত। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাওয়া পড়ে যেত। শুনেছি তিব্বতের মালভূমিতেও নাকি রোজ এইরকম দমকা হাওয়া সারাদিন বইতে থাকে।

ইয়াটুংএর রৌদ্রে বিশ্রাম

এখানে তিনদিন সকাল সন্ধ্যায় একটু বেড়ানো, নিয়মিত খাওয়া দাওয়া দিনের বেলায় বসে ডায়েরী ও চিঠিপত্র লেখা, গল্প গুজবে ও সারারাত ঘুম, এই করে দিব্যি কাটান গেল। সকালে বেড়ান শেষ করে রোজ বসু মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হতাম, Statesmen পড়ে ও গল্প সল্প করে বেলাটা কাটত। তাঁর কাছে তিব্বতীয়দের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, ইয়াটুংএর ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প শুনতাম। ভদ্রলোকের আফিসের কাজকর্ম্ম শেষ করতে সপ্তাহে একঘণ্টার বেশী লাগত না। বাকী সময়টা তাঁর কাটতে চাইতনা। তাই তাঁকে পেয়ে আমাদের যত আনন্দ হয়েছিল, আমাদের পেয়ে তাঁর ততোধিক আহ্লাদ হয়েছিল। অবসর সময়ে আমরা ইয়াটুংএর ডাকবাংলার আগন্তুকের খাতাখানি উল্টে পাল্টে দেখতাম। গত আট বৎসরের মধ্যে দেখলাম, মাত্র দুই দল বাঙ্গালী যাত্রী এদিক বেড়াতে এসেছিলেন। অথচ প্রতি বৎসর ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ সাহেব কত যে এসেছেন তার ঠিকানা নেই। এই খাতায় Mount Everest Expedition এর নেতা Captain Bruce, Captain Mallory প্রভৃতির সই দেখলাম। বারবার বিফল মনোরথ হয়েও চোখের সামনে কতো সহযাত্রীর মৃত্যু দেখেও আবার সেই গিরিশৃঙ্গে ওঠবার এ কী মহীয়সী প্রচেষ্টা! বিপদকে তুচ্ছ করে, নূতনের সন্ধানে অভিযানের এই ভয়হীন প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন না করে থাকা যায় না। আমাদের জড়পিণ্ডের মত নিশ্চেষ্ট জীবন কি কখনো শেষ হবে না?

তিব্বতীয়দের সৌজন্য ও আতিথেয়তার পরিচয় ইয়াটুংএ যথেষ্ট পেয়েছিলাম। আমরা পৌছবামাত্রই British Trade Agent-এর দপ্তরের বড় বাবু পেম্‌বা-সিং মহাশয়, জনৈক ভুটানবাসী, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সাহেবের অনুপস্থিতিতে ইনিই সেই আফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁর এই আগমন যদিও তাঁর কর্ত্তব্যের অঙ্গ তবু অনেকক্ষণ বসে কথাবার্ত্তা কয়ে ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তিনি আমাদের আপ্যায়িত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরদিন সকালেই দেখি তাঁর চাকর নানাবিধ তরীতরকারী শাকসব্জীর ভেট নিয়ে উপস্থিত। তখকার Political Officerএর নাম ছিল Mr. F Williamson, (সম্প্রতি লাসা নগরীতে দেহ রেখেছেন) ও তাঁর Personal Assistantএর নাম রায় বাহাদুর নরবু ধনতুপ। রায়-বাহাদুরের শ্বশুরালয় এই ইয়াটুংএ। আগে রাজা দরজী আমাদের তিনদিন সেইখানেই থাকবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ডাকবাংলো পাওয়া গেল বলে সেখানে যাবার প্রয়োজন হ'ল না। আমাদের ইয়াটুং গমনের সংবাদ রাজা দরজী নরবু ধনতুপকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন Political Officer এর সঙ্গে Lhasa নগরীতে ছিলেন। আমাদের

দ্বিতীয় দিনের সকাল বেলায় দেখি একজন তিব্বতীয় বৃদ্ধ একটি ট্রে-তে দুধ, ডিম, ফল ও তরকারী নিয়ে উপস্থিত। অনুসন্ধানে জানলাম লোকটী নরবু ধনতুপ-এর বাড়ী থেকে এসেছেন। পিঞ্চুকে সব দ্রব্য সামগ্রী নামিয়ে নিতে বললাম। কিন্তু গোলমালে বাহককে কিছু বখ্‌শিষ দিতে ভুলে গেলাম। পরদিন প্রভাতে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে কার্ড রাখতে গিয়ে পরিচয় জানলাম, যে আমাদের ভেটবাহক তাঁর শ্বশুর স্বয়ং। তখন ভাবলাম কাল ভাগ্যিস্ বখ্‌শীষ দিতে যাইনি। ফেরবার আগের দিন রাজা দরজীর কাছ থেকে আর একটী পার্শেল এলো, তার মধ্যে মাখন, চা, ফল, চিঁড়ে ইত্যাদির সঙ্গে ছিল ফারপোর রুটি ও কেক্। সুদূর তিব্বতে বসে কলিকাতা হতে পাঠনা বন্ধ-করা টিনের বাক্সে খাদ্যদ্রব্য পেয়ে—বলা বাহুল্য যে—আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হ'লাম। এই রকমে আমাদের শেষ ক্যাম্পে তিনদিন খুব আরামে ও আনন্দে কেটে গেল। ইয়াটুং যে ব্যবসাকেন্দ্র তার চিহ্ন এইটুকু দেখলাম যে রাশি রাশি ভারে ভারে পশম ও আলু মিউলের পিঠে চলেছে। এই পশমের, প্রতিবৎসর বহু টাকার পশম তিব্বত হ'তে কালিমপংএ আমদানী হয়। তিনচারিটী মাড়ওয়ারী পশম ব্যবসায়ীর গদি ইয়াটুং সহরে রয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি এই চুম্বী উপত্যকার আলুও বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। বাংলা-দেশেরই উত্তরে হিমালয়ের পরপারে এই তিব্বত দেশ। অথচ এখান হ'তে পশম আমদানী করে লক্ষ লক্ষ টাকা মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা উপার্জ্জন করছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলের এ ব্যবসার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের চরিত্রে কোথাও একটা বিশেষ গলদ আছে, দেশ নেতাদের এবিষয় ভাবা উচিত!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

মিথ্যা কভু নহে

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

পৃথিবীর প্রাণ-পদ্মে এত মধু এতখানি রূপ!
ছন্দবর্ণরসায়ণে মূর্তিমতী মৃত্তিকার তল
পরিপূর্ণা প্রিয়তরা কে জানিত, কে বুঝিত আগে?
কুসুমিত কল্পলোক—কবি ছিল নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ;
শুচি-শুভ্রতায় ভরা আঁখিপুট স্থির অচঞ্চল
আফিমের ফুলজাগা সুষমার ঘন অনুরাগে।
লগ্নবেলা বিচ্ছুরিল প্রভাতের প্রভাতীর সনে,
শরতের স্নেহোচ্ছলা উচ্ছ্বসিত স্বপনের বাণী
রোমাঞ্চ-শিহর-সুখে মুহূর্তেকে উঠিল সে গাহি,
অনাদি কালের তরে অন্তহীন এত আয়োজনে—
নিঃস্বত্বে নিঃশেষ হ'ল জীবনের শেষ সত্তাখানি;
বিচিত্র আলোক-রসে অকস্মাৎ নিল অবগাহি'।
তোমার আত্মার সাথে ওগো মোর কুমারী প্রেয়সি
প্রাণের প্রাচুর্য দিয়া হ'ল মোর চির পরিচয়,
সমগ্র অন্তর দিয়া অপরূপ দিনু উদ্বোধন;
অনাগত বাসন্তিকা জানি আমি উঠিবে বিকশি,
জীবনের অমানিশা জ্যোছনায় হ'বে স্বপ্নময়,
মরণ-শূন্যতা মোর পূর্ণ হ'বে সুধা-সঞ্জীবন।

নষ্ট তারা

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

সরলা প্রিয়লালকে অনেকবার বারণ করল, শুনছ গো, তুমি যেও না, নতুন জায়গা, বন-বাদাড় পার হ'য়ে যেতে হ'বে, মাথা খাও। লাইনের ধারে জঙ্গলে বাঘ বের হয়। কাল সকালে যেও। রাত্রে ত আর গাড়ী আসবে না আর যদি বা আসে জীবনকে বিপন্ন করে যাওয়া উচিত নয়। তাও যদি পথ ঘাট বেশী দিনের চেনা হোত।

প্রিয়লাল দরজায় এসে দাঁড়াল। সরলার নিষেধের প্রত্যেক কথাটা শুনল।

লাল ইট বারকরা ক্ষুদ্র রেলের কোয়ার্টার। অত্যন্ত অপ্রশস্ত। কোন রকমে বাস করা চলে। পাশাপাশি লোকের বসতি নাই। চারিপাশে ঘন বাঁশ ঝাড়, সামনে বহুদূর বিস্তৃত অসমতল রুক্ষ মাঠ,—মাঠের শেষে ঘন পিয়াল গাছের সারি, তার ওপাশে গোলপাতার কয়েকটা ঘর, ছোট ষ্টেশনের দু' একজন কুলি ও কয়েকঘর চাষীর বাস, তার পিছনে অনেকটা শালের বন, সেই বনের মাঝ দিয়ে স্বল্প পরিসর পায়ে চলা পথ, তারপর ষ্টেশন

পশ্চিমের ঐ সঙ্কীর্ণ নিভৃত অংশে, মানুষের হয় ত বেশী প্রয়োজন হয় না। তাই সমস্ত দিন ও রাত্রে চারখানা মাত্র ট্রেণ কয়েক মিনিটের জন্যে থামে। খুব কম লোক ওঠা নামা করে।

মাথার উপর খণ্ড আকাশে জ্যোৎস্নাবিধৌত শুভ্রতা। অসমতল প্রান্তরের বুক মনে হয় যেন পাতলা তুষারের আবরণ।

প্রিয়লাল কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে ঘন সমাচ্ছন্ন শালবনের দিকে তাকিয়ে ষ্টেশনের দূরত্বটা চিন্তা করল। যদিও চাঁদের আলোর প্রাচুর্য্যে স্থানটি আলোকিত,—কিন্তু তবুও ভয়াবহ পথ।

সরলার কথার উত্তরে সে বলল, কিন্তু আমি না গেলে পরেশের যে ভয়ানক কষ্ট হ'বে সরলা! বেলা বারটা থেকে আজ আমি বিশ্রাম উপভোগ করছি, তখন থেকে সমানভাবে ও সেখানে কাজ করছে। ছেলে মানুষ, কষ্ট হ'বে।

সরলা চুপ করে রইল। কথাটা খুবই সত্য। কুড়ি বছরের ছেলে পরেশ। ছোট খাট ষ্টেশন হলেও, দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার মত মনের ও দেহের সামর্থ্য এখনও তার হয়ত হয়নি।

সে দিন দুপুরে বন মাঠ পার হ'য়ে সরলার কাছে সে এসেছিল প্রিয়লালের একটা সংবাদ বহন করে। ওর ক্লান্ত মুখখানা দেখে সরলার অত্যন্ত মায়া হ'ল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সমস্ত মুখখানা ওর লাল হয়ে উঠেছিল, সর্ব্বদেহ অবসাদে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছিল। শিশুর মত মুখখানা কোমল, সরলতাপূর্ণ। রমণীজনসুলভ কমনীয় দেহ।

সরলা স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, বস ভাই! ঘেমে নেয়ে গেছ। এতটুকু বয়েসে তোমার বাবা মা তোমাকে কাজে ঢুকিয়েছেন!

তালপাতার পাখার হাওয়া করতে করতে সরলার সঙ্গে পরেশের পরিচয় হ'ল।

সরলা জিজ্ঞেস করল, তোমার কে আছে ভাই?

ব্রীড়ানত মুখে পরেশ বলল, আমার বাবা নেই, মা আছে আর দিদি।

সরলা বলল, তোমার দিদি বুঝি বিধবা?

পরেশ সরলার মুখের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলল, না!

সরলা বলল, তা হ'লে শীগগির শ্বশুর বাড়ী যাবে বুঝি?

পরেশ তেমনিভাবে মাথা নীচু করে বলল, দিদির স্বামী দিদিকে নেয় না। অত্যন্ত সরলভাবে ও বলল, দিদি পাগল কি না। জামাইবাবু দিদিকে মারে, গায়ে বেত মারবার বড় বড় দাগ আছে। আজ প্রায় এক বছর হ'ল দিদি পালিয়ে এসেছে,

শ্বশুর বাড়ী আর যায় না। জামাইবাবু বলেছে, খবরদার আর যেন ও আমার বাড়ীতে না আসে। মাও পাঠায় না।

সরলার মুখখানা মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, বিয়ের পর বুঝি তোমার দিদির মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?

পরেশ বলল, বিয়ের অনেক দিন পর দিদির টাইফয়েড হয়। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। প্রায় ছ' মাস পর দিদি প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু তারপর মাথার দোষ হ'তে আরম্ভ হ'ল। পূর্ব্বেকার ঘটনা, কথা, এক রকম সমস্তই ভুলে গেল, চোখের দৃষ্টি হ'ল অস্বাভাবিক, চঞ্চল। কথা বলতে লাগল অসংলগ্ন।

সরলা বলল, তুমি এত সুন্দর, তোমার দিদিও নিশ্চয় সুন্দর?

পরেশ নিজের রূপের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল; বলল, আমার চেয়ে দিদি আরও ফর্সা। শুধু আমাদের গ্রাম নয় পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রামের ভেতরও দিদির মত কেউ সুন্দর নয়। জামাই বাবু খুব বড় লোক, রাজসাহী কলেজের তিনি প্রফেসার। দিদির বিয়ে দিতে আমাদের বিশেষ কিছু খরচ হয়নি। এখন আর দিদিকে দেখলে আমার সে দিদি বলে মনে হয় না,—কয়েকখানা মাত্র কঙ্কাল, বিবর্ণ রং। দুঃখে মা'র শরীরও ভেঙ্গে গেছে। আমার উপায়ই এখন হ'ল সকলকার সম্বল।

পরেশের রক্তাভ গালের উপর দু' ফোঁটা জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল।

সরলা স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, দাদা তোমার অবস্থা সব জানেন?

পরেশ বলল, না বৌদি! অবস্থা আমার না জানলেও দাদা আমায় ভালবাসেন, আমার সমস্ত দুঃখ যেন উনি বুঝতে পারেন। এবার মাইনের সময় তিনি আমায় পাঁচ টাকা বেশী দিয়েছেন। আর জন্মে তিনি আমার নিশ্চয় কেউ ছিলেন।

সরলা বলল, আমি তোমার দাদাকে বলব।

পরেশ বাধা দিয়ে বলল না বৌদি, তিনি এমনি আমার সঙ্গে দেড় মাসের পরিচয়েই অত্যন্ত বেশী আমার বিষয় ভাবেন, এসব শুনলে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠবেন।

সরলা মনে মনে ভাবল, ভাবাটা খুব বিচিত্র নয়, সে'ত দেড় মাসের পরিচয়, এই এক ঘণ্টা পরিচয়ে তারই মনে হ'চ্ছে, কতদিনের যেন ওর সঙ্গে আত্মীয়তা।

সরলা বলল, একদিন তোমার বাড়ী যাব ভাই। ষ্টেশনের কাছে ত' তোমাদের থাকার জায়গা?

পরেশ বলল, দু'খানা মাত্র গোলপাতার ঘর। কোনও রকমে চলে যায়। নিশ্চয় একদিন যাবেন বৌদি! তারপর বাইরের দিকে চেয়ে বেলা অনুমান করে পরেশ বলল, অনেক দেরী করে ফেললাম, চললাম বৌদি!

সরলা বলল, চললাম বলতে নেই ভাই, বল, আসি।

পরেশ হেসে সরলাকে প্রণাম করে বলল, আসি।

মাথায় হাত দিয়ে সরলা বলল, এস ভাই, তোমার গরীব বৌদিকে ভুলো না।

*

সরলা বলল, একটা লণ্ঠন হাতে করে নিয়ে যাও, আর এক গাছা মোটা লাঠি।

প্রিয়লাল তার সবল মাংসপেশীবহুল হাতখানার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক বলেছ, লাঠি থাকলে এখনও দু'টো বাঘের মণ্ডা নিতে পারা যায়।

সরলা প্রিয়লালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আদরের সুরে ধমকের ভাণ করে বলল, থাক পালোয়ানজি, শরীরের আর গর্ব্ব করতে হ'বে না। আমি একটা ধাক্কা মারলে কোথায় ছিটকে পড়বে তার ঠিক নেই, উনি আবার বাঘ মারবার আস্ফালন করছেন।

প্রিয়লাল আর থাকতে না পেরে জামার হাতটা গুটিয়ে হাতের পেশী স্ফীত করে বলল, এখনও বাইসেপসটা প্রায় ষোল ইঞ্চি আছে সরলা! তোমার মত দুটো দেহ আমি দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরতে পারি।

সরলা বলল, ইস্! থাক্ হয়েছে। একটার ভারেই অস্থির হয়েছ আর দুটো দেহয় কাজ নাই। তারপর হঠাৎ পরেশের কথা মনে প'ড়ে গিয়ে বলল, আহা, পরেশ বেচারী, একলা রয়েছে, ওর হয়'ত খুব কষ্ট হ'চ্ছে।

প্রিয়লাল বলল, এত রাত্রে তাই ভেবেই ত' যাচ্ছি, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারলাম না।

সরলা বাইরের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে বলল, ছেলেটা বড় মায়াবী,—না ?

প্রিয়লাল হেসে বলল, এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে মুগ্ধ করে গেছে দেখছি। ওযে মায়া জানে এটা এখন স্বীকার করতেই হ'ল। কেন জানিনা, এই অল্প দিনের পরিচয়ে আমি ওকে সত্যই ভালবেসে ফেলেছি। নিষ্পাপ পবিত্র ওর শুভ্র মুখখানা।

সরলা বলল, ও বড় দুঃখী।

প্রিয়লাল বলল, সে পরিচয়ও তুমি পেয়েছ! ওর সাংসারিক পরিচয় কিছু পাইনি, জিজ্ঞেসও করিনি। ওর মুখ দেখলে আমি যেন ওর অন্তরের সমস্ত চিন্তাকে চোখে দেখতে পাই।

সরলা বলল, আমি কিন্তু ওর সব জানি।

প্রিয়লাল বলল, তুমি সব শুনেছ ?

সরলা বলল, হ্যাঁ, সংসারে আছে ওর বিধবা মা আর এক ভগ্নী। বিয়ের পর ওর ভগ্নীর অসুখ করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে সম্পূর্ণ পাগল। স্বামী ওকে ঘরে নেয় না, সমস্ত দেহে তাদের অমানুষিক প্রহারের দাগ আছে। পরেশের মাইনের কটা টাকাই হ'ল ওদের একমাত্র উপায়।

প্রিয়লাল চিন্তিতভাবে বলল, ঐ রকম একটা কিছু ব্যাপার যে ছেলেটাকে দিনরাত ভাবিয়ে রেখেছে এটা আমি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছি। গত মাসে ওকে আমার মাইনে থেকে পাঁচ টাকা দিয়েছি। প্রথমটা ও নিতেই চায় না, বিস্মিতনেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল। এক রকম জোর করেই টাকাটা আমি ওকে গ্রহণ করতে বাধ্য করলাম।

সরলা বলল, ও তা আমার কাছে বলেছে।

প্রিয়লাল বলল, বলেছে ? ওদের ত' বড় কষ্ট, এক ফোঁটা ছেলে কি করে সামলাবে। এ ষ্টেশনে না হয় কাজটা কম, কিন্তু অন্য জায়গায় যদি ও বদলি হয়! সে যা হোক, এখন আমি ষ্টেশনে চললাম।

এক হাতে লণ্ঠন ও অপর হাতে এক গাছা মোটা লাঠি নিয়ে প্রিয়লাল হন্-হন্ করে অসমতল মাঠের উপর দিয়ে চলতে সুরু করল।

সরলার দু'টো চোখ হঠাৎ সজল হয়ে উঠল ; প্রিয়লালের চলার পথে অনেকক্ষণ ও চেয়ে রইল। তারপর কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলল, প্রভু তুমি ওঁর দেহের শক্তি আর মনের উদারতা বজায় রেখো।

শালবনের মাঝ দিয়ে চলতে চলতে, এক একবার প্রিয়লালের গা ছম্-ছম্ করে উঠছিল। চারিপাশের নৈশ নীরবতা মৃত্যুপুরীর মত ভয়াবহ হ'য়ে তার চতুর্দ্দিকে যেন আবর্ত্তিত হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে বাতাস লেগে শালের বনে খস্-খস্ আওয়াজ আসে। দু' একটা বুনো খরগোস এদিক ওদিক ছুটে পালায়। পরিস্কার চাঁদের আলোয় তাদের ক্ষুদ্র চলন্ত দেহ প্রিয়লালের চোখে পড়ে।

বেশী জোরে আওয়াজ পেলেই প্রিয়লাল সতর্ক দৃষ্টিতে চায়। ঝোপের ভেতর থেকে হয়ত বাঘ বা কোন হিংস্র পশু দৃষ্টিগোচরে আসে। লাঠিখানা সে সজোরে চেপে ধরে, সমস্ত দেহ তার ফুলে ওঠে, কপাল বয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে।

বন পার হ'য়ে প্রিয়লাল রেলের লাইনের উপর পড়তেই ষ্টেশনের বিবর্ণ আলো তার চোখে পড়ল। ক্রমেই সে আলো নিকটতর হ'তে লাগল। প্রিয়লাল আকাশের দিকে চেয়ে কতটা রাত হ'ল অনুমান করে নিল। পরেশের জন্যে সে চিন্তিত হল। আরাম কেদারায় এতক্ষণ হয়ত পরেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। কোমল সে মুখে এখন হয়ত পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার ভাব, কিংবা হয়ত দুঃস্বপ্নে সে মুখে নানা রূপান্তর হ'চ্ছে। হঠাৎ তার নজর গেল, দূরে কতকগুলি ঝোপের পাশে অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি,—শুভ্র বসনে সমস্ত দেহ আবৃত।

প্রিয়লাল বিস্মিত হ'য়ে সেদিকে চেয়ে রইল। তার মনে হ'ল মূর্ত্তি যেন তার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ক্রমে অত্যন্ত নিকটে, তারপর একবারে সামনে।

প্রিয়লাল দেখল, সে মুখ কাগজের মত সাদা। রক্তের লেশমাত্র যেন তথায় নেই।

সমস্ত রক্ত তার হিম হ'য়ে আসতে লাগল। লাঠিখানা চেপে বাগিয়ে ধরে, সাহস করে সে বলল, কে তুমি ?

স্পষ্ট মানুষের কণ্ঠে জবাব এল, কে আমি? তোমার মত মানুষ।

প্রিয়লালের মনে হ'ল, স্বরের ভেতর ত কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, কেন তুমি একলা বের হয়েছ?

সমস্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ সে নারীমূর্ত্তি খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসির সেই বিকট শব্দে প্রিয়লাল শিউরে উঠল।

অত্যন্ত অস্বাভাবিক হাসি।

নারী বলল, আমি ত একলা নই, তুমিও ত আছ।

প্রিয়লালের মাথার ভেতর বোঁ-বোঁ করতে লাগল। তার দিকে চাইতেও যেন তার আর সাহস হচ্ছে না।

উচ্চহাস্য করে আবার নারী বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে? আমার সঙ্গে এস।

রেলের লাইন ধরে নারীমূর্ত্তি ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে লাগল, আমার সঙ্গে এস।

প্রিয়লাল এক পাও অগ্রসর হ'তে পারল না।

রেলের লাইনের যে দিকে গোলপাতার ঘর সব সেই দিকে নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রিয়লালের সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে উঠল। কাপড়ের কোঁচায় মুখখানা মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে সে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হ'ল। কাণেতে তখনও তার অদ্ভুত হাসির শব্দ থেকে থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। চমকে উঠে সে পিছন দিকে চাইলে।

ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর পৌঁছে দেখল, ছোট ঘরের ভেতর পরেশ কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছে, হাতে তার নীল পতাকাটা তখনও ধরা। অদূরে কুলিটাও নির্জ্জীবের মত হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে।

পরেশের কাছে এসে প্রিয়লাল মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল।

পরেশ উঠে বসল। তারপর প্রিয়লালের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কতক্ষণ এসেছেন দাদা! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রিয়লাল পরেশের মাথায় হাত দিয়ে বলল, চল তোমায় বাড়ীতে দিয়ে আসি।

পরেশ বলল, থাক দাদা, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। পথের অলৌকিক ঘটনাটা প্রিয়লালের মনে উদিত হ'ল। পরেশের কথায় বাধা দিয়ে বলল, এই রাত্রে একলা যেও না ভাই, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

পরেশ প্রিয়লালের হাত ধরে বলল, রঘুয়াকে নিয়ে আমি যাচ্ছি! ট্রেণ আসতে এখনও দেরী আছে, একটু ঘুমিয়ে নিন্।

রঘুয়া কুলিকে নিয়ে পরেশ চলে গেল।

প্রিয়লাল আরাম কেদারায় তার দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল। মনের মধ্যে কিন্তু তখন তার ঘুরতে লাগল, আসবার পথে আশ্চর্য্য ব্যাপারটা।

সকাল বেলার ট্রেণটা সবে মাত্র চলে গেছে। পরেশ এসে বলল, দাদা, আমার একটা কথা রাখতে হবে।

প্রিয়লাল প্রফুল্ল হ'য়ে বলল, কি কথা রাখতে হবে ভাই? কথাটা একবার শুনি।

পরেশ বলল, আগে বলুন রাখবেন।

পরেশ বলল, আপনাকে আজ দুপুর বেলা আমাদের বাড়ীতে যেতে হ'বে। মা বিশেষ করে বলেছেন।

প্রিয়লাল মুক্তির নিশ্বাস ফেলার ভাণ করে বলল, এই কথা! আমি ভাবলাম কি না কি। নিশ্চয় যাব ভাই। কিন্তু কি খাওয়াবে শুনি?

পরেশের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। লজ্জিত হ'য়ে সে বলল, জঙ্গলের দেশে ভাল জিনিষ কি আর পাওয়া যাবে দাদা! তা ছাড়া আমরা বড় গরীব।

প্রিয়লাল পরেশের চিবুক ধরে বলল, তোমার দাদাকে খুব বড় লোক ঠাউরেছ, কি বল ভাই? মা'কে বোল, আমি নিশ্চয়ই যাব।

দুপুর বেলায় পরেশের সঙ্গে প্রিয়লাল তাদের বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করল। লাইনের ধার দিয়ে যেতে যেতে পরেশের দৈন্য সংসারের নানা ছবি বিভিন্ন রূপে তার মনে

উদয় হ'তে লাগল। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘরগুলির কাছে আসতে তার গত রাত্রের সেই রহস্যময়ী নারীর কথা মনে পড়ল। অজানিতেই সে চমকে উঠল। উজ্জ্বল দিবা-লোকেও সে এদিক ওদিক ফিরে চাইল।

ওরই ভিতর একটা গোলপাতার বাড়ীর সামনে পরেশ ও প্রিয়লাল এসে দাঁড়াল। দরজা ঠেলতে ভিতর থেকে এক প্রৌঢ়া এসে দরজা খুলে দিল।

পরেশ প্রিয়লালকে ভিতরে নিয়ে গেল। ক্ষুদ্র দু' খানা ঘর, ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকি রুক্ষ জায়গা। মাঝখানে টিনের ভিতর অর্দ্ধ সতেজ একটা তুলসী গাছ, তলায় একটী ছোট মাটীর প্রদীপ। ঘরের সামগ্রীর বাহুল্য নেই। অভাবের স্পষ্ট রূপ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। তার ভিতরই যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে সমস্ত গোছান।

পরেশ বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, দাদা, ইনি আমার মা।

প্রিয়লাল বৃদ্ধাকে প্রণাম করল। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বৃদ্ধা অশ্রুসজল চোখে প্রিয়লালকে বলল, বাবা, তুমি আর জন্মে আমার ছেলে ছিলে। পরেশকে তুমি যে কত ভালবাস তা আমি ওর কাছে সর্ব্বদা শুনি।

প্রিয়লাল বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বলল, পরেশ যে আমার ছোট ভাই মা।

কথার মাঝে বাধা দিয়ে পরেশ বলল, দিদি কোথায়?

বৃদ্ধা বলল, এক ঘণ্টা হ'ল মাধুরী কোথা গেছে, কই এখনও ফেরেনি।

প্রিয়লালের মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমার মেয়ে পাগল বাবা। সে মাধুরী আমার আর নেই,—সে মরে গেছে।

বৃদ্ধার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। তুমি একটু বো'সো বাবা, এখনি আমি আসছি, বলে উপচীয়মান অশ্রু রোধ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

সহসা দ্রুত পদশব্দে চমকে উঠে প্রিয়লাল সম্মুখে চাইতেই, যে মূর্ত্তি তার নজরে পড়ল, তাতে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। গত রাতের পথের মাঝে দেখা সেই অদ্ভুত নারী।

ঠিক সেই সময় ছুটে এসে পরেশ উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রমণীকে উদ্দেশ করে বলল, কোথায় গেছলে দিদি?

মাধুরী বলল, তোর জামাই বাবুকে দেখতে গেছলাম রে। ঐ শালবনের ভেতরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, আমার কত ভালবাসে জানিস ত? কথা শেষ করে সে হেসে উঠল।

প্রিয়লাল নির্ব্বাক হ'য়ে বসে রইল। তার দুটী চোখ স্থির নিবদ্ধ।

প্রিয়লালের অনুমান হ'ল মাধুরীর বয়েস বছর সাতাশেক। সে দেহে যে এক সময় সৌষ্ঠব, রূপ ও অপূর্ব্ব যৌবনের প্রাচুর্য্য ছিল সেটা তার অযত্নম্লান কঙ্কালসার দেহ দেখলে এখনও বোঝা যায়। আয়ত কৃষ্ণবর্ণ দুটি চোখ, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টির স্থিরতা নেই। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহের রং এখনও বিবর্ণ, রক্তহীন মনে হয়। এক মাথা কুঞ্চিত কেশ, তৈলাভাবে বিবর্ণ, অযত্নে বিক্ষিপ্ত।

পরেশের কথার জবাব দিয়ে মাধুরী প্রিয়লালের কাছে সরে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ইনি কে পরেশ?

পরেশ বলল, ইনি হলেন আমার মনিব, প্রিয়লাল দা।

মাধুরী হেসে উচ্চস্বরে বলল, চিনতে পেরেছি! কাল রাত্রে দেখা! আমায় চিনতে পারছ? তা পারবে কেন? তোমরা ভুলে যাও। আমার সঙ্গে ত কাল গেলে না। আমায় বলে সব পাগল, মাথা খারাপ।

খিল খিল করে হেসে সে আবার বলল, মাথা খারাপ ত তোমাদের, সব ভুলে যাও। এই আমি কি ভুলি? ওর আস-বার কথা ছিল দুপুর বেলা শালবনে, আমি ঠিক গেছি। কত কথা কইলাম।

প্রিয়লালকে উদ্দেশ করে আবার বলল, আচ্ছা বল ত আমার ভিতর কি পাগলামী দেখলে।...বলবে না? তোমারও ত মাথার ঠিক নেই। আচ্ছা আমি আসি, অনেক দূরে রেল লাইনের ধারে তিনি আবার আসবেন কি না!

ছুটে সে বেরিয়ে গেল। পরেশ চেঁচিয়ে ডাকল। মাধুরীর ভ্রূক্ষেপ নেই,—উঁচু নীচু পথের উপর দিয়ে,

কাঁটা বন, ঝোপের পাশ কাটিয়ে রেল লাইন ধরে সে ছুটতে লাগল।

পরেশ ফিরে এল। প্রিয়লাল আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। একটা গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন।

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল পরেশের ডাকে।

পরেশ বলল, দিদি বোধ হয় আর ভাল হ'বে না। না? এই এখন চলে গেল, সেই সন্ধ্যার পর ফিরবে; হয়ত গভীর রাত্রে দরজায় এসে ধাক্কা দেবে। এক একদিন দেখি সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত, ছেড়া কাপড় কোন রকমে গায়ে ঢেকে রেখেছে।

প্রিয়লাল বলল, কিন্তু স্মৃতিশক্তি এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি পরেশ! হয়ত উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লে সেরে উঠতে পারতেন।

নিস্পন্দ দ্বিপ্রহর। চারিদিকে রৌদ্র-ম্লান বন-শোভা। প্রিয়লাল ষ্টেশনের ছোট ঘরখানায় বসে ভাবছিল মাধুরীর কথা। দূরে একখানি লোহার চেয়ারে পরেশ এসে বসল। দুপুরের ট্রেণ আসতে তখনও দেরী আছে। দু' একজন ভিন্ গ্রামের লোক প্লাটফর্ম্মের উপর পায়চারি করছে।

প্রিয়লাল বলল, মাধুরীর শ্বশুর বাড়ী কোথায়?

পরেশ বলল, জামাই বাবু রাজসাহী কলেজে প্রফেসারী করেন। ওখানেই তাঁরা থাকেন।

প্রিয়লাল চিন্তিতভাবে বলল, তোমার জামাই বাবুর নাম কি?

পরেশ বলল, দিবাকর মুখার্জ্জি।

বিস্মিত ভাবে প্রিয়লাল বলল, দিবাকর! আচ্ছা কি রকম দেখতে?

পরেশ বলল, ফর্সা, আপনার মত লম্বা, দেহের গঠনও অনেকটা আপনার মত।

প্রিয়লাল অন্যমনস্ক ভাবে বলল, আমার মত দেখতে অনেকটা, কি বল? তোমার দিদির ক'বছর বিবাহ হ'য়েছে?

পরেশ বলল, প্রায় দশ বছর।

প্রিয়লাল বলল, বেনারসে থেকে কি তোমার দিদির বিবাহ হয়েছে? বেনারস কলেজে তিনি কি তখন সবেমাত্র প্রফেসার হয়েছেন?

পরেশ আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বলল, আমি তখন খুব ছেলে মানুষ ছিলাম, কিন্তু আপনি যা বললেন সবই ঠিক। তিনি তখন ওখানকার কলেজে পড়াতেন।

প্রিয়লালের মুখখানা অদ্ভুরূপ ভাবান্তর হ'ল। নিজের মনে বলে উঠল, দিবাকর! মাধুরী! সেই মাধুরী! কাশীর গঙ্গার তীরে। সেই মাধুরীকে আজ চেনা অসম্ভব! তবু নিবিষ্টভাবে দেখলে চেনা যায়। অপূর্ব্ব আয়ত দু'টী চোখ, সুন্দর অবয়ব! যদিও আকাশ পাতাল প্রভেদ,—সে দেহের বিকৃত ছায়া, কিন্তু সেই মাধুরী। মাধুরী তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল, স্মরণের হয়ত চেষ্টা করছিল।

পরেশ বিস্মিত হ'য়ে প্রিয়লালের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি কি দিদি, জামাই বাবুকে চেনেন? প্রিয়লাল নিরুত্তর। তখন তার মানসপটে ভেসে উঠল একটা স্পষ্ট ঘটনা।

সন্ধ্যার পাতলা আবরণ তখন সবে মাত্র পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেছে। কাশীতে হরিশ্চন্দ্রঘাটে তখন সে বসে। সামনে বিস্তৃত বারিরাশি, ওপারে অন্ধকার ঢাকা অস্পষ্ট বন-রেখা, ঘাটের পাশেই শ্মশানভূমি, লেলিহান অগ্নিশিখা হ'তে ধূম্ররাশি কুণ্ডলিত হ'য়ে আকাশের দিকে উর্দ্ধায়িত হ'চ্ছে। মন্দিরের তীব্র বাদ্যধ্বনি স্থানটিকে মুখরিত করে তুলেছে।

শ্মশানের ওধারে একটা গোলমাল উঠল, তারপর শোনা গেল প্রহারের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠে আওয়াজ এল, কেউ আছেন, আমাদের বাঁচান।

ঐ কথায় সে উঠে দাঁড়াল, মাংসপেশী তার স্ফীত হ'য়ে উঠল, তীরবেগে শ্মশানের ভেতর দিয়ে সে ছুটল, যেখান থেকে আওয়াজ আসছে।

স্থানটি শ্মশানের জলন্ত চিতার আলোকে ঈষৎ আলোকিত। সে দেখল, একজন যুবক চার পাঁচজন সবল কৃষ্ণবর্ণ লোকের আক্রমণ প্রতিরোধ করছে, সমস্ত মুখ রক্তে লাল হ'য়ে উঠেছে। অদূরে এক রমণী অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে লাঠি হাতে একজন লোক পথরোধ করে দাঁড়িয়ে।

সে তেমনি তীরবেগে যে লোকটি রমণীর পথরোধ করেছিল তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর লোহার মত শক্ত হাতে তার গলদেশে প্রচণ্ড আঘাত করল। চিৎকার করে লোকটা মাটীতে পড়ে গেল. তড়িতের মত তার হাতের লাঠিখানা নিয়ে সে অন্য আক্রমণকারিদের সম্মুখীন হ'য়ে খুব নিপুণতার সঙ্গে লাঠি চালনা করে গুরুতর ভাবে আঘাত করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আততায়ীরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে গেল। লাঠিখানা মাটীতে রেখে যুবককে সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। যুবক তখন অচৈতন্য। অদূরে দণ্ডায়মানা রমণী ধীরে ধীরে তার নিকট অগ্রসর হ'য়ে কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, আপনি আজ আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, মৃত্যু আজ আমাদের ছিল অনিবার্য্য।

মুখ ফিরে সে চেয়ে দেখল, এক যুবতী কুলপ্লাবিত বারিরাশির মত তার দেহে উজ্জ্বল রূপ-যৌবন। সৌজন্যভরে সে বলল, প্রাণ রক্ষার মালিক আমি নই, রক্ষার মালিক হলেন ভগবান। একটু পরে যুবকের চৈতন্য ফিরে এল, ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদের পালা চলল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'য়ে গেল। পরিচয়ে সে জানল, যুবকের নাম দিবাকর মুখার্জ্জি, ওখানকার কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। এক বছর হ'ল ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছে। যুবতী তার স্ত্রী, মাধুরী।

তারপর কাশীতে গঙ্গার ধারে নিত্যই সে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'ত। কতদিন শুক্ল রাত্রে গঙ্গাবক্ষে বজরায় চড়ে তাদের সঙ্গে সে সময় অতিবাহিত করেছে। তার দৈহিক সুঠামের প্রশংসা মাধুরী ও দিবাকরের মুখে ধরত না। মাধুরী বলত, আপনার শরীর দেখলে "স্যাণ্ডোর" ছবি মনে পড়ে।

দিবাকর হেসে বলত, তোমাকে দেখতে ঠিক "ম্যাডোনা।" মাধুরী হেসে বলত, তুমিই কেবল আমায় সুন্দর দেখো, আর ত' কেউ আমায় বলে না।

দিবাকর তাকে উদ্দেশ করে বলত, প্রিয়লাল বাবু, আপনি বলুন্‌ত, ওঁর রূপ প্রশংসা পাবার যোগ্য কি না?

সে হেসে সমর্থন করত।

মাধুরী কলহাস্যে বলত, আপনাকে নিশ্চয় ঘুষ দিয়েছেন।

চারিটা মাস খুব আনন্দে তাদের সঙ্গে সে অতিবাহিত করল। তারপর রেলে সে চাকরি পেল। এই দীর্ঘ কয়বছর বিভিন্ন স্থানে তাকে ঘুরতে হয়েছে। কোন খবর আর রাখবার সে অবকাশ পায় না। বিস্মৃতির অতল তলে ঘটনাটা বিলুপ্ত হ'তে চলেছে। চিন্তাকে বাধা দিয়ে পরেশ বলল, আপনি নিশ্চয় চেনেন, কি ভাবছেন বলুন।

প্রিয়লাল যেন গভীর নিদ্রার পর আলস্য ভেঙে উঠল। পরেশের কথায় সে ছোট উত্তর দিল, আমার সঙ্গে তোমার দিদির ও জামাই বাবুর বহু বছর পূর্ব্বে পরিচয় হয়েছিল।

আর কোন কথা সে বলল না। অত্যন্ত উদাসভাবে মধ্যাহ্ন গগনের দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরের ট্রেণ, বিকেলের ট্রেণ এল চলে গেল। প্রিয়লাল বিশেষ কথা কইল না, তাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

পশ্চিম চক্রবালে অস্তমান সূর্য্যের দিকে চেয়ে প্রিয়লাল বলল, পরেশ, তুমি বাড়ী যাও, অনেকক্ষণ তুমি আজ কাজ করেছ।

পরেশ আপত্তি করল। কিন্তু প্রিয়লালের কাছে তা টিকল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরেশ চলে গেল।

গাঢ় অন্ধকার ক্রমে পৃথিবীকে গ্রাস করেছে।

শৃগালের উর্দ্ধস্বর, ঝিঁ-ঝিঁ পোকার এক টানা আওয়াজ নৈশ অন্ধকারকে মুখরিত ক'রে আছে।

প্রিয়লাল আজ সাব্যস্ত করেছে, মাধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, একাকী। কুলি রঘুয়াকে সেখানে বসিয়ে সে রেলের লাইন ধরে অগ্রসর হতে লাগল। ঘন বনের কাছ বরাবর এসে সে পদচারণা করতে লাগল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। মাধুরীর সাক্ষাৎ সে পেল না। নিরাশ হয়ে সে ষ্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছিল; এমন সময় দূরে দ্রুত পদশব্দে, সে পিছন ফিরে চাইল।

অন্ধকারে সে অস্পষ্ট দেখতে পেল কে যেন ঘন শালবনের ভিতর থেকে বেরিয়ে রেলের লাইনের পাশ দিয়ে ছুটে আসছে।

মুহূর্তের জন্যে প্রিয়লালের বুক কেঁপে উঠল। তারপর নিজেকে সংযত করে স্থাণুর মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে মূর্ত্তি প্রিয়লালের সামনে এসে নিশ্চল হ'ল।

প্রিয়লাল দেখল, মাধুরী।

মাধুরী ফ্যাল ফ্যাল করে প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল।

প্রিয়লাল ডাকল, মাধুরী, আমায় চিনতে পারছ? আমি প্রিয়লাল, কাশীর শ্মশানের পাশে।...

হাস্যে চারিদিক মুখরিত করে মাধুরী প্রিয়লালের খুব নিকটে সরে এল। মাধুরীর দৃষ্টি তখন প্রিয়লালের মুখের প্রতি স্থির নিবদ্ধ।

হঠাৎ জোর গলায় মাধুরী বলল, তুমি! প্রিয়লাল! কাশীতে! একটু থেমে আবার বলল, মনে পড়েছে! হরিশ্চন্দ্র শ্মশানের কাছে। আমি সেই মাধুরী! হো-হো করে সে হেসে উঠল।

প্রিয়লাল মাধুরীর হাত ধরে বলল, তোমার সব মনে পড়েছে মাধুরী?

সহসা ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে মাধুরী চিৎকার করে বলল, আমাদের বাঁচাও, কে আছে!

পরমুহূর্ত্তে নিম্নস্বরে বলল, কে তুমি! প্রিয়লাল!

হেসে উঠে আবার সে বলল, মাথা আমার ঠিক আছে, সব মনে আছে। তবু আমায় বেত মারে, বলে মাথা খারাপ।

প্রিয়লালের দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

মাধুরীকে ধরা গলায় বলল, তোমার স্বামীর কাছে যাবে মাধুরী?

হেসে মাধুরী বলল, বা রে, আমার যাবার কি দরকার। রোজত ওর সঙ্গে দেখা হয়, বনের ধারে, নালার পাশে, রোজত সে আসে। তুমি দেখা করবে? আমার সঙ্গে ছুটে চল।

প্রিয়লাল বলল, আমি এখানে দেখা করব না, রাজসাহীতে তোমায় নিয়ে যাব।

মাটীতে বসে পড়ে আতঙ্কের সঙ্গে মাধুরী বলল, না গো না, ওখানে যাব না, সেখানে আরতি নামে একটা ধাড়ি আইবুড় মেয়ে আছে।...আমার দিকে কটমট করে চায়। আমায় মেরে ফেলবে, আমি যাব না।

বিদ্যুতের মত মাটী থেকে মাধুরী উঠে প্রাণপণে ছুটতে লাগল, আর বলতে লাগল, আমি যাব না!

প্রিয়লাল পিছু পিছু খানিকটা ছুটে ডাকতে লাগল,—মাধুরী—মাধুরী!

পরের দিন প্রতি দিনের মত পরেশের সঙ্গে ষ্টেশনে প্রিয়লালের দেখা হ'ল। পরেশের মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট।

প্রিয়লাল পরেশের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, পরেশ, কি ভাবছ?

বিমর্ষ ভাবে পরেশ উত্তর দিল, কাল রাত্রে দিদি বাড়ী ফেরেনি, আজ ভোর বেলা আমি অনেক খুঁজেছি, কোথাও দেখতে পেলাম না।

প্রিয়লাল অন্যমনস্কভাবে বলল, হয়ত একটু দূরে গিয়ে পড়েছেন। আজ নিশ্চয় ফিরবেন।

পরেশ বলল, যত রাতই হোক, দিদি রোজই ফেরে।

প্রিয়লাল একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। সে দিন তার দিন ও রাত নানা চিন্তার ভেতর দিয়ে কেটে গেল।

তার পরের দিন পরেশ অত্যধিক বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তার সমস্ত মুখখানায় এক পোঁচ কালি কে লেপে দিয়েছে।

দুপুরের ট্রেণটা চলে যাবার কিছুক্ষণ পর, প্রিয়লাল পরেশকে ডেকে পাশে বসিয়েছে, এমন সময় রঘুয়া এসে প্রিয়লালকে জানাল, আজ বাবু মধুপুর গ্রাম থেকে আসার সময় নজর গেল রেল লাইনের পাশে কোম্পানির খালের ধারে গাছের তলায় আমাদের পাগলী মা শুয়ে আছে,—আমায় দেখতে পেয়ে ডাকল, কাছে যেতে বলল, তুই গ্রামে যাচ্ছিস?—আমি বললাম হ্যাঁ, আর কোন কথা কইল না, পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

প্রিয়লাল উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে রঘুয়াকে বলল, মধুপুর গ্রাম এখান থেকে কত দূর, কোন দিকে!

রঘুয়া বলল, কাছেই বাবু, দু' মাইল, রেল লাইন ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে।

পরেশের হাত ধরে প্রিয়লাল সে দিকে ছুটতে লাগল।

অসমতল প্রান্তরের মাঝ দিয়ে, বনে ভেতর দিয়ে, এঁকে বেঁকে যাওয়া রেল লাইন ধরে তারা ছুটতে লাগল।

বুনো কাঁটার ঝোপে ওদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হ'তে লাগল। তবু ছোটার বিরাম নেই।

কোম্পানির খালের কাছে পৌছে ওরা চারি পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল, দূরে বিরাট শব্দে ট্রেণ আসার আওয়াজ পেল, ক্রমে চলন্ত ট্রেণ তাদের দৃষ্টির পথে এসে পড়ল, ঠিক সেই সময় একটী নারীমূর্ত্তি তীর বেগে খালের ধারে বনের ভেতর দিয়ে বের হ'য়ে চলন্ত ট্রেণের দিকে ছুটতে লাগল,—

পরেশ চিৎকার করে ডাকল, দিদি! প্রিয়লাল ডাকল, মাধুরী! হয়ত সে শব্দ অস্পষ্টভাবে মাধুরীর কাণে পৌছল।

মাধুরী ফিরে চাইবার জন্যে যেই ঘাড় ফেরাতে গেল, ঠিক সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে একখণ্ড প্রস্তরে বাধা পেয়ে সে চলন্ত ট্রেণের পাশে পড়ে গেল।

প্রিয়লাল তীরবেগে অগ্রসর হয়ে তখন মাধুরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ট্রেণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। প্রিয়লাল মাধুরীর মূর্চ্ছিত দেহ দু' হাতে তুলে নিয়ে খালের পাশে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় এনে শুইয়ে দিল। পরেশ কাপড় ভিজিয়ে জল এনে মাধুরীর চোখে ও মাথায় দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মাধুরীর জ্ঞানসঞ্চার হ'ল,— চোখ খুলে চারিপাশে সে একবার দৃষ্টিপাত করল, একবার প্রিয়লালের মুখের দিকে চেয়ে পরেশের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

পরেশ ও প্রিয়লাল উভয়েই বিস্মিত! মাধুরীর দৃষ্টির ভেতর অস্বাভাবিকতা, চাঞ্চল্য যেন আর নেই, অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক দৃষ্টির ভঙ্গি।

ক্লান্ত কণ্ঠে মাধুরী ডাকল, পরেশ,—তারপর প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,—প্রিয়লাল, তুমি! কেন, এসেছ,—আমার কি হয়েছে?' পরেশ মাধুরীর বুকের উপর মাথা রেখে ক্রন্দনের সুরে বলল.—দিদি, তুমি রেলের তলায় মরতে যাচ্ছিলে?

ম্লান হাসি হেসে মাধুরী বলল,—মরতে যাচ্ছিলাম? কেন মরতে দিলি না, আমি যে তা হলে বেঁচে যেতাম পরেশ।

প্রিয়লালের সারা মুখখানা আনন্দে ভরে উঠল, ধমকের ভান্ করে প্রিয়লাল বলল, তোমাকে মরতে দিইনি, আমাদের খুসী, কি বল পরেশ! তারপর মাধুরীর মুখের নিকটে মুখ এনে বলল,—তুমি সেরে গেছ—মাধুরী, বাড়ী চল, অনেক কথা বলব। আমি প্রিয়লাল,—তুমি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতে,—কাশীতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে শীগগির দেখা করব,—আমায় নিশ্চয় তুমি ভুলে যাওনি। বাড়ী চল তারপর কথা কইব।

মাধুরী হেসে বলল, সত্যি আমি সেরে গেছি,—না? তুমি ভাল আছ?

প্রিয়লাল আনন্দিত হয়ে বলল, ভাল আছি, মাধুরী?

* * * *

ঘটনার পর আরো সাতটা দিন কেটে গেল। সকলকে বিস্মিত করে মাধুরী সম্পূর্ণ ভাবে সেরে উঠল। মাধুরী আবার হল পূর্ব্বেকার সহজ সরল মাধুরী। প্রিয়লালের সঙ্গে তার আলাপ নিবিড় হ'য়ে উঠল, পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘটনাই সে বিস্তারিত ভাবে বলতে পারে, কোথাও বাধে না। সরলা এখন হয়েছে তার সাথী, সরলার সঙ্গে কথা কইতে বসলে মাধুরীর কথার আর শেষ হয় না।

কথার ছলে প্রিয়লাল একদিন মাধুরীকে বলল, রাজসাহীতে চল,—দিবাকরকে আমি চিঠি লিখেছি,—তোমায় ফিরে পেলে ও নিশ্চয় খুসী হ'বে।

মাধুরী হেসে বলল, তা হয়ত হ'বে কিন্তু এর মধ্যে আর একজন যদি আমার শূন্য স্থান অধিকার করে থাকে?

বিস্মিত ভাবে প্রিয়লাল বলল, আর একজন কে?

মাধুরী বলল, আরতি।

প্রিয়লাল বলল, কথাটা একদিন তুমি বলেছিলে বটে,

কিন্তু সেটা আমি তোমার প্রলাপ বাক্য বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, সে স্থানের সম্পূর্ণ জোর তোমারই। দিবাকরের সঙ্গে এ বিষয় একটা বোঝাপড়ার দরকার,—যদি সে গ্রহণ না করে,—শুধু পরেশের বাড়ীই নয়, আমার বাড়ীও ত চিরকাল তোমার জন্যে খোলা আছে মাধুরী। কালই রওনা হতে হবে, আমি ছুটি নেবার ব্যবস্থা করছি।

* * *

রাজসাহীর একটী নিভৃত অংশে একখানি সুন্দর বাংলোর সামনে যখন তারা এসে দাঁড়াল, সন্ধ্যা তখন সবে মাত্র তার স্নিগ্ধতা পৃথিবীর উপর বিস্তার করেছে।

মাধুরী ও পরেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রিয়লাল দরজার সামনে গিয়ে দিবাকরের নাম ধরে ডাকল। পুরুষ কণ্ঠে ভিতর থেকে সাড়া দিল, যাই।

সেই কণ্ঠস্বর পৌছিল মাধুরীরও কাণে, পরিচিত স্বর এক মুহূর্ত্তে মাধুরী চিনে নিল,—লজ্জায় তার সমস্ত মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল,—বাতাসে কাঁপা লতার মত তার সারা দেহ কেঁপে উঠল,—পরেশকে দু'হাতে সে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরেই একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে প্রিয়লালের সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়লাল বলল, আমায় চিনতে পারছ, হরিশ্চন্দ্রঘাটের কালীর আমি সেই প্রিয়লাল।

ভদ্রলোক উত্তর দিল,—হাঁ, নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছি।

প্রিয়লাল বলল, তোমার বাড়ীতে আমাকে আজ রাত্রের মত স্থান দিতে হবে। কিন্তু আমি একলা, নই, আমার এক আত্মীয়া আছেন।

দিবাকর সাগ্রহে উত্তর দিল, এ তোমারই বাড়ী মনে করতে পার প্রিয়লাল। যদিও আজ মাধুরী নেই, হয়'ত এ পৃথিবী থেকে তার শেষ নিশ্বাস উর্দ্ধে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু আমি আছি,—তা ছাড়া আর একজন নতুন লোক আছে, সেখান থেকেও আদর আপ্যায়ন তুমি কম পাবে না।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রিয়লাল বললে, আর একজন? কে সে?

দিবাকর বললে, সে আরতি—আমার স্ত্রী। দু'মাস হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

প্রিয়লালের মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ হ'ল,—আরতি—! তারপর নিজেকে সংযত করে সে বলল, ভিতরে চল দিবাকর, আমি তাঁকে নিয়ে এখুনি আসছি।

দিবাকর ভিতরে প্রবেশ করল। প্রিয়লাল, মাধুরীকে বলল, সব ত' শুনলে মাধুরী? মনকে শক্ত করে আমার সঙ্গে ভিতরে চল।

মাধুরী মাথা নেড়ে বললে, মনকে শক্তই করে তোমাদের সঙ্গে ফিরে চললাম—বলে আর কোন কথাই উচ্চারণ না করে যে পথে এসেছিল সেই পথে সে ফিরে চলল।

বিমূঢ় প্রিয়লাল ও পরেশ কোনও প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করল।

* * *

কিছুক্ষণ পরে দিবাকর বাইরে এসে উচ্চৈস্বরে ডাকতে লাগল প্রিয়লাল, প্রিয়লাল, কোথায় গেলে? দেরী করছ কেন?

তার কণ্ঠস্বরে আরতি ভিতর থেকে বাইরে এসে বললে, কাকে ডাকছ?

দিবাকর বললে, এইমাত্র আমার একটি বন্ধু এসেছিল প্রিয়লাল আর সম্ভবতঃ তার স্ত্রী প্রিয়লাল তার স্ত্রীকে আনতে গেছে। এখনি তারা এসে পড়বে।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

শ্রীসুশীল কুমার বসু

বাংলায় কৃষক আন্দোলন

বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের না হইলেও অল্পদিনের মধ্যেই ইহা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের বহু সভাসমিতির অনুষ্ঠান এবং কয়েকটি জেলায় জেলা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। তাঁহারা যে দ্রুত সংঘবদ্ধ হইতেছেন এবং নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শক্তিশালী ও যথোচিত নেতৃত্বের অভাব না হইলে এই আন্দোলন আরও অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং রাজনীতিক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব অনুভূত হইবে। রাজনীতিক চিন্তা ও কর্ম্মের ধারাও ইহার দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এদেশের তিন চতুর্থাংশেরও উপর লোকের জীবিকা কৃষি অথচ, অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরিদ্র, দুর্গত ও উপেক্ষিত। কাজেই কৃষক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। যে আন্দোলনের পশ্চাতে তীব্র আয়োজনের তাগিদ আছে, যাহা বহু সংখ্যক লোকের দুঃখ দূর করিবার আশ্বাস লইয়া আসিয়াছে, সংখ্যাতিভূয়িষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি বিধান যাহার লক্ষ্য সে আন্দোলন যে শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলন শ্রেণীগত এবং এদিক দিয়া শ্রমিক আন্দোলনের সহিত ইহার জ্ঞাতিত্ব আছে। দেশের রাজনীতিকেও ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে। আমাদের রাজনীতিক চিন্তানায়কগণ ও নেতৃবর্গ রাজনীতিক্ষেত্রে জনসাধারণের যোগদানের প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার যে গণ আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও আন্দোলন সফল হইলে যে এই প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী একথা বারবার বলিয়া সকলকে গণ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কাজেই একথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, নূতন আন্দোলনের নূতন দিকটা কোথায় এবং কোন দিক দিয়াই বা ইহা রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। এই পার্থক্যটা বুঝিবার জন্য গত রাজনীতিক আন্দোলনগুলির একটা দিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইবে।

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে প্রধানতঃ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। দেশের নেতৃত্ব সহজেই ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল (এবং এখনও আছে)। আর্থিক অবস্থায় ইঁহারা অনেকেই দরিদ্র কাজেই জনসাধারণ হইতে খুব দূরে থাকিতে পারেন নাই—যাঁহারা কতকটা অবস্থাপন্ন তাঁহাদিগকেও ধনীদের অপেক্ষা জনসাধারণের সহিত অধিকতর সংযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধির বলে ইঁহারা সহজেই সম্মান, বিশ্বাস ও ক্ষমতালাভে সমর্থ হইয়াছেন। কৃষক শ্রমিক প্রভৃতির তুলনায় ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল থাকায় এবং গাঁতিদার, মহাজন, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক রূপে সমাজের বহুলোকের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাওয়ায় নিজেদের সহজেই জনসাধারণের নেতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া এই অবস্থা চলিয়া আসায় ইহা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। খুব স্পষ্টভাবে না হইলেও ইঁহাদের এই ধারণা ছিল যে বর্ত্তমানে দেশের যে শ্রেণীর লোক সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা যে অনুপাতে ভোগ করিতেছেন, স্বাধীনতালাভ হইলে নবলব্ধ সুবিধা

সুযোগ সমূহও সেই অনুপাতে ভাগ বাঁটোয়ারা হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনকারী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের আশা ছিল যে ইহার সর্ব্বপ্রধান লাভ অর্থাৎ দেশে শাসন ও দেশের কল্যাণ করিবার ভার তাঁহারাই পাইবেন। ইহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া গেল অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের সময় এবং সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গেল পণ্ডিত জওহরলাল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আভাষ দিতেই দেশময় যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠিয়াছিল তাহাতে।

রাজনীতিক মতিবিশিষ্ট আমাদের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরা যে এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছিলেন তাহার পশ্চাতে বাহিরের প্রভাবও বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক (ধনতান্ত্রিক) দেশ সমূহের শাসন কার্য্য যদিও জনসাধারণের কল্যাণের নামে চালান হয় এবং শাসন কার্য্যে এই অর্থে তাঁহাদের হাত থাকে যে, তাঁহাদের প্রদত্ত ভোটের জোরেই প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হন তবুও নানাশ্রেণীর ধনিক ব্যবসাদার, কলকারখানার মালিক ব্যাঙ্কওয়ালা প্রভৃতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদেরই ইঙ্গিত অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। শাসনকার্য্যের পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রদের ক্ষমতা বা তাহাদের জন্য কল্যাণের প্রেরণা খুব বেশী থাকে না। ধনতান্ত্রিক সবদেশেই আবার বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তেরা নিজেদের ধনীদের দলভুক্ত মনে করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের রাষ্ট্রিক নেতারা এই সব ধনতান্ত্রিক দেশ হইতেই গণতন্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন কাজেই এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি তাঁহারা কাজ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু, অবস্থার চাপে আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তা ও আদর্শে পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক বারের আন্দোলনে দেখা গেল যে তাহা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং ইহাও দেখা গেল যে দেশের জনসাধারণের যোগ ব্যতীত এই সকল আন্দোলনের পুরাপুরি সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বাধীনতা, স্বরাজ, মুক্তি, ত্যাগ, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, জনসাধারণের কল্যাণ প্রভৃতি যে সকল কথা বলা হইল তাহাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হইল না, তাহাদের দুঃখ দূর করা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আশ্বাস দেওয়া হইল তাহাও কাজে আসিল না। বিশেষ বিচার বিবেচনা না করিয়া লোকে যেন কতকটা আপনা হইতেই বুঝিতে পারিল যে স্বাধীনতার অর্থ দরিদ্র ও ধনীর নিকট এক নহে, দুঃখ দূর হইবার সাধারণ আশ্বাস অনেকটা মূল্যহীন। এই অবস্থায় দেশের রাজনীতিক নেতাদের দেশের জনসাধারণ ও তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে অধিকতর নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট কথা বলিতে হইতে লাগিল। জনসাধারণ কথাটা ব্যাপক এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে এক সঙ্গে বুঝান যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলের স্বার্থ এক নহে, অভাব অভিযোগ একপ্রকারের নহে এবং প্রতিকারের উপায়ও এক নহে। কৃষক, শ্রমিক, শ্রমশিল্পী, জমিদার, মহাজন ব্যবসাদার প্রভৃতি সকলেরই শ্রেণীগত স্বার্থ আছে এবং অনেকস্থলে তাহা আবার পরস্পর বিরোধী। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর এই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা এবং তাহাদের সকলের সামঞ্জস্য বিধানের উপায়ের কথা নেতাদের ভাবিতে হইতে লাগিল এবং সে সম্বন্ধে মতামতও দিতে হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী ভিত্তিতে যে সঙ্ঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠিল তাহারও চাপ আসিয়া নেতাদের ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপর আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ইহাও আমাদের নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে এই সকল শ্রেণীর কথা ভাবিতে অনেকটা বাধ্য করিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ কারণ ব্যতীত বাহিরের প্রভাবও আমাদের রাজনীতিক চিন্তার পরিবর্ত্তন সাধনে সহায়তা করিয়াছে। রাশিয়ার অভ্যুত্থান এবং অন্যত্র অমীমাংসিত জটিল সমস্যাসমূহের সকল সমাধান সমগ্র জগতের চিন্তার গতির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিক নেতাদেরও এই নূতন মতবাদের অপ্রতিবাদ্য অনেক নীতির সহিত নিজ নিজ মতবাদের সন্ধি করিতে হইয়াছে। অনেক তরুণ কর্ম্মী নূতন মতবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু, কংগ্রেস পরস্পরবিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাধারণ রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন

শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের অন্তর্বিরোধ থাকিলেও, সকলের স্বার্থের সহিতই বৈদেশিক প্রভুত্বের চাপের বিরোধ আছে। কংগ্রেস দেশকে ইহা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন। এদিক দিয়া কংগ্রেসের চেষ্টা সকল শ্রেণীরই স্বার্থের অনুকূলে যাইতে পারে। তবে তাহা কোন শ্রেণীর স্বার্থের কতটা অনুকূলে যাইবে তাহা নির্ভর করিবে কংগ্রেসে কোন শ্রেণীর প্রাধান্য কতটা থাকিবে তাহার উপর। যদিও কৃষক ও শ্রমিকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তবুও যতদিন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীর ভিত্তিতে সংঘবদ্ধতা গড়িয়া না উঠিতেছে ততদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কৃত্রিম চাপে কখনই কংগ্রেস তাঁহাদের দাবী পুরাপুরি স্বীকার করিবেন না বা করিতে পারিবেন না। যখন তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইবেন, নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হইবেন, তাঁহাদের দাবী না পুরাইলে যখন তাঁহাদের সহযোগিতা বা সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না তখনই কংগ্রেস বা অন্য কোন রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তি ও গণপ্রতিনিধিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইঁহাদের দাবী পুরাইতে বাধ্য হইবেন।

বর্ত্তমান কৃষক আন্দোলনের মধ্যে এই সম্ভাবনারই সূচনা দেখা দিয়াছে। অবশ্য কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্য লইয়া এই আন্দোলনের আরম্ভ হয় নাই। তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশা এতটা চরমে পৌঁছিয়াছে যে বাঁচিবার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা না করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। এই দুঃখ দুর্দ্দশার তাগিদই আন্দোলনকে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহাই তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। যাহারা রাজনীতির নবীনতম দর্শনে বিশ্বাসী উৎপন্ন দ্রব্যে উৎপাদকদিগেরই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অধিকার থাকা উচিৎ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, কৃষকদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগাইতে তাঁহাদের প্রচেষ্টাও উপেক্ষনীয় নহে। কৃষক আন্দোলন যাহাতে বিপথে চালিত না হইয়া বৈজ্ঞানিক পন্থার অনুসরণ করিতে পারে, যাহাতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ন্যায্য দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন ও নিজেদের রাষ্ট্রিক অধিকার তাঁহারা বুঝিয়া লইতে পারেন, এই আন্দোলনের নেতৃবর্গকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কংগ্রেসের ভিতরে না বাহিরে

অনেকের মনে এমন একটা ধারণা আছে যে কৃষক বা শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণী আন্দোলনগুলি পৃথক না হইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াই উচিত। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা মনে করেন যে, কংগ্রেস বর্ত্তমানে যে গণপ্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, কংগ্রেসের বাহিরে অন্য সংঘ গড়িয়া উঠিলে তাঁহাদের সেই প্রতিনিধিত্ব খর্ব্ব হইবে এবং কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া বাহিরে একটা ঐক্যের ভাব রাখিতে পারিলেই কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। কৃষকেরা যে আজও কংগ্রেসে দলে দলে যোগদান করেন নাই এবং করিতে যে পারেন না এবং শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠিলেই যে ইঁহারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন সে কথাটা পূর্ব্বে আলোচনায় অনেকটা বলা হইয়াছে।

কংগ্রেস দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে সকলকে বরাবর ডাকিয়াছেন কিন্তু, তাহা হইলেও সমাজের সর্ব্বস্তরে সমান সাড়া পান নাই কেন? তাহার প্রধান কারণ কংগ্রেস মুখ্যত রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা অন্য যে সকল সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা দুই কারণে করিয়াছেন। হয় তাঁহাদের সেই সকল কার্য্যের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ পড়িয়াছে, অথবা জনসাধারণের উপর অনুষ্ঠিত অবিচারের অবসানের আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে ও এইরূপে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যদি শুধু কৃষকদের কথা ধরা যায় তবে বলা যায় যে, দেশের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনে কোন অভিযোগ ছিল না, কাজেই তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই।

যদিও, কৃষকদের দুঃখের সর্ব্বশেষ দায়িত্ব দেশের রাজসরকারের এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে তাঁহাদের দুঃখ পুরাপুরি দূর হইতে পারে না তবুও সে সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন নহেন। প্রত্যক্ষ যে বাস্তবের সহিত তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ তাহারই সম্বন্ধে মাত্র তাঁহারা সজাগ হইতে পারেন। তাঁহারা চোখের উপর দেখিতে পান, জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, মহাজন তাঁহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছে, তাঁহারাই সব ফসল উৎপন্ন করেন অথচ, তাহা তুলিয়া দিয়া আসিতে হয় ইহাদের ঘরে। কাজেই, কৃষকদের

যাহা কিছু অভিযোগ তাহা সঞ্চিত হয় ইহাদেরই বিরুদ্ধে। তাঁহারা জানেন, পাটের দর কমিয়াছে, ধানের দর কমিয়াছে, উৎপন্ন অনেক জিনিস বাজারে বিকাইতেছে না, এবং তাহার ফলে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রের আহার্য্য, পরিধেয় জুটিতেছে না। কিন্তু, ইহার পশ্চাতে যে, রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা প্রভৃতি বহু জটিল জিনিসের সূক্ষ্ম হস্ত রহিয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বরং প্রতি পক্ষের প্রচার এবং তাঁহাদের অজ্ঞতার ফলে তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, শস্যের মূল্য হ্রাসের জন্য কংগ্রেস আন্দোলনই দায়ী। তাঁহারা দেখিতে পান, চাষের জমি ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, পূর্ব্বে যাহারা অন্য নানাপ্রকার কাজে লিপ্ত ছিল তাহারাও জীবিকার জন্য কৃষি অবলম্বন করিতেছে এবং প্রতি কৃষকের ভাগের জমি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দেশের শ্রম শিল্প নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যে এরূপ ঘটিতেছে এবং তাহার জন্য দেশের রাজসরকারের দায়িত্ব আছে, সে কথা বুঝিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। তাঁহারা চোখের উপর দেখিতে পান, নানাবিধ ব্যাধি, মহামারী তাঁহাদের নিত্যসঙ্গী অথচ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করিবার সাধ্য নাই; তাঁহারা ভাগ্যকে দোষী করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা একথা জানেন না যে তাঁহারা প্রাণ রক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের উপর দাবী করিতে পারেন। বরং বিনামূল্যে চিকিৎসার যে অতি সামান্য ব্যবস্থা মাঝে মাঝে আছে, তাহাকে প্রাপ্যের অধিক সরকারী বদান্যতা মনে করিয়া তাঁহারা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হন। যে দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাক সেখানেই এই একই ব্যাপার দেখা যাইবে। তাঁহাদের শিক্ষার কথা ধরা যাক, জলের অভাবে, বাঁধের অভাবে, প্লাবনের জন্য তাঁহাদের শস্যহানির কথা ধরা যাক, বদ্ধজলা, জঙ্গল প্রভৃতির জন্য দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা ধরা যাক, কোন কিছুরই দায়িত্ব যে সরকার অস্বীকার করিতে পারেন না সে কথা, অজ্ঞ কৃষকেরা বুঝিতে পারেন না। কাজেই, রাজনৈতিক মুক্তির নামে যদি তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেন তবে, তাহাই অস্বাভাবিক হইত! সরকারের বিপক্ষে ইহাদের মনোভাব গড়িয়া তুলার পথে অন্য অন্তরায়ও ছিল। ঘটনাক্রমে যাহারা সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, যাহাদের হস্তে দেশের যাহা কিছু অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে যাহারা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, সমাজের নিম্নস্তরের লোকের উপর তাঁহাদের ঘৃণার অবধি ছিল না। সমান সমান ব্যবহার ত ইহাদের সহিত কখনই করে নাই, এমন কি ইহাদিগকে মনুষ্যপদবাচ্যই মনে করেন নাই। নানাপ্রকারে ইহাদিগকে শোষণ ত করিয়াছেনই, অপমান লাঞ্ছনা করিতেও ক্রটি করেন নাই। ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায় ইহাদিগের উপর কখনই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ইহাদিগকে নিজেদের স্বার্থের শত্রু মনে করিয়াছেন। অপর পক্ষে ইংরেজ সরকারের আইনেই তাঁহাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়াছে। যাহাদের সহিত কোন ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই কোন দিন সমান হইবার দাবী করিতে পারেন নাই, ইংরেজের আইন তাঁহাদিগকে অন্য সকলের সহিত সমান অধিকার দান করিয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহারা অনেক সুবিধা ও মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছেন ও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবস্থারও কিছু কিছু উন্নতি হইয়াছে। যে সকল জাতির প্রধান ব্যবসা কৃষি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বাধাদানের মধ্যে এবং বাধাদান সত্ত্বেও তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছে, একথা তাঁহাদের বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে এবং ইহা তাঁহাদিগকে ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী করিয়াছে। কিন্তু, দেশের রাজসরকার যে বিদেশের এবং এদেশের ধনীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হয়, কৃষকদের যতটা উন্নতি হইতে পারে, তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যে যৎসামান্য চেষ্টা হইয়াছে তাহা তাহার তুলনায় যে যৎসামান্য মাত্র একথা অজ্ঞ কৃষকেরা বুঝিতে পারেন না, এজন্য কোন রাষ্ট্রিক আন্দোলনে তাঁহাদিগকে টানিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে তাঁহারা পূর্ব্বে কংগ্রেসে যোগ দেন নাই এবং এই কারণেই এখনও কংগ্রেস বা এমন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, তাঁহারা যোগদান করিতে রাজী হইবেন না।

কৃষকেরা নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা

সংঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতে পারেন। বর্ত্তমান কৃষক আন্দোলনের উদ্ভবও এই অবস্থার মধ্যে হইয়াছে। দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এই চেষ্টা অচল হইয়া উঠিতেছে এবং যে রাজসরকারকে তাঁহারা এতদিন কল্যাণকামী মনে করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন তাঁহারা রাজনীতির দিকে ঝুঁকিবেন এবং তখনই মাত্র কংগ্রেস বা অন্য রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবেন যখন তাহা তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার ও গুরুত্ব স্বীকার করিবে।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, কংগ্রেস যদি কৃষকদিগের জন্য পৃথক একটি শাখা স্থাপন করিয়া শুধুমাত্র কৃষকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন এবং ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু, কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য রাজনীতিক হওয়ায় কংগ্রেসের কোন শাখার উপরও কৃষকগণ পুরাপুরি নির্ভর করিতে পারিবেন না এবং কংগ্রেসের কোন শাখাও তাঁহাদের স্বার্থ পুরাপুরি রক্ষা করিতে পারিবেন না—তাঁহাদের ঈপ্সিত রাজনীতিক লক্ষ্যের জন্য কৃষকদিগকে আকৃষ্ট করিতে যতটুকু করা দরকার কৃষকদিগের জন্য ততটুকু মাত্র তাঁহারা করিবেন। কংগ্রেস যখন কোন প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইবেন বা বিশেষ কোন লক্ষ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইবেন তখন কৃষকদের স্বার্থ প্রধান লক্ষ্যরূপে রাখিয়া তাঁহাদের অন্যান্য নীতি বা কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। বরং কংগ্রেসের অন্যান্য নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই কৃষক শাখার কাজ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কিন্তু, কৃষকদের পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকিলে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও কৃষকদের মঙ্গলই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে, কৃষকদের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা কোন সময়েই তাহার নিকট বড় হইয়া উঠিতে পারিবে না। কাজেই কৃষকদের পৃথক প্রতিষ্ঠানের উপর কৃষকেরা যতটা বিশ্বাস নিরাপদে করিতে পারিবেন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কৃষক শাখার উপর কখনই ততটা পারিবেন না। কৃষকেরা মাত্র সেই প্রকার রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানেই যোগ দিতে পারিবেন যাহা কৃষকদের শ্রেণীগত স্বার্থকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিবেন। আপনা হইতে কেহ ইহা স্বীকার করিবেন না, যদি না কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা যথাযথ জাগ্রত হয় এবং নিজ শ্রেণীয় স্বার্থ তাঁহারা দাবী করিতে শিখেন ও আদায় করিবার শক্তি অর্জ্জন করেন। শ্রেণী সংঘবদ্ধতা হইতেই মাত্র এই শ্রেণীর চেতনা ও শ্রেণীশক্তি আসিতে পারে।

হয়ত বা কেহ একথা মনে করিতে পারেন যে পরাধীনতা আমাদের সকলের দুঃখের ও সকল দুঃখের মূল। স্বাধীনতা লাভ না হইলে কোন শ্রেণীরই দুঃখ পুরাপুরি ঘুচিবে না। কাজেই বর্ত্তমানে কোন শ্রেণী বিরোধের কথা শ্রেণী স্বার্থের কথা না তুলিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করা উচিত; স্বাধীনতা লাভ হইলে তাহার পর ভাগাভাগির কথা বিবেচনা করিলে হইবে। বর্ত্তমানে শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উহার বিরোধকে জাগাইয়া তুলিয়া লাভ নাই। ভিতরে যে স্বার্থের বিরোধ আছে তাহাকে অস্বীকার করিলে যদি তাহা সাময়িক ভাবেও লুপ্ত হইত, ঐক্যের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিত তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু অন্তর্বিরোধকে স্বীকার না করিলেই তাহা লুপ্ত হইবে না বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ (কখন সাম্প্রদায়িক, কখনও বা অন্য কোন রূপ) করিয়া ঐক্যের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। ইহার প্রধান প্রমাণ কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া জাতীয় ঐক্যের কথা বলিয়াছেন তাহার জন্য নেতারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ শ্রেণী স্বার্থের কথা বলিয়া অন্তর্বিরোধকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই; কিন্তু কংগ্রেসের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—ঐক্যের আবেদন জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় নাই। কিন্তু অপরপক্ষে শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে দল গড়িবার চেষ্টা হইলে, সব শ্রেণীর দলগুলিই দৃঢ় হইবে এবং যখন সকলেই দেখিবেন যে রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে কাহারও আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন হয় ত সকলেই একটা মিলিত কর্ম্মক্ষেত্রে (হইতে পারে কংগ্রেস) রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একত্রিত হইতে পারিবেন।

এই সকল এবং আরও অন্যান্য নানা কারণে শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উপযোগিতা রহিয়াছে এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের আওতায় সে উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না।

যশোহর জেলা কৃষক সম্মেলন

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যশোহর জিলা কৃষক সম্মেলন-এর প্রথম অধিবেশন হইয়া গেল। নিকট হইতে এই অধিবেশ-নের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছিল। কর্ম্মীদের ঐকান্তিকতা, শৃঙ্খলা ও তৎপরতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সম্মেলনের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা যেরূপ বিপুল সংখ্যায় এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, সকল ব্যাপারে যে সহযোগিতার ভাব দেখাইয়াছিলেন, যে উৎসাহ ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সম্মেলনে উপস্থিত সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যশোহরের কৃষকদের মধ্যে যে জাগরণ আসিয়াছে, নূতন আশার উদ্দীপনা যে তাঁহাদের মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা বর্ত্তমানের দৈন্য ও নৈরাশ্যের শত চিহ্নের মধ্যেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক কৃষক ধর্ম্ম ও সমাজের বৈষম্য ভুলিয়া যেরূপ দলে দলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন ও নিবিড় ঐক্যের ভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দেশে বিশেষ আশার কথা। কর্ম্মীদের অধিকাংশ অ-কৃষক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হইয়াও সেবা ও কর্ম্মের শক্তিতে কৃষকদের যে বিশ্বাস অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন দেখা গেল তাহা প্রকৃতপক্ষেই তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

২৫.৩০ মাইল বা তদপেক্ষাও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে কৃষকেরা শোভাযাত্রা করিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া সভায় যোগ দিয়াছিলেন। কৃষকদের মধ্যে কতটা যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে ইহা তাহার একটা প্রমাণ।

সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কুমিল্লার বিখ্যাত কৃষকনেতা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বি-এল। বৃহৎ সভার জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য যেমন তিনি প্রশংসনীয় দৃঢ়তা ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন তেমনই মধুর ও অকপট ব্যবহারে এবং সরল অনাড়ম্বর সাদাসিধা চালচলনে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় বারের উকিল, প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও যশোহরের তরুণদলের নায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায়। কৃষ্ণবিনোদবাবুর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ও কর্ম্মীদলের চেষ্টায় এত বড় বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যেও কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া সভায় যোগদান ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে জমিদারী প্রথার ফলে কৃষকের দুরবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"বাংলা দেশের চাষীরা খাজনা দেয় বছরে মোট ১৫ কোটি টাকার কিছু বেশী। জমিদারদের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট খাজনা পান প্রায় তিন কোটি টাকা (২ কোটি ৯১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭ শত ৪৪ টাকা)। এ ছাড়া গবর্ণমেণ্ট পথকর বাবদ পান এককোটি টাকার কিছু বেশী। বাকী ১১ কোটি যায় জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির হাতে। অবশ্য সব টাকা তাঁরা আদায় করতে পারেন না, কিন্তু অনাদায়ী টাকা বাদ দিলেও ৭।৮ কোটি টাকা যে তাঁদের কবলে যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।...ঐ টাকাটা জনকয়েক জমিদার তালুকদার নায়েবের প্রতিপালনে ব্যয়িত না হ'য়ে কৃষকদের উন্নতির জন্যে ব্যয় হলে দেশের কত উন্নতি হত! দেনার চাপে চাষীদের তা'হলে আজ এভাবে মরতে হত না—ম্যালেরিয়া আজ এমন করে লাখ লাখ লোককে মেরে ফেলতে পারত না—চাষীদের ছেলে মেয়েরা আজ তা'হলে নিরক্ষর থাকত না।" খুবই ঠিক কথা। বকেয়া খাজনার সুদ, নানাপ্রকার বে-আইনী আদায় প্রভৃতি বাবদ চাষীদের আরও কয়েক কোটি টাকা দিতে হয়। এ টাকাটা তাঁহাদের অনেক উপকারে আসিতে পারিত; অথবা যদি দিতে না হইত তাহা হইলেও তাঁহারা বিপুল বোঝার চাপ হইতে মুক্তি পাইতেন। সভাপতি খাজনার হার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া যাওয়া উচিত বলিয়াছেন। কারণ জিনিষপত্রের দাম অনেক কমিয়া গিয়াছে, ফলে পূর্ব্বহারে খাজনা দেওয়া কৃষকের পক্ষে অসম্ভব

হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—"পাট হচ্ছে বাংলার প্রধান ফসল। ১৯২০-২১ সন থেকে ১৯২৯-৩০ সনের মধ্যে বাংলাদেশের চাষীরা বছরে গড়পড়তায় পাট বিক্রী করে পেয়েছিল ৩৭॥ কোটি টাকা—১৯৩২-৩৩ সনে ঐ আয় কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। মোটের উপর দেখা যায় যে, চাষীর আয় যা ছিল তার সিকিতে এসে ঠেকেছে।

সাধারণ লোকের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে যে, যুদ্ধ বাধিলে কাঁচামালের দর বাড়িবে এবং তাহাতে চাষীদের লাভ হইবে। এই ধারণার ভুল দেখাইয়া সভাপতি বলিয়াছেন :—

"অনেকে বলেন যে আমাদের দেশের চাষীদের তাতে (যুদ্ধ বাধিলে) ভালই হবে—কেননা বিদেশে যুদ্ধ বাধলে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু একটা কথা আছে। চাষের জিনিষের দাম বাড়বে ঠিক কিন্তু কলে তৈরী যেসব জিনিস চাষীদের কিনতে হয়······ সে সব জিনিষের দর যে আগুন হয়ে যাবে।······তার আয় যেটুকু বাড়বে ব্যয় বাড়বে তার চতুর্গুণ বা তারও বেশী।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায় তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণে কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে অনেক প্রণিধান-যোগ্য কথা বলিয়াছেন। কৃষকেরা কি করিয়া ঋণজালে জড়াইয়া পড়ে তাহা দেখাইতে যাইয়া ইনি বলিয়াছেন :—

"প্রথম জমিদারের দেনা। খাজনা বাকী প'ড়ে এই বাকী খাজনার দেনা হয়। খাজনা বাকী পড়ে কেন?—তার কারণ এই যে প্রতি বৎসরই সব জমিতে ফসল হয় না, কোন কোন জমিতে কোন কোন বার অজন্মা হয়, অনেক জমিতে বহুবারই অজন্মা হয়। কিন্তু আইন এমনই যে জমিতে ফসল উৎপন্ন হোক বা না হোক সে জমির খাজনা চাষীকে দিতেই হবে। কৃষক কোথা থেকে দেবে? হয় তার পেটের খোরাক থেকে, নতুবা অন্য জমির ফসলের মূল্য থেকে, তারপর তাতেও না কুলুলে হয় খাজনা বাকী পড়ে নচেৎ মহাজনের কাছ থেকে ধার করে খাজনার দেনা শোধ করতে হয়। এমনি করেই জমিদার বা মহাজনের ঘরে চাষীর দেনা হয়।" নূতন ভারত শাসন আইনে কৃষকদের স্বার্থ কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া কৃষ্ণবিনোদ বাবু বলিয়াছেন :—

"প্রথমতঃ এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক কৃষককেই ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। আইন হওয়া উচিত ছিল যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। তার পরিবর্ত্তে এই আইনে ঠিক করে দেওয়া হ'য়েছে যে যাঁরা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা বা ট্যাক্স্ দেন না, তাঁরা ভোট দিতে অধিকারী নন। এইখানেই বড় লোকদের প্রথম ধাপ্পা। এর ফলে সব বড়লোক ও তাঁদের তাঁবেদার ভোট দিতে পারবে। কিন্তু সব কৃষক ভোট দিতে পারবে না। আইনে এইখানেই কৃষকদের অনেকখানি ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হ'য়েছে এবং বড়লোকদের অনেকখানি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারের বড়লোকের প্রতি পক্ষ-পাতের একটা প্রমাণ এইখানে। তারপর দ্বিতীয় কথা এই আইনে ভোটারদের দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান; ফলে কৌশলে ও প্রকারান্তরে কৃষক সমাজকেই দুটি ভাগে বিভক্ত করে তাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের যদি সমস্ত কৃষক-কুলের জন্য দরদ থাকে, তবে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সমস্ত কৃষকেরই তাঁহাকে ভোট দেওয়া উচিত ও কৃষক সমাজের পক্ষে সেইটাই মঙ্গলকর। কিন্তু এই আইনে হিন্দু কৃষকের কৃষকনেতা মুসলমান হলে তাঁকে ভোট দেবার অধিকার নাই। কৃষক হিসাবে কৃষকদের একতা এর ফলে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এবং অন্যরূপ সমস্যা তাদের সামনে এনে তাদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।······ তারপর তৃতীয় কথা সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য একটা আইন সভা হয়েছে—তাতে কৃষকদের সঙ্গে বড়লোকেরাও ভোট দিতে পারবেন; কিন্তু আর একটা উচ্চতর আইন সভা গঠিত হয়েছে—সেখানে শুধু বড়লোকেরা

ও বড় বড় জমিদারেরা ভোট দিবেন। এই উচ্চতর আইন সভা করে এই আইন বিশেষভাবে বড়লোকদের সার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।" এ সম্বন্ধে আরও অন্যান্য কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ

ভিন্ন প্রদেশে যাইয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করা, অর্থোপার্জ্জন করা, বড় চাকরিতে নিযুক্ত হওয়া অথবা জনপ্রিয় হওয়া কঠিন হইলেও অনন্যসাধারণ নহে। কিন্তু, ভিন্ন প্রদেশে আইন পরিষদের নির্ব্বাচন দ্বন্দের মত গুরুতর ব্যাপারে সেই প্রদেশবাসীকে পরাজিত করিয়া সাফল্য লাভ করা যে কতটা অসামান্য কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাও আবার বাঙ্গালীর পক্ষে পাঠানের দেশ! শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনেক ভোটে দুইজন প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করিয়া এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২৯-৩০ সালে ইনি এই প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে একমাত্র তিনি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে ফৈজপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। ইনি দেশ সেবার জন্য নির্ব্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুত ঘোষ পেশোয়ারে সরকারী চাকরি লইয়া যান। পরে সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেছেন।

জাপান এসিয়াবাসী বলিয়া গণ্য নহে

এসিয়া ও আফ্রিকার রঙীন জাতিদের সম্বন্ধে শ্বেত জাতিদের মনোভাব সুবিদিত। রঙের অজুহাতে নানা অধিকার হরণ এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত নানা লাঞ্ছনার মধ্যে এই মনোভাব নিত্যই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু, গায়ের জোরে জাপান অনেক দিন পূর্ব্বেই জাতে উঠিয়াছে এবং বাধ্য হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে সব ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা অন্যান্য রঙীন জাতিদের পক্ষে কৌতুকাবহ হইয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এইরূপ একটি মজার সংবাদ আসিয়াছে। এসিয়াবাসীদের চাকরিতে বা তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে যাহাতে কোন শ্বেতাঙ্গ নারী নিযুক্ত হইতে না পারেন এই মর্ম্মে একটি আইন হইবে। এই আইনে জাপানীদের এসিয়াবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। রঙীন জাতিদের দোষ গাত্রবর্ণে না শক্তির দৈন্যে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অবশেষে মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার স্বাস্থ্যের অতি শোচনীয় অবস্থা অবিমিশ্র আনন্দ ব্যাহত করিয়াছে। বিনা বিচারে যাঁহারা আজও কারান্তরালে রহিয়াছেন সুভাষচন্দ্রের ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁহাদের অসহায় দুঃখের ব্যথাকে নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল তাহা একদিকে সুভাষচন্দ্রের প্রতি দেশবাসীর প্রগাঢ় প্রীতি এবং অন্যদিকে বিনাবিচারে আটক তরুণ তরুণীদের জন্য দেশের লোকের মনে যে সঞ্চিত ক্ষোভ আছে তাহার পরিচায়ক।

সুভাষচন্দ্র মুক্তি পাইলেও, তাঁহার সুস্থ হইতে বিলম্ব ঘটিবে এবং আপাততঃ দেশ তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সম্বর্দ্ধনা সভার প্রতিভাষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বর্ত্তমান রাজনীতিক মত স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু, এই কথাগুলি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে যে ইহার দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহার বিশদ বিবরণ পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিছু বলা নিরাপদ নহে। সুভাষ বাবু বাংলায় দলাদলির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, প্রাদেশিকতারও নিন্দা করিয়াছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দলাদলি বাংলাকে বিশেষভাবে খর্ব্ব ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব ততটা নিন্দনীয় না হইলেও কোন সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইতে না পারা এবং সহযোগিতা করিতে যাইয়াও দলাদলিকেই প্রাধান্য দেওয়া বিশেষ দুর্ব্বলতার পরিচয়। রাজনীতিক বাংলা এই দুর্ব্বলতায় পঙ্গু। যাঁহারা

নিজেরা দলাদলির মধ্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা নিজেরাও যে এ কথাটা না বুঝিতেছেন তাহা নহে কিন্তু দলের মোহ ও গণ্ডী কাটাইয়া উঠা শক্ত হইতেছে। সুভাষচন্দ্র দেশের বর্ত্তমান দলাদলির বাহিরে আছেন বলিয়া যদি সকল দলের উপরই তাঁহার কথার কিছু ফল হয় তবে দেশ উপকৃত হইবে। সুভাষচন্দ্র শীঘ্র সুস্থ হোন ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

আবিসিনিয়ায় হত্যাকাণ্ড

ইটালীয় সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীকে হত্যার চেষ্টার পর ইটালীয় সৈন্যদের দ্বারা আদ্দিস আবাবায় যে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয় বর্ব্বরোচিত নৃশংসতায় তাহার তুলনা স্পেনের রণক্ষেত্র ছাড়া বোধহয় আর কোথায়ও মিলিবে না! ৭০০ হাবসী প্রাণভয়ে আমেরিকার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে ইহারা তিন দিন ছিল। ইহাদিগকে হত্যা করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি আমেরিকান প্রতিনিধি প্রাপ্ত হইবার পর ইহারা বাহিরে আসিলে, ইহাদের প্রত্যেককে পশুর মত হত্যা করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া ২৫শে মার্চ্চ তারিখে ব্রিটীশ হাউস-অব-কমন্সে একটি বিতর্ক হয়। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ হেণ্ডারসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতিকে (বিতর্ক উত্থাপক) লীগ-অব-নেসান্সের দোহাই দিয়া শান্ত হইবার উপদেশ দেওয়া হয়।

সেকেণ্ডারী শিক্ষা বোর্ড

সেকেণ্ডারী শিক্ষার কর্ত্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে সরাইয়া পৃথক বোর্ডের হাতে দিবার জন্য ডাঃ ডবলিউ-জেন্‌কিন্স একটি আইনের খসড়া সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই খসড়া বা তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের চোখে পড়ে নাই। তবে প্রকাশ, প্রস্তাবিত বোর্ডের গঠন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতা সর্ব্বক্ষেত্রেই ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছনীয় কিন্তু, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। শিক্ষার মধ্য দিয়া ইহা দূর ভবিষ্যৎ কালেও প্রসারিত হইবে কিন্তু, তাহার চেয়েও আশঙ্কার কথা যে, শিক্ষার পরিচালন ভার যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্পিত না হইয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হইলে জাতির মানসিক যোগ্যতা ও বিদ্যার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি বিদ্যার ও যোগ্যতার মূল্য উপেক্ষিত হয় তবে তদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে!

উৎকর্ষের নামে শিক্ষা সঙ্কোচের বিরুদ্ধে বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর জনমতের মধ্যে যে ঐক্য দেখা গিয়াছে তাহা এ সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাবের সঠিক পরিচায়ক। বাংলার পল্লীর স্কুলগুলি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দারিদ্র্যের সহিত লড়িয়াও জাতীয় জীবন গঠনে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী-মাত্রেই অবগত আছেন। ইহাদের অবস্থা ভাল হউক তাহা সকলেই চাহেন, কিন্তু মাত্র জনসাধারণের চেষ্টায় ইহাদের অবস্থার উন্নতি যদি সম্ভব না হয় তবে এগুলি যাক্, তাহা কেহ চাহিবেন না। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় নাকি এমন সব কড়াকড়ি বিধান আছে যাহাতে অর্দ্ধেকের উপর স্কুল উঠিয়া যাইবে। বাংলার প্রায় সকল স্কুলই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জনসাধারণের চেষ্টায়। ইহার অর্দ্ধেক সংখ্যক স্কুলও যদি সরকারকে গড়িয়া তুলিতে হইত, তবে, তাঁহাদের অনেক টাকা খরচা হইত। এখন এই স্কুলগুলির উৎকর্ষ বিধান যদি সরকার অপরিহার্য্য মনে করেন তবে স্কুলগুলিকে সেজন্য সরকারি সাহায্য দান, তাঁহাদের পক্ষে খুব বেশী কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। অর্দ্ধেক সংখ্যক স্কুলের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

আলিগড়ের ছাত্রদের প্রতি সতর্কবাণী

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস-চ্যান্‌সেলর প্রোফেসর এ-বি-এ হালিম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার্থীদের সম্বোধন করিয়া জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রদের বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রেরাই নাকি তাঁহাকে অনুক্ষণ ভোগাইয়াছেন। তিনি ইহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "ইহাদের জন্য ভারতের আরও ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—আলিগড়ে ইহাদের জন্য কোন স্থান নাই; ইহা মুসলিম অর্থে গঠিত মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে কোন উগ্রমতবাদ কোন ক্রমেই সহ্য করা হইবে না।" শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রদের

বিসম্বাদ বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে কিন্তু, এই সদ্ভাব রক্ষায় যে কর্ত্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। কর্ত্তৃপক্ষ যদি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন তবে ছাত্রদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। এই বিরুদ্ধতায় ছাত্রদের দৃঢ়তা এবং চিন্তার নির্ভুলতা প্রমাণিত হইবে। আলিগড়ের ছাত্রদের একদল যে ফলদায়কভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়িতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কীকরণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নিখিল-ভারত-ছাত্রসংঘ হইতে পৃথক হইয়া মুসলিম ছাত্রসংঘ গঠনে ইহারাই বাধা দিয়াছিলেন।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের বিবৃতি

কংগ্রেস প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি দিতে গবর্ণরগণের অক্ষমতা সমর্থন করিয়া হাউস-অব-লর্ডস'এ লর্ড জেটল্যাণ্ড যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আইনের তর্ক বাদ দিয়া যেখানে তাঁহাদের কার্য্যের নৈতিক দিক দেখাইয়াছেন সেখানে বলিয়াছেন যে, কোন প্রদেশে হিন্দুরা এবং কোন প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকিয়া যদি মন্ত্রী মণ্ডলী এমন কোন কাজ করিতে চাহেন যাহাতে একক্ষেত্রে মুসলমানের এবং অন্যক্ষেত্রে হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় তবে, তাহাতে তাঁহাদের আইনের বাধা থাকে না। যাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলী এইরূপ আইনানুমোদিত স্বেচ্ছাচারে রত হইতে না পারেন তাহার জন্যই গবর্ণরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতাসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। আইনানুসারে যদি প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভবও হইত তাহা হইলেও এরূপ প্রতিশ্রুতি দানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইত এবং তাঁহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার হইতে আর রক্ষা করিবার পথ থাকিত না। একখানি ভারতীয় সংবাদপত্রকে শিখণ্ডী স্বরূপ রাখিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড কংগ্রেসের এই দাবী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এ যেন গুণ্ডারা দাবী করিতেছে যে, তাহারা যে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে দমকলের এঞ্জিন ব্যবহার করা হইবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক। যুক্তি ও উপমা দুইই চমৎকার! ভাবটা এমন যে, গবর্ণরকে যে বিশেষ ক্ষমতাসমূহ দেওয়া হইয়াছে তাহার পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের সামান্য মাত্রও স্বার্থবুদ্ধি নাই, শুধুমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষার নিঃস্বার্থ মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে হইয়াছে। হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠদের হাত হইতে অসহায় মুসলমানদের এবং মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠদের হাত হইতে অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করিবার অপরিহার্য্য দায়িত্ব এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে হইয়াছে। এই কথায় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। হিন্দুকে এই সুযোগে বলিয়া দেওয়া গেল যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু মুসলমান এবং মুসলমানকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হিন্দু এবং উভয়কেই বলা গেল যে ব্রিটীশ আমলাতন্ত্রই তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিত্র ; সংখ্যালঘিষ্ঠদের বলিয়া দেওয়া গেল যে ব্রিটীস সরকার ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলে তোমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবে না। লর্ড জেটল্যাণ্ড ভুলিয়া গেলেন যে, তাঁহাদের কথা হইতেছিল কংগ্রেসের সহিত, কোন কোন হিন্দু, মুসলমান, বা সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়ের নেতারা সহিত নহে। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা তাহাদের লক্ষ্য নহে, তাঁহাদের কাজের জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটেই তাঁহাদের জবাবদিহি করিতে হয়। কংগ্রেসের একমাত্র নির্ভর দেশের জনমত, জনমতের বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

যদিও ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীদের হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রভৃতি নানা কৃত্রিম বিভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস জাগাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তবুও, ভারতবাসীরা নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই বিভাগকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় মাঝে মাঝে তাহাদের মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইতেছে যে তাহারা এক নহেন, পরস্পরবিরোধী নানা ভাগে বিভক্ত।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ঝরা ফুল

শ্রীউষারাণী দেবী

দরজার পুরু পর্দ্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নিখিল বল্লে—'একি বৌদি, সন্ধে বেলা অন্ধকারে শুয়ে, ব্যাপার কি?'

টুক্ করে সুইচ টেপার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো আর এক জোড়া চমকিত চোখের দৃষ্টি এক সঙ্গে পড়লো কৌচের ওপর শায়িতা লতার উপর। সে উঠে বসতে বসতে বল্লে—'মাথাটা ভারী ধরেছে ভাই, তাই অন্ধকার করে দিয়েছিলুম ঘরটা। তুমি আজ এত শীগগীর যে?'

নিখিল লতার কাছে কৌচটার উপর বসতে বসতে লতার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—'কিন্তু মাথার সঙ্গে সঙ্গে গলাটাও যে ধরেছে, গাল দুটোও ভিজে, চোক দুটোও ফুলেছে দেখছি, ব্যাপার কি?'

লতা একটু ম্লান হেসে পাশে থেকে একখান পুরু খামের চিঠি তুলে বল্লে—'মামার একটা চিঠি পেলুম আজ। তুমি তো জান ভাই মামাকে আমি কত ভালবাসি, তবু আজ এই চিঠিটা পাবার পর থেকে ভগবানের কাছে তার মৃত্যু কামনাই কচ্ছিলুম আমি।'

শেষের কথা কটি লতার জড়িয়ে গেল অশ্রুর উচ্ছ্বাসে। নিখিল তার দিকে আরো সরে বসে তার চিঠি শুদ্ধু হাতটায় ধীরে ধীরে হাত বুলুতে বুলুতে বল্লে—'যাকে ভালোবাসো বৌদি, তার দুঃখে শুধু কেঁদে কোনও লাভ নেই, তার চেয়ে তার প্রতিকারের পথ ভাব।'

তেমনি অশ্রুভেজা গলায় লতা বল্লে—'উপায়ের পথ যে কিছু নেই ভাই।'

কোমল স্বরে নিখিল বল্লে—'আমায় ওটা দেখালে কোনও ক্ষতি আছে বৌদি?'

লতা বল্লে—'না ভাই তবে শুধু এটা দেখে কিছু বুঝতে পারবে না, ওর সব চিঠিগুলোই তোমায় দেখতে হবে। তোমার সময় হবে কি এখন?'

নিখিল বল্লে—'নিশ্চয় হবে বৌদি। যে বিষয় তোমায় এত বিচলিত করেছে সে বিষয় জানবার সময়ের অভাব আমার জীবনে কখনও হবে বলে তো মনে হয় না।'

লতা উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিতে নিতে বল্লে—'নিজে খুব বেশী সুখ সৌভাগ্য ভোগ কল্লে দুর্ভাগ্য প্রিয়জনদের জন্যে আরো বেশি মন খারাপ হয়, নয় কি?'

নিখিল বল্লে—'বলতে পারলুম না বৌদি, কারণ ও দুটোর একটাও উপস্থিত আমার নেই, কাজেই আমি অনভিজ্ঞ।'

'যা হোক তবু একটা জিনিষ আজোও তোমার অভিজ্ঞতার বাইরে আছে—'বলতে বলতে লতা ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নিখিল সেই কৌচটার উপর সোজা শুয়ে পড়ল। একটু পরে এক তাড়া চিঠি হাতে লতা নিখিলের কাছে এসে বল্লে—'তারিখ মিলিয়ে প্রথম থেকে পড়, খোকা কাঁদছে আমি ও ঘরে যাচ্ছি।'

নিখিল নিরুত্তরে চিঠিগুলি নিয়ে বাছতে লাগলো। লতা চলে গেল। একটুক্ষণ বাছার পর নিখিল একখানা চিঠি খুলে পড়তে লাগলো—

লতি!

আমার এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না শুনে তুই রাগ করেছিস। লিখেছিস অনুপায়ে যতদিন সহরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলুম ততদিন এই পল্লীর প্রসংশায় ছিলুম আমি পঞ্চমুখ, আর তারি ঝোঁকে যেই সহরে বাস আমার অনাবশ্যক হোল, চলে এলুম এখানে, একেবারে স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করে। তার পর বছর না ঘুরতে এই যে বিমুখতা, এর মূলে আছে আমার যে মন, সে নাকি পুরুষের মনের মত চঞ্চল, বর্ত্তমানে বীতস্পৃহ, ভবিষ্যের স্বপ্নালু, আর অলক্ষ্যের পূজারী, কিন্তু তা নয়।

আমার সম্বন্ধে অনেক অনুমান তোর সত্যি হোলেও এটা হয় নি। আর এই যে ভুল তোর হয়েছে সেটার জন্যে তোকে কোনও দোষ দেবার নেই, কেন না আমি জানি এটা হতে পেরেছে কেবল মাত্র পল্লীবাসীদের বিষয় প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা তোর নেই বলে, যে অনভিজ্ঞতার ফলে আজ আমার এই অনুশোচনা। ত রি দরুণ তোরও এই ভুল।

পল্লীর যেরূপ প্রথম দর্শনে আমাদের মুগ্ধ করে, সেই সবুজের সমারোহে সমৃদ্ধ সকাল, শব্দহীন শুব্ধ মধ্যাহ্ন, গন্ধ ভারাতুর শান্ত সন্ধ্যা, কাদের কলহের কলরবে কুৎসার কালিতে কালো হয়ে যায়, এই উদার অসীম অবারিত আকাশ, কাদের কুটিলতার বিষে এমন সুনীল হয়ে যায় তা যদি তুই জানতিস লতা তবে তুইও চাইতিস আমারই মত পালাতে।

সহরে ইঁট কাঠের ঠাস গাঁথুনীর মধ্যেও যে মন আমার উদার আলো হাওয়ায় আপনাকে মেলে ধরেছিল এখানে এই অবাধ প্রশস্ততার মধ্যেও সে মরছে হাঁপিয়ে।

সহজ সচ্ছন্দ নিঃশ্বাসটুকুও আজ নেবার শক্তি নেই আমার পাছে দুর্নামের খোঁচায় ঘা খাই ভয়ে।

তুই তো জানিস আমার আচার নিয়মে এমন কোন আচরণ নেই যাতে আমার হিন্দুত্বের নিষ্ঠায় আসে নিন্দা, তাই এদের আলোচনা চলছে এখন আমার পরিচ্ছন্নপ্রিয়তা আর লজ্জাশীলতা নিয়ে। নারীর অনবগুণ্ঠনের অপরাধ তো অবহেলার নয়, নারীর প্রাত্যহিক পরিধেয়ে পরিচ্ছন্নতার আর বাহুল্যতার প্রয়োজনও তো শুধু পুরুষের পরিতুষ্টির জন্যই। যার জীবনে সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে মাত্র একখানি আধ ময়লা কাপড়ই কি তার শোভন আবরণ নয়? যে নারী এর ব্যতিক্রম করে তার অতীত আর ভবিষ্যত কি সন্দেহ-জনক নয়?

প্রতিদিন আমার অল্প বয়স আর অনাত্মীয় অবস্থায় বিগলিতপ্রাণ প্রতিবাসীদের কাছে থেকে উপদেশের আবরণ ঘেরা যে অপমান আমাকে গ্রহণ কর্ত্তে হয় একে বহন করবার মত শক্তি আমার বর্ত্তমান মনের নেই, তাই চাই পালাতে।

জানিস লতি, এদের দেখে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর যে সভ্যতা, যে সংস্কৃতির স্বপ্ন আমরা দেখি সে কোথায়? আর কোথায়ই বা অতীতের সেই অনাড়ম্বর নিষ্ঠাপুত নিরহঙ্কার সরল গ্রাম্যতা। এদের দেখে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে মানুষ বিধাতার মহৎ সৃষ্টি। ত্যাগে সাধনায় সহিষ্ণুতায় এই মানুষই হয় বিধাতারও বিস্ময়।

এরা বোঝে শুধু প্রথা, আর প্রয়োজন; এই দুই দেবতার দুয়ারে এরা বলি দিয়েছে এদের বিবেক, এদের বিচারবুদ্ধি

এরা জানে মেয়েরা দিন কাটাবে শুধু খাওয়া আর খাওয়ানর অবিরাম আয়োজনে আর তারি ফাঁকে ফাঁকে করবে পরলোকের পুঁজির চিন্তা আর অপরের অন্যায়ের অনুসন্ধান, সমালোচন আর শাসন।

এরই একচুল এদিক ওদিক হতে দেখলেই এরা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে করবে কত অতীতকে আবিষ্কার, বর্ত্তমানকে বিচার, আর ভবিষ্যতকে সৃষ্টি। সেই ব্যতিক্রমকারিণীর জন্যে পরলোকে করে রাখবে অনন্ত নরকের সিট রিজার্ভ, আর ইহলোকে যে কোন অপমান আর অপবাদ দিতে থাকবে অকুণ্ঠিত।

বল দেখি কেমন করেই বা বোঝাই এদের এরা যা কচ্ছে তা' কত অনাবশ্যক আর মনুষ্যত্বের গ্লানিকর। আর কেমন করেই বা সয়ে থাকি এরা এদের মাপকাটি দিয়ে যে আঘাত করে আমায় তার ব্যথা।

একা আমি, অবসন্ন বেদনাবিহ্বল মন নিয়ে অনভ্যস্ত নতুন জীবনের সমস্ত বিচার বিশ্লেষণের ভার তুলে দিয়েছি এদেরই হাতে পল্লীর শান্ত শান্তির মোহে।

যাক নিজের কথা অনেক হোল এখন তোদের খবর শুনি। কেমন তোরা আছিস দুজনে, খোকনমণির খবর কি?

আজ এখানেই বিদায় নেই, কেমন?

তোর মায়া

লতি!

আশ্চর্য্য তো, এরই মধ্যে অশোকের কথা এরা লিখেছে তোকে, কেমন করেই বা ঠিকানা পেলে বলতো?

মাত্র পনের দিন হোল অশোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কেমন করে হোল সেও এক আশ্চর্য্য ঘটনা, বলি, শোন—তুই তো জানিস এখানে যখন আসি তখন আমাদের টু-সিটার কার-খানা এসেছিল আমাদের অতীত জীবনের

সাক্ষী হয়ে, বর্ত্তমানের সঙ্গী হয়ে,—আমার অতীত জীবনের কত আনন্দবিহ্বল দিনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর অঙ্গে। সেদিনের আমি একমাত্র ওরই কাছে আজও বেঁচে আছি, তাই আজও আমার হাতের স্পর্শ পেলেই আনন্দচঞ্চল বেগে ও ছুটে চলে পথ থেকে পথান্তরে আমায় কর্ম্মহীন নিঃসঙ্গ দিনের বেদনা-পথের প্রান্তরের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়ে দেবার কামনায়।

এখানে প্রথম এসে ওর সঙ্গে সময়ে অসময়ে আমার এই অজানায় উদ্দেশ্যে নিঃসঙ্গ ভ্রমণও হয়েছিল এদের সকলের একটা আবিস্কারের বস্তু, তার সঙ্গে নিষেধ আর নীতির উপদেশ বর্ষণেরও বিরাম ছিল না। তবু আমাদের বিশ্রাম ছিল না এক দিনও। সেদিনও শীতের শেষ বেলায় যখন নেবু ফুল আর আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস উঠেছে মাতাল হয়ে তখন গন্ধের মাদকতায় অপরাহ্নের আলো-ছায়ার অপরূপ মায়ায় এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে আমি যেন আবিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে চলেছিলুম অ-পরিচিত এক পল্লীর সবুজ ঘাসের বন্ধনী ঘেরা আঁকা বাঁকা এক লাল রংয়ের সরু পথ ধরে। হঠাৎ গাড়ী গেল থেমে। চমকে চেয়ে দেখি কুড়ি মাইলের ওপর এসেছি, তেল ছিল অল্প, তাই বেচারী গাড়ী আমার নিরুপায়ে থেমে দাড়িয়েছে। উপায়! শীতের ক্ষণজীবি অপরাহ্ন অস্তমিতপ্রায়—একা অজানা পল্লীতে। এদিক ওদিক চাইতেই চোখ পড়ল অল্প দূরে মস্ত একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, তারি গেটের সামনে গুটি কতক ছেলে গল্প করছে, এদের সকলেরই চাল চলনে পোষাকে রয়েছে কলেজী ছাপ। পল্লীর প্রাঙ্গণে এদের দেখলে এদের বিশেষত্ব বুঝতে দেরী হয় না।

তুই জানিস কলেজী ওভারপলিস ছেলেদের সম্বন্ধেও আমার মনোভাব খুব ভাল নয়। আমি জানি শিক্ষা এদের যতই হোক মেয়েদের সম্বন্ধে ভদ্র এরা হতে চায় না। তাদের বিষয় আলোচনা করবার সময় এরা নিজেদের সমস্ত সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়ে নেমে যায় আদিম বর্ব্বরতার নিম্ন স্তরে। এমনি কটি ছেলের কাছে এই আসন্নসন্ধ্যায় একা যেতে হবে সাহায্যের জন্যে যার ফলে আজকের সমস্ত সন্ধ্যাটা ওদের কাটবে আমারি সমালোচনে ভেবে ভারী অস্বস্তি বোধ কর্ত্তে লাগলুম। অথচ উপায়ও কিছু ভেবে বার কর্ত্তে পাচ্ছি না—তখন দেখি ওদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে আমার গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। দেখে একটু স্বস্তি পেলুম তবু উপাযাচকত্বের লজ্জাটা একটু কমলো। ছেলেটীর সর্ব্বাঙ্গে একবার সমালোচকের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম। সুঠাম দীর্ঘ দেহের উপর একখানি সুশ্রী মুখ কাছে এসে শিষ্ট স্বরে ছেলেটী বল্লে—'আপনার গাড়ীর কিছু কি খারাপ হয়েছে? যদি দরকার হয় আমরা ঠিক করে দিতে পারি।

মুহূর্ত্ত আগের মনের সমস্ত বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে দিলে তার দুটি চোখের অপূর্ব্ব কোমল দৃষ্টি। বুদ্ধির প্রদীপ্ত আলোয় শীলতার কি স্নিগ্ধ প্রকাশ!

এই হচ্ছে আমার অশোক আর তোর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সে। সে আসে আমার কাছে প্রায়ই একথা সত্যি। আর, একদিন রাতেও সে ছিল সত্যি, আরও একটা সত্যি যা এখানকার প্রতিবাসীরা বোধ হয় তোকে জানায় নি তাও বলি শোন, আমি অশোককে ভালবাসি,—দোষ আছে কিছু? কেন, তোকে ভালবাসি, প্রিয়তমা বলি, তাতে কোনও দোষ স্পর্শ করে কি আমার সতীত্বে, আমার পরম পূজনীয় বৈধব্যে। তবে অশোকেই বা হবে কেন—সে পুরুষ বলে কি? কিন্তু তোকেও কি আমার বলে বোঝাতে হবে, আমার জগতে পুরুষ শুধু একজন আর সবাই শুধু মানুষ?

তোর মায়া

লতি!

তোর চিঠি পেয়ে কি যে অনুভব কচ্ছি কেমন করে তোকে বোঝাবো ভেবে পাচ্ছি না। তুই লিখেছিস—'আমি কি পেয়েছি এই অশোকের মধ্যে যার জন্যে আমি নিজের সুনাম আর যে স্বামীকে ভালবাসার গর্ব্বে নিজকে আমি সীতা, সাবিত্রীর সমতুল্যা মনে করি সেই স্বামীর সম্ভ্রম বংশ মর্য্যাদাকে লাঞ্ছিত কর্ত্তে কুণ্ঠিত হচ্ছি না, কি আছে একটা এম, এ, ক্লাসের সবজান্তা ছেলের মধ্যে যে তাকে ছাড়লে দিন আমার কাটবে না।

দিন কাটবে। জানি পৃথিবীর দিনের গতি কিছুতেই বন্ধ থাকে না। কিন্তু কেন? যে অশোক আজ আমার শোকাচ্ছন্ন মনের সান্ত্বনা, আত্মীয়হীন নিঃবান্ধব গৃহের নির্মল আনন্দের অনাবিল উৎস, সেই নিষ্কলঙ্ক অশোককে ছাড়বো আমি যাদের নিন্দায়, তারা কেউ কি ওর নৈতিক নিষ্ঠার, চিত্তের দৃঢ়তার, উদার চিন্তাশীলতার, মার্জ্জিত মননশীলতার সামান্যতম অংশেরও অধিকারী। ওদের মধ্যের কেউ কি অশোকের সুযোগের ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও পেলে আমাকে সর্ব্বনাশের শেষ সোপানে নাবিয়ে দিতে এতটুকু ইতঃস্তত কর্ত্ত?

এদেরই ঈর্ষার পীড়নে অপমানিত করবো আমি অম্লান অকলঙ্ক অশোককে!

এতদিনের চেনা মায়াকে কি তোর মনে নেই লতি?

প্রিয় হারাবার অসহ্য আঘাতে মন আমার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাই অবসন্ন আমি, সংসারের সকল কোলাহল সকল দাবী থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে চেয়ে যে নির্জ্জনতার আশ্রয় নিয়েছিলুম সেই বিজন বাস আমার আজ দুর্জ্জনের পদাঘাতে কেঁপে উঠেছে, যে মহৎমনার মন্ত্র আমায় শিখিয়েছিল জগতের সমস্ত তুচ্ছতাকে ঘৃণা কর্ত্তে, অন্যায়কে আঘাত কর্ত্তে, বৃহৎকে ধারণা কর্ত্তে, তাঁরই অমর স্মৃতি বুকে নিয়ে, এবার এদের আঘাত করবো আমি এদের অস্বীকার করে। এতদিন এদের এতখানি প্রাধান্য দিয়ে করেছি আমি তাঁরই অপমান, যিনি আমায় শিখিয়েছিলেন অন্যায় সহ্য করার দুর্ব্বলতার মধ্যেও আছে অন্যায় করার মনোভাব।

কোন স্মরণাতীত কাল থেকে চলেছে এদের নিঃসম্পর্কীয়া নরনারীর একটি মাত্র সম্বন্ধেরই স্বীকৃতি।

ওকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শাস্ত্র, সংহিতা, সমাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধকে বিষাক্ত করেছে এরা এরই বাষ্পে। এরই বিভীষিকায় ব্যাকুল হয়ে এরা হারিয়ে ফেলেছে মনের সত্য-সন্ধিৎসা, দৃষ্টির উদার সমদর্শিতা। এরই আতঙ্কে আকুল হয়ে নারীকে জেনেছে এরা নরকের দ্বার।

তাই বিধি দিয়ে, বিধান করে, অনুশাসন গড়ে সে দ্বারকে রেখেছে এরা রুদ্ধ। শক্তির মদগর্ব্বে নারীর স্বতন্ত্র্যকে করেছে অপমান, বিবেককে করেছে অবজ্ঞা।

আর নারী? বোধহীনা নারী যুগের পর যুগ বয়ে আসছে এই অসম্মানের বোঝা। অস্ফুট কণ্ঠ তাদের আজও উচ্চারণ করতে পারলে না আমি মানুষ! আত্মোপলব্ধির আলোয়, শিক্ষার সবলতায়, আমিও পারি প্রবৃত্তিকে পরাভব কর্ত্তে, জ্ঞানের অনুশীলনে বিবেকচালিত বুদ্ধিকে আমিও উজ্জ্বল, মানবিক মহত্ত্বে মহিমান্বিত করে তুলতে পারি। কেবলমাত্র অজ্ঞানতার অন্ধকারেই স্বর্গদূত নরের হাত ধরেই আমরা নেমে আসি নরকের দ্বারে।

এত যে সাবধানতা, এত যে নিষ্ঠার নির্য্যাতন, এরই ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকে এত কলঙ্কের ক্লেদ! যার দূষিত হাওয়ায় সমাজের কণ্টকিত বোঁটা থেকে নিরন্তর ঝরে পড়ে কত অস্ফুট কলি বীভৎসতার ব্যথা বয়ে। কত মা আশ্রয় নেয় সংসারের আবর্জ্জনাস্তূপে, একা অসহায়।

তবু এরা সগর্ব্বে বাজায় নিজেদের সুশাসিত সমাজের পবিত্রতার পাঞ্চজন্য।

এদেরই দেওয়া দুর্নামে কিই বা আমার এসে যায়। এতদিন ধরে এরা তো এমনি একটা কিছুই আশা কচ্ছিলো আমার কাছে। এদের সেই কামনাকে সফল করে দিয়ে এদের রাত্রি দিনের আলোচনাকে এমন ইণ্টারেষ্টিং করে দিয়ে আমার তো মনে হয় ভালই করেছি। আমার ক্ষুত নামের বোঝা বইবার কেউ তো নেই আমার আগে পাছে, তাই ভয় ভাবনা শুধু তোকে নিয়ে তুইও ওদের দলে যোগ দিবি নাকি?

তুব কি জানিস না লতি! মমতায় কোমল, উৎসাহে চঞ্চল, মহত্ত্বে মহান, সুখে সঙ্গি, দুঃখে বন্ধু, একটি ভাইকে আমি কত দিন কল্পনায় গড়েছি। না পাওয়ার ব্যথা সারা জীবন বয়েছি। অশোক আমার সেই সাধনায় গড়া সান্ত্বনায় ভরা ভাই।

তুই জানতে চেয়েছিস কি পেয়েছি আমি ওর মধ্যে। এর চেয়ে বেশি তোকে কি বোঝাবো লতি। তবুও শোন

আবার বলি তোকে, যে রবির আলোয় আমার অন্তরের সমস্ত দলগুলি বিকশিত হয়েছিল, পরিপূর্ণ প্রফুল্লতায় যে আলোকে আত্মসমাপন করেছিলুম, আমার জীবনাকাশে সে রবি অস্তহীন, তারই আলো চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার পথে, প্রান্তরে, অন্তরে, বাহিরে।

আমার প্রতিদিনের জগতে যে মৃত, আমার অন্তরের সেই চির-অমৃত ডুবিয়ে দেবে আমার সমস্ত রিক্ততা।

আজ তবে এখানেই ইতি।

তোর মায়া

লতি!

তোর চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। তুই বার বার লিখেছিস আমায় তুই যে কত ভালবাসিস সেটা আমি বুঝতে পারলে তোর এ চিঠিতে রাগ করবো না আর অশোকের আসা যাওয়ার বিষয়ও সংযত হবো।

আচ্ছা লতি, তুই আমায় খুব ভালবাসিস তো? তোর কি কোনও দিন মনে হয় না, বর্ষার বর্ষনমুখর বিষণ্ণ দিন, গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষী অলস বেলা একা অচেনা জায়গায় কেমন করে আমার কাটে। আমার শিক্ষায়, সংস্কারে, রুচির সাদৃশ্যে, চিন্তার ধারায় মেলে এমন একটি কথা কখন কাণেও না শুনে, শুধু অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার আকাশস্পর্শি স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিয়ে মূর্খ সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে অনভ্যস্ত অর্থহীন আচার নিয়মগুলাকেই পরম প্রয়োজনীয় বলে পালন করে, অতীতের সমস্ত অভ্যাসকে জীবন থেকে মুছে ফেলে স্নেহহীন বন্ধুহীন আমি কেমন করে আমার দুঃখের দিন কাটাই। এ কথা কোনও দিন কি তোর মনে হয় লতি!

তুই বলবি হয় মায়া! তোর কথা মনে হয়ে কত আমি কাঁদি।

কিন্তু তার উত্তরে আমি বলবো হয় না। তা' যদি তোর হোত, তা' হলে তুই আমাকে এত ভাল করে জেনেও অশোক সম্বন্ধে অমন কথা লিখতে পারতিস না।

আমার সব কিছুই তোকে বলা হয়ে গ্যাছে তবু আবার বলি তোর মনে যে ধারণা হয়েছে যে অশোক আমার সব কিছুর লোভে তার চরিত্রের সর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিয়ে আমায় মুগ্ধ করবার চেষ্টা করছে, এ বিশ্বাস তোর ভুল। মায়ার চোখ আজ অবধি মানুষ চিনতে ভুল করে নি আর ভবিষ্যতে যদি দেখাই যায় ভুলই হয়েছে ক্ষতিই বা তাতে কি, নিজের উপর বিশ্বাস আছে মায়ার অগাধ। তারই বলে অনেক ভুলকে সে সেরে নিতে পারবে। তবু অনিশ্চয় আকাঙ্খায় যে অশোক আজ আমার নিরন্ধ্র অন্ধকার জীবনে আলোককণা, যাকে আশ্রয় করে আবার আমি জেগে উঠতে চাই মনুষ্যের মহিমায়, কর্ম্মহীন দিন ভার নিতে চাই জগতের অশেষ প্রয়োজনে, তাকেই অপমানিত করে, আমার অকালে প্রস্থিত প্রিয়তমের অশরীরি আত্মার যে আকুল আশীর্ব্বাদ অশোককে এনে দিয়েছে আমার আর্ত্ত মনের দরজায়, তাকে অবহেলা করতে পারবো না।

এই যে সব সমাজের শরীররক্ষীর দল যারা নিজেরা ডুবে আছে অপরাধ আর অনাচারের পাঁকে, তাদের দু'টা বেনামা মিথ্যা চিঠি তোকে এত কাবু করে ফেল্‌লে লতি? ছিঃ। নৈতিক নিষ্ঠা নিয়ে, অন্যায়কে আঘাত দেওয়ার উপর তোর শিক্ষিত মনের কি কোন আস্থা নেই? তুইও কি গতানুগতিকের স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে নিরাপদে পার হতে চাস? তবে শিক্ষার সফলতা কোথায়?

সে কি শুধু বিংশ শতাব্দীর সংস্কারপন্থীদের স্বপ্ন। শিক্ষা কি শুধু বর্ত্তমানের বিলাস? ভাল করে ভেবে উত্তর দিবি। আজ এখানেই শেষ

তোর মায়া

অশোক আর নেই। আমারই জন্যে রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিত আঘাতে পথের ধুলার পরে প্রাণ দিয়েছে সে, একা, অসহায়।

তুই বলতে পারিস লতি! কেমন করে আসে বিস্মৃতি, কেমন করে লুপ্ত হয় চেতনা।

শেষের চিঠিখানি অসমান রেখায় এলো মেলো লেখা

শেষে লেখিকার নাম অবধি নেই। নিখিল সেখানি পড়ে বিস্ময়ে শুব্ধ হয়ে অল্পক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বেদনার নিবিড় রেখা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেললে তার মুখের সদা প্রসন্নতার আলোটুকু। বেশ একটু কি ভেবে নিয়ে আশে-পাশের চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে লতিকার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লে—'বৌদি, আমি যদি মায়া দেবীর কাছে যাই খুব কি খারাপ হবে ?'

লতিকা খোকাকে কোলে নিয়ে সারা ঘরটায় ঘুরে ঘুরে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। নিখিলের কথা শুনে বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো—'তুমি, তুমি যাবে ঠাকুরপো, কিন্তু সে যে খুনের দেশ আর মায়া, সেও তো তোমায় চেনে না।' নিখিল চিঠিগুলো লতিকার হাতে দিতে দিতে বল্লে—'চিনতে আর কতটুকু লাগে। তুমি শীগগীর আমার সুটকেশটা ঠিক করে দাও, এগারটায় ট্রেণ।'

শ্রীঊষারাণী দেবী

আকাশ ও সিন্ধু

শ্রীজীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ

আকাশ কহিছে ডাকি—শুনরে সাগর,
আমা সম হ'তে চাস্‌ একি স্পর্দ্ধা তোর !
অনন্ত অসীম আমি বিরাট মহান্‌
স্ফীত হ'য়ে হ'তে চাস্‌ আমার সমান ?

সবিনয়ে সিন্ধু কহে শুনহে আকাশ ;
আমার মাঝারে তব স্বরূপ প্রকাশ।
অনন্ত-অসীম—সব সত্য বটে তুমি—
তোমাকে ধরেছি বুকে—কম কিসে আমি ?

নববর্ষ

বাঙলা দেশের নববর্ষে আজ আমরা বিচিত্রার বান্ধব-গোষ্ঠীকে আমাদের ঐকান্তিক অভিবাদন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখে শ্রীরবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস। তিনি সুদীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে বাঙলার যশোগগন সমুজ্জ্বল ক'রে রাখুন, এই আমাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা।

বাঙলা নববর্ষের পঞ্চম বার্ষিক কুচকাওয়াজ

গত ১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিনে "ফেডারেসন্ অফ অ্যাসোসিয়েশনে"র তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগে হাওড়া ময়দানে সকাল ৬॥০ ঘটিকার সময়ে একটি বিরাট কুচ-কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত এম-এ বার-এট-ল নেতৃত্ব করেছিলেন। সামরিক বিধি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাদ্যাদির সহযোগিতায় চালিত এই কুচকাওয়াজ অসংখ্য দর্শকের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এই জাতিহিতকর প্রচেষ্টার জন্য "ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন"কে আমরা অভিনন্দিত করছি। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বালক এবং যুবক-গণের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উন্নতি সাধিত হবে এবং মনের মধ্যে সাহস এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা বর্দ্ধিত হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

গত ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৩ বঙ্গদেশের নব্য ন্যায়ের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় নবদ্বীপে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশের যে ক্ষতি হ'ল তা সহজে পূর্ণ হবার মতো নয়। এই পরিণত বয়সেও তাঁর বুদ্ধির মধ্যে কিছু মাত্র আবিলতা দেখা দেয়নি, এবং কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করার পর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তিনি সুদীর্ঘ কাল নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা ক'রে আসছিলেন।

বাল্যকালে তিনি পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণের নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তৎপরে নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী কামাখ্যানাথের প্রথিতনামা ছাত্র ছিলেন।

দীর্ঘকাল তর্কবাগীশ মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য এবং কলিকাতা পণ্ডিত সভার সভাপতি ছিলেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তর্কবাগীশ মহাশয়কে তাঁর সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি হতে প্রকাশিত তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত কুসুমাঞ্জলি এবং তত্ত্বচিন্তামণি নামক পুস্তক দুটিতে তাঁর অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সন্নিবেশিত আছে।

পণ্ডিত কামাখ্যানাথের তিরোভাবে বাঙালা দেশের জ্ঞানাকাশের একটা দিক নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল।

রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ

গত ২রা চৈত্র ১৩৪৩ রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ মহাশয়ের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে এঁর বয়স ৬৮ বৎসর হয়েছিল।

ইনি বাঙালী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ছাত্রদের কল্যানদায়ক অনেক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক যোগ ছিল। নাগ মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন এবং দীর্ঘকালের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদে অবস্থিত ছিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রেভারেণ্ড নাগ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন। ১৯১৪ সালে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীযুক্ত আনি বেশান্ত সভানেত্রী হন। উক্ত অধিবেশনে রেভারেণ্ড নাগ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে মডারেট দল কংগ্রেসের সংশ্রব পরিত্যাগ করলে তিনিও কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বাঙলার ন্যাশনাল লিবারেল লীগের প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

২২ বৎসর বয়সে বিমলানন্দ নাগ খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০০ সাল হ'তে তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনের কার্য্যে যোগদান করেন। ক্রমশঃ তিনি ভারতীয় খৃষ্টান্ কন্‌ফারেন্স, বঙ্গীয় খৃষ্টান কনফারেন্স এবং ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। ১৯০৪ সালে বার্লিনে ওয়ার্ল্ড ব্যাপ্টিষ্ট্ কংগ্রেসের অধিবেশনে রেভারেণ্ড নাগ সহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

ওরিয়েণ্ট্যাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাস্যুর‍্যানস কোম্পানী

ওরিয়েণ্ট্যালের কর্ত্তৃপক্ষের মারফৎ আমরা অবগত হ'লাম যে ১৯৩৬ সালে তাঁরা মোট ১০,২৬,৯৭,৪১৬ টাকা মূল্যের ৫৬,৩১১ বীমাপত্র প্রদান করেছেন, ১৯৩৫ সনে তাঁদের প্রদত্ত বীমাপত্রের সংখ্যা ও তার মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪৮,৮৫৮ এবং ৮,৮৯,৮৯,১৪৯ টাকা। অতএব দেখা যাচ্ছে ১৯৩৫ এর অপেক্ষা ১৯৩৬ সালে ওরিয়েণ্ট্যালের প্রদত্ত বীমাপত্রের সংখ্যা বেড়েছে ৭,৫৫৩ এবং সে পত্রের মূল্য পরিমাণে বেড়েছে ১,৩৭,০৮,৩৪৭ টাকা। ওরিয়েণ্ট্যাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে প্রথম দশটির অন্যতম, এবং গত বৎসরের প্রকাশিত হিসাব অনুসারে নূতন সাধারণ বীমাপত্রের সংখ্যানুপাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ওরিয়েণ্ট্যাল ভারতীয় কোম্পানী বলে আমরা সত্যই গর্ব্ব অনুভব করতে পারি।

নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বসু

২৫ বৎসর বয়স্ক তরুণ নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বসু এই অল্প বয়সেই বহু দীর্ঘকাল ধ'রে নানা দেশ পরিভ্রমণ ক'রে সঙ্গীত এবং নৃত্যশিল্প বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। গত ৩রা এপ্রিল ১৯৩৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর নৃত্যকলার একটি অভিনয় হয়েছিল। বহু

নৃত্যশিল্পী বিমলেন্দু বসু

মর্ম্মজ্ঞ এবং রসজ্ঞ দর্শক উক্ত অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হয়েছিলেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দর্শকবৃন্দের নিকট বিমলেন্দু বসুর পরিচয় প্রদান করেন এবং অভিনয়ের পর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার অভিনয়ের প্রভূত প্রশংসা করেন।

রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী পি, সি, স্যার টি-দেশিবাসারী (ট্রিচিনপলি), স্যার শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, স্যার এস রাধাকিষণ, ভাইস্-চান্সেলার, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়,

নিজাম ষ্টেটের দেওয়ান মহারাজা বাহাদুর স্যার কৃষ্ণপ্রসাদ, কোচিনের মহারাজা প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বসুর নৃত্য দর্শন করে উচ্চ প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

স্যার রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "The crowd audience which was present was greatly impressed by his perfect control over the technique and the great power of concentration, I have no doubt that years to come he will make out for himeself a permanent front place among the front Rank artist."

শ্রীযুক্ত বসু শীঘ্রই ইয়োরোপ যাত্রা করবেন। আমরা তাঁর সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে ডাঃ এস, সি, রায়

গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৭ ভারত ইনসিওরান্স্ কোম্পানীর সুযোগ্য ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ ডাঃ এস, সি, রায় মহাশয় সহসা

পরলোকগত ডাঃ এস, সি, রায়

রক্তচাপ রোগে পরলোকগমন করেছেন। ভারতবর্ষীয় বিমা বিভাগে যে কয়েকজন সুদক্ষ কর্ম্মী আছেন ডাঃ রায় তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল অতিশয় যোগ্যতার সহিত নিউ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর পরিচালনা করেন, তৎপরে ভারত ইন্সিওরেন্সে যোগ দেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুতে বীমাজগৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরলোকগতা হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী

গত ১৬ই চৈত্র সন্তোষের জমিদার সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী হৃদ্‌রোগে তাঁর কলকাতার ভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৪ বৎসর বয়স হয়েছিল।

পরলোকগতা হেমনলিনী রায় চৌধুরাণী

শ্রীযুক্তা হেমনলিনী ঢাকা জিলার অন্তর্গত মালখানগর গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ বসু বংশের স্বর্গীয় উকিল উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। তরুণ কবি জমিদার প্রমথনাথের সহিত সুন্দরী বালিকা হেমনলিনীর বিবাহের পর তিনি কলকাতায় স্বামী ভবনে এসে বাস করেন। অচিরেই তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের অমায়িকতা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আকৃষ্ট করে। যশের জন্য লালসা অথবা

আত্মপ্রকাশের প্রয়াস হেমনলিনী-চরিত্রে অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই জন্য অগোচরে অন্তরালে দুস্থ দরিদ্রকে দান করা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব।

পরলোকগতা হেমনলিনীর স্বামী, দুই পুত্র, এক কন্যা, বৃদ্ধা মাতা, ভাই, ভগিনী বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

একশত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ অনাথ আশ্রম, পোঃ চাশ, মানভূম হ'তে তথাকার অবৈতনিক সম্পাদক ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর আমাদের যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তা' প্রকাশিত হ'ল।

"বাংলা দেশের ছেলেরা অনেকেই লক্ষ্য রাখেনা যে, বাংলায় শ্রেষ্ঠ মানুষ কতগুলি আছেন। তাই বর্ত্তমানে তাহাদের একটা মানসিক পরাধীনতার ভাব অপরাপর প্রদেশের সম্পর্কে আসিয়াছে। এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালী ছেলেদিগকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মানুষগুলির সম্পর্কে কৌতূহলী করিবার জন্য আমরা কতকগুলি পুরস্কার দিব মনে করিয়াছি। আমাদের প্রথম দুইটী পুরস্কার যথাক্রমে পনের টাকা ও দশ টাকা প্রদত্ত হইবে তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রতিযোগীকে, যাঁহারা উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর একশত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর (হিন্দু বা মুসলমান, পুরুষ বা মহিলা) নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আগামী ১৫ই আষাঢের মধ্যে আমাদের নিকট পৌছাইতে পারিবেন। সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে মাত্র যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় হইবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দুইটী নগদ প্রদান করা হইবে। যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী এই প্রতিযোগীতায় যোগ দিতে পারেন, কোনও ফি দিতে হইবে না। বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বিচারক করা হইবে এবং বিচার ফল সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে। বিচারকের নির্দ্দেশই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবে।"

ব্রহ্মদেশের বিচিত্রার চাঁদা

ব্রহ্মবিচ্ছেদের ফলে গত ১লা এপ্রিল হ'তে ব্রহ্মদেশের ডাক-ব্যয় ইংলণ্ড ডাক-ব্যয়ের সমান হ'য়েছে। তদনুযায়ী আমরা ব্রহ্মদেশের জন্য বিচিত্রার বার্ষিক সডাক চাঁদা আট টাকা ও ষান্মাসিক সডাক চাঁদা চার টাকা ধার্য্য করলাম। বর্ত্তমান চাঁদার উপর শুধু সে-মাশুলটুকু বৃদ্ধি করলে চলে আমরা তাহাই করলাম। আমরা যদি ব্রহ্মদেশের শুধু সম্পূর্ণ চাঁদাটুকু আদায় করতাম তাহ'লে বার্ষিক চাঁদা ও ষান্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে আট টাকা চার আনা ও চার টাকা দু' আনা পড়ত। ব্রহ্মদেশের ভিঃ পি ব্যয়ও তিন আনা স্থলে পাঁচ আনা ধার্য্য হ'য়েছে।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane Calcutta and Published by Indubhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা ষাণ্মাষিক তিন টাকা চার আনা। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল তিন টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ব্রহ্মদেশের সডাক বার্ষিক মূল্য আট টাকা ও সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য চার টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে সডাক বার্ষিক ও সডাক ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে দশটাকা ও পাঁচ টাকা। মূল্যাদি 'ম্যানেজার বিচিত্রা নিকেতন লিঃ'—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন। উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে নিষেধ-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কুপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয় জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত কবিতা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথবা এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতি স্থান-বিশেষে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'বর্জ্জাইস্'-অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ১ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ ⅛ পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ২৫৫৪

বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

জাপানী শকুন্তলা

জাপানদেশীয় শিল্পী
ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সৌজন্যে

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ | ৫ম সংখ্যা

বাঁধাঘাট

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঘনাপাড়ার বাঁধাঘাট।

গোবিন্দজিউর নামে শ'খানেক বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। ঘাটটি প্রশস্ত, বড়ো বড়ো সিঁড়ির ধাপগুলি জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে, উপরে চওড়া দালান, তারই দুদিকে চার পাঁচখানি ক'রে ঘর—বাসোপযোগী। কাশীর নামজাদা ঘাটগুলির মতো এর আভিজাত্যের গরিমা নেই, এর গড়নে আছে নিছক বাংলাদেশের ঘরোয়া স্থাপত্য। বোঝা যায় বাংলার গ্রাম যখন ঐশ্বর্য্যবান ছিল, তখন তার ধনের সচ্ছলতা কোনো উৎকট রূপ না নিয়ে নিজের চারপাশে সুসংযত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে যথাসম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

বাঁধাঘাটের এখন আর যত্ন নেই। বালি খ'সে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। সেই নগ্নতার লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা আর কেউ না করুক করছে কেবল শ্যাওলা আর জংলী গাছ-গাছড়া।

একদিকের পাঁচিল ভেঙে প'ড়ে জমিয়েছে মস্ত ইঁটের স্তূপ—সেখানেই যত জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা। মোটের উপর ঘাটের জরাজীর্ণ দুরবস্থা।

কিন্তু সামান্য কিছু দেবত্র সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকায় গোবিন্দজিউর সেবা একেবারে বন্ধ হয়নি। একটি পুরোহিত-বংশ ঘাটের দুপাশের ঘরগুলিতে কায়েমিভাবে বাসা বেঁধেছে তিন-পুরুষ ধ'রে। সম্পত্তির প্রায় সমস্ত আয়ই এঁদের ভরণপোষণে যায়—সামান্য যা বাকি থাকে দেবতার বরাদ্দ সেইটুকুতেই, আর তাতে কোনোমতে চলে স্নানযাত্রার দিনে মেলার ব্যবস্থা। ঘাটের সংস্কার সেইজন্য বহুকাল সম্ভব হয়নি, বিশেষ প্রয়োজন বোধও কেউ করেনি।

পুরোহিত ঠাকুরকে লোকে ঘাটের বাবু ব'লে ডাকে। চাটুজ্জে মহাশয়ের বয়স হয়েছে সত্তরের কম নয়, যৌবনে যেমনই মতিগতি থাকুক এখন ধর্ম্মকর্ম্মের আড়ম্বর যথেষ্ট। সকালবেলায় উঠেই তিনি ঘরে ব'সে ভাঙা কর্কশ গলায় ঘণ্টা দুই ধ'রে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান করেন। ঘাটে যারা স্নান করতে আসে তাদের হরিভক্তি তাতে বাড়ে না। অন্য ঘরে গিন্নিরা সেই সময় পট্টবস্ত্র প'রে ঘটা ক'রে জপতপ করতে থাকেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন এঁরা। ভগবানের কৃপায় আর কোনো ভাবনাচিন্তার দায় এঁদের নেই। কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত এত নিরীহভাবে ঘাটের বাবুদের সময় কাটত না। আশেপাশের গৃহস্থ-বৌরা দিনের বেলা ছাড়া নিরিবিলি সময় ঘাটে আসতে তখন ভরসা পেত না।

ভারতের পশ্চিমে যেমন কুয়াতলায়, আধুনিক ইউরোপে যেমন হোটেল বা ক্লাবের নাচঘরে—বাংলাদেশে তেমনি নদীর ধারে ঘাটতলায় সমাজের অবকাশকালীন ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে যে জনস্রোত চলাচল করে তার থেকে বাঙালি জীবনের অনেক সন্ধানই পাওয়া যায়—তার দারিদ্র্য, তার ঐশ্বর্য্য, তার ক্ষুদ্রতা, তার ঔদার্য্য।

বাঘনাপাড়ার বাঁধাঘাটে সূর্য্যোদয়ের অনেক আগে থেকেই লোক-সমাগম আরম্ভ হয়। এমন কি রাত্রেও ঘাট জনশূন্য প'ড়ে থাকে না। কয়েকজন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী সেখানে আড্ডা নিয়েছে। প্রথম দিকে ডুগডুগি-খরতাল বাজিয়ে খুব খানিকটা গণ্ডগোল করবার পর শ্রান্ত হোলে, গাঁজায় আবার দম দিয়ে, বাকি রাতটা গল্প ক'রে বা ঝিমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

প্রত্যূষে প্রথম আসেন দু'চারজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যথারীতি জপতপ স্নানাদি সেরে নামাবলী গায় দিয়ে মালা জপতে জপতে পুজো করে বাড়ী ফিরে যান। পথে মন্দিরের সামনে যে চাঁপা ও জবা গাছ আছে তাতে দুচারটি যা ফুল ফুটে থাকে তোলেন নির্ম্মমহাতে, সাজিতে ভরে নিয়ে যান ঘরে।

তারপরেই আসেন এ পাড়ার গিন্নিরা। চৌধুরীবাড়ির মেজপিসি পরপর সব সন্তান ক'টিকে হারিয়ে শেষ শিশু বুকের মধ্যে আঁকড়ে বিনাপক্ষপাতে দেবদেবী এবং পীরের দরজায় অনেক মানত দিয়েছেন। তিনি এসেই খোকাকে ঘোষেদের ছোটো বৌয়ের কোলে তুলে দিয়ে ঘাটের শেষ ধাপে লম্বা হয়ে শুয়ে গড় করেন। মা গঙ্গা অনেককেই টেনে নিয়েছেন, মিনতি এই যে এটির দিকে দৃষ্টি যেন না দেন।

অন্যপ্রান্তে বেশ একটি মজলিস ব'সে গেছে এতক্ষণ। সেখানে মুখুজ্জোদের তিন গিন্নীর অধিষ্ঠান। তাঁদের রাসভারি চেহারা, গায়ে ভারি ভারি সোনার গয়না, চওড়া লাল পাড়ের তসরের কাপড়। ও পাড়ার পাগল হরগোবিন্দ রায়ের গৃহিণী মুখরা বামাসুন্দরী ছাড়া আর সকলেই তাঁদের সমীহ ক'রে চলে। আগের দিনের দুটি পাড়ারই সব খবর রান্নাবান্না অসুখবিসুখ কোনো বিষয়ই বাদ যায় না—সব আলোচনা হয়ে গেলে তাঁরা সদলবলে ঘাট ছেড়ে জলে নামেন। ওপারে নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য্য দেখা দিয়েছে—নদীর ধারে গাছের তলায় অন্ধকার তখনো যায়নি, কিন্তু জলের উপর রোদ প'ড়ে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। সেই সোনালি আলো সিঁড়ির ধাপে সাজিয়ে রাখা কাঁসার বাসনগুলির উপরে ঠিকরে প'ড়ে ঘাট উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, আর মধুর করেছে আমাদের ঐ কয়েকটি বঙ্গবধূর শ্যামল দেহকান্তি।

মেয়েদের ভিড় ক্রমশ ক'মে গেলে বাবুদের পালা। জীর্ণ শরীর, মুখে হাসি নেই, দেখলেই বোঝা যায় এরা কোন শ্রেণীর জীব। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপত্র, ইস্কুল-কলেজ মায় গবর্ণমেণ্ট আপিস পর্য্যন্ত বাংলাদেশের কোনো উদ্যোগই চলে না এদের সাহায্য বিনা। বেলা আটটার মধ্যে দুমুঠো ভাত কোনো রকমে গিলে আফিস ছোটবার তাগিদে গঙ্গাস্নানটাও তাড়াহুড়ার মধ্যে দুটো ডুব দিয়ে সংক্ষেপে সারতে হয়। তাই এদের মধ্যে আড্ডা তেমন জমে না। তবে এদের দৈনিক একটা আমোদের বিষয়—হরগোবিন্দ রায়। হরগোবিন্দ কামারহাটি জুটমিলের বড়োবাবু ছিলেন। মিলের ক্যাশে প্রায় ১৫ হাজার টাকার গরমিল হোলো। তারপর থেকেই পাগলামি চাপল ক্যাশিয়ারের ঘাড়ে। পাগলামির পরিচয়টা লোকজনের সামনে ঘাটেতেই বেশি পাওয়া যায়। ইংরেজি বাংলায় নানারকম বক্তৃতা দেওয়া, বাঁশি বাজানো এবং মাঝেমাঝে বিকট হুঙ্কার দেওয়া হয়েছিল অভ্যাসগত। এই নিয়ে সকলেই—বিশেষত তার পূর্ব্ব সহযোগী কেরাণীবৃন্দ—পরম কৌতুক বোধ করত।

বেলা হোলে ছেলেদের জলক্রীড়া সুরু হয়। পাড়ার যত ছেলে এসে জমে। ঘণ্টাখানেক ধ'রে তাদের ঝাঁপাঝাঁপি চেঁচামেচিতে গঙ্গার ধার মুখরিত হয়ে ওঠে। দু'একটি প্রৌঢ়া ভুলক্রমে এই সময় এসে পড়লে তাঁদের মিষ্ট অনুনয় বা তীব্র গালাগালি সবই বৃথা হয়। কে গ্রাহ্য করে? লম্ফঝম্প সমানেই চলতে থাকে। এদের সর্দ্দার ছিল হরিদা'। সে এখন বড়ো হয়েছে, বিয়ে করে বিদেশে গেছে কাজকর্ম্মের টানে। ছুটিতে মাঝেমাঝে যখন সে বাড়িতে আসে তখন যেন কোটালের বান ডেকে আসে ছেলেদের ছেলেমিতে।

হরিদাস যখন কলকাতায় কলেজে পড়ত তখন গোলদিঘিতে আধুনিক প্রণালীতে সাঁতারকাটা শিখেছিল। অনেক উঁচু থেকে লাফ দিয়ে জলে পড়তে পারত, ডুব-দেওয়া বিদ্যের প্রতিযোগিতায় বেশ নাম করেছিল। গ্রামের ছেলেরা তার কাছে এই বিদ্যে শেখে—তাই সে রোজ এই সময় ঘাটে এসে ছেলেদের উৎসাহ দেয়। ফলে নৌকোর মাঝিরা বাঁধাঘাটের ধার দিয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। নৌকো দেখলেই ছেলেরা তার হালের উপর, ছাতের উপর পিল্‌পিল্ ক'রে বেয়ে ওঠে জলে ঝাঁপ দেবার জন্যে।

একটি মানুষ এই ঘাটের সঙ্গে চিরকালের জন্যে আমার মনকে বেঁধেছে। সে হচ্ছে হরগোবিন্দ রায়ের মেয়ে করুণা। গঙ্গার স্রোতের মতোই তার অক্লান্ত হাসি আর কল-কৌতুক। ছুটিতে কিছুদিনের জন্যে যখন বাড়িতে আসে তখন গঙ্গার তীর যেন প্রাণ পেয়ে ওঠে। তার স্বামী হরিদাস ছেলেদের সর্দ্দারিতে পাড়ার হাওয়ায় যেমন পাক খাইয়ে দেয়, তার স্ত্রীটিও তেমনি ঝি বৌদের মহলে।

২

সে দিন ভোরবেলায় আলো যখন সবেমাত্র আকাশের এক কোণে একটুখানি দেখা দিয়েছে, তখনো আধা অন্ধকার, ঘাটে কেউ নেই, করুণার মুখখানা ভারি, মনে হয় রাত্রে ঘুম হয়নি। এ রকম কাতর চেহারা তার কখনো দেখা যায় না।

এবারে করুণা বাপের বাড়ীতে এল কিন্তু এখানে ওর আনন্দের মিলন সহজ হলো না। পাড়ার তিন জন ছেলে হঠাৎ গেছে জেলখানায় তলিয়ে। সবাই জানে তারা ছিল সোনার টুকরো ছেলে। হরিদাস যখন গ্রামের ইস্কুলে পড়াত তখন তারাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। সম্প্রতি তাদের আচরণে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দিয়েছিল শাসন বিভাগে যেগুলো কালো মার্কায় চিহ্নিত। তাদের পরণে ছিল খদ্দরের খাটো ধুতির উপর একখানা খাকি রঙের মোটা জামা, না ছিলো গায়ে চাদর, না ছিলো পায়ে জুতো। তারা সৎপাত্র কিন্তু কন্যাকর্ত্তাদের পক্ষে ছিল দুর্লভ। মিল-এর মজুরদের ছেলেরা ওদের কাছে পড়ত। ওদের মধ্যে যে ছিল ডাক্তার সে গরীবদের কাছে ফি নিত না। সকলের চেয়ে অন্যায় ছিল এই যে জনসাধারণের প্রতি তাদের প্রভাব ছিল অসামান্য। জেলখানায় যখন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন কানে কানে এই কথা রটল যে চরগিরি করেছে আমাদের পুরুত ঠাকুর। তখন থেকে গাঁয়ের লোক পুরুৎকে মনে মনে যত করত ঘৃণা তার সাত গুণ করত ভয়। তার সাহায্যে নিজ নিজ কাজ উদ্ধারের প্রলোভনে তাকে খুসি করত নানা উপায়ে। মিল-এর সাহেবদের কাছে ঠাকুরের ঘন ঘন আনাগোনা ছিল ব'লে কাজের উমেদারদের স্তুতিবাক্যে ওর বাসা ছিল মুখরিত।

হরিদাস অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হোল। এ বাড়ীর বাগান থেকে শাকসব্‌জি ঝুড়িতে ক'রে প্রায়ই চাটুজ্জের বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়—হরিদাস বারবার এটা দেখেছে, প্রত্যেক বারেই অত্যন্ত বিরক্ত হোলেও সহ্য করেছে। আজ পথের মধ্যে দেখতে পেলে সেই সঙ্গে এক ভাঁড় ঘি চলেছে। ঘরের দুধ জমিয়ে জমিয়ে বামাসুন্দরী এই ঘি তৈরি করেছেন। অথচ হরিদাস জানে করুণা তার বাবার জন্যে রোজ দেড় সের করে দুধ নিজের পয়সা থেকে কিনিয়ে আনায়; ঘরের দুধের দাবী করতে গেলেই অনটনের ফর্দ্দ দাখিল হয়। আজ হরিদাসের গা জ্বলে উঠল, ইচ্ছে করল ভাঁড়টা ভেঙে ফেলে। বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করে এল ঘাটে। করুণাকে বললে, "আমার ছুটি ফুরোতে দেরি আছে, কিন্তু আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহেই ছুটি ক্যান্‌সেল্ করে দিয়ে আমি ফিরব কাজে।"

করুণা জিগেস করলে,—"কেন?"

হরিদাস বললে, "শাশুড়ি ঠাকরুণকে বারবার বলেছি চাটুজ্জেকে এ বাড়িতে আসতে দিলে আমি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব, তিনি কথা দেন, কথা রাখেন না, কিন্তু আমার কথা আমি রাখব।"

করুণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, "অনেকদিন পরে বাবাকে দেখতে এলুম এত শীগগির চ'লে গেলে তাঁর বড়ো কষ্ট হবে। আমি ছাড়া তাঁকে যে দেখবার আর কেউ নেই।"

"তোমার মা তাঁকে মানুষ ব'লে গণ্যই করেন না। এবারে আমরা ওঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।" —

"তা হোলে উনি বাঁচবেন না। ওঁর প্রাণ আছে এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়িয়ে, ফাটলের অশথ গাছটার মতো।"

"কিন্তু করুণা, যে বাড়িতে তোমার বাবা দুঃখ পান অবজ্ঞায়, আর ঐ পাষণ্ড ভণ্ডামির জোরে এত আদরে থাকে, সেখানে আমার এত অসহ্য হয় যে কোন্‌দিন কী ক'রে বসব বলতে পারিনে।" এই বলেই সে হাত মুঠো ক'রে ছুটে চ'লে গেল।

করুণা তার প্রতিদিনের প্রথা মতো হাতে এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে এসেছে। তার নিজের জন্যে নয়। ঘাটে তিনটে কুকুর তার প্রত্যাশায় শুয়ে ছিল। সে তাদের সামনে এক জায়গায় খানিকটা মুড়ি ঢেলে দিয়ে ডাক দিতে তিনটেই এসে ঠেলাঠেলি করে ভারি গোল বাধিয়ে দিল। তিন জায়গায় সে মুড়ি ভাগ ক'রে দিল। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হোলো না—একটা কুকুর যেই কোনো একটা ঢিবির দিকে এগোয় অন্য দুটোও অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ে। অন্যদিন হোলে সে বোধহয় মুড়ির জন্য কুকুরদের এই লড়ালড়ি দেখে খুব কৌতুক বোধ করত, কিন্তু আজ একটু মুচকে হেসে তারপর বিশেষ চেষ্টা ক'রে তাদের এক একজনকে এক একটা ঢিবিতে জোর্ ক'রে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। যখন দেখলে তারা নিজের নিজের ভাগ নিয়ে ভদ্রব্যবহার করছে, সে প্রত্যেককে ঠোঙা উজাড় ক'রে দিয়ে মুড়ি বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করল।

কুকুরদের খাওয়ান হয়ে গেলে সে ধাপের উপর থেবড়ে বসে দুই হাতের উপর মাথা রেখে চুপ করে স্থির দৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার ছুটিতে বাড়িতে এসে তার মনের মধ্যে ভারি গোল বেধে গেছে। সে এতদিন জীবনকে খুব সহজ সরল মনে করে নিয়েছিল,—তার নিজের স্বভাব যেমন সরল। যতই দিন যাচ্ছে মাকে ও ভালো করে বুঝতে পারছে না। বাবার দুঃখ কেবলি ওর বাজছে বুকে। দেখলে তাঁর মশারি ছেঁড়া, গায়ের কাপড়ের দৈন্য, আহারের ররান্দে অত্যন্ত অযত্ন। ও যত পারে নিজের খরচে ওঁর অভাব মোচন করেছে। আর রোজ নিজে রেঁধে ওঁকে না খাইয়ে ছাড়ে না।

দানাপুরে ওর স্বামীর কর্ম্মস্থানে গিয়ে কেবলি মনে পড়ত তার বাবাকে—সেই 'পাগল' হরগোবিন্দকে—সে ছিল তার খেলাঘরের সঙ্গী—তার কৈশোরের বন্ধু। মেয়েদের মনে যখন স্নেহ দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম জাগে, করুণার জীবনে সেই প্রথম বিকাশের সন্ধিক্ষণে এই পাগল জুড়ে বসেছিল তার খেলাঘর—সেই ছিল তার পুতুল। তাকে খাইয়ে পরিয়ে, আদর করে, ধমক দিয়ে তার বাসনা মিটত। ঝগড়া হোত ক্ষণে ক্ষণে, আবার মিটমাট হতে দেরি হোত না। পাগল বাপকে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার জন্য মা বামাসুন্দরী কত না রাগ করেছে। মনে মনে হিংসা হতো স্বামীর উপর। বাইরেকার রুক্ষমূর্ত্তির নীচে মেয়ের কাছ থেকে ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা আগুনের মতো ছাইচাপা থাকত। মাঝেমাঝে ঈর্ষায় জ্বলে উঠত যখন সে দেখত করুণা কেমন সরলভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিচ্ছে ঐ পাগলের সেবায় ও ভালোবাসায়। কই সে তো এমন করে কোন দিন করুণাকে পায়নি, অথচ করুণার উপর দাবী তো তারই। তবে তাদের মধ্যে এ ব্যবধান কেন?

ব্যবধানের সব চেয়ে প্রধান কারণ ঐ চাটুজ্জে। সমস্ত গ্রামের ও যেন শনিগ্রহ। ওকে সবাই মনে মনে ঘৃণা করে বামাসুন্দরী ছাড়া। বামাসুন্দরী নিজের আচরণে গুরুপুত্রের সম্বন্ধে অচলনিষ্ঠ কর্ত্তব্যের দোহাই দিলেও লোকের কাছে সেটা রুচিকর হতো না। এ বাড়িতে ওর নিত্য অবারিত গতিবিধিতে এত আতিশয্য প্রকাশ পায় যে করুণা মনে কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে ভয় পেত, চোখ বুজে চিন্তাটা চাপা দিয়ে রাখত; নানা উপলক্ষ্যে নানা কুদৃশ্যে বেদনা যতই জমা হতো, ওর বাবার প্রতি স্নেহ ততই যেন ব্যথিয়ে উঠত। এ কথা সে কেবলি অনুভব করেছে এ বাড়ির হাওয়ায় সুখ নেই, শোভনতা নেই। ওর মায়ের স্বাভাবিক পরুষতার ভিতরে ভিতরে মেয়ের প্রতি গভীর স্নেহ ছিল মেয়ে তা জানত। কিন্তু এই স্নেহ তিনি ওর বাবার স্নেহের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন না তাই করুণা মায়ের চেয়ে বাপের স্নেহকেই মূল্য দিত অনেক বেশি। ঘরে ওর বাবা সবতাতেই বঞ্চিত ছিলেন বলেই করুণার কাছে যখন-তখন অন্যায় আবদার করতেন, সমস্তই সহ্য করত করুণা গভীর ধৈর্য্যের সঙ্গে।

স্বামীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল খুব সহজ। হরিদাস তাকে ভালোবাসে কি না—কতখানি ভালোবাসে—এ সব কথা ওজন করে কোনোদিন ভাবতে হয় নি। বিয়ে জিনিষটাই তার মনকে বেশী নাড়া দেয়নি—হরিদাসকে সে আগে থেকেই ভাল ক'রে জানত—ছেলেবেলায় তাদের দলের সর্দ্দার সে ছিল। কিন্তু যাকে বন্ধু ব'লে, আত্মীয় ব'লে, গুরু ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিল, যার হাতে নিজের দেহ মন সমস্তই একান্তভাবে সঁপে দিয়ে পরম তৃপ্তি বোধ করেছিল—তার সঙ্গেকার নিবিড় সম্বন্ধকে এই যে একটা বাইরের মানুষ কেবলি আঘাত করছে সেই কথাটা আজ নতুন করে ওর মনকে যেন মোচড় দিচ্ছে। এবারে যেন বয়সের সঙ্গে ওর অন্তর্দৃষ্টি স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। আজ তাই নিয়ে কত কী ভাবছে এবং ভাবনা চাপা দিতে চেষ্টা করছে।

বেলা হয়ে গেছে, খেয়াল করেনি। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে তার বিধবা ননদ সরোজিনী পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

"বৌ, যাবি নে ঘরে ?"

"কেন, ভাই ঠাকুরঝি, দুদণ্ড দেখতে না পেয়ে ভাবলে বুঝি বৌ পেয়ারা খেতে গাছে উঠেছে ? এখন বৌ কি আর সেই ছেলেমানুষটি আছে ? সে দিন গেছে। চল্ চল, যাই।"—ব'লে খুব খানিকটা হেসে সরোজিনীর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

আমার বজরার খোলা জানলা দিয়ে করুণার উচ্ছ্বসিত হাসি সকালবেলাকার উজ্জ্বল আলোর মতোই ঘর ভরে দিয়ে গেল। মুহূর্ত্ত আগে সে তো ছিল অন্ধকারে, তার মনের অজানা কোণে কত ঝড়ই না রয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারপরেই উঠল উথলে হাসির ফোয়ারা। কিন্তু এতদিন পরে দেখা গেল সে হাসির সুর গেছে বদলে।

৩

ঘাটে বসে তেল মাখতে মাখতে বড়োগিন্নি মেজ গিন্নিকে বললেন, "ও মেজ বৌ, শুনেছ, বামাসুন্দরীর জামাই আমাদের হরিদাস ছুটি নিয়ে দেশে আসতেই জেদ ধরেছে জমিদারের জুলুম থেকে প্রজাদের সে বাঁচাবে।"

মেজ বৌ বললে, "শোনো একবার কথা! শাসন না করলে ছোটোলোকেরা যে মাথায় চড়ে বসবে।"

বড়ো গিন্নি বল্লেন, "এখনকার ছেলেদের ঐ তো দশা! উপরওয়ালাদের কাউকে মানতে চায় না—ঠাকুর দেবতা থেকে সুরু করে গুরু পুরুৎ পর্য্যন্ত।"

চন্দরা এসে বসল পাশে, একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে। বললে, "শুনেছিস দিদি! শাশুড়ি জামাইয়ে ঠোকাঠুকি বেধে গেছে।"

"যে শাশুড়ি! এতদিন বাধেনি এই ভাগ্যি। কেন, কী হয়েছে ?"

"হরিদাস বলে, চাটুজ্জেমশায় জমিদারের হয়ে জুলুম করছে—প্রজাদের ঘাড় মটকাবার বেহ্মদত্যি।"

"তুই এত কথা শুনলি কার থেকে ?"

"ঐ যে ওদের শঙ্করীদাসী, মাকড়ী বাঁধা রেখে আমার কাছে ধার চাইতে এসেছিল, শুনলুম তারি কাছে। জামাই ধরে পড়েছে শাশুড়িকে, চাটুজ্জেকে যেন বাড়ি ঢুকতে না দেওয়া হয়।"

মেজগিন্নি চোখ টিপে মৃদু হেসে বললেন, "শাশুড়ি কী বল্লেন ?"

চন্দরা—"বলবে আর কী। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বললে, গুরুপুত্র বটে তো, ভালো হোক মন্দ হোক সে যে দেবতা, তাকে দান দক্ষিণে না দিলে পরকাল রক্ষে হয় না যে। বাড়ি আসতে বারণ করি কী করে ?"

বড়োগিন্নি—"জামাই তাতে সন্তুষ্ট হোলো ?"

"সহজ ছেলে সে নয়, এবার একটা কাণ্ড বাধাবে।"

ছোটগিন্নি—"তা জামাইয়ের কথাটা না হয় রাখলই বা। ওর যত ধর্ম্মে মতি সে তো জানাই আছে।—চাটুজ্জের উপর এত কিসের দরদ।"

মেজগিন্নি ঠোঁটদুটি বেঁকিয়ে বললেন, "আহা, তুই ভাই, আর জ্বালাস্ নে, যেন কিছু জানিস্ নে ?"

ঘটনাটি হয়ে গেছে আজ দিন দশেক আগে। যেন প্রথম আগুন লেগেছে শুকনো ঘাসের মাঠে। আস্তে

আস্তে এগিয়ে এসে আজ লেগেছে বড়ো ঘরের চালায়। তার খবরটা পাওয়া গেল এই ঘাটে পুরুষসভায়। আজ রবিবার। বাবুরা উঠেছেন দেরিতে। মেয়েরা প্রায় সবাই ঘাট ছেড়ে গেছে। এখন এদের স্নান চলবে ধীরে সুস্থে। কিন্তু আজ ভারি উত্তেজনা। সাঁতার কাটাও বন্ধ। গাঁয়ের মধ্যে কথার মতো কথা আজ জুটেছে অনেকদিন পরে। কথাটা কানাকানির সীমা গেছে পেরিয়ে—সকলেরই গলা চড়েছে উপরের সপ্তকে।

ব্যাপারটা এই :—

বশীমণ্ডলকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা ক'রে জমিদার যখন কিছুতে পেরে উঠল না তখন চাটুজ্জের কাছে নিলে পরামর্শ। নছরুল্লার সঙ্গে বছর দুই আগে জমির সীমানা নিয়ে বশীর বেধেছিল মামলা। অনেকদিন হোলো সে ঝগড়া মিটে গেছে। বশীর সঙ্গে নছরুল্লার এই শত্রুতার কথা জমিদারের জানা ছিল, নিজের লোক দিয়ে নছরুল্লার কলাইয়ের মড়াইয়ে দিলে আগুন লাগিয়ে। বশীকে করলে আসামী খাড়া। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। হরিদাস নিল বশীর পক্ষ, প্রমাণ করে দিল যে বশী গিয়েছিল দুদিন আগে তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী, মেয়ে মরছিল সান্নিপাতিক জ্বরে। এদিকে চাটুজ্জে সাক্ষী দিয়ে বসেছে যে সে স্বচক্ষে দেখেছে আলো নিয়ে বশী মড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে—সন্দেহক্রমে ও তার পিছু নিয়ে দেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন চাটুজ্জে পড়ে গেছে মিথ্যা সাক্ষী দেবার মামলায়। ঘাটে বার আনা লোকের দরদ চাটুজ্জের পরে—বেটা বশী ছোটোলোক, বজ্জাত, মুনিবকে মানেনা, এত বড়ো আস্পর্দ্ধা! ওকে শাসন করবে না তো কী? এমন তো আকসার হয়ে থাকে, তাই ব'লে কি বামুনের ছেলে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪

এদিকে চাটুজ্জের চারদিকে জাল জড়িয়ে আসছে। সব রকম জালিয়াতির মকদ্দমায় যারা প্রবীণ এমন সব পাকা মাথার মোক্তার-উকীলরা বলছে—ব্যাপারটা সহজ হবে না। আরো বিপদ হয়েছে এই, ডেপুটিবাবু চাটুজ্জের বদমায়েষীর খবর ভালোই জানেন। কিন্তু ওকে কিছুতেই শাসনের ফাঁসে টানতে পারেন নি। একবার একজন মরা মানুষের নাম বদলিয়ে গ্রামের বাইরেকার অজানা লোকের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে পঞ্চাশহাজার টাকা ঠকাবার পরামর্শে সে ছিল প্রধান মন্ত্রী। সাক্ষী সাজিয়েছিল অনেক সাবধানে। প্রধান আসামী নবীন জোয়ার্দ্দারের সঙ্গে কথা ছিল টাকাটা হাতে এলে অর্দ্ধেক বখরা পাবে সে নিজে। মকর্দ্দমা গেল ফেঁসে, নবীন গেল জেলে, অনেকগুলো সাক্ষী মোলো ঐ সঙ্গে। ও গেল বেঁচে। অথচ নবীনের মাথায় এ মৎলব গোড়াতে আসেনি। চাটুজ্জেই তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল। ব্যাপারটা সবাই জানে। ম্যাজিষ্ট্রেটের খুব ইচ্ছে ছিল যাতে ওকে আইনের পাকে জড়াতে পারে, পারলে না। মানুষখেগো বাঘের মতো অদ্ভুত কৌশলে বারেবারেই রাজদণ্ডের হাত ও এড়িয়ে যায়। কেবল এইবারেই পড়েছে ধরা। আটঘাট ছিল পাকা; কিন্তু যে-বশী ভিটে ছেড়ে নড়ে না, সে যে ফসল কাটার পুরো মৌসুমে হঠাৎ দৌড়বে মেয়েকে দেখতে একথা সে ভাবতেই পারেনি। আবার হবি তো হ', মেয়েও গেল মরে, সুতরাং বশীর পক্ষের প্রমাণের অভাব রইল না। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সদর মহকুমা থেকে নামজাদা উকীল আনাতে হোলো, পুঁজি ফুরোল দিনে দিনে। ব্রাহ্মণ দুবেলা হরিদাসকে অভিসম্পাৎ দিচ্ছে আর টাকা ধারের বৃথা চেষ্টায় মহাজনদের বাড়ি বাড়ি মাথা খোঁড়াখুড়ি করে মরছে।

এদিকে ওর বিপদ যত ঘনাচ্চে শুকিয়ে মরছে বামাসুন্দরী। তার আহারনিদ্রা বন্ধ বললেই হয়। বারবার হরিদাসের কাছে মাথার দিব্যি দিয়ে অনুনয় করছে, "বাবা, ব্রাহ্মণকে মেরো না।" হরিদাস রেগে-মেগে বলে, "ঐ বামুনা কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে, আরো কত করবে, দয়া করবে না তাদের পরে?" বামাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, চোখের জল ফেলে, আর দেবতার দুয়ারে মানৎ দেয়।

হরিদাস যতক্ষণ ঘরে থাকে চাটুজ্জের এ বাড়িতে আসা অসম্ভব—সে যখন থাকে না তখন করুণার অকরুণ দৃষ্টি থাকে, যাতে চাটুজ্জে চৌকাঠ মাড়াতে না পারে। একদিন বামাসুন্দরী থাকতে পারলে না, কোনো ফাঁকে ডেকে

আনালে চাটুজ্জেকে। বললে, আমার হাতে তো নগদ টাকা নেই, সে আছে আমার মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা। কেবল লোহার সিন্ধুকে আছে শাশুড়ির দেওয়া গয়নাগুলো, সেও আমার মেয়েরই সম্পত্তি। বিদেশে থাকে ব'লে নিয়ে যায় নি। তা হোক্ ঐ গয়নাগুলো তুমি নিয়ে যাও, দেখো মকদ্দমার তদ্বিরে যেন ত্রুটি না হয়।

বামাসুন্দরী লোহার সিন্ধুক খুলে গয়না যখন বের করতে যাচ্চে এমন সময় করুণা ঢুকে পড়ল ঘরে। বললে, "কী করছ মা!"

চাটুজ্জে অধীর হয়ে বললে, "কী আর করবে? গয়না বের করছে। আমার চাই, এখখুনি চাই।"

করুণার মাথায় যেন বজ্র পড়ল। বলল,—"মা, তুমি ওঁকে দেবে!—আমার গয়না!"

বামাসুন্দরী বললে, "চুপ কর্, বকিস্‌নে তুই! তোর জন্যেই দিচ্চি, তোরই কল্যাণ হবে। দে না, নিজের হাতেই দে না।"

"কখখনো দেব না, কখখনো না।"

"থাম্ থাম্, চেঁচাস নে, পাড়া সুদ্ধু লোক এসে জড়ো হবে।"

"না আমি গয়না দিতে দেব না।"

চাটুজ্জে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "চুপ কর্ বেটি! আমাকে বাঁচাতে দিবি নে! মরবি নরকে প'চে!"

"না আমি দেব না। যদি জোর করে নাও, নিশ্চয় নালিশ করবেন আমার স্বামী।"

হরিদাস গেছে নদীতে নাইতে, এখনি সে এসে পড়বে। আর তো দেরি করা চলবে না। চাটুজ্জে করুণার হাত চেপে ধরে তার চোখের উপর চোখ রেখে বললে,—"করুণা, আমি তোর বাপ হই তা জানিস্?"

"তুমি আমার বাপ! কখ্‌খনো না, মিথ্যে কথা! আমাকে বাপ তুলে গাল দিয়ো না বলছি।"

চাটুজ্জে বামাসুন্দরীকে বললে, "বামী, আর তো চেপে রাখা চলবে না, ব'লে দাও ওকে আমি ওর বাপ।"

বামাসুন্দরী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

চাটুজ্জে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে বললে, "এখনো যদি না বলবে তবে কখন বলবে! আমি যখন জেলে গিয়ে পচে মরব তখন! করুণা, তুমি নিজে জিগেস করো তোমার মাকে। তোমাকে ও মিথ্যা কথা বলতে পারবে না।"

করুণা মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারলে, কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বললে, "মা, বলো আমাকে, আমার গা ছুঁয়ে বলো, উনি যা বলছেন, সে কি সত্যি?"

চাটুজ্জে রেগে উঠে বললে, "বামী, এখনো না যদি বলিস, তোর জিব যাবে প'চে"

বামাসুন্দরী হাত মুঠো করে শক্ত হয়ে বললে, "হাঁ সত্যি, উনিই তোমার বাপ!"

করুণা বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এই সময়টাতে হরিদাস বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে বসে করুণাকে যত তার সখের বই পড়ে শোনায়। ক'দিন ধরে গোর্কির লেখা গল্প শোনাচ্ছিল, শেষ হোতে বাকি আছে।

দেরি হয়ে যায়, করুণা ঘরে আসে না। হরিদাস ভাবে হোলো কী। বাইরে এসে দেখে ছাদের যেদিকে ছায়া পড়েছে সেইদিকে এককোণে চুপ করে বসে আছে।

"করুণা, শুতে আসবে না?"—কোনো জবাব নেই।

যেমনি হরিদাস কাছে বসে ওর পিঠে এসে হাত দিয়েছে করুণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হরিদাস করুণার মাথা কোলের উপর তোলবার চেষ্টা করলে, পারলে না। বললে, "কী হয়েছে তোমার? ঘরে আসবে না?"

"না।"

"না, কী? আমি কোনো অপরাধ করেছি?"

"না, না, না।"

"কাণ্ডটা কী, ঘরেই চলো না।"

করুণা উঠে বসল, বললে,—"ঘরে যেতে আর বোলো না আমাকে।"

"কখনো বলব না?"

"না, কখ্খনোই না।"

"এর মানে কী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে জিগেস করো না, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।"

"এমন কী কথা আছে যা তুমি আমাকে বলতে পারবে না?"

"আমি জানতে পেরেছি যে আমাদের বিয়ে হয়নি।"

"কার কাছে জানতে পারলে?"

"মার কাছে।"

"আমি কি তাহোলে বিয়ের রাত্তিরে স্বপ্ন দেখছিলুম?"

"হাঁ, স্বপ্নই দেখছিলে।"

"আর একটু স্পষ্ট করে বলো, করুণা।"

"আর কিছু আমি বলতে পারব না, এই তোমাকে জানাচ্ছি, আমার জাত নেই, আমার জাত নেই।"

"আচ্ছা, বেশ তো, জাত না হয় না-ই থাকল, কিন্তু তুমি যে আমারই করুণা সেটাতে কোনো সন্দেহ নেই তো!"

মুখের উপর আঁচল চেপে ধরে করুণার আবার কান্না, বুক ফেটে কান্না।

"তোমার বাবার পাগলামি হঠাৎ তোমাকে পেয়ে বসল বোধ হচ্চে।"

"বাবা, বাবাগো"—ব'লে করুণা কেঁদে উঠল।

হরিদাস হতবুদ্ধি হয়ে বললে,—"তোমার কিছু হয়েছে না কি?"

এমন সময় বাইরে থেকে চাটুজ্জের গলা শোনা গেল—"একবার দেখা করতে চাই—জরুরি কথা আছে।"

করুণা তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে গেল, যেন আগুন লেগেছে তার সর্ব্বাঙ্গে।

চাটুজ্জে হরিদাসের সামনে এসে বললে,"অসময়ে এসেছি, কিছু মনে কোরো না। অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"টাকা চাই, পাঁচ হাজার।"

"তুমি টাকা চাও আমার কাছ থেকে?"

"হাঁ, তোমারই কাছ থেকে। ধার দিতে চাও তো তাই দিয়ো, টাকায় শতকরা চার আনা সুদে। কিন্তু আর দেরি কোরো না, দোহাই তোমার।"

"শক্তি যদি বা থাকত তবু দিতুম না, তোমাকে টাকা দেবার মতো রুচি আমার নেই।"

"দেখো, লড়াইয়ের সময় শত্রুকে গুলি মারতে কারো বাধে না। কিন্তু গুলি লাগলে তারপরে তো হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার সেবা করে। আমাকে তো বাবা, মেরেছ তোমার গুলি, এখন যখম হয়েছি, এইবার আমায় বাঁচাও।"

"জমা টাকা তো আমার নেই।"

"তোমার না হোক্ করুণার তো আছে।"

"করুণার টাকায় আমি হাত দেব কী করে?"

"দেখো আমাকে যদি বলতে বাধ্য করো তা হোলে বলব, তুমি যদি ঐ টাকায় হাত না দিতে পারো আমার হাত দেবার অধিকার আছে।"

"কী রকম শুনি!"

"তা হোলে বলি। একবার বলে ফেললে কিন্তু আর কথা ফিরবে না। তার চেয়ে কিছুই না শুনে যদি টাকা দিতে পারতে তাহোলে শান্তি পেতে।"

"আমি শান্তি চাইনে, সত্যকথা শুনতে চাই।"

"তবে শোনো। হরগোবিন্দ, যাকে তুমি শ্বশুর ব'লে মান্য করো আর যাকে পৃথিবীসুদ্ধু লোক পাগল ব'লে জানে, জুটমিলে সে অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করত। ইতিমধ্যে করুণার জন্ম হোলো। আমার যে কী হোলো, ওর উপর কী স্নেহ পড়ল, সে আমি বলতে পারিনে। জগতে এত ভালো আর কাউকে বাসিনে। বুদ্ধি খাটিয়ে খাই, বিষয় সম্পত্তি নেই, যদি থাকত সব ওকে দিয়ে ফেলতুম। হরগোবিন্দ ঠকবার সনন্দ নিয়ে জন্মেছে, ওকে আত্মীয় ঠকায়, বেগানা লোকে ঠকায়, দালাল এসে লোভ দেখিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যায়, জুয়োখেলায় বাজি রেখে ঠকে, রাতারাতি লক্ষপতি হবার ফিকির বাৎলাবার লোক ওর কাছে সর্ব্বদা জোটে। ওকে বললেম, হরগোবিন্দ,

তোমার তো দেউলে হবার কপাল, সেই সঙ্গে মেয়েটার কপাল ভেঙো না। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার মতো সম্বল এখন থেকে জমানো চাই। হরগোবিন্দ বললে, জমানো খুবই তো দরকার কিন্তু জমে না। তখন আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাৎলিয়ে দিলুম উপায়। কোম্পানির তহবিল থেকে হাজার পনেরো পর্যন্ত খসাতে পেরেছিল এমন সময় পড়ল ধরা। আমার বুদ্ধি ষোল আনা মেনে চলবার মতো ওর মগজ ছিলনা ব'লেই এমনটা ঘটল। তখন ও কিছু পরিমাণ পাগল হোলো জেলখানার ভয়েই, কিছু পরিমাণ হোলো আমার শিক্ষামতো। লোকটা হাবাগোছের ছিল ব'লেই বড়োসাহেব ওকে নিয়ে মজা করত আর স্নেহও করত। তাই কোনোমতে বেঁচে গেল। তারপর থেকে পাগল হওয়াটাই ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। এর থেকে বুঝবে টাকাটা আমারই, সে টাকা করুণাকে আমারই দান, পাগলার হাত দিয়ে এসেছে মাত্র।"

"বের হও, তুমি এ বাড়ি থেকে এখনি বের হও।"

"বের হব, কিন্তু টাকাটা না নিয়ে বের হবার রাস্তা নেই। কলকাতা থেকে কৌসুলি আসছে, রোজ লাগবে সাড়ে সাত শো' টাকা, আবার তার জুড়ি একটা ক্ষুদে কৌসুলি রাখা চাই।"

"টাকা পাব কোথায়? করুণার নামে যে টাকা আছে সে আমি কালই মিলের সাহেবদের কাছে ফেরৎ দিয়ে আসব।"

এক মুহূর্তে চাটুজ্জের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। চৌকী থেকে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "খবরদার! ও টাকা যদি ফেরৎ দাও তবে তোমার গলা টিপে মারব। করুণার টাকা, আমি ধার নেব, আবার শোধ দেব। আমারই দানের টাকা। ওতে হাত দিলে আমি মরে গিয়েও তোমার ঘাড় মটকাব।"

"মরে গিয়ে তুমি যা পারো তাই কোরো—কিন্তু করুণার নাম দিয়ে এ পাপ আমি জমিয়ে রাখতে পারব না।"

"তুমি কে? তুমি করুণার কে? করুণা তোমার কে?"

"আমি করুণার স্বামী।"

"তুমি আমাকে মারবে পণ করেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু টাকার মার সবচেয়ে বড়ো মার নয়। এখনো সাবধান করছি দাও টাকা, নইলে এমন মার মারব যে সে শেল জীবনে আর তুমি বুক থেকে ওপড়াতে পারবে না।"

"মারো তোমার মার, আমি তোমাকে ভয় করিনে।"

"তবে শোনো আমিই করুণার বাপ।"

"মিথ্যে কথা!"

"কথা আমার মিথ্যে নয়, মিথ্যে তোমার স্ত্রী। চলো তোমার শাশুড়ির কাছে। তাকে দিয়ে তোমার সামনেই আমি বলাব।"

উস্কোখুস্কো চুলে বামাসুন্দরী ঘরের মধ্যে ঢুকল, বললে,—"হ্যাঁ। আমি বলছি তোমার সামনেই, উনিই করুণার বাপ। করুণার টাকায় ওঁরি অধিকার, তোমার নয়।"

"কেন আমার নয়?"

"তোমার বিয়ে বিয়েই নয়।"

"করুণা সব কথা জানে?"

"হ্যাঁ, জানে।"

"জানুক, তাকে আমার ত্যাগ করবার কোনো কারণ ঘটেনি।"

"কিন্তু সে তো তোমাকে ত্যাগ করেছে।"

"করেছে?"

"হ্যাঁ, করেছে।"

"কে বললে?"

"আমি বলছি।"

"এমন কথা নিয়ে বানিয়ে বলবেন না।"

"বানাচ্চি নে; সব তার ফেলে রেখে সে গেছে চলে।"

"মানে কী? কোথায় গেছে?"

"এই দেখো, ছেঁড়া কাগজে কী লিখে আমার ঘরে ফেলে রেখে চলে গেছে। তাকে খুঁজে পাচ্চিনে।"

হরিদাস পড়ে দেখলে,—"মা, আমি আমার বাবার মেয়ে নই, আমি আমার স্বামীর স্ত্রী নই, তা হোলে আর কেন এ বিড়ম্বনা।"

চাটুজ্জের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, বললে—"কী সর্ব্বনাশ! হয়তো সে—"

বামাসুন্দরী মুখের ভাব কঠিন ক'রে বললে, "হ্যা গো হ্যা, হয়তো সে নেই এ জগতে।"

চাটুজ্জে চেঁচিয়ে উঠল, "কী বলো তুমি! নেই! হোতেই পারে না।"

"কেন হোতেই পারে না? কিসের ভয় মরণকে! মায়ের ঘেন্না গায়ে নিয়ে দিনরাত নিজেকে ঘেন্না করবার জন্মে বাঁচতে হবে? মরুক্, মরুক্, অভাগিনী, জুড়োক তার তাপ মা গঙ্গার কোলে। বেঁচে থাকতে হবে আমাকেই, জলতে হবে অষ্টপহর—নইলে প্রায়শ্চিত্তি কিসের?"

চাটুজ্জে হরিপদ দুজনেই ছুটে গেল বেরিয়ে।

বামাসুন্দরী মেজের উপর আছাড় খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

আমার বোটের জানলার ফাঁকে ফাঁকে এতদিন যে ট্র্যাজেডি নিজের স্বরূপ গোপন ক'রে চলেছিল সবার অগোচরে, আজ হঠাৎ সেটা জলে উঠল, আর তখনি চিরকালের মতো গেল নিবে। দুই একটা অঙ্গার যা ধোঁওয়াচ্ছিল তাও দেখতে দেখতে কখন ছাইচাপা পড়ে গেল।

৬

হরগোবিন্দ জলের ধারে সানের উপর চুপ করে বসে আছে। করুণার অন্তর্ধানের কথা কেউ তাকে জানায় নি। ম্লানমুখে ভাবছে আজ সকালে করুণা তাকে চা খাইয়ে গেল না কেন? ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এমন তো একদিনও হয় না, তাই ওর মনে ভারি অভিমান হয়েছে। করুণাকে ওর বিশেষ ফরমাস ছিল কাল ওকে লাউ-চিংড়ি রেঁধে খাওয়াবে; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছে কখখনো খাবে না। আবার সেই সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চে, না খেলে মা করুণার মুখ কী রকম শুকিয়ে যাবে, সে কথা মনে করেই ওর চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে মনে বানাচ্চে করুণা কী রকম সাধাসাধনা করবে, আদর ক'রে ওর চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেবে—বলবে, ইস্, চুলে কী জটা পড়েছে, ব'লে চিরুণী নিয়ে ওর চুল আঁচড়িয়ে দেবে। করুণা ওকে যখন যত রকম যত্ন করেছে ও মনে মনে তারি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। জগতে যত্নের দাবী ওর কেবল ঐ একটিমাত্র জায়গায়, সেইজন্মে একলা বসে মনে মনে করুণার কাছে যত্নের কাঙালপনা করে।

পরনে হাঁটুর উপর খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া—ছুটোই যথেষ্ট ময়লা—রুক্ষ চুল, কামানো হয়নি পাঁচ-ছ' দিন, তাই খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়িতে মুখ ভরা, হাতে একটা বাঁশের বাঁশি। যখন কেউ থাকে না মুখের উপর বিষাদের ছায়া এসে পড়ে—লোকজন দেখলেই চোখ ঘুরিয়ে অন্যরকম চেহারা ক'রে বসেন। চুপ করে একলা যখন বসেছিলেন লোকটিকে মায়া না হয়ে যায় না. আলুথালু বেশভূষা, রুক্ষ চেহারার মধ্যেও বিশিষ্টতার লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে, চোখের চাহনিতে একটি খাঁটি ভদ্রতার ছাপ, তবে মুখের নিচের দিকে নজর পড়লে বোঝা যায় একটা কোথায় দুর্ব্বল প্রকৃতির চিহ্ন আছে। পায়ের উপর পা ঝুলিয়ে হাতে মাথা রেখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মধ্যে অন্তরের সঞ্চিত বেদনার সমস্ত পরিচয় প্রকাশ হয়ে উঠেছিল। পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু বাঁশি খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বকে যেতে লাগলেন:—

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in thy philosophy—বুঝলে কিনা, সেক্স্পীয়র বলে গেছে।—I say, Mr Shakspeare, I congratulate you in thy wisdom, rather I admire your truthfulness. My philosopy Ha, ha, ha, my philosophy! What is in my philosophy? Nothing but Ganges water, the water of Mother Ganges, holy but full of mud, mud and water…Ho, ho, ho! আর তোমাদের বাপু কেমন philosophy! সব philosophy লেখা আছে ঐ John Dickinson-এর লেজারের খাতায়…পাতা উল্টে যাও! দেখোনা উল্টে কেবল L. S. D., বুঝলে ভায়া তাতে philosophy পাবে না। দিনকাল অন্যরকম, এখন শিক্ষাদীক্ষা ভুলে যাও—Politics করো, আমার মতো ঐযে Vagabond Gandhi তার ল্যাজ ধরে ঘোরো।

—এই রকম চলল আধঘণ্টা ধরে—তার পরেই বাঁশিতে থিয়েটারি ঢঙের একটা গৎ বাজাতে লাগলেন। যখন সবাই চলে গেছে হঠাৎ দেখে এক দাড়িগোঁফে আবৃতমুখ সন্ন্যাসী। হরগোবিন্দ বললে "কী, বাবাজি, গাঁজার খোরাক চাই না কি?" লোকটা ওর কানে কানে বললে—

"আমি চাটুজ্জে, গোল কোরো না, ভায়া, একটু স্থির হয়ে বোসো, কথা আছে।"

"বাপরে, ভয় করি তোমার কথাকে আবার নতুন বেশে নতুন কী মতলব এঁটেছ বলো, শুনে যাই। কিন্তু আমি তো এখন মানুষের বাইরে—আমাকে নিয়ে আর টানাহ্যাঁচড়া কেন?"

"বলছি, এ রকম ক'রে আর কতদিন কাটাবে? চলো, কোথাও বিদেশে চলে যাই, সেখানে নতুন করে কী ফন্দ ফাঁদা যাবে।"

"তোমার এখনো প্রাণে সখ থাকে, তুমি যাও। আমার আর কিছুতেই দরকার নেই। দাদা, পরকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, নিজেকে যে দেওয়া যায় না। মা করুণা, আমায় দুমুঠো রেঁধে দিলেই আমার দিন চলে যাবে। করুণাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না। তার হাসিমুখখানা দেখেই আমি সব ভুলে থাকি। এখন যাই তার কাছে"—ব'লে হরগোবিন্দ বাঁশিটা তুলে নিলে—

"মন, কেন উদাসী…"

বাজাতে বাজাতে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাগরণ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ঝনঝনিয়ে বুকের পাঁজর
ব্যথার ঝাঁঝর
উঠ্‌ল যে মোর বেজে,
নাই রে নাই, কোথাও নাই রে সে যে!

উড়িয়ে ধূলি মরুর পরে
ঘূর্ণীভরে
এমনি হঠাৎ বেগে
দমকা হাওয়ার কান্না উঠে জেগে।

তোলপাড়িয়ে স্তব্ধ সাগর
ঊর্ম্মি মুখর
আর্ত্ত অট্টরোলে
কোন্ রোদনের ঢেউ-এর দোলা দোলে?

গুটিয়ে মাথা হাজারমুখী
এই বাসুকী
ছিল মাটির তলে,
তুলল ফণা কোন্ বেদনার বলে?

নীহারপুঞ্জে ঝঞ্ঝাবাতে
বজ্রাঘাতে
নক্ষত্র-নয়ানী
ধূম্রাম্বরা খুলল ঘোম্‌টাখানি।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

মিলনের পূর্ব্বাবস্থায় নায়ক-নায়িকার মনে পরস্পরের দর্শন, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি হইতে যে ভাব বা প্রীতি জন্মায় তাহার নাম রতি। রতি যখন মনের বিভাব-সংবলনের ফলে গাঢ়তর হইয়া আস্বাদময়ী হয়—তখন তাহাকে বলা হয় পূর্ব্বরাগ। সুধীগণ প্রগাঢ় রতির দশ দশা বর্ণন করিয়াছেন। প্রথম লালসা—এই দশায় অভীষ্টপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠে দুর্নিবার। দ্বিতীয় উদ্বেগ—ইহাতে প্রকাশ পায় মনের চাঞ্চল্য। তৃতীয় জাগর্য্যা—ইহাতে ঘটে নিদ্রাক্ষয়। চতুর্থ তানব—এ দশায় দেহ কৃশ হইতে কৃশতর হইয়া চলে। তানবের পাঠান্তর আছে—তাহা বিলাপ। পঞ্চম জড়িমা—তখন আর ইষ্টানিষ্টের জ্ঞান থাকে না—প্রশ্ন করিতে থাকিলেও উত্তর দেয় না। ষষ্ঠ—বৈয়গ্য। ভাবের গম্ভীরতা হেতু যে চিত্তবিক্ষোভ সঞ্জাত হয়—তাহা সহিতে না পারাই এদশার বিশেষত্ব। সপ্তম—ব্যাধি। ইহাতে প্রকাশ পায় বিবর্ণতা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি শারীরিক গ্লানি। অষ্টম—উন্মাদ;—এদশায় প্রিয়ের প্রতি নিবিড় আবেশহেতু অতি-ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। নবম—মোহ। এ দশায় উপনীত হইলে চিত্ত সহজগতি হারাইয়া বিপরীত-গামী হয়—সর্ব্বব্যাপারে বিমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়। দশম—মৃত্যু। প্রিয়সমাগম অসম্ভব প্রতীয়মান হইলে মৃত্যুর উদ্গম হয়। আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের ক্রম আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরাধিকা সহচরী পরিবেষ্টিতা হইয়া ক্রীড়ায় মত্ত। সহসা পূর্ণমাসীদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে নিয়া উপবিষ্টা হইলেন, ও শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও রূপ-ব্যাখ্যান আরম্ভ করিলেন—

কৃষ্ণ বলি এক   রসিক নাগর
গোকুল নগরে আছে॥
তার কি ক'ব রূপের লাবণি।
আমার বচন,   শুনলো সুন্দরী
করহ পিরীতিখানি॥
তোমার যেমন,   নবীন যৌবন
তেমতি রসিকরাজ।
বিধির সংযোগে   হয়েছে মিলন
বুঝিয়ে করহ কাজ॥

তিনি আরও বলিলেন,—

এ নব যৌবন   সুখে গোঁয়াওসি
যদি শ্যামে কর প্রেম॥

ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না—রাধিকাকে বিশেষ করিয়া 'পিরীতি'র মর্ম্মার্থ বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—ত্রিভুবনে পিরীতির অধিক সম্পদ আর কিছু নাই। যে যুবতী রসিক নাগরকে লইয়া পিরীতি-রস পান করে সে অতি সুখে কালযাপন করে। ধর্ম্ম আচরণ কঠিন অনুষ্ঠান,—কিন্তু পিরীতি সংযোগে তাহাও সহজ ও মধুর হইয়া উঠে। পিরীতি সকল রসের সার,—এ রসে অবগাহন না করিতে পারিলে জীবনধারণই বৃথা।

শ্রীরাধিকার যুবতীচিত্তে চঞ্চলতার দোলা লাগিল,—গোকুলনগরের সেই পরম রসিক কৃষ্ণকে দর্শন করিবার কৌতুহল তাঁহার অদম্য হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতে বিলম্ব হইল না—পূর্ণমাসীদেবীর মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের দর্শন সম্ভবপর হইল। দর্শনাশায় যাত্রাকালে শ্রীরাধা,—

নাসা পরশ করি   বলিয়া শ্রীহরি,
বাড়ায় বামপদখানি।
কর্পূর তাম্বুল   লয়ে নানা ফুল,
ক্ষীর সর ছানা ননী॥

শ্রীবৃন্দা-বিপিন রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের স্থান। শ্রীরাধিকার সঙ্গে শুধু সখী বৃন্দা,—অন্য সখীগণ এই প্রথম দর্শন ব্যাপারের অণুমাত্রও জানিলনা—শুনিলনা। ভানুসুতা কম্পিতবক্ষে বিপিনে প্রবেশ করিলে তাঁহার রূপ বনস্থলীকে রূপে, দীপ্তিতে, শোভায়, সুষমায় স্বর্গীয় করিয়া তুলিল। সেই অপূর্ব্ব শোভারাশি দর্শনে শ্যামরায় মদন লালসায় আকুল হইয়া আপনার সম্বিৎ হারাইলেন।

সেই শোভা দেখিয়া নগর কানু।
মদন মোহিত হারায়ে সম্বিত
খসিয়ে পড়িছে বেণু॥

কিন্তু শ্রীরাধিকার অঙ্গ-সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার মূর্চ্ছার অপনোদন হইল। তিনি রাধিকাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—

এসো এসো ধনি! প্রেম বিনোদিনী,
রসবতি রসধাম।
সফল জীবন তুয়া দরশন
তুয়া অনুগত শ্যাম॥

রাধিকা মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু অন্তরে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি জাগিয়া উঠিল,—মনে হইল,—এত রূপ তাঁহার নয়নপথে আর পতিত হয় নাই।

তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন,—কিন্তু গৃহকর্ম্মে আর মনোনিবেশ করিতে পারেন না। সর্ব্বদা মনে জাগিয়া থাকে শুধু কৃষ্ণদর্শনের অদম্য লালসা। তিনি ভাবেন, 'কৌতূহল মিটাইতে যাইয়া এ আমার কি দশা!'

নিরমল গোরা তনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেল ভোর।
তাপ-ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
যব হাম পেখলুঁ গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদন লালসে মন ভোরা॥
অরুণিত নয়নে তেরছ অবলোকনি
সন্ধিযে কুসুমশর সাথে।
জীবইতে জীবনে সেহ নাহি পারলুঁ
ডুবলু পঙ্ক অগাধে॥
(বাসুদেব ঘোষ)

শুধু কৃষ্ণদর্শনই নয় মদনলালসাও তাঁহার অন্তরে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের অরুণ নয়নের বঙ্কিম চাহনি শ্রীমতীকে মন্মথের পঞ্চশরের আঘাত অনুভব করাইতে লাগিল। সেই রসিকের সঙ্গে পিরীতি রসে আপ্লুত হওয়াই হইল তাঁহার চরম পরম ঈপ্সিত বস্তু। অভীষ্টপ্রাপ্তির তীব্র লালসার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার আয়াস-সীমার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল।

সখীগণ শুধু শ্রীরাধিকার এই ভাব লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু শ্রীমতীর নবানুরাগের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিতেছে না। তাহারা আলোচনা করিতে লাগিল,—রাধিকার এ কি ব্যবহার!

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পড়ে॥

শ্রীরাধা লালসা সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। 'এই কৃষ্ণ আসিতেছেন—এই আসিতেছেন' মনে করিয়া লজ্জা ও আশঙ্কা জড়িত পদে ঘরের বাহির হইতেছেন—আবার আশাহতা হইয়া ত্রস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। মেঘের বর্ণ কৃষ্ণ—শ্যামরায়ের বর্ণও কৃষ্ণ—তাই সঞ্চরমান মেঘের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রাখেন—আপনার অলকদাম বেণীমুক্ত করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করেন। রাধিকার চঞ্চলতার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া সখীগণ আবার ভাবেন,—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।

সদাই ধেয়ানে　　চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা।

*　　*　　*　　*

এক দিঠ করি　　ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরখনে ॥

দরদী সখীগণ ভাবে—ব্যাকুলা হয় কিন্তু তাহারা সত্য-তথ্যের সন্ধান পায়না। তাহাদের কল্পনায় স্থান পায়না যে ইহা 'কালিয়া বন্ধুর' সঙ্গে নব পরিচয়ের ফল।

শ্রীরাধিকা সখীগণের নিকট কৃষ্ণদর্শন ব্যাপার আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। তাহাদের প্রশ্নে উত্তর করিলেন,—

কি রূপ দেখিনু　　মধুর মূরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে　　এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার ॥
বড় পিনোদিয়া　　চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চান্দ।
জিনি বিধুবর　　বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফান্দ।
নব জলধর　　বসে চর চর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ　　বজড় কাঞ্চন
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড় ভুরু যেন　　কামের কামান
কে না কৈল নিরমান।
তরল নয়নে　　তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ ॥

সেই অতুল রূপৈশ্বর্য্যের অধিকারীকে একবারমাত্র দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম দর্শনেই তাঁহার মনে 'ভাবের' সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরেও ভাবের আতিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহন সৌন্দর্য্য রাধিকার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। পুনর্ব্বার সেই 'রূপ' দর্শন ব্যতিরেকে তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ প্রশমিত হইতেছে না—শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে না।

রাধিকার উক্তি শ্রবণে সখীবৃন্দ চিন্তাক্লিষ্টা হইয়া উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াস পাইতে লাগিল। চতুরা বিশাখা পটে শ্যামমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বৃষভানুসুতনয়ার নয়ন সম্মুখে প্রসারিত করিতেই—রাধিকার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিলেন। সখীগণ মূর্চ্ছাভঙ্গের উপায়ান্তর না পাইয়া ত্রস্তে কৃষ্ণসকাশে গমন করিয়া বলিলেন—'রাধিকার নিকেতনে আমরা তোমার উপস্থিতি যাচ্ঞা করি। আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া রাধিকাকে ও তথা আমাদিগকে সৌভাগ্যযুক্ত কর।' সমস্ত ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণকে গোচর করাইয়া তাহারা জানাইল যে—রাধিকার পতি-গৃহের পতি পতিমাত্র, সে তাঁহার প্রাণপতি নহে। রাধিকা সেই পতির শব্দ শ্রবণে চমকিত হইয়া উঠেন মাত্র—কিন্তু বাহিরের পথে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শ্রবণমাত্র উন্মত্তা হইয়া ধাবিত হন। তিনি পতির দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না—কিন্তু গোকুলবিহারীর অদর্শনে কৃষ্ণবর্ণ নবজলধর নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকেন,—

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জির রবে উনমতি ধাব ॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর ॥

*　　*　　*

শ্যামিক শয়ন মন্দির নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জে মাহা লুঠই ॥
পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজন আলিঙ্গনই তরুণ তমাল ॥
মুরলি নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই ॥

সখীর এই উক্তিতে রাধিকার লালসা-উদ্বেগ ইত্যাদির বিমিশ্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বরাগের দশ দশা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

রাধিকার ব্যবহারে পূর্ব্বরাগের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন? পূর্ব্বরাগের পরিপক্ক অবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে সকল দশা উপস্থিত হয় তাহা যে সর্ব্বদা বর্ণিতক্রমে ও অবিমিশ্রভাবে প্রকাশ পায় তাহা নহে। কোন কোন স্থলে উহাদের একাধিক দশার যুগপৎ বিকাশ

ঘটিয়া থাকে। ইহা সাধারণ নায়িকার পক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও,—যে নায়িকা প্রিয়তমের প্রথম দর্শনেই আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন—তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। শ্রীরাধিকা এই শ্রেণীর নায়িকা। তাঁহার প্রথম দর্শন সঞ্জাত প্রেমই অতি গভীর—তাঁহার প্রেম সর্ব্বস্বপণ প্রেম—তিনি প্রেমরসসীমা। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে কৃষ্ণ 'পতিঃ পতীনাম্ পরমং পরস্তাৎ।'

লালসোদ্বেগের ফলে রাধিকা সর্ব্বভূতে শ্যামল নিরীক্ষণ করেন। শ্যামরূপ তাঁহার জ্ঞান—শ্যামরূপ তাঁহার ধ্যান হইয়া দাঁড়াইল।

লোচনে শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর॥

এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া সখী কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—'তোমা হইতেই রাধিকার এই অবস্থার কারণ উদ্ভূত হইয়াছে।

তুই মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশিদিন জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়িয়ে সেই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজে উঠয়ে তব রোয়॥
সখিগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাহে ততহি নাহি পায়॥

এই পদ কয়টিতে শ্রীরাধিকার জাগর্য্যাদশার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামরূপ তাঁহার ধ্যানের বস্তু—শ্যামনাম তাঁহার জপমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবার ফলে তাঁহার নিদ্রাক্ষয় ঘটিয়াছে। লালসা, উদ্বেগ, নিদ্রাক্ষয় ইত্যাদির অত্যাচারে রাধিকার মানসিক অশান্তির সঙ্গে শারীরিক ক্লেশও আরম্ভ হইল।

ধূলিধূসর ধনী ধৈরজ না রহ,
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরীভাব হার তেয়াগল
তাপিত তিমিত পরাণে॥

বিগলিত অম্বর সম্বর নাহ ধনি
সুরসুতা স্রবে নয়নে।
কমলজ কমলই কমলজ যাপল
সোই নয়নবর বয়নে॥

ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে দেহ ও মনের অতি সন্নিকট সম্বন্ধ। মনের গ্লানি দেহকেও স্পর্শ করে। রাধিকাও ইহ হইতে মুক্তি পান নাই। এক্ষণে তিনি তানব দশায় উপনীত হইয়াছেন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বরাগের প্রগাঢ়তা এখানেই শেষ হয়না! কৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তিতে শ্রীরাধার অন্তরের জড়িম ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি,
খেলই সহচরী সাথ।
বাউ পটিল তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ॥
শুন মাধব ইথে কাহে বলসি আন।
ও অচপল মতি পুন তাহে কুলবতী,
নীচয়ে তুহু সে নিদান॥
তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলী আলাপলী
মুনিজন মোহন সোয়।
মুরলী নিসান শ্রবণে যবে পৈঠল
তাহি চঞ্চল ভই রোয়॥
তব ধরি জাগর ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিষমে জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কাণ॥

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 'দশা'গুলি ক্রমশঃ একক ষ্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া বিমিশ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অন্তরের বিভাব সংবলনের ফলে শ্রীমতী এদশায় উপস্থিত হইলেন যে এখন আর তাঁহার ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান নাই;—কৃষ্ণপ্রেমে এত জর্জ্জরিত হইয়াছেন যে অন্তর জড়িত হইয়া গিয়াছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষিত হইলেও তিনি নিরুত্তরে উপবিষ্ট থাকেন।

তাঁহার ভাবের গম্ভীরতা গাঢ়তর অবস্থা লাভ করিতেছে; ফলে, নিরতিশয় চিত্তবিক্ষোভ সঞ্জাত হইয়াছে—

কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি।

করতলে সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেলি ॥
* * *
কহতহি গদগদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মঝু শ্যামর দায়।
ইহ দুখ হাম কহিয়ে না পারিয়ে
অদিসমে কে চ বাহিরায় ॥
খেনে করে খেদ খেনে খেনে নিরবেদ
অসূয়াদি কতহুঁ সঞ্চারি।

এই পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে—রাধিকার যে চিত্তবিক্ষোভ জাগরিত হইল—তাহা সহনাতীত। নিরুদ্ধ আবেগের ফলে তিনি ব্যাধির কবলে পতিত হইলেন। সখী তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ
শোধনে দূবরি খীয়ত যৈছন
অসিত চতুর্দ্দশী চান্দ ॥
কবহি গেয়ান শূন হোই চাহই
না চিহুই নিজ সখিবৃন্দ।
রমণিক ভকতি, কতিহুঁ না পেখলুঁ
শুনইতে লাগই ধন্দ ॥

এই ব্যাধি শারীরিক মানসিক উভয়তঃ। শারীরিক ব্যাধির সকল চিহ্ন—বৈবর্ণ্য, উত্তাপ, শীত ইত্যাদি গ্লানি প্রকট হইয়া উঠিল। মানসিক ব্যাধিও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। তিনি আর কত সহ্য করিবেন! সর্ব্বগ্লানি সংমিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল,—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয় ॥
খেনে আকুল খেনে থীর।
খেনে ধাবই খেনে গীর ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত আবেশহেতু রাধিকার অতি-ভ্রান্তি ঘটিতেছে—চিত্ত সহজগতি হারাইয়া বিপরীতগামী হইয়াছে। তিনি কোন ব্যাপারেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছেন না—সর্ব্বদাই বিমনস্কতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সখী খেদোক্তি করিয়া কৃষ্ণকেই ইহার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিতেছে—বলিতেছে—কৃষ্ণ হইতেই রাধিকার এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে—

যব তুয়া নয়ন মুরলি বিস জারল
তব মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণিতল
পরিণয়ে লাগিল শেল ॥
আন উপদেশে তোমারি নামে তৈখনে
দৈবহি উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কাণে সম্ভায়ল
ঐছনে চেতন ভেল ॥

কিন্তু এই চেতনাসঞ্চারের কোন মূল্যই উপলব্ধি করা যাইতেছে না। কেননা, চৈতন্যসম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ তাঁহার দেহমনে বিষক্রিয়া সঞ্চালিত করিতেছে। এই প্রকারে রতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া শ্রীরাধিকাকে দশম দশায় উপস্থিত করিয়াছে,—

লুঠই ধরণি ধরি শোয়।
শ্বাসবিহীন হেরি সহচরী রোয় ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈব সে জান ॥

সখী বলিতেছেন,—'অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি ত্বরায় চল—রাধিকার এ দুর্দ্দশার অপনোদন কর।'

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়া জ্ঞানদাস অতীব মনোরম পদ রচনা করিয়াছেন,—

অপরূপ তুয়া মুরলি ধনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি ॥
কি রূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া জাগিয়া হৈল খীন।
অসিত-চান্দের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ।
অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম।
জীবন ঔষধ তুহারি নাম

শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য—শ্রীরাধিকা আরাধিকা। আরাধিকার নিষ্ঠা পরীক্ষা না করিয়া আরাধ্য তাঁহাকে কৃপা করিবেন কেন? ভাবের কোন পর্য্যায়ে রাধিকা উন্নীত হইয়াছেন তাহাই বিচার করিবার জন্য সেই কপটশিরোমণি চাতুরী-পূর্ব্বক বলিলেন,—

গোপকুমার সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহম্।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহম্॥
সখি পরিহর বচন বিলাসম্
গোপশিশূণাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরু পরিহাসম্॥
যদিচ কলাবলয়াপি কুলস্থিতিঃ
অনয়া পরিহরণীয়া
কিমিতি তদা ময়ি রতি রতি বিকলা
বালে কিল করণীয়া॥

শ্রীরাধিকা সখী হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই বার্ত্তা অবহিত হইলেন,—কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার তখন মহাভাব। এই প্রেমের নিয়ম এই যে অভীষ্ট-অপ্রাপ্তিতেও হার তিরোভাব ঘটেনা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াই চলে। তাই শ্রীরাধিকা বলিলেন,—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো ময়ি যদি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তর কৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিত ভুজা-বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনু॥

যাহা হউক, এই মর্ম্মান্তিক পরীক্ষা রাধিকা উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার ভক্তির—তাঁহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার অনুকূলে আনয়ন করিল। আরাধ্য ও আরাধিকা সম্মিলিত হইলেন।

অধরে অধরে কিয়ে লাগিল দন্দ।
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ॥
এত বুঝি কিঙ্কিনি করত ফুকার।
রাজা মদন না করে পরচার॥
দৃঢ় পরিরম্ভনে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরি ভৈ গেল নব লেহা॥
একহি মানস একহি পরাণ।
পহিলহি হোয়ল রাধা কান॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি করল দুহুঁ তনু এক॥
কহে কবি বল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মুরতি রস অবতার॥

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিচারে সাধারণ পার্থিব—প্রাকৃত প্রেমের বিশ্লেষণ করিলে চলিবেনা। আমরা আগেই বলিয়াছি তাহাদিগের সম্বন্ধ—আরাধ্য আরাধিকার সম্বন্ধ; তাহাতে আবার শ্রীরাধিকা 'নিত্যসাধিকা'। ইহাদের লীলা অনুষ্ঠানকে সর্ব্বৈব ইতিহাস বলা ভ্রমাত্মক। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইহার কতক ইতিহাস—কতক রূপক। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন—কারণ উক্ত আছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।' আর রাধিকা 'ভাবিনী ভাবের দেহা' অর্থাৎ তিনি Person নন—Principle.

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম কল্প—প্রত্যাবর্ত্তন

জেলাপের পথে

১৭ই অক্টোবর প্রাতে আমাদের রওয়ানা হবার কথা। আসবার সময়ে আমরা গ্যাণ্টক হ'তে নাথু-লার উপর দিয়ে
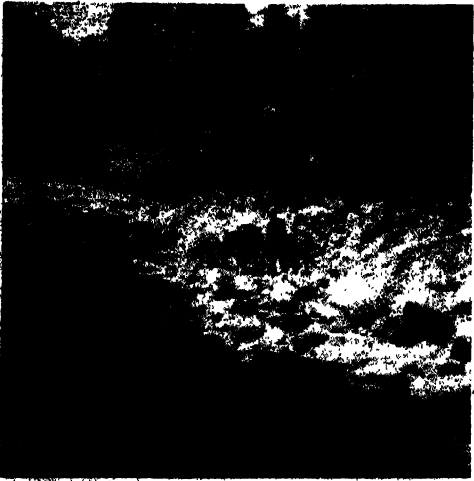
প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

এসে ইয়াটুংএর চার মাইল পূর্ব্বে Kalimpang Lhasa Trade Route এ পড়েছিলাম, ফেরবার পথে জেলাপ-লা দেখ্‌বো বলে আমাদের ঐ Trade Route ধরে বরাবর জেলাপ-লার উপর দিয়ে গিয়ে, কুপুপ নামক ডাকবাংলোয় প্রথম ডেরা করবার কথা। আসবার সময় এক ডাকবাংলো হতে অপর ডাকবাংলোর ব্যবধান দশ-এগারো মাইলের বেশী ছিলনা। কিন্তু ইয়াংটুং হতে কুপুপ আঠারো মাইল। এই আঠারো মাইল পথ সূর্য্যাস্তের আগে শেষ করতে হবে বলে আমরা অত্যন্ত প্রত্যুষে ঠিক সাড়ে-ছটায় যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনদিনের বিশ্রামের পর ভোরে উঠে যাত্রার

রিঞ্চিংপং-গ্রাম

আয়োজন করতে কারও আর ক্লান্তি বোধ হয়নি। পাঁচ মাইল দূরে রিনচিংপং গ্রামে আমরা পূর্ব্বোক্ত পথ ছেড়ে জেলাপ-লার পানে চললাম। এখান হ'তে আর একটি পথ ভুটান অভিমুখে গেছে। আমাদের দুদিন আগে গভর্ণর বাহাদুর ঐ পথ দিয়েই ভুটান হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন

মেষপালিকা পার্ব্বত্যবালিকা

ফিরেছেন। তিনি ঐ গ্রামের মধ্যে দিয়েই গেছলেন। রিনচিংপং মাঝারি আকারের গ্রাম। বাজারের মধ্যে যেখানে আমরা বিশ্রাম করছিলাম সেখানে এক বিশ্রী দৃশ্য দেখলাম। বড় বড় চমরী গাইয়ের মুণ্ডু বাইরেই টাঙ্গান রয়েছে। শুনলাম যে শীতের মুখে নাকি তিব্বতীয়েরা এই সব পশু মেরে সারা বছর ধরে তার শুকনো মাংস খায়। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। বলবার কিছুই নেই।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রীগণ

রাস্তা কয়েকমাইল বেশ সমতল পেলাম তারপর পথ আমো-চু নদীর তীর ছেড়ে ঘনবনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গায়ে চড়্‌তে আরম্ভ করল। এই ইয়াটুং হ'তে জেলাপ-লার আঠারো মাইল পথ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সব চেয়ে ভীষণ চড়াই। স্থানে স্থানে মাইলের পর মাইল শুধু ভাঙ্গা পাথরের উপর দিয়ে চলেছি। পথের রেখা পর্য্যন্ত ছিলনা। কোথাও বা আমাদের পথ ইস্ক্রুপের পাকের মত একটা খাড়া পাহাড়কে জড়িয়ে চড়ে গেছে। এব সব ভয়ানক পথে চড়বার সময় বুঝেছিলাম যে মিউল মানুষের কি রকম বন্ধু!

জেলাপের পথে

আশ্চর্য্য জানোয়ার! অদ্ভুত তাদের পায়ের শক্তি। এই সরু রাস্তা দিয়ে এতো মাইল তো গেলাম, কিন্তু একটিবারও কোন মিউলের পদস্খলন হয়নি। ভবিষ্যতে আর কখনও খচ্চর কথাটার মানে যে নীচ, হেয়, তা সহজে মেনে নেব না। সন্নিবিষ্ট কয়েকখানা চিত্র হ'তে পাঠক পথের কতকটা যাহোক ধারণা করতে পারবেন। এই পথের মধ্যে একস্থানে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখলাম। পিন্টু বললেন যে, Younghusband-এর যুদ্ধাভিযানের সময় এই দুর্গে সেনানিবেশ করা হয়েছিল। দুর্গ প্রথমে তিব্বতীয়দের দখলে ছিল। পরে বৃটীশদের করতলগত হয়। এইভাবে চলতে চলতে ও মধ্যপথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে করতে বেলা প্রায় দেড়টার সময় জেলাপ-লার সর্ব্বোচ্চ শিখরে এসে

জেলাপ-লা

পৌঁছলাম। আগেই বলেছি জেলাপ-লার উচ্চতা ১৫১০০ ফুট। নাথু-লার তুলনায় জেলাপ-কে তবু কতকটা পাহাড়ের ঘাঁটি বলে মনে হয় জেলাপের কাছাকাছি হ'লে দেখা যায় যে তিব্বতের দিকে ও ভারতবর্ষের দিকে দু'দিকই পথ কি রকম বন্ধুর। যেমন জেলাপের পৌঁছবার দুমাইল আগে হতে খাড়া পাহাড় চড়তে হয়েছিল, তেমনি জেলাপ থেকে ভারতবর্ষের দিকেও প্রায় দুমাইল খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে হয়েছিল। নামবার সময় এই দুমাইল আমরা মিউল থেকে নেমে হেঁটেই গেছলাম। যেখানে

কুপুপ ডাকবাংলা

যেখানে নামবার মুখে অত্যন্ত ঢালু রাস্তা পেয়েছি, সেই খানেই আমরা এই রকম করেছি। এই রকমে বেলা তিনটার সময় আমরা পৌঁছলাম কুপুপ ডাকবাংলোয়। এই ডাকবাংলোটি অবস্থিত অনেকটা ফাঁকা ও খোলা উপত্যকাভূমিতে, বড় বিশ্রী বাংলো। নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। তবে আমরা তখন ঘরমুখো। কোন রকমে এক রাত্তির কাটিয়ে পরদিন প্রাতে পাঁচটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। কুপুপ হ'তে ইয়াটুংএর দিকে Kalimpong-Lhasa Trade Route চলে গেছে, বেশ দেখতে পেলাম। ভারতবর্ষের দিকে এই Trade Route বেশ প্রশস্ত ও খুব ভাল অবস্থায় আছে। তিব্বতের সীমান্ত
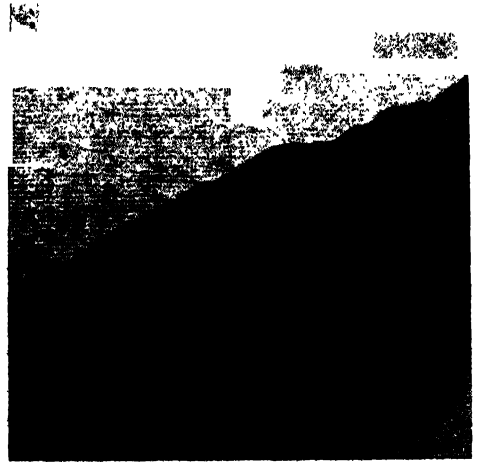
দূরে পথের রেখা

পর্য্যন্ত মটর চলাচলের ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। স্থানে স্থানে পথকে কেটে আরও চওড়া করা হচ্ছে। আমরা সে পথ ছেড়ে এখান হ'তে একটি চারমাইল যে ছোট পথ গ্যাণ্টক-নথুলা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে চললাম। বেলা এগারোটার মধ্যেই পূর্ব্ব-পরিচিত পথে পড়ে বেলা একটার মধ্যে চঙ্গু ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম। চঙ্গু থেকে কর্পোনাং এবং কর্পোনাং হ'তে গ্যাণ্টকের পথে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী লিখে আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করবনা। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণপঞ্জী অনুসারে আমরা প্রতিস্থানে পৌঁছে ২০শে অক্টোবর গ্যাণ্টক ও ২১শে অক্টোবর কালিমপংএ নির্ব্বিঘ্নে ফিরলাম।

অনেক দিনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হোল। (সমাপ্ত)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

সুশান্ত সা'
দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এট্-ল

৬

মাঘ মাসের গোড়াতেই মহাল পর্য্যবেক্ষণে বেরিয়ে, মফঃস্বলের কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে এলাম, ফাগুনের ৮ই ৯ই। ফাগুন মাসের শেষাশেষিই মাকে নিয়ে কাশী রওনা হলাম।

*　　*　　*

সেদিন রাত্রে মুকুন্দদের বাড়ীতে তুষারকে আনতে গিয়ে প্রাণের মধ্যে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, তার বোঝাপড়া নিজের প্রাণের মধ্যে নিজেই করে নিয়েছিলাম বাইরের কারুরই সাহায্য নি নাই—এমনকি তুষারেরও নয়। সেদিনকার ব্যাপারটা নিয়ে তুষারের সঙ্গে আমার আলোচনা যে একেবারেই হয়নি, এমন নয়। তবে দুএকদিন অবশ্য কোনও কথাবার্ত্তা হয়নি,—আমিও কিছু বলিনি, সেও চুপ করেই ছিল। আঘাতটা পেয়েছিলাম একটু—গুরুতর রকমেরই, তাই সেই বেদনায় প্রাণখানা ছিল ভরা, রাগ অভিমানের বিশেষ কোনও ঠাঁইই ছিল না প্রাণে। তাই বোধহয় নিজের ব্যথায় নিজেই অস্থির হয়ে বেড়িয়েছি, তুষারের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও বোঝাপড়া করার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আমার হয়নি। তুষারও নিশ্চয়ই আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু সেও যেন কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। নেহাত প্রয়োজনীয় ছাড়া আমার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তাই বলেনি, দু একদিন। তবে এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে ব্যবহারে আমার প্রতি তার কোনও রাগ বা অভিমানের প্রকাশ ত ছিলই না বরং প্রত্যেক পদে পদে আমার মনকে শান্ত করে তোলবার জন্য সে যেন প্রাণপাত করতে পর্য্যন্ত রাজী—এমনই একটা নীরব মাধুর্য্যে ভরে উঠেছিল তার সমস্ত ব্যবহার আমার প্রতি। প্রথম, ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল আমাদের মধ্যে, ব্যাপারটা ঘটবার ২।৩ দিন পরে। কথাটা প্রথমে কে তুলেছিল, আমার মনে নাই। তবে তুষারের কথাগুলি আমার আজও মনে আছে। আমার মনোভাবের একটু ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সহজ সরল শিশুর মতন সে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে যে কোনও দোষ করেছে—এ যেন সে ধারণাই করতে পারেনি। রোগীর যন্ত্রণার কথা শুনলে সে কোনও দিনই নিজেকে সামলাতে পারেনা, তাই সে ছুটে গিয়েছিল মুকুন্দদের বাড়ীতে, ভুলেই গিয়েছিল আমার নিষেধবাণী। এবং সে কল্পনাও করতে পারেনি যে আমার নিষেধের মধ্যে এতখানি নিষ্ঠুরতা থাক্‌তে পারে যে অসুখে বিসুখে পর্য্যন্ত সে নিষেধের ব্যতিক্রম হবেনা। আর মুকুন্দর স্ত্রীর অসুখের শুশ্রূষার সঙ্গে মুকুন্দর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তার বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলাটা নেহাত অভদ্রতা, তাই তার সঙ্গে দুএকটা কথা বলতে সে বাধ্য হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা—তার স্বভাবে কেমনই একটা দুর্ব্বলতা আছে যে অতি সহজেই সে লোকের অপরাধ ক্ষমা করে ফেলে, ক্ষমা চাইবারও অপেক্ষা রাখে না। লোকের চরিত্রের কুৎসিত দিকটা প্রাণে প্রাণে চিরদিন সে

পোষণ করে রাখতে পারে না—তার চাইতে ত মরে যাওয়াই ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দিলে, তার মুকুন্দদের বাড়ীতে যাওয়ার মধ্যে যে কোনও দিক দিয়ে আমাকে এতটুকু অপমান করা হয়েছে—এটা সে একেবারেই বুঝতে পারেনি। তার বুদ্ধিই বা কতটুকু। নইলে আমার সম্মান যে সকলের উপরে—সেই ত তার মাথার মণি।

এসব কথায় মন কি সায় দিয়েছিল? সায় যে দিয়েছিল এমন কথা বল্‌তে পারি না, কিন্তু মন কতকটা শান্ত হয়েছিল—এটা নিশ্চয়। বিশেষ করে এই সব কথা বলতে বলতে সে যখন আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল—আমি একটু যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। একবার ভেবেও ছিলাম—হয়ত বা তুষারের প্রতি আমি নিদারুণ অবিচারই করেছি। যাই হোক, ফলে দু তিন দিন পরে একটা হাল্‌কা মন নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

কিন্তু ভোর হতে না হতেই চম্‌কে ঘুম ভেঙ্গে গেল—এ কদিন ধরে রোজই যেমন হচ্ছে। কে যেন বুকের উপর একটা সজোরে ধাক্কা মেরে ঘুমটা দিলে ভাঙ্গিয়ে—একটা অসহনীয় ব্যথায় বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠ্‌ল। শোবার ঘরের জানালা খোলাই ছিল, বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম—অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভোরের আভাস সবে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে মাত্র, সমস্ত জগৎ তখনও সুষুপ্ত। ব্যথাটাকে বুকের মধ্যে চেপে প্রাণপণ শক্তিতে আবার ঘুমুবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু চোখ্ দুটো তখন এক মুহূর্ত্তে একেবারে শুকিয়ে এমন হাল্‌কা হয়ে উঠেছে যে তাকে চেপে বুজিয়ে রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। চোখ চেয়ে জানালার দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলাম।

আমার পাশেই তুষার অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। দেহ থেকে লেপ কতকটা সরে গেছে—অসংযত তার বসন, আলুলায়িত তার অঙ্গভঙ্গী। তার দিকে চাইতেই কেমন যেন প্রাণমন দেহ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। নিজেকে বোধহয় একটু সরিয়েও নিয়েছিলাম।

তুষার অবিশ্বাসিনী! না—না—এযে অসম্ভব। অসম্ভব—অসম্ভব—বারে বারে মনকে বোঝাই অসম্ভব, কিন্তু মনের মধ্যে ত জোর পাই না। তুষার,—আমার স্ত্রী তুষার, আমারই বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী—নিজের কাছে নিজের এতখানি অপমান কিছুতেই সইতে পারলাম না।

আজও ভোর হতে না হতে সুরু হল আবার সেই অসহ সেই মর্ম্মবেদনা—এ কদিন ধরে যা আমাকে তিলে তিলে পীড়া দিয়েছে, বিষে বিষে ভরিয়ে দিয়েছে সমস্ত প্রাণখানা। মনকে চাবুক মেরে বল্‌লাম—এ তোমারই দৈন্য। কিন্তু আমার মনের অহঙ্কারের সীমা পরিসীমা নাই। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে তোমার স্ত্রীর সীজারের (Ceaser) এর স্ত্রীর মত হওয়া উচিত, সন্দেহ তাকে স্পর্শই বা করবে কেন।

বেলা হল। রোদ উঠ্‌ল। সমস্ত জগৎখানি মুখর কলরবে উঠ্‌ল জেগে। এটা ওটা সেটা নানান কাজে মনটাকে অন্যমনস্ক করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু অন্যমনস্ক হইও বা যদি, থেকে থেকে চম্‌কে উঠি। বুকের মধ্যে যে বিষধর সাপ বাসা বেঁধেছে, বাইরের কাজে কি তার দংশনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল, এবং যতদূর মনে পড়ে ৭।৮ দিন পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনকে দমন করতে পেরেছিলাম কিনা জানিনা, তবে অবসন্ন মন কিছুদিন পরে নিজেই যেন নিজের কাছে পরাস্ত হল। দংশনে দংশনে সাপের দাঁতের বিষ গেল ফুরিয়ে।

ভাবলাম, অবসন্ন মন যদি অবসন্নতায় ঘুমিয়ে পড়ে ত—পড়ুক। তাকে জাগিয়ে ত কোন লাভ নেই। আর তার প্রয়োজনই বা কি। তুষারের নিখুঁত মধুর ব্যবহারের মধ্যে প্রাণ আবার সহজেই যেন আশ্বস্ত হল।

আশ্বস্ত ত হল। তুষারের ব্যবহারের মধ্যেও ত এতটুকু ত্রুটী কোথাও ছিল না। তবুও আমার মফস্বলের যাওয়ার দিন যত ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, ততই প্রাণের মধ্যে ক্রমেই একটা অস্থিরতা অনুভব করতে লাগ্‌লাম। কেমন যেন তুষারকে বাড়ীতে রেখে যেতে মন সায় দেয় না। যদিও ঠিক করে নিয়েছিলাম যে সেদিনকার রাত্রের মুকুন্দদের বাড়ীর ব্যাপারটার বিষয় আর একটুও ভাবব না, ব্যাপারটা একেবারেই ভুলেই যাব, তবুও সেই মুকুন্দদের বাড়ী, সেই

তুষার, কেমন যেন এদের সব একই জায়গায় ফেলে আমার দূরে চলে যেতে প্রাণ কিছুতেই এগুচ্ছিল না। তাই যখন শুনলাম, মুকুন্দও মফস্বলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সত্য-সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিলাম। এবং আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই রকম করে যাওয়াটা দিন ৫।৭ পেছিয়েও দিয়েছিলাম যতদিন না মুকুন্দ সত্যসত্যই রওনা হয়ে গেল।

* * *

মফস্বল থেকে ফিরে আসার পর, মা-ই প্রথম কাশী যাওয়ার কথাটা তুললেন। বললেন "সুশন! এইবার ত তোর মফস্বলের কাজ শেষ হয়েছে—এইবার আমি কিছু দিনের জন্য কাশী ঘুরে আসি।"

কেমন যেন মার কাশী যাওয়ার কথা উঠলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। কারণ এ নয় যে মাকে ছেড়ে কিছু দিন থাকতে আমার কষ্টের কোনও কারণ ছিল; তবুও মা চলে যাওয়ার কথা উঠলেই কেমনই মনে হত—মার এ সংসারে শান্তি নেই বলেই মা সরে যাইতে চাইছেন। এবং এ সংসারে শান্তি নেই কেন? কারণ অনুমান করাও আমার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। আমার কোনও অপরাধ ছিলনা, তবুও কেমন যেন নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হত।

বললাম "বেশ ত! আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কাশী বেড়িয়ে আনব।"

মার মুখে হাসি ফুটল।

বললেন "বেশত—সে ত ভালই হয়। কিন্তু তোর এদিক ছেড়ে কি যাওয়া চলবে! বউমা রয়েছে।"

বললাম "তা আর কি! সবশুদ্ধই চলনা কিছুদিন কাশী থেকে আসি। ললিত ত কাশীতেই আছে। আমি বরং তাকে একখানা চিঠি লিখে দি, আমাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করতে।"

আমারই সেই কলেজের বন্ধু সুলোচনা দিদির ভাই ললিত এখন কাশীতে ডাক্তারী করে।

মা কিন্তু কথাটা শুনে শুধু একবার বললেন, "বেশত" বিশেষ যে কিছু আগ্রহ দেখালেন এমন নয়।

কেন যে মার আগ্রহের অভাব হল তা বুঝতে আমার একটুও দেরী হল না। বুঝলাম তুষার যে সঙ্গে যায়, এটা মার মোটেই ইচ্ছা নয়। কাশীতে গিয়ে মা দিন কতক সমস্ত অশান্তি থেকে নিরিবিলি একটু দূরে থাকতে চান।

কথাটা সমস্ত দিন মনের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগল। এক একবার মনে হল মার যখন ইচ্ছে নয় তুষারকে সঙ্গে নিয়ে কাশী যাওয়া, তখন তুষারের সঙ্গে না যাওয়াই ভাল। মাকে দিনকতক নিরিবিলি থাকতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু তুষারের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যই মা গিয়ে কাশী বাস করবেন, আর আমিও মাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ীতে তুষারকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরকন্না করব—ভাবতেও মনে যেন কেমন একটা ব্যথা পাচ্ছিলাম, ভাল লাগছিল না। মা এমনি গিয়ে কিছুদিন দূরে কাটিয়ে আসতেন, আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু তুষারের জন্য মাকে দূরে সরিয়ে দিতে আমারই মনে যেন আত্মসম্মানে ঘা লাগল। অথচ কি করি তুষারকেও ত ছাড়া যায় না।

যাই হোক মার কাশী যাওয়ার যখন এত আগ্রহ, তখন তা বন্ধ করা কোনও মতেই চলে না। যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই এই ভেবে বাড়ী ঠিক করবার জন্য ললিতকে চিঠি লিখে দিলাম।

ব্যবস্থা হল—সবদিক দিয়েই আমার মন তাতে সম্পূর্ণ সায় দিল। কদিন ধরে কেবলই ভাবছি কেমন করে আমার মনের সঙ্গে মিলিয়ে মার কাশী যাওয়ার একটা সুব্যবস্থা করি, এমন সময়—ললিতকে চিঠি লেখার ৫।৬ দিন পরে তুষারের বাপের বাড়ী থেকে খবর এল, তুষারের মার শরীর বিশেষ খারাপ; তিনি তুষারকে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দিতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। খবর নিয়ে এল, তুষারেরই সম্পর্কে একটী খুড়তুতো ভাই—বয়স বছর ২৫।২৬, নাম জলধর। এ একেবারে তুষারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

আমার মত না দেওয়ার কোনও কারণ নেই, এবং মাও কোনও অমত করলেন না। ২।৩ দিনের মধ্যেই তুষার বাপের বাড়ী রওনা হয়ে গেল।

তুষার বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন কাতর

ভাবে একবার আমার দিকে চেয়েছিল। বলে গেল— রীতিমত যেন তাকে চিঠিপত্র লিখি, এবং কাশী থেকে ফিরে এসেই যেন লোক পাঠিয়ে তাকে আনাই, দেরী যেন না করি।

তার সেই করুণ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে আমার মনটায় হঠাৎ কেমন যেন একটা কষ্ট হয়েছিল—আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হল অভাগিনী এতটুকুও বুঝতে পারলে না যে তার এই সময় চলে যাওয়াটা আমাদের বাড়ীর দিক দিয়ে, বিশেষ করে আমার মনের দিক দিয়ে কতখানি বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। তার চলে যাওয়ার দরুণ, এতটুকু ব্যথা, এতটুকু অতৃপ্তি আমাদের বাড়ীর, কৈ, কোথাও ত একটুও লক্ষ্য করা গেল না। চারিদিকেই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস।

তুষার চলে যাওয়ার দিন সাতেক পরেই কাশী রওয়ানা হলাম। দাদা কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। বললেন—তাঁর বইখানা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এ সময় তিনি নিরিবিলি বাড়ীতেই থাকতে চান। দূরে গিয়ে নিজের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে তিনি রাজী নন।

* * *

মাকে নিয়ে কাশী এসে পৌছলাম একদিন সকাল বেলায়—এই বেলা ৮টা আন্দাজ। এর আগে জীবনে আর একবার মাত্র কাশী এসেছিলাম, যখন কলেজে পড়ি—বাবা মার সঙ্গে। সেবার কাশী যে বিশেষ ভাল লেগেছিল বলতে পারিনা, কিন্তু এবার কাশীতে দিনকতক বাস করে সত্য সত্যই বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কাশী, ভারতের মহামানবের পুণ্যতীর্থ কাশী,—তার মধ্যে যে কি আছে সেটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, বোঝান যায়না। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কাশীতে দেখার মত বিশেষ কিছুই নেই—অপরিষ্কার ধূলোয় ভরা আঁকাবাঁকা সব রাজপথ, সারি সারি বড় বড় এলো মেলো সব অট্টালিকা—তার না আছে কোন কারুকার্য্যের শ্রী, না আছে কোন সামঞ্জস্যের ছন্দ, ছড়ান ছড়ান জীর্ণ খোলার বস্তি—ইতর—অপরিচ্ছন্নতার বৈষম্যে ভরপুর, হরেকরকম লোকজন, হরেকরকম জিনিষের দোকান পাট হাট বাজার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তবুও কাশী—কাশী। অপরাহ্নে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বেড়াতে বেড়াতে উচ্চশীর কাশী নগরটার দিকে চেয়ে চেয়ে একাধিকবার মনে হয়েছে, —এ যেন এক রুক্ষ নগ্ন, তপস্যারত সন্ন্যাসী, উর্দ্ধবাহু, ধ্যানস্থ; আধুনিক কালের সমস্ত জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র—আত্মসমাহিত নিজেরই পরিপূর্ণতায়। এ যুগের মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, আধুনিক সভ্যতা সবই যেন অনিত্য তুচ্ছ— নিত্যরসের পুণ্যামৃত কাশীর মধ্যেই চিরনূতন চিরসরস। মনে হয়েছে—সনাতন আদি যুগের মহামন্ত্রটী অমর হয়ে বাঁধা পড়েছে কাশীর আকাশে বাতাসে, কাশীর ঐ সব সরু সরু গলি পথের মধ্যে কাশীর মন্দিরে মন্দিরে, গঙ্গাবক্ষে, চিরদিনের জন্য চিরকালের জন্য।

ললিত ষ্টেশনে এসেছিল—আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে। বললে—

"এ বেলাটা আমার ওখানেই চল। তোমাদের জন্য যে বাড়ী ঠিক হয়েছে, খাওয়া দাওয়া করে বিকেল বেলা সেখানে যেও।"

এক্কা যোগে ষ্টেশন থেকে ললিতদের বাড়ী এসে পৌছলাম। গোধূলিয়ায় বড় রাস্তার উপরেই একটী ছোট জীর্ণ দোতালা বাড়ীর সামনে এক্কা এসে দাঁড়াল। এইটে ললিতের বাড়ী। নীচের তলায় বড় রাস্তার উপরে বাইরে একখানি ঘর—ললিতের ডাক্তারখানা। এই ঘরটীর পাশ দিয়ে একটী সরুপথ—অন্দর মহলে যাওয়া যায়। আমাদের এক্কা এসে দাঁড়ান মাত্র কতগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছুটে এল বাড়ীর সদর দরজার কাছে—রাস্তার ধারে। এবং তাদেরই পিছনে এসে দাঁড়ালেন একটী মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক, একটু অতিরিক্ত স্থূলকায়া। পরিধানে তাঁর একখানি চওড়া লালপেড়ে মিহি তাঁতের সাড়ী, দুইহাতে কব্জীর কাছে ঝক্ ঝক্ করছিল একরাশ সোণার চুড়ী—উজ্জ্বল গায়ের বর্ণের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল।

আমরা নেমে অন্দরের পথে প্রবেশ করতেই মহিলাটী হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে সুশান্ত! কেমন আছিস? চিনতে পারছিস ত?"

"সুলোচনা দিদি যে" তারপর ললিতের দিকে চেয়ে

বললাম "বারে—ললিত। তুই এতক্ষণ বলিস্‌নি, সুলোচনা দিদি এখানে আছেন।"

ললিত একটু হেসে বললে "দিদিইত মানা করে দিয়েছিলেন—বলতে।"

সুলোচনাদিদি বললেন—'ইনি তোর মা বুঝি সুশান্ত? আসুন মা, ভেতরে আসুন। আপনার সঙ্গে ত কখনও আমার দেখা হয়নি, কিন্তু সুশান্তর কাছে আপনার কথা কত শুনেছি। সুশান্তকে ত আমি পর মনে করিনা। আমার কাছে ললিতও যা—সুশান্তও তাই।"

এ ধরণের কথা সুলোচনাদিদির মুখে আগেও অনেকবার শুনেছি। কলকাতার কলেজ জীবনে অবশ্য সুলোচনাদিদির আন্তরিক স্নেহের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি এবং চিরকালই সুলোচনাদিদির এই ধরণের কথাবার্ত্তায় এমনই একটা স্বচ্ছ সরলতার অভিব্যক্তি ছিল যে সুলোচনাদিদির এসব কথা একটা অতিরিক্ত বাহুল্য বা অতিরঞ্জিত ভদ্রতা বলে কোনও কালেই মনে হয়নি।

সুলোচনাদিদি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তা, বউকে সঙ্গে আনিসনি সুশান্ত?"

আমি বললাম "না। তার আসা হলনা। হঠাৎ তার মার অসুখ করাতে বাপের বাড়ী যেতে হল।"

সুলোচনাদিদি সত্যই যেন বিশেষ দুঃখিত হলেন। বললেন "ও। আমি কত আশা করে বসে আছি সে আসবে। কটা দিন তাকে নিয়ে আমোদে কাটাব। কতদিন তাকে দেখিনি—নাজানি এখন দেখ্‌তে কি ভালই হয়েছে।"

সুলোচনাদিদির সঙ্গে তুষারের অবশ্য পূর্ব্বেই আলাপ হয়েছিল। আমার বিবাহের বছর দেড়েক বছর দুই পরে, সুলোচনাদিদির বিশেষ অনুরোধে একবার তুষারকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম। উঠেছিলামও ললিতদের বাড়ীতেই।

সুলোচনাদিদির আদর যত্নে সমস্ত দিনটা চমৎকার কাটল। নানান কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সুলোচনাদিদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই না আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত কথাই না আমাকে বল্‌লেন। ললিতের স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা, মা নাই, তাই সুলোচনাদিদি এলাহাবাদ থেকে ভাইয়ের বাড়ীতে এসে কিছুদিন আছেন। সুলোচনাদিদির দুটী ছেলে দুটী মেয়ে। ছোট ছেলেটীকে এবং মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, বড়দের রেখে এসেছেন এলাহাবাদে—সেখানে তাঁর শাশুড়ী আছেন কিনা। তা, শাশুড়ী ছেলে মেয়েদের যত্ন করেন খুব। সে বিষয় সুলোচনাদিদি নিশ্চিন্ত। তা, এদিকে কাশীতে তাঁকে ত মাঝে মাঝে আস্‌তেই হয়, কেননা সময়ে সময়ে ললিতের সংসার প্রায় অচল হয়ে ওঠে। বউটা—নাম তার নলিনী,—সে ত একরকম চিররুগ্না। তার উপরে, মা ষষ্ঠীর অযাচিত কৃপায় ললিতের স্ত্রীর সুস্থ হয়ে সহজ মানুষের মত জীবনযাপন—এত ললিতের আত্মীয়স্বজন বাড়ীর লোকজন একরকম ভুলেই গিয়েছে। এক ফাঁকে মাকে বললেন, আমার কানে গেল, "তা সুশান্তর ছেলেপুলে হলনা, এ কি রকম অন্যায় কথা। আপনি কোনরকম শান্তিস্বস্ত্যয়ন—যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করুন।"

খাওয়া দাওয়া সেরে গুছিয়ে গাছিয়ে নিজেদের ভাড়াটে বাড়ীতে যেতে বিকেল হল। যাওয়ার সময় সুলোচনাদিদি বললেন "তা আলাদা বাড়ী না করে কিছুদিন এখানে থাকলেই ত বেশ হত।"

ললিতের স্ত্রী একটু আড়াল থেকে ঈষৎ চাপা গলায় বল্‌লে "আমাদের ত ভালই হ'ত। যে ছোট বাড়ী ওঁদেরই কষ্ট হত।"

বাঙ্গালীটোলায় দশাশ্বমেধ ঘাটের খুব কাছাকাছি আমাদের জন্য একটী ত্রিতল অট্টালিকা ভাড়া করা হয়েছিল। দোতালা এবং তিনতালাটা আমাদের ব্যবহারের জন্য এবং একতালায় বাড়ীওয়ালা থাকতেন। দোতালায় চারখানা ঘর এবং তিনতালায় রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, আরও একখানি ঘর এবং ঘরগুলির সামনে একটী বারান্দা। একটী রাহ্মণী এবং একটী দাসী আগে থাকতেই ললিত বন্দোবস্ত করে রেখেছিল—আমাদের সেবার জন্য।

আমাদের বাড়ীওয়ালার পরিবার অতি ছোট। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী এবং এই কুড়ী একুশ বছরের তাঁদেরই একটী সধবা কন্যা। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী মুঙ্গেরে সরকারী কি কাজ করতেন, অবসর নিয়ে কাশীতে এই বাড়ীখানি ক্রয়

করে, বৃদ্ধ বয়সে এখানেই বসবাস করছেন। দুচার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এই মেয়েটীর জীবন ঠিক সাধারণ নয়—একটু রহস্যজড়িত। প্রথম থেকেই মেয়েটী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং প্রথম থেকেই কেমন আমার মনে হয়েছিল যে মেয়েটীর সুন্দর নয়ন দুটীর সুগভীর বিষণ্ণতা যেন একটু অস্বাভাবিক। মেয়েটী সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী, নিটোল স্বাস্থ্যে লাবণ্যময়ী। কেন জানিনা, মেয়েটীর ধরণে ধারণে, ভাবে ইঙ্গিতে, শান্ত সমাহিত তার ভঙ্গিমায়, আভাস পেতাম কি যেন একটা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি—যেন কোথায় কবে এর সঙ্গে একটা পরিচয় ঘটেছিল আমার জীবনে।

কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটীর জীবনের রহস্য আমার কাছে প্রকাশ হল। মেয়ের মা-ই আমার মার কাছে সব গল্প করেছেন। মা একদিন রাত্রে আমার কাছে সব খুলে বললেন। মেয়েটীর বেশ ভাল ঘরে, ভাল ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের বছর ৪।৫ পরে, মেয়েটীর বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর, তখন হঠাৎ তার স্বামী এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মেয়েটীর বাপ সরকারী কাজ হতে দীর্ঘ ছুটী নিয়ে জামাইয়ের অনেক সন্ধান করেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপর কাজ হতে অবসর নিয়ে, মেয়েটীকে সাথে করে এসে কাশী-বাসী হন। এই কাশীতেই বছরখানেক হল জামাইয়ের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি এখন একজন মৌন নগ্ন সন্ন্যাসী—মুনিকর্ণিকার ঘাটে দিনরাত বসে থাকেন। অনেক অনুনয় বিনয় কান্নাকাটী কিছুতেই তাঁকে ফেরান গেলনা। প্রতিদিন ভোরে রাত্র প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাপ মেয়েকে নিয়ে মুনি-কর্ণিকার ঘাটে যান। সেখানে গঙ্গাস্নান করে মেয়েটী স্বামীর পা পূজা করে। পূজান্তে সন্ন্যাসী নাকি রোজ মেয়েটীর মাথায় একবার হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেন—এইমাত্র; কোনও কথা বলেন না। মেয়েটী যদিও সধবা, আসলে ব্রহ্মচারিণীর মতনই থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারিণীর নিয়ম কানুন সব পালন করে, মাছ মাংস স্পর্শও করেনা। মা বললেন "আহা! মেয়েটী বড় ভাল, বড় লক্ষ্মী। মেয়েটীর মুখখানার দিকে তাকালে বুক ফেটে যায়। মেয়েটীর মুখে আমাদের সাবির আদল আসে। আমার বড্ড মায়া হয়।"

"সাবির আদল আসে"—তাইত! মার মুখে কথাটা শোনা মাত্র আমার সমস্ত প্রাণখানা হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। এলোমেলো হয়ে বুকের মধ্যে কেমন যেন সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেল—খানিকক্ষণের জন্য।

সুলোচনাদিদির সঙ্গে পরামর্শ করার দরুণই হোক, বা মার প্রাণের একান্ত বাসনার ফলেই হোক, কিছুদিনের মধ্যে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হল আমাদের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণ এল, পূজা হোল, হোম হোল, বিশ্বনাথের বাড়ীতে ঘটা করে পূজা দেওয়া হোল, আমাকে গরদের ধুতি পরান হলো, সুলোচনাদিদি স্বহস্তে কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দনের তিলক; এবং বিশ্বনাথের চরণামৃত মা নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিলেন, মাথায় দিলেন আশীর্ব্বাদী ফুল। কিন্তু আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার ভবিষ্যত সন্তানের আগমনীর এই শুভ আয়োজনের সমস্ত ব্যাপারটা মেয়েটী একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখছিল; এবং কেমন যেন একটা সঙ্কোচ একটা লজ্জায় আমি মেয়েটীর মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। কিসের এ লজ্জা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিষের সন্ধানে

প্রাচীন কাহিনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ

ক'সে বেঁধে দিনু ঠুলি নয়নে আমার.
শয়তানের নেয়ানেতে কর এইবার
তোমার কাজের সুরু। ওড়ে সাদা ধোঁয়া,
ঠুলি চোখে দেখি আমি হয়ে বেপরোয়া।

রয়েছে সে তার কাছে, কোথা ওরা এবে,
কি করিছে সব জানি। মোর কথা ভেবে
হাসে ওরা, ভাবে বুঝি অশ্রু মোর ঝরে,
যাচি দেবতার বর উহাদের তরে!

খলে পিষে গুড়া কর, বিন্দু বিন্দু জলে
মাড়িলে কোমল হবে পেষনীর তলে।
দেখি তব কারিগরি, থাক্ প্রতীক্ষায়
নাচঘরে প্রতীক্ষায়, যারা মোরে চায়।

ওই যে রয়েছে খলে,—গঁদ্ বুঝি ওটা?
গাছের গুঁড়িতে ফলে সোনা গোটা গোটা
কি ওই শিশির মাঝে, গাঢ় নীলপানা?
দেখে মনে হয় মিঠে, বুঝি বিষ-দানা?

তুমি আর আছে যত পুঁজিপাতি তব,
একসাথে পেলে সুখে দিশাহারা হ'ব।
আংটি অথবা দুলে পাখায় ঝাঁপিতে,
মরণের হানা পারি গোপনে ঢাকিতে।

দেরী নাই, 'চামেলি'রে একখিলি পানে
আধঘণ্টা অবসানে পাঠাব শ্মশানে।
ধূপকাঠি দিব জ্বালি', একটি নিঃশ্বাসে
'চাঁপা'র পরাণবায়ু মিলাবে বাতাসে।

দেরী কত? হল শেষ? রঙটা ঘোরালো,
আর একটু ফিকে হলে হ'ত বড় ভালো।
মদের গেলাসে তবু সোণালী আভায়
হবে মনোলোভা অতি, মধু রসনায়।

এক ফোঁটা? ওটুকুতে বুকের স্পন্দন
থামাবে না কভু তার! আমার মতন
নয় সে ত ক্ষীণতনু, সে যে সুগ্রীবর,
তাই ত পড়েছে ধরা আমার নাগর!

কাল রাত্রে দেখি—ওরা ফিস্ ফিস্ করে!
পুড়ে ছাই হবে বুঝি মোর দৃষ্টিভরে
ভেবেছিনু; কিছু হায় হ'লনা ত তার!
এ গরল হ'তে কিন্তু রক্ষা নাই আর!

দেখো, যেন যন্ত্রণার অবধি না থাকে,
জ্বলে পুড়ে মরে যেন। ওর দেহটাকে
বিষের দাগায় মৃত্যু করুক্ ভীষণ,
ভুলিবে না ওই মুখ বঁধু আমরণ!

হ'ল শেষ? মুখোষ্‌টি খুলি এইবার?
মিছে তুমি কোরোনাক মুখখানি ভার।
সর্ব্বস্বের বিনিময়ে পেয়েছি এ বিষ,
ওর যাতনার মোর নহে কি হরিষ?

মণিমুক্ত সব নাও, ধনে ওঠ' কেঁপে,
অধর চুমিতে পার বুকে মোরে চেপে।
গুঁড়োগুলো ঝেড়ে দাও, বাধাবে কি জ্বালা,
এবার এসেছে মোর নাচিবার পালা।

Browningএর The Laboratory হইতে।

যোগশাস্ত্র

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

আত্মা ও পরমাত্মার বন্ধন স্থাপন ধর্ম্মের লক্ষ্য ১। বিষয় ভোগ ছাড়িয়া মন যখন নিশ্চল হয় ও আত্মশক্তি স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই মানুষের সমাধির অবস্থা হয় ২। পাতঞ্জল দর্শন চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলিয়াছেন ৩। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইতে পারে ৪। যত্নের সহিত অনেকদিন অভ্যাস করিলে চিত্ত দৃঢ় এবং নিশ্চল হয় ৫।

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, ঔদাসীন্য, বিষয়াসক্তি অনিত্যজ্ঞান, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি সমাধির বিঘ্ন ৬। সাঙ্খ্য মতে শরীর ও মনের একতা সাধনই যোগ। বেদান্ত মতে যোগ অর্থে ধ্যান দ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মায় মিলন৭। এই মিলনে সসীম জীবাত্মা অসীম অনন্ত আত্মায় বিলীন হয় ৮। শ্রীধর স্বামী গীতার টীকায় পরমেশ্বরে ঐকান্তিক ভাবই যোগ বলিয়াছেন ৯। আবার গীতায় যোগ কর্ম্মবন্ধ মোচনের কৌশল বলা হইয়াছে ১০। বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ (ইষ্টানুসন্ধানকে) যোগ বলিয়াছেন ১১। বৌদ্ধ দর্শনে সকল বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ ১২।

দক্ষস্মৃতিতে মনকে বৃত্তিহীন, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একীভূত করিলে যে মুক্তিলাভ হয় তাহাই মুখ্য যোগ ১৩। শঙ্করাচার্য্য বলেন ধর্ম্মানুমোদিত কাজ করা, সিদ্ধি, (ফল) অসিদ্ধি (অফল) সমভাব দেখাই কর্ম্মপাশ মোচনের কৌশলরূপ যোগ ১৪। ভারতীয়:সকল দর্শনেই মনোবৃত্তির বিকাশ প্রদর্শনের জন্য আলোচনা আছে। বৈজ্ঞানিক কতকগুলি প্রাকৃতিক লীলার নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করেন। দার্শনিক প্রাকৃতিক লীলার ইতিহাস উদ্ঘাটন করেন। তাঁহারা মূল তত্ত্ব আঁবিষ্কার করিয়া সমস্ত 'কেন'র উত্তর দিতে চান। সাঙ্খ্য বলেন "জ্ঞানান্মুক্তি" গৌতম বলেন "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সা ধিগম" (ন্যায়দর্শন ১।১।২ সূত্র), বৈশেষিক দর্শনকার বলেন—"যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"। পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান কার্য্য মনোরাজ্যের আঁলোচনা।

---

১ The highest Object of their religion was to restore that bond by which their ownself (Atma) was linked to the eternal self (Paramatma)

—Maxmuller.

২ তাত্বা বিষয়ভোগাংস্তু মনোনিশ্চলতান্বতম্।
আত্মশক্তি স্বরূপেন, সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ দক্ষস্মৃতি ॥ ২২ ॥

৩ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। সমাধিপাদ ১।২ পাতঞ্জল দর্শন।

৪ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। সমাধিপাদ ১।১২ „

৫ তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। সমাধিপাদ ১।১৩ „
স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য-সৎকারা
সেবিত দৃঢ়ভূমিঃ। সমাধিপাদ ১।১৪ „

৬ ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তি দর্শনালব্ধ-
ভূমিকত্বাবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।
সমাধিপাদ ১।৩০ পাতঞ্জল দর্শন।

৭ জীবাত্মপরমাত্মনোরৈক্যম্। বেদান্ত।

8 The Sankhy Yogo is the union of the body and the mind. In its Vedantic view it is the joining of the individual with the Supreme Spirit by holy communion with the other through intermediate grades, whereby the limited soul may be lead to approach its unlimited fountain and lose itself in the same."

—Mullins's "Essay on Vedanta".

৯ "যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা"—স্বামিকৃত টীকা।

১০ যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। গীতা। ২।৫০।

১১ "স্ব স্ব দেবতানুসন্ধানমিতি।

১২ সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।"

১৩ বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥ ৭। ১৫

১৪ স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ
সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিত চেতস্তয়াতৎ কৌশলং কুশলভাবঃ তদ্ধি।"

—শঙ্করভাষ্যং।

যোগাচার কত প্রাচীন তাহা এখনও সঠিক বলা যায়না। মোহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পায়, যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে মনে হয় "আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ সালে সিন্ধুদেশে এরূপ মনন বা চিন্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং উপাস্য দেবতাও চিন্তনকারীর ছাঁচে গঠিত হইতেছিল।" * আমরা প্রাগবৈদিক সভ্যতায় যোগ প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের যোগ কুণ্ডলিনী উপনিষদে গুরুর নিকট হইতে যোগাচার শিক্ষার কথা আছে। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধদেব ক্রমান্বয়ে দুইজন গুরুর নিকট হইতে যোগশাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন ইহাতে তাঁহার আস্থা থাকে নাই। সাংখ্যের মূলকথা সৎকার্য্যবাদ তিনি ত্যাগ করেন। তাঁহার মতে কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। সুতরাং সৎকার্য্যবাদ কিছু নহে সমস্তই ক্ষণিক। এইভাবে তিনি গোড়ায় সৎকার্য্যবাদের স্থান দেন নাই এবং পরিশেষে সাংখ্যের কৈবল্যও তাঁহার পছন্দ হয় নাই। বুদ্ধ বলেন "সর্ব্বং শূণ্যং শূন্যম্।" "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্॥" এখানে বলা উচিত বৌদ্ধেরা পূণ্য বলিতে স্বয়ং জ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ অবস্থা বুঝেন। হিন্দুরা শূন্য বলিতে অন্ধকার বুঝেন। পাতঞ্জল দর্শন বলেন মন স্থির হইলে তেজ বা জ্যোতি দেখা যায়।†

যোগিরা পরমাত্মা-ভিন্ন কোনও পদার্থকে সুখকর ভাবেন না। পরমাত্মা আনন্দকর ও তৃপ্তির হেতু। তিনি কার্য্য-কারণবিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন। তিনি জ্ঞাত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত। তিনি কোন বস্তু নন্ এবং তিনি কোন বস্তু হন নাই। তিনি পুত্র, বিত্ত এবং জগতের অন্যান্য সকল বস্তু হইতে পরমপ্রিয়তম।†† যোগিরা এই রসসিন্ধুসুধার জন্য যোগাভ্যাস করেন। আনন্দস্বরূপ আত্মা দ্বারাই সুখের বিস্তার হয়।* সংসারের আনন্দের সঙ্গে দুঃখ বিজড়িত আছে। তাই শ্রুতি একমাত্র আত্মাকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন†। এই আনন্দলাভের ইচ্ছায়ই মানুষ আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে চায়। কেহ কেহ অনুমান করেন মানুষের নিরিবিলি থাকার অভ্যাস হইতেই যোগমতের প্রবর্ত্তন।

যে কাজ করিলে নিবিষ্টচিত্তে থাকা যায়, চিত্তে কোনও অস্থিরতা জন্মিয়া অশান্তি ঘটায় না ঋষিরা এইরূপ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখনকার যুগে মানুষ প্রাণি-জগতের সূক্ষ্ম সন্ধান করিত। ভারতীয় দার্শনিকরা বিশ্ব-প্রকৃতির পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম চিন্তা এবং যথাযথ পরিকল্পনা দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেন। যুক্তি এবং পরীক্ষা ছিল তাঁহাদের সত্যনির্দ্ধারণের উপায়। তাঁহারা দেখিলেন সাপ, ব্যাঙ্ প্রভৃতি প্রাণী শীতকালে ভূগর্ভস্থ গুহায় সমশীতোষ্ণ স্থানে তালুকুহরে জিহ্বা দিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন ক্রিয়া থাকে না। এমন কি শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়, লালা, স্বেদ, উত্তাপ কিছুই থাকে না। ভারতীয় যোগশাস্ত্র এই সকল প্রাণীর আচরণ, অভ্যাস এবং কার্য্যকলাপ পরীক্ষার ফল। যোগীর পদ্মাসন অনেকটা ব্যাঙের বসার মত। পলকহীন দৃষ্টি, সমশীতোষ্ণ গুহা ও লম্বা জিহ্বা তালুমূলে রাখা অল্পাহার ও খাদ্যবিচার এই সমস্ত স্বভাবতঃ সমাধিমান্ প্রাণীর (Hibernating Animals) আচরণ সাবধানে পরীক্ষা করার ফলই যোগশাস্ত্র। তাঁহারা দেখিলেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসই চিত্তবৃত্তির উদয় এবং শরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি করে। এইজন্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধই যোগীর লক্ষ্য। ইহাকে যোগ-শাস্ত্রে প্রাণায়াম বলে। সমাধি বায়ুসংযমের পরিণাম মাত্র, যাহা অবশেষে নির্ব্বাণ মুক্তি বা ব্রহ্মাদ্বৈতভাব লাভের ইচ্ছায় মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে। তাঁহারা অজ্ঞেয় অচিন্ত্যকে

---

* শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ, 'প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩৩৯।

† বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ১।৩৬ সমাধিপাদ।
—পাতঞ্জল দর্শন।

†† তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

* আনন্দময়ো হ্যাত্মা এতস্যৈব আনন্দস্য।
মাত্রা উপজীবতি সর্ব্বে আনন্দাঃ॥—শ্রুতি।

† রসো বৈ সঃ। তৈত্তিরীয়।

(Unknown and unknowable) শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মনোজ্যোতির ক্রমবিকাশ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন*। নিঃশ্বাসের বিশেষ বিশেষ গতি দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ গতি উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ বিশেষ গতি হইতে মনোবৃত্তিরাশির স্ফুরণ হয়। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে নিঃশ্বাসের গতি থাকিলেই মনোবৃত্তি ক্রিয়া করিতে থাকে। নিঃশ্বাসের গতি বন্ধ হইলে মনোবৃত্তিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকরা যেমন জড়বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন প্রকৃতির গর্ভ হইতে সেইরূপ যোগীরা দুঃনিবৃত্তির আবশ্যক বোধে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সংস্থাপনরূপ যোগপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তি বা বাসনা জন্মের কারণ। জন্ম হইলেই রোগ, শোক, চিন্তা মানুষকে পীড়িত করে। এই দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মুক্তির প্রয়োজন। সুষুপ্তি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। যোগদ্বারা ব্রহ্মের সহিত দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই মুক্তির প্রয়োজন। যোগ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সুষুপ্তি-কালের অবস্থা হইলে যে প্রকার নিশ্চলতা হয়, যোগশাস্ত্রে এই অবস্থা লাভের প্রণালী দেওয়া হইয়াছে। যিনি যোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তির (মনের) লয় করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম, অমৃত এবং শুদ্ধ। ইহা জীবের পরমাগতি এবং পরমলোক†। যোগসিদ্ধ হইলেই মানুষ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। নির্ম্মলচেতা লোকেরা সমাধি যোগে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ‡। মহাদেবী প্রকৃতিই ব্রহ্মতেজোমণ্ডলের মধ্যবাসিনী। যোগিরা ভক্তি-প্রভাবে পরিণামে সেই তেজকেই দেখেন*। সাধনার উদ্দেশ্য সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি। এই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া মানুষ পরিশেষে সতে পরিণত হইয়া থাকে †। অন্যের সুখে সুখ, দুঃখে দয়া, পুণ্যে আনন্দ এবং পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তপ্রসাদ জন্মে এবং তাহাই সমাধির জনক হয় ‡। সমাধিসূত্রের ভিতর দিয়াই পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

যোগিরা ধ্যানবলে এরূপ জানিয়াছেন, পরমাত্মা পরমেশ্বর যখন মায়ার (প্রকৃতির) আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হয়। ঈশ্বরের সেই শক্তি কেহ দেখিতে পায় না। এই শক্তি নিরন্তর নিজগুণ দ্বারা ঢাকা থাকে। মানুষ প্রকৃতির কার্য্য দেখিতে পায় কিন্তু হেতু বুঝিতে পারে না। প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই সৃষ্টির উৎপাদক *। এই সৃষ্টিতত্ত্ব জানা ধ্যানের (যোগের) উদ্দেশ্য। অন্যবৃত্তি নিরোধ হইলে ধ্যান সিদ্ধ হয় †। এই জন্যই আসন প্রভৃতি নানাবিধ নিয়ম পালন ††। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য বস্তুও যোগিরা দেখেন§। যোগদ্বারা কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মারূপ

---

* To say nothing of Indian sages, to whom evolution was a familiar nothor ages before paul of Tarsus was born.

—Prof. Huxley

মানসে তু বিলীনে তু সৎ সুখং চাত্মসাক্ষিকম্।
তৎব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্লোক এব সঃ॥

—মৈত্রী, ৬।২৪।

এবং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরম্ পদম্॥

কূর্ম্মপুরাণ।

* সা দেবী প্রকৃতির্ব্রহ্ম তেজোমণ্ডল বাসিনী।
কেবলং প্রকৃতিশ্চৈকা দৃশ্যতে ভক্তি যোগতঃ॥

—ব্রহ্মতন্ত্র।

† The whole object of Sadhana is to increase Satta Guna until, on man bocoming wholly Sattvika, his body passes from the state of prodominanat Sattva Guna into Sat itseil.

—Tho Garland of Letters.—Woodroffe,

‡ মৈত্রী করুণামুদিতো পেক্ষানাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। ১।৩৩ সমাধিপাদ। পাতঞ্জল দর্শন।

* তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। শ্বেতাশ্বেতর ১৩।

† বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৩।৩১ সাংখ্যপ্রবচন সূত্র।

†† স্থিরসুখমাসনম্।৩।৩৪ „

§ যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ।১।৯০ „

ভগবানের সাক্ষাৎলাভ নহে, পরন্তু ঋদ্ধি সিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের উপায়রূপেও যোগ বিহিত হইয়াছে। ইতালীর অধ্যাপক ডাঃ মেকিয়ারো (Dr. Macchioro) বলেন "ভগবানের সংস্পর্শে আসিবার জন্যই যে প্রাণায়াম মনঃ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে তাহা নহে, একজন ব্যবসায়ীও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে প্রাণায়াম অভ্যাস. দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিতে পারে"*। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক কেজারলিঙ বলেন ইউরোপের বিদ্যাপীঠগুলিতে যোগাভ্যাস প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কারণ ইহাতে ছাত্রদের সংযম ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। জিমন্যাষ্টিকের দ্বারা যেরূপ মাংসপেশী দৃঢ় হয় ও বলিষ্ট হয় যোগের দ্বারা সেইরূপ মনের শক্তি বাড়ে। ইহার মালমসলা হঠযোগ, মন্ত্রজপ, অঙ্কন, রসায়ণ ইত্যাদি। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, অজপাসাধন ইত্যাদির উদ্দেশ্য নিজের এবং অন্যের শরীর মন ও বাহ্যপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব কারী।

বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ অপরা প্রকৃতিকে বশের চেষ্টা করিয়া দূরদর্শন (Telescope, television), দূরশ্রবণ (Telephone, Radio), কথোপকথন (Talkie), পাষাণ-স্ফোটন (Dynamite), মতিবেগ (Motor), আকাশ-ভ্রমণ (Aeroplane) এবং জরাবিনাশ (Monkey gland) প্রভৃতির চেষ্টা করিতেছেন, যোগীরা সেইরূপ যোগদ্বারা মনোজগতে সেই শক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ এবং পরকায় প্রবেশনের দ্বারা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও করিয়াছেন।

মনকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রকৃতিকে মুঠার মধ্যে আনার চেষ্টাই ছিল যোগীর সাধনা। তান্ত্রিকরা পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্রের ঈশ্বর প্রণিধানের সঙ্গে হঠযোগ মিলাইয়া ঈশ্বর প্রণিধানকে সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হঠযোগ যোগীদের মতে কেবল স্থূলশরীরের নহে সূক্ষ্মশরীরেরও ব্যায়াম। প্রাণায়াম দ্বারা দেহস্থ বায়ুকে আয়ত্ত করিলে দুই শরীরের উপরেই কাজ করে! উপনিষদে সমাধিযন্ত্রের ভিতর দিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভের উপদেশ করা হইয়াছে।*

শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য

* আনন্দবাজার পত্রিকা। রবিবার ২৯ আষাঢ়, ১৩৪২ সাল, ১৬ পৃঃ।

* 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

অশ্রুতটিনীর বিজন কূলে কূলে
হাসির তরীখানি চলিল দুলে দুলে।
শুধানু, কোথা যাবে একা এ নাও টানি?
নিশীথে মোর ঘাটে জ্বেলেছি দীপখানি!
ক্ষণিক আঁখিপানে চাহিল আঁখি তুলে,
কহিল—'এই ভালো'—কেবল দুটি কথা;
আধেক ছিল হাসি, আধেক যেন ব্যথা।
যেমন এসেছিল তেমনি গেল সে কি?
মনের বনে ডাকে নাম-না-জানা পাখী,
প্রদীপ নিবে গেল অশোক তরুমূলে!

পড়ে মনে পড়ে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

পড়ে মনে পড়ে -
বিস্মৃতির অন্ধকার রুদ্ধদ্বার ঘরে
পেয়েছিনু তার দেখা। বাহিরের আলো
ক্লান্তিভরা এ নয়নে লাগে নাই ভালো ;
পরম নির্ভর ভরে তার দুটা হাতে
সমর্পিয়া এ জীবন বসেছিনু সাথে।

সেই সন্ধ্যাবেলা
পৃথিবীর এক প্রান্তে একান্ত নিরালা
তার সাথে ক'টি কথা ক'ব ছিল মনে—
যে কথাটা গুঞ্জরিয়া জীবনে যৌবনে
ফিরেছিল অশ্রান্ত ভাষায়। বারে বারে
তার মুখে তাকাইয়া এ নয়ন হারে।

সহসা বাতাস
আকুল করিয়া গেল ঘন কেশপাশ,
মাধবী উৎসব রাতি হল আনমনা,
অধীর হৃদয়াবেগে ভুলিনু আপনা ;
দুই হাতে তুলি ধরি তার মাথা নিয়া
মৃদু কম্পস্বরে শুধু ডাকিলাম--'প্রিয়া'।

সে ডাকে শিহরি
আবেশে বিহ্বল হিয়া উঠে মধু ভরি
পুলকে কাঁপিল তনু পরাণবধুর
লাজমৌন প্রেমারুণ মিনতি মধুর ;
স্বপ্নমাখা আঁখি দুটী স্তব্ধ পূর্ণ রাতে
সুধীরে মুদিয়া গেল গুরু বেদনাতে।

পরে কতদিন
গেছে নব সম্ভাষণে, -এমনি নবীন
ধরণীর চেলাঞ্চল যুগান্তর ধরে ;
যে ডাকটী রাখিয়াছে এ জীবন ভরে
শুধু সেইটুকু ছাড়া আর সবি ভুলে
গেছি আজ বিস্মৃতির বিস্মরণী কূলে।

বনবাণী

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

কবি রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে তাঁহার কথার ইন্দ্রজালের মোহন মন্ত্র পড়িয়া পুনঃসৃষ্টি করিয়াছেন—যে প্রকৃতিকে আমরা নিত্য নিরন্তর দেখিতেছি তাহার সহিত আমাদের নূতন নিবিড় পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন যাদুকর কবি– যেমন চেনা মেঘকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন কবি কালিদাস। মরমিয়া কবি তাঁহার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ও রসের মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নবনব মাধুর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পরিচয়ের ধারা ঐতিহাসিক কাল-পর্য্যায়ের ক্রমে যদি অনুসরণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাই—প্রথমতঃ কবি প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতার বাহিরের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহার পরে অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতির ভাবরাজ্যের ও অন্তর্জগতের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা লাভ করেন; শেষে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয়ের মাঝে কবি বিশ্বপ্রকৃতির এক নবীনতর পরিচয় ও অর্থ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই যদিও প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ, তথাপি তিনি ছিলেন প্রধানত মানবের কবি। মানবীয় সুখদুঃখ ও সৌন্দর্য্য-ঔদার্য্য যেমন ভাবে তাঁহার কাব্যে বাণী পাইয়াছে, প্রকৃতি সেইরূপ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্থকতা যেন মানবকে পাইয়াই—মানবহীন প্রকৃতি যেন কবির কাছে মাধুর্য্যহীন ও ব্যর্থ—তুলনীয় 'পোড়ো বাড়ী' কবিতা, ছবি ও গান কাব্যে।

মানবের অনুভূতির মাঝেই প্রকৃতি সার্থক। তাই কবি প্রকৃতির মাঝে মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়া প্রকৃতিকে অনুভব করেন। কবি নিজেই বলিয়াছেন—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অপর নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ।"—পঞ্চভূত। তাই সৌন্দর্য্য-বিলাসী কবি মানবকে প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন—তিনি মানবকে প্রকৃতির আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ব্যক্তিত্ব দান করিয়া দেখিয়াছেন। মানব-বন্ধু কবি প্রকৃতিকে মানবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। শীতের রৌদ্র বন্ধুর আলিঙ্গনের মত, বর্ষার আকাশ সুন্দরীর জলভরা চোখ স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং নির্ঝর কেশ এলাইয়া ছোটে,—কবির মানস-সুন্দরী কখনো মানবী, কখনো প্রকৃতিময়ী—'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি' এবং 'সহস্রের সুখে রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার হে বসুধে!'—বসুন্ধরা।

কেবলমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নব নব রসময় সম্বন্ধ বন্ধনের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কবিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি ছিল জড়েরই বৈচিত্র্যমাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় যথেষ্ট প্রকৃতি বর্ণনা আছে কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই—প্রকৃতির সহিত কবি চিত্তের কোন আত্মীয়তা দৃষ্ট হয় না, বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য কি কি উপভোগ্য জোগায় তাহারই তালিকামাত্র পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টাকে মনে পড়িয়াছে–কিন্তু এই পর্য্যন্ত। মাইকেলের প্রাণের উপর প্রকৃতি কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে দুই একটি সনেট ছাড়া তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকৃতি বর্ণনা নাই।

হেমচন্দ্রকে ও নবীনচন্দ্রকে বিশ্বপ্রকৃতি ভাবনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে মাত্র—তাই পদ্মের মৃণাল দেখিয়া হেমচন্দ্রের

মনে পড়িয়াছে রাজার ও রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা, পদ্মা দেখিয়া নবীনচন্দ্রের মনে হইয়াছে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির কথা, মেঘনা দেখিয়া মনে হইয়াছে মানব জীবনের বাধা বিঘ্ন ও স্বস্তি-অস্বস্তির কথা—প্রকৃতির সহিত ইহাদের কোন আত্মীয়তা দৃষ্ট হয় নাই। বিহারী-লালেই আমরা প্রথম মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের আদান-প্রদানের পরিচয় পাই—

"ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে
জ্যো'স্নার আলোক হাসি ফুটেছে অধরে
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা দেলা ভুলি।
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।"

—শরৎকাল।

বিহারীলালের শিষ্য রবীন্দ্রনাথই মানুষের সহিত প্রকৃতির যুগ-যুগান্ত-বিস্মৃত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটিকে নানাভাবে পুনর্বন্ধন করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বহুমুখ প্রভাবে রবীন্দ্র-চিত্ত গঠিত; আবার রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে মানস-দৃষ্টিতে রসমণ্ডিত করিয়া নূতন রূপে গড়িয়াছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার ক্রমবিকাশ এই পুনর্গঠনেরই ইতিহাস

কবি সন্ধ্যা সঙ্গীতের "হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে" ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্য্যময় জীবনটিকে খুঁজিতেছেন—মাঝে মাঝে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন আবার হারাইয়াছেন; তাই সন্ধ্যা সঙ্গীতে নৈরাশ্য আছে অতৃপ্তি আছে, সঙ্কোচ আছে, শিশিরোজ্জ্বল প্রভাতের "সেই হাসিরাশির মাঝারে আমি কেন থাকিতে না পাই?" বলিয়া খেদ আছে। এখন

গাছপাতা সরোবর গিরিনদী নিরঝর

সকলের সহিত কবির প্রণয় জন্মিতেছে। কিন্তু—

শুধু মনে জাগে এই ভয়
আবার হারাতে পাছে হয়।

কবির এখন

বসন্তের কুসুমের মেলা
মেঘেদের ছেলেখেলা।

সারাদিন দেখিতে ভাল লাগে। প্রথম প্রণয়ের আকুলতায় একটা ব্যথা আছে, তাই এই সঙ্গীতগুলির নাম হইয়াছে আরক্তিম সন্ধ্যার সঙ্গীত।

কবির মিলন ব্যাকুলতা প্রকৃতির অন্তর স্পর্শ করিল—সেও কবিকে হাতছানি দিয়া তাহার অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইল। অমনি "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" হইল, কবির রস-পিপাসু চিত্ত-ভ্রমর অন্তর্গুহা হইতে বাহির হইল। তাই প্রভাত সঙ্গীতে দেখি প্রকৃতির অন্তঃপুরের দিকে কবির যাত্রা —প্রভাত উৎসবের মধ্যে মেঘ, বায়ু তাঁহাকে পথ দেখাই-তেছে—মেঘকে কবি আকাশ পারাবারে লইয়া যাইতে বলিতেছেন, বায়ুকে বলিতেছেন তাঁহাকে দিগদিগন্তে ছড়াইয়া দিতে, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার আগ্রহে তিনি মরণকে পর্য্যন্ত আহ্বান করিতেছেন—

অনুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে যেতে চাই চরাচরময়।

কবির "সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ"

আর মনে হইল—

কে যেন মোরে খেতেছে চুমা
কোলেতে তারি পড়েছি লুটি'!

কবি এখন জগত-ফুলের কীট। মরণ-হীন "অনন্ত-জীবন মহাদেশ" তাঁর আবাস-স্থল।

ইহার পরে ছবি ও গান। প্রকৃতির অন্তঃপুরে কবি প্রবেশ করিয়াছেন—যেখানে প্রকৃতির—

অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি

প্রকৃতির মধ্যে মমতার আস্বাদ পাইয়া সেই মমতা কবি আরো নিবিড় ভাবে পাইতে চাহিতেছেন। তাই কবি স্নেহময়ী পল্লী প্রকৃতির অঙ্গনে আসিয়াছেন, যেখানে—

একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।

তারপরে কবি প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাধুর্য্য দেখিতে পাইলেন।—

ঐ যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে, ওরা মোর আপনার লোক, ওরাও আমারই মত তোর স্নেহে আছে রত যুঁই চাপা বকুল, অশোক।

প্রকৃতির মধ্যে মানবীয় মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া কবি মানব-প্রকৃতির প্রতিও লুব্ধ হইলেন—"কড়ি ও কোমল" সুরে তাঁহার চিত্ত-বীণা বাজিয়া উঠিল—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবি বলিয়াছেন—প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।—"জীবন স্মৃতি"। প্রকৃতির সহিত কবির তন্মাত্রগত বা ইন্দ্রিয়ানুভবগত পরিচয়ের এইখানেই শেষ।

প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয় হওয়ার ফলে কবি দেখিলেন, প্রকৃতি কেবল আদরই করেনা, শাসনও করে, প্রয়োজন হইলে পীড়নও করে। কবি তাই প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরা বলিয়াছেন স্থূল অতি-পরচয়গত অভিমানে। প্রকৃতির কঠিন নিয়মকে তিনি তিরস্কাব করিয়াছেন—"আমরা কাঁদিয়া মরি, এ কেমন রীতি?" কবি প্রকৃতির মধ্যে দেখিতেছেন—"পাশাপাশি এক ঠাই দয়া আছে দয়া নাই।" "মহাশঙ্কা মহাআশা একত্রে বেঁধেছে বাসা।" "মানসীতে" কবি প্রকৃতিকে জননী জ্ঞান করিয়াছেন বলিয়াই অভিমানে নিষ্ঠুরা বলিয়াছেন—"জীবনমধ্যাহ্ন ও অহল্যা' কবিতায় প্রকৃতির মাতৃত্ব ফুটিয়াছে।

"সোনারতরীতে" কবি প্রকৃতিমাতার স্নেহের ব্যথাটুকুও লক্ষ্য করিয়াছেন—সেত নিষ্ঠুর নয়, সে "অক্ষমা", সে দরিদ্রা—মানবের অনন্ত ক্ষুধা ও অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিতে না পারিয়া সে বাধিতা। সে মৃতবৎসা জননী—"যেতে নাহি দিব" বলিয়া সে সন্তানকে বুকে আঁকড়িয়া ধরে "তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!" কঠিন নিয়ম—ধরার জন্য একদিন যাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন—কঠিন নিয়ম প্রকৃতির নহে, সে নিয়ম বিশ্বস্রষ্টার; সেই নিয়মের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া মাও কাঁদিতেছে, ছেলেও কাঁদিতেছে! তাই প্রকৃতির প্রতি দরদে কবির মন ভরিয়া উঠিয়াছে—"সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় যেমন জননীত্বের আকৃতি ফুটিয়াছে তেমনি "বসুন্ধরায়" সন্তানের ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি ইহার পরে কিছুকাল বিশ্ব-প্রকৃতির দিক হইতে মানব-প্রকৃতির দিকে ফিরিয়াছেন; তারপর পুনরায় প্রকৃতির দিকে যখন ফিরিলেন, তখন প্রকৃতিকে দেখিলেন আর এক চোখে—তখন প্রকৃতিতে আর মানবিকতা নাই, মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ তখন আর প্রকৃতিতে কবি আরোপ করিলেন না, তখন প্রকৃতিতে কবি দেখিলেন ঐশিকতা—Humanity হইতে Divinityতে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি তখন উপসংহৃত হইয়াছে, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে—প্রকৃতির স্থূল যবনিকা তখন স্বচ্ছ সূক্ষ্ম লতাজালে পরিণত হইয়াছে। সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া কবি দেখিলেন লীলাময়কে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য এখন কবির কাছে সেই লীলাময়েরই লীলামাত্র। "নৈবেদ্যেই" প্রথম কবি প্রকৃতির মধ্যে ঐশিকতা-বোধ অনুভব করিলেন, "খেয়াতে" তাহা স্পষ্টতর হইল। প্রশান্ত আনন্দ ঘন আকাশের তলে "মুগ্ধসম" "শিরায় শিরায় আতপ্ত প্রেমাবেশ" লইয়া কবি ঘুরিতেছেন সেই লীলাময়কে লক্ষ্য করিবার জন্য। যে "অরূপ-রতন" আশা করিয়া কবি "রূপ সাগরে ডুব" দিয়াছিলেন, এখন তাহার সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহার পরে ক্রমে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে কবির রসের কারবার সবই বিশ্বনাথের সঙ্গে অপরোক্ষভাবে; বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ এখন গৌণ। বিশ্বপ্রকৃতি কখনো ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে দেয়াসিনী, কখনো দয়িতের সহিত মিলনের দূতী, কখনো অন্তঃপুর-পথ-পরিচায়িকা প্রতিহারিনী, কখনো কাব্যের উপেক্ষিতার মত বিশ্বনাথের সহচরী বিশ্বপ্রকৃতি কবির চক্ষে উপেক্ষিতা। প্রকৃতি কখনো ইঙ্গিতে লীলাময়কে দেখাইয়াছে কখনো সে কবিকে আঘাত করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছে, কখনো কবির পূজার অর্ঘ্য-সম্ভার যোগাইয়াছে, পূজার ডালি ভরিয়া দিয়াছে, মালা গাঁথিয়া দিয়াছে, বিশ্বনাথকে বহন করিয়া কবির দুয়ারে আনিয়া হাজির করিয়াছে, কখনো বা গোপন করিয়া রাখিয়া কবির সহিত লুকাচুরী খেলিয়াছে, কখনো ভগবানকে বরণ করিয়া কবির মনোমন্দিরে তুলিয়াছে।

নৈবেদ্যের স্তরে কবি যেমন বিশ্বনাথকে প্রকৃতির অতীত "মহারাজ" "প্রভু" বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী স্তরে

বিশ্বনাথকে তেমন বিশ্বাতীত রূপে দেখেন নাই। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বনাথকে অভিন্নাত্মক রূপে দেখিয়াছেন; এখন লীলাময়ী প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে বিরাজমান লীলাময়ের মহারাজত্ব ও প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছে।

আবার কবির নিজের সঙ্গেও প্রকৃতির অভেদাত্মকতা কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। লীলাময়ের সঙ্গে শুধু নিজেরই মধুর সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেও লীলাময়ের সেই প্রকার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। আরও উচ্চস্তরে কবি কেবল নিজের সঙ্গেই ভগবানের রস-সম্পর্কের কথা নয়, মহামানবের সহিতও ভগবানের ঐ সম্পর্ক যে সহজ ও চিরন্তন তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার রসবোধের চরম সার্থকতা। এই বিশ্ববোধে কবি মহামানবের সহিত নিজেরও অভিন্নাত্মকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন।

কবির ব্যক্তিত্ব ক্রমে আয়ত হইতে আয়ততর হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বমানবের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছে। তাই কবি প্রত্যাশা করেন তাহার পদধ্বনি প্রত্যেক মানবেরই শোনা সম্ভব, তাই কবি ভাবেন, তাঁহার মনে যিনি বিরাজ করেন "যে ছিল মোর মনে মনে" সেই তিনিই "শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে সবার দিঠি" এড়াইয়া অভিসারে আসেন।

বলাকায় এই বিশ্ববোধের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বমানবের সংযোগে বিশ্ব সংস্থিতির অন্তরে এক প্রবল গতির যোগ হইয়াছে—কবি দেখিতেছেন, এক বিরাট শোভাযাত্রা অনন্তকাল চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই বিশ্রাম নাই ভগবানের মন্দিরের দিকে নয়, ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গে সগৌরবে বহন করিয়া লইয়া।

কবি মনোলোকে বিশ্বপ্রকৃতিকে এইভাবে মানব মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। এইটিই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বনবাণীতে কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের আত্মীয়তা আরো বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কাব্যে প্রকৃতির প্রতি কবির দরদ বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে। কিন্তু বনবাণীতে সেই দরদ ও প্রীতি একটি স্পষ্টরূপ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বইখানি লেখা সম্বন্ধে কবি কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হোয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়, তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু বহু যুগ-যুগান্তর গুণগুনিয়ে ওঠে।

"ওই গাছগুলো বিশ্ব-বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম অদ্বৈতম। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শান্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্ম্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

"বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়? তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর; সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন-সঙ্গীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইয়ে মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন যদিং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে

এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে, বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?

"এখানে—ভিয়েনা নগরে—ভোরে উঠে হোটেলের জান্‌লার কাছে বসে কতদিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখবো আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম প্রৈতিব বন্ধবিহীন প্রকাশ-রূপ দেখবো সেই নাগকেশরের ফুলে-ফলে! মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে প্রতি নিস্তব্ধ রাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দাম বেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাবো কোথায়? কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল সেই সঙ্গীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চুপ করে যেতে পারলেই সেই সুরের নির্ম্মল ঝরণা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরম সুন্দরের মুক্তরূপ প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ—আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।"

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি এবং উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর প্রতি কবির প্রীতি এই বনবাণী কাব্যে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—এই বিশ্ববোধ ও বিশ্বমৈত্রী ও করুণা ইহার মধ্যে চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—১। বন-বাণী, ইহাতে আরণ্যক তরুলতা ও পশুপক্ষীর সম্বন্ধে কবির মমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; ২। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—যিনি বিশ্বেশ্বর তিনি নাটের গুরু, তিনি নটরাজ. ঋতুতে ঋতুতে তাঁহার বিবিধ নৃত্যলীলা জগতে প্রদর্শিত হয়. ঋতুগুলিই যেন তাঁহার রঙ্গপীঠ; "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হোতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালা গানের এই মর্ম্ম।" ৩। বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। ৪। নবীন—বসন্তের চিরনবীনতার আবির্ভাবে কবি-মনের আনন্দোৎসব। শান্তিনিকেতনে ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ছাত্রদের মনের সংযোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে এগুলি লেখা হইয়াছিল। নবীন হইতেছে বসন্ত ঋতুকে আবাহন।

এই সকল বিভাগেই কবি তাঁহার অনন্তকে ও অসীমকে উপলব্ধি এবং বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে নিমজ্জন-জনিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে করুণা ও বিশ্বমৈত্রীও প্রকাশ পাইয়াছে।

বনবাণীর সকল কবিতারই রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে কবি একটু করিয়া পরিচয় নিজেই দিয়া রাখিয়াছেন। কেবল একটি কবিতার সঙ্গে আমার কিছু সংস্রব আছে, সেইটুকু এইখানে ব্যক্ত করিয়া রাখি।

১৯২৬ বা ১৩৩৩ সালে আমি কবির কাব্য সম্বন্ধে আমার সংশয় নিরসনের জন্য কবির কাছে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ঢাকায় আমি কেমন আছি এই সংবাদ জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিলেন—শুনেছি তুমি নাকি তোমার বাড়ীতে সুন্দর একটি বাগান করেছো, অনেকেই তার প্রশংসা আমার কাছে করেছে। তাতে কি কি গাছ লাগিয়েছো?

আমি বলিলাম—সমস্ত ঋতুতে যাতে ফুল থাকে এমন বিবেচনা ক'রে পর্য্যায়ক্রমে আমি গাছ লাগিয়েছি। বন থেকে কুরচির গাছ এনে লাগিয়েছি—ঢাকার বনে অনেক

কুরচি গাছ জন্মে, আর যখন বর্ষাকালে ফুল ফোটে তখন বন আলো করে রাখে, বন যেন হাসতে থাকে।

তাতে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, আমার মনে আছে একবার আমি কুষ্টিয়া ষ্টেশনের ধারে একটা গাছে ফুলের বিপুল সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আমি বলিলাম—কিন্তু আপনি তো তার উপরে কোন কবিতা লেখেন নি!

কবি হাসিয়া বলিলেন—কুরচি নামটার মধ্যে কোন কবিত্ব নেই, নামটা কুরুচির কাছাকাছি, ও কবিতায় চলে না।

আমি বলিলাম—না হয় ওর সংস্কৃত নামে কবিতা লিখুন, কবি কালিদাস তো কুটজ কুসুমকে মেঘদূতের অর্ঘ্য বানিয়ে অমর ক'রে রেখে গেছেন।

কবি হাসিয়া বলিলেন—ওটাত শ্রুতিকটু কর্কশ নাম—কেমন অনার্য্য ওর ধ্বনি। কবিত্ব করার মত লালিত্য ওতে নেই।

তখন আমার মনে পড়িল কবি তাঁহার মেঘদূত প্রবন্ধে কালিদাসের কালের নামের সঙ্গে এখানকার নামের পার্থক্য দেখিয়া দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহারে মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই

আমি বলিলাম, আপনি না হয় নিজে তার একটা কোমল নরম নাম দিয়ে তাকে সম্মানিত করুন।

কবি হাসিয়া বলিলেন, তা যেন দিলুম, কিন্তু তাকে কে চিনবে? তার ঐ কর্কশ ইতর নাম কুরচি যে কায়েমি হ'য়ে গেছে—ওতে আবার আমাশার ওষুধ হয়, কবিরাজের অনুপানে আর বেনের দোকানে ওর বাস হওয়াতে ওর জাত গেছে।

আমি বুঝিলাম যে আমার প্রিয় ফুল কুরচির ভাগ্য আর সুপ্রসন্ন হইল না। তখন দেখিলাম কবি তাঁহার বাসভবন উত্তরায়ণের ধারে বাবলা জাতীয় এক রকমের কাঁটা-গাছ লাগাইয়াছেন, তাহাতে ছোট ছোট হলুদ রঙের সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া আছে। কবি সেই ফুলের নাম রাখিয়াছেন বনকদম্। আমি বলিলাম, আপনি এই কাঁটা গাছের নাম রেখেছেন বনকদম। এর উপরেও তো কোনো কবিতা লেখেন নি। ঢাকাতে এই বনকদমের গাছও প্রচুর। আমি কাঁটার জন্যে আমার বাগানে লাগাইনি, ছোট বাগান কণ্টকাকীর্ণ করতে পারি না।

কবি হাসিয়া বলিলেন, চারু, তুমি রসিক লোক হয়ে কাঁটাকে ভয় করো!

এই কথাবার্ত্তার ফল স্বরূপ কবি ঐ কুরচির উপরে কবিতা লিখিয়া এই বনবাণীতে * স্থান দিয়াছেন এবং আমার আনন্দকে স্থায়ী করিয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

* লেখকের এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। "বনবাণী"র বহু পূর্বে শ্রাবণ ১৩৩৪ সালের 'বিচিত্রা'য় কবির রচিত 'কুরচি' নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। বিঃ সঃ।
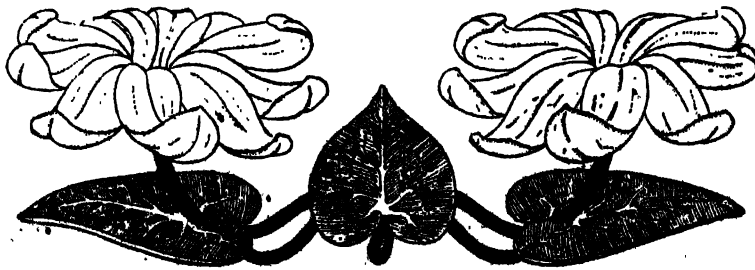
"কামনা সমুদ্রতীরে নিরুপায় মাটির মানুষ-

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

সামনের আয়নায় নিজের অবসন্ন, ক্লান্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ডাঃ বনার্জি একটা ম্লান হাসি হাসিলেন, তারপর চুরুট ধরাইয়া দরজা খুলিয়া ঘণ্টা টিপিলেন, ক্রিং-রি রিং। সহকারী ডাঃ সানিয়াল আসিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্যর, আপনার শরীর ভাল ত ?

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে জবাব আসিল, ওঃ, খুব ভাল। ধন্যবাদ। আজ কোন জরুরী কেস আছে ?

—হ্যাঁ, দুটো। দুটোরই অপারেশন করতে হবে। একটা ত' খুবই—

—খুব শক্ত যদি না হয় ত' আপনারাই কাজ চালিয়ে দিন। আজ আমার পুরোপুরী ছুটী।

সহকারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে ডাঃ বনার্জির মুখে ছুটীর কথা কেহ কখনও শুনে নাই। কলিকাতার বিখ্যাত সার্জ্জন তিনি। দিনের পর দিন মানুষের শরীরে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্র চালাইয়া আসিয়াছেন—তাঁহার হাতে মানুষ যেন খেলার পুতুল। কাজের চাপে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কোন চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার নাই। কিন্তু আজ সকাল হইতে চিন্তার পর চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সহকারী বিদায় লইতেই তিনি ইংরেজী গানের একটা কলি গুণ গুণ করিতে করিতে দরজা ভেজাইয়া খাস কামরায় ঢুকিলেন।

ছোট্ট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মন যে এত চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে—এ কথা তিনি কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ঘটনাটি খুব সাধারণ। কলিকাতা নগরীর বুকের উপর হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালার অত্যাচার। ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। নিরীহ, ভদ্র পথিকের উপরেই কত অকারণ অত্যাচার ঘটে ; তা সামান্য ফিরিওয়ালার বরাতে ঘটিয়াছে ত' তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ কি! শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে দুর্ব্বলের উপর সবলের এই অত্যাচার শুধু কলিকাতায় কেন, জগতের আন্তর্জাতিক কুরুক্ষেত্রে ত' প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ছেলেটি প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া বছর তিনেক কোন কাজ জুটাইতে পারে নাই। শেষে হতাশ হইয়া ভদ্রভাবে হাওড়ার পুলের ধারে 'বাংলাদেশের জঙ্গলা গাছ-গাছড়ায় প্রস্তুত দদ্রুহুতাশন সিদ্ধেশরী মলম' ফিরি করিতে সুরু করিয়াছিল। রোজগার হইত সামান্য। তাহা দিয়া নিজের সংসার চালাইয়া পাহারাওয়ালার বিপুল ক্ষুধা মিটানো যায় না। তাহাতেই বাঁধিল গণ্ডগোল। আজ সকালে পাহারাওয়ালাদের সহিত বচসা কিছু চড়িয়া উঠিয়াছিল। শেষে একজন পাহারাওয়ালা মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারিয়া ছেলেটিকে সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ছেলেটি আঘাত সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া আসিয়া পড়িল রাস্তার উপরে। শুধু রাস্তায় নহে একেবারে ডাঃ বনার্জির গাড়ীর তলায়। তিনি কার্য্যোপলক্ষে হাওড়া যাইতেছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মোটর থামিয়া গেল। ছেলেটি আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল বটে কিন্তু হাঁটুতে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল। ডাঃ বনার্জি কালবিলম্ব না করিয়া ছেলেটিকে হাসপাতালে লইয়া গেলেন। তারপর বাড়ী ফিরিয়া আর মোটেই নিজের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। প্রায় বাইশ বৎসর আগে তাঁহার নিজেরই জীবনে এমন এক মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। দুর্ঘটনা কেন—সুঘটনাই বলিতে হইবে। সেই আকস্মিকতার ফলেই ত আজ তাঁহার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। নতুবা আজকের এই বিলাসী জীবনের সহস্র উপকরণের অধিকারীরূপে সেদিন তাঁহাকে কে কল্পনা করিতে পারিত।

পাশের ঘরে দ্রুত জুতার শব্দ শোনা গেল। ডাঃ বনার্জি মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আবার কে আসিতেছে? তিনি একটু নির্জ্জনতায় একলা বসিয়া ভাবিতে চান। কাজের চাপে, উচ্চজীবনের সামাজিকতার অত্যাচারে এমন কয়েকটি নিরালা মুহূর্ত্ত বহুদিন পাওয়া যায় নাই। আজ যদি মিলিয়াছে ত' ইহার একটি কণাও তিনি অপব্যয় করিতে চান না। মিসেস বনার্জি সসব্যস্তে আসিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, কি ব্যাপার তোমার? এখনো তৈরি হওনি?

ইঁহাদের সমাজে মাতৃভাষার প্রচলন নাই। কারণ ইঁহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাকে অস্পৃশ্যের মত পরিত্যাগ করেন। না করিলে দৈনন্দিন জীবনে বিলাতী ময়ূরপুচ্ছ ত' শোভা পায় না। জন্মকে অস্বীকার করার উপায় নাই। তাই ইঁহারা বংশপদবী পুরামাত্রায় পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব পরিমার্জ্জন করিয়া নেন।

—কিসের জন্যে তৈরি হব? ডাঃ বনার্জি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

—আঃ, বড় দুঃখিত। তোমাকে যে এ কথা বলাই হয়নি। পরশু এমিলিয়া এসেছিল। তখন তুমি গেছলে মিঃ আলেকজাণ্ডারের অপারেশন করতে। আজ ওর বড় মেয়ের বিয়ে। নাও, নাও চটপট্ উঠে পড়। আজ ত' তোমার হাতে বিশেষ কাজ দেখছি না।

চক্ষের নিমেষে হাতের কবজিতে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটির দিকে চাহিয়া মিসেস বনার্জি বিস্মিতকণ্ঠে মৃদু চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এ যে চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট। এর পরে গেলে এমিলি কি মনে করবে বলত? আমায় সে বিশেষ করে বলেছিল যেন তিনটের আগে যাই।

ডাঃ বনার্জি জবাব দিলেন, আমি বড় দুঃখিত রেবা, আজ যেতে পারলুম না। শরীরটা ভাল নেই।

মিসেস বনার্জি কাছে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিলেন। সোহাগের স্বরে বলিলেন, ডোণ্ট বি সিলি নরি। ভদ্রসমাজে থাকতে গেলে এ সব সামাজিকতা রাখতে হয়। ডাঃ বনার্জির নাম নরেশ। তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বন্ধুরা নামকরণ করিয়াছিলেন নরু। স্ত্রী ইংরেজী নামের সাদৃশ্যে সেই নাম বিকৃতি করিয়া ডাকিতেন, নরি।

ডাঃ বনার্জি কোন জবাব দিলেন না। উদাসীনভাবে একখানা মোটা বই খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। মিসেস বনার্জি কয়েক মিনিট প্রতীক্ষা করিয়া বিরক্তিভরে ডাকিলেন, নরি।

– কেন রেবা আমায় বিরক্ত করছ? আজ বুঝি তোমার সঙ্গী নেই?

—সঙ্গী নেই মানে? সঙ্গী থাকলে আমি কি তোমায় যেতে বলি না?

—মাপ কর রেবা, তাইত' আমার ধারণা। দেখেছি, আমি সঙ্গী হলে তুমি যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ কর।

মিসেস বনার্জি আর থাকিতে পারিলেন না। রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, আমি তোমার কি করেছি? আজ মাস খানেক ধরে, কাছে এলেই এমনিভাবে তুমি আমাকে বিঁধে বিঁধে অপমান করছ? যদি আমাকে তোমার ভাল না লাগে স্পষ্ট করে সে কথা বললেই ত' হয়!

তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। ডাঃ বনার্জির মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এই রেবা! একদিন মনে হইয়াছিল, ইহাকে না পাইলে তাঁহার জীবন শূন্য হইয়া যাইবে!

সহসা আর একখানি মুখ তাঁহার মনের কোনে ভাসিয়া উঠিল। সেই মুখখানি আজ আর ভাল করিয়া মনে পড়ে না। শুধু শেষ বিদায়ের দিনে সেই চোখদুটিতে যে স্নিগ্ধতা যে মায়া উপছাইয়া উঠিয়াছিল – ডাঃ বনার্জি এতদিনেও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই।

* * *

অনেকদিন আগেকার কথা। যুবক নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে বিনাবেতনে আই-এস-সি পড়িত। অনেকদিন আগেই মা-বাপের মৃত্যু হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার পাতিডাঙা গ্রামে মামার বাড়ীতে থাকিয়া নরেশ মানুষ হয়। মামা

গোলোক মুখুজ্যের ছিল পাতিভাঙার সামান্য মহাজনী কারবার। মাসে মাসে কলিকাতার খরচ বাবদ তিনিই কিছু কিছু টাকা পাঠাইতেন। নরেশ খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আসিল দৈব বিড়ম্বনা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের সবেমাত্র সূত্রপাত হইয়াছে। দরিদ্র নরেশ একদিন ধরা পড়িল মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। অভিযোগ অবশ্য বিচারালয়ে টিকিল না। আটমাস পরে নির্দোষী বলিয়া নরেশ ছাড়া পাইল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখিল মুক্তির চেয়ে বন্দীজীবন ছিল ভাল। পুলিশের বক্রচক্ষু এবং আত্মীয়জনের গাম্ভীর্য্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। গোলোক মুখুজ্জে একদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন আমার বক্তওঠা পয়সা যে অমন করে নষ্ট করতে পারে এ বাড়ীতে তার জায়গা নেই।

মামীমা রাগিয়া উঠিলেন, ছিঃ, ও কথা বলো না। ছেলে মানুষ। যদিই বা কিছু অন্যায় করে থাকে তাবলে তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

মামা কিছুমাত্র নরম না হইয়া একটা গ্রাম্য সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাড়িয়ে দেব না ত দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষব ? ওর বাপটা নিজে নিশ্চিন্তে মলো আর আমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্যে রেখে গেল হতভাগাকে।

নরেশ বড় মুস্কিলে পড়িল। গ্রামের যুবক, হাতে এককড়িও নাই। সহরে বিশেষ কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় নাই। এখন কোথায় যাইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে? তবু অভিমানী মন কিছুতেই বাধা মানিল না। স্থির করিল, পরের দিন সকালে আর কেহ তাহাকে এগ্রামে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু সে যে একেবারে নিঃসম্বল! পথখরচ কিছুত' চাই। সে জানিত, এবাড়ীতে কেহ তাহার বন্ধু নাই, এক মামীমা আর তাঁহার অবিবাহিত ভাইঝি বীণা ছাড়া। বীণার কথা মনে হইতেই, তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু বীণার সাহায্য সে লইবে না। তাহাদের বিবাহের কিছু পাকাপাকি ঠিক হয় নাই বটে তবে আপন আপন গোপন মনের কাছে দুজনেই বহুদিন হইতেই ধরা পড়িয়াছিল। আট মাস হাজত বাসের পর গ্রামে ফিরিয়া সে লজ্জায় বীণার সহিত একটি কথাও বলিতে পারে নাই। আর বীণাও তাহাকে নিয়ত এড়াইয়া চলিয়াছে। আজ তাহার কাছে কোনমুখে সাহায্য চাহিবে! সারাদিন নরেশের দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যাকালে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিয়া ফিরিবার সময় নিরালা পাইয়া বীণা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি কি আজ রাতেই চলে যাবে ?

নরেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি করে জানলে ?

—এ কথা জানবার জন্যে আবার পাঁজি পুঁথি দেখতে হয় নাকি ? তোমার মুখের দিকে চাইলেই ত বোঝা যায়।

নরেশ হাসিয়া বলিল, তাই নাকি ? বীণা সে কথায় কান দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কোথা যাবে ?

—যেখানে দুচোখ নিয়ে যাবে।

বীণা আঁচলের আবরণ হইতে দুই গাছা বালা বাহির করিয়া বলিল, এ দুগাছা সঙ্গে রাখ, হয়ত রাস্তায় দরকার হতে পারে।

নরেশ হাত বাড়াইল না। কোন জবাবও দিল না। বীণা বুঝিতে পারিল, নরেশ লইবে না। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, পরের জিনিষ বলে তাই বুঝি তুমি নেবে না ? তোমাকে জোর করবার কি আমার কোন অধিকার নেই ? বীণার চোখ দুটী অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হইয়া আসিল।

নরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বীণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, দুষ্টু মেয়ে, আজ যদি তোমার গহনা নিয়ে এমন করে পালাই, যে দিন তুমি মামার কাছে ধরা পড়বে সে দিন যে তোমার আর অপমানের সীমা থাকবে না।

বীণা জবাব দিল, তার জন্যে ভাবি না। ফিরে এসে তুমি আমার সেই অপমানের শোধ নিও।

নরেশ ইহার অর্থ বুঝিল। তাহার ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ রাখিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, তাই যেন সত্যি হয়। সেদিনের অধিকার যাতে হাত ছাড়া না হয়, তাই রেখে গেলুম এই চিহ্ন।

কিন্তু সেদিন রাতে যে যুবক স্নেহের দেওয়া দুই গাছা [illegible] সম্বল করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তাহার অদৃষ্টে যে এত দুঃখ ছিল—কে জানিত! সে কথা ভাবিতেও আজ গা শিহরিয়া উঠে। চাকরির আশায় কয়েক মাস ধরিয়া কত জায়গায় না ধন্না দিয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আশা দিয়াছিল অনেকে কিন্তু আশায় বসিয়া থাকিবার মত সম্বল নরেশের ছিল না। তারপর বিত্তহীন, নিরাত্মীয় যুবকের অদৃষ্টে যাহা ঘটে তাহাই হইল। মেস হইতে বিতাড়িত, কপর্দ্দকহীন, নিরাশ্রয় হইয়া ক্ষুধার তাড়নায় অবসন্ন চিত্তে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ালো। এমনি অবস্থায় কখন যে কি ঘটিয়াছিল তাহা সে জানে না। শুধু মনে পড়ে চলিতে চলিতে সহসা মোটরের একটা তীব্র আঘাত এবং পরমুহূর্ত্তেই লুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে যেন সে শুনিতে পাইয়াছিল বহুকণ্ঠের ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ আর্ত্তনাদ।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সে হাঁসপাতালে। যাহার মোটরের তলায় সে পড়িয়াছিল তিনি একজন নামজাদা ইউরোপীয় ব্যবসাদার। সদ্য বিলাত হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অজস্র অর্থব্যয়ে নরেশ ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। তারপর সেই সাহেবের অর্থ সাহায্যে বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে গেল। কোথা দিয়া যে কি হইল তাহা ভাবিলে স্বপ্ন কথা বলিয়া মনে হয়। তেপান্তরের মাঠের পারে কে এমন করিয়া তাহার জন্য রাজভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছিল যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বিলাত যাইবার আগে নরেশ মামা মামীর খোঁজ করিতে পারে নাই। অসুখের পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজকে নিরাত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আজ মিথ্যার ভয়ে মিথ্যাকেই বড় করিল। নিজের সত্য পরিচয় দিতে পারিল না। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল বীণাকে গোপনে একখানা চিঠি দেয়। তারপর ভাবিল গোলযোগে কাজ নাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া যাহা হয় করিবে। মনে মনে বীণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আজ যাই হই না কেন তবু আমি তোমারই। তোমার কাছে আমি ত শুধু ঋণী নই—তুমি যে আমাকে বেঁধেছ চিরজীবনের বাঁধনে।

কিন্তু নিজকে ফাঁকি দিতে মানুষের জোড়া আর কেহ নাই। যখন অপরূপ সুন্দরী, সুশিক্ষিতা রেবা তাহার জীবন পথে আসিয়া পড়িল, কোথায় রহিল তাহার এই সব সঙ্কল্প। রেবার সহিত তাহার দেখা বিলাতে। বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের মেয়ে সে। রেবার মধ্যে নামটি ছাড়া আর কিছুই দেশীয় ছিল না। তাহার চলন বলন, হাসি কাশি, চিন্তা ধারণা,—জীবনের সকল দিক হইতে জোর করিয়া দেশী ছাপ দূর করিবার উগ্র চেষ্টা! নরেশও তখন মাতিয়া উঠিয়াছে সাগরপারের সভ্যতাকে জীবনের অণুতে পরমাণুতে গ্রহণ করিবার জন্য। ইউরোপীয় হইবার নেশায় তখন সে মশগুল। নিজেকে ভাঙিয়া চুরিয়া সে নতুন করিয়া গড়িতে চায়। কিন্তু বড়ঘরের বড়লোকের একমাত্র মেয়ে রেবাকে সহজে সে পায় নাই। নিজেদের সমাজেই রেবা ছিল দুর্লভ বস্তু। তাহাকে পাইবার জন্য প্রার্থীর অভাব ছিল না। নরেশের কুলশীলহীন জন্ম এবং গ্রাম্য আবেষ্টনে প্রতিপালনের কথা তুলিয়া রেবাও আপত্তি জানাইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন বাধাই টিকে নাই। যে লোক নিঃসম্বল হইয়াও এমন করিয়া দুইহাতে নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য! রেবার বাবা নরেশকেই কন্যাদান করিলেন।

* * *

ডাঃ বনার্জি আরাম কেদারার উপর পা দুইটি বিছাইয়া দিলেন। আত্মজীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। জীবনের ভবিষ্যতের কাছে রেবার হার হয় নাই। সেদিন নিতান্ত আপত্তি স্বত্তেও বিবাহ করিয়া অন্ধকার ভবিষ্যতের বুকে সে যে ঝাঁপ দিয়াছিল, অদৃষ্ট আজ তাহাকে বঞ্চনা করে নাই। গত দশ বৎসরের মধ্যে ডাঃ বনার্জির ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি এবং উন্নতির সীমা নাই। রেবা কোনদিক দিয়াই অসুখী নয়। তিনি জানেন, রেবার স্বামী সৌভাগ্য দেখিয়া সমাজের অনেক মহিলাই তাহাকে ঈর্ষা করে। কিন্তু—। ডাঃ বনার্জির চিন্তিত মুখে একটা অশান্তির রেখা যেন ফুটিয়া উঠিল। তিনি নিজকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, অদৃষ্ট কি তাঁহাকে বঞ্চনা করে নাই? সেদিন যাহাকে

লাভ করিবার আশায় তাঁহার যৌবন উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনি জীবনের কি সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন ?

এই প্রশ্ন মনে আসিতেই ডাঃ বনার্জি কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। মিসেস বনার্জি চলিয়া যাইবার পর হইতে কামরার দরজা খোলা পড়িয়া ছিল। তিনি বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যেন এ প্রশ্ন, এ চিন্তা এতই গোপন, এতই তাঁহার একান্ত নিজস্ব যে দরজা বন্ধ না করিয়া দিলে তিনি নিজকে নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ একেলা ভাবিতে পারেন না। তাঁহার যেন মনে হয় তাঁহার চারিদিকে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন গিজগিজ করিতেছে। যেন এক সহস্র লোকের মাঝে তিনি তাঁহার গোপন ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন।

দরজা বন্ধ করিতে গিয়া তাঁহার কাণে আসিল ড্রয়িং রুম হইতে ডাঃ ডাট এবং রেবার কলহাস্যের শব্দ। বিরক্তিভরে তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া রহিলেন। ডাঃ ডাট রেবার কুমারী জীবনে ডাঃ বনার্জির একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শুধু ডাঃ ডাট নয়। প্রফেসর গুপ্ত, স্যর মুকার্জিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রায় এবং আরো অনেকে। তাঁহাদের অনেকেই আজও রেবার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। কিন্তু ডাঃ ডাটের সংস্পর্শ ডাঃ বনার্জি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। ডাঃ ডাটের রুচি অতি অভব্য। সমাজে তাঁহার কুকীর্ত্তির সীমা নাই। ডাঃ বনার্জি লক্ষ্য করিয়াছেন, ডাঃ ডাটের যেদিন আবির্ভাব হয় সেদিন মাঝরাতের আগে রেবা বাড়ী ফিরিতে পারে না। সেদিন আর তাহার হুঁশ থাকে না—পানের মাত্রা অপরিমিত হইয়া যায়। ডাঃ বনার্জির একবার মনে হইল, আজ অপমান করিয়া ডাঃ ডাটকে তাড়াইয়া দিবেন যাহাতে আর কখন যেন রেবার সংস্পর্শে না আসিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কাজ নাই। ইহাতে সমাজে তাঁহার নামে কেলেঙ্কারি বাড়িবে মাত্র। বাড়ীতে না আসিতে পারিলে ক্লাবে রেবার সাক্ষাৎ পাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না।

তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ড্রয়িং কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেবাও তখন বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ডাঃ বনার্জি শান্তভাবে বলিলেন, রেবা, তুমি এখনও এমিলিদের ওখানে যাওনি ? আমি মনে করেছিলুম, চলে গেছ।

—না, যাবার জন্যে গাড়ীতে উঠছি এমন সময় ডাঃ ডাট এলেন। ওঁর বড় ইচ্ছে একবার ক্লাবটা ঘুরে যাই। মিস মিত্তির বিলেত থেকে ফিরেছে—আজ প্রথম ক্লাবে আসবে কিনা !

—ওঃ—ডাঃ বনার্জি অন্যমনস্কভাবে বললেন, তাহলে যাও। আমি ভাবছিলুম, আমার কাছে যদি একটু বস। মাথাটা বড় দপ্ দপ্ করছে।

—আমি ঠিক এই ভয়ই করছিলুম। আজ সারাদিনটা যে ভাবে তুমি একলা বসে বসে কাটালে তাতে একটা অসুখ না করে কি ছাড়বে ? নরি, লক্ষীটি, তুমি একটু শোওগে যাও। আমি রহমনকে বলছি উপর থেকে ওডিকোলন আর স্মেলিং সল্টটা নিয়ে আসতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি এসে পড়ব। ডাঃ ডাটকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়েই ফিরে আসব। এমিলির ওখানে আর যাব না।

* * * * *

মিসেস বনার্জি চলিয়া যাইতেই একটা বিদ্রূপের হাসি ডাঃ বনার্জির সারা দেহে খেলিয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন, ইহারা এই রূপই। কৃত্রিমতার আবেষ্টনে দিবা রাত্র নিঃশ্বাস লইয়া, ইহারা আর কৃত্রিমতাকে প্রবঞ্চনা বলিয়া মনে করে না। স্বামীর উপর রেবা রাগিয়া আছে কিন্তু ডাঃ ডাটের সাম্নে কেমন অন্তরঙ্গতা দেখাইল। সেই অন্তরঙ্গতা যেমন মিথ্যা, তেমি মিথ্যা তাহার কয়েকমিনিট পরে ফিরিয়া আসিবার অঙ্গীকার। ইউরোপীয়ানার মোহ এই মানুষগুলিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কৃত্রিমতার মধ্যে ইহাদের জীবনের সুখ, শান্তি আনন্দ সব বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এই ত' পাশের বাড়ীর মিঃ ও মিসেস ভোস্—তাহাদের মনোমালিন্যের সীমা নাই। দিবা রাত্র খেয়োখেয়ি চলিয়াছে। অথচ বাড়ীর বাহির হইলে তাহাদের সেই মনোমালিন্য কে বুঝিতে পারিবে ! কতই না তাহাদের মিল ! কতই প্রণয় ! সেদিন বিজি

সেনের কুকীর্ত্তিতে ত' সমাজে বাহির হইবার উপায় ছিল না। অথচ মিঃ সেন দিব্যি প্রসন্নমুখে চলাফিরা, মেলামেশা করিয়া বেড়াইতেছেন। কাল ব্যারিষ্টার মিটার পাঁচশত টাকা ধার লইয়া গেল। এরূপ আরও দুই একবার সে রেবার কাছ হইতে লইয়া গিয়াছে কিন্তু শোধ দিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই! আর দিবেই বা কোথা হইতে! ইংরেজ স্ত্রীকে টাকা যোগাইতে যোগাইতে লোকটার জীবনই ত' নষ্ট হইল। বাজারে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক তাহার দেনা। কিছু দিন পরে হয়ত তাহাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে। তবু আজও তাহার সাহেবিয়ানার কামাই নাই।

ডাঃ বনার্জ্জির মাথায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। এই,—এই তাঁহাদের সমাজ! এম্নি করিয়া পরস্পরকে ঠকাইয়া চলিয়াছে। হাসিতে কাশিতে কোথাও মানুষের স্বাধীনতা নাই। কাহারও কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। আপন আপন মুখোস খসিয়া পড়িবার ভয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে সকলেই যেন সন্ত্রস্ত। দেশ ইহাদের নাই। আপনার নিজস্ব বলিতে সভ্যতা ইহাদের নাই। ইহাদের মনই ইহাদের নিজস্ব নহে। ব্যক্তিগত আনন্দ বলিয়া ইহাদের কিছুই নাই। নিছক সামাজিকতার উপাসক ইহারা, রেওয়াজকে অবজ্ঞা করার শক্তি ইহাদের নাই। মদ খাইয়া, ক্লাব জমাইয়া, পরস্ত্রীর সহিত বাজে রসিকতায় সময় কাটাইয়া পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থের প্রসাদে ইহারা পরম আরামে দিন অতিবাহিত করে। গত কয়েক বছরের মধ্যে ডাঃ বনার্জ্জির আর কিছু পরিবর্ত্তন হোক বা না-হোক কৃত্রিম ইউরোপীয়ানার মোহ তাঁহার কাটিয়া গিয়াছিল।

পাশের টেবিলে তাঁহার নিজস্ব ফোন বাজিয়া উঠিল। ফোন ধরিতেই তাঁহার সহকারী ইংরাজীতে জানাইলেন ডাঃ মজুমদার একটা শক্ত অপারেশন কেসের জন্যে ফোন করছেন। তাঁর সঙ্গে কি আপনি কথা বলবেন?

—কি কেস?

—ডেলিভারী কেস। ডাঃ মজুমদার বলছেন, আপনি গেলে কিছু মোটারকম আদায় হবে।

ডাঃ বনার্জ্জি জবাব দিলেন, না বল আমার শরীর ভাল নেই। যেতে পারলুম না বলে আমি খুব দুঃখিত।

সাহেব গভীর আলস্যে একটা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলেন। বেয়ারা আসিয়া স্নিগ্ধ, সবুজ আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ আর কাজের লেশমাত্র নয়। দীর্ঘ দশ বৎসর কি অসাধারণ পরিশ্রম না তিনি করিয়া আসিয়াছেন! কেন? নিজেকে সাধারণ সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া কেন এই কঠোর পরিশ্রম? কার জন্য?—রেবার জন্য? ডাঃ বনার্জ্জি আপন মনেই জবাব দিলেন, না রেবার জন্য কখনই নহে। রেবাকে তিনি ঘৃণা করেন। হাঁ, এই অসাধ্যসাধনের প্রেরণা উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে তাঁহার নিজেরই ভিতর হইতে। টাকাই তাঁহার জীবনের আজ মূলমন্ত্র। টাকা উপায় করিয়া নিজেকে কলিকাতা সমাজে সকলের অগ্রগণ্য করিয়া তুলিবেন—তাঁহার প্রতিপত্তি এবং প্রভাবের সীমা থাকিবে না - ইহাই ত' আজ তাঁহার একমাত্র কামনা! কিন্তু তারপর? দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তি এবং অগাধ ধনৈশ্বর্য্য যেন তাঁহার হইল কিন্তু তাহাতে পরিণামে তাঁহার জীবনের কি দুর্লভ ফল মিলিবে? ইতিমধ্যেই ত' তিনি কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। টাকা যাহা কিছু জমাইয়াছেন তাহাতে কয়েক পুরুষ রাজহালে অলসজীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। তবু কেন তাঁহার এই অর্থোপার্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম! ডাঃ বনার্জ্জি ভাবিলেন, শেষ কি পরিণাম হইবে তাহা মানুষের বিবেচ্য নহে। জীবনে হয়ত শেষ কিছুই নাই। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া সৃষ্টির লীলা স্রষ্টার সহিত সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। হয়ত ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। জীবনে যাহা কিছু করা যায়, করার আনন্দের মধ্যেই আছে উহার শেষ সার্থকতা। টাকা উপায়ের জন্যই টাকা উপায় করা।

সাহেব দক্ষিণদিকের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। এক ঝলক পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ আলোক বহুদিন তাঁহার চোখে পড়ে নাই। রোজ এই ঘরে রাত বারটা পর্য্যন্ত তিনি পড়েন।

এম্নি পূর্ণিমার চাঁদ কতদিন কতবার হয়ত ঘরের মধ্যে হাসির ফোয়ারা তুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহিরে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার এতদিন ছিলনা। জানালার পরেই টেনিস কোর্ট। তার ওপারে কর্পোরেশনের বড় পার্ক। প্রথম হেমন্তের ঝিরঝিরে বাতাস ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খাইতে থাকে। ডাঃ বনার্জি একটা আরামের শ্বাস লইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলেন। আকাশে দুই একখানা ফিনফিনে পাতলা মেঘ চাঁদের বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোৎস্না সমস্ত পৃথিবীর বুকে যেন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সবই যেন নূতন অথচ কিছুই অজানা, অপরিচিত নহে। ডাঃ বনার্জির মনে আজ জাগিয়াছে চৈত্রের চাঞ্চল্য। জানালার ফাঁক দিয়া পথের দেবতা যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। তাঁহার মনে পড়ে বহুদিন আগেকার কথা। তাঁহার অন্তরে বিস্মরণের কূল উপছাইয়া আজ আসিয়াছে স্মৃতির বন্যা। এম্নি সুন্দর প্রকৃতির বুকেই ত' তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। একদিন, দুইদিন নয়,—প্রায় দীর্ঘ আঠারো বৎসর। এই ঝিরঝিরে বাতাসের ধ্বনির মধ্যে মনে হয় যেন রহিয়াছে তাঁহারই ক্ষুদ্র পল্লীমায়ের বনমর্ম্মর। বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে যেন গ্রামের সেই বিস্তৃত, উন্মুক্ত প্রান্তরের আহ্বান। সেই ভিজে মাটির একান্ত পরিচিত গন্ধ। কিশোরীর যৌবনের মত এই জ্যোৎস্নাই ত' তাঁহার গ্রামের আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকিত। ডাঃ বনার্জি স্বভাবতঃই চাপা। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য মোটেই ছিল না। কিন্তু আজ আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। নিজের গ্রামের কথা স্মরণ হইতেই আবার তাঁহার মনে পড়িল দুইটি সজল চক্ষু,—কালো মেঘের মমতায় স্নিগ্ধ। বিস্মৃতির মাঝে চিতা রচনা করিয়া এতদিন কোথায় ছিল এই চোখ দুটি! তাঁহার সাধ্য কি ইহাকে অবহেলা করিয়া বিস্মরণের তীরে চিরদিনের জন্য সমাহিত করিয়া রাখেন! জীবনে যাহা যায়, তাহা একেবারে যায় না। চলিয়া যাইতে যাইতে ফেলিয়া যায় এক কণা চিহ্ন,—এক টুকরা স্মৃতি। বিগত জীবনের সেই টুটা-ফুটা যাহ কিছু থাকিয়া যায়, তাহা যে মরিয়াও মরিতে চাহে না। ডাঃ বনার্জি নিজের অজ্ঞাতে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, আজ এখানে আমার পাশে যদি বীণাকে পাইতাম! প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবেগ-চঞ্চল মন যেন অনুভব করিল, বীণা আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছে। সেই বাইশ বছর আগেকার বীণা—হুবহু ঠিক যেমনটি ছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য ডাঃ বনার্জির চারিদিকে আকাশ দুলিয়া উঠিল, একটি নিবিড়, অনুভূতিময় স্বপ্নের মুহূর্ত্ত! পরক্ষণেই তাঁহার মধ্যে যে সিনিক ছিলেন তিনি হাসিয়া উঠিলেন। মানুষ নিজেকে লইয়া এম্নি ভাবে পাগলামি করিতে পারে! ডাক্তার তিনি, মনোবিজ্ঞানের কথা তাঁহার মনে পড়িল।

সহসা পাশের কামরায় উজ্জ্বল আলো জলিয়া উঠিল। সাহেবের প্রধান বেয়ারা সঙ্কুচিত ভাবে আসিয়া জানাইল, হুজুর, সানিয়াল সাহেবনে আপকে পাশ বভূতি বাবুকো ভেজা হ্যায়। ডাক্তার সাহেব হিন্দিতে বলিলেন, বভূতি বাবু কে? হিন্দিতে জবাব আসিল, দো হপ্তে ভোর যে নতুন কেরাণী বাবু ডিপপেন্সারী অফিসে কাজ করছেন তিনি।

সাহেবের হুকুমে বিভূতি ঘরে ঢুকিয়া ম্লানমুখে জানাইল, তাহার বাড়ী থেকে এই মাত্র টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহার মা মৃত্যু শয্যায়। আজ রাতের গাড়ীতেই সে বাড়ী যাইবে। ক্যাশিয়ার বাবু চলিয়া গিয়াছেন। হুজুর যদি দয়া করিয়া তাহাকে এক মাসের মাহিনা দেন! সাহেব চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির বয়স যোল সতর হইবে। ছিপ ছিপে দোহারা, মুখে একটা করুণভাব। সাহেবের মন অনুকম্পায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বাংলায় নরম সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মার কি অসুখ? সাহেবকে আজ দশ বৎসরের মধ্যে প্রথম বাংলা বলিতে শুনিয়া বেয়ারা খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, আজ বভূতি বাবুর কিসমৎ ভাল।

বিভূতি জবাব দিল, প্রথমে একটু একটু ঘুসঘুসে জ্বর হত। তারপর একবার খুব সর্দি হয় আর গলা ভেঙে যায়। সেই থেকে মাঝে মাঝে কাশতেন। দুমাস আগে এক

খানা চিঠি পেয়েছিলুম, একদিন মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠেছিল। শুনে কবিরাজ মশায়ের কাছ থেকে ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর সব চিঠিতেই লিখতেন, ভাল আছি। আমি পরশুও আবার ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছি। আবেগে ছেলেটির স্বর বন্ধ হইয়া আসিল।

সাহেব বলিলেন, আমাকে আগে বলনি কেন? তিনি তাড়াতাড়ি নিজের মনিব্যাগ হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বেয়ারাকে বলিলেন, এটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসে বাবুকে দে। দশ টাকার দশখানা নোট আনবি,—নাঃ, কিছু খুচরো আনিস।

বেয়ারা চলিয়া গেলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাতেই ট্রেণ পাবে?—তোমাদের বাড়ী কোথায়?

—আজ্ঞে বর্দ্ধমান জেলায় ভুবনপুরে।

—ভুবনপুরে? পাতিমডাঙা চেন? সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

—খুব চিনি, হুজুর। ওখানেই ত' আমার মা রয়েছেন। আমিও ওখানে থেকেই মানুষ হয়েছি। আপনি সেখানে গেছেন কখন?

—হ্যাঁ,—না, ঠিক যাইনি। তবে আমার এক বন্ধুর দেশ সেখানে। সাহেব নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, কাদের বাড়ী তুমি থাকতে?

—গোলোক মুখুজ্জেদের বাড়ীতে। তিনি আমার মার পিসেমশাই হতেন। ভুবনপুরে আমার বাবার বাড়ী কিন্তু আমি যে বছরে জন্মাই সেই বছরেই তিনি মারা যান। তারপর থেকে—। অনুকম্পায় সাহস পাইয়া ছেলেটি আপন কাহিনী বলিয়া যায়।

এদিকে ডাঃ বনার্জ্জির সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নের মায়ামরীচিকার উপর বাস্তবের কি রূঢ় আঘাত! হঠাৎ ছেলেটির কথা স্রোতে বাধা দিয়া ডাক্তার রূঢ়কণ্ঠে ইংরেজীতে বলিলেন; তুমি যাও। আমায় আর বিরক্ত করো না। লাটুর কাছ থেকে টাকা পাবে। কি [?—না, আর একটিও কথা নয়। যাও।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৪০০ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আজি হতে শত বর্ষ আগে,
তুমি যে রচিয়াছিলে শতমূর্ত্ত রাগে
মদির মধুর ছন্দ আজিকার সবাকার তরে
গাহিতেছি সেই গাথা নিরজন ঘরে—
"কৌতূহল ভরে"।
সে দিনের মানবের সুখ দুঃখ হাসি,
"বিরহমিলন কথা", বেদনাশ্রু রাশি;
অমৃত-আনন্দভরা শরৎ প্রভাত,
সে দিনের ফুলে গন্ধে গানে ভরা রাত,
ধূসরগোধূলি লগ্নে সেদিনের সেই রক্ত রাগ,
"অনুরাগে সিক্ত করি" পাঠায়েছো যে তাহার ভাগ-
লয়েছি হৃদয়ভরি নিবিড় আনন্দ ভরে—
তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে।

আজি বসি দক্ষিণের মুক্ত বাতায়নে,—
তব গানে গানে
যে-অতীত হেছে ধরা মানস সম্মুখে—
হেরিতেছি রূপ তার পরম উৎসুকে।

ভাবিতেছি,—অতীতের সেই দূর পুরে
একদিন যৌবনের সুরে
এমনি রাঙিয়াছিল ধরা;
এমনি বাঁধনহরা
বনপুষ্পগন্ধবহ ফাল্গুন প্রভাতে
নিখিলে করিয়াছিল দৃপ্ত মূর্চ্ছনাতে
আবেশ বিহ্বল।
সেদিন জাগিয়াছিল আবেগ-চঞ্চল
যে কবি তরুণ—
আশীষিল যারে বালারুণ,
নবীন হৃদয় প্রাণে,
পরাণ উতলা গানে,
গঙ্গোত্রীর চিরন্তন তানে,
কানন কুসুমসম প্রকাশের সার্থক বেদনে,
একদিন শত বর্ষ আগে—
আজ মনে জাগে।

ওগো বিশ্বকবি,
আজিকে করিছে গান যে নবীন কবি,
তোমা হতে শত বর্ষ পরে,
আমাদের ঘরে—
নহে সে নূতন;
গাহিছে সে তোমারই বাণী চিরন্তন
রচেছিলে যাহা কোন্ শ্যামস্নিগ্ধ প্রান্তে
"অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে"।
সেদিনের বসন্তের যে অভিবাদন,
যে তোমার আশীর্ব্বাচন,
পাঠায়েছো আজিকার দীন কবি-করে,
লয়েছে সে নতশিরে শত শ্রদ্ধাভরে।
লও কবি তুমি তার অন্তরের অন্তর্গূঢ়
নৈবেদ্য
ভেদি কালসমুদ্র অকূল।

কবিবর,
তোমার বীণার স্বর,
তোমার বসন্তগান বর্ষ বর্ষ ধরি'
বিশ্ববাসি জনে র'বে সঞ্জীবিত করি;
সবাকার বসন্তের হৃদয় স্পন্দনে,
কুসুমিত বনানীর পল্লবস্বননে,
মূর্ত্ত হয়েছিলো যাহা তোমার বসন্তক্ষণে
একদিন রূপে, রসে, রাগে—
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে।

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যে সৌন্দর্য্যানুভূতি

শ্রীসুনীলবরণ ঘোষ

আর্য্যগণ বহু পুরাতন কাল হইতেই পূর্ণতার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্ব সৃষ্টিকে মানবের সহিত একাত্মভাবে দেখিয়াছিলেন। মনোজগতের সহিত বাহ্য জগতের অভিন্ন সম্বন্ধের মধ্যেই তাঁহারা পূর্ণতার রস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য কামনার চরিতার্থতায় এবং তজ্জনিত ক্ষণিক আনন্দে তাঁহারা ভোরপুর হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কারণ ইহার ভিত্তি পরিপূর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই আর্য্য সাহিত্যে কামনার বাহ্য সৌন্দর্য্য সমারোহ সর্ব্বত্র প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াছে; কারণ ভোগ প্রবৃত্তি জনিত সুখাকাঙ্ক্ষা তাঁহারা মনুষ্য জীবনের চরম আদর্শ করিয়া লইতে পারেন নাই। প্রবৃত্তিমার্গের বাহ্যিক সুষমায় তাঁহারা সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই;

কারণ তাহা ক্ষণিক সুন্দর, আপাতমধুর ও আংশিক। তাঁহাদের চক্ষে সুন্দর তাহা যাহা নিত্য এবং মঙ্গলময়। সুন্দর, সত্য এবং মঙ্গল এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত যে একটিকে ছাড়িয়া দিলে অপরটি অঙ্গহীন এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেরূপ বিভিন্ন অবয়ব পরস্পর পরস্পরের সৌষ্ঠব সাধন করিয়া পরস্পরে বিলীন হইয়া মানবের সম্পূর্ণ সুগঠন দেহটির রচনা করে, সেইরূপ সুন্দর সত্য ও মঙ্গল রূপ গুণত্রয় পরস্পরে লীন হইয়া সৃষ্টি করে একটি সম্পূর্ণতার। প্রাচ্য সাহিত্যে এই পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। তাঁহাদের নিকট সৌন্দর্য্য ভূষণসম্ভূত নহে, তাহা বস্তুর বাস্তবতা ও মঙ্গলময় পরিণতিতে সন্নিবিষ্ট। ইংরাজ কবি কীটস্-এর চিন্তা ধারা আর্য্যদিগের সৌন্দর্য্যানুভূতির অনুরূপ; যথা—"Beauty is truth, truth beauty,—that is all ye know on earth, and all ye need to know". তাই দেখি গিরিবালা অলোকসামান্য বাহ্যিক রূপ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলা যৌবন রস লাবণ্যময় রূপ লইয়া মানসপটে কল্পনা লোকের কত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দুষ্মন্তের নিকট কঠোর প্রত্যাখ্যান লাভ করিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার ভোগলিপ্সা যখন অত্যধিক উৎকটাকার ধারণ করিল তখন নেপথ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল ভারতের পুরাতন আদর্শ বাণী—চক্রবধূকে "আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ উপস্থিতা রজনী"। সত্যই এই সময়ে তাহাদের একান্ত ভোগলোলোকোচিত কামকলঙ্কিত মিলনের মধ্যে একটা ঘোর তামস যবনিকা পতিত হইল কারণ তাহা অসম্পূর্ণ, চঞ্চল ও অমঙ্গল। এই বিচ্ছেদ সেই তামসী যবনিকা অপসারিত করিয়া অন্তরের নিগূঢ় ভূষণসম্ভূত বাহ্য সৌন্দর্য্যহীন সত্যময় সুন্দরকে বাহির করিয়া পবিত্র, সম্পূর্ণ ও শান্তিময় মিলন সম্পন্ন করিল।

ইহা হইতে পুনরায় বুঝা যায় যে আর্য্যগণ অতি পুরাকালেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন জগৎ-সৃষ্টি মাঝে একান্ত বিচ্ছেদ বলিতে কিছু নাই; বিচ্ছেদ বলিতে তাহাই বুঝায় যাহা অসম্পূর্ণ মিলনকে সম্পূর্ণাকারে পরিণত করে। সূর্য্যদেব উদয়াচল আরোহণ করিয়া অন্ধকার নিরাকৃত করিলে পুনরায় চক্রবাকমিথুন মিলিত হয়; সেই বিচ্ছেদেরও একটা অপূর্ব জ্যোতিঃ আছে যাহার আগমে বাসনাময় তমঃ বিনষ্ট হইয়া পূর্ণতর শুভ মিলন সাধিত হয়; সুতরাং বিচ্ছেদকে মিলন হইতে পৃথক করিয়া আর্য্য কবিরা দেখিতে পারেন নাই। বিচ্ছেদ চিত্তশুদ্ধি সমাধা করিয়া বস্তুর সত্তা বাহির করিয়া তাহাকে সত্যের বিগ্রহ করিয়া স্থাপন করে।

এই বিচ্ছেদ না থাকিলে হৃদয়ের আবিলতা দূরীকৃত হইয়া পূর্ণ মিলন হয় না। তাই যক্ষ বিচ্ছেদকে প্রেমধ্বংসকারী বলিয়া মনে করে নাই—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি॥"

উত্তরমেঘ—৫১।

প্রাচ্য কবিগণ হৃদয়ের পবিত্রতাতেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অবসর সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য এরূপ একটি ব্রাহ্মী স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে সেই সুষমা চঞ্চলাত্মিকা নয়; তাহা সর্বদাই শান্তিময় এবং নিত্য। এরূপ নিখুঁত সৌন্দর্য্যের এরূপ সজীব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন সেই প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণ যাঁহারা ভোগলোকের চিত্রকে পর্য্যন্ত সেই রংএ রঙাইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীসুনীলবরণ ঘোষ

ভূষণ ও নন্দরাণী

শ্রীবিনয় চৌধুরী

"পাগল পেয়েছে সব আমাকে, পাগল? যত ভাবি করবো না কারও সঙ্গে অসরস—"ভূষণ বাড়ী ঢুকিয়া উঠানের মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইল। দ্রুতপদে আসিতে আসিতে থপ করিয়া থামিয়া পড়ে ভূষণ। তুমি ভূষণকে না চিনিলে নিশ্চয় ভাবিবে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এমনি থামাকা থামিয়া পড়িয়া লোককে চমকাইয়া দেয় ভূষণ। ক্ষণকাল তোমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া যা খুসী বলিয়া দিবে একটা কিছু; বলিয়া মাথা চুলকায়। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতি লোকটার। কথা কহিতেছে তোমার সঙ্গে, আর ক্রমাগত এক পায়ের উপর হইতে অন্য পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতেছে,—চাহিবে ত পিট পিট করিয়া,—নয় ত আঙ্গুলে আঙ্গুলে গলাইয়া দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নানান্ অঙ্গভঙ্গি করিতেছে। বহুবার তিরস্কার করিয়াছি ভূষণকে এজন্য, ভূষণ অপ্রস্তুত হইয়া একপ্রকার অদ্ভুত ধরণের হাসি হাসে, কিন্তু যার যাহা স্বভাব, কখনো বদ্লায় না।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভূষণ কি ভাবিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া মনে করিয়া লইল হয়ত কি করিতে বাড়ী আসিয়াছে। তারপর হাতের দা'খানা রাখিয়া দিল ঘরের দাওয়ায়। না, কে আবার হাত পা কাটিয়া ফেলিবে, দা'খানা চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

"মনে করে সব ভারি চালাক? এম্-এ, বি-এ, পাশ সব! আরে, আমার কাছে আসিস্ চালাকি করতে? এক মিনিটে সব ঠাণ্ডা করে দিতে পারি তা জানিস্? বলে কিনা, গান্ধীর চেলা—মহা পণ্ডিত একেবারে—"

ভর্ত্তি ঘড়া কাঁখে করিয়া নন্দরাণী এই সময় স্নান করিয়া আসিল। ঘড়াটা রান্নাঘরে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে লাগিল। শুনিয়া শুনিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে নন্দর; ভূষণের কথায় তার এখন আর কৌতূহল জাগে না বিন্দুমাত্র। সারাদিন এমনি কত কাণ্ড যে ঘটিতেছে ভূষণের, কান পাতিয়া শুনিতে গেলে সংসার ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে হইবে নন্দর। লোকে শুনুক চাই না শুনুক, আপন মনে বকিয়া যাওয়াই ভূষণের স্বভাব।

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। চৈত্রমাসের শেষাশেষি, রোদের তেজ এই সকালেই বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। রান্নার তাড়া নাই যদিও বিশেষ কোনও, খাওয়া দাওয়া আছে ত তবু সকলের, ভূষণের কথায় সায় দিলে হইয়াছে আর কি?

"যত নচ্ছার লোকের আমদানী হয়েছে গাঁয়ে।—ভদ্রস্থ থাকবে না আর কারও, দেখে নিও।"

সেজন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এই সকালে ভূষণের মাথা গরম করিবার কি এমন আশু প্রয়োজন হইল জানি না! নন্দ বলিল—"ঘাটে দেখলাম, গোলের নৌকো এসেছে, দেখে এস না একবার খোঁজ নিয়ে,—সেদিনকার ঝড়ে ত ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে চাল—"

কটমট করিয়া নন্দর আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল ভূষণ—খুব কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে নন্দ! বলিল—"সে হবে'খন, তোমার অত পাকামি করতে হবে না—"

"ভাল, পাকামি করা হয় ত আর বলবো না—" নন্দ চলিয়া গেল।

"আমার হয়েছে উভয়সঙ্কট! ঘরে বাইরে সমান! বাড়ী এসে শোন—নেই, নেই, আর—

দাওয়ায় বসান গাড়ুটা নাড়িয়া দেখিল ভূষণ সেটা খালি। রাগ হয় কি ভূষণের সাধে? জীবনে সে কোনো দিন দেখিল না গাড়ুটায় জল আছে!

"একটু জল দিয়ে যাও গাড়ুটাতে, না বললে ত আর হুঁস হবে না তোমার কোনোদিন ?"

রান্না ঘরের পিছনে বাঁশের আলনায় নন্দ ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতেছিল—বলিল, 'যাই।'

"যাই ? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে উমেদারিতে ?"

এক মিনিটও কাটে নাই, নন্দ আসিয়া ঘড়া লইয়া গাড়ুতে জল ঢালিবার উপক্রম করিতেই সেটা তুলিয়া লইয়া ভূষণ বলিয়া উঠিল—"থাক্ থাক্, আর দরকার নেই—হাত পা পড়ে যায় নি এখনো আমার।" বলিতে বলিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

ভূষণের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইবার সময় চলিয়া গিয়াছে নন্দর। ঘড়াটা মাটিতে রাখিয়া বলে—"আগেই ভাবলে হতো সেটা—"

"সে আমার ইচ্ছে—"

কি যে ভূষণের ইচ্ছা আর কি নয় আজ দশ বৎসর ভূষণের ঘর করিয়াও তাহা ঠিক বোধগম্য হইল না নন্দর। দিনের মধ্যে অন্ততঃ বিশবার মুখ হাত ধুইবে, মাথায় জল ঢালিবে ভূষণ, বাড়ীর নিচেই ত বেত্রবতী,—ভুলিয়াও একবার সেমুখো হইবে না। একবার যদি গাড়ুতে জল না পাইল ত আর রক্ষা নাই! বসিয়া বসিয়া কত গল্প করিবে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জলের পোকা ভূষণ কত সাঁতার কাটিয়াছে বেত্রবতীর জলে—অথচ নন্দ ত দেখিল না কোনো দিন চর্ম্ম চক্ষে; নিতান্ত নহিলে নয়, তাই স্নান করিতে একবার জলে নামে, দুই কাণে আঙুল গুঁজিয়া কোনোমতে গোটা দুই ডুব দিয়া উঠিয়া পড়ে ধড় মড় করিয়া। কিন্তু তুমি বলিয়া দেখিও একবার ভূষণকে সে কথা!

আত্মম্ভরী ও অভিমানী, মনেরও অন্ত মিলিল না আজ পর্য্যন্ত। ভূষণের হাতে পড়িয়া ভয়ে ভয়েই জীবন কাটিল নন্দর! মুখ ফুটিয়া কোনোদিন ভূষণ জানাইবেনা, কি তার প্রয়োজন, অথচ চাই ষোল আনা। বলে, বলিলে ত পাড়ার লোকেও আসিয়া করিয়া দিবে, বিবাহ করা তবে কি জন্য ? কিন্তু নন্দ ত আর অন্তর্যামী নয়! তা ছাড়া খামখেয়ালী লোকের ত মতির স্থিরতা নাই কোনো! তাই, কোন্ মন্ত্রে যে দেবতাকে তুষ্ট করা যায় নন্দ তাহা আজও আবিষ্কার করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা তার পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। ক্ষুব্ধ ভূষণ ভাবে অহঙ্কারী মেয়ে নন্দ ইচ্ছা করিয়া তাকে অবহেলা করে, অগ্রাহ্য করে। ভাবিয়া রাগ হয় ভূষণের। নন্দর অপরাধ ধরা পড়ে তখন পদে পদে। শেষ পর্য্যন্ত একটা ঝগড়া ঝাঁটি হইয়া গেলে তবে ভূষণ শান্ত হয়।

অন্ন আসিয়া বলিল—"মাছ কিনবে মা ? নামিয়েছে জ্যেঠাদের উঠানে, ডাকবো ?"

নন্দ অতিকষ্টে উনান ধরাইয়া এতক্ষণে রান্না চাপাইয়াছে। এক একদিন কি যে হয়, কিছুতেই কাঠ জ্বলিতে চাহে না। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—"নিয়ে আয় ডেকে।"

দুখী জেলে মাছ বেচিতে আসিয়াছিল, অন্নর পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল—"মাছ নিবা নাকি মা-ঠাকরুণ, না, ডেকে ফিরিয়ে দেবা ? ভাল মাছ আনিচি—"

লোকটা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ আর তিরিক্ষি মেজাজের। নন্দ বলিল—"তোমার কাছ থেকে কি পারবো আমরা মাছ নিতে ? নামাও ত দেখি—"

ডালি নামাইয়া মুঠা কতক চেলা পুঁটি ও পাবদা মাছ ডালার উপর রাখিয়া দুখীরাম বলিল "নাও, চার পয়সা। দরদস্তুর নেই আমার কাছে, এক কথা,—দেরি করতে পারবো না, ধরো—"

"ঐ কটা নাকি চার পয়সায় ? আর গোটা কতক দাও—" নন্দ খারা আনিয়া ধরিল।

"পেন্নাম হই ঠাকুর মশায়! দেখেন দিনি একি কম হয়েছে চার পয়সায় হক্কে।"

ভূষণ ফিরিয়া আসিবার আগেই মাছ কটা ঘরে তুলিয়া দুখীরামকে বিদায় করিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু এখন আর উপায় কি! নন্দ বলিল—"ও হয়নি বাপু, দাও আর চারটি।"

ভূষণ আগাইয়া আসিয়া বলিল—"জুটেছ এসে সক্কাল বেলাই ? কই—কি মাছ দিচ্ছ দেখি ?

"এজ্ঞে, এই চেলা পুঁটি—"

"থাম দিকিনি—তোল আর দুটো পাবদা, তোল ডালায়—"

"খাবা ত দুজন লোকে,—কি করবা এক কাঁড়ি মাছ—" আরও গোটা দুই মাছ তুলিয়া দুখীরাম বলিল—"বড় ত্যক্ত করো তোমরা ঠাকুর—খ্যাও, পয়সা নি এসো—" ভূষণকে ডাকিয়া নন্দ বলিল—"পয়সা দাও দিকিনি গোটা চারেক—"

"পয়সা নেই—"

"চারটে পয়সাও নেই—?"

"না নেই—"

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল নন্দ মিনিট খানেক—তারপর দুখীরামকে বলিল—"কাল নিয়ে যেও এসে পয়সা কটা—"

"ঐ তোমাদের বড় ইয়ে! এই জন্যই ত আসিনে বামুন পাড়ায়। কেবল ধার চাবা! ধার আমি দিতে পারবো না—"

"না পার তোমার মাছ নিয়ে যাও—" ডালার উপর নন্দ মাছের খারা উবুড় করিয়া দিল।

"নিবানা, কিছু না, দেরী করবা খালি অনাথক! তখুনি কয়েলাম—"

দুখীরাম চলিয়া গেলে ভূষণ বলিল—"ফিরিয়ে দিলে যে বড়—।"

নন্দ রান্না ঘরে গিয়াছে ততক্ষণে, বলিল, "কি করবো, পয়সা নেই বললে—"

"পয়সা নেই বললে—আছে কি না আছে তুমি জানলা?"

"অত জানিনে বাপু"

"তা জানবে কেন? আত্ম অহঙ্কারেই মলে যে? না হয় তোমার বাবা বড়লোক অনেক আছে তাই বলে চারটে পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই আমার? নিয়ে ফিরিয়ে দিলে মাছকটা—"

নন্দ আর জবাব দিল না। বস্তুতঃ পয়সা ভূষণের আছে এবং না দিবারও ইচ্ছা ছিলনা তার। পয়সার জন্য নন্দ পাঁচবার তাকে বলিবে, সে নাই বলিয়া হাঁকাইয়া দিবে, অবশেষে পয়সা কয়টা ফেলিয়া দিবে কর্ত্তৃসুলভ দাক্ষিণ্য দেখাইয়া—মস্ত একটা পরিহাস হইবে, ভূষণ ভাবিয়াছিল। ভূষণের পরিহাস এই ধরণের। কিন্তু নন্দর ঐ বড় দোষ আদৌ ধরিতে পারে না ভূষণের মনের ভাব। এবং তার কথাবার্ত্তা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। ভূষণ হাজার বকিয়া মরিলেও দুই চারিটার অধিক কথা নন্দর মুখ দিয়া বাহির হয় না সহজে। ভাবলেশহীন নন্দর গম্ভীর মুখ দেখিয়া ভূষণের আপাদমস্তক জলিয়া যায়। সে কি নন্দর কথার যোগ্য লোকই নয়? সে পুরুষ মানুষ, নানান্ ঝঞ্ঝাটে ফিরিতে হয় তাকে, ওজন করিয়া কথা বলা তার পক্ষে কি সব সময়ে সম্ভব? সে কখনো রাগিয়া দুটা শক্ত কথা বলিতে পারে, আবার এক সময় হাসিয়া কথা কহিবে, মেয়ে মানুষের দুইটাই সমান ভাবে মানিয়া লওয়া উচিৎ অম্লান বদনে, ভূষণ ইহাই বোঝে। কিন্তু নন্দ কোনোদিন তাহা বুঝিল না।

"বড় মানষি চাল ওসব, বুঝিনে কিছু কি আর? টেক্কা দেওয়া হলো আমার উপর। আমার উপর টেক্কা? আমার কি ক্ষতিটে হলো? মাছ না হলেও আমার ঢের চলে—" খাতা পত্র পাড়িয়া লইয়া ভূষণ লিখাপড়া করিতে বসিল। রেজিষ্ট্রী অপিসে সে দলিল লেখার কাজ করে, এই সময় তামাদির মুখে তার প্রচুর কাজ; অপিস ত আছেই সকাল সন্ধ্যায়, বাড়ীতে বসিয়া লিখিয়াও ফুরাইতে পারে না। লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া এক একবার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া দেখে রুষ্ট দৃষ্টিতে, আর অবিশ্রাম বকিয়া যায় আপন মনে।

নন্দও নীরবে যথাকর্ত্তব্য করিয়া যায়। কাণ দেয় না ভূষণের কথায়। কিন্তু এক সঙ্গে থাকিয়া সংসার করিয়া সব সময় কিছু নির্ব্বিকারভাবে পাশ কাটাইয়া চলা যায় না, বা অপর পক্ষের সকল অসঙ্গত কথায় সায় দিয়া যাওয়াও সম্ভব নয়। বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে কাল রাত্রে। খাওয়া দাওয়ার পর শুইয়া শুইয়া ভূষণ পা নাচাইতেছিল খোস মেজাজে। নন্দ আসিয়া শুইয়া পড়িলে বলিল—"যার মা নেই, বুঝলে একেবারে হতচ্ছাড়া সে।"

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না হইলে তোমার সাধ্য নাই বলিতে পার কোন দুর্নিবার্য্য পরিণতির ইহা হইল অবতরণিকা। কিন্তু ভূষণের এই সব মতবাদ যে বিপজ্জনক চোরাবালি সে শিক্ষা হইয়াছে নন্দর। তা ছাড়া শুইয়া শুইয়া বক বক করিতে তার ভাল লাগে না। নন্দ চুপ করিয়া রহিল।

ভূষণ হাতের উপর মাথা রাখিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া বলিল "যদি বলো কেন, ত ঐ হেজো মুখুজ্জের কথাই ধরো। খাওবা করে খাচ্ছিল দুমুঠো, মা-টা মরবার পর একদম বকে গেল ছোঁড়া, একদম বকে গেল—"

যে লোক নেশা করিয়া সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে নিজের মা থাকিলেই কি তাকে ঠেকাইতে পারে? আর মা ত কাহারও অমর নয়—বাঁচিয়া থাকিলে একদিন সকলকেই মাতৃহীন হইতে হয়। কিন্তু সে কথা বলিয়া লাভ নাই ভূষণকে।

তবু নন্দ বলিল—"ঐ নেশাখোরের কথা আর বলো না—"

"কেন, বলবো না কেন? নেশা করে বলে' আর সে মানুষই না তোমার কাছে? আচ্ছা, তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বলছ নেশা করে—আমার বেলা কি বলবে? মা যাবার পর থেকে আর সুখের মুখ দেখলাম না, দেখিছি? তুমিই বল?"

কি বলিবে নন্দ? মাতৃহীন ভূষণের কোথায় যে অ-সুখ তাহা নন্দ কি করিয়া জানিবে? পয়সা কড়ির দিক দিয়া তখন ছিল সংসারে অভাব আর এখন আসিয়াছে সচ্ছলতা! এবং উপযুক্ত ছেলের কতটুকু সেবাই মায়ে করিতে পারে? কিন্তু ভূষণ বলিবে "মা ছিলেন সংসারের লক্ষ্মী, ভাবনা ছিল কি আমার আজ মা বেঁচে থাকলে।" ভূষণ দুপয়সা রোজগার করে, ভূষণের ধারণা, সেজন্য গ্রামের লোক ত বটেই নন্দও মনে মনে ঈর্ষা করে তাকে। এবং এ কথা সে নন্দকে জানাইয়া দিতেও কসুর করে না। নন্দ হাই তুলিয়া ঘুমে জড়ানো সুরে বলিল, "সে ত ঠিকই, মা আর কার খারাপ হয়—।" হঠাৎ মুখ বিকৃত করিয়া ভূষণ বলিয়া ওঠে—"তবে তোমার মত বাপ মা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, মরে গেলেও যারা খোঁজ নেয় না মেয়ের—"

ইহা নন্দর স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, তাই বলিয়া নিস্কৃতিও নাই নন্দর। যত মন্দই হৌক, মুখের উপর মা-বাবার নিন্দা করিলে মনে ব্যথা পায় লোকে, এবং অমন নিন্দা করাটাও ঠিক নয়, ভূষণ তাহা বোঝে, কিন্তু সে থামিতে পারে না। অন্যায় বুঝিয়াই আরও তার রোখ চাপিয়া যায়। ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কি, অমনি অভিমান হলো নাকি? ইঃ ভারিত ইয়ে, তার আবার—"

প্রথম প্রথম নন্দ আপত্তি করিয়াছে। অকারণে বাপ-মায়ের কথা তুলিয়া তাকে পীড়া দিয়া কি লাভ হয় ভূষণের। ফলে উল্টা উৎপত্তি হয়, ভূষণ আরও জোর দিয়া বলে—"সত্যি কথা বলবো তার আবার লাভ লোকসান কি?"

নন্দ কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। নন্দর এই নিরুত্তর চুপ করিয়া যাওয়াটাই ভূষণ একেবারে পছন্দ করে না, কথা বলিতে কি এতই কষ্ট হয়? আসলে ভূষণের সাথে আদৌ খাপ খায় না নন্দ। এমন একটা সুকুমার মার্জ্জিত ভাব ফুটিয়া ওঠে নন্দর ধরণ ধারণে যাহা ভূষণের ধারণাতীত। পারত পক্ষে সে ভূষণের ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করে না, কিন্তু তার স্বভাবে যে অনাড়ম্বর প্রকৃতিগত বিরুদ্ধতা রহিয়াছে, ভূষণ বরদাস্ত করিতে পারে না তাহাই! তাই রাগিয়া চেঁচাইয়া আস্ফালন করিয়া ভূষণ অনর্থ বাধাইয়া তোলে, তবু ঐ রোগা ঢ্যাঙা, স্বল্পভাষিণীকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারে না,—শীর্ণ হাত দুইটা যার সে শক্ত মুঠার মধ্যে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে পারে জুলুম করিয়া যাকে সে কাঁদাইতে পারে, এমন কি তাকে সে খাইতে নাও দিতে পারে।

কি একটা লইতে নন্দ এঘরে আসিয়াছিল। ভূষণ ডাকিয়া বলিল—"শোন—" নন্দ ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভূষণের মুখের দিকে চাহিল।

"আরে, শোনই না, এদিকে এসে—।"

"কি বল" বলিয়া নন্দ আগাইয়া আসিল।

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত খাদে নামাইয়া ভূষণ বলিল—"বলেছ নাকি কাউকে সে কথা?"

"কোন কথা?"

"না—কিছু বুঝতে পার না তুমি? ঐ জমির ব্যাপারটা—বুঝলে না?"

ওঃ—এতক্ষণে নন্দর মাথায় ঢুকিল। বসন্ত ময়রার নিকট হইতে একটা জমি কিনিবার মতলবে আছে ভূষণ, নন্দ তাহা জানে। "কাকে আবার বলতে যাব আমি সে কথা?"

"না তাই বলছিলাম—। রামেশ্বরটা আবার বড় মুখ পাতলা, কথায় কথায় বলে ফেললুম ফস্ করে'—কি জানি

গাঁময় গাবিয়ে না বেড়ায় এখন—" ভূষণ ফের খৎ লেখায় মন দিল।

খানিকটা পরে নন্দ আসিয়া বলিল—"তেল আনতে হবে।" ভূষণ লিখিয়াই চলিল, কোনো জবাব দিল না। নন্দ আবার বলিল, "শুনছ, তেল আনতে হবে—আর একটা ইঁচোড় পেড়ে দাও গাছ থেকে।"

"আঃ, বড় বিরক্ত করো তুমি কাজের সময়। এখন হবে না, যাও।"

মহা মুশকিল হইয়াছে নন্দর। খাইতে বসিয়া এতটুকু ত্রুটী হইলে চলিবে না, অথচ একবার বলিলে যদি কিছু আনিয়া দিবে কোন সময়!

"না আনলে রান্না হবে না আজ তা বলে দিলাম—"

ভূষণ আকাশ হইতে পড়ে। এই ত সেদিন আনিয়া দিয়াছে তেল—আর আজ তিন দিন হয় নাই এক মোট তরি-তরকারি আনিয়াছে হাট হইতে। সঙ্কল্প করিয়া লাগিয়াছে নন্দ ভুবণকে ফতুর না করিয়া ছাড়িবে ন। "তেল টেল আজ হবে না, যাও—"

"তেল না হয় না আনো, ইঁচোড় ত একটা পেড়ে দাও—"

এক মুহূর্ত্ত যদি ভূষণকে স্বস্তিতে বসিতে দিবে নন্দ! দপ্তর গুটাইয়া ভূষণ উঠিয়া পড়িল। হঠাৎ নন্দর দিকে চাহিয়া খিঁচাইয়া উঠিল, "অত হাসি হচ্ছে কেন—হাসির কি কাজ হয়েছে?"

উপরের ঠোঁটটা নন্দর ঈষৎ খাটো বলিয়া মুখ বুঝিয়া থাকিলে ঠোঁটের প্রান্ত দুটি বারবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, ভূষণ ভাবে, নন্দ মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। যত আক্রোশ ভূষণের ঐ হাসির উপর। সে কি সঙ না পাগল যে কথায় কথায় এমনি উপহাস করা!

নন্দ অবাক্ হইয়া বলিল—"হাসতে দেখলে আবার কোথায়!"

"না, হাসছ না? ঠাট্টা পেয়েছ আমার সঙ্গে, সব সময় ঠাট্টা—"

এমনি করিয়া দিন কাটে নন্দর। বিবাহের পর হইতে এযাবৎ কাটিয়াছে, বাকী জীবনও তাহার এই ভাবেই কাটিবে। আমি বলিতে পারি না নিজের দুর্ভাগ্য লইয়া নন্দ দুঃখ করে কিনা। দশ বছর বিবাহের পরেও অদৃষ্টকে অস্বীকার করিয়া দুঃখ করিবার মত মন কি আছে নন্দর,—পাড়া গাঁয়ের কোনো এক সংসারে জন্মিয়া যে বাংলাদেশের পাড়া গাঁয়ের আর এক সংসারে আসিয়াছে ঘর করিতে? তারই সমান ভাগ্যবতী মা ঠাকুরমার নিকট হইতেই ত তার শিক্ষা দীক্ষা! ঘা খাইয়া খাইয়া অনুভূতির জগতে মৃত্যু ঘটিয়াছে হয়ত নন্দর, নতুবা হাসিমুখে বলিতে পারে সে তার দুর্দ্দশার কাহিনী? বলে—শোন আমাদের প্রথম দেখা সাক্ষাতের কথা। ফুলশয্যার রাত—"

একই বিছানায়—খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া দুজনে শুইয়াছিল। ভূষণই প্রথম কথা কহিয়াছিল,—"মন কেমন করছে নাকি তোমার বাড়ীর জন্যে" এবং নন্দকে জবাব দিবার অবসর না দিয়াই আবার বলিয়াছিল—"যা যা দেবার কথা ছিল সব কিন্তু দেয় নি তোমার বাবা।" বিবাহে ভূষণ যৌতুক পাইয়াছিল প্রচুর, তবু এই অভিযোগ সত্য এবং ইহাই নন্দর দাম্পত্য জীবনে প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ।

"কি, কথা কও না যে, বোবা নাকি?"

কি কথা কহিবে নন্দ! শুনিয়া শুনিয়া বিবাহের আগেই মেয়েরা কল্পনায় একটা স্বপ্নময় অবাস্তব জগৎ তৈরি করিয়া রাখে মনে মনে; এইভাবে রূঢ় আঘাতে যদি তাহা ভাঙিয়া যায়—কথা জোগায় কি নববধূর? হয়ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকিবে নন্দ—ভূষণ বলিয়াছিল, "অত প্যান প্যানে স্বভাব কেন তোমার—"

নন্দর স্পষ্ট মনে রহিয়াছে কথাগুলা। এক সময় হাত ধরিয়া নন্দকে কাছে টানিতে গিয়া ভূষণ বলিয়াছিল—"বাঃ বেশ নরম ত' তোমার হাত! কাজ করতে হতো না বুঝি বাপের বাড়ী। হতো না বোধ হয়, না? তোমরাত বড়লোক—! আমাদের বাড়ী কিন্তু কাজ করতে হবে—"

যত অসঙ্গত খাপছাড়া কথা। নন্দকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তারপর ভূষণ বলিয়াছিল, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে না হয়ে যদি আর কারো সাথে তোমার বিয়ে হতো—?" কি অদ্ভুত প্রশ্ন! কি জবাব দিবে নন্দ একথায়? ভূষণ

নিরুত্তর নন্দকে তখন বলিয়াছিল—"আমাকে পছন্দ হয়নি তোমার, না ?"

যাকে চিনিল না এখনও ভালরূপে, তা ছাড়া মন্ত্র পড়িয়া যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, পছন্দ অপছন্দের অবকাশ কোথায় তার সম্বন্ধে ?

শুইয়া শুইয়া উশি পিশি করিতেছিল ভূষণ। কতক্ষণ পরে নন্দর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তার মাথার উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, "খুব গরম, না ?"

গভীর নিশুতি রাতে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘরে ও বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া নামিয়াছে, আর চারিদিক নিস্তব্ধ, পাশে শুইয়া তখন অতিশয় বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি মস্তিস্কের উত্তাপ বুঝাইতে আচমকা হাত টানিয়া লইয়া তার মাথার উপর রাখিয়াছে ! ভয় পাইয়া চোখ বুজিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়াছিল নন্দ। ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতেও পারে নাই, সারারাত্রি জাগিয়া কাটিয়াছিল ।

তখন নন্দর শাশুড়ী বাঁচিয়া, বড় জা ও তখন এখানে, ননদেরা ছিল, দেওর ছিল। সকলের আওতায় পড়িয়া ভূষণকে বুঝা যায় নাই ঠিক। তারপর তার ভাসুর আসিয়া বড় জাকে লইয়া গিয়াছেন কোথায় সান্তাহার না শিলিগুড়ি। রেলের চাকরি, ছুটি ছাটা নাই, একেলা থাকিতে কষ্ট হয় তাঁর। কাজ পাইয়া দেবরও সেখানে গিয়াছে। ননদ দুটির এক এক করিয়া বিবাহ হইয়াছে, নিজেদের ঘর সংসার ফেলিয়া এখন আর তারা বাপের বাড়ী আসে না। আরও কতদিন পরে তার শাশুড়ী মারা গিয়াছেন। তারপর এই ছয় সাত বৎসর স্বামীস্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাসে কাটিয়াছে—অনড়, ফাঁকা, একঘেয়ে ছয় সাত বৎসর ! ইতিমধ্যে অন্ন, ও তার ছয় বছর বয়সে এই মাস কতক আগে হিমু জন্মিয়াছে।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ভূষণ কোথায় বাহির হইয়াছে। নন্দর রান্না প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এত বেলা হইল তবু দুধ দিয়া গেলনা কামিনী, হিমু কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। অন্নও যে কোথায় ঘুরিতেছে পাড়ায় পাড়ায় একদণ্ড যদি বাড়ী তিষ্ঠবে মেয়ে। নন্দ চেঁচাইয়া হাঁক পাড়িল অন্নকে ডাকিয়া ; খানিকক্ষণ পরে লাফাইতে লাফাইতে অন্ন বাড়ী আসিয়া ঢুকিল। রান্নাঘরে গিয়া নন্দর পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুহাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "খিদে পেয়েছে মা—"

নন্দ হাসিয়া ফেলে। "ও-ও, ডেকে নিয়ে এলাম বলে তাই, না ? ছিলি কোথায় এতক্ষণ ?"

"অনুদিদের বাড়ী। অনুদির মা, না মা, তাই পায়েস রাঁধছে। একদিন করবে মা তুমি পায়েস ? যেতে বলেছে মা আমাকে বিকেলে, যাব ?" পিছন হইতে নন্দর গালের পাশে কচি মুখ রাখিয়া অন্ন বলিল—

"আচ্ছা, যেওখন। ভাইটি কাঁদছে, লক্ষ্মীমেয়ের মত একটু শান্ত করগে দিকি তাকে।" হাত বাড়াইয়া অন্নকে সামনে আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নন্দ মেয়ের মুখে একটা চুমা খাইল।

কোলে তুলিয়া লইতেই হিমু চুপ করিল। কিন্তু অন্নর ভাল লাগে না। হিমুকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে। মাকে ডাকিয়া বলে—"থাকছে না মা হিমু—তুমি নাও।" হিমুকে নামাইয়া দিয়া চক্ষের পলকে অন্তর্ধান।

দুরন্ত হিমুকে সামলাইতে নন্দর প্রাণান্ত হয়। আর তেমনি কাঁদুনে ছেলে, বায়না ধরিলে আর যদি চুপ করিবে। নন্দ এখন রাঁধিবে না ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে ! কামিনীর কাছে দুধ লওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে !

বেলা বাড়িয়া রৌদ্রের তেজ আরও চড়িয়াছে, বাতাস তাতিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে। দুপুরবেলা এমনি রোদের সময় মন বিষিয়া ওঠে, কিছুই ভাল লাগে না, শরীর যেন জ্বলিতে থাকে, সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে মানুষের।

রুদ্যমান ছেলেকে কোলে ফেলিয়া চাপড়াইয়া দোলা দিয়া কত রকমে শান্ত করিবার চেষ্টা করে নন্দ। তেমনি ছেলেই বটে ! একপেট না গিলিয়া চুপ করিল আর কি ? দুগ্ধহীন, শুষ্ক স্তন মুখে দিয়া কতক্ষণ ভুলাইয়া রাখিবে নন্দ ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে ? ওদিকে ভাত উথলিয়া উঠিল। ধপাস করিয়া ছেলেকে মাটীতে বসাইয়া দিয়া নন্দ এক চড় মারিয়া দিল তার পিঠে। হিমু ককিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় ভূষণ বাড়ী ফিরিল। নন্দকে ডাকিয়া বলিল—"মহৎ কাজটা হচ্ছে কি শুনি যে ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছো এমনি করে?"

উনন হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া নন্দ এবার ফেন গালিবে, নিরুত্তরে সে তারই আয়োজন করে; "কথার জবাবই দেওয়া হয় না! বলি ও রাজরাণী কাঁদছে কেন ছেলেটা?"

"দুখানা ত হাত, কতদিক সামলাব?" নন্দ বলে, "নাও না একবার কোলে।"

"হুকুম হচ্ছে, নবাব নন্দিনীর হুকুম জারি হচ্ছে? কতদিক সামলাব—" মুখ ভেংচিয়া ভূষণ বলে—"দিলেই ত পারতো বাপে রাজা রাজড়ার ঘরে, সাতটা দাসীবাঁদী থাকতো সাতদিকে? দিয়েছে কেন গরীবের ঘরে?"

"তাই বলে কি মরতে হবে নাকি?"

"না পটের বিবি সেজে বসে থাকতে হবে আর আয়নার মুখ দেখতে হবে—"

"হাঁ কত সুখেই আছি তোমার সংসারে এসে? দেখছ না?"

"খুব দেখিছি—"

অতি সাধারণ একখানা শাড়ী পরণে, ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দিয়া কপালে একটা সিন্দুরের টিপ পরিয়াছে নন্দ; দুপুরের রোদে আর আগুনের তাতে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মুখ চোখ—নন্দ জানেনা, চমৎকার একটা অগোছালো সৌন্দর্য্য আছে তার—পরিপাটি, অনায়াসলব্ধ।

"কি, দেখছ কি! আমি সেজে গুজে বসে আছি রাতদিন, আর সংসারের কাজগুলো করে দিয়ে যাচ্ছে তোমার আপনার জনেরা এসে, না?"

"মুখ সামলে কথা বলো—আস্পর্দ্ধার শেষ নেই একেবারে?"

আস্পর্দ্ধাটা কিসের? নন্দ ত গায়ে পড়িয়া কথা বলিতে যায় নাই—

"খবুরদার বলচি, ভাল চাও ত রাগিও না আমায় তেপ্‌পরের সময়—"

"কেন, কি করবে কি তুমি?"

"জান না আমি কি করবো? এখনো বলচি ছেলে শান্ত করো—"

"পারবো না"

"আলবৎ পারবে—তোমার ঘাড় পারবে—"

কি হইল আজ নন্দর? "পারবো না, কিছুতেই পারবো না" পাগলের মত সে আসিয়া হিমুর পিঠে দুই চড় বসাইয়া দিল—"কত তোর আপনার লোক রয়েছে দেখি—"

"বটে,—" রাগের মাথায় ছুটিয়া গিয়া ভূষণ নন্দর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল হিড় হিড় করিয়া। তারপর সজোরে এক ঠেলা দিয়া বলিল—"বেরোও আমার বাড়ী থেকে, বেরোও—বজ্জাত মেয়েমানুষ কোথাকার—জন্মের মত দূর হও, জন্মের মত?" ঠেলিতে ঠেলিতে তাড়াইয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল নন্দকে!

ভূষণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—একি তার ব্যবহার—ঘরের বউ তাড়াইয়া দিলে সে যাইবে কোথায়। শুনিয়া ভূষণ মহা খাপ্পা, বলে, "থামো, থামো, বক্তৃতা অমন সবাই দিতে পারে—পড়তে পাল্লায় ত বুঝতে? উপদেশ দিতে এসেছেন, উপদেশ—"

অনুদের বাড়ীর রান্নাঘরের দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া নন্দ দাঁড়াইয়া আছে। তাদের বাড়ী হইতে ভূষণের গলা শোনা যাইতেছে। অনুর মা বাহিরে আসিয়া বলিল—"কি, আজ আবার ঠেলে উঠেছে গয়াসুর—"

নন্দ প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল। বড় ব্যথাতুর মর্ম্মান্তিক হাসি। লক্ষ কথায় যাহা হইত না, নিঃশব্দ ম্লান একটুখানি হাসি তাহাই করিল। নন্দর ভাগ্যবিড়ম্বনা, তার জীবনের সমস্ত দুঃখ লজ্জা ও গ্লানি অতিশয় স্পষ্ট হইয়া এক মুহূর্ত্তে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল।

অনুর মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—"চলে যেতে পারিসনে দিন কতক কোথাও? জব্দ হয়,—মর্ম্ম বোঝে—"

কিন্তু কোথায় যাইবে নন্দ! বাপের বাড়ী?—বিবাহ দিয়া ত বাপ মা সম্পর্ক চুকাইয়াছে। চিঠি দিয়াও সংবাদ লয় না একবার! তাছাড়া, তার সুখের সংবাদ হয়ত সেখানেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিনা আহ্বানে, যাচিয়া গিয়া সেখানে উঠিবে শ্বশুরবাড়ীর জ্বালা যন্ত্রণার হাত

এড়াইতে? সে বড় লজ্জা! তার চেয়ে সে এইখানে পড়িয়া হজম করিবে তার দুঃখ কষ্ট! আর কোথায় যাইবে নন্দ? জায়ের বাসায়! চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হার মানিয়াছে নন্দ, তারা জবাব দেয় না। ভাবিয়া কোনো সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। কোনোদিন তার দুর্গতির অবসান হইবে এমন ভরসাও পায় না নন্দ কোনোদিকে।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল নন্দ। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের আঙুল দিয়া উঠানের মাটি আঁচড়াইতে লাগিল অন্যমনস্কভাবে। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েছে তোমার দিদি? হয়ে থাকে ত দাও না অনুকে দিয়ে একটুখানি পাঠিয়ে, হিমুকে খাইয়ে আসুক—"

দুধ জ্বাল দেওয়া হইয়াছিল অনুর মার। একবাটি তুলিয়া অনুর হাতে দিয়া বলিল—"নিয়ে আয় না হয় ছেলেটাকে—"

অনেকক্ষণ পরে অনু ফিরিয়া আসিল হিমুকে কোলে করিয়া। অন্নকে খাওয়াইয়া এবং ভূষণের ভাত তরকারি থালায় বাড়িয়া সে ঢাকিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। অনুর মা বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলি কেন, উঠে বোস।" নন্দ উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল দাওয়ায়।

"হিমু আজ নাইবে খুড়িমা, নাইয়ে দেবো?"

"দাও—"

স্নান করাইয়া, চুল আঁচড়িয়া চোখে কাজল পরাইয়া দিল অনু হিমুর। দুইহাতে হিমুকে তুলিয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলে—"কি ছিরি করেই তুমি রাখ ছেলেটাকে খুড়িমা? পাঠিয়ে দিও এবার থেকে রোজ সকালে আমার কাছে—"

"দেবো, নিয়ে আসিস—"

কোলে করিয়া অনু ঘুরিয়া ঘুরিয়া হিমুকে ঘুম পাড়াইল।

ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়ার পর অনুর মা বলিল—"এইখেনে খা এবেলা নন্দ, ভাত বেড়ে নিই, কি বলিস—?"

"না—"

"না, কেন? সংসারে থাকতে গেলে অমন হয়েই থাকে, তাই বলে না খেয়ে কদ্দিন থাকবি?" শিখানো কথা পুনরাবৃত্তি করার মত নন্দ বলিল—"না খেয়ে আর কদ্দিন থাকবো?"

"তবে—?"

তবে কি? নন্দর যেন এতক্ষণে হুঁস হইল। পূর্ণদৃষ্টিতে অনুর মার দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বলছ দিদি—শুনিনি মন দিয়ে—"

অনুর মা একটু হাসিয়া আবার বলিল—"বলছি, আজ আমার সঙ্গে খাবি তুই, শুনলি, উঠে আয় আর দেরি করিস নে—"

"না দিদি, তুমি খাও, আমি পারবো না—" বলিয়া নন্দ উঠিয়া পড়িল। "তোমাদের কামরায় গিয়ে একটু শুচ্ছি দিদি, বলোনা কাউকে, আমি আছি এখেনে।" সত্যসত্যই সে কামরায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সারা দুপুর ভূষণের ছটফট করিয়া কাটিল। শুইয়া বসিয়া স্বস্তি পাইল না একতিল। অন্ন পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে, কিন্তু ভূষণের ঘুম আসিল না চোখে। কোথাও গিয়া দুদণ্ড কাটাইয়া আসিবারও তখন সময় নয়—খাইয়া দাইয়া যে যাহার বিশ্রাম করিতেছে, ডাকিয়া তুলিলে বিরক্তই হইবে। কিন্তু শুইয়া শুইয়া গরমে এপাশ ওপাশ করাও কষ্টকর। খানকয়েক আরও দলিল লিখিবার ছিল, লিখিতে বসিয়া তাহাতেও মন বসিল না। দূর হোক গে ছাই—বলিয়া ছাতাটা লইয়া ভূষণ বাহির হইয়া পড়িল। ফিরিল যখন বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। অন্ন পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় তার ছোবা, হাঁড়ি, আহ্লাদী পুতুল আর টিনের বাক্সটা লইয়া ইট সাজাইয়া খেলাঘরের সংসার পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভূষণ ডাকিল—"এদিকে আয় ত অন্ন, কত মাছ এনিছি, দেখ্‌সে।" অন্ন কাছে আসিলে চুপি চুপি বলিল—"তোর মা কোথায় রে—?"

"আমি জানিনে।"

"জানিস্ নে? কেন, বাড়ী আসেনি এখনো?"

"আমি জানিনে—" অন্ন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল।

"আচ্ছা, দেখে আসছি আমি, তুই বোস এখেনে, দেখিস বেড়ালে না খায় মাছগুলো!"

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূষণ কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইল না নন্দর। অন্নুদের বাড়ীও গিয়াছিল। অন্নুর মা চালুনি দিয়া খই বাছিতেছিল, ভূষণকে দেখিয়া বলিল—"ঠাকুরপো যে, কি মনে করে?"

ভূষণ মাথা চুলকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলে "তোমাদের এখেনে আছে নাকি বৌঠান?"

অন্নুর মা কিছুই জানে না—বলে "কে আছে আমাদের এখেনে?"

"কে আবার, ও বাড়ীর মেজ বৌ?"

"কেন, বেড়াতে বেরিয়েছে নাকি? কখন বেরিয়েছে? কোথায় গেছে?"

"এখানে আছে কিনা তাই বলো না?"

"কি করে জানবো? ব্যাপার কি বলতো—আজ আবার—"

রগড় পাইয়াছে সব, মজা দেখিতেছে! ভূষণ আর দাঁড়াইল না সেখানে, গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। থাক্‌গে যেখানে তার খুসী—

হন হন করিয়া সে মনের খেয়ালে নগেন হালদারের ডাক্তার খানায় গিয়া উঠিল। সেখানে তখন অনেক লোক, জমাট আড্ডা। ভূষণকে ঢুকিতে দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে চুপ করিল; নগেন্ আহ্বান করিয়া বলিল—"এস ভূষণ এস বসো"—বলিয়া একটা জায়গা নির্দেশ করিল হাত বাড়াইয়া। ভূষণ বসিল না, একবার জনে জনের মুখের উপর অর্থশূন্য দৃষ্টি বুলাইয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি চলিয়া গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। কে একজন বলিল, "মাথা খারাপ"।

আর একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ভূষণ আবার গিয়া অন্নুর মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বল না বৌঠান, সত্যিই জান না কোথায় গিয়েছে?"

"বাড়ী গেছে দেখগে। কেমন, দরকার লাগে মেয়েমানুষ? বলি কি, বয়েস হচ্ছে এখন, ছেলে পিলের বাপ হলে আর কি করা উচিত অমনধারা, না ভাল দেখায়?"

ভূষণ কথা বলে না, উপদেশ শুনিয়াও রাগ করিবার মত মনের অবস্থা আর তার নাই। "গিয়েছে তা হলে বাড়ী—" স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে দাওয়ায় উঠিয়া বসিল পিঁড়ি পাতিয়া। "এক গ্লাস জল দিতে পার বৌঠান?" জল খাইয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিল—"ভাবি ত তাই—তবে কি জান বৌঠান—"

নন্দ বাড়ী ফিরিয়াছে। তাদের বাগানের উপর দিয়া ঘাটে যাইবার সরু পথ নামিয়া গিয়াছে বেত্রবতীর গর্ভে। পরিস্কার—ধবধবে ছায়াশীতল পথ। হিমুকে বুকে করিয়া ধীর মন্থর পায়ে ঐ পথের উপর বিচরণ করিতেছে নন্দ, আর আনমনে গান গাহিতেছে গুণ গুণ করিয়া। যদি জানিতে পারে নন্দরাণী, আমি তাকে লইয়া গল্প রচনা করিতেছি, তবে জীবনে সে আর আমার মুখ দর্শন করিবে না; কিন্তু ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে নন্দ সত্যই গান করিতেছে।

প্রকাণ্ড আম কাঁঠাল ও তিত্তিরাজ গাছের ছায়ায় নিভৃত স্থানটি। সারা দুপুর গুমোটের পর বড় স্নিগ্ধ হইয়া নামিয়াছে আজ বৈকাল, আর কচি দেবদারু পাতার মধ্য দিয়া বাতাস বহিতেছে ঝির ঝির করিয়া।

নন্দকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটাইতেছে, খোঁপা খুলিয়া গিয়া চুল এলাইয়া পড়িয়াছে পিঠের উপর,—পা ফেলিতেছে যেন গণিয়া গণিয়া। বদরাগী উদ্দণ্ড স্বামীর অধীনে বাস করিয়া করিয়া সন্ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি তার—সারা দিনের কষ্টে বড় কোমল ও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, শীর্ণ মুখ আরও শুকাইয়া গিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর মত তার কাহিল শরীর ব্যাপিয়া একটা রুক্ষ ক্লান্তি, যেন সে কতকাল তপস্যা করিয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে।

হিমু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমন্ত ছেলেকে বাড়ী গিয়া দোলায় শোয়াইয়া দিল নন্দ! তারপর ফিরিয়া আসিয়া আস্তে আস্তে জলে গিয়া নামিল।

আঃ, মায়ের কথা মনে পড়িয়া যায় নন্দর! গভীর জলে গিয়া দুহাত মেলিয়া দিয়া ভাসিয়া রহিল নন্দ কতক্ষণ। বাতাসে জলে ঢেউ উঠিয়া নন্দর গালে মুখে আসিয়া মৃদু আঘাত করে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শরীর শির শির করিয়া ওঠে। নন্দর মনে হয়, এমনি করিয়া পায়ের নখের ডগা হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে তার সর্বাঙ্গ যদি, সেই গল্পের

মত ক্রমে ক্রমে পাষাণ হইয়া যায়, পাষাণ হইয়া সে বেত্রবতীর জলে পড়িয়া থাকে, তারপর অনেক দিন পরে হিমু বড় হইয়া তার মাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্ধার করে আর মন্ত্রপড়া জল ছিটাইয়া আবার জীবন্ত করিয়া তোলে! কিন্তু স্রোতের বেগে তলাইয়া—যদি তলাইয়া যায় ততদিন? ভাসিতে ভাসিতে হাতেপায়ে খিল ধরিয়া নন্দ ত ডুবিয়া যাইতেও পারে? আচ্ছা, জেলেদের ঐ পাটার কাছে কলমীর দামের নীচে যদি সে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকে, একঘণ্টা, দুঘণ্টা—দম আটকিয়া তাহা হইলে মরিয়া যায় সে নিশ্চয়ই! নন্দকে কিসে যেন টানিয়া লইয়া যায় পাটার দিকে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নদীর কিনারে জলের উপর গাছের ঝোপে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কতক্ষণ পরে চমক ভাঙ্গিল নন্দর, হিমু কাঁদিতেছে না ঐ, হিমুরই ত গলা? দ্রুত সাঁতার কাটিয়া নন্দ ডাঙ্গায় আসিয়া উঠে, ভিজা কাপড়ে প্রায় ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসে।

রাত্রিবেলা। ভূষণের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। দুপুর বেলা ভাত লইয়া বসিয়াছিল মাত্র, খাইতে পারে নাই একেলা বসিয়া। আজ দশ বৎসরের অভ্যাস, খাইবার সময় নন্দ বসিয়া থাকে সমুখে! ফেলিয়া ছড়াইয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। স্বামী ও কন্যাকে খাওয়াইয়া নন্দ এবার নিজে খাইতে বসিয়াছে। ভূষণ ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া মেয়েকে লইয়া শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছে। গল্প, না মনের চঞ্চলতা ঢাকিবার প্রয়াস? এখনো পর্য্যন্ত নন্দ একটিও কথা কয় নাই ভূষণের সাথে। এতটা পথ হাঁটিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া বেলেডাঙার হাট হইতে মাছ আনিল ভূষণ, মাছ দেখিয়া নন্দ খুসী হইল কি না বুঝিতে পারিল না সে! বিষণ্ণমুখী নন্দরাণী নীরব। সারা সন্ধ্যা নন্দ যতক্ষণ রাঁধিয়াছে, ভূষণ রান্নাঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল খানিকটা তফাতে, নয়ত হিমুকে বুকে ফেলিয়া উঠানে পায়চারী করিয়া বেড়াইয়াছে। রাঁধিয়া বাড়িয়া অন্নকে দিয়া ডাকাইয়া ভূষণের ভাতের থালা ধরিয়া দিয়াছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়া বাড়িয়া দিয়াছিল ভাতব্যঞ্জন, আর কিছু চাই কি না ভূষণের, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবারও দরকার হয় নাই। অথচ মুখ ভার করিয়াও নাই নন্দ, রাগও দেখাইল না একবার। কেবল তার স্বাভাবিক সংযত চলা ফেরায় একটা শ্রান্ত দুর্ব্বলতা আর ঠোঁটের ভঙ্গিতে ধৈর্য্যশীল দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। এই সব সময়ে কেমন ভয় করে ভূষণের নন্দকে। মুখ দেখিয়া মনের খবর আঁচ করিতে পারে না, মনে হয় আর একটু কিছু হইলে এইবার নন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িবে একেবারে। তার যত দম্ভ বকুনি ও আস্ফালন, সব কোথায় উবিয়া যায়, পোষমানা জন্তুর মত আধ ব্যাকুলতায় নন্দর কাছে কাছে ঘুরিতে থাকে।

ভূষণের সন্দেহ হইল, হয়ত নন্দ খাইতেছে না। চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া একবার রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিল। না, টেমির আলোয় একখানা কানা উঁচু কাঁসিতে ভাত বাড়িয়া লইয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাইতেছে নন্দ!

অন্ন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কখন, তুলিয়া তাকে ভূষণ ঘরে গিয়া শোয়াইয়া দিল।

কতক্ষণ পরে খাওয়া সারিয়া, রান্নাঘরের কাজ চুকাইয়া নন্দ এঘরে আসিল। ঘরে গিয়া খুট খাট করিয়া পান সাজিয়া খাইল। তারপর হিমুকে তুলিয়া বাহিরে আনিয়া দাওয়ায় দুধ খাওয়াইতে বসিল।

চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের রাত্রি, আকাশে মেঘ নাই, উন্মুক্ত অজস্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে নারিকেল গাছের পাতায়, মাটির উঠানে, ঘরের দাওয়ায়।

ভূষণ উস্ খুস্ করিতে লাগিল। একই দাওয়ার দুই প্রান্তে দুইজনে রহিয়াছে, কাছাকাছিই বলিতে হয়, তবু একজন অপরের মনের নাগাল পাইতেছে না কিছুতেই। ভূষণ জানে, নিতান্ত সাংসারিক প্রয়োজন না হইলে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইবে, নন্দ নিজে আসিয়া তবু কথা বলিবে না। ভূষণ নিজেই ত পারে নন্দকে ডাকিতে, কিন্তু সোজাসুজি আলাপ সুরু করিতে তার বাধবাধ ঠেকে। নন্দকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলে, 'উঃ কি গরম পড়েছে আজ, ঘরে আর শুতে হবে না—।' কিন্তু নন্দ জিজ্ঞাসা করিল না, বাহিরে আনিয়া ভূষণের বিছানা পাতিয়া দিবে কি না! দুধের বাটিতে ঝিনুকের ঘা দিয়া খেলা করিতে লাগিল ছেলের সাথে।

শুইয়া শুইয়া ভূষণ উঃ আঃ করিতে লাগিল।

"রোদে ঘুরে ঘুরে যা মাথা ধরেছে, ছিঁড়ে পড়ছে একেবারে মগজটো—"

কিন্তু বৃথা, এবারও নন্দ কথা বলিল না, কাছে আসিয়া মাথা টিপিয়া দিতেও বসিল না, হিমুকে লইয়া দিব্য ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। এইবার হয়ত শুইয়া পড়িবে নন্দ, ভূষণের জন্য দুর্ভাবনায় ত ঘুম হইতেছে না তেজীয়ান মেয়ের! সে-ই ত শুধু ছটফট করিয়া মরে, নন্দর বহিয়া গিয়াছে, ভূষণ মরিয়া গেলেই বা নন্দর কি ক্ষতি! উঠিয়া ঘরে যাইবে ভূষণ? কিন্তু পায়ে ধরিতে হইবে নাকি নন্দর? তাছাড়া যেরকম জেদ, হয়ত নন্দ বাহিরে চলিয়া আসিবে, এবং সমস্ত রাত ঠায় দাওয়ায় বসিয়া কাটাইয়া দিবে—চিনিতে ত বাকি নাই ভূষণের!

ভূষণ এবার আকাশের চাঁদ ও গ্রামের বেত্রবতী নদীকে শুনাইয়া বলিল, "রাগলে মানুষের জ্ঞান থাকে? কথায় বলে লোকে—রাগ না চণ্ডাল।"

একেলা ঘরের মধ্যে নন্দ শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলে—"না রাগলেই ত হয় তাহলে—"কিন্তু ভূষণ শুনিতে পাইল না সে কথা, মরীয়া হইয়া বলিল—"একটু জল দিয়ে যাও। উঃ. তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে একেবারে—"

এক গ্লাস জল লইয়া নন্দ বাহিরে আসিল। ভূষণের কাছে মাটিতে রাখিয়া দিতে যাইবে গ্লাসটা, খপ করিয়া নন্দর একটা হাত ধরিয়া ফেলিল ভূষণ এবং জোর করিয়া টানিয়া তাকে কাছে বসাইল। একবার দুজনের চোখাচুখি হইল, তারপর উভয়েই দৃষ্টি নামাইয়া লইল। ধরা পড়িয়া গিয়া অপ্রস্তুতের মত ভূষণ খামোকা হাসিয়া ফেলিল। নন্দ বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইল। ইচ্ছা থাকিলেও ভূষণ ঐ হাতখানা আর তুলিয়া লইতে পারিল না, এবং চেষ্টা করিয়াও বলিবার মত কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া গেল।

শ্রীবিনয় চৌধুরী

পীযূষ পাত্রখানি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কলম্বসের নব জগতের নূতন আবিষ্কার
মাটী আর জল, সেই সে ভূতল, পঞ্চভূতের ভার?
আমার নয়ন হ'য়েছে ধন্য
ভূর্ভুর্ব স্বঃ তন্ন তন্ন
করিয়া পেয়েছি সৃষ্টির বুকে শ্রেষ্ঠ রতন সার
যিনি স্বয়ম্ভু কারণার্ণবে মানস পদ্ম তাঁর।

সেই সে কমলে উঠিল বিধাতা, ফুটিল বিধির বাণী
আদি পুরুষের অনাদি রসের উদ্ভব সেথা জানি
সে আদি রসের নির্ঝরে ভরি
অধরে আমার তুলিয়াছ ধরি—
এই মিটে এই মিটে না পিয়াসা হে মোর রাজেন্দ্রাণী,
করে ঢল ঢল সুরভি শীতল পীযূষ পাত্রখানি।

(The cup of Tantallus)
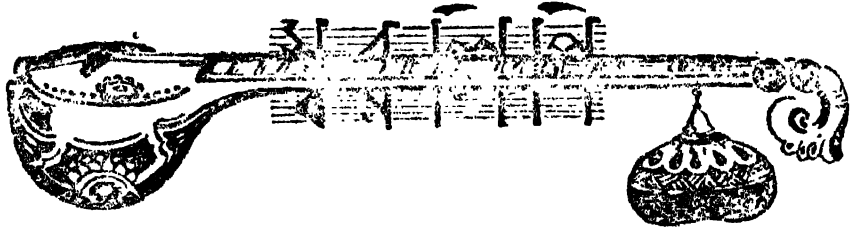
গান—মীরাবাঈ

একতালা

এস প্রিয়ের ঘরে ঃ
আর কত বা থাকব বলো
চেয়ে পথের 'পরে ?
শঙ্কা কিছু নেই গো তোমার,
রেখো না ভয় মনে ঃ
তুমি এলে ভরবে হৃদয়
সুখের শিহরণে ।
এ-দেহ মন দেব ডালি
তোমার রাঙা পায়ে ঃ
কাটবে জীবন মোহন শ্যামের
কমল-চরণ-ছায়ে ।
ও তার কোমল প্রেমের ছায়ে ॥

কাতর অশ্রু ঝরে ঃ
তুমি এলে উঠবে গো ঢেউ
পুলক-সরোবরে ।
বিলম্ব আর সহে না গো—
কাটে না দিন আর,
তোমার লাগি' ছেড়েছি সব—
'কাজল, তিলক, হার ।
অনন্ত এই সময় যেন
নেই কো তুমি ব'লে
জন্ম-জন্ম-দাসী মীরা
হিয়ার আগল খোলে ।
আজি বন্ধ আগল খোলে ॥

সুর—দিলীপকুমার

অনুবাদক—শ্রীমতী মমতা দেবী

০ ১ + ৩ ॥
II মা ঋা জ্ঞা | মা পা দা I ণা র্সা দণা | র্সা -া -া I
এ সো ০ | প্রি য়ে র ঘ ০ ০ | রে ০ ০

০ ১ + ৩
র্সা র্ঋা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা দা I দা ণা র্সা | দা পা -া I
আ র ক | ত না ০ থা ক ব | ব লো ০

০ ১ + ৩
ণা দা -া | ঋা মা জ্ঞা I রজ্ঞা মা ঋা | সা ঋা সণ্ I
চে য়ে ০ | প থে র 'প ০ ০ | রে তু মি

II র্সা -া ঋর্া | র্সা ণা -া I ধণা র্সা ধণা | দা পা -া I
শ ং কা | কি ছু ০ নে ই গো | তো মা র

পা দা জ্ঞা | মা পা মপা I ধা ণা -া | -া -া -া I
রে খো ০ | না ভ য় ম নে ০ | ০ ০ ০

পা দা ণা | সা র্রা জ্ঞা I র্রজ্ঞা র্মা র্রজ্ঞা | ঋর্া র্সা -া I
তু মি ০ | এ লে ০ ভ র বে | হৃ দ য়

সা মা ঋা | জ্ঞমা জ্ঞরা জ্ঞা I ঋা সা -া | -া -া -া I
সু খে র | শি হ্ ০ র ণে ০ | ০ ০ ০

সা মা মা | মা মা পা I জ্ঞা জ্ঞা ণা | ণা ণা -া I
এ ০ দে | হ ম ন দি ব ০ | ডা লি ০

পা পা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সজ্ঞা র্রজ্ঞা র্সঋা | র্সা -া ঋর্া I
তো মা র | রা ঙা ০ পা ০ ০ | য়ে ০ ০

র্সা -া র্সা | ণা ণা -া I দা দা -া | পা পা -া I
কা ট বে | জী ব ন মো হ ন | শ্যা মে র

মা মা -া | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞঋা জ্ঞঋা জ্ঞঋা | সা সা ঋা I
ক ম ল | চ র ণ ছা ০ ০ | য়ে ও তার

ণ্া সা -া | দা পা -া I ঋর্া -া -া | র্সা -া -া II
কো ম ল | প্রে মে র ছা ০ ০ | য়ে ০ ০

(দ্বিতীয় স্তবকটি প্রথমের সুরে হবে)

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গীয় সংস্কৃতি

শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক এম-এ

১

সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহিলাগণ ও সজ্জনগণ, আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার ন্যায় একজন অসাহিত্যিক কেরাণী যদি সাহিত্য সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠে

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ

তবে সুধীসমাজে উপহাস্যতাই তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু আমার একটা কৈফিয়ৎ আছে এই যে আমি সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী নই, ওদিকে আমার লোভ কোনদিনই ছিল না। নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও যদি আজ এই সভায় উপস্থিত হইয়া থাকি, সে কেবল আপনাদের আদেশ প্রতিপালনের জন্য। অথবা যিনি পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ করেন, মূককে বাচাল করেন ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর আসন্ন সঙ্কট সময়ে আপনাদের এই আয়োজনের মধ্যে আমি আমার সেই ইষ্টদেবতার ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছি, আপনাদের আহ্বানে আমি তাঁরই বেণুধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। মাতৃ ক্রোড় হইতে আমরা নির্ব্বাসিত। ওপারে আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি আর এপারে আমাদের পঙ্গু মূক, মোহগ্রস্ত, বঞ্চিত জীবন—মাঝখানে বিচ্ছেদের বঙ্গোপসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মের অন্তরালে কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয় এই বিরহের আভাসে উৎকণ্ঠিত, ব্যথিত না হয়? তাই যখন এই সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগের সংবাদ পাইলাম, তখন আশা ও আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম, এতদিন পরে বুঝি এই ঘরছাড়া আত্মবিস্মৃত জাতির ঘরের কথা মনে পড়িয়াছে, এতদিন পরে বুঝি তারা মায়ের ডাক শুনিতে পাইয়াছে,—

প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির ক'ব নীর, হায়রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখো মনে, নাহি মা ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে—

ব্রহ্মদেশের ভূমিও শস্যশ্যামলা। এখানেও হরিৎক্ষেত্র পাহাড়ের কোলে গিয়া মিশিয়াছে। কিন্তু বাতাস বুঝিবা ঠিক তেমন করে ধানের উপর ঢেউ খেলিয়া যায় না। এ দেশও নদীবহুল।

কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে? এখানেও সন্ধ্যাকালে ধীরে ধীরে তারা উঠে—কিন্তু তারা স্মরণ করাইয়া দেয় সেই গঙ্গাসাগরের নদী-সৈকতে এক নির্জ্জন সন্ধ্যার কথা। সেই সন্ধ্যায়, শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল······

তাই আমি আসিয়াছিলাম, সাহিত্যের নিবন্ধ পাঠের প্রয়োজনে নয়, কাব্য-সমালোচনার অভিপ্রায়ে নয়, শুধু আপনাদের এই সম্মিলনে যদি আমাদের হারাণো মায়ের উদ্দেশ পাওয়া যায়। যদি সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই জলের সন্ধান মিলে।

২

বস্তুজগতে যাহা আমাদের অধিগম্য নয়, ভাবজগতেই আমরা তাহার সন্ধান পাইতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রবাস জীবনের অশেষ বিড়ম্বনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিড়ম্বনা এই যে, আমরা আমাদের স্বদেশের ও স্বজাতির ভাবধারা হইতে নীরবে নিঃসংশয়ে দুর্ব্বার গতিতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। আমাদের সকল দৈন্যের মাঝে সর্ব্বনাশা দৈন্য এই যে, আমরা বঙ্গীয় সংস্কৃতি হইতে ধীরে

স্থিরে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। আর একটা রসহীন, ছন্দহীন বৈচিত্র্যহীন, লক্ষ্যহীন, স্বতন্ত্র, ভোগসর্ব্বস্ব জীবন বহন করিয়া চলিয়াছি। জাতি হিসাবে, বাঙ্গালীহিসাবে, এ পথ যে মৃত্যুর পথ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর এও নিঃসন্দেহ যে আমাদের এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে যদি বিদেশের বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে আমরা একটা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই, যদি বাংলা ও বাঙ্গালী নামের কোন অর্থ আমাদের কাছে থাকে, যদি আমরা ব্রহ্মদেশের মিশ্রণ-প্রবণ জাতিনিবহের মধ্যে আত্মবিলোপ করিতে না চাই, তাহা হইলে সময় থাকিতে আমাদের অবহিত হইতে হইবে, আত্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। আমাদের অন্তরের অন্তর্লোকে মায়ের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ধ্যানযোগে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশমাতৃকার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমাদের মা, তিনি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, তিনিই কমল-দলবিহারিণী কমলা, তিনিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। তিনি বহুবলধারিণী হইয়াও সুস্মিতা ও ভূষিতা। আর আমাদের উচ্চারণ করিতে হইবে সেই বিস্মৃতপ্রায় পূজার মন্ত্র—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

৩

আমাদের জীবন যদি কেবল বাঁচিবার আয়োজন হইত, আর মরণেই এর পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলে হয়ত এ সকল প্রশ্নের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু আমরা অমৃতের পুত্র; আমরা কেবল মরণের জন্যই বাঁচিতে চাই না, মরণের পরপারে যে রহস্যময় আনন্দলোক বিদ্যমান আমরা সেই তীর্থের অভিলাষী :—

It is the desire of the moth for the star.

প্রতীচ্যের উদ্ধত জড়বাদ, বিজ্ঞানের দম্ভ, বৈশ্যসভ্যতার উন্মত্ত কোলাহল, আধুনিক জীবনযাত্রার কর্ম্মের তাড়না, সকলই উপেক্ষা করিয়া আমাদের মর্ম্মের গহনে এই বাসনা প্রদীপ্ত হইয়া আছে। জীবনযাত্রায় কর্ম্মকে আমরা বাদ দিই নাই, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে, এই শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু উহা অবান্তর মাত্র। মুখ্যতঃ মানবজীবন সত্য শিব সুন্দরের সাধনা; অথবা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনধারার একটী পরিচ্ছেদ। এই সাধনাই সংস্কৃতির মূল। বাঙ্গালী এই সাধনার যে সঙ্কেত জানিয়াছিল, তাহার উপরেই তার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। তার একটা বিশেষ মূল্য আছে, অর্থ আছে। সুতরাং আমাদের অন্তরে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার একটা প্রয়োজন আছে।

৪

কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন ধর্ম্মসাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ। এমন কি, চিত্তের যে রসালুতা, অনুভূতির যে তীক্ষ্ণতা সংস্কৃতির ফল, ধর্ম্মসাধনার দ্বারা তাহা আরো বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

একথা যদি সাধারণ ভাবে সত্য হয়, তবে ভারতের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য। ধর্ম্ম সাধনই ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস, আধ্যাত্মিকতাই ইহার প্রাণ। বাঙ্গালীর প্রাণমূলের এই আধ্যাত্মিকতা তাহার চিত্তে যে অভিনব রসরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহাই বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

ভারত চাহিয়াছে মুক্তি, বাঙ্গালী চাহিয়াছে প্রেম। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতায় ও শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কাব্যে এই প্রেম সাধনার যে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল মধুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় জগতে তাহার তুলনা নাই। পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে নদীয়ার প্রেমের বাজারে গৌরনিতাই দুই হাতে যে প্রেম বিলাইয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ধন্য হইয়াছিল, সে মুক্তি চায় নাই। বেদান্ত প্রদর্শিত কঠোর নীরস জ্ঞানমার্গের সাধনা ভারতের অন্যত্র সমাদৃত হইলেও রসিকচিত্তকে উহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেদান্তের প্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বাঙ্গালীর চিত্তকে কখনও ব্যাপকভাবে অধিকার করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী কখনও সোঽহং মন্ত্রের উদ্গাতা ছিল না। তার

প্রাণের কথা,—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে অন্তরঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে মানুষের মত করিয়া ভালবাসিয়াছে। তার সাধন মন্ত্র,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তার প্রেমের ঠাকুর,

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিযাত কোটী কাম
বদন জিতল কোটি শশী,
ভঙ্গুভাঙ্গী ঠাম নয়নকোণে পুরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি।

এই যে শ্যামসুন্দর ইনিই আবার "যোগীর আরাধ্য ধন।" বাঙ্গালী বৈদান্তিক গীতার ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন—

বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাৎ বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপিতত্ত্বং অহং ন জানে।

বাঙ্গালী মোক্ষ কামনা করে নাই। সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য প্রভৃতি তাহার জন্য নয়, সে চাহিয়াছে তার প্রেমাস্পদের কাছে আত্মনিবেদন করিতে, নব নব অনুরাগে তাহাকে ঘিরিয়া থাকিতে—

সোই পিরিতি, অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

এই প্রেমপরিশীলনের শেষ নাই, সীমানা নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই,

লাখ লাখ যুগ, হিয়া পর রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কিন্তু জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর, নলিনীদলগত জলের ন্যায় চপল। তাই ভক্তের মর্ম্মের বাণী রাধার অন্তরের কামনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে

বন্ধু কি আর বলিব আমি,
জনমে জনমে, মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

বাঙ্গালীর শক্তিপূজার মধ্যেও তার এই আত্মনিবেদনের ভাব পরিস্ফুট। এখানেও সে মুক্তি চায় নাই। এই বিশ্বের মূলাধার যে মহাশক্তি তাহাকে বাঙ্গালী মা বলিয়া ডাকিয়াছে মা বলিয়া ভাল বাসিয়াছে। জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও না। কালীর বরপুত্র রামপ্রসাদ যে চিনি খেতে ভালবাসিতেন, চিনি হতে চান নাই একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মাকে বলিতেন মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শ্রদ্ধা ভক্তি দাও। তিনি কাঁদিয়া মাকে বলিয়াছিলেন, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া বেহুস করে রাখিস না মা। মায়ের সংহারমূর্ত্তির মধ্যেও বাঙ্গালী সাধক স্নেহ ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছে।

আমি তাই শ্যামারূপ ভালবাসি
কালী জগমনোমোহিনী এলোকেশী।
সবাই বলে কালো কালী, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।
বিষম বিষয়ানলে মা, দহে তনু দিবানিশি,
যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে আনন্দ সাগরে ভাসি।
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করে অসি,
মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি, সুধাক্ষরে রাশি রাশি।
কমলাকান্তের মন নহে অন্য অভিলাষী,
আমার শ্যামামায়ের যুগল পদে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

আবার বাঙ্গালীর কবিচিত্তে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শ্যামা মা তো কেবল মেয়ে নয়—সে যে

মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখনো কখনো পুরুষ হয়।
মা কভু বাঁধে চূড়া, কভু পরে ধড়া
ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়,
ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়……

বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এই যে একটি আনন্দের সুর রহিয়াছে, তাহা কেবল সাধক ভক্তদের মধ্যেই আবদ্ধ

ছিল না, তাহা বিচিত্র অভিনব উপায়ে সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তরে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার আলোচনা এখানে অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কেননা, প্রবাসে আমাদের সে অখণ্ড সমাজের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং সে শিক্ষাপ্রণালীরও উপযোগিতা নাই। কিন্তু বাঙ্গালী হইতে হইলে আমাদের জীবনের তার সেই সুরে বাঁধিতে হইবে।

৬

এই আনন্দের বিচিত্র সুর বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার করিয়াছে। বাংলার সংস্কৃতি মূলে যে পারমার্থিক চিন্তা রহিয়াছে, এই সাহিত্য তাহারই প্রভাবান্বিত ছিল বলিয়া বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে কোন বিরোধ ছিল না। বাঙ্গালীর সংযত কল্পনা বিশ্বের পরিধি পর্য্যন্ত হয়ত ধাবিত হয় নাই কিন্তু তার সীমার মধ্যে সে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়াছে। একদিন তার শান্ত, সরল, স্বভাবসুন্দর জীবনে ইংরেজি সভ্যতার তীব্র আলোক আসিয়া আঘাত করিল, তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল। নূতন মুক্তির আস্বাদনে

হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায়
কারার দ্বার।

ইউরোপের তথাকথিত মধ্যযুগের অবসানে মানবমনের অভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মানবের আড়ষ্ট কল্পনা মুক্ত ও বহির্মুখী হইয়া এই নশ্বর পৃথিবীর বর্ণে, স্পর্শে শব্দে গন্ধে যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল এবং কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে সেই আনন্দের যে রসরূপের সৃষ্টি করিয়াছিল, কল্পনার সেই স্বপ্নভঙ্গের নাম রেনাসাঁস দেওয়া হইয়াছে। সেই নবজাগরণের ফলে মানবের অনুসন্ধিৎসা ও মুক্তচিন্তা দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া তাহাকে নব নব সৃষ্টির উল্লাসে আত্মহারা করিয়াছিল। সেদিন মানব আপনার সৃষ্টির দম্ভে দেবতাকে অস্বীকার করিয়াছিল। এবং জীবনের আধ্যাত্মিক মূলসূত্রকে ছিন্ন করিয়া আপনার উদ্ধত শক্তির দ্বারা বিশ্বজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। সে বিশ্বজয় করিয়াছে। সে—

Sceptres, tiaras, swords and chains and tomes
Of reasoned wrong, glozed on by ignorance,

এই সকলের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিয়াছিল। সে মুক্তি সে চাহিবার অধিক পাইয়াছে। কিন্তু আজিকার এই মুক্ত মানব তার মুক্তি লইয়া কি করিবে তাহার দিশা পাইতেছে না। সংশয় ও ব্যর্থতার স্বখাত সলিলে সে আজ নিমজ্জমান।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজী সাহিত্যের প্রেরণায় বাঙ্গালা সাহিত্যেরও এইরূপ নবজন্ম ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালীর কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যের চিরাচরিত পন্থা পরিহার পূর্ব্বক নূতন পথে নূতন ছন্দে তাঁহার মহাকাব্যের তূর্য্যনিনাদ করিয়াছিলেন। দেবতাকে তুচ্ছ করিয়া তিনি পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার কাব্যে দেবতাভিমানী রাঘব ভিখারী, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলাবিলাসী আর দেবদ্বেষী রাক্ষস বীরবাহু বীর-চূড়ামণি। তাই মেঘনাদ নিহত হইয়াও বীর, আর লক্ষ্মণ বিজয়ী হইয়াও কাপুরুষ। মেঘনাদের চরিত্রের পার্শ্বে লক্ষ্মণের চরিত্র কুণ্ঠিত, নিষ্প্রভ, হীন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও আমরা এই নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত হইলেও ইঁহাদের কল্পনার মধ্যে একটা সংযম ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই আমরা একটা নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিতে পাই। তাই শৈবলিনীর প্রতি তাহার আবাল্য প্রেমকে নির্ব্বাপিত করিতে না পারিয়া প্রতাপ সমরক্ষেত্রে আত্মাহুতি প্রদান করিল। তাই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন রোহিনী প্রমত্ত হইয়া নিশাকরের কাছে অভি-সারে গেলে। এখানে মানবহৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে স্বীকার করা হইয়াছে। অতি আধুনিক কবি হইলে হয়ত রোহিনী সুটকেশ লইয়া প্রকাশ্যেই নিশাকরের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যাইত। তখন রূপো বলিত "বাবু পুরুষ হলে কি অমন করে লোকে মেয়েলোককে ছেড়ে দিত? চুলের মুঠো ধরে টেনে রেখে দিত। এখনও বুঝিয়ে দাও যে, তুমি পুরুষ। জোর করে ঘরে নিয়ে চাবী বন্ধ করে রেখে দাও।"

আর অমনি রোহিনী সুটকেশ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলালের গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত।

৭

মুক্তমানবের এই সংযত পাদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মদিরায় টলিয়া গেল। সে কাব্যের যে রসবস্তু তাহা উপলব্ধি করিবার মতো সূক্ষ্ম রসানুভূতি খুব অল্প লোকেরই ছিল। কিন্তু সে কাব্য বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে সুরা, পানেই তাহার সার্থকতা। আর পান করিলে দেহ মন এক অলসমধুর স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সে কাব্যের সুর কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করে। অশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার কিছুই বুঝিল না। শিক্ষিত যুবকও বেশী কিছু বুঝিল না, কিন্তু যেটুকু বুঝিল তাহা তাহার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল।

তাহা তাহাকে জাতীয় সংস্কৃতিপুষ্ট জীবনমূল হইতে সজোরে উৎপাটিত করিয়া একটা প্রদীপ্ত কামনার প্রবাহে ভাসাইয়া দিল। সে শুনিতে পাইল নিখিলবিশ্ব নিশিদিন বিলাপ সঙ্গীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মুক্তবেণী বিবসনা উর্ব্বশীকে সে স্বপ্নসঙ্গিনী করিল। সে তাহার কামনার তৃপ্তির জন্য কোন বাধা কোন বিঘ্নই মানিতে চাহিল না।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর?

বৈষ্ণব সঙ্গীতের রসধারায় সে গোপনে তার প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের তপ্ত প্রেমতৃষ্ণা মিটাইতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে যখন তৃপ্তি হইল না, তখন সে কল্পনায় তার মানসসুন্দরীকে সৃজন করিল। সে কিছু চাহিল না, শুধু বলিল,

দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দামে চলিয়া—

এই শ্রদ্ধাহীন, উদ্দেশ্যহীন, দায়িত্বহীন, ক্ষণিকের ভাব-বিলাসের ক্ষেত্রে তথাকথিত কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের বীজ উপ্ত হইয়া অতি-আধুনিক সাহিত্য নামে পরিচিত যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে উহা বঙ্গীয় ভাব ও বঙ্গভাষার বিরাট ব্যভিচার। উহাতে দেখিতে পাই শুধু আদিম বর্ব্বর মানবের যৌন লালসার অকুণ্ঠিত অভিনয়!

৮

আমাদের জাতীয় জীবনের উপর রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম ফলের কথা বলিলাম। সেই লোকোত্তর প্রতিভার সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু একথা বলিলে হয়ত ভুল হইবে না যে, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী কবি হইলেও বাঙ্গালীর কবি নন্। তাঁহার অলোকসামান্য কবিপ্রতিভা বাংলার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সীমাহীন প্রান্তরে পক্ষ বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে সে তাঁহাকে পাইয়াছিল, বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য যে, সে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?

একজন ফরাসী সমালোচক বলিয়াছেন সাহিত্য জাতীয় হইয়াই বিশ্বসাহিত্যের মাঝে সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। তিনি জাতীয় কবির আসনের দাবী না করিয়াও আন্তর্জ্জাতিক বিদগ্ধ মণ্ডলীর সভায় উচ্চ আসন পাইয়াছেন। তাঁহার দেশবাসী যে তাঁহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, একথা তিনি জানেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁহার The Religion of an Artist শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন:—

Some said that my poems did not spring from the national heart; some complained they were incomprehensible, others that they were unwholesome. In fact, I have never had complete acceptance from my own people.

এ সকল অভিযোগ নূতন নহে। এর আলোচনাও হইয়াছে যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ দেশকাল নিরপেক্ষ এক নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিয়া ভূমানন্দে যে কাব্য

সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে জাতীয়তার ছাপ দেওয়া চলে না ইহা সুস্পষ্ট। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার ভক্তগণের তাঁহার কাব্যপ্রীতির মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো রসোপলব্ধি নাই, আছে শুধু সুরের ঝঙ্কার, যাহাতে পাঠক "ভুলে গিয়া বাঁশী" কেবল সঙ্গীতভরে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু unwholesome অথবা wholesome এই বিশেষণে রসবস্তুকে বিশেষিত করা যায় না। যাহা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে পথ্য তাহাই রোগীর কাছে বিষ। শ্রীগৌরাঙ্গের কামগন্ধবর্জ্জিত অনুপম প্রেমধর্ম্মই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া নেড়া নেড়ির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি যদি জীবনসংগ্রামে পরাভূত, রুগ্ন ভাববিলাসী বাঙ্গালীর জীবনে ও কল্পনায় উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক হইয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত কবিকে তার জন্য দায়ী করা যায় না। এখানে বিচার্য্য art কোন আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিবে কিনা। কবি কি সত্যই নিরঙ্কুশ? এই সকল দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নাই—

গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ

কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতিকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্য বিদেশে বাঙ্গালীকে সম্মানিত করিয়াছে সত্য। কিন্তু স্বদেশে বাঙ্গালীকে সে সম্মানের অধিকারী হইতে সহায়তা করে নাই। শিক্ষিত সমাজে প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাবে culture নামক যে পদার্থটি আমরা দেখিতে পাই উহা প্রাণহীন, মজ্জাহীন, দায়িত্বহীন একটা বিকৃত ভাববিলাস মাত্র। উহা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী।

উপরোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থলে লিখিয়াছেন,

I do not hesitate to say that my songs have found their place in the heart of my land along with her flowers that are never exhausted, and that the folk of the future, in days of joy or sorrow or festival, will have to sing them.

ইহা সত্যের বিপরীত। এ কেবল বিশ্বদরবারে মাল্য-চন্দন প্রাপ্ত বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্তমনের করুণ আবেদন।

৯

বাংলা সাহিত্যের যুগ-সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। আমরা দাঁড়াইয়া আছি।

Between two worlds, the one dead
And the other powerless to be born.

বাংলার সাহিত্যাকাশে রবি অস্তমিত প্রায়। প্রদোষের গগন অতি-আধুনিক সাহিত্যের ঝিল্লীরবে মুখরিত। শীঘ্রই রাত্রি আসিবে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য মরিবে না। রাত্রির বুকে যে প্রভাতের সম্ভাবনা আছে, সেই প্রভাতের নূতন আলোকে বাংলা সাহিত্য তাহার জাতীয় প্রাণমূল হইতে উঠিয়া অতি-আধুনিক সাহিত্যের পঙ্ক ভেদ করিয়া আবার জাতীয় জীবনে প্রস্ফুটিত হইবে। সে কবে কে বলিতে পারে? কিন্তু

When winter comes, can spring be far
behind?

১০

প্রবাসে আমরা যদি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া চলিতে চাই তবে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের ও সাহিত্যের অনুশীলন অপরিহার্য্য। তাই ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিলাম। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ধর্ম্মানুশীলনের ও সাহিত্যানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। নানা বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে জাতীয় মনোভাব হারাইয়াছি বা হারাইতেছি সেই মনোভাবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এর জন্য এদেশের বাঙ্গালীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া দরকার ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আর একটা বিষয়ও দরকার তাহা এই যে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমরা বাঙ্গালী। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমরা অনেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য্যে, আহারে, বিহারে, আলাপে, পোষাক পরিচ্ছদে অর্দ্ধেক সাহেব ও সিকি বর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছি।

প্রয়োজন না হইলেও আমরা অনেক সময় ইংরাজীতে কথা বলি। অনেক বাঙ্গালী পরিবারে ভাই বোন ইংরাজীতে বা বর্ম্মী ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা হয়ত গর্ব্ব অনুভব করেন। আমরা আপিসে হ্যাটকোট পরিয়া যাই, বাড়ীতে আসিয়া লুঙ্গী পরি। পূজা পার্ব্বণ ব্যতীত কোন সামাজিক সম্মিলনে আমরা চা-এর আয়োজন করি। আমাদের ঘর সাহেবী ফার্নিচারে ভরা। আমাদের ছেলেমেয়ের নাম Dolly, Molly, Albert, অনেক স্থলে, বিশেষতঃ মফঃস্বলে ইহাদের বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত পরিচয় হওয়া কঠিন। আমাদের সমাজ নেই, তাই সামাজিক শাসন ও শৃঙ্খলাও নেই, তাই আমাদের চিন্তায় ও চালচলনে আমাদের একটা 'বেপরওয়া' ভাব দেখা যায়। ফলে ভবিষ্যতের চিন্তা খুব একটা আমরা করি না। এ সকল কথা একটী একটী করিয়া পৃথক করিয়া দেখিলে হয়ত ছোট এবং formal মনে হইবে। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের পথে এগুলি যে বিষম অন্তরায় একথা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মদেশে জন্মিয়াছেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রাণ এখনও বোধ হয় বাঁচিয়া আছে। এখনও যদি ঘটনাচক্রে কোন বাঙ্গালী মিশন বা সঙ্ঘের সাধু সন্ন্যাসী এদেশে আসেন ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন কয়েকটি দিন আমরা যে প্রবাসী সে কথা ভুলিয়া যাই, যেখানে কীর্ত্তন বা ধর্ম্ম প্রচার হয় সেই ভূমি মাতৃতীর্থে পরিণত হয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকলে বিশেষ আনন্দ পান না। তাঁহাদের কাছে বাংলা সংস্কৃতির বিশেষ কোনো অর্থ নাই। উহা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাও তাঁহাদের কাছে নিরর্থক মনে হইবে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার এই যে আর সময় নাই। যাঁহারা বাংলাকে চিনিবার পরে এদেশে আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। তাই এই সম্মিলন যে এখন অনুষ্ঠিত হইল ইহা আমি শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া মনে করি। যদি তাই হয় তবে যে ইহা সফল হইবে এ আশা দুরাশা নয়। আপনাদের শুভাগমনে আজ এই বঙ্গীয় শিক্ষালয় মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আমি সেই তীর্থরেণু মাথায় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক

নিখিল ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

বিরস কুসুম

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

মন কেন গো বিরস হ'ল
বাসি ফুলের মত,
পাপড়ী সম পড়ছে ঝরি
প্রাণের হরষ যত।
কি জানি কোন্ পরশ লেগে
পুষ্প আমার উঠল জেগে,
ছল্ ছলে কোন্ শিশির পাতে
আজকে ব্যথা হত।
মন কেন গো বিরস হ'ল
বাসি ফুলের মত।

পথ চেয়ে মোর কেটে গেছে
নিত্য কতই বেলা,
পুষ্প-পাগল পরাণ আমার
সইল কতই হেলা।
প্রভাত-মধু চয়ন করি
পান করেছি হৃদয় ভরি,
আঁখি আমার এঁকেছিল
রঙ্গীন স্বপন খেলা।
পথ চেয়ে মোর কেটে গেছে
নিত্য কতই বেলা—।

চিরন্তনের প্রেমের বাণী
সে যে সুদূর বাঁশী,
ডাকে যেন হাত-ইসারায়
ছলন অভিলাষী।
শিহর লাগে হৃদয় দলে,
ঘুম টুটে যায় নয়ন জলে,
বয়ন করি আপন মনে
মিলন-মধু হাসি।
চিরন্তনের প্রেমের বাণী
সে যে সুদূর বাঁশী।

সেই ফুলে মোর বিরস ছোঁয়া
লাগে আজি কার
পরাণ আমার তিক্ত হ'ল
রিক্ত মধু তার।
গহন রাতের শান্ত বাঁশী
আজ কেন গো হয় উদাসী,
ছিন্ন করি রঙ্গীন স্বপন
ঝরায় আঁখিধার।
সেই ফুলে মোর বিরস ছোঁয়া
লাগে আজি কার।

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

২৪

মানুষ যতক্ষণ কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য ধরা পড়ে না, যতক্ষণ সে পাপ সঞ্চিত অর্থের জোরে আরাম ও ভোগ বিলাসের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার সুযোগ পায়, ততক্ষণ সে ধরাকে সরা দেখে এবং যে সমস্তই সে নিজের মস্তিষ্কের ও পরিশ্রম অধ্যবসায়ের ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু পতনের দিনে তাহার এ মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন অথবা প্রার্থী অতিথি-ভিখারী বলিয়া জীব যে জগতে আছে, ভগবানের দয়া না হইলে যে জগতে কেহ সাফল্য লাভ করিতে পারে না, তিনি আহার না যোগাইলে যে আহার পর্য্যন্তও জুটে না,—এ কথাটা মানুষের দুর্দ্দশা দৈন্যের অবস্থায় অথবা বিপদ আপদের দিনেই মনে পড়ে। শশাঙ্কমোহনেরও হইয়াছিল তাহাই।

চন্দ্রমাধব বাবু কলিকাতা হইতে তাঁহার উকীলের পরামর্শ পাইয়াই রেখাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। এতদিন তিনি ডাক্তারখানার খাতাপত্র অভিজ্ঞ মুহুরী ও হিসাব নবীশদের দ্বারা পরীক্ষা করাইতেছিলেন। পরীক্ষার ফল উকীলকে জানাইবার পর উকীল বাবুই তাঁহাকে খাতাপত্র লইয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিতে বলিয়াছিলেন। আরও বলিয়া দিয়াছিলেন কথাটা খুব গোপন রাখিতে। যদি শয়তানরা ঘুণাক্ষরেও এ সব তদ্বিরের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তে গা ঢাকা দিবে। উকীল গোপনে সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন যে, তাহাদের আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদ এমন কিছু নাই যাহা ক্রোক করিলে ডাক্তারখানার দরুণ চুরির টাকাটা কোন কালে আদায় হইতে পারে। তবে তাহাদের ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলে তাহাদের কথঞ্চিৎ পাপের শাস্তি হইতে পারে। এসব শয়তানকে আর কিছু না হউক সমাজের মঙ্গলের জন্য শায়েস্তা করিয়া দেওয়া উচিত। আর হয়ত ফৌজদারী নালিশ রুজু করিবার ভয় দেখাইলে জেলের ভয়ে তাহারা যেখান হইতে হউক তাহাদের চুরির টাকাটা উদ্গীর্ণ করিয়া দিতে পারে।

চন্দ্রমাধব বাবু কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কথামত উকীল গৌরমোহন বাবু শশাঙ্ক সান্যাল, মন্মথনাথ ও লেডী ডক্টর বাণী দেবীকে উকীলের চিঠিতে ডাক্তারখানা সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব দাখিল করিতে সাত দিন সময় দিয়াছিলেন। আর ঐ সঙ্গে তাহাদের উপর নজর রাখিবার ভার একজন পাকা গোয়েন্দার উপর দিয়াছিলেন। পত্র প্রাপ্তির পর হইতে শশাঙ্ক ও বাণী দেবী সভয়ে দেখিতেন যে, একটা না একটা লোক অনুক্ষণ তাঁহাদের ষ্টুডিওর সম্মুখস্থ পান বিড়ির দোকানে বসিয়া আছে এবং যখনই তাঁহারা একত্র বা স্বতন্ত্র ভাবে কোথাও বাহির হইতেন, তখনই একজন না একজন লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। মন্মথনাথের সে ভয় ছিল না, তাহাকে কেহ অনুসরণ করিল কি না অথবা কেহ তাহার উপর নজর রাখিতেছে কি না, ইহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিত না—সে স্বয়ংই ধরা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কল্পনাদেবী সরাসরি ডাক্তারখানার সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এজন্য তাঁহার উপর কেহ নজর রাখিত না বা তাঁহাকে কোথাও অনুসরণ করিত না। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কারবারের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহাকেও অহরহ চিন্তান্বিত হইয়া থাকিতে হইত। বিশেষতঃ ইদানীং মন্মথনাথের ভাবগতি দেখিয়া তাঁহার মন অতিমাত্র সন্দেহাকুল হইয়াছিল।

যে দিন কল্পনাদেবীর রূঢ় ব্যবহারে মন্মথনাথ কুক্কুরের

ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইদিন এই কথা লইয়া বাণী দেবীর কাছে তাঁহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছিল। বাণীদেবী অনুযোগ করিয়া বলেন যে, সে-ই তাঁহাকে মন্মথনাথের মনস্তুষ্টি করিতে উপদেশ দিয়াছিল, অথচ সে-ই মন্মথনাথকে শত্রু করিয়া রাখিল, ইহা কি ভাল হইল? কিন্তু ইহার পরেও যখন মন্মথনাথ অপমান হজম করিয়া যথাকালে গৃহে আসিতে লাগিল, তখন তাঁহাদের আশঙ্কা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া গেল। কল্পনাদেবী একদিন হাসিয়া বলিলেন যে, ঐ শ্রেণীর অন্নদাস কুক্কুরকে তু বলিয়া ডাকিলেই দৌড়াইয়া আসিবে, উহার জন্য কোন ভাবনা নাই।

এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইতে না হইতেই উকীলের চিঠি আসিল। তাঁহারা যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই হইল। তখন যত শীঘ্র সম্ভব জাল গুটাইবার গুপ্ত পরামর্শ চলিল। কিন্তু সে আশাও নির্ম্মূল,—পদে পদে কড়া পাহারা! মন্মথনাথ যে দিন দীপ্তির বাড়ীতে গিয়া তাহাদের চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিল, সেই দিন ষ্টুডিওতে আবার এক গুপ্ত পরামর্শ-বৈঠক বসিল। সে দিন স্থির হইল যে, যেরূপেই হউক, সেইদিনই তিনজনে তিন দিক দিয়া সরিয়া পড়িবেন, তাহার পর ঢাকায় গিয়া মিলিত হইবেন। শশাঙ্কমোহন নিজের বাসায় না গিয়া সারাদিন কার্য্যব্যপদেশে ঘুরিবেন এবং ছদ্মবেশে সন্ধ্যার গাড়ীতে হাওড়া রেলে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত গিয়া নৈহাটীতে ঢাকা মেল ধরিবেন। আর বাণীদেবী ও কল্পনাদেবী অপরাহ্ণে শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে গিয়া পিকনিক করিবেন এবং কল্পনাদেবী বাগানে থাকিয়া শেষ ফেরী ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিবেন। বাণীদেবী লুকাইয়া বাগানের ঝোপজঙ্গল দিয়া ঘুরিয়া গিয়া শিবপুরের পথে উঠিয়া চলতি ভাড়াগাড়ী ধরিয়া হাওড়ায় রেলে উঠিবেন। কল্পনাদেবী পিকনিকের জিনিসপত্র লইয়া বাগানে অপেক্ষা করিলে শত্রুপক্ষের চর অনুমান করিবে যে, বাণীদেবীও ঐ সঙ্গে রহিয়াছেন। মন্মথনাথের কি হইবে না হইবে সে কথা কাহারও একবার চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইল না।

কিন্তু মানুষ ভাবে বা গড়ে এক, বিধাতা করেন অন্যরূপ। তাঁহাদের চক্রান্তের তাসের ঘর মন্মথনাথের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। মন্মথনাথের সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাকে নগণ্য বলিয়াই সাব্যস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু সে-ই শেষে বিধাতার যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়া তাঁহাদের ধরাইয়া দিল। বিধাতার অজ্ঞেয় লীলারহস্য বুঝিবে কে?

মন্মথ দীপ্তির নিকট হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখিল দলের কেহ কোথাও নাই, কেবল চাকর বামুন যেমন বাড়ী চৌকী দেয় তেমনি দিতেছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানিল, তাঁহারা বাহিরে গিয়াছেন, রাত্রি দশটার পর ঘরে ফিরিবেন ও বাহির হইতেই আহারাদি সারিয়া আসিবেন, এই হেতু কেবল তাহাদের ও মন্মথবাবুর জন্য আহার্য্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

মন্মথ আহার্য্য স্পর্শ করিল না, সেও বাহির হইতে খাইয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে তখন কেবল এই সন্দেহ হইতেছিল যে, তিন মূর্ত্তি একত্র দিবাভাগে এমন করিয়া ত বাহির হয় না, অথবা এত রাত্রি অবধি ত বাহিরে থাকে না, তবে তাহারা কোথায় কি উদ্দেশ্যে গেল? নিজের শয়নকক্ষে যাইবার পূর্ব্বে সে একবার বসিবার ঘর এবং তাহার পার্শ্বস্থ গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষ হইয়া আসিল। তাহার মনে হইল, ঘর দুইটায় কি যেন নাই, যেন ফাঁকা ফাঁকা। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে কিন্তু কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না, গৃহের কোন দ্রব্য বা আসবাবপত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। ভৃত্যের নিকট শুনিল গৃহ-কর্ত্রীরা পিকনিকের ষ্টোভ, কুকার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। কোথায় পিকনিক হইবে তাহা তাহারা জানে না।

হঠাৎ মন্ত্রণাকক্ষের পার্শ্বস্থ কল্পনাদেবীদের শয়নকক্ষের মধ্যে দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিল, তাহাদের ট্রাভলিং স্যুটকেসটা যথাস্থানে নাই। আলনার উপর হইতে কতকগুলি কাপড়চোপড়ও অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া তাহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল।

ঠিক সেই সময়ে ফটকে একখানা ট্যাক্সি লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সোপানে পদশব্দ হইল এবং মুহূর্ত্ত পরেই কল্পনাদেবী কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। মন্মথনাথ তখন বসিবার

ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই কল্পনা দেবী ঈষৎ বিচলিত হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "কি গো, বাবুর বার হোলো? কোথায় ছিলেন সারাদিন?"

মন্মথনাথ মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিল, "কোথায় আর যাবো? ঘুরছিলুম চাকরীর ধান্দায়। ডাক্তারখানার অন্ন ত উঠলো তোমাদের কৃপায়।"

কল্পনাদেবী বেশ পরিবর্ত্তন করিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বসিবার ঘরে আসিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "আমাদের কৃপায়? বেশ! তুমি করলে চুরি—"

মন্মথনাথ শ্লেষের সুরে বলিল, 'আর তোমরা বুঝি সাধু? যাক্ গে, দিদি কোথায়, দিদি এলো না?" মন্মথনাথ প্রশ্নটা সহজভাবেই করিল।

মুহূর্ত্তকাল কিন্তু কল্পনাদেবীর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি মন্মথর উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিলেন। অথবা মন্মথনাথেরই হয় ত দৃষ্টিভ্রম। তাহার পর প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, "না। হঠাৎ একটা জরুরী কলে মফঃস্বলে চলে গেছে, ফিরতে দেরী হবে।"

মন্মথ যেন অন্যমনস্কভাবে অথবা ঔদাসিন্যভবে বলিল, "ওঃ! তা, কি রকম খাওয়া দাওয়া হোলো? সঙ্গে আর কে ছিল?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "বেশ হোলো। তুমি জানলে কোত্থেকে যে আমাদের পিকনিক ছিল শিবপুরে?"

মন্মথ হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া বলিল, "চাকরের কাছে থেকে। চল শুই গিয়ে, বড় ঘুম পাচ্ছে। শিবপুরে পিকনিক ছিল না কি? কল এলো কখন তা হলে?"

কল্পনাদেবী চকিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কল? হাঁ, না, কল এসেছিলো সকালে। দেখো আজ তুমি তোমার ঘরে শোও গিয়ে—সমস্ত দিন হটুরা পিটে একবারে ডেড্ টায়ার্ড হয়ে পড়েছি।"

মন্মথনাথ উঠিয়া আবার হাই তুলিয়া বলিল, "আমিও তাই। ডাক্তারের কোন খবর পেলে?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "না, কেন বল দিখি?"

মন্মথনাথ বলিল, "না, এমন কিছু না। ওর বাপ আমাদের নামে কেস টেস আনছে নাকি?"

কল্পনাদেবী বলিলেন, 'তাও ত জানি নি। দেখো, বেহালার দিকে একটা বাড়ীর সন্ধান কোরো দিকি তুমি ত চারদিকে ঘোরো।"

মন্মথনাথ বলিল, "বেহালা? কেন উঠে যাওয়া হবে না কি?'

কল্পনাদেবী শয়নকক্ষে যাইতে যাইতে বলিলেন, "দেখছো ত দিন চলে না, এখন খরচ কমাতে হবে। আয় নেই অথচ খরচ ত কমতি নেই। দেখো, যাও।"

০　　০　　০　　০

গভীর রাত্রিতে বাড়ী নিস্তব্ধ নিঝুম হইলে মন্মথনাথ সন্তর্পণে নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইল। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোক পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। মন্মথনাথ অত্যন্ত ভীত চকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলোকে আগন্তুককে দেখিয়া সে চমকিত হইল, এবং লোকটাকেই সে আজ কয়দিন হইতে এই বাড়ীর আশ পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। কে এই লোকটা?

লোকটা বলিল, "আপনিই মন্মথ বাবু না? না বলবেন না, আমি আপনাদের দলের সকলকে চিনি। এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন?—কল্যাণপুরের জমিদারের বাড়ী?"

মন্মথনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি কে?'

লোকটা হাসিয়া বলিল, 'আমি গোয়েন্দা পুলিস—আপনি জমিদার বাড়ী গিয়ে যা বলেছেন টেলিফোঁতে সে সব আমরা আফিস থেকে শুনেছি—টেলিফোঁ করেছে চন্দ্রমাধব বাবুর বাড়ী থেকে—তিনি আজ সকালে এসেছেন কলকাতায়। আপনি রাজার সাক্ষী দাঁড়াবেন ত?"

মন্মথনাথ ব্যগ্রভাবে বলিল, "দাঁড়াবার দরকার হলে দাঁড়াবো, কিন্তু আপনি এখনি শয়তান শশাঙ্ক আর লেডী ডাক্তার বাণীদেবীর সন্ধান করুন—আমার ভয় হচ্ছে তারা এক জোটে সহর ছেড়ে রাঁচী গেছে সেখানে তারা ডাক্তার বাবুকে খুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছে।"
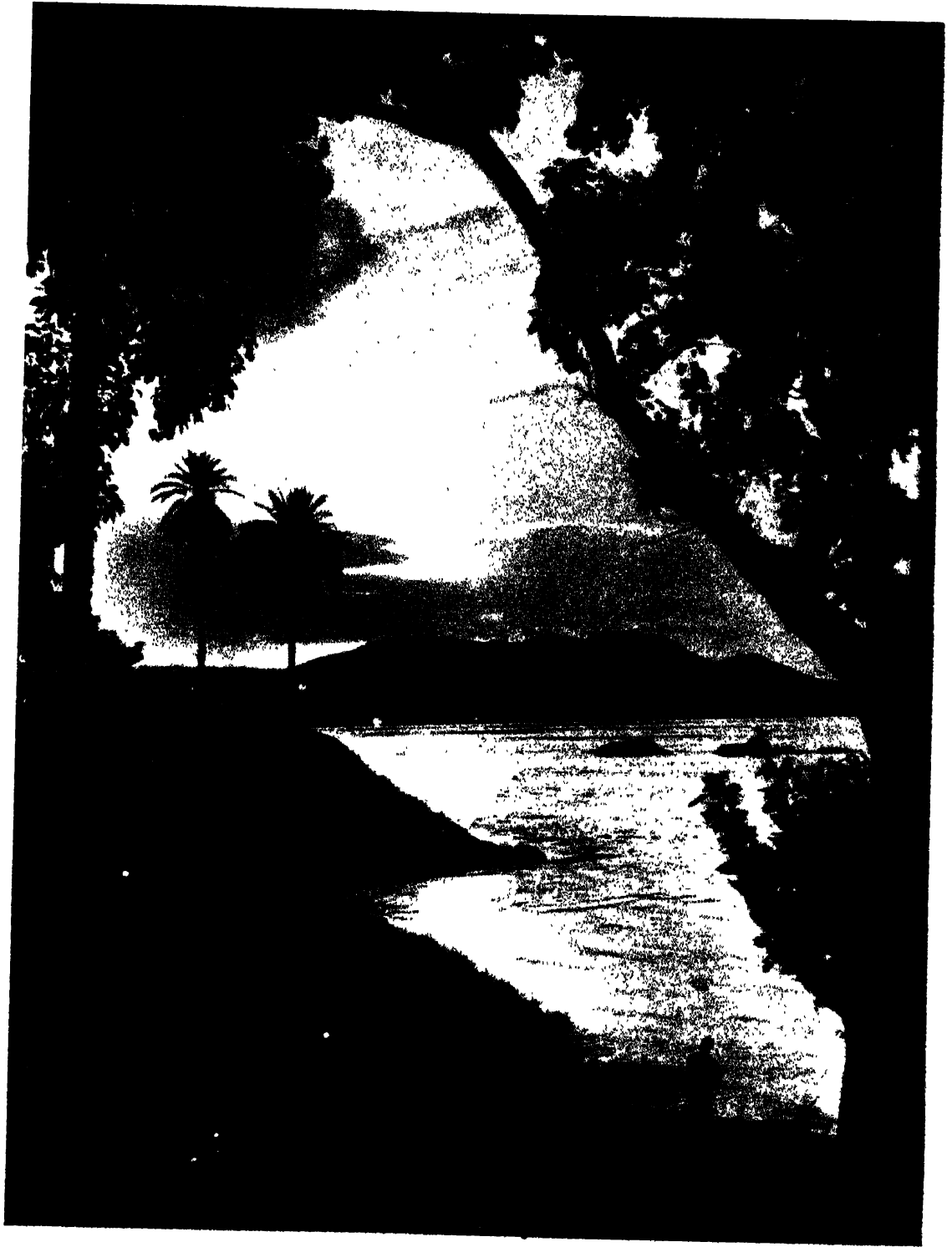
বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

বনানীর ছিদ্রপথে
ব্রহ্মপুত্র—আসাম

আলোকশিল্পী
শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায় এম এস সি

লোকটি হাসিয়া বলিল, "অনুমান মিথ্যে করেন নি—সহর ছেড়ে তারা পালিয়ে যাবার ঠিকঠাক করেছিল বটে তবে পালাতে পারে নি, কোম্পানীর বাগান থেকেই তাদের একজনের পুলিস পেছু নিয়েছে, সেখানেই থাক, কাল সকালে লালবাজারে এনে হাজির করবে।"

মন্মথনাথ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তবে আপনি এখানে কি করছেন ?"

লোকটি বলিল, "কি জানি যদি অনেক রাতে এখানে ফিরে আসে মালপত্র নিতে—যাক, আপনার জমিদার বাড়ী যাবার দরকার নেই, আমার সঙ্গে থানায় চলুন, দরকার হতে পারে—"

মন্মথনাথ তাহার হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি পালাবোনা, নিজেই ধরা দোবো। কিন্তু তার আগে আমায় একবার রাঁচী যেতে দিন। অসহায় ডাক্তার বাবুকে সতর্ক করে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরবো—তারপর আমার হাতে হাতকড়া দেবেন—আমার সঙ্গে না হয় পুলিস পাহারা দিন—"

পুলিসের লোকটি বলিল, "তার দরকার হবে না—সে ব্যবস্থা ডাক্তার বাবুর বাপ আর কল্যাণপুরের জমিদার করছেন, তাঁদের মধ্যে সে সব কথা হয়ে গেছে। চলুন।"

মন্মথনাথ তখনও একবার শেষ কাতর অনুরোধ করিল, বলিল, "যেতে দিন দয়া করে—আমি মহাপাতক করেছি। আচ্ছা, একবার জমিদার বাড়ী হয়ে আসতে দিন দয়া করে। তাও দেবেন না ?"

পুলিসের লোক বলিল, "হুকুম নেই। আপনাদের নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

মন্মথ বলিল, "আমাদের ? কার কার ?"

পুলিসের লোক বলিল, "তিন জনের, কেবল কল্পনা দেবীর নামে নেই। চলুন।"

মন্মথ বিকট হাসিয়া বলিল, "শশাঙ্ক সান্যালের নামে আছে ত ? ব্যস আর কিছু চাই না। শয়তান।"

২৫

পুরুষপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, জগতে চালাকির দ্বারা কখনও কোনও বড় কাজ হয় না। শশাঙ্কমোহনের হ্যাটকোট, বর্ম্মা সিগার, হঃ হঃ হাসি অথবা ইংরাজী বুকনি,—কোন কিছুই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, বাণীদেবী গভীর জলের মাছ, কাজেই গ্রেফতার হইবার সময় একটি কথাও কহিলেন না, পাছে কোন কথা উকীলের বিনা পরামর্শে বলিলে মামলায় তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু শশাঙ্কমোহন অতি বড় চালাক হইলেও গ্রেফতারের সময় ইংরাজী বুলী আওড়াইয়া পুলিসকে জেরায় বিব্রত করিয়া তুলিলেন, কেন কি বৃত্তান্ত, কাহার নালিশে তিনি গ্রেফতার হইতেছেন, ইত্যাদি। তাঁহার ধারণা ছিল, ডাক্তার হিমাংশু মিত্র ব্যতীত অন্য কাহারও তাঁহার নামে অভিযোগ আনয়ন করিবার অধিকার নাই, কেন না তিনিই ছিলেন ডাক্তারখানার মালিক। কিন্তু পুলিশ তাহার সেই ভ্রম অপনোদনের কোন আগ্রহ না দেখাইয়া কেবল দেখাইল ম্যাজিষ্ট্রেটের বডিওয়ারেণ্টের হুকুমনামা, আর ফরিয়াদী চন্দ্রমাধব বাবু স্বয়ং—তখন তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। অভিযোগ ফৌজদারী,—তঞ্চকতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও তহবিল তছরুপাতের। তখন তিনি প্রথমে নরম ও পরে গরম হইয়া ভয় দেখাইলেন, সেসন আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রিভিকাউন্সিল আছে, ইত্যাদি।

চন্দ্রমাধব বাবু গোড়া বাঁধিয়া কাজ করিয়াছিলেন। ডাক্তারখানার মালিকানি স্বত্ব তিনি স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন লেখাপড়ার ভিতরে, অথচ পুত্রকে ব্যাঙ্কের উপর যথেচ্ছা চেক কাটিবার অধিকার দিয়াছিলেন। জুয়াচোরদের অপরাধ সম্বন্ধে পাকা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া উকীলের পরামর্শ অনুসারে তিনি বডি ওয়ারেণ্ট বাহির করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মামলার তদ্বিরের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেদিন রাত্রিতে দীপ্তি যখন নীহারের পিত্রালয়ে তাঁহার কাছে আকুল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাভরে সমস্ত কথা জানাইল তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, জুয়াচোরদের কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নের কোন উপায় নাই, কেন না তাহাদের নামে বডিওয়ারেণ্ট বাহির করা হইয়াছে। পরন্তু তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, দিন দুই দিন পূর্ব্বে তিনি পুত্রের খবর পাইয়াছেন, সে ভাল আছে, সুতরাং মন্মথ বিল সরকারের কথায় বিচলিত হইবার কোন কারণ

নাই। হয় ত তাঁহাদিগকে এ সময়ে কলিকাতা হইতে সরাইবা দিবার উহা একটা কৌশল মাত্র, পরন্ত হিমাংশু এমন কোন কাজ করিযাছে বলিয়া শোনা যায নাই, যাহাতে তাহারই দলের লোকের কাছে তাহার অস্তিত্বের কোন আশঙ্কা আছে। চন্দ্রমাধব বাবু এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে দীপ্তির আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা দেখিযা পরম প্রীতি অনুভব করিলেন। বলিলেন দুই চারি দিনের মধ্যেই তিনি রেখাকে তাহার কাছে রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্তমনে মামলার তদ্বির করিবার অবসর পাইবেন। রেখাকে তিনি নীহারের কাছে রাখিবার জন্য পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, নীহার যে কল্যাণপুর চলিয়া যাইতেছে তাহা তিনি জানিতেন না। ভালই হইল, রেখাকে কাছে রাখিবার জন্য যখন দীপ্তির পূর্ব্বাপর এত আগ্রহ, তখন তাহার কাছেই রেখা থাকিবে।

দীপ্তি কিন্তু তাঁহার কথায় মোটেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিল না। পরন্ত এবার রেখাকে কাছে রাখিবার প্রতিশ্রুতি পাইযাও আনন্দ প্রকাশ করিল না। কেন, তাহা তৎপর দিনই চন্দ্রমাধব বাবু জানিতে পারিলেন। সেইদিন তিনি রেখাকে দীপ্তির ওখানে রাখিয়া আসিতে গিয়া জানিলেন, দীপ্তি সেই দিন প্রভাতেই মোটর যোগে রাঁচী চলিয়া গিয়াছে, ট্রেনের সময় পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে নাই। সঙ্গে গিয়াছেন যদুগোপাল বাবু, দ্বারপাল খানসামা নিতাইচরণ এবং পুরাতন দাসী মুক্তার মা। রাঁচীতে তাহার এক পিতৃবন্ধু সপরিবারে বাস করেন। চন্দ্রমাধব বাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইযা বিশেষ স্বস্তি বোধ করিলেন। আশ্চর্য্য এই নারীজাতি! কোন কারণ না থাকিলেও উহারা বাতাসে ভয় পায়। আর উঁহাদের ঘৃণা ও ভালবাসার মধ্যে ব্যবধানের রেখাও এত সূক্ষ্ম যে, কখন আছে কখন নাই, বুঝিবার উপায় নাই। তাহারা একবার ভালবাসিলে তাহাদের নিকটে সমস্ত বাধাবিঘ্ন জাহ্নবীস্রোতে মত্তমাতঙ্গের মত ভালবাসার পুণ্যস্রোতে ভাসিয়া যায়। এই গর্ব্বিতা অহঙ্কারদৃপ্তা জমিদার কন্যা একদিন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার পুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আর আজ? কিসের আকর্ষণে আজ সে এই মহানগরীর ভোগবিলাস ও আরাম আয়াসের জীবন পরিহার করিয়া মানভূমের জঙ্গলে ছুটিয়া চলিয়াছে? পণ্ডিতেরা সত্যই পরাজয় স্বীকার করিযা বলিয়াছেন, নারীর মন দেবতারাও বুঝিতে পারেন না, মানুষ ত কোন ছার।

বিষণ্ণ মনে রেখাকে লইযা ঘরে ফিরিয়া চন্দ্রমাধব বাবু দীপ্তির পত্রখানি আবার পাঠ করিলেন। মাত্র কয় ছত্র। দীপ্তির বাড়ীর সরকার মহাশয পত্রখানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"জ্যেঠা মহাশয,

না জানাইযা চলিয়া যাইতেছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। খবর সত্য কি মিথ্যা নিজে না দেখিযা কিছুতেই উৎকণ্ঠা লইযা এখানে থাকিতে পারিলাম না। খবর লইযাই ফিরিব, তখন রেখাকে আমায দিতে হইবে, এই অনুরোধ। ইতি, প্রণতা কন্যা দীপ্তিময়ী।

পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অধরকোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। আপন মনে বলিলেন, মিথ্যা আশঙ্কা, কেবল ছুটাছুটিই সার হইবে। হিমাংশু আপনার ভার আপনি গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

আহারাদির পর তিনি মামলার কাগজ পত্র লইয়া বসিলেন। তখন তিনি এমনই তন্ময় যে, হিমাংশুর কথা, দীপ্তির কথা, জগতের অন্য সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য-তন্ময়তা ছিল এই প্রকৃতির। তখন তাঁহার একমাত্র ঝোঁক, কিসে দুষ্কৃতকারীদিগকে সমুচিত দণ্ডিত করা যায়। যাহারা তাঁহার সরল বিশ্বাসী পুত্রের বিশ্বাস ও উপকারের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকার করিয়াছে, তাহারা যেই হউক, তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেই হইবে, নতুবা সমাজের শৃঙ্খলা থাকিবে না, পাপ পুণ্যের বিচার হইবে না। একেইত তাঁহার অনেক টাকা ডাকাতির ব্যাপারে ডুবিযাছিল—জুয়াচোরেরা তাহার অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়াছিল—তাহার উপর তিনি এই মামলা চালাইবার জন্য অকাতরে মুক্তহস্তে টাকা ছড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার জিদ হইল, যদি ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। [illegible]

দেওয়া হইবে না। এজন্য তিনি কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ব্যারিষ্টারদের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাগজ পত্র দেখিয়া একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আসামীদের কঠিন দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। মামলা রুজু হইবার পর কল্পনা দেবীরও নিস্তার থাকিবে না, তাঁহাকেও পাপাচারীদের সাহায্যকারী ও উৎসাহদাত্রী বলিয়া অভিযুক্ত করা হইবে। শিবপুর বাগান হইতে তিনি যে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঠাট বজায় রাখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিপক্ষে গিয়াছিল, ব্যবহারজীবরা এই অভিমত প্রকাশ করিলেন।

২৬

রাঁচি পৌছিয়া দীপ্তি তাহার পিতৃবন্ধুর দ্বারা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল, আজ কয়দিন হইল চণ্ডজানির ডাকবাঙ্গলোয় একজন বাঙ্গালী ডাক্তারকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তারের নাম হিমাংশু মিত্র। সে এখন রাঁচীর হাসপাতালে আছে। এখনও হিমাংশুর অবস্থা সঙ্কটশূন্য হয় নাই, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে সে অবস্থান করিতেছে। অতিকষ্টে দুই দিন চেষ্টার পর সে আজ পিতৃবন্ধুর সহায়তায় অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য হিমাংশুকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছে।

দর্শকদের অপেক্ষা করিবার স্থানে আর পাঁচজন দর্শকের সহিত দীপ্তিও বসিয়াছিল, বাহিরে যদু গোপাল বাবু মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দীপ্তির মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নদ্বয়ে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের চিহ্ন। সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালের দুর্ঘটনা-ওয়ার্ডের ডাক্তারটি ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁহার পিতৃবন্ধুর বিশেষ পরিচিত। তাঁহারই অনুগ্রহে দীপ্তি সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছিল। নতুবা বর্ত্তমানে আহত রোগীর পক্ষে বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথন নিষিদ্ধ—কোনওরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবার কারণ দেখা দিলে তাহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাহার আঘাত সাংঘাতিক—প্রথম দুইদিন তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না, তাহার কোনওরূপ চৈতন্যেরও অনুভূতি ছিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, জীবন-প্রদীপের আলোক ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। গত কল্য হইতে সে কথা কহিতেছে—অতি ধীরে অতি অনুচ্চকণ্ঠে অতি অল্পক্ষণ। দীপ্তি রাঁচী আসিয়া প্রথম দুই দিন সাক্ষাতের অনুমতি পায় নাই—সে দুই দিন তাহার কিরূপে কাটিয়াছে তাহা তাহার অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। সে নামমাত্র আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে—আপনার বিশ্রাম কক্ষে রুদ্ধদ্বারে অস্থির হইয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইয়াছে আর অনুক্ষণ তাহার অন্তর্য্যামীর নিকটে দীনহীন কাতর প্রার্থীর ন্যায় অন্তরের গভীর বেদনা জানাইয়াছে—তাহার প্রাণের বিনিময়ে আর একটি প্রাণ ভিক্ষা করিয়াছে। কি ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই সে সেই দুই দিন অতিক্রম করিয়াছে!

শ্বেত পরিচ্ছদ মণ্ডিতা একটি নার্স আসিয়া তাহাকে তাহার অনুগমন করিতে বলিল। এই অনুমতির জন্য দীপ্তি কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছে, কত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছে—তাহার কাছে সেই সময়টুকু যেন কত যুগ যুগান্তর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অথচ নার্স যখন প্রীতিপূর্ণ কোমল কণ্ঠে তাহাকে রোগীর কক্ষে যাইবার জন্য আহ্বান করিল, তখন তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, চরণযুগল যেন চলিতে চাহে না! নার্স আপন মনে বলিতেছিল,—"আপনিই দীপ্তি? আজ দুদিন জ্ঞান হয়েই কি, আর বিকারের ঘোরেই কি, রুগী কেবল ডেকেছে আপনাকে—কেবল 'দীপ্তি! দীপ্তি!' আঃ আপনি এসে আমাদের অনেকটা কাজ এগিয়ে দিলেন।"

কথার সাড়া না পাইয়া নার্স পশ্চাতে ফিরিয়া দীপ্তির দিকে চাহিল, দেখিল, দীপ্তি বসিবার আসন ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে।

নার্স বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল, তাহার পর পুনরায় অনুসরণ করিতে আহ্বান করিল। এবার দীপ্তি তাহার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনও তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতেছে। সে যখন তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন তাহার বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল, মনে হইল যেন হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

কক্ষদ্বারের যবনিকা অপসারিত করিয়া নার্স তাহাকে

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দ্বারপ্রান্ত হইতে দীপ্তির চরণ আর চলে না—বক্ষ স্পন্দন যেন আর রুদ্ধ হইতে চাহে না! কক্ষমধ্যে রোগ সেবার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র—আর এক পার্শ্বে রোগীর শয্যা। গবাক্ষ পথে অপরাহ্নের হীন তেজ তপনদেবের রজত রশ্মিজাল সমস্ত কক্ষটিকে আলোকিত করিয়াছে, সেই আলোকে দীপ্তি রোগ শয্যার উপর যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। রোগীর মুখ চক্ষু মস্তক বাহু বক্ষ,—প্রায় শরীরের সমগ্র উপরার্দ্ধ ব্যাণ্ডেজে বদ্ধ—সে দেহ যেন জীবন্ত বলিয়াই অনুমিত হইল না!

মুহূর্ত্তকাল দীপ্তি নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে রুদ্ধ বেদনার অভিব্যক্তি বুঝি আর সে ধরিয়া রাখিতে পারে না!

অতি সন্তর্পণে লঘুচরণে দীপ্তি শয্যার অভিমুখে অগ্রসর হইল। হঠাৎ সেই দিক হইতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে একটি কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিল। সত্য, না স্বপ্ন? দীপ্তি থমকিয়া দাঁড়াইল; তাহার বক্ষের স্পন্দন একবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। দীপ্তির হৃদয়-সঞ্চিত জমাট ব্যথা গলিয়া তাহার নয়নপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল—তাহার কোমল বক্ষ আলোড়িত করিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধে উঠিয়া আপনার ভারে বুঝি আবার মাটিতে পড়িয়া গেল!

আবার! আবার ক্ষীণকণ্ঠে সেই আগ্রহ ভরা করুণ সম্ভাষণ! দীপ্তি এবার স্পষ্ট শুনিল, সেই স্বর তাহাকেই সম্ভাষণ করিতেছে,—"দীপ্তি!"

দীপ্তি আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—সেই করুণ ব্যথাভরা আহ্বান তাহার নারী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত সমস্ত ভালবাসাকে—সমস্ত ব্যথা বেদনা সম্বলিত হর্ষ আনন্দকে সবলে আকর্ষণ করিল—দীপ্তির সমস্ত লজ্জা জড়তা উদ্বেগ আতঙ্কের জাল নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দীপ্তি নতজানু হইয়া শয্যা পার্শ্বে মেঝের উপর উপবেশন করিল—দুই হস্তে রোগশয্যাশায়ীর একখানি মুক্ত হস্ত ধারণ করিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও উচ্চারিত হইল না।

অঘোর ক্ষীণকণ্ঠে হিমাংশু বলিল, "তুমি এসেছো, দীপ্তি? আর কেউ না আসুক তুমি আসবে জানতুম। দীপ্তি! তুমি ত জান না, এই বুকের মধ্যে কতটা স্থান জুড়ে বসে আছ তুমি! তুমি ত জান না—"

দীপ্তি দেখিল হিমাংশু অতিকষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে, বাধা দিয়া বলিল, "থাক, কথা কবেন না—"

হিমাংশু বাধা দিয়া বলিল, "না, তা হবে না। জীবনের ওপারে চলে যাচ্ছি, হয় ত আর সময় হবে না—"

দীপ্তির প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। আপনার হস্তে হিমাংশুর মুখ আচ্ছাদন করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "কেন ওকথা বলছেন? মানুষের রোগ হলে সেরে ওঠে না কি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া হিমাংশু বলিল, "হুঁ সেরে উঠেছি! এই দেখ দীপ্তি, দুটি চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে—এই কপালে—এই বুকে—না, না, এই হতভাগার দুঃখের কাহিনীর বোঝা চাপিয়ে তোমায় বিরক্ত করতে চাইনি—এ কি কাঁদছ? ছি ছি দীপ্তি!"

বড় বড় ফোঁটার আকারে দীপ্তির তপ্ত-অশ্রুবিন্দু হিমাংশুর হাতের উপর গড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমাংশু আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "ছি দীপ্তি, তোমার চোখে জল দেখতে পারি নে—তোমার আগেকার সেই মনের জোর কোথায় গেল—তোমার মত আর ত একটিও দেখিনি!"

হিমাংশু হাঁপাইতে লাগিল। এই সময়ে নার্স আসিয়া বলিয়া গেল, আর দশ মিনিট মাত্র সময় আছে, বাহিরে আরও একজন বাবু একটি ছোট মেয়েকে লইয়া সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

হিমাংশু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দীপ্তি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবু—ছোট মেয়ে সঙ্গে?"

হিমাংশু উপাধানে ভর দিয়া মস্তক ঈষৎ উন্নীত করিয়া সাগ্রহে বলিল, "বাবা? রেখাকে নিয়ে এলেন বুঝি?"

নার্স চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জানাইয়া গেল যে, আজ আর সাক্ষাৎ নিষেধ, ডাক্তার বাবুর আদেশ। আর তাহারাও যেন দশ মিনিটের মধ্যে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শেষ করে।

নার্স বাহির হইতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

হিমাংশু আবার দীপ্তির একখানি হাত ধরিয়া আবেগ ও উচ্ছ্বাসভরে বলিল, "দীপ্তি, বল আবার আসবে? বল, এ দেখা আমাদের শেষ দেখা নয়? তুমি যদি সে আশা দাও, তা হলে হয় ত আবার বেঁচে উঠতে পারি। বল আসবে?"

হিমাংশুর কণ্ঠস্বর আশঙ্কা ও উদ্বেগজড়িত—যেন ঐ কথাটির উত্তরের উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

দীপ্তির পক্ষে তখন আত্মসংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে মৃদুভাবে ধরা গলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে সে বলিল, "আসবো না? তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? কিন্তু বল তুমি আমায় ক্ষমা করেছো? অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আমি তোমায় বার বার অপমান করেছি—বল ক্ষমা করেছো, না হলে—" দীপ্তির করুণ বাণী হিমাংশুর চেতন ও অচেতন লোকের রুদ্ধ বাতায়নটি খুলিয়া দিল। তাহার অধরে যেন হাস্যের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। হিমাংশুর রোগশীর্ণ অন্ধকার আননে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া গেল। সে কম্পিত দক্ষিণ হস্ত দীপ্তির মাথার উপর রাখিয়া বলিল, "কি স্বার্থপর আমি!—এখন আবার বাঁচতে সাধ হচ্ছে! আমার মত অন্ধ বিকলাঙ্গ অপদার্থের জন্য ভগবান যে এত সুখের সুধা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন তা ত স্বপ্নেও ভাবি নি—আজ আমার চেয়ে ভাগ্যবান কে?"

দীপ্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অতি দীন শুষ্ক ম্লান হাসি তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কই, বললে না ত আমায় ক্ষমা করেছ! আমি—আমি—"

প্রেমভরে দীপ্তির হাতখানি আপনার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বুকের উপর টানিয়া লইয়া হিমাংশু বলিল, "ক্ষমা? কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্য সঞ্চয় করেছিলুম, তাই আজ যা স্বপ্নেও পাবার আশা করিনি, তাই তুমি দিয়েছো। তোমায় ক্ষমা? দীপ্তি! এবার নিশ্চয় বেঁচে উঠবো। ডাক্তার বাবু বলেছেন, চোখ দুটি ফিরে পাবো, তবে হয়ত বুকের বেদনা চিরদিন কষ্ট দেবে। তা হোক, তোমায় ত দেখতে পাবো!"

বহুদিন পরে আজ ভগ্নদেহ নষ্ট স্বাস্থ্য হিমাংশুর মুখখানা হাসির আলোকে উদ্ভাসিত হইল। দীপ্তি মনে করিতে পারিল না, কতদিন—কতদিন সে সেই বালকের মত সরল উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিতে পায় নাই!

এবার নার্স আসিয়া দীপ্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল, আর এক মুহূর্ত্তও নয়। হিমাংশু দীপ্তির করপল্লব মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। দীপ্তি কোমল মধুর স্বরে বলিল, "এইবার আসি—বল সেরে উঠবে?"

হিমাংশু তাহার কথা শেষ করিতে দিল না, কাতর করুণকণ্ঠে ভিক্ষা করিল, "বল, আবার বল। আসবে—তোমার জন্যেই আমি বেঁচে উঠবো। বল, দীপ্তি বল, আবার কবে আসবে—যদি না আস তাহলে হয়ত আর আমি—" দীপ্তির বক্ষকে মথিত করিয়া একটি ছোট মর্ম্মভেদী অস্ফুট স্বর হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, "হুঁ", তারপর অতি কষ্টে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "আবার ঐ কথা? তাহলে আর ত আসবো না—"

ভয়চকিত কম্পিত কণ্ঠে হিমাংশু বলিল, "না, না, দীপ্তি আর কি আমি মরতে পারি? আবার এসো, এই স্বার্থপর অপদার্থকে আর ফেলে চলে যেও না।"

দীপ্তির গণ্ড বাহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। হাসিকান্নার মাঝে সে বিদায় গ্রহণ করিল। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সে আবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল তাহার পর উদ্গত অশ্রুবারি গোপন করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল, ততক্ষণ হিমাংশু সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তাহার পর তাহার আচ্ছাদিত নয়ন সমক্ষে যেন কক্ষের সমস্ত দীপ্তি নিভিয়া গেল, অবসন্ন ক্লান্তদেহে সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

* * *

বাহিরে আসিয়া দীপ্তি প্রথমে চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দর্শকদের বিশ্রাম কক্ষে আসিতেই রেখা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর পরিণতবয়স্ক স্বভাবগম্ভীর চন্দ্রমাধব বাবু অশ্রুমোচন করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "চল মা,

ঘরে যাই—আমি তোমার ওখানেই রেখাকে নিয়ে উঠেছি। আজ ত আর এরা দেখা করতে দেবে না। কেমন দেখলে, মা ?"

গাড়ীতে উঠিবার পর চন্দ্রমাধব বাবু আবেগ ও উৎকণ্ঠা-ভরে তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রেখাও ছাড়িল না। কিন্তু দীপ্তি মাত্র দুই একটি হাঁ-না ভিন্ন কোন কথা কহিতে পারিল না, তখন তাহার মন ক্ষণপূর্ব্বের সাক্ষাতের স্মৃতির ভারে পীড়িত—অবসন্ন।

গৃহে পৌছিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন "তোমরা না থাকিলে আমাদের মত হতভাগাদের এ সংসারনরকে কি উপায় হোতো, মা ?"

দীপ্তির নয়নকোণে অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমল করিয়া উঠিল। সে এ কথার কোন উত্তরই দিল না! চরণস্পর্শ পূর্ব্বক চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রণাম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"বাবা, আপনি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন।" (সমাপ্ত)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বিচিত্রা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

চক্রধারীর চক্রক্রীড়ায় রৌদ্র ও মেঘে যুদ্ধ নাকি ?
ক্ষুব্ধ হয়েছে রুদ্রের রূপ তথাপি করিছে মুগ্ধ আঁখি !
অক্ষি তারকা কৃষ্ণ সে তবু হেরে উজ্জ্বল তীব্র বিভা,
নিমিষে প্রাবৃট ঘনাইয়া আসি' ঢাকে কজ্জলে দিব্য দিবা।
কালোর কক্ষে আলোর বিজুরী, আলোয় সঙ্গী অন্ধ রাতি,
রাধাকৃষ্ণের বন্দনা গাহি' জ্বলে অগণ্য গন্ধবাতি ;
কি মধু ছন্দ ! গীত গোবিন্দ ! গাহে গ্রহতারা, সূর্য্য চাঁদে,
মধু আনন্দে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ বিদরে—তূর্য্যনাদে !
ভগ্ন সমাধি ধূর্জ্জটি ধীর, তোলে তাণ্ডব নৃত্যগানে,
বিশ্ববক্ষ ভিন্ন করিয়া ত্রিশূলী ত্রিশূল নিত্য হানে ;
ডম্বরু বাজে ডঙ্কার সাথে নাচে শঙ্কর সর্পরাজ,
শঙ্কামগ্ন বসুন্ধরার সর্ব্ব দর্প খর্ব্ব আজ।
বাজিছে শ্রবণে বংশীর ধ্বনি ধ্বংসের পারে ধ্বান্ত নাশি,'
গর্জ্জি ছুটিছে চক্র দারুণ, ছিন্নকণ্ঠ,—ভ্রান্ত বাঁশী ;
'শ্যামাশিব' আর 'রাধাকৃষ্ণে'র মূর্ত্তি হেরে কি সৃষ্টি সারা ?
জীবন ব্যাপিয়া শব আর শিব দর্শনে প্রায় দৃষ্টিহারা।
অন্ধ আঁখির সম্মুখে যবে চিরতরে হ'বে দৃশ্য শেষ,
সে দিন দাঁড়ায়ো যুগ্ম মুরতি উজল করিয়া শীর্ষদেশ ;
মুরলীর সুরে বিষাণের রবে, উভয় কর্ণে শান্তি সুধা,—
বর্ষণ করি' মধু অমৃত মিটায়ো মৃতের ভ্রান্তি, ক্ষুধা।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গঠন ও নীতি কি হইবে তাহা সঠিক আজও জানা যায় নাই। তাহা হইলেও এ সম্বন্ধে যে সব কথা শোনা যাইতেছে তাহাতে শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষা সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সাম্প্রদায়িকতা যাহাতে না থাকে, শিক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীদের মনে যাহাতে কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ না থাকে, কোন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে না পারিলে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর হইবে না। যদিও বর্ত্তমান আবহাওয়ার মধ্যে কোন ব্যবস্থাই যে সম্পূর্ণ ভাবে সাম্প্রদায়িকতা দোষ-মুক্ত হইবে, সাহস করিয়া আমরা এমন আশা করিতে পারিতেছি না।

শোনা যাইতেছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের যে নূতন বিধান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নাকি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। একদিন যে ইংরাজীর মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলেই যে আমাদের বর্ত্তমান মানসিক প্রসারতা ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও মাতৃভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষালাভের সময় অনেক দিন পূর্ব্বেই আসিয়াছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও যে বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তা, মনের বন্ধ্যাত্ব, এবং সৃজনী প্রতিভার আপেক্ষিক অভাব লক্ষিত হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে যে স্থান দিয়াছেন প্রয়োজনের তুলনায় তাহাও সামান্য। তবুও উদ্দেশ্যের পথে ইহা প্রথম সোপান বলিয়া শিক্ষাব্রতীরা ইহাকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া লইয়াছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার বিস্তার যে অনেক দ্রুত ঘটিবে, অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে ছাত্রেরা যে অনেক বেশী শিখিতে পারিবেন, তাঁহারা যে মানসিক শক্তির অনেক অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই সমান উপকৃত হইবেন। বরং একথা বলা যায় যে, যাঁহারা শিক্ষায় অধিকতর পশ্চাদ্বর্ত্তী তাঁহারাই এই ব্যবস্থায় অধিকতর উপকৃত হইবেন। পল্লী অঞ্চলের স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন, অনগ্রসর অঞ্চলের ছেলেদের সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হয়, ইংরাজী শিখিতে। যাঁহারা শিক্ষায় অগ্রসর তাঁহাদের ছেলেরা বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে এবং অনেক সময় অতিশয় স্বল্প মূল্যে গৃহ শিক্ষকের নিকট হইতে সাহায্য পান। যাঁহারা শিক্ষায় আজও পশ্চাদ্বর্ত্তী রহিয়াছেন তাঁহাদের ছেলেরা এই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত। স্কুলের বাহিরের কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীত সাধারণ ছেলেদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ব করা শক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য শেষোক্ত দলের ভাল ছেলেরাও—অন্যান্য বিষয় ভাল শিখিয়াও ইংরাজীতে কাঁচা থাকিয়া যান। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলে ইঁহাদের এই অতিরিক্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার উপর পূর্ব্বাপেক্ষাও বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, কাজেই ইংরাজী না শিখিবার ফলে মানসিক পুষ্টি কম হইবার আশঙ্কাও ইহাতে নাই। অবশ্য

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কার্য্যোপযোগী ইংরাজীর সামান্য জ্ঞান সকলের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও এবং প্রতিভাবান ছেলেদের পক্ষে ইংরাজী এবং সম্ভব হইলে আরও অন্যান্য বিদেশী ভাষা ভালভাবে শিখিবার উপযোগিতা থাকিলেও, সকলকেই ভালভাবে ইংরাজী শিখাইবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ কোন সুফল হয় না। ইংরাজী সাহিত্য হইতে পুষ্টি আহরণ করিবার মত জ্ঞান অনেকের হয় না; অনেকের সে আগ্রহ থাকে না, আর যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে সমগ্র চেষ্টাটাই অপব্যয় হইয়া যায়। তবুও প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায় ইংরাজী ভাল ভাবে শিখাইবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। সে সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ যদি এই হয় যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাংলা শিখিতে চাহেন না তা হইলে ত এই ব্যবস্থায় মাতৃভাষা হিসাবে তাঁহারা উর্দ্দু শিখিতে পারিবেন। যদিও বাংলা-ভাষী মুসলমানদের পক্ষে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্য্যাদা না দেওয়া অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও তাঁহাদের পক্ষেও ক্ষতিকর হইবে। একথাও সত্য যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে একটা শক্তিশালী দল, বাঙ্গালী হিন্দুদেরই ন্যায় বাংলার চর্চ্চা করিতেছেন এবং তাঁহাদেরই ন্যায় বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

যদিও, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাংলা শিক্ষা করিবেন কি না তাহা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে তবুও বাংলা যে তাঁহাদের মাতৃভাষা ইহা তথ্যের কথা, কাহারও স্বীকার করা বা না করার উপর তাহা নির্ভরশীল নহে

স্কুলের শিক্ষা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে কোন বোর্ডের হাতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না এবং তাহার ফলে শিক্ষার উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব যে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, শিক্ষার বিস্তার সাধনে বাধা ঘটিবে এবং অন্যান্য অসুবিধা দেখা দিবে সে সব কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি

প্রজা ও লীগদলের মিলন

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে প্রজা ও লীগদলের মিলনে এসেম্ব্লীর রাজনীতিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাদে ইহার অন্য একটা দিকও ভাবিবার আছে। বাংলার কৃষক প্রজারা কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছেন। অন্য দল সাম্প্রদায়িক কিনা সে বিতর্কে না যাইয়াও বলা যায় যে উহা মাত্র এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের, মুসলমানদের দল এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের কল্পিত স্বার্থ (এক সম্প্রদায়ভুক্ত সকল লোকের কোন একটি বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই) রক্ষাই উহার উদ্দেশ্য। কাজেই, যে দলে মুসলমান ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও আছেন সেই দলের প্রতিনিধিরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত একযোগে দল গঠন করিলেন কি প্রকারে। অমুসলমান কৃষকদের প্রতি ইহার দ্বারা কি প্রকারের ব্যবহার করা হইল? মুসলমান কৃষকদের প্রতিও ইহাতে সুবিচার করা হয় নাই। কৃষকদের মধ্যে যদি মুসলমান ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোক নাও থাকিতেন তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রতি ইহার দ্বারা সুবিচার করা হইত না। কারণ, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল লোক কৃষক নহেন, এবং ইঁহাদের স্বার্থ মুসলমান কৃষকদের স্বার্থের সহিত এক নহে—অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী। কাজেই, এই প্রকার মিলনে হিন্দু মুসলমান সকল কৃষকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছে। কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যেরা যদি হিন্দু মহাসভার সহিত মিশিয়া যাইতেন তাহা হইলে ব্যাপার যেরূপ হইত—এ মিলনের ব্যাপারটাও অনেকটা তাহাই হইয়াছে। অথচ, ইঁহারা যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয় নাই বা বিক্ষোভ দেখা যায় নাই। এই অস্বাভাবিকতার কারণ কি?

প্রথম কারণ, নির্ব্বাচক মণ্ডলী সম্প্রদায় হিসাবে বিভক্ত হওয়ায় দেশে রাজনীতিক মত বা অর্থনীতিক স্বার্থের ভিত্তিতে দল গঠনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন রাজনীতিক বা অর্থনীতিক দলের মনোনীত প্রতিনিধি বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই প্রকার কোন দলভুক্ত সকল লোকের ভোট পাইতে পারেন না। কোন কৃষক প্রতিনিধির হিন্দু মুসলমান সকল কৃষকের সমর্থন পাইবার সুবিধা বর্ত্তমান

ব্যবস্থায় নাই। তাঁহাকে শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের কৃষকদের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্য সম্প্রদায়ের কৃষক ভোটারদের নিকট প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকে না বলিয়া (যদিও কৃষক প্রতিনিধি হিসাবে সব সম্প্রদায়ের কৃষকের প্রতিই কর্ত্তব্য সমান) কৃষক প্রতিনিধির সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি হওয়া সহজ হয়। দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির অতি প্রাবল্য বশতঃ কাহাকেও বিশেষ ভাবে সচেতন করিয়া না দিলে যে কোন শ্রেণীর লোকই সর্ব্বপ্রথম মনে করিয়া থাকেন যে তিনি হিন্দু বা মুসলমান। কৃষকেরাও এই মনোভাব হইতে মুক্ত নহেন। যদিও তাঁহারা সমাজের একটা বিশেষ স্তরের লোক, তাঁহাদের বিশিষ্ট স্বার্থ আছে এবং সেই স্বার্থ হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল কৃষকেরই সমান, যদিও দল গঠনের পক্ষে এই স্বার্থই তাঁহাদের প্রধান ও একমাত্র সত্য ভিত্তি, যদিও কোন বিশেষ কৃষক বা কৃষক দল হিন্দু বা মুসলমান সে কথাটা নিতান্তই গৌণ তবু বর্ত্তমানে প্রতি কৃষক সর্ব্বপ্রথম মনে করিয়া থাকেন যে তিনি হিন্দু বা মুসলমান। সেইজন্য মুসলমান কৃষকদের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন দলে যোগ দিলে, কৃষকদের প্রতি যে, কোন অবিচার করা হইল, একথা মুসলমান কৃষকদের পক্ষে সহসা বুঝিতে পারা শক্ত। এখনও একদিকে তাঁহারা সব কৃষককে এক মনে করিতে শিখেন নাই, অন দিকে যে কোন শ্রেণীর মুসলমানকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কাজেই কৃষক হিসাবে তাঁহারা যাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন তিনি দল পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের মনে কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁহাদের মনে মনে এই প্রকারের ধারণা আছে যে কৃষক ও মুসলমান সমার্থক। অথচ তাঁহারা কৃষক হইলেও যখন মুসলমান এবং সব মুসলমানের স্বার্থ যখন এক, তখন যদি মুসলমান কৃষকদের প্রতিনিধিরা সমগ্র মুসলমান সমাজের সহিত মিলিত হন তাহা হইলে মুসলমান কৃষকদের স্বার্থহানি হইবার কারণ থাকিবে না।

লীগ দলের সহিত প্রজা দলের মিলনে আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাপেক্ষা সমাজের যে আভ্যন্তরীণ অবস্থার ফলে ইহা হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অনেক অধিক। কারণ জনসাধারণ যতক্ষণ না তাঁহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হইবেন ততক্ষণ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সুযোগ থাকিবে এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা শুধুমাত্র তাঁহাদের ব্যক্তিগত সততার উপর নির্ভর করিবে। এ অবস্থা কখনও স্বাস্থ্যকর নহে এবং এই অবস্থায় নেতাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল কাজ করা অস্বাভাবিকও কিছু নহে।

অর্থনীতিক কারণকে কি করিয়া সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলা হয়

বাংলার কৃষক ও শ্রমিক সাধারণের (ইঁহাদেরও অধিকাংশ ভূমিহীন কৃষক) দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অভাব অভিযোগের তালিকা সুদীর্ঘ। অথচ, তাঁহারা ইহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় সঠিক অবগত নহেন। অন্যদিকে তাঁহাদের মধ্যে এ বোধ আছে যে তাঁহারা কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান। এইজন্য তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতি কেহ সহানুভূতি দেখাইলে তাহার দিকে ইঁহাদের ঢলিয়া পড়া এবং তাহার দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক—সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দলগঠনে ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা অভ্যস্ত বলিয়া এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রভাবাধীন বলিয়া ইহাঁদের সাম্প্রদায়িকতার পথে পরিচালিত হওয়া আরও স্বাভাবিক। এই অবস্থাটা সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে কি ভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা সম্ভবতঃ অনেকের জানা নাই।

প্রথমে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ধরা যাক। প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক নেতৃগণ (ইঁহাদের মধ্যে অখ্যাত স্থানীয় নেতাদেরই সংখ্যা বেশী) মুসলমান জনসাধারণের—যাঁহাদের অধিকাংশই কৃষক ও দরিদ্র—সভায় বা বৈঠকে কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন এবং শ্রোতারা যখন নিজেদের দুঃখময় জীবনের স্বরূপ জানিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের মনে মনে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প জাগে তখন বক্তা ইহার প্রতিকারকল্পে

মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন এবং ইহার প্রত্যাশিত ফলও ফলে। অবস্থার বর্ণনা এবং যুক্তি ঠিকই দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাই ভুল। আমাদের দেশে লোকে দলের কথা সম্প্রদায় হিসাবেই ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহারা চিরদিন জানিয়া আসিয়াছে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান। কাজেই সভায় উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মুসলমান কৃষকেরাও ভুলিয়া যান যে বর্ণিত দুঃখ হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত কৃষকের এবং ভুল করিয়া মনে করেন যে ইহা মুসলমান জনসাধারণের দুঃখ। তাঁহারা একদিকে যেমন সমদুঃখী এবং সমস্বার্থবিশিষ্ট হিন্দু কৃষকদের কথা ভুলিয়া যান, তেমনই ইহাও ভুলিয়া যান যে, মুসলমান মাত্রেই কৃষক নহেন এবং অকৃষক মুসলমানেরা কৃষক মুসলমানদের দুঃখের অংশভাগী নহেন। এইরূপে যাহার জন্য হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল কৃষকের সংঘবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা ধারণা দূরীভূত হইয়া স্বার্থের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠা উচিত ছিল, তাহারই ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৰ্দ্ধিত হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠে! জমিদার গাতিদার, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর লোক অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়ায় এবং কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায় এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আরও সহজ হইয়াছে।

হিন্দুদের কৃষকশ্রেণীগুলির মধ্যেও আমরা এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। হিন্দুরা বিভিন্ন শ্রেণী উপশ্রেণীতে বহু বিভক্ত। ইঁহাদের কৃষকসম্প্রদায়গুলিও এক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। বৈবাহিক আদান প্রদান আহারাদি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি শ্রেণীর মধ্যেই এক একটা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিথিল অর্থে এই শ্রেণীগুলিকেই এক একটি দল বলা যায়। হিন্দুদের কৃষকশ্রেণীগুলিও তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হইয়াছেন বা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাঁহাদিগকে সচেতন করা হইতেছে এবং প্রতিকারস্বরূপে প্রত্যেক শ্রেণীর নেতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হইয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে বলিতেছেন এবং এই চেষ্টা প্রতিটি শ্রেণীর পৃথক সংঘবদ্ধতা উপসাম্প্রদায়িক সীমারেখাগুলিকে (অর্থাৎ তাঁহারা হিন্দুদের অন্যান্য শ্রেণী হইতে যে স্বতন্ত্র তাঁহাদের এই বোধকে ইহা বাড়াইয়া দিতেছে, অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য ও স্বার্থ যে এক এ বোধকেও অস্পষ্ট করিয়া দিতেছে) আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে এই সকল কৃষকশ্রেণীর দুঃখ কিছু দূর না হইয়া ইহাঁদের অকৃষক নেতাদের কিছু লাভ হইতেছে মাত্র। ইহাঁরা যে কৃষক, এবং স্বার্থের দিক দিয়া অন্যান্য সকল কৃষকের সহিত যে ইহাঁদের ভাগ্য বিজড়িত, একথাটার পরিবর্ত্তে যখন তাঁহারা শুনিতেছেন যে তাঁহারা হিন্দুসমাজের একটি বিশেষশ্রেণী এবং এই বিশেষ শ্রেণীর উন্নতির অর্থই তাঁহাদের উন্নতি, তখন অন্যান্য অহিন্দু সম্প্রদায় হইতে তাঁহারা যে পৃথক এবং সে পার্থক্য যে তাঁহারা হিন্দু বলিয়া এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্পিত স্বার্থের সহিত যে তাঁহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত অর্থাৎ সর্ব্বোপরি তাঁহারা যে হিন্দু এ বোধও কতকটা উগ্র হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র হিন্দু সমাজের যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছেন বর্ণ ও অবর্ণ হিন্দুদের এমন সাম্প্রদায়িক নেতারা এভাবটাকে কাজে লাগাইতেছেন এবং এভাবটাকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

হিন্দুদের এই শ্রেণীগুলি আবার বর্ণ হিন্দুদের সহিত সমান সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী নহেন এবং এবিষয়ে তাঁহাদের বহু সঙ্গত অভিযোগও আছে। হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে যখন তাঁহারা সংঘবদ্ধ হন তখন এই হীনতাসূচক ব্যবস্থার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণের চেষ্টাই তাঁহাদের সমস্ত মন অধিকার করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের এই অন্যায় ও বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা যে দূর হওয়ার প্রয়োজন এবং তাহার জন্য চেষ্টা ও প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু আর্থিক দুর্দ্দশার সহিত ইহাকে জড়াইয়া ফেলিয়া এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর করিবার উপায়স্বরূপ এই চেষ্টাকে গ্রহণ করিয়াই ভুল করা হইয়া থাকে। দলবদ্ধতার জন্য, দুঃখের প্রকৃত ও অন্য সকল কারণের ও গোড়ার কারণ দূর করিবার জন্য যে আর্থিক স্বার্থকেই ভিত্তি করিতে হইবে এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়াতেই বিপদ ঘটিতেছে।

সাম্প্রদায়িকতার ফলে নেতৃত্ব কাহাদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে

হিন্দু, মুসলমান বা অন্য যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক, সর্ব্বত্রেই দেখা যাইবে যে, কোন সম্প্রদায়েরই সমগ্র লোকের স্বার্থ এক নহে এবং অন্য সকল সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন স্বার্থও তাঁহাদের নাই। একই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত জমিদার ও মহাজন এবং প্রজা ও খাতকের স্বার্থ এক নহে। যদি জমির খাজনা ও সুদের হার কমে ও ফসলের দাম বাড়ে তবে প্রথমোক্তদের লোকসান এবং শেষোক্তদের লাভ হইবে, আবার অবস্থা যদি বিপরীত হয় তবে লাভ লোকসানের ভাগও উল্টাইয়া যাইবে। মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য। কোন সম্প্রদায়েরই সকল লোকের স্বার্থ যেমন এক নহে তেমনই হিন্দুদের কোন এক বিশেষ স্তরের লোকের এমন কোন স্বার্থ নাই যাহা অন্য সম্প্রদায়ের সমান স্তরের লোকের স্বার্থ নহে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে সকল হিন্দুর মনেই এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে হিন্দুরা সব এক, তাঁহাদের স্বার্থও এক এবং তাহা অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ত বা তাহার বিরোধী। মুসলমানদের মনেও অনুরূপ ধারণা আছে—তাঁহাদের মধ্যে উপ-বিভাগ নাই বা তাহার তীব্রতা ও সংখ্যা কম বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে এই ধারণা আরও বেশী দৃঢ় ও শক্তিশালী। এই ধারণার ফলে প্রতি সমাজেই যে স্বার্থের অন্তর্বিরোধ আছে এবং বিভিন্ন সমাজের একই স্তরের লোকের মধ্যে যে স্বার্থের সংযোগ আছে সেকথাটা লোকে ভুলিয়া থাকে। হিন্দু কৃষক তাঁহার হিন্দুত্বের ঝোঁকে একথা ভুলিয়া যান যে তাঁহার এবং হিন্দু জমিদার ও গাঁতিদারের (এমন কি তাহার স্বশ্রেণীরও এই সব লোকের) স্বার্থ এক নহে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষকের সহিত তাঁহার স্বার্থ অভিন্ন। মুসলমান কৃষকও এইভাবে একথা ভুলিয়া থাকেন। স্বার্থের এই বিরোধের কথা ভুলিয়া যান এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই বিরুদ্ধ স্বার্থবিশিষ্ট লোকদেরও নিজেদের লোক মনে করেন বলিয়া কৃষকদের বিরোধী স্বার্থের ধনী লোকেরা কৃষকদের নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান এবং কৃষকদেরই সাহায্যে কৃষকদের স্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক বোধই এই ভাবে সমাজের অন্তর্বিরোধকে ঢাকিয়া রাখিয়া সমাজের দরিদ্র জনসাধারণের নেতৃত্বের ভার ধনীদের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া ধনীশ্রেণীর এই সকল নেতা সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং হিন্দু এক হও মুসলিম এক হও, হিন্দু স্বার্থ, মুসলিম স্বার্থ প্রভৃতি ধুয়া তুলিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিয়া তুলেন। এই ভ্রান্তি না থাকিলে লোকে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে স্বার্থের ভিত্তিতে দল বাঁধিতে পারিত এবং ইঁহাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইতে পারিত।

একটা যুক্তির ভুল

মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা মুসলমান কৃষক সাধারণের নিকট একটা ভুল যুক্তি দিয়া থাকেন। কৃষকদের অধিকাংশ যখন মুসলমান এবং মুসলমান সমাজের অধিকাংশের জীবিকা যখন কৃষি তখন মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং মুসলিম স্বার্থ রক্ষিত হইলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হইবে,—ইহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। বরং এই কথা বলা ঠিক হইত যে, কৃষকদের অধিকাংশ যখন মুসলমান এবং মুসলমানদের অধিকাংশ যখন কৃষক তখন কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হইলে এবং তাঁহাদের উন্নতি হইলে মুসলমান সমাজের অধিকাংশের উন্নতি হইবে।

বাংলার কৃষিজীবিদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইলেও অমুসলমান কৃষকদের সংখ্যা নগণ্য নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অমুসলমান কৃষকেরা না থাকিলে মুসলিম ঐক্যের মধ্য দিয়া মুসলমান কৃষকদের উন্নতি হইতে পারিত তবুও আলোচ্য ক্ষেত্রে অমুসলমান কৃষকদের অস্তিত্বের ফলে তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ তাঁহারা মুসলিম ঐক্যে যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া মুসলিম কৃষকগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। মুসলিম কৃষকগণ যখনই মুসলিম ঐক্যের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান করিবেন তখন তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দুকৃষকেরাও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবেন। ইহাতে কৃষকশ্রেণী দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত

হইয়া পড়ায় স্বার্থরক্ষা ও অধিকার লাভের জন্য শুধু যে একযোগে লড়াই করিতে পারিবেন না তাহা নয়, তাঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক কৃষক-স্বার্থ-বিরোধী ধনী নেতাদের দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধেই চালিত হইবেন। কাজেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অমুসলমান কৃষকও বহু সংখ্যায় আছেন ততক্ষণ মুসলমান কৃষকেরা মুস্‌লিম ঐক্যের দ্বারা কখনই লাভবান হইবেন না।

যদি কৃষকদের মধ্যে মুসলমান ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোক না থাকিতেন তাহা হইলেও মুসলিম ঐক্যের দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইত না এবং তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ফলে সমানই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। কেননা, কৃষকেরা যদিও বা. সকলে মুসলমান হইতেন, মুসলমানেরা সকলেই কৃষক হইতেন না—অকৃষক ধনী ও বুদ্ধিজীবি মুসলমানেরাও থাকিতেন। সাম্প্রদায়িক সংঘবদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ব্ব আলোচনায় বর্ণিত উপায়ে অ-কৃষক মুসলমানেরা কৃষক-মুসলমানদের নেতৃত্ব করিতেন এবং নিজেদের স্বার্থের জন্য তাঁহাদের পরিচালিত করিতেন। ইহার ফলে কৃষকদেরও তাঁহারা যে কৃষক এ বোধ নষ্ট হইয়া গিয়া এই বোধ জন্মিত যে তাঁহারা মুসলমান এবং কৃষকদের স্বার্থের কথা তাঁহাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়া অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার ভাব (অথবা, বিদ্বেষ) জাগিত। সাম্প্রদায়িকতার মোহে মুসলমান কৃষক মুসলমান জমিদারকে হিন্দু কৃষক অপেক্ষা নিজের লোক ভাবিতেন। ইহাতে কৃষকদের স্বার্থসিদ্ধি না হইয়া স্বার্থহানি ঘটিত।

যদি এমন হইত যে, কৃষকেরা সকলেই মুসলমান হইতেন এবং মুসলমানেরা সকলেই কৃষক হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অকৃষক কেহই না থাকিতেন,—অর্থাৎ মুসলমান বলিতে যদি শুধুই কৃষক বুঝাইত এবং কৃষক বলিতে শুধুই মুসলমান বুঝাইত তাহা হইলেও, 'কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হও' একথা না বলিয়া 'মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হও' একথা বলা ভুল হইত। ইহাতে, মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে অবশ্য কৃষকদেরই সংঘবদ্ধ হওয়া হইত এবং কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল কিছু কিছু কাজও হইতে পারিত। কিন্তু, ইহাতেও ইঁহারা কৃষক এই কথা না ভাবিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়াই ভাবিতেন এবং কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়িয়া না উঠিয়া অন্য বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বা তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠিত। ইহাতে কৃষকদের উন্নতিমূলক কোন ধারাবাহিক কর্ম্মনীতি বা কর্ম্মপন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং নানা ভূয়া জিনিসের পশ্চাতে ছুটিয়া মিছামিছি শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিতেন। কিন্তু, শুধুমাত্র কৃষকেরা থাকিবেন, অথচ, তাহাদিগকে ঠকাইয়া ও শোষণ করিয়া নিজেরা পুষ্ট হইবার মত লোক থাকিবে না—এমন সমাজের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। যদিও তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে কোন একটা বিশেষ সময়ে ইহা সম্ভব তাহা হইলেও একথা নিশ্চিত যে, শীঘ্রই সে সমাজে শোষণ করিবার ও ঠকাইবার মত লোক দেখা দিবে। যখন এই কৃষক সম্প্রদায় ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল বাঁধিবেন তখনই তাঁহাদের মধ্যে এই ইচ্ছা দেখা দিবে যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোক চাকরি পাক, দোকান পসার খুলুক, ডাক্তার, উকিল হোক। এই সব লোক দেখা দিবেন এবং তাঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকের উৎসাহ ও সমর্থন পাইবেন এবং ক্রমে জমিদার, গাঁতিদার মহাজন প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও দেখা দিবেন। এইরূপে কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা না থাকায় ইহারা যে কৃষক স্বার্থ বিরোধী তাহা কৃষকেরা সহসা বুঝিবেন না। কাজেই, সব কৃষকই মুসলমান এবং সব মুসলমানই কৃষক, সমাজের এই অসম্ভব অবস্থা কল্পনা করিয়া লইলেও, কৃষকদিগকে তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন না করিয়া, ধর্ম্ম সম্প্রদায় হিসাবে সংঘবদ্ধ করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে না।

খুলনা জেলা কৃষক সম্মেলন

গত সংখ্যায় যশোহর জেলা কৃষক সম্মিলনের কথা লিখিবার পর আরও কয়েকটি কৃষক সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে খুলনার মৌভোগ গ্রামে খুলনা-জেলা-কৃষক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। আয়োজন খুব অল্প সময়ের মধ্যে করা হইলেও, উদ্যোক্তাদের চেষ্টার ফলে সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং প্রতি

পক্ষের বাধা দান সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক কৃষক যোগদান করিয়াছিলেন।

খুলনা জেলা ছাত্র সম্মিলন

গত ১২ই বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে খুলনা জেলার ছাত্রদের একটা সম্মিলন হয় এবং জেলার নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা ইহাতে যোগদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে 'দেশ ও ছাত্র সমাজ,' 'রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ,' 'শিক্ষা ও বেকার সমস্যা,' 'বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা,' 'যুদ্ধের বিভীষিকা' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন :—

"ছাত্রেরা রাজনীতি চর্চ্চা করিতেছে শুনিলে প্রবীণ অভিভাবক ও শিক্ষকগণ চমকাইয়া উঠেন। কিন্তু, আমাদের কাছে ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। আমার মনে হয় 'রাজনীতি' বলিতেই তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকা। কিন্তু ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে আজ ছাত্রদের মনে সন্ত্রাসবাদের রোম্যান্স আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। সন্ত্রাসবাদের যে নেশা ছিল তাহা তাদের কাটিয়া গিয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে—দেশের জনসাধারণকে বাদ দিয়া দেশের ব্যাপক সমস্যাকে উপেক্ষা করিয়া কোন স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নহে। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ একটা ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি মাত্র; সমাজের একটা বিশেষ অবস্থায় উহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল —আজ সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ধারারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সন্ত্রাসবাদের মোহ কাটিয়া গিয়াছে।"

সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে একথা সত্য বলিয়া আমাদেরও বিশ্বাস সভাপতির চিন্তা উদ্দীপক অভিভাষণে ছাত্র ও যুবদের ভাবিবার কথা অনেক রহিয়াছে। তাঁহার অভিভাষণের কোন কোন অংশ পরে উদ্‌ধৃত হইল।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতি

দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পণ্ডিতমূর্খদের অনুসাশন অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যদিও যৌবনের ধর্ম্ম তবুও যে, নিছক ভাবপ্রবণতা বা উচ্ছ্বাসের অন্ধতাড়না হইতে আত্মরক্ষা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অনুসরণ সাফল্যলাভের পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজন যে সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে সাবধান করিয়া দিয়া খুলনা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

"অগ্রগতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জ্ঞানের অনুশীলনের আত্যন্তিক সমন্বয় সাধন আধুনিক জীবনের অপরিহার্য্য পাথেয়। কোন দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি, আমাদের অভিযান কতদূর এসে পৌছেছে, কোনো দল পিছিয়ে পড়ল কি-না, এ সমস্ত মনে হলেই একটা মাপকাটি বা কষ্টিপাথরের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, যে কষ্টিপাথরের সন্ধান আমরা পাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সহায়তায়। ধন উৎপাদনের ও ধন বণ্টনের পদ্ধতি সমাজের পরিবর্ত্তনের নিয়ামকরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সব রকমের পরিবর্ত্তনের মাপকাটি এই মূলসূত্রের মধ্যে খুঁজতে হবে। এই জন্যই জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের চিন্তার সঙ্গে ব্যবহারের এই নিত্য সম্বন্ধটিকে সব সময় মনে রাখতে হবে। তা না হলে হয় সূক্ষ্ম চিন্তাবিলাসে ডুবে যাব, নয়ত আবেগের বশে হঠকারিতার প্রশ্রয় দেব। কিন্তু দুয়ের একটাও কাম্য নয়।

"বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে সব জিনিস যাচাই করে নেবার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। বাঙ্গালী ছাত্র ও যুবকের পক্ষে এটা বিশেষ দরকার। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি বলে বাজারে একটা সুনাম বা দুর্নাম আছে; আর এই স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সঙ্গে যখন যৌবনের উদ্দামতার রাসায়নিক সংযোগ হয়, তখনই একটা লক্ষ্যহীন ও আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে কেবল আতঙ্ক ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়—বাস্তবিক এগিয়ে যাওয়ার কাজ কিছু হয় না। আবার অন্যপক্ষে তেমনি অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। প্রগতিবিরোধী আন্দোলন যে আজ চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার কারণও এই বুদ্ধিসম্মত বিশ্লেষণের অভাব। ব্রতচারী নৃত্য, বয়স্কাউট, গার্লস্ গাইড

আন্দোলন, কোন কোন ছাত্রদলের প্রতিক্রিয়ামুখিতা, ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, নিন্দিত পল্লীমুখী মনোবৃত্তি প্রসারের চেষ্টা, প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তব ও পাঠশালার মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মগত গোঁড়ামিকে কায়েম রাখবার অপচেষ্টা, মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে মধ্যবাংলা বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন, কৃষি-কলোনি বা সদাগরী অফিসের চাকরির এজেন্সির সাহায্যে ব্যাপক বেকার সমস্যা সমাধানের নামে সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করা, এ সমস্তই এদেশের জনসাধারণের স্বার্থের ঘোর বিরোধী। এই সোজা কয়টি কথা যে এখনও লোককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়, এটাই আমাদের চিন্তার লালবাতি জ্বালানর সুস্পষ্ট প্রমাণ। ……ছাত্রদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করতে ও বুঝে দেখতে হবে যে এগুলি আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটকে ধামাচাপা দেবার, অগগতিকে ব্যাহত করবার ও সস্তায় বাজিমাৎ করবার ষড়যন্ত্র মাত্র।"

আরও দু'একটি কথা

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে লড়াই সুরু করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে অধ্যাপক গোস্বামী বলিয়াছেন :—"আলিগড়ের প্রগতিবাদী ছাত্রেরা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রস্তাবিত মুসলমান ছাত্রসংঘ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে কেবলমাত্র আলিগড় থেকে তাড়িয়েছেন তা নয়, এমন কি লক্ষ্ণৌতেও তাদের কোন রকমে তিষ্ঠিতে দেন নাই। সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িকতার অনুগ্রহীতাদের আনুকূল্যে দুইবার বিতাড়িত এই সব ছাত্রেরা বাংলাদেশে এসে নির্লজ্জ-ভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নানা যায়গায় মুসলমান ছাত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলবার চেষ্টায় আছে।"

বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিয়াছেন :—

……… এখনও যে কোন বিদ্যায়তন সংলগ্ন ছাত্রাবাসে হিন্দুসমাজের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে এটা বড়ই বিসদৃশ ও আপত্তিকর। আশা করি, এই ভেদনীতি অচিরেই তুলে দেওয়া হবে ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তজ্জন্য ছাত্রেরা, অভিভাবকেরা ও জনসাধারণ সচেষ্ট হয়ে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করবেন।"

রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ সম্বন্ধে অভিভাষণে বলা হইয়াছে :—"অনেকে বলেন যে, ছাত্রেরা রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দূরে থাকবেন। কিন্তু, রাজনীতি আজ-কাল দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে যে, কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেই রাজ-নীতির কথা এসে পড়তে বাধ্য। বেকার সমস্যা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন মত প্রকাশ ও আলোচনার সুযোগ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, সংস্কৃতির ব্যাপকতর প্রসার প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ছাত্রসমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য, কিন্তু, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই, ছাত্রদের যদি দেশের ও জগতের প্রধান সমস্যাগুলির আলোচনা করতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও এসে পড়বে। জীবনের সমস্যাকে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সুতরাং একটার সঙ্গে অন্যগুলিও এসে পড়েই। যাঁরা ছাত্রদের রাজনীতিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে বলেন, তাঁরাও কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া এ কথা বলেন? ………সমস্ত পৃথিবীর ছাত্র সমাজ যখন এগিয়ে চলেছে, মিশরের ছাত্ররা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের ন্যায্য দাবী সরকারকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন, চীনের ছাত্ররা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার প্রতিরোধ করার জন্যে যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, তখন ভারত-বর্ষের ছাত্র আন্দোলনকেও সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বর্ম্মা গমন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ব্রহ্মদেশে যাইয়া সেখানকার সর্ব্বশ্রেণীর জনগণকর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। এখানকার বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে বাংলায় একটি অভিনন্দন

দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে 'দেশপ্রাণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উভয় দেশের শাসকদের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে উভয় দেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান গড়িয়া উঠিবে এবং উভয় দেশের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এমন অবস্থারও সৃষ্টি হইবে। কিন্তু, তাহা হইলেও, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক ভাগ্যের সহিত ব্রহ্মদেশের ভাগ্য ঘনিষ্টভাবে জড়িত এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের সাফল্যের অনুপাতেই ইঁহাদের রাষ্ট্রিক অধিকার সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইবে। এবিষয়ে ব্রহ্মবাসীদের সহায়তা ভারতবর্ষের পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান হইবে। কিন্তু উভয় দেশের রাজনীতিক অবস্থা যে এক এবং উভয়ের ভাগ্য যে এক সূত্রে গ্রথিত, ইহা সত্য হইলেও, উভয়দেশবাসীর বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রহ্মদেশবাসীদের নিকট এই সত্য অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। রাজনীতিক সম্পর্ক ব্যতীতও ভারতের সহিত ব্রহ্মের কৃষির সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কও দূর নহে। কিন্তু রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার সময় এই সম্পর্কও দূরতর হইবে। তবে ভারতবর্ষের জনমতের, কৃষ্টির, বিদ্যার নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণ মাঝে মাঝে ব্রহ্মদেশে গেলে এই সম্পর্ক কিছু পরিমাণে রক্ষিত হইবে। এদিক দিয়া এই সময় জওহরলালের ব্রহ্মদেশ গমন, ব্রহ্ম ও ভারতের সংযোগকে দৃঢ় করিয়াছে।

ছাত্র প্রভাবিত করিবার নূতন উপায়

সরকারি প্রেরণায় বাংলার কোন কোন স্থানে (সর্ব্বত্র কিনা জানিনা) স্কুলের ছেলেদের কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাদের খেলাধূলা প্রভৃতির দলও পৃথক। প্রত্যেক দলকে আবার কয়েকজনকে করিয়া শিক্ষকের এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্রদের কড়া তত্ত্বাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে কোন ছাত্রেরই সম্ভবতঃ সরকারের সতর্ক দৃষ্টির বাহিরে থাকা সম্ভব হইবে না।

ইহার আরও কয়েকটি ফল ফলিতেছে। প্রায় প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই, এক স্কুলের ছাত্র বলিয়া একটা ঐক্যবোধ আছে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার ভাব একটু দেখা যায় তাহাও, সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না বলিয়া, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষা পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না। কিন্তু, বিভিন্ন দলে একই স্কুলের ছেলেদের ভাগ করিয়া দেওয়ায় একই স্কুলের ছেলে বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ ছিল তাহার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইতেছে। এই প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারেও পরিণত হইতেছে। দল তিত্ব লইয়া কোন কোন স্থানে ইহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নও উঠিয়াছে এবং ছাত্রদের সাধারণ মিলনক্ষেত্রগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কাজেই এই পরিকল্পনার প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে।

মুসলমান জনসাধারণকে কংগ্রেসে আনিবার চেষ্টা

মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী ও আদর্শের প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস বিশেষ উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কংগ্রেসের মধ্যে অনেক মুসলমান কর্ম্মী এবং প্রতিপত্তিশালী মুসলমান নেতা আছেন, সে কথা সত্য। তবুও মুসলমান জন সাধারণ যে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের যোগদান সাময়িক হইয়াছে, সে কথাও সত্য। কংগ্রেস বরাবর এ সম্বন্ধে সজাগ আছেন এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে আকৃষ্ট করিবার জন্য বরাবরই সাগ্রহে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের চেষ্টা এইজন্য সফল হয় নাই যে, মুসলমান নেতাগণ কংগ্রেসে যোগদান করিবার পূর্ব্বে সব সময়ই কোন না কোন বিশেষ প্রতিশ্রুতি চাহিতেছেন। এই সকল সর্ত্ত পূরণ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, এই রাষ্ট্রীক স্বার্থ হিন্দু এবং মুসলমানের পৃথক নহে (যদিও বিভিন্ন আর্থিক স্তরের লোকের পক্ষে সমান নহে), কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট রাষ্ট্রিক স্বার্থ নাই,

কাজেই, কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে কোন বিশেষ সুবিধা দিবার অধিকার কংগ্রেসের নাই। কংগ্রেস যে রাষ্ট্রিক লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন তাহা হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে বণ্টিত হইবে না—সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই তাহার ভাগ পাইবেন। এই জন্য কংগ্রেসের যে প্রচেষ্টা তাহাতে যে কেহ যোগ দিতে পারেন এবং তাহাতে তিনি হিন্দু কি মুসলমান তাহা তাঁহার ভাবিবার কারণ থাকে না।

কিন্তু কংগ্রেসের এই অ-সাম্প্রদায়িক আদর্শের কথা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হওয়ায় তাঁহারা কংগ্রেস সম্বন্ধে অজ্ঞই রহিয়া গিয়াছেন এবং কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ও কর্ত্তব্যের জন্য সব সময়েই নেতৃবৃন্দের পরামর্শের উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। মুসলমান জনসাধারণ যাহাতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ থাকেন তাহাতে এই সকল নেতার লাভ আছে বলিয়া, মুসলমান জনসাধারণ যাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বা অসাম্প্রদায়িক কোন আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া অসাম্প্রদায়িক হইয়া না পড়েন সেদিকে ইঁহারা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কাজেই, এই সকল নেতার নিকট হইতে ইঁহারা কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া জানিয়াছেন এবং কংগ্রেসকে সেইভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুসলমান জনসাধারণের কংগ্রেস সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং তাহা হইতে প্রভূত বিরূপতাই সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেস সম্বন্ধে বর্ত্তমান মনোভাব অবলম্বনের শক্তি দিয়াছে। কারণ, এই সকল নেতা যদি জানিতেন যে জনসাধারণকে তাঁহারা যাহা খুসী বুঝাইতে পারিবেন না তবে জনসাধারণের মতের চাপই তাঁহাদিগকে মত পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিত। কাজেই, সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস এতদিন ভুলপথে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহাদের এবারকার চেষ্টা যথাযথভাবে পরিচালিত হইলে সুফল ফলিবে আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুদের অনুন্নত শ্রেণীগুলিরও কংগ্রেস সম্বন্ধে মনোভাব অনেকটা মুসলমানদেরই অনুরূপ এবং তাঁহারা ক্রমে হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িতেছেন।

জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বোধ কমিয়া গেলে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অন্যান্য মতও দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে প্রসারলাভ করিবে। প্রগতিমূলক সর্ব্বপ্রকার চিন্তাধারার বিস্তার সাধনে সাম্প্রদায়িকতা আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা জন্মাইতেছে। আগ্রা অযোধ্যার জননেতা রফিউদ্দিন কিডোয়াই, অযোধ্যার চীফকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার ওয়াজির হাসান, পাঞ্জাবের জননেতা অধ্যাপক আবদুল মজিদ খান প্রভৃতি মুসলমান প্রধানগণ সাম্প্রদায়িক দাবীর বিরুদ্ধে বলিয়াছেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

গোপন কথাটি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমারে তুমি কি বলিবেনা সখী, গোপন কথাটি তব,
সরমে ঢাকিয়া রাখিবে তোমার রহস্য নব নব।
পূজার অর্ঘ্য সাজাল যে জন যুগ-যুগান্তর ধরি'
নব প্রভাতের বন্দনা গানে তুলিল ভুবন ভরি',
গোধূলি বেলার স্তিমিত আলোকে বিদায়ের কল্পনা
সাগরে যাহার মর্ম্মকথায় দিয়ে যায় আল্পনা,
সারাটি হৃদয় লুটায়ে করিল তোমার সন্ধ্যারতি
তামসী নিশায় ছন্দে গাথায় ফুটাল আলোর জ্যোতি,
গোপন কথার রঙে রঙে রচে ইন্দ্রধনুর শোভা,
পূর্ণ চাঁদের সোনালী-স্বপন বিচিত্র মনোলোভা,
হৃদয়-ধূপটি জ্বালায়ে যে-জন বাসর-শয়ন পাতি
না-বলা কথার মালা গেঁথে গেঁথে কাটায় মিলনরাতি,
অকথিত তব গোপন কথাটি বলিবেনা তুমি তারে ?
গহন মনের দুয়ার হইতে ফিরিবে সে বারে বারে ?

তোমার পথের দুধারে সজনী, ফুটেছে কত না ফুল,
কেহবা রঙের রাজরাণী, কেহ সুগন্ধ সমাকুল।
সাদা বা সবুজ কেহ লাল নীল কারো বা গোলাপী দেহ,
অবনতমুখী সলাজ চাহনী, চটুল আলাপী কেহ।
কতনা ছাঁদের গড়ন তাদের, কত ধাঁজে তারা চায়,
নিকুঞ্জ বনে তারা মনে মনে কত কথা কয়ে যায়।
মধু আছে বলে' কারো বা আদর, রঙের কদর কারো.
সুগন্ধধন করিয়া হরণ তুমি ফেলে যেতে পারো ?
মন ভুলাইতে খুলিয়াছি মন, কতনা আকিঞ্চন,
মন সে তোমার হয়ত ভুলেছে, পাইনি তোমার মন
আনন্দ পাব, খুসী হবে তুমি তাইত গেয়েছি গান,
নৃত্য চপল রজনী হয়েছে সুরে সুরে অবসান।

সুরে সুরে তার ভরেছে বাতাস, লেগেছে নাচের নেশা,
পানপাত্রের রঙের নেশায় রঙীন অধর মেশা।
চন্দ্রাতপের ঝাড়লণ্ঠনে নাচের খেয়াল জাগে,
বেণীবন্ধন খুলে খুলে যায়, শ্লথ অঞ্চলে লাগে
নাচের খেয়াল, সুরের নেশায় মাতাল দখিনা বায়,
হয়ত পেয়েছি আনন্দ তাতে বল কিবা আসে যায় ?
জয়'ত করেনি আনন্দ মোর আমার গানের রাণী,
বাতাসে ভাসিছে যে সুর আমার হারাল কি তার বাণী।
বাসর-সখীরে পাইনিত আমি হৃদয়-লক্ষ্মীরূপে,
শয়ন-শিয়রে তাইত প্রদীপ জ্বালায়েছি চুপে চুপে।

নানাছন্দের দীপাবলি জ্বেলে উজল করেছে গেহ,
উজল হয়েছে আমার মনের গোপন কথার স্নেহ।
শিয়রে তোমার জাগিয়া রয়েছে সে গোপন কথাগুলি,
কখন তোমার ভাঙ্গিবে সে ঘুম, দুয়ার যাইবে খুলি।
ঘুম যদি ভাঙ্গে হয়ত নয়ন মেলিবেনা সঙ্কোচে,
আমার বাহুর শিথানে তোমার কুণ্ঠা যদি না ঘোচে,
আমার লজ্জা আমারে তখন, বিঁধিবে দিবস নিশি,
দীপ নিবে যাবে উষার আলোকে আঁধারে যাইবে মিশি।
কোথায় লুকাব আমারে তখন ? তোমার নিষ্ঠুরতা
সেই বড় হ'ল ? ম্লান হয়ে গেল আমার গোপন কথা?
স্ফুট-অস্ফুট-কথা-কুসুমের গাঁথিয়াছি কত মালা,
আমারি মনের আনন্দে গাঁথা তোমারি সকাশে বালা।
যে আশায় আমি মিলন-বাসরে পরাইনু তব গলে,
সে আশারে মোর সফল করিয়া আমার কুঞ্জতলে
কেন ফুটাইলে গোপন কথার রজনীগন্ধা বেলী,
চম্পা চামেলি মুখ চেয়ে আছে যাবে তুমি অবহেলি ?

'মামি'

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—"বাঃ এখনও এখানে বোসে। চল সিনেমার যে সময় হোয়ে গ্যাছে। মনে নেই বুঝি? সান অব ইণ্ডিয়া আছে।"

চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। সুদূর আফ্রিকার কায়রোর বুকে অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কায়রোর মিউজিয়মে টুট-আনখ্-আমুনের মামির শবাধারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া অতীত মিশরের শিল্পকলা, গৃহসজ্জা দেখিতেছিলাম; সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ঘরটীর মধ্যে আলোর দীপ্তি কমিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। আমি ছাড়া আর একটী ভদ্রলোক সে ঘরে ছিলেন। অন্যান্য দর্শকের অধিকাংশই তখন মিউজিয়াম ত্যাগ করিয়াছেন। নারী-কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাকাইয়া দেখি একটী তরুণী অপর ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়াইয়া। ভদ্রলোকটী অভিনিবেশ সহকারে কাগজ পেন্সিলে কি সব টুকিতেছিলেন। তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এই যে হ'য়েছে, আর মিনিট দশেক"।

অসহিষ্ণুভাবে মহিলা উত্তর দিলেন "কি যে বল তুমি। আর মাত্র পনের মিনিট দেরী আছে। চল শীগ্গী। আবার নয়ত কাল আসবে ঐ সব মড়া ঘাঁটতে"।

সুদূর কায়রোর বুকে একজোড়া বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম "মাপ করবেন। বাঙলা কথা শুনে আলাপ না করে পারলাম না"।

ভদ্রলোক সহাস্যে উত্তর দিলেন "বেশ ত। এ ত আনন্দের কথা। আপনিও ত বাঙ্গালী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চেহারাতেই কতকটা তা বোঝা যায়, কিন্তু আপনার চেহারা আর রঙ থেকে সহজে বোঝা যায় না যে আপনি বাঙ্গালী, অবশ্য ওঁর কাপড় আর চুল ওঁর আসল পরিচয় সহজেই দেয়"।

ভদ্রলোক একটী প্রাণখোলা হাসি হাসিলেন। কিন্তু সে হাসির আওয়াজের অন্তরালে অস্পষ্ট একটা উক্তি কাণে আসিল "ঐ-ই ত আছে।"

পরক্ষণেই স্পষ্টতর কণ্ঠে মহিলাটী বলিলেন "চল আর সময় নষ্ট কোরোনা। আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে সিনেমায়?"

রাত্রে কোন কাজ ছিল না, কাজেই সম্মত হইলাম। তিনজনে একটা ট্যাক্সীতে উঠিলাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম জানতে পারি?"

—"স্বচ্ছন্দে। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার?"

—"অমর সরকার। আর ইনি নন্দিতা, আমার স্ত্রী। আপনি কবে এসেছেন এখানে?"

নন্দিতা দেবীকে নমস্কার করিয়া উত্তর দিলাম,

—"দিন পাঁচেক হোল"—

—"ইওরোপের পথে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?" মিঃ সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন।

—"না। আমি ধূপের ব্যবসা করি। জাপান, আমেরিকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত ক'রে, এবার এসেছি ইওরোপের দিকে। এখানে কয়েকটী ভাল এজেন্ট করে, যাব ইওরোপে"।

—"বাঃ চমৎকার! আপনারাই সত্যিকার বাহাদুর; বাইরের টাকা দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার!" সরকার বলিলেন।

—"হ্যাঁ তোমার মত সবাই শ্বশুরের পয়সা ওড়ায়না"—মহিলাটী কহিলেন। এই অস্বাভাবিক কঠোর উক্তি সহসা

আমাদের সমস্ত আলাপকে যেন বিষাক্ত করিয়া তুলিল। বিস্মিতও বড় কম হইলাম না। এই সুদূর বিদেশেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ কি এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে! অথবা মহিলাটী স্বভাবতঃই দুর্মুখ! কথা কয়েকটী সহসা মিঃ সরকারের মুখ হইতে যেন সমস্ত রক্ত চুষিয়া লইল, পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে রক্তপ্রবাহ আসিয়া মুখখানিকে অস্বাভাবিক লাল করিয়া তুলিল। ঠিক তীব্র চাবুকের ঘায়ে রক্ত সহসা সরিয়া গিয়া পরক্ষণেই আঘাতের স্থানটী যেমন লাল হইয়া উঠে তেমনি। সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, পরে মিঃ সরকার বলিলেন "এখানে কোথায় উঠেছেন আপনি?"

—"সেমিরামিস হোটেলে"।

—"ও তা হ'লে ত আমাদের বাড়ীর কাছেই"—মহিলাটী কহিলেন।

—"আপনি যে ক'দিন আছেন এখানে দয়া করে আসবেন আমাদের ওখানে। ১৩ নম্বর বাড়ী ঐ রাস্তাতেই" মিঃ সরকার বলিলেন।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম "আপনি কি এখানে বাড়ী নিয়ে আছেন? কতদিন আছেন এখানে?"

—"প্রায় দেড়মাস হোলো আমরা এখানে আছি। এর আগেও আমি ছাত্রাবস্থায় অনেকদিন কাটিয়েছি এখানে। ইজিপ্টের অতীত ঐশ্বর্য্য, তার সংস্কৃতি, সভ্যতা আমাকে মুগ্ধ করে; ভারী আনন্দ দেয়"। মিঃ সরকার বলিলেন।

সিনেমায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রচুর আলোকে, বিভিন্নবেশী লোকের ভিড়ে নানা চিত্রবৈচিত্র্যে সিনেমার প্রবেশ দ্বার ঝলমল করিতেছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মাপ করবেন, এখানে এতদিন ধরে বাস করছেন নিশ্চয় কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে?"

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "হ্যাঁ, আমি একজন ইজিপ্টোলজিষ্ট (Egyptologist)—"

ছোট্ট রুমালটা মুখে চাপা দিয়া মাঝপথেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নন্দিতা বলিয়া উঠিলেন "ও সব বড় বড় ইষ্ট (ist) কিষ্ট বোলে আর নিজের কদর বাড়িওনা।"

পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "ব্যারিষ্টারী, ইঞ্জিনিয়ারিং—যাতে পয়সা রোজগার হয় তাতে ফেল মেরে এখন ঐ সব ভাঙ্গাচুরো খোঁড়া নুলো পাথরের পুতুল আর মড়া নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছেন"।

তীক্ষ্ণ আলোকের নীচে মসৃণ সিল্কের সাড়ী ঘেরা তন্বী দেহখানা রুক্ষ হাসিতে ঝকমক করিয়া উঠিল। চমৎকার সুশ্রী চেহারা, দীর্ঘ পাতলা শরীর, সুন্দর রঙ; বাঁ গালে একটী ঘনকৃষ্ণ আঁচিল গোলাপী রঙের উপর চমৎকার মানাইয়াছে, সুন্দর সুবিন্যস্ত শুভ্র দন্তপাটী। কিন্তু এত প্রচুর সৌন্দর্য্যের মাঝে এমন কুৎসিৎ মন যে কেমন করিয়া স্থান পাইল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সিনেমা শেষে তিনজনে একসঙ্গেই ফিরিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহারা উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইতে আসিবার জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

* * *

প্রত্যুষে উঠিয়া চলিয়াছিলাম নীলনদের ধারে। খানিকটা খোলা হাওয়ায় পায়চারী করিয়া ফিরিবার পথে মিঃ সরকারের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম। আমার হোটেলের আট দশখানি বাড়ীর পরই মিঃ সরকারের বাড়ী। তাঁহার বাড়ীর সামনে আসিতেই দেখিলাম তিনি সামনের ছোট বাগানটায় পায়চারী করিতেছেন।

কহিলাম "নমস্কার; খুব ভোরে উঠেছেন ত।"

একগাল হাসিয়া নমস্কার করিয়া তিনি বলিলেন—"নমস্কার। এত সকালে কোথায় চোলেছেন? আসুন ভেতরে আসুন"। ছোট্ট গেটটা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। কহিলাম—"আপনারা খুব ভোরে ওঠেন। 'Early to bed and early to rise, তাই আপনি এত wise হ'য়েছেন। আমাদের মশায় চল্লিশের কোঠা চ'লছে; ঘুম আসতেও রাত্রি একটা দেড়টা আর ভাঙ্গেও ভোর চারটেয়"

—"না আমার ভাগ্যেও সকাল সকাল শোয়া ঘটে না। পড়াশুনায় কোনদিন বা রাত্রি একটা, কোনদিন দুটো বাজে, কিন্তু সকালে খুব ভোরেই ঘুম ভাঙ্গে। কাল একটা নতুন

মামির জন্মতারিখ নিয়ে প্রায় রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত কেটে গেছে।"

বলিলাম "নীলনদের ধারে বেড়াতে যাচ্ছি। যাবেন?"

তিনি কহিলেন "আচ্ছা চলুন। দাঁড়ান স্লিপারটা ছেড়ে আসি"। তিনি ভেতরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন "চলুন"।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম "মিসেস সরকার যাবেন না?"

তাচ্ছিল্যভরে তিনি বলিলেন "সে বোধ হয় এখনও ওঠেইনি। চলুন ফিরে এসেই চা খাওয়া যাবে।"

নীলের তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সূর্য্যোদয় হইল। রক্তিমাভায় চারিদিক লাল হইয়া উঠিল। নীলের বুকের প্রকাণ্ড পালওয়ালা নৌকাগুলো সুষুপ্তির কোল হইতে জাগিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠিল; দূরে পিরামিডের চূড়াগুলি নিশার অন্ধকারের আবরণ হইতে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ভোরের হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া ভারী ভাল লাগিল; বলিলাম "আঃ চমৎকার হাওয়া। আজকের সকালটা বেশ মিষ্টি না?"

হাসিয়া তিনি কহিলেন "মিষ্টি আজকের সকাল নয়, আপনার মন। মনের অবস্থা শান্ত ও সুখী না হোলে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাকে স্পর্শ কোরতে পারেনা। নয় কি?"

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল তা আমাকে আঘাত করিল; তাই শুধু বলিলাম "হয়ত তাই।"

আরও খানিকক্ষণ পায়চারী করার পর আমি প্রশ্ন করিলাম "আচ্ছা এই নীল নদের ওপর দিয়েই ত একদিন ক্লিওপেট্রা রোমে গিয়েছিল?"

উৎসাহিত ভাবে তিনি বলিলেন "শুধু ক্লিওপেট্রাকেই আপনার মনে পোড়ল, নীলের সঙ্গে ঈজিপ্টের কত ইতিহাস যে জড়িত তার ইয়ত্তা নাই। আচ্ছা ক্লিওপেট্রা আপনার মনে বাসা বেঁধেছে কি জন্যে? তার অসামান্য রূপের জন্যে, না তার চিত্তের কদর্য্যতার জন্যে?"

হাসিয়া বলিলাম "তা বলা বড় শক্ত, হয়ত দুইএর জন্যেই।"

—"ঠিক এই জন্যেই ইজিপ্ট আমার এত প্রিয়। এর প্রতি নদনদী, পাহাড়, পিরামিড, ধুলোবালিতে পর্য্যন্ত আলো ও অন্ধকারের ইতিহাস জড়িত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শারীরিক শক্তি এবং নিষ্ঠুরতায় যেমন এরা একদিন জগতের শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি মানসিক দৈন্য ও চিত্তের সঙ্কীর্ণতায় এবং শারীরিক অক্ষমতায় এদের পতন হোয়েছে। এখানকার প্রতি পাথরের টুকরাটীর সঙ্গে একটা দেশের ও জাতির উন্নতি এবং অবনতির ইতিহাস জড়িত। একদিন যাঁরা আদিতম শ্রেষ্ঠ সভ্য জাত ছিল, আবার তারা অসভ্যে পরিণত হ'য়েছে। বলুন ত এই উত্থান পতনের কাহিনী ব্যারিষ্টারী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মুখস্থ বিদ্যের চেয়ে ঢের বেশী সরস কিনা? এর জন্যই ত শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পোড়তে এসে ফেল করলুম, শেষে অগতির গতি ব্যারিষ্টারী পোড়তে হোল শ্বশুরের ইচ্ছেয়, কিন্তু সত্যিই তা পড়লে আর ফেল কোরব কেন? লণ্ডনের এক প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল; তিনিই আমাকে এ রসের সন্ধান দেন। নইলে আমি বুদ্ধির দৈন্যে ফেল করেছি এ অপবাদ নন্দিতাও দেবেনা।" বলিয়া হাহা করিয়া মিঃ সরকার হাসিয়া উঠিলেন। সিগারেট কেসটা বাহির করিয়া আমাকে একটা দিয়া নিজে একটা ধরাইলেন।

পরে বলিলেন "ভাল ছেলে ছিলাম বলেই ত নন্দিতার বাবা গরীব জেনেও আমাকে তার একমাত্র মেয়েকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওদের আশামত ভালছেলে হোতে পারলাম না, অর্থাৎ রোজগেরে হলাম না। উল্টো শ্বশুরের সম্পত্তির মালিক হোয়ে তাঁর অর্থ নিজের খেয়ালে ওড়াচ্ছি, তাইত নন্দিতার অত রাগ" বলিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া হুস্ করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িলেন। "নন্দিতা এই সব নীরস কাঠ পাথর গুলোকে দুচোখে দেখতে পারে না। আমাকে মাঝে মাঝে বলে ঐ সব মড়া আর পাথর ঘেঁটে ঘেঁটে তুমি ওদেরই মতো হোয়ে গিয়েছ, তোমার প্রাণ গিয়েছে শুকিয়ে, মরে।

বলিলাম "হয় ত ওঁর দিক থেকে কথাটা খুবই সত্য।"

আমার অবিচলিত কণ্ঠস্বর—সম্ভবতঃ ক্ষণেকের জন্য মিঃ সরকারকে বিচলিত করিল, তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত আমা

মুখের দিকে তাকাইয়া কঠিন কণ্ঠে বলিলেন—'না তা নয়। আমার অবহেলার জন্যে ও অমন হয় নি। ও এবং আমি ভিন্ন সমাজের। আমরা বাঙালী হোলেও, ব্রাহ্মণ হোলেও ভিন্ন জাতের। আমাদের সংস্কৃতি আচার ব্যবহার সমাজ সব আলাদা। ও ধনী কন্যা, আমি গরীব, ওর বাপের অর্থে বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন সার্থক কোরতে পেরেছি—এই অনুগ্রহের কথা ও ভুলতে পারে না। কুক্ষণে ফিফ্থ ইয়ারে আমার মাথায় বিলেত গিয়ে পণ্ডিত হবার দুরাশা জাগে। সেই-দুরাশাকে সফল করবার জন্যে নিজের ইজ্জত, ভবিষ্যৎ সব জলাঞ্জলি দিয়ে ওর বাপের অনুগ্রহ নিই। ওর বাপ মারা গেছেন, বেঁচে থাকলেও তিনি হয়ত তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন না, কিন্তু নন্দিতা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না যে আমি তার বাপের অনুগৃহীত জীব। তাই—তাই মিঃ ব্যানার্জ্জি, আমাদের মধ্যে এই নির্ম্মম ট্র্যাজিডি চোলেছে। আমার অবহেলা নয়।" অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তিনি কথা কয়টী বলিলেন; তাঁহার চোখ দুইটায় একটা হিংস্র জ্বালা ঝরিতেছিল। অত্যাচারী শক্তিমানের নির্ম্মম কশাঘাতে শক্তিহীনের চোখে যে নিষ্ফল আক্রোশ জ্বলে সে জ্বালা কতকটা তেমনি। আমি চুপ করিয়া রহিলাম, উভয়ে নীলের সেতুর রেলিং এ ভর দিয়া—চলন্ত জলস্রোতের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়াছিলাম। সহসা মিঃ সরকার বলিলেন "মাপ কোরবেন মিঃ ব্যানার্জ্জি হঠাৎ উত্তেজিত হোয়ে অনেক ব্যক্তিগত কথা বলে ফেলেছি, কিন্তু আপনি আমার বন্ধু। মাত্র কালকের পরিচিত হোলেও, এই অল্প সময়ে আপনার ব্যবহারে, দৃষ্টিতে কথাবার্ত্তায় যে একটা দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি—তারই স্পর্শে মনের গোপন কথাগুলো ভদ্রতার আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে।"

গাঢ়কণ্ঠে বলিলাম "এ আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বোলেই মনে করবেন"। পরে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"চলুন ফেরা যাক্; ক্রমশঃ রোদ চোড়ছে"

—"হ্যাঁ চলুন। আমার মামিটার গবেষণা এখনও অনেক বাকী"—

দুজনে আসিয়া মিঃ সরকারের বাড়ীর বারান্দায় চেয়ারে বসিলাম। মিঃ সরকার হাঁকিলেন "নন্দিতা চায়ের ব্যবস্থা কর। আমরা এসেছি"।

ক্ষণপরেই নন্দিতা ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার চোখ মুখ অস্বাভাবিক রূপে দীপ্ত, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া তিনি রুদ্ধ ক্রোধে বলিলেন "শোন; এদিকে এসো"। বলিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। মিঃ সরকার আমার দিকে একবার তাকাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দীপ্ত চোখের ভাষা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই পাশের ঘরে গর্জ্জন শুনিলাম "কি মনে কোরেছ তুমি? তোমার যা খুসী তাই কোরবে ভেবেছ। এতদিন যা কোরছিলে মুখ বুজে সইছিলাম; শেষে কিনা কবর থেকে মড়া টেনে এনে বিছানায় তুলেছ! জাত ধর্ম্ম নয়ত জলাঞ্জলিই দিয়েছ কিন্তু তাই বলে মঙ্গল অমঙ্গলও ত মানতে হয়। কোথাকার কার মড়া তার ঠিক নেই, তুমি কোন সাহসে আমার ঘরে এনেছ শুনি?" কথাগুলা এত স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল যে ইহা বলিবার জন্য নন্দিতা দেবী স্বামীকে আলাদা না ডাকিলেও পারিতেন।

মিঃ সরকার অস্পষ্ট ভাবে নীচুস্বরে কি বলিলেন ঠিক শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু মিসেস সরকারের বেশ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল "তোমাকে আমি কতদিন বারণ কোরেছি পরের মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরোনা, ওতে অমঙ্গল ঘরে ডেকে আনবে; তা—তোমার গ্রাহ্যই হয় না। বেশ ত ছিলে পাথর পুতুল নিয়ে—তাতেই ত খুব পাণ্ডিত্য হোচ্ছিল; তা না আবার ঐসব মড়া ঘরে নিয়ে আসতে আরম্ভ কোরেছ? কি, তোমার নিজের বিছানায়? কিন্তু ঘরটা ত আমার। ওযে কোনদিন তোমাকে ওর পাশে শোয়াবে তা জান?"

আবার মিঃ সরকারের অস্পষ্ট আবেদন শোনা গেল; বুঝিলাম আপাততঃ তিনি এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু মিসেস সরকার তেমনি উদ্ধত কণ্ঠেই বলিলেন "সরিয়ে রাখবে কি? আমি বুঝি ঐ আপদ তোমার জন্যে ঘরে এখনও রেখেছি? তাকে দূর কোরে দিয়েছি"।

এবার স্পষ্ট মোটা গলায় মিঃ সরকার বলিলেন "কি কোরেছ তুমি? কোথায় ফেলে দিলে আমার মামি? তার কত দাম জান?"

—"যতই দাম হোক। সে আমার টাকা; আমি তা নিয়ে যা খুসী কোরতে পারি, কোরেছি। তাতে তোমার কি?"—

—"টাকা, টাকা, টাকা; খালি টাকার গর্ব্বেই তুমি গেলে। আর লাখ টাকা দিলেও সে জিনিষ পাওয়া যাবে না তা জান?"

—"আমার জানবার দরকার নেই। আমার খুসী আমি ফেলে দিয়েছি। তোমাকে আমি সোজা কথা জানিয়ে দিচ্ছি—এখানে আর থাকা চোলবেনা। কালই দেশে ফিরে চল; তুমি না যাও আমি একাই চোলে যাব। এই ভূতের দেশে মড়ার সঙ্গে বাস কোরতে আমি পারবো না, পারবো না। আমার টাকায় আমাকেই এমনি কোরে দুঃখ দেবে তুমি?"

—"দেখ বারবার তোমায় বোলেছি টাকার খোঁটা তুমি দিও না। আমি বোলতে সঙ্কোচ করি তাই, নইলে তোমার বাপের টাকা শুধু তোমারই নয়, আমারও তাতে অধিকার আছে"—

—"সে আমি মলে, তার আগে নয়। তুমি যাও আর না যাও কালই আমি দেশে যাব।"—

দুজনের কণ্ঠস্বর এত উত্তেজিত এবং উদ্ধত হইয়া উঠিল যে আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। চলিয়া আসাও শোভন হইবে না মনে হইল, কিন্তু ঐ বিতর্কের মাঝে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি অধিকতর অশোভন বলিয়া ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

৪

পরদিন সকালে হোটেলে বসিয়া আছি, সহসা মিঃ সরকার আসিয়া হাজির। তাঁহার অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চুলগুলা উস্কো-খুস্কো, চোখ দুইটা ঘোর লাল, মুখের সর্ব্বত্র একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য—প্রথম দেখিলেই মনে হয়, ভদ্রলোক হয় উন্মত্ত নয় খুনী। সামনের চেয়ারটা দেখাইয়া বলিলাম "বসুন। কি খবর?"

না বসিয়াই তিনি কহিলেন "নন্দিতাকে সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছিনা।"

সবিস্ময়ে বলিলাম "সে কি? কোথায় তিনি?"

—"আপনার এখানে এসেছে কিনা—খবর নিতে এলাম। সকালে উঠে তাকে দেখতে পাইনি"—

—"কৈ আমার এখানে ত তিনি আসেন নি। আর কেউ কি আলাপী আছেন এখানে?"

—"না আর ত কেউ নেই"—তিনি চুপ করিলেন চেয়ারের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া হাঁটুতে রাখা হাতটা দিয়া মাথার চুলগুলায় তিনি নিঃশব্দে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলাম—"পুলিশে খবর দেওয়া উচিত বোধ হয়।"

একটা ম্লান হাসি তাঁহার ওষ্ঠে খেলিয়া গেল, মনে হইল 'মামির' বরিস কারলফের হাসি। তিনি কহিলেন "কি লাভ হবে? সে গেছে নিজের ইচ্ছায়, পুলিশে খবর দিয়ে হাঙ্গাম আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ কি?"

—"নিজের ইচ্ছায় গেছেন? কোথায়?"—

—"সম্ভবতঃ দেশে। হয়ত আপনিও কাল শুনেছেন সে বোলছিল আজ একলাই সে চোলে যাবে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। দাম্পত্য কলহ এতদূর গড়াইল! সিগারেট কেসটা খুলিয়া মিঃ সরকারের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলাম "কি করবেন এখন?"

একটা সিগারেট নখের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি বলিলেন "আমার আর্থিক অবস্থার কথা বলছেন? ইচ্ছে করলে কোথাও না কোথাও দু' তিনশ' টাকার চাকরী একটা আমি জুটিয়ে নিতে পারি কিন্তু তাতে ত আমার চোলবেনা। সারা জীবনটা আমি যে লক্ষ্যের পানে ছুটে চোলেছি, যার জন্যে নিজের আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছি, তার যে এখনও অনেক বাকী। আমি চাই ইজিপ্টের ইতিহাসে এক নূতন আলোক সম্পাত কোরতে। পরের বিত্তে মুখস্থ কোরে অধ্যাপকের ভূমিকা অভিনয় কোরে

আমার জীবনটাকে আজ নষ্ট করতে পারিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মৌলিক গবেষণার একটা বিশিষ্ট স্থান—আমি নিশ্চয়ই রেখে যাব, কিন্তু তার জন্যে চাই টাকা—প্রচুর টাকা। দেখি ভাগ্য কোথায় আমাকে নিয়ে যায়।" প্রায় উদভ্রান্তের মত তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

বিকাল বেলা মিঃ সরকারের বাড়ী গেলাম—কতকটা কর্ত্তব্যের খাতিরে, কতকটা সহানুভূতির আকর্ষণে। বারান্দায় উঠিয়া ডাকিলাম "মিঃ সরকার আছেন নাকি ?"

—"আসুন"—ভিতর হইতে উত্তর আসিল। বারান্দা হইতে ঢুকিয়াই একটা বড় ঘর, মাঝামাঝি একটা পর্দ্দা; বোধ হয় পর্দ্দার অপর দিকে আহারের ঘর, সামনের অংশটায় অল্প সাজান একটা ড্রয়িং রুম। এই ঘরটার দুই দিকে দুইটা ঘর। ঘরের দরজা দুইটার পর্দ্দা আধখোলা, কাজেই ভিতরের খানিকটা দেখা যায়। ডান দিকের ঘরটা সম্ভবতঃ শুইবার ঘর, বাঁ দিকের ঘরের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের ছোটবড় মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। মিঃ সরকারের স্বর বাঁ দিকের ঘর হইতেই আসিয়াছিল, তাই পর্দ্দা ঠেলিয়া সেই ঘরে ঢুকিলাম।

একটা কোচের উপর মিঃ সরকার ঢিলে পায়জামা পরিয়া বসিয়া ছিলেন, পাশে টিপয়ে অনেকগুলা বই, নীচে কার্পেটের উপরও কয়েকটা বই খোলা অবস্থায় পড়িয়া ছিল। ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তি, বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা এবং বহু প্রাচীন গাত্রাবরণ সযত্নে রক্ষিত। একদিকে দেওয়ালের ধারে একটা লম্বা টেবিলের উপর একটা বিচিত্র বর্ণের শবাধার। শবাধারটা দেখিয়াই গত কালের কথা মনে পড়িল; নিশ্চয়ই উহার আধেয় লইয়াই সমস্ত গণ্ডগোলের সৃষ্টি। শবাধারটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল চোখে দেখিলাম না।

পাশের চেয়ারটা দেখাইয়া তিনি বলিলেন "বসুন।"

বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন খবর পাওয়া গেল ?"।

—স্বপ্নোত্থিতের মত তিনি কহিলেন "কার ?" পরক্ষণেই যেন আত্মচেতন লাভ করিয়া বলিলেন "ও। না, কি আর— খবর পাওয়া যাবে! সে চোলেই গেছে! আমিও ঠিক করেছি দেশে ফিরব। চলুন একবার টমাস কুকের অফিসে গিয়ে জেনে আসি কবে পরের প্লেন খানা ছাড়বে। প্লেনে গিয়ে আমি তার আগেই দেশে পৌছুতে চাই।"

তিনি উঠিলেন। বলিলাম "বেশ ত চলুন!"

—"আপনি একটু বসুন! আমি তৈরী হোয়ে নিই"— তিনি অন্যঘরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার খোলা বই ক'খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। একটা জায়গায় চোখ পড়িল কি উপায়ে ঈজিপ্সিয়রা 'মামি' বহুদিন অবিকৃত রাখিত তাহারই সম্ভাবিত নানা পন্থা। বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবে জিনিষটা বর্ণিত হইয়াছে, কতক্ষণ পড়িয়াছিলাম ঠিক জানিনা; সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল "আসুন। আমি তৈরী"।

৬

পরদিন সকালে মিঃ সরকার আবার আসিলেন। যাইবার জন্য সাজিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন, বাহিরে ট্যাক্সীতে তাঁহার জিনিষ পত্র ছিল। তিনি বলিলেন "যাচ্ছি—মিঃ ব্যানার্জ্জি। দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা, কিন্তু তবু আপনি বন্ধু বাঙ্গালী, তাই যাবার সময় একটা কাজের ভার দিয়ে যাব।"

বেচারীর দুর্ভাগ্যে বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম, হয়ত বা মনের কোণে একটু করুণাও জাগিয়াছিল।

প্রসন্নভাবেই কহিলাম "বলুন। এতে আর কুণ্ঠার কি আছে ?"

—"আপনি আর কতদিন এখানে আছেন ?"

—"হয়ত এখনও দিন পনের। কেন ?"—

—"আমি বোধ হয় আর ফিরবোনা; আমার জিনিষ-পত্র—মাঝপথে বাধা দিয়া বলিলাম "সে কি আপনি আর আসবেন না ?"

একটু থতমত খাইয়া তিনি বলিলেন—"একেবারে আসবো না এমন নয়, তবে সেখানে যা হোক একটা ব্যবস্থা কোরে ফিরতে হয়ত অনেক দেরী হবে। তা ছাড়া আমরা, যারা মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আমাদের ভাগ্য সর্ব্বদা

সুপ্রসন্ন নয়। এ দেশের লোকেরা ত এই সব মামিগুলোকে দেবতা এবং ভূত দুই-ই মনে করে, আমরা যারা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করিনা. এমন অনেক সত্য ঘটনা জানি, যাতে এদের অশুভ দৃষ্টিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি না। এদের কুদৃষ্টি অনেক সময় আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে। যাচ্ছি প্লেনে, কি জানি যদি সুস্থ দেহে দেশে পৌছতে না পারি তাই আমার বাড়ীর আসবাবপত্রের এবং সংগ্রহের দুটো ফর্দ্দ আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। যদি না ফিরি বা সুস্থ শরীরে না পৌছতে পার, অনুগ্রহ কোরে আসবাবপত্র-গুলো বেচে দিয়ে সেই টাকায় সংগ্রহগুলো কোলকাতা মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিবেন, অজ্ঞাতনামার দান বোলে পাঠাবেন, নিজের নামে উপহার দিয়ে অপমানের বোঝা আর বাড়াবো না।"

একখানা বন্ধ খাম এবং একটা চাবি তিনি আমার হাতে দিলেন। সে দুটা পকেটে রাখিয়া বলিলাম—"কিন্তু আপনি কবে আসবেন?"

—"যত শীগ্‌গী পারি; তবে পনের দিনের মধ্যেই আপনি খবর পাবেন, তার বেশী দিন আপনাকে আটকে রাখবো না। তার বেশী দেরী হোলে আমার বাড়ীর চাবি আপনার হোটেলের ম্যানেজারের কাছে রেখে দিয়ে যাবেন। সে আমাকে চেনে। আচ্ছা নমস্কার; অশেষ ধন্যবাদ। আমার আর সময় নেই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সিলভারউইংস প্লেনেই যাচ্ছেন ত?"

দরজার বাহির হইতেই উত্তর আসিল "হ্যাঁ"।

৭

সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সামনের পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা "সিলভারউইংস প্লেন সমুদ্রের জলে পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত আরোহী এবং ক্রু (crew) মৃত"। শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। মিঃ সরকার কি পূর্ব্বেই নিজের দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন? কিন্তু অন্যান্য সকল যাত্রীই ত ইজিপ্টোলজিষ্ট ছিল না, তাহাদের ভাগ্য একসূত্রে কি করিয়া গ্রথিত হইল!

বন্ধুর অনুরোধ মত ফর্দ্দটা লইয়া তাঁহার বাড়ী গেলাম। জিনিষগুলা মিলাইয়া লইয়া একে একে বিক্রী করিব এবং সংগ্রহগুলি মিলাইয়া কলিকাতা পাঠাইব ঠিক করিলাম। যে ভার একান্ত অনাবশ্যক মনে করিয়াই লইয়াছিলাম, অবশেষে তাহা গুরুতর দায়িত্বে পরিণত হইল।

সমস্ত আসবাব পত্র মিলাইয়া পাইলাম। সংগ্রহের তালিকা লইয়া একে একে মিলাইতে লাগলাম। ফর্দ্দের সব শেষে ছিল "মামির শবাধার, মামি শুদ্ধ"।

ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ঐ মামি লইয়াই এত কাণ্ড আবার সেই 'মামি' ফিরাইয়া আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়াছেন। হয়ত এই জন্যই নন্দিতা আর এখানে তিষ্ঠিতে পারে নাই। শবাধারের ডালা খুলিয়া ফেলিলাম; আতঙ্কে, বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় যেন পাথর হইয়া গেলাম; চীৎকার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিলাম, হাতের ফর্দ্দটা পড়িয়া গেল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শবাধারের মধ্যে একটী মামি, অদ্ভুতভাবে অবিকৃত, সহসা মনে হয় ঐ নারী বুঝি ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার মত দুর্ব্বল মন আমার নয়। সেই নারীর বামগণ্ডের উপর তেমনি একটী আঁচিল যেমন নন্দিতা দেবীর ছিল। সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে সেটী নন্দিতা দেবীরই মামি।

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আণ্ড্রোথ

মিঃ ডেনিস্ পামার কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে সেচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেচিলিস্ ভারত মহাসমুদ্রে অবস্থিত। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে তিনি আর একটা দ্বীপ খুঁজে বার করেচেন, যা সেচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জের মতই সুন্দর, অথচ ভারতের খুব কাছে বলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া তত ব্যয়সাধ্যও নয়।

মিঃ পামারের লিখিত বর্ণনা থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমি মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে জনৈক দেশী জাহাজের মালিকের আলাপ হয়। লোকটা আমায় লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কথা প্রথমে বলে। এর আগে আমি লাক্ষাদ্বীপের নাম শুনেছিলুম, কিন্তু সেখানকার সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

এই লোকটার মুখে শুনলাম লাক্ষাদ্বীপ কতকগুলি প্রবালদ্বীপের সমষ্টি, পরীদের দেশের মত সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন। লাক্ষাদ্বীপ ভারত মহাসাগরের যে অংশে অবস্থিত, তার নিখুঁত চার্ট এখনও তৈরী হয়নি, বড় বড় জাহাজ তো সে পথ দিয়ে চলেই না, পালতোলা জাহাজ ভিন্ন ষ্টীমচালিত জাহাজ কচিৎ দেখা যায়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় সেখানে যায়নি। তবুও আমি তার কথায় ততটা বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে নিজেও একটু অনুসন্ধান করলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল আরবসমুদ্রের বাইরের অংশে মালাবার উপকূল থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সবশুদ্ধ চৌদ্দটা ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। আণ্ড্রোথ্ দ্বীপ এর মধ্যে বৃহত্তম, দৈর্ঘ্যে তিন মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল।

এর অধিবাসী প্রায়ই মপ্লা, ধর্ম্মে মুসলমান। তারা মালয়ালম্ ভাষাভাষী।

এই গৃহে মিঃ পামার নিদ্রা গিয়েছিলেন

লাক্ষাদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গুজবও শোনা গেল। একটা গুজব এই যে একদল বড় বড় ইঁদুর ওই সব অত্যন্ত উৎপাত করেচে—সমস্ত খাদ্যশস্য তারা নিঃশেষ করে ফেলেচে। আর একটা গুজব, সেখানকার মেয়েরা রাজনৈতিক ও সামাজিক শাসনের ভার নিজের হাতে নেওয়ায়

দরুণ সেখানে নারীরাজ্য স্থাপিত হয়েচে। নিজের চোখে জায়গাটা দেখে আসবার অত্যন্ত কৌতুহল হোল।

কালিকট বন্দর থেকে সন্ধ্যাবেলা আমাদের জাহাজ ছাড়লো। এগুলিকে জাহাজ না বলে বড় নৌকো বল্লে এর ঠিকমত বর্ণনা করা হবে। এ দেশের মিস্ত্রির হাতে তৈরী হোলেও সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পক্ষে এগুলো বেশ উপযোগী।

পূর্ণিমা তিথি সেদিন। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের মাথায় পূর্ণচন্দ্র উঠেছে, আরবসমুদ্রের জলে জ্যোৎস্না পড়ে কোথাও চিক্‌চিক্ করচে, কোথাও জ্যোৎস্নায় আর কুয়াসায় মিশে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমাদের নৌকোখানা আরবসমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে ডুবুডুবু অবস্থায় খাড়া পশ্চিমমুখে চললো। হাওয়া পেয়ে পাল ফুলে উঠলো।

সমুদ্রসৈকতে একটি আরব নৌকো টানা হচ্ছে

সে রাত্রের শোভা অবর্ণনীয়—ঘুম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় স্থির করলাম রাতটা ডেকে বসে জেগেই কাটিয়ে দেবো। ঘুমের নানা বাধা, একেতো ডেকের ওপর লোকে লোকারণ্য, পা রাখবার স্থান নাই, তার ওপর তক্তার ফাঁকে অসংখ্য ছারপোকার আড্ডা, শুয়ে পড়লে রক্ষা নেই, সমস্ত গায়ে ছেঁকে ধরবে।

পরদিন সকাল থেকে বাতাস একদম পড়ে গেল। নৌকো আর চলে না। মপ্‌লা মাঝিরা দাঁড় বাইতে আরম্ভ করলে। নৌকোর পালগুলো ছেঁড়া কাপড়ের মত ঝুলতে লাগলো। তিনদিন তিনরাত্রি একভাবে কাটলো। আরবসমুদ্রের বক্ষ পুকুরের জলের মত নিথর, নিস্পন্দ। সমুদ্রের কোনো দিকে অন্য কোনো জাহাজ বা নৌকো দেখলাম না।

তিনদিন পরে সকাল থেকে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একজন মাল্লা মাস্তলের ওপর উঠে দেখতে লাগলো ডাঙা দেখা যায় কি না। এ রকম দেখা অত্যন্ত দরকার, কারণ এই বিশাল সমুদ্রে লাক্কাদ্বীপের মত ক্ষুদ্র দ্বীপ দশফুট উঁচু একটা শৈবালস্তূপের মত দূর থেকে প্রতীয়মান হয়—খুব সাবধান না থাকলে অনেক সময় গন্তব্যস্থান ছাড়িয়ে কয়েকশো মাইল বিপথে যাওয়ার পর বোঝা যায় যে পথভুল হয়েছে। এজন্যে প্রথম যে ডাঙা দেখতে পায় তাকে কিছু বখ্‌শিস্ দেওয়ার নিয়ম আছে।

চতুর্থ দিন প্রাতে মাস্তলের মাথা থেকে একজন মাল্লা চীৎকার করে বল্লে—ঐ জমি দেখা গিয়েছে!

দুঘণ্টা বাদে আগ্রোথ বন্দরে আমরা নোঙর ফেলি।

কয়েক মিনিট মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি চেয়ে রইলাম। আগ্রোথের তীরভূমি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে বেঁকে গিয়েচে। কিছুদূর পর্য্যন্ত বালি, তারপরে দীর্ঘ নারিকেল গাছের বন। বন্দরের জল নীল ও স্বচ্ছ। নীচের তৃণাবলী ও প্রবালপুঞ্জ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নারিকেল বনের মধ্যে সারি সারি কুটীর। এই সমস্ত ঘরের মধ্যে থেকে লোকজন আমাদের নৌকো দেখে ছুটে এল। আমায় দেখে তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। শুনলাম তিন বছর পূর্ব্বে একজন সাহেব তাদের দ্বীপে নেমেছিল, তিন বছরের মধ্যে আর কোনো ইউরোপীয় এদিকে আসেনি।

আগ্রোথের শাসনকর্ত্তা আমাকে অভ্যর্থনা করতে এলেন। তিনি মুসলমান, বহু বৎসর ধরে তাঁরা এই দ্বীপ শাসন করছেন। তাঁর আদেশে অধিবাসীরা আমায় একখানা নারিকেল পাতায় ছাওয়া কুটীরে নিয়ে গেল। সেখানে মেয়েরা আমার জন্য পাকা কলার কাঁদি, ডাব মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিলে।

একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একটা মসজিদ ও গোরস্থান। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সমাধিস্থানে খেলা করে বেড়াচ্ছে

সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, দেখে মনে হয় মনে তাদের কোনো দুঃখ নেই। আসল কথা তাদের মনে কোনো উচ্চাশা নেই, উচ্চাশায় অপূর্ণতা থেকে আসে যে অশান্তি ও অস্থিরতা, তাও নেই। সকলেই বেশ অবস্থাবান। তরুণ তরুণীরা সকলেই দেখতে ভালো।—মেয়েদের রং খুব ফর্সা, ঠোঁটগুলি লাল টুকটুকে, চলনভঙ্গি সুন্দর। তারা পর্দ্দানশীন নয়, আমার ঘরের সামনের পথ দিয়ে তারা হাসিমুখে সমুদ্রতীরের নারিকেল পুঞ্জের দিকে যাচ্চে আসচে, দোকান থেকে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে ফিরচে। অনেকেরই পরনে রেশমী সাড়ী, সকলেই বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের অধীনস্থ প্রজা, এদেরও অবস্থা বেশ ভালই। তবে স্ত্রী স্বাধীনতা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

সর্ব্বনিম্নসম্প্রদায়কে বলে 'মালচেরী', এরা অত্যন্ত দরিদ্র, চাকুরী করে এদের দিন চলে। লাক্ষাদ্বীপের সমাজে এদের স্থান এত নীচু যে ছাতা মাথায় দিয়ে পথে চলবার অধিকার নেই এদের। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে।

দ্বীপের সর্ব্বত্র খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তা, সকলেই পেট ভরে খেতে পায়। কোনো অসুখবিসুখ না থাকায় দেহের গঠন সকলেরই ভাল।

এ্যাণ্ড্রোথের সর্ব্বপ্রধান উপসাগর

অল্পক্ষণ পরে আমি আবিষ্কার করলাম পরিচ্ছদ হিসেবে এখানকার অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পরনে দীর্ঘ রঙীন আলখেল্লা বা আচকান, একশ্রেণী একধরণের মোটা কোট পরে, আর একশ্রেণীর লোকে প্রায় উলঙ্গ থাকে।

লাক্ষাদ্বীপের অভিজাত সম্প্রদায়কে বলে 'কোয়া'। এরা এখানকার জমিদার ও শাসক সম্প্রদায়। কোয়াদের মেয়ে বা পুরুষ রেশম বস্ত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। এরা প্রধানতঃ মুসলমান। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রধানতঃ হিন্দু। এরা

প্রধান শাসনকর্ত্তাকে বলে 'আমীম'।

দেশ শাসনের কাজ সর্ব্বসম্প্রদায় থেকে নির্ব্বাচিত একটী মন্ত্রীসভা আমীমকে সাহায্য করে। আমীম ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ একদিন আমায় অভ্যর্থনা করতে এসে বল্লেন—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

আমি বল্লাম—যতদিন ভাল লাগে।

তাঁরা বল্লেন—আমাদের ইচ্ছা, আপনি আমাদের মধ্যে বরাবর থাকুন। আমীম আপনার বাসের জন্যে ভাল ঘর তৈরী করে দেবেন। আপনার ফুল বাগান করবার জন্যে

যতখানি জমি দরকার, তা আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি যদি বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করে দেওয়ার ভার আমরা নিতে পারি।

আমি বল্লাম—আপাততঃ আমি বিবাহ করে এখানে ঘরসংসার পাতাতে আসিনি। যদি পরে আবশ্যক বিবেচনা করি, আমীমকে জানাবো। আপনাদের সদয় ব্যবহারের জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মধ্যে তালকুঞ্জ

এঁরা কেউ ইংরাজি জানেন না, স্থানীয় স্কুল মাষ্টার দোভাষীর কাজ চালাচ্ছিলেন।

এইবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানকার সমস্ত আণ্ডোথ দ্বীপের মধ্যে আমিই একমাত্র ইংরাজী-নবীশ (লোক), আমি ভূগোল ও জ্যামিতি পড়েচি।

—আপনি হিন্দু না মুসলমান?

—আমি হিন্দুবংশে জন্মেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমি মুসলমান। পাঁচ বছর আগে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেন। এখানকার একটী মেয়েকে বিবাহ করে আমি মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি।

—দেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয়স্বজনকে কি বলবেন?

—দেশে ফেরবার ইচ্ছে নেই আমার—এখানে আমি বেশ আছি। স্কুলে লেখাপড়া শেখাই, অবসর সময়ে সাঁতার দিই, নৌকো বেয়ে বেড়াই, নয়তো সমুদ্রতীরে চুপ করে শুয়ে থাকি। মনে আমার কোন অশান্তি নেই, টাকার চেষ্টায় হয়রাণ হয়ে বেড়াইনে।

এই সময় আমার স্নান করবার জল এসে পৌছে গেল। স্নান শেষ করে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। স্কুল মাষ্টার আমার কাছে বসে তার জীবনের অনেক গল্প করছিল। নিকটেই নাকি একটি দ্বীপ আছে, সেখানকার লোকেরা নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থেকে থেকে এত অলস হয়ে পড়েচে, যে চার পাঁচ দিনের মত ভাত বেঁধে নিয়ে রেখে শুধু শুয়ে থাকে আর গল্প করে। সপ্তাহে একদিন মাছ ধরতে বেরোয়, যা পায় তা সাত দিন ধরে খায়, আর ঘর থেকে নড়ে না।

স্কুল মাষ্টার সমুদ্রের নানা ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কথা বলছিল। একরকম মাছের গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা আছে, তাদের কাঁটার ঘায়ে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তা সারে না, প্রায়ই বিষিয়ে উঠে মানুষ মারা যায়। একরকম মাছ এত হিংস্র যে জলে নামলেই তারা হাত পা কেটে নেয়। সোর্ড-ফিশ ও হাঙরের উৎপাতও খুব, প্রতি বৎসর অনেক ডুবুরী এদের হাতে মারা পড়ে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল থেকে একজন লোক ঝড়ে পোতভগ্ন অবস্থায় এই দ্বীপে এসে ওঠে এবং তারাই নাকি এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা ছিল হিন্দু পরে আরব ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যসম্পর্কে যাতায়াত সুরু করে। ক্রমে উভয়জাতির সংমিশ্রণে দ্বীপের বর্ত্তমান অধিবাসীদের উৎপত্তি।

স্কুল মাষ্টারের গল্প শুনতে শুনতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, উঠে দেখি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নালোক ঘরের মধ্যে এসে পড়েচে, একপ্রকার

সামুদ্রিক পাখী নারিকেলশাখার আড়ালে বসে তারস্বরে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করচে।

সত্যই বটে, এই দ্বীপের পারিপার্শ্বের অবস্থা এমন যে এখানে শরীরকে খাটাতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে হয় দীর্ঘ দিনমান শুধু শুয়ে বসে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী নারিকেল বনচ্ছায়ায় অলস দিবাস্বপ্নে ভোর হয়ে থাকি। আমার অবস্থা যদি দুদিনেব মধ্যেই এরকম হয়, তবে যারা আজীবন এখানে কাটায়, তাদের অলস হওয়া বিচিত্র কি ?

স্কুলমাষ্টারকে মনে মনে দোষ দিতে পারলাম না আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এখানে থেকে জাওয়ার জন্যে।

দ্বীপের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমার সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হোল। আমার সকলপ্রকার সুবিধা অসুবিধার দিকে তারা এত সতর্কদৃষ্টি রাখতে লাগলো, যে আমি অনেক সময়ে বিব্রত হয়ে পড়তাম। এখানকার ধনী জমিদার সম্প্রদায়ের লোকে প্রত্যহ আমার খাদ্য প্রেরণ করতেন, তার জন্যে কখনো কিছু দাম নিতেন না। খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ কচি ডাব, ঝুনো নারিকেল, মুরগী, ডিম, মাছ, অক্টোপাসের দাড়া, ছাগলের দুধ।

আমীমের মন্ত্রণাসভায় প্রত্যেক সদস্য আমায় পর্য্যায়-ক্রমে তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিলেন।

সমুদ্রমধ্যে মিঃ পামারের নৌকো

দিন যত যায়, ততই মনে হয় এ দ্বীপ ছেড়ে লণ্ডনের কর্ম্মকোলাহলময় জীবনে আর ফিরবো না। সেচিলিস্ দ্বীপে অবস্থানকালে যেমন মনের শান্তিলাভ করেছিলাম, আবার তাই ফিরে পেলাম এতদিন পরে। সমগ্র লাক্কাদ্বীপে আমিই একমাত্র ইউরোপীয়, সুতরাং, আমার পূর্ব্বতন জীবনের কর্ম্মব্যস্ততা স্মরণ করিয়ে দেবার লোক এখানে কেউ ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ তাই অতি নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল।

মন্ত্রণাসভার প্রধান সদস্য মুসলমান এবং অত্যন্ত ভদ্রলোক। তাঁর দশ বারো বছরের একটী জ্যেষ্ঠ ছেলে সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে ভালবাসতো। তার বাপ কালিকট থেকে একখানা সাইকেল আনিয়ে দিয়েছেন, সমগ্র লাক্কাদ্বীপের মধ্যে এই একমাত্র সাইকেল। যখনই আমি ছেলেটীর ফটো নিতে চেয়েছি, তখনই সে তার সাইকেলখানাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেচে।

অক্টোপাস্ শিকার এখানকার নিম্নবর্ণের লোকের একটী প্রধান ব্যবসা। এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাঙর ও সোর্ডফিশ তো আছেই তা বাদে হিংস্র অক্টোপাস্ দাড়া দিয়ে জড়িয়ে শিকারীকে অতল জলে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে

মাস্তুলের উপর হ'তে নিরীক্ষণ

মারে। শিকারীর যথেষ্ট কৌশল ও সাহসের আবশ্যক হয় এই হিংস্র কুদর্শন জীব শিকার করতে। অক্টোপাসের দাড়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের একটী উপাদেয় খাদ্য। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে অক্টোপাস্ একরকম কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থ নিজের শরীর থেকে বার করে ছড়িয়ে দেয় শিকারীর চোখে—তাতে অনেক সময়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।

সমুদ্রে নানাজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ সামুদ্রিক মৎস্য বিষাক্ত, সতর্ক না হয়ে যা তা মাছ খেলে প্রাণসংশয় হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে সাধারণতঃ হাট-বাজার নেই, মালচেরিরা যখন মাছ ধরে আনে, দ্বীপের অধিবাসীরা সমুদ্রের তীরে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং সংসারের জন্যে যতটা তাদের দরকার, সেখান থেকে কিনে বাড়ী নিয়ে যায়।

আমার যাবার সময় উপস্থিত হোল। আণ্ড্রোথ ছেড়ে যেতে সত্যই কষ্ট হচ্ছিল। এখান থেকে গিয়ে সভ্যজগতের সভ্যজীবনে আমায় খাপ খাওয়ানো যেন অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ

পরিপূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব সুষমা
মৃগ-মদ ছড়াইয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে;
ত্রিদিব-দুর্লভ ধন হেন, অনুপমা,
অতনুভাণ্ডার হতে হরিলে কেমনে?

হৃদয়-মালঞ্চে মম তুমি একাকিনী
ভ্রমিতেছ সঙ্গোপনে অভিসারে কা'র?
চ'লে যাও অজানিতে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
ধূলায় লুটায়ে মালা নবমল্লিকার।

এ মালা কাহার লাগি? প্রশান্ত সুন্দর
ধ্যানমগ্ন অন্তরালে বিশ্ব-নয়নের;
চলেছি সন্ধানে তার জন্ম-জন্মান্তর,
নীরব-বন্দনা সহি সে প্রিয়জনের।
তোমার মালিকাখানি আমি নিরন্তর
সঁপি তাঁরে মিশাইয়া মাধুরী মনের।

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

পারুলের মার মৃত্যুর পর কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে বিজয়লাল অথবা ভজুয়ার কোনো সংবাদই পাওয়া যায়নি। প্রথম দিন থেকেই পারুল অমরেশের গৃহে বাস করছে এবং তার ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে অমরেশকেও সেই গৃহে রাত্রি যাপন করতে হয়। মনুষ্যলোক এবং প্রেতলোক সংক্রান্ত নানাবিধ আশঙ্কায় তার মন ভারাক্রান্ত, এবং একমাত্র অমরেশ ভিন্ন হরিদ্বারে আর কোনও ব্যক্তির প্রতি তার বিশ্বাস অথবা নির্ভরতার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অমরেশ বলেছিল, 'জীবিত গুণ্ডাদের না-হয় দু-চার মিনিট লড়াই ক'রে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু ম'রে যারা গুণ্ডা হয়েছে তাদের ঠেকিয়ে রাখবার কোনো কৌশলই ত' জানিনে পারুল।' উত্তরে পারুল বলেছিল, 'আপনি বামুন মানুষ, আপনার কাছে তারা আস্‌তে পারবে না।' অমরেশ বলেছিল, 'তোমার জন্যে যাকে প্রহরী নিযুক্ত করব মনে করেছি সে চৌবে, অর্থাৎ বামুন; সুতরাং সে মরা গুণ্ডা আর জ্যান্ত গুণ্ডা দুই সামলাতে পারবে।' কিন্তু এ আশ্বাস প্রদর্শনের ফলেও চৌবের প্রতি পারুলের কিছুমাত্র আস্থা জন্মাতে দেখা যায়নি। অগত্যা অমরেশকে রাত্রে তার বাসায় শয়ন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল।

দুটি ঘরের মধ্যে বড় ঘরটি অমরেশ পারুলকে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারুল তাতে কিছুতেই সম্মত না হ'য়ে ছোট ঘরেই নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। প্রথম দিন-তিনেক সেই ঘরেরই একদিকে কোনো রকমে সে নিজের রন্ধন কার্য্যটা সেরে নিত, বারান্দার একপ্রান্তে যথাপূর্ব্ব কুকারে অমরেশের আহার প্রস্তুত হ'ত। চতুর্থ দিনে অমরেশ আপত্তি তুললে; বল্‌লে, "আমার রান্নার সমস্ত ব্যাপারটা তুমিই ত ক'রে থাক পারুল, আমি শুধু নামে রাঁধি। এ ছলনায় কাজ কি? আজ থেকে আমার কুকার আর তোমার কড়া এক ক'রে নাও, এক চৌকার অন্তর্গত।"

বিস্ময়ে এবং আনন্দে পারুলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল; বললে, "আমার হাতের রান্না আপনি খাবেন?"

অমরেশ হাসিমুখে বল্‌লে, "না খাবার ত কারণ দেখিনে। সামান্য উপকরণ দিয়ে ছ্যাকছোঁক ক'রে তুমি যখন রাঁধ, তখন তোমার কড়া থেকে যে-রকম সুবাস ছাড়ে তা'তে মনে হয় তৃপ্তির সঙ্গেই খাব।"

এক মুহূর্ত্ত নীরবে অবস্থান ক'রে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত পারুল বল্‌লে, "কিন্তু আপনাকে ত' সেদিনই সব বলেছি,—আপনি ত' জানেন,—আমার কথা আপনি সবই জানেন—"

কি কথা বলতে পারুল চেষ্টা করছে অথচ কুণ্ঠিত হচ্ছে তা বুঝতে পেরে অমরেশ তাকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে বল্‌লে, "তোমার কথা আমি সব জানি, কিন্তু মহর্ষি সত্যকামের কথা তুমি জান পারুল?"

মাথা নেড়ে পারুল বল্‌লে, "না।"

অমরেশ বল্‌লে, "সত্যকাম একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি বিদ্যা শেখবার জন্যে মহর্ষি গৌতমের কাছে উপস্থিত হ'লে গৌতম সত্যকামের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন; বলেন, 'বাবা, তোমার গোত্র কি?' তাতে সত্যকাম বলেন, 'আমি ত' জানিনে, মাকে

জিজ্ঞাসা ক'রে কাল আপনাকে বলব।' পরদিন গৌতমের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সত্যকাম বল্‌লেন, 'আমার মার কাছে জানলাম যে যৌবনে তিনি বহুচারিণী ছিলেন, সেই সময় আমার জন্ম হয়, সুতরাং আমার গোত্র কি তা তিনি জানেন না। আমার মা জবালা, আর আমি সত্যকাম, এই পর্য্যন্তই আপনাকে বল্‌তে পারি।' সত্যকামের সত্যবাদিতায় খুসি হ'য়ে গৌতম তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন—আর তাঁর মাতার পরিচয়ে তাঁর নাম দেন সত্যকাম জাবালি। তুমিও ত সেদিন তোমার গোত্র কি তা বল্‌তে পারনি, তারপর নিজের ইচ্ছাক্রমে আমাকে তোমার সত্য পরিচয় দিয়েছিলে। সুতরাং তোমার সত্যবাদিতায় খুসি হয়ে গৌতমের মতো আমিও তোমার হাতের অন্নগ্রহণ করতে সম্মত হলাম, আর তোমার মার পরিচয়ে তোমার নাম দিলাম পারুল-প্রভা। এখন বল, কি তুমি চাও?—গৌতমের চেয়ে অমরেশ হীন হ'য়ে যায়, তাই চাও?—না, মহর্ষি সত্যকাম জাবালির মতো পারুল-প্রভা বড় হয়ে ওঠে তা চাও না। বল, কি চাও?" ব'লে অমরেশ হাসতে লাগল।

এ প্রশ্নের উত্তরে পারুল কোনো কথাই বল্‌লেনা, সত্যকাম ও গৌতমের যে কাহিনী অমরেশ বল্‌লে তার তাৎপর্য্য এবং প্রযুক্ততাও হয়ত সে সম্পূর্ণভাবে বুঝলেনা,—কিন্তু এই দুই-তিন দিনের বাক্যে এবং আচরণে অমরেশের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে এ কথা সে নিঃসন্দেহে বুঝলে যে এ প্রসঙ্গে আর কেনো বিচার-বিতর্ক তোলবার প্রয়োজন নেই।

প্রত্যুষে যথারীতি একজন পশ্চিমা ঠিকা পরিচারিকা চৌকা এবং বাসন মেজে দিয়ে গেছে। বারান্দার এক প্রান্তে একটু ঘিরে-ঘেরে পারুল রন্ধনের জন্য সম্ভবমতো প্রশস্ত খানিকটা স্থান ক'রে নিলে, তারপর গঙ্গাস্নান সেরে এসে মহা উৎসাহের সহিত রন্ধনের উদ্যোগ-পর্ব্বে লেগে গল।

এইটুকু অধিকার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ অমরেশের অস্থায়ী ক্ষুদ্র সংসারের সর্ব্বত্র পারুলের দৃষ্টি পড়ল। প্রথমে দিন তিনেক সে একান্ত ভাবে আশ্রিতা হয়েই ছিল। শুধু গ্রহণই করেছে, দান করবার কিছুই ছিলনা; কিন্তু এখন ক্রমশঃ তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, আর কিছু না হোক, দেহ এবং মনের নির্ব্বিকল্প পরিচর্য্যার দ্বারা সে হয়ত তার দুষ্পরিশোধনীয় ঋণ-ভারের কতকটা অংশ পরিশোধ করতে পারে। দুর্দ্দিনের রক্ষাকর্ত্তা আশ্রয়দাতা আত্মভোলা উদাসীন অমরেশের প্রতি একটা উগ্র সেবা-লালসায় পারুলের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় দ্রবীভূত হ'য়ে এল।

দক্ষেশ্বর শিবমন্দিরে শ্রীসম্প্রদায়ের একজন সাধু কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখা হবার কথা ছিল। সভারম্ভের পূর্ব্বে উক্ত সাধুর সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে আহারাদির পর অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রেই অমরেশ শিব-মন্দিরের উদ্দেশে নির্গত হ'ল। সদর দরজায় অর্গল লাগিয়ে দিয়ে এসে পারুল দেখলে অমরেশের কক্ষে তালা লাগান নেই, শুধু শিকলটা টানা আছে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি চিন্তা করলে, শিকলে হস্তার্পণ করেও একবার কি ভাবলে, তারপর শিকলটা টেনে খুলে ফেলে দরজা ঠেলে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে। এর পূর্ব্বে কোন দিনই সে এ ঘরে প্রবেশ করেনি, এমন-কি বাহির হ'তে উঁকি মেরে ভিতরের অবস্থা দেখবার জন্যে কোনো সময়ে উৎসুকও হয়নি।

ঘরে প্রবেশ করে পারুল দেখ্‌লে জিনিষপত্র খুবই সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য জিনিষপত্রকে অবলম্বন ক'রে এলোমেলোমীর অসামান্য লীলা দেখে তার হাসিও পেলে দুঃখও হ'ল। বিছানা'র চাদর কুঞ্চিত, অবিন্যস্ত; দুজোড়া জুতার মধ্যে এক জোড়া দক্ষিণদিকের কোণে অবস্থিত, তন্মধ্যে একপাটি উল্টে রয়েছে,—অপর জোড়া পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে, অর্থাৎ—যখন যেখানে পরিধানকারীর খেয়াল হয়েছে সেইখানেই মুক্তিলাভ করেছে; পরিধেয় বস্ত্রাদির কোনোটি শয্যার উপর ছাড়া, কোনোটি ভাঙ্গা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, কোনোটা বা স্যুটকেসের ডালার উপর জড়ো ক'রে রাখা; কয়েকখানা বই এবং খাতাপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

এক টুকরো দড়ি সংগ্রহ ক'রে পারুল সর্ব্বাগ্রে ঘরের এক কোণে কোনো রকমে একটা আলনা টাঙিয়ে নিলে, তারপর ধুতি এবং পাঞ্জাবীগুলা ভাল ক'রে গুছিয়ে তদুপরি

স্থাপন করলে, বাহির হ'তে একটা ঝাঁটা সংগ্রহ ক'রে এনে ঘরের সমস্ত ধূলা ময়লা উত্তমরূপে পরিষ্কার ক'রে ফেললে ; শয্যা সুবিন্যস্ত করলে ; বইগুলো সাজিয়ে রাখলে ; সর্ব্বশেষে পড়ল জুতা জুজোড়ার পালা। একটা অপরিচ্ছন্ন তোয়ালে দিয়ে জুতাগুলো পরিষ্কার ক'রে ঘরের একটা কোণে রাখতে গিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হল, একপাটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় ঠেকালে, তারপর গৃহে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই সে জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বাইরের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে তাড়াতাড়ি মুহূর্ত্তের জন্য জুতাটা বুকের উপর দুহাত দিয়ে চেপে ধরলে। পরে অঞ্চলের অগ্রভাগ দিয়ে সব জুতাগুলাই আর একবার ক'রে মুছে মুছে রেখে উঠে দাঁড়াল। ঘরের চতুর্দ্দিক ধীরে ধীরে অবলোকন ক'রে পরিবর্ত্তিত অবস্থার জন্য সে খুসীই হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে শিকল টেনে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে।

সন্ধ্যার পর অমরেশ যখন গৃহে এল তখন পারুল রান্না চড়িয়েছে। নিকটে উপস্থিত হ'য়ে অমরেশ বললে, "এ বেলাও সেই রকম চর্ব্ব-চোষ্যের ব্যবস্থা করছ নাকি পারুল ?"

মুখ ফিরিয়ে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিত মুখে পারুল বললে, "বলবার মতো ও বেলা কিছুইত ব্যবস্থা করিনি। চা খাবেন ? জল চড়াব ?"

অমরেশ বললে, "না, চা আমি খেয়ে এসেছি।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে অমরেশের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ল কেরোসিন্ ল্যাম্পের উপর। অপ্রত্যাশিত ঔজ্জ্বল্যের সহিত উক্ত দীপযন্ত্রটি আলোক বিকিরণ করছে! হেতু তার প্রধানত দুটি মনে হ'ল। প্রথমতঃ চিমনির ক্রমশ-সঞ্চিত কালি সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পেয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত দীপশিখার আকার এবং আয়তন দেখে মনে হয় বাতিটি যত্নপূর্ব্বক কাটা হয়েছে। বর্দ্ধিত আলোকের সহায়তায় ক্রমশ কক্ষের সর্ব্বত্র দৃষ্টি পড়ল,—এবং সর্ব্বত্রই যে সংস্কারের একজোড়া সুনিপুণ হস্ত তার ক্রিয়াশীলতার চিহ্ন রেখে গেছে তা অনুভব করতে বিলম্ব হ'লনা।

ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে অমরেশ প্রথমে পারুলের ঘরে প্রবেশ করলে ; তারপর ঘুরে ঘুরে বারান্দা, অঙ্গন, স্নানের ঘর সর্ব্বত্র পরিদর্শন ক'রে বেড়ালে ; শেষকালে পারুলের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে বললে, "কি কাণ্ড পারুল ?"

কাণ্ডটা যে কি তা বুঝতে পারুলের একটুও বাকি ছিল না, পিছন ফিরে রাঁধতে রাঁধতে বললে, "তা'ত জানিনে।"

অমরেশ বললে, "জাননা, তা হ'লে এসব ব্যাপার কি ক'রে হ'ল ? ভৌতিক ক্রিয়ায়, না জাদুবলে ?"

সেই রকম পিছন ফেরা অবস্থায় হাতা নাড়তে নাড়তে পারুল বললে, "এমন ত' কিছু হয়নি।"

অমরেশ বললে, "যেমনই হোক, তুমি দেখচি আমাকে বিপদে না ফেলে ছাড়বে না। হরিদ্বারে এসে সাধু-সঙ্গ ক'রে মনের মধ্যে খানিকটা বৈরাগ্যের মশলা ভ'রে নিয়ে বাড়ি ফিরব মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি যদি সংসারের এই রকম মোহিনী মূর্ত্তি দেখাতে আরম্ভ কর, তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্লা দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক ডাকাতে না হয়!"

কড়াটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে অমরেশের দিকে সমুখ ফিরে সকৌতূহলে পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "ঘটক ডাকাতে হবে কেন দাদা ? আপনার কি এখনো বিয়ে হয় নি ?"

অমরেশ বললে, "সকলেরই কি সব জিনিষ হয় ?"

"আপনার হয়। আপনার আবার বিয়ের অভাব! করেননি তাই হয় নি। এখনো ত করতে পারেন।"

"এই বৃদ্ধ বয়সে ?"

সবিস্ময়ে পারুল বললে, "বৃদ্ধ কি রকম ? আপনার আর কি-এমন বয়স হয়েচে।"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল ; বললে, "তুমি কত অনুমান কর ?

অমরেশের দিকে একবার ভাল ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে একটু ভেবে পারুল বললে, "তিরিশ বত্রিশ।"

তুমি যখন দশ বার বছরের বালিকা ছিলে তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ বত্রিশ।"

মনে মনে একটু হিসেব ক'রে নিয়ে পারুল বললে,

"তা হ'লেও পুরুষমানুষের পক্ষে ও বয়স এমন কিছু বেশি নয়।"

শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বল্‌লে, "তোমাদের কাছে পুরুষমানুষের সাতখুন মাফ; তার বার্দ্ধক্যকে ক্ষমা করতেও তোমাদের তেমন কিছু বাধে না!"

এ প্রসঙ্গ কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হ্‌লনা, বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সংবাদ নিয়ে এসে অমরেশ একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করলে, "খাবার প্রস্তুত হয়েছে পারুল?"

"হয়েছে।"

"তা হ'লে আমাকে দিয়ে দাও। আমার একটি পরিচিত লোকের আর তাঁর স্ত্রীর প্রায় একসঙ্গে কলেরা আরম্ভ হয়েছে, এখনি আমাকে যেতে হবে।"

কলেরার নাম শুনে পারুলের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল, তারপর সে ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লে, "আমাকেও সঙ্গে নিন দাদা। দুজন ত রুগী, আমরা ভাগাভাগি ক'রে সেবা করব।"

অমরেশ বল্‌লে, "না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। একলা থাকতে ভয় করছ ত? কোনো ভয় নেই, আমি লখিয়া মাঈকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, সে এসে তোমার কাছে শোবে। তা ছাড়া সামনেই শীতল চৌবে আছে, তাকেও ব'লে যাব।"

পারুল বললে, "লখিয়া মাঈ আর শীতল চৌবে সব ভয় ভাঙাতে পারেনা দাদা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

মনে মনে কি চিন্তা ক'রে অমরেশ ধীরে ধীরে শির-শ্চালনা করতে করতে বল্‌লে, "তুমি ছেলেমানুষ, সে অসুখের জায়গায় তোমার যাওয়া উচিত হবেনা পারুল।"

উচ্ছ্বসিত স্বরে পারুল বললে, "কাজের সময়ে যদি আমাকে ছেলেমানুষ বল্‌বেন, মেয়েমানুষ বল্‌বেন, তা হ'লে আজ সকালে কেন আমাকে সত্যকামের গল্প শুনিয়ে-ছিলেন? এ কিন্তু আপনার অন্যায় হচ্ছে দাদা!"

আরও খানিকটা কথা কাটাকাটির পর অমরেশ যখন বুঝতে পারলে যে পারুলকে নিরস্ত করা সহজ হবেনা তখন অগত্যা তার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল; বল্‌লে, "তা হলে তুমিও খেয়ে নিয়ে প্রস্তুত হও। খালি পেটে ওসব জায়গায় যেতে নেই।"

মিনিট দশেকের মধ্যে আহারাদি শেষ ক'রে উভয়ে সদর দরজায় তালা দিয়ে পথে বাহির হ'য়ে পড়ল। গৃহের প্রতি একটু দৃষ্টি এবং মনোযোগ রাখবার জন্য অমরেশ শীতল চৌবেকে অনুরোধ ক'রে গেল।

টর্চের আলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে নিঃশব্দে দ্রুতপদে উভয়ে পাশাপাশি পথ চলছিল। সহসা এক সময়ে অমরেশ ডাক্‌লে, "পারুল!"

একটু কাছে স'রে এসে পারুল বল্‌লে, "আজ্ঞে?"

"তুমি মেয়েমানুষ, সুতরাং সত্যকামের মতো তোমার মহর্ষি হওয়া সম্ভব হবেনা, কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি মহীয়সী হয়ো। মহীয়সীর মানে জান ত?"

মাথা নেড়ে পারুল বল্‌লে, "না, গরীয়সীর মানে জানি।"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "মহীয়সী আর গরীয়সীর প্রায় একই অর্থ। মহীয়সীর মানে 'অতি মহৎ'। গরীয়সীর মানে তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?"

কালী-দর্শন করতে গিয়ে কালীঘাট থেকে পারুল লম্বা কাঁচ দিয়ে বাঁধানো একটা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" কিনে এনেছিল। কলিকাতার গরাণহাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এখনো সেটা টাঙ্গানো আছে। সেই থেকেই গরীয়সী শব্দের সহিত তার পরিচয়। কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা না ব'লে সে বল্‌লে, "দাদা, এ আশীর্ব্বাদও করুন যে, আপনার আশীর্ব্বাদ যেন কোনো মতেই নিষ্ফল না হয়।"

অমরেশ বল্‌লে, "সে আশীর্ব্বাদেরও বাকি রাখিনি পারুল।"

পারুল আর কোনো কথা বল্‌লে না। বেশ্যার কন্যা বেশ্যা পারুল-প্রভার মনের মধ্যে তখন প্রবল রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কন্‌সোলেশন্‌ প্রাইজ্‌

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

ক্ষিপ্রহস্তে জানালার শাসি বন্ধ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ জলধারায় অর্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়া তড়িৎপ্রভা বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌স! ম'লাম ভিজে! মুকুলদা কিন্তু বেশ, একটু গ্যালন্ট্রি ও যদি থাকে আপনার!"

একটা বেতের সোফায় পা ছড়াইয়া শুইয়া মুকুল চুরুট ফুঁকিতেছিল, তড়িতের অভিযোগে উঠিয়া পরবর্ত্তী জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "কয়ে নাও যা কইতে পার এবং না-ও পার। বিধাতা এবার তোমায় সুযোগ দিয়েচেন।"

তড়িৎ মুকুলের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দেখুন ত কি রকম ভিজে গিয়েছি।"

হাতের পোড়া চুরুটের গোড়াটা য়্যাশ্‌ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া মুকুল তড়িতের দিকে চাহিল, বলিল, "এঃ সত্যিই যে ভিজে ঝোড়ো কাকটির মত হয়েচো। যাও শীগ্‌গীর কাপড় জামা বদ্‌লে এসো।"

মুকুলের গলার স্বরে গার্জ্জিয়ানীর সুর। তড়িৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

তড়িতের অগ্রজ সরিৎকান্ত এতক্ষণ আরেক দিকে আরেকটা সোফায় বসিয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘরের আর সব কিছুর অস্তিত্ব প্রায় যখন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় মুকুলের জোর গলার উচ্চারিত আদেশ তাহার কাণে গেল।

কাগজ রাখিয়া দিয়া সরিৎ বলিল, "তোকে কতবার বলেছি তরী বৃষ্টিতে বাইরে বেরোস্‌ নি আজ—তবু কোথায় গিয়ে ভিজে এলি! যা শীগ্‌গীর জামা কাপড় ছাড়্‌ গিয়ে!"

তড়িৎ হাসিতে ঘর ভরিয়া কহিল, "বেশ্‌ তুমি বড়দা! বসে রয়েচি তোমার নাকের ডগায়—উঠে জান্‌লা বন্ধ কর্ত্তে গিয়ে ভিজে গেলুম—তুমি বলে দিলে বাইরে ঘুরে আমি ভিজে এলুম।"

সরিৎ সপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল, "কাগজটা পড়্‌ছিলুম—অতটা লক্ষ্য করি নি'ক। যা কাপড় ছাড়্‌ গে যা এখন।"

তড়িৎ মুকুলের দিকে একবার বক্র কটাক্ষে চাহিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া ওর শোবার ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরখানি ছোট। একদিকে দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি ক্যাম্পখাট, অপরদিকে ছোট একটি ড্রেসিং টেবিল। মাথার দিকে ছোট একটা টেবিল ও একটা চেয়ার। মাঝখানটায় সরু একটা গালিচা পাতা। এটি তড়িতের এ বছরের জন্মদিনের উপহার।

তড়িৎ মেয়েটি কৃশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোথাও ওর মাংসের কোনো বাহুল্য নেই; দেহটি প্রায় ছেলেদেরই মত ও। চুল ওর বব্‌ করিয়া কাটা কুঁচির উপর ঘুরাইয়া ঘের টানিয়া সাড়ী পরে আঁট স্কার্টের মত করিয়া। রং খুব ফরসা না হইলেও ময়লা নয়। নাকে মুখে একটা তীক্ষ্ণতার আভাষ।

শৈশবে তড়িৎ মাতৃহীন। দিন কাটিয়াছে ওর ভাইদের সাহচর্য্যে ঠাকুমার কাছে। এখনও ঠাকুমা ওদের আগ্‌লাইয়া আছেন।

তবে ঠাকুমা—ঠাকুমা। বাহিরের চক্ষেই যে কেবল দেখিতে পান্‌ না তাহা নয়, মনশ্চক্ষেও পান্‌ না। নব যুগের নবতর শিক্ষা ও রুচি-বৈচিত্র্য সম্মুখে প্রাচীরবৎ দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরমা হাতড়াইয়া পথ পান্‌ না।

তড়িতের পাশের ঘরটাই ঠাকুমার ঘর। এই ঘরের একদিকে ট্রাঙ্ক্‌ ও আল্‌নাটি থাকে। তড়িৎ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কাপড় বদ্‌লাইয়া লইল।

ঠাকুমা পিছন হইতে বলিলেন, "তরী, এই বৃষ্টিতে কোথা বেরুচ্ছিস্‌? কি ধিঙ্গী মেয়ে হয়েছিস্‌ বাবা তুই! সারাদিনই আছিস্‌ ছেলেগুলোর সঙ্গে ঘুরতে। ওরা হোল ছেলে—আর তুই হ'লি মেয়ে। দিবেরাত্তির ওদের সঙ্গে তোর আড্ডা দেওয়া কেন?"

ক্ষিপ্র অঙ্গুলিতে ঘাড়ে বুকে পাউডার পাফ্‌ চালাইতে চালাইতে তড়িৎ বলিল, "তুমি ত বাড়ীর কর্ত্রী,—হোষ্টেস্‌—যাও না তুমি ওদের আপ্যায়ন কর গিয়ে। আমি রান্নাঘরে সিঙ্গাড়া কচুরি ভাজি।'

ঠাকুরমা মুখে যতই বলুন কার্য্যতঃ তড়িৎকে রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় কখনও পদার্পণ করিতে দিতেন না। বৈকালিক জলযোগের জন্য নানাবিধ সুখাদ্য স্বহস্তে প্রস্তত করিয়া খাওয়াইয়া তিনি যে আনন্দলাভ করিতেন, অনভিজ্ঞ তরীকে তাহার অনধিকার চর্চ্চা করিতে দিয়া তাহা নষ্ট করিতে দিতে তিনি কখনই প্রস্তুত ছিলেন না।

তড়িতের কথায় ঠাকুমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "যাও বাপু, যেখানে যাচ্ছ সেখানে যাও, মিছিমিছি রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাৎ বাধিয়ো না।"

বাহিরের ঘরে যুগপৎ অনেকগুলি ছেলের হাসি ও কথা শোনা গেল। তড়িৎ ঠাকুমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ঐ শোনো, ওরা সব্বাই এসে পড়েচে। শীগ্‌গীর ক'রে কাপড় বদ্‌লাও, কোন্‌ সাড়ীটে পরবে বল আমি পরিয়ে দিচ্ছি। পাউডার রঙ্‌ চট্‌পট্‌ লাগিয়ে নাও।"

ঠাকুমা তাহার গালে ঠোনা মারিয়া কহিলেন, "নে যা, আর ঢং কর্ত্তে হবে না।"

তড়িৎ হাসিতে হাসিতে ঠাকুমার মাথা ধরিয়া ঝাঁকিয়া বলিল, "আমি ত আগেই বলেচি, আদ্যিকেলে বদ্যি বুড়ী তুমি চুপ্‌ করে থাক, তোমার শাস্তর গুটিয়ে রাখো তোমার ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলিতে।"

তড়িৎপ্রভার মত তড়িৎ পলকে পর্দ্দার ওপিঠে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

দরজার কাছে বারান্দায় বর্ষাতি গায় দাঁড়াইয়া ছিল, হরিৎকান্ত, হিরণ, বিনায়ক, ব্রতচারী। তড়িৎকে দেখিয়া সকলে একযোগে কোলাহল করিয়া উঠিল, "তড়িৎ, ঝট্‌পট্‌ বর্ষাতি নিয়ে এসো,—গ্র্যাণ্ড্‌ প্রোগ্রাম্‌—পাগলাঝোরায় যাব সব।"

হরিৎ হাসে, বলে, "তুই যাবি তরী? কোনো একটা দিক্‌ বা গন্তব্য কিছু নিরূপণ করে আমরা যাব না কিন্তু। যতক্ষণ না আমরা ক্লান্তিবোধ করি 'ততক্ষণ আমরা ছুটব,—ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠ্‌বে, ক্ষুরে আগুন চম্‌কাবে, ঘাড়ের চুল ঘামে ভিজে নেতিয়ে যাবে—আমরা ছুটবোই ছুটবো।"

হিরণ হরিতের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "জীবনে একবার আমরা কুছ্‌পরোয়া নেই হয়ে ভয় ভাবনা বিজ্ঞতা পেছনে ফেলে যদৃচ্ছালব্ধের অভিসারে যাত্রা কর্ব্ব।"

বিনায়ক তাহার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে বলে, যেখানে,

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে,
যেন কোন্‌ দুর্দ্দম বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে—

সেইখানে—সেই অজ্ঞাত, ভয় বিপদের দিকে।"

ব্রতচারীও ছাড়ে না, বলে, "মাঝপথে তুমি যে বলবে, বতুদা, জিরিয়ে নি একটু থাম—সে হ'বে না কিন্তু।"

বিনায়ক ফোড়ণ দেয়, "অথবা, ক্ষিদে পেয়েচে একটু খাব—না হয় দুটো ব্ল্যাক্‌বেরি বা টেপারি—

হরিৎ। না, হয়ত একটুখানি লেমনেড্‌—চা না-ই জোটে যদি।

ব্রতচারী। তা যদি না মেলে তবে ভুট্টা—

বারান্দার ব্র্যাকেট হইতে লাল রংএর পাত্‌লা বর্ষাতিটা পাড়িয়া লইয়া তড়িৎ বলিল, "পুরুষরা চিরদিনই মেয়েদের খাটো করে দেখে এসেছে। ভারবাহী পশুর সামিল, নয়ত অপরিণতমস্তিষ্ক শিশুদের সামিল করেচে। মনে মনে তোমরা জানো "

ঘরের ভিতর হইতে মুকুল হাসিয়া বলে, "তড়িৎ, আজকার দিনে আর যা-ই কর, ঐ নিদারুণ সমস্যাটি উত্থাপন কোরো না।"

তড়িৎ ঠোঁট উল্টাইয়া বলে, "নিজের বেলা আঁটি সাঁটি সবারই। আপনি যে বড় ঘরের কোণায় সোফায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, আপনি যাবেন না?"

মুকুল। আমি আর সরিৎ অলসভাবে বসে আজকার দিনটা কেবল কিছু 'না' করার আনন্দে কাটাব ভেবেচি।

তড়িৎ সাতঙ্কে সরিতের দিকে চাহিয়া কহিল, "সত্যি বড়দা, তুমি এই কুঁড়েমীর ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েচো? তা হলে মনে রেখো কিন্তু আর কখনো সার্টের বোতাম ছিঁড়লে

গোজা রিপু সময়মত না হ'লে, তোমার মশলার কৌটা খালি পড়ে থাক্‌লে আমার ওপর রাগ কর্ত্তে পাবে না।"

বিনায়ক। নিশ্চয়ইনা নিশ্চয়ইনা। কিছু না করার আনন্দ শুধু উনিই ভোগ কর্ব্বেন, আর কেউ কর্ব্বে না?

সরিৎ। অলস ভাবে বসে দিন কাটাব,—কে, বল্লে? বস্তাবন্দী কাগজ রয়েচে আমার দেখবার, মুকুল নিজের খুসী মত যা হয় বলে দিলে তাতেই হয়ে গেল আর কি!

হিরণ। আপনি যাবেন না তাহলে?

সরিৎ। আমার মর্‌তে অবকাশ নেই, আমি যাব? কি বল যে তোমরা।

তড়িৎ। কিন্তু মুকুলদাকে যেতেই হ'বে। কিছু-না-করার আনন্দের বদলে সব-কিছু-করা আনন্দের ভিতর আপনাকে টেনে নেব।

মুকুল। সরিৎ তা হ'লে একা থাক্‌বে ঘরে, ওরি জন্যে থাকতে চাইছিলুম নইলে আমার আর কি!

তড়িৎ। দাদা যখন কাগজের ভেতর ডুব মারে তখন দাদার কাছে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল বলেই আমরা জানি।

বিনায়ক। আপনার কেস দাঁড়াবে না, যেহেতু আপনি সংখ্যালঘিষ্ঠ, সুতরাং সরিৎবাবুর বর্ষাতিটা নিয়ে উঠে পড়ুন।

পকেট হইতে গালার এক জোড়া দুল বাহির করিয়া ব্রতচারী বলিল, "তড়িৎ, এই তোমার সেই দুল। দেখ পছন্দ হয় কি না।"

হাঁ হাঁ করিয়া সকলে দুল জোড়ার উপর পড়িল। মুকুল পর্য্যন্ত।

বিনায়ক বলিল,"কাণবালার মত দুল কাণে দিয়ে ঘোড়ায় ঘোড়্‌সোয়ার হবে কি রকম?"

মুকুল। রাইডিং স্যুটের ওপরেই ওটা লাগাবে না কি তড়িৎ?

হিরণ। লাগাক্‌ না, ক্ষতি-ই বা কি তাতে! একটা নতুনতর কিছু হ'বে ত!

ব্রতচারী। দুলটা আন্‌লুম, একটু কাণে পর, দেখি কেমন দেখায়।

তড়িৎ নির্ব্বিকার:চিত্তে দুল কাণে পরিল।

মুকুল দুই হাতে তড়িতের মাথাটি ধরিয়া দুল খুলিয়া লইয়া বলিল, "আমাদের সীমানার ভিতর সেঁধিয়ে তুমি নিজের সীমানা বজায় রাখবে—আমরা তা বরদাস্ত কর্ব্ব কেন? দুল পরবে বাড়ীতে—সাড়ীতে, খোঁপায়, বাজুতে, বালাতে।—ঘোড়সোয়ার হয়ে দুল; প্যুঃ!"

বিনায়ক। নিশ্চয় নিশ্চয়; আমাদের অনবধানতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাদের টেরিটরিতে তোমার নিশানা গাড়্‌বে আমরা তা সইব কেন!

হরিৎ। এবারে তরী, জবাব দে দেখি ঠিক্‌ মত!

তড়িৎ। যে বলেছে জবাব দেব তাকে। তুমি কেন মাঝখান থেকে পোঁ ধরচ!

বিনায়ক। ফেমিনিন্‌ এলিমেণ্ট থাক্‌লেই নানা গোলযোগের সৃষ্টি। কোথায় এখন বেরিয়ে পড়্‌ব—

ছুটবে ঘোড়া উড়বে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি ছুটিব নিশিদিন,
বরশা হাতে ভরষা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন—

তা নয়—হানাহানি তুচ্ছ কথা নিয়ে মটকা গালার দুল, পাঁচসিকে দাম, টুসকিটি সয় নাক, কাঁচের খেলনা, হায়—তারি লাগি চলে গবেষণা। বাক্যধারা ছোটে ফেনায়িত—

সকলে হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠে। হিরণ হাত তালি দিয়া বলে "ব্রেভো, ব্রেভো," আর সবাই কোরাস্‌ ধরে।

তড়িৎ মুকুলের দিকে হাত বাড়াইয়া বলে, "দিন্‌ আমার কাঁচের খেল্‌নাটি।"

মুকুল তাহা পকেটস্থ করিয়া বলে, "অনধিকার চর্চ্চার অধিকারের জন্য উটি বাজেয়াপ্ত হোল। দোষের শাস্তি অনিবার্য্য।"

তড়িৎ জোর করিয়া পকেটে হাত ভরিয়া দেয়।

মুকুল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকায়, বলে, "সাংঘাতিক সাহস দেখচি তোমার!"

বিনায়ক উত্তর দেয়, "ওর হাতে হাত কড়া লাগান।"

হিরণ পিছন হইতে উঁকি দিয়া বলে, "খুঁজে আন্‌ব নাকি মাধবীকঙ্কণ?"

বিনায়ক গেটের পাশ হইতে পুষ্পিত ক্লিমেটিস্‌এর

পল্লবাগ্রভাগ ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, "এই যে আমি এনেচি নতুন মাধবীকঙ্কণ।"

মুকুল হাসিয়া তড়িতের দিকে চাহিয়া বলিল, "এত-বড় ডাকুকে আমি কি হাতকড়া দিতে পারি!"

তড়িৎ গুন গুন করিয়া বিস্মৃতপ্রায় গানের একটা কলি গাহিতে গাহিতে লতাগ্র হইতে ফুলগুচ্ছ লইয়া বাটন্ হোল করিল।

ব্রতচারী তাড়া দিয়া বলিল, "চল, চল, এখন সব নেমে পড়ি চল। বর্ষণ গিয়ে রৌদ্র উঠেচে। হেমন্তের মেঘ আর কতক্ষণ থাকে!"

ঢালু গিরিতট দিয়া ওরা পাশাপাশি নীচে নামিতে থাকে। চলিতে চলিতে তড়িৎ মুকুলের পিছনে গিয়া মুকুলের পিঠ হাত দিয়া ঝাড়িতে থাকে।

মুকুল কাঁধের ওপর দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলে, "কি হচ্ছে আবার? পোকা মাকড় বিছে-ফিছে কিছু এঁটে দিচ্ছ না ত?"

তড়িৎ হাসিমুখে বলে, "ও সব অসদভিপ্রায়ের ছায়া মাত্রও আমার মনে নেই। প্রতিপক্ষের পিঠের থেকে কুটো ঝেড়ে ফেলে বরঞ্চ অনেকখানি ঔদার্য্য প্রকাশ করচি।"

২

দরজার কাছে অবধি তড়িৎকে পৌছাইয়া দিয়া মুকুল বলিল, "আসি তবে। তুমি যে এত ভাল ঘোড়ায় চড়্তে পারো, আমি কিন্তু তা জানতুম না তড়িৎ। ঘোড়ার পিঠে বাঙ্গালীর মেয়ে এক অভিনব দৃশ্য বটে। যা হোক্, আমি তোমার স্পিরিট্ এবং সাহসের প্রশংসা করি।"

তড়িতের মুখে চোখে আনন্দ উপচিয়া ওঠে। হাসিয়া বলে, "রাইডিং ভালবাসেন আপনি বলুন তবে।"

"বাসি কিনা বল্তে পারি না, তবে ভাল বলে মনে করি। একটা শক্তিমান উদ্ধত প্রকাণ্ড জানোয়ারকে হাতের মুঠোর রাশ টেনে বাগিয়ে চলার ভিতর পৌরুষের যে প্রকাশ আছে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। ছেলেদের বাইসিকেল-প্রীতি আমার কাছে মনে হয় হাস্যকর। অতি সন্তর্পণে সাবধানে সুড়ুৎ করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারাই হচ্ছে ওর লক্ষ্য। বাঙ্গালীর ভীরু নিরুপদ্রব জীবনের ও বেশ ভাল প্রতীক জুটেছে

তড়িতের শ্রেষ্ঠ আকিঞ্চন ছিল ছেলেদের সমকক্ষ হওয়া। শৈশবে ও পুতুল খেলার দিকে যতটা প্রলুব্ধ হইত, তাহার অনেক বেশী ছুটিত লাটু বল এবং হকির দিকে। সাড়ীর চেয়ে ট্রাউজার-এর উপর ওর টান্ ছিল বেশী। ছেলেদের মত ব্যায়াম কসরৎ কিছুই ও বাদ দিত না। সমপাঠী ছেলেদের নীচে পাছে পড়িয়া যায় এই ভয়ে পড়িত প্রাণপাণ করিয়া।

ছেলেদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ও ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছিল, তাহার যে অন্য আরেকটা দিক আছে বা সাফল্যের অংশ আছে, ও তা কখনই ভাবিয়া দেখে নাই। মুকুলের কথায় গর্ব্বের সঙ্গে অনেকখানি পরিতৃপ্তি বোধ করিয়া তড়িৎ বলিল, "আমার কিন্তু রাইডিং খুব ভালো লাগে।"

"Our hill and dale marsh and moor—নির্ভয়ে ছোটো যখন, তখন বল্তে ইচ্ছে হয় এক-একবার সাবাস তড়িৎ।"

তড়িৎ হা হা করিয়া ছেলেদের মত হাসে, তারপর বলে, "আপনাদের কথার থেকে কিছু বোঝা ভার। এখন ত এত কথা বল্ছেন,—তখন কিন্তু আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলুম আমি জোর করে এক রকম। যাই বলুন আর তা-ই বলুন, ভয়ানক কুঁড়ে আপনি!"

"আমি কুঁড়ে? জিজ্ঞাসা কোরো সরিৎকে,—সরকারের মতে আমি হচ্ছি একজন এব্লেষ্ট অফিসার।"

তড়িৎ স্যালুট্ করিয়া বলে, "গোস্তাকি মাফ্ কিজিয়ে বান্দাকা।"

মুকুল হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলে, "বহুৎ আচ্ছা। চলি তবে এখন। গুড্বাই।"

"গুড্বাই" বলিয়া তড়িৎ হাত বাড়াইয়া দেয়, মুকুল হ্যাণ্ডশেক করিয়া দুয়ারের ধাপ হইতে নামিয়া পড়ে।

তড়িৎ খানিকক্ষণ তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার পর নামিয়া ছায়ান্ধকার বাগানের সীটে বসে। পশ্চিম গগনতট হইতে বিলীয়মান অস্তরাগের আভায় ওর কাছের ল্যাভেণ্ডার ফুলের গুচ্ছ তখন উদ্দীপ্ত

দেখাইতেছে, পায়ের কাছে পিটুনিয়ার পীত, নীল ও বেগুনি প্রচুর ফুল সন্ধ্যার ম্লানিমায় গিয়াছে মিশাইয়া, দূরে কাঞ্চন-জঙ্ঘার শিখরে ঝলমল আলোর ঝালর ঝুটা জরির পাড়ের মত কালো হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এগুলি দেখিবার মত দৃষ্টি ওর তখন নাই। হাতের উপর চিবুক রাখিয়া বিষণ্ণ-করুণ দৃষ্টি মেলিয়া তড়িৎ চাহিয়া রহিল ওদের বাড়ীর পাশ দিয়া যেখানে ঢালু তট নিম্নে উপত্যকা-ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে সেই দিকে পুঞ্জিত অন্ধকার শূন্যতার দিকে।

চিত্ত মথিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ওঠে ওর। মুকুলের "এত বড় ডাকুকে কি আমি হাতকড়া লাগাতে পারি" কথাটা ওর মনে বাজিতে থাকে অবিশ্রান্ত রেশ তুলিয়া। পরিহাসছলে কথিত এই কথা কয়টির ভিতর হইতে যে নিষ্ঠুর সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা তাহার মনকে দিয়াছে বেদনা-বিহ্বল করিয়া। আর দশ জন ছেলে যেমন বাসে মুকুল ওকে ভালবাসে বন্ধুর মত সঙ্গীর মত বয়োকনিষ্ঠ বলিয়া এবং সরিতের বোন্ বলিয়া দেখিয়া থাকে স্নেহের চক্ষে। কিন্তু তাহার প্রাণ যাহার জন্য তাতল সৈকতের মত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সুদূরতম সম্ভাবনার ক্ষীণতম আভাষেরও ত এ পর্য্যন্ত কোনো সন্ধান মিলিল না।

কি অন্ধ মুকুল! খোলা পাতার মত চোখ বুলাইলেই যাহার আদ্যন্ত সে দেখিতে পায় একবার তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাতও করিল না।

তড়িতের হতাশ মন অন্তরতরণীয়ের উপর দিয়া সেতু বাঁধিবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাতড়াইয়া কোনো উপকরণ খুঁজিয়া পায় না। যাহা কিছু ধরিবার চেষ্টা করে তাহারই মূল যায় খসিয়া। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অবশ হইয়া বসিয়া থাকে।

হঠাৎ মাথার উপর একজন টোকা মারায় চমকিয়া পিছন ফিরিয়া তাকায়।

মুকুল হাসিয়া ওঠে; বলে, "একেবারে স্বপ্নমগ্ন! কী এত ভাবছিলে? তোমার মেলাঙ্কলিয়া আছে জানতুম না কিন্তু।"

তড়িৎ হাসে। সরিয়া বসিয়া মুকুলের বসার জায়গা করিয়া দিয়া বলে, "ফিরে এলেন যে? ফেলে গিয়েছেন বুঝি কিছু?"

"যা বোলেছো! সিগার কেস্‌টা রয়ে গিয়েছে সরিতের টেবিলে।"

তড়িৎ পকেট হইতে জিনিসটা বাহির করিয়া মুকুলের সম্মুখে ধরে।

"থ্যাঙ্কস্। সব কিছুর ওপরেই তোমার এত দৃষ্টি যে, যেই তোমার কাছে আসে তার আর কোনও অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে হয় না।"

মুকুল কেস্ হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া লইয়া বলিল, "এখন বল দেখি ব্যাপারটা কি? এমন বিষণ্ণ বেদনাতুর ভাবে বসে আছ কি জন্যে?"

তড়িৎ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "কি হবে বলে আপনাকে, আপনি ত তার কোনো প্রতীকার কর্ত্তে পারবেন না।"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মুকুল উত্তর দেয়, "এতই সিরীয়াস্ ব্যাপার?"

"এতই।"

"বল্লে হয়ত কোনো রকম কিছু একটা কর্ত্তে পারি!"

"শেষটা হয়ত মনে করবেন—"

"পাগল না কি! নাও, আর ভণিতা না করে বলে ফেল।"

"আচ্ছা, আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেচেন কি?"

"মোটেই না।"

"তা হ'লে আপনি বুঝবেন না।"

"নেহাৎ ছেলেমানুষি কথা বলচ। সাগর যে দেখেনি সে কি আর সাগরের বার্ত্তা জানে না? মোদ্দা কথাটা যা বুঝতে পারছি তা হচ্ছে এই যে, তুমি কাউকে ভালবেসেচ।"

তড়িৎ স্তব্ধ হইয়া থাকে। ওর বুকের ভিতর এমন জোরে ঢিব ঢিব করিতে থাকে যে ওর ভয় করিতে থাকে পাছে মুকুল তাহা শুনিতে পায়।

মেঘভাঙা চাঁদ পাইন গাছের সারির উপর দিয়া মাথা বাড়ায়, খানিক আলো বাগানে গাছপালার উপর আসিয়া পড়ে। জ্যোৎস্নার কুহক লাগে ওদের মনে, চোখে মুখে

তার আভা লাগে। মুকুল তড়িতের দিকে ফিরিয়া বসিয়া ওর মুখের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিয়া সুধায়, "তোমার ব্যপারটা কি ? মনে হচ্ছে তুমি সুখী নও।"

বিষাদমিশ্রিত হাস্যে তড়িত বলে, "সুখী হওয়া কি সবার ভাগ্যেই ঘটে !"

"তোমার ভাগ্যে কি কারণে তা ঘট্‌বে না তাই আমি জান্‌তে চাই। বিচ্ছেদ ঘটেচে, না ঝগড়া হয়েচে, না তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই – কি বল দেখি।"

"শেষে যা বল্লেন তাই হচ্ছে কারণ।

মুকুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলে, "পাওয়ার সম্ভাবনা নেই—কেন ? বিবাহিত সে ?"

তড়িৎ হাসিয়া বলে, "না।"

"তবে কি ?"

এবার তড়িৎ মনে মনে মুকুলকে গাল দেয়, প্রকাশ্যে বলে, "মোটে বোঝেই না কিছু !"

"এই মুস্কিল ? এ-বাধা অনতিক্রমণীয় কিছু নয়, আজ সে যা বুঝছেনা কাল ত সে তা বুঝতে পারে। বল যদি আমি বিন্দেদূতী হতে পারি। কিন্তু তড়িৎ, অবাক করে দিলে তুমি—সদা সর্ব্বদা আমরা তোমায় দেখচি, তোমাদের বাড়ী আসা যাওয়া কর্‌চি—এর ভেতর কাকে কখন তুমি হৃদয় দান করে বস্‌লে ? কে সে ?"

তড়িতের মুখ চোখ লাল হইয়া ওঠে, অধরপুট কম্পিত হয়, দাঁতে সে ঠোঁট চাপিয়া রাখে !

মুকুল জিজ্ঞাসা করে, "বল্‌বে না কে সে ?"

"বল্‌তে আমি তা পারব না কিছুতেই।"

"এইটিই হোল নারী চরিত্র। কিন্তু—তুমি যে নারী সে কথা আজ হঠাৎ মনে করিয়ে দিলে তড়িৎ ! ও কথাটা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। হয়ত বা আমাদের মত সেও এ কথাটা ভুলেচে। খোদার ওপর খোদগিরি করার হচ্ছে এই শাস্তি। বুঝলে ? নারী পুরুষের মন অধিকার করে যে গুণে, তুমি দিয়েচো সে গুণ সব লোপ করে।"

অন্য সময় হইলে তড়িৎ হয়ত বলিত "মেয়েদের জীবনে ও আর কাজ নেই, পুরুষের মন কি করে অধিকার কর্ব্বে তার জন্যে হাঁ করে বসে আছে" কিন্তু আজ আর এ দম্ভোক্তি ওর মুখ দিয়া বাহির হইল না, মুকুলের অভিযোগে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুরুট ফুকিতে ফুকিতে মুকুল বলিল, "তুমি একটা ভুল কর্‌চো। পুরুষ শক্তিমান্ জীব, সুতরাং কঠোরতা ও শক্তিমত্তার দ্বারা তাকে মুগ্ধ করা যায় না। তোমার পুরুষোচিত সাহসিকতায় তোমাকে সে সাবাস্ বলে, কিন্তু অন্তরে আকাঙ্ক্ষা করে না। মেয়েদের যে দুর্ব্বলতাকে তুমি প্রাণপণে পরিহার কোরেচো, সেই দুর্ব্বলতাই হচ্ছে তোমাদের প্রধান বিজয়াস্ত্র। পাথরের উপর পাথর যায় গড়িয়ে, ঠোকা লাগলে আগুন ঠিকরে পড়ে। সেই পাথরকে জয় করে ক্ষীণপ্রাণ সুকোমল লতা। পল্লবে ফুলে সে দেয় তাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে। তার ভেতর পাথর অতি সহজে লুপ্ত হয়ে যায়।

পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত যে বৈষম্য সেই হচ্ছে প্রকৃতির আসল মারণ মন্ত্র। তুমি এক কাজ কর, যোয়ান ডি আর্ক না হয়ে গ্রেস্ ডার্লিং হও, তা হলেই অভীপ্সিত ফল পাবে। তোমার পুরুষালি চাল ছেড়ে দাও।

তড়িতের মন লাটিমের মত ঘুরপাক খায়। যে ধারণা ও আজন্মকাল পোষণ করিয়াছে, ওর অবচেতন মনের গহন গভীর তল ব্যাপিয়া যাহা মূল বিস্তার করিয়াছে, সব যেন টান খাইয়া নড়িয়া ওঠে।

ওর চেতনার নীচে বাসুকী যেন মাথা নাড়া দেয়, পলকের দোলায় সব যেন বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম করে। মাটির দিকে চাহিয়া ও মুখ নীচু করিয়া থাকে।

মুকুল উঠিয়া বলে, "চলি আমি এখন তড়িৎ। যে উপদেশ তোমায় দিলুম তা অমূল্য। চলেই দেখ তুমি তার মত, সব ঠিক্ হয়ে যাবে। আচ্ছা আসি তবে।"

গেটের কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুকুল তড়িতের বব্‌ড চুলের গোছা ধরিয়া নাড়িয়া বলিল, "তোমার এই বব্ ছেড়ে বিননিয়া বেণী বাঁধ, এই আরেক কথা বলে গেলাম।

মিলিটারী ধরণে হাত কাণের পাশ পর্য্যন্ত উঠাইয়া তড়িৎ বলিল "যো হুকুম।"

৬

সকালবেলা তড়িৎ ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে বসিয়া মাথায় ব্রুশ চালাইতেছিল, পরণে ওর ঢিলা পায়জামা, গায় খাটো সার্ট, ছেলে কি মেয়ে, দেখিলে হঠাৎ বোঝা যায় না।

চেয়ারে বসিয়া ও টেবিলের কোণার উপর দিল পা তুলিয়া। সিগার কেসটা টানিয়া লইয়া একটা চুরুট ধরাইয়া মুখে দিল। চুরুটটা যখন প্রায় আধখানা ভস্ম হইয়া আসিয়াছে, তখন ছুঁড়িয়া তাহা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ফ্রেণ্ড্স্, কম্‌রেড, কম্পানিয়ন—কচু! কিছুই চায় না ওরা! ওরা চায় সেই ঘোমটা টানা, এক গা গয়না সিঁদুর আল্‌তা মাখা জড়সড় কোণার বউটিকেই। মুখেই শুধু বক্তৃতা, Together we rise and sink—ছুঃ! যত বাজে কথা! মনের তলায় নিজেদের শ্রেষ্ঠতাব বোধ পূরোপুরি। ওদের সীমানায় কেউ পা বাড়িয়েছে কি আঁৎকে উঠ্‌লেন ভয়ে,—গেল, গেল বুঝি সব! হাজার হাজার বছর ধরে স্বাধীনতার যে প্রিভিলেজ ওঁরা অর্জ্জন কোরেছেন তা ওঁরা খসিয়ে দেবেন আর কাউকে! ইস্ এতই উদার প্রাণ ওঁদের। আবার মেয়েদের বলা হয় হিংসুটে। যেন হিংসা বস্তুটি ওঁদের কিছুমাত্রই নেই। মেয়েদের জীবনের পরিধি ক্ষুদ্র, কাজেই বেচারীদের হিংসাও ক্ষুদ্র, ওঁদের জীবনবৃত্ত যেমন বৃহত্তর, হিংসাও ওঁদের তেমনি বৃহৎ, প্রচণ্ড। স্বামীদের জেলসিতে ত দেখা যায় শতকরা নব্বুইটি স্ত্রীর জীবনই দুর্গতি-সার! মেয়েরা আজকাল বিয়েই কর্ত্তে চায় না স্বামীদের এইসব যন্ত্রণার জন্যে!

মুকুলকে তুড়িয়া খানিকটা বকিয়া দিতে তড়িতের ইচ্ছা করিতে থাকে। তাহা না পারিয়া ও নিজের মনেই গজর্ গজর করিতে থাকে। ব'য়ে গেছে ওঁর জন্যে আমার বিননিয়া বেণী বাঁধ্‌তে! বাবুর কি আব্দার! খেলাধূলো সব ছেড়ে হাতা বেড়ী নিয়ে উনুনের পাশে বসে থাক্‌বো আমি! হিট্‌লারী জবরদস্তি—Back to the kitchen! ও ভুলে যাচ্ছে যে ও ত আর হিট্‌লার নয়। সাম্রাজ্যের কর্ণধার যে তার কথায় লোক ওঠে বসে। উনি কে শুনি!

হরিৎ হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তড়িতের খাটে বসিয়া পড়িয়া বলে, "তরী, শিগ্‌গীর করে আমায় একটু জাম্বাক লাগিয়ে দে, দেখ্ কতটা ছোড়ে গেছে এইখানটায়।"

হরিৎ ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলিয়া দেখাইল।

দেখিয়া তড়িৎ বলিল, "তোমার কাজই ঐ! কেবল আছ হাত পা কাট্‌তে, নয় কাপড় জামা ছিঁড়্‌তে; নয়ত কোটের বোতাম হারাতে। একটু ধীরেসুস্থে কিছুতেই তুমি চল্‌তে পারো না।"

"যা যা, বখামি করিস্ নে। তুই সেদিন কানে ওরিয়েণ্টাল বাম্ লাগাচ্ছিলি কেন

"বেড়াবার পথে যে পপ্‌লার গাছটা আছে—

"ধাক্কা লেগেছিল তার সঙ্গে অথবা পড়ে গিয়েছিলি তার তলায়। নিজের বেলায় তোমার সবই ভালো, যত দোষ আমাদের বেলায়।"

"ছোড়দা, তুমি ভারী অকৃতজ্ঞ। কাজও করিয়ে নেবে, আবার বকুনিও দেবে" বলিয়া তড়িৎ জাম্বাক লইয়া হরিতের পায় লাগাইতে বসিল।

উহু হু করিতে করিতে হরিৎ বলিল, "ছাখ্, পথে মুকুল বাবুর সঙ্গে দেখা, টানাটানি কর্‌লুম—এল না তবু। চলেছেন জয়শ্রীদের বাড়ী নাচের নেমন্তন্নে!"

"ওদের সঙ্গে আলাপ আছে না কি ওঁর?"

"পরিচিতের গ্যালারি থেকে প্রোমোশন পেয়েছেন বন্ধুর রিজার্ভ সিটে এখন।"

সবিস্ময়ে তড়িৎ বলিয়া ওঠে, "সত্যি?"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি, এই তিনসত্যি কর্‌লুম" বলিয়া হরিৎ হাসিতে থাকে।

"আহা, হাস্‌চ কেন, হাস্‌বার কি হোল শুনি।"

"কিছু না" বলিয়া হরিৎ হাত পা মেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। তড়িৎ জিজ্ঞাসা করে, "ছোড়দা জয়শ্রী কি রকম দেখ্‌তে?"

"জয়শ্রীরই মত।"

"সত্যি?"

হরিৎ হাসে; বলে, "তিন সত্যি কর্ব্ব আবার?"

"বাঃ, আমি বুঝি তাই বল্‌ছি: 'জয়শ্রীরই মত' কথাটা

শুন্‌তে যে কি রকম কম্‌প্লিমেণ্টারি তা বোধ হয় তোমার নিজেরও খেয়াল নেই।”

হরিৎ অর্দ্ধেক উঠিয়া বসিয়া তড়িতের চুল ধরিয়া টানিয়া বলে, “এ রকম স্তববাক্য বা চাটুবাক্য কখনও কাউকে বলেছি, এ রকম নজীর দেখাতে পারিস্‌?”

মাথায় হাত দিয়া তড়িৎ বলে, “ছাড়ো ছাড়ো ছোড়দা, নইলে পিঠে কাম্‌ড়ে দেব।”

হরিৎ চুল ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে থাকে। তড়িৎ বলে “স্তব শোনাবার সময় আসুক, তখন দেখ্‌ব শোনাও কি না। জয়শ্রী ত তোমার ক্লাস মেট্‌, চেন বোধ হয় খুব ভাল করেই ওকে।”

“যে দেমাক্‌ মেয়ের, আমাদের মত চুণো পুঁটির সঙ্গে ভাল করে কথাই কন্‌ না।”

“মুকুলদার সঙ্গে এত খাতির কোত্থেকে হোল?”

“নাচে। দুজনেই ব্রতচারী নৃত্য করেন।”

তড়িতের মুখে উষ্মা প্রকাশ পায়। ভ্রূ বাঁকাইয়া বলে, “যত সব ইয়ে আর কি! ব্রতচারীকে ওঁরা বুঝি বল্‌ ডান্সে পরিণত কর্‌ছেন?”

হরিৎ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, “কতকটা ত বটেই এই দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মেটাবার মত আর কি!”

তড়িৎ ভ্রূভঙ্গী করে, ওর মনের আকাশ ছাইয়া যে অপ্রসন্নতা অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ও তাহার কোনো রূপ বা ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

হরিৎ বালিশে ঠেস্‌ দিয়া অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বসিয়া বলে, “ছাখ্‌ তন্বী, যে মেয়ে পুরুষের পৌরুষকে ম্লান করে দিয়ে তার মন অধিকার কর্‌তে চায় সে ঠকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ প্রতিষ্ঠার গিরি-সানুদেশে পৌছাতে পারে, কিন্তু প্রেমের সিংহদ্বারে যে পৌছায় না তা ঠিক্‌।”

তড়িৎ কথার উত্তর ছায় না। উঠিয়া ঘরের ভিতর ঘুরিতে থাকে।

হরিৎ তাহার শিঙ্গল্‌ করা মাথার দিকে চাহিয়া বলে “তোর এই পুরুষের মত ছাঁটা চুলের মাথার চেয়ে জয়শ্রীর কুণ্ডলিত কবরী সমেত মাথাটি যে অনেকখানি দেখ্‌তে ভাল, এ আমি বল্‌তে বাধ্য।”

তড়িৎ আল্‌নার কাপড়ের ভিতর হইতে কি একটা খুঁজিতেছিল, হরিতের কথায় দিল তাহা ছাড়িয়া। হাত বাড়াইয়া হরিতের হাতের আঙ্গুলগুলি মোচড়াইয়া দিয়া এক লম্ফে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হরিৎ উচ্চৈস্বরে গান ধরিল, “আমি চিনি গো চিনি তোমারে,” একটু থামিয়া,—“ওগো জেলসিনী।”

পাশের ঘর হইতে ওদের নতুন ছোকরা বয়টা আসিয়া বলিল, “বাবু গাধ্‌ধাকে মাফিক এৎনা মৎ চিল্লাইয়ে, বড়া বাবু বোলা।”

হরিৎ তাহার কাণ ধরিয়া টানিয়া সরিতের কাছে লইয়া চলিল, বলিল, “দাঁড়া হতভাগা দেখছি তোকে কে গাধ্‌ধাকে মাফিক চিল্লায়।”

চা পানান্তে মুকুল চারিদিকে চাহিয়া তড়িৎকে না দেখিতে পাইয়া বাগানে গিয়া তাহাকে ধরিল।

মুখে “বয়ে গেছে” বলিলে কি হয়, মুকুলের কথা কাটাইয়া চলিতে ওর মন সরিতেছিল না। চায়ের পার্টিতে ও আজ পরিয়াছে ডালীমফুলী সাড়ী, কাণে গালার প্রকাণ্ড দুলটা, মৃতা জননীর গহনার বাক্স খুলিয়া গলায় দোলাইয়াছে সাত নহর, বাহুতে বলয় বাজুবন্ধ মাথার চুলও এই তিন চার মাসের মধ্যে কাটে ত নাই, উপরন্তু ম্যাকেসার তেল মাখিয়া কাঁধ পর্য্যন্ত নামাইয়াছে। হাড় বেরকরা শুষ্ক দেহকে তনুলতা বলা চলে কি না তদ্বিষয়ে মুকুল একদিন সংশয় প্রকাশ করায় তড়িৎ সকালে চা ছাড়িয়া দুগ্ধ পান আরম্ভ করিয়াছে, এবং একখানা টোষ্টের জায়গায় দুইখানা করিয়া টোষ্ট, পুরু করিয়া মাখন লাগাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেরা আজ ওকে দেখিয়া হাসি হল্লায় ঘর ফাটাইয়াছে, সকলে মিলিয়া ওকে মাঝখানে রাখিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া একদফা নাচিয়াছে বিনায়ক বলিয়াছে, “তড়িৎ এখনো পুরোপুরি তুমি তড়িন্ময়ী হওনি. যেদিন হবে—সেদিন কিন্তু সাবধান। আগেই বলে রাখচি,—beware of that day। প্রথম দাবী আমার।”

শ্যাম কনক দাবড়াইয়া ওঠে, বলে, “চোপরও ছুঁপিড প্রথম দাবী আমার।”

—কথাটা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, ব্রতচারী বিনায়ক, হিরণ, অচপল সকলেই সদম্ভ আস্ফালন করিতে থাকে।

আস্তিন গুটাইয়া শ্যাম কনক বলে, "এস লডি, The fair for the brave! বারান্দায় সকলে মিলিয়া মুষ্টি-চালনা করিতে থাকে।

এমন সময় খাবার ডাক পড়ে।

তড়িৎ ভাবিতেছিল, খোশ খবরের ঝুটাও ভাল। এত জনের এত কথার মধ্যে, যাহার কথা শুনিবার জন্য যে উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সে-ই শুধু একটা কথা কহিল না। ওদের মত রহস্য করিয়াও যদি সে একটিবার বলিত! মনে কিছু তাহার নাই বা থাকিত —শুধু মুখের একটা কথা—বাতাসে যেমন গাছের পাতা ওড়ায়, ফুলের কেশর ঝরায়—তারি মত—ভূত-ভবিষ্যৎ হীন স্বল্পায়ু ক্ষণজিবী একটি কথা—নিশ্বাসের সঙ্গে না হয় তাহা শেষ হইয়া যাইত, নিমেষপাতে মিলিয়া যাইত—তবু—

মুকুল বেঞ্চের এক পাশে বসিয়া বলে, "এই যে তুমি এখানে। সত্যি কথা বল্‌তে কি তড়িৎ, বেশ বদ্‌লিয়ে তুমি ভাল কর নি। ভয় করুচে তোমার কাছে বস্‌তে, এতক কাল যা করে নি কখনো।"

তড়িৎ মনের খুশী গোপন করিয়া তর্জ্জনী শাসন করিয়া বলে, "Thou too Brutus!"

মুকুল হাহা করিয়া হাসে। বলে, "আসল কথাটা কি জান, তোমরা হচ্ছ আমাদের এনিমি, সৃষ্টির আদি হ'তেই চলে আসচে তোমাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই। কখনও তোমরা হার কখনও আমরা। জয় পরাজয় অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে চিরকাল। ইতিমধ্যে দুই পক্ষই দুই পক্ষকে জব্দ করার অবসর খোঁজে। যে যাকে বাগে পায়, সে তার টুঁটি চেপে ধরে। কাজেই তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের মনটা হচ্ছে—"no quarters!"

মুকুলের কথায় তড়িৎ একটুখানি বিস্মিত হইয়া তাকায়। ভাইদের সঙ্গে এবং ভাইদের তত্ত্বাবধানে মানুষ হইয়া সেক্স প্রব্লেমের গুরু সমস্যা কচিত ওর মনে উদয় হইয়াছে।

ও দেখিয়াছে শুধু জীবনের বাহিরের রূপ। আলোর গায় আলো যেখানে গতি-বিভঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ছায়াতে জাগে দ্যুতি-সঞ্চার শিখা। যৌবনের তোরণদ্বার হইতে সুদূরবর্ত্তী জীবনকে দেখায় কুহকের মত।

মুকুল তড়িৎকে ভাবিবার অবসর না দিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তারপর, বল দেখি তোমার খবর। আমি যা বাংলে দিয়েচি, তাতে ফল হোল কিছু?"

তড়িৎ মাথা নাড়িয়া সক্ষোভে বলে, "কিছু না।"

"কিছু না? বল কি? হবে, হবে, তুমি শুধু ধৈর্য্যাবলম্বন করে থাক, নিশ্চয় হবে। মন না মতি তার গতির কি কিছু ঠিক আছে? মানুষ মুহূর্ত্তে কখনও বদ্‌লে যায়, কখনও বদলায় ধীরে ধীরে।"

তড়িৎ সংশয়মিশ্রিত হাসি হাসে। মুকুল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া ওঠে, "বাই জোভ তড়িৎ, একটা প্ল্যান এসেচে আমার মাথায়। অনেক সময় সহানুভূতি থেকে প্রেম জন্মলাভ করে। কোনো রকমে তুমি কি তার মনে সহানুভূতি উদ্রেক করতে পারো না?"

"ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে একসিডেণ্ট করে যদি হয়, তবে একবার চেষ্টা দেখা যেতে পারে।"

মুকুল হাসে, বলে, "না না ওরকম ড্রাষ্টিকভাবে করতে বল্‌চি না। কিন্তু—তোমাকে নিয়ে ঐ কিন্তু এক গোল। তুমি সেল্‌ফ সাফিসিয়েণ্ট গোছের মানুষ কি না, তোমাকে দেখে কারুর মনে সহানুভূতি জাগতেই পারে না। এই ধর না কেন,—তোমাদের অবস্থা যদি এ রকম ভাল না হোত, সরিৎ যদি এরকম স্নেহশীল ভাই না হয়ে—ধর—বৈমাত্র ভাই হোত এবং তোমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিত—তাহলে—স্বতঃই তার মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হোত। সরিৎ হরিৎ ওরা রাখে তোমাকে মাথায় করে,—তোমাদের অবস্থা দেখে লোকের হয় ঈর্ষার উদয়—তুমি নিজে দুনিয়ার কিছু কেয়ার কর না—এ অবস্থায় সহানুভূতির উদয় হবে কিসে!"

"ধরুন, আরেকটা ভূমিকম্প যদি হয়, চাপা পড়ে যায় সব, আমি বেঁচে থাকি একা—"

মুকুল জিভ কাটিয়া বলে, "ছি ছি, ওসব বোলোনা। দুর্দ্দৈবের কথা রহস্য করেও মুখে আন্‌তে নেই। আচ্ছা—ছাখো—এমনি তার সঙ্গে তোমার কি রকম ভাব ?"

তড়িতের গলা আট্‌কাইয়া আসে, ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "বন্ধুর মত, আর কি।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুকুল বলে, "ও কথাটা অস্পষ্ট; পরিষ্কার ওতে কিছু বোঝা যায় না। তোমার ওপর তার টান আছে কি না তা বল দেখি।"

"হয়ত আছে, হয়ত নেই, ঠিক আমি কিছু বল্‌তে পারি নে।"

"আচ্ছা, এক কাজ করা যায় না, কিছু দিনের জন্য তুমি কোনোখানে যেতে পারো না ?"

হাতের উপর চিবুক রাখিয়া তড়িৎ কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলে, "পারি বোধ হয়।"

"পূজোর ছুটী ত এসেই পড়েচে, এই উপলক্ষে তুমি কোথাও বেড়াতে যাও। অতিরিক্ত নৈকট্যে চক্ষু হয় অন্ধ, দূরত্ব দৃষ্টির প্রসার ঘটায়। যে মানুষ সর্ব্বদা কাছে থাকে, সে যায় মন থেকে সরে ; যে দূরে চলে যায়, সে মন জুড়ে বসে। ছুটী ফুরোলেই চলে এসো না যেন, যেমন করেই হোক মাস দুই কাটিয়ে এসো। কোথায় যাবে বল দেখি ?"

"এক কাকা আছেন ঢাকাতে, ভাব্‌চি সেখানেই যাব।"

"পার্‌বে সেখানে থাক্‌তে ?"

তড়িৎ একটু হাসে, বলে, "পারব।"

"সেখানে ত তোমার একেবারে জেনানা বল্‌তে হবে।"

"হোলই বা। নতুন একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে। দেখা যাক্ তাতেই কি আছে।"

"তোমার প্লাক্ আছে তড়িৎ, ঐটিই তোমার আসল গুণ। ঐতে তোমায় প্রশংসা না করে পারা যায় না। অভ্যস্ত আচারের নাগপাশে নিজেকে তুমি হারিয়ে ফেলো নি। বোঝো যখন ছাড়্‌তে হবে—তখন ছাড়্‌তে পারো ; খড়্গের মতন ছেদন করতে পারো যা নিরর্থক, যা প্রতিকূল, যা শৃঙ্খলস্বরূপ। কবির মত বল্‌তে ইচ্ছে করে—

তীক্ষ্ণধার যেন তলোয়ার,
মুহূর্ত্তেকে খণ্ড খণ্ড করে
প্রগাঢ় অচল অন্ধকার
বিদ্যুতের শিখা সম দীপ্ত তেজে—"

তড়িৎ মুগ্ধ হইয়া শোনে। মুকুলের স্তবগান ওর কানে দেয় সুধা ঢালিয়া। রসবঞ্চিত তপ্ত মৃত্তিকার উপরে স্বল্প বর্ষণের অপ্রচুর ধারার মত ও সমস্ত অন্তর দিয়া সঞ্চয় করিতে থাকে তাহার প্রত্যেকটি বিন্দু।

মুকুল মাঝখানে থামিয়া বলে, "আর হোল না, ফুরিয়ে গেল ভাণ্ডারের পুঁজি !"

তড়িৎ হাসে, বলে "রেখে দেব সোণার আখরে বাঁধিয়ে।"

ঢাকায় গিয়া তড়িৎ দুই মাসের জায়গায় তিন মাস কাটাইয়া দিল। ফিরিয়া যখন আসিল তখন ওর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অনেকখানি। মাথার চুল নামিয়াছে কাঁধের নীচে, সাড়ীর আঁচল উঠিয়াছে অঙ্গ বেড়িয়া, করপ্রকোষ্ঠে চুড়ীবালা, কণ্ঠ বেড়িয়া হার এবং কাণে কাণবালার প্যাটার্ণে সোণার দুল। নিঃসঙ্কোচে ওর মুখে দেখা দিয়াছে, উষার প্রথম আলোকাভাষের মত প্রথম লজ্জার অনতিস্ফুট আভা। তিন মাস এখানে থাকিয়া বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনযাত্রার ছোট বড় সমস্ত ব্যাপার ও এমন করিয়া অধিগত করিয়াছে যে তাহার অভিনবত্বে ও নিজেই বারম্বার কৌতুকে হাসিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ ফিরিয়া প্রথম যেদিন মুকুলের সঙ্গে ওর দেখা হইল, সেদিন মুকুল গেল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া। বিকালের দিকে ওরা চলিয়াছে ম্যাল্‌এ বেড়াইতে। অপরাহ্ণের আলোতে কাঞ্চনজঙ্ঘার কাঞ্চনশিখরের দ্যুতিতেভরা ওর চোখ, মাটির পৃথিবী গিয়াছে পিছনের কুজ্ঝটিকার মত মিলাইয়া। পাশের দিকের রাস্তা হইতে মুকুল সম্মুখে আসিল। অন্যবারকার মত তড়িৎ হাণ্ডশেক্ করিল না, উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া হাঁকিয়া বলিল না, কি মুকুলদা, কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন, ভাল ত ? বুকের উপর হাত দুখানি যোড় করিয়া সুচারু স্মিত এক প্রণামে

তাহার অন্তর পূর্ণ আকুতিকে দীপশিখার মত জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিল।

মুকুল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "লর্ড জেসাস্! তড়িৎ, এ কি তুমি, চিনেও চিনিতে নারি একি হেরি চমৎকার! কবে এলে? খবর ত দাও নি একবার!"

তড়িৎ হাসিয়া বলে, "যদি জানতুম খবর না দিলে আপনার সুনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটচে, তা হ'লে হয়ত দিতুম।"

তড়িৎ সঙ্গের লোকদের বিদায় দিয়া মুকুলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।

মুকুল জিজ্ঞাসা করে, "তারপর, কেমন ছিলে সেখানে?"

"আপনাদের মেহেরবানিতে খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে দিব্যি ছিলাম। রোববার দিন যাবেন আমাদের ওখানে, যত কিছু রান্না শিখে এসেচি, সব খাইয়ে দেব।"

মুকুল পাহাড়ের একটা নিভৃত দিক্ দেখিয়া একটা পাথরের ঢিপির উপর বসিয়া বলে, "বসে পড় এখানে। ওদিকে কতদূর কি হোল তোমার বল দেখি।"

তড়িৎ বসিতে ইতস্ততঃ করে, আগের মত নিঃসঙ্কোচে দ্বিধাহীন চিত্তে মুকুলের পাশে সে আসন গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুল হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। "বল তোমার কাহিনী।"

তড়িৎ হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকে। মুকুল তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলে, "এই, কি হয়েচে? অমন করে রইলে কেন?"

মাথা তুলিয়া ক্ষীণ হাস্যে তড়িৎ বলে, "আমার যথা পূর্ব্বং তথা পরং, শোনাবার মত কোনো কথা নেই।"

অনির্ব্বার বেদনাবেগে তড়িতের অধর কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, চোখের তারায় অন্ধকার নামে গহন নিশীথের মত।

মুকুল অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে।

স্বগতভাবে একবার বলিয়া ওঠে, "আশ্চর্য্য কিন্তু, এতদিনেও সে লোকটি কিছুই বল্লে না?"

তড়িৎ উঠিয়া পড়িয়া বলে,—"চলুন বেড়াই গিয়ে, সন্ধ্যে হয়ে যাবে এখুনি। ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট ফুল কুড়িয়ে কি হবে!"

মুকুলের মনে অপরিসীম মমতা বর্ষার জলভারগুরু মেঘের মত নামিয়া আসে। তড়িৎকে ঘিরিয়া পরদুঃখকাতর চিত্ত আহা আহা করিয়া ঘুরিতে থাকে।

মুকুল ওঠে না দেখিয়া তড়িৎ দাঁড়াইয়া থাকে, মুকুল তাহাকে আবার বসাইয়া বলে, "সব কাজেই তোমার তাড়াহুড়ো তড়িৎ। বোসো একটু চুপ্ কোরে, অত রাশিং হলে কি পারা যায়। আমার মনে আরেকটা কথা জাগছে, ভরসা দাও ত বলি।"

জরীপাড় ময়ূরকণ্ঠী সাড়ীর আঁচলখানি গায় টানিয়া তড়িৎ নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। মুকুল বলে, "আমি বলি কি, যার জন্য তুমি এত ত্যাগ স্বীকার কর্লে, এত কিছু কর্লে, কিছুতেই যখন তাকে পাওয়া গেল না— তখন তার চেষ্টাটা না হয় ছেড়েই দিলে। তার চেয়ে হুকুম কর যদি—বরঞ্চ—অবশ্য এমন প্রিজাম্প্‌শন্ আমি কচ্ছি না যে তার চেয়ে আমি যোগ্যতর লোক—হয়ত আমার চেয়ে তার যোগ্যতা অনেক বেশী ছিল,—

একটুখানি হাসিয়া তড়িৎ বলে "আপনি কি কনসোলেশন্ প্রাইজ্ অফার কর্চ্ছেন?"

মুকুল হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

খানিক পরে সামলাইয়া লইয়া বলে, "জানইত— নির্ব্বোধ মোরা কহিতে জানি না কথা, সুতরাং মাপ কোরো যদি অশোভন কিছু বলে থাকি। তোমার দুঃখ শান্তির জন্যে ততটা বলি নি, যতটা বলেছি স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে। মনে প্রাণে তোমায় চেয়েছি বলেই কথাটা বল্‌তে পেরেছি।"

"আচ্ছা" বলিয়া তড়িৎ উঠিয়া ক্ষিপ্র পদে অন্তর্হিত হইয়া যায়। মুকুল তাহাকে ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া অবশেষে একাকী বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

পথে ডাক দিল হরিৎ। বলিল, "মুকুল বাবু কি রেভারিতে নিমগ্ন, পাশাপাশি চলচি, তবু দেখ্‌তে পান্ না।"

"হরিৎ না কি? ও তা বটে, ভাবনাতেই ডুবে ছিলাম। আস্বা শোনো, একটা কথা বলবো তোমাকে। তড়িৎকে আমি আজ প্রপোজ্ করেচি—ও উত্তর দেয়নি কিছু, তোমার কি মনে হয়,—আমি মিথ্যে আশায় মুগ্ধ হয়েচি?"

হরিৎ হা হা করিয়া হাসে এক ধমক। তারপর বলে, "মুকুল বাবু তা হ'লে জানেন না যে আপনার জন্যেই তরী ওর কৃতিত্বের কীর্ত্তিকেতন ধুলোয় নামিয়ে খ্যাতিহীন গৌরব-হীন অনুজ্জ্বল গার্হস্থ্য জীবনের দরজায় দাঁড়িয়েচে?"

মুকুল হরিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, "কি বল্‌চ তুমি হরিৎ? ঠাট্টা কর্ত্তে লেগে গেলে না কি?

হরিৎ হাসিয়া বলে, "সম্পর্কটা ঘটবার আগেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর্ব না এ জেনে রাখুন। তরীটা আপনার জন্যে আমাকে ভয়ানক জ্বালাতন করেচে, সেই জন্যে আমি ওর সিক্রেট ফাঁস করে দিলুম। জয়শ্রী জয়শ্রী ক'রে মরেচে ও জেলাসিতে। কেন যে আপনি ওর সঙ্গে নাচতে গেলেন তরীর সঙ্গে না নেচে—আমি তার কারণ কি জান্‌ব বলুন,—কিন্তু তার জন্যে ও আমাকে বাড়ীতে তিষ্ঠিতে দেয় নি। যাক্ আপনি প্রপোজ করে সব জঞ্জাল দূর করেচেন, নইলে খেতে শুতে নাইতে ও আমাকে স্রেফ জ্বালিয়ে মারত। কিন্তু পথের মধ্যে কথা ত ভাল হোল না, বাসায় যাবেন, তখন ভালো করে কন্‌গ্রাচুলেট্ করা যাবে।"

হরিৎ যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনি তেমনি হঠাৎ চলিয়া গেল, মুকুল পথের মাঝখানে নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হরিৎ তাহাকে এ কী, বলিয়া গেল! যত কিছু অসম্ভবকে বিধাতার কারসাজিতে সে সম্ভব হইতে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, তাহার কিছুরই সঙ্গে এ-কথা মেলে না। তাহারই জন্য তড়িৎ এত কাণ্ড করিয়াছে? তাহার কথা তাহাকে বলিয়া, তাহারই পরামর্শে চলিয়া তাহার মাথা ধূলায় লুটাইয়া দিয়া হাসিয়া সে চলিয়া গেল! এতদিন ধরিয়া কি সে চাহিয়াছে তাহা সে গিয়াছে ভুলিয়া, দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন কি আত্ম-বিস্মৃতির ভিতর যে সে ডুবিয়া ছিল তাহাও সে জানে না। আজ অকস্মাৎ তাহার নিভৃত মর্ম্মকন্দরে এক নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে, তাহার জলোচ্ছ্বাসে তটভূমি গিয়াছে ভাসিয়া, দিক-দিগন্ত ভরিয়াছে কলরোলে, আকাশে ছাইয়াছে তাহার প্রতিধ্বনি!

এতদিন ধরিয়া সে করিয়াছে কি? কি ভাবনায় সে দিন কাটাইয়াছে, কি লইয়া সে জীবনের পথে ঘুরিয়া মরিয়াছে! একে একে তড়িতের প্রত্যেকটী কথা ঝলমল মণিপুঞ্জের মত অতীতের পশ্চাদভিমুখী অন্ধকার জল-তরঙ্গ হইতে স্মরণের জালে ও ছাঁকিয়া তোলে। ঘুরাইয়া এক একটীকে দেখে সে শতবার করিয়া।

হঠাৎ এক সময়ে অপরিসীম কৌতুকে মুকুল হাসিয়া উঠিয়া বলে, Oh, inscrutable inconquerable woman!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

শঙ্খের পুত্র শঙ্খ হয়

শ্রীকালীচরণ মিত্র

'শঙ্খের পুত্র শঙ্খ হয়, গেঁড়ির পুত্র গেঁড়ি।' অভিজ্ঞতা ছানিয়া জাহির করিল কে এই প্রবাদ বচন আদিতে, সত্যের গণ্ডী দিয়া রাখিল কোন্ মান্ধাতার আমলে চৌবন্দী করিয়া?

পহেলা ও শেষ কথা শুধুই কি ঐ—'বাপকো বেটা' (Like father like son); নিজস্ব বলিয়া দাবির তাল ঠুকিবার কিছুই কি নাই মানুষের, নাই অপর কিছুরই কোন মৌরসীপাট্টা দেহগঠনে ও স্বভাবের প্রবর্ত্তনে?

বহু বৈজ্ঞানিকের মতে নিশ্চয়ই আছে, দেহ ও মনের কাঠামোতে পাঁচটা মাল মশলার মধ্যে একটা পৈতৃক ধারা, হউক না কেন তাহা মাটি বা খড়, খড়ি-দড়ি, রং-রাংতা। তাঁহারা বলেন, মানুষ সঙ্গে লইয়া আসে কতক

নিজস্ব ধারা ভ্রূণের ছাঁচে, ভূমিষ্ঠ হইলে পরে পরে শরীরে ছাপ লাগে খাদ্য ও জলবায়ু প্রভৃতির, প্রকৃতিতে ছোপ পড়ে শিক্ষা দীক্ষা আবেষ্টনী ইত্যাদির।

তবেত টিকিয়া থাকা দায় নিশ্চয়ই শঙ্খ ও গেঁড়ির পুত্রদের! 'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?'—ডাক ছাড়ে যদি তাহারা, আশ্বাস দিবে কে? প্রশ্ন করে যদি—'তবে কি আম গাছে জাম ফলিবে, শেয়াকুলে পদ্ম?'—উত্তর কোথায়!

মাভৈঃ! আসন টলার শঙ্কা আর নাই শিরোনামার বচনের! কায়েমী হইয়াই বা যায় রাজতক্ত শঙ্খ ও গেঁড়ি নন্দনের—ছাতাধরা চালচিত্রে টাটকা রংয়ের ফলনে! তাহার ফিরিস্তি পরে।

সাবেকী কথা এই, উদ্ভিদে যেমন মানুষেও তাই, ভালমন্দ সু কু দোষগুণ বংশপরম্পরায় বর্ত্তে, দৈহিক আকৃতি অবয়বের বৈচিত্র্য—শ্রী ও শ্রীহীনতা বজায় থাকে পুরুষানুক্রমে। কূলোর মতো কাণ, টেকো মাথা, কোটরগত চক্ষু, বেগুণ বা সুপারী গাছের আড়া চৌদ্দ পুরুষে সমানভাবে দেখা যায়, চুরি বাটপাড়ি জাল জালিয়াতি খুনজখম বদমেজাজও তেমনই। আবার সুন্দর দেহসৌষ্ঠব, মিষ্টস্বভাব, সারাজীবন ধর্ম্ম বা বিদ্যার অনুশীলন, পরোপকার—পরায়ণতা, এই সকল বিশিষ্টতাও ঐ ভাবে ধরা দেয়। এই মতবাদের শিকড় চালনা অকারণ নয়—যেহেতু সাধারণের উক্ত দোষগুণ, বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন আবহমান কাল হইতে। বিচিত্র কি, তাঁহারা অসঙ্কোচে প্রচার করেন—এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য নয় কি যে, নিজস্ব বলিয়া একটা কাণা কড়িও নাই পুঁজি সম্পত্তির, ষোল আনা বজায় করিয়া চলিতে হইবে তাহাকে বংশেরই ধারা, সেই সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে শিক্ষা দীক্ষা আবেষ্টনীর প্রভাব মূল্যহীন বলিলেও চলে।

এই সনাতন সংস্কারের পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই এক বিখ্যাত পণ্ডিত। উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ বলিয়া অশেষ প্রসিদ্ধি অধ্যাপক রুগল্‌স্ গেট্‌সের; বহু সারগর্ভ পুস্তক রচনা হেতু বিশেষজ্ঞগণের নমস্য ইনি। গত চারি বৎসর অক্লান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন 'প্রিমরোজ' ফুলের। গাছগুলি সংগৃহীত হয় সুদূর দেশদেশান্তরে—পর্ব্বতের তুঙ্গস্থলেও। রোপিত হয় খাস বিলাতের 'রিজেন্টস্ পার্কে'—'কুইন মেরী' উদ্যানের ঝোপ-ঝাপের পার্শ্বে, সাধারণের অলক্ষিতে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণের ফলে সাহেব নির্ণয় করেন যে, জলবায়ু প্রভৃতি স্বাভাবিক আবেষ্টনী হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়া অনুরূপ কৃত্রিম অবস্থায় স্থাপিত হইলেও পত্রপুষ্পাদির কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। পৈত্রিক ধারাই ইহার মূলীভূত কারণ —সাহেবের চূড়ান্ত মীমাংসা এই।

উদ্ভিদের এই ধারা দৃষ্টে সাহেব নৃতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। বহু গবেষণার ফলে সাব্যস্ত করেন যে, জীবাণুকোষের ভিতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেগবান 'ক্রমোসোম' (Chromosomes) নামক যে অণুগুলি বিদ্যমান তাহাতেই প্রাণীর আসল বৈশিষ্ট্য সূচীত ও আবদ্ধ। 'প্রিমরোজ' ফুলে ইহার সংখ্যা ১৪টি, মানুষ ৪৮টি। আবহাওয়া, মৃত্তিকা ও রসগ্রহণ দ্বারা উহার ক্রিয়া প্রতিহত হয় না, অথচ ইহা হইতেই গাছগুলির গঠন, দৈর্ঘ্য, বর্ণ প্রভৃতি নিয়মিত হয়। তবে ১৪টির স্থলে একটি অণুও বেশী থাকিলে, ফল—ফুলাদির তারতম্য সামান্য ঘটিতে পারে, কিন্তু অপর কোন কারণেই তাহা সম্ভব নয়।

সাহেব বলেন, ৪৮টির অতিরিক্ত একটীও 'ক্রমোসোম' বেশী আছে এমন কোন মানবের পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে 'ক্রমোসোমের' বিশিষ্টতা হেতুই বৃদ্ধা পিতামহীর বাঁকা নাসিকা অথবা অতিবৃদ্ধ পিতামহের রুক্ষ প্রকৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পাইয়া থাকি।

সাহেব বলিতেছেন—'সু ও কু গুণ ও অগুণ একই বংশে শত শত ও সহস্র সহস্র বৎসর যে চলিয়া আসে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ। রুমানিয়ার স্কিপিয়ন বংশ তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসরের কথা, স্কিপিও আফ্রিকেনাসের অভ্যুদয়, তাঁহারই বংশধরদিগকে লইয়া বর্ত্তমান স্কিপিয়ন বংশ। আফ্রিকেনাসের হস্তে ছয়টী অঙ্গুলি ছিল। স্কিপিয়ন বংশের সকলেরই তাহা বরাবর

দেখা যায়।' আরও বলিতেছেন—'জনৈক চিকিৎসক একশত হাঁপানি রোগীর বংশতালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, রোগটা যে বংশানুক্রমে দেখা দেয়, বংশতালিকা হইতে তাহার নির্দ্দেশ সুব্যক্ত।'

নানা তথ্য হইতে সাহেব এই দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করিতেছে,ন যে -যেবংশের ইতিহাসে হাঁপানি পীড়ার প্রাদুর্ভাব সেই বংশের সন্ততিদিগকে রোগচিহ্ন প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই যদি প্রতিষেধক ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করা যায় ঐ নিদারুণ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা তাহাদের থাকে না। রোগ পীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ ভিন্ন কোন্ বংশের সন্তানের কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের কল্যাণ ও সাফল্যলাভ ঘটিবে তাহাও স্থির করা সহজ, সুতরাং এইরূপ নির্দ্দেশ হইতে অশেষ শুভফল প্রাপ্তি

শিশুর কোষ্ঠিবিচার হইতে যে সতর্কতা-বাণী প্রভৃতির প্রত্যাশা, বংশতালিকার ইতিহাস বিচারেও তাহা লভ্য—সাহেব পরিশেষে এই প্রকারের ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

সাহেবের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করা হয়—'তবে কি বংশধারাই সর্ব্বস্ব, শিক্ষাদীক্ষা দেশকালপাত্র প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকের কোন প্রভাবই খাটে না?' দৃঢ়কণ্ঠে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন—'এই প্রশ্ন এখন অচল, উত্তরের সময় বহুকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বংশধারাই সকল জীবন নিয়ন্ত্রিত করে—কি উদ্ভিদ, কি পশু, কি মনুষ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আবেষ্টনী শুধুই বংশ-ধারাগত সম্ভাবনায় বাধা দান করে, ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে কেবলমাত্র বংশের দোষগুণ সংক্রমণে।'

সাহেবের মীমাংসা হইতে আমাদের প্রাচীন পন্থার কথা মনে জাগে। বিবাহের পাত্রী নির্ব্বাচনে সেকালে পাত্রীর বর্ণের খাদকষা বা পিতার যৌতুক যাচাই প্রচলন ছিল না, ছিল শুধুই বংশবিচার। তবে কি তাহাই সমীচীন রীতি? পাঠক-পাঠিকার হস্তে এই প্রশ্ন সমাধানের ভার দিয়া আমরা খালাস।

যুক্তিবাদীর কাছে জটিল প্রশ্নটির মীমাংসা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গেল কিনা ইহাই এখন বিচার্য্য। প্রাচীন ধারণা এবং অধ্যাপক গেট্সের সেই ধারণার বিজ্ঞান-সম্মত সমর্থন যুক্তিবাদীর মনে কোন রেখাপাত করিল কি? অথবা অপর নানা কঠিন সমস্যা সমাধানের ন্যায় ইহাও নিষ্ফল প্রয়াসের কোঠায় পড়ল?

সাহেব ছয়টি অঙ্গুলীবিশিষ্ট আফ্রিকেনাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এমন আরও লোক দেখা যায় যাহাদের ছয়টি অঙ্গুলী অথচ তাহাদের সন্তানদের তাহা নয়, আবার এক পিতার দশ সন্তানের কেহ সাধু সন্ন্যাসী, কেহ খ্যাতনামা পণ্ডিত, কেউ হস্তীমূর্খ, কেহবা দুর্বৃত্ত পাষণ্ড! বংশধারার প্রভাব এখানে মিলে না। এই অসামঞ্জস্য অধ্যাপক গেট্সের অবশ্যই অবিদিত নাই। সন্ততির নিজস্ব কিছু সম্বল, পৈতৃক বংশধারা, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এইগুলির সমষ্টিতে মানুষের ভিতর বাহিরের গঠন,—প্রবন্ধের প্রারম্ভে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা সুযুক্তিপূর্ণ অনুমিত হয়। নূতন গবেষণার ফলে অপর সকল কারণ নস্যাৎ করিয়া শুধু বংশধারাই সর্ব্বেসর্ব্বা এবং বাকিগুলি গৌণ, বংশধারার ব্যাঘাতদানে সমর্থ মাত্র, সাহেব এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিলেন কেন? অনেকের মনে এইপ্রকার সংশয়ের উদয় সম্ভব। সংশয়ের নিরাসন ও বিশদ ব্যাখ্যা অথবা দুই মতের সমন্বয় অচিরে হইতেও পারে, হয়ত ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আমরা সেই প্রতীক্ষায় রহিলাম। শঙ্খ ও গেঁড়ির পুত্রেরাও কিছুকাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন।

এইসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গেট্স্ সাহেবের অনুরূপ আশ্বাসের বার্ত্তা আর একদল বৈজ্ঞানিক বহুদিন হইতেই শুনাইয়া আসিতেছেন। অপরাধতত্ত্ব লইয়া সারাজীবন আলোচনা করেন যে সকল মনীষী তাঁহারা এই দলভুক্ত। নানা নজির দেখাইয়া ও বহু গবেষণা করিয়া অকাট্য যুক্তি-বলে ইঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছেন যে, 'খুনে' প্রভৃতির বংশে গুরুতর অপরাধ-প্রবণতা অপরিহার্য্য ইত্যাদি। অতএব এইদিক দিয়াও প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের কিস্তিমাৎ, শঙ্খ ও গেঁড়ির আত্মজেরই পোয়া বারো।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

'মনোমুকুর'-এর কবি

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কিছুকাল থেকে, যে কারণেই হোক, ভালো কবিতা একেবারে দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এই শোচনীয় সত্য যে কোনো মাসিক পত্র খুললেই টের পাওয়া যায়। বাংলা দেশে যাঁরা ভালো কবিতা লেখেন তাঁদের কেউ কেউ কথা-সাহিত্যের আসরে নেমেছেন, আর যাঁদের রসবোধ এবং বিচারশক্তি অত্যন্ত সচেতন তাঁরা কবিতা লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এর কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এ নয়। এবং কারণ যাই হোক, 'পল্লী ব্যথার' কবি সাবিত্রীপ্রসন্নও আরও অনেকের মতোই দীর্ঘকাল অজ্ঞাত-বাস করছিলেন। রসিক সমাজ বহুকাল তার সরস কবিতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বহু কাল পরে বাণীলক্ষ্মীর মন্দিরে আবার তাঁর আবির্ভাব হ'ল 'মনোমুকুর' নিয়ে। একেবারে নতুন রূপ, নতুন সুর, নতুন রস। মনে হ'ল মধ্যের কয়েক বৎসর আমাদের বঞ্চিত ক'রে তিনি ভালোই ক'রেছেন। নইলে হয়তো তাঁর বাঁশীতে এই নতুন সুর ধ্বনিত হ'ত না। আমরা অনেক বড় কবির ক্ষেত্রেও দেখেছি, দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে কবিতা লেখার ফলে একটা বিশেষ সুর তাঁদের পেয়ে বসে। তাঁরা ভুল ক'রে ভাবেন তাঁদের অনুরাগী পাঠকের মনে এই বিশেষ সুরটি চিরকাল ধরে আনন্দ দেবে, এবং এটি বাদ দিলে তাঁদের কবিতার বিশেষত্বই নষ্ট হবে। ফলে কবিতার আনন্দরূপটি চিত্তলোক থেকে যায় মুছে। কবি তখন হাঁই তুলতে তুলতে ক্লান্তভাবে নিজের পূর্ব্বতন ভালো কবিতার অক্ষম অনুকরণ ক'রে চলেন। অবশ্য যাঁরা কোনো একটি বিশেষ কবির কাছে চিরকাল ধ'রে একটি বিশেষ সুরই প্রত্যাশা করেন, এবং সেই সুর খুঁজে না পেলে হতাশ হন, এমন পাঠকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে মরিস হিউলেটের মর্ম্মান্তিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—"What am I to do? It imputes to me incredible stupidity, itself is incredibly stupid —and what can one do with stupidity except foam at the mouth?"

মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে সকল দেশের কবিতায় পার্থিব ব্যর্থতা, সৃষ্টির নিস্ফলতা এবং সর্ব্বদিকের অনিশ্চয়তার একটা সুর এসেছে। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতা সে পর্য্যায়ে পড়ে না। 'মনোমুকুরের' কবিতায় আছে সুমধুর মাদকতা এবং সকরুণ স্নিগ্ধতা। তিনি গেয়েছেন ঝরা ফুলের গান,—যে রজনীগন্ধা সন্ধ্যায় ফোটে, প্রভাতে ঝ'রে যায়, তারই গান। কিন্তু সেই ঝ'রে যাওয়াতেই গান শেষ করেন নি। তার পরেও বলেছেন :

> মিলনমালার ফুল ঝরে যায়
>
> নব-মিলনের লীলা খেলায়,
>
> রবিকরসম্পাতে !

বলেছেন :

> যোজনগন্ধার মোহে রজনীগন্ধার বনে বনে
>
> দলিত ফুলের ব্যথা গুমুরিছে দখিনা পবনে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন স্বপ্নের কবি। সেখানে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিষ্ঠুর কদর্য্যতার স্থান নেই। বারে বারে তার মনোমুকুরে যে বিচিত্ররূপিণীর ছায়া প'ড়েছে, বারে বারে যে ছায়া গেছে মুছে আঁখিজলে, তারই ছায়া সংগোপনে তিনি ধরতে চেয়েছেন। আর পাখীর মতো কলকণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন :

> আলোকে আঁধারে ছায়াছবি জাগে দূরে তরু-বীথিকায়,
>
> মধু যামিনীর অলস স্বপ্নে মন ফিরে যেতে চায়,
>
> চরণ-সঞ্চরণে
>
> ফুলসম্ভারে খুসীর খেয়াল জাগে মাধুরীর বনে

তাঁর আঁখিজলও এই খুসীর খেয়াল। কারণ বিরহ-বিদায়-বেদনায় এ আশা সব সময় তাঁর মনে আছে যে, নব ফাল্গুনে স্বপ্ন-সায়র তীরে আবার দেখা হবে। ভ্রমর-গুঞ্জরণে আবার ফুটবে লবঙ্গলতা। ভরা জ্যোৎস্নায় অঞ্জনা নদীর পারে পথের একটি পাশে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠিতা বালা মৃদু মৃদু হাসবে। চন্দ্রাবতীও তাই অঘোরে ঘুমায়। 'মীনাঙ্কিত সুবর্ণ আধারে' নব মালতীর মালা গেছে শুকিয়ে, বিশুষ্ক চন্দন-লেখা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা গেল ব্যর্থ,—'প্রিয়তম আসিল না'। প্রিয় প্রতীক্ষায় জেগে চন্দ্রাবতী।

মনোমুকুর—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কখন ঘুমায়ে গেছে, বাহুলতা লতায় শিথানে,
স্বপ্নাবেশে শিহরণ তনুদেহে উরস-অঞ্চলে।
কিন্তু শুধু নিদ্রাই এলনা। নিদ্রাঘোরে
সুন্দর আসিল সাথে, প্রিয়ারে বাঁধিল আলিঙ্গনে,
সে সুখ-ভুঞ্জনে সখী চন্দ্রাবতী অঘোরে ঘুমায়।

কিম্বা মনে করুন স্বপ্নবাসবী। ফাল্গুন-রাত্রির মদনোৎসব তার ব্যর্থ হতে চলেছে। 'যৌবন-মধু-পুষ্প-আসব' যার মুখে তুলে ধরেছিল সেও নিষ্ঠুর হ'ল। কিন্তু এত বড় ব্যথারও কবির কল্পনায় তার মুখ-কমল অশ্রুতে মলিন হ'ল না। স্বপ্নবাসবী অশ্রুর সাগরে স্নান ক'রে উঠল,—প্রভাত রবির মতো তার
'রক্তিম আঁখি সুন্দরতর'! বললে,
এ যে সখী মোর স্বপন-বিলাস
বিরহ বেদনা নহে!
তাই মৃত্যুও তার কাছে এল বরবেশে। রাঙা করবী কুসুম পরলে অলকে। তারপরে

আসব-পাত্রে স্বপ্নবাসবী
পান করে হলাহল,
মৃত্যু-মাধুরী-মহিমায় থির
উৎসব-কোলাহল।

'মনোমুকুরের' আগাগোড়া এমনি সুন্দর স্বপ্নের বিলাস। তাহা নদীজল-কলরোলের মতো সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে ব'য়ে চ'লেছে লীলায়িত ভঙ্গিতে। একেবারে মানব মনের বিরহ-মিলনের তটদেশে তোলে ঝঙ্কার। কবি সাবিত্রী-প্রসন্নের কল্পনায় বিচিত্র বর্ণচ্ছটা এই নিরাভরণ, রিক্ত কবিতার যুগে মনকে মুগ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে, কোমল স্বপ্নে রঙীন করে। তাঁর কবিতা মরুভূমির মতো উদার, অবাধ এবং দিগন্তবিস্তৃত নয়,—ছায়াঘন কুঞ্জবনের মতো নিভৃত, তাতে মাত্র দুটি অন্তরঙ্গ প্রাণীর ঠাঁই আছে। তাতে তাই দম্ভের ঝড় নেই, আছে বসন্ত-পবনের দাক্ষিণ্য। বাংলার কাব্য সাহিত্যে তাঁর কবিতা অন্তত অনেক কালের জন্যে অক্ষয় হয়ে রইল।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

যূঁই

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ওগো যূঁই !

পাখীর বুকের চেয়ে নরম,

শীতের শান্ত নদীতে

ভোরের আলোর চেয়েও রূপোলি

তোমার শিশিরসিক্ত রূপ।

ওই যে শ্বেত প্রজাপতি

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়

তোমার কোমল পাপ্ড়িগুলি,—

তারি মতো সুখী তুমি

লঘু, মৃদু, চঞ্চল।

দক্ষিণের জান্লা খুলে বসে আছি।

দূর রাস্তার ওপার থেকে ভেসে আসে

তোমার সুবাস-জাগানো

ঈষৎ-আকুল বাতাস।

সে হাওয়ায় নেই

চৈতী ঝড়ের আসন্ন উন্মাদনা,

আছে উন্মুখ শিহরণ।

ওগো যূঁই !

বড়ো দ্রুত তোমার বিকাশ,

ক্ষণিক তোমার খেলা······

স্বল্প সময়ে মেলো আপনাকে,

একটুতেই যাও ফুরিয়ে—

ফুরিয়ে যায় উৎসাহ

অধীর রূপান্বেষীর।

এর চেয়ে ভালো বেলফুল—

কঠিন কুঁড়ি ফোটে যেদিন,

ছড়ায় আকাশে বাতাসে

তার তীব্র মধুগন্ধ,

একটি পরম ক্ষণে দেয় ঢেলে

চিরসঞ্চিত আবেগ।

তবু কাজ নেই বিচার-তুলনায়,

ভালোবাসি তোমাকেই।

আমার মনের আঘাত জম্লো যে প্রচুর !

যৌবনের শেষ জোয়ার গেলো নেমে—

বন্ধুত্ব আর প্রেমের চড়ায়

জাগ্লো ধীরে উষর বালু।

হায়, এমন কোনো ঈশ্বর নেই,

যিনি রূপ দেন আমাকে

একটি যূঁই-গাছের !

পেতাম পায়ের নীচে স্নেহক্ষরা বসুন্ধরা,

যেখানে শিকড় করতো সঞ্চয়

তার সঞ্জীবনী রস······

প্রতি বসন্তে হাজার হাজার

শুভ্র নম্র প্রাণ

ফুট্তো আমার সর্ব্বাঙ্গে······

চল্তি হাওয়া এনে দিতো

সোহাগ-সঞ্চালন,

মাথা নোয়াতো তবু ঝরতো না······

আর আমার ফুটন্ত ফুলের

ললিত সরসতা, সরল পেলবতা

চমক জাগাতো মানুষের মনে

বারে বারেই—

থাম্তো, দেখ্তো, ভালোবাস্তো তারা।

ওগো যূঁই !

কোন্ বিধাতা দিলেন তোমাকে এতো সব

আর আমাকে কিছুই না !

প্রজাপতির দল করবে শুধুই মাধুকরী ?

বিলাবে সুরভি তুমি পাত্রে-অপাত্রে ?

ভয় নেই একটু-ও ?

দাও না শিখিয়ে আমায়

তোমার সহজ মাদকতা,

আর নিপুণ সঙ্কোচন !

দেবে—দেবে তোমার চঞ্চল প্রাণ-কৌতুক,

ওই অনাতপ শুভ্র হাসি ?

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকম্। শ্রীরায় রামানন্দ প্রণীত। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ৩৮ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনির্ম্মলকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

জগন্নাথ বল্লভ নাটক বৈষ্ণব সাহিত্যের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত নাটকখানির রচয়িতা শ্রীরায় রামানন্দ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে প্রতীত হয় যে স্বয়ং মহাপ্রভু রামানন্দ সহ এই অপূর্ব্ব রসগ্রন্থের রসাস্বাদন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পায় আনন্দ।"

জ্যোতিশচন্দ্র রায় মহাশয় সংস্কৃত মূল সহ উহার সুললিত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া রসপিপাসু পাঠকগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত দর্শনাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"ডাক্তার শ্রীমজ্জ্যোতিশ্চন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গভাষানুবাদ চ্ছলে যে গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। ডাক্তার বাবুর ভাবসিদ্ধ কবিত্ব ও রসানুভবের পারিপাট্য বড়ই সুমধুর। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর রসশাস্ত্রের সমালোচনা ও প্রচ্ছন্ন ভাবুকতা বৈষ্ণবকুলের নিকট যে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" আমরাও আশা করি এই গ্রন্থখানি পাঠকগণের নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

ঘোষ

বোধিচর্য্যাবতার।—শান্তিদেব কৃত। প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্-এ, বি-এল সম্পাদিত এবং শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্-এ, কর্ত্তৃক ৩২ নং বিডন রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

শান্তিদেব শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্র দেশের রাজকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন। গুরুদেব মঞ্জুশ্রীর আদেশে তিনি সাধনামগ্ন হন এবং অবশেষে নেপালে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের নিকটস্থ এক গুহায় সিদ্ধিলাভ করেন। নালন্দা মহাবিহারে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। ইনি বৌদ্ধদিগের মহাযান সম্প্রদায়ের ছয়জন প্রধান আচার্য্যের অন্যতম ছিলেন। সম্পাদক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, "তিনি সর্ব্বদাই পারমিতা সাধনে অতিবাহিত করিতেন এবং সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে সাধনার ক্রম অনুযায়ী উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন এবং নিজের অনুভূত ভাব সকলও তাহাতে সন্নিবেশিত করিতেন। এইরূপে তাঁহার 'সূত্র সমুচ্চয়' গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তাহার পরে তিনি সেই 'সূত্র সমুচ্চয়' গ্রন্থখানি অতি সুললিত পদ্যে সংক্ষেপে রচনা করেন। তাহারই নাম 'বোধিচর্য্যাবতার।' এক একটি পরিচ্ছেদে সাধকের মনোবৃত্তি কিরূপে কতরূপে প্রলোভিত করে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে কিরূপ দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও ইষ্ট মহাপুরুষের উপর নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ আবশ্যক তাহা অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।"

সম্পাদক মহাশয় এই বহুমূল্য গ্রন্থখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে এবং আমরা উহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

শ্রীকেশব সমাগম—মূল্য বারো আনা মাত্র।
শ্রীকেশব কাহিনী—মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।
শ্রীমতিলাল দাশ বি-এ প্রণীত এবং মঙ্গলকুটীর, বিধান পল্লী, রমনা, ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

সমালোচ্য গ্রন্থ দুইখানিকে একই গ্রন্থের দুইটি ভাগ বলা যাইতে পারে এবং নববিধান জুবিলী উপলক্ষে দুইটি ভাগই এক সঙ্গে গ্রন্থকারের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। প্রথম ভাগে কেশব-জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, এবং দ্বিতীয় ভাগে দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।"

কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের একজন ক্ষণজন্মা সুসন্তান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। এই সময়ে তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ একজন ভক্ত এই গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত করিয়া বিস্মৃতি-প্রবণ বাঙ্গালীকে তাঁহার বাণীগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং তাঁহার আত্মিক জীবনের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ও সহচর ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজী ভাষায়, এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়গণ বাঙ্গালাভাষায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন চরিত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে লেখক ব্রহ্মানন্দের জীবন-কাহিনী ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া প্রশংসনীয় নিষ্ঠাসহকারে তৎসম্বন্ধীয় নানা তথ্য ও বাণী সম্বলিত করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় 'কুচবিহার বিবাহে ঈশ্বরাদেশ ছিল কিনা' প্রভৃতি বিষয় এতদিন পরে পুনরালোচিত না করিলে ভাল হইত এবং শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কেশব-বিরোধীদলের উল্লেখ না করিলে গ্রন্থের গাম্ভীর্য্যও বৃদ্ধি পাইত, কেশবচন্দ্রের গৌরবজ্যোতিও বিন্দুমাত্র ম্লান হইত না।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মহাভারতের রহস্য। প্রথম ভাগ। অবসর প্রাপ্ত লেফটেনেন্ট কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুরুলিয়া আনন্দমঠ হইতে শ্রীভাস্বরানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

মহাভারত কল্পনাপ্রসূত কাব্য না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস?

শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ বলিবেন মহাভারতোক্ত সকল ঘটনাই সত্য। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলিবেন সকল ঘটনা সত্য হওয়া অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, কিন্তু কাল্পনিক হইলেও যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া, তখন উহা সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? কেহ বলিবেন যে কল্পনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে ক্ষতি আছে তাহা স্বীকার করি কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত সেখানে উপায়ান্তর নাই। আবার কেহ বলিবেন পুরাণের আখ্যানগুলি প্রকৃতই হউক বা কাল্পনিক হউক, সদুদ্দেশে রচিত। সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রী পুরুষ চরিত্রের আদর্শ। উহার আলোচনায় যে ফল হয়, কোনও শিক্ষা হইতে সেইরূপ ফল লাভ সম্ভব নহে।

সুপণ্ডিত ও সত্যনিষ্ঠ গ্রন্থকার বলেন যে মিথ্যা গল্পগুলিকে সত্য বলিয়া অজ্ঞ সাধারণকে বুঝাইয়া শিক্ষিতগণ অনিষ্ট করিতেছেন। তাঁহারা নিজে উপনিষৎ পড়েন, ভগবদ্গীতা পড়েন, দর্শন পড়েন, ভাগবৎ পড়েন, পুরাণের গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন আর জনসাধারণকে কতকগুলি গাঁজাখোরি গল্প সত্য বলিয়া শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য সত্য ধর্ম্ম আর নাই, কিন্তু পুরাণগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা আলোচনা বা প্রচার করি না। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে মহাভারতের কতকগুলি রহস্যের এরূপ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সেগুলি পুরাণের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত পণ্ডিতগণের চিন্তার যথেষ্ট উপাদান যোগাইবে। আমরা সাগ্রহ সহকারে গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

পুরঞ্জন। (মহাকবি শেলির অনুসরণে)। 'ভিখারিণী' প্রণেতা শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ বি-এল প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

জগদ্বিখ্যাত কবি শেলীর 'প্রমিথিয়স আনবাউণ্ড' ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়। শেলীর কাব্যের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ও মাধুর্য্য অনুবাদে রক্ষা করা অসম্ভব, এমন কি তাহার ক্ষীণতম আভাস দেওয়াও সুকঠিন। এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করত ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকগণকে সেই অনবদ্য কাব্যের রসাস্বাদনের সুযোগ দিবার চেষ্টা করিয়া নলিনী বাবু তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্থানে স্থানে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া কাব্যটিকে দেশীয় পরিচ্ছদ প্রদান করত তিনি উহাকে সুখপাঠ্য করিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গ হইতে 'Life of Life! thy lips enkindle' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদগুলির অনুবাদটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকগণকে গ্রন্থকারের রচনার পরিচয় দিতেছি :—

"জীবের জীবন ওগো! অধরে তোমার
স্ফুরিছে কি ভালবাসা নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
শূন্যে যবে মিশে যায় হাসি ছটা তার
প্রকৃতি রাঙিয়া উঠে তাহার বাতাসে।
কি প্রেম লুকান ওগো আঁখিতে তোমার
নীলকৃষ্ণ তারা মাঝে রেখেছ লুকায়ে
কি যে দৃষ্টি, বারেক যে চাহে পানে তার
মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় ফেলে চেতনা হারায়ে।

'বরাঙ্গের বিভা, ওগো আলোকনন্দিনী!
হতেছে বাহির তব বসন ফুটিয়া,
রবির কিরণ রেখা বিশ্ববিমোহিনী
মেঘ ভাঙ্গি আসে যথা প্রভাতে ছুটিয়া।
আবরি স্বর্গের ছবি পশ্চাতে তাহার
সে আসে যেমন, যথা কর লো গমন
অই দিব্য শুভ্র পূত অঞ্চল তোমার
আচরিয়া রাখে তব ও রূপ তেমন।

"অনিন্দ্যসুন্দরী কত আছে এ ধরায়,
তুলনা তোমার সনে হয় না কাহার;
কোমল মধুর মৃদু স্বর সুষমায়
লোক চক্ষু হতে যেন বদন তোমার
রহিয়াছে ঢাকা। ওই লাবণ্য-ভাস্বর
—গলিত কাঞ্চন সম—হেরি প্রাণ মন
মুগ্ধ, কিন্তু কেহ নাহি হেরে কলেবর,
কাছে থাক তবু কভু হেরে না নয়ন'।

"ধরার প্রদীপ! যেথা কর লো গমন,
নিষ্প্রভ মূরতি উঠে আলোকে ভরিয়া,
রহে সেথা তব যত আদরের জন
আত্মারূপে শূন্যে ভ্রমে উড়িয়া উড়িয়া।
শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবশেষে মস্তক ঘূর্ণিত,
—ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবে আমি গো যেমন—
বিভ্রান্ত হইয়া হয় ভূমি বিলুণ্ঠিত,
অন্তর দুঃখিত তবু না হয় কখন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শেলীর কবিতার মাধুর্য্য অনুবাদে প্রকাশ করা যায় না। তবে, যাঁহারা মূলের রসাস্বাদন করিতে অক্ষম তাঁহাদিগের পক্ষে 'দুধের সাধ ঘোলে মিটান' ব্যতীত গত্যন্তর নাই এবং গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিশ্চয়ই সংগ্রহযোগ্য।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

পড়ো জমি—মৌলবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন। দু'খণ্ড, মূল্য আড়াই টাকা। মোহাম্মদী এজেন্সী, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

রাশিয়া আজকাল সমগ্র জগতের কৌতূহল মিশ্রিত ভীতির কারণ হয়েছে। কুম্ভকর্ণের মত ওদেশ জেগে উঠেছে; আসুরিক বলে তার জাগরণের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। রাশিয়ার সঠিক খবর আমরা পাইনে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" ওদেশ সম্বন্ধে অসামান্য আলোকপাত করেছে। হিন্দাসের 'উৎখাৎ মানবতা' (Humanity Uprooted by Hindus) নামক বইয়ে কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। রাশিয়ার রক্ত বিপ্লবের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যাবে আমার মনে হয় তার সাহিত্য এবং শিল্পে।

গর্কীর 'মা', ডস্টয়এভস্কীর 'পাপ ও শাস্তি', টলষ্টয়ের 'আনা করেনিনা' প্রভৃতি বইতে রাশিয়ার মনের কথা ধরা পড়েছে। টুর্গেনিভের Virgin Soilএ—পড়ো জমিতে রাশিয়ার নব-জাগরণের পূর্ব্বাভাষের বিচিত্র ইতিহাস উপন্যাসাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব ভার্জ্জিন সয়েল অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করছেন; তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছ এবং রসাল হইয়াছে, অনুবাদ বলে আদৌ মনে হয় না। ভার্জ্জিন সয়েলকে তিনি 'পড়ো জমি' বলেছেন; পতিত জমি বল্লে ঠিক হ'ত বা 'অচষা ভুমি'। মাঝে মাঝে দু একটী বানান ভুল, এবং প্রাদেশিক উচ্চারণ লিপিবদ্ধ হয়েছে যথা "টোলের উপর" (পৃঃ ৫৪, টুল ?) "নুংরামীর জন্য" (পৃঃ ১৮৭, নোংরামী ?), "বুঝুতে" (পৃ ১০৮, বোঝাবে ?)। বইয়ের দাম একটু বেশী হয়েছে বলে মনে হয়।

জরীন কলম

আয়না—আবুল মনসুর আহ্‌মদ, বি, এল। মিলন বুক এজেন্সী, ময়মনসিংহ।

আবুল মনসুর আহমদ মুসলমান সংবাদপত্র মহলে সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বহুকাল সাপ্তাহিক 'দি মুসললান' এবং 'খাদেম' নামক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক বিভাগে কাজ করতেন। দেশের জন্য তিনি দুঃখ এবং দরদ অনুভব করেন; এই মমত্ব-বোধ হইতেই এই 'আয়না'র সৃষ্টি। গ্রন্থখানির নামকরণে লেখক মহাশয় মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন,—নামটী অতিশয় সহজ অথচ কাব্যোপযোগী। আয়নায় সাতটী গল্পের নক্সা ধরা পড়েছে। লেখকের দেখবার ক্ষমতা আছে এবং কুশাগ্রবুদ্ধি দিয়ে শেষ দেখাকে গঠন করে তুলেছেন এই নক্সাজগতে। লেখক যুবক এবং উদার হিন্দু মুসলমানের বিভেদ তিনি দেখিয়েছেন, অথচ অশিল্পীজনোচিত sentimentalityর প্রশ্রয় দেন নি। এ আয়নায় প্রধানতঃ মুসলমানসমাজের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে, তবে প্রয়োজন ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের ছবি আঁকতে কুণ্ঠা ও বিদ্বেষের পরিচয় দেন নি। এজন্য তাঁকে অন্তর থেকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

গল্পগুলোর নাম দেখলে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হবে,—'হুজুর কেবলা' 'গো দেওতা ক দেশ' 'নায়েবে নবী, 'লীডারে বক্তব্য, 'মুজাহেদীন', 'বিদ্রোহীসঙ্ঘ', এবং 'ধর্ম্মরাজ্য'। মুসলমান সমাজকে নীরোগ কর্ম্মঠ এবং উন্নতশীল করে তুলবার জন্য লেখক এই বিদ্রূপাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছেন। ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে মুসলমান সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি এবং ভণ্ডামী কুৎসিত আকার ধারণ করেছে গুরুপদে, তথাকথিত সূচী সাধনায়! আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতার নামে অনেক কিছু চলেছে। ভবিষ্যৎ আত্মার মুক্তির আশায় আমরা নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নির্বস্ত্র মুসলমান সমাজের জড়পিণ্ড কী অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা এবং উৎসাহ দেখতে পাই, কিন্তু ফল গজভুক্ত কপিত্থবৎ। কুশলী ও বিলাসী জীবনের আধ্যাত্মিকতার অক্টোপাশে পড়ে দরিদ্র মুসলমান সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বাচাল এবং অশিক্ষিত সমাজনেতার চালবাজীতে পড়ে বিপথগামী এনং বিপদগ্রস্ত হচ্ছে; এই সকল বিষয় অবলম্বন করেই নিষ্ঠুরভাবে লেখক বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করেছেন। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি সমাজের মর্ম্মস্থান দিয়ে এই বিদ্রূপবাণ পড়ুক ভেঙ্গে, সেখান থেকে নবজীবন দাত্রী গঙ্গার অমৃতধারা বহন করে আনুক।

ছাপা বাঁধাই ভাল, ভেতরের কার্টুনচিত্রগুলো প্রশংসনীয়। গ্রন্থের ভাষায় পারস্য শব্দ প্রচুর।

জরীন কলম

লক্ষ্ণৌয়ে কয়েকদিন

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চল, অনিল আর তা'র বোন সুগৌরী। বহুদিন পরে এদের দেখা ট্রেইনের ইণ্টারের কামরায়। ট্রেইনের সশব্দ গতি আর দুই বন্ধুর অতীত দিনের টুক্‌রো গল্পের মধ্যে সুগৌরী হঠাৎ ব'লে উঠলো—'লক্ষ্ণৌ কেমন লাগলো চঞ্চলদা!' অন্যের কাছে হয়ত এই প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপেই হত, কিন্তু চঞ্চল বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। সে

প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করে তা'র যৌবন, প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি করে তা'র মধ্যকার যাযাবর পুরুষটিকে। তা'র কাজের মধ্যে সে দেখে প্রাণ আর সংসারের ভেতর প্রতিষ্ঠিত সত্য। তা'র সজীব ভাষায় সে সুগৌরীকে বললে—'কী দেখলাম জান গৌরী! দেখলাম ইতিহাসের পিছনে সত্য অতীত। তোমরা সবাই ইতিহাস পড়েছ, অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদাৎখাঁ ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক অযোধ্যার সুবেদার পদে নিযুক্ত হ'য়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাসভবন স্থাপন করেন। তোমরা শুধু এই মাত্রই জান, কিন্তু আমি দেখলাম এর অতীত ইতিহাস—যা' তোমাদের ইতিহাসে নেই। তুমি হয়ত হাসবে—যদি আমি বলি, লক্ষ্ণৌ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ। তখন এর নাম ছিল লক্ষ্মণপুর। তোমার হয়ত হাসি আসছে, কারণ হিন্দুই হিন্দুর অতীত গৌরবকাহিনী অবিশ্বাস ক'রা গৌরবের বিষয় মনে করে। কিন্তু আমার কথার সত্যাসত্য তুমি "মচ্ছি ভবন" থেকেও পাবে। এখন যেখানে "মচ্ছি ভবন" অবস্থিত—সেইখানেই ছিল লক্ষ্মণপুরের অবস্থিতি। আর লক্ষ্ণৌ নাম যে লক্ষ্মণপুর হ'তে উৎপন্ন তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।

তারপর দেখলাম মোগল সভ্যতা। মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পিদিগের বিস্ময়কর নৈপুণ্য। তাঁ'দেরই তৈরী 'ইমাম-বাড়া' সুবৃহৎ ও গৌরবময়। আর তা'র মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত আসাফউদ্দৌলা। তাঁর সমাধির পাশে একটি আধার স্থাপনা করা হয়েছে—আশা দর্শকগণ কৃপা ক'রে যা' দেবে—তা' দিয়ে হবে সমাধির সংস্কার আর আলোকদানের ব্যবস্থা। জান গৌরী, তখন আমার মনে কি হলো,—যা'র শৌর্য্যে লক্ষ্ণৌ গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, যা'র তর্জ্জনী হেলনে রাজকোষাগার নিঃশেষিত হ'ত তা'র সমাধির পাশে বাতি দেবার জন্য একটা পয়সাও সংগ্রহ করতে হয়,—চমৎকার না?

তারপর দেখলাম লক্ষ্ণৌয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ "ফরহৎ বক্স"। 'ফরহৎ বক্সের' অপূর্ব্ব অভ্যর্থনাগার আর তা'র বিভিন্ন মহল আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। পুলকে আমার মন পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন সঙ্কুচিত ক'রে দিল আমার মন, প্রতি দেয়ালটি অশ্রুতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে জানিয়ে দিল আমরা, সাদাৎ আলির কীর্ত্তি যে বিক্রী করেছিল তা'র পিতৃপিতামহের সম্পত্তি পরশক্তির জন্য জানিয়ে দিল—আমরা সেই জীবের সৃষ্টি, যে বিসর্জ্জন দিয়েছিল নিজ মনুষ্যত্ব, দেশের স্বাধীনতা, জাতির শ্রে... অধিকার—তারপর আর কিছুই দেখা যায়নি! সেখান থেকে ফি'রে এলাম নিজ বাসায়, মাথার ভিতর কে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুক্ষণের ভিতর সুস্থ হব কিন্তু সেটা ক্রমেই বে'ড়ে চলতে লাগলো। অসহনীয় যাতনা! অব্যক্ত বেদনা! কি করি কিছুই ঠিক করতে পার্চ্ছি না, শেষে এক বন্ধুর উপদেশ মত রচির একটি সারিডন ট্যাবলেট সেবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল হল। আমি জীবনে একথা কখনও ভুলতে পারবো না 'সারিডন ট্যাবলেট' অসময়ে আমার উপকারে লেগেছে।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর সুগৌরী ধীরে ধীরে বললে—'তোমার অসমাপ্ত কাহিনীর শেষ করছি চঞ্চলদা। গাজীউদ্দীন হায়দার 'লক্ষ্ণৌ'এ প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং ওয়াজিদ আলি সা পঞ্চম বা শেষ রাজা। লক্ষ্ণৌর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় কৈশর বাগ' ওয়াজিদ আলি সা'র তৈরী। জান চঞ্চলদা কৈসরবাগ কি দিয়ে তৈরী? লোকে বলে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে, কিন্তু আমি দেখেছি কি দিয়ে জানো? আর্ত্তের হৃদয় শোণিত দিয়ে আর নির্য্যাতিত বেগমদের অশ্রুর বন্যায়। ওয়াজিদ আলি সা'র ছিল ৩৬০ বেগম। তাদের জন্য তিনি ৩৬০ মহল তৈরী করেন সত্য, কিন্তু সে মহলগুলির বাতাস পর্য্যন্ত অত্যাচারিত, অবহেলিত, পীড়িত, মথিত অভাগিনীদের দুঃখে জড় হ'য়ে গেছে, তাই তা'র মধ্যে গিয়ে আমরা এখনও পাই যেন কা'র শবশীতল স্পর্শ, অনুভব করি অশ্রুময় দীর্ঘশ্বাস আর নীরব অভিশাপ—যা' চিরন্তনী নারী অত্যাচারিত হৃদয়হীন পুরুষদের দিয়েছে ও দিবে

সুগৌরীর কথা শেষ হবার আগেই বাইরের একটী স্বর জানিয়ে দিলে "জৌনপুর হ্যায়"।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

খেলা ধূলা

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী

ফুটবল ঃ—

বৈশাখের তপ্ত রোদে ও শুকনো মাঠে প্রথম ডিভিসন লীগ আরম্ভ হল। এবার লীগে দুটী নবাগত মিলিটারী টীম ক্যামেরনিয়ানস্ ও কে, ও, এস, বি এবং গতবছরের বি, ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর খেলছে।

কালীঘাট বনাম মহোমেডান স্পোর্টিং বিজয়ী মহোমেডান স্পোর্টিং লীগের প্রথম হাফে খেলার দুর্বল কালীঘাটকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। গোল কীপার এস, ব্যানার্জি একটি অব্যর্থ গোল বাঁচাচ্ছেন

লীগের প্রারম্ভে কয়েকটী টীমের উৎসাহী কর্তৃপক্ষরা নানা জায়গায় খ্যাত ও অখ্যাত খেলোয়াড়গণ যোগাড় করে এনে মাঠে নাবলেন। কিন্তু তাদের লীগের স্থান তেমন কিছু সন্তোষজনক হল না। সেই সঙ্গে খেলায় টাগ্রার্ডও নিম্নস্থানে পড়ে রইল। তাই শূন্য গ্যালারির ও উৎসাহ-হীন দর্শকদের সামনে লীগের গেম প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হতে চলেছে।

ফুটবল বাংলার National গেম বল্লে ভুল হয় না। এই গেমে তাদের অক্ষয় কীর্ত্তি এখনও অতীতের কাহিনী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার ছেলেরাই ফুটবল এত নিকৃষ্ট খেলতে পারে প্রতিদিন মাঠে তারই প্রমাণ দিচ্ছে নামজাদা বাঙালী টীমগুলি।

এবারকার খেলায় একটা বিশেষত্ব ঃ—লীগের অধিক

উৎকৃষ্ট [illegible]কেও দুর্ব্বল টীমের কাছে হার মানতে হয়েছে। তারপর খেলায় ড্র ত' লেগেই আছে। শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিংকেও দুর্ব্বল ডালহৌসির সঙ্গে ড্র করে ভগ্ন মনে তাঁবুতে ফিরতে হয়েছিল।

খেলায় একটী গেম না হেরে লীগের প্রথম স্থান এখনও অধিকার করে আছে বিজয়ী মহমেডান, ৮টী গেম খেলে পয়েন্ট করেছে ১৩, এবারও সবচেয়ে পুষ্টকর ও উন্নত টীম মহমেডান। এঁদের পাঁচটী নামজাদা ফরোয়ার্ড সেলিম, রহিম, সাবু, রহমত ও আব্বাসকে আটকে রাখতে বিপক্ষ দলের কোন ডিফেন্সই সক্ষম হয় না। তারপর এঁরা সকলেই ভাল স্কোরার। গোলের কাছে বল পেলে একটী গোল দেবেই। রহমত ফিরে আসতে ফরোয়ার্ড লাইন আরো সুন্দর খেলছে। আব্বাসের চেয়ে এবার সেলিমই মাঠে নাম কিনেছে বেশী। কিন্তু রসিদের স্থান এখনও অপূরণ হয়ে রইল। গত তিনবছর ধরে লীগের বেষ্ট সেণ্টার-হাফ্ নুর মহম্মদকেই বোঝাতো। এ বছর তাঁর সেই অতুলনীয় খেলা দেখা যাচ্ছে না। কালিঘাট ও এরিয়ান্সকে ৫ গোল দিয়ে মহমেডান গোল-এভারেজ বাড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু ভাল খেলেই মহমেডান যে জয়ী হয়ে চলেছে তা নয়। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান বেশীক্ষণ মহমেডানকে চেপে খেলেও দু গোলে হার স্বীকার করে সকলকে বিস্মিত করে দেয়।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম ই, বি, আর, ইষ্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি ব্যানার্জি একটি গোল দিচ্ছেন। খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে জয়ী হন।

লীগের দ্বিতীয় স্থানে আছে ক্যামেরনিয়ান্‌স্। টীম হিসেবে ক্যামেরনিয়ানসকে মন্দ বলা যায় না। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র ও মোহনবাগানের কাছে এক গোলে হেরে গেলেও উৎসাহ নিবে যায়নি। খেলার বেশীক্ষণ মহমেডানকে আক্রমণ করে খেলেও শেষ পর্য্যন্ত ড্র করে বিশেষ নাম কেনে। গোল-কিপার রাসেল ও রাইট আউট-নেলসন বেশ সুন্দর। নেলসন একাই এরিয়ান্সের কয়েকটী খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল দিয়ে এল।

কাষ্টমস বনাম মোহনবাগান কাষ্টমসের গোলকীপার জার্ডিন একটী গোল বাঁচাচ্ছেন। খেলায় [illegible] পরাজিত হন।

লীগের তৃতীয় স্থানে ভবানীপুর। এই প্রথম ১ম ডিভিসনে খেলতে নেমে নামজাদা পুরোণ টীমদের পেছনে রেখে ভবানীপুরের কৃতিত্ব কম নয়।

লীগে এরাই প্রথম মহমেডানকে বেগ দেয়। অতি সুন্দর খেলেও মহমেডানকে হারাতে পারল না। খেলা ড্র হল। অখিল আহামদ একাই টীমটাকে চালিয়ে নিচ্ছে। বাইরের থেকে ধার করা খেলোয়াড় আনিয়ে ভবানীপুর কালিঘাটের মত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের অপমান করেনি। তরুণ উন্নত খেলোয়াড় নিয়েই সে জয়ী হয়ে চলেছে। কে, ও, এস, বি-কে চার গোল দিয়ে ভবানীপুর [illegible] কিন্তু খেলার দোষে দুর্বল কালিঘাটের [illegible] হেরে যায়।

লীগে তারপরই কে, ও, এস, বি। গোড়ার কয়েকটা ম্যাচে কে, ও, এস, বির উৎকৃষ্ট খেলায় আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম যে মহমেডানের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র ও ভবানীপুরের কাছে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরে গিয়ে বড় দমে গেছে। [illegible] বৃষ্টি পড়লে এই কে, ও, এস, বি লীগে অনেক আপসেট করেছে, সন্দেহ নাই।

কোথায় বার্ম্মা, পেশোয়ার, বাঙ্গালোর, দিল্লী—নানা ায়গার খেলোয়াড় যোগাড় করে কলিঘাট উচ্চ আশা নিয়ে াবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে। কিন্তু লীগে স্থান এখনও াঝামাঝি। বিখ্যাত হারিস এল বার্ম্মা থেকে। দুই তিনটে

এঁদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি লা টৈষ্ট একজন উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড়, টীমের বেশীর ভাগ গোলই সে দিয়েছে!

লীগে কাষ্টমস পয়েণ্ট মন্দ করে নি। কিন্তু খেলা তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। দুর্ব্বল টীমদের কাছেই একমাত্র কাষ্টমস

এরিয়ানস বনাম ক্যামেরিনিয়ান্‌স এস ভট্টাচার্য্য একটি অনিবার্য্য গোল বাঁচাচ্ছেন। খেলায় ক্যামেরিনিয়ানস ২-১ গোলে জয় লাভ করেন।

গমে ভাল খেলেও হঠাৎ কেন বসে গেল—এ রহস্য এক ালিঘাটই জানে! তারপর ইণ্টার ন্তাসনাল গোল কিপার ল, বানার্জ্জী কম পক্ষে মহমেডানের কাছে ৬ গোল খেয়ে ুরার বসে গেল না কি!

জিতেছে। পুরোণ জার্ম্মিন এখনো গোলে বেশ খেলছে। ফরোয়ার্ড লাইন তেমন প্রাণ দিয়ে খেলে না। একজন ভাল খোরায় এঁদের কেউ নেই!

অসংখ্য দর্শকদের উচ্চ আশা ভেঙে দিয়েছে মোহন-

বাগান। জেতা গেমগুলি কেমন করে হার স্বীকার করতে হয় অন্ততঃ কয়েকটী খেলায় বেশ প্রমাণ দিয়েছে। সেদিন চ্যারিটী ম্যাচে বিপক্ষ মহমেডানকে বেশীক্ষণ চেপে খেলেও শুধু স্কোরারের অভাবে ২ গোলে হেরে ভগ্ন মনে মাঠ থেকে বিদায় নেয়। খেলায় মহমেডান সেদিন দাঁড়াতে পারে নি। প্রেমলাল শেষ পর্য্যন্ত উত্তম খেলেও মহমেডানের একটা গোল সাহায্য করে! তার হেডেই একটী গোল খায়। এ, দেব গোলের মুখে বল পেয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে গোল দেবার মুখে ওসমানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পা ভেঙ্গে যায়। হাসপাতালে সে এখন ভাল আছে। এ দেব একজন নামজাদা অল রাউণ্ডার। ফুটবলের চেয়ে সে হকি ও ক্রীকেটে নাম কিনেছে বেশী। করুণা এসেই টীমে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছে। কিন্তু বাকি খেলোয়াড়দের খেলায় তেমন উৎসাহ ও প্রাণ নেই। ভাল স্কোরার ও উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্যের অভাবে মোহনবাগানের আজ এমন দুরবস্থা।

গত বছরের টীম নিয়ে ক্যালকাটা লীগে মন্দ করে নি। খেলার সেই নৈপুণ্য না থাকলেও ক্যালকাটাই কয়েকটী গেমে আপসেট করেছে। পুরোন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে সে অতি সহজেই ৩-১ গোলে জেতে। বৃষ্টি পড়লেই ক্যালকাটা অনেকের ওপর চলে যাবে।

ই, বি, আর-ও তেমন মুগ্ধকর খেলা নেই! নিজেদের দোষে অনেক গেম হেরেছে! ২২ বছর খেলে এখনও তরুণ খেলোয়াড়দের ঠকিয়ে অতি সহজে গোল দিয়ে আসে সামাদ। কিন্তু একা কার্ভে ও সামাদের ওপর একটী টীম নির্ভর করতে পারে না। সেণ্টার ফরোয়ার্ড "কর" বেশ। হাফে এস, বানার্জ্জি মন্দ নয়।

এতদিন পর ইষ্টবেঙ্গল বুঝতে পেরেছে বাইরের খেলোয়াড় আনিয়ে কখনও লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায় না। কয়েক বছর ভারতের নানাস্থান চষে এবার শুধু স্থানীয় খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভর করে খেলছে! বি, ডিভিসনের উত্তম খেলোয়াড়দের সব এনেছে। যেমন, বি, সেন, ডি বানার্জি, খালেক, রাজাবালী প্রভৃতি! উন্নত টীম তবু ইষ্ট বেঙ্গলের বরাত মন্দ। ডি, বানার্জ্জি তিন চারটে অতি সহজ গোল মহমেডানের বিরুদ্ধে না দিতে পেরে সকলকেই কম বিস্মিত করেনি। অথচ অতি বাজে খেলে মহমেডান মাত্র ৫ মিনিটে ২ গোল দিয়ে উল্লাসে সারা মাঠ ভরিয়ে দিল। টীম অনুসারে ইষ্টবেঙ্গল দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করা উচিত ছিল! কিন্তু লীগে অতি নিম্ন স্থানে পড়ে ইষ্ট বেঙ্গল!

তার পরই সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল এরিয়ান্স ও ডালহৌসির। এরিয়ান্স যেন হারবে বলেই খেলতে নামে। তবে ডালহৌসিকে হারিয়ে এক পয়েণ্টে ওপরে আছে! ডালহৌসি আর টীম গড়তে পাচ্ছে না! কোনরকমে ড্র করতে পারলেই যেন বাঁচে।

এঁদের মধ্যেই একজনকে বি, ডিভিসনে নামতে হবে! দুটী পুরোন টীম! দেখা যাক—খেলার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়।—

প্রথম ডিভিসন

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	গোল স্বপক্ষে	গোল বিপক্ষে	পয়েন্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	৮	৫	৩	০	২০	৬	১৩
ক্যামেরনিয়ান্স	৮	৫	২	১	১৩	৮	১২
ভবানীপুর	৮	৪	২	২	১৪	৯	১০
কে, ও, এস, বি,	৫	৩	১	১	৭	৮	৭
কালীঘাট	৭	৩	১	৩	৮	১০	৭
কাষ্টমস	৬	৩	০	৩	৭	৮	৬
মোহনবাগান	৮	২	২	৪	৫	৯	৬
ক্যালকাটা	৬	২	১	৩	৫	৯	৫
ই, বি, আর	৬	১	৩	২	৬	৭	৫
ইষ্টবেঙ্গল	৫	১	২	২	৬	৮	৪
এরিয়ান্স	৬	১	১	৪	৫	১৯	৩
ডালহৌসি	৬	০	২	৪	৭	১৩	২

খেলাধূলার সমস্ত ব্লকগুলি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পুষ্করের মৌলিকতা

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস

সাজান বাগান-বাড়ীর মত ছোট্ট সহরটি।

সব ক'টা রাস্তা সমকোণে ছেদ করে সোজা চলে গেছে, ঠিক সরল রেখার মত। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা বরাবর রাজপ্রাসাদে উঠেছে, তারই মাঝামাঝি পুষ্করের ক্যাবিন। তৈজসপত্র অতি কষ্টে একবারেই যা করেছিল, তারপর আর তার শ্রীবৃদ্ধি হ'য়ে উঠেনি। কিন্তু মাল-মসলার বহর যে-কোন বনেদী দোকানকে হার মানায়। নেকার চণ্ডীচরণ ভোর না হ'তেই এসে দোকান ঝাঁট দেয়, পাশের ঠেলা কল থেকে বালতি করে জল এনে টিনকে টিন বোঝাই করে; কাপ প্লেটগুলোর ধুলো ঝাড়ে, আলমারিটা নূতন করে গুছোয়, তারপর উনুনে আঁচ দিয়ে টিনের চেয়ারটায় এসে বসে।

পুষ্কর বেলা দশটা নাগাদ এসে শুধোয়, কি রে চণ্ডী, আজ কেমন দেখছিস—কত হ'ল এ পর্য্যন্ত?

অপ্রসন্নের ভাব দেখিলে চণ্ডী বলে, কই আর হয় বাবু, দু'পয়সা কে খরচ করবে? যারা পারে তাদেরও দরকার হয় না। আর এই যত দেখেন সব আপনার মত, হয় নস্যি নয় বিড়ী—বলে কম খরচ। জোর করে ওরা নেশা বদলায়।

তবু কিছুই কি হয়নি?

দু'কাপ। তাও বাকী।—এমনি কথা ওদের প্রায়ই হয়।

সেদিন হতাশ হ'য়ে পুষ্কর একটা চেয়ারে বসে পড়ল! বল্‌ল, আচ্ছা চণ্ডী তোমার মাইনের হিসেবটা একবার দাওতো আমায়। এমনি করে আর তো তোমায় আটকে রাখতে পারবো না।

চণ্ডী একটু হাসল।

প্রথম দু'মাস পুরো, তার পর একমাস অর্দ্ধেক, তারপর ক'মাস এমনি চলছে ঠিক মনে নেই।—হঠাৎ চণ্ডী গম্ভীর হ'য়ে পড়ল। আমার কথা ছেড়ে দিন বাবু। লেখা-পড়া আমরা কেউ শিখিনে। তবু যা'হ'ক খাবার ভাবনা নিজেকে ভাবতে হয় না, পরের উপর দিয়েই চলে যায়। কিন্তু আপনার লেখা পড়া শিখেও তো পরের উপর ভর করবার ক্ষমতা হয় নি!

পুষ্করের অজ্ঞাতেই একটু হাসি বেরিয়ে আসে। ওরা দু'জনাই ছিল এক পথের পথিক। এক জনের শিক্ষা আলঙ্কারিক, আর এক জনের অর্থকরী। কিন্তু তাও চণ্ডীদের মত লোককে বেকার হতে হয়! একই পথাবলম্বী বিভিন্ন যাত্রীর পরস্পরকে খুঁজে নেয়া তেমন কষ্টকর নয়। ওদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

একদিন পুষ্কর স্পষ্ট করে বলল, তুমি আর কোন কাজে হাত দাও। এ হতভাগার দোকান আর তোমার আগলে পড়ে থাকতে দেবো না। তোমার মাইনে আমার কাছে জমা রইল।

চণ্ডী ওর দোকান ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ওকে ছাড়তে ওর কেমন মায়া লাগে। তাই ও পারে না। পুষ্কর মনে মনে বলে, এ রাজ্যে লোক নেই।—তারপর গুটিকতক মাত্র সরঞ্জাম রেখে ও আর সব ছেড়ে দেয় অকৃশানেণ।

আজকের ডাকে আসা চিঠিখানি পুষ্করের বারকতক পড়া হ'য়ে গেছে। চিঠির একটা ছত্র ওর মনকে করে তুলেছিল অসম্ভব রকম চঞ্চল। এতদিন সে চিন্তা ওর মনের আস্তরণে গ্রন্থির পর গ্রন্থি রচনা করে চলেছিল, আজ যেন ও তার কিনারা দেখতে পেল। পুষ্কর টেব্‌ল থেকে চিঠিখানি তুলে নিয়ে আর একবার পড়ল। তারপর সেটাকে ছুড়ে দিয়ে হো হো করে পাগলের হাসি

হেসে উঠল। পুষ্করের হাসি আর থামে না—কে যেন ওকে জোর করে হাসাচ্ছে।

চণ্ডীচরণ পাশের ঘরে রান্নার যোগাড় করছিল। বাড়ীওয়ালা ভিন্ন আর কেউ তাদের মাটী মাড়ায় না, সে জানে। আর বাড়ীওয়ালা, সে কখনো হাসে না, এ ধারণাটাও সে সূর্য্যোদয়ের মতই সত্য বলে ধরে গিয়েছিল। তাই একলা ঘরে পুষ্করের হাসি ওর ভালো লাগল না। কিন্তু ওকে বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। পুষ্কর এসে বলল; চণ্ডী, আজ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, কবে ফিরবো তা' এখন ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু এবার তোমায় অবাক হতে হবে চণ্ডীদা।—বলে হাসতে হাসতে পুষ্কর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুষ্কর চলে যাবার পর অনেকগুলো দিন অতীত হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে চণ্ডী তার কোন খবর পায়নি। একদিন অনেক রাত্রে তার নূতন কার্য্যস্থল থেকে ফিরে এসে শুতে যাচ্ছে, এমন সময় কার চাপা গলার স্বরে সে চমকে উঠল। কে ডাকছে, চণ্ডী দোর খোলো। লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে চণ্ডী সদর দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে যা দেখল তা' সে কখনো আশা করেনি। চণ্ডীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরয় না।

পুষ্করের পিছনে একটি তরুণী। তাকে দেখিয়ে বলল, তোর মা চণ্ডী, প্রনাম কর।

সেরাত্রে আর কারো ঘুম হয় না। সারা রাত্রি ধরে ওদের কিসের পরামর্শ চলে। মধ্যে মধ্যে চণ্ডী আর তরুণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অবশেষে পুষ্কর বলল, তা হ'লে সব ঠিক অজয়া? এখনো সময় আছে ফেরার—বুঝো, কত বড় ঝক্কি নিচ্ছ মাথায়! আজ পর্য্যন্ত যা কোন বাঙালীর মেয়ে শত সাহসেও পারেনি, তুমি তা'তেই হাত দিচ্ছ! একবার স্বুরু করলে এর শেষ না দেখে কেউ ফিরতে পারে না। মনে থাকে যেন তোমায় খেলা করতে হবে, এবং কাদের নিয়ে তাও নিশ্চয় ভুলে যাওনি।—পুষ্কর শেষ করল।

অজয়া দাঁত দিয়ে ওর নীচের ঠোঁট নিপীড়িত করছিল। পুষ্করের কোন কথায় ও সাড়া দিল না—এমনি ওর প্রকৃতি। বক্তৃতায় সত্য জাহির করবার দলের ও নয়, পুষ্করের কথা শেষ হ'লে ও ঠোঁট ছেড়ে দিয়ে, ওর নিবিড় কালো চোখ দু'টি পুষ্করের চোখে তুলে ধরল। পুষ্কর হেসে বলল, হ্যাঁ, তোমার চোখ বলছে তুমি পারবে।

প্যালেস রোডকে কেটে যে রাস্তাটা বরাবর দক্ষিণ মুখো চলে গেছে, তারই মাথায় একটা ছোট রেঁস্তরা দেখা দিয়েছে কিছু দিন হ'ল। পুষ্কর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তার বাইরে—বড় ভিড়। ভিড় একটু কমে আবার বাড়ে। অবশেষে ভিড় কমবার আশা নেই দেখে পুষ্কর আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল।

চা? আর কি চাই?—বলতে বলতে একটি তরুণী এগিয়ে এল তার দিকে।

পুষ্কর ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনাকে এখানে মানায় না—ক্ষমা করবেন, আমি একটু পক্ষপাতী।—তারপর গলার স্বর নামিয়ে, আজ কেমন মনে হ'চ্ছে অজয়া?

অজয়া নিজের ঠোঁটে তর্জ্জণী স্পর্শ করে জানাল, চুপ!

একজন সোনার বোতামওয়ালা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অজয়ার হাতের মধ্যে একটা টাকা গুঁজে দিল। পুষ্করের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে ভদ্রলোক সোজা বেরিয়ে গেল। অজয়া চেঁচিয়ে উঠল, চেইঞ্জ?

সোনার বোতামের মনেই হ'ল না সে কিছু বেশী দিয়েছে।

ভদ্রলোক চলে গেলে অজয়া হাসল। চণ্ডীর নাম বদলে চরণ হ'য়েছে। অজয়া হাঁকল, চরণ, আর এক কাপ চা।

চরণ চা নিয়ে এসে ফিস্ ফিস করে বলল, দেখছেন বাবু, কি কাটতি! তা ছাড়া যথেষ্ট উপরি রোজগারও হ'চ্ছে। আপনার মাথা খোলে বেশ।

পুষ্কর কৃতজ্ঞ নয়নে অজয়ার দিকে তাকাল। অজয়া ভ্রূকুটি করে সেখান থেকে চলে গেল।

এক ভদ্রলোকের স্প্রিংএর চশমা। তার দিকে চেয়ে অজয়া বলল, আপনাকে ক'দিন দেখিনি যে? আপনারা যদি দয়া করে পায়ের ধুলো না দেন—

না, এই এখানে ছিলুম না কি না, তাই। মফঃস্বিলে যেতে হ'য়েছিল—যা কাজের চাপ পড়েছে! একটু যে এসে রিফ্রেসড্ হবো তারও কি যো আছে! এখানে এলে একটু শান্তি পাই। কিন্তু হ্যাঁ, আপনার বাসাটা কোথায় বললেন না তো?—বলেই ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকাল। কি দেখল অজয়ার মুখে?—এইবার বুঝি অজয়ার কপোল ফেটে পড়ে রক্তের চাপে। তার স্বাভাবিক সুন্দর মুখে এর তুলনা নেই। অজয়া যেন কিসের স্বপ্নে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, এমনি ভাবে সে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের বাষ্পভরা চা'র পেয়ালার দিকে। ভদ্রলোক তার স্বপ্ন ভেঙ্গে ফেলতে চায় না নিষ্ঠুরের মত। কিন্তু অজয়া একটু পরেই সম্বিৎ ফিরে পায়। লজ্জিত হ'য়ে বলে, আর এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিই আপনাকে?—বলেই সরে যায়।

ভদ্রলোকের অন্তরে তুফান ওঠে।

পর্দ্দা ঠেলে অজয়া পাশের ঘরে গেল। মুর্শিদাবাদী সিল্কের পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনি কি অনেকক্ষণ এসেছেন? আহা, এই গরমে ফ্যানটা খুলে দেন নি এখনো!

অজয়া ফ্যানটা খুলে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বলল, আপনার সেই কার অসুখ ভালো হ'য়ে গেছেন তো?

ভদ্রলোক কি উত্তর দেয় পুষ্কর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। পর্দ্দার ফাঁকে সে দেখছিল অজয়ার হাত নাড়ার ভঙ্গি, আর তার চটুল চাহনির দ্রুত পরিবর্ত্তন। চরণ একবার ফাঁক করে এসে পুষ্করের কাণে কাণে বলল, ও কিছু নয়; দূর থেকে সবাই শিং নাড়ছে, গুতো দেবার সাহস কারো নেই।

পুষ্কর দুষ্টামির হাসি হেসে বলল, দু'মাস আগে এত লোক কোথায় ছিল চরণ?

মধ্য রাত্রে পুষ্করের সুড়সুড়িতে অজয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখের পাতা থেকে হাত নামিয়ে পুষ্কর বলল, চল অজয়া, কলকাতা কি আর কোথাও যাই। এখানকার পাট না তুললে শীগগিরই ধরা পড়তে হবে আমাদের। তখন লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে তোমার। আর লুকোচুরিরই বা কি দরকার। এবার তো আমাদের নূতন করে কিছু করবার মত অবস্থাও হ'য়েছে।

অজয়ার দিক থেকে কোন প্রতিবাদের স্বর উচ্চারিত হয় না। সে আর একটু সরে আসে তার স্বামীর বুকের কাছে, একান্ত নির্ভরতার নিদর্শণ নিয়ে।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস

দিব্য-জ্ঞান

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

অব্যক্তের অভিব্যক্তি ব্যক্তের ভিতর,
অসীমের রূপ দেখি সসীমের 'পর।
বিরাটের বীজ দেখি ক্ষুদ্রের মাঝার,
মানবের রূপে দেখি রূপ দেবতার।

ধন্য হব তোমায় কাছে পেয়ে

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোলো বছর ?—মিথ্যা কথা সখি,
পাইনি তোমায় ষোলো বছর আগে,
এইত' সেদিন তোমার দুটি আঁখি
আমার পানে চাইলো অনুরাগে।

এইত সেদিন কমলকলি সম
সরমরাঙা মুখটি মনোরম
আমার প্রেমের দীপ্ত রবিকরে
উঠলো ফুটে মৃণাল গ্রীবাপরে।

ষোলো বছর !—একী পরিহাস
এ যেন ঠিক কালকে মনে হয়,
তিরিশ দিনে নয় ক' এ সব মাস
বারো মাসে এ সব বছর নয়।

কথা বলা-ই হয়নি আজো শেষ
বাসররাতের মিলন গীতি-রেশ
বুকের মাঝে সদাই ওঠে ধ্বনি'
ওগো প্রিয়া, ওগো চিরন্তনী!

মালা বদল সেদিন হ'লো সুরু
বিয়ের রাতে হয়নিকো তা শেষ!
আজো হৃদয় কাঁপছে দুরু দুরু
আবেগভরা নয়ন অনিমেষ।

মেঘের মত ছড়িয়ে কালো চুল
দুলিয়ে কাণে নীল পাথরের দুল
বসবে তুমি এসে আমার পাশে,
ভাববো মনে স্বর্গ নেমে আসে।

ঝড়ের মাতন গাছের ডালে ডালে
বৃষ্টিধারা নামে ধরার বুকে,
আমার হিয়ার অধীর তালে তালে
তোমার হিয়া মিলবে নীরব সুখে।

গুণ্ গুণিয়ে গাইবে তুমি গান
আনন্দে মোর উঠবে ভরে প্রাণ
বুকের পরে রেখে আননখানি
কোন কথাটি বলবে তখন রাণী ?—

বলবে তোমার খোকা খুকুর কথা ?
দুষ্টুমিতে কোনটি কাহার মত!
রান্নাঘরের ঝিয়ের অবাধ্যতা ?
দোকানদারের জোচ্চুরী সব যত ?

হরলিক্স্‌টা আর এক বোতল চাই,
স্পিরিট আনার কথাই মনে নাই!—
সংসারেরি এমনি খুঁটিনাটি
বলে আমার করবে কি ভাব মাটি ?

না—না প্রিয়ে, ও সব কথা নয়,
থাকবে শুধু আমার পানে চেয়ে,—
নীরবতায় প্রেমের পরিচয়—
ধন্য হ'ব তোমায় কাছে পেয়ে।

বাদুড় উড়িয়া চলে

শ্রীফাল্গুনী রায়

বাদুড়ের দল আকাশের তল জুড়িয়া জুড়িয়া উড়িয়া যায়,
উড়ো-ছায়া-মালা রচনা করিয়া চল্ চল্ বলে উড়িয়া যায়।
উড়িয়া উড়িয়া কতদূরে যায় খোঁজ করে কেবা আর তাদের?
পাখার ছন্দে ক্ষণ-আনন্দে ভুলিয়া কী যায় নীড় তাদের!

হোথায় নামিল ধূসর সন্ধ্যা, মৃদুল-ছন্দা দখিনাবায়,
ফুলে ফুলে ফুলে নেচেনেচে দুলে ঝিরঝির বহে দখিনা বায়;
তটিনী চলেছে—ছল ছল ছল কল গান তারই ভারী মধুর,
মেঘের কাজল তাহার আঁখিতে—তটিনী আঁখিতে ভারী মধুর!

আবার দেখিনু আঁখি মেলি' দিয়া—সারি সারি সারি বাদুড়দল,
করুণ-কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া উড়িয়া চলিছে বাদুড়-দল,
মেঘ-হীন নভে মেঘ-বেণী রচি' শ্রেণী-বাঁধা পাখী ডাকিয়া চলে,
একটি কোথায় দল হারাইল—দলে খুঁজেখুঁজে ডাকিয়া চলে!

নারিকেল-শীরে ধীরে ধীরে ধীরে চিলের কাঁদন মিলায়ে আসে,
হারা হাঁস খুঁজে পুকুরের তীরে রাখালের ডাক মিলায়ে আসে,
মাঠের বাঁ পাশে শালিকের দল কাহারে করিছে তিরস্কার,
সন্ধ্যা মৌন, গভীর মৌন—তাহারে করিছে তিরস্কার?

হারানো বাদুড় কোথায় চলিছে—নীড় তারি আজ ভুলিয়া গেছে,
কোথায় থামিবে কোথায় নামিবে—কিজানি তাও কি ভুলিয়া গেছে?
কতদূরে তার সন্ধ্যা-সাথীরা—কতদূরে সেকি জানিছে তাহা,
আঁধার-মুকুট পরিয়া সামনে মৃত্যু দাঁড়ায়ে—জানিছে তাহা?

আমিও ভুলেছি চরণে আমার জড়ানো রয়েছে ঘাসের স্নেহ,
তুষার-শীতল শ্যামল-মেদুর কোমল মধুর ঘাসের স্নেহ;
অদূর আকাশে কাজল-আকাশে নীড়-হারা সেই বাদুড়পাখী,
ডাকিয়াছে মোরে, ভুলায়েছে নীড়—আমার মধুর—বাদুড়পাখী!

অশোকের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত রাজধানী তোসলী নগরী আবিষ্কৃত

তরুণ গবেষক ছাত্র শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত সম্রাট অশোকের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত রাজধানী তোসলীনগরী (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে) আবিষ্কৃত করেছেন। এযাবৎ মনিষীগণ তোসলীর স্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হননি, কেবল মাত্র ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে পশ্চিমে তক্ষশিলা এবং রাজধানী পাটলীপুত্র ভিন্ন কলিঙ্গ বিজয়ের পর সম্রাট অশোক এই তোসলী নগরী স্থাপিত করেন। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে অজিতকুমার পুরীর বীরেন রায় মহাশয়ের সহিত একযোগে এর স্থান নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হন। এই গবেষণার ফলে তাঁরা বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি ও ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এইবার বহু পরিশ্রমের ফলে অজিতকুমার সম্পূর্ণভাবে তোসলী নগরী আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

এই তোসলী নগরী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি ও ধোলী পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। ধোলী পর্ব্বতে আবিষ্কৃত অশোকের শিলালিপি এবং উদয়গিরিতে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ খারবের প্রস্তরলিপির বর্ণনার সহিত এই তোসলী নগরীর অবস্থান সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে। নগরের বহির্ভাগে প্রায় ২৫টি সৈন্যাবাসের কক্ষ আছে এবং নগরীটির চতুপার্শ্বে গড় এবং উচ্চ প্রাচীর স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। নগরীর মধ্যে বহু প্রাচীন কূপ আছে এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী তিনি পেয়েছেন তার মধ্যে খোদিত স্বস্তিকা শিলাটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে তিনি অনুমান করেন যে খনন কার্য্য আরম্ভ হ'লে

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

এই নগরীর নিম্নস্তরে দ্রাবিড় সভ্যতার বহু উপাদান পাওয়া যেতে পারে। কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক নির্ণীত নূতন তোসলী নগরীরও সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় নিতান্ত তরুণ যুবক। এত অল্প বয়সে তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা এবং কার্য্যদর্শিতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

দেবেন্দ্রনাথ হেমলতা সুবর্ণপদক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অব একজামিনেসন্‌স্‌-এর নিকট হ'তে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনটি আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত করলাম।

UNIVERSITY OF CALCUTTA
NOTICE.

Graduates who have obtained the degree of M.A M.Sc., Ph.D., D.Sc., M.L D.L., M.D, M.O, M.S. are entitled to compete for the Debendranath Hemlata Gold Medal within 3 years of obtaining such degree.

Competitors will have to appear before the Students' Welfare Committee of the University for a routine medical examination which will include—

(1) examination of urine,

(2) estimation of blood pressure

and (3) estimation of vision.

In addition to the above examination, candidates will be subjected to the following tests of fitness—

(1) Exercise Tolerance Test.

(2) Estimation of Vital Capacity.

(3) Strength of Grip (Rt. and Lt.)

(4) Endurance Test with Dynamometer.

(5) Movements for testing mobility of joints.

In awarding the medal the record of physical achievements of the candidates throughout their academic career will be taken into account.

ভূপর্য্যটক বিমল মুখোপাধ্যায়

১৯২৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর চারজন বাঙালী যুবক সাইক্লে ভূপর্য্যটন করবার জন্য কলিকাতা হ'তে যাত্রা করেন এবং যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমারোহের সহিত টাউনহলে তাঁদের বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, একথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। চারজনের মধ্যে ক্রমশঃ তিন জন সঙ্কল্পচ্যুত হ'য়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, শুধু শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায় অদম্য উৎসাহ এবং দৃঢ়তার সহিত নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হন। সাইক্লে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ ক'রে সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, এবং অচিরে কলিকাতায় উপস্থিত হবেন।

এই কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং বিপদসঙ্কুল পর্য্যটনের দ্বারা বিপুল সাহস এবং দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়ে শ্রীযুক্ত বিমল ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। কলিকাতার মেয়র প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট পৌরজনের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শ্রীযুক্ত বিমল কলিকাতায় উপস্থিত হ'লে তাঁর যথোচিত সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ক'রে যেন গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন।

যাত্রা আরম্ভ ক'রে শ্রীযুক্ত বিমল মধ্যভারত হ'তে মেসোপোটেমিয়া, সাইরিয়া, তুর্কি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ মধ্য ইয়োরোপ অতিক্রম ক'রে ইংলণ্ডে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। পোর্টুগাল ভিন্ন ইয়োরোপের অন্য সকল প্রদেশ তিনি ভ্রমণ করেন। ইয়োরোপ পরিত্যাগ ক'রে তিনি ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো এবং জাপানে গমন করেন। জাপান হ'তে কলম্বো উপনীত হন এবং তৎপরে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করেন।

পথে অনেক দুঃখ কষ্ট বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য। উত্তর মেরু প্রদেশে এক বৎসর কাল তিনি শীত, বৃষ্টি, তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে ধীবরের জীবন যাপন করেন। আবার অনেক স্থলে সুখ, শান্তি, রাজসম্মানেরও অভাব ঘটেনি। দুঃখ-সুখ, শঙ্কা-শান্তি, বিপদ-সম্পদ খচিত এই ভূপর্য্যটকের ভ্রমণ-কাহিনী বিচিত্র!

শ্রীযুক্ত বিমল 'বিচিত্রা'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতৃব্য-পুত্র।

বাঙ্গলার নব-নিযুক্ত গভর্ণমেণ্ট-সলিসিটার

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত এণ্ড সেন কোম্পানীর অ্যাটর্ণি শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাঙলা দেশের গভর্ণমেণ্ট-সলিসিটার নিযুক্ত হয়েছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বীমা এবং কোম্পানীর আইন বিষয়ে সংস্কারসাধনের ভার প্রদান করেছিলেন, এ কথা বোধ করি অনেকের মনে আছে। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র আমাদের এবং বিচিত্রা পত্রিকার বন্ধু। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতি (Bengal Music Association)

গত ২৭শে মার্চ্চ হ'তে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতির প্রথম বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মিলন সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় সন্তোষের মহারাজা বাহাদুর সম্মিলনের উদ্বোধন এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই উৎসবে মাননীয় ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নসীপুরের রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বহু শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী এই সঙ্গীতোৎসবে যোগদান করেছিলেন। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেশরী সিং নাহার, সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্যাসী-চরণ রায় এবং কার্য্যকরী সভার প্রধান সভ্য শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই সম্মিলন এরূপ সাফল্য লাভ করেছে। সন্তোষের মহারাজা বাহাদুর তাঁর অভিভাষণের মধ্যে বলেন, "এই সমিতির দ্বারাই যাহাতে উচ্চ সঙ্গীতের প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার, সঙ্গীতের একটি কলেজ স্থাপন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে সঙ্গীত বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয় তাহাই যেন সমিতির লক্ষ্য থাকে।" নিম্নলিখিত শ্রেষ্ঠ গুণিগণ এই সঙ্গীতে যোগদান করেছিলেন।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচ্ছন সাহেব (নৃত্যকার), কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র (মৃদঙ্গ) সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেহদী হোসেন, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন চট্টো-পাধ্যায়, ছোটে খাঁ, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন ঘোষ, অরুণপ্রকাশ অধিকারী (মৃদঙ্গ), রাইচাঁদ বড়াল, রামচন্দ্র ভট, কেরামত খাঁ দিলীপচাঁদ বেদী, কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (সুর সিঙ্গার), মুনেশ্বর দয়াল (হার্ম-মোনিয়ম), চিন্তামণি রাণাডে, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অকিঞ্চন দত্ত (বেহালা) ছম্মু মিশ্র (সারেঙ্গী), গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মুরারি মিশ্র, দিলীপ রায়, কে, এল, সাইগল, শচীনদেব বর্ম্মন, জামিরুদ্দিন খান, নথু খাঁ, শ্রীবিনোদলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিজয়কমল মুখার্জ্জি, শ্রীসফি।

মহিলা শিল্পীগণের মধ্যে মিসেস স্বরস্বতী বাই (বোম্বে), বীণাপাণি মুখার্জ্জি, গীতা দাস, গীতা রায়, বিন্দুবাসিনী দেবী, রেণুকা সাহা, সুষমা দে, অঞ্জলী গাঙ্গুলী, (নৃত্য) গীতি'রায় ও দীপ্তি রায় (নৃত্য) প্রভৃতির গীত, বাদ্য ও নৃত্যে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

স্বদেশী বার্লি ও বিস্কুট

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—এই বাক্য যাঁরা নিজেদের জীবনে সপ্রমাণ করেছেন সুপ্রসিদ্ধ বার্লি ও বিস্কুট প্রস্তুত-কারক শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু মহাশয় তাঁদের অন্যতম। অভাব ও অনটনের জন্য যথোচিত বিদ্যালাভের সুযোগ তাঁর হয় নি, তাই অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যৌবনের প্রারম্ভে তাঁকে অল্প বেতনের চাকরি অবলম্বন করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে বাণিজ্যপরতার যে প্রবল প্রেরণা ছিল তা তাঁকে চাকরির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারলে না। তিনি চাকরি পরিত্যাগ ক'রে বার্লি প্রস্তুতের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। বাল্যকালে তিনি দেখেছিলেন যে, যবের মণ্ড পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তাই থেকে যব চূর্ণ ক'রে বার্লি প্রস্তুত করবার কল্পনা তিনি করেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্য নিয়ে শ্যামবাজার বার্লি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়—তারপর ক্রমোন্নতির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানের বিপুল আয়তনে উপস্থিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়ে বিচক্ষণ বসু মহাশয় সুসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে ভুল করেন নি, এবং সেই সময়ে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রথমে নিজের উদ্ভাবিত কল প্রভৃতির সাহায্যে এই কারখানা পরিচালিত হয়—বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ কারখানার সমস্ত উপকরণে এই প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ। সুতরাং আমাদের দেশের এই-জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্যামবাজার বার্লি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী অন্যতম।

বিশুদ্ধতায় ও উৎকর্ষে এই ফ্যাক্টরীর প্রস্তুত দ্রব্যগুলি কঠিন রাসায়নিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষের বহু স্থানে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে ফ্যাক্টরী সুবর্ণপদক লাভ করেছে। কে সি বসুর বার্লি ও বিস্কুট এখন বাঙলার ঘরে ঘরে নিত্যব্যবহৃত বস্তু।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রাধারমন সম্মিলন সমিতি—ডুমুরদহ

হুগলী জেলার ডুমুরদহ একটি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে এক সময়ে এ গ্রামের বিশেষ প্রসার প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রাম ক্রমশ ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়। পুনরায় এ গ্রামের উন্নতি দেখা দিয়েছে।

রাধারমণ সম্মিলন সমিতি এ গ্রামের একটি কল্যাণপ্রদ প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির ক্রিয়াশীলতা প্রধানত চারটি বিভাগে বিভক্ত। (১) সাহিত্য বিভাগ, মায় গ্রন্থাগার পরিচালনা (২) স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম বিভাগ (৩) গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নতি বিভাগ ও (৪) সেবা ও সৎকার বিভাগ। এতদ্ব্যতীত ইহার পরিচালনায় একটি সমবায় ঋণ দান সমিতি আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে স্থানীয় রাধারমণজীর মন্দির প্রাঙ্গণে এই সমিতির বার্ষিক উৎসব অধিবেশন (বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তদুপলক্ষে রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু, স্থানীয় উত্তম আশ্রমের আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্যাম সুন্দর রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় রায় প্রভৃতি বক্তৃতাদি করেছিলেন।

এই সমিতির কার্য্যকারিতা দেখে এবং উপযোগিতা অনুভব ক'রে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলাম। বাঙলার গ্রামে গ্রামে এইরকম সমিতির প্রতিষ্ঠা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণের উদ্যম এবং পরিশ্রম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

স্থানীয় উত্তম আশ্রম ডুমুরদহ গ্রামের একটি পুণ্য-সম্পদ। এই আশ্রমের বিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Indubhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রার নিয়মাবলী

১। বিচিত্রার সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা, ষাণ্মাষিক তিন টাকা চার আনা। কলিকাতায় বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ছয় টাকা, ষাণ্মাষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল তিন টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। ব্রহ্মদেশের সডাক বার্ষিক মূল্য আট টাকা ও সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য চার টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ খরচ পাঁচ আনা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে সডাক বার্ষিক ও সডাক ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে দশটাকা ও পাঁচ টাকা। মূল্যাদি 'ম্যানেজার বিচিত্রা নিকেতন লিঃ'—এই নামে পাঠাইতে হয়।

২। শ্রাবণ মাস হইতে বিচিত্রার বর্ষ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইতে সেই বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ। কিন্তু যে-মাস হইতে ইচ্ছা উল্লিখিত হারে গ্রাহক হওয়া চলে।

৩। বিচিত্রা প্রতি বাঙলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বিচিত্রা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন। ডাকঘরের তদন্তের ফল আমাদিগকে সেই মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন। উক্ত তারিখের পরে লিখিলে পুনরায় কাগজ পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৪। জমা চাঁদা নিঃশেষ হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে নিষেধ-আজ্ঞা না থাকিলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বার্ষিক গ্রাহকের পক্ষে বার্ষিক চাঁদার হিসাবে ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের পক্ষে ষাণ্মাসিক চাঁদার হিসাবে ভি-পি করা হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডারে চাঁদা পাঠানোই সুবিধাজনক, খরচও কম পড়ে।

৫। নূতন গ্রাহক হইবার সময়ে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মনিঅর্ডার কুপনে অথবা আদেশ-পত্রে জানাইবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য চাঁদা পাঠাইবার সময়ে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যাটি লিখিয়া দিবেন। নচেৎ আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

৬। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়েও গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয় জানাইবেন, অন্যথা আমাদিগকে অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব হইয়া যায়।

প্রবন্ধাদি

৭। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। উত্তরের জন্য ডাক-টিকিট না পাঠাইলে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৮। প্রবন্ধাদি হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি, সুতরাং লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। ফেরৎ যাইবার ডাক খরচা না থাকিলে অমনোনীত অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৯। প্রবন্ধ-মনোনয়নের বিষয়ে সংবাদ লইতে হইলে এবং অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরৎ লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হয়। সংবাদ পাওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা না করিলে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

১০। বর্ত্তমান মাস হইতে দুই বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে যে সকল রচনা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথবা এতাবৎ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলি অন্যত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এই মর্ম্মে লেখকের নিকট হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে আর বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবে না।

বিজ্ঞাপন

১১। বাঙলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পুরাতন বিজ্ঞাপনের কোনও পরিবর্ত্তন আমাদের হস্তগত না হইলে পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকায় আর তাহা দিতে পারা যাইবে না। চলতি বিজ্ঞাপনাদির ছাপা বন্ধ করিতে হইলেও সে খবর উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া চাই, নচেৎ সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

১২। "বিচিত্রা"র সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণত "স্মল পাইকা" অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; হেডিং প্রভৃতি স্থান-বিশেষে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়। কোন বিজ্ঞাপনদাতা যদি 'বর্জ্জাইস্'-অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে চাহেন বা অন্য কোন প্রকার আকারে বিজ্ঞাপন সাজাইতে চাহেন, তাহা হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। সাধারণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার দাবী অগ্রাহ্য হইবে। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

মাসিক বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা বা দুই কলম	২৫৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	১৩৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম	৭৲
ঐ সিকি কলম	৫৲
সূচীর পৃষ্ঠায় ১ পৃষ্ঠা	২০৲
ঐ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
ঐ ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৯৲
ঐ ঐ ⅙ পৃষ্ঠা	৬৲

কভারের ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পৃষ্ঠার রেট এবং অন্যান্য বিশেষ স্থানের রেট পত্রে জ্ঞাতব্য।

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ২৭৫৫

গল্প—বলা

শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত।

দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পালের নৌকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালেব নৌকা ছাড়ি,
গাছের পরে গাছ ছুটে যায়, বাড়ির পরে বাড়ি।
দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রামে
ঘাটের পরে ঘাটগুলো সব পিছিয়ে চলে যায়
ভোজ রাজিরি প্রায়।
নাইচে যারা তারা যেন সবাই মরীচিকা
যেমনি চোখে ছবি আঁকে, মোছে ছবির লিখা।

আমি যেন চেপে আছি মহাকালের তরী,
দেখচি চেয়ে যে খেলা হয় যুগযুগান্ত ধরি।
চলতে চলতে পরিচয়ের আরম্ভ ও শেষ,
সাম্‌নে দেখা দেয়, পিছনে অম্‌নি নিরুদ্দেশ।
ভেবেছিলুম ভুলবনা যা, তাও যাচ্চি ভুলে,
পিছু-দেখার ঘুচিয়ে বেদন চলচি নতুন কূলে।
পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া

এই নাড়াতেই খুসি লাগচে ব্যথা লাগচে কভু,
বেঁচে থাকার চল্‌তি খেলা ভালই লাগচে তবু।
বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া-
এ'কেই বলে জীবন তরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।
তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড়টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার-তীর্থগামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা,
যে সমুদ্রে অস্তে নামে কালপুরুষের তারা॥

হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভাগ, উপপত্তি ও বৈশিষ্ট্য *

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু ডি-এস্-সি

তিব্বতী "বস্তান্-হ্গুর" সূত্রের নবতি অধ্যায়ে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। প্রথম, বসুমিত্রের 'সমবধোপচক্র'—এখানি অধ্যাপক Wassilief তাঁহার Buddhisme' গ্রন্থে অনুবাদ করেন; দ্বিতীয়, ভব্যের 'কয়ভেত্রোবিভঙ্গ', এবং তৃতীয়, বিনিতদেবের 'সময়ভেদোপরচনচক্র'। তদ্ভিন্ন, জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার প্রণীত 'ভিক্ষুবর্ষগ্রপ্রিসা' নামে আরও একখানি পুস্তকের অনুবাদ বস্তান্-হ্গুরে দেখা যায়। অধ্যাপক Woodville Rockhill তাঁহার ইংরাজী বুদ্ধচরিতে ভব্যের অনুবাদ সম্পন্ন করেন, এবং এই প্রসঙ্গে বিনিতদেব ও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের নিবন্ধ হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের থিওরিগুলির আলোচনা বসুমিত্র ও ভব্য উভয়েরই অনুরূপ কিন্তু এতাদৃশ সংক্ষিপ্ত যে, কোন সন্তোষজনক অনুবাদ করা অসম্ভব না হইলেও দুষ্কর বটে। বিনিত-দেবের গ্রন্থখানি বসুমিত্রের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। অধ্যাপক Wassilief কৃত অনুবাদ অনেকস্থলে দুর্বোধ্য হওয়ায় Rockhill ভব্যের অনুবাদ সাধন করিয়া বিষয়টি অনেক পরিমাণে সরল করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে ভব্যপ্রণীত প্রণষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের 'অনুবাদ ও সম্পাদন' সঙ্কলন করিলাম; মূল সংস্কৃতের তিব্বতী অনুবাদ, তিব্বতী হইতে ইংরাজী এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা, এই তিন ধাপে বিষয়টির যাথার্থ্য, গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব কতদূর অক্ষুণ্ণ রহিল তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

ত্রিরত্নের অর্চনা করি!

অষ্টাদশ সম্প্রদায় ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ অবয়বগুলি কিরূপে সংঘটিত হয়? একমাত্র ভগবান্ তথাগতের উপদেশ-উত্স হইতে উত্সরিত হইয়া উহারা বিভিন্ন ধারায় নামিয়া আসিয়াছে।

শ্রীবুদ্ধপরিনির্বাণের শতাধিকষষ্টি সংখ্যক কাল * অতীত হইলে যখন নৃপতি ধর্মাশোক [কালাশোক] কুসুমপুরে [পাটলিপুত্রে] রাজত্ব করিতেছিলেন তখন কতিপয় বিতণ্ডাত্মক প্রশ্ন লইয়া সংঘে এক মহামতভেদ গড়িয়া উঠে, এবং এই বিচ্ছেদ হইতে সংঘে 'মহাসাংঘিক' ও 'স্থবির' এই দুইটি শাখা সৃষ্ট হইয়া পড়ে। এতন্মধ্যে মহাসাংঘিকসম্প্রদায় হইতে কালক্রমে অষ্ট উপসম্প্রদায় গঠিত হয়; যথা, ১ মূলমহাসাংঘিক, ২ একব্যবহারিক, ৩ লোকোত্তরবাদী, ৪ বহুশ্রুতীয়, ৫ প্রজ্ঞপ্তিবাদী, ৬ চৈত্যিক, ৭ পূর্বশৈল, এবং ৮ অবরশৈল।

স্থবির সম্প্রদায় ক্রমশঃ দশটি (?)† উপসম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইল,—১ মূল স্থবির [মতান্তরে হৈমবত], ২ সর্বাস্তিবাদী; ৩ বৈবদ্যবাদী, ৪ হেতুবিদ্য [মতান্তরে মুহুন্তক, বা মুরুন্তক],

* জাপানী অধ্যাপক Yamakami Gogon-এর মতে মহাযানী সম্প্রদায় এইগুলি :—১ মাধ্যমিক, ২ বিজ্ঞানবাদী, ৩ অবতংস, ৪ মন্ত্র, ৫ ধ্যান, ৬ সুখাবতীব্যূহ, ৭ [চৈনিক] টিয়েংটাই, এবং ৮ [জাপানী] নিচিরেন্। কিন্তু, হিন্দু ও চৈনিক বিবরণে উভয় যান-নির্বিশেষে মোট চারি সম্প্রদায়ের কথাই দেখা যায়; যথা, ১ মাধ্যমিক, ২ যোগাচার, ৩ সৌত্রান্তিক, ও ৪ বৈভাষিক। এই প্রবন্ধে শুধু হীনযানী শাখার কথাই লিপিবদ্ধ হইল।

* সম্ভবতঃ, একশত ষোল বৎসর হইবে; "পরিশিষ্ট" দ্রষ্টব্য।

† বসুমিত্রের "সমবধোপরাচক্র" মতে, সর্বাস্তিবাদী ও হেতুবিদ্য [মুহুন্তক] অভিন্ন সম্প্রদায়; পরন্তু, 'বৈবদ্যবাদী'কে তিনি 'ষণ্ণগরিক' বলিয়াছেন। এই ভেদদ্বয় গণ্য করিলে ভব্য ও বসুমিত্রের তালিকায় ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু কাহারও অষ্টাদশসম্প্রদায় হয় না,—ভব্যের বিশ, বসুমিত্রের উনিশ। "ভিক্ষুবর্ষগ্রপ্রিসা"র গ্রন্থকারের মতে মোটের উপর চারি সংসদ [সংনিকায়, ত্রিংসদে] এবং অষ্টাদশটি বিভাগ। তপশ্রীল্ সহযোগে এই বিভাগ নির্ণীত হইল:

৫ বাৎসিপুত্রীয়, ৬ ধর্মোত্তরীয়, ৭ ভদ্রযানীক, ৮ সম্মতীয় [মতা° অবন্তক, বা কুরুকুল্লক], ৯ মহীশাসক, ১০ ধর্মগুপ্তক, ১১ সদ্ধর্মবর্ষক [মতা° সুবর্ষক, বা কাশ্যপীয়] ১২ উত্তরীয় [মতা সংক্রান্তিবাদী]। মহাসাংঘিক নামটি 'মহা সংগীতি' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে. এই মত বহু লোক দ্বারা অনুসৃত হয়।

যাঁহাদের অভিমত এই যে, যাবতীয় তত্ত্বই [doctrines] এক অদ্বয় ও অপরোক্ষ জ্ঞান [তি° স্বাদ্ চিগ্ গাচিগ্-দাঙ্গ-লদাং-পাই-শেস্-রাব্] দ্বারা বোধ্য— যেহেতু, বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম জ্ঞানমার্গীয়—তাঁহারা "অদ্বৈত মতের শিষ্য" বা একব্যবহারিক।

যাঁহারা বলেন যে বুদ্ধগণ চরাচরলোক [all worlds] হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান, এবং তথাগত জাগতিক নিয়মশৃঙ্খলের বশীভূত ছিলেন না, তাঁহারা লোকোত্তরবাদী।

যাঁহারা বহুশ্রুতিয় নামক আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন তাঁহারা বহুশ্রুতীয় বলিয়া অভিহিত।

যাঁহাদের মত এই যে, যাবতীয় বিমিশ্র পদার্থের [compound things] সহিত দুঃখ বিজড়িত আছে, তাঁহারা প্রজ্ঞপ্তিবাদী।

যাঁহারা চৈত্য নামক শৈলনিবাসী তাঁহারা চৈত্যিক; যাঁহারা পূর্ব ও অবর নামক শৈলদ্বয়ের অধিবাসী তাঁহারা যথাক্রমে পূর্ব্বশৈল ও অবরশৈল বলিয়া অভিহিত।

যাঁহাদের শিক্ষা এই যে, স্থবিরগণ কতকগুলি নির্বাচিতব্যক্তি [স° অরিয়ঃ] তাঁহারা স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত—তাঁহারা হিমবত্ পর্বতে অধ্যাসিত ছিলেন বলিয়া হৈমবত নামেও বিদিত।

যাঁহাদের মত এই যে, ভূতভবিষ্যত্‌বর্ত্তমান কালে পদার্থনিচয়ের বাস্তবতা আছে তাঁহারা সর্বাস্তিবাদী।

যাঁহারা বলেন যে কতিপয় পদার্থের বাস্তবতা আছে, যথা, অতীতকর্মের যে কর্মের ফল পরিপক্বতা লাভ করে নাই, এবং কতিপয় পদার্থের বাস্তবতা নাই, যথা, সেই কর্মাদি যাহার ফললাভ হইয়াছে, বা ভাবী কর্ম-সমূহ, তাঁহারা (কর্মের) বিভাগ সৃষ্টিকারী হেতু বৈবন্তবাদী নামে অভিহিত।

যাঁহারা বলেন যে, অতীতকর্ম, বর্ত্তমানকর্ম ও ভবিষ্যকর্ম, সকলপ্রকার কর্মেরই একটা হেতু আছে, তাঁহারা হেতুর্বিদ্য।

যাঁহারা মরুন্তক শৈলনিবাসী তাঁহারা মুরুন্তক।

যাঁহারা মানবজন্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবার কালে বলিয়া থাকেন, "নারীগণ পরিবারবর্গের 'বাসস্থান' স্বরূপ, মানবকুল তাহাদের সৃষ্ট, এবং মানবগণ 'বাসস্থানে'র বাসপুত্ররূপে গণ্য হইতেছেন", তাঁহারা বাৎসিপুত্রীয়"।*

আচার্য্য ধর্মোত্তরের শিষ্যগণ ধর্মোত্তরীয় নামে প্রসিদ্ধ।
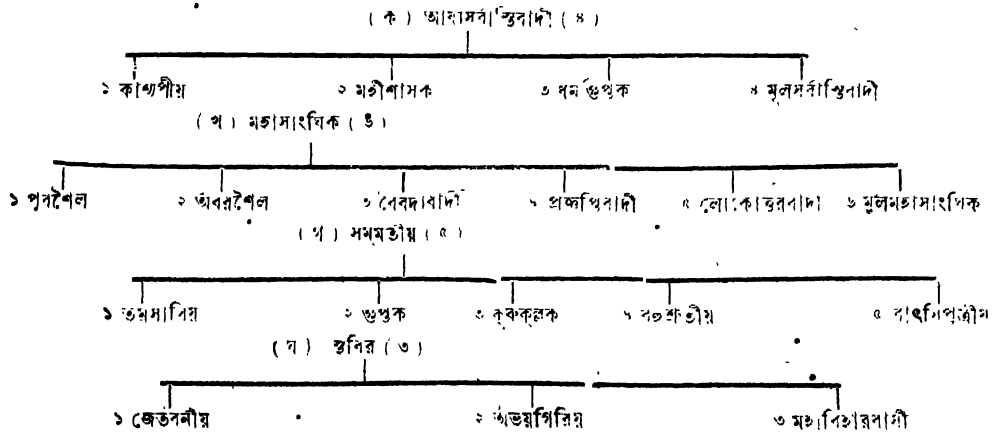
"মহাবংশের" মতে অভয়গিরিয় দল বুদ্ধনির্বাণের ৪৫৩ বৎসর পরে উদ্ভূত হয়। এবিষয়ে Turnour, পৃঃ ২০৭ দ্রষ্টব্য।

* নির্ভুল বলিতে গেলে "বাসপুত্রীয়" হওয়াই বিধেয়। কিন্তু সম্প্রদায়টির এরূপ নাম ছিল না; c. f. Stan Julien, *Listes divers des Noms des dix-huit Ecoles schismatiques* : "Journal Asiatique". 5 th series No XIV. পৃঃ ৩৫৩,৩৫৬

আচার্য্য ভদ্রযন বাঁহাদের উপদেষ্টা তাঁহারা ভদ্রযানীক। সেইরূপ, সম্মতের শিষ্যগণ সম্মতীয় বলিয়া বিশ্রুত।

যাঁহারা অবন্ত শহরে সম্মিলিত হন তাঁহারা অবন্তক নামে পরিচিত। যাঁহারা কুরুকুল পর্বতনিবাসী তাঁহারা কুরুকুল্ল(ক)।

যাঁহাদের মত এই যে, 'মহী' (পৃথিবী) হইতে জাত মনুষ্যকুলের মহীর বহির্ভূত কোন স্থানে অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাঁহারা মহীশাসক সম্প্রদায়ী।

আচার্য্য ধর্মগুপ্তের শিষ্যগণ ধর্মগুপ্তক নামে প্রখ্যাত

যাঁহারা শ্লাঘ্যাভাবমূলক ধর্মবৃষ্টি (স্বরৃষ্টি) উৎপন্ন করেন তাঁহারা স্ববর্ষক। কশ্যপের শিষ্যগণ কাশ্যপীয়, উত্তরের শিষ্যগণ উত্তরীয়।

যাঁহাদের মত এই যে, পুদ্গল পৃথগাত্মকতা ; individuality) জন্ম হইতে জন্মান্তরে উৎক্রান্ত (সংক্রমিত) হয়, তাঁহারা সংক্রান্তিবাদী।

প্রাগুক্ত শাখাগুলির মধ্যে মহাসংঘিক ও অপর সাতটি সম্প্রদায় 'নিগমনভাবে' (a priori) অনাত্মবাদী ; এবং স্থবির, সর্বাস্তিবাদী, মহীশাসক, ধর্মোত্তরীয়, কাশ্যপীয় সম্প্রদায়গুলি 'উপার্জিতভাবে' (a posteriori) অনাত্মবাদী। যেহেতু, এই সর্ব সম্প্রদায়ের মতেই যাবতীয় বস্তুই অনাত্ম। তাঁহাদের মত এই যে, যাঁহারা আত্মাবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহারা 'তির্থিক' মতাবলম্বী ; (পরন্তু) সমুদয় ধর্মই (things) আত্মাবিযুক্ত। অপরাপর সম্প্রদায়— যথা বাৎসিপুত্রীয় প্রভৃতি পঞ্চশাখা।—পুদ্গলের (আত্মার) অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁহারা বলেন, যেহেতু ষড়িন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পুদ্গল একপ্রস্থ স্কন্ধ হইতে অপরপ্রস্থ স্কন্ধে সংক্রমিত হইতে পারে (এজন্য) জন্মান্তর গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সাধ্য।*

অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এইরূপ।

২

কাহারও কাহারও মতে সম্প্রদায়বিভাগ এরূপ নহে তাঁহারা বলেন যে, মূলতঃ তিনটি শাখা, যথা স্থবির, মহাসাংঘিক ও বৈবদ্যবাদী। স্থবির সম্প্রদায়ের দুই উপশাখা,—সর্বাস্তিবাদী ও বাৎসিপুত্রীয় ; এবং সর্বাস্তিবাদীর দুই প্রশাখা,—মূলসর্বাস্তিবাদী ও সৌত্রান্তিক। বাৎসিপুত্রীয়ের চারি প্রশাখা,—সম্মতীয়, ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীক, ষন্নগরিক। এইরূপে স্থবির শাখা হইতে সর্বসমেত ছয়টী প্রশাখার সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাসাংঘিকদিগের আটটি বিভাগ,—১ মূলমহাসাংঘিক, ২ পূর্বশৈল, ৩ অবরশৈল, ৪ রাজগিরিয়, ৫ হৈমবত, ৬ চৈত্যিক, ৭ সংক্রান্তিবাদী, ৮ গোকুলিক। এইরূপে তাঁহারা মহাসাংঘিকদের বিভাগ করেন।

তাঁহাদের মতে বৈবদ্যবাদীগণের চারিটি উপসম্প্রদায়,— মহীশাসক, কাশ্যপীয়, ধর্মগুপ্তক, ও তম্রসাথিয়।

এইরূপ, অরিয়গণের অষ্টাদশটি সম্প্রদায়ের কথা তাঁহারা কহিয়া থাকেন।†

* এতদ্বারা বুঝা যায় না যে, এই সাধ্য 'জ্ঞান'ই একমাত্র নির্বাণ কিনা ; অথবা, ইহাতে মোক্ষের পথই মাত্র সূচিত হয়।

† বোধসৌকর্য্যার্থে নিম্নে তপসীলযোগে প্রদর্শিত হইল :—

(ক) স্থবির (৬)
- সর্বাস্তিবাদী
  - মূল ঐ
  - সৌত্রান্তিক
- বাৎসিপুত্রীয়
  - সম্মতীয়
  - ধর্মোত্তরিয়
  - ভদ্রযানীক
  - ষন্নগরিক

(খ) মহাসাংঘিক (৮)
- মূল ঐ
- পূর্বশৈল
- অবরশৈল
- রাজগিরিয়
- হৈমবত
- চৈত্তিক
- সংক্রান্তিবাদী
- গোকুলিক

(গ) বৈবদ্যবাদী (৪)
- মহীশাসক
- কাশ্যপীয়
- ধর্মগুপ্তক
- তম্রসাথিয়

৩
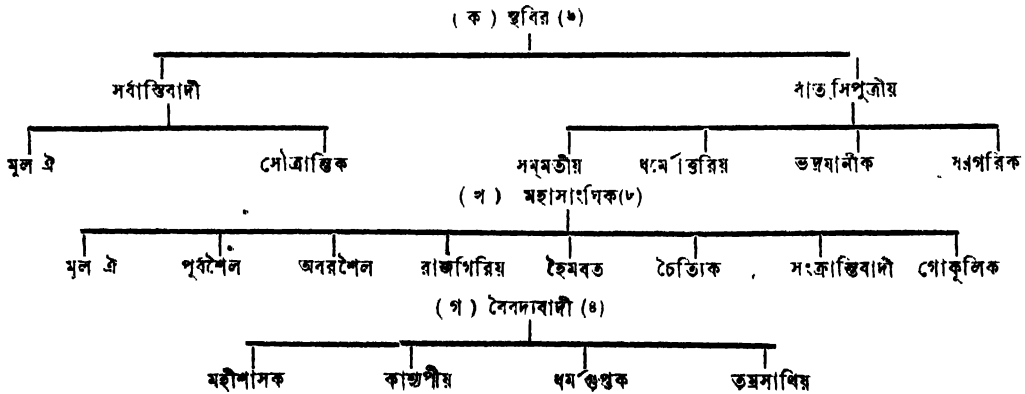
অন্যমত এই যে, তথাগতের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ১৩৭ বৎসর পরে রাজা নন্দ ও মহাপদ্ম পাটলিপুত্রে বিভিন্ন অরিয়গণকে আহ্বান করেন।* যিনি দুরধিগম্য শান্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন সেই মহাকাশ্যপ, এবং মহামান্য মহালোম [তি° স্পুছেন্-পো], মহাত্যাগ [তি° গটাঙ্-বা ছেন্-পো], উত্তর [তি° ব্লা-মা] প্রভৃতি অর্হৎগণ, যাঁহারা সূক্ষ্ম বৈশ্লেষণিক-জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহারা পাপাত্মাগণকে সুকৃতমুক্ত করিবার প্রয়াসে সমবেত হইয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণের আচার-ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হইয়া গেলে এবং নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হইলে, পঞ্চ-প্রকার বিষয় লইয়া পুনরায় সংঘে দলাদলির সৃষ্টি হয়। নাগ, স্থিরমতি ও বহুশ্রুতিয়নামা স্থবিরগণ উক্ত পঞ্চপ্রতিজ্ঞা অনুমোদন করিতেন, এবং তদ্রূপ শিক্ষাও দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, উপদেশ ['advice to another'; তি° গজাংলা লাং-গদাব্], অবিদ্যা ['ignorance'; তি° মিশেস্-পা], সংশয় ['double-mindedness'; তি° যিদ গনিস্-পা], সম্যকপ্রতিপাদন ['complete demonstration'; তি° যঙ্-স্ বতাগ্স্-পা], আত্মপ্রতিষ্ঠা, ['restoration of self'; তি° বদাগ্-ঞ্জিদ্'গসো-বার্-ব্যায়েদ্-পা]—এইগুলিই পন্থা, এবং এ বিষয়ে বুদ্ধ * শিক্ষা দিয়াছিলেন। অতঃপর সংঘ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল,—স্থবির ও মহাসাংঘিক। এই সংঘভঙ্গের পরবর্ত্তী ৬৩বর্ষ ধরিয়া উক্ত দুই দল 'নাছোড়বান্দা' কলহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

একশত দুই বৎসর পরে স্থবির ও বাৎসিপুত্রীয়গণ ধর্ম্মসমুদয় যথাযথ সঙ্কলন করেন। তৎপরেই মহাসাংঘিক সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়,—একব্যবহারিক ও গোকুলিক। একব্যবহারিকদের মতে মূলধর্ম্ম এই যে, তথাগত চরাচর সর্বলোক হইতে অন্তর্হিত হন বলিয়া তথাগত জাগতিকধর্মের বশীভূত নহেন, যাবতীয় তথাগতগণের ধর্মচক্র মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে না, তথাগতগণের 'গর্ভ' সমূহ ['the worlds of all the Tathagatas'] সম্ভূতঃ সংগঠিত হন; তথাগতগণ ইহকালে 'রূপে'র অভিলাষ করেন না; বোধিসত্ত্বগণ ভ্রূণবিকাশের ধারাবাহিক সোপানগুলি অতিক্রম করেন না [lit: does not receive the condition of *KALALA* (তি° মুর্-মুর্), *arbuda* (তি° মের্-মের্), *pechi* (তি° নার্-নার্) and *gana* (তি° গর্-গর্)] কিন্তু ঐরাবতরূপে তাঁহাদের আপনাপন জননীর বামকুক্ষির অন্তর্গত হইয়া স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন। পরন্তু, তাঁহারা বলেন যে বোধিসত্ত্বের 'কামসংজ্ঞা' নাই [তি° হদদ্-পাই'হদু'শেষ]; মানবকুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি নিকৃষ্টপ্রাণীগণের মধ্যে অভ্যুদিত হন। অধিকন্তু, তাঁহারা

। বৈশালীর দ্বিতীয় সঙ্গীতির অব্যবহিত পরেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়; কারণ, বুদ্ধের দেহত্যাগের ১১০ বৎসর পরে যদি উক্ত সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়, তবে আরও ২৭ বৎ পরে (আনুঃ ৪০৬ খৃঃ পূর্বাব্দে) নন্দ ও মহাপদ্মের সময়ে (?) পাটলিপুত্রে উক্ত অরিয়গণ সমবেত হন। "পরিশিষ্ট" দ্রষ্টব্য।

† বসুমিত্র 'সময়ভেদোপচক্রে' বলেন, "তথাগতের নির্বাণপ্রাপ্তির একশতাব্দীর কিঞ্চিদধিককাল পরে, সমুজ্জ্বল ভানু অস্তমিত হইলে, ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট অশোকের (?) রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে মহাসাংঘিকদলে বিচ্ছেদ ঘটে। পাঁচটি প্রতিজ্ঞা বিষয়ে ধারণা ও প্রবর্ত্তন-বিধি লইয়া ইহা সংঘটিত হয়:— "অপর কর্তৃক প্রভাব' [influence by another; তি° গজাং-গিস নেবার-বস্ গ্রাব-পা], 'অবিদ্যা' [ignorance; তি° মি শেস্-পা] 'সংশয়' [doubt'; তি° সম্-ঞি], 'অন্যের অনুসন্ধান' [investigation of another'; তি° গজাং-গিস রণং-পার প্যিয়দ-পা], 'বাক্যদ্বারা পন্থানিরূপণ' [the production of the way by words'; তি° লাম্স্-গ্রা (খিস্) হব্যিন্-পা]" বিনিতদেব বলেন, 'সহজসিদ্ধজ্ঞান [intuitive knowledge'; তি° রাঙ্ রিগ্'মোপ্সিন্-নো] বলিয়া কিছু নাই; অর্হতগণের সংশয় ও অবিদ্যা থাকিতে পারে [তি° দগ্রা-বচম্-পা-ন'। মস্-লা °-যঙ্-সম্ ঞি-দাঙ্ মি° শেস পা'য়দ দে); ফললাভ করিতে হইলে অপরের ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় [তি° হরাস্-বু-লা'গজাং-গি'রদা-স্প্রাদ'দগস্-সো]; দুঃখবিষয়ে আলোচনা, অপরের নিকট দুঃখবিষয়ক ব্যাখ্যা করা, ইহাতে পন্থা নির্ণীত হয় [তি°সদুগ-বস্ঙ্গাল্'স্মস-মিঙ্, সদুগ বস্ঙ্গাল'র্জসিগ-ড্রক্দ-পাস্-লাম্' স্কিয়ে-বার্-হগ্যার-রো]", এ বিষয়ে 'Taranath', পৃঃ ৪১ পঙক্তি ২০, দ্রষ্টব্য।

বলেন যে একমাত্র জ্ঞান [তি' দজন্, ইযে শেস্] দ্বারা চারিসত্য সম্পূর্ণ অধিগত হয়, ষড়বিজ্ঞান রিপুবশীভূত এবং রিপুমুক্তও বটে। তাঁহাদের উপপত্তি [theory] এই যে,—চক্ষু রূপ ['forms'] দেখে, অর্হত্‌গণ অপরের তত্ত্ব (doctrines) আয়ত্ত করিতে পারেন, অবিদ্যা ও অনিশ্চয়তা দূরীভূত করিবার একটি পন্থা আছে; সম্যক-প্রতিপাদন ও দুঃখ আছেই আছে, সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ অবস্থাতেও কতকগুলি বাক্য আছে যাহা উচ্চারণ করা যায়; অবিশুদ্ধতা (impurity) নাশ করা যায়, যিনি 'সম্যক নিরোধ' ('right restraint') সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন তিনি যাবতীয় আসক্তির উচ্ছেদ করিয়াছেন; অবশিষ্ট মানবকুল সম্বন্ধে তথাগতগণের সম্যকদৃষ্টি নাই; মন (তি° সেম্‌স্) তেজঃ স্বভাব, এ হেতু 'অনুশয়' (thoughts; তি° বগ-লা 'ন্যাল্) মনের অংশভাগী হয়, কি হয় না, তাহা ব্যক্ত করা অসুচিত; অনুশয়-সমুদয় এক পদার্থ; সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত ('the completely spread out') বস্তু যাহা (স° মনঃ, তি° কুন্-নাস্-লদাঙ্'বা) তাহা অন্য পদার্থ; অতীত ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা বর্ত্তমানে থাকিতে পারে না; 'স্রোতপত্তি'গণই ধ্যান আয়ত্ত করিতে পারেন। এইগুলিই "একব্যবহারিক"দিগের মূল তথ্য।

"গোকুলিক"গণের দুই উপশাখা,—বহুশ্রুতীয় ও প্রজ্ঞপ্তিবাদী।

বহুশ্রুতীয়দিগের সারকথা এই—প্রকৃত মোক্ষের ('real salvation'; স' নির্যানিক) পথে কোনরূপ জীবন গঠন করা যায় না; দুঃখ—বিষয়িগত সত্য (subjective truth'; তি° কুন্-দসব্-কিয়ি'বদেন্-পা), এবং আযাসত্যই (তি° হ্ফাগ্‌স্-পাই'বদেন্) সত্য; সংস্কারজনিত দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারিলেই সম্যক পবিত্রতায় প্রবেশ করা যায়; ক্লেশ ও পরিবর্ত্তের দুঃখ (misery) উপলব্ধি করিবার কোন পন্থা নাই; সংঘ পার্থিব আইনকানুনের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, অর্হত্‌গণ অন্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মোপদেশ অর্জন করিতে সমর্থ; সম্যক-প্রচারিত মার্গ একটি আছে (তি' যঙ্-দাগ্-পার্'বস্‌গ্রাগ্‌স্-পাই-লাম্'যঙ্-য়দ্ ভো); পূর্ণযোগে (স° সমাপত্তি) প্রবেশ করিবারও সম্যকপন্থা আছে।

প্রজ্ঞপ্তিবাদিগণ বলেন যে, ক্লেশ ত কোন স্কন্ধ নয়; সম্পূর্ণ আয়তন কিছু নাই; সর্ব সংস্কাররাশি একত্রবন্ধনে বদ্ধ; ক্লেশ হইল চরম—absolute (তি' স্‌ডুগ্-বস্নগাল্-নি'ডন-ডাম্-পর্‌ রো); মন হইতে সঞ্জাত যাহা-কিছু তাহা পথ নয়, অকালমৃত্যু অসম্ভব (তি' ডুস্-মা-যিন্-পার্' হ চি-বা'নি' মেডো); মানুষী কর্ত্তৃত্ব কিছু নাই ('human agency', তি' স্কাইয়েস্-বু-বাইয়েড্-পা'যঙ্-মেড্-ডো); কর্ম্ম হইতেই যাবতীয় ক্লেশের উত্‌পত্তি।

গোকুলিকদিগের অপর একটি উপসম্প্রদায় আছে, তাহাকে "স্থবির-চৈতিক" বলা হয়। মহাদেব নামে জনৈক পরিব্রাজক বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করেন; তিনি কোন পর্বতে বাস করিতেন, তথায় একটি চৈত্য ছিল। তিনি মহাসাংঘিকগণের বিধি অনুমোদন না করিয়া একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, তাহা "চৈতিক" নামে অভিহিত হয়।

এই ছয়টি হইল মহাসাংঘিকদের বিভিন্ন শাখা।

স্থবিরবাদীগণের দুইটি শাখা,—মূলস্থবির (তি° স্নগর্-গ্যি'গ্নাস্‌ব্রটাং) ও হৈমবত।

মূলস্থবিরদের মত এই যে, অপরের ধর্ম্মোপদেশে অর্হতগণ সংসিদ্ধ হইতে পারেন না; অতএব, অবশিষ্ট পঞ্চপ্রতিজ্ঞাগুলিও তাঁহারা অস্বীকার করেন। পুদ্‌গলের বাস্তবতা আছে; দুই ক্রমিক জন্মের মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থার বিদ্যমানতা নাই; অর্হত্-ত্বই পরিনির্বাণ (তি' দগ্রা-বচম্-পা' যঙ্গস্থ' ম্যা-ন্‌গাং-লাস্-হ্দাসপা' নি'য়দ-ডো); অতীত ও ভবিষ্যত্ বর্ত্তমানের মধ্যে নিহিত আছে; নির্বাণের একটি অর্থ আছে।

হৈমবতদিগের মূলকথা এই—বোধিসত্ত্বগণ সাধারণ মনুষ্য নহেন, তির্থিকগণেরও পঞ্চ 'অভিজ্ঞান' আছে; পুদ্‌গল্ স্কন্ধ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, কারণ নির্বাণাবস্থায় স্কন্ধ সমুদয় রুদ্ধ হইয়া যাইলেও পুদ্‌গল বিদ্যমান থাকে; 'সমাপত্তি' অবস্থায় বাক্যস্ফুরিত হইতে পারে; মার্গদ্বারা ক্লেশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

আদ্য স্থবিরবাদ (তি° দাঙ্-পয' গ্নাস-ব্রটং) দুইশাখায় বিভক্ত হয়,—সর্বাস্তিবাদ ও বাত্‌সিপুত্রীয়।

সর্বাস্তিবাদিগণের মূল বক্তব্য দুইটি প্রতিজ্ঞায় বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

(ক) যৌগিক ও মূলপদার্থের বাস্তবতা আছে। এই পরিকল্পনা হইতে কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায় এই যে, পুদ্গল বলিয়া কিছু নাই; অতএব যখন কাহারও কর্তৃত্ব নাই (তি° বাইয়েদ-পা· মেদ্-চিঙ্গ্), যখন ন্যায়ের কর্ত্তা বলিয়া কেহ নাই, এবং আত্মাবিহীন হইয়া এই দেহ জন্মান্তর পরিগ্রহ করে, তখন সত্বার আবহমান স্রোতের মধ্যেই 'জীব' পড়িয়া গিয়াছে ('one consequently drops into the stream of existence')—এইরূপই তাহারা বলিয়া থাকেন, ইহাই তাহাদের প্রধান বক্তব্য

(খ) 'নামরূপ' লইয়াই তাঁহাদের মূল ব্যাপার। অতীত ও ভবিষ্যতের বিদ্যমানতা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। 'স্রোতপত্তি' ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। যৌগিকবস্তুর তিনটি বিশেষত্ব আছে; চারি পবিত্র সত্য ক্রমশঃ অধিগত হয়। শূন্যতা, অকাম্যতা ("the undesired") ও অবিশেষত্ব ("the uncharacteristic") হইতেই বিশুদ্ধাবস্থা ["the unblemished (state"); তি° স্বাইয়ন্-মেদ্-পা-লা] সঞ্জাত হয়। "স্রোতপন্ন" ফল প্রাপ্তি হইতে ১৫ মুহূর্ত্ত* অতিবাহিত হয় মাত্র। স্রোতপত্তি ধ্যান অবলম্বন করেন। এমন কি অর্হত্-ত্বও একটি অপূর্ণ অবস্থা। সাধারণ মানব 'রাগ' ('evil-mindedness') অথবা দুষ্প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ। এমন কি তিথিকের পঞ্চ অভিজ্ঞান থাকিতে পারে, এবং দেবগণেরও ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবার বিধি আছে। সূত্র সমুদয়ের একটি সরল (তি° ড্রাঙ্গ্-পো; ঋচু) অর্থ আছে। যিনি বিশুদ্ধসত্যে উপনীত হইয়াছেন তিনি 'কামধতু'র বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। কামলোকে অধিবাসী জীবগণের কামলোক বিষয়ে একটি সম্যকবোধ অন্তর্নিহিত আছে। পঞ্চবিজ্ঞান রিপুর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয় না, পরন্তু পঞ্চবিজ্ঞান একেবারে রিপুমুক্তও নয়।

সর্বাস্তিবাদিগণের অপর একটি সম্প্রদায় আছে, তাহা 'বৈবজ্যবাদী' নামে অভিহিত। বৈবজ্যবাদীর উপশাখা এইগুলি,—মহীশাসক, ধর্মগুপ্তক, তাম্রসথিয় এবং কাশ্যপীয়।

মহীশাসকগণের স্থূল কথা এই—অতীত ও ভবিষ্যতের বিদ্যমানতা নাই; বর্ত্তমানে যৌগিকবস্তুরই অস্তিত্ব আছে; ক্লেশের পার্থক্য নির্ণয় করা মানে চারিসত্যের অঙ্গগুলি পরীক্ষা করা; অনুশয়গুলি সব এক, কিন্তু তাহাদের পৃথক্ লক্ষণ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক; ধারাবাহিক দুই জন্মের মধ্যবর্ত্তী অন্য অস্তিত্ব নাই; দেবভূমে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কোন ধর্ম নাই; এমন কি অর্হত্ও সুকৃত সঞ্চয় করিতে পারেন; পঞ্চবিজ্ঞান রাগের ('passion') অধীন এবং অধীন নয়-ও বটে; পুদ্গল জীবের সর্বাঙ্গেই বর্ত্তমান; স্রোতপত্তি ধ্যানী হইবেন; সাধারণ জনগণ রাগ ও দুষ্কর্ম বর্জন করিতে পারে; সংঘের মধ্যেই বুদ্ধের অধিষ্ঠান, বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের পরম মোক্ষাবস্থা ('perfect freedom') একমাত্র; এমন কোন পদার্থ নাই যাহা পুদ্গলকে অবগত হইতে পারে। মন, অথবা তাহার অবভাস ('manifestations'), অথবা জন্মপরিগ্রহবিষয়ের নিয়মকানুনের অল্পিষ্ট সাহায্যকর কোন পদার্থই জন্ম হইতে জন্মান্তরে উত্ক্রান্ত হয় না। যাবতীয় যৌগিকবস্তুই ক্ষণকালস্থায়ী। সংস্কারের প্রসার হেতু ("extension of the sanskara"; যদি জন্মান্তর স্বীকৃত হয় তবে সংস্কারের নিত্যতা থাকিতে পারে না। 'কর্ম' ও 'মন' সমধর্মী। মনই একমাত্র বস্তু যাহার স্বেচ্ছাবৃত্তি আছে। অপকর্মপ্রাপ্তির হেতুমূলক নহে এরূপ নিয়ম কিছু নাই। কায় ও বাক্যের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। চৈত্যকে সম্বর্দ্ধনা করায় কোন সুফল (reward) লাভ হয় না। বর্ত্তমানের ঘটনামাত্রেই একটা অনুশয় বিশেষ (তি° ড্-ল্টার বায়ঙ্গ্-বা ঢাগ্-তু নি বগ্-লা-ঠ্যাল্-বা' যিন্নো); যৌগিক বস্তুর বিভিন্নতা নির্ণয় করা ও নিষ্কলসত্যে প্রবেশ করা একই কথা।

ধর্মগুপ্তকদের সার কথা এই—বুদ্ধ সংঘের বহির্বস্তু †; বুদ্ধকে উপনয়ন (*offerings*) নিবেদিত হইলে মহা সুফল

*নির্মলসত্তায় ['unblemished reality'] প্রবেশ করিয়া ১৫ মুহূর্ত্তে যে মানসিক উন্নতি['mind's development'; তি° সেম্স্-বস্কাইয়েদ্-পা] লাভ হয় তাহাকে 'স্রোতপন্ন,' বলে; অন্যকথায়, "স্রোতপন্ন" হইল নির্বাণমার্গের প্রথম পাদ বা ধাপ।

† বিনিতদেবের সহিত ঐক্য আছে; কিন্তু বসুমিত্রের মতে 'বুদ্ধ সংঘেই বিম্বিত'।

হয়, কিন্তু সংঘে অর্পিত হইলে কোন ফল নাই। দেবভূমে 'ব্রহ্মাচারয়' ('life of virtue') বলিয়া একটা ধর্ম আছে। প্রপঞ্চের (তি' হ্‌জিগ্‌-র্টেন্‌-পাই-চস্‌-নি' য়দ্‌-ডো) নিয়ম-পরম্পরা আছে। (অধিকন্তু, বসুমিত্র বলেন, "অহতের দেহ আস্রবশূন্য"); তাঁহাদের অপরাপর উপপত্তিগুলি মহাসাংঘিকদের মতই।

কাশ্যপীয়গণ বলেন যে, প্রতিফল, প্রতিফলের নিয়ামবর্তিতা, ও প্রতিত্যসমুত্পাদ + বিদ্যমান আছে; যে ব্যক্তি অধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে সে পূর্ণজ্ঞানী ‡। ইহাদের অন্যান্য উক্তিগুলি (তি° হদদ্] ধর্মগুপ্তকের ন্যায়।

তম্রশাখিয়ের মূল কথা এই যে, পুদ্‌গল বলিয়া কিছু নাই। সর্বাস্তিগণের এক শাখা সংক্রান্তিবাদী, ও এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য উত্তর। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, পঞ্চস্কন্ধ সমুদয় ইহজন্ম হইতে পরজন্মে সংক্রমিত (তি' হফো) হয়, মার্গ আবিষ্কার করিতে না পারিলে স্কন্ধসমুদয়ের নিরোধ হয় না;* একটি স্কন্ধ আছে যাহা সহজাত পাপের ('inborn sin ') আস্রব। পুদ্‌গল বস্তুকে বিষয়িগতভাবে (তি ডন্‌-ডাম্‌-পার্) বিবেচনা করা চলে না। সর্বৈব অশাশ্বত।

এইরূপে সর্বাস্তিবাদিগণের সাতটী উপসম্প্রদায়ের মূল মতসমুদয় উল্লিখিত হইল।

বাত্‌সিপুত্রিয়গণের মূল তথ্য এই—মানুষের বিষয়াধিকার এবং উপদন (উপাদান আসক্তি, clinging) একজাতীয়—"the possession of what one was attached to and upadana are solidary"; ইহজন্ম হইতে পরজন্মে কোন ধর্মই (Properties) গমন করে না। (বসুমিত্র বলেন, "পুদ্‌গল ভিন্ন অপর কোন বস্তুই জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করেন না"; বিনিতদেবও এই কথা বলেন), পঞ্চস্কন্ধে আবদ্ধ জীবের পুদ্‌গলই মাত্র সংক্রামিত হয়, কতকগুলি বিমিশ্র পদার্থ (সংস্কার) আছে যাহারা ক্ষণস্থায়ী, এবং কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী নয়; পুদ্‌গল, উপাদান-স্কন্ধ-গত, কি উপাদান-স্কন্ধ-গত নয়, তাহা বলা উচিত নয়; সর্ব অবস্থার 'একীকরণ' অথবা 'বিচ্ছেদন'-ক্রিয়ার উপর নির্বাণ নির্ভর করে কিনা তাঁহারা সেরূপ কিছু বলেন না—"they donot say that nirvana is in the unication of all conditions, or that it is in the disruption of them"*; নির্বাণের প্রকৃতস্থিতি ("real existence") তি' য়দ্‌-পা' স্থিদ্) আছে বা নাই, এরূপ তাঁহারা কিছু বলেন না। তাহারা বলেন যে, পঞ্চবিজ্ঞান রাগের বিষয়ীভূত নহে; পুনশ্চ, রাগশূন্য বিজ্ঞান থাকিতে পারে না।

বাত্‌সিপুত্রিয়গণের দুই বিভাগ,—মহাগিরিয় ও সম্মতীয়। সম্মতীয়ের মূল কথা এই।—বস্তুর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাস, বস্তুর (বর্তমান) অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং যাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে বিশ্বাস ইহাদের আছে; জন্মমৃত্যুর অস্তিত্বে বিশ্বাস—যথা, যে বস্তু বা যে ব্যক্তি নাশপ্রাপ্ত হইবে, যে বস্তু অন্তর্হিত হইবে, যে বস্তু প্রত্যক্ষ কিংবা

+ হৈতুকী উৎপত্তি। "Dependent origination—" Yamakami Gogen; "law of coming to pass"—W. W. Rockhill.

‡ মূলে আছে, "যে অধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে সে অপূর্ণজ্ঞানী [তি' স্পঙ্‌স্‌-লা যঙ্‌স্‌-মা শেস্‌-পা'য়দ-ডো], কিন্তু Rockhil এর মতে ইহা নমাত্মক। বসুমিত্রের গ্রন্থে আছে, "স্পঙ্‌স্‌-পা যঙ্‌স্‌ শেস-পা'য়দ-ডো, মা'স্পঙ্‌স্‌-পা'যঙ্‌স্‌-স্পঙ্‌ ডজেস্‌-পা-মেড-ডো।" এজন্য, ভব্যের উক্তি "স্পঙ্‌স্‌-পা"র অর্থ হয়—"যে অধর্ম (পাপ পরিত্যাগ করিয়াছে"। কিন্তু Wassilief বসুমিত্রের অনুবাদে বলিয়াছেন—"যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে"। বিনিতদেবে আছে, "যঙ্‌স্‌ শেস্‌-লা-মা-স্পঙ্‌স্‌-পা ... মে ডো"; ইহার অর্থ, "যিনি সম্যকজ্ঞানী তাঁহার এমন-কিছু নাই যাহা পরিত্যক্ত হয় নাই"। অতএব, এই উক্তিটিতে উপযুক্ত অনূদিত ভাবোক্তি সমর্থন করা যায়

* বসুমিত্রের উক্তি বিপরীত। বিনিতদেব এই সম্প্রদায়ের কথাগুলির উল্লেখ করেন নাই।

* এই উক্তিটি দুর্বোধ্য। তিব্বতী ভাষাটি এই: ম্যা-ন্‌গান্‌-লাস্‌-হ্‌দাস্‌-পা নি-চস্‌ পামস্‌ চাড্‌-দাঙ্‌-গচিগ্‌-পা-স্থিদ্‌-ডু'ডাম'থাদাদ্‌-পা-স্থিদ্‌-ডু মি ব্রজড্‌-ডো"। বসুমিত্র অথবা বিনিতদেব এই নীতির উল্লেখ করেন নাই।

যাহা বিজ্ঞান—ইহাঁরা করিয়া থাকেন।* (ইহাঁদের তত্ত্বগুলি বড়ই অস্পষ্ট)।

মহাগিরিয় (তিং রি-চেন্-পো) সম্প্রদায়ের দুই শ্রেণী, —ধর্মোত্তরীয় ও ভদ্রযানীক। ধর্মোত্তরীয় সম্প্রদায়ের সার কথা এই—জন্ম অবিদ্যাসম্ভূত; জন্মনিরোধে অবিদ্যানিরোধ। ভদ্রযানীক মতেও এইরূপ। কেহ কেহ বলেন যে ষণ্ণগরিক সম্প্রদায় মহাগিরিয় সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ. আবার, কেহ কেহ বলেন যে পূর্বোক্ত সম্প্রদায় সম্মতীয়ের শাখাবিশেষ। এইরূপ বাৎসিপুত্রীয়ের চারি শাখা

৪

অষ্টাদশ বিভাগ (তিং র্নাম্-পা) কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির উপপত্তি-প্রতিষ্ঠা হইতে ক্রমশঃ সমুদ্ভূত হয় ("ভব্য" এক্ষণে অপরশ্রেণী ঐতিহাসিকের থিওরি উত্থাপন করিতেছেন)। আরও একটি বিভাগ আছে যাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। তত্ত্বসমূহের বৈষম্য হইতে সর্বাস্তিবাদিগণের চারিশাখা চারিমত লইয়া সৃষ্ট হইল। (ক) ভাব (substance, তিং ডঙ্স্-পো), (খ) লক্ষণ (characteristics; তিং মতসান্-নিদ্), (গ) অবস্থা (condition; তিং জ্ঞাস্-স্কাব্স্), এবং (ঘ) পরিবর্ত্তন (change; তিং গজান্' গজান্-ডু' হগ্যুর্-বা-ন্যিদ)—এই চারিবিষয়ে চারিমত লইয়া উক্ত শাখাগুলি গড়িয়া উঠে।*

মূল "ভাব" ও তাহার পরিবর্ত্তন বিষয়ে ভদন্ত ধর্মত্রাত বলেন:—

কাল ও অবস্থা (circumstances; তিং চস্-র্নামস্) অনুসারে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বা ভাব ভাবান্তর পরিগ্রহ করে না। যদি সুবর্ণনির্মিত একটি 'কারুকার্য্যখচিত ভাণ্ড' (vase) ভাঙ্গিয়া ভিন্নাকৃতি-বিশিষ্ট অপর কোন সামগ্রী গড়া যায়, তাহাতে অপর 'বস্তু'তে (substance, তিং র্ডসাস্) রূপান্তরিত হয় না. সেইরূপ, দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইয়া বিভিন্ন আস্বাদ ও বিভিন্ন গুণ (তিং নুস্-পা) যুক্ত হইলেও, উহাতে বস্তুত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। পরন্তু, যদি অতীতের ধর্ম (conditions) বর্ত্তমানে স্থিতিলাভ করে তবে অতীতের বস্তুত্বও (তিং ডঙ্স্-পো) তাহাতে থাকিবে। অতএব তিনি বলিলেন, যদি বর্ত্তমানের ধর্ম ভবিষ্যধর্মে প্রোত থাকে তবে নশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই,—There is no destructible matter. বর্ত্তমানের বস্তুত্ব (তিং ডঙ্স্-পো) বিনাশধর্মী নহে (অর্থাৎ ভবিষ্যতেও অটুট থাকে)।

"লক্ষণে"র পরিবর্ত্তন বিষয়ে যাহা উপপত্তি তাহা ভদন্ত ঘোষক কর্তৃক সৃষ্ট। তিনি বলেন:—

কালের প্রভাবেও বস্তুনিচয় অতীতের লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতেও বজায় রাখিবে। বস্তুর ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎলক্ষণ তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিবে। দৃষ্টান্তস্থলে বক্তব্য, যদি কোন স্ত্রীলোককে কতিপয় পুরুষ ভালবাসিয়া থাকে, তবে তাহারা স্ত্রীজাতির (অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদের) প্রতি ভালবাসাহীন হইতে পারে না।

"অবস্থা" পরিবর্ত্তনের উপপত্তি ভদন্ত বসুমিত্র গড়িয়াছিলেন। তিনি বলেন:—

কালের প্রভাবে বস্তুসমুদয় পরিবর্ত্তশীল হইলেও তাহাদের অবস্থার (তিং জ্ঞাস্-স্কাব্স্) ব্যতিক্রম হয় না। উদাহরণস্থলে বক্তব্য, কোন বিশেষ উদ্ভিজ্জের একটি প্রাণ আছে লোকে বলিয়া থাকে, উদ্ভিজ্জের একশত ধারাবাহিক জীবনে শত-প্রাণ, সহস্র জীবনে সহস্র প্রাণ লোকে বলিয়া থাকে।

অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উৎক্রমণের উপপত্তি ভদন্ত বুদ্ধদেব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন:—

বস্তুর উপর কাল যে কার্য্য করিতেছে, সেই কালের সুদূরবর্ত্তী (remote; তিং স্নগন্) ও নিকটবর্ত্তী (proximate, তিং ফাই-মা) ক্ষণে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে বোধ হইবে যে, বস্তুসকল এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, জনৈকা স্ত্রীলোককে কেহ "মা" বলিয়া সম্বোধন করে, আবার কেহ-বা "বু-মো"

* অর্থাৎ, তাহারা বিষয়াত্মক ও বিষয়িগত উভয়বিধ সত্তায় বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে বসুমিত্র ও বিনিতদেবের বক্তব্য দ্রষ্টব্য। বিনিতদেব এই সম্প্রদায়কে "কুরুকুল্লকা", "গুপ্তক" ও "বাৎসিপুত্রীয়" সম্প্রদায়গণের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

(বালিকা) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল (কোন অতীতকালে)।

এজন্য, এই চারি সম্প্রদায়ী সর্বাস্তিবাদীগণ বলেন যে যাবতীয় বস্তুর বাস্তবতা থাকিবেই।

সেইরূপ, কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, সবসমেতে সাতটি প্রতিত্য (তিং র্কেন্) আছে,—১ হেতু, ২ আলম্বন (চিন্তা), ৩নৈকট্য (তিং দে-মা-থগ্-পা, ৪ আত্মা (তিং ব্দাগ্-পো), ৫ কর্ম, ৬ আহার্য্য (food, তিং জাস্), এবং ৭ অধীনত্ব (dependency ; তিং তে'ন্)।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যক্ষানুভূতির মাত্র চারি পন্থা, সত্য নানাবিধ (তিং বদেন্-পা' সো-স্ব); অপরে কহিয়া থাকেন যে, ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান (তিং চস্-শেস্-পা) অষ্টবিধ, এজন্য বৈশ্লেষনিক জ্ঞান (analytical knowledge) বলিতে কিছু নাই।

পরিশিষ্ট

'কালাশোক' নামে নৃপতির কথা মগধের ইতিহাসে দেখা যায় না, তবে Rockhill এই নামটি কোথায় পাইলেন?[১] সিংহলের পালি "মহাবংশে" দুইজন অশোকের পরিচয় আছে; প্রথম অশোক 'কালাশোক', দ্বিতীয় অশোক[২] 'ধর্মাশোক'। মহাবংশের মতে কালাশোক বুদ্ধনির্বাণের ১০০ বর্ষ পরে কুসুমপুরে রাজত্ব করিতেন, এবং ইঁহার রাজত্বকালেই সদ্ধর্মসঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশমূলক শাস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়। এই কালাশোকের ১০ পুত্র প্রথমে ২২ বর্ষ, পরে ৯ পুত্র ২২ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার শেষ পুত্র ধননন্দ। ধননন্দের পরেই মৌর্য্যবংশের অভ্যুত্থান। বায়ুপুরাণ[৩] মতে শিশুনাগবংশীয় শেষরাজা মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজা হইবেন, তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন, এবং ২৮ বৎসর রাজত্ব করিবেন। মহাপদ্মের অবসানে তাঁহার দ্বাদশটি পুত্র, প্রত্যেকে ৮ বৎসর করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্যভোগ করিতে থাকিবেন। ইহাদের অবসানে নন্দ রাজা হইবেন। অতঃপর তাঁহার ১০০ বর্ষ রাজ্যভোগান্তে তিনি কৌটিল্যকৌশলে রাজ্যচ্যুত হইবেন, এবং চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবেন। অতঃপর ভদ্রসর (বিন্দুসার?) ২৫ বর্ষ রাজ্য করিবার পর তৎপুত্র অশোক ২৬ (?) বর্ষ রাজত্ব করিবেন। কিন্তু বায়ুপুরাণে কালাশোকের নাম নাই। ইহাতে মনে হয় 'পিয়দসি' [প্রিয়দর্শি] যেমন অশোকের একটি 'বিরুদ' বা উপনাম, 'কালাশোক' নামটিও পূর্বোক্ত নৃপতিগণের মধ্যে কাহারও উপনাম হইবে।

বুদ্ধনির্বাণকালবিষয়ে দুই তিনটি মত দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে,[৪] "সিংহল ও শ্যামের প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধনির্বাণ অব্দ আরম্ভ; Max Muller প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহা হইতে আরও ৬৬ বাদ দিয়া ৪৭৭ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধনির্বাণ স্থির করিয়াছেন। এদিকে সকলেই বলিতেছেন যে শেষ জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ সমসাময়িক, সুপ্রাচীন বহু বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন-সম্প্রদায় বহুকাল হইতে যখন একবাক্যে ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিয়া আসিতেছেন, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি প্রধান বৌদ্ধজনপদে বহুকাল হইতেই (উক্ত বর্ষের ১৬ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ) ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে বুদ্ধনির্বাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন ৪৭৭ খৃঃ পূর্বাব্দকে আমরা নির্বাণাব্দ বলিয়া সমীচীন মনে করি না।"

এদিকে ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ ও ডাঃ মজুমদার[৫] ৪৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দকে নির্বাণাব্দ ধরিয়াছেন, অন্যত্র ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্[৬]

১ W. W. Rockhill, 'The Life of the Buddha,' পৃঃ ১৮২, (১৮৮৪)

২ 'প্রিয়দর্শী' অধ্যায়, "বিশ্বকোষ"।

৩ "বায়ুপুরাণ," ৯৯ অধ্যায়।

৪ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", বৈশ্যকাণ্ড, পৃঃ ১০৮ ৯

৫ V. Smith: "The Early History of India." পৃঃ ৩৬; ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার; "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"।

৬ V. Smith (revised by H. G. Rawlinson I. E. S.): "The Oxford Students' History of India," 1929.

বলিতেছেন, "The date of his (Buddha's) death is uncertain, but there is good reason for believing that the event happened in or about 543 B. C., the traditional date." M. Taylor[৭] বলেন যে শাক্যমুনির মৃত্যুকাল ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে, 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থেও[৮] ঐরূপ ধরা হইয়াছে; কিন্তু, Harmsworth[৯] ৪৮৭ খৃঃ পূঃ ধরিয়াছেন, এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী[১০] ৪৮৩ খৃঃ পূঃ ধরিয়া ৬০ বৎসর আগাইয়া আনিয়াছেন। এখানে শুধু দুই মত ধরিয়া দুই অশোকের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিব। প্রথম মত, ৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দ, দ্বিতীয় মত, ৪৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দ।

দ্বীপবংশের মতে "সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পরে পিয়দর্সন রাজ্যলাভ করিবেন," মহাবংশও বলিতেছে—

"জিন-নিব্বানতো পচ্ছা পুরে তস্সাভিসেকতো।

অট্ঠারসং বসসসতং দ্বয়মেবংবিজানিয়ং॥"

Rockhill-এর তিব্বতী "খোটেন-রাজ্যের ইতিবৃত্তে"র অনুবাদ[১১] ঐ বাক্যদ্বয়েরই সমর্থন করিতেছে। প্রথম মতে ৩২৪ খৃঃ পূর্বাব্দ, ও দ্বিতীয় মতে ২৬৯ খৃঃ পূর্বাব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক। পূর্বোক্ত অব্দটি ধরিলে তিনি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক হইয়া পড়েন; নগেন্দ্রনাথ বসু এই মতটিই পোষণ করেন[১২]। দ্বিতীয় অব্দটি সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে দেখিতেছি। প্রথম মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে, ও দ্বিতীয় মতে ৩২১ খৃঃ পূর্বাব্দে (ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও অন্যান্য মতে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি ২৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে এবং অভিষেক ৩।৪ বৎসর পরে ধরিয়া গণনা করায় উক্ত অব্দটিই স্থিরীকৃত হইয়াছে)। জৈনগ্রন্থ[১৩] হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে, এবং শকরাজ কণিষ্কের রাজ্যারোহণ ৭৮ খৃঃ ধরিলে মহাবীরের মোক্ষকাল ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দটি পাওয়া যায়। যথা—

"বীরমোক্ষাদর্দ্ধশতে সপ্তত্যাব্দেশতেগতে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্ নৃপঃ॥ হেমচন্দ্র, পরিপর্ব অর্থাৎ, মহাবীর স্বামীর মোক্ষকাল হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে, ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক, এবং

"পণছ সমবস পণনা সজুদং গমিয় বীরণি-বুইদো সগরাজো" অর্থাৎ, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্বে, ৫২৭ খৃঃ পূর্বাব্দে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

কোন কোন জৈনগ্রন্থে[১৪] ৩১৩ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি অব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ হিসাবে তিনি সেলিউকাস নিকেটরের সমসাময়িকরূপে গণ্য হইতেছেন, কারণ তাঁহারও রাজ্যাভিষেক ঐ অব্দে। অপরপক্ষে, চন্দ্রগুপ্ত জৈন 'পট্টচর' [ধর্মাধ্যক্ষ] ভদ্রবাহুর সমসাময়িক হিসাবে গণ্য হওয়ায়[১৫] চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ কাল ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে এই মতটিই সমর্থিত হয়।

অতঃপর, কালাশোক কে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। ভব্যের "১৬০ বৎসরকাল পরে কালাশোকের অভ্যুদয়" এই মতটি যদি গণ্য করা যায় তবে নির্বাণকালের প্রথম মতে ৩৮৩ (৫৪৩—১৬০) খৃঃ পূর্বাব্দে কালাশোক কুসুমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন বুঝা যায়, সুতরাং প্রথম মতে ইহা দ্বারা নন্দবংশীয় শেষ রাজা ধননন্দের কালই সূচিত হয়; দ্বিতীয় মতে অঙ্কটি ৩২৭ খৃঃ (৪৮৭—১৬০) পূর্বাব্দ হওয়ায় চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব রাজ্যাঙ্কের মধ্যে পড়ে, এজন্য পুনরায় কালাশোক বলিতে ধননন্দকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাবংশের মতে কালাশোকের পুত্রগণ ৪৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পর

৭. M. Toylor: 'Manual of Indian History,' পৃঃ ৪৫, ৫০

৮ "বিশ্বকোষ", ১৯ খণ্ড।

৯ Harsmworth: "History f the World." vol. IV.

১০ দুর্গাদাস লাহিড়ী: "পৃথিবীর ইতিহাস", ৫ম খণ্ড।

১১ Rockhill: l. c chap. VIII, 'The Early History of Li-Yul (Khoten)', পৃঃ ২৩৩,

১২ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"; বৈশ্য ও রাজন্যকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৩ হেমচন্দ্র-সূরি: পরিশিষ্ট-পর্ব, ৮।৩৩৯; ও "ত্রিলোকসার"।

১৪, "তিথ্গালিয়া পয়ন্না" ও "তীর্থদ্ধার প্রকীর্ণক," "পৃথিবীর ইতিহাস," ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯ ধৃত।

১৫ "পৃথিবীর ইতিহাস," ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৯পৃঃ।

মৌর্য্যবংশের সূত্রপাত; এ হিসাবে কালাশোক কখনই ধননন্দ হইতে পারেন না।

প্রথম মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ধরিলে ৪৪ বৎসর পূর্ব-অব্দ ৪১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দটি পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট্ স্মিথের মতে[১৬] তাহা অজাতশত্রুর পুত্র দর্শকের রাজাকাল মধ্যে পড়ে; ইহা যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ কুসুমপুরের তখন প্রতিষ্ঠাই হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় মতের অনুকূল গণনা দ্বারা (৩২১ + ৪৪) ৩৬৫ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়, এবং ইহা ভিন্সেন্ট স্মিথ-ধৃত মহাপদ্মের কালই নির্দ্দেশ করে, কেন না তাঁহার মতে ৩৭১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ মহাপদ্মের রাজ্যারোহণকাল। প্রথম মত ধরিলে ভিন্সেন্ট্ স্মিথ-ধৃত অজাতশত্রুর রাজ্যারোহণকাল ৫০০খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পরিবর্ত্তে ৫৫১ (৫৪৩ + ৮)[১৭] খৃঃ পূঃ ধরিতে হয়, এজন্য ৪১৬খৃঃ পূর্ব্বাব্দটি নন্দবংশীয় মহাপদ্মের রাজত্বের শেষকাল সূচিত হয়। এই মহাপদ্ম এবং অপর ৯ জন (মতা ৮; মহাবংশমতে ১৯; বায়ুপুরাণ মতে ১৩) রাজাকে লইয়া বায়ুপুরাণ মতে ১০০ বর্ষ, ভিঃ স্মিথ্ মতে ৫০ বর্ষ, এবং মহাবংশ মতে ৭২ বর্ষ (৪৪ + ২৮)[১৮] অতীতান্তে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় অমান্য করিলে, মহাবংশের মতে মহাপদ্মের কাল হয় ৪৪৪ হইতে ৪১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত (অবশ্য বায়ুপুরাণের ২৮ বর্ষ রাজাকাল গণ্য করিলে). এবং মহাপদ্মই যে কালাশোক তাহা সপ্রমাণিত হয়। কারণ, মহাবংশকথিত "কালাশোক বুদ্ধনির্বাণের ১০০ বর্ষ পরে কুসুমপুরে রাজত্ব করিতেন"—এই উক্তিটি বজায় থাকে। বায়ুপুরাণে আছে, "রাজা মহাপদ্ম ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইবেন; তিনি ২৮ বর্ষ যাবৎ পৃথ্বীপালন করিবেন"। এই পুরাণ ব্যতীত (সম্ভবতঃ 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'ও আছে) অন্যত্র কোথাও মহাপদ্মের রাজ্যকাল সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

এক্ষণে বুদ্ধের একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে[১৯] —

"আমার পরিনির্বাণের ৪ মাস পরে সংঘের প্রথম সম্মিলন হইবে, এবং ১১৮ বর্ষ পরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারজন্য দ্বিতীয় সম্মিলন হইবে। এই সময়ে ধর্ম্মাশোক (কালাশোক?) নামে এক ধার্মিক ও প্রতাপশালী নরপতি জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করিবেন।"

এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উত্তরবাসী বৌদ্ধগণ কালাশোককে বহুশাস্ত্রে ধর্ম্মাশোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং (প্রিয়দর্শি) অশোককেও কখন কখন ধর্ম্মাশোকই বলিয়াছেন, কেহই 'কালাশোক' উক্তি করেন নাই, এজন্য একটু মুস্কিল হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণবাসী বৌদ্ধগ্রন্থে (যেমন সিংহলের পালি 'মহাবংশে') কালাশোক ও ধর্ম্মাশোক উভয়ই আছে। বুদ্ধকথিত এই ধর্ম্মাশোক (উভয় অশোকই ধার্মিক) নিশ্চয় প্রিয়দর্শি মৌর্য্যাশোক নহেন, পরন্তু ইনিই দক্ষিণবাসীদের কালাশোক; এই বাণীদ্বারা ৪২৫ (৫৪৩-১১৮) খৃঃ পূর্ব্বাব্দ সূচিত হওয়ায় মহাপদ্মই যে কালাশোক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি[২০] যে বুদ্ধনির্বাণের ১০০ বৎসর পরে যশস্, রেবত্ প্রভৃতি অরিয়গণ মিলিত হইয়া বৈশালীর সংঘবৈঠকে দশপ্রশ্রয়ের প্রতিবাদ করেন মাত্র, তদ্ভিন্ন কার্য্য আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। এক্ষণে তাহারও ৮ বৎসর পরে (বুদ্ধমতে) প্রকাশ্যে দুইটি দল সৃষ্ট হইল,—স্থবির ও মহাসাংঘিক। এ বিষয়ে জাপানী সোগেনের[২১] মত এই—

"When 116 years had elapsed after the death of the Great Teacher, there arose amongst his followers a violent controversy regarding

১৬ "Early History of India," l. c.

১৭ "According to the *Li-Yul-gyi lo-rgyus pa*, f. 420 a Ajatasatru became King of Maghada five years before the Buddha's death···The Southern recension (See Dipawonso, iii 60) says that it was eight years after Ajatasatru's coronation that the Buddha died" Rockill, l. c. পৃঃ ৯১

১৮ মহাপদ্মের রাজ্যকাল ২৮ বর্ষ [বায়ু পু: ৯৯ অধ্যায়]

১৯ "বিশ্বকোষ," ১০ খণ্ডে-ধৃত।

২০ "বিচিত্রা," মাঘ সংখ্যা, ১৩৪৩।

২১ Y. Sogen Systems of Buddhistic Thought." (Calcutta University Lectures, 1912)

the theory and practice the Vinaya, which divided them at last, into two bitterly antagonistic camps. The conservative party came to be designated as the *Sthaviras*, while their opponents styled themselves Mahasanghika."

এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে ভব্যের কালনির্ণয় ৩৮৩ খৃঃ পূঃ (৫৪৩-১১৬ হওয়াই সমীচীন। বৈশালীতে বিনয়পিটকের অন্তর্গত দশপ্রশ্ন লইয়া যে দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাতে ৫।৬ বৎসর পরেই সমগ্র বিনয়পিটকের উৎপত্তি ও অনুষ্ঠান লইয়া (কুসুমপুরে?) প্রকাশ্য সংঘভঙ্গ হওয়াই সম্ভব; এবং সেটি কালাশোক মহাপদ্মেরই যুগ।

ভব্যবর্ণিত অনাগত স্বীকার্য হইলে ১৩৭ বর্ষ পরে (৫৪৩ –১৩৭ – ৪০৬) ৪০৬ খৃঃ পূর্বাব্দে মহাপদ্ম ও ধননন্দের মধ্যবর্ত্তী কোন এক নন্দবংশীয় রাজার রাজত্বকালে সংঘে সম্প্রদায়-সৃষ্টি হইয়াছিল ধরিতে হয়। সেই নৃপতিই 'কালাশোক-নন্দ' ও নবনন্দের অন্যতম, কিন্তু বায়ুপুরাণোক্ত বা বুদ্ধকথিত "মহাধার্মিক ও প্রতাপশালী" কি করিয়া হন বুঝা যায় না, কেননা ইতিহাস নবনন্দের মধ্যে প্রথম নন্দ (মহাপদ্ম) ও শেষনন্দ (ধননন্দ) ব্যতীত অপর সাতটি নন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন না। ধননন্দের রাজ্যকাল ৩৪।৩৫ বৎসর ধরিলে (বায়ুপু ১০০ বর্ষ) ৪০৬ খৃঃ পূর্বাব্দটি ধননন্দের প্রথম রাজ্যাঙ্কেই পড়ে, কিন্তু মহাবংশের মতে পরবর্ত্তী ৯ নন্দের ৪৪ বৎসর রাজ্যকাল নির্দিষ্ট করা যায়, পক্ষান্তরে, মহাপদ্মের রাজ্যকাল ৪০ বৎসর ধরিলে (বায়ুপু মতে ২৮ বর্ষ) ৪০৬ খৃঃ পূঃ মহাপদ্মের রাজ্যাঙ্কের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ভব্যবর্ণিত "তথাগতের নির্বাণপ্রাপ্তির ১৩৭ বর্ষ পরে রাজা নন্দ ও মহাপদ্ম" উভয়েই এককালে কি করিয়া অরিয়গণকে আহ্বান করিতে পারেন বোধগম্য হয় না। মনে হয় ("নন্দ ও মহাপদ্ম" র পরিবর্ত্তে) "নন্দ-মহাপদ্ম" হইবে। তজ্জন্য বায়ুপুরাণের ২৮ বর্ষ রাজত্বকাল স্বীকৃত হয় না; হয়ত মহাপদ্ম আরও ১০।১২ বৎসর অধিক রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। তিনিই দাক্ষিণবাসী বৌদ্ধদিগের "কালাশোক"। সব দিক দিয়া গণনা করিলে মনে হয় জাপানী সোগেনের উক্তিটিই গ্রাহ্য করা উচিত; কেন না তাহা হইলে শ্রীবুদ্ধের বাণীটিই কালের ইতিহাসপটে বাস্তবের রূপ ধরিয়াছিল ইহা অস্বীকার করা চলে না। তাই ভব্যের ১৬০ বর্ষের পরিবর্ত্তে ১১৬ বর্ষই সমীচীন বোধ করিয়া মহাপদ্মকে কালাশোক স্থির করিলাম।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

বরষা

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ঘন-মেঘ-কুন্তলা এল ঐ বরষা !
বুকে প্রীতি উচ্ছল, করুণায় সরসা !
লীলায়িত ভঙ্গিমে নাচি' নাচি' চলে সে,
নর্ত্তনে বর-তনু দুলে নব-আবেশে !
মঞ্জীর-নিক্কণে সুর তুলে দাদুরী,
বিদ্যুতে উঠে ফুটে হাস্যের মাধুরী !
অঞ্চলে বিজড়িত কেয়া-নীপ-যুঁথিকা,
গাঁথা যেন শত শত দ্যুতিময় মণিকা !

ঝর্ ঝর্ ঝরে জল শতধারা-নিঝরে,
ফল্গু সে বহি চলে মরুভূমি-ঊষরে !
বনে বনে উৎসব, ধরা সাজে শ্যামলী,
শুষ্ক নদীর বুকে আসে বান্ উছলি !
মাঠে মাঠে কৃষাণের বুক ভরে পুলকে,
লক্ষ্মীর কৃপা আজ নেমে এল ভুলকে !
অন্তরে জাগে গান—এল ঐ বরষা !
এল প্রীতি-উচ্ছলা, করুণায় সরসা !

স্রোতের মুখে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আজিকার কথা আজিকাই বলো বলো
কালিকে সে-কথা হবে বড়ো পুরাতন।
যে-প্রেমে আজিকে আঁখিদুটী ঢলো ঢলো
সে-প্রেম ফুরাবে ফুরাইলে দুটী ক্ষণ।
সন্ধ্যা-মালতী সন্ধ্যার কোল ভরি'
প্রভাতে শিথিল অবশ পড়ে যে ঝরি' ;—
শেফালির মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধরি'
রাখিবে কি আজীবন ?
আজিকার কথা আজিকাই বলো বলো
কালি যে সে-কথা হবে বড়ো পুরাতন।

আজিকার ব্যথা আজিকাই ভুলে' চলো
কালিকে সে-ব্যথা হবে বড়ো পুরাতন।
আঁখির পাতায় অশ্রু যে টলো টলো
মুক্তা তো নয় রবে না সে চির-ধন।
বাদলে বাদলে গিয়াছে ধরণী ভরি'
পিছে পিছে তার আলো ঝল্ মল্ করি'
বাঁশরি বাজায়ে আসে যে শরৎ, হরি'
নিতে তনু প্রাণ মন।
আজিকার কথা আজিকাই ভুলে' চলো
কালিকে সে-ব্যথা হবে বড়ো পুরাতন।

আজিকার সুখে আজিকাই গেয়ে চলো
কালিকে সে-সুখ হবে বড়ো পুরাতন।
ঠোঁটের কিনারে আজি যেই হাসি—বলো
ধরিয়া রাখিতে পারিবে কি সারাক্ষণ ?
তৃণে তৃণে যেই শিশির শিহরে মরি !
শুকায়ে যে যাবে কিম্বা পড়িবে ঝরি' ;—
কোন্ প্রেম-সুখ শুধু মনে স্মরি' স্মরি'
রাখা যায় আজীবন।
আজিকার সুখে আজিকাই গেয়ে চলো
কালিকে সে-সুখ হবে বড়ো পুরাতন।

আজিকার মালা আজিকাই গেঁথে তোলো
কালিকে সে-মালা হবে বড়ো পুরাতন।
সুখ-সুরে আজ নদী চলে ছলো ছলো,
সেথায় কালিকে ধূ ধূ মরু কাঁটাবন।
আজিকে ফাগুনে পৃথিবীর বুক, মরি !
মরকত চুঁণি নীলাতে গিয়াছে ভরি',
উষর কঠোর বৈশাখ অবতরি'
জ্বালি' দেবে হুতাশন।
আজিকার মালা আজিকাই গেঁথে তোলো
কালি যে সে-মালা হবে বড়ো পুরাতন।

আজিকার কথা আজিকাই বলো বলো
কালিকে সে-কথা হবে বড়ো পুরাতন,
আজিকার এই "আজি"টা কোথায় বলো
কাল খুঁজে পাবে, পাবে এই হিয়া মন !
হায় যে সকলি স্রোতের টানেতে সরি'
চ'লে চ'লে যায়—নূতনের নব তরী
প্রতি খনে আসে নব নব বেশ ধরি'
নিয়ে নব আয়োজন।
আজিকার কথা আজিকাই বলো বলো
কালি যে সে-কথা হবে বড়ো পুরাতন।

লতা চাপলির পথে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ

মানুষ স্থাবর নয় জঙ্গম। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে স্থবিরক। তার শারীরিক ও মানসিক চলচ্ছক্তিহীনতা আপনার বশে। ইচ্ছা করলে আত্মহত্যাও করতে পারে। ইচ্ছাই ত গতি-শক্তির প্রেরণা। ইচ্ছা হয় না বলেই ত দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর আমরা দেহমনে খিল্ দিয়ে ঘরে বসে থাকি। বাহিরের এই রূপের জগৎ তার নানা শোভা সৌন্দর্য্যের পসরা পেতে বসে থাকে। আমরা যে অন্ধ তা নয়, সৌন্দর্য্যবোধ যে নাই তাও নয়, তবু সে তাগিদ অন্তরে নাই যা আমাদের দু পা হাঁটিয়ে এই বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটা নিকটতর পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। আল্‌মারিতে বই আছে, গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার পাতা কাটা হল না, হয়ত কোনো দিনই হবে না। কেতাবগুলো ওই তাকের উপর চিরপ্রতীক্ষায় রইল। কেন এমন হয়? গৃহকোণটির ভিতর কি এমন মধু আছে যে আমাদের দশা—যাকে বলে, 'কমলোদর বন্ধনস্থ' ভৃঙ্গবৎ?

বিজ্ঞান বলে আমরা জড়ের থেকে উদ্ভূত হয়েছি, পরমাণুর মধ্যে বদ্ধ ইলেক্‌ট্রনের ঘূর্ণী কল্পকল্পান্তরে আমাদের চেতনায় ফুটে উঠেছে। সেই নবোদ্বুদ্ধ চেতনা জীবের সঙ্গে জীবকে ও জগৎকে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে নিজের ব্যক্তিত্বটিকে নানা অভিজ্ঞতা অনুভূতির ভিতর দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলতে চায়। একটা কথা শুনেছিলাম

"তরবো হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।

স জীবতি মনো যস্য মননে নহি জীবতি॥"

গাছপালা পশুপক্ষী বেঁচে আছে এক রকমে। আর এক রকম বাঁচা মননশক্তির জোরে বাঁচা। সেই মনস্বিত্ব জড়ের বন্ধনের ভিতর আমাদের অনেকেরই ভাল করে ফোটেনি, তাই জীবন্ত মনের প্রক্রিয়াও আমাদের মধ্যে অনেক সময়ে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। জড় ধাক্কা পেলে চলে, আমাদেরও ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে। আমার সেই ঘুমটা হঠাৎ ভাঙ্‌ল স্নেহাস্পদ এক তরুণ বন্ধুর পত্রাঘাতে। পেলেম তাঁর নিমন্ত্রণ বরিশালের নদীনালা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আসমুদ্র ঘুরে আসতে হবে। যে ঠন্‌কো টিনের এঞ্জিন গাড়ীটার স্প্রিং কেটে গেছে অথচ চাকাগুলো ঠিক আছে, তার নাকে দড়ি দিয়ে টান্‌লে সে চলে বইকি। আমার অন্তঃপ্রেরণা যতই দুর্ব্বল হোক্, যখন সুতোয় টান পড়ল তখন আর অচল-প্রতিষ্ঠ হয়ে থাকা সম্ভব হল না। সুতরাং লোটা কম্বল নিয়ে ছুটলাম বরিশালের মুখে।

অথ যাত্রারম্ভ ২০শে অক্টোবর বেলা ৩-৫০ মিনিটের ট্রেণে বরিশালের পথে। ঢিলে মানুষের মনে ট্রেণ ফেল হবার আতঙ্কটা জাগরূক থাকে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় এই কথাটার সত্যতা প্রত্যক্ষ করলাম আলিপুর থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত রৌদ্রোজ্জ্বল পথে। এতদিন ধরে মোটরে, বাসে, ট্রামে কলকাতার সহরে কত ঘুরে বেড়িয়েছি, কই দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা ত কখনো মনে হয় নি। কিন্তু সেদিন কেবলি মনে হ'তে লাগল, ওই বুঝি টায়ার ফাটল, লাগল বুঝি ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা, পড়ল বুঝি লোকটা আমার গাড়ী চাপা। গাড়ী ছুটে চলেছে নানা বাধা-বিঘ্নের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। ঝোপে ঝোপে কত দৈবাতের বাঘ ওত পেতে আছে আমার এই অভিসারটিকে এক লম্ফে ধূলিসাৎ করে দিতে। মোটরটা যখন ভিড়ের হিড়িকে থেমে দাঁড়ায় অমনি আমার ঘড়ির কাঁটা যেন দ্বিগুণ বেগে ছুটতে আরম্ভ করে, ষ্টেশন এখনও নাগালের বাহিরে—many a slip between the cup and the lip

চায়ের পেয়ালা হাতে

খসে যদি দৈব্যাতে,

উৎসুক সে চুমুক

হবে শুধু বায়ুভুক্!

এই রকম করে ভরিয়ে ডরিয়ে কাহিল হতে হতে যখন ষ্টেশনে পৌছান গেল এবং যথাসময়ে গাড়ীর কাম্‌রার জানালার ধারের স্থানটি দখল করে বসলাম, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব দুর্ভাবনার তিরোধান হল। ট্রেণ ফেল হবার হাত থেকে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। সন্ধ্যার পরে খুলনায় পৌছে উৎসাহের আতিশয্যে মোট সমেত কুলির পথপ্রদর্শক হয়ে যে ষ্টীমারটিতে তাড়াতাড়ি উঠ্‌লাম, কুলিকে বিদায় দেওয়ার পর আবিষ্কার করা গেল যে ভুল ষ্টীমারে চেপে বসেছি। বুঝলাম ঘাট না ছাড়তেই আমার তরী ডুবল। তারপর কেমন করে যে ব্যাগ্‌ বেডিং নিয়ে বিদায় হুইসিল্‌বাদিনী বরিশালযাত্রিনীর ক্যাবিনে শেষ মুহূর্ত্তে আশ্রয় পেলাম সে কথা না বলাই ভাল। জামা জুতা ছেড়ে ডেকের আরাম চেয়ারে আপনাকে এলিয়ে দিয়ে লুপ্ত সম্বিৎ ফিরে পাওয়া গেল। পথে নৌকাডুবি না হলে কাল ভোরে যে বরিশালে পৌছাব সে সম্বন্ধে আর সংশয় রইল না।

বাঁধা রাস্তায় চলায় বড় একটা উত্তেজনা নাই। কিন্তু যে পথে চলা সাধারণের সাধ্যাতীত, সেই উন্মার্গগতিতে একটা নূতনত্বের নেশা আছে। বন্ধুটি Touring Officer। এ অঞ্চলে প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিঘা চরজমি দানা বেঁধে উঠছে জলসমাধির থেকে। তার ফাটলে ফাটলে নদীনালার অলিগলি। সেপথে ফেরি ষ্টীমারের গতিবিধি নাই। বন্ধুর ঘাটেবাঁধা লঞ্চ্‌টি সুন্দরবনের কঞ্চুকী, এই বিপুল চরের অন্তঃপুরে তার সর্ব্বত্র অবাধপ্রবেশ। বনলক্ষ্মীর অসূর্য্যম্পশ্য অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করলাম এই ষ্টীমারের কল্যাণে। বাংলার উপকণ্ঠে একটি ঔপসাগরিক 'নয়া বাংলা'র সম্প্রসার বেড়ে চলেছে প্রতি বৎসর। সেই উপবঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করবার দুর্ল্লভ সুযোগ পাওয়া গেল। একশ' মাইল জলপথে দুধারের জঙ্গল ও আবাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে সমুদ্রের তীরে খেয়া ভিড়াতে হবে এই ছিল বন্ধুর ব্যবস্থা। সেখানে সমুদ্রের তীরে নিবিড় জঙ্গলের পাশে একটি ডাকবাংলার আতিথ্য তিন রাত্রির জন্য গ্রহণ করে, সমুদ্রে স্নান, বালিয়াড়িতে বিচরণ ইত্যাদি সমাপনান্তে পুনশ্চ বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন।

আমাদের ভ্রমণপন্থা মোটামুটি এই রকম : –

(১) বরিশাল থেকে যাত্রা। বরিশাল নদী, বাখরগঞ্জ নদী ও বেঘাই নদীপথে

(২) খাপ্‌রাভাঙা। আঁধারমাণিক নদী পার হয়ে

(৩) লতা চাপ্‌লি। সেখানে তিন রাত্রি বাস করে আঁধারমাণিক দিয়ে

(৪) আমতলিতে ষ্টীমারে রাত্রিবাস। বেঘাই নদী ও গুলিশাখাই দামের ভিতর দিয়ে

(৫) মরিচ কুনিয়া। বেঘাই ও পটুয়াখালি নদীপথে

(৬) পটুয়াখালি। লোহালিয়া নদী পার হয়ে

(৭) গলাচিপা। ষ্টীমারে রাত্রি বাস। লোহালিয়া নদীপথে পুনশ্চ

(৮) বরিশাল।

সুন্দরবনের কঞ্চুকী
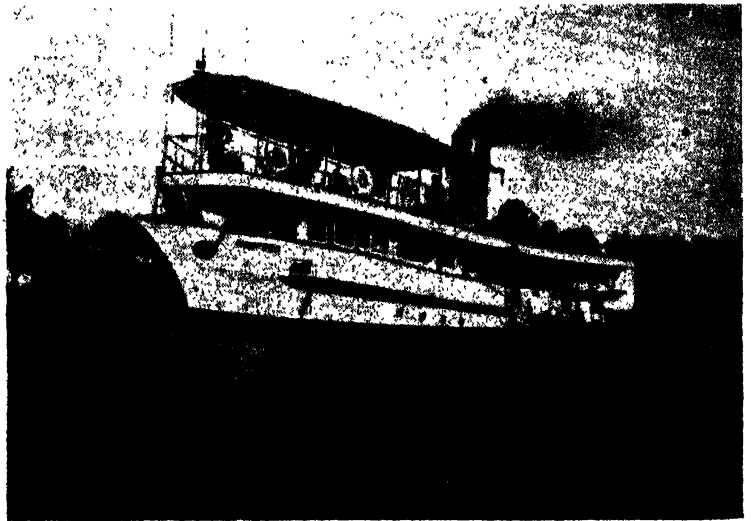
২২শে অক্টোবর। সকালে আন্দাজ ৯||০টার সময় আমাদের

ষ্টীমার ছাড়ল। ডেকে গিয়ে একখানি Camp chair দখল করে হাত-পা মেলে বসলাম। দুচোখ বাঁধা পড়ে রইল দুপারের ধানের ক্ষেতে আর জঙ্গলে জঙ্গলে। নদীর জল একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। অতি মিহি একটি মাটির নরুণপাড় যেন তার তরল ধূসরাঞ্চলখানির সীমান্তরেখা, সমতল নধর সবুজ ক্ষেতগুলির প্রান্তে টেনে রেখেছে। মাটির বন্ধন কঠিন হলেও স্নেহার্দ্র, মাঝে মাঝে গ'লে গ'লে নদীর জলে খ'সে পড়ছে।

কচুরি পানার ফৌজ কাতারে কাতারে ভেসে চলেছে। বাংলা দেশটিকে জয় করে, তার নদীনালা পুষ্করিণীতে ছাউনি গেড়ে, বিজয়ী সেনানী চলেছে দক্ষিণবাহিনী ধারা-পথে। নদী আজ নৌকাবিরল। দু-একখানা ভারী নৌকা চলেছে মরালগতিতে। মাঝি হালের মস্ত হাত-লটি ঠেলে কেবল আগুপিছু করছে, দুখানি দাঁড় দুপাশে তালে তালে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে। ক্ষেতের পর ক্ষেত কোথাও দিগন্তবিস্তৃত, কোথাও অদূরে বনরাজিবেষ্টিত, কোথাও বা গুল্মবিটপী জটলায় খণ্ডিত। মাঝে মাঝে বাঁশি ঝাড়, খাড়ির মুখ, বনস্থলীর অন্তঃপুরের দেহলি।

নীল জমির উপর যেন সাদা রঙের রুহিতনের টেক্কা। আশপাশের দৃশ্যগুলির উপর ক্রপ্ করে নিমেষে একপিঠ মুগ্ধদৃষ্টি সংগ্রহ করে নিল। তীরে কচিৎ দুএকখানি কুঁড়ে ঘর, দুচারিটি ছাগল, দুএকটা গরু। মাঝে মাঝে নদীর ধারে দুএকটা শুভ্র বক, কেউ বা উদগ্রীব, কেউ বা আনত-চঞ্চু। কৃষকবধূ মাথার উপর বাহু উত্তোলন করে ষ্টীমারের দিকে চেয়ে আছে। ডেকের রেলিংএর ফাঁকে আমি যে তাকে দেখলাম এবং একটি ছত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম, সে তুচ্ছ সংবাদটি চিরদিনই তার অগোচরে থাকবে। তা নদীতীরে কৃষকবধূর মূর্ত্তিটি এই সহরে চোখে একটি ছবি এঁকে রেখে গেল।

পথিক চলেছে হন্ হন্ করে পুরাণ বিগলিত-বর্ণ ছাতা মাথায় দিয়ে, হাতে একটি গাছের ডালভাঙা লম্বা লাঠি, কোন গ্রামের পানে তা সে-ই জানে। তার চলার গতিটা কেদারায় হেলান-দেওয়া আমাকে অকস্মাৎ চলিষ্ণু করল কেন?

মাথার উপর শরতের নীলাকাশ, আর ওই সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থানে স্থানে মেঘচ্ছায়া। রৌদ্রে ঝলমল এই নদীর জলে কালো ছায়ার জাজিম পাতা।
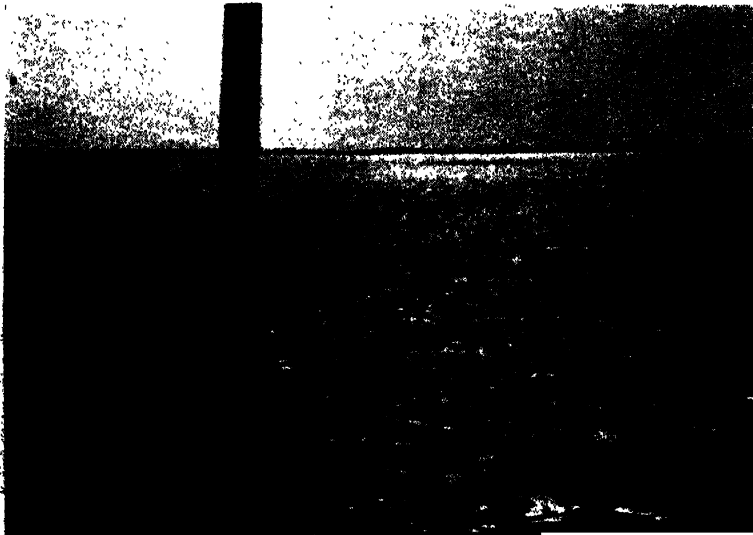
আঁধারমাণিক

ওই একখানা ছোট্ট পান্সী ভেসে চলেছে। তার বুকভরা নীল পালখানিতে একটি চৌকোণা সাদা তালি,

২৩শে অক্টোবর। কাল সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটা তেমন ফুটলনা। ভাঙা গলায় গানের মত বর্ণ-মূর্চ্ছনার স্বর-

ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তারপর সন্ধ্যার তরল আঁধারটি মধুময় লাগল। সপ্তমীর চাঁদ, দুচারিটি তারা, আর ওই দিগন্তবিস্তৃত নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে এই নিঃসঙ্গ ষ্টীমারের ক্ষিপ্র পাড়ী। আজ দুর্গাপূজার সপ্তমীতিথি। বাংলার শঙ্খ ঘণ্টার আরতিধ্বনি এখানে এসে পৌছাল না। বাজল শুধু আমার মনে।

এই নদীর নাম 'আঁধার মাণিক'।

আজ একটা তরল ধূসর আলোর চাদর মুড়ি দিয়ে আপনার কাজলশ্রী আমার চোখে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে যখন ঝলমলে তারার হাজার-নরী মালাটি গলায় পরে দাঁড়ায় নিরাবরণে, তখন সেই তিমির-বরণীর কী রহস্যঘন রূপটি ফুটে ওঠে, সেই কথাই কেবল মনে হচ্ছিল। কোন্ মাঝি-কবি এর নাম আঁধার মাণিক রেখেছিল এই অ-থই অকূলে পাড়ী দিতে দিতে? আমরা লেখা পড়া শিখে নিরেট মূর্খ হয়েছি। পরের বুলি কপ্‌চে নিজের প্রাণের শূন্যতা জাহির করি। নিবিড় অনুভূতির ভিতর দিয়ে যে দুএকটা কথা বুদ্বুদের মত ফুটে ওঠে, তার লাগে, তাদের মুখে ফোটে দুটো একটা কথা, থাকে লোকের মুখে মুখে অমর হয়ে।

আঁধার মাণিকই ত প্রেমিকের চক্ষে নারীর শাশ্বত রূপ, চিরন্তন সোহাগের বাণী। চিররহস্যের অন্ধকারে আকাশভরা তারার মত যার দীপ্তি, এই নদীর মত যে তলতটহীন। দেখা ত চোখের না, সান্দ্র অনুভূতির ভিতর খোলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি। এই কালো জলের সুনিবিড় আলিঙ্গনের মত যার স্পর্শের গহনতা সেই স্পর্শই ত আঁধার মাণিক।

সন্ধ্যার পর দরিয়ার পাড়ী শেষ করে ষ্টীমার ঢুকল খাড়ীর ভিতর। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে চলেছি। এই রকম ফাটলে ফাটলে জমাট জঙ্গল তার অন্তরে প্রবেশের সঙ্কীর্ণ জলপথগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। নতুবা সুন্দরবন চিররহস্যের অনধিগম্যতায় চিরদিনই আমাদের নাগালের বাহিরেই থাকত। খাপ্‌রা ভাঙায় পৌছলাম। ষ্টীমারে নোঙর পড়ল, এইখানেই রাত্রিবাস। সকালে বন্ধু ডিঙিবাহনে তীরস্থ হবেন। তাঁর তদারক কার্য্য শেষ

সুন্দরবন
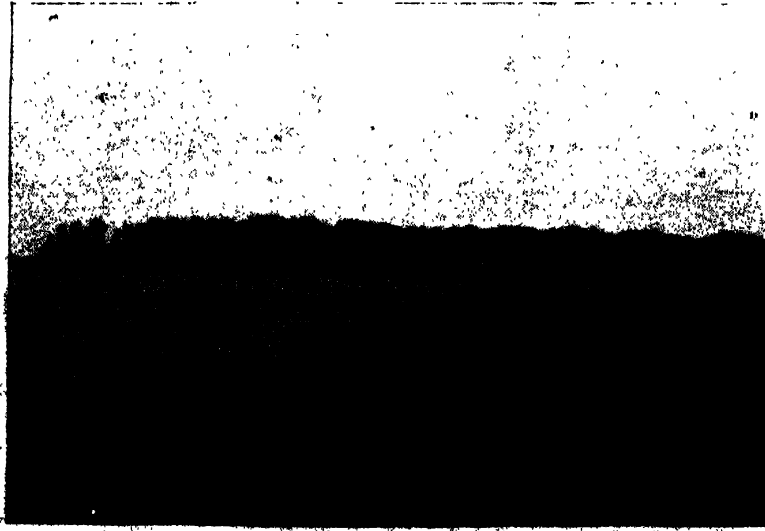
মাহাত্ম্য আমরা বুঝব কেমন করে, এই নিঃসাড় প্রাণের বাণীহীন নৈঃশব্দ্যের ভিতর! আমাদের স্বগতোক্তি বলে কিছু আছে কি? 'প্রকৃতির স্পর্শ যাদের বুকে গিয়ে হলে পরে লতাচাপ্‌লির মুখে অগ্রসর হওয়া যাবে। লতাচাপ্‌লি এখান থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ।

ঝিরঝিরে সমুদ্রের বাতাস আসছে। খাড়ীর জল

নিথর, একটু কাঁপছে মাত্র সিন্ধু-সমীরের স্পর্শে। সেই ঈষৎকম্প্র জলে সপ্তমীর তন্বী শশিকলার ছায়াখানি রূপার তাবিজের মত প্রসারিত হয়ে গেছে। তারার প্রতিবিম্বগুলি দুলছে, অদৃশ্য বোঁটায় আলোকের ফুল।

পোকার দৌরাত্ম্যে রাত্রে ডিনারের পরে আর পড়তে পারলাম না। ডেকে বসে চাঁদের রক্তপাণ্ডুর অস্তিমের জলসমাধি দেখলাম। বন্ধু সুকণ্ঠ, গাইতে বললাম। দুটি গান শুনলাম, তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রাত্রির সঙ্গে মুখোমুখী বসে রইলাম মুগ্ধ হয়ে।

২৪শে অক্টোবর। বেলা ১১॥০ টা। বন্ধু ঘণ্টা খানেক হল ইন্‌স্‌পেক্‌শন শেষ করে এসেছেন। তাঁর কাছে Rupert Brooke এর গুটিকতক কবিতার আবৃত্তি শুনলাম। বড় ভাল লাগল। "নদীমিবান্তঃ সলিলাং সরস্বতীং" তাঁর অন্তর্গূঢ় কাব্যরসধারা। আফিসের ফাইল চাপা পড়েও শুকিয়ে যায়নি। পানাপুকুরের শৈবালদল সরিয়ে স্বচ্ছ সুমিষ্ট জল পান করে শুষ্কতালুর পিপাসা মিটল, সেই আবৃত্তি-ধারার অঞ্জলি পান করে।

হবে। মাটিগলা ঘোলা জল, দুপারে নিবিড় জঙ্গল, মাঝে মাঝে মগদের কুটীর। এ অঞ্চলে মগরা পত্তনী পেয়েছে। এদের পূর্ব্বপুরুষরা অনেকে নাকি জলদস্যু ছিল। এখনও সুবিধা পেলে পৈত্রিক পেশার চর্চ্চা করে থাকে। ষ্টীমারে Capstan বা নোঙরের ঘানিগাছটির উপর অচল হয়ে বসে চলেছি এই তন্বীধারার বীথিপথের দুপারে চোখ বুলিয়ে। নদীযাত্রায় পা চলে না, চলে কেবল অপলক চোখ দুই তীরের শ্যামল শোভা সঙ্কলন করতে করতে। এই রকম পঙ্গু-পরিক্রমার বড় একটা আলস্যমধুর আনন্দ আছে। ক্রমাপসারিণী দৃশ্যপরম্পরা চোখের সামনে কেবলই প্রসারিত হয়ে চলেছে। নিস্তব্ধবিস্তৃত দৃষ্টির কাছে একদিকে সবই স্থির, আবার সেই সঙ্গে আশপাশে ক্রমশ পট পরিবর্ত্তন। বৈচিত্র্যের সঙ্গে অচঞ্চল নিত্যযুক্ত। ষ্টীমার নোঙর করে বসল কদিনের জন্য। আমরা খেয়ে দেয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে অপরাহ্নে রওনা হব লতাচাপ্‌লির ডাকবাংলায়।

বেলা তিনটার সময় লতাচাপ্‌লির ডাকবাংলায় পৌছান গেল। ষ্টীমার থেকে ডিঙিতে খানিক দূর পর্য্যন্ত পাড়ী

লতা চাপ্‌লির মগ পল্লীবাসী

খাড়ীর ভিতর দিয়ে ষ্টীমার জোয়ারের ঠেলায় মন্দগতিতে চলেছে। এই নালা প্রস্থে আলিপুরের আদি গঙ্গার মত

দিতে হয় নামাবার ঘাটে। আজ শনিবার এখানকার হাট-বার। কতকগুলো নৌকা ঘাটে বাঁধা, ক্রেতা বিক্রেতাদের

যানবাহন। ঘাট থেকে বাংলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি মোটামুটি পরিষ্কার, মাঝে মাঝে একটু আধটু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। বাংলাটি গ্রাম থেকে প্রায় আধমাইল দূরে এবং সমুদ্রের উপকণ্ঠে। ত্রিসীমায় আর জনপ্রাণী নাই। ঢালু টিনের ছাদের বাড়ী, অনেকগুলি উঁচু খুঁটির উপর মাটির থেকে আচ্‌গোচে দাঁড়িয়ে আছে, বহুপদবিশিষ্ট বিপুলাকার জানোয়ারের মত। এ পদবাহুল্য গৌরবের জন্য নয়। সাপ, বন্য জানোয়ার ও বন্যার নাগালের বাহিরে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই ব্যবস্থা। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌লাম। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ঘরগুলি, সিমেন্টের মেঝে, চারিদিক ঘিরে বারাণ্ডা। দক্ষিণে সমুদ্রমুখী সিমেণ্ট করা চত্বরে আরাম কেদারাগুলি পাতা। সামনে তাকালেই অদূরে 'নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণতল' উপকূল। পূবদিকে নিবিড় জঙ্গল একেবারে বাংলার গায়ে এসে ঠেকেছে। গুল্মলতা আর বড় বড় গাছে মাটির থেকে যেন জমাট সবুজের প্রাচীর গেঁথে তুলেছে আকাশের মাঝে।

বেড়াতে গেলাম। সমুদ্রের এমন নিরীহ মূর্ত্তি বড় একটা দেখিনি। ভাঁটায় অনেকদূর সরে গেছে। নিস্তরঙ্গ দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। কেবল মাঝে মাঝে একটা লম্বা ঢেউএর দেয়াল কূলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ শূন্যে মাথা তুলে আবার ধুলিসাৎ হয়ে সিকতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে। সূর্য্যাস্তের আভায় নীলধূসর জলে একটা লাল সোণালী দীপ্তি ছড়িয়ে গেল। অষ্টমীর চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার নামবার আগেই ঝোপঝাপের বুক-চেরা সরু পথ দিয়ে বাংলায় নির্ব্বিঘ্নে ফেরা গেল। সমুদ্রের তীর থেকে ফিরে এসেই বাংলার উঠানে আর একটি সাপের সঙ্গে দেখা। হারিকেন বাতি ও লাঠির সাহায্যে তার কোনো সদ্গতি কর্‌তে পারা গেল না। বাংলার সাম্‌নেই গাছের সারি। বারাণ্ডায় বসে আছি, এমন সময় সন্ধ্যার অন্ধকার মথিত করে সাম্‌নের গাছে ডেকে উঠল একটা তক্ষক। মনে পড়ল মোহিতলালের সেই লাইন কটি—

লতাচাপ্‌লি

মানুষের গতি ত দূরের কথা, সে জঙ্গলে বন্দুকের গুলি গাছের ভিড় ভেদ করে দুর্দ্দান্ত এগুতে পারে কি না সন্দেহ। শুন্‌লাম এখানে নেকড়ে বাঘ অনেক আছে। রয়েল বা ওমরাও ব্যাঘ্রের বড় একটা গতিবিধি নাই। বাংলায় পৌঁছেই একটা সাপ মারা হল। চা খেয়ে সমুদ্রের তীরে

"হেনকালে ওই শুন মর্ম্মভেদী একি পরিহাস!
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক!
জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্রবলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন একান্ত উদাস।"

চমকে উঠে সামনে তাকালাম। আকাশে চাঁদের আলো

উপ্‌চে পড়ছে। ভাঁটায় মৌন সমুদ্রে এখন জোয়ারের কল্লোল জেগে উঠেছে, উদ্বেল জলের আব্‌ছায়ায় ঝলমল করছে শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা। তক্ষকের রুক্ষ কণ্ঠরব উবে গেল জ্যোৎস্না ও সমুদ্রের যাদুমন্ত্রবলে। মন বললে, "কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।" সমুদ্রে যখন জোয়ার জাগে জ্যোৎস্নারাত্রিতে, তখন কি আর তক্ষকের সোল্লুণ্ঠ নিষেধে কর্ণপাত করতে ইচ্ছা হয়? অনেকক্ষণ জনশূন্য বারাণ্ডায় বসে জ্যোৎস্না উপভোগ করা গেল। তক্ষকের নিষেধ বিদ্রূপ উপেক্ষা করলাম বটে, কিন্তু এবার মশার কাছে হার মান্‌তে হল। তাদের উৎপীড়নে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে মশারির আশ্রয় গ্রহণ করতে হল। রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙে গেল। শুনি আবার ডাকছে সেই তক্ষক। বলছে প্রেম, সৌন্দর্য্য, জীবন সব ঝুটা। জীবনে দুঃখ পেয়েছি ঢের। সুখও ত কম পাইনি। তেমটিটা পয়সার চেয়ে একটা টাকা গুণ্‌তিতে কম হলে কি হয়, মূল্য বেশী। লতাচাপ্‌লির এই রাত্রিটি অমূল্য, ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে শাসালে কি হবে তক্ষক ভায়া!

কমা-সেমিকোলানহীন গোনা দিনকটি ফুরিয়ে গেল। এখানকার সিন্ধু-সৈকতটি সুদূরবিস্তৃত এবং ঢালু সমতলভূমি ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীরে নেমে গেছে। সমুদ্রস্নানের পক্ষে এমন নির্ব্বিঘ্ন তীর দুর্লভ। বর্ষার পরে বাংলার সমস্ত নদী নালার জল এখানে এসে পড়েছে, তাই সমুদ্রের জলে এখন লবণত্ব নাই। রংটাও তীরের কাছে ঘোলাটে। শীতকালে তার এই আবিলতা ঘোচে এবং ফিকে জল লোণা হয়। এই সময়ে বাতাসও মোটেই নাই বল্‌লে হয়। সমুদ্রের এমন নিবাত নিষ্কম্প ভাব বড় অস্বাভাবিক লাগে। ঢেউগুলি একেবারে তীরের কাছে এসে দু-তিনটি সমান্তরাল ছত্রে হঠাৎ যেন একটি শ্লোক রচনা করে, তারপরে কলতানে শতধা বিদীর্ণ হয়ে একটি ক্ষণভঙ্গুর ফেনিল ঝঙ্কার রেখে যায়। তীর বরাবর নিবিড় জঙ্গল। এ জঙ্গলে হরিণ আর ধ্যাৎরা (চিতাবাঘ) বিস্তর? বড় বাঘ দূরের জঙ্গলে।

২৭শে অক্টোবর। ফিরবার পথে এখানকার বর্ম্মী প্যাগোডা দেখে নিলাম। প্রকাণ্ড পিতলের বুদ্ধমূর্ত্তি। পদ্মপলাশলোচন, ও দীর্ঘোন্নত সরল নাসিকা। পিছনে
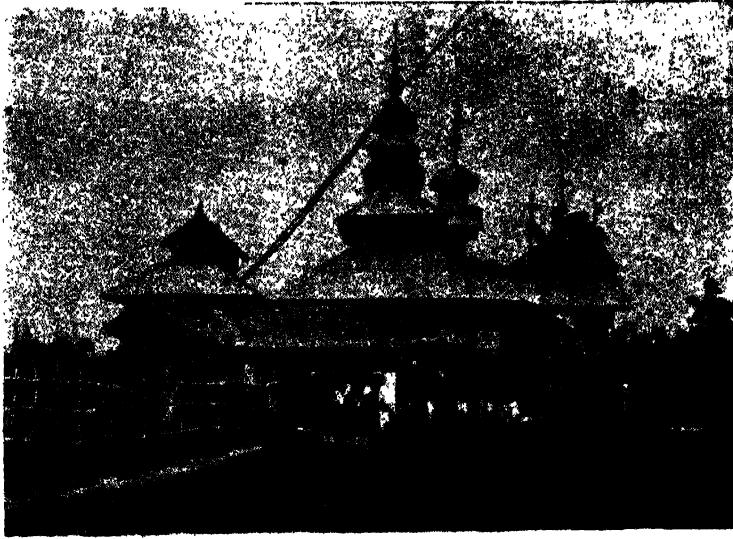
মগ প্যাগোডা

তিনদিন তিনরাত লতাচাপ্‌লির বসবাসে কাটল। রোজ সকাল সন্ধ্যা সমুদ্রের তীরে বেড়ান, গল্প, সাহিত্যালোচনায়

একটা প্রকাণ্ড কারুখচিত পিতলের ঘণ্টা। এ অঞ্চলের মগরা অত্যন্ত নোংরা ও আগোছালো। গ্রামে কুটীরে

কোনো লক্ষ্মীশ্রী নাই। তুলনায় সাঁওতাল পল্লীগুলির পরিচ্ছন্নতার কথা মনে পড়ে। লোকগুলি শুনলাম নিতান্ত অলস ও আফিমখোর। সমুদ্রের তীরে হলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখানে যথেষ্ট আছে।

খাড়ীর ভিতর দিয়ে অনেকখানি জলপথ দু-পারের প্রসারিত শাখাপল্লবের ছায়াতলে এঁকে বেঁকে চলেছে। ষ্টীমারের গতি অতি মন্থর, সাবধানে আস্তে আস্তে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে হয়, নতুবা পদে পদে অপ্রশস্ত নালায় আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা। সন্ধ্যার আগে আবার সেই আঁধারমাণিকে গিয়ে পড়লাম। আঁধারমাণিক অস্তরাগে আঁচোলখানি রাঙিয়ে, চাঁদের টিপটি কপালে প'রে দেখা দিল। রাত্রি এল যখন, তখন সে জোৎস্নালোকে শুক্ল-বসনা সুন্দরী, নীলাভ ওড়নায় দুচারিটি তারা কেবল ঝলমল করছে। কিন্তু এ ত তার আসল রূপ নয়। আঁধার লাগছে নদীর হাওয়া, জলের কল্লোলোচ্ছ্বাসে মর্ম্মরিত হচ্ছে আশ্বাসবাণী -

"That shall be to-morrow not to-night."

মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে আঁধারমাণিকের দেখা একদিন পাবই পাব।

২৬শে অক্টোবর। রাত্রে আমতলিতে ষ্টীমারে নোঙর পড়ল। সকালে চার পর বন্ধু তীরে নামলেন ইন্‌স্‌পেকশনে। ষ্টীমারে সরু বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে তীরে শোভা দেখতে লাগলাম।

একটি জেলের পো ছিট্‌কি জাল দিয়ে মাছ ধরে চলেছে। দু-একটা চুনো মাছ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার ফলে তার করায়ত্ত হচ্ছে এবং কোঁচড়ের থলিতে স্থান পাচ্ছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে এ আকাশ বাতাস নদীর অন্তস্তল থেকে কিছুই ধরা পড়ল না। বহুদিনের একটা বিস্মৃতপ্রায় বাউলের গান

আমতলি

কেশভারের তলে নিরাবরণ পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী যখন দেহে মনে বিগলিত হয়ে অকূল অতলস্পর্শ হয়, হাজার তারায় যখন তার অপলক আকাশ ভরে ফুটে ওঠে, সে কাজলরূপখানি এ যাত্রা আর দেখাবার সৌভাগ্য হল না। জ্যোৎস্নার এই ছদ্মাবরণের তলে সেই দুরবগাহ তমিস্ররূপটি আমাকে উন্মনা করেছে। হু হু করে বুকে মগ্নচৈতন্যের থেকে ভেসে উঠল। সেটাকে লিপিজালে আবদ্ধ করলাম।

"আজ আমার কাদা মাখা সার হল।
দর্ম্মমাছ ধরব বলে নামলাম জলে
আমার ছিট্‌কি জাল ছিঁড়ে গেল।

কুসঙ্গের সঙ্গ নিলাম,
কুক্ষণে বিল গাবিলাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম
এখন) উপায় কি করি বল ?
আমি বিল খুঁজে পাই চাঁদা পুঁটি,
তাও লোভ-চিলে লয়ে গেল।

মাছ ধরা পাছ পড়েছে
ছয়টা ভূত পাছে লেগেছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে,
আরো বাকি দশজনা।
ও দীন জহর বলে
আমি চরণ ভুলে
আজ হয়েছি এলোমেলো।”

অখ্যাত জেলে কবির গানের মানবহৃদয়ের চিরন্তন ব্যর্থতা, অনুতাপ ও অতৃপ্তির বেদনা কি সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় ফুটে উঠেছে।

২৭শে অক্টোবর। এবার মরিচ বুনিয়ার পথে চলেছি। দুপারে সুপারি নারিকেল গাছের সারি। খেজুর গাছের জটলাও মাঝে মাঝে আছে। আর আছে ক্ষেতের পর ক্ষেতে সবুজ ধানের উদার বিস্তার। নদীর তীরে কুঁড়েঘর-গুলি বিরল। কোথাও দুচারিটি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, কখনো বা বহু অপেক্ষার পরে দুএকটা চোখে পড়ে। গোলপাতার ছাউনি বেশী নাই, অধিকাংশেরই টীনের চালা। প্রশস্ত বেঘাই নদীতে এসে পড়লাম। বাঁ দিকের তীর ঘেঁসে ষ্টীমার চলেছে। ধানের ক্ষেত, গুবাকুকুঞ্জ, তালিবনরাজি, কলাগাছের সারি, তারপর জমাট বন। ভাঁটার কাদার উপর বেকার নৌকা, নদীবক্ষে কচিৎ দু-একখানি পান্‌সী। তীরে রোমন্থপর পরিপুষ্ট গো-মিথুন, জলে আকর্ণ নিমজ্জিত উর্দ্ধমুখী মহিষের দল। আর মাঝে মাঝে নদীর ঘাটে পল্লীবধূ, নীলসাড়ী, নাকে রূপার নাকছাবি, চোখে উৎসুক দৃষ্টি এই অপসৃয়মান ষ্টীমারের উপর। কোথাও পল্লীশিশুর কৌতুকোত্তলিত বাহুসঞ্চালন ষ্টীমারের উদ্দেশে। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বঙ্গলক্ষ্মীর এমন অপূর্ব্ব শ্যামলশ্রী আর কোথাও দেখিনি। বাহাদুরাবাদের পথে ময়মনসিংহের ভিতর দিয়ে যখন ট্রেনে গিয়েছি তখনো একটা পল্লীসমৃদ্ধি চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু এই বাখরগঞ্জের চর-সৌন্দর্য্যের কাছে পূর্ব্ববঙ্গের বনস্থলীর লাবণ্যদীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কি ময়মনসিংহে, কি এখানে, এই অতুলনীয় পল্লীসম্পদ হিন্দুবাঙালীর নয়। মুসলমান এখানে একচ্ছত্র অধিপতি। জমি বিলির সময়ে গবরমেণ্টের পক্ষপাতিত্ব ছিলনা। হিন্দুর আলস্য, নিরুদ্যম, জাতিভেদের খণ্ডতা ও সমবায়ের অভাব লক্ষ্মীর সম্পদ পায়ে ঠেলেছে। সাহসী কর্ম্মিষ্ঠ মুসলমান কৃষাণ এই মাটির চরে ফলিয়েছে সোণার ফসল।

তরুণ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মানদীর মাঝি”তে হোসেন মিঞার চিত্র আছে। একটি অসমসাহসী পুরুষ সুন্দরবনের আরণ্যদ্বীপে বিশ্বামিত্রের মত আপনার জগৎ সৃষ্টি করে তুলছে, তার একখানি সমুজ্জ্বল ছবি। জাতীয় শক্তি ও জীবনের কেন্দ্র কোথায় সে কথা তলিয়ে ভাববার সময় এসেছে। বিপদকে অনিশ্চিতকে পুরুষাকার কেমন করে পোষমানিয়ে আত্মশক্তিকে উদ্ভিন্ন করতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সংক্ষিপ্ত সুন্দরবন পরিক্রমায় আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত হয়ে রইল। জাতীয় জীবনের শিকড় যদি বাংলার মাটির ভিতরে প্রবেশলাভ করতে না পারে তাহলে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। আমাদের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার কল্‌কে ঢেলে না সাজ্‌লে হিন্দুবাঙালীর বাঁচবার আর পথ আছে বলে মনে হয়না। আরাম কেদারায় বসে এ কথা আমার পক্ষে বলা অশোভন ও হাস্যকর তা জানি। তবু আমাদের জীবনে যা হলনা, আগামী কালে তার উদ্বোধন হবে, একথা কল্পনা করতে গিয়েও তন্দ্রালু প্রাণ জাগ্রত হয়। আমাদের ব্যর্থতা ও অপদার্থতার বেদনার উপর ভবিষ্যের সঙ্কল্প ও সাধনা জাগ্রত হোক, এ প্রার্থনা সঙ্কোচকুণ্ঠিত কণ্ঠে উৎসারিত হতে চায়।

মরিচবুনিয়ার থেকে পটুয়াখালি হয়ে লোহালিয়া নদী দিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে পাড়ী দিয়ে গলাচিপায় পৌঁছে ষ্টীমার রাত্রের মত নোঙর বন্দী হল।

জাহাজের Aneroid Barometer এ unsettled

weather এর উপর কাঁটা ঘুরে দাঁড়াল সেই সঙ্গে আকাশে মেঘ ও বাতাসে ঝোড়ো হাওয়া দেখা দিল। লোহালিয়া খুব চওড়া নদী। আমরা তীরের কাছ ঘেঁসেই জাহাজ বেঁধেছিলাম। ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঝড়ের দাপট ও ষ্টীমারের গায়ে ঢেউএর সংঘাত উপভোগ করা গেল। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। নদীটা দুঃস্বপ্নে একবার বিড়বিড় করে বকে উঠে আবার দিব্যি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঝোড়ো হাওয়া বেগতিক দেখে কোথায় হল নিরুদ্দেশ। রাত্রে পোকার দৌরাত্ম্যের থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ষ্টীমারের খোলা জানালা কবাটে ফ্রেমে আঁটা লোহার জালের পর্দ্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবু একটা

গুব্‌রে পোকা এল ঘরে
বোঁ বোঁ রবে পক্ষভরে,
খুব খানিকটা চক্রাকারে ঘুরি
খটাস্ করে মেঝের পরে
উল্কাপিণ্ড সম পড়ে,
অকস্মাৎ মৌন রণতুরী।

দেওয়া হল সলিল সমাধি। হয়ত তলিয়ে গেছে, হয়ত বা আবার মুক্তপক্ষে আকাশে উড্ডীন হয়েছে। আমাদের ঘরে আর প্রবেশ করেনি। লোহার জালে পতঙ্গ-বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে নিরুপদ্রবে রাত্রি কাটান গেল।

২৮শে অক্টোবর। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বরিশালে পৌঁছিবার কথা। এক সপ্তাহের নৌকাযাত্রা শেষ হয়ে এল। এ সাতটা দিন কলিকাতার ভাবনা চিন্তা ছিল ধামাচাপা। ধামাটা এখন আবার নড়তে আরম্ভ করেছে। স্থলচর জীব ডাঙার জন্য উৎসুক, পুরাণ গৃহকোণটির জন্য চঞ্চল। হায় রে মানুষের মন, বন্দিশালায় খোঁজে মুক্তি, মুক্তির মাঝে খোঁজে পুনর্বন্ধন!

২৯শে অক্টোবর। ষ্টীমারে কলিকাতার পথে। কাল মেঘলা দিন ছিল। আজ আকাশ দিব্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে। চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি। ডেকের একপ্রান্তে ইজিচেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ কোজাগর পূর্ণিমা। বরিশালে যাবার মুখে

গলাচিপা

ঝড়ের প্রেতাত্মাটি বুঝি আমাদের কামরায় এসে রুদ্রলীলা সম্বরণ করল। একটা কাগজের মোড়কে তাকে বন্দী করে

অন্ধকারে এইপথে এসেছিলাম। কেবল ষ্টীমারের Search lightএর আলোয় দুইপারের ক্ষণিক আভাস ছাড়া আর

কিছু চোখে পড়েনি। এবার তার উদার উন্মুক্ত রূপ দেখলাম। সেবার প্রথম পরিচয়ের দুচারিটি কথা ও দৃষ্টি বিনিময়, এবার নিবিড় আত্মীয়তার সহজ সরল অবাধ ঘনিষ্ঠতা। তবু এই জানাটুকু ঘিরে রইল অজানার চক্রবাল। রাত্রি ১টার সময় শুতে গেলাম। ৩॥০টার সময় ঘুম ভেঙে গেল। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া। ওভার কোট মুড়ি দিয়ে ঢেকে গিয়ে বসলাম। হুলাঘাট ষ্টেশনের পরে অনেকখানি পথ খাড়ীর ভিতর দিয়ে ষ্টীমার চলেছিল। দুপারের অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি ভোর হয়ে এল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা"য় অসীমের ডাক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ মাটিকে ভালোবাসিয়াছেন। তিনি এই পৃথিবীর সন্তান। শ্যামলা-মায়ের দুলাল তিনি জননীর বক্ষের অঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাঁচিয়া থাকিতে চান। এই রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী ধরণীর বিরহ তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারেন না। তাই তিনি বলেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"

এই পৃথিবীকে লইয়া তিনি অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার তুলির স্পর্শে মোহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কল্পনার সুক্ষ্মানুভূতিতে "বসুন্ধরা" কবিতাটী সত্যই অতুলনীয় হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার কাব্যের একটিমাত্র ধারা। সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন।" এই সুদূরের ডাক, এই অসীমের আহ্বান তিনি অনেকদিন পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। তাঁহার কৈশোরের বীণায় এই অসীমের সুর অস্পষ্ট ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তিনি শুনিয়াছেন, হয়ত বুঝিয়াছেন, হয়ত বোঝেন নাই। কিন্তু এই আহ্বানের হাত হইতে তাঁহার পরিত্রাণ নাই। তরুণ-বয়সে এই অসীমের মায়া তাঁহাকে উন্মাদ করিয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। চঞ্চল কস্তুরীমৃগের মতো তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী"

কিন্তু অসীমের আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারিতেছেন না। এই যে হৃদয়ের আবেগের সহিত বাস্তবের অপারগতার পরাজয়,—তাহা তাঁহাকে বেদনাহত করিয়াছে। তাই ব্যথিতচিত্তে তিনি বলিতেছেন,

"সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ-দুয়ার সে-কথা যে যাই পাশরি"

তারপর পরিণত বয়সে তিনি এই ডাক আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছেন। তখন যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, স্বাভাবিক ধীরতার সহিত তিনি অসীমের সুরের সঙ্গে তাঁহার আপন গানের সুর মিলাইয়াছেন।

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া,
দিকে দিকে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

দিনে দিনে এই অসীমের মায়ায় তিনি ধরা দিয়াছেন "আকাশের স্তব্ধ নীল যবনিকা"র অন্তরাল তাঁহার নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছে, "চঞ্চলের মালার মণিকা"র সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। এই সুর "বসুন্ধরা"য় অতি স্পষ্ট হইয়া ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

এই ডাক,—পৃথিবীর ডাক। ধরিত্রীর সন্তান কবি ধরিত্রীর বুকে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর হইতে নিরন্তর যে জীবন-রসধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে তিনি নিমজ্জিত হইয়া যাইতে চাহেন। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তৃণতরুপুষ্পদলে,

নদীনীরে, দিকদিগন্তরে, ভূধরসলিলে যে নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে, তাহারই উদ্ঘাটন তিনি একই সময়ে করিতে চাহেন।

"নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যতো এক মুহূর্ত্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে।"

এই-যে বিরাটের ডাক, ভূমার আহ্বান ইহাতে কবি কেবল বিশ্বপ্রকৃতিকে আপনার করিয়া লন নাই, বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি—সমস্ত দেশ ও প্রাণীর হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় মিলাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই কবি-হৃদয়ের ক্ষুধা, বিরাট অথচ মহান। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি আপন দুর্ব্বলতায় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন।

"ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া।"

কিন্তু কবিচিত্ত তাহাতে নিরুৎসাহ হয় নাই। কল্পনার বায়ুতে তিনি ভাসিয়া যাইতেছেন। কল্পনার মাঝে তিনি আপনাকে সমস্ত দেশে দেশে লইয়া যাইতেছেন, প্রত্যেক দেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। বিভিন্ন-দেশের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে নব-নব আনন্দ দান করিতেছে। তিনি আপনাকে "হিমবস্ত্রপরা মহামেরুদেশে" "তরুশূন্য-প্রান্তরে" "নিস্তব্ধ নীরালা নীল সরোবরে" সমুদ্রের তটে সমস্ত স্থানেই লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও কবি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আরও চাহিয়াছেন,

"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে"

তাই তিব্বতের গিরিতটবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া "তাতার নির্ভীক" অবধি সমস্ত জাতির সহিত তিনি হাত মিলাইয়াছেন। সকলের জীবনই কবির কাম্য। কবির ক্ষুধিত-হৃদয় ইহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। তাই তিনি শুধু মানব-জাতি নহে; পশুদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া তাহাদের জীবনের সহিত আপন জীবন মিশাইতে চাহিতেছেন। তবুও তাঁহার কামনা নিঃশেষিত হয় নাই ;

"ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ,
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ-মদিরা ধারা নব নব স্রোতে।"

কবির বাসনা এইবার আরও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সমস্ত বিশ্বকে আপনার বক্ষের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চাহেন। তিনি প্রভাতের বায়ু হইয়া রজনীর নিদ্রা হইয়া আপনাকে প্রকৃতির মধ্যে শান্ত সমাহিত রাখিতে চাহেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা মনে পড়ে। ইহা হইতেছে Darwin এর Evolution Theory। কবির কল্পনার সহিত এই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, কবির কল্পনা কোনও বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, বিজ্ঞান ও কাব্য বিভিন্ন জিনিষ নহে। ইহাদের ক্ষেত্র পৃথক হইলেও দুই-ই সত্যকে আবিষ্কার করে। একটি হইল প্রাকৃতিক জগতের, অপরটি মনোজগতের। এই পৃথিবী যে বহুদিনের, এবং আমাদের পুরাতন পৃথিবী যে বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই বর্ত্তমান পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে—ও বিশ্বপ্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও নবতম সৃষ্টি যে মানব—Darwin-এর এই theory কবির মনে কল্পনার সূক্ষ্মানুভূতিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ আদিম প্রকৃতি হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিলেও, কবিহৃদয়ের ভাবপ্রবণতা আজও প্রবাসী সন্তানের জন্য প্রকৃতির কাতর আহ্বান শুনিতে পায়। কোন্ অলক্ষিত জ্যোতির্ম্ময় মুহূর্ত্তে আদিম ধরার শান্তিময়-ক্রোড়ে আবার বিশ্রামলাভের আশায় উন্মুখ হইয়া ওঠেন। তিনি বলেন,

"মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা,
মন যবে ছিল মোর সর্ববাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব-নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।"

ঠিক ইহারই প্রতিধ্বনি আমরা কবির "প্রবাসী" কবিতাতেও শুনিতে পাই।

"মনে হয় যেন সে ধূলির তলে,
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণদলে,
সে-দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে,
সেই মূক-মাটী মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।"

তারপর ধরার কবি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেননা, মানবের মৃত্যু তাহাকে ধরার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া দিবে। তিনি ভাবিতেই পারেন না যে, লক্ষ লক্ষ বৎসরের এই যে প্রকৃতির সহিত মানবের সম্বন্ধ, ইহা মৃত্যু আসিয়া একমুহূর্ত্তেই ছিন্ন করিয়া দিবে।

"ছেড়ে দেবে তুমি
আমারে কি ওগো মাতৃভূমি,
যুগ-যুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন,
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?"

না, তিনি মৃত্যুর পরে পৃথিবীতেই বিরাজ করিবেন। প্রকৃতির জীবন-রস তাঁহাকে পূর্ব্বের মতোই সঞ্জীবিত রাখিবে

"যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা,
শতলক্ষ আনন্দের স্তন-রস-ধারা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।"

তারপর মাতৃস্নেহে পুষ্ট ধরার তরুণ সন্তান বৃহত্তর জগতে তাহার অভিযান চালাইবে।

কিন্তু পৃথিবীর আশ আজও তার মেটে নাই। আজও সে ধরার শিশু।

আবার সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। মানুষ এখনও যে আপনাকে একেবারে বিকশিত করিতে পারে নাই, তাহার পরিপূর্ণতার এখনও যে অনেক বিলম্ব আছে, কবির শেষ কথাগুলি এই কথারই প্রতিধ্বনি জানায়।

তাই ধরার শিশু-সন্তানের মন এখনও তৃপ্ত হয় নাই। বিপুল ধরণীর শ্যামল অঞ্চল আজও সে কামনা করে।

"আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে।"

কবিতাটি পড়িয়া আমাদের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে। এই যে প্রকৃতির আহ্বান, ভূমার ডাক ইহা কি কেবল কবিই শুনিতে পান ও কবি-হৃদয়ই কি ইহাতে সাড়া দিবার একমাত্র অধিকারী? ইহা কি নিছক কল্পনা, বা ইহার মধ্যে হৃদয়ের অনুভূতি আছে!

মনে হয়, পৃথিবীর ডাক পৃথিবীর প্রত্যেক মানবই একদিন শুনিতে পায়। কেহ বুঝিতে পারে, কেহ পারে না। কেহ সাড়া দেয়, কেহ দেয়না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি শুভ দিন আসে, যেদিন নব প্রভাতে জাগরিত হইয়াই কি অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার মন ভরিয়া যায়। বিশ্ব-প্রকৃতি সেদিন কি জানি কেন, তাহার চোখে সুন্দরের কাজল পরাইয়া দেয়। সেই দিন প্রভাতের সব কিছুই তাহার কাছে আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। সেদিন তাহার হৃদয়-বীণায় যে সুন্দরের সুর ঝঙ্কৃত হয়, তাহার প্রতিধ্বনি সে সমস্ত আকাশে বাতাসে শুনিতে পায়। সেদিন আর ঘরে মন টেঁকেনা। প্রতিদিনের তুচ্ছ সংসারের রুদ্ধদুয়ার ভাঙিয়া ফেলিয়া সে বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চায়। অদৃশ্য দুখানি হাত হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকে।

"কি জানি কী হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হোতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর,
একী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর,
ওরে কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।"

কিন্তু এই অসীমের মায়া তাহাকে বেশিক্ষণ প্রলুব্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। সংসার আবার তাহাকে টানিয়া লয়। তাই সাধারণ মানুষের কানে অসীমের এই ক্ষীণ ধ্বনি একমুহূর্ত্তের জন্য স্পষ্ট হইয়া আবার ক্ষীণতর হইয়া যায়। কিন্তু কবি-চিত্ত এই ডাকে একান্ত মনে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বেপরোয়া

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

১

বুলবুলির কাণ্ড ;—আগে তার পরিচয়টা দেই।

বড়দাদারি বড় মেয়ে ; ছেলেবেলা থেকে কিনা ভারি দুরন্ত, সবাইকে ডোণ্ট্ কেয়ার করিয়া চলে, তাই আমিই একসময়ে তার নামকরণ করিয়াছিলাম বুলবুলির বদলে "বেপরোয়া"। এই অভিধান পাইয়া সে রাগ করেনা, অবশ্য অনধিকারীর কেহ অর্থাৎ ভাই বোনেরা এ সম্বোধন করিতে গেলে বিপন্ন হয়।

শ্রীমতী বুলবুলি পড়াশুনায় ভালই ; এবারে আই-এ পরীক্ষা দিয়াছে। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উপর বেশ অনুরাগ আছে, সুতরাং অত্যাচারও আছে ; অর্থাৎ অনেককিছু লেখে, যথা গদ্য-কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ। আমি সাহিত্যটা মোটেই বুঝিনা একরার করি ; তবু আমাকেই সেগুলি আগাগোড়া পড়িতে হয় এবং সমালোচনা শুনাইতে হয় ; অর্থাৎ বাঃ বেশ বলিতে হয়।

মেয়েটার আর একটা বিদ্যা দেখি,—ছবি আঁকিতে পারে। শিক্ষা বিশেষ কিছু পায় নাই, বলা যায় সহজ-নিপুণা। বাবা কাগজ পড়িতেছেন, কাকামণি অর্থাৎ আমি চশমা চোখে সিগারেট খাইতেছি ; টুনী হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, এ সব সে পেনসিলে দিব্যি আঁকিয়া তোলে। ভারতীয় চিত্রকলা নিশ্চয় হয় না, কেননা দেখিয়া ভালই লাগে, মেজাজ মোটেই বিগ্ড়ায় না।

শ্রীমতী আবার নারী-প্রগতিতে অগ্রণী, এখানকার মহিলা সমিতির মেম্বর ; নারীর অধিকার সাব্যস্ত করিতে সর্ব্বদাই মুখর। কাকামণির সঙ্গে তার নিত্য-কলহের এই একমাত্র বিষয়। কোনো অধিকার স্বীকার করিতে আমি আবার একেবারেই নারাজ। আমার উদ্দেশ্য শুধু মেয়েটাকে খেপানো ; কাজেই যে বিরোধী মত ঘোষণা করি, তার মধ্যে যুক্তির চেয়ে কোলাহলটা থাকে বেশী, আর বুলবুলি বেপরোয়া হইয়া পড়ে।

এই সেদিন আমার পরিহাসোক্তি সূত্রে সে যে কাণ্ডটা করিয়া বসিল, তার বাংলা বিশেষণ দেওয়া যায় চমৎকার আর, ইংরেজীতে বলা যায় অরিজিনাল,—সেটাই আজ বলিতে যাইতেছি। দেখা যাইবে, আমার নামকরণটা সার্থক হইয়াছে।

পরীক্ষা শেষ হইবার পর সেদিন তার একটা রচনা দেখিতেছিলাম ; বরিশাল মহিলা সমিতিতে পঠিত, নাম 'পুরুষের নারী বিদ্বেষ'। ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গি সুন্দর, অতটুকু মেয়ের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়ই বটে। অভিযোগের মধ্যে যে কয়টি স্পষ্ট কথা ছিল, সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করাই সুবুদ্ধির কাজ মনে করিলাম। তবু একটা সদিচ্ছা-বশত মন্তব্য করিলাম,—দিব্যি লেখাটি, গোটা গোটা বাঁকা অক্ষর—মেয়েলি ছাঁদ।

ঐ রেঃ—মেয়েলি ছাঁদ, অর্থাৎ নারীজাতির উপর কটাক্ষ! শুনিয়াই বুলবুলি উদ্যতচঞ্চু হইল। বলিল,— "মেয়েদের হাতের লেখায় একটা বিশেষত্ব থাকে নাকি কাকামণি"?

ভাগ্যক্রমে একটা নজীর আমার মনে পড়িয়া গেল, মস্ত বড় লোকের সাক্ষ্য। উত্তর করিলাম, "তোমাদের রবিঠাকুরের এই মত। বসন্তপ্রয়াণের ভূমিকায় তিনি বিদ্রূপ ক'রে গেছেন,—মেয়েলি ঢঙের লেখা বাঁকা বাঁকা অক্ষর, দেখিলেই চেনা যায়। বইখানা আবার একটী মেয়েরি লেখা।"

অতবড় সাক্ষীর সামনে বুলবুলি কিঞ্চিৎ থমকিয়া গেল। ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল,—"রবি ঠাকুর বলেছেন বলেই কথাটা সঙ্গত হবে এমন নয়। নারী বিদ্বেষটা পুরুষের মজ্জাগতই বটে ; কিন্তু কবি হবেন লোকোত্তর, এটাই আশা ক'রে-ছিলাম।"

আমি টিপ্পনী করিলাম "কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি?"

সে কথায় কান না দিয়া বুলবুলি বলিল, "তাঁর নিজের

হাতের লেখারই বা কি ছিরি! কতগুলি নৈনিতাল আলু সারবন্দী কাত হয়ে পড়ে আছে, তারই রেখাচিত্র। ঐ লেখার ছাঁদের মধ্যে পুরুষত্বটা কোথায় সেটা একটা কবিতা লিখে তাঁর বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের এরূপ বিচিত্র সাদৃশ্য-লক্ষ্মী পাইয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলাম "বাঃ—"

বুলবুলি রাগ করিয়া প্রশংসা শুনিতে দাঁড়াইল না।

ওখানেই কিন্তু ব্যাপারটার অন্ত হইয়া যায় নাই। দুই তিন দিন পরে শ্রীমতী বেপরোয়া দেবী একখানি চিঠির খসড়া আমার হাতে দিয়া জানাইল, এটা কপি করিয়া পাঠানো হইয়াছে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায়। চিঠিখানি এই—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীশ্রীচরণেষু

প্রণামপূর্ব্বক বিনীত নিবেদন,

এইরূপ শোনা গেল যে আপনি কোনো এক মহিলা-লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখ্‌তে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "মেয়েদের হাতের লেখাটা বাঁকা বাঁকা অক্ষরে একই ধরণের হয়;—মেয়েলি ঢঙ্‌, দেখলেই চেনা যায়", ইত্যাদি। আপনার মন্তব্যটা পাওয়া গেল না, তবে আমার কাকাবাবু (এম-এ, বি-এল্) বলেন, তার মর্ম্ম এইরূপই। বাস্তবিক যদি এরূপ কোনো অযথা উক্তি আপনি করে থাকেন তবে সেটা আপনার পক্ষে খুবই অনুচিত হয়েছে। এটাকে আমরা মেয়েদের উপর অবজ্ঞামিশ্র কটাক্ষ বলে' মনে করি। হাতের লেখার মধ্যে মেয়েপুরুষ জাতিবিভাগ কবি-কল্পনায় চল্‌তে পারে, আপনি কি তাই করেছেন?

তর্কমুখে স্বীকার করা যাক্ যে আমাদের হাতের লেখার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আপনি আবিষ্কার করেছেন, যেটাকে আপনারা বলেন, মেয়েলি ছাঁদ। আচ্ছা, এরূপ বিশেষত্ব কি অন্য কোথাও নেই? এবং তা ধ'রে কি কোনো জাতি কল্পনা চলে? একটা সত্যিকার দৃষ্টান্ত দেখাই।

এম-এ, বি-এল্ কাকামণির টেবিলের উপর একখানা বিলাতি কাগজ দেখ্‌তে পাই, তাতে অনেক মেমসাহেবদের ছবি আছে। একদিন গ্রীষ্মের দুপুর বেলা সেই ছবির কয়েকটাকে কালী দিয়ে গোঁফ দাড়ি ভূষিত করে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আশ্চর্য্য! সেগুলি একটা বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্য বয়সের অবিকল ছবি হ'য়ে গেছে। শুনে প্রীত (?) হবেন যে সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার কথায় বিশ্বাস না করেন তো নিজে একবার মেমসাহেবদের ছবি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি ভালো আঁকতে পারেন তো নিজের ফোটো বলে ভুল হবে।

এই অদ্ভুত মিল দৃষ্টে আপনি কী বল্‌তে চান, আমাকেই বা কী অনুমান করতে বলেন? এ নিয়ে কিন্তু আমি কোনো পরিহাস করছিনা—মেয়েরা তা করেনা জান্‌বেন। নানাধারে বিচিত্র বস্তুর মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায় এটুকুই আমার বক্তব্য। এবং তা নিয়ে যে, কোনো জাতিকল্পনা অনুচিত, একথা বোধ হয় আপনি এখন স্বীকার করবেন।

আশা করি আপনগুণে আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, এবং আপনার সেই মন্তব্যটা প্রত্যাহার করে 'বিচিত্রা'য় জ্ঞাপন করবেন। ইতি

বিনীতা শ্রীমতী বুলবুলি দেবী

(ভালো নাম প্রভাবতী, কেউ সেটা বলে না)

চিঠি পড়িয়া তো আমার চক্ষুস্থির! সেদিনকার সামান্য কথাটি লইয়া মেয়েটা কি কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে! সত্য সত্যই এ চিঠি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়াছে এটা ভাবিতেই আমার হাসি পাইল। গম্ভীর হইয়া চিঠিখানি আবার পড়িলাম। বুঝিতে পারিলাম যে বুলবুলির মত মেয়ে ঠিক এ চিঠি ডাকে দিয়াছে, তবু একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাকে দিয়েছ?

মাসিক কাগজ খানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বুলবুলি উত্তর করিল—আজকের ডাকে চলে গেল।

আমি বলিলাম, কাজটা ভাল হয়নি, সর্ব্বমান্য কবি, তাতে প্রবীণ মানুষ, অসন্তুষ্ট হবেন।

বুলবুলি বলিল, 'কুচপরোয়া নেই কাকা বাবু! তিনি তো বড় লোক ঠিকই, ছোটদের অপরাধ ক্ষমা করা তাঁর স্বভাব। আর মিথ্যে তো কিছু বলিনি, দেখি উত্তরে কি তিনি লেখেন।'

৩

এই ঘটনার পর মাস খানেক চলিয়া গেল, শান্তিনিকেতন থেকে ঐ চিঠির কোনো জবাব আসিলনা। ইতিমধ্যে দাদা সপরিবারে কুমিল্লায় বেড়াইতে গেলেন; সেখানে মেজদাদা চাকুরী করেন।

বুলবুলি সেখানে গিয়া তুইবার চিঠিতে জানিতে চাহিয়াছে, শান্তিনিকেতনের কোনো খবর আছে কিনা। আমি উত্তরে লিখিয়াছি, কোনো চিঠি আসে নাই।

অনেকদিন পরে বুলবুলির চিঠি আবার পাইলাম। নানাবিধি সংবাদ জানিতে চাহিয়া এবং জানাইয়া শেষে যাহা লিখিয়াছে সেটা ঐ ব্যাপারেরই উত্তরকাণ্ড, সেটুকু এই—

"এখান থেকে শান্তিনিকেতনে তুবার তাগিদ পাঠিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি। আমার মনে হয় রবিঠাকুর লজ্জা পেয়ে চুপ করে আছেন।

"এদিকে কিন্তু গোড়ায় গলদ ঘটেছে, কবির বিরুদ্ধে আগেকার অভিযোগটাই তুলে নিতে চাই। মত পরিবর্ত্তনের কারণটা বলছি।

"এখানে মেজকাকার কাছে একটা ছবির বই পেলাম, অর মধ্যে হরেক রকম ছবি। এ দেশী নারীর চিত্রও আছে। তারি একটা নিয়ে যথাস্থানে গোঁফ ও চশমা এঁকে দিয়ে দেখি, সেটা হুবহু আমাদের পরিবারের এক জনার ছবি হয়ে গেছে। মা দেখেই বল্লেন, এযে ছোট ঠাকুরপো! আর তিনি নিজেই ছবির নীচে এম্-এ, বি এল্ লিখে দিলেন। এই গেল প্রথম দফা। তার পরে একটা কুলী রমণীর মুখে ঝাঁটা আর কাঁধে গামছা দিয়ে সাজিয়ে দেখি, সেটা আমাদের ভজুয়া। এখন দেখছি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক মেয়েমানুষ পুরুষের সাজ পরে পৌরুষ গর্ব্ব করেন, তবে আর মিছামিছি তাঁকেই শুধু লজ্জা দেই কেন?

"এতো গেল নারী পুরুষ সমস্যার কথা। আর একটা আবিষ্কারের কথা বলি। সেই বইটাতে বাঁদরের ছবিও আছে; তারি একটাকে কোঁচা কাপড় পরিয়ে গলায় পৈতা এবং হাতে হুঁকা দিয়ে দেখি,—বলুন তো কে? ঠিক মদন ঠাকুর মশাই, আমাদের পুরোহিত! আরও একটা মজার কাণ্ড, টুনী এখানকার মেলা থেকে একটা মস্ত মাটীর পেঁচা কিনেছে। সেটাকে কাপড় পরিয়ে গলায় মালা দিয়ে নিত্যই সাজায়। সে দিন সেটার মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে টুনী আমাকে দেখায়, বলে, ছাখো আমাদের পিসিমা! বলবার দরকার ছিলনা, দেখবামাত্রই আমি চিনেছিলাম। মা কাকীমা দেখে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেলেন। পিসিমা উঠে এসে টুনীকে দিলেন বাঁ হাতের ঠোনা আর পেঁচাটাকে দিলেন লাথি। ডান হাতে মালার পুঁটলি ছিল, নইলে আমার ভাগেও কিছু জুটতো।

"এখন বলুন দেখি এমনতর সিদ্ধান্ত করতে পারি কিনা যে গোঁফ, দাড়ি, চশমা পৈতা এই সাজসজ্জাগুলির নামই পুরুষত্ব। এগুলি খসিয়ে ফেললে অনেক ছদ্মবেশী মেয়েমানুষ ধরা পড়েন। আবার কেউ বা সত্যি বাঁদর, আর কেউ পেঁচা; মানুষের সাজে আমাদের মধ্যে কেমন বেমালুম চলে। আপনি এতে সায় দেন কিনা লিখবেন।

"রবি ঠাকুরকে আর তাগিদ দেবোনা ঠিক করেছি। প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণতা আপনার বুলবুলি মা।

"পুঃ—আপনাকে রবি ঠাকুরের শ্রেণীতে ফেলেছি বলে রাগ করবেন না যেন। ছবিটা আপনা আপনি ঐরকম হয়ে গিছলো,—আমি কি কোরবো? আমার কোনো নষ্টামি ছিল না—মা সাক্ষী আছেন।

আচ্ছা কাকামণি, বাবা আসলে কি? মেজাজটা কিন্তু—কার মত বলি—বাঘ না ভালুক? চিঠির উত্তর দেবেন, ইতি।"

বুলবুলিকে চিঠি দিতে অনেকটা দেরী হইয়া গেল। বল দেখি উত্তরে কি লেখা যায়?

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

মেঘ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

লণ্ডনের শীতের ধোঁয়া—যাকে ইংরাজীতে fog বলে, সেটা ছিল নগরবাসীর একটি বিভীষিকা! শীত আসচে—তুষারে ছেয়ে যাবে ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট এবং তার উপর পথ রুদ্ধ ক'রে থাকবে নিবিড় মসীকৃষ্ণ চিম্‌নীর ধোঁয়া, সেকথা ভাবলেও বুক গুর গুর করে উঠে! কিন্তু শিল্পী হুইস্‌লার প্রকৃতির অসামাজিক কদর্য্য কাণ্ডটাকেই অবলম্বন ক'রে যখন ছবি আঁকতে লাগলেন এবং অস্কার ওয়াইল্‌ড প্রভৃতি রসিকেরা যখন তার রস-পরিবেষণ করলেন জন-সমাজে, তখন জন-মনের মধ্যে সেই fogএরও একটি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সঙ্কেত ধরা দিলে। সেই থেকে লণ্ডনের fogএ সুধীসমাজের যতই অসুবিধা হোকনা কেন, তার প্রকৃতির বুকের উপর মানুষের গড়া factory প্রভৃতির উগ্রভাবকে আচ্ছন্ন করে একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার কথা তাঁরা এখন সহজে ভোলেন না। তেমনি আষাঢ়ের কাজল-ঘন মেঘ যুগে যুগে ভেসে এসে কোথায় চলে গেছে মানুষের মাথার উপর আকাশের কোলে, কিন্তু তার খোঁজ কে রেখেচে? সেই মেঘ একদিন উজ্জয়িনীর নব-রত্নসভার শিখরে গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হ'ল, তখন কবি কালি-দাসের কলমে মসীমাখা হয়ে ধরা দিলে এবং তাঁরই আদেশে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার পথের একটি নির্দ্দেশ সে পেয়ে গেল। যক্ষের বিরহবেদনার কথা বহন করে নিয়ে যাবার আদেশ পেয়ে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘ ধন্য হ'ল।

মেঘের জন্ম-রহস্য বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা এখন জানতে পারচি, তড়িৎযোগে আকাশের মধ্য দিয়ে মেঘবার্ত্তা রেডিওতে আমরা সহজেই আজ পাচ্চি। কিন্তু যদি কবি ভবিষ্যতের আবিষ্কারের কথা অনুমান করতে পারতেন তাহলে হয়ত তিনি এত কষ্ট করে সে যুগে মেঘদূতটি লিখে রেখে যেতেন না; এবং তাতে ক্ষতি এই হ'তো যে মেঘের অন্তরের ব্যথা আজও আমরা ধরতে পারতুম না—যদিও বিজ্ঞানের যুগে তারই মারফৎ দূরের সকল বার্ত্তাই সহজে পেয়ে যেতেম আমরা।

ভেসে ভেসে চলে গেছে
কত মেঘ যুগে যুগে
খোঁজ কেউ রাখে নাই তার,
অনির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে
নিরুদ্দেশে ভেসে গেছে,
কত রঙ মেখে গেছে,
পরে গেছে বলাকার হার!
দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে
দূরে দূরে চলে গেছে মেঘ,
হিমের শিখর হ'তে
সাগরের ছুঁয়ে তীরতট,
যাত্রাপথে দেখে গেছে
হাসিকান্না মাখা
নগরনগরী আর
পুষ্পভরা কত বৃক্ষ, বট!
কিন্তু, তার কথা কেউ
ভাবে নাই দেখে নাই চেয়ে,
ভূমার বুকের শিশু
বজ্র-ধর মেঘ, যায় কোথা ভেসে—
তার কথা জানাবারে
উজ্জয়িনী-কবি
আসিলেন
কোন্ শুভক্ষণে
ব্যথা-ভরা বিরহীর
বাণী বহিবারে
শিখালেন শেষে;—

১লা আষাঢ় ১৩৪৪ সাহিত্য-সেবক সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মেঘোৎসব সভায় পঠিত।

অকারণ ভেসে যাওয়া মেঘে
দিলেন যে গুরুভার,
তাই যক্ষ বিরহের
সকল ব্যথারে
জানাইল তারে—
বার্ত্তা বহি মেঘ
হবে তার প্রিয়া-অনুগামী—
পর্ব্বতের সানুদেশ হতে
যাবে কোথা কত নদী পারে !
তাই আজো বছরের
প্রথম আষাঢ়ে
তারি যেন সুর
দূর হতে দূরে ভেসে আসে,
জাগায় মধুর
বিরহের কাল-ঘন ছায়া
কত কি আশারে !
কাজলী-মেঘের মাঝে
বিদ্যুতের বাণী-শিহরণে
ভাঙা বুক জোড়া দেয়
ক্ষণ-দীপ ঘুচায় আঁধারে !
আজি তাই বারে বারে
আষাঢ়ের মেঘের আসরে
স্মরি মোরা শেখাল যে
দূর মেঘে ধরণীর বাণী—
বিরহ-ব্যথারে
যে কবি করিল অমর
তারে আজি অর্ঘ্য দিই আনি !

শ্রীঅসিত কুমার হালদার

জাগরণ

শ্রীমতী তরলিকা দেবী

আমার জীবন পাত্রে ভরি' দিলে মধুরস-ধারা
কোন্ শুভক্ষণে ।
কম্পিত-হিয়ার তলে স্নিগ্ধ হেসে, ফোটে সন্ধ্যাতারা
গোধূলি লগনে !
তোমার যৌবন-কান্তি, সম্ভ্রমের রশ্মি আঁখিতলে
বিচ্ছুরিয়া ওঠে,
আমার বক্ষের মাঝে ব্যথার কমল দলে দলে
পরিপূর্ণ ফোটে !

উদ্দাম উত্তাল বায়ু শান্ত হ'য়ে মরুভূর পথে
সূক্ষ্ম রস-ধারা,
প্রতি রোমকূপে কূপে, অতীন্দ্রিয় প্রাণের পরতে
হয়ে গেল হারা !
মহান্ বিশ্বের মাঝে কল্যাণের কর্ম্ম অনুভূতি
কল্লোলিয়া জাগে,
সুনিবিড় প্রেম মম ছড়াইনু সূর্য্যসম দ্যুতি
নব অনুরাগে !

সুশান্ত সা

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এট্-ল

৬

কাশীতে দুটো মাস ত থাক্‌বই এবং যদি বিশেষ কোনও অসুবিধা না হয় ত তিন মাসও থাক্‌তে পারি—এই রকম একটা ইচ্ছা নিয়ে কাশী এসেছিলাম। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বাড়ী থেকে দাদার এক চিঠি এসে হাজির হল—পত্রপাঠ আমাদের রওণা হয়ে যাওয়ার জন্য লিখেছেন। কারণ, বউমা অর্থাৎ তুষার, হঠাৎ বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছেন, এবং যদিচ সরলা ঝি আছে, তবুও আমরা ফিরে না গেলে তাঁর পক্ষে একলা ও-বাড়ীতে থাকা একরকম অসম্ভব।

আমি এবং মা দুজনেই চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। তুষারের হঠাৎ এরকম ফিরে আসার কোনও কারণই আন্দাজ করা গেল না। এই ত ৪।৫ দিন হল আমি তুষারের চিঠি পেয়েছি, কিন্তু সে চিঠিতে ফিরে আসার কথা ত কিছুই লেখেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাশীতে এই একমাসেই আমার প্রাণ ধীরে ধীরে যেন হাঁপ ছেড়ে মুক্তি পাচ্ছিল—আবার যেন ফিরে পাচ্ছিল তার সেই নিজস্ব আনন্দটুকু, যা সে একটু একটু করে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল দেশের পারিবারিক জীবনের সেই ঘাত প্রতিঘাতের পঙ্কিল আবর্ত্তে।

দাদার চিঠি পড়ে মা বল্লেন "কিন্তু আর ত ৭।৮ দিন থাক্‌তেই হবে।" কি একটা বিশেষ পুণ্যযোগের কথা তুলে বললেন "সেই শুভদিনের আর ত মোটে দিন সাতেক বাকী। কাশীর মত জায়গা থেকে অমন দিন পিছনে ফেলে গেলে যে মহাপাপ হবে।"

সমস্ত দিন মনটা খারাপ হয়ে রইল। বিকেলে ৪-টের মধ্যেই ললিতদের বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। সাধারণতঃ বিকেলটা ললিতদের বাড়ীতেই চা খেয়ে আমি ও ললিত একসঙ্গে বেড়াতে বেরুতাম এবং প্রায়ই সুলোচনাদিদিও আমাদের সঙ্গে যেতেন। কিন্তু আজ বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ললিতদের বাড়ী না গিয়ে আমি একলাই গঙ্গার ঘাটের দিকে চল্‌লাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে একলাই চুপ করে বসে রইলাম—একটা ভারী প্রাণ নিয়ে।

বসে বসে নানান দিকের নানান এলোমেলো চিন্তা মনটাকে পেয়ে বস্‌ল। ভাবতে লাগ্‌লাম। এক একবার মনে হল মনটাকে আরও কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়া দরকার। মন এখনও ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। কিন্তু ফিরে না গিয়েই বা উপায় কি? তুষার ফিরে এসেছে—একলা থাক্‌বেই বা কি করে? হঠাৎ শরীর মন একসঙ্গে কেমন শিউরে উঠ্‌ল। মনে হল, সেই বাড়ী, সেই মুকুন্দ—একলা তুষার। সমস্ত দিন ত কই একথাটা ঠিক এ ভাবে মনে হয়নি। ছিঃ ছিঃ ভাবতেও লজ্জা হয়—সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। আর যেন এক মুহূর্ত্ত কাশীতে থাকা চলেনা।

সন্ধ্যা ঘোর হতে না হতে বাড়ী ফিরে এলাম। মা বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌তে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। রোজই সন্ধ্যার পর আমি ও ললিত মাকে বিশ্বনাথের আরতি দেখাতে নিয়ে যেতাম। মা আমাকে একলা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "কই ললিত এলনা? সুলোচনাও যে আজ আরতি দেখ্‌তে যাবে বলেছিল?"

বললাম "ললিতদের বাড়ীতে আজ আর যাইনি।"

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বল্লাম "মা, আমার মনে হয় কালই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।" মা আমার মুখের দিকে একটু চুপ করে চেয়ে থেকে শান্তস্বরে বললেন "বেশ।"

বল্লাম "কালই দুপুরলো খাওয়া দাওয়া করে দুটোর গাড়ীতে রওয়ানা হওয়া যাবে—কি বল ?"

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ললিত ও সুলোচনা দিদি এসে হাজির হলেন। বিকেলে কেন আমি ললিতদের বাড়ী যাইনি—সুলোচনা দিদির কাছে সেই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমরা সবাই মিলে বিশ্বনাথের মন্দির অভিমুখে রওণা হলাম।

একতালার বারান্দায় এসে দেখি অন্ধকারে বারান্দার এককোণে বাড়ীওয়ালার মেয়েটী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটীর নাম মালতী। এই মাসখানেকের সান্নিধ্যে আমাদের মধ্যে সঙ্কোচের ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। মেয়েটীর মাকে 'মাসিমা' বলে ডাকার দরুণ মেয়েটী ইতিমধ্যে আমাকে "দাদা" বলে ডাক্‌তে সুরু করেছিল। আমি মালতীকে দেখেই একটু যেন থমকে দাঁড়ালাম—যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

সুলোচনা দিদিই প্রশ্ন করিলেন—"মালতী! বিশ্বনাথের আরতি দেখতে যাবে না ?"

শান্তস্বরে মালতী উত্তর দিলে "না।"

আরতি দেখে ফিরবার পথে আমি ও ললিত একটু এগিয়ে চলছিলাম, সুলোচনা দিদি ও মা আমাদের ঠিক পিছনে পিছনে আস্‌ছিলেন।

হঠাৎ সুলোচনা দিদি আমাকে ডেকে বললেন—"হ্যারে সুশান্ত! তুই নাকি কালকেই দেশে ফিরে যেতে চাস ?

বললাম "তাই ত ভাবছি।"

দিদি বললেন "যাও দেখি কাল তুমি কেমন যেতে পার। কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ রইল।"

রোজই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর, শুতে যাবার আগে আমি একবার একলা দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যেতাম। খানিকক্ষণ চুপ চাপ ঘাটে বসে থেকে বাড়ী ফিরে আসতাম। আজও রাত্রে তেমনি বেড়িয়ে ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতে যাব, এমন সময় দেখি সিঁড়ির পাশে বারান্দায় মালতী দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম "মালতী! তুমি এখনও শুতে যাওনি ?"

বললে "না। দাদা! কালই নাকি আপনারা চলে যাচ্ছেন ?"

বললাম "কালই ত যাব ভাবছি।"

বেশ শান্ত অথচ মিনতি ভরা সুরে বললে "কেন? আর দু চারটে দিন থাকুন না।"

বললাম "বাড়ীতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। দুচারটে দিন থেকে আর বেশী কি লাভ।"

বললে "সামনেই এত বড় একটা যোগ; মাসীমা কাশীতে এসে যোগের স্নানটা না করে ফিরে যাবেন।"

একটু চুপ করে রইলাম। মালতী আবার বললে "থাকলে বড় ভাল হয়। তবুও আপনারা আছেন, দিনগুলো এক রকম কাটছে।"

একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে চেপে নিল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার আকাশ পাতাল চিন্তায় মনটাকে পেয়ে বসল। সবাই বাধা দিচ্ছে, সবাই আমাকে পিছু থেকে ডাকছে—এমন কি মালতী শুদ্ধ। সকলকেই দুঃখিত করে কালই রওয়ানা হব? সামনেই শুভ যোগ—কাশীতে এসে যদি গঙ্গাস্নান না করে ফিরে যেতে হয়, মা, যদিও মুখে কিছু বলবেন না, মনে মনে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাবেন—বুঝতে আমার একটুও বাকী ছিল না। তবুও কালই যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—কেন? ভাবলাম—নিজেরি মনের একটা দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য; আর ত কিছু নয়! দুর্ব্বলতা, নিতান্ত দুর্ব্বলতা! কালই রওয়ানা হই বা দুদিন পরেই রওয়ানা হই, বাইরের দিক দিয়ে তাতে ত বিন্দুমাত্রও আসে যায় না। সত্যই যদি তুষার অবিশ্বাসিনী হয়ে থাকে কাল রওয়ানা হলেও যা, দুদিন পরে রওয়ানা হলেও তাই। আর যদি তার প্রতি অন্যায় সন্দেহই করে থাকি, এত বাধা সত্বে কালই রওয়ানা হয়ে ত তাকে অপমানই করছি। সুতরাং কালই রওয়ানা হতে চাইছি, নিজেরই দুর্ব্বল অন্তরের অন্যায় প্ররোচনায়—নিজেরি মনের তুষ্টির জন্য। ভাবলাম—না, মনকে সংযত করা দরকার।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম—মনটা বড়ই ক্লান্ত, বিশেষ ভারী হয়ে রয়েছে। এত ক্লান্ত যে সেই দিনই রওয়ানা হওয়ার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত নয়। তবুও মাকে কিছুই না বলে মুখ হাত ধুয়ে গঙ্গার ধারে একবার বেড়াতে গেলাম। বাড়ী ফিরে সদর দরজায় পোষ্ট পিওনের সঙ্গে দেখা হলো। সে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলে। আমারই চিঠি—তুষার লিখেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে ফেললাম। পত্রপাঠ, বিশেষ অনুরোধ করে, আমাকে রওয়ানা হতে লিখেছে। তুষার লিখেছে :—

দেবতা আমার!

ওগো! আমি হঠাৎ আজকে পলতা থেকে ফিরে এসেছি। আজ দুপুর বেলা এসে পৌছেছি। জান ত—নৌকায় চড়লেই আমার কি রকম মাথা ঘোরে। তাই এখানে এসে সমস্ত দিনটা প্রায় শুয়েই ছিলাম। রাত্রে, খেয়ে উঠে এখন একটু সুস্থ বোধ করছি—তাই এখনই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পলতায় হঠাৎ "মার অনুগ্রহ" দেখা দিয়েছে। আমাদের বাড়ী ত গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। পূবের পাড়ায় একটা লোক মারাও গিয়েছে। মা এ অবস্থায় আমাকে আর পলতায় রাখতে সাহস করলেন না। জলধরের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

এখানে এসে প্রাণের মধ্যে যে কি রকম 'হু' 'হু' করছে, তোমাকে আর কি জানাব? শূন্য বাড়ী, তুমি নেই—আমি যেন এক মুহূর্ত্তও এ বাড়ীত টি‍ঁকতে পারছি না। প্রত্যেক পদে পদে তোমার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠ্ছে। চমকে উঠ্ছি—খালি যেন শুন্ছি বাইরের বারান্দায় তোমার পায়ের শব্দ। ওগো প্রিয়তম! তুমি যে আমার কতখানি তুমি কি তা বোঝ?

ওগো! তুমি পত্রপাঠ মাত্র চলে এস। তোমাকে ছেড়ে আর আমি একমুহূর্ত্তও থাক্তে পারছি না। কোন দিনও ত এ বাড়ীতে তোমাকে ছেড়ে একলা থাকিনি। তাই তোমার অভাবটা এতটা অসহ্য বোধ হচ্ছে। তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র রওয়ানা হয়ে আসবে ত?

ভাসুরঠাকুর বল্লেন, তিনি আজকের ডাকেই তোমাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, পত্রপাঠ চলে আসবার জন্য। ভাসুরঠাকুর যে আমার কি রকম যত্ন করছেন, সে আর তোমাকে চিঠিতে কি জানাব? আমার যাতে কোনও দিকে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য সমস্ত দিনটা আজ অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পাছে আমার একলা শুতে ভয় করে, সেইজন্য বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন সরলা ঝি ত আমার ঘরে শোবেই, তাছাড়া বারান্দার আমার ঘরের ঠিক সাম্নেই দুজন চাকর শোবে। সত্যি, অনেক পুণ্যের ফলে এ রকম ভাসুর পেয়েছিলাম। তুমি ঠিকই বল্তে—উনি মানুষ নন—দেবতা।

কিন্তু যতই যা ব্যবস্থা হোকনা কেন, তুমি নইলে সবই ফাঁকা। তুমি ২।১ দিনের মধ্যে না এলে, আমি এরকম ভাবে একলা এ বাড়ীতে থাক্লে বোধহয় পাগল হয়ে যাব। সমস্ত দিন কি করে কাটাই—বল ত? তাই বলি, চিঠি পাওয়া মাত্র রওয়ানা হও। লক্ষিটী! এস কিন্তু, আমার বিশেষ অনুরোধ, দুটী পায় পড়ি।

মার শরীর ভাল আছে ত? মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং প্রাণভরা ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমারই তুষার।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে তুষারের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠ্ল। মনে পড়ে গেল আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার বেলায় তার সেই কাতর চোখ দুটো। সকাল বেলার ভারী মন, সহসা আপনা থেকে হাল্কা হয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্ল। চোখ তুলে চেয়ে দেখ্লাম ললিত আস্ছে। ললিত এসে বললে "দিদি পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রে তোমার আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ।"

বল্লাম "বেশত। কি খাওয়াবেন দিদি?"

ললিত বললে "তাহলে, তোমরা আজ আর যাচ্ছ না ত?"

একটু হেসে বললাম "পাগল—আজ যাওয়া হয়না—মার একান্ত ইচ্ছা, সামনের স্নানটা সেরে যান।"

ললিত বল্লে "তাহলে চলনা আমাদের বাড়ীতে।"

বল্লাম "তুমি যাও, আমি একখানা চিঠি লিখে একটু পরে যাচ্ছি।"

বললে "আচ্ছা। আমার পথে একটু কাজও আছে। সেরে বাড়ী যাব।"

ললিত চলে গেল। ভেতরে গিয়ে মাকে ডেকে বললাম "মা, থাক আজ আর যাব না। স্নানটা সেরে ৭।৮ দিন পরেই রওয়ানা হওয়া যাবে।"

* * * *

এক সপ্তাহ কাট্‌ল। কালই সেই শুভদিন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক হিন্দু নরনারী কাশীতে এসেছে, এই শুভযোগে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথকে একবার দর্শন করবার জন্য। কি যে যোগটা ঠিক নাম এখন আমার মনে নাই। তবে এইটুকু মনে আছে, সবাই বলেছিল—২৫।৩০ বছর অন্তর অন্তর এই শুভদিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং এমন দিনে কাশীর মত তীর্থক্ষেত্রে থাকা বহু বহু জন্মের তপস্যার ফল।

শুভযোগের সময়টাও মনে আছে—রাত ১১টা ২০ মিনিট ১০ সেকেণ্ড গতে, ২২টা ৩৯ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডের মধ্যে। শুনেছিলাম এই সময়ের মধ্যে গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথকে দর্শন করলে সপ্তজন্মের পাপ-স্খলন হয়। ঐ সময় গঙ্গার ঘাটে এবং বিশ্বনাথের মন্দিরে অসম্ভব ভীড় হবে—এটা সহজেই অনুমান করা গেল। এবং কি রকম কি বন্দোবস্ত করলে মোটের উপর সহজে সব সুসম্পন্ন করা যায়—এই নিয়ে সাতদিন ধরে আমাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল। সুলোচনা দিদির মতে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ব্ব হতেই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকা উচিত, নইলে রাস্তার ভীড় ঠেলে ঠিক সময়ের মধ্যে হয়ত গঙ্গাস্নান হয়ে উঠবেনা। ললিতের মতে, ঐ ভীড়ে কাশীর মত স্থানে অত রাত্রে মেয়েদের নিয়ে না বেরুনই ভাল, এবং একান্ত যদি বেরুতেই হয় ত প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে অন্ততঃ ৪ জন করে পুরুষ থাকা দরকার। এবং অত পুরুষ লোক যখন আমাদের মধ্যে নাই, তখন সুলোচনা দিদির না যাওয়াই উচিত। আমি এবং ললিত মাকে নিয়ে কোনও রকমে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনা যাবে। আর গঙ্গাস্নান? এক ঘটী গঙ্গাজল আগে থাকতে নিয়ে এসে মাথায় একটু ছিটিয়ে নিলেই হবে। এই কথা শুনে সুলোচনা দিদি রেগে উঠে বলেছিলেন—এমন দিনে কাশীতে থেকে তিনি কিছুতেই চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারবেন না। ললিত যদি একান্তই নিয়ে নাই যায়, এবং আমিও যদি সাহস না করি, তিনি টেলিগ্রাফ করিয়ে বিমলবাবু অর্থাৎ তাঁর স্বামীকে আনাবেন। আমি সুলোচনা দিদিকে ভরসা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম "দিদি! ব্যস্ত হবেন না, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবেই।"

যাই হোক শুভযোগের আগের দিন তুষারের কাছ থেকে আমার চিঠির জবাব পেলাম। বেশ চিঠিখানা লিখেছে। আমার যেতে দেরী হওয়ার দরুণ প্রাণে ব্যথা পেয়েছে খুবই, কিন্তু তবুও সে যে অবুঝ নয়, এটা আমাকে চিঠিতে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং বারে বারে অনুরোধ করেছে শুভযোগের পরের দিনই যেন রওয়ানা হই—আর যেন কোন বাধা না হয়। চিঠিতে কত দুঃখ করেছে নিজের দুরদৃষ্টের জন্য। এমন দিনে আমার হাত ধরে গঙ্গাস্নান করবার মহাপুণ্য থেকে সে বঞ্চিত হলো—না জানি কত পাপই করেছিল পূর্ব্ব জন্মে।

কিন্তু সেই দিনই বেলা ৩টা আন্দাজ দাদার এক 'তার' এসে হাজির হলো। তার পাওয়া মাত্র আমাদের রওয়ানা হয়ে যেতে লিখেছেন। কোনও কারণ দেখান নি এবং কেন যে সব জেনে শুনে হঠাৎ আমাদের যাওয়ার জন্য তার করলেন, তার কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেন নি। তুষারকে এবং দাদাকে আগেই সব খুলে লেখা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কালকের দিনটা কাটিয়ে পরশুই আমরা রওয়ানা হব। তবুও এক তার এসে হাজির হলো।

কিছুই বুঝলাম না। মনটা বিশেষ খারাপ হয়ে গেল। মাও একটু কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বললেন, "তা চল, আজই রাত্রের গাড়ীতে ফিরে যাই।"

যদিও ভীষণ একটা দুর্ভাবনা হলো, হয়ত বা হঠাৎ কারো সাংঘাতিক অসুখ করেছে, তবুও আজই রাত্রে ফিরে যেতে কোন রকমেই মন সায় দিল না। পুণ্য করার লোভ, আমার নিজের অবশ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। তবুও, সব দিক রক্ষা করে, একটা সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে, হঠাৎ

একটা অর্থহীন টেলিগ্রাফের জন্য সব উল্টে দেব? বিশেষতঃ মার মনের দিক দিয়ে তার ফল যে কতদূর শোচনীয় হবে, অনুমান করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। দাদার উপর মনে মনে একটু রাগও হলো—হঠাৎ এক তার করে বসেছেন, অথচ কোনও কারণ দেখান নি।

ললিতের সঙ্গে পরামর্শ করে, দাদার তার পাওয়ার ঘণ্টা খানেক পরেই এক তার দিলাম দাদার কাছে। তারটী এবার সাধারণ নয়—জরুরী। উত্তর দেওয়ার টাকাও সঙ্গে দিয়ে দিলাম। দাদাকে প্রশ্ন করে পাঠালাম "কেন?—কারও কি ভীষণ অসুখ?"

সেদিন রাত্রে অবশ্য কোনও জবাব পেলাম না। সমস্ত রাতটা নানান দুর্ভাবনায় ভাল করে ঘুমুতেই পারলাম না—ছট্‌ফট্ করে কাটিয়ে দিলাম। মাকে দাদার কাছে তার পাঠানর কথা বলেছিলাম এবং মুখে কিছু না বললেও মাও যে সমস্ত রাত বিশেষ অস্থিরতায় কাটিয়েছেন—বুঝতে আমার এতটুকু বাকী ছিল না।

জবাব এল, তার পরের দিন বেলা প্রায় ১২টা আন্দাজ। জবাব পেয়ে সত্য সত্যই আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? লিখেছেন "সবাই ভাল আছে—ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।"

তবুও মনটা কিন্তু শান্ত হল না। আগের তার যে কেন করেছিলেন, কোন সন্তোষজনক কারণই খুঁজে পেলাম না। নানান চিন্তা মনটাকে পেয়ে বস্‌ল। একটী একটী করে, যা কিছু কল্পনা করা যায়, সমস্ত রকম কারণ ভেবে দেখলাম। শেষ পর্য্যন্ত নানান রকম ভেবে মোটামুটী একটা কারণ মনে মনে ঠিক করে নিলাম। তুষার হয়ত কোনও কারণে রেগে দাদাকে বিশেষ কিছু অপমান করেছে, তাই দাদা দুঃখে কষ্টে অভিমানে হঠাৎ ঐ রকম তার পাঠিয়েছেন। কিন্তু তুষার ত দাদার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলেনা। হয় ত ব্যবহারে কিছু অমর্য্যাদা দেখিয়েছে, কিম্বা হয়ত আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়েই কোনও অপমানসূচক কথা বলেছে।

তারের কথা শুনিয়ে মাকে বল্‌লাম "মা! দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন "যাই হোক, কালকেই দুপুরের গাড়ীতে ফিরে চল—আর কাশীতে থেকে দরকার নেই।"

সমস্তদিন মনটা ভারী হয়েই ছিল, কিন্তু সূর্য্যদেব অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগস্নানের আয়োজনে, ভারটা মনের মধ্যে যেন চাপা পড়ে গেল—একটা উত্তেজনায় ভরে উঠল প্রাণ। ললিত, জানা-শোনা দু'চারজন ভলান্টিয়ারের সঙ্গে কথা বলে, কি ভাবে কি বন্দোবস্ত করলে ভাল হয় চারটের মধ্যেই আমাকে খবর দেবে, এই ছিল ব্যবস্থা; কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেল, তবুও ললিতের বাড়ীর কোনও খবর নেই দেখে আমিই ললিতদের বাড়ী অভিমুখে রওনা হলাম।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, ললিতের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত—ললিতদের বাড়ীতে ভীষণ চাঞ্চল্য! সকাল থেকেই না কি ললিতের স্ত্রীর শরীরটা খারাপ হয়েছিল এবং দুপুরের পর থেকেই বেদনা বেশ স্পষ্টভাবে আরম্ভ হয়েছে। ললিত স্ত্রীর অবস্থাটা বিস্তারিত বর্ণনা করে বল্‌ল "এই ত অবস্থা ভাই। আমাদের ত কারও যাওয়া হয় না।"

আমি বল্‌লাম "তা এতক্ষণ আমাদের বাড়ীতে একটা খবর দাওনি কেন? মা এসে একবার দেখে যেতে পারতেন।"

ললিত বললে "সে কথা ত অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি। কিন্তু কে যায় বল? চাকরটাকে ত প্রায় এক ঘণ্টা হল ধাত্রী আনতে পাঠিয়েছি—এখনও এল না। এদিকে এই অবস্থা, আমি ত বাড়ী ছেড়ে যেতে পারছি না, দিদি ও বামুন-ঠাকরুণ ত নলিনীকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন।"

সুলোচনা দিদি বোধহয় আমার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। কোণের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন "কে? সুশান্ত না কি? দেখলে ত ভাই, অদৃষ্টের খেলা। নইলে আজকের দিনেই ঠিক এ রকম হবে কেন?"

কথাটা সত্য। এই যোগ উপলক্ষ্যে সুলোচনা দিদির উৎসাহ, আগ্রহ, বোধহয় সকলের চেয়ে বেশী ছিল। অবস্থা দেখে, সুলোচনা দিদির জন্য আমার সত্য সত্যই একটা কষ্ট হল। কিন্তু উপায় ত কিছুই নাই। সুলোচনা দিদি নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন "কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও

ধান ভানে। নইলে কাশীর মত জায়গায় থেকে এত বড় যোগে স্নানটা পর্য্যন্ত করতে পারলাম না। হবি ত হ আজকের দিনেই। ঠিক সময়ে হলে, এখনও ত প্রায় একমাস দেরী। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টে না থাকলে কিছুই হয় না।”

সুলোচনা দিদির চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

কিছুক্ষণ ললিতের বাড়ীতে থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। বলে এলাম, পারিত স্নানে যাওয়ার আগে মাকে নিয়ে এসে একবার দেখে যাব।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। রাত ১০টা আন্দাজ স্নান যাত্রায় মাকে নিয়ে বেরুলাম—সঙ্গে গেল মালতী। মালতীর বাবা রাত্রে চোখে দেখতে পান না, তাই তিনি ঐ ভিড়ে বেরুতে সাহস করলেন না। মালতীর মার কোমরে বাত তিনি ছিলেন একরকম শয্যাশায়ী।

মালতীর বাপ ও মা যে যেতে পারবেন না এ আমি আগেই জানতাম। এবং বাপ মা না গেলে মালতী যে অতরাত্রে একলা আমাদের সঙ্গে যাবে—একথা আমি একবারও ভাবিনি।

ললিতের বাড়ী থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার পরে মালতীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

মাকে সব কথা বলে দশাশ্বমেধ ঘাটের অবস্থাটা দেখবার জন্য একলাই একবার সেইদিকে বেড়াতে গেলাম। দেখলাম ভিড় এরই মধ্যে বেশ জমতে আরম্ভ হয়েছে।

ফিরে এসে মারই কাছে শুনলাম, মালতী আমাদের সঙ্গে যাবে। শুনলাম মালতী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে মালতীর বাবা শুধু আপত্তিই করেননি, মেয়ের এই রকম অসঙ্গত ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য একটু তিরস্কারও করেছিলেন। একটু শ্লেষভরেই নাকি বলেছিলেন তার মত অদৃষ্টহীনার পক্ষে এ রকম বাসনা মনে আনাও অমার্জ্জনীয়।

অদৃষ্টহীনা বলে পুণ্যলোভাতুরা হওয়াও কেন যে অমার্জ্জনীয়, এর কোন পরিষ্কার সঙ্গত কারণ মালতীর বাবার মনে ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু এই মাস খানেক মাস দেড়েকের মধ্যেই এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম মালতীর বাবা, অবশ্য সময়ে অসময়ে বিনা কারণে মেয়ের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না। মালতীর প্রতি পিতার ব্যবহারে সব সময়েই একটী কথা প্রকাশ পেত—মালতীর দুরদৃষ্টের জন্য তিনি মালতীকেই সম্পূর্ণ দোষী করেছেন, এবং কন্যার দরুণ তাঁদের বৃদ্ধবয়সের মনোকষ্টের দায় ভার তিনি সম্পূর্ণ মালতীর উপর চাপিয়ে দিয়েই যেন কতকটা স্বস্তি পেতে চান।

যাই হোক, মালতীর বাবা আপত্তি করেছিলেন, হতেও পারে আমাদের সঙ্গে ওভাবে একলা যাওয়াটা তাঁর ঠিক মনঃপূত ছিলনা। শুনলাম মালতী সমস্ত সন্ধ্যাটা বাড়ীর অন্ধকার কোণে কোণে চোখের জল পুঁছে কেঁদে বেড়িয়েছে। মা সবই লক্ষ্য করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত মা-ই গিয়ে মালতীর মাকে মালতীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এবং মেয়ের প্রতি করুণা বশতঃই হোক, কিংবা মার অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্যই হোক, কি জানি কি ভেবে মালতীর বাপ শেষ পর্য্যন্ত তাকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

মা বললেন “আহা! মেয়েটা সত্যি বড় ভাল। যাওয়ার কথা বলে বকুনি খেয়ে মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, অথচ বাপ মাকে কিছুই জানতে দেয়নি। হায়রে! এমন মেয়ের এমন অদৃষ্ট।”

রাস্তায় বেরিয়ে নদীর দিকে কিছু দূর যেতে না যেতেই বোঝা গেল যে মা ও মালতীকে আমার দু পাশে রেখে হাত ধরে চলা দরকার। নইলে রাস্তার প্রচণ্ড জনস্রোতের ঘূর্ণিপাকে কে কোথায় হারিয়ে যাব—খুঁজেই পাওয়া যাবে না। মার হাত ধরে, মালতীর হাতখানি ধরতে প্রথমটা আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মালতী জনতার প্রবল চাপে আমার এত কাছে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল যে মালতীর সমস্ত শরীরখানিই আমার বাহুতে অনায়াসে দিল ধরা, আমার শরীর কেমন যেন শিউরে উঠতে লাগল।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে—বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে জনতার অবস্থা দেখে এক পাণ্ডা নিযুক্ত করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু তবুও মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্বনাথের সম্মুখে প্রচণ্ড জনতার প্রবল নিষ্পেষণের হাত

হতে মালতীকে বাঁচাবার জন্য বাহু বন্ধনে তাকে একেবারে বুকের মধ্যে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলাম। এই অবস্থায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ছে তার তনুখানি;—এত নিস্পন্দ এত প্রাণহীন, যে বাহুবন্ধন একটু শিথিল করলেই নিরাশ্রয়ে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।

* * *

পরের দিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কাশী ছেড়ে দেশের অভিমুখে রওয়ানা হলাম। সম্মুখেই আমার আবার সেই চির-পুরাতন দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাত।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এ সবই নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত হেয় বলে মনে হতে লাগল—যেন আমার প্রাণকে আর স্পর্শই করতে পারবে না। কাশী ছেড়ে চলেছি বটে কিন্তু প্রাণে প্রাণে নিয়ে চলেছি একটা পুলকের স্পন্দন, যেন একটা নতুন উৎসাহ একটা গভীর আনন্দের নব জাগরণ। মাধবপুর! আমারই প্রাণের অনুভূতির রসে চিরসরস মাধবপুর! আমারই সম্মুখে। চলেছি ত তারই প্রাণে।

ট্রেনে যেতে যেতে হঠাৎ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! সাবির খবর কি? বহুকাল ত তার কোনও খবর পাইনি।"

মা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন "বছর পাঁচেক আগে বিধবা হয়েছে খবর পেয়েছিলাম—তারপর আর কোনও খবর পাইনি।" (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমরা বাসিব ভালো

শ্রীপ্রতাপ সেন

তোমারে বেসেছি ভালো হেমন্তের উষ্ণ রৌদ্র সম,
তোমার নয়নে দেখি বিরহিণী কুমারীর রেখা;—
শুভ্র-সীমন্তের 'পরে সিঁদুরের চিহ্ন অনুপম
এখনো দেয়নি দেখা। এখনো যে আছ তুমি একা
সহস্রের মাঝে, আপনার চিন্তায় মগন।
দেখ নাই পৃথিবীর প্রচুরতা তব অপেক্ষায়
আছে চাহি; বৃথা কাটে আমাদের প্রতিটি লগন;
আসন্ন-বসন্ত যেন ব্যর্থ হ'য়ে না লয় বিদায়!

অতীত বৃশ্চিক সম এখনো যে করিছে দংশন,
তার জ্বালা দিবানিশি দহিতেছে তনু-মন মোর;
তোমার পরশ দিয়া যদি তায় কর নিবারণ,
ধীরে ধীরে কেটে যাবে অতীতের তিক্ততার ঘোর।
তাই বলি,—সরে এসো, কাছে এসো একাকিনী মেয়ে,
আমরা বাসিব ভালো যুগ-যুগ মুখোমুখি চেয়ে!

সোনালী রঙ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৬

ঘণ্টা দুয়েকের আগে-পিছে স্বামী এবং স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং অমরেশ প্রভৃতি সেবাকারিগণের নিরবসর শুশ্রূষা অতিক্রম ক'রে স্বামী প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পরলোকের যাত্রী হ'ল। দুর্দ্দান্ত রোগ-যন্ত্রণার উপর স্ত্রীর অসহ্য হয়ে উঠল শোকের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা। সমস্ত দিন তার মুখের বুলি হ'ল, 'ওগো, তোমরা আমাকে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুলে আমার সর্ব্বনাশ করোনা! যেতে দাও আমাকে তাঁর কাছে, দয়া ক'রে যেতে দাও!' সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিধাতা-পুরুষ অভাগিনীর করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন। দাহ-কার্য্যের ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে পারুলকে নিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে অমরেশ যখন গৃহে ফিরল তখন প্রায় রাত্রি আটটা।

অল্প সময়ের ব্যবধানে চোখের সম্মুখে স্বামী এবং স্ত্রী দুই-জনের মৃত্যু অবলোকন ক'রে,—বিশেষতঃ সেই ভীষণ রোগে, যাতে মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সে তার জননীকে হারিয়েছে,—পারুলের মন একটা উৎকট সন্ত্রাসে এবং আঘাতে অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল। গৃহে ফিরে অল্পক্ষণ পরে অমরেশ যখন বললে, 'তোমার অনেক কষ্ট গেছে পারুল, আজ আর রান্না-বান্না ক'রে কাজ নেই, ভাল দোকান থেকে কিছু পুরি ভাজিয়ে আনাই, সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া যাক।' তখন পারুলের চেতনা স্বাভাবিকের রেথাঙ্কনের দিকে অনেকখানি ফিরে এল। বললে, "না দাদা, এত অসুখ বিসুখের মধ্যে বাজারের খাবার খেয়ে কাজ নেই। আমি আগুন দিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি, আপনি হাত পা ধুয়ে বসুন। তারপর সামান্য দুটো ভাতে-ভাত রেঁধে নোবো অখন।"

অমরেশ আর এ বিষয়ে তেমন আপত্তি করলেনা, বিশেষত কথাটা যখন একমাত্র তারই আহার নিয়ে নয়।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে অমরেশ বল্‌লে, "পারুল, কাল আমাদের হৃষিকেশ যাবার কথা, জান ত? রাত্রি তিনটের সময় উঠ্‌তে হবে। আমার যদি ঘুম না ভাঙ্গে আর তোমার যদি ভাঙ্গে, তা হ'লে আমাকে উঠিয়ে দিয়ো।"

হৃষিকেশে একজন উচ্চশ্রেণীর অঘোরপন্থী যোগীর আগমনের কথা শোনা গিয়েছিল। অমরেশের পরিচিত চার পাঁচজন সাধুর সহিত অমরেশের উক্ত যোগীকে দর্শন করতে যাওয়ার কথা কয়েকদিন থেকে স্থির হ'য়ে আছে। কথাটা একবার পারুল শুনেছিল, কিন্তু গতরাত্রি হ'তে অসুখের গোলযোগের তাড়নায় সে কথাটা তার একেবারেই মনে ছিলনা। চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লে, "এই পরিশ্রম আর অনিয়মের পর আজ শেষরাত্রেই না গেলেই কি নয় দাদা?"

অমরেশ বল্‌লে, "পরিশ্রম আর এমন কি হয়েচে? তা ছাড়া, চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে শরীরে আর কোনো গ্লানিই থাক্‌বে না।"

"কিন্তু দিন দুই পেছিয়ে দেওয়া যায় না কি?"

অমরেশ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না তা যায় না। শুধু ত আমারই কথা নয় পারুল, চার পাঁচ জন সাধু নিজেদের সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন, তাঁদের অসুবিধে হবে।"

"ঋষিকেশ এখান থেকে কত দূর?"

"ক্রোশ ছয়েক।"

"কিসে যাবেন?"

"অবশ্য হেঁটে।"

অমরেশের কথা শুনে পারুল শিউরে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "ছ ক্রোশ পথ হেঁটে যাবেন? কেন গাড়ি করুন না, গাড়ি ত যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

অমরেশ বল্‌লে, "গাড়ির অভাব নেই, কিন্তু আমাদের কাছে ঋষিকেশ যাবার প্রধানত দুটো আকর্ষণ; প্রথম হচ্ছে সাধু দর্শন, আর দ্বিতীয় পথ চলা। আমার নিজের কাছে আবার প্রথমটা দ্বিতীয়, আর দ্বিতীয়টা প্রথম কি-না, তা ঠিক বল্‌তে পারিনে।"

"ফেরবার সময়ে গাড়ীতে আসবেন ত?"

"পারক পক্ষে নয়। বৈকালে পাঁচটায় রওনা হ'য়ে রাত্রি দশটায় এখানে পৌঁছনো এমন কিছু কঠিন হবে বলে মনে হয় না।"

কিছুক্ষণ পারুল চিন্তিত মনে নীরবে অবস্থান করলে, তারপর ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বল্‌লে, "আমার একটা কথা রাখবেন দাদা?"

"কি কথা?"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন?"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেললে; বল্‌লে, "তবেই হয়েছে!"

অপ্রতিভ হ'য়ে পারুল বললে, "কেন, হাঁটতে পারব না বলছেন? তা নিশ্চয় পারবনা, কিন্তু আমার জন্যে একটা গাড়ি নিলেই ত হবে।"

অমরেশ বল্‌লে, "আর, মাঝে মাঝে আমাকে তোমার সেই গাড়িতে চড়িয়ে নিলেই হবে, কেমন এই মৎলব ত?"

"তা'তে এমনই কি আপত্তি আছে দাদা?"

"তাতে আমার পক্ষ থেকে তেমন কিছু আপত্তি না থাকলেও সকলের পক্ষ থেকে অন্য দুটি গুরুতর আপত্তির কথা আছে।"

কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

"প্রথমত, আমাদের শাস্ত্রে আছে পথ চল্‌তে হ'লে স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিতে নেই; আর দ্বিতীয়ত, আমার মত অসাধুর কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু আর যে সব সাধু আছেন তাঁদের সঙ্গে যেতে হ'লে তোমার সাধারণ স্ত্রীলোকের মত যাওয়া চলবেনা; গেরুয়া বস্ত্র পরে দলভুক্ত হ'তে হবে। কিন্তু সে সব ব্যবস্থা করবার পক্ষে সময়ের একান্ত অভাব।" তারপর নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে অমরেশ বল্‌লে, "যাও, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে, শেষ রাত্রে উঠতে হবে; হয়ত তখন এক কাপ চা-ও ক'রে দিতে হবে।"

অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবতে ভাবতে পারুল বল্‌লে, "এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগচে না দাদা,—এই ছ কোশ পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা—শরীরের ওপর এত অত্যাচার করবেন না!"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বললে, "এ-সব শরীর অত্যাচারের রোদ বৃষ্টিতে এমন ক'রে পেকেছে যে, সামান্য অত্যাচারে বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না, বরং আরামের আওতার মধ্যে ঘুণ ধরবার ভয় আছে।"

কুণ্ঠিত স্বরে পারুল বল্‌লে, "কিন্তু—"

পারুলকে কথা কইবার অবসর না দিয়ে অমরেশ বল্‌লে, "কিন্তু কথায় কথায় আমার বিশ্রামের সময়টা ক্রমশই কমে আসছে;—অতএব আর বিলম্ব না ক'রে শুয়ে পড় গিয়ে।"

এ কথার পর আর কোনো কথা চলে না, অগত্যা পারুল তার নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলে।

৭

কয়েক ঘণ্টা পরে অমরেশ যখন ঋষিকেশের অভিমুখে যাত্রা করলে তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। একটু বেশি রাত্রি থাকতেই তার সহযাত্রীরা এসে তাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলেছিল।

যাবার সময়ে অমরেশ পারুলকে বললে, "লখিয়া মাইকে না-হয় ডেকে দিয়ে যাই পারুল, বাকি রাতটা সে তোমার কাছে এসে থাকুক।"

মাথা নেড়ে পারুল বললে, "রাতের আর কতটুকুই বা বাকি আছে, তাকে বিরক্ত করবার কোনো দরকার নেই।"

দরকার সত্য সত্যই তেমন কিছু ছিল না;—পথে ঊষা-

স্নানযাত্রীদের চলাচল আরম্ভ হয়েছিল; তা ছাড়া, সামনের বাড়িতে শীতল চৌবের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অমরেশ বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে সাবধানে থেকো, আমি রাত দশটা আন্দাজ ঠিক এসে পৌঁচচ্ছি।"

অমরেশ চ'লে গেলে সদর দরজায় ভাল ক'রে অর্গল দিয়ে এসে পারুল তার শয্যা গ্রহণ করলে। একটু নিদ্রা দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুতেই তা হ'ল না। একটা কি রকম অস্বস্তি, একটা যেন কিসের দুশ্চিন্তা মনকে স্থির হ'তে দেয় না, চঞ্চল ক'রে রাখে। সে চিন্তার আকার প্রকার, সঙ্গতি, কারণ—কিছুই সঠিক নির্ণয় করা যায় না, অথচ মনকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করাও যায় না। এক একটা বেদনা আছে যার অনুভূতি থাকে কিন্তু পরিস্থিতি বোঝা যায় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলেও তার স্থান নির্ণয় করা শক্ত হয়,—এ যেন কতকটা সেই রকম। হয়ত তার অবচেতন মনে তার একান্ত আশ্রয়হীনতার যে ভীতি যে শঙ্কা লুক্কায়িত আছে, চেতন মনে এ তার অস্পষ্ট ছায়াপাত। কলিকাতা হ'তে এই সুদূর বিদেশে মাতৃহীন, স্বজনহীন বন্ধুহীন হয়ে সে আছে একমাত্র অমরেশের সহৃদয়তা এবং করুণার উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু এর স্থায়িত্ব কোথায়?—এ ত যে-কোনো মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। এই ত' অমরেশ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চ'লে গেল, সে ত আটকাতে পারলে না! এ না হয় কয়েক ঘণ্টার জন্য ঋষিকেশের কথা, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যেদিন সে তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যাবে সেদিন কি হবে? সেদিন কি আবার সেই গরাণহাটার বাড়িতে সে প্রবেশ করবে?—সেই অনাচার-অত্যাচার-ব্যভিচার-কলুষিত পাপ-পুরীর মধ্যে?—সেই মদ-মাংস-চিংড়ি-কাঁকড়ার আঁস্তাকুড়, লম্পট-গুণ্ডা-বাড়িওয়ালীর লীলাক্ষেত্র গাইয়ে বিনির গৃহে?—এই অমরেশকে পরিত্যাগ করে? এই অমরেশের পবিত্র নির্ম্মল উদার পরিবেশ হ'তে কক্ষচ্যুত হয়ে?

একটা মর্ম্মন্তুদ ঘৃণা এবং বিরক্তিতে পারুলের সমস্ত দেহ এবং মন কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল!

কি সুন্দর এই অমরেশ! কি অদ্ভুত তার ক্ষমা করবার শক্তি, আর কি বিস্ময়কর তার ঘৃণা করবার অক্ষমতা! বিপদের মহাদুর্দ্দিনে পরিত্রাতারূপে দেখা দিয়ে পরবর্ত্তী এই কয়েক দিনের অপরূপ আচরণের দ্বারা সে তার পাপসম্পৃক্ত মসীময় বিগত জীবনকে ধুয়ে মুছে তার গ্রন্থন এমন শিথিল ক'রে দিয়েছে যে, সে জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়া আর অসম্ভব। কিন্তু অমরেশের কাছে একটা দীর্ঘস্থায়ী পাকা আশ্রয়ও ত অসম্ভব। সুদূর প্রবাসে সমাজের বাইরে একান্ত উপায়হীনতার মধ্যে যে আশ্রয় তার সম্ভব হয়েছে, কলিকাতায় অমরেশের গৃহের ভিতর একদিনেরও জন্য তার সম্ভাবনা নেই। অমরেশের স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই তা সত্য, কিন্তু সমাজ এবং সংসার ত শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পারুলের মধ্যে স্ত্রীলোকের লতাধর্ম্মী মন আশ্রয়ের লালসায় চতুর্দ্দিকে সঞ্চরমাণ হয়ে উঠল।

বাইরে প্রত্যুষের আলোক সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। নিদ্রাহীন শয্যা পরিত্যাগ ক'রে পারুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পথের অপর দিকে সামনের বাড়িতে শীতল চৌবে তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে দোহা আবৃত্তি করছে—

সুত বিত নারী ভবন পরিবারা,
হোঁহি যাহি জগ বারহি বারা।
অস বিচার জিঅ জাগহুঁ তাতা,
মিলে ন জগমে সহোদর ভ্রাতা॥

ক্ষণেকের জন্য পারুলের মন শীতল চৌবের গভীর-মিষ্ট কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হ'ল। তারপর ধীরে ধীরে অমরেশের ঘরের তালা খুলে সে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে। যাবার সময়ে অমরেশ তাকে চাবি দিয়ে গিয়েছিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে পারুল অমরেশের শয্যা-পার্শ্বে এসে দাঁড়াল। বিছানার চাদর কুঞ্চিত; মাথার বালিস যথাস্থান থেকে বাঁ দিকে একটু স'রে গিয়েছে; পাশের বালিসটা একদিকের শয্যা-প্রান্তে ঠেলে দেওয়া; সমস্ত শয্যার উপর সদ্য-ব্যবহারের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। ক্ষণেকের জন্য মনের একটা অন্ধতম গহ্বরে মলিন লোভ জেগে উঠল,—ইচ্ছা হ'ল সমস্ত দেহটা অমরেশের ব্যবহার-রম্য শয্যার উপর একবার লুণ্ঠিত ক'রে দিতে, কিন্তু নিমেষের মধ্যে মনেরই আর একটা দিকে ভৎর্সনার নিষেধ বাণী জেগে উঠল,—না, না! মনে মনে অপ্রতিভ হ'য়ে

পারুল অমরেশের শয্যার পাদদেশে এসে ভূমিতলে উপবেশন করলে, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার প্রান্ত-দেশে তিনবার মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন লখিয়া মাঈ সদর দরজায় কড়া নাড়ছে।

বাসন মেজে, চৌকা লেপন ক'রে লখিয়া মাঈ উনানে আগুন দিতে উদ্যত হ'ল। পারুল বললে, "লখিয়া মাঈ, এ বেলা আর উনোনে আগুন দিয়ো না।"

সকৌতূহলে লখিয়া মাঈ জিজ্ঞাসা করলে, "কেন মা-জী?"

"বাবু গেছেন ঋষিকেশ, ও বেলা আসবেন। একা আমার জন্যে আর রেঁধে কি হবে, কিছু চিঁড়ে আর দই এনে দিয়ো। চিনি বাড়িতেই আছে।"

বিস্মিতকণ্ঠে লখিয়া মাঈ বললে, "বাবুজী ঋষিকেশ গেছেন ব'লে তুমি রাঁধবে না মাজী? আর চা? চা খাবে না?"

"একটু কাগজ-টাগজ জ্বালিয়ে চায়ের জল ক'রে নোবো অখন।"

লখিয়া মাঈর মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "বাবুজী ঋষিকেশ গেছেন ব'লে মাজীর মন উদাস হয়ে গেছে! ভুখ পিয়াসও নেই।" তারপর একটা কি ছড়া আবৃত্তি ক'রে উচ্চস্বরে হাসতে লাগল।

পারুলের মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল, অধর প্রান্তে মৃদু হাস্যের একটু আভাসও দেখা দিলে। ছড়ার মর্ম্ম সে একটুও বুঝতে পারলে না, কিন্তু একথা সে নিঃসংশয়ে বুঝলে যে, অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঠিক প্রকৃতি যদি লখিয়া মাঈর জানা থাকত তা হ'লে ও ছড়া আবৃত্তি করা তার কিছুতেই চলত না।

আলস্যে অনুৎসাহে শুয়ে ব'সে পারুলের সমস্ত দিনটা কোনো রকমে কেটে গেল। পড়বার জন্য অমরেশ খান দুই বই দিয়েছিল, সে গুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে ভাল লাগে নি। সন্ধ্যা হ'তেই রান্না চড়িয়ে দিয়ে কর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সে অনেকটা আরাম বোধ করলে।

রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে সদর দরজায় যখন কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল তখন তার রন্ধন কার্য্য শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে অমরেশ বললে, "কি পারুল, ভয়-টয় করেছিল না-কি?"

পারুল বললে, "না, করে নি।"

"খবর সব ভাল ত?"

"ভাল।"

"তবে গলার স্বর ও-রকম ভারি কেন?"

মৃদু হেসে পারুল বললে, "না, ও কিছু নয়। আসবার সময়েও হেঁটে এলেন ত দাদা?"

"তা এলাম বই কি।"

"খুব কষ্ট হয়েছে?"

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেললে; বললে, "কিছু যে হয়নি তা বলতে পারি নে, কিন্তু 'খুব' বলতে তুমি যা মনে করছ তেমন কিছু হয় নি।"

"তা হ'লেই বোঝা গেছে" ব'লে পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "চায়ের জল চড়িয়ে দেবো দাদা?"

অমরেশ বললে, "তা দিয়ো, কিন্তু তার আগে যদি একটা বাল্‌তি ক'রে খানিকটা অল্প গরম জল দাও ত মন্দ হয় না।"

আগ্রহভরে পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "কি করবেন?"

"পা দুটো খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে একটু আরাম পাওয়া যাবে, অথচ বেদনাও হবেনা।"

ব্যস্ত হ'য়ে পারুল বললে, "গরম জল খানিকটা করাই আছে, আমি এখনি ঠিক করে দিচ্ছি।" ব'লে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলে।

আহারাদি সমাপন ক'রে অমরেশ ও পারুল যখন নিজ নিজ ঘরে শয়ন করতে গেল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। শয্যা গ্রহণ করবা মাত্র অমরেশের পথশ্রমক্লান্ত অবশ দেহ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই গাঢ় নিদ্রার মধ্যেই এক সময়ে অনির্ণেয় কারণে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঠিক কিছু বুঝতে পারলে না। মনে হল ঘরের ভিতরটা যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেছে; সম্মুখ রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল, হয়ত চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার জন্যই হ'য়ে থাকবে মনে ক'রে সে পাশ ফিরে শুলো। নিদ্রা আসতে বিলম্ব হ'ল না, কিন্তু এবার নিদ্রা গাঢ় হবার পূর্ব্বেই স্পষ্টভাবে একটা স্পর্শ অনুভব ক'রে আচম্বিতে

শয্যার উপর উঠে বস্‌ল। সম্মুখে একটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে হাত বাড়াতেই একখানা চুড়ি-বালা সমেত হাত মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ল!

গভীর কণ্ঠে অমরেশ বল্‌লে, "এ কি? পারুল না কি?"

অমরেশের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত ক'রে নেবার কোনো চেষ্টা না ক'রে পারুল মৃদু স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ

"তুমি এ সময়ে এখানে কেন?"

অমরেশের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে পারুল বল্‌লে, "আমি চলে যাচ্ছি দাদা, আপনি ঘুমোন।"

ধীরে ধীরে পারুলের হাত ছেড়ে দিয়ে অমরেশ বল্‌লে, "আচ্ছা আমি ঘুমব অখন, কিন্তু তুমি একটু বোসো।" তারপর বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার ক'রে পাশের টিপয়ে রাখা ল্যাম্পটা জ্বেলে দেখ্‌লে পারুল উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার কিসের একটা বাটি।

"ওটা কি ব্যাপার দেখি!" ব'লে সকৌতূহলে হস্ত প্রসারিত ক'রে বাটিটা হাতে নিয়ে দেখে বল্‌লে, "এ যে গরম সরষের তেল!" তারপর নিজের পদদ্বয় লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "দুটি পায়ে বেশ ক'রে লাগিয়েও দিয়েছ দেখ্‌চি! সেবার পক্ষে এ অবশ্য খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছিলে, কিন্তু তবুও ভাল করনি পারুল! এত রাত্রে এমন ক'রে আমার ঘরে তোমার আসা ভাল হয়নি।"

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে পারুল বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করুন দাদা!"

অমরেশ বললে, "ক্ষমার কথা নয় পারুল। ক্ষমা করার চেয়ে ধন্যবাদ দেবার কথা হয়ত এতে বেশি আছে। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবেনা যে, প্রত্যেক পুরুষের সহিত প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সম্পর্কের হিসাবে যে বিশেষ আচরণের ব্যবস্থা আছে তা বজায় রেখেই চল্‌তে হবে। আশা করি এ কথা তুমি ভবিষ্যতে কখনো ভুলবেনা।"

"কিন্তু আমার ভবিষ্যত যে কি তা'ত জানিনে দাদা! আপনি ত আমার আশ্রয় ভেঙ্গে দিয়েছেন!" বলে সহসা পারুল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

কাছেই একটা টুল ছিল, সেটা পারুলের দিকে সরিয়ে দিয়ে অমরেশ বল্‌লে, "উত্তেজিত হ'য়োনা, স্থির হ'য়ে বোসো।" তারপর পারুল উপবেশন করলে বললে, "আশ্রম ভেঙ্গে দেওয়ার মানে ঠিক বুঝতে পারছিনে, তুমি কি স্থির করেছ যে গরাণহাটার বাড়িতে আর ফিরে যাবে না?"

দুই হাতের ভিতর মুখ লুকিয়ে পারুল তখনো ফুলে ফুলে কাঁদছিল; বল্‌লে, "না, কিছুতে না!"

অমরেশ বললে, 'তা এ তো ভাল কথা; এর জন্যে এত কান্নাকাটি কেন? তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোয় গে, তোমার গরাণহাটার চেয়ে ভাল জায়গা কলকাতায় খুব দুষ্প্রাপ্য হবেনা। আর-কিছু যদি না-ই হয়, গড়ের মাঠের গাছতলা ত কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।" ব'লে সে হাস্‌তে লাগল। তারপর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে বল্‌লে, "এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা পরে হবে অখন, এখন তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মত শুয়ে পড়োগে। তোমার তেমন দরকার না থাকলেও, আমার একটু ঘুমের দরকার হয়ত আছে।"

পারুল উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর সমস্ত রাতটা বিছানায় পড়ে কেঁদে কেঁদে কাটালে। সে কান্নার কতখানি নৈরাশ্যের, আর কতখানি আশ্বাসের, মনোগণিতের সে একটু কঠিন অঙ্ক।

সকালে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে পারুলের কাছে উপস্থিত হ'য়ে অমরেশ বল্‌লে, "চায়ের কত বিলম্ব পারুল-প্রভা?"

চায়ের ব্যবস্থা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। পিছন ফেরা অবস্থাতেই পারুল বল্‌লে, "পারুল-প্রভা নয় দাদা, পারুল।"

অমরেশ বল্‌লে, "না না, পারুল-প্রভাই। আজকের না হ'লেও, ভবিষ্যতের নিশ্চয়ই। তা নইলে গাছতলা দেখাতে সাহস করি!" ব'লে উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল।

চায়ের কাপ হাতে ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পারুল বল্‌লে, "চলুন, ঘরে দিয়ে আসি।"

সেইদিন বৈকালে অসীমানন্দ স্বামীর সহিত একান্তে দেখা হ'তে অমরেশ বল্‌লে, "পারুলকে নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে প্রভু!"

অসীমানন্দ বল্‌লেন, "তোমার সমস্যা ত' সমাধানের হাত ধ'রে উপস্থিত হয়, তবে ভাবনা কেন?"

সহাস্যমুখে অমরেশ বল্‌লে, "এবারকার সমস্যাটা ঠিক সেরকম নয়, সত্যই কঠিন। পারুল আর তার গরাণহাটার বাড়ির গত জীবনে ফিরে যেতে চায় না।"

অসীমানন্দ বল্‌লেন, "তোমার আশ্রয় যখন সে পেয়েছে তখন ত' চাইবেই না। তুমি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

অমরেশ বল্‌লে, "আমি কেমন ক'রে ক'রে দেবো প্রভু? সে স্ত্রীলোক আর আমি অবিবাহিত পুরুষ—আমার শক্তিই বা কোথায়, আর সুযোগই বা কোথায়?"

অসীমানন্দ বল্‌লেন, "তোমার শক্তি আছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, আর শক্তি থাকলে সুযোগের প্রয়োজন হয় না। শোনো অমরেশ, পারুল তোমার জীবনের সমস্যা নয়, সে তোমার জীবনের সুযোগ। তুমি তাকে অনেক উপরে তুলে দেবে, আর তাকে অবলম্বন করে তুমি নিজেও অনেক উপরে উঠে যাবে। এ তুমি দেখে নিয়ো।"

হাসতে হাসতে অসীমানন্দের পদধূলি গ্রহণ ক'রে অমরেশ বল্‌লে, "আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়। কিন্তু আমার প্রতি আপনার এ বিশ্বাসের মূল অহেতুক স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই নয় প্রভু।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে অসীমানন্দও হাসতে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা

শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু

তোমারে মরিনু খুঁজি' তারাভরা রজনী-গহনে,
বসন্তে মাধবীবৃন্তে কম্পমান মধুভৃঙ্গ দল
বৃথাই ডেকেছে মোরে, সায়াহ্নের ধূসর গগনে
দিবসের শেষ আলো মরণের পরশ-বিহ্বল,
মোহিয়া তুলেছে যারা মরমীরে ঘিরি' স্বপ্নজালে,
প্রিয়েরে প্রিয়ার বুকে আনিয়াছে আরো কাছে টানি',
মৌন নিবিড় রসে ভরিয়াছে রাত্রি অন্তরালে
স্তব্ধ ব্যাকুল হিয়া, ফুটায়েছে ভাষাহীন বাণী;

অন্তরে আমার কভু বাজেনিক তব মধুবাঁশী।
দৃঢ়গ্রন্থি মায়াজালে হেরিনু যে বদ্ধ শতপাশে
শৃঙ্খলিত জীবনেরে, আনন্দের স্রোত যেথা আসি'
সহসা হারাল ধারা, এনু যবে বেদনা মাড়ায়ে
কামনা-ব্যথিত, শুনি পদধ্বনি হৃদয়-আকাশে,
প্রিয়া মোর, এলে তুমি ব্যবধান-অতল পারায়ে?

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

শ্রীদীনেন্দুসুন্দর দাস বি-এ

জাতীয় সাহিত্য বৃহত্তর জীবন-সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। সাহিত্যের সহিত জীবনের সংযোগ অতি ঘনিষ্ট। জাতীয় জীবনকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সাহিত্যের দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতা কিছুতেই ঘুচিবে না। আজ আমাদের প্রধান দুঃখ এই যে, জীবনের বিরাট মহিমা আমাদের সাহিত্যে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না। স্বল্প-পরিসর জীবনের ছোটখাটো হাসিকান্নার ছবি ইহার একমাত্র সম্বল। কিন্তু সাহিত্য-সাধনাকে জীবন-সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আমরা অনেকে নিছক স্বপ্ন-বিলাস হিসাবেই সাহিত্যকে দেখিয়া থাকি। কিন্তু সাহিত্য ত একান্ত আরামের বস্তু নয়। ইহা সাধনার ধন। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একাগ্র আন্তরিকতার আবশ্যক। এই আন্তরিকতাই সকল সাধনার মূলমন্ত্র। আমাদের দৃষ্টিকেও আগাগোড়া নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া লইতে হইবে, তবেই আমরা শিব-সুন্দর হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলি ভাব ও ভাষার বিচিত্র আলোকসম্পাতে ফুটাইতে পারিব। পাপ দৃষ্টিতে কখনও পুণ্যছবির স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। সুরাপায়ী উন্মত্ত জগৎসংসারের সারভূতা মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তির পবিত্র ব্যঞ্জনাকেও উগ্র লালসার চোখে দেখিয়া থাকে—ফলে দৃষ্টি অন্ধ ও লুপ্তবোধ হওয়া ছাড়া লাভ কিছু হয় না। স্রষ্টার জীবন-ভিত্তির উপর যদি সৃষ্টির বনিয়াদ রচিত ও গঠিত না হয় তবে তাহা দুইদিন স্বল্প সম্মান ও সস্তা বাহাদুরি ভোগ করিয়া পরিণামে তাসের ঘরের মতই অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টি-সম্ভারের তলে তলে স্রষ্টার জীবন-নদী যদি কুলুকুলুস্বনে উচ্ছল আনন্দে বহিয়া না যায় তাহা হইলে শুধু ফাঁকা-কথার চমক লাগাইয়া স্থায়ী যশ ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করা যায় না। লেখকের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ-বিরহিত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে যশের ফসল বোনা যায় না। পক্ষান্তরে অন্তরের অন্তস্থলে যাহার জন্ম, সত্যের আবহাওয়ায় শিবসুন্দর হৃদয়-পুরীতে যাহা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে-সৃষ্টি স্রষ্টার দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয় না। বরং উহা যতই পুরাতন হইয়া আসিবে ততই যেন অবিনশ্বরতার সোপান বাহিয়া লেখকের অক্ষয় কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া থাকে। লেখক মরেও অমর হন। শেলী, কীটস্, টেনিসন, সেক্সপিয়ার, কালিদাস, সত্যেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রভৃতি মনীষিগণ এই শ্রেণীর রচয়িতা।

বড়ই দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের রুচির বিকার যাহা অগণিত অপরিণতমতি কিশোর-কিশোরীর নৈতিক অবনতির জন্য প্রধান দায়ী সেই হীন রুচি সংক্রামক রোগের মত আজ অন্তপুরেও অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়া যথেচ্ছ বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। নারী, যাঁহারা বিশ্বরমার অংশভূতা, কল্যাণীরূপিণী, সেবাধর্ম্মে ও আপন স্বভাব-মাধুর্য্যে এতদিন সংসার-তাপদগ্ধ মানব-চিত্ত সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা বিলাসিনী ও রূপোপজীবিনীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম ভুলিয়া বিবিধ ভোগবিলাসে মাতিয়া উঠিতে-ছেন। শ্রমলব্ধ সাধারণ অন্নবস্ত্রে আজ তাঁহাদের অনেকেরই পরিতৃপ্তি হয় না, কৃত্রিম জীবন-যাত্রা প্রায় সকলেই অবলম্বন করিয়াছেন, তুচ্ছ ভোগসুখ ও লালসার মোহও অনেককে পাইয়া বসিয়াছে। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য যাহা নারীচরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলিয়া ভারতে আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, সতীত্ব যাহা নারীর সহিত অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হইত আজ যুগধর্ম্মবশে তাহা অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশ্বসংসারের মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিলোপ ও ছোট বড় সকল বিষয়ে পরার্থপরতা যাহা

যুগে যুগে ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হইত, স্বার্থলোলুপ, আধুনিক সভ্যতা তাহাকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়া হীন স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ও অহম্-সর্ব্বস্ব চিন্তাধারাকে নারীর হৃদয়-সিংহাসনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ফলে বাড়িয়াছে অশান্তি, আসিয়াছে গৃহবিবাদ, দম্পতীকলহ আরও অনেক কিছু। ভারতের সহজ, সবল জীবন-প্রবাহে কলুষ-আবিল পঙ্কিলতার জলরাশি মিলিত হইয়া এক মহা-বন্যার সৃষ্টি করিতেছে। এ উত্তাল বন্যা-প্রবাহে সনাতন রীতি-নীতি আচার-বিচার সব তৃণবৎ ভাসিয়া যাইতেছে। এক কথায় আজ আমরা স্বার্থলোলুপ, শ্রমকুণ্ঠ, হীনচিত্ত, বিলাসী, অমানুষ হইয়া উঠিতেছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এদিকে সাম্প্রদায়িকতার ভূতও যেন আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। স্কুল-কলেজ হইতে আফিস্-আদালত, খেলার মাঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমাজ-গণ্ডীর সকল বিভাগেই ইহার প্রবল প্রতিপত্তি ক্রমেই প্রকট হইতেছে। ক্ষেত্রবিশেষ ও অবস্থার গুরুত্ব-অনুসারে ইহার সাময়িক প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার করি। সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই তাহা মানিয়া লন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার নামে, কম-বেশী সুবিধা-সুযোগের দোহাই দিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে আমরা ব্যবধানের যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছি তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এইরূপ মনোবৃত্তি সকল বৃহত্তর উন্নতির পথে বিরাট্ অন্তরায়। মতান্তর হইতে মনান্তর, অনৈক্য হইতে অসহযোগ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বার্থসংরক্ষণের তুচ্ছ চেষ্টায় আমরা বৃহত্তর মিলনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিরোধের যে বীজ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বপন করিতেছি, যুগধর্ম্মের সুযোগ লইয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জলসেচনে সেই বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া মহা মহীরুহের আকার ধারণ করে। ক্রমে সেই বিষবৃক্ষের ফল সংক্রামক রোগের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া গিয়া সুস্থ, সবল জীবনযাত্রাকে দুর্ভর করিয়া তোলে। ফলে সৃষ্টি হয় পরস্পর অবিশ্বাস, ঘোর দলাদলি, কর্ম্মজীবনে চির-বিরোধিতা ও আনুষঙ্গিক বহুতর অশুভ-সমষ্টি।

আমাদের সমাজ-জীবনে আজ নানাদিক্ দিয়া ঘুন ধরিয়াছে। সৎসাহিত্যের ভিতর দিয়া এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজে নব জীবনের সঞ্চার করা আদর্শ সাহিত্যিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। যে সাহিত্য আমাদিগকে মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বল ও কাপুরুষ করিয়া তোলে, বিলাসের ব্যসন-যজ্ঞে ইন্ধন যোগানোই যাহার ব্রত, কর্ম্ম অপেক্ষা নর্ম্মের দিকেই লক্ষ্য যাহার সমধিক ব্যগ্র, বাঙলা দেশে সে সাহিত্যের প্রয়োজন বহুদিন ফুরাইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তে উচ্চতর সাহিত্যের ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই রক্ষণশীল বঙ্গবাসী অতীতের মোহে আজও মজিয়া আছে। সেই মোহ যাহাতে টুটিয়া যায় আপন লুপ্তশক্তির পুনরুত্থানে বাঙ্গালী যাহাতে জাগ্রৎসচেতন হইয়া উঠে, সুস্থ-সবল চিন্তাধারার মধ্য দিয়া দেশে এমন সাহিত্যই আজ গড়িয়া তোলা দরকার হইয়াছে। ভাঙ্গাগড়া লইয়াই সৃষ্টি। যাহা অতীত ও পুরাতন তাহার উপযোগিতা ততদিন অবশ্যই আছে যতদিন সে বিধিনিষেধের অতিরিক্ত বাধনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে দুর্ভর করিয়া না তোলে। বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠার মূলে অতীতের অবদানরাজি অস্বীকার করা যায় না। অতীত ও বর্ত্তমানকে এক যোগসূত্রে মিলনের বন্ধনে বাধিয়া লইয়া জীবনের উপাদানে সাহিত্য গড়িয়া তোলাই হইবে এ যুগের সাহিত্যিকের ব্রত। সত্য হইবে তাঁহার কর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা, জগতের শিব তাঁহার লক্ষ্য, আর চিরসুন্দর দিবে তাঁহাকে অনন্ত প্রেরণা সৃষ্টির পথে যাহা অতুল পাথেয়।

আমাদের চিত্ত-দৈন্যের সুযোগ লইয়া বঙ্গভারতীর পবিত্র কুঞ্জকাননে যে বিবিধ আগাছা, পরভৃতিকা ও কণ্টকতরুর উদ্ভব হইয়াছে, উপযুক্ত সম্মার্জ্জনীসহযোগে সেগুলি নির্ম্মূল করিয়া না দিলে ফলপ্রসূ বৃক্ষলতার শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব। নিরপেক্ষ সমালোচনা সৎসাহিত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে বিপুল সহায়। সৎসাহিত্যের অগ্রগতির পথে অন্তরায় অনেক। সে-সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া আপন কৃতিত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ও সাহস রিক্ত অতি-আধুনিকের শূন্য-ভাণ্ডারে কোথায়? সাহিত্যকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী

করিয়া সুফলপ্রসূ করিতে হইলে তাহাকে প্রদেশের মানসিক উত্তাপে গলাইয়া লইয়া নূতম ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে হইবে। কাঠামো বিদেশী রাখিয়া শুধু দেশী সাজ-পোষাক পরাইলেই চলিবেনা, এদেশের প্রাণের স্পন্দনে উহাকে জীবন্ত করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ চেষ্টা অপচেষ্টায় এবং আশা হতাশায় পরিণত হইবে। আমরা একান্তভাবেই আশা করি ক্ষণিকের মোহে আমরা কদাচ লক্ষ্যহারা হইব না। চিরন্তন পূর্ণ সত্যের উপরই যেন সাহিত্যের সৃষ্টি করা হয়, নচেৎ তাহা ধোপে টিকিবেনা। আমরা প্রবীন তথা নবীন সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীদীনেন্দুসুন্দর দাস

রাশি রাশি বই কেনো

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

হুজুগের দেশে পঁচিশ বছর কাটিয়া গিয়'ছে যার,
সেই সমিতিরে 'বাহবা' বলিতে কুণ্ঠা জাগেনা মনে!
কত না কবির উদয় দেখিলি, কত না ফক্কিকার,
কত না চমক, কত না ঠমক, মিলালো আঁখির কোণে!

কত না উড়ুনী, কত প'ঞ্জাবী আসিয়া, মিলাল ধীরে,
কত মিহিগলা, বর্ম্মাচুরুট, বেশবিন্যাস কত,
কত না ডায়েসে পাদপ্রদীপে নূতন কবিতাটিরে
পাঠ করা হ'ল, সুর টেনে টেনে, তোমার আমার মত!

দুর্নাম কারো, নামী হ'ল কেহ, বিনামা কাহারও ভালে,
প্রোপ্যাগাণ্ডার নামাবলী কেহ মাথা ঢেকে দিল মুড়ি,
অলিতে গলিতে দেখেছি চলিতে, নিত্যনূতন চালে
নিত্যনবীন কথাশিল্পীরে উড়াতে কথার ঘুড়ি!

প্যাঁচ লেগে গেছে, সূতো গেছে কেটে, ভাবের মাঞ্জা
ক্ষ'য়ে,
দুয়ো ব'লে কেউ হাততালি দেয়, তবু থামে নাই কবি;
সমালোচনার জলবিছুটিতে যন্ত্রণা স'য়ে স'য়ে
থামায়েছে খেলা সহসা কখন্, বড় সে করুণ ছবি!

বড় দুঃখের ছবি সে বন্ধু, ইহপরকাল খেয়ে
যশোলিপ্সায় ছুটে ছুটে এসে দারিদ্র্যে ঝ'রে পড়া!
যে মৃত্যুবাণ পেয়েছে তাহারা, দেখোনি হয়ত চেয়ে
কোনোটা তাহারি, অবহেলাভরে তোমারি
হাতের গড়া!

বাঁচাও তাদের, তোমার লাগিয়া যাহারা সাধনা করে,
নামহীন ফুল, খ্যাতিহীন জন, লেখক লেখিকা নব,
ভালো ক'রে তারা না ফুটিতে যদি আঘাতে
আঘাতে ঝরে,
ব্যর্থ সমিতি, ভুলোনা বন্ধু, গুরুদায়িত্ব তব।

কি করিতে পারো? প্রশ্ন জাগে কি? বাড়াও
পড়ার নেশা!
ট্রামে বাসে ট্রেণে পথে ও ঘরেতে কেতাব সঙ্গে এনো।
উপহার লোভে থামাও যতনা কবিদের সাথে মেশা,
চেয়ে নিয়ে পড়া বন্ধ করিয়া, রাশি রাশি বই কেনো।

---

* সাহিত্য সেবক সমিতির রজতোৎসবে পঠিত

মুরারিমোহনের কীর্ত্তি

শ্রীসুবোধ বসু

মুরারি স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। প্রসাধনের জন্য চিরকালই সে পয়সা ব্যয় করিয়া থাকে। তবে বেকার অবস্থায় একটু বেশি করিত, এখন একটু কম করে।

রবিবার ভোরে যখন সে নিউ-মার্কেট হইতে বাহির হইয়া আসিল, হাতে ও বগলে প্যাকিং কাগজে জড়ান নানা মোড়ক দেখা গেল। তার কোনটায় বিলাতি অঙ্গরাগ, কোনটায় ফরাসী গন্ধ, কোনটায় বা মার্কিণী মাথা ঘষা। এমন কি, অনুসন্ধান করিলে এই সকলের মধ্যে একটা নখর-প্রসাধনের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত আবিষ্কার করা যাইবে, এবং সেটা তার নিজেরই ব্যবহারের জন্য কেনা।

এই সৌন্দর্য্যরুচি তার স্বভাবজ। একই কারণে সে এক সময়ে কবিতা লিখিতেও প্রবৃত্ত হয়,—এবং এই সকল কবিতার অন্তত দেড় ডজন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠার পাদপুরণ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সময় হইতেই সে কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

অবশ্য এখন আর সে কবিতা লেখে না। বেকার অবস্থায় কবিতা লেখার মত উপকারী বন্ধু, কমই আছে,—ছন্দ মিলাইবার দুরূহ প্রয়াসে অনেক অযাচিত সময় অনায়াসে এবং অজ্ঞাতসারে চলিয়া যায়। কাজেই তখন কবিতা লেখার ঝোঁক তার অতিশয়ই প্রবল ছিল। কিন্তু এখন ছন্দ মিলাইবার মত অবসর খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কবিতার জন্য একটা রবিবার আর সে নষ্ট করিতে পারে না। তবে সে আজকাল গদ্য কবিতা লিখিবে কিনা ভাবিতেছে।

যাহোক, অঙ্গরাগের বিবিধ প্রকরণ বগলজাত করিয়া মুরারিমোহন হগ-বাজার হইতে বাহির হইল। অবশ্য এখন সাধারণত এতটা আর সে করে না। বিশেষ কারণ ছিল, কারণটা গোপন রাখার কোনই সার্থকতা নাই। মুরারির বিয়ে ঠিক। কাল ভোরেই পাকা দেখা এবং পরশুর পরের দিন শুভ পরিণয়ের তারিখ।

শ্বশুর বর্ম্মাতে বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী। বছরে লক্ষ টাকা তার আয়। একদিন নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় অবনী চৌধুরী মগের মুলুকে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছিলেন। ভাগ্য ধরা দিয়াছে, এবং টাকায় টাঁকায় তিনি নাকি লাল হইয়া উঠিয়াছেন।

অবনী চৌধুরী অবশ্য ব্যবসা ফেলিয়া পাত্র দেখিতে আসিতে পারেন নাই। নিজে নেপথ্যে থাকিয়া ভাই, শালা, ভায়রা প্রভৃতির সাহায্যে মুরারিকে জোগাড় করিয়াছেন। ঠিক আছে, বিয়ের দুচার দিন আগে আসিয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিবেন। পাত্রীর আশীর্ব্বাদ ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে।

চৌধুরী মশায়ের অর্থবল সম্বন্ধে এমন সব গল্প শোনা গিয়াছে যে কবি-চিত্ত পর্য্যন্ত লুব্ধ না হইয়া পারে নাই। অবশ্য শ্বশুরের মেয়েও আছে। বর্ম্মাতে বাঙালি মেয়েকে পড়ান সুবিধাজনক নয় বলিয়া স্কুল হইতে সুরু করিয়া মালতীলতা কলেজের এই ফার্ষ্ট ইয়ার পর্য্যন্ত বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়িয়া আসিতেছে। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইবার পর পুলকিত লজ্জার সঙ্গে সে সঙ্গিনী মহলে প্রচার করিল,—উনিই বিখ্যাত তরুণ কবি মুরারি বাবু।

হাঁটিয়া এসপ্ল্যানেডে আসিয়া মুরারি শিয়ালদহের ট্রামে

চাপিল। পুরাতন ধরণের ট্রাম—নির্জ্জলা কাঠের আসন, তবে বেশ তক্‌তকে পরিষ্কার। মুরারি ট্রামে উঠিয়া কোনদিনই বই বা কাগজ পড়ে না,—এমন কি পরীক্ষার জন্য যাইতে যাইতেও কোনদিন ট্রামে সে নোটের উপর শেষ কামড় দিতে প্রলুব্ধ হয় নাই। সহস্রবার দেখা পথই সবিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে—পথের কোনও বিশেষ ঘটনা তার চোখ এড়ায় না। সহসা—'থামো থামো, রাখকে,—এই, এই শুন্‌তা হ্যায়,—থামাও, থামাও'—ফুটপাথের মধ্য হইতে ব্যাকুল এবং বিষম চিৎকার শোনা গেল। ট্রাম শুদ্ধ সমস্ত লোক ত্রস্ত ফিরিয়া তাকাইল। ট্রাম থামাইবার জন্য এমন সুউচ্চ নির্ঘোষে তীব্র-ভীষণ মিনতি প্রায়ই শোনা যায় না। ইন্দ্রের রথ থামাইবার জন্য মাতলিকেও এমন আবেদন কেহ জানাইত কিনা সন্দেহ।

মুরারি চাহিয়া দেখিল কালো দেখিতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফুটপাত হইতে ছাতা উঠাইয়া ট্রামচালকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে। দাড়িগোঁপে ভরা মুখ, একদিকের কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়া গেছে, গায়ে আধময়লা টুইল সার্টের উপর সাদা কাজ করা সিল্কের চাদর। চোখের উদ্বিগ্নভাব দেখিয়া মনে হয় এই ট্রামগাড়িটা চলিয়া গেলে সে যেন অকূল পাথারে পড়িয়া থাকিবে।

'কে রে ভূতটা!'—ট্রামটা কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থামিয়া যাইতে বিরক্ত মুরারি বিড়বিড় করিয়া মন্তব্য করিল।

ট্রাম থামিতেই ফুটপাথ হইতে প্রৌঢ় ধুতি ও চাদর বাগাইতে বাগাইতে ছুট্ দিল। উল্টা দিকে একটা মোটর হর্ণ দেওয়ায় চম্‌কাইয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, তারপর ভয়-চকিত ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোটর নাই দেখিয়া ছাতা বগলে উর্দ্ধশ্বাসে ট্রামে আসিয়া চড়িল, এবং একটা হোঁচট খাইয়া ছিটকাইয়া মুরারির গায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া তার আসনের অপরার্দ্ধে বসিয়া পড়িল।

ও-দিকে মুখ ফিরাইয়া মুরারি বিড় বিড়্ করিয়া কহিল—'একেবারে জংলী!'

শীঘ্রই মুরারি অনুভব করিল আগন্তুক ক্রমশই তাকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া বেশি জায়গা দখল করিয়া লইতেছে। স্বেচ্ছায়ই মুরারি জায়গা ছাড়িয়া দিল—এমন ব্যক্তির আসঙ্গ মোটেই লোভের নয়। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি না হইলেই বরঞ্চ সে বাঁচে।

পরমুহূর্ত্তেই কুণ্ডলীকরা এক গুচ্ছ চুরুটের ধুঁয়া আসিয়া মুরারির মুখ দিয়া অতর্কিতে গলায় ঢুকিয়া পড়িল। কাশির ধকলটা কমিয়া যাইবার পর মুরারি আবিষ্কার করিল ইতিমধ্যে তার প্রতিবেশী মোটা দেখিতে এক চুরুট জ্বালাইয়া সমুদয় ধুঁয়া মুরারির মুখের উপর উদ্গীরণ করিতেছে।

ট্রামে ও বাস্‌এ চড়িতে হইলে ওসকল সহ্য না করিয়া আর উপায় কি। কিন্তু যেমন উদাস অবজ্ঞার সঙ্গে লোকটা সমস্ত ধুঁয়া তার মুখের মধ্যে স-ফুৎকারে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে, তাতে নীরবে হজম করা স্নায়ুগুলির পক্ষে পীড়াদায়ক।

এমন সময় সহসা কোথা হইতে প্রবল ঝড়ের একটা নির্ম্মম ঝাঁপটা আসিয়া মুরারির ডান দিকের গাল, নাকের ও চোখের উপর আছড়াইয়া পড়িল। চোখ খুলিতে যাইয়া মুরারি দেখে খোলা যাইতেছে না,—বরঞ্চ চোখের এবং মুখের উপর আঠাল মত কি একটা বস্তু ছড়াইয়া আছে। বুঝিয়া মুরারি রুমাল আন্দাজে পকেট হইতে বাহির করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাকাইল। তার প্রতিবেশীর নাকের কাছাকাছি গোঁপের উপর শ্লেষ্মার চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান থাকায় কারণ বুঝিতে মুরারির বেশি বেগ পাইতে হইল না।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক পকেট হইতে একগাছা হিসাবপত্র বাহির করিয়া বেশ সুউচ্চস্বরে হিসাব মিলাইয়া দেখিতেছে, যেন তার বাজারের হিসাব ট্রামের প্রত্যেক যাত্রীর পক্ষে সমান আবশ্যকীয়।

মানুষটার উপর একটা গভীর বিরক্তিতে মুরারি মুখ বিকৃত করিয়া তুলিল। কিন্তু করে কি? একে বয়সের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে

ঝগড়া করিতে চক্ষুলজ্জা হয়,—বিশেষত কবির ধাত থাকাতে ঝগড়ায় সে কোনও দিনই বিশেষ আঁটিয়া উঠিতে পারে না। তাছাড়া এমন উদাসীন অবহেলার সঙ্গে তিনি এই সকল সৎকার্য্য করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন যে প্রতিবাদ করিবার একটুমাত্র অবসর দেন না।

কিছুক্ষণ ট্রাম চলিল। মুরারি ভাবিতেছিল যে পৃথিবীতে একপ্রকারের লোক আছে যাদের চালচলন দেখিলেই মন তাদের উপর রাগিয়া ওঠে, তারা যে ইতর তাতে আর সন্দেহ থাকে না, এবং দুই থাপড় লাগাইয়া দিতে পারিলে ঠিক হয়। তার পাশের লোকটা যে সেই দলের তাতে মুরারির আর সন্দেহ নাই।

কিছুক্ষণ ধরিয়া মুরারি পাশের লোকটার অস্তিত্ব টের পাইতেছে না। পাশে এক মিনিট বসিয়া থাকিলেও এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে, মুরারি তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। হয়তো ইতিমধ্যে সে গেছে, এই ভাবিয়া পাশে তাকাইল।

দেখিল ভরাট ত্রিভুজের মত এক টুকরা কাঠ লইয়া নিবিষ্ট মনে প্রৌঢ় কি পরীক্ষা করিতেছে। মুরারি ভারি বিস্ময় বোধ করিল। কিন্তু তার বিস্ময় চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল যখন দেখিল লোকটার হাতে ছুরি এবং সমুখের আসনের হেলান দিবার কাঠটার মাথা হইতে গর্ত্ত করিয়া এক চাক কাঠ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে গর্ত্তর আকৃতি দেখিয়া মুরারির আর সন্দেহ রহিল না কোথা হইতে কাঠের ত্রিভুজ জোগাড় হইয়াছে।

যদি একটা ছোট দুষ্টু ছেলে পকেট-ছুরি দিয়া ট্রামের আসনের কাঠ হইতে এক টুকরা কাটিয়া উঠাইত, তবে মুরারি বিশ্বাস করিতে পারিত। কিন্তু ধাড়ী বুড়া একটা লোক যে কাটিয়া এমন একটা জিনিষ নষ্ট করিতে পারে, তাহা ইহা দেখিবার পূর্ব্বে সে বিশ্বাস করিতে পারিত না। লোকটার কি আক্কেল পছন্দ বলিয়া কিছু নাই?

কাঠের টুকরাটা পকেটে রাখিয়া ভদ্রলোক আবার ছুরি উঠাইল।

'হা হা, করেন কি মশায়',—মুরারি কহিয়া উঠিল,—'কেটে নষ্ট করচেন কেন এগুলি?'

এক সেকেণ্ড ভদ্রলোক হতভম্ব হইয়া মুরারির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন অযাচিত নিষেধের মর্ম্মার্থ কিছুতেই যেন তার হৃদয়ঙ্গম হইতেছেনা। তারপর পুনরায় ট্রামের কাঠের উদ্দেশ্যে ছুরি উদ্যত করিল।

'আবার আবার' বিস্মিত বিরক্ত মুরারি চেঁচাইয়া উঠিল, 'আরম্ভ করেছেন কি, আপনি? মাথা খারাপ নাকি?'

'বটে? মাথা খারাপ আমার?'

'নয়তো আর এমন করবেন কেন?'

'করবো, একশোবার করব। তোমার কেনা সম্পত্তি এটা?'

'ট্রাম কোম্পানী জেলে দিতে পারে আপনাকে।'

'সব শালারই কেরামত দেখা আছে, বাকি রইল ট্রাম কোম্পানী। তা বলে তুমি জ্যাঠামি করতে আসবে কেন হে, ছোক্‌রা?'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন'—মুরারি চেঁচাইয়া কহিল।

'ওঃ, কোথাকার নবাব, কুর্ণিশ করে' বেড়াতে হবে।'

এতক্ষণে যাত্রীরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল—'ব্যাপার কি', 'ব্যাপার কি?' 'আহা বুড়ো মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করচেন?' 'ছি ছি, কী বেহায়া আজকালকার ছেলেগুলি' ইত্যাদি।

ভদ্রলোক হুঙ্কার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন।

'বাঁদর হয়, মশায়রা, আজকালকার ছেলেগুলি,—বাঁদর হয় লেখা পড়া শিখে।'

'জংলীভূত কোথাকার', ক্রুদ্ধ মুরারি কহিল।

'বাঁদর, হনুমান।'

পুনর্ব্বার হাঁকডাক করিয়া ট্রাম থামাইয়া ভদ্রলোক গজর গজর করিতে করিতে নামিয়া পড়িলেন। বুড়াকেও অভিসম্পাত করিতে করিতে মুরারি বাড়ি পৌছিল।

বাড়িতে নানান্ আয়োজন চলিতেছে। হাঁকডাক উৎসাহের অন্ত নাই। কাল ভোরেই মুরারির পাকাদেখা ও পরশুর পরের দিন বিবাহ।

পরদিন প্রভাতে সদরদরজায় একসঙ্গে কয়েকটা মোটর থামার শব্দ হইবার পর নানা কলরব জাগিয়া উঠিল। ও-পক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নেপথ্যে 'আসুন' 'এদিকে আসুন', 'বসুন' ইত্যাদি আদর আপ্যায়ন চলিতে লাগিল।

ভাই, শালা, ভায়রা, শালাপুত্র, ভগ্নিপতি, ভাগ্নে প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া অবনী চৌধুরী আসিয়াছেন। কিন্তু শ্বশুরকে দেখিয়া মুরারিমোহন চমকাইয়া উঠিল, এবং হবু জামাতাকে দেখিয়া বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী লক্ষপতি অবনী চৌধুরী আঁৎকাইয়া উঠিলেন।

বিস্ময়ের প্রচণ্ড আঘাতটা কাটিবার পর অবনী চৌধুরী শালা, ভায়রা এবং ভগ্নিপতিকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন।

চাপা তর্জ্জনে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন,—'মেয়ের বিয়ে দেব শেষে এই উল্লুকের সঙ্গে?'

শঙ্কিত আত্মীয়েরা অবাক্ হইয়া কহিল,—'কেন, কেন, হয়েচে কি?'

'হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু। জগতে আর বাঁদর খুঁজে পেলেনা তোমরা?'

শালা কহিল,—'চুপ চুপ, চৌধুরী মশায়। ব্যাপারখানা কি, বলুন দেখি? রাজপুত্রের মতন দেখ্‌তে ছেলে,—দোষ কোথায় পেলেন্?'

'এইটেই কালকের সেই 'হনুমানটা। ট্রামে কাল এই হনুমানটাই আমাকে নাহক অপমান করেছিল। ট্রামের কাঠের শুধু একটু মাত্র নমুনা নিয়েছি, ট্রামের জন্য তক্তা যদি সরবরাহ করিতে পারি, এই জন্য,—আর এই উল্লুকটা খেঁকিয়ে উঠে অপমানের একশেষ করলে। আমার মেয়ের বিয়ে না হয়, না হোক্, তবু এই হনুমানের সঙ্গে নয়।"

অবনী চৌধুরী উঠিবার উপক্রম করিলেন। দেখিয়া সঙ্গীরা প্রমাদ গণিল।

ভগ্নীপতি কহিল,—'চিন্‌তে পারে নি, আপনারে চৌধুরীমশায়। নইলে অমন কেউ করে?'

চৌধুরী কহিলেন,—'নাই বা চিন্‌লে, কিন্তু আদত বাঁদর না হলে এমনটা করে নাকি কেউ? ওঠো তোমরা, এতে আর আমি নেই।'

শালা আসিয়া অনুনয় করিয়া কহিল,—'দোহাই আপনার চৌধুরীমশায়। আশীর্ব্বাদটা চুপচাপ করে এখন করে যান্ তারপর বাড়ি গিয়ে ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসা কিছু নয়,—বিশেষ দিদির কথা একবার ভেবে দেখুন। ও আঘাত তিনি কি সাম্‌লাতে পারবেন?'

সবাই প্রতিধ্বনি করিল যে এ-কথা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এখন আশীর্ব্বাদ হইয়া যাক্। তারপর দরকার হইলে না করিয়া দিতে কতক্ষণ?

চৌধুরী গজ্‌গজ্ করিয়া কহিলেন,—তা বল্‌ছো, করো। কিন্তু বলে দিলুম, আমি বেঁচে থাক্‌তে এই বাঁদরের হাতে মেয়ে দেব না।'

অপরপক্ষে মুরারি কহিল,—'এই সেই জংলীটা। এই ইতরটা হবে আমার শ্বশুর? অসম্ভব,—আশীর্ব্বাদ ক্যান্সল্ কর।'

তাকেও এই বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া আশীর্ব্বাদের জন্য রাজী করান হইল যে এই মুহূর্ত্তে কোনও গণ্ডগোল করিয়া কাজ নাই,—বিশেষ, এরা অতিথি,—তারপর ভাবিয়া দেখা যাক্। প্রয়োজন হইলে না করিতে কতক্ষণ।

আশীর্ব্বাদের সময় শ্বশুর কটমট করিয়া তাকাইল জামাইয়ের দিকে, এবং জামাই কটমটাইয়া শ্বশুরের সে-দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। চোখে চোখে যেন বজ্রবিনিময় হইয়া গেল।

বাড়ি আসিয়া অবনী চৌধুরী কহিলেন,—যাও সবাই অন্য পাত্র খোঁজ। যত টাকা চাই দেব, এ-হপ্তার মধ্যেই

বিয়ে ঠিক করা চাই। কিন্তু খবরদার, ও-বাঁদরের কথা আমার কাছে কেউ তুলো না; বলছি।'

কাজেই আত্মীয়স্বজন কেউ ঘটকের অপিসে, কেউ কলেজ হষ্টেলে; কেউ এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পাত্র খুঁজিয়া মরিতে লাগিল।

'টাকা ছড়ালে', সদম্ভে অবনী চৌধুরী কহিলেন, 'পাত্রের অভাব হয় না।'

ওদিকে মালতীলতা সমবয়সী খুড়তুত বোন মণিমালার কাছে গোপনে কহিল,—'আমি আত্মহত্যা করবো।'

মণিমালা সবিস্ময়ে কহিল,—'সে কি রে মেজদি, —একদিন বৈ তাকে আর দেখিসই নি তো! তাতেই এতো? তা ছাড়া একমাস আগে তার নামই কি জান্‌তিস?'

'তা বৈ কি? কবি মুরারি দত্তের নাম কে না জানে? না ভাই, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। ক্লাসের মেয়েদের কাছে বলে বেড়িয়েচি মুরারি বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে,—এখন কোন্ লজ্জায় তাদের কাছে মুখ দেখাব?'

সর্দ্দির জন্য এক সময়ে কিছুকাল মালতীমালা চ্যবনপ্রাশ খাইয়াছিল। কৌটায় এখনও তার কিছুটা পড়িয়াছিল। কৌটাটা মণিমালাকে দেখাইয়া মালতী তাড়াতাড়ি বাক্সে ভরিয়া ফেলিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অম্লান বদনে কহিল,—'এই আফিং-ই এখন আমার একমাত্র বন্ধু।'

মণিমালার মুখে সংবাদ পাইয়া মালতীর মা চৌধুরী-গিন্নী হাউমাউ করিয়া উঠিলেন। মেয়েকে আসিয়া বুঝাইয়া কাঁদিয়া একশেষ হইলেন। মালতীর শুধু এক কথা,—'আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই,—আমার মরাই ভাল।'

কাজেই গিন্নী নিরুপায় হইয়া কর্ত্তার কাছে ছুটিলেন। সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া অবনী চৌধুরী কহিলেন,—'এ অসম্ভব! ও-হনুমান আমার বাড়ির ত্রিসিমানায় আসতে পারবে না। তুমি পাগল হয়েছ, গিন্নী, মেয়ে দেব বাঁদরের হাতে?'

'মেয়ে যে আত্মঘাতী হতে চায়, তার কি?'

'শুনেচো তো গিন্নী আমার অপমানের কথাটা,—তার পরও এ সব কথা আবার উঠাচ্চো?'

গিন্নী এবার দুচোখে বর্ষা আনিয়া ফেলিলেন। সজল সুরে কহিলেন,—'আমি কোন্ দিক দেখি? মরণ হলেই আমি বাঁচি। এদিকে তোমার জেদ, ওদিকে মেয়ে আঁচলে আফিং গুঁজে বেড়াচ্চে,—আমি কোন্‌দিক সামলাই?'

শুনিয়া অবনী চৌধুরী অনেকক্ষণ ভাবিলেন। এদিকে বাড়িতে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা, ওদিকে সুবিধামত পাত্রও জোগাড় হইতেছে না, সেটাও ভাবিবার কথা। ক্রোধের তীব্রতাও দুই দিনে কিছু কমিয়াছে।

'তোমাদের যদি এতই ইচ্ছে, তো কর ওখেনেই। আমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া বৈ তো নয়। বিয়ে তো আর সত্যি ভেঙে দেওয়া হয় নি,—ওরা কিছু টেরও পাবে না। কাউকে খোঁজ খবর করতে পাঠাও।—তবে মনে রেখ, এমন বাঁদর জামাইয়ের সঙ্গে আমার কোনদিন বনিবনা হবে না। ঈস্, কম অপমানটা করেছিল আমাকে!'

'কি যে অলুক্ষুণে কথা বল,' বলিয়াই চৌধুরী-গৃহিণী ছুটিলেন আসন্ন আত্মহত্যা হইতে মালতীলতাকে বাঁচাইতে। বাঁচাইতে পারিলেনও।

ও-দিকে মুরারিমোহনও বাঁকিয়া বসিয়াছে। অসম্ভব! জীবন থাকিতে এমন ছোট লোককে শ্বশুর করিবে না!

কন্যাপক্ষের লোকেরা ইন্‌স্যুরেন্সের দালালের মত আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিল। কিন্তু মুরারির কবিচিত্তে ভাবী শ্বশুর নিষ্ঠুরভাবে ছন্দভঙ্গ করিয়াছে।

অবশেষে একদিন অবনী চৌধুরীর শালা আসিয়া কহিল,—'বাবাজী, মেয়েটাকে আর আত্মঘাতী করো না।'

মুরারি কহিল,—'কিন্তু অবনী চৌধুরীর ব্যবহার ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কাঠের ব্যবসায়ী মানুষ;—চিরকাল কাঠের নমুনা সংগ্রহ করে এসেছেন। ট্রামে সেদিন মুদ্রাদোষেই অমন করেছিলেন,—নইলে কারুর কুটাটি কোনও দিন ছোঁন্ নি।'

মুরারি চোখ বুজিয়া কল্পনা করিয়া কহিল,—'কিন্তু ট্রামের ভেতর সেই সব গালাগালি কিছুই ভুলতে পারছি না, মশায়।'

শালাবাবু মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—'ট্রামে আর যাতে তোমার না চড়তে হয়, সে ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।'

'কি রকম?' উৎসুক মুরারি প্রশ্ন করিল।

'কথা-অনুযায়ী যৌতুক তো পাবেই,—তার ওপর তোমাকে আমরা একটা মোটরও কিনে দেব, ঠিক করেছি।'

এরপর কি করিয়া আর কঠিন হইয়া থাকা যায়? অগত্যা মুরারি রাজী হইয়া গেল।

শ্রীসুবোধ বসু

"স্মৃতির ডোরে হয়নি গাঁথা"

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

স্মৃতির ডোরে হয়নি গাঁথা অতীতদিনের মালা
একে একে কোথায় গেছে ভেসে,—
নেইকো মনে ছিল কিনা গন্ধমদির ঢালা
ঠেক্‌বে গিয়ে নামহারা কোন দেশে।
ভাব-তুলিকার পরশভরে কাট্‌লো কবে সংশয়েরি ঘোর,
রুদ্ধ বীণার অজানা সুর জানায় কবে আমার নিশি-ভোর
কমল কলির সলাজ ইসারাতে,
হারিয়ে ফেলা তার কাহিনী ঝরায় নাকি সেই মমতার লোর
শ্রাবণ-রাতের নিবিড় ধারাপাতে।

পাল-উঠানো নৌকাগুলি স্রোতের টানে চলে
মাঝির গানে আকাশ ওঠে ভরে—
সেই বিরহীর কাতর বেদন ঘুমায় তারি তলে
পিছের বাঁধন নাইকো যাহার তরে।
ফাগুন দিনে এই মহুয়ার ভরাটকরা অবসরের ফাঁকে,—

দুপুর বেলায় লুকিয়ে-থাকা বন-কপোতীর ক্লান্ত করুণ ডাকে
আভাস তাদের জানায় যেন আসি,—
কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার তলে হয়তো কবে বসে পথের বাঁকে
খেয়াল খেলায় বাজিয়েছিনু বাঁশী।

বনান্তরের যেই ভূমিকা মালতী চায় দিতে
এলোমেলো হাওয়ায় উঠে দুলে,—
ঘরের মাঝে সাজিয়ে তারে হারাই চিনে নিতে
শীর্ণ হাসির ঝিমিয়ে পড়া ফুলে।
জাগলো কবে তার চেতনা এই ধরণীর সবুজ আশার গানে
কার সে ভীরু নীরব চাওয়ার গন্ধে ভরা মুখর প্রতিদানে,—
আবার কবে পড়লো ধীরে ঝরে,
আলোছায়ার মৌন ভাষা সেই হেঁয়ালী দোলায় যবে প্রাণে
অর্থহারা বল্‌গো কেমন করে!

নিত্যদিনের খেই-হারানো ভাবনাগুলির মাঝে
আনমনা মন হারিয়েছে তার পুঁজি,—
আজকে দিনে ঘনিয়ে-আসা বিয়োগ-বিধুর সাঁঝে
একলা ঘরে কোথায় তারে খুঁজি!
রইলো তারা আকাশজোড়া মিলিয়ে-যাওয়া তরল অন্ধকারে—
ভোরের আলোয় এড়িয়ে চলা দূরের পানে তারার অভিসারে
রাতের দেনা চুকিয়ে দিয়ে রাতে,
বারতা তার নাইবা র'ল যত্নে আঁকা কাজলরেখার পারে
পরশ-প্রিয় কালো আঁখির পাতে।

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

———

ছন্দ-ব্যাকরণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

"বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন কোরে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন ব'লে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে" (রবীন্দ্রনাথ—উদয়ন, ১৩৪১, বৈশাখ, পৃঃ ১১)। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণী-বিভাগটি সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, এ বিষয়ে মতভেদ হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে ব'লে মনে করিনে। অবশ্য তৃতীয় শাখাটির ভাষা কি—কৃত্রিম বাংলা না সচল বাংলা—উপরের উক্তি থেকে সে বিষয়ে কোনো নির্দ্দেশই পাওয়া যায় না।

বাংলা ছন্দের যে-শাখাটি 'পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষা' অর্থাৎ সাধু বাংলাকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র সেটিকে 'সাধু ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন; আর সচল অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে নাম দিয়েছেন 'প্রাকৃত ছন্দ'। তৃতীয় শাখাটিকে তিনি কোনো নাম দেননি। ছন্দের উৎপত্তির ও ব্যবহারের দিক থেকে এ রকম নামকরণের কিছু সার্থকতা আছে। কিন্তু তাতে কিছু ত্রুটিও থেকে যায়। কারণ, প্রথমতঃ ভাষার ঠাট বা সাহিত্যিক রচনা-রীতি অনুসারে ছন্দের নামকরণ বিজ্ঞানসম্মত নয়। এভাবে নামকরণ করলে তৃতীয় শাখাটির কোনো নাম দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত' বাংলা ছন্দের প্রথম শাখাটিতেও সাধু বাংলার অধিকার একচেটে নয়। এ ছন্দে সাধুভাষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত বাংলাও সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। তা-ছাড়া, এ ছন্দে আগাগোড়া প্রাকৃত বাংলা প্রয়োগেরও অতি সুন্দর নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' নামক কাব্যগ্রন্থখানিতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত পুস্তকের উন্নতি, আগন্তুক, প্রাণ, সাথী প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখ করতে পারি। বাংলা ছন্দের দ্বিতীয় শাখাটিতে অর্থাৎ প্রাকৃত ছন্দে প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আছে। আর, তৃতীয় শাখাটিতে সাধু ও প্রাকৃত দু-রকম বাংলাই সমভাবে চলে। কাজেই সাধু ছন্দ ও প্রাকৃত ছন্দ এ রকম নামকরণকে ত্রুটি-শূন্য বলা যায় না (বিচিত্রা ১৩৩৮, ফাল্গুন, পৃঃ ২৪৪-৪৮ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত' ছন্দের নামকরণ করা উচিত তার ভিতরের গঠনরীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে। বিভিন্ন ছন্দে ধ্বনির প্রয়োগ-প্রণালী বিভিন্ন রকম। ছন্দের নামকরণের সময় ধ্বনির বিভিন্ন প্রয়োগ-রীতির উপর লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। এদিক থেকে বাংলা ছন্দের তৃতীয় শাখাটিকে বলা যায় মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রিক (quantitative), দ্বিতীয় শাখাটিকে নাম দেওয়া যায় স্বরবৃত্ত (syllabic), আর প্রথম শাখাটিকে বলতে পারি যৌগিক (composite)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই প্রথম শাখার ছন্দে ধ্বনিসংস্থাপনরীতি কিরূপ সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

বাংলা ছন্দের সমস্ত ধ্বনিকেই মোটামুটি অযুগ্ম ও যুগ্ম এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সাধারণ স্বরান্ত ধ্বনিকে বলি অযুগ্ম ধ্বনি (open syllable) এবং যুগ্মস্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বলি যুগ্ম ধ্বনি (closed syllable)। যেমন—'ছন্দ' শব্দে ছন্ যুগ্ম, দ অযুগ্ম; 'চন্দন' শব্দে চন্ ও দন্ দুটিই যুগ্ম; 'ঢেউগুলি' শব্দে প্রথম ধ্বনিটি যুগ্ম, বাকি দুটি অযুগ্ম; 'গৌরব' শব্দে দুটিই যুগ্মধ্বনি; 'বৈশাখ' শব্দেও তাই।

বাংলা ছন্দে অযুগ্ম ধ্বনির ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই এক রকম। প্রায় সর্ব্বত্রই অযুগ্ম ধ্বনি এক unit বা মাত্রা

ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু যুগ্মধ্বনির ব্যবহার দুই রকম। যুগ্মধ্বনিকে কখনও টেনে প্রসারিত ক'রে উচ্চারণ করি, তখন তাকে বলি বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি, আবার কখনও টেনে সঙ্কুচিত ক'রে উচ্চারণ করি, তখন তাকে বলি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি। প্রচলিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে এক unit বা এক মাত্রা ব'লে গণ্য করা হয়; আর বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয় দুই unit ব' দুই মাত্রা। এই হিসাব একেবারে নির্দ্দোষ নয়। তথাপি এ হিসাবে মোটামুটি কাজ চালানো যায়। তাই এস্থলে এ বিষয়ে আমরা সূক্ষ্মতর মাত্রাবিচারে প্রবৃত্ত হব না।

পূর্ব্বেই বলেছি অযুগ্ম ধ্বনির ব্যবহার বৈচিত্র্যহীন, সকল রকম ছন্দেই প্রায় সর্ব্বদাই ওর মূল্য এক মাত্রা। কিন্তু যুগ্মধ্বনির ব্যবহার ছন্দভেদে বিভিন্ন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি প্রায় সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট অথচ দ্বৈমাত্রিক। আর, রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধুছন্দে যুগ্মধ্বনি স্থান বিশেষে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক এবং অন্যত্র বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক। আমরা এখানে সূক্ষ্মতর মাত্রাবিচার করব না। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে শুধু এইটুকুই লক্ষ্য করা দরকার যে, সাধু ছন্দে যুগ্মধ্বনি অবস্থা বিশেষে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট দু রকমই হ'য়ে থাকে। আর এজন্যেই এ ছন্দের নাম দিয়েছি 'যৌগিক'; ধ্বনির দুই রূপের সংযোগেই এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

এই যৌগিক বা সাধু ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ কোথায় সংশ্লিষ্ট ও কোথায় বিশ্লিষ্ট হ'য়ে থাকে, এ বিষয়ে কি কোনো নিয়ম নেই? আছে, কিন্তু সে নিয়ম খুব সরল নয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বে দুটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি (ছন্দ জিজ্ঞাসা—তৃতীয় পর্ব্ব, বিচিত্রা—১৩৩৯, বৈশাখ; এবং ছন্দ-সঙ্কট, উত্তরা—১৩৩৯, ভাদ্র)। সুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে দুয়েকটি মাত্র প্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা ক'রেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। যৌগিক ছন্দে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি সংস্থাপনের নিয়মগুলি হচ্ছে মোটামুটি এই রকম।—

(১) শব্দান্তবর্ত্তী গৌণ ও মৌলিক উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনিরই উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট। তাই এ ছন্দে 'কাশীরাম' শব্দের 'রাম' এবং 'পুণ্যবান্' শব্দের 'বান্' এই যুগ্মধ্বনি দুটি বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। 'রাম' হচ্ছে গৌণ এবং 'বান্' মৌলিক যুগ্মধ্বনি।

(২) অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী বিযুক্তাক্ষরে লিখিত মৌলিক এবং গৌণ উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনিই সাধারণতঃ বিশ্লিষ্টই হ'য়ে থাকে, কিন্তু স্থল বিশেষে বিকল্পে সংশ্লিষ্টও হ'তে পারে। যেমন, টাট্‌কা ও ঠাক্‌রুণ শব্দের টাট্ এবং ঠাক্-কে সাধারণতঃ দুই মাত্রা ব'লেই গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে এ-দুটি ধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট ক'রে এক মাত্রা ব'লেও গণ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি বিযুক্তাক্ষরে লিখিত হ'লেও সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে। যথা—বল্‌গা, উৎসব, প্রগল্‌ভ শব্দের বল্, উৎ ও গল্ এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট ও এক মাত্রিক ব'লে গণনা করাই সাধারণ রীতি।

(৩) সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সমস্ত শব্দেরই মধ্যবর্ত্তী যুক্তাক্ষরে লিখিত মৌলিক বা গৌণ উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে। যথা—সিক্ত, তক্তা, অন্ন, কান্না প্রভৃতি শব্দের যুগ্মধ্বনিগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হ'য়ে থাকে।

(৪) সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের পূর্ব্বাংশস্থিত শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনি বিযুক্তাক্ষরে লিখিত হ'লে প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট দুরকমই হ'তে পারে। কিন্তু যুক্তাক্ষরে লিখিত হ'লে সংশ্লিষ্ট ব'লে গণ্য করাই প্রচলিত রীতি। যেমন—'মৃৎপাত্র' শব্দটি ত্রৈমাত্রিক বা চাতুর্ম্মাত্রিক দুরকমই হ'তে পারে, কিন্তু 'মৃণ্ময়ী' শব্দকে ত্রৈমাত্রিক ব'লে গণনা করাই প্রচলিত রীতি; তেমনি 'জগৎপ্রিয়' শব্দে চার মাত্রাও ধরা হয়, পাঁচ মাত্রাও ধরা হয়, কিন্তু জগন্মাতা বা জগদ্ধাত্রী শব্দে পাঁচ মাত্রা না ধরাই সাধারণ প্রথা।

(৫) অ-সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের পূর্ব্বাংশস্থিত শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনি সাধারণতঃ বিযুক্তাক্ষরেই লিখিত হ'য়ে থাকে এবং এসব যুগ্মধ্বনিকে প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক ব'লেই গণনা করা হয়। মৌলিক এবং গৌণ

উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনির পক্ষেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। পদান্ত-স্থিত যুগ্মধ্বনি প্রত্যয়যোগে শব্দ মধ্যে স্থাপিত হ'লেও এ নিয়ম খাটে। যথা—হাকিম সাহেব, ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিটবাবু, জগৎ-জোড়া, স্বদেশ-মাতা, গ্রামখানি, একটি, একশো, বালকগুলি, জাম-বাটি, দাঁত-কপাটি ইত্যাদি সমাসবদ্ধ ও প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্ব্ব শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিটি প্রায় সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক হ'য়ে থাকে।

একথা বলা দরকার যে, যৌগিক ছন্দের কোনো নিয়মই অলঙ্ঘনীয় নয়; বরং এ ছন্দের প্রত্যেকটি নিয়মকেই অতি অনায়াসেই লঙ্ঘন করা যায়, অথচ ছন্দ অব্যাহতই থাকে। এজন্যেই উপরের সবগুলি নিয়মেই 'প্রায়-সর্ব্বদা', 'সাধারণত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছি। এসব শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য একথা বলা যে, সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম হ'তে পারে। এ রকম কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথাই আমরা এস্থলে আলোচনা করব।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম নিয়মটির ব্যতিক্রমের প্রতি অমূল্যধন বাবু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এ উপলক্ষে যে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে দুটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্যই মনে হ'লো না, তৃতীয়টি গ্রাহ্য। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি হচ্ছে এই।

(১) যাদঃ পতিরোধ যথা 'চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) তোমার শ্রীপদরজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

(৩) মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীরে নিশীথে।

প্রথম দৃষ্টান্তটি পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ নিয়মের অন্তর্গত (যাদঃ পতি)। কাজেই প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে এটির কিছুমাত্র মূল্য নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রজঃ শব্দে একটি দৃশ্যমান বিসর্গ আছে বটে, কিন্তু বাংলায় ওই বিসর্গটির উচ্চারণ করা হয় কি? অন্ততঃ আমি তো উচ্চারণ করিনে। আর ছন্দ যে দৃশ্যমান হরফের উপর নির্ভর করে না, করে উচ্চারিত ধ্বনির উপর—একথা অমূল্যধন বাবু অবশ্যই জানেন। বাংলা ছন্দে দৃশ্যমান হরফ এবং উচ্চারণের মধ্যে কতখানি পার্থক্য হ'তে পারে তার দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নাদির! নাদির!—কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ!
মেঘে চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ!

—মোহিতলাল, স্বপন পসারী, নাদির শাহের জাগরণ

এখানে 'আওয়াজ' শব্দটিতে দেখতে চার মাত্রা, কিন্তু শুনতে তিন মাত্রা। তাই ছন্দে এটি ত্রৈমাত্রিক ব'লেই গণ্য হয়েছে। এই দৃষ্টান্তের 'আহ্বান' শব্দটির উচ্চারণটিও লক্ষ্য করা উচিত। বাংলায় এ শব্দটির প্রচলিত উচ্চারণ দ্বিবিধ। এক ভঙ্গীর উচ্চারণে 'আহ্বান' শব্দের প্রথম যুগ্মধ্বনিটি স্বীকৃত হয়, তখন স্বভাবতই এটিকে চার মাত্রার শব্দ ব'লে গণ্য করতে হবে; বর্ত্তমান দৃষ্টান্তটিতে তাই হয়েছে। অন্য ভঙ্গীর উচ্চারণে এ শব্দটির প্রাথমিক যুগ্মধ্বনিটি বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, তখন তার উচ্চারণ-রূপ হয় 'আভান'; আর এ শব্দের এই উচ্চারণ রূপটিই অধিকতর প্রচলিত। তাই এ শব্দটিকে অনায়াসেই ত্রৈমাত্রিক ব'লেও গণ্য করা যায়। জিহ্বা, গহ্বর, বিহ্বল প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও এ নিয়ম খাটে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

(১) কি ঘোর পিপাসা! 'জিহ্বা'
তালু যেন ফুলে যায় সবাকার,
কালো হ'য়ে গেল ওষ্ঠ অধর,
জল নাই ভিজাবার

—ঐ, ঐ, নাদির শাহের শেষ

(২) কণ্ঠে রজ্জু, 'জিহ্বা' বিগলিত,
ভীষণ দশন-মালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-বহ্নির জ্বালা—
এ সব দেখেছ, 'আহ্বান' শুনেছ?
ডেকেছ কি নাম ধ'রে
সুখ-রজনীর ভোরে?

—ঐ, ঐ, মৃত্যু

এবার অন্য রকমের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকেনা 'বোধ
হয়' কারো;
ভুলেছিনু, আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো!

—ঐ, ঐ, নাদির শাহের শেষ

'বোধ হয' কথাটি দেখতে স্পষ্টতই চাব মাত্রা, কিন্তু উচ্চারণের বেলায় ধ্বনি সংক্ষেপ ক'বে তিন মাত্রাও কবা যেতে পারে। এখানে ঐ কথাটিব সংশ্লিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত উচ্চাবণই হয়েছে, তাই এই শব্দ-দুটি মাত্র তিন মাত্রাব স্থান অধিকাব কবেছে। মোহিতলাল শক্তিশালী কবি, তাই তিনি এরূপ উচ্চাবণ-সংশ্লেষ ও মাত্রা সংক্ষেপ কবতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ কবেন নি। এস্থলে ওই কথা-দুটিব উচ্চাবণ হচ্ছে "বোধয"। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কবিবা 'বোধ হয' শব্দ-দুটিতে তিন মাত্রা গণনা কবতে অনেক ইতস্তত' কবতেন সন্দেহ নেই। অবশ্য 'বোধ হয' কথা-দুটিকে বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চাবণ ক'বে চাব মাত্রা গণনা কবতেও বাধা আছে ব'লে মনে হয না। যথা—

সেই কথা আজ নাই মোব মনে, নাই বোধ হয কাবো।

আবও একটা দৃষ্টান্ত দেওযা যাক্।—

হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।

—ববীন্দ্রনাথ, কল্পনা, শরৎ

এখানে দেখা যাচ্ছে 'মাতঃ" শব্দে দুই মাত্রাই ধবা হযেছে, কেননা সংস্কৃত পদ্ধতিতে তঃ যুগ্মধ্বনি হ'লেও বাংলায় তা নয়। বাংলায বিসর্গান্ত প্রায সকল শব্দ সম্বন্ধেই এই নিযম খাটে, কারণ বাংলায প্রাযই ওবকম বিসর্গেব উচ্চাবণই হয না। কাজেই 'শ্রীপদ বজঃ' শব্দের জঃ এই যৌগিক শব্দটিব হ্রস্বীকবণ হয়েছে একথা বলা একান্তই নিষ্প্রযোজন। কেননা তা হ'লে বলতে হবে যে উপবেব দৃষ্টান্তটিতেও 'মাতঃ' শব্দে তঃ এব হ্রস্বীকবণ হযেছে। আশা কবি অমূল্যধন বাবুও সেকথা বলবেন না, কাবণ যেখানে সাধাবণ গদ্য উচ্চাবণেও বিসর্গটি স্পষ্টই বিলুপ্ত সেটিকে ছন্দে হ্রস্বীকৃত ব'লে ঘোষণা কবা অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক, আব, অমূল্যধন বাবুব আবৃত্তিতেও যে ওবকম বিসর্গ বিলুপ্ত হ'যে থাকে তাবও প্রমাণ আছে। মধুসূদন লিখেছিলেন 'যাদঃ পতি বোধঃ' কিন্তু অমূল্যধন বাবু 'বোধঃ' শব্দেব বিসর্গটি লুপ্ত করেছেন। তাঁর এই অনবধানতাব হেতু বোধ হয এই যে তাঁব আবৃত্তিতে রোধঃ শব্দেব বিসর্গটি উচ্চারিত হয না। তাই মনে হয় মুদ্রিত হরফের রূপ দেখে হিসাব কবেছেন ব'লেই অমূল্যধন বাবু 'শ্রীপদরজঃ' শব্দে যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণের কথা উত্থাপন কবতে পেরেছেন, একথাগুলির উচ্চাবিত ধ্বনিব প্রতি কান বেখে হিসাব করলে তিনি এ প্রসঙ্গ তুলতেন ব'লে মনে হয না। যাহোক, পূর্ব্বেই বলেছি অমূল্যধন বাবুব প্রদত্ত তৃতীয দৃষ্টান্তটি গ্রহণযোগ্য। যথা—

মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীব নিশীথে

যদিও এটিকে খুব সু-দৃষ্টান্ত ব'লে মনে হয না, তথাপি এটিতে অমূল্যধন বাবুব বক্তব্য বিষয প্রতিপন্ন হচ্ছে ব'লেই মনে কবি। এমনও হতে পাবে যে প্রচলিত কাযদায় লিখিত অক্ষব অর্থাৎ হবফেব সংখ্যা গুণে ছন্দেব হিসাব রাখা হয়েছে ব'লেই উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে 'মাভৈঃ' শব্দেব অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি এক 'অক্ষব' ব'লে গণ্য হযেছে। যাহোক, আমি এস্থলে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত কবছি যাতে ওবকম সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

দিনেবে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিযে যায়
অন্ধকাব অজানায।

—ববীন্দ্রনাথ পূববী, সমাপন

এখানে 'ভৈঃ' যুগ্মধ্বনিটি সাধাবণ রীতি অনুসারেই বিশ্লিষ্ট এবং তাব ধ্বনিমূল্য দুই। কিন্তু—

হে দুযাব, জীবলোক, তোবণে তোবণে
কবে যাত্রা মবণে মবণে।
মুক্তি-সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
"মাভৈঃ" বাজে নৈবাশ্য-নিশাথে।

—ববীন্দ্রনাথ, পবিশেষ, দুয়ার

এ দৃষ্টান্তটিতে 'ভৈঃ' যুগ্মধ্বনিটিব উচ্চাবণ সংশ্লিষ্ট এবং তাব ধ্বনিমূল্য এক। যদি লেখা হ'তো—

'মাভৈঃ' বাজিছে ঐ নৈবাশ্য নিশীথে

তাহ'লে 'ভৈঃ' এবং ঐ উভযেবই ধ্বনি-মর্য্যাদা হ'য়ে যেত ডবল। আবও দৃষ্টান্ত দেওযা যাক্।—

তাপস নিঃশ্বাস বাযে মুমূর্ষুরে দাও উড়াযে,
বৎসবেব আবর্জ্জনা দূব হ'যে যাক্।

* * *

বসেব আবেশ রাশি শুষ্ক করি, দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলযেব শাঁখ।

—ববীন্দ্রনাথ, নটরাজ (বনবাণী) বৈশাখ-আবাহন

এখানে দাও শব্দটি আছে দুবার। কিন্তু এদের উচ্চারণ-রূপের পার্থক্যটি লক্ষ্য করার বস্তু। উচ্চারণে ও ধ্বনিমর্য্যাদায় দুটি 'দাও' সমান নয়। দ্বিতীয় 'দাও'-টি সাধারণ রীতি অনুসারে উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট এবং ধ্বনি-মর্য্যাদায় দুই। কিন্তু প্রথম 'দাও-টির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং তার ধ্বনিমূল্য এক unit বা ব্যষ্টি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'দাও উড়ায়ে' পর্ব্বটিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গটি সুস্পষ্ট। স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দের মধ্য ও অন্ত উভয়ত্রই যুগ্মধ্বনি সাধারণত' সংশ্লিষ্ট হ'য়ে থাকে, একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

এবার যৌগিক ছন্দের পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখানো যাক্। নিয়মটি হচ্ছে এই। যৌগিক ছন্দে অ-সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও এক-ব্যষ্টিক হয়। এ নিয়মটির পরিধি আরেকটু বাড়িয়েও দেওয়া যায়। কারণ যে-সকল অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করাই সাধারণ রীতি (যথা—কান্না, গল্প, রাস্তা, ফুর্ত্তি, জব্দ, লম্বা, বন্ধু, পঞ্চু, মস্ত, দিব্যি, ইস্তফা, ওস্তাদি, আস্তাবল, বারান্দা, ইত্যাদি) সে-সকল শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিও প্রায় সর্ব্বত্রই সংশ্লিষ্ট ও এক-ব্যষ্টিক হয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিচিত্রা ও উত্তরায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। অমূল্যধন বাবুও নিয়মের ব্যতিক্রমের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যথা—

সর্ব্বাঙ্গ জলে গেল অগ্নি দিল গায়

(বাংলা ছন্দের মূল সূত্র, পৃঃ ২৬)

দৃষ্টান্তটিকে কুলীন ব'লে স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্তের কৌলীন্য সর্ব্ব-স্বীকৃত না হ'লে নিয়মের মর্য্যাদাহানি ঘটে। অতএব দৃষ্টান্তের কৌলীন্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই অবহিত থাকা প্রয়োজন মনে করি।

আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিকে নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।
—রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ৫১ (১৩৩০)

এখানে 'নিস্তব্ধ' শব্দটি অমূল্যধন বাবুর 'সর্ব্বাঙ্গ' শব্দের ন্যায় ধ্বনি-মর্য্যাদা পেয়েছে চারের। কিন্তু দৃষ্টান্তটি হয়তো যথোচিত ভাবে সাধু বা কুলীন নয়। অতএব আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যার কৌলীন্য সম্বন্ধে সন্দেহ চলে না।—

(১) "আহা আহা" 'চীৎকার' করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দুহাত;
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণ মন কায়,
একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায়!
—রবীন্দ্রনাথ, কথা ও কাহিনী, নিষ্ফল উপহার

(২) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর 'বর্ষার' মতো।
—রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বর্ষা-যাপন

(৩) 'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।
—রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, অতীত কাল

(৪) 'জ্যোৎস্না' ডালের ফাঁকে
হেথা আলপনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
—রবীন্দ্রনাথ, বনবাণী, চামেলি বিতান

(৫) মণি কেঁদে বলে, "তবে
শুধু কি রইবে বাকি 'কান্নার' খেলা ?"
—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, খেলনার মুক্তি

(৬) বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
'পাস্তি'-ঘাটায়।
—রবীন্দ্রনাথ, পরিশেষ, খ্যাতি

এই দৃষ্টান্তগুলিতে 'চীৎকার', 'বর্ষা', 'যুগান্তর', 'জ্যোৎস্না', 'কান্না' এবং 'পাস্তি' এই কয়স্থানে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি (যুগ্মাক্ষর বা খণ্ড-ত'য়ের সাহায্যে লিখিত হওয়া সত্বেও) উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট হয়েছে এবং ধ্বনিমর্য্যাদায় দ্বিগুণ মূল্য পেয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দগুলিতে তথাকথিত 'অক্ষরের' সংখ্যার চেয়ে ধ্বনিমূল্যের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি ব্যবহারের এ রীতি সচরাচর চলে না; এগুলি হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

যদি কখনও ছন্দের প্রয়োজনে কোনো যুগ্মধ্বনি-ওয়ালা

শব্দকে তার 'অক্ষর' সংখ্যার চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয় তবে কবিরা সাধারণত' যুগ্মাক্ষরকে ভেঙে বর্ণবিন্যাস ক'রে যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট রূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলেন। যেমন —পৌষ, বাংলা, আল্পনা, ব্যাঙ্গমা, হাল্কা, কুর্চ্চি প্রভৃতি শব্দকে যদি কবি 'অক্ষর'-সংখ্যার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তাহ'লে এসব শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্টতাকে প্রত্যক্ষ ক'রে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে যুক্তাক্ষরকে বিযুক্ত ক'রে দেন, অর্থাৎ 'অক্ষর'-সংখ্যাকে বাড়িয়ে ধ্বনির মূল্য পরিমাণের সমান ক'রে দেন। তখন এই শব্দগুলির বিশ্লিষ্ট রূপ হয় যথাক্রমে পউষ, বাঙ্‌লা, আল্‌পনা, ব্যাঙ্‌গমা, হাল্‌কা কুর্‌চি। এভাবে যুগ্মধ্বনিকে ভেঙে বিযুক্ত না ক'রে কোনো শব্দকে তার 'অক্ষর'-সংখ্যার চেয়ে বেশি মূল্য দিলে প্রায়ই ছন্দে খুঁৎ থেকে গেল ব'লে অনুভব করা হ'য়ে থাকে। যেমন—

(১) 'পৌষের' পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস।
—রবীন্দ্রনাথ, বলাকা, নং ১৩।

(২) বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র 'মৌচাক',
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
—ঐ, কণিকা, হাতে-কলমে

(৩) এত দিনে 'বাংলা' ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল।
—ঐ পরিশেষ, খ্যাতি

(৪) 'ব্যাঙ্গমা' মেলে দিল পাখা
মণিদিদি উড়ে চলে, সারা রাত্রি ধ'রে।
—ঐ, ঐ, খেলনার মুক্তি

(৫) সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি
কিছু কিছু চিনি,
'কুর্চ্চি,' পড়েছো ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।
—ঐ, বনবাণী, কুরচি

(৬) জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা 'আল্পনা' আঁকে
এ নিকুঞ্জ জ্বালো আপনার।
—ঐ, ঐ, চামেলি-বিতান

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে 'পৌষ', 'মৌচাক,' 'বাংলা,' 'ব্যাঙ্গমা,' 'কুর্চ্চি,' 'আল্পনা' প্রভৃতি শব্দে ছন্দ পতন ঘটেছে ব'লেই সচরাচর গণ্য করা হ'য়ে থাকে। অথচ এই শব্দগুলির মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করলে ছন্দ যে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই সুবিধার খাতিরে এ রকম বিশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে সচরাচর বিচ্ছিন্ন ক'রেই লিপিবদ্ধ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু সব সময়ই যে এ রকম করা হয় তা নয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তগুলির অন্তর্গত 'বর্ষা,' 'যুগান্তর,' 'কান্না,' 'পান্থি' প্রভৃতি শব্দেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাজেই দেখা গেল যে, যৌগিক ছন্দের সর্ব্বপ্রধান দুটি নিয়মেরও ব্যতিক্রম চলে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এ রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
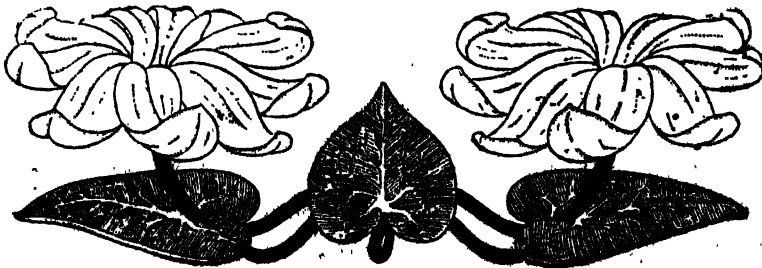
বন্দীর বাঁশী

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বিশ্বাস

নদীর নাম মাথাভাঙ্গা—তারই দুপাশে নতুন-জাগা চর। ওপারে ধু ধু করছে কেবল বালি—এখনও মানুষের বসতি গড়ে ওঠেনি। এপারে মানুষের বসতির সঙ্গে তার রিক্ত ধূসরতার মধ্যে একটা শ্যামল সৌন্দর্য্য জেগে উঠেছে।

নদীর এপারে ছোট একখানি ঘর—খড়ের ছাউনি, রাজবন্দীর বাসের জন্য। পাশেই থানা ও দারোগার বাসা—হাত পঞ্চাশ দূরে।

দারোগার দুই মেয়ে—বড়টীর বয়স বছর পনর,—নাম নীলা। বৈচিত্র্যহীন সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। আশ-পাশের গ্রামবাসীর অধিকাংশ নিরক্ষর; মুসলমান ও নমঃ-শূদ্র ছাড়া কোন জাতের লোক সেখানে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একদিন সুজিত আসে এই গ্রামে অন্তরীন হ'য়ে। নানাবিধ আসবাব পত্রের মধ্যে তার ছিল একটা বাঁশের বাঁশী, বাজাতে পারতও সে চমৎকার। একঘেয়ে নিরানন্দ বন্দীজীবনে এই বাঁশীটাই দেয় তাকে প্রচুর আনন্দ।

রাত্রি একটা। কৃষ্ণ পক্ষের শেষ জ্যোৎস্নায় বিরাট জগৎ ম্লান ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন সুদূর হতে ভেসে-আসা করুণ সুরের বাঁশী ঘুমের মধ্যেই নীলার প্রাণকে স্পর্শ করে। সে সহসা বুঝতে পারে না এত রাত্রে দিকে দিকে এমন সুরের উন্মাদনা ছড়িয়ে কে বাঁশী বাজায়। সে বিছানা ছেড়ে জানালায় এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় নবাগত বন্দী বাবুই তার ঘরের সমুখে এসে বাঁশী বাজায়। কতক্ষণ সে বিভোর হ'য়ে থাকে জানে না। হঠাৎ তার মা ডাকে—"নীলা, এত রাত্রে জেগে কি করছিস?"

সে বলে,—"শুনছ মা, বন্দী বাবু কি চমৎকার বাঁশী বাজাচ্ছে।"

তার মা বলে—"তাই ত রে, আর কোন দিন তো শুনি নি।"

সে বলে,—"আজই বোধহয় এখানে প্রথম বাজাচ্ছে।"

বাঁশীতে তখনও মালকোশ সুর রাত্রির স্তব্ধতা মধ্যে যেন এক অভিনব রূপ পেয়ে সমস্ত দুনিয়ার বুকে সুধা বর্ষণ করে চলে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে সুজিত দেখতে পায়, তা[র] জানালার সাম্‌নে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে একটী কিশোরী। এ[ক] মাথা কোঁকড়ান চুল—চোখ দুটা ছোট কিন্তু সে মু[খে] মোটেই বে-মানান নয়।

সমস্ত চেহারাটার মধ্যে যেমন একটা সলজ্জ ভীরুতা ভাব, চোখ দুটায় তেম্নি একটা দুষ্টামি ভরা চপলতা। তার পানে তাকাতে সে সেখান হ'তে চলে যায়, কি[ন্তু] পরক্ষণেই সে এসে দাঁড়ায় তাদের জানালায়। সুজি[ত] এবারেও তার পানে তাকায় কিন্তু সে নড়ে না।

বিকাল বেলা বেড়াতে যাবার সময় নীলার ছোট বো[ন] টুনুর সঙ্গে হয় সুজিতের দেখা। বছর সাতেক বয়স—ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে; প্রজাপতির মত হাল্কা ও চপল। সুজিতের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে সে বলে—"বন্দী বাবু, আজ সন্ধ্যাবেলা বাঁশী বাজাতে হবে, আমি শুনব।'

সুজিত বলে—"তুমি জানলে কি করে আমি বাঁ[শী] বাজাতে জানি?"

—"কেন, দিদি বল্লে; সে কাল অনেক রাত পর্য্য[ন্ত] আপনার বাঁশী শুনেছে—আমরা তখন সকলে ঘুমিয়েছিলুম।'

টুনুর সঙ্গে সুজিত বাসায় ফিরে আসে। তাকে পা[শে] বসিয়ে সে বাজাতে সুরু করে তার বাঁশি। টুনু মন্ত্রমুগ্ধের ম[ত] তাই শোনে, আর বাঁশীর ওপর নড়ে বেড়ান আঙুলগুলো[র] পানে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে। হঠাৎ এক সময় বাঁশী থে[মে] যায়—তাদের পিছন হ'তে কে যেন ছুটে পালায়। সুজি[ত] জিজ্ঞাসা করে—"কে?"

টুনু বলে—"কে বলুন দেখি ?"

সুজিত বলে—"তোমার দিদি।"

টুনু বলে—"ঠিক বলেছেন।"

সুজিতের চাকরও যায় নীলাদের বাড়ী বেড়াতে।

নীলা বলে—"হ্যাঁ রে, তোর বাবুর আজ কি রান্না হ'ল ?"

চাকরটা উত্তর দেয়—"ডাল আর ভাজা।"

নীলা বলে—"ওই দিয়ে মানুষ খেতে পারে ? আর কিছু রাঁধিস নি কেন ?"

সে বলে—"বাবু যে বলে ওতেই হবে।"

"তোরাও বেঁচে যাস, বেশী কাজ করতে হস না" বলে নীলা একখানা থালায় পরিপাটি করে কিছু তরকারী সাজিয়ে চাকরটাকে দেয়। নীলার মা বলে—"আমি ত রান্নার দিকে যেতে পারিনি—কি রাঁধলি, কেমন হ'ল, তাও জানি না। হয় তো নিন্দে করবে।"

নীলা বলে—"নিন্দা করে সেতো আমার করবে, তোমার আর কি ?"

সুজিত তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করে—"এসব কোথা থেকে আনলি ?"

"দিদি দিয়েছে।"

সুজিতের মুখখানা নিমেষের তরে একবার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। প্রশ্ন করে—"তুই নিশ্চয় কিছু বলেছিস, তাই এসব দিয়েছে।"

সুজিত বিশ্বাস করতে পারে না যে এই অপরিচিত স্থানে এক অপরিচিতার অন্তরে দুদিনের মধ্যে তার জন্য এতখানি স্নেহ মমতা জমা হ'যে উঠতে পারে।

চাকরটা বলে—"না বাবু আমি কিছু বলিনি ; মায়ের অসুখ, দিদি রান্না করছে। জিজ্ঞাসা করলে আমাদের কি রান্না হ'য়েছে, তারপর এই সব দিলে।"

সুজিত আর কিছু বলে না। তার বাড়ীর কথা মনে পড়ে। এম্নি মমতাভরা স্নেহের আহ্বানকে সে কেমন ক'রে উপেক্ষা করে। তার একঘেয়ে সুদীর্ঘ বন্দী-জীবনের মধ্যে এই অযাচিত স্নেহ এনে দেয় এক অপূর্ব্ব সান্ত্বনা—এক অভিনব তৃপ্তি।

বিকালের দিকে নীলার সঙ্গে সুজিতের দেখা। নীলাকে আজ সুজিতের আরও ভাল লাগে। তার ইচ্ছা হয় ডেকে নীলার সঙ্গে আলাপ করে ; কিন্তু সঙ্কোচে বাধে। নীলাও আজ কেন সুজিতকে দেখে পালাতে চায় না। সুজিত একেবারে তার কাছে এসে পড়ে।

নীলা তার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুজিৎ হঠাৎ বলে ওঠে—"চমৎকার আপনার রান্না—অনেকদিন মনে থাকবে।"

নিজের সুখ্যাতিতে নীলা একটু সঙ্কুচিত হয়। তবুও সে জবাব দেয়—"শুধু শুধু ঠাট্টা করে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, আমি রাঁধতে জানি না, কোন দিন রেঁধেছি যে ভাল হ'বে।"

সুজিত বলে—"বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার ভাল লেগেছে, নহলে—"

—"যান আপনার কথা শুনতে চাইনা—সব মিথ্যা কথা" বলে সে সেখান হ'তে চলে যায়।

এম্নি ভাবে একদিন সুজিত ও নীলার মধ্যকার সঙ্কোচের ব্যবধান যায় টুটে উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় সৌহার্দ্দ্য।

প্রতিদিন রাত্রে সুজিত তার বাঁশীতে সেই সুরগুলো বাজায় যে গুলো নীলার খুব ভাল লাগে। নীলা সে সুরগুলো শোনে—প্রাণ ভরে—বিনিদ্র রজনীর অফুরন্ত অবকাশের মাঝে। তারপর বাঁশী থেমে যায়—সে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। চোখে তখনও ঘুম আসে না। চোখ বুজে সে ভাবে - সুজিতবাবু কি মনে করে ? সে হয় তো মনে করে মেয়েটা কি বেহায়া ! সত্যিই কি তাই ? তার কি কোন বোন নেই—সে কি এমন করে তাকে যত্ন করে নি ? তবে ? আর সে ভাবতে পারে না, ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে।

দিন যায়······হঠাৎ একদিন সুজিতের আসে Transfer Order। দারোগা বাবু বিকালে তাকে ডেকে বলে—"আপনি তো চল্লেন, আপনার Order এসে গেছে।"

সুজিত—'না' 'হ্যাঁ' কিছুই বলে না। এক নিমেষে তার মনটা ব্যথায় ভরে উঠে। থানা থেকে বেরিয়ে সে যায় নীলাদের বাড়ীতে ; ডাকে—"টুনু"। তার দিদি নীলা

জানালায় এসে দাঁড়ায়—জিজ্ঞাসা করে—"কি বন্দীবাবু ?"

সুজিত বলে—"আমার Order এসেছে, কাল চলে যাচ্ছি।"

—"কোথায় ? বাড়ী ?"

—"না, অন্য জায়গায়।"

তারপর কারও মুখে কথা সরে না। বর্ষোন্মুখ মেঘের মত সজল চোখে উভয়ে থাকে উভয়ের পানে চেয়ে। কিছুক্ষণ পরে সুজিত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—"স্মৃতি হিসাবে এই fountain penটা রেখে দিও, আমি যখন থাকব না তখন আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।"

নীলা কোন রকমে হাত বাড়িয়ে সেটা গ্রহণ করে; তারপর চলে যায়।

সে দিন রাত্রে বাঁশী আর বাজে না। সুজিত অনেক রাত পর্য্যন্ত তার ঘরের সাম্নে ডেক চেয়ারটার ওপর পড়ে থাকে।

রাত প্রায় আড়াইটে···হঠাৎ সুজিতের চোখে পড়ে নীলার ঘরের আলো। ভাবে—সে কি তবে এখনও জেগে ?

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর মনে হয় যেন সে জানালায় বসে। সুজিত ঘর থেকে বাঁশী এনে বাজাতে সুরু করে বেহাগের সুর। সমস্ত পাড়া সুপ্তির মাঝে অচেতন—সাড়া নেই শব্দ নেই। কেবল দুটী প্রাণী সুজিত আর নীলা সারা বিশ্বসংসারে জেগে; একজন সুরের মোহ ছড়িয়ে চলে, আর একজন অন্তরের অন্তঃস্তলে তা গ্রহণ করে।

বেহাগ হ'তে সুজিতের বাঁশী রামকেলীতে এসে থামে। পূব আকাশের আলো এসে সারা দুনিয়ার অন্ধকারকে গ্রাস করে। প্রথম অস্পষ্ট আলোর মাঝে সুজিত চেয়ে দেখে তখনও নীলা জানালায় বসে। তার মুখে চোখে একটা সুস্পষ্ট কাতরতার ছাপ। ভোরের উতোল বাতাস তার কোঁকড়ান কুচো চুলে দোল দিয়ে যায়, আর তারই তালে তালে বুকের ওপরকার শিথিল আচলখানা ওঠে কেঁপে।

বাইরে হ'তে দরজা বন্ধ দেখে নীলার মা ডাকে—"এখনও উঠলি নি মা; উঠে পড়, অনেক বেলা হ'য়েছে। আজ আবার বন্দীবাবু এখানে খাবে, সকাল সকাল রান্না চড়াতে হ'বে।"

নীলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে তার নিজের কাজে মন দেয়; কানের ভিতর কিন্তু তখনও সেই রাত্রের বাঁশীর করুণ প্রাণ-ছোঁয়া সুর বাজতে থাকে। মনও যেন সেই সুরে বল্‌তে থাকে—

"আজি যে রজনী যায়
ফিরাইব তায় কেমনে!"

খাবার সময় নীলা নিজের হাতে সুজিতকে পরিবেষণ করে; সুজিত বলে—"থাক্, যাবার দিন মার হাতের রান্না আর বোনের হাতের পরিবেষন চিরদিন মনে থাকবে।"

নীলার মা বলে—"তুমি তো চল্লে বাবা, মেয়ে দুটোর যে কি হ'বে ভেবে পাই না। একটা মানুষ বলতে দেশে কেউ নেই; তবু তোমাকে পেয়ে ওদের দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। ওরা যদি কিছু অন্যায় করে থাকে তো কিছু যেন মনে করো না—"

—"ও কথা বলবেন না মা। ছোট বোনেদের মত ওরা আমায় কম স্নেহ যত্ন দেয় নি। আজ যাবার দিন শুধু সেই কথাই মনে পড়ছে।"

নৌকা তৈরী···সুজিত শেষ বিদায় নিতে এসে নীলার মাকে প্রণাম করে। নীলাও সুজিতের পায়ের কাছে একটা ছোট্ট প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর একটা ফুলের মালা তাকে দিয়ে বলে—"বন্দীবাবু, ছোট বোনের স্মৃতি হিসাবে এই মালাটা রেখে দেবেন। এফুল সহজে শুকায় না—" আর কিছু সে বলতে পারে না—গলার স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে।

নৌকা ছেড়ে দেয়; সুজিত ছইএর উপর হ'তে রুমাল নেড়ে সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। সাম্নেই নদীর বাঁক। আর একটু পরে সমস্ত আড়ালে পড়ে যাবে। সুজিত আর একবার তার রুমাল নাড়ে। নৌকাখানা দৃষ্টিপথে যাবার পূর্ব্বে নীলা তার আঁচলখানা নেড়ে সুজিতকে একটা ছোট্ট নমস্কার করে—সুজিতও তা প্রত্যর্পণ করে।

পাল দেওয়া নৌকা উজান স্রোতে ছুটে চলে। নৌকার বুকে স্রোতের জল প্রতিহত হ'য়ে এক অস্ফুট আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করে। সে আর্ত্তনাদ সুজিতের কানে আসে। সে বুঝতে পারেনা এ আর্ত্তনাদ তার অন্তরের মর্ম্মস্থলের, না সত্যই জল-কল্লোলের।

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

কাব্যে নবীনচন্দ্র

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ

প্রত্যেক সাহিত্যেরই আদিতে দেখিতে পাই, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য এবং রসবোধ সেখানে মানুষের ধর্মবোধের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে তাহাদিগকে আর স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করা যায় না। মোটের উপরে ধর্ম্মের মাহাত্ম্যই সেখানে অনেক খানি মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, রসবোধ—সৌন্দর্য-বোধ যেন রথের অশ্বমাত্র। অনেকে হয়ত ইহাই ব্যাখ্যায় বলিতে পারেন,—সাহিত্যের যে রসবোধ সেও ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর—সুতরাং আদিতে যে কাব্যাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদেরই সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এ কথায় প্রাচীন সাহিত্যের দেবদেবী মাহাত্ম্যকে সত্য সত্যই ব্যাখ্যা করা চলে না, কারণ আলঙ্কারিকগণ যে দৃষ্টিতে কাব্যাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলিয়াছেন, সেখানে সাহিত্যকে তাঁহারা খুব করুণার চক্ষে দেখেন নাই, বরঞ্চ সাহিত্যের ভিতরেই এমন একটা মাহাত্ম্যের সন্ধান পাইয়াছেন যেখানে তাহার ব্যাপ্তি এবং গাম্ভীর্য্যের ভিতরে সে ব্রহ্মাস্বাদেরই সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন এবং মধ্যযুগে যে মঙ্গলকাব্যের প্লাবন দেখিতে পাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কি বলিবার আছে? এই যে দেবদেবীর প্রত্যাদেশের ভাণ না করিয়া কবি মঙ্গল-কাব্যের আসর জমাইয়া তুলিতে পারিতেন না ইহার কারণ কি? তারপরে এই যে অসংখ্য বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে অনন্ত-বৈচিত্র্যে এবং রস-সম্ভারে রাধাকৃষ্ণ প্রেম লইয়া বাঙালী কবিগণ একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, এই সকল কবিতাই কি শুধু বাঙালী জাতিকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামে পৌছাইয়া দিবার জন্য? সত্য কথা বলিতে গেলে—এখানে রহিয়াছে মনুষ্যত্বের উপরে মানুষের গভীর অশ্রদ্ধা। তখন পর্যন্তও মানুষ বুঝিতে পারে নাই মানুষের জীবনের মাহাত্ম্য কত বৃহৎ—কত গভীর,—অনুভব করিতে পারে নাই একটা জীবনের অনন্তরহস্য—তাহার অতলতায়—গভীরতায় সে যে অভ্রভেদী কৈলাসের কৃত্তিবাস হইতে কোথাও কিছু কম নয়—তাহার ভিতরেও রহিয়াছে অনন্ত অজানা—অসীম বিস্ময়! তাইত বাঙালী মায়ের ঝরণার মত ঝরিয়া পড়া স্বচ্ছ শীতল বাৎসল্যের ধারাটিও উমা ও গিরিরাণীর মুখোস না পরিয়া বাঙালীর কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। কিন্তু কালের প্রবাহ ক্রমে ফিরিয়া রহিল, মানুষের শ্রেয়ো-বোধ আকাশের অদৃশ্য লোক বা পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে আজ আমাদের মাটির ধরায় নামিয়া আসিয়াছে। আজ দুঃখী চাষার ঘরের ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা অনশনক্লিষ্টা মা বৎসরান্তে তাহার স্নেহের পুত্তলী কন্যাকে স্মরণ করিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু আঁচলে মুছিয়া ফেলে, তখন আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি, গিরিরাণী তাঁহার উমাকে লইয়া কৈলাস-শিখর হইতে আমাদের মাটির কুটিরে বিরাজ করিতেছেন,—আজ তাই প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ-মিলনে, বীরের বীর্যে, স্বদেশ-প্রেমিকের আত্মত্যাগে দেবত্বের সকল মাহাত্ম্যকেই আমরা আবার আমাদের নিজেদের ভিতরে বণ্টন করিয়া লইয়াছি।

এই যে মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা, ইহাই বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, বর্তমান সাহিত্যও তাই এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত। বাঙলা সাহিত্যের কথাই বিশেষ করিয়া ধরা যাক্। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণব কবিতা তাহার রূপ বদলাইয়াছে; নর-নারীর প্রেম রাধাকৃষ্ণের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিয়া এই মাটির দেহে বাস্তব আলো বাতাসের মধ্যে নিজের স্বরূপে প্রকাশ পাইল কবিওয়ালাদের গানের ভিতরে। সেখানে

অবশ্য আমরা বাস্তবকেই বেশী করিয়া পাইয়াছি, ইহাই আমাদের লাভ; কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় আমরা যে শুধু বাস্তবকেই পাইয়াছি তাহা নহে,—আমরা পাইয়াছি বাস্তবের অতলস্পর্শ মহিমা।

কালের স্রোতেই যে সুর ভাসিয়া আসিতেছিল আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে সে পিছন হইতে পাইল আর একটা প্রবল ধাক্কা,—তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে আমরা দেখিতে পাই, বাঙালী দেবতার কবল হইতে তাহার স্বীয় অধিকার আবার সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইযাছে, মধুসূদনের রাবণ ও মেঘনাদ তাই রাম লক্ষণের দিব্যজ্যোতি ম্লান করিয়া দিয়াছে; দানব-নন্দিনী প্রমীলাকে আমরা সীতা হইতে কিছু কম করিয়া পাই নাই; হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের মধ্যে সমস্ত দেবদেবীর শৌর্য বীর্য সুখ দুঃখ সকল ঢাকা পড়িয়াছে একমাত্র দধীচী মুনির আত্মত্যাগের মহিমায়। এই মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা ইহারই অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিতে পাইলাম আমরা নবীনচন্দ্রের ভিতরে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তুর ভিতরে একটা আভিজাত্য আছে বটে, কিন্তু সে আভিজাত্য মানুষের জীবন মাহাত্ম্যকে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হাতে বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন,—তিনি মানবতারই পূর্ণ আদর্শ। দয়া, প্রেম, শৌর্য বীর্য, জ্ঞান ভক্তি, কর্ম—মানুষের সকল সবলতা-দুর্ব্বলতা, রুদ্রত্ব ও কমনীয়তা—সকলই একটি সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের ভিতরে,—এই জন্যই তিনি আদর্শ মানুষ, তিনি সকলের নমস্য—তিনি সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি। এই মানবতার মাহাত্ম্যেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। কবি মনে করেন, এই মনুষ্যত্বের পূর্ণতায়ই মানুষ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতরে মানুষ বুঝিতে পারে,—তাহার অসীম আশা আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত শক্তি ও প্রসারের ভিতর দিয়া সেও অসীম অনন্ত—সেও বিরাট, তাই সে ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার নহেন,—তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ,—তাঁহার আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেন, তিনিও ব্রহ্ম—ইহাই কবির 'সো-হহম্'-বাদ।

অমিতাভের ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, কবি ভগবান বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই,—আমাদের এই মতের দুঃখ-বেদনা-নিরাশার ভিতরে শুভ্রশান্ত সান্ত্বনার সমুজ্জ্বল মূর্তি করিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ "সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্লাধিক অতি মানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিযাছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিযা বোধ হয।"

এই যে মনুষ্য-প্রীতি এবং মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-বোধ ইহা সর্বত্রই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে একটা গৌরব দান করিয়াছে। স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া হাজার হাজার বৎসরের সাহিত্য-পুরাণ-ইতিহাসে যে কিংবদন্তি, অলৌকিকতা—যে অতিরঞ্জনের ভিড় জমিয়া উঠিযাছিল, তাহার ভিতর দিয়া একটি পূর্ণাদর্শের মানব চরিত্র খুঁজিয়া বাহির করার কৃতিত্ব নবীনচন্দ্রেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে এই আলোকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নবীনচন্দ্রের ন্যায় এমন স্পষ্ট এবং গভীর করিয়া এ জিনিসটি ইতিপূর্ব্বে আর কেহ অনুভবও করেন নাই, প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। এই কৃষ্ণ চরিত্রের নবীন কল্পনা লইয়া নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিম চন্দ্রের ভিতরে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য নবীনচন্দ্রের নিকটে ঋণী। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের সাহায্যে; কিন্তু নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-মূর্তি পাণ্ডিত্য-লব্ধ নহে,—উহা তাঁহার

অন্তরের গভীর প্রেরণা-লব্ধ— কবি-প্রেরণায় প্রকাশিত। আদর্শের অনুরোধে তিনি পুরাণের শ্রীকৃষ্ণকে ভাঙিয়া-চুরিয়া আপনার মত করিয়া লইয়াছেন,—যেখানে প্রয়োজন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তবে তাঁহার মূল আদর্শের প্রতি যে পুরাণাদির সমর্থন মোটেই নাই এ কথা বলা চলে না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, কিশোর শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসবধের জন্য মল্লভূমিতে আগমন করিলেন তখন কবি তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

মল্লানামশনির্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনো-২সতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা-স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেব তেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
(১০।৪৩।১৭)

অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন তখন তিনি মল্লদের নিকটে বজ্র, মানুষের ভিতরে শ্রেষ্ঠ মানুষ, স্ত্রীলোকের নিকটে মূর্তিমান মদন, গোপগণের স্বজন, অসৎ রাজাদের শাসক, নিজের পিতার নিকটে শিশুটি, ভোজপতির নিকটে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞানীদের নিকটে তিনি বিরাট, যোগীদের পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিদের নিকটে তিনি আবার পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ভিতরে নবীনচন্দ্র মনুষ্যত্বের যে একটি পূর্ণ পরিণতির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার বীজ ভাগবতের ভিতরেই লুকায়িত আছে। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, নবীনচন্দ্র এ আদর্শ শাস্ত্রজ্ঞানের ভিতর দিয়া লাভ করেন নাই, এ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার কবিচিত্তের অনুপ্রেরণায়,—এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শুধু শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনার মৌলিকতা এবং মহত্বের জন্যই নহে, কাব্যের বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনাতেও নবীনচন্দ্র যে মৌলিকতা এবং অনন্যসাধারণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই বিরল। নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনকে মোটামুটি বিচার করিতে হইলে আমরা তাঁহার সমত্নে গ্রথিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসকেই গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের আদি মধ্য ও অন্তলীলাকে অবলম্বন করিয়া কবি যে এক ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই রূপ গ্রহণ করিয়াছে 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র ভিতরে। এই তিনখানি গ্রন্থের ভিতরে প্রকাশ করিবার জন্য কবি যে আখ্যানবস্তুটির পরিকল্পনা করিয়াছেন, বাঙলা-সাহিত্যে উহাই একমাত্র মহাকাব্যের উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। 'মহাকাব্য' নামটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এজাতীয় কাব্য ক্ষণিকের নহে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটি কথা লইয়া নহে,—ইহা ব্যক্তিবিশেষের কথা নহে,—বিরাট তাহার কালের পরিধি,—বিপুল তাহার পরিসর,—সে একটা সমগ্র যুগের একটা সমগ্র জাতির জীবন-ইতিহাস। এতখানি পরিসর—এতখানি গভীরতা—এতখানি গাম্ভীর্য্য লইয়া তবে সে মহান হইয়া ওঠে, তাই সে মহাকাব্য,—তাই সে নগাধিরাজ হিমালয়ের মত শ্যামল কোমল সমতল ভূমির পাশে আপন অনির্বচনীয় মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে। নবীনচন্দ্রের এই মহাকাব্যের পরিকল্পনাতেও আমরা এই জাতীয় একটা বিরাটত্ব এবং মহত্বের আভাস পাই। কবি অস্পষ্ট অতীতের ইতিহাসের সহিত আমাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের এমন একটী যোগসূত্র নিপুণ কল্পনা দ্বারা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে, আজ সেই আলোকে চাহিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারি,—আমাদের আজিকার এই বিংশশতাব্দীর জীবন—ইহার সমস্ত ধর্ম, রাষ্ট্র এবং সমাজগত সমস্যার সহিত সেই সুদূর অতীতের অস্পষ্ট ছায়াটির সহিত যেন একটি নিবিড় ক্রমবিবর্ত্তনের যোগ রহিয়াছে। আজ আমরা জাতীয় অবনতির মূলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে এক অনৈক্যের বীজাঙ্কুর আবিষ্কার করিয়াছি—তাহার মূল শুধু বর্ত্তমানের জলাভূমিতে নহে,—তাহার শিকড় পৌঁছিয়াছে সেই অনৈতিহাসিক যুগের গভীর ভূমিভাগে। নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনার ভিতরে ধর্মের দিক হইতে দেখিতে পাই, 'রৈবতকে'র প্রথম সর্গেই 'সৌরাষ্টক' এবং 'অষ্টাকের লড়াই ; একদিকে ঋষিগণ সূর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতীকের উপাসনা করিতেছেন, অন্যদিকে কৃষ্ণ 'বিশ্বেশ্বর নারায়ণে'র উপাসনা করিতেছেন;

রাষ্ট্রক্ষেত্রে একদিকে যেমন আর্য এবং অনার্যদের এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াই আছে, অন্যদিকে বিশাল ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, পরস্পরের ভিতরে নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদ; সমাজের দিক হইতে আর্যের সহিত অনার্যের জাতিগত বৈষম্য,—আর্যদের ভিতরে আবার ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণাশ্রম ধর্মের বৈষম্য ও সঙ্ঘাত। সুতরাং নবীনচন্দ্রের সেই মানসযুগের ইতিহাস আমাদের বর্তমান জীবনের ইতিহাস হইতে পৃথক নহে,—সেই একই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী—সেই একই সমস্যা। কিন্তু আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মনেই প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল,…'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেব আমি।'

'রৈবতকে'র সপ্তদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—

গৃহভেদ, জাতিভেদ,
রাজ্যভেদ, ধর্মভেদ,
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্য জাতি।
চাহি আমি বক্ষ পাতি
নিবাইতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির শান্তি; নহে সখে! সমর দুর্বার।

* * * *

শিখাব একত্ব মর্ম,—
এক জাতি এক ধর্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা রাজা নারায়ণ!

এই যে সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত করিয়া এক ধর্ম এক রাজ্য একমাত্র জাতীয়তা-বোধের ভিতরে এক অখণ্ড মহাভারতের পরিকল্পনা ইহা আদর্শের দিক হইতে মানবতার দিক হইতে সত্যই বিরাট এবং অভিনব হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়, আদর্শের বৈশিষ্ট্যের জন্য, চিন্তার ব্যাপকতা এবং গভীরতার জন্য লেখক হয় ত শ্রদ্ধা পাইতে পারেন কিন্তু কাহারও কাব্য বিচার করিতে হইলে এই আদর্শবাদ বা চিন্তাশীলতাই যথেষ্ট হইতে পারে না। কাব্যের বক্তব্য বিষয়ই যে কাব্য-বিচারের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য তাহা বলা যায় না,… কাব্য-বিচারে এখানেই আমাদের হয় মস্ত বড় ভুল। কবির কাজ শুধু চিন্তা নহে, তাঁহার প্রধান কাজ সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির নিপুণতায়, প্রকাশের সৌন্দর্য-মাধুর্যের উপরই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিচার চলিবে।

এই শিল্প-সৃষ্টি এবং রসসৃষ্টির দিক হইতে আমরা কবি নবীনচন্দ্রকে যে একেবারে সফল বলিতে পারি তাহা নহে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, এক্ষেত্রে তাঁহার অনেক কৃতিত্বও যেমন অসাধারণ,—অনেক দোষও তেমনই একান্ত মারাত্মক।

এই 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসের কথাই ধরা যাক। আমরা দেখিয়াছি, কবি যে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা মহাকাব্যের উপাদান হিসাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই কাব্যত্রয় একত্রিত হইয়া একখানি সত্যকার মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ এখানে বিষয়বস্তুর যে বিরাটত্ব সে সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়া সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে বিরাট করিয়া তোলে নাই—এ পরি-কল্পনার বিরাটত্ব শুধু শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ বক্তৃতায়। বক্তৃতায় মানুষ জানে মাত্র,—কিন্তু আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব ব্যতীত উহা রস হইয়া ওঠে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত কাহারও কথার ভিতর দিয়া বিরাট হইয়া উঠে নাই; ঘটনার বিপুল প্রবাহের ভিতর দিয়া—শত শত জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যে বিরাটত্ব আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে আসিয়া পড়ে, তাহাকে আমরা শুধু সংবাদের মত জানি না—সমগ্র হৃদয় দ্বারা তাহাকে অনুভব করি। বিপুল মহাভারতের সমস্ত জীবন-সংগ্রাম—আশা-নিরাশা-জয়-পরাজয়কে তুচ্ছ করিয়া বিজয়ী পঞ্চ-পাণ্ডব যেদিন দ্রৌপদী সহ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন, সে বিরাট বৈরাগ্যকে আমরা কোন কথার বাঁধুনির ভিতরে খুঁজিয়া পাই নাই,—তাহাকে পাইয়াছি নিরন্তর ঘটনাপ্রবাহে। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের পরিকল্পনাও যদি এইরূপ ঘটনার

স্বাভাবিক গতিতেই রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারিত তবেই কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারিত।

কাব্যরূপের ভিতরে নবীনচন্দ্র তাঁহার পরিকল্পনার মহিমা ও অনন্যসাধারণতাকে অনেক স্থলেই ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাকাব্যে বর্ণিত যে জীবন সে আমাদের ছোটখাট সুখদুঃখের আশা নিরাশার কাহিনী লইয়া নহে, সে সর্বত্র অলৌকিকও নহে সে অসাধারণ। এখানে মানুষ হাসিতে পারে কাঁদিতে পারে,—কিন্তু সে হাসি-কান্নার ভিতরেও একটা অনন্যসাধারণতার গাম্ভীর্য থাকা চাই। বিরাট হিমালয়ের বুকে আলো জ্বলিতে পারে,—কিন্তু সে তুলসীতলার মাটির প্রদীপ নহে,—সে গভীর নিশীথের দাবাগ্নি; ওই দাবাগ্নির সহিত হিমালয়ের অসাধারণতার একটা নিগূঢ় যোগ থাকে, কিন্তু মাটির প্রদীপ নিরালা তুলসীতলায় যতই কমনীয় এবং মধুর হোক, পাহাড়ের বুকে সে যে শুধু নিরর্থক তাহাই নহে,—সে হাস্যাস্পদ। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের ভিতরেও বক্তৃতা ছাড়িয়া কবি যেখানে কাব্যসৃষ্টির ভিতরে মন দিয়াছেন সেইখানেই মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম জটিলতা,—তাহার সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা এমন লৌকিক এবং তরলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে উহা পদে পদে রসজ্ঞ পাঠকের মনে আঘাত করে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্যে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, সে প্রেমরসের দিক হইতে বা গভীরতার দিক হইতে কিছু কম হয় নাই,—কিন্তু তাহা একেবারে সাধারণ, একান্ত লৌকিক হইয়া ওঠে নাই,—কবি তাহার ভিতরে বেশ একটি আভিজাত্য রাখিয়াছেন; কিন্তু 'রৈবতকে'র কৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রেম, 'কুরুক্ষেত্রে' কিশোর-কিশোরী অভিমন্যু ও উত্তরার প্রণয়-চপলতা অনেক স্থানে এমন লৌকিক—এত তরল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে মহাকাব্যের ভিতরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। নবীনচন্দ্রের প্রায় সকল কাব্যের ভিতরেই কারণে অকারণে এত হাসি এত কান্না,—ব্যক্তি-জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার এত প্রাধান্য যে সমগ্র জিনিসটি একত্রিত হইয়া কোন বিরাটত্বকে উপলব্ধি করিতে দেয় না।

মহাকাব্যের বিপুল বপুটি বড় কঠিন বন্ধনে বাঁধা; ইহা সঙ্গীতের ধ্রুপদ-রাগিণী,—ইহার ভিতরে খেয়ালের তান নাই। কোথাও থামিয়া দাঁড়াইয়া সপ্তসুর লইয়া যাদু বিদ্যা দেখাইবার সময় নাই, এখানে প্রত্যেকটি ধ্বনি প্রত্যেকটি ধ্বনির সহিত এমন নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ যে একটু খেই হারাইয়া গেলেই সুর ভঙ্গ। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্যের সকল দৃশ্যগুলি এইরূপ একটা অখণ্ড সমগ্রতার ভিতরে নিবিড় ভাবে সম্বন্ধ নহে; অনেক স্থলেই দৃশ্যগুলি ভাষা ও ছন্দের লালিত্যে বর্ণনার নৈপুণ্যে অপূর্ব্ব লিরিক হইয়া উঠিয়াছে,—কোথাও চমৎকার উপন্যাস হইয়াছে, কোথাও নাটক হইয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন তানগুলি যেন একটি রাগিণীর মূর্চ্ছনায় আপনাদিগকে সংহত করিয়া কোন একটি ফলশ্রুতি দান করে না।

কথাটি সংক্ষেপে বলিলে দাঁড়ায় এই,—নবীনচন্দ্রের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কবির গুণ প্রায় সকলই ছিল,—কিন্তু ছিল না শুধু কাব্য সৌন্দর্যের মূলসূত্র সংযম। কবির ভিতরে এত উচ্ছ্বাস রহিয়াছে—এত ভাবাবেগ রহিয়াছে,—তাবার উপরে এমন দখল রহিয়াছে—এমন বর্ণনা নৈপুণ্য রহিয়াছে, কিন্তু সকলের ভিতরে একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি স্থাপন করিবার ক্ষমতাটি নাই। ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাসই কবিচিত্তকে এমনভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইত যে, কোন্ খানে যে মাত্রা পূর্ণ হইল,—কোথায় যে কোন্ প্রবাহের বিরাম-যতি আবশ্যক সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। এ যেন অনেক খানিই আনন্দের প্রাচুর্যে 'বালনৃত্যবৎ'। কিন্তু নৃত্যকে যেখানে শিল্পকলায় পরিণত করিতে হইবে সেখানে শুধু আনন্দের প্রাচুর্যে পা ফেলিলেই চলে না,—সেখানে রহিয়াছে পদে পদে ছন্দের বাঁধন,—এবং সেই ছন্দের বন্ধনের ভিতর দিয়াই সে লাভ করে একটি অখণ্ড পরিণতি। নবীনচন্দ্রের কাব্য যেন অনেক স্থানেই তাঁহার ভাবাবেগের প্রচণ্ড প্রবাহ মাত্র,—নিজের গতিতে সে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে,—কোথাও হয়ত সে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া তটস্থ শ্যামল শস্যভূমির ভিতরে অনেকখানি অনধিকার প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে,—কিন্তু কবি নিজেই সে জলতরঙ্গকে সংহত করিতে পারিতেছেন না। নাচিয়া কুঁদিয়া হাসিয়া

কাঁদিয়া অন্তরের অনিবার্য উন্মাদনাকে প্রকাশ করাই যেন কবির কাজ হইয়া পড়িয়াছে। এদিক হইতে আমরা নবীনচন্দ্রকে ইংরেজ কবি বায়রণের সহিত তুলনা করিতে পারি; বায়রণের দোষগুণ কবি প্রায় সকলই পাইয়াছিলেন। তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তুকে অবলম্বন করিয়াও মুহূর্তে তাহাকে কল্পনার বিদ্যুৎ-ছটায় উদ্ভাসিত করিতে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া তাহাকে একটি বিশেষ পরিণতি-দানের ধাতটিই যেন কবির ছিল না।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের আর একটি অসৌষ্ঠব তাঁহার চরম আদর্শবাদ। অবশ্য তখন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে 'Art for Art's sake'এর ধুয়া তেমন করিয়া জাঁকিয়া ওঠে নাই, এবং মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষের ভিতরে তাহার রসবোধ এবং সৌন্দর্যবোধকে তাহার অন্যান্য সকল বোধ হইতে এইরূপে একেবারে ছাঁকিয়া তোলা যায় কি না সে প্রশ্নেরও এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নাই; কিন্তু সাহিত্য যদি আবার শুধু বেত্র হস্তেই 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' —এই শাসন-বাণীই প্রচার করিতে থাকে তবে তাহার ব্যবহারিক মূল্য যাহাই থাকুক, ললাটে সে সাহিত্যের শিরোনামা বহন করিতে অক্ষম। শিল্পক্ষেত্রে আদর্শবাদের কোন প্রবেশ অধিকারই নাই—এ মতও যেমন গোঁড়ামি,—আবার একথাও স্বীকার্য যে শিল্পক্ষেত্রে আদর্শবাদের একটা সীমা আছে;—সে যখন এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া আপনারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতে চায়, কলালক্ষ্মী সেখানে আপনার সম্মান বাঁচাইয়া আত্মগোপন করেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার সার্বজনীন মঙ্গলের আদর্শ যেমন একদিকে তাঁহার কাব্যের একটা গৌরব দান করিয়াছে, অন্যদিকে মাত্রাধিক্যে সে অনেক স্থলে শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যমঞ্চে অনেক আদর্শের অন্তরাত্মা অশরীরী দেবতার মতই ভাসিয়া বেড়ায়,—তাহারা বাস্তব শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে আসে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম বাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে বটে, কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিম বাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন,—গড়িতে পারেন নাই।...... বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গুলিন ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।" এখানে ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ বলিতে কবি সেই সাহিত্যকেই বুঝিয়াছেন যাহার ফলশ্রুতি চতুর্বর্গ-ফল লাভ—এবং সাহিত্যজীবনে কবি নিজেও এই আদর্শকেই গ্রহণ করিযাছেন; ফলে তাহার অঙ্কিত আদর্শ চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে এক একটা ধরাণ (type) মাত্র হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সম্যক স্ফুরণ নাই!

কিন্তু এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি—সকল অসংযম, অসাবধানতা সত্ত্বেও যে কবি নবীনচন্দ্র আমাদের নিকটে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহার সমগ্র কাব্যের একটা জীবন্ত স্পন্দন! তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর-সৈকতের পার্বত্যদেশে পরিবর্ধিত কবির স্পন্দনময় বিক্ষুব্ধ চিত্রটির সাড়া আমরা যেন তাঁহার কাব্যের পাতায় পাতায়ই পাইতেছি, ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষ গুণ। কবির কাব্য প্রেরণা তাহার উচ্ছ্বসিত গতিবেগ কতগুলি রীতি-নীতির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া প্রাণহীন কথার বাঁধুনিমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি দোষগুণ লইয়া কবি যে একটি জীবন্ত প্রাণের সাড়া দিতেছেন,—এবং তাঁহার সেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সহিত যে পাঠকের হৃদয়কেও উন্মথিত করিয়া দিতে পারেন, ইহাই ত শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ। কবির 'রঙ্গমতী'তে এবং 'পলাশির যুদ্ধে' এই প্রাণ স্পন্দন অতি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে যখন 'কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,'—'কাঁপাইয়া আম্রবন' বৃটিশের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন কবি নিজেও যেন স্বশরীরে বাঙলার তথা ভারতের ভাগ্য-বিধাতার খেলা প্রত্যক্ষ করিতে উপস্থিত ছিলেন; যেখানে 'নাচিছে অদৃষ্ট দেবী নির্দয়-হৃদয়'—সেখানে কবি শুধু

কল্পনার সাগরে ভাসমান নহেন,—রুদ্ধশ্বাস, নিস্পন্দদেহে তিনিও তখন নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্য করিতেছেন—ভারতের ভাগ্য-বিধাতা একটা সমগ্র জাতিকে কোন পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। পলাশির যুদ্ধের পর মুহূর্তে মোহন-লাল যখন অস্তমিত-প্রায় সূর্যের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী।'

তখন কবির মুহ্যমান হৃদয় হইতে সমগ্র জাতির করুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসটিই ভাষায় রূপ লইয়াছে। সমগ্র কাব্য-খানির ভিতর দিয়া কবির আশা আকাঙ্ক্ষা,—শৌর্যবীর্য,—আনন্দ-বিষাদ যেন ভাষা ও ছন্দের বাঁধন ভাঙিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এই যে কাব্যের ভিতর দিয়া কবি-চিত্তের গভীর সঙ্গ লাভ—ইহা অতি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের পরে আজিকার দিনে বাঙলা সাহিত্য কাব্য-কবিতায় মুখর; কিন্তু আমাদের প্রাণহীন কথার বাঁধুনিতে, ভাষা ও ছন্দের বিলাসে সকল কাব্য-কবিতাই যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়া যেন একটা বিশেষ প্রাণ তাহার অমোঘ সন্ধানে আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে না। নবীনচন্দ্র হইতে কাব্যের ক্ষেত্রে অধিক সংযম, ভাষা ও ছন্দের অধিক নৈপুণ্য হয়ত আমরা প্রাপ্ত করিতে পারিয়াছি,—কিন্তু সেই স্পন্দনময় উন্মাদ প্রাণদেবতার সন্ধান যেন এখনও লাভ করিতে পারি নাই। সেই প্রাণদেবতার জীবন্ত বিগ্রহ নবীনচন্দ্র আজও তাই আমাদের বরেণ্য এবং নমস্য।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সাহানগর ইনষ্টিটিউটের নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-বাসরে পঠিত।

চারিদিক হ'তে আসে কিসের আহ্বান

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

চারিদিক্ হ'তে আসে কিসের আহ্বান,
সুদূরের কোন্ মায়া ডাকে মোর প্রাণ!
সে আহ্বান দক্ষিণের চঞ্চল পবনে,
পত্রে পুষ্পে মর্ম্মরিয়া বাজে ক্ষণে ক্ষণে,
অধীর চঞ্চল কোন্ ভাষাহীন সুরে
নিয়ে যায় সেই বাণী আমারে সুদূরে।
বৈশাখের তপ্ত বেলা কৃষ্ণপুঞ্জ মেঘে
সহসা মৌনতা ভাঙি যবে উঠে জেগে,
চঞ্চল আমারে ল'য়ে নিমেষে নিমেষে,
চ'লে যায় কোথা কোন্ অধীরের দেশে।
বর্ষাক্রান্ত শ্রাবণের সজল সন্ধ্যায়
সুরভি অলসে জাগে রজনীগন্ধায়,
পরাণের মাঝে কোন্ বেদনার বাণী,
অধীর আমার প্রাণে ধীরে দেয় আনি,
কতোবার কতোছলে সুদূরের বাঁশী
মৌনসুরে মনে মোর দোলা দেয় আসি,
সে আহ্বানে উল্লাসের অধীর চেতনা
না-পাওয়ারে খুঁজে ফেরে বিফল বেদনা।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার

শ্রীজনরঞ্জন রায়

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। কথিত হয় বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা শ্রীযাদবাচার্য্যকে দীক্ষাদান করেন। এজন্য যাদবাচার্য্যের বংশধরগণ নিজেদের বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার-গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দেন। ইহা কতদূর ইতিহাস সঙ্গত আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব

প্রাচীন কথা অনেক দিন পরে লিখিতে গিয়া অনেকেই ঠিক জিনিষ দিতে পারেন না। যাঁহারা সঙ্কলন করিয়াছেন (১) তাঁহারা রুচিভেদে একই ঘটনার ভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। আবার একই পুস্তক বিভিন্ন লোকের দ্বারা [illegible] হইবার সময়ে কোথাও পরিত্যক্ত কোথাও বর্দ্ধিত হইয়াছে (২)। এই সব বৈষ্ণব গ্রন্থের মা [illegible]ত্মক পাঠ অনেকা আমাদের বিভ্রান্ত করে।

যাদবাচার্য্য

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃ পরিচয় "প্রেমবিলাস" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রেম বিলাস হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা যাদবের সম্বন্ধে কথা হয়। এই দুইটি বিলাসেই বিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃ পরিচয় ছিল। ইহার প্রতিবাদে "জাল প্রেম বিলাস গ্রন্থের সমালোচনা" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ হয় তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে "মুর্শিদাবাদ বহরমপুর শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয় অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ সহ এই ১৮শ বিলাসের পুস্তকাবলম্বনে প্রেমবিলাস গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন; তৎপরে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ১৯শ ও ২০শ বিলাস রচনা করিয়া তাহা উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারা মুদ্রিত করিয়া লইয়াছেন। যিনি এই ১৯শ ও ২০শ বিলাসের পদ্য রচনা করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য দেহধারী হইলেও অহৈতুকী হিংসার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, বৈষ্ণব জগতের মহা অমঙ্গলকারী। এই নূতন পদ্য রচনা দ্বারা নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্মের পবিত্রতা, বৈষ্ণব সমাজের মর্য্যাদা ও অনেকানেক পার্শদ মহান্ত গোস্বামী বংশের সম্ভ্রম নষ্ট করিবার অনুচিত চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা বৈষ্ণব সমাজে ভয়ানক একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে...ইত্যাদি।" উক্ত সমালোচনা পুস্তিকা ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং বহরমপুরের উক্ত প্রেমবিলাস গ্রন্থ যে ভ্রমপূর্ণ তাহা নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, জিরাট, অম্বিকা, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত ও বৈষ্ণব সমাজ দ্বারা ঐ পুস্তিকায় সমর্থিত হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে ব্রতোপবাস করা বৈষ্ণবগণের চিরাচরিত প্রথা। ইহা জানিয়াও উক্ত প্রক্ষিপ্ত প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসে লিখিত হইয়াছে যে— খেতরীর নরোত্তমদাসের ভবনে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের পর সমবেত বৈষ্ণবগণ মধ্যাহ্নে ও রাত্রে চতুর্ব্বিধরসে

---

(১) যথা "বংশী শিক্ষা" নামক পুস্তক। বৈষ্ণব জগতে ইহার বেশ নাম আছে। ইহা ঠাকুর বংশীবদনানন্দের দেহান্তের অনেক দিন পরে লেখা হইয়াছে। ইহা বংশীবদনানন্দের নিজের লেখা নহে। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য শ্রীপ্রেমদাস বা পুরুষোত্তম মিশ্র কর্ত্তৃক লেখা। এই প্রেমদাস সাধুব্যক্তিদের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন সেই সব কথা এবং বংশীবিলাস, বংশী-লীলামৃত, রামের কড়চা, কেশব সঙ্গীত, গৌরাঙ্গ-বিজয় প্রভৃতি পুস্তক বিচার করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এমন কি, কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চরিত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং স্বয়ং বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতেও অন্যের সংগ্রহ হইতে বহুলাংশ গৃহীত হইয়াছে।

(২) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত "প্রেম 'বিলাস' তাহার একটি প্রধান নিদর্শন। উক্ত পুস্তক ২৪টি 'বিলাস' বা অধ্যায়ে রচিত হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা পরে ২০টি বিলাসে রূপান্তরিত করেন। তাহা করিবার সময়ে ১৯শ ও ২০শ বিলাস দুইটিতে অমূলক বিষয় সকল

ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ

অভিষেক ১২ই মে ১৯৩৭

সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ

নামটি লুপ্ত করিবার সবিশেষ চেষ্টা হইয়াছে (৩)। যাহা হউক, অনুসন্ধানের দ্বারা আমরা যাদবের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। ১৩১০ সালে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় "গৌরপদ তরঙ্গিনী" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের উপক্রমনিকায় প্রেমবিলাসের উদ্ধৃত এইরূপ পাঠ আছে—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হইল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকেও উপরের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এইরূপে 'আমরা জানিতে পারি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন ও তাঁহার নাম ছিল শ্রীযাদব মিশ্র। তাহার পরে প্রেমবিলাসে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হইল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল॥
নানা শাস্ত্র পড়িয়া হইল পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত॥

পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমাত্র কন্যা আর না হইল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রে তাঁরে কৈল দান॥"

এখানে যেন জোর করিয়া 'একমাত্র' শব্দটী বারে বারে বলা হইয়াছে। এরূপ পুনরুক্তি না করিয়া কবি সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাল্যমূর্ত্তির রূপ গুণের উল্লেখ করিলে ভাল হইত। ইহাতে সতঃই মনে হয়, ইহা প্রক্ষিপ্ত ও বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারকে লোকচক্ষে গোপন করিবার জন্য এরূপ করা হইয়াছে।

উপরের পয়ারাংশ আরও একস্থানে প্রক্ষিপ্ত শব্দ আছে। "জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর-কালিদাস"—এইস্থলে পরাশর শব্দটীর যোগে ছন্দ পতন হইয়াছে। আমাদের মনে হয় দুর্গাদাস মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল কালিদাস, তাহা পরাশর কালিদাস ছিল না। যশোদালাল তালুকদার মহাশয় ভুলক্রমে পরাশর কালিদাসকে একব্যক্তি স্থির করিয়াছেন কৈফিয়ত স্বরূপে তালুকদার মহাশয় বলিয়াছেন, পরাশর কালীভক্ত ছিলেন।

পরাশর পুত্র—যিনি চণ্ডী প্রণয়ন করেন, তাঁহার বিবরণ পরে লিখিত হইল।

ভোজন করিলেন! কিন্তু চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"চৈতন্যের জন্ম যাত্রা ফালগুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মাদিও এ তিথি করেন আরাধনা।"

ভক্তিরত্নাকরে আছে—

'ধন্য এই ফালগুন পৌর্ণমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী॥'

বংশীলীলামৃত গ্রন্থে আছে—

"যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা গৌরজন্মব্রতং পরং।
তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরে॥"

চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌম কৃত স্তব—

"ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যান্ত চৈতন্যজন্মবাসরে।
উপোষণং প্রপূজাঞ্চ কুর্য্যা জাপো সমাহিতঃ॥"

(৩) যশোদালাল তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৪শ বিলাসের পাঠ, যথা—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুইপুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাসর-কালিদাস।

* * *

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
গীত বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ।
সর্ব্বভক্তগণ তাঁরে করিলেক স্নেহ॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে।
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥
(জগবন্ধু ভদ্রের উদ্ধৃত পাঠ)"

এইরূপে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃবংশের পরিচয় পাইলাম। পরের ঘটনা সকল বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া বংশলতিকা আকারে তাহা দিতেছি—

দুর্গাদাস মিশ্র+স্ত্রী বিজয়া

- জ্যেষ্ঠ পুত্র: সনাতন+স্ত্রী মহামায়া
  - কন্যা: বিষ্ণুপ্রিয়া
  - পুত্র: শ্রীযাদব মিশ্র
- কনিষ্ঠ পুত্র: পরাশর+স্ত্রী বিধুমুখী
  - একমাত্র পুত্র মাধবাচার্য্য (শ্রীঅদ্বৈত শিষ্য) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা।
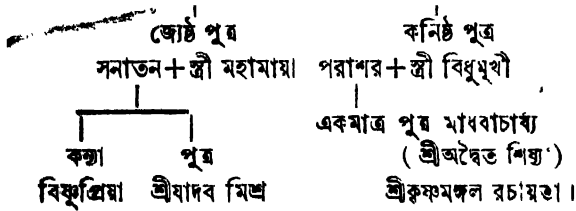
বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার গোস্বামীগণের কাহারও কাহারও কুল পঞ্জিকাতে দুর্গাদাস মিশ্রের নামান্তর বটেশ্বর বলিয়া উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা যাদব মিশ্রই যাদবাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। যথা—

"জয় ভট্ট গোপাল শ্রীরূপ সনাতন।
জয় রঘুনাথ দাস দুঃখীর জীবন॥
জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ শ্রীরাঘব।
জয় রঘুনাথ ভট্ট আচার্য্য যাদব॥"
—ভক্তি রত্নাকর ৭ম তরঙ্গ।

যাদবাচার্য্য ও যাদবদাস বর্য্য একই ব্যক্তি নহেন। যাদবদাস অদ্বৈত শিষ্য ও পৃথক ব্যক্তি (৪)। এবং যাদবাচার্য্য তাঁহার ভগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার শিষ্য। ইহা আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার মধ্যে মহাপ্রভুর গুরুপরম্পরা সংবাদ হইতে জানিতে পারি (৫)। কিন্তু যাদব বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট দীক্ষা লইয়া কাশীশ্বর গোস্বামীর নিকট "শিক্ষা" গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"কাশীশ্বর গোসাঞির গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তার বড় নাঞি॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞির শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহ অতি বড় রঙ্গী॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা—৮ম পরিচ্ছেদ।

'কাশীশ্বর গোসাঞি যে সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সহ তাঁর অতি প্রীত॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা আর্য্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য্য॥"
—ভক্তিরত্নাকর—১৩শ তরঙ্গ।

জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিতে বহু গুরুর নিকটে শিক্ষা লওয়া

(৪) প্রেম বিলাসের ১৯শ বিলাসে নরোত্তম দাসের পাঠ খেতুরের মহোৎসব বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"এই ত কহিল নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। এবে কহি অদ্বৈত-গণের আগমন॥ অনন্তদাস নারায়ণ যাদবদাস বর্য্য। হরিচরণ রঘুনাথ শ্রীরাম আচার্য্য॥"

চৈতন্য চরিতামৃতে ১২শ পরিচ্ছেদেও এই যাদবদাসের নাম পাওয়া যায়—"যাদব দাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন। অনন্ত-দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥ লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥"

(৫) চৈতন্যতত্ত্ব দীপিকায়—"শ্রীমন্মধ্বমুনেঃ শিষ্যো পারম্পর্য্যানুসারতঃ। মাধবেন্দ্রপুরী নাম তথেশ্বরপুরী স্বয়ং॥ মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রৌ। ঈশ্বর শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥ দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং। সিদ্ধোমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং সদীক্ষয়েৎ। ইতিশাস্ত্রবলাদ্ধেতোঃ স্বভার্য্যামুপদিষ্টবান্॥ অথ তং যাদবা-চার্য্যং সর্ব্বেষাং নঃ পরং গুরুং। সানুজং দীক্ষয়ামাস কৃপয়া শক্তিরীশিতুঃ॥ যাদবাচার্য্য শিষ্যোহভূৎ মাধবাচার্য্য আত্মবান্। তৎশিষ্যপ্রশিষ্যানুশিষ্যাবয়মিহস্মৃতাঃ। সংপ্রতিষ্ঠাপনায়া সৌ নৈজিং প্রতিকৃতিং ততঃ। ভার্য্যামাজ্ঞায় ভগবান বন্ধু-বান্ধবহিতঃ প্রভুঃ॥"

প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা শাস্ত্রসম্মত এবং শিক্ষাগুরুর স্থানও অতি উচ্চে (৬)।

যাদবাচার্য্য ভজনশীল সাধু ব্যক্তি ছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের জন্য তিনি কাতর হইয়া পড়েন। সংসারের আশক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে অসমর্থ হয়। গৃহত্যাগের সময় তিনি নিজ পুত্র মাধবকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অভিভাবকত্বে রাখিয়া যান। বৃন্দাবনে গিয়া যাদবাচার্য্য কাশীশ্বর গোস্বামীর নিকট শিক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত ভজনানন্দে নিমগ্ন হয়েন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহারা ফিরিয়া আসার কথা কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

মাধবাচার্য্য

আমরা গৌরপদ তরঙ্গিনীতে ছয়জন মাধবের বিবরণ পাইয়া থাকি। তাহার পরে আরও কয়েকজন মাধব ও যাদব-নন্দন আখ্যায়িত ব্যক্তির অনুসন্ধান পাইয়াছি। ইহাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারভুক্ত মাধবাচার্য্য কোন্ ব্যক্তি তাহা স্থির করিতে হইবে।

১। গঙ্গাপতি মাধবাচার্য্য —নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার স্বামী। "পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর" প্রভৃতি নিত্যানন্দের শাখার অন্তর্গত —চৈতন্যচরিতামৃত ১১শ খণ্ড। [শাস্তম্ব তত্ত্ব]

২। গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র।—ইনি মহাপ্রভুর গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। সুতরাং চৈতন্য, নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত কাহারও শাখার অন্তর্গত নহেন।

৩। মাধাই বা মাধব শর্ম্মা;—জগাই মাধাই ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে কনিষ্ঠ মাধব। ইহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয় শাখারই অন্তর্গত করা হইয়াছে।

"জগাই মাধাই হইল ভক্ত অতিশয়।
দুই প্রভুর শাখা মধ্যে গণনা যে হয়॥"
প্রেমবিলাস—২২শ বিলাস। [জয়-বিজয় তত্ত্ব]

৪। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা পরাশর-কালিদাসের পুত্র মাধবাচার্য্য।—ইনি অদ্বৈত শাখার অন্তর্গত এবং মাধব পণ্ডিত নামেও খ্যাত ছিলেন।

"লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥"
চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা—১২শ পরিচ্ছেদ।

"শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে।
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥
প্রেমবিলাস।

"শ্রীমাধব আচার্য্য আইলা ভক্তিরসপুর।
যাঁর কৃষ্ণমঙ্গল গান পরম মধুর॥"
প্রেমবিলাস—১৯শ বিলাস [মাধবীসখীতত্ত্ব] (৭)।

৫। মাধব পট্টনায়ক।—ইনি উৎকল দেশবাসী। তথায় করণগণের পট্টনায়ক উপাধি আছে। করণগণ শূদ্র।

৬। কুলিয়াবাসী মাধবদাস।—মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আসিয়া এই মাধব দাসের বাটীতে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন

"বাচস্পতি গৃহে প্রভু যে মত রহিলা।
লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥

(৬) ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে অবধূত সংবাদে ২৪টী গুরুকরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গীতায়—"আচার্য্যং মাং বিজানিয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ..।"

চৈতন্যচরিতামৃতে—"শিক্ষাগুরুকেও জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামি ভক্তশ্রেষ্ঠ হয় দুই রূপ।"

(৭) 'জাল প্রেমবিলাস" নামক সমালোচনা পুস্তিকায় লেখকেরও কয়েকটি বিশেষ ভুল আছে। তাঁহার মতে সনাতন মিশ্রের অন্য ভ্রাতা ছিলেন না। এবং মাধবের পুত্র যাদব! তাঁহার কথিতমতে বংশলতিকা এইরূপ—

বটেশ্বর মিশ্র + বিজয়া
|
সনাতন মিশ্র + ব্রহ্মময়ী
(সনাতনের অন্য ভ্রাতা ছিলেন না)

বিষ্ণুপ্রিয়া + মহাপ্রভু — মাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়া শাখা ও তৎশিষ্য + হরিপ্রিয়া

যাদবাচার্য্য

তিনি আরও একটি প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা (পরাশর পুত্র) মাধবাচার্য্য রাঢ়ীশ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন! এবং তাঁহার বংশ আছে! ইত্যাদি।

মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষকোটি লোক তথা পাইল দরশন॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥"

চৈতন্যচরিতামৃত—১৬শ পরিচ্ছেদ।

অনেকে বলিয়া থাকেন এই মাধবদাসই বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

৭। চূড়াধারী মাধব।—মহাপ্রভু কর্তৃক 'শিয়াল' বাসুদেব, 'কপীন্দ্রী' বিষ্ণুদাস ও 'চূড়াধারী' মাধব পরিত্যজ্য হয়। কারণ তাহারা ধার্ম্মিকের ভান করিয়া লোক ঠকাইত।

"মাধব নামে বিপ্র কোন রাজার পূজারী।
বিগ্রহের অলঙ্কার নিল চুরি করি॥
কোন স্থানে গোপের পল্লীতে চলে গেল।
গোয়ালার পৌরহিত্য করিতে লাগিল॥
চূড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লঞা লীলা।
চূড়াধারী নামে ইথে বিখ্যাত হইলা॥
চণ্ডালাদি যত অন্ত্যজের নারীগণ।
কৃষ্ণলীলাচ্ছলে করে তাহাদের সঙ্গম।
কোন দিন মাধব নারীগণ সঙ্গে।
নীলাচলে উপস্থিত হইলেন রঙ্গে॥
চূড়াধারী কাচি মাধব নারীগণ সনে।
মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে করিল গমনে॥
প্রভু কহে ইহো কোন আইল চূড়াধারী।
নারীসহ লীলা খেলা ধর্ম্মনাশ করি॥
ওহে ভক্তগণ চূড়াধারী ধর্ম্মভ্রষ্ট।
যে দেশে করিবে বাস সে দেশ হইবে নষ্ট॥
ইহো অপরাধী পতিত মুখ না দেখিবা।
পুরুষোত্তম হইতে শীঘ্র তাড়াইয়া দিবা॥"

প্রেমবিলাস—২৪ বিলাস।

৮। মাধব ঘোষ।—বাসুদেব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর ভ্রাতা। অগ্রদ্বীপের নিকট বাস, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, পদকর্ত্তা মহাজন। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

"রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥"

চৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলায় ১০ম পরিচ্ছেদে মুল শাখা বর্ণনা।

৯। চণ্ডী প্রণেতা মাধব। তাঁহাকে অনেকেই সনাতন মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস-পরাশরের পুত্র বলিয়া ভুল করেন। একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি চণ্ডীপুস্তক মধ্যেই এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞ জপ তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
...তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
ইন্দু বিন্দু বান ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥"

১৫০১ শকে ইনি চণ্ডী গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভু ১৪৬৫ শকে অপ্রকট হয়েন। একারণ ইনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। সপ্তগ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইনি ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি। গৌরপদ-তরঙ্গিনীর মতে ইনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন না।

১০। যাদব নন্দন কৃষ্ণদাস।—বীরভূমি পত্রিকায় ১৩৩০ সালের ৬-৪ সংখ্যায় শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের দুইজন কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে "যাদবনন্দন" নামক জনৈক কবির লিখিত একখানি "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন। তিনি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন তাহা গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন।

"পূর্ব্বগ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞী।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই... ॥"

প্রবন্ধকার শিবরতন মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"...এমন কি যাহারা বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিবার বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারাও ইঁহার পরিচয় বা নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন।" এই যাদবনন্দন কোথাও এরূপ লিখেন নাই যে তিনি যাদবাচার্য্য বা যাদব মিশ্রের নন্দন। এমন কি, বন্দনাদিচ্ছলে বিষ্ণুপ্রিয়ার নামটী কোথাও উল্লেখ করেন

নাই। সুতরাং তিনি যে যাদবাচার্য্যের পুত্র ছিলেন না ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

১১। যাদব চার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গৌরপদতরঙ্গিনীতে তিনজন মাধবাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ শাখার অন্তর্গত গঙ্গাপতি মাধবাচার্য্য ও অদ্বৈত শাখার অন্তর্গত কালিদাস-পরাশরের পুত্র মাধবাচার্য্যের পরিচয় দিয়াছি। সুতরাং অপর মাধবাচার্য্য, যাদব মিশ্রের পুত্র। এবং তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া শাখার অন্তর্গত। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল। এবং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পালকপুত্ররূপে বৈষ্ণব সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও সম্মানীত হইয়াছেন। যথা—"তবে প্রভু মিশ্র যাদব নন্দনে! নিয়োযিত করিলেন প্রভুর সেবনে"—বংশীশিক্ষা। এখানে বংশীশিক্ষার লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভু বংশীবদন (অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নির্দ্দেশে) যাদব নন্দনকে গৌরাঙ্গ প্রভুর বিগ্রহের সেবাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন (৮)। চৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়াছেন—

"নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।
সপুত্রায় সভৃত্যায় সকলত্রায়তে নমঃ॥"

অর্থাৎ—হে ত্রিকাল সত্য জগন্নাথ (মিশ্র) সুত, (আমি) তোমার ভৃত্য, অর্থাৎ ভক্ত, সেবক ও শিষ্যবর্গ এবং পুত্র, অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পালিত ও পুত্রস্থানীয় মাধবাচার্য্য ও কলত্র অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সহ তোমাকে প্রণাম করিতেছি। (৯)

---

(৮) "নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ বিগ্রহ" প্রবন্ধে অতঃপর এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

(৯) প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নিজ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার একটী বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মৃত শিশু (?) পুত্র সকলত্রায়' পদটী একত্রে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। 'সকল' বলিয়া পরে 'ত্রায়' বলিতেছে। এজন্য প্রভুপাদের মতে সকলত্রায় শব্দের সঙ্গত অর্থ হইতেছে—যে সকলকে ত্রাণ করে.! দেখিতেছি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গোস্বামী মহাশয়ের কুণ্ঠা আসিয়াছে! আমরা কঠোর সমালোচনা করিতে বিরত

ঐ শ্লোকটী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও দেখিতে পাই। [সুধীরা সখীতত্ত্ব] (১০)।

মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর নিজ শাখান্তর্গত—"ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন" —চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা।

এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের উদ্ধৃত বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল (১১)। বহু পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে আমরাই এই বংশের কথা তুলিলাম। সপুত্রায় ও সভৃত্যায় পদ দুইটীর সঙ্গে সকলত্রায় পদটী আছে। এজন্য সব পদগুলিরই এক রকম অর্থ হইবে। পুত্রের সহিত, ভৃত্যের সহিত ও কলত্রের (স্ত্রীর) সহিত —এইরূপ অর্থই হইবে। মহাপ্রভুঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ মহিমায় সকল বৈষ্ণব গ্রন্থেই পূজিতা। শুধু চৈতন্যচরিতামৃতের এই শ্লোক দ্বারা নহেন।

(১০) প্রভুপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার "বৈষ্ণবাচার দর্পনের" ৫ম বিভব—৩৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"সুধীরা যে সখী মাধবাচার্য্য এবে।
সনাতন মিশ্র পুত্র মাধব জানিবে॥
নবদ্বীপে বাস বিষ্ণুপ্রিয়া শাখা জানি।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী যাঁহার ভগিনী॥"

এখানে যাদবাচার্য্য না লিখিয়া ভুলবশতঃ মাধবাচার্য্য লেখা হইয়াছে।

(১১) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয় পত্রিকায় ৮ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় ঠাকুরদাস দাস মহাশয় একটী মহাপ্রভুর শাখার সংবাদ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— 'চান্দরা ও যশোদকের গোস্বামীগণ নিজেদের মহাপ্রভুর শাখা বলিয়া দাবী করেন।" তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "পরাশর-কালিদাসের পুত্র মাধবী-মাধবের বংশ নাই।" তাহা আমরাও স্বীকার করি। লেখক বলিয়াছেন "এই গোস্বামীগণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।" কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু এবং সনাতন মিশ্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। লেখক বৈষ্ণবাচার দর্পনের "সুধীরা যে সখী"—ইত্যাদি শ্লোকটী প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও যে ভ্রমপূর্ণ ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ঐ মাধবী-মাধব আবার অদ্বৈত্য শিষ্য ছিলেন। এই সব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে চান্দরা

ছাপার অক্ষরে সাধারণের নিকট উপস্থিত করি। অধুনা-লুপ্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়া পত্রিকায় ১৩৩০।৩১ সালে তাহা প্রকাশ হয়। আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন অংশের প্রতিবাদ হয় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি যাঁহাদের পড়া নাই, তাঁহাদের কাছে এই লেখার কোথাও কোথাও অস্পষ্ট হইবে। অল্প পরিসরে জটীল বিষয়ের মীমাংসা করা শক্ত।

মাধবাচার্য্যের পঞ্চ পুত্র।

মাধবাচার্য্য পণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র হয়। তাঁহারাও পণ্ডিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস ন্যায়বাগীশ, ২য় বাণীকণ্ঠ, ৩য় জগদীশ তর্কালঙ্কার, ৪র্থ রামচন্দ্র ও পঞ্চম লক্ষ্মণ।

ইঁহাদের মধ্যে জগদীশের পাণ্ডিত্যগৌরব অসাধারণ ছিল। জগদীশের লেখা "কাব্য প্রকাশের" টীকা, ন্যায়লঙ্কার উপাধিক তাঁহারই একটী ছাত্র নিজের অধ্যাপনার জন্য লিখিয়া লয়েন। তাহাতে জগদীশের নিজের লেখা একটী আত্মজীবনী সন্নিবিষ্ট ছিল। আমরা তাহার সাহায্যে অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" নামক জগদীশের আর একখানি মূল গ্রন্থ জয়চন্দ্র শর্ম্মা নামক একজন পণ্ডিত কাশী হইতে ছাপাইয়াছেন। তাহাতে তিনি জগদীশের স্বলিখিত ঐ জীবনীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। চলিত প্রথামত তাহাতে জয়চন্দ্র দুই চারি কথার একটী মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ মুখবন্ধে জগদীশের পিতার নাম যাদব লিখিয়া নিজের অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জগদীশের পিতার নাম যে মাধব বিদ্যা-বাগীশ ছিল তাহা নবদ্বীপের প্রাচীন লোকদের অজ্ঞাত নাই। আমরা যে সব কুলজীপত্র পাইয়াছি তাহাতেও ঐরূপ বলে সে কারণ আমরা জয়চন্দ্র কৃত মুখবন্ধে যাদবের স্থানে মাধব—এই পাঠ গ্রহণ করিব (১২)।

জগদীশ যে আত্মজীবনের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—"তাঁহার পিতা মাধব বিদ্যাবাগীশের পাঁচটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। জগদীশ পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃ-হারা হয়েন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীদাসের উপর সংসারের ভার পড়ে। সে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেববিগ্রহ সেবার অতি অল্প যে আয় ছিল, তাহাতে অতিশয় দুঃখে দিন যাপন হইত। বাল্যে জগদীশ বিশেষ অশান্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আরও দুষ্ট হইয়া পড়েন, বড় ভ্রাতার শাসনে কোন ফল হয় না। একদিন একটী তাল গাছের উপরে পাখীর ছানা ধরিতে উঠেন। তিনি পাখীর বাসায় হাত ভরিয়া দিয়া একটী বিষধর সাপ টানিয়া বাহির করেন। সাপ দেখিয়া কিছুমাত্র ভয় না হওয়ায় তিনি তালবৃন্তে ঐ সাপের মাথাটা ঘসিতে থাকেন। মাথাটা দুই খণ্ড হইয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দেন। ঐ ঘটনার পর তাহার প্রতি বিধি প্রসন্ন হয়েন। এই নির্ভিকতা লক্ষ্য করিয়া একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তে শিলাময়ী ঈশ্বরীকে প্রদান করেন (১৩)। তিনি তখন ১৮ বৎসরের যুবক। সেই সময়ে তিনি মিশ্রবংশে শ্রীমাধবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশাৎ পিতুঃ সমজনি, যতো দৃশ্যতে জগদীশকৃত কাব্য প্রকাশ টীকায়াং কাব্যপ্রকাশরহস্য নাম জীবস্তন্যা কশ্চিচ্ছাত্রো ন্যায়লঙ্কারোপাধিকো লিলিখ। তদন্তে লিপি সমাপ্তৌ শ্লোকমেক মালিখৎ যথা—শকে রন্ধ্রাদ্রিবান ক্ষিতি পরিগণিতে মাঘ মাসে নবম্যাং পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ যুগ্ম লগ্নে। ন্যায়া-লঙ্কার ধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তকমেতৎ সমস্তং স্বীয়ং সৌধাঙ্গণস্থো ব্যালিখদ নলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥

বা যশোদলের গোস্বামীগণ কখনই মহাপ্রভু শাখা (বিষ্ণু-প্রিয়া শাখা) বলিয়া দাবী করিতে পারেন না।

(১২) ঐ ভুল সংশোধন করিয়া নিম্নে উক্ত মুখবন্ধটীর অংশবিশেষ উল্লেখ করিলাম—

৺জগদীশ তর্কালঙ্কারস্য সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তং।

প্রায়স্ত্রিশত বর্ষাদূর্দ্ধং নবদ্বীপ নগর্য্যাং জগদীশো মৈথিল

(১৩) এই দেবীর নাম এক্ষণে পোড়া মা। ইঁহাকে নবদ্বীপেশ্বরী বলা হয়। ইনিই নবদ্বীপের প্রধানা গ্রাম্য দেবী। জগদীশ এই দেবীকে উপলক্ষ করিয়া সরস্বতীর অপার কৃপা লাভ করেন বলিয়া নবদ্বীপের টোলের পড়ুয়াগণ এই দেবীকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহা তন্ত্রোক্ত যন্ত্র অঙ্কিত একখানি প্রস্তর ফলক, তাহার উপর ঘটস্থাপন করিয়া পূজা হয়। দেবীর মন্দির (পর্ণকুটীর) এক সময়ে পুড়িয়া যায়। সেই হইতে পোড়া মা নাম হয়। পণ্ডিতগণ এক্ষণে তাঁহাকে বিদগ্ধ বা বিবুধ জননী বলেন।

বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। শিলাময়ী দেবীর কৃপায় কাব্য ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে প্রবেশ করেন। (উপেক্ষা-ভরে) সহপাঠীগণ (প্রথমে) তাঁহাকে 'জগা' বলিত, পরে 'জগু' বলিয়া ডাকিত।"

অধ্যয়ন শেষে তিনি দেখেন যে প্রচলিত দীধিতির টীকায় নানা প্রকার অযৌক্তিক বিষয় আছে। এজন্য তিনি ঐ টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি অন্য কোন গ্রন্থই যদি রচনা না করিতেন তবে ন্যায়ের অনুমান খণ্ডে কেবল এই জগদীশী টীকা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত। কিন্তু তিনি একের পর এক অলঙ্কার ও ন্যায় শাস্ত্রের বহু টীকা এবং অতীব দুরূহ 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। পরে স্বাধীনভাবে 'তর্কামৃত' ও 'শব্দশক্তি প্রবেশিকা' নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ মূল গ্রন্থসকল প্রণয়ন করেন। ১৮শ বর্ষে পাঠারম্ভ করিয়া এই সমস্ত কূটতর্কপূর্ণ গ্রন্থের টীকা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। তিনি যে বিশেষ দীর্ঘায়ু ছিলেন ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণ হয়।

জগদীশের ছাত্র ন্যায়লঙ্কার ১৫৭৩ শকাব্দায় (শাকে বহ্ন্যদ্রিবাণ ক্ষিতি পরিগণিতে) 'কাব্য প্রকাশ রহস্য' প্রতিলিপি করেন। তখন জগদীশ জীবিত ছিলেন। মহাপ্রভুর জন্ম ১৪০৭ শকে। সুতরাং মহাপ্রভুর জন্মের ১৬৬ বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ লেখা হয়। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা মাধবাচার্য্য ও তাঁহার পাঁচপুত্রের জন্মকাল অনুমান করিতে পারি। এবং পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির প্রণয়ন কালও অনুমান করা যাইতে পারে।

গৌরপদতরঙ্গিনী নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন মাধবাচার্য্যের বয়স ৯ বৎসর ছিল। অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার ভ্রাতার অপেক্ষা ৩ বৎসরের বড় ছিলেন। আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, ২৪ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ও সন্ন্যাসের ৩ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।

একারণ—[১] বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম (মহাপ্রভুর জন্মের ৯ বৎসর পরে) ১৪১৬ শকাব্দায়। [২] যাদবাচার্য্যের জন্ম (বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মের ৩ বৎসর পরে) ১৪১৯ শকাব্দায়। [৩] মাধবাচার্য্যের জন্ম (যাদবের ২৬ বৎসর বয়সে হইলে) ১৪৪৫ শকে। [৪] তাঁহার ১ম পুত্র ষষ্ঠীদাসের জন্ম (মাধবের ২৬ বৎসর বয়সে হইলে) ১৪৭১ শকে। [৫] ২য় পুত্র বাণীকণ্ঠের জন্ম (আরও ২ বৎসর পরে হইলে) ১৪৭৩ শকে। [৬] ৩য় পুত্র জগদীশের জন্ম (আরও ২ বৎসর পরে হইলে) ১৪৭৫ শকে। [৭] ৪র্থ পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম (আরও ২ বৎসর পরে হইলে) ১৪৭৭ শকে। [৮] ৫ম পুত্র লক্ষ্মণের জন্ম (ঐরূপ ২ বৎসর পরে হইলে) ১৪৭৯ শকে।

আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে ১৮ বৎসরে যাঁহার বর্ণজ্ঞান হয় তাঁহার পক্ষে কাব্যব্যাকরণন্যায়শাস্ত্র শেষ করিতে ২৬।২৭ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং জগদীশ সম্ভবতঃ ১৫৫০ শকে কাব্যপ্রকাশের টীকা লেখেন। তাহারও ৪০ বৎসর পরে জগদীশের ছাত্র ন্যায়লঙ্কার কাব্য-প্রকাশ রহস্য লেখেন ধরিয়া লইতেছি। সুতরাং উহা ১৫৭৩ শকে (১৬৫১ খৃঃ) লেখা হইয়াছে অনুমান করা যাইতেছে।

জগদীশের আত্মচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে—"শ্রীচৈতন্যদেব বিগ্রহ সেবয়োপার্জ্জিতেনার্থেন দুঃখ দুঃখেন দিনং নয়ৎ।" অর্থাৎ মহাপ্রভু বিগ্রহ সেবায় তাঁহাদের আয় অতি সামান্য ছিল এবং অতি কষ্টে তাহার দ্বারা সংসার চলিত। আমরা আরও জানি যে নবদ্বীপের রাজা ও সমাজপতি কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এবং নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ শাক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ-রাজ অনুমোদন ও কৃপা না করিলে তখন কোনও পণ্ডিতই প্রাধান্যপদ বা রাজবৃত্তি অথবা ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি পাইতেন না। এখন যদিও গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি দিয়া প্রধান পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণনগরাধিপের আনুকূল্য থাকে। অন্ততঃ প্রতিকূল হইলে তাঁহার নিয়োগ সম্ভব হয় না ইহা পণ্ডিতগণ জানেন। জগদীশ এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ তখন নিজেদের অবস্থা অনুভব করিয়া বৈষ্ণবাচার পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের পাঁচ ভ্রাতার সংসার মহা-প্রভু বিগ্রহ সেবার দ্বারা চলে না দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাসকে

সেবার ভার দিয়া বাণীকণ্ঠ, জগদীশ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পঠন-পাঠনে প্রবৃত্ত হয়েন। পণ্ডিত সমাজের আগের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরেরা শাক্ত সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে বাণীকণ্ঠ সার্ব্বভৌমের বংশ নাই। মহামহোপাধ্যায় জগদীশ্বর তর্কালঙ্কারের বংশধর ৺দ্বারিকানাথ শিরোরত্ন প্রভৃতি ও রামচন্দ্র সার্ব্বভৌমের বংশধর শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সিদ্ধান্ত বি-এ প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী। লক্ষ্মণচন্দ্র বাচস্পতির বংশধর ৺দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতি নবদ্বীপের নিকটে পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহারা সকলেই ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন। কেবল ষষ্ঠীদাসের সন্তানগণ বৈষ্ণবাচারী থাকিয়া গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন।

ষষ্ঠীদাসের সন্তানগণ।

ষষ্ঠীদাসের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামদেব গোস্বামী ও কনিষ্ঠ মহাদেব গোস্বামী। প্রচলিত প্রথামত রামদেব দশ আনা ও মহাদেব ছয় আনা সেবার স্বত্ব পাইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ রামদেবের চারি পুত্র ও এক কন্যা হয়। তাঁহার দশ আনার সেবা পুত্রকন্যাদের মধ্যে দুই আনা হিসাবে বণ্টন হয়।

কনিষ্ঠ মহাদেবের তিন পুত্রের মধ্যেও তাঁহার ছয় আনা অংশ দুই আনা হিসাবে বণ্টন হয়।

এইরূপে শাখা পল্লবিত হইয়া এক্ষণে ষষ্ঠীদাসের সন্তানগণ ৯১ ঘরে বিভক্ত ও তাঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভু বিগ্রহের সেবা ৬৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব সমাজে বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের উচ্চ স্থান থাকা উচিৎ। তাঁহারা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজের তাচ্ছিল্য সহ্য করিয়া এতদিন মাত্র এই বিগ্রহ সেবাটী অবলম্বন করিয়া আছেন। সমাজপতির ভ্রূকুটি, দারুণ অভাবের লাঞ্ছনা—কিছুতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইঁহারা এ পর্য্যন্ত বিগ্রহের ভোগরাগাদি স্বহস্তে প্রদান করিয়া থাকেন। প্রায় সর্ব্বত্র যেমন যে-কোনও ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা-কার্য্য হয় এখানে সে ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের সেবার নিষ্ঠা প্রশংসাযোগ্য।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যদুবংশীয়গণকে বলিয়াছিলেন—

"তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথ প্রজল্প শয্যাসনাশন স যৌন
সপিণ্ডবন্ধঃ,
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্ম নিবর্ত্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ,
স্বয়মাস বিষ্ণুঃ।"
—ভাগবত ১০।৮২।৩১॥

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাদের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে, বিবাহাদি সম্বন্ধে অতি আপনার, এজন্য তোমাদের সৌভাগ্যের সম্যক পরিচয় দিতে আমাদের শক্তি নাই। আমরাও এই বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার গোস্বামীগণকে সেই চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় বলিতে পারি—হে গৌরসেবকগণ, তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে স্বয়ং গৌরাঙ্গ তোমাদের পরমাত্মীয় ছিলেন।*

শ্রীজনরঞ্জন রায়

কেদার মাষ্টার

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্কুলে একটা ভেকেন্সি ছিল; সেক্রেটারী একটি গ্রাজুয়েট ভদ্রলোককে কোথা হইতে খুব অল্প টাকায় ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ভদ্রলোকের বেশভুষা দেখিয়াই বেশ বুঝিলাম, পাকা স্কুল মাষ্টার না হইয়া যায় না,—বোতামের ঘর ঠিক নাই, চুল কদম ছাঁট, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

হোষ্টেলে কয়েকদিন এক সঙ্গে বাস করিয়া বুঝিলাম ভদ্রলোকের মনটাও স্কুল-মাষ্টার-মাফিক—ঘোর সেন্টিমেণ্টাল. কোন কথাই মনে থাকে না, চশমা হাতে করিয়া ঘরময় চশমা খুঁজিয়া বেড়ান, ক্লাস-বিভ্রম করিয়া অন্যের ক্লাসে ঢুকিয়া পড়েন, নমস্কার করিলে প্রতি নমস্কার করিতে ভুলিয়া যান—এমনি তাঁর স্বভাব।

নাম কেদারবাবু।

একদিন টিচার্স রুমে বসিয়া আলাপ হইতেছিল—বাড়ীতে কে কে আছেন, পূর্ব্বে কোথায় কি চাকুরী করিতেন প্রভৃতি।

কেদারবাবু বলিলেন,—বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা, এবং একটি বিধবা ভগিনী আছে, হাঁা গোপালবাবু, আপনি ত স্কুল, হোষ্টেল সব-কিছুরই হিসেব রাখেন, আমার একটা হিসেব রাখবেন ?

গোপালবাবু জবাব দিলেন, বলুন, আমি কি করতে পারি।

কেদারবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, বাড়ীতে টাকা পাঠান আর আমার হ'য়ে ওঠে না; মাইনে যে দিন দেবেন অর্দ্ধেক মাকে মনি-অর্ডার করে দেবেন, বাকিটা আমাকে দেবেন, ফুরিয়ে গেল, আমার আর ভাবনার কিছু রইল না।

তিনি অবিবাহিত। কাজেই খুব সহজেই নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

কথাবার্ত্তায় জানা গেল,—পূর্ব্বেও তিনি করিতেন, একস্থানে সেক্রেটারীর সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় চাকুরী যায়, অন্যত্র হেড মাষ্টারের অর্ডার মত কাজ না করায় চাকুরী যায়, তার পরে এখানে আসিয়াছেন।

এমন লোকের চাকুরী থাকাটাই আশ্চর্য্য !

অবশেষে তিনি বলিলেন,—দিবারাত্রি সেই এ স্কয়ার, মাইনাস বি স্কয়ার আর মোগল বাদশাহের নামের তালিকা, এর মধ্যে মেজাজ ঠিক রাখাই ত বিপদ।

কিছুদিন চলিয়া গেল।

বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে না, মাঝে মাঝে কেদারবাবু অন্যের কাপড় পরিয়া ফেলেন, জলন্ত বিড়ি বিছানায় রাখিয়া তোষোক পুড়াইয়া ফেলেন এইমাত্র। আমরা তাঁহার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে মাঝে মাঝে ঔষধ প্রস্তাব করি—ক্যাদার বাবু একটা পাত্রী দেখি, নইলে এ সারবে না

কেদারবাবু হাসিয়া বলেন,—তার আগে মাইনেটা বাড়ান যায় না ?

সেদিন সমস্ত টিফিন পিরিয়েড পড়াইয়া যখন আফিসে ঢুকিলেন তখন হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—কেদারবাবু, আপনাকে একটা কথা না বলে আর পাচ্ছিনে। প্রত্যেক ঘণ্টার পরে যদি ১০ মিনিট ১৫ মিনিট করে নেন, তবে অন্য সকলে পড়ান কি ক'রে ?

—আজ্ঞে ঘণ্টা শুনতে পাইনে, একটু জোর ঘণ্টা দিতে ব'লবেন।

—আপনার কানের কাছে ঘণ্টা দিলেও শুনতে পান না যে! আপনার ক্লাসে সেদিন গিয়েছিলুম, ছেলেরা ত সব হোম-টাস্কই আনে না, একটু কড়াকড়ি না ক'রলে যে ওরা গোল্লায় যাবে।

—মারতে বলেন ?

—না মারলে কি লেখাপড়া হয় ?

—আজ্ঞে যাদের হয় তাদের কিছু বলতে হবে না, যাদের কিছু হবে না তাদের জন্যে শুধু শুধু কষ্ট করে কি হবে ?

—মারের কাছে সব জব্দ মশায়।

—ওরা সুকুমার বালক, মারামারি করাটা আমাদের পছন্দ হয় না, ওদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ওদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই এতক্ষণ বলছিলুম, ওরা বেশ বুঝতে পেরেছে, ওরা আর পড়াশুনো অবহেলা ক'রবে না।

—ওসব বক্তৃতার কথা রেখে দিন মশায়, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। যা বলছি তাই করুন।

—মারতে হবে ?

—হ্যাঁ—কিল চড় কাণমলা।

—ফাইন ক'রলেও ত হয়।

—ফাইন ত গার্জিয়ানদের করা হয়, তাতে ওদের কি ?

—ওটা সমীচীন বলে মনে হয় না।

—দেখুন, আমি ১৮ বছর মাষ্টারী করছি, পড়া কিক'রে আদায় করতে হয় তা ভাল করেই জানা আছে, আমাকে ও সম্বন্ধে উপদেশ না দিলে সুখী হব।

কেদার বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। হোষ্টেলের ঘরে দেখা হইলে বলিলেন,—দেখুন, দেখুন মশায়, এই জন্যেইত একবার চাকুরী গিয়েছে।

ফোর্থ পিরিয়েডে, তার ক্লাসের পাশেই ক্লাস লইতেছিলাম, হঠাৎ দেখি কেদারবাবু দারুণ বিক্রমে ও-ক্লাসের কোন বালককে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বলিতেছেন—ভেবেছ ফাঁকি দেবে ? আর ফাঁকি দেবে ?

অস্পষ্ট ক্রন্দনমিশ্রিত স্বরে বালকটি বলিল,—না, না স্যর।

ঘণ্টা শেষ হইলে আরক্ত চোখে হেডমাষ্টারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—ভয়ঙ্কর মাথা ধ'রেছে, আজ আর ক্লাস নিতে পারবোনা। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

শেষঘণ্টা লিজার ছিল, ঘরে ঢুকিতেই দেখি, কেদার বাবু বিমর্ষভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবছেন ?

—দেখুন, ওই শিশু, ওরা কি বোঝে! ওদের মারলে আমি যে ওদের চেয়ে বেশী কষ্ট পাই! কেন মারলুম ? আচ্ছা মারটা কি খুব বেশী হয়েছে ? মাষ্টারী আর জল্লাদগিরি কি এক ?

বালকের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ দুটি ছল ছল ক'রিয়া উঠিল। তিনি যে মনে মনে ওই কথাই ভাবিতেছিলেন স্পষ্ট বুঝিলাম। কিছু বলিতে সাহস হইল না, বেদনা হয়ত সহানুভূতিতে আরও তীব্র হইয়া উঠিবে!

ছুটির ঘণ্টা পড়িল—

কেদারবাবু তাড়াতাড়ি বাহিব হইয়া কাহাকে সেই বালকটিকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সে ত আরও কিছু হইবে মনে করিয়া কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হইল। কেদার বাবু শুধাইলেন, হাঁরে তারা, তোর খুব লেগেছে ?

—না স্যর, তেমন লাগে নি।

—কেন তোরা পড়া করিস্ নে! দেখলি ত, কত কষ্ট পেয়েছিস্! লেখা পড়া না শিখলে—

নীরব তারা কোন উত্তর দিল না।

—কাল ছুটির পরে দেখা করিস্। আচ্ছা যা—

তারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কেদারবাবু বলিলেন, দেখেছেন মশায়, কেমন মুখখানা শুকিয়ে গেছে!

আমি বলিলাম,—কিছু না, বাড়ী গিয়ে পেয়ারা গাছে উঠ্‌তে যা দেরী, সব ভুলে যাবে।

—মানুষের মন অত সহজে সব জিনিষ ভোলে না।

দুএকদিন পরের কথা।

কেদার বাবু তারাকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ তারা, এই যে কলমদানি, এটা নিবি ?

কাঁচের সুন্দর একটী কলমদানি—মূল্য একটাকা দেড় টাকা হইবে।

তারা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ।

—তোকে মেরেছিলাম বলে এটা দিচ্ছিনে বুঝলি, প্রত্যেকদিন পড়তে বসে ওটা দেখলেই তোর মনে পড়বে যে পড়া না ক'রলে মার খেতে হয়। শাস্তিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে—তোর পড়া রোজ হবে ?

—হুঁ স্যার, রোজ পড়া তৈরী ক'রবো।

—যা, এটা নিয়ে যা।

তারা কলমদানি সহ মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি সেদিন ওই ক্লাসে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম,—কেদার বাবুর পড়াটা সব ক'রে নিয়ে আসবি, নইলে, জানিস তো উনি ভয়ানক রেগে যান।

একজন বলিল,—তিনটা বেত খেয়ে যদি অমন সুন্দর কলমদানি পাওয়া যায়, তবে আর পড়া কচ্ছিনি স্যর।

কেদারবাবু মাহিয়ানা পাইয়াছেন।

গোপালবাবুর কৃপায় অর্দ্ধেক বাড়ী গিয়াছে, বাকীটা ভাঙাইয়া কেদারবাবু বিছানার নীচে পাতাইয়া রাখিয়াছেন। যখন যাহা প্রয়োজন সেখান থেকে লইয়াই খরচ করেন—যেদিন দেখিবেন বিছানার নীচে কিছুই নাই সেই দিন বুঝিবেন যে তাঁহার হাতে কিছু নাই—জমা খরচের খুব ভাল পন্থা!

কেদারবাবু টিফিনে আসিয়া বলিলেন, এবার আর চাকুরী যাবে না, কি রকম ষ্ট্রীক্ট হ'য়েছি দেখেছেন? আজ ক্লাস নাইনের পাঁচটাকে চার আনা করে ফাইন করেছি। হাঃ হাঃ হাঃ কেমন ডিপ্লোমেসি। নিজে হাতে মারও দিতে হল না, বাড়ী যেয়ে খুব হবে।

আমরা হাসিলাম,—কোন যুক্তিই খাটিবে না।

মাহিয়ানা দিবার সময় হইলে ওই পাঁচজন একদা আসিয়া উপস্থিত। কেদারবাবু বলিলেন,—কিরে, সব কি জন্যে!

—স্যার, আপনি ফাইন করেছিলেন—

—সেটা খুব ভাল কাজই করেছি।

—স্যর, বাড়ীতে বললে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, কদিন জল খাবারের পয়সা জমিয়ে দু আনা হ'য়েছে। স্যর, এবারের মত মাপ করুন।

—ওরে হতভাগারা, বিকেলে তোরা খাসনি? স্বাস্থ্য খারাপ হ'বে যে! অমন কি ক'রতে আছে?

—তবে ফাইন দেব কি ক'রে? মাপ করুন স্যর।

—বলা কথা, চলে-যাওয়া সময় এ আর ফেরানো যায় না, মাপ কি ক'রে করি! তোদের দোষের জন্যে তোদের অনুতাপ হ'চ্ছে?

—হ্যাঁ স্যর, আর কখনও করবো না।

—তবে যা, এই নে চার আনা ক'রে। আর বিকেলে খাবার পয়সা আছে ত?

—না স্যর, বাড়ীতে জমিয়েছি।

—তবে নিয়ে যা এই চার আনা পাঁচ জনে অল্প অল্প করে খেয়ে নিবি।

বালকগণ হৃষ্টমনে চলিয়া গেল।

কেদারবাবু গর্ব্বিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—দেখলেন মশায়, অনুতাপই সব চেয়ে বড় শাস্তি। মারলে ত মরিয়া হ'য়ে উঠে, এই ওদের শাস্তি!

কেদারবাবুর কথার কি জবাব দিব! হাসিলে বেদনা পাইবেন। ওঁর বালকসুলভ অন্তরের কথা ভাবিয়া করুণা হইতেছিল!

কেদারবাবু শনিবারে কলিকাতা যাইবেন।

হোষ্টেলে প্রায় তিরিশ জন ছাত্র থাকিত; এমন কি নয় দশ বছরের কয়েকজন ছেলেও ছিল। কেদারবাবু চাদর প্রভৃতি লইয়া যখন রওনা হইবেন, একজন আসিয়া বলিল,—স্যর, কোথায় যাবেন?

—ক'লকাতা।

—লজেন আনবেন স্যর?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আনবো।

সোমবারে কেদারবাবু ১ পাউণ্ড লজেন্স লইয়া ফিরিলেন। ছাত্রমহলে বিতরণ করিতেই তাহারা মহোল্লাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। তাহারাও কেদারবাবুকে চিনিয়াছিল, যাহার যত আব্দার তাঁহারই নিকটে—স্যর একটা লাল কলম দেবেন? স্যর একটা কলার-বক্স দেবেন? মাস পড়িতে না পড়িতেই কেদার বাবুর শয্যার নীচেটা খালি হইয়া যায়—মাসের শেষে বিড়ি কিনিবারও পয়সা থাকে না। কেদারবাবুর মহা উল্লাস,—দেখেছেন মশায়, ওইশ্যামল কেমন ছবি এঁকেছে, মানুষের মধ্যে অমনি গুণ সব লুক্কায়িত থাকে। সময় পেলেই তা বেরিয়ে পড়ে—ও-পয়সা ব্যয় আমার সার্থক!

একথার জবাব নাই, আমরা চুপ করিয়া থাকি, অলক্ষ্যে হাসি।

সেদিন কেদারবাবু বলিলেন,—এবার টাকাটা আর বাড়ী পাঠাবেন না, শ্যামল একটী গল্পের বই চেয়েছে, তরুণ একখানা ব্যাডমিণ্টন ব্যাট চেয়েছে—

গোপাল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—বলা কথা, চলে-যাওয়া সময় এ ফেরানো যায় না, আর আপনার মাও ত টাকা চেয়েছেন। টাকা দিতে পারবো না—একবার বলেছেন অথচ—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে থাক্।

কিন্তু তিনি বিমর্ষ হইলেন। অসাক্ষাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আমার উপার্জ্জিত টাকা আমি যথেচ্ছ খরচ করতে পারিনে?

আমি বললাম—না।

কথাটা যেন তাঁহার পছন্দ হইল না।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে। ঘরে মশার জ্বালায় থাকা যায় না। রাত্রে খাবার পরে সেই কথাই আলোচনা করিতেছিলাম,—এবার হোষ্টেলে অসুখ আরম্ভ হবে, ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা। এ মশার কামড়ে অন্ততঃ ম্যালেরিয়া না হইয়া যায় না।

হইলও তাহাই। তরুণ শ্যামল কয়েকজন দেখিতে দেখিতে শয্যা গ্রহণ করিল। কেদার বাবু প্রাণপণে শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমরা বলি, কেদার বাবু, রাত্রি জাগরণের কোন আবশ্যকতাই নেই,—ম্যালেরিয়া জ্বর, রাত্রি জেগে শুধু শুধু শরীর খারাপ করে কি লাভ?

—বলেন কি মশায়! অতটুকু-টুকু ছেলে, বাপ মাকে ছেড়ে আছে, জ্বরের ঘোরে মায়ের সেই কল্যাণ-স্নিগ্ধ হাত-খানির কথা মনে পড়ছে, কাছে কাছে থাকলে হয়ত একটু সান্ত্বনা পাবে—

—কাছে কাছে থাকেন তাতে ত আপত্তি নেই, তবে ওরা ঘুমোয় আপনি কেন শুধু শুধু জেগে বসে থাকেন?

—ধরুণ ওরা যদি একটু জল চায়!

জানিতাম তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যাইবে না, বৃথা তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রাত্রি দশটায় খাইতে যাইবার সময় ডাকিতে যাইয়া দেখি তিনি সাইকেল নিয়া কোন দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।—কোথায় যাবেন এত রাত্রে?

—বরফ, বরফ চাই; শ্যামলের টেমপারেচার ১০৩° ডিগ্রি হয়েছে।

—জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দিলেই হবে, আর সে ত চার মাইল দূরে—দরকার নেই।

—বলেন কি, ওরা এমন কষ্ট পাবে আর চুপ করে বসে থাকবো? বরফ না হলে হয়! না জানি কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে, সুকুমার বালক-যন্ত্রণা প্রকাশও ত করতে জানে না।

দ্বিতীয় কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি সাইকেলে ব্যস্ততার সঙ্গে চাপিয়া বসিলেন। আমরা চাহিয়া থাকিয়া খাইতে গেলাম। গোপাল বাবু বলিলেন—অতিরিক্ত ব্যস্তবাগীশ। ম্যালেরিয়া জ্বর, এত ব্যস্ততার কি আছে?

হেড মাষ্টার মহাশয় সেদিন ডাকিয়া বলিলেন, দেখুন, কেদারবাবু ভাল লোক সন্দেহ নেই কিন্তু ছেলেরাত কিছুই করে না। হয়ত অথরিটি কবে বলবেন—দরকার নেই, ওঁকে আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করতে বলুন—নির্ঝঞ্ঝাটে গেলেই ভাল হয় না কি?

—কেন উনিত ভালই পড়ান।

—তা সত্যি, তবে পড়া আদায় করতে পারেন না। আদর দিয়ে বাঁদর ছেলেদের মাথায় তুলছেন।

সার মর্ম্ম যথেষ্ট ঘুরাইয়া কেদারবাবুকে জানাইলাম, বিমর্ষ ভাবে শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন,—আমার চাকুরী থাকে না কেন বলতে পারেন?

এদিক ওদিক দরখাস্ত করিতে লাগিলেন। তোষোকের তলাটা খালি, শেষে আমরাই ডাক টিকিট দিয়া সাহায্য করি। অবশেষে একদিন এক উত্তর আসিল, মাইনেও বেশী। কেদারবাবু বিমর্ষভাবে বলিলেন,—কি করি বলুন ত?

—দেখুন, জগতে কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, ভাল চান্স্ যখন পেয়েছেন তখন কেন ছাড়বেন? আর এখানেও ত তেমন সুবিধে কিছু নেই। জীবনে উন্নতি করাই মানুষের ধর্ম্ম।

কেদারবাবু রাজি হইয়া পত্র দিলেন, নিয়োগপত্রও আসিল। স্কুলে রেজিগ্‌নেশনও দিয়া দিলেন।

হেডমাষ্টার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,— বেশ! বেশ! আপনার উন্নতি হোক্ এই আমরা চাই।

বিদায়ের দিন সমাগত হইল।

কেদারবাবু সেদিন ছেলেদের জন্যে এক পাউণ্ড লজেন্স আনিয়া, সেখানে গল্প করিতেছেন; কথাগুলি কানে ভাসিয়া আসিল—হ্যাঁরে শ্যামল আমি ত চলে যাচ্ছি, তোদের কষ্ট হবে?

হ্যাঁ স্যর, কেন যাবেন?

আর একজন বলিল,—আমরা লজেন্‌স কোথায় পাব স্যর?

কেদারবাবু মনে মনে আবৃত্তি করিলেন,—জগতে কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, জীবনের উন্নতিই মানুষের ধর্ম্ম।

—আপনি যাবেন না স্যর!

কেদারবাবু বিমর্ষভাবে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরা বলিবার কিছু নাই বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলাম।

আজ সকালে কেদার বাবু যাইবেন। অদূরের বট গাছের মাথায় তখন প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি ঝিক্-মিক করিতেছে।

ছেলেরা বারান্দার নীচে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কেদার বাবুর যাওয়া দেখিতেছে। আমরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার সাফল্য কামনা করিলাম। কেদারবাবু সুটকেশ হাতে রওয়ানা হইলেন। ছল ছল চোখে শ্যামল তরুণ সকলে অপস্রিয়মান কেদারবাবুর দিকে চাহিয়া আছে—শ্যামল চোখের জল মুছিল।

কেদারবাবু বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া শ্যামলকে শুধাইলেন—হ্যাঁরে তুই কাঁদছিস্?

শ্যামল রুদ্ধস্বরে জবাব দিল,—কেন যাবেন স্যর?

—না, না আমি আর যাব না। আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,— নাই বা হ'ল জীবনে উন্নতি, কি হবে টাকা দিয়ে? এমন প্রভাতে, এদের কাঁদিয়ে আমি যেতে পারবো না।

কেদারবাবু সত্যই ফিরিয়া আসিলেন—কিশোর মন ওঁকে এমনি করিয়াই রাখিয়াছে!

কেদারবাবুর অনুরোধে তাঁহার চাকুরী স্থগিতের পত্র খানা বাতিল হইয়া যায় কিনা জানিবার জন্যে সেক্রেটারীর নিকটে উপস্থিত হইলাম।

বলিলাম—দেখুন, লোক হিসাবে বা পড়ান হিসেবে দোষ তাঁর এমন কিছু নেই যে—

সেক্রেটারী বলিলেন,— দেখুন, আমার উপর গুরু দায়িত্ব রয়েছে, ভাল লোক মাইনে করে রাখায় ত কোন সার্থকতা নেই, আমরা ভাল মাষ্টারই রাখতে চাই, যাঁর দাপটে ছেলেরা আপনিই পড়া ক'রে আসবে।

বিশেষ সুবিধা হইবে না বুঝিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কেদারবাবুকে বলিলাম—

বেঁচে থাক্‌তে যখন হবেই তখন আর কেন বৃথা এখানে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবেন?

—যেতেই তা হ'লে হবে!

এই ছোট্ট কথা কয়েকটির ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরটা স্বচ্ছ পদার্থের মত স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

জানিতাম—ওই কিশোর ছল ছল চোখের মমতাকে উপেক্ষা করিয়া কেদারবাবুর যাওয়া হইবে না। তাই গোপাল বাবুকে বলিলাম—কাল ওঁর যাবার সময় আপনি ছেলেদের বেরুতে দেবেন না।

সেদিন সকালেও তেমনি রৌদ্র উঠিয়াছে; শিশিরের বিন্দু তেমনিই ঝলমল করিতেছে। গোপনে চোরের মত কেদারবাবুকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বট তলায় হটাৎ থামিয়া কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কই ছেলেরাত আমার যাওয়া দেখলে না!

—তারা পড়া শুনা করছে।

—হ্যাঁ পড়ুক, ডিস্টার্ব করাটা ঠিক নয়।

আবার চলিলাম। বাস ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করিবার সময় তিনি বলিলেন,—দেখবেন ওরা আমার জন্যে যেন দুঃখ না করে—মানুষ এমনি আসে এমনি যায়।

বাস আসিয়া কেদারবাবু সহ চলিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম ধীরে ধীরে সেটা রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। ওখানে কি ওঁর চাকুরী থাকিবে!

ফিরিবার কালে মনটা আপনি ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল—ওঁর আশ্রয়হীন মনটা এ জগতে হয়ত আজ একটা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরে। আর সেই মনটাই ওঁর সবচেয়ে বড় শত্রু!

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাঁচি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চৌদ্দ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে রাঁচি রওনা হলুম। বড় দিনের ছুটিতে এই সম্মেলনের বৈঠক বসে—তখন পশ্চিমে দুরন্ত শীত। তার পর রাঁচি যাওয়ার নানা পথ আছে কিন্তু কোন পথই সুগম

লেখক—শ্রীঅবনীনাথ রায়

নয়। সোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক হ'য়ে, হাজারিবাগ হ'য়ে, গয়া হ'য়ে, টৌরি হ'য়ে—সব পথেই গাড়ী বদল করার প্রয়োজন হয়। শীতের রাত্রে গাড়ী বদল একটা দুর্ব্বিপাকের সামিল। সুতরাং স্থির করলুম কলকাতা হ'য়ে যাওয়াই সুবিধা। ই. আই. আরের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কোন দিন ভি কম হয় কিনা জানি নে, আমি ত অন্ততঃ দেখি নি। ত পর এই সময় ত বড়দিনের ছুটির মর্স্থম, সুতরাং ভিড় হ আশাই করেছিলুম। গাজিয়াবাদে কোন গতিকে গাড়ী আশ্রয় নিলুম কিন্তু সেই দারুণ শীতে মনে হ'ল যে গাড়ী ভিড় থাকায় ভালই হয়েচে, নয় ত শীতে আরো কষ্ট পে হ'ত।

গাড়ীতে উঠতেই কলকণ্ঠে দিল্লীর এক বন্ধু অভ্যর্থ করলেন, আসুন, আসুন। মনে করলুম অদৃষ্ট সুপ্রস ভিড় যতই হোক, বন্ধু বান্ধবের ভিড় তবু সহ্য হবে। বল্লেন, তিনি কাশীধাম হ'য়ে রাঁচি যাবেন। কা জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলুম গত বছরের সম্মেল কার্য্যবিবরণ কাশীতে ছাপা হচ্চে, সেগুলি সশরীরে ভারি নিয়ে রাঁচি পৌছিতে হবে।

মোগলসরাই গিয়ে বন্ধু নেমে পড়লেন। তখন প্রা কাল। সূর্য্যোদয় হয়েচে। বন্ধু কেবলি নোট বুক দেখ লাগলেন, তিনি মোগলসরাই থেকে বেনারসের গা ধরতে পারবেন কিনা। মাত্র ৮ মাইল পথ। ট্রেণ ছা অন্য যান বাহনও পাওয়া যায়।

ভাবুয়া রোডে পৌছে হঠাৎ গাড়ী দাঁড়িয়ে গে সাম্‌নে কোন গাড়ী লাইনচ্যুত হয়েচে—লাইন ক্লিয়ার নেই সেখানে ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট দেরি হ'য়ে গেল। ভাবু রোডের প্ল্যাটফর্ম্মে বহু জাতির নরনারী পায়চারি ক' বেড়াতে লাগলেন। রেস্তোরাঁ কারের দিকে পুরুষ মহি অনেকে চায়ের জন্য ধাবিত হ'লেন।

কলকাতা পৌছুতে গাড়ী ঘণ্টা দেড়েক লেট হ'ল ড্রাইভার চেষ্টা ক'রেও তার বেশি সময় পুষিয়ে নিতে পার না।

দু' দিন কলকাতায় থেকে ২৭ ডিসেম্বর রাত্রি ৮।৪

মিনিটের রাঁচি এক্‌সপ্রেসে রাঁচি রওনা হলুম। তখন বি, এন, আর লাইনে ধর্ম্মঘট চলচে। সুতরাং ভয়ে ভয়েই ট্রেণে উঠ্‌লুম। অর্দ্ধেক পথ গিয়ে ফিরে না আস্‌তে হয়! অনেকগুলি ষ্টেশন দেখলুম অন্ধকার, জনশূন্য। প্রত্যেক ষ্টেশনেই নিয়মিত সময়ের চেয়ে দেরি হ'তে লাগলো। বোঝা গেল নতুন লোক দিয়ে তাদের অনভ্যস্ত কাজ কোন রীতিকে চালান হচ্ছে মাত্র।

টাটানগর যখন পৌছুলুম তখন শেষরাত্রি—শীতেরও প্রাবল্য, ঝিমুনিও আসচে। হঠাৎ আমার নাম ধ'রে ডেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রবোধকুমার সান্যাল এবং শ্রীযুত সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী সেই কামরায় উঠ্‌লেন। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁদের পেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল তা অনুরূপ অবস্থায় না পড়লে কেউ বুঝতে পারবেন না। শীতের কষ্ট, পথের ক্লান্তি যেন এক মুহূর্ত্তে সব দূর হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যাক্‌, রাঁচি আর যত দূরই হোক্‌, পথের কষ্ট আর আমাদের কাবু করতে পারবে না। বিশেষ প্রবোধ বাবু যা গল্পে লোক—তাঁর গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে সময় যে কোন দিক দিয়ে কেটে যাচ্চে তা' হুঁস্‌ রইল না। সে গল্পের পরিধির মধ্যে সাহিত্য আছে রাজনীতি আছে, ভ্রমণ কাহিনী আছে, হাসি আছে, ঠাট্টা আছে, বিদ্রূপ আছে—বিশেষ করে আমাদের ভাল লাগলো বাঘ শিকার করার সম্বন্ধে তাঁর মনোহারী গল্প—সে গল্প যে শুনতো তারই ভাল লাগতো জোর ক'রে বলতে পারি।

মুড়ি জংসন ষ্টেশনে পৌছুলুম তখন প্রাতঃকাল। তার আগেই সূর্য্যোদয় হয়েচে। ওখানে আরো তিন জন সম্মেলনের প্রতিনিধি রাঁচি যাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁদের নাম কানাই পাল, বলাই পাল এবং সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা তিন জনে কলকাতা থেকে সম্মেলনে যাচ্ছেন। মুড়ি জংসনে গাড়ী বদল ক'রে মিটার গেজের ছোট গাড়ীতে উঠ্‌তে হ'ল। এ গাড়ীগুলি ছোট এবং অপরিচ্ছন্ন, এর যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই ছোটনাগপুরের অধিবাসী কোল। আমরা সকলে গাদাগাদি ক'রে এক কামরায় ঢুকলুম। শিল্পশাখার পরিচালক শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন দেখা গেল।

মুড়ি জংসনের পর পথ অসমতল—ক্রমশঃ উঁচু হ'য়ে গেছে। সুতরাং ট্রেণ আস্তে চল্‌তে লাগ্‌লো। দু'ধারে লাল রঙের মাটি আর শালের বন। জোনা ষ্টেশনের আগে পথিমধ্যে আর একটি নাকি ষ্টেশন ছিল—দু-তিনবার সেখানকার ষ্টেশন মাষ্টারকে বাঘে নিয়ে যাওয়ায় সে ষ্টেশনটি তুলে দেওয়া হয়েছে শুনলুম

রাঁচি জিলা স্কুল—যেখানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বসিয়াছিল।

আমরা রাঁচি পৌছুলুম বেলা সাড়ে দশটায়—ট্রেণ দেড় ঘণ্টা লেট্‌। বেলা ১১টায় সম্মিলন সুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রতিনিধিগণ তখনো আসচেন দেখে সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা আরম্ভ হওয়ার সময় আরো এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিলেন।

সম্মেলন বস্‌বার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল রাঁচির জিলা স্কুল। জিলা স্কুল নাম হলেও এটি একটি সেকেণ্ড গ্রেড্‌ কলেজ—যদিচ এর প্রধান শিক্ষকের নাম অধ্যক্ষ না হ'য়ে

হয়েচে হেড্‌মাষ্টার। হেড্‌মাষ্টার একজন বাঙালী—আই, ই, এসের গ্রেডভুক্ত—ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় তিনি শিক্ষালাভ করেচেন। তিনি বেশ হাস্যরসিক লোক ব'লে মনে হ'ল।

কালীবাড়ী—রাঁচি

প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল জিলা স্কুলের । এই স্থানটি খুব মনোরম। হষ্টেলের সাম্‌নে সুন্দর ফুলের বাগান, তার সাম্‌নে রাস্তা, তার পরই খোলা মাঠ। হষ্টেলের পূর্ব্বদিকে রাঁচি লেক্—তার পরপারে রাঁচি হিল। জায়গাটির দৃশ্য খুব সুন্দর। শুনলুম রাঁচিতে মাছ খুব সুলভ নয়। কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় প্রতিনিধিদের জন্য প্রতিদিন ঐ রাঁচি লেকে থেকে মাছ ধরান হ'ত। মাছ সুস্বাদু।

সম্মেলন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। কেননা আনন্দবাজার পত্রিকার দৌলতে সে সম্বাদ এবং সভাপতি মহাশয়দের অভিভাষণ পুরোপুরি ভাবে জনসাধারণের হস্তগত হয়েচে। অতএব সম্মেলনের প্রেস্ রিপোর্ট বাদ দিয়ে অন্য আলোচনা করা যেতে পারে।

আমি পুরো তিন দিনও রাঁচি থাকবার সময় করতে পারি নি। বড়দিনের সামান্য ছুটির মধ্যে আমার অন্যত্র যাওয়ারও তাগিদ ছিল। তাই রাঁচি পরিপূর্ণভাবে দেখার এবং উপভোগ করার অবকাশ আমার হয় নি। কিন্তু সামান্য যেটুকু আমি দেখেচি তাতে জায়গাটিকে আমার ভাল লেগেচে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় তাঁর অভিভাষণে রাঁচির নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর সুন্দর বর্ণনা দিয়েচেন। অতএব সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি যে রাঁচিতে আমার ভাল লাগলো তার ছবির মত চেহারার জন্যে, তার পরিচ্ছন্নতার জন্যে, তার স্বাস্থ্যের জন্যে। এবং সেখানে উৎ-

রাঁচি লেক এবং রাঁচি হিলের দৃশ্য
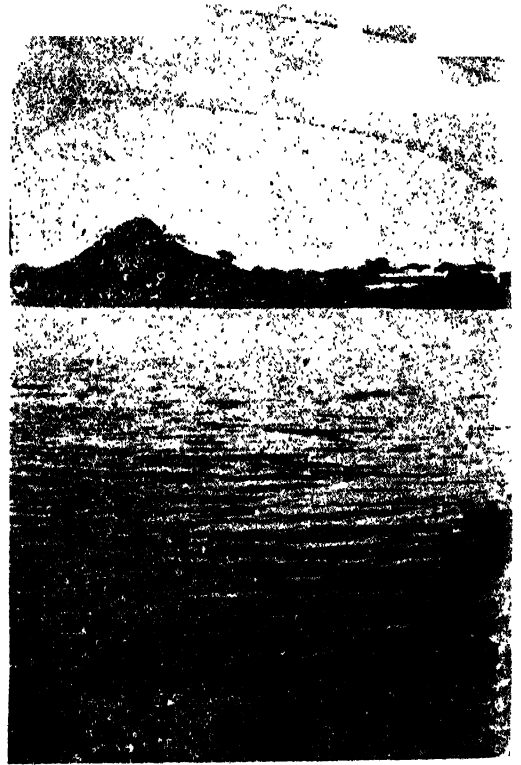
দ্রব্যাদির সুলভতার জন্যে। এ ছাড়া ছোটনাগপুরের আদি অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং ভাষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সেখানে আছে। ঐ বিষয় ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখে এবং ছবি দিয়ে বিদেশী সাময়িক পত্রে পাঠালে কিছু অর্থাগম হয়।

রাঁচিতে যা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তার মধ্যে দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি টমেটো, আর একটি পেঁপে। প্রথম বস্তুটির আমরা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার তিন দিনে করেছিলুম—বরঞ্চ ভয় ছিল ভাইটামিনের প্রাবল্যে আমাদের রেলে ঢুকতে অসুবিধা না হয়। কেননা গল্প শুনেছিলুম যে রাঁচিতে কোন টিক্‌টিকিকে নাকি তিনদিন টমেটো খাইয়ে কুমীরে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছিল। যাক্ সে কথা। পেঁপে ওখানে খুব বড় বড় হয়—এমন কি চালকুমড়োর মত। বড়দিনের ছুটিটা অবশ্য পেঁপের সময় নয়। তবু আমরা কিছু পেঁপে খেয়েছিলুম—খুব সুস্বাদু!

রাঁচিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ডুরাণ্ডা, হিনু এবং রাঁচি। শুনলুম এই তিন জায়গা মিলিয়ে রাঁচিতে বাঙালীর সংখ্যা নাকি দশ হাজার হবে। এবারকার সম্মেলন অবশ্য রাঁচিতে হয়েছিল কিন্তু অনেকে বল্লেন যে কেবলমাত্র হিনুতে কিম্বা কেবলমাত্র ডুরাণ্ডাতেও সম্মেলন হ'তে পারে, এ রকম জনসংখ্যা সেখানে আছে।

সম্মেলনের থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে খানিক দূর গেলেই বাঙালীদের কালীবাড়ী। কালীবাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল ব'লেই মনে হ'ল। সেখানে একজন কুম্ভকারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—সে ফটো দেখে মাটির ব্যাস্ট (Bust) তৈরি করতে পারে। আজকালকার ভাষায় তাকে আর্টিষ্ট বলতে দোষ দেখি না।

আমার কয়েক জন বন্ধু রাঁচি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কাঁকে নামক জায়গায় মেণ্টাল হাসপাতাল দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্যে বাস্ পাওয়া যায়—বাসে পঁচিশ জনের সিট্। হাসপাতাল উন্মুক্ত মাঠের মাঝখানে—পাহাড়ের ধারে। হাসপাতালের ডাক্তার একজন মুসলমান—তিনি নাকি দর্শকদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন। ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ড এবং ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ড পৃথক। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডও পৃথক। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডে শুনলুম ১২০০ রোগী আছে। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে অবশ্য অনেক টাকা খরচ করা হয়—কেননা সেখানে অনেক দাতার গুপ্ত দান আছে। একজন বাঙালী রোগীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার বন্ধুরা চমৎকৃত হয়েছিলেন—তিনি আপ্-টুডেট্ সমস্ত খবর রাখেন—তখন ফৈজপুর কংগ্রেসে কি হচ্চে তা' তাঁর অজ্ঞাত নেই—অথচ তিনি উলঙ্গ। কেন উলঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে শুদ্ধ খদ্দরের অভাবে তিনি বিবস্ত্র থাকেন। ঐটুকুই তাঁর ম্যানিয়া।

অভ্যর্থনা সমিতি সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যে চিত্তবিনোদনের যে আয়োজন করেছিলেন তার মধ্যে ছিল ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের নৃত্য। এই আদিম অধিবাসীরা কোল। এরা মেয়ে পুরুষ উভয়েই কৃষ্ণকায়

জগন্নাথপুরের মন্দির—রাঁচি

এবং খর্ব্বাকৃতি। এরা মেয়ে পুরুষ পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে নাচে—সঙ্গে মাদল বাজে, রং বেরংয়ের নিশাণ ওড়ে। নাচের মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় ওদের পদক্ষেপ—সকলের পা এক সঙ্গে পড়ে, আর মুখে এক সঙ্গে শিস দেয়। শুনলুম ওরা খুব প্রাণ খোলা জাত—সর্ব্বদা নাচ আর গান নিয়েই আছে। সব সময়েই হাসিখুসি। ভবিষ্যতের জন্য কখনো চিন্তা করে না—প্রয়োজনের বেশি রোজগার

করে না। প্রয়োজনও যৎসামান্য—হাতে বুনে কাপড় পরে, ভাত রেঁধে তাতে জল ঢেলে পান্তা ক'রে খায়। কল-কারখানা, কয়লার খনি প্রভৃতি যেখানে ওরা মজুরি করে সেখানকার নিয়মিত খাটুনির ঘণ্টা ব্যতীত অবশিষ্ট সময়
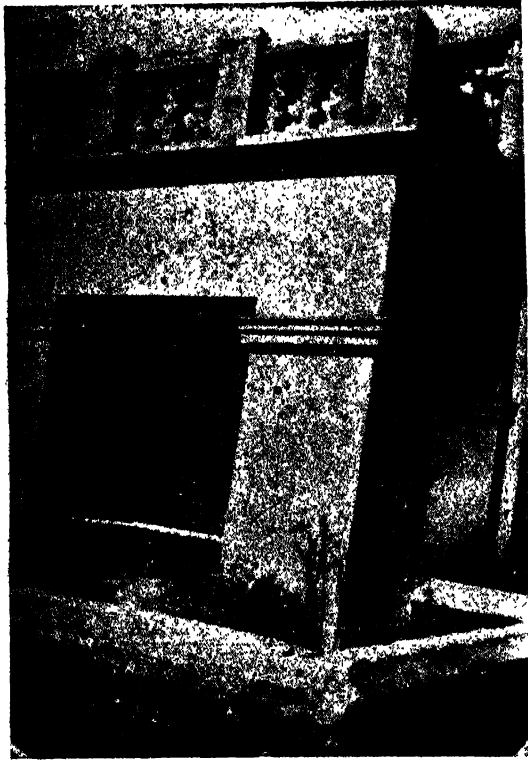
নিবারণ-আশ্রমের অপরাংশ--রাঁচি

ওরা নাচ আর গান নিয়েই কাটায়। তাদের গ্রামে রাত্রের অধিকাংশ সময়ই মাদলের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, আওয়াজ শুনে অন্য-সকলেরাও সেখানে এসে জোটে। ওদের আনন্দ হচ্চে 'হাড়িয়া' নামক স্বহস্তেপ্রস্তুত মদ খাওয়া। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলে এক সঙ্গে এই 'হাড়িয়া' খায়। ওরা মিথ্যে কথা বলতে জানে না, চুরি করে না, এমন কি খুন ক'রে হত ব্যক্তির মাথা হাতে নিয়ে ওরা থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করেচে এমন দেখা গেছে। মানভূম জেলায় নাকি আইন আছে যে আদালতে কোলেদের জেরা করা হবে না, ওরা যা বলবে তাই সত্য ব'লে মেনে নিতে হবে।

উপরে যা' বললুম সেটা গ্রামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বোধ হয় সম্পূর্ণ খাটে। যারা বাঙালীদের বাড়ী চাকরি বাকরি করচে তারা বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ চালাক হ'য়ে উঠ্‌চে। আমাদের প্রতিনিধিদের ক্যাম্প থেকে একটি গরম কোট চুরি গিয়েছিল। এর থেকে আন্দাজ করা যায় ওরা আগের মত নির্দ্দোষ আর নেই।

কোলেদের দু'টি নৃত্য আমরা দেখেছিলুম—একটি পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে, আর একটি ওদের মেয়েদের মাথায় কল্‌সীর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে। রাত্রে দেখলুম ওদের ছোঃ নৃত্য। ছোঃ মানে মুখোস—অতএব মুখোস পরে এই নৃত্যটি ওরা দেখায়।

কেউ ইন্দ্রজিৎ সেজে এল, কেউ গণেশ, কেউ শ্রীকৃষ্ণ, কেউ দুঃশাসন, কেউ ভীম ইত্যাদি। অবশেষে ভীম এবং

কোলেদের নৃত্য

দুঃশাসনের মধ্যে যুদ্ধ হ'ল এবং দুঃশাসনের মৃত্যু হ'ল। নাচের সঙ্গে ঢাকের মত একটা যন্ত্র বাজে—তার একটি মাত্র তাল। সেই একই তালে সবগুলি নাচ হ'ল—সুতরাং একঘেয়ে লাগলো।

রঁাচির আর একটি দ্রষ্টব্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়। সেখানে আমরা যাই নি কিন্তু সেখানকার সুকুমার ব্রহ্মচারীগণকে দেখেছি। তারা হলদে রঙের কাপড় পরে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছিলো। ছোট ছোট ছেলে, কচি মুখ, অতি

ওরাওঁদিগের নৃত্যের একটি দৃশ্য

নম্র, ধীর, শান্ত কিন্তু ঐ বয়সেই তাদের কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত নেই। রঁাচির শীতেও তাদের পরিমিত বাস, অনেকের পায়ে জুতোও নেই। দেখে সত্যিই মায়া হয়, আর শরৎ চন্দ্রের "শেষ প্রশ্নের" হরেনের আশ্রম এবং কমলের যুক্তিগুলি মনে পড়ে। রামানন্দবাবু ওখানে অতিথি হ'য়ে ছিলেন—তাঁর ঘরের সামনে টুলের উপর একটি ছেলে ব'সে ঘুমে ঢুলছিলো। রামানন্দবাবু তখন ঘরের ভিতর নিদ্রিত—পাছে কেউ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত করে তাই বাইরে এই পাহারার ব্যবস্থা।

রঁাচি সম্মেলনমণ্ডপ থেকে হিনু মাইল তিনেক পথ হবে—রিক্সায় যেতে আমার ৪৫ মিনিট সময় লেগেছিল। হিনুতে আমার স্বগ্রামবাসী এক ভদ্রলোক থাকেন—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলুম। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল, বেহারের আপিসে যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের কোয়াটার্স দেখলুম—বিশেষ পছন্দসই মনে হ'ল না। শুনলুম নাকি প্রথম এই আপিস অস্থায়ীভাবে রঁাচিতে এসেছিল—তাই কোয়াটার্সগুলি সব অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত, সব খোলার ছাত। কিন্তু সে আজ বাইশ বছর পূর্ব্বেকার কথা। এখনো একটা প্রস্তাব চলছে যে নতুন কন্‌স্টিটিউশান্‌ কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আপিস পাটনায় উঠে যাবে। তবে বাড়ীগুলির ভাড়া কম—বেতনের প্রতি টাকায় এক আনা হারে ভাড়া কেটে নেওয়া হয় শুনলুম।

হিনুর বন্ধু বল্লেন, রঁাচিতে এসে দেখলে না ত কিছুই অন্তত চল জগন্নাথপুরের মন্দিরটি দেখিয়ে আনি—এখান থেকে বেশি দূর নয়। উৎসাহিত হ'য়ে বল্লুম, চল। তখন হিনু থেকে দু'খানি রিক্সায় ক'রে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে জগন্নাথপুরের মন্দির দেখতে গেলুম। আরো মাইল তিনেক পথ উঁচু-নীচু বন্ধুর—দু'-পাশে বড় বড় গুলঞ্চ (ভাষান্তরে কল্‌কে চাঁপা) ফুলের গাছ, আর ছোটখাটো জলাশয়। জগন্নাথপুরের মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত—পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে

একটি ওরাওঁ রমণী

এই মন্দির নির্ম্মিত। বৎসরান্তে এখানে একটি বড় মেলা বসে সেই মেলায় কলকাতা থেকে পর্য্যন্ত দোকানপসারি আসে, স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহ,—ভিতরে একটু অন্ধকার। বিগ্রহকে পরিক্রমা করার জন্য সরু পথ আছে। মন্দিরটি প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরানো—১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্ম্মিত হয়। ছোটনাগপুরের রাজা রঘুনাথের বাঙালী গুরু ব্রহ্মচারী হরিনাথ এই মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহণ করেছিলেন। মন্দিরটি চারি-পাশে দুর্গের মত বেশ আঁটা এবং সুরক্ষিত।

ওরাওঁদিগের সমর-নৃত্য

জগন্নাথপুর থেকে ফেরার পথে নিবারণ-আশ্রমে গিয়েছিলুম। এটি নীরব কর্ম্মী ৺নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের স্মৃতির দ্বারা পবিত্র। মানভূমের কর্ম্মবীর নিবারণচন্দ্র দাশ-গুপ্তের নাম বোধ হয় সকলেই শুনে থাকবেন। সেই সাধক উক্ত আশ্রমে যক্ষ্মারোগে ভুগে দেহত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটির নামকরণ হয়েচে নিরারণ-আশ্রম। সেখানে নিবারণচন্দ্রের প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু এবং নীলমণি চট্টো-পাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এঁরা ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত আছেন। ক্ষিতিশচন্দ্র শুধু কর্ম্মী নন, সাহিত্য-রসিকও। রাঁচি সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতে দেখেচি এবং রামানন্দ বাবুর সপ্ততি বর্ষ পরিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাঁকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তার রচনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের হাত ছিল। নিবারণ-আশ্রমে বেশীক্ষণ কাটা-নোর সময় আমার হাতে ছিল না কিন্তু আমি স্থির করেছিলুম যে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক্, উক্ত কর্ম্মবীরের একাগ্র সাধনার উদ্দেশ্যে আমার নিঃশব্দ প্রণতি জানিয়ে আস্‌বো।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনেই বিকাল সাড়ে পাঁচটার ট্রেণে আমি কলকাতা রওনা হই। তখন জিলা স্কুলের প্রাঙ্গণে গার্ডেন পার্টি বস্‌বার আয়োজন চলেচে। প্রতিনিধিদের ফটো কখন নেওয়া হ'ল জানিনে—বোধ হয় গার্ডেনপার্টির পরে কিম্বা পরের দিন সকালে। আমার সঙ্গে উক্ত ট্রেণে আরও তিন জন প্রতিনিধি চলে এলেন—কলকাতার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বেরেলির সারদাপদ বাবু এবং কাণ-পুরের একনাথ বাবু। সম্মেলন নিয়ম-অনুযায়ী তখনো সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। কিন্তু কলকাতায় ফিরবার ঐ একটিমাত্র ট্রেণ—সেদিন না এলে আবার ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। শুনে এলুম পরবর্ত্তী সম্মেলন পুরুলিয়ায় হবে। তাই যদি হয় এবং যদি সে সম্মেলনে যোগ দেওয়ায় সৌভাগ্য ঘটে তবে আর একবার রাঁচি যাব এই কামনা মনে নিয়ে ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য রাণীর নিকট বিদায় নিলুম।

পথে কোথায়ও নাম্‌বো না এই সংকল্প ছিল কিন্তু টাটানগরে এসে আট্‌কে গেলুম। আমার স্বগ্রামবাসী শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জোর ক'রে আমার বাক্স বিছানা নামিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। টাটার বিরাট লৌহযন্ত্রের সুবিপুল খ্যাতি পূর্ব্বেই শুনেছিলুম, দেখার লোভও ছিল কিন্তু এবারও সময় হ'ল না। আমার গ্রামের সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করতেই একদিন কেটে গেল্। টাটার বিরাট আপিসের বহিঃপ্রাঙ্গণটা একবার ঘুরে এলুম; টাটার সুন্দর এবং সুবৃহৎ হাসপাতাল দেখে এলুম। ডাঃ জে সি রায় অনুগ্রহ ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত ওয়ার্ড, অপারেশান্ টেবিল, শান্তিরাম এক্‌স রে হল, ষ্টোর রুম প্রভৃতি দেখালেন। হাসপাতালে শুনলুম পঁচিশ জন ডাক্তার

আছেন। হাসপাতাল থেকে আমরা বাঙালীদের কালীবাড়ী কামনা দেবীর মন্দির দেখতে গেলুম। মন্দিরটি সহর থেকে একটু বাইরের দিকে। সেখানে বাঙালী পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ হ'ল। মন্দিরটি সম্প্রতি তৈরি হয়েছে।

সাহিত্য সম্মেলন থেকে কলকাতায় ফিরবার পথে মনে মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে এলুম যে প্রতি বছর সাহিত্য সম্মেলন বসে এর সার্থকতা কি? যাঁরা আহ্বান করেন তাঁদের অর্থব্যয় এবং শারীরিক পরিশ্রম অপরিসীম, যাঁরা যোগ দিতে যান তাঁদের অর্থব্যয় এবং মানসিক উদ্যমও কম নয়। আমি নিজে জানি এই ঘরের পয়সা খরচ ক'রে দারুণ শীতে পুত্র পরিবার ফেলে সাহিত্য সম্মেলনে ছোটার সাংসারিক চেহারাটা কি। এর ফলে ঘরে পরে অনুযোগের অন্ত থাকে না। এমন শুভানুধ্যায়ীরও অভাব নেই যাঁরা বলেন যে এই সম্মেলনে ছোটার পিছনে বিকৃত মস্তিষ্কের ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই সারবান পদার্থ নেই। তাঁরা যে ভুল করেন এমনও নয়, কেন না সারবান পদার্থ বল্‌তে তাঁরা Productive utility বোঝেন। যে পয়সা খরচ ক'রে তার পরিবর্ত্তে ঘরে কিছু ফিরে আসে না তাঁদের কাছে তার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু আমি তাদের স্মরণ করতে বলি যে সব সার্থকতাই কি চোখে দেখা যায়? আজ যেটা অদৃশ্যরূপী ধোঁয়া ব'লে ঠেকৃচে কালক্রমে একদিন হয়ত সেটা পরিগ্রহ ক'রে বাস্তব হ'য়ে উঠবে। সে দিন তার জীবন্ত মূর্ত্তিটা দেখে হাততালি দেবার লোকাভাব ঘটবে না কিন্তু কি রকম ক'রে বুকের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে একটা জিনিষ গ'ড়ে তুল্‌তে হয় তা যাঁরা গড়েন তাঁরা ছাড়া আর কেউ বোঝে না। সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া একটা খেয়াল সন্দেহ নেই কিন্তু মানুষের এই রকম খেয়াল আছে ব'লেই রক্ষে, নইলে
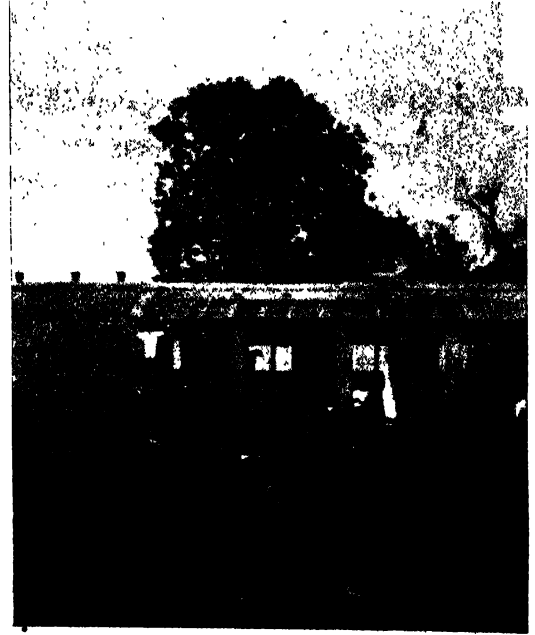
কামনা দেবীর মন্দির—জমসেদপুর

পৃথিবীটা শুধু একটা দেনা-পাওনার প্রকাণ্ড হিসাবখানায় পরিণতি হ'ত—তার অতিরিক্ত আর এখানে কিছুই থাকৃতো না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

ছন্দা

শ্রীশান্তি পাল

সে যে আছে, সে যে আছে, সে যে আছে ;
আমার পরাণ রাঙায়ে দিয়া সে
মধুর ছন্দে নাচে !
সে যে আছে, সে যে আছে !

মেঘের সায়রে ফেনায়ে উঠিয়া,
চাঁদের পাসরে নীরবে ফুটিয়া,
বনের আড়ালে বাতাসে লুটিয়া
কুসুম পরাগ যাচে ;
সে যে আছে, সে যে আছে !

কখনো এ-পারে কখনো ও-পারে,
কখনো আলোকে কখনো আঁধারে,
কখনো সমুখে কখনো পিছনে,
—শতেক আঘাতে বাঁচে ;
সে যে আছে, সে যে আছে !

তটিনীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া,
নুপুর নিকনে ডাকিয়া ডাকিয়া,
ভাঙিয়া গড়িয়া ধূলায় মাখিয়া
চলেছে দূরের কাছে ;
সে যে আছে, সে যে আছে !

ভাঙ্ ভাঙ্ ওরে বন্ধন যত আছে,
হৃদয় আমার উল্লাসে আজি নাচে ।

মুকুতা প্রবাল এমন হেলায়
লুকায়ে র'য়েছে সাগর বেলায়,
কুড়াস্ কেনরে মাটির ঢেলায়
রতন ফেলিয়া কাঁচে ;
সে যে আছে, সে যে আছে !

ওরে আকাশে উঠেছে ঝড় !
সাগর উছলি ওঠে ফুলে ফুলে,
দুকূল ছাপিয়া লোটে কূলে কূলে,
অধীর উধাও ছুটিয়া চলেছে
বাহির হ'য়েছে ঘর ;
আমার পরাণ যে গান গাহিছে
শুনে সে নিরন্তর ।

নবকিশোরের বিয়ে

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার খাঁ

প্রণতির সঙ্গে একদিন যে তার সত্যিই বিয়ে হয়ে যাবে তা কিন্তু নবকিশোর কোনদিন ভাবেনি। অবিশ্যি বিশেষ করে প্রণতির নাম মনে করেই যে ওর এরকম ভাবনা এসেছিলো তা নয়। তবে প্রণতি বা প্রণতির মত কোন মেয়ের সঙ্গে তার পারিবারিক জীবনকে একত্র করে সে একদিনও কোনো কথা ভাবেনি। প্রণতি ছিল তার সমসাময়িক আরো অনেক মেয়েদের মধ্যে একজন, যার কথা সে আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে এবং অনেক আজগুবি কল্পনার সঙ্গে রাঙিয়ে নিয়ে ভাবতো; কিন্তু সত্যি কোনোদিন বিয়ের সম্ভাবনার দিক দিয়ে ভাবেনি। অথচ এই প্রণতির সঙ্গে একদা সন্ধ্যায় নবকিশোরের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের সময় পর্য্যন্ত নবকিশোরের সমস্ত জিনিষটা নিতান্তই একটা নাটকের বা ছায়াচিত্রের অভিনয়ের মত মনে হচ্ছিল। মন্ত্র পড়ার সময় নবকিশোর বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কিন্তু প্রণতির ছোট্ট নরম হাতখানা ওর হাতের মধ্যে ধরা অবস্থায় বার বার ওকে বাস্তবের এলেকায় টেনে আনছিল। তবু সত্যিই যে সে হাতখানা প্রণতির তা ঠিকমতো ওর ধারণায় আসছিল না! প্রণতির অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত নত মুখের মাত্র সুগঠিত চিবুক এবং টিকলো নাকটা ওর নজরে আসে। প্রকাণ্ড বিবাহ-আসরে এতো লোকের সামনে সেইদিকে চাইতে লজ্জা হয়। কিন্তু তবু দেখতে ইচ্ছা করে। সাধ হয় একটু লুকিয়ে দেখতে সেই শ্যামলী প্রণতির মুখের আদলে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন এসেছে কি না। কেন পরিবর্ত্তন আসবে না? প্রণতি যদি আজকের দিনে সুন্দরী না হয়ে ওঠে তাহলে কিসের বিয়ে! আজিকার এই বিস্তৃত আসর, অসংখ্য আলো, সহস্র চরণের ব্যস্ততা, বহু কণ্ঠের সম্মিলন, অগণিত কুমারী ও রমণীর মৃদু ত্রস্ত চরণক্ষেপ, রহস্যে চাপা অসংখ্য ইঙ্গিত, এ কিসের জন্যে, কাদের জন্য? শ্রীমান নবকিশোর ও শ্রীমতী প্রণতির জন্য নয় কি? এই একটি দিনের জন্য অন্ততঃ নিতান্ত সাধারণ নবকিশোর রাজা এবং মৃদুস্বভাবা নতনয়না প্রণতি রাণী, এবং রাণী যখন, তখন অবশ্যই প্রণতি আজ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। আর কতটা সুন্দরী হয়েছে তাই দেখতে বার বার ইচ্ছা যায় নবকিশোরের।.........

এবারে গোড়ার কথা। গ্রাম্য স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে নবকিশোর কলকাতায় এসে ভর্ত্তি হলো। অগণিত উদার স্বপ্ন আর সেই সঙ্গে কলকাতা সহর দেখতে দেখতে দু-বছর কেটে গেলো। নবকিশোর আই-এ পাশ করে বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হলো। সঙ্গের মেয়েগুলোর কয়েকজনও ওর সাথী হয়ে এসেছে। নবকিশোরের বয়স তখন কৈশোরের শেষ প্রান্তে আগতপ্রায়। সে মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌লো। লক্ষ্য করতে লাগলো কে কি রকম দেখতে, কে কোন শাড়ি বেশী পরে, কার অঙ্গে কোন রকম শাড়ি মানায়। লক্ষ্য করতে করতে একদা ঘটনাক্রমে অণিমার সঙ্গে হয়ে গেলো আলাপ। আলাপের সূত্রপাত, যেমন সামান্য কারণে হয় তেমনি; কিন্তু ক্রমে তা গাঢ় হয়ে এলো। অণিমাদের বাড়ি যাতায়াত আরম্ভ হলো। এবং পড়াশুনোর অছিলায় দুজনে এল পরস্পরের বেশ কাছাকাছি।

একদিন সন্ধ্যায় অণিমাদের বাড়ি একটি নিতান্ত সাধারণ মেয়ের সঙ্গে অণিমারই ঘরে নবকিশোরের দেখা হ'ল। অণিমা তখন ঘরে ছিলোনা। মেয়েটি বাইরে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে নবকিশোর, এবং নবকিশোরও এসব ব্যাপারে এমনি আনাড়ি যে যে-মেয়ে ওকে এড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে যেতে চাচ্ছে তাকে

পথ দেবার জন্যে দ্বার ছেড়ে সরে দাঁড়াবে, এ খেয়ালই ওর হলোনা। এমন কি ও ঠিক বুঝতেই পারলো না যে মেয়েটি ঘর থেকে বাইরে যেতে চায়। ভাবলো, সে ও-কে দেখে এমনি ন্যর্ভাস হয়েছে। এমন তো সব অপরিচিতা মেয়েই হয়।···কিন্তু প্রণতি কি করবে ভেবে পেলোনা। একে মেয়ে, তায় নবোদ্ভিন্না কিশোরী; নিতান্ত সৌজন্যের জন্যও প্রথমে যে কথা কইবে তা নয়। উল্টে সে এই আনাড়ি ছেলেটার অশিষ্টতা দেখে গায়ে জ্বলে গেলো। কি বেহায়া! দরজা জুড়ে একেবারে ভীমসেনের মত (হ্যাঁ, ভীমসেনই ঠিক! তেমনি মোটাসোটা, কেবল একটি গদা হলেই চমৎকার!) দাঁড়িয়ে যেন অভিমন্যুকেই রক্ষা করছেন!···কথাটা হয়ত নবকিশোরেরই প্রথম বলা উচিত ছিলো, কিন্তু প্রণতিকে তার দেখতে কেমন যেন ভালো লাগলো তাই দেখতেই লাগলো। প্রণতি ভাগ্যিস্ পনরো বছর বয়সী কিশোরী, তাই রক্ষে; নতুবা যুবতী হলে হয়ত বা নবকিশোরকে অভদ্রের মত চেয়ে থাকার জন্যে কৈফিয়তই দিতে হতো। কিন্তু প্রণতির ভালো লাগলো, যে লোকটা ওরই দিকে চেয়ে আছে। লোকটা নিতান্ত অভদ্র নয়। প্রণতি একদিকে মুখ করে গভীর মনোযোগে একখানা শিশুপাঠ্য বইএর ছবি ও ছড়া দেখতে লাগলো। এমনি সময় ওদেরকে উদ্ধার করলো অণিমা। সে পিছন থেকে এসে বললো, কিশোর বাবু আমি স্বয়ং ঘরের মালিক সুতরাং আপনি দ্বাররক্ষী হলেও আমাকে পথ দিতে বাধ্য। নবকিশোরের পাল্টা রসিকতা করার মত অবস্থা ছিলোনা। লজ্জিত হয়ে সে এক পাশে সরে দাঁড়ালো, এবং আরো লজ্জিত হয়ে অণিমার দিকে চাইলো। ভাবটা, এই মেয়েটি কে?

—কিশোর বাবু, এ আমার বোন, আপন নয়, মাসতুতো, —সে জন্যে বোন ও বন্ধু দুই-ই। এর নাম প্রণতি

—প্রণতি, ইনি কিশোর বাবু, আমার সহপাঠী এবং পুরাতন বন্ধু।

নবকিশোরই প্রথম নমস্কার করলো, প্রণতি করলো পরে।

অণিমা জিজ্ঞেস করলো—কতক্ষণ এসেছেন কিশোর বাবু? অনেকক্ষণ বোধ হয়। আর প্রণতিটা এমনি যে আপনাকে বসতে বা আমার সন্ধান কিছুই বলেনি। মেয়ে আজ বাদে কাল কলেজে যাবেন অথচ বুদ্ধি দিন দিন বাড়ছে

দিদির এই তিরস্কার, বিশেষতঃ নবপরিচিত একজন যুবকের সামনে, প্রণতিকে আকর্ণ-রক্তিম করে দিলো নবকিশোর তা লক্ষ্য করলো, বললো, উনি আমাকে বসতে বলেছিলেন, আমিই বসিনি। ভাবছিলাম আপনি কতক্ষণে আসবেন।

প্রণতি বাঁচলো, মনে মনে নবকিশোরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলো আর দিদির দিকে বক্রভাবে চাইলো। কি ফাঁপরে পড়লো এবার নবকিশোর! অণিমা বোনকে ছেড়ে তাকে করলো আক্রমণ,—আপনার কি ওর সামনে বসতে ভয় বা লজ্জা হচ্ছিলো যে আমার আগমনের অপেক্ষা একেবারে জানকীর দ্বাররক্ষী লক্ষ্মণের মত অপেক্ষা করছিলেন? নবকিশোরের মুখে সামান্য হাসি ছাড়া কিছুই প্রকাশ পেলোনা। অণিমাকে সে জানে ভারী মুখরা, কারো তোয়াক্কা রেখে কথা কয় না। আর এই কারণেই নবকিশোরের তাকে ভালো লাগে। ভালো লাগে এই ভেবে আরো যে অণিমা কোন দলের কেউ নয় সে নিতান্তই অণিমা। কারো কথা নিয়ে কারো সাথে সে বিবাদ করে না। বিবাদ করলে একেবারে ব্যক্তিগত করেন। নবকিশোর তাই অণিমাকে শ্রদ্ধা করতো তবু সহপাঠী বলে তার প্রতি একটু আকাঙ্ক্ষাও যে ছিল তা নয়। কিন্তু বেচারার এমন সাধ্য ছিল না যে অণিমার ত্রিসীমানায় এগোয়। অণিমাও নবকিশোরকে চিনতো। তাকে প্রশ্রয়ও দিতো, কারণ সত্যি ওর নবকিশোরকে ভালো লেগেছিলো। ভালো লেগেছিলো তার লাজুক ভীরু কিন্তু সরল সহজ স্বভাব, তার শ্যামল গ্রাম্যতা সে আপনা থেকেই তাকে কিশোর বাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করে। নবকিশোর অণিমাকে কখনো অণি কখনো বা, যেমন বিরক্ত করবার ইচ্ছা হলে, অন্য বা ডাকতো। কথাটা অণিমা ভালো ভাবেই নিতো; যদি গায়ের রঙটা তার নবকিশোরের তুলনায় অনেক ময় ছিলো।······

প্রণতির সঙ্গেই নবকিশোরের ভালো মিললো। অনিমা সাহায্য করলো বলে আরো ভালো। কিন্তু অনিমা এখন থেকে কিশোরকে মমতার চক্ষে দেখতে লাগলো। তার চেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট নিতান্ত স্নেহের বোন প্রণতির প্রায় সমানই মনে করলো কিশোরকে। এমন কি এক আধবার কল্পনার সাহায্যে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলো যে কিশোর বয়সেও ওর চেয়ে ছোট কি না। এতে সাহায্য করলো একটি কারণ; নবকিশোরের বাপ স্কুলের মাষ্টার। আর স্কুল-মাষ্টারের ছেলে নিশ্চয়ই অল্পবয়স থেকে পড়াশুনো ছাড়া আর কিছুই করে বয়স বাড়াবার সুযোগ পায় নি।

নবকিশোরের সঙ্গে প্রণতির পরিচয় ও আলাপ ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রণতির সঙ্গ, তার কথা তার দৃষ্টি, হাসি সবই কিশোরের ভালো লাগতো, যেমন ভালো লাগতো আরো অনেক মেয়ের শাড়ির রঙ্ বা চুলের ধরণ। তাই কিশোর প্রণতির সঙ্গ পছন্দ করতো। প্রণতির কথা তার মাঝে-মাঝে অকারণে মনে হতো। রাত্রে শোবার পর অন্ধকারে যখন কড়িকাঠের সৌন্দর্য্য উপভোগের চেষ্টা চলতো সেই সময় হঠাৎ মনে হলো, প্রণতির নামটা কিন্তু বেশ; পরক্ষণেই আবার মনে আসতো, কিন্তু প্রণতির বন্ধু মণিকার চোখ দুটো আর শাড়ি পরবার ধরণটা আরো বেশ! পরক্ষণে বেচারা কিশোর ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো কি-না সে খবরটা অবিশ্যি জানা যায় নি। এমনি যখন অবস্থা তখন প্রণয়ীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা কি করেই বা ভাবে। বিশেষ বিয়ে জিনিষটা এমনি গন্ধময় যে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে ঐ কথাটা মনেই আসতে চায় না। এইতো গেলো নবকিশোরের পূর্ব্বরাগ-পর্ব্ব।

কিন্তু প্রণতির অবস্থাটা ছিলো অন্যরকম। কিশোরকে প্রণতির ভারী ভালো লাগতো। অসম্ভব অদম্য কৌতূহল জাগতো তার মনে কিশোরের জীবন সম্বন্ধে। কেমন হতে পারে কিশোরের অতীত-জীবন সে সম্বন্ধে সে অনেক উপন্যাসের সাহায্যে কল্পনা করবার চেষ্টা করেছে। তার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধেও প্রণতি একটা ধারণা করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পুরুষের জীবন সম্বন্ধে মেয়েদের ধারণা ………। প্রণতি ভাবতে চেষ্টা করতো নবকিশোরের আদর্শ সম্বন্ধে। নিজের আদর্শের সঙ্গে সেই কল্পিত আদর্শের সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করতো। কিন্তু প্রণতির জীবনের আদর্শ? প্রণতি কিছুতেই ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারতো না।……প্রণতি হয়ত কখনো জানালা দিয়ে বাইরে বর্ষণমুখর আকাশের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে আসতো, কি জানি কিশোর এখন কোথায় কি করছে। যে-রকম তার জ্ঞান আবহাওয়া সম্বন্ধে। হয়ত কিছুই না ভেবে কোথায় বেরিয়েছে আর বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছে। এই অসময়ে বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে কতকিই তো হতে পারে,—ইনফ্লুয়েন্জা, প্লুরিসী। প্রণতি আর ভাবতে চাইতো না! …নিজের পাঠ্যপুস্তকের মাঝে প্রণতি কখনো কখনো খেই হারিয়ে ফেলতো। খাতার উপর নবকিশোরের নাম লিখতো। বার বার লিখে দেখতো কোনটা দেখতে অথবা লিখতে ভালো।—নবকিশোর নবকিশোর নবকিশোর অথবা কিশোর কিশোর কিশোর। নীচে আর এক লাইনে হয়ত লিখতো, নবকিশোর কিশোর নবকিশোর কিশোর ইত্যাদি। প্রণতি বিরক্ত হতো নামটার উপর। কিবা নামের শ্রী! কখনো যেন আর কৈশোর উত্তীর্ণ হবেন না! নবকিশোর! কেন ভীম-সেন কিম্বা বৃকোদর রাখলে কি ক্ষতি হতো?

অনিমা না-জানি কেমন করে প্রণতির এই অবস্থাটা আবিষ্কার করলো। এবং তারই মধ্যস্থতায় বিয়ের প্রস্তাব উঠ্‌লো। আর হিন্দুর ঘরে বিয়ে দেবার সুযোগ এলে কবেই বা তা বৃথা হয়। সুতরাং প্রণতির সঙ্গে কিশোরের বিয়ের সম্ভাবনাটা পাকাপাকি হয়ে উঠলো। কিন্তু নবকিশোর ভাবতেই পারলো না যে সত্যিই প্রণতির সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছে আর কি করেই বা হচ্ছে তা ধারনা করাও হলো মুস্কিল কেননা কই কেউ তো তার মতামত জিজ্ঞেস করলো না। প্রণতির মুখ দেখেও তো বোঝা যায় না এতে তার খুব আনন্দ হচ্ছে।…থাক্‌গে ওসব আর ভাবা যায় না।

কিন্তু নবকিশোর ভাবতে পারুক আর না-ই পারুক একদা সত্যিই প্রণতির সঙ্গে ওর হয়ে গেলো বিয়ে। যখন হলোই তখন আর কি করা যায়! কিন্তু বিয়ের পর এক সময় নিরালায় নবকিশোর প্রণতির মুখের দিকে চাইলো। আশ্চর্য্য! যে প্রণতি এতো-পরিচিত সে আর ও-র মুখের দিকে চাইতে পারে না। তার স্রোতের জলের মত চোখ আপনা থেকেই যেন বন্ধ হয়ে আসে। আরো আশ্চর্য্য এই যে প্রণতি দেখতে কী সুন্দর…!

…ার খাঁ
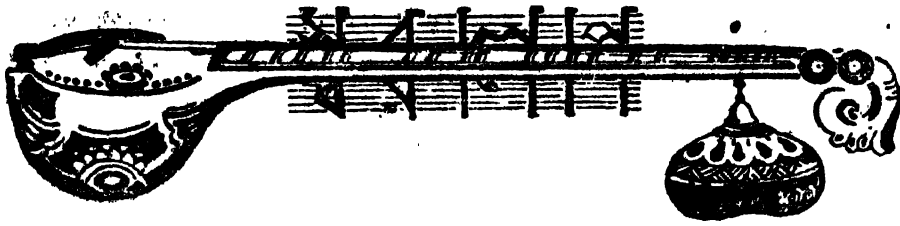
আজি বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণরাতি,
একা ব'সে স্মৃতি-বেদনার মালা গাঁথি' ॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি'
আঁধার ঘরে রাখি দ্বার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে
মোর দুখ রজনীর সাথী ॥
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি 'পরে রাখিব-রে মিলন আসনখানি পাতি'

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

ধা না II র্সা র্সগা র্গা র্গা র্রা র্রা -র্সা -া I মা -া -া -া -া -া -া -া
আ জি ব রি ষ ণ মু খ রি ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা -মা -পা -মা -গা -মা -পা -মা I গা -রা -সা -া -া -া -া -া I সা -সমা মা -া
শ্রা ০ ০ ০ ব ০ ০ ণ রা তি এ কা ব

মা -পা -গা -া I মা -ধা -না -র্সা র্সর্গা -া -র্রা -র্সা I না ধা ধা না -া -া -পা -া I
সে ০ ০ স্ম তি বে দ না ০ ০ র মা ০ লা ০

না ধা ধা না I -া -া ধা না II
গাঁ ০ থি "আ জি"

| -া -া র্সা র্রা II নর্সা -ধা -া ধা | না -া র্সা র্রা I নর্সা -া -া র্রা |
০ ০ আ জি কো ন্ ০ ভু | লে ০ ভু ০ লি০ ০ ০ আঁ

| নর্সা -ধা -া ধা I না -া র্সা র্রা | না -র্সা -ধা -না I র্সা -া -া -া |
ধা০ র ০ ঘ রে ০ রা খি | দ্বা ০ র খু লি ০ ০ ০

| না র্সা র্সা র্সা I না না ধা ধা | পা -মা মা -া I -া -া র্সা র্সা |
ম নে হ য় বু ঝি আ সি | ছে ০ সে ০ ০ ০ মো র্

| র্সা র্গা র্গা র্গা I র্গা -র্মা -র্পা -র্মা | র্গা -র্রা র্সা -র্রা | না র্সা ধা না II
দু খ র জ নী ০ ০ র | সা ০ থী ০ | ০ ০ "আ জি"

| -া -া -া -া II { সা সমা মা -া | মা -া -া -া I মা মা মা -া | মা -পা -গা -া I
০ ০ ০ ০ আ সি ছে ০ | সে ০ ০ ০ ধা রা জ ০ | লে ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধা | ধা -া মা -া I মা ধা না র্সা | সর্ঋা সর্ঋা সর্ঋা র্সা I
সু র লা গা | য়ে ০ ০ ০ নী পু ব নে | পু ল ক জা

I না -া র্সা -া | -া -া -া -া } I র্সা সর্গা র্গা র্গা | র্গা -র্মা র্পা র্সর্পর্ম I
গা ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০ য দি ও বা | না ০ হি ০০

I র্মর্পা -র্মা র্গা -া | -া -া -া -া I র্গা র্মা র্মা -া | র্গা -া র্রা -র্সা I
আ ০ 'সে ০ | ০ ০ ০ ০ ত বু বৃ ০ | থা ০ আ ০

I না -ধা ধা র্সা | -া -া -া -া I সা সমা মা -া | মা -া -া -া I
খা ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০ ধূ লি প ০ | রে ০ ০ ০

I মা মা মা -া | মা -পা -া -গা I মা ধা ধা -ধা | না র্সা র্রা র্সা I
রা খি ব ০ | রে ০ ০ ০ মি ল ন আ | স ন খা নি

I না -া সা -র্রা | -না -র্সা ধা না II
পা ০ তি ০ | ০ ০ "আ জি"

হিন্দুস্থানী তন্ত্র-সঙ্গীত

শ্রীবারেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস বহু পুরাণ ও উপকথার গহণে আবৃত। ইহার আদি রূপটি এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু যে সঙ্গীত বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী প্রধান বিভাগ আমরা দেখতে পাই, একটী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অপরটী কর্ণাটী সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত উত্তর ভারতে ও কর্ণাটী সঙ্গীত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। এই প্রভেদ পরবর্ত্তী যুগে হয়েছে অথবা গোড়া থেকেই সঙ্গীতের দুই বিভিন্ন ধারা চ'লে এসেছে তা বলা শক্ত। আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা ও জাতির পার্থক্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ যথেষ্ট রয়েছে। তবে একথা সত্য যে আমরা এই দুই সংস্কৃতির যে সকল বিকাশ দেখ্‌তে পাই তা'তে দুইটী ধারার দুই বিভিন্নমুখী গতি অতি সুস্পষ্ট।

দক্ষিণী শিল্পকলায় ও সঙ্গীতে আমরা পাই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ও কারুকলার নিবিড়ঘন বিন্যাস। সেখানকার সঙ্গীতে সুরগুলি অতিঘনরূপে সাজান মূল্যবান বহুবর্ণের ঠাসবুনানো শালের মত। সুরের এই অতি বৈচিত্র্যের জন্য দক্ষিণী সঙ্গীতে সুর অধিকাংশ সময়েই কম্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; সুরের স্থিতির অবকাশও সেখানে অতি অল্প। কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুরের এই অতি বৈচিত্র্যময়—আন্দোলিত কারুকলার চেয়ে মৃদুমন্দ বলয়িত স্বরবিন্যাস ও মাঝে মাঝে বিরামের অবকাশ রাগরসের বিশেষ পরিপোষক।

তন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী রীতির পার্থক্য একই প্রকারের। তারের যন্ত্রসঙ্গীতকে তন্ত্র সঙ্গীত বলে। বীণাযন্ত্রই অতি প্রাচীন সময় থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত ভারতে তন্ত্রসঙ্গীতের আদি যন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে। হিন্দুস্থান ও কর্ণাটের বীণা করণ অর্থাৎ বীণাবাদন পদ্ধতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখ্‌তে পাই দক্ষিণী বীণায় সুরের কারুকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা কম্পন ও কৃন্তনের খেলা চলেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী বীণায় মীড়ের মৃদুদোলন ও আঁশের ঘুমিয়ে-আসা সুরবিন্যাসে সুরের স্থিতিরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিলম্বিতের বাহারই হিন্দুস্থানী বীণাকরণের বিশেষত্ব। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বীণাযন্ত্রের পার্থক্য এইজন্যই হয়েছে। দক্ষিণী বীণা কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত; একদিকে একটী কাঠের বড় তোম্বা, অপরদিকে একটী ছোট লাউ অল্প পরিসর একটী কাঠের ডাণ্ডির দ্বারা যুক্ত। ডাণ্ডিটী অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াতে ঘাটগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ইহা দ্রুত অঙ্গুলী সঞ্চালন ও নিবিড়ঘন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উপযোগী কৃন্তন কম্পন প্রভৃতি অলঙ্কারের উপযোগী হয়েছে। এই বীণের নাম সারস্বত বীণ—মতান্তরে রুদ্রবীণ। হিন্দুস্থানী বীণও হিন্দুস্থানী বীণাকরণের উপযোগী করেই তৈয়ারী। দুইটী বৃহৎ লাউ একটী বাঁশের ডাণ্ডির দ্বারা যুক্ত। ডাণ্ডিটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও তদুপরি অপেক্ষাকৃত বড় পরিসরের ঘাটগুলি পরস্পর হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে সাজান। এই বীণের নাম নারদ বীণ এবং ইহা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের হিন্দুস্থানী বীণাকরণের উপযোগী মৃদু সুমিষ্ট স্বর প্রকাশের ও দীর্ঘ বিলম্বিত মীড় প্রভৃতি অলঙ্কার প্রকাশের উপযোগী।

উত্তর ভারতের উপর দিয়ে নানা বৈদেশিক অভিযানের ঝড় ক্রমাগত এসেছে—তার ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নির্ব্বিঘ্নে কখনও অগ্রসর হতে পারে নি—তা ছাড়া বৈদেশিক সংঘাতের নানা অভিনব প্রভাবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নানা রূপান্তরও ঘটেছে। অপর পক্ষে দক্ষিণীভারতে শান্তিময় তীর্থের নানা শিল্প সমৃদ্ধ মন্দিরে মন্দিরে যে সঙ্গীত ক্রমগঠিত হয়ে এসেছে তাতে বৈদেশিক প্রভাব বিশেষ আসেনি।

কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যেখানে বিশেষত্ব অর্থাৎ বিলম্বিতের রসরূপ, তা বৈদেশিক রূপে স্বীকার করা যায় না।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে রূপের সহিত আমরা পরিচিত তার গোড়াতে আমরা একজন বিদেশী পুরুষের ছবি দেখ্‌তে পাই। তাঁর নাম আমীর খসরু। আমীর খসরু পারস্য দেশ থেকে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের প্রধান অমাত্যরূপে ভারতে আসেন। ঐ সময় নায়ক গোপাল, বৈজু বাওরা প্রভৃতি সঙ্গীতনায়কগণ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষ উৎকর্ষ এনেছিলেন। আমীর খসরু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে পারসী রাগের সংমিশ্রণে কতকগুলি অভিনব রাগের সৃষ্টি কর্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে বীণা যন্ত্রকে ছোট ও সহজ করে সেতার যন্ত্রেরও উদ্ভব কর্‌লেন। আমীর খসরু-প্রবর্ত্তিত সেতারে পারসী চালের সহিত মিশ্রিত হিন্দুস্থানী রীতির সঙ্গীত বাজানো হ'ত। আমীর খসরু পারসী সঙ্গীতের সহিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্মিলনের যে পথ দেখিয়েছিলেন পরবর্ত্তী যুগে তা সমৃদ্ধতর সংমিশ্রণে খেয়াল সঙ্গীত ও সেতারী রীতির প্রবর্ত্তন করেছে। কিন্তু পারসী রীতির সংমিশ্রণ বাদ দিয়েও হিন্দুস্থানের নিজস্ব সম্পদ ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বীণাকরণের আসন অতি সমুচ্চ।

আমীর খসরুর পর অনেকদিন হিন্দুস্থানের নানা রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ে সঙ্গীতের চর্চ্চা ও বিকাশ স্তব্ধ ছিল। তারপর মোগল রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরুদ্বোধন ও বিপুলতর বিকাশ হয়। এই বিকাশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সঙ্গীতজগতে এক অভূতপূর্ব্ব স্থান অধিকার করতেছিল। এ সময় গোয়ালিয়ারের রাজা মানসিং নায়কগোপাল ও বৈজু বাওরার প্রবর্ত্তিত ধ্রুবপদ্ধতির অনুসরণ করে ধ্রুপদ সঙ্গীতের বহুপ্রচার করেন। তাঁর সমসাময়িক সঙ্গীতসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস স্বামী ধ্রুপদে এক অচিন্ত্য ভক্তিরস ও অলৌকিক মাধুর্য্যরসের সঞ্চার করেন। হরিদাস স্বামীর শিষ্য মিঞা তানসেন অতুলনীয় সঙ্গীতপ্রতিভা বলে ধ্রুপদকে কণ্ঠ-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্তরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লেন। মিঞা তানসেনের প্রবর্ত্তিত ধ্রুপদকেই হিন্দুস্থানের সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণনা করা হয় ও তানসেনই আধুনিক হিন্দুস্থানী রাগপদ্ধতির জনক। তিনি পারসীমিশ্রিত রাগও গ্রহণ কর্‌লেন বটে কিন্তু সে রাগের গঠন দিলেন হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ পদ্ধতিতে। হিন্দুস্থানী কণ্ঠ-সঙ্গীত যখন এরূপ নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সহসা এক অভাবনীয় অবস্থায় উপনীত হ'ল তখন সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রসঙ্গীতে বীণাযন্ত্রও যথেষ্ঠ উন্নতিলাভ করেছে। তবে সে সময় বীণার কাজ ছিল কণ্ঠ-সঙ্গীতের আলাপ ও ধ্রুপদের অনুসরণ—বীণ্‌কারগণ তখন গায়কের আলাপ ও গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতেন, স্বতন্ত্রভাবে বীণাবাদনের রীতি তত প্রচলিত ছিল না।

যন্ত্রসঙ্গীতের ও বীণাকরণের স্বতন্ত্র আভিজাত্যের উদ্ভব হল মিঞা তানসেনের জামাতা সিংহলগড় রাজপুত্র মিশ্রীসিংজীর প্রতিভাবলে। মিশ্রীসিংজী প্রথমটা তানসেনের গানের অনুসরণ কর্ত্তেন কিন্তু পরে তিনি তন্ত্র-সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পথ সৃষ্টি কর্‌লেন। তখন বীণার পরিবর্ত্তে সারেঙ্গী কণ্ঠসঙ্গীত অনুসরণের ভার ছিল—আর এ কাজে সারেঙ্গীর তুল্য যন্ত্র হিন্দুস্থানে সত্যই নেই।

হিন্দুস্থানী তন্ত্র-সঙ্গীতের পৃথক ও স্বাধীন সত্তা হল রাগালাপ নিয়ে। রাগালাপ মানে হচ্ছে রাগের অখণ্ড প্রকাশ। গীতে পদ আছে ও সেই পদ বিশেষ বিশেষ তালে নিবদ্ধ। কিন্তু আলাপে কবিতা বা পদ নেই—ঈশ্বরের নাম যা উচ্চারণের পক্ষে সুবিধাকর অথবা কতকগুলি সাংকেতিক শব্দে আলাপ গাওয়া হয়। তালের বাঁধনও তাতে অপরিহার্য্য নয় বরঞ্চ তালের বাঁধন থেকে মুক্ত রাগের স্বাভাবিক লয়েই আলাপ সমধিক প্রচলিত। তাল না থাক্‌লেই যে লয় ও ছন্দ থাক্‌বে না তা বলা যায় না। আলাপের কাজ হচ্ছে প্রতি রাগের স্বাভাবিক স্বরবিন্যাস ও লয়ের বিকাশ। তাতে রাগের নিছক অলঙ্কারবর্জ্জিত রূপের প্রকাশও হতে পারে আবার রাগের নানা অঙ্গের নানা অংশের বিভিন্ন কলার বৈচিত্র্যময় বিকাশও দেখানো যেতে পারে। নিছক স্বরূপ পরিচয়ে রাগবিস্তারের দরকার হয় না, অলঙ্কার, গমক, তান প্রভৃতির বাহুল্য বাদ দিয়ে শুধু রাগের প্রধান প্রধান সুর ও সেই সব সুরের প্রধান যে বিন্যাসে রাগ গঠিত হয়, তাই একেবারে খুলে দেখানো হয়। কিন্তু রাগবিস্তারে এক সঙ্গে সবটা রাগ না খুলে ক্রমে ক্রমে নানা অলঙ্কার

গমক ও তানের সঙ্গে সঙ্গে রাগরূপ উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু বিস্তার মানে নিরর্থ অলঙ্কার বাহুল্য ও সুরের পূরণ অঙ্ক কষা নয়; যে দোষে আল্লা বন্দে খাঁর মত ওস্তাদ্‌ও দোষী। রাগবিস্তার মানে হচ্ছে যেসব বিশেষ অলঙ্কারে গমকে বা তানে বিশেষ বিশেষ রাগের বিশেষ ভঙ্গীর বিকাশ হয় তাই দেখানো। প্রতিরাগেরই নিজস্ব একটী রূপ ও ছন্দ আছে—তাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে সুরের ভোজবাজী দেখানোকে রাগবিস্তার বলে না। আলাপের তিনটী লয় আছে—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। বিলম্বিত আলাপ মানে ধীর সুললিত স্বর ও লয়ে রাগের প্রকাশ। বিলম্বিতে মীড় আঁশ ও মৃদুমন্দ গমকের প্রয়োগই শোভনীয়। বিলম্বিতের অপর চারিটী ভাগ আছে। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। অস্থায়ীতে রাগের গ্রহস্বর বা 'পকড়' থেকে আলাপ সুরু করে 'উদারা' ও 'মুদারা' গ্রামের মধ্যে রাগকে খুলে দেখাতে হয়। অন্তরাতে 'তারা' গ্রামের দুয়েকটী সুর নিয়ে রাগ প্রসারিত হয়। সঞ্চারীতে মুদারার মধ্য অংশ থেকে রাগ পুনরায় আরম্ভ করে বাদী সংবাদী, অর্থাৎ রাগের প্রধান সুরগুলিকে আরোহী অবরোহীর মিশ্রিত প্রয়োগে দেখাতে হয়। আভোগ অন্তরারই বিস্তৃততর সংস্করণ। এইভাবে বিলম্বিত আলাপ শেষ করে মধ্যলয়ের আলাপ সুরু কর্ত্তে হয়। মধ্যলয়ে গমকের ও অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ হয়—আবার একেবারে সিধে কাটা কাটা সুর প্রয়োগও করা যায়। দ্রুত ও মধ্যলয়েরই দ্বিগুণ লয়ে কাটা কাটা সুরের বিস্তার চলে। এই পর্য্যন্তই কণ্ঠ-সঙ্গীতে আলাপের শেষ হয়। মিশ্রী সিংজীর পূর্ব্বে যন্ত্র-সঙ্গীত বা বীণাতেও এখানেই আলাপ শেষ করা হ'ত। কিন্তু মিশ্রী সিংজী কতকগুলি নূতন বাজ বা বাদ্যপদ্ধতির আবিষ্কার কর্লেন। কণ্ঠ-সঙ্গীতের সঙ্গে সে বাজ-এর কোন সম্বন্ধ নেই। ঝালা, ঠোক্‌ঝালা, লড়ি, লড়গুথাও, লড়-লপেট, পরণ্‌ প্রভৃতি বীণার বাজকে এক কথায় তার-পরণ বলা যায়। তারপরণ মানে তারে যে পরণ্‌ বা মৃদঙ্গের বোল বাজে। এ জিনিষ পূর্ব্বে ছিল না মিশ্রী সিং মৃদঙ্গের অনেক বোল নিয়ে তন্ত্রকারী রীতির পরণ্‌ সাজালেন, তাকেই তারপরণ বলে।

এইভাবে মিশ্রী সিংজীর সময় থেকে আজ অবধি বীণার বিভিন্ন বাজ তার বংশে অর্থাৎ মিয়াঁ তানসেনের দৌহিত্র বংশে চলে আসছে এবং অন্যান্য গুণিগণও এই বংশ থেকেই বীণা শিক্ষা পেয়েছেন। সাহ সদারঙ্গ এ বংশের এক অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তিনি বীণা যন্ত্রের আলাপে মাধুর্য্য ও লালিত্য অনেক বৃদ্ধি করেছেন। রাগের মধ্যে বিচিত্র সুরের বর্ণসম্পাতে তাঁর গুণপনার তুলনা ছিল না—তিনি রঙের বাদ্‌শা ছিলেন। তাই তাঁর পৈতৃক নাম নিয়ামৎ খাঁর স্থলে বাদশা মহম্মদশা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'সাহ সদারঙ্গ'। সাহ সদারঙ্গের তুল্য বীণাকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাজ্যে কখনও হয়নি। অপরদিকে যন্ত্র-সঙ্গীতে মিঞা তানসেনের দানও সামান্য নয়, তিনি এক নূতন যন্ত্রের প্রচলন ভারতে করেন—তার নাম রবাব। শোনা যায় প্রাচীন কালে গ্রীস্‌ দেশে এই যন্ত্রের প্রচার ছিল। তা ছাড়া তিব্বতের বৌদ্ধ চিত্রে রবাবের অনুরূপ যন্ত্রের ছবি আমরা দেখতে পাই। মিঞা তানসেন এই প্রাচীন যন্ত্রটীর নবগঠন দিয়ে এক নূতন বাজ সৃষ্টি করেন। তাঁর দৌহিত্র বংশে বীণার চর্চ্চা ও সাধনা হতে দেখে নিজ পুত্র বিলাস খাঁর বংশের জন্য রবাব যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রবাবের স্বর কণ্ঠের অনুরূপ, তাই কণ্ঠসঙ্গীতসিদ্ধ তান-সেনের পক্ষে রবাবের প্রতি অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তানসেনের বংশ বা সেনীখান্‌দানে রবাবের বাদ্য-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ হয়ে এসেছে। বীণা যন্ত্রের সঙ্গে রবাবের আকারগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে বীণা বাঁশের তৈরী, সঙ্গে দুদিকে দুটী লাউ; আর রবাব কাঠের তৈরী, তার একদিকে একটী তোম্বা এবং তাতে চামড়ার ছাউনি। বীণার তন্ত্র হচ্ছে তার আর রবাবের তাঁত। দক্ষিণ হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলীতে মেজরাব প'রে বীণা বাজাতে হয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে চিকারীর তারে ছেড়ের প্রয়োগ হয়।

আর রবাবে বাঁশ বা কাঠের ছোট একটী খণ্ড, যাকে জবা বলে—তা দিয়ে ডান হাতে বাজাতে হয়। বীণার বাইশটী পর্দ্দা অচল ও মোমে আঁটা—সেই পর্দ্দার উপরে, তারে বাম হাতের দুই অঙ্গুলীতে সুর বার কর্ত্তে হয়—আবার

বাঁশের ডাণ্ডির অপর পাশে একটা ছেড়ের তার থাকে, বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে তাতে সময় সময় ঝঙ্কার দিতে হয়। এইভাবে উভয় হাতেরই তিন অঙ্গুলী বীণার বাজে লাগাতে হয়। রবাবে ডান হাতে জবা থাকে আর বাম হাতে কাঠের উপর তাঁতে নখ ঘ'ষে সুর বার কর্ত্তে হয়। রবাবে পর্দ্দা নেই। তাই বীণার প্রধান অলঙ্কার হচ্ছে মীড় বা কর্ষণ আর রবাবের অলঙ্কার হচ্ছে সুঁৎ বা ঘর্ষণ। বীণার মত সব অঙ্গের বাজই রবাবে আছে—তারপরণের সঙ্গতে মৃদঙ্গের ধ্বনির সঙ্গে রবাবের থালের আওয়াজ মিশে খুবই অপূর্ব্বতার সৃষ্টি করে। তবে রবাবের কতকগুলি অপূর্ণতা আছে; রবাবের সুর স্বভাবতই গম্ভীর কিন্তু সুঁতের দম কম হওয়াতে বিলম্বিতের কাজ তত ভাল হয় না ও বর্ষাকালে চাম্‌ড়ার ছাউনি শ্লথ হয়ে যায় এবং ইহার ধ্বনিও বিকৃত হয়। এই দোষগুলি সংশোধন করতে গিয়ে সেনী জাফর খাঁ এক নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তার নাম সুরশৃঙ্গার। সুরশৃঙ্গার রবাবেরই অনুরূপ সংস্করণ, তাতে চামড়ার ছাউনি নেই এবং তানপুরার মত একটা তোম্বা বা বড় লাউ ব্যবহার হয়—ডাণ্ডি কাঠের কিন্তু তার উপরে লোহার পাত বসানো। তাঁতের পরিবর্ত্তে তাতে লোহার ও পিতলের তার ব্যবহার করা হয়। ছেড়ের জন্য চিকারীর তারেরও ব্যবহার থাকে। এর পর থেকে রবাবীগণ সুরশৃঙ্গার ও রবাব এই উভয় যন্ত্রে আলাপের বৃহত্তর প্রকাশে সমর্থ হন। রবাব তাঁতের যন্ত্র, তার গম্ভীর ধ্বনিতে মধ্য ও দ্রুত কাজ ও তারপরণের বাহার খুব খোলে—কিন্তু বিলম্বিতে রবাব কখনও বীণের সমকক্ষ হ'তে পারেনি। সুরশৃঙ্গার সেই অভাব দূর কর্ল। লোহার পাতে তারের সহায়ে আঁশের পরিধি এত বেড়ে গেল যে বীণাতেও মীড়ের পরিধি তত হ'তে পারেনি। তা ছাড়া সুরশৃঙ্গারে বীণার চিকারীর কাজ ও বীণার অনেক অলঙ্কার অন্তর্ভুক্ত করে রবাবীরা তন্ত্র-সঙ্গীতের এক বিশেষ সমৃদ্ধি দিলেন যা পূর্ব্বে ছিলনা।

তন্ত্র-সঙ্গীতে এভাবে বীণকার ও রবাবীদের দানই শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ দান যা থেকে অন্যান্য সব রকম যন্ত্র-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। তন্ত্রকার বল্‌তে গেলে পূর্ব্বে রবাবী ও বীণ্‌কারদেরই বোঝাত। শ্রেষ্ঠ তন্ত্র-কারদের মধ্যে শাহ সদারঙ্গ, নির্ম্মল শা, জীবন শা ও ইদানীন্তন উজীর খাঁ বীণায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন—অপর দিকে রবাবীদের মধ্যে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বসদ্‌ খাঁ ও বাহাদুর সেন প্রভৃতির নামও চিরস্মরনীয় থাকবে।

বীণ্‌ রবাবে রাগের যে সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ মূর্ত্তি দেখানো হয় তারই ছোট সংস্করণ হচ্ছে সেতারের গৎ-তোড়া। সেতার যন্ত্রটী আমীর খসরু অনেক পূর্ব্বে তৈরী ক'রে গেলেও হিন্দুস্থানে তার প্রচলন ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে মিয়া তানসেনের অপর পুত্র সুরত্‌ সেনের বংশীয় কোনও সেনী এই যন্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন। কথিত আছে সে মসিদ্‌ খাঁ নামক কোনও সেনী দাসীপুত্র ছিলেন তাই তাঁকে বীণা রবাব প্রভৃতি অভিজাত যন্ত্রের পরিবর্ত্তে সেতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা কতটা সত্য জানি না, তবে মসিদ্‌ খাঁই সেতারের বর্ত্তমান বাজের প্রবর্ত্তক এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত এবং এ জন্যই সেতারের শ্রেষ্ঠ চালের বাজকে মসিদ্‌খাঁনি বাজ বলা হয়ে থাকে। মসিদ্‌ খাঁর খানদানি গুণিগণ জয়পুরে সেতারের এক ঘরানা সৃষ্টি করেন—এঁরাও সেনী বলে পরিচিত। বীণ্‌ রবাবের বৃহৎ সৃষ্টির ক্ষমতা যাদের রইল না, যাদের অত বৃহৎ প্রকাশের সামর্থ্য নেই, তারা ছোটর মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিকাশের জন্য সেতারের আশ্রয় নিল। সেতারে মজিদ্‌খানি গতে বীণায় কিছু কিছু কাজ অল্পের মধ্যে দেখানো হয়। মসিদ্‌খানি গতের আরম্ভ বিলম্বিতে। বিলম্বিতের নানা তান তালে বেঁধে প্রথম দেখানো হয়। তারপর রাগের মধ্যলয়ের জোড়ের টুক্‌রো ভরে ভরে গৎকে বাজানো হয়—শেষটা ঝালা ও ঠোকে দ্রুতের কাজও দেখানো হয়। বিস্তৃতি এতে তত থাকে না, সংক্ষেপে সবই দেখানো হয়।

মসিদ্‌ খাঁর ঘরানা ওস্তাদরা দিল্লী বা রাজপুতনাতে থাকতেন—পশ্চিম ভারতে তাঁদের বাস ছিল বলে তাঁদের বাজকে পছাওকি বাজ বলা হয়। এই বাজএ অমৃত সেন অতি প্রবীণ ও অতি মধুর বাদক ছিলেন। তাঁর পৈতৃক নাম ছিল হায়দর সেন কিন্তু তাঁর হাত এত সুমিষ্ট ছিল সে জয়পুরের মহারাজ তাঁর নাম অমৃত সেন রেখেছিলেন। অমৃত সেনের পর তাঁর বংশীয় আমীর খাঁ ও নিহাল সেন

উৎকৃষ্ট সেতারী ছিলেন। আধুনিক কালে নিহাল সেন ও ইমদাদ্ খাঁ মসিদ্‌খানি বাজএ অতুলনীয় ছিলেন।

পশ্চিম ভারতে সেতারের বাজ টিমে গৎকে আশ্রয় ক'রেই ফুটে উঠেছে—পূর্ব্ব ভারতে সেতারের অন্য এক বাজ-এর উৎপত্তি পরবর্ত্তী কালে হয়েছে। রবাবী ও বীণকারেরা তাদের কতিপয় শিষ্যদের জন্য সেতারের এক অভিনব বাজ-এর উদ্ভাবন করেন তার নাম রেখাখানি বা পূরববি বাজ। রেজা খাঁ এই বাজ-এর প্রথম বাদক। এই বাজ-এ গৎ দ্রুনী লয়ে চলে। মসিদ্‌খানি গৎ আলাপের বিলম্বিত ও জোড়েরই ক্ষুদ্র সংস্করণ—আবার দ্রুনী গৎ তোড়া বা পূরব্‌বি বাজ্ হচ্ছে তারপরণের ক্ষুদ্র সংস্করণ। পরবর্ত্তী লোকেরা ধৈর্য্য ধরে তারপরণের বৃহৎ বিস্তারে সমর্থ না হওয়ায় পরণের টুক্‌রো লঘু তালে বেঁধে সেতারের জন্য পূরব্‌বি বাজ-এর সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাজ-এ গোলাম মহম্মদ খাঁ সেতারী ও তাঁর পুত্র মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সভাসদ্ সাজাদ্ মহম্মদ্ খাঁ অতুলনীয় ছিলেন। কাশীর সেতারী বাজ পেরীজীও পূরব্‌বি বাজে অতি প্রবীণ ছিলেন।

তারপর এল সুরবাহার। গোলাম মহম্মদ্ ও তাঁর পুত্র সাজাদ্ মহম্মদ্ এর আবিস্কর্ত্তা। সুরবাহার সেতার যন্ত্রেরই একটু বড় সংস্করণ—সেতারের অপেক্ষা লাউ বড় ও ডাণ্ডিটা কিছু বেশী চওড়া। সেতারে বীণের আলাপের অনুকরণের চেষ্টাতেই সুরবাহারের সৃষ্টি। এই সুরবাহারের আবির্ভাবই হিন্দুস্থানী বীণাকরণের তিরোভাবের অন্যতম কারণ। সুরবাহার সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৎ তোড়ার কাজ সেতারে চললেও আলাপের জন্য বীণই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সুরবাহারের বাজ সহজ ও অল্প সাধনাসাপেক্ষ এবং এতে বীণের আলাপের বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের কিন্তু প্রকাশ সামর্থ্য থাকাতে সুরবাহারের ভক্তের সংখ্যা বাড়তে দেরী হল না এবং ক্রমশঃ আয়াসসাধ্য বীণাসাধকের সংখ্যা হিন্দুস্থান হতে লোপ পেতে লাগল। তাই আজ হিন্দুস্থানী বীণকারের এত অভাব ও বীণাকরণের পদ্ধতি এত লুপ্ত। সুরবাহার ও সেতারের পর বর্ত্তমান যুগে স্বরোদ যন্ত্রটী বিশেষ প্রচলিত হয়েছে। সেতার যেমন বীণার ক্ষুদ্র সংস্করণ তেমনি স্বরোদ হচ্ছে সুরশৃঙ্গার ও রবাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। স্বরোদে আলাপ বাজানো চলে, আবার গতে, বিশেষতঃ দ্রুনীগতে স্বরোদ সেতারকেও ছাড়িয়ে গেছে। স্বরোদে কাঠের তোম্বার উপর চামড়ার ছাউনি আছে—কাবুলে কাঠের উপর তাঁত দিয়ে রবাবের মত বাজানো হয়। কিন্তু ভারতে কাঠের উপর লোহার পাত বসিয়ে সুরশৃঙ্গারের মত বাজাবার রীতি। চামড়া থাকায় এর আওয়াজ অনেক দূর অবধি পৌঁছায়, যদিও আঁশের কাজ সুরশৃঙ্গারের মত সম্ভব হয় না সুরের দম কম হবার দরুণ। স্বরোদ যন্ত্রটীর ভারতীয় আকার দিয়েছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ গোলামালী খাঁ প্রমুখ কয়েকজন গুণী। শ্রেষ্ঠ স্বরোদীদের মধ্যে কৌকড় খাঁ আহম্মদ আলি, মোরাদালি খাঁ ও অধুনা হাফেজালি ও বাংলার রত্ন আলাউদ্দিনের নাম করা যেতে পারে।

সারেঙ্গীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কণ্ঠস্বরের অনুকরণে ও অনুসরণে সারেঙ্গীর তুল্য যন্ত্র ভারতে নেই। সারেঙ্গীতে মীড় ও আঁশ খুবই সুন্দর উঠে ও তানের খেলায় এর পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক। তবে এ যন্ত্রটী নটীদের গীতের সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার হওয়ায় বহুদিন ভদ্রসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়রূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু অধুনা পাতিয়ালার ওস্তাদ মম্মন খাঁ এই যন্ত্রটি স্বতন্ত্রভাবে বাজিয়ে উচ্চসঙ্গীতের আসরে বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। উচ্চসঙ্গীতে এর স্থান কেন হবে না তার কোনও সুযুক্তি থাক্‌তে পারে না।

নানাযন্ত্রে হিন্দুস্থানী তন্ত্রসঙ্গীতের বিকাশ কিভাবে হয়েছে তা আমরা দেখলাম। কিছুদিন পূর্ব্বেও হিন্দুস্থানী তন্ত্র-সঙ্গীত পৃথিবীর সঙ্গীত-জগতের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হতে পার্ত্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলেও সঙ্গীতের আদর্শ দেশে ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। এখন একটা সময় এসেছে যখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ সঙ্গীত শিক্ষা কর্ত্তে চান কিন্তু গত যুগের মত গুণী খুঁজে পান না। তবে এই অভাব সত্ত্বেও আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তোলা যেতে পারে যদি গতানুগতিক পথে না চ'লে নবতর রীতিতে যন্ত্রসঙ্গীতের বিকাশের চেষ্টা আমরা করি

এই সূত্রে দক্ষিণী তন্ত্রপদ্ধতি থেকে হিন্দুস্থানী তন্ত্রকারী রীতিতে কি কি উপাদান যোজনা করা সুশোভন তা নিয়ে যথেষ্ট ভাববার ও পরখ্ করার ক্ষেত্র আছে। এই উভয় রীতির সমন্বয় নিতান্তই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

বর্ত্তমানকালে বীণা সেতার প্রভৃতি যন্ত্র যেভাবে তৈরী হচ্ছে তাতে বৈঠকখানা ভিন্ন বড় সভাপ্রাঙ্গনে এসব বাজানো চলে না। হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রকারেরা যখন দিল্লীর দরবারে বা বড় বড় রাজসভায় বাজাতেন তখন তাঁদের বাজনা সে সব বৃহৎ সভার শেষ অবধি শোনা যেত। আবার এমন দিন এসেছে যখন সঙ্গীত বৈঠকখানার ক্ষুদ্র বিলাসকক্ষ ছাড়িয়ে বৃহৎ সম্মিলনীর বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজে লাগ্‌ছে। এই অবস্থায় প্রাচীনকালের যন্ত্রের গঠনের পুনরুদ্ধার ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রসংস্কার অতীব প্রয়োজনীয়। Loud Speaker, Microphone প্রভৃতিও আমাদের যথেষ্ট সহায়ক হবে।

সর্ব্বশেষে আমাদের আর একটী জিনিষ ভাব্‌বার আছে যে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত একক্‌ হবে অথবা বহু যন্ত্রের ঐক্যবাদনে পরিণত হবে। পাশ্চাত্যদেশে হার্ম্মণি যেভাবে রয়েছে তার ঠিক অনুকরণ না করেও আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের নিজস্ব ও মৌলিক ধারা থেকে হার্ম্মনি বা ঐক্যতানের পথ আবিষ্কার করাও সম্ভব। আমাদের তন্ত্রকারেরা অনেকে দুইজনে মিলে সেতার বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছেন। সঙ্গে মৃদঙ্গ বা তব্‌লার সঙ্গতও চলেছে। তাতে অনেক সময়ই পর্য্যায়ক্রমে একজন তন্ত্রকার শুধু মূল সুর বাজিয়ে গেছেন অপরজন সেই সময় তান, পরণ, তোড়া প্রভৃতি দেখিয়েছেন। এইভাবে দুইটী যন্ত্রের ঐক্যতান আমাদের দেশে ছিল। বহু যন্ত্রের ঐক্যতানে বিরাট এক হার্ম্মণির সম্ভাবনা আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতে নেই তা কে বল্‌তে পারে?

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

বদ্ধজীব

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

গোটা গায়ে দাদ তার অন্ধ কোন জন
প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে করিয়া গমন
বাহিরিতে নাহি পারে চেষ্টা যত করে,
একমাত্র দ্বার ছিল খুঁজে শুধু মরে।
দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে শেষে
দরজার কাছে প্রায় দাঁড়াইল এসে।
এমন সময় হ'ল ব্যাধির পীড়ন,
দেয়াল ছাড়ি দুই হাতে করে কণ্ডূয়ন।
দিগ্‌ভ্রম হ'য়ে গেল, মূর্খ পুনরায়
খুঁজে মরে দ্বার কোথা করি' হায় হায়।
এমনিই যায় দিন, বাহিরিতে নারে,
বিড়ম্বিত হতভাগ্য ঘোরে বারে বারে।
আবদ্ধ জীবের দশা এমনিই ঠিক,
কাছে এসে ফিরে যায় ঘুরি' চতুর্দ্দিক।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

সংস্কার

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গ্রীষ্মের ছুটি তখনও হয় নাই। ভোর হইয়াছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার-যবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত না হওয়ায় পলাসপুর গ্রামখানি দূর হইতে রূপকথার পুরীর ন্যায় নিস্তব্ধ নিঝুম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এখনও গ্রাম্যপথে লোক চলাচল সুরু হয় নাই। ইহারই মধ্যে পাঠশালার সংলগ্ন বকুলতলায় পাতাদি বগলে করিয়া ছেলেরা লুটোপাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের অবিরাম কোলাহলে বকুলতলাটি মুখর হইয়া উঠিল।

শরৎ পণ্ডিত পাঠশালার গুরুমশাই। তিনি অতি প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দাওয়ায় বসিয়া পরম নিশ্চিন্তে তামাক খাইতে খাইতে ছেলেদের লুটোপাটি লক্ষ্য করিতেছিলেন। গুরুমশাইয়ের সামনে খেলা করিতে ছেলেরা কেমন যেন কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল, কিন্তু খেলার নেশায় মত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গুরুমশাইয়ের অস্তিত্ব একদম ভুলিয়া গেল।

এমন সময় রায়েদের শঙ্করকে তেঁতুলতলায় দেখা গেল।

শঙ্করের বয়স অনুমান চল্লিশ। অল্প বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় সে আর বিবাহ করে নাই। গায়ে একটা বহু পুরাতন শতছিন্ন ঝলঝলে জামা,—ঠিক মত ফিট্ না হওয়ায় হাঁটুর নিচে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তৈলবিহীন অযত্নবর্দ্ধিত চুলগুলি সংস্কারের অভাবে জোট বাধিয়া গিয়া জটায় পরিণত হইয়াছে। চোখের চাহনিতে কেমন যেন একটা নির্ম্মম রুক্ষতা, সহসা চাহিয়া দেখিলে দেহ আপনা হইতেই ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। পাগলের মত বিড় বিড় করিতে করিতে লাঠি হস্তে সে আপন মনে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

বকুলতলার দিকে শঙ্করকে আসিতে দেখিয়া ছেলেদের খেলা বন্ধ হইয়া গেল। ছেলেরা তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

শঙ্কর রাগে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

গুরুমশাই কি একটা দরকারে বাড়ির মধ্যে গিয়াছিলেন। বাহিরে বিকট চীৎকার এবং আস্ফালন শুনিতে পাইয়া তিনি বকুলতলায় আসিয়া দেখিলেন রায়েদের শঙ্কর ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে এবং থাকিয়া থাকিয়া লাঠি দেখাইয়া তাহাদের শাসাইতেছে।

গুরুমশাইকে দেখিতে পাইয়া ছেলেরা একটু তফাতে যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল।

"কী হয়েছে শঙ্কর? অত চীৎকার করছিলে কেন" বলিয়া পণ্ডিত মশাই শঙ্করের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"দেখুন না, শরৎ দা, সকালবেলা থেকেই ছেলেগুলো আমার পেছনে লেগেচে! আমাকে ওরা পাগল ঠাউরেচে না কি?"

"ওদের কথায় কি রাগ করতে আছে, শঙ্কর? তবে আর ছেলের জাত বলেচে কেন? একটু পরে ওরা আপনিই থেমে যেতো।"

"সেই ছেলে কি না ওরা। সরুন তো একটু, এই লাঠি দিয়ে ওদের ঘা কতক দিয়ে দিই। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে'খন।"

"তোর মতলবখানা কি শুনি? মারধোর করে শেষে কি জেলে যাবি?"

"জেলে যাবো আমি? ওদেরই পাঠাবো, দেখে নেবেন।"

দূরে ছেলেরা হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

"দেখচেন তো, এখনও ওরা চুপ করলে না। শরৎদা, আপনি এর কোন বিহিত করবেন না?"

"আমাকে নিয়ে কেউ যদি ওরকম ঠাট্টাতামাসা করতো

আমি তাহলে কি করতুম জানিস্? মারামারির ধার দিয়েও যেতুম না। সকলকে কাছে ডেকে এনে পয়সা দিয়ে বলতুম— দেখা দেখি তোদের কেরামতি? কত পেছনে লাগতে পারিস একবার দেখি।"

"শেষে আপনিও কি আমায় পাগল বলচেন? কত বড় বংশের ছেলে আমি, আপনি তা জানেন?" বলিয়া শঙ্কর রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই বংশ-গৌরবের স্পর্দ্ধা শঙ্কর করিতে পারে।

পলাশপুরের বনিয়াদী বংশ বলিতে রায়েদের বোঝায়। এককালে ইহারাই প্রায় সমস্ত গ্রামখানির জমিদার ছিল। শোনা যায় ইহাদের আদি পুরুষ রাজীবলোচন রাজার দেওয়ান ছিলেন। হাতির চালায় তাঁহার টাকা আসিত। গাঁয়ের একপ্রান্তে যে প্রকাণ্ড দীঘিটি আছে ইহা রাজীব বাবুর একটা মস্ত বড় কীর্ত্তি। দীঘিটির নাম যমুনা। এত বড় দীঘি আট দশ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে একটিও নাই। সংস্কারের অভাবে দীঘিটি মজিয়া আসিয়াছে, তবুও উভয় কূলে দৃষ্টি চলে না। জল কাঁচের মত স্বচ্ছ।

এই দীঘি-খনন-সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

* * *

গ্রীষ্মকাল। নিশুতি রাতে ছাদে বসিয়া রাজীবলোচন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় ছাদটি ভরিয়া গিয়াছে।

"আমার একটা সাধ তোমায় পূরণ করতে হবে।"

"বেশ তো, শিবানী, কি তোমার ইচ্ছে আমায় বল?"

"একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা করবো।"

"ও:, এই কথা," রাজীবলোচন একটু হাসিয়া বলিলেন, "কালই এর ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

"কিন্তু একটা সর্ত্ত আমার আছে।"

"বল।"

"তোমার সব চেয়ে যে তেজী ঘোড়া আছে সে এক দৌড়ে যতদূর যাবে তত বড় পুকুর তোমায় কাটাতে হবে।"

"বেশ, তাই হবে।"

পরদিন সকালে রাজীবলোচন নায়েবমশাইকে ডাকাইয়া নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ঘোড়া ছুটিল। কিন্তু এমনই দৈবদুর্ব্বিপাক, ঘোড়া মাইল খানেকের কিছু উপর ছুটিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

তাহার পর হাজার হাজার লোক পুষ্করিণী-খননে নিযুক্ত হইল। ছয়মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পুষ্করিণী খনন-কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে গাঁয়ের ষোল-আনা লোক ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তন লক্ষ্য করিয়া রুদ্ধবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল।

রাজীবলোচন শিবানীকে সঙ্গে করিয়া পুষ্করিণী দেখিতে আসিলেন। শিবানীর কিন্তু পুষ্করিণী দেখিয়া মনঃপূত হইল না। বলিল, "এতটুকু পুকুর প্রতিষ্ঠা আমি করবো না।"

"কিন্তু ঘোড়া যে একদমে এর বেশী ছুটতে পারলে না।"

শিবানী এ-কথার কোন উত্তর দিল না।

রাজীবলোচন বলিলেন, "তোমার সাধ আমি মেটাবোই, যত খরচ হয় হোক।"

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইল বাড়ীর ঝি যমুনার নামে।

শিবানীর সাধ অপূরণ রহিয়া গেল। রাজীবলোচন মারা গেলেন।

শিবাণীর তখন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবার রোক চাপিয়া গিয়াছে। ইহার পর রাজীবলোচনের দুই পত্নী মিলিয়া যে পুষ্করিণীটি কাটাইল তাহার নামকরণ হইল "দু-সতীনে।" মাঠের মাঝখানে একটা পুকুর, গ্রীষ্মকালে এক ফোঁটাও জল থাকে না, মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া থাকে। বর্ষার জলে পুকুরটি যখন ভরিয়া উঠে তখন এক হাঁটুর বেশী জল হয় না।

* * *

রাজীবলোচনের পুত্র ব্রজবল্লভ মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া অতি দক্ষতার সহিত জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পিতার রাখিয়া-যাওয়া জমিদারীর কলেবর আরো বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। তাহার পর আসিলেন শিবপ্রসাদ। ইঁহারই হাতে জমিদারীর অধঃপতনের প্রথম সূত্রপাত। গদিতে বসিয়াই তিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দুই হস্তে অর্থের অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। বিদেশ হইতে টাকা আসা বহুদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু জমিদারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিলে কয়দিন

তাহা টিঁকিয়া থাকে? কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ক্রমশঃ শূণ্য হইয়া আসিল। জমিদারীর কিছু কিছু অংশ যে এখানে ওখানে বাঁধাও না পড়িল এমন নহে। দেনার দায়ে তখন কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়া হিসাব করিয়া চলিলে তাঁহার জীবনে কোনরূপ কষ্ট তো হইতই না এমন কি তাঁহার ছেলেপিলেদেরও রাজার হালে চলিয়া যাইত।

কিন্তু তাহা হইবার নহে। অন্তর্য্যামী অন্তরীক্ষে বসিয়া কলকাটি টিপিয়া দিলেন। দত্তপুকুরের পাড়ে সামান্য একটি অশত্থ গাছ লইয়া ঘোষালদের সঙ্গে শিবপ্রসাদের বিরোধ বাঁধিল। মালিকানা সত্ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া উভয় পক্ষ আদালতের শরণাপন্ন হইলেন। জলের মত টাকা খরচ হইতে লাগিল। শিববাবু জীবদ্দশায় ইহার ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল তিন পুরুষ পরে, তাও আবার প্রকাশ্য আদালতে নহে। মকদ্দমার জের টানিতে গিয়া উভয় পক্ষ তখন ফতুর হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের ঠাকুরদাদা কালীকিঙ্কর তখন জমিদার। গাঁয়ের দক্ষিণ দিকের প্রাচীন বটগাছকে সাক্ষী মানিয়া কালীকিঙ্কর বহুদিনকার জেরটানা ঝগড়া মিটাইয়া লইলেন। শিববাবুর স্বর্গগত আত্মা দূর হইতে ইহা অনুমোদন করিলেন কিনা তাহা বোঝা গেল না।

কাজেই শঙ্করের পিতা মৃত্যুঞ্জয় সম্পত্তি হিসাবে পাইলেন জরাজীর্ণ প্রাসাদোপম প্রকাণ্ড অট্টালিকা, কয়েক বিঘা জমি এবং কয়েক টুকরা পুরাতন আসবাবপত্তর।

ইঁহার সময় সংসারে উন্নতির ক্ষীণ আলো নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ-শিখার মত জ্বলিয়া উঠিল।

অর্থের সন্ধানে মৃত্যুঞ্জয় বিদেশে বাহির হইলেন। বাড়িতে রহিয়া গেল তাঁহার বৃদ্ধ মাতা, আর দুই পুত্র— শঙ্কর ও সুব্রত।

শঙ্করের তখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে। রাত্রে সে ঠাকুরমার কাছে শুইয়া তাহাদের বংশের অতি প্রাচীন কাহিনী এবং কীর্ত্তিকলাপের কথা রুদ্ধ আবেগে শোনে। দুঃখে তাহার সর্ব্বদেহ মন কেমন যেন অবসন্ন হইয়া যায়। চিন্তা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। সুব্রত তখন ছোট, ওসব বিষয় উপলব্ধি করিবার বয়স তাহার হয় নাই।

কনট্রাক্টরি করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ আশার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বসিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকার খানিকটা অংশ পঙ্কোদ্ধার করিয়া ফেলিলেন। পুনরায় দাস দাসীর কলরোলে বাড়ি মুখর হইয়া উঠিল।

অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত সৌখিন হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর আর একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। সব সময় তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসেন। পুরাতন আসবাবপত্তরগুলির আমূল সংস্কার হইল এবং ঘরের শোভা বর্দ্ধনের জন্য ইহারা পুনরায় যথাস্থানে স্থান পাইল।

প্রত্যহ সকালে চাকরবাকরেরা ঘরের আসবাবপত্তর ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রাখে। শঙ্কর ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া তত্ত্বাবধান করে। দেখিয়া শুনিয়া সব সময়ে ফিট ফাট থাকা, ঘরদোর পরিষ্কার করানো শঙ্করের বাতিকে পরিণত হইল। কোথাও এতটুকু জঞ্জাল দেখিলে চাকরদের সে রীতিমত বকুনি দেয়।

বছর দশেক পরে হঠাৎ একদিন ফটকায় সর্ব্বশান্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় আবার গৃহে ফিরিলেন। এতবড় একটা শক সহ্য করিতে না পারায় মাসখানেকের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

শঙ্করের সংসারে দারিদ্র্য আবার নির্ম্মম মূর্ত্তিতে দেখা দিল। চারিদিকে সংখ্যাতীত অভাব অভিযোগ। একদিক কোন রকমে ঢাকিতে যাইলে অপরদিক অনাবৃত হইয়া পড়ে। নিজেদেরই দুই বেলা দুই মুটো খাইবার সংস্থান নাই। ইহার উপর চাকরবাকরদের ভরণপোষণের কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম শঙ্কর স্বহস্তে করে। ঘরদোর পরিষ্কার করা, আসবাবপত্তর ঝাড়াঝুড়ি মায় ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্য্যন্ত, এইগুলি যেন তাহার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও এতটুকু জঞ্জাল থাকিবার যো নাই। সারা দিনমান ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া একটি ভাঙ্গা ঝুড়িতে সে সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে। নিশুতি রাতে গাঁয়ের সমস্ত লোক ঘুমাইয়া পড়িলে ঝুড়িটি নিজে লইয়া

গিয়া গাঁয়ের একপ্রান্তে সে ফেলিয়া দিয়া আসে। ধমনীতে যে পূর্ব্বপুরুষের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যে সংস্কারের তীব্র আলোক এতকাল সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এখন তাহা বিভিন্ন প্রণালীতে প্রকট হইয়া উঠিল। ইহাকে রোধ করার ক্ষমতা তাহার নাই।

সুব্রত ভিন গাঁয়ে গোমস্তার কাজ করে। বিনীদ্র রজনী অর্থ উপায়ের চিন্তা করিতে করিতে কাটিয়া যায়। সকাল হইলে পূর্ণ উদ্দমে সে কাজ করিতে ছোটে।

এতদিন শঙ্করের যে বাতিকটা ঘরের মধ্যে সীমবদ্ধ ছিল এখন তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাস্তায় এতটুকু নোংরা থাকিবার উপায় নাই। দেখিলেই শঙ্কর হাতে করিয়া সেটুকু পরিষ্কার করিয়া দিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা তাহার একমাত্র চিন্তা,—কি বাহিরে কি ভিতরে যেখানে হোক। এক একদিন সুব্রত রাতে বাড়িতে ফিরিয়া দাদার আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া অবশ দেহ লইয়াও খুঁজিতে বাহির হয়। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায় তেঁতুলতলায় নীচু হইয়া দাদা কিসের অন্বেষণে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"বাড়ি চল দাদা, রাত যে অনেক হ'ল। রাজ্যের নোংরা ঘাটা অভ্যেস তোমার গেল না দেখচি।"

"কোন জায়গায় নোংরা দেখলে যে থাকতে পারি না, সুব্রত।"

"বাড়ি এসো" বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়া সুব্রত দাদাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনে। দাদাকে খাওয়াইয়া সুব্রত পরে খাইতে বসে।

শিয়রে প্রদীপের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিছানায় শুইতেই সুব্রতর তন্দ্রা গাঢ় হইতে থাকে।

শঙ্করের চোখে ঘুম নাই। বিছানায় খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া সে বলে, "ঘুমোলি সুব্রত?"

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে সুব্রত বলে: "বড্ড ঘুম পেয়েছে, দাদা; শালারা যে খাটায় দু'দণ্ড সুস্থ মনে কথা কইবার আর সামর্থ্য থাকে না।"

"ঘরে তেল নুন নেই। কাল সকালে না আনলে রান্না চড়বে না।"

"কাল বেরোবার সময় পয়সা দিয়ে যাবো। মধুর দোকান থেকে যা দরকার নিয়ে এসো।"

"কারবার করে মিত্তিররা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলো। ওরা অনেক পয়সার মালিক, নয়?"

"তা হবে।"

"চুরি না করলে এত পয়সার মালিক চট করে হওয়া যায় না, কি বলিস?"

"হুঁ।"

"তুইও তো একটা ব্যবসা করতে পারিস?"

"পয়সা নেই। এইবার ঘুমোও, দাদা, প্রদীপের তেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে" বলিয়া সুব্রত জোর করিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দেয়। শঙ্কর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া ঠাঁকুরদাদার আমলে শতছিন্ন তালি-দেওয়া কোটটি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া শঙ্কর গায়ে দিল। সুব্রতর কাছে পয়সা চাহিয়া লাঠি হাতে তেলের ভাঁড়াটি লইয়া শঙ্কর মধুর দোকানের দিকে চলিল।

শঙ্করকে দোকানের দিকে আসিতে দেখিয়া মধু মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা টুল বাহির করিয়া রায়বাবুকে বসিতে দিল।

টুলে বসিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে মধু, সরষের তেলের এখন দর কত?"

"সাড়ে উনিশ টাকা, বড়কর্ত্তা।"

"বলিস কিরে! এই না সে-দিন সাড়ে ষোল করে নিলি, তোরা আমাদের আর বাঁচতে দিবি না, দেখচি।"

"কি করবো, বড়কর্ত্তা, বাজার যে ক্রেমে চড়চে।"

"তা হ'লে আমরা যাই কোথায়?"

"কি যে বলেন বড়বাবু—আপনারা হচ্চেন টাকার কুমীর। আপনাদের খেয়ে পরেই তো আমরা মানুষ। হাঁ, তেল কত দেবো?"

"এক সের দে। নুনটা এঁকপো-ই দিস। বেশী নিয়ে গেলে বড্ড নষ্ট হয়।"

মধু নুন-তেল ওজন করিতে বসিল।

টুলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উপর দিকে নজর পড়িতেই শঙ্কর দেখিতে পাইল বাঁশের শাডার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ঝুল জমিয়া আছে। মন ওমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘরের কোণে-রাখা মইটি লইয়া ঝুল ঝাড়িবার জন্য সে

মধু এতক্ষণ জিনিষ ওজন করিতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ শঙ্করকে মইয়ের উপর উঠিতে দেখিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "নেমে আসুন, বড়বাবু, পড়ে যাবেন।"

শঙ্করের নামিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সে মইয়ের উপর হইতে বলিল, "ঘরদোর এত নোংরা করে রাখিস কেন মধু? এগুলো সময় করে একটু ঝাড়তে পারিস না? দে দে ঝাঁটাটা এগিয়ে, ঝুলগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে যাই।"

"সে কি বড়বাবু! আপনি যাবেন ঝুল ঝাড়তে! আমায় আর পাপে ডোবাবেন না। আপনি শিগগির নেমে আসুন। আমি সময়মত ওগুলো পরিষ্কার করে নেবো," বলিয়া মধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর মত গেঁতো লোক আর দুটো দেখলুম না। এখন কথা রেখে ঝাঁটাটা এগিয়ে দে দিকি।"

মধু বড়বাবুর স্বভাব ভালো করিয়াই জানে। কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া সে ঝাঁটা গাছটি আগাইয়া দিল।

আধ ঘণ্টা ধরিয়া ঘরের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া শঙ্কর নামিয়া আসিল।

"কত হয়েচে রে মধু?"

"আজ্ঞে, পৌণে দশ আনা। আপনি ন' আনা দিন।"

সওদা করিয়া শঙ্কর রাস্তায় নামিল। নন্দীপাড়ার পথ ধরিয়া সে চলিয়াছে। বাইরের ঘরের জানলায় বসিয়া শশী তামাক খাইতেছিল।

"ও খুড়ো, অত হন হন করে কোথায় চলেচো? তামাকটা একটু টেনে নাও, তৈরী অম্ন ছেড়ে যেয়ো না।"

অগত্যা শঙ্করকে শশীর বৈঠকখানায় ঢুকিতে হইল। তেলের ভাঁড়টি এবং নুনের ঠোঙাটি মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "এখন আর বসবার সময় নেই, শশী; বাড়িতে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। সময়ে চাপাতে না পারলে সুব্রত কাছারিবাড়ি থেকে এসে খেতে পাবে না। দে হুঁকোটা এগিয়ে দে, শট শট করে দু' টান টেনে নিই।"

হুঁকোটা পাল্টাইয়া শশী শঙ্করের হাতে দিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া বারকতক টানিয়া শঙ্কর বলিল, "পয়সা খরচ করে দিব্যি বৈঠকখানা কংচিস, কিন্তু ঘরটা এত নোংরা করে রাখিস কেন বলতো? দু' দণ্ড বসতে যে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে!"

"কি করবো, খুড়ো, সময় করে উঠতে পারি না।"

"তা হ'লে সখ করে ঘর তৈরী করা কেন? ভেঙ্গে ফেলে দে। কোন ঝক্কিই পোয়াতে হবে না।"

"কথাটা সত্যি। কিন্তু কী করে তৈরী জিনিষটা ভাঙ্গি বল।"

"আজ আর সময় হয়ে উঠবে না। আর একদিন এসে ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে যাবো'খন," বলিয়া শঙ্কর শশীর হাতে হুঁকোটা দিল এবং জিনিষ দুইটি হাতে লইয়া শশীর কোন কথা বলিবার আগে সেঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করের দিনগুলি বেশ নির্ব্বিবাদেই কাটিয়া যাইত যদি-না পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা উঠিতে বসিতে লাগিত। ইহাদের লইয়া তাহার অশান্তির অবধি নাই। রগড় করিতে যাইয়া বাঁড়ুজ্জের নাতি সতীশ শঙ্করের তালি-দেওয়া শতছিন্ন জামাটি ছিঁড়িয়া দিল।

শঙ্কর রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল, "কি করলি বল তো, সতীশ? জামাটা পরবার যে আর আয় রইল না। ছোট ছেলে হলে না হয় কথা ছিল। তোর বয়সের যে গাছপাথর নেই।"

"কি করবো, শঙ্করদা, তোমার জামা যে পচা। হাত দিতে না দিতেই ছিঁড়ে গেল।"

"পচা না তোর মুণ্ডু।"

সতীশ ততক্ষণ পলাইয়া গিয়াছে।

সেইদিনই শঙ্কর সদরে আসিয়া সতীশের নামে চুপি চুপি একপ্রস্ত নালিশ ঠুকিয়া আসিল।

শমন পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে সতীশ কোর্টে হাজির হইল। মহকুমার হাকিম নালিশের কারণ শুনিয়া হাসিয়াই খুন।

সতীশ কোনরূপ ভনিতা না করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া আদালতের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

হাকিম মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন কাজটা সতীশের অন্যায় হইয়াছে। সুতরাং সতীশের তিনি দশ টাকা জরিমানা করিলেন। আদায় হইলে টাকাটা শঙ্করকে দেওয়া হইবে।

শঙ্কর বলিল, "আমার একটা আর্জ্জি আছে হুজুর।"

"বল।"

"ও টাকাটা নিয়ে আমি কি করবো ?"

"কেন ? একটা নতুন জামা কিনে নিয়ো।"

"পয়সার অত অভাব এখনো আমার হয়নি। ওকে টাকা দিতে হবে না। ও রকম কাজ যেন ও আর না করে।"

হাকিম লোকটিকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন, "বেশ তাহ'লে একটা দরখাস্ত করে দিয়ো।"

সন্ধ্যার পর স্তিমিত আলোকে শঙ্করকে ছেঁড়া জামাটি সেলাই করিতে দেখিয়া সুব্রত বলিল : কোর্টে গিয়ে কি করে এলে, দাদা ?"

"আমাদের নাম ডাক তো কম ছিল না, সুব্রত। হাকিমের কাছে কেস উঠতেই তিনি এক কথায় সতীশের দশ টাকা জরিমানা করে দিলেন।"

"ওই টাকা দিয়ে তাহ'লে এবার একটা নতুন জামা কিনো।"

"জরিমানার টাকাটা নিতে কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেকলো। হাকিমকে সেই কথাই বলে এসেচি।"

"তবে নালিশ করতে গিয়েছিলে কেন দাদা ?"

"ওর যাতে একটু হুঁস হয়।"

"এ জামার পেছনে আর পণ্ডশ্রম করো না, দাদা, এ পরে তুমি আর বাইরে বেরুতে পারবে না।"

"বাড়ি থেকে আর কোথাও বেরুবে না রে, সুব্রত।"

আজকাল পথেঘাটে শঙ্করকে বড় একটা আর দেখা যায় না যদিও-বা দৈবাৎ বাহির হয়, বাড়ির সামনে তেঁতুল গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গাঁয়ের লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার প্রত্যুত্তর করে মাত্র।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকে প্রকাণ্ড বাড়ির প্রতিটি কক্ষ সে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অর্থের অভাবে বাড়িটির সংস্কার না হওয়ায় কোন রকমে ঠেক খাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের জানলা দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! কাহারো-বা একখানি কপাট নাই। লোহার কব্জাগুলিতে জং ধরিয়া আছে, একটু টানিলেই হয়তো সবশুদ্ধ খসিয়া আসিবে। কোন কোন ঘরের ছাদ ফুটো হওয়ায় বৃষ্টিজলের দাগ লাগিয়া ঘরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কড়ি বরগাগুলি পড়-পড়, যে-কোন মুহূর্ত্তে বিপদ আসিলেই

তেঁতুলতলায় বসিয়া শঙ্কর তাহাদের নষ্ট ঐশ্বর্য্যের কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় ঘোষালদের নায়েবমশাই আসিয়া বলিলেন "রায়মশাই, একটা কথা আপনাকে বলবো ?"

"কি শুনি ?"

"এত বড় বাড়ি ক্রমশঃ নষ্ট হতে চলেচে। এক কাজ করুন না, সামনের দিকে দু'চারখানা ঘর রেখে বাড়ীটা বিক্রি করে দিন, সংসারে লোকজন বলতে তো আপনারা দু'জন।"

"বাড়ি বিক্রি করবো, আমি ? কেন কি হয়েচে ?"

"দিন কতক পরে যে সব পড়ে যাবে। এখনও আয় আছে। খানিকটা অংশ বিক্রি করলে যে টাকাটা পাবেন তাতে আপনাদের অংশ বেশ সারিয়ে সুরিয়ে নিতে পারবেন।"

"টাকার গরম দেখাতে আমার কাছে এসো না, মতি। বিশ্বাস না কর নিশুতি রাতে আমাদের গড়ের ধারে গিয়ে কাণ পেতে থেকো। শুনতে পাবে যখেরা এখনও আমাদের গচ্ছিত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। চাই কি একটু চেষ্টা করলে প্রচুর অর্থও মিলতে পারে। যাও না, একবার চেষ্টা করে দেখ না, নায়েবী করে খেতে হবে না। তোমার বংশধরেরা দু'চার পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি, মতি ?"

"না না, রায়মশায়, আপনার কাছে টাকার গরম দেখাতে আমি যাইনি। বলছিলুম কি—"

"থাক, ঢের হয়েচে মতি, তোমার কথা আর শুনে কাজ নেই," বলিয়া শঙ্কর রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তেঁতুলতলা হইতে উঠিয়া গেল।

কয়েক বৎসরের ব্যবধানে শঙ্করের শরীরে দ্রুত ভাঙ্গন ধরিয়াছে। বয়সের অনুপাতে এখন তাহাকে অত্যন্ত স্থবির বলিয়া মনে হয়।

কাজকর্ম্মের ফাঁকে শঙ্কর চিন্তা করে তাহাদের মধ্যে কে আগে মরিবে—সে না সুব্রত? এবং এই চিন্তাটি আরো তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া তোলে।

আরও একটি চিন্তা তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়; তাহারা মরিয়া গেলে দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা এই বাড়ি ভোগদখল করিতে আসিবে। এমনও হইতে পারে বাড়ি জমিজিরেত চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া লইয়া নকড়া ছকড়া দামে বিক্রয় করিয়া এখানকার পাট উঠাইয়া দিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইবে। না, না, সে আর চিন্তা করিবে না। রায় বংশের শেষ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী রসাতলে যাইলেও তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

স্থবির হইয়াও শঙ্করের কাজে বিরাম নাই। এখনও তাহার প্রাত্যহিক কর্ম্মপদ্ধতির একচুল এধার ওধার হইবার যো নাই। দেয়ালের কোণে মাকড়সার জালগুলিকে সে নষ্ট করে। ক্ষয়প্রাপ্ত অতি পুরাতন আসবাবপত্তরগুলিকে সে সযত্নে ঝাড়িয়া রাখে, হাতলবিহীন চেয়ারটার হারানো হাতোলটি খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া পেরেক দিয়া ঠিক করিয়া লয়। শার্শীর ভাঙ্গিয়া-যাওয়া কাঁচগুলির পরিবর্ত্তে মোটা পিজবোর্ড ব্যবহার করিয়া সে ইহার ফাঁক পুরণ করে। নিশুতি রাতে ঘরদোরের জমাকরা জঞ্জাল এখনও সে বাহিরে অতি গোপনে ফেলিয়া দিয়া আসে।

আজকাল ঘরের মধ্যে থাকিতে শঙ্কর খুব পছন্দ করে। নিত্য-ব্যবহৃত শতছিন্ন কোটটিকে এতদিনে সে রেহাই দিয়াছে, কিন্তু তবুও প্রত্যহ একবার করিয়া ইহাকে না ঝাড়িলে তাহার মন উঠে না।

একদিন দোতালার জানলার ধারে দাঁড়াইতেই হঠাৎ তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দোতলার পুবদিককার জানলায় দাঁড়াইলে মিত্তিরদের প্রকাণ্ড নূতন অট্টালিকার পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। জানলার গরাদ ধরিয়া দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইল মিত্তিরদের বাড়ির ফটকের পার্শ্বে একতালার কার্নিসে লোকচক্ষুর অন্তরালে কতকগুলি আগাছা আপনা হইতেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

শঙ্করের মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। মিত্তিরদের কেউ বড় একটা এখানে থাকে না—কাহাকে সে এ কথা বলিবে? ইহার উপর এখানকার বাড়ি, জমি জিরেত তত্ত্বাবধান করিবার জন্য যে লোকটি সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছে সে অত্যন্ত বদমেজাদের লোক। কাহারও কথায় সে দৃকপাত করে না। অথচ আগাছাগুলিকে উপড়াইয়া না ফেলিলে দেখিতে দেখিতে ইহারা সমস্ত বাড়িটির উপর অবাধ আধিপত্য বিস্তার করিবে ইহাও সুনিশ্চিত। কথাটা তাহাকে লোকটির কাণে না তুলিলেই নয়।

কাজকর্ম্ম সারিয়া রাতে সুব্রত বাড়ি ফিরিতেই শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দেখেচিস মিত্তিরদের বাড়িতে কি কাণ্ড হয়েচে?"

"কি আবার হবে?"

"সে কি রে! মিত্তিরদের বাড়ির ফটকের পেছনে একতালার কার্ণিসের ওপর আগাছায় যে ছেয়ে গেচে। এটাও তোর চোখে পড়েনি, সুব্রত?"

"কই না, দাদা।"

"ওই লোকটার সঙ্গে দেখা করে ওগুলোর ব্যবস্থা করতে বলিস।"

আগাছাগুলি শঙ্করের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিতেছে। সুব্রত সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিলেই শঙ্কর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রত্যহ তাহাকে একই প্রশ্ন করে, "বলেছিলি সুব্রত?"

"না।"

"এক্ষুনি গিয়ে বলে আয়। তুইও দেখচি কম গোঁতো নস। আগাছাগুলো বাড়িটাকে যে নষ্ট করে দিচ্ছে।"

আগাছাগুলির কথা চিন্তা করিয়া শুইয়া বসিয়া শঙ্কর একটুও স্বস্তি পায় না। প্রত্যহ সে দিনের মধ্যে খুব কম পক্ষে বার পঞ্চাশ জানালার কাছে আসিয়া দেখে আগাছাগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। বাতাসের মৃদু কম্পনে তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। জঙ্গলে পরিণত হইতে আর বেশী দেরী নাই।

সুব্রতর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিতেই শঙ্কর বলিল : আজও ভুলে গেছিস তো?"

"না। লোকটার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললুম।"

"কী বললে?"

"বলবে আবার কি। তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—মাঝখান থেকে থামাকা আমায় কথা শুনতে হল।"

"তোকে অপমান করেচে নাকি?"

"ওর চেয়ে ড়'ঘা মার খেয়ে আসা ঢের ভাল ছিল, দাদা। যেই তাকে কথাগুলো বললুম লোকটা তো রেগেই খুন। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বললে, বাড়ির আলশেতে কোথায় দুটো আগাছা জন্মেচে তাই নিয়ে আপনার ঘুম ধরে না, বুঝি? ওগুলোর জন্যে আমার বাড়ি যদি জাহান্নমে যায়, যাক্‌। ও-ধরণের কথা আমাকে আর শোনাতে আসবেন না—যান। এখনও কানা হয়ে যাইনি, বুঝলেন।"

কথাগুলি শুনিয়া শঙ্করের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ইহার পর কোন কথা কহিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

নিস্তব্ধ রজনী। বাঙ্ময় পৃথিবী রাত্রির ধ্যানমগ্ন ধূসরতায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় পলাশপুর গ্রামটি ভরিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্করের চোখে ঘুম নাই। সুব্রত দাদার পার্শ্বে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

শঙ্কর বিছানা হইতে উঠিয়া আলো জ্বালিল। সেই পরিচিত ছেঁড়া জামাটি পরিয়া নীচে আসিল এবং জানালার ধারে রাখা মইটিকে লইয়া সে রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিল।

মইয়ে উঠিয়া সবেমাত্র সে একটি গাছ ছিঁড়িয়াছে এমন সময় কে যেন তাহাকে প্রশ্ন করিল "এত রাত্তে মইয়ে চড়ে ওখানে কী হচ্ছে?"

"আগাছাগুলো ছিঁড়ে দিচ্চি।"

"হুঁ। নেমে এস।"

"এগুলো আগে সব শেষ করতে দাও।"

"শিগগির নেমে এস বলচি।"

বাধ্য হইয়া শঙ্করকে নামিয়া আসিতে হইল, সব আগাছাগুলিকে সে ছিঁড়িতে পারে নাই।

"নিশুতি রাতে গাছ ওপড়াবার উপযুক্ত সময়ই বটে। ন্যাকামি রেখে এখন থানায় চল দিকি।"

আগাছাগুলিকে ছিঁড়িতে না পারায় শঙ্করের ক্ষোভের সীমা নাই। অন্যমনস্কভাবে বলিল, "বেশ, চল।"

সেদিন দুপুর বেলায় শশীদের বৈঠকখানায় পাশার আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। শশী, উপেন, তিনকড়ি আর হাবুল খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আশপাশে পাড়ার আরো অনেক লোক খেলা দেখিতেছে।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "শুনেচো হাবুলদা, শঙ্করদার খবর?"

হাবুল তখন ঘুঁটির চাল দিতেছিল, বলিল, "একটু দাঁড়া, বেজা, শুনচি।—হাঁ কি বলছিলি বলতো?"

"শঙ্করদার খবর শুনেচো?"

"কেন, কি হয়েচে তার?"

"শঙ্করদা শেষকালে জেলেই মারা গেল।"

"তাই তো, শঙ্করটা মরল গিয়ে শেষে জেলখানায়।"

উপেন বলিল, "ওহে শশী, তোমারও কি হাবুলার দেখাদেখি ভাব লাগলো, নাকি? নাও, এইবার চাল দাও দিকি। একখানা কচে বারো। এদিকে তা না হলে বাজী যে মাত হয়। অজ্ঞানদের ওইরকম করেই আত্মবলি হয়, বুঝলি?"

শশী পাশাটিকে ঠিক করিয়া লইয়া মেঝের উপর ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কচে বারো পাশা, ক—চে বা—রো। দেখলে তো হে উপিন, আমার হাতে পাশা কি রকম কথা কয়?"

"ওতে তোমার কোনরকম বাহাদুরী নেই, শশী। জানতো কথায় আছে, পড়ে পাশা তো খেলে কোদালের বাট।"

বিতর্কিকা

১। রাষ্ট্রভাষা এবং বাংলা বনাম হিন্দী

শ্রীসুশীলকুমার বসু

*মানুষ ও মানুষের মধ্যে যত রকম ব্যবধান আছে, ভাষার ব্যবধান তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও দুরতিক্রম্য। দূর দূরান্ত অতিক্রম করিয়া, সাগর গিরি লঙ্ঘন করিয়া এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষের কাছে যাইতে পারে কিন্তু, একে অপরের ভাষা না জানিলে, এই শারীরীকি সান্নিধ্য সত্বেও, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না, একে অপরের হৃদয়ের সন্ধান পান না, চিন্তা ও ভাবধারায় বিচ্ছিন্ন থাকে, সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার সংযোগ ঘটে না। ভাষার অপরিচয় হেতু দুইজন মানুষ মুখামুখি বসিয়া থাকিয়াও অপরিচিত থাকিয়া যান আবার স্থান কালের বাধা অতিক্রম করিয়া ভাষা মানুষ ও মানুষের সহিত সংযোগও ঘটাইতে পারে।

ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মের, নানা জাতির, নানা সমাজের, এবং নানা ভাষার লোক বাস করে এবং এই সকল ভিন্নতা আমাদের ঐক্যের পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা আমাদের এই সকল ভিন্নতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যে ভারতবাসীরা কখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবেন না, তাঁহাদের জাতীয়তার দাবী অনেকটা কাল্পনিক।

আমরা জানি, এই সকল বাধা যদিও আজ আমাদের পরিপূর্ণ ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে তবুও, একই সুখদুঃখ, একই স্বার্থ এবং একই ভাগ্যের অধিকার আমাদিগকে একই পথের যাত্রী করিবে—ইহা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে অনেকদূর একপথে লইয়া গিয়াছে। সহকর্ম্মিত্বের, আত্মীয়তার ও পরিচয়ের মধ্য দিয়াই একদিন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সীমারেখাগুলি বিলীন হইবে। কিন্তু, সেই সহকর্ম্মিত্ব, আত্মীয়তা ও পরিচয়ের জন্য সর্ব্বপ্রথমে চাই ভাষার সংযোগ। আজ যে আমরা অনেকটা এক হইতে পারিয়াছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত যে আজ পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ইংরাজী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতা। যদিও, একই বৈদেশিক শাসন হইতে উদ্ভূত একই দুঃখ ও অভাবের চাপ আমাদের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা দিয়াছে তবুও একথা সুনিশ্চিতভাবে সত্য যে, ইংরাজীভাষাই একমাত্র আমাদের মধ্যে সেই সংযোগ-সাধন সম্ভব করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ যে একযোগে কাজ করিতে পারিয়াছে, এক প্রদেশের নেতার নির্দ্দেশ বিভিন্ন প্রদেশে একই সময় অনুসৃত হইতে পারিয়াছে, বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের একত্র বসিয়া আলোচনা করা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে, একটা সুসংযত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলা সম্ভব হইয়াছে, তাহা শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষার কৃপায়। এই সংযোগ যাহাতে আরও ঘনিষ্ঠ হইতে পারে, ইংরাজীর সাহায্যে যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার পরিণতি যাহাতে আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এইজন্য ভারতীয় কোন ভাষাকে ভারতের সাধারণ ভাষার আসনে বসাইবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই ভারতবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজন রাজনীতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে বলিয়া এবং স্বজাতিকতাবোধের ইহাই কেন্দ্র বলিয়া (দেশীয় কোন ভাষাকে গ্রহণ করিবার মূলে আমাদের স্বাজাত্যের প্রেরণা রহিয়াছে) এই প্রচেষ্টা কার্য্যতঃ কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ অগ্রসর হইয়াছে।

* আমাদের বহুসংখ্যক পাঠকের অনুরোধে বর্ত্তমান মাস হইতে 'বিতর্কিকা' পুনরায় প্রবর্ত্তিত করলাম। বিঃ সঃ।

কংগ্রেস হিন্দীকেই এই গৌরবের আসন দিয়াছেন। মহাত্মাজী হিন্দীর সমর্থক হওয়ায় এবং কংগ্রেসে তাঁহার অসমান্য প্রভাব থাকার ফলে হিন্দীর পক্ষে এই গৌরব লাভ সম্ভব হইয়াছে,—হিন্দীভাষী নেতাদের প্রভাবও এদিকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

কোনও দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজীকেই ভারতের সাধারণ ভাষা এবং নিখিলভারত প্রতিষ্ঠান সমূহের ভাষা হিসাবে রক্ষা করা, (বাহিরের সহিত সংযোগের আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া) উচিত হইবে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র এবং সম্ভবতঃ তাহাই আমাদের পক্ষে অধিকতর লাভের হইবে। কিন্তু, কোন একটি বিশেষ ভারতীয় ভাষাকে এই উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলির দাবী যে সযত্ন নিরপেক্ষতার সহিত বিবেচনা করা উচিত ছিল হিন্দীকে নির্ব্বাচন করিবার সময় তাহা করা হয় নাই

হিন্দীকে যে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা হইল তাহার সমর্থনে বলা হইল যে, হিন্দী ভারতীয় অন্য যে কোন ভাষা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের দ্বারা কথিত হয়। কিন্তু হিন্দীভাষীদের সংখ্যার এই যে হিসাব ধরা হয় ইহাকেও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এদিক দিয়া বাংলার দাবীও দুর্ব্বল নহে।

প্রথমতঃ বিহারীর ন্যায় একটা গোটা স্বতন্ত্র ভাষাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হয়। অথচ, বিহারী একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। ইহাতে কমবেশী প্রায় তিন কোটি লোক কথা বলেন এবং ইহার মূল্যবান প্রাচীন সাহিত্যাদি আছে। যাহা বাংলারই একটা বিভাষা মাত্র, কয়েক লক্ষ লোকের মাতৃভাষা সেই আসামীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরা হয় অথচ, অন্যদিকে হিন্দীর সহিত প্রায় সম্পর্কহীন (বিভিন্ন আর্য্যভাষাগুলির মধ্যে যে জ্ঞাতিত্ব আছে তাহা ছাড়া) বিহারীকে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। বিহারীকে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাংলার প্রতি মাত্র এইটুকু অবিচারই করা হয় নাই। ভাষাবিদ অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বিহারীর সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সম্পর্ক অনেক নিকট। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাংলার সহিত মৈথিলীর পার্থক্য তদপেক্ষা কম। কাজেই বিহারীকে যদি অন্য কোন ভাষার অংশ স্বরূপ গণ্য করিতেই হয় তবে তাহাকে বাংলার অংশ বলিয়াই ধরা উচিত হইত। রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষাকে হিন্দী বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে অথচ ওড়িয়া বা আসামী প্রভৃতি ভাষার উপর বাংলার এই দাবী স্বীকৃত হয় না।

হিন্দীভাষীর মধ্যে যাহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় তাঁহাদের মধ্যে উর্দ্দুভাষীরাও আছেন। হিন্দী ও উর্দ্দুর পার্থক্য যে শুধু বর্ণমালায় তাহা নহে তাহার মূল যে আরও গভীর তাহা হিন্দী ও উর্দ্দুর দীর্ঘ বিবাদের ইতিহাস হইতেই অনেকটা বুঝা যাইবে। যাঁহারা উর্দ্দু শিখেন নাই, হিন্দীভাষী এমন লোকের পক্ষে উর্দ্দু বুঝিতে পারা শক্ত। হিন্দুস্থানীর মধ্যবর্ত্তিতায় হিন্দী ও উর্দ্দুর বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে যে হিন্দী এবং উর্দ্দু এক হইয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা কম। খুব বেশী হইলে হয়ত হিন্দীভাষী ও উর্দ্দুভাষী ইহাকে সাধারণভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন।

অন্যদিকে বাংলাভাষীদের যে সংখ্যা ধরা হয় তাহার মধ্যে অন্য কোন ভাষা বা উপভাষার লোক নাই। বরং এ সন্দেহ অনেকে করিয়া থাকেন যে বাংলাভাষী অনেক অঞ্চল বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় বাংলাভাষীদের প্রকৃত সংখ্যা ধরা পড়িবার পক্ষে বাধা হয়।

কাজেই, বিহারীকে যদি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরা হয়, যদি হিন্দী ও উর্দ্দুর পার্থক্যের কথা মনে রাখা যায় এবং আসামী ও বাংলার সীমান্তবর্ত্তী উপভাষাগুলির উপর বাংলার প্রভাবের কথা গণনা করা হয় তবে বাংলা ও হিন্দীভাষীদের মধ্যে কাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবেন তাহা সন্দেহের বিষয়। সাধারণভাষা নির্ব্বাচন করিবার সময় আরও একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। ভাষা প্রকৃতপক্ষে যাহারা ব্যবহার করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা যেমন দেখিতে হইবে, তেমনই এই ভাষা সহজে শিখিবার সুবিধা কত লোকের হইবে তাহাও দেখিতে হইবে। এই গণনায় বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অধিবাসীরা বাংলার অনুকূলে যাইবেন। কিন্তু, বাঙালীরা এ বিষয়ে

সজাগ নহেন বলিয়া, যথেষ্ট জোরের সহিত তাঁহারা নিজেদের দাবী উত্থাপিত করিতে পারেন নাই বলিয়া বাংলার দাবীর কথা কেহ বিবেচনা করে নাই। বাঙ্গালীরা যদি বাংলার দাবী যথোচিত শক্তির সহিত উত্থাপন করিতে পারিতেন এবং নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যাইত যে সাধারণভাষা হইবার দাবী বাংলা অপেক্ষা হিন্দীরই বেশী তাহা হইলেও বাংলা তাহার প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্য্যাদা পাইতে পারিত।

বর্ত্তমানে যে হিসাব ধরা হয় তাহাতেও সংখ্যার দিক দিয়া বাংলা দ্বিতীয় স্থানীয়। সাধারণভাষা হিসাবে যদি সকল ভারতবাসীকে হিন্দী শিখিতে হয় তবে বাংলার প্রতি সুবিচার করিয়া এ কথা বলা সঙ্গত হইত যে হিন্দীভাষীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা শিখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীরা যদি বাংলাভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে শক্তিশালী আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারেন, অপরকে বাংলা শিখাইবার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাইতে পারেন তবেই এ বিষয়ে তাঁহারা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন এবং সাধারণভাষা বলিয়া গণ্য হউক বা না হউক অ-বাঙ্গালীদের বাংলা শিখাইতে পারিবেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মাত্র কংগ্রেসের ফতোয়ার জোরে নয়, হিন্দীভাষীদের চেষ্টার ফলেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দীর প্রসার ঘটিতেছে। কিন্তু, এই প্রকার কোন চেষ্টা যাহাতে আরম্ভ হইতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করা চাই এবং বাঙ্গালীর আত্ম-বিকাশ ও আত্মপ্রসারের পক্ষে বাংলাভাষা প্রসারের আবশ্যকতা আছে একথা বুঝান চাই।

'বিচিত্রা'র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় 'বিতর্কিকা' বিভাগের প্রথম আলোচনা হিসাবে এই বিষয়টির অবতারণা করিতে দিয়া বিশেষভাবে আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মাতৃভাষানুরাগী সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি আগ্রহ সহকারে এই আলোচনায় যোগদান করেন তবে, দুরাশা হইলেও, এ আশা একেবারে অসম্ভব না হইতে পারে যে, এই সূত্র ধরিয়াই এই আন্দোলন একদিন দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে আরও অন্যান্য কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

২। উড়ানী vs বিনা উড়ানী

মুখোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় বিচিত্রা-সম্পাদক, বাঙালীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদ হইতে উড়ানীকে বাদ দিবার প্রসঙ্গ তুলিয়া কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই লইয়া সাধারণের মধ্যে একটু আলোচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পোষাক সম্বন্ধে এই আবশ্যকীয় আলোচনায় বিশেষ কেহ যোগদান করেন নাই। ইতিমধ্যে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আমি পুনরায় একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

একথা সত্য যে চাদর বহুকাল হইতেই বাঙালীর পরিচ্ছদের অঙ্গস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। তবে এ কথাও সত্য যে, সর্ব্বদেশে সনাতন নিয়মই জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোন জাতির অঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া থাকিতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তনে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার বাঙলার সহিত কিংবা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বকার বাঙলার সহিত আজিকার বাঙালার আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখনকার বাঙলায় চাদর ছিল—না হলেই নয়, আজিকার দিনে চাদর—ফেলিয়া দিলেই হয়। তখন বাঙালীর পোষাক ছিল—শুধু ধুতি আর চাদর; হরেক রকমের জামার কোন হাঙ্গামাই

ছিল না। সুতরাং উড়ানী ছিল তখন—অপরিহার্য্য। সে স্থান এখন জামা আসিয়া অধিকার করিয়া লওয়ায় চাঁদর এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক—সুতরাং পরিত্যাজ্য।

শুধু অনাবশ্যকই নয়, এই জিনিসটীতে বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। এই চাদর দ্রব্যটী এখন এতই অভদ্র এবং বে-আদব হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই স্কন্ধদেশে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না, কেবলি ভূমিসাৎ হইবার জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং পথ চলিবার কালে একটী হস্তকে সর্ব্বদাই উহার পিছনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। বাকী রহিল—একখানি হাত। কিন্তু সেই একখানি হাতের মুখাপেক্ষায় থাকেন—কোঁচা, ছাতা, ব্যাগ বা attache case, পোঁটলা-পুঁটলি প্রভৃতি। ফলে পথ চলিতে আমাদের বিষম বিব্রত হইয়াই পড়িতে হয়। সেদিন হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, এক চাদরধারী ভদ্রলোকের গলায় চাদরখানি হইতে হাত সরাইয়া লইয়া ঘাড় চুলকাইতে যাওয়ার ফলে, এক মুহূর্ত্তের ফাঁক পাইয়াই তাঁহার অবাধ্য চাদরখানি হাওয়ায় উড়িয়া একেবারে গঙ্গাস্নান সুরু করিয়া দিল। অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে বসা অবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিতে গেলে এই চাদর জিনিসটী কোন দ্রব্যে বাঁধিয়া গিয়া অনেক কাণ্ড বাধাইয়া বসে। সেদিন এক বায়োস্কোপের অভিনয় অন্তে দর্শকের দল যখন বন্যাস্রোতের মত ঠেলা ঠেলি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন দেখা গেল, কোন এক ভদ্রলোকের কাঁধের চাঁদর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আর এক ভদ্রলোকের মাথার পাগড়ী হইয়া উড়িতেছে।

যে জিনিসটীর কোন আবশ্যক নাই, অথচ যাহাকে লইয়া পথে ঘাটে এতই অসুবিধা, তাহাকে 'পুরাতন প্রথা' বলিয়া আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দেওয়াটা যে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ব্যয়ের দিক দিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অপরিহার্য্য ধুতী এবং জামার উপর পরিহার্য্য চাদর কিনিতে অর্থ ব্যয়টা অনুচিত। প্রথমতঃ চাদর কিনিতে খরচ। তারপর বরাবরই তার কাচাই খরচ আছে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, চাদর ফরসা থাকে কিন্তু জামা কাপড় তৎপূর্ব্বেই ময়লা হইয়া যায়। এ ব্যাপারেও এক মহা অসুবিধা। সুতরাং সব দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, এই অত্যাচারী দ্রব্যটীর প্রতি Capital Punishment দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই—অন্ততঃ Transportation for life!

অবশ্য আমাদের যদি দেবতাদের মত কিম্বা আদি পুরুষগণের মত ('ডারউইনে'র মতে) দুইটীর বদলে চারিটী করিয়া হাত থাকিত, তাহা হইলে না হয় সনাতন প্রথামত এই সনাতন দ্রব্যটিকে বুকে জড়াইয়া রাখিতাম এবং একটি হাতকে চাদর ধরিয়া রাখা কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন চাদরকে আর কি করিয়া রাখা চলে? চাদরকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। যাঁহারা পুরাতন প্রথার অত্যন্ত ভক্ত, তাঁহাদের বলি যে আমাদের বাপ ঠাকুর্দ্দা পথ চলিতে ছাতা লাঠি এবং গামছা ব্যবহার করিতেন, রাত্রে ঘরে ঘরে রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বালিতেন, রবিবারে মাছ খাইতেন না, সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, গোঁফ এবং দাড়ী দুই-ই রাখিতেন, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা দোষের বলিয়া মনে করিতেন, এবং এইরূপ আরও কত কি করিতেন কিন্তু এই সকল আমরা এখন মানি কি? সেকালে কোথাও যাইতে হইলে ঘরের মেয়েদের মধ্যেও চাদর ব্যবহারের প্রথা ছিল। কিন্তু এখন যদি পুরাতন প্রথা বলিয়া মা-লক্ষ্মীদের জর্জ্জেট সাড়ী ও ব্লাউজের উপর একখানা উড়ানী গায়ে জড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁরা যে কি করিবেন বা বলিবেন, তাহা ঘরের বাবুরা সহজেই ভাবিয়া লইতে পারেন। আমার শ্যালক একদিন আমার কথামত তাহার স্ত্রীর জন্য একখানা চাদর কিনিয়া পুরাতন প্রথা বজায় রাখিতে গিয়াছিল। শুনিয়াছি, বৌমাটি চাদরখানি পোড়াইয়া ফেলিয়া তার সঙ্গে তিনমাস কথা কহেন নাই।

চাদরধারীদের সর্ব্বশেষে আমি একটি কথা বলি। তাঁরা অন্ততঃ পনর দিনের জন্য, কেবল পরীক্ষার্থে বিনা চাদরে পথ চলিয়া দেখুন যে তাহাতে সুবিধাই বা কতটুকু আর অসুবিধাই বা কতটুকু। আমার এই সকল কথাকে যদি কেহ লাঙ্গুলহীন শৃগালের বক্তৃতা বলিয়া মনে করেন তাহাতে আমার দুঃখ নাই; তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করিবেন যে—বর্ত্তমানে যে কোন সভা সমিতি বা—জনতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উড়ানী vs বিনা উড়ানীর মোকর্দ্দমায় কি ভাবে উড়ানী পরাজিত হইয়া দিন দিন হঠিয়া যাইতেছে। আমার এই চাদর নিবারণী প্রস্তাবটীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে—সাধারণের নিকট হইতে সাড়া পাইবার আশা করি।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শাসননীতির নূতন রূপ

কোন দেশেরই রাজ সরকার জনমতের সমর্থন ব্যতীত টিঁকিতে পারে না—এমন কি পরাধীন দেশেও পারে না। কোন দেশ গায়ের জোরে, অস্ত্রের জোরে জয় করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু, গায়ের জোরে দেশ শাসন করা যায় না, পণ্য চালান যায় না, মূলধন খাটান যায় না; এ সকল উদ্দেশ্যে জনমতকে সপক্ষে রাখিবার চেষ্টা সব রাজসরকারকেই করিতে হয়। সরকারের শক্তি এবং নিজেদের অসহায়তা সম্বন্ধে লোকের মনে যখন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তখন শান্তভাবে লোকে সরকারকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছা সত্বেও হউক সমর্থন করিয়া থাকে। এই সময় জনমতকে পক্ষে রাখিবার জন্য সরকারকে কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। কিন্তু, এই অবস্থা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না,—জনসাধারণ ক্রমেই নিজেদের শক্তি উপলব্ধি করিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইতে থাকে, পৃথিবীর নানাদেশের রাষ্ট্রনীতিক ঘটনাবলীর মধ্যে তাহারা রাজশক্তির দুর্ব্বলতা ও প্রজাশক্তির ক্ষমতার প্রমাণ পাইতে থাকে, অন্যান্য দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তাঁহাদের মনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগায়, এবং অধিকার লাভের জন্য লোকে ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যে যাইবার জন্যও প্রস্তুত হয়। এ সময়ও অবশ্য রাজসরকারের শক্তির উপর জনসাধারণের বিশ্বাসরক্ষাই জনমতের সমর্থন পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপায়। এজন্য সব রাজসরকারই জনসাধারণের কাছে শক্তির প্রমাণ দিতে তাহাদের সম্মুখে শক্তির আস্ফালন করিতে কখনই বিরত থাকেন না এবং তরবারির উপরই যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা সে কথা বলিবার ও প্রচার করিবার কোন সুযোগই পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু, প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শুধু ভয় প্রদর্শনের উপর এই সময় কোন রাজসরকার ভরসা করিয়া নির্ভর করিতে পারেন না। কারণ পরাধীন দেশের লোকের মনেও যে সম্ভ্রমবোধ, উন্নতির ইচ্ছা এবং স্বজাতিপ্রীতি জাগে তাহা তাহাদিগকে বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধতা করিতেও উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে। সরকারের যদি যথেষ্ট শক্তি না থাকে তবে, তাঁহাকে বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। আর যদি শক্তি থাকে তবুও তরবারির জোরে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হয় না—সর্ব্বত্র অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে তাহা অশান্তির আকারে দেখা দেয়। সরকারের শক্তির ভয়ে যে জনমত এতদিন সরকারকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইত (এবং অভ্যাসের ফলে যে ভয় ভক্তির আকারে দেখা দিত) সেই জনমত সরকারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাবে গড়িয়া উঠে এবং বিপদের সম্মুখেও আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস সঞ্চয় করে। গায়ের জোরে এই অশান্তি দমন করিতে পারিলেও ইহার জন্য সরকারকে সব সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়, অশান্তির মধ্য দিয়া অসন্তোষ ক্রমে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে বলিয়া অন্য প্রকারের স্বার্থহানি ঘটে এবং জনসাধারণের যে বিপুল অংশ কোন প্রকার রাজনীতিক মতামতের বাহিরে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে, তাহারাও ক্রমে রাজনীতিক মতের আওতায় আসিয়া পড়ে ও অবশেষে অতিশয় শক্তিশালী সরকারেরও বিপদ ঘটাইতে পারে। এইজন্য জনসাধারণ (বিশেষ করিয়া কোন অধীন দেশের) যখন সরকারবিরোধী মতবাদের প্রভাবাধীন হইতে থাকেন তখন রাজসরকার একদিকে যেমন দৃঢ়হস্তে শক্তিপ্রয়োগ

করিয়া নিজেদের সবলতার প্রমাণ দিতে থাকেন তেমনই অন্যদিকে লোকের নবজাগ্রত সম্ভ্রমবোধ স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাঁহার জন্য নানাপ্রকারের কৌশল অবলম্বন করিতে থাকেন। নানাভাবে লোককে তখন তাঁহাদের বুঝাইতে হয় যে, তাঁহাদের আপাত অযৌক্তিক প্রভুত্বের পশ্চাতে মানবকল্যাণের সুমহৎ আদর্শ আছে, তাঁহাদের অবস্থানের ফলে শাসনাধীন দেশ অনেক দুর্গতির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে, শাসিত দেশের সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির এবং দেশবাসীকে সুশাসনের কৌশল শিক্ষাদানের জন্য তাঁহারা দেশ শাসন করিতেছেন প্রভৃতি অনেক কথা তাঁহাদিগকে প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুসারে বলিতে হয় এবং এই সব কথা সপ্রমাণের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের এমন কোন কোন নীতি অবলম্বন করিতে হয়, নিজেদের কথার অনুকূলে যাহার ব্যাখ্যা করিয়া লোককে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়। জনমত বা তাহার একাংশকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য ইহাদের অন্য যে সকল কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। ভারত শাসন ব্যাপারে কিছুদিন হইতে ভারত সরকারও যে বিশেষ সতর্কতার সহিত এদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন তাহা তাঁহাদের নানাবিধ সংস্কার চেষ্টার মধ্যেই দেখা যাইবে। কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে সরকারের সচেতনতা পল্লী উন্নয়নের চেষ্টা, কুটীরশিল্প প্রসারের চেষ্টা প্রভৃতি ইহারই নির্দ্দেশক। ইহাঁদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে ইহাও দেখা যাইবে যে, জনসাধারণকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং ভারতের স্বাজাতিক আন্দোলনকে শক্তিহীন করিবার জন্য ইহারা ভারতীয় নেতাদের এবং কংগ্রেসের অবলম্বিত কোন কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

জনসাধারণ অনুক্ষণ যে সকল দুঃখ ভোগ করিতেছেন, অর্থের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, সম্ভ্রমের, আত্মবিকাশের যে সকল অভাব অনুক্ষণ ভোগ করিয়া তাঁহাদের জীবন দুঃসহ হইয়াছে সেই সকল দুঃখ ও অভাব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে এই অবস্থার জন্য দায়ী এই কথা বলিয়া রাষ্ট্রীক অধিকার আদায় করিতে পারিলে, ইহার প্রতিকার হইবে এই আশ্বাস দিয়া জনসাধারণকে রাজনীতির দিকে আকর্ষণ করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা বলা যাইতে পারে। অন্যান্য দুর্গতি অপেক্ষা দারিদ্র্যের যাতনা তীব্রতর, অধিকতর দুঃসহ এবং ইহা সর্ব্বজনবোধগম্য। আমাদের নেতৃবর্গ এই দারিদ্র্যকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার ফল বলিয়া যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আর্থিক স্বাধীনতালাভের উপায়স্বরূপ তাঁহারা কুটীর শিল্পের পুনপ্রবর্ত্তনের কথা বলিলেন এবং একথাও বলিলেন যে ইহার দ্বারা রাজনৈতিক পরাধীনতার উপর চাপ দেওয়া হইবে। লোকের দারিদ্র্য অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর বেকার সমস্যা সমাজের সর্ব্বস্তরে তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে। কাজেই কাজ পাইবার গ্রাসাচ্ছাদন জুটিবার আশায় লোকে এদিকে আকৃষ্ট হইল। একথাটাও লোকে সহজে বুঝিল, পণ্যের বিনিময়ে অনেক টাকা বিদেশে যাইতেছে, না গেলে লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল থাকিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝিল যে অর্থের এই নিষ্কাশনে ইংরেজের স্বার্থ অনেকখানি রহিয়াছে। এইজন্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ লোকে সরকার বিরুদ্ধতার উপায়স্বরূপই গ্রহণ করিল। স্বদেশী প্রচার কথা এবং সরকারের বিরুদ্ধতা করা লোকের নিকট সমার্থবোধক হইল। স্বদেশী প্রচারের মধ্য দিয়া সরকারবিরোধীভাব দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল বলিয়া সরকার স্বদেশী প্রচারে বাধা দান করেন এবং ইহাও পূর্ব্বোক্ত ধারণাকে বদ্ধমূল করে। লোকে মনে করিতে লাগিল তাহাদের বাঁচিবার পক্ষে এদেশে পণ্য উৎপাদন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার অপরিহার্য্য। সরকার যখন ইহাকে বাধা দিতেছেন তখন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও ইহা করা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? সরকার যে জনহিতের কতটা বিরোধী স্বদেশীপ্রচারে তাঁহাদের বাধাদানের দৃষ্টান্ত দিয়া রাজনীতির নেতারা তাহা জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। সরকারও ক্রমে দেখিতে লাগিলেন যে, কঠোরহস্তে দমননীতি চালাইয়া শুধু শক্তির প্রমাণ দিলেই জনমতের

গতিরোধ করা যাইবে না। কাজেই, লোকের চিত্তজয় করিবার জন্য সরকারকে অন্য পথের কথা ভাবিতে হইয়াছে। ইঁহারা দেখিলেন কুটীরশিল্পের অল্প একটু-আধটু উন্নতি হইলে অথবা স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে বাধা না দিলে ইঁহাদের এমন কিছু ক্ষতির কারণ নাই। অথচ এই সব জিনিষকে আশ্রয় করিয়া যে সরকারবিরোধী মনোভাব দেশের মধ্যে ছড়াইতেছে প্রকৃত ক্ষতির কারণ সেইখানে। কাজেই, তাঁহারা কুটীরশিল্পে ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অন্যপক্ষ এতদিন যে সব কথা বলিয়া লোককে স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, সরকারও যখন সহসা সেই সব কথা বলিতে লাগিলেন তখন অপর পক্ষ অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। কারণ, লোকে মনে করিল, দেশোন্নতির জন্য স্বদেশীশিল্পের প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন ছিল, এবং যাহার প্রতিষ্ঠায় সরকার বাধা দিতেছিলেন বলিয়া সরকারের বিরুদ্ধতা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, সরকার নিজেই যখন তাহার সহায়তা করিতেছেন, তখন সরকারের বিরুদ্ধতা করিবার প্রয়োজনটা কি? যাঁহারা মনে মনে সন্দেহ করিলেন যে, এটা সরকারপক্ষের একটা চাল হইতে পারে, তাঁহারাও ভাবিলেন, স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠার মত এমন একটা বড় ব্যাপারে যদি সরকারের সহায়তা পাওয়া যায় তবে সে সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ইঁহাদের সহিত সহযোগিতা করাই উচিত হইবে।

গ্রামোন্নতি হোক, স্বাস্থ্যোন্নতি হোক, বেকারসমস্যা হোক, কৃষির উন্নতি হোক, শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হোক, পল্লী সংস্কার হোক, ম্যালেরিয়া তাড়াইবার চেষ্টা হোক, জনসাধারণের দুঃখ দূর হোক,—এতদিন যাহা কিছুর মধ্য দিয়া স্বাজাতিকতার প্রচার চলিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহার সবগুলিই সরকারি প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সরকার তাঁহাদের অনেক দাবী মিটাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এদিক দিয়া তাঁহারা ক্রমেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবার পক্ষে দমননীতি অপেক্ষা ইহাই অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

আমাদের কৃষকেরা এখনও রাজনীতিক মনোভাবাপন্ন হন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, দ্রুত কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। কৃষকদের সম্বন্ধে সরকারের সচেতনতা এবং তাঁহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য ইঁহাদের চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় যে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া কালে অসন্তোষ ছড়াইতে পারে বলিয়া সরকার আশঙ্কা করিতেছেন।

নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন কথা নহে। ইহার দ্বারা লাভবান হইবার লোক আছে বলিয়া শত নিন্দাবাদ সত্ত্বেও ইহার প্রশমনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বরং কিছুদিন ধরিয়া নানাস্থানে যেভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে তাহাতে ইহা ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। হাঙ্গামায় কার্য্যতঃ যাঁহারা লিপ্ত হন তাঁহারা সাধারণতঃ দরিদ্রশ্রেণীর লোক, এই সকল হাঙ্গামায় তাঁহাদের নিজেদের কোন প্রকার লাভ হয় না, তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়েরও কোন লাভ হয় না। বরং হাঙ্গামায় লিপ্ত এই দরিদ্র-লোকেরা বেকার অবস্থায় পতিত হইয়া, মামলা মোকর্দ্দমায় জড়াইয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশীদের সহানুভূতি হারাইয়া বিশেষ প্রকারের অসুবিধায় পতিত হন। এই সকল দরিদ্রের বহু দুঃখের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁহাদের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রভৃতি যে সকল কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন তাহা জনসাধারণকে ভুলাইবার একটা সুবিধাজনক উপায় মাত্র। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যে শুধু উভয় সম্প্রদায়ের আর্থিক ক্ষতি হয়, ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, লোকজন হতাহত হয়, নানাবিধ নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান হয় তাহাই নয়, ইহা সাম্প্রদায়িকতাকে নূতন জীবন ও শক্তি দান করে, অসাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টাসমূহের ফলে অনেক দিন ধরিয়া যেটুকু কাজ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং অসাম্প্রদায়িক ভবিষ্যৎ চেষ্টার পথ রুদ্ধ করে।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের নূতন চাল

পার্লামেন্টের রক্ষণশীলদলের সদস্যদের একটা ঘরোয়া

সভায় লর্ড জেটল্যাণ্ড কংগ্রেসের মন্ত্রীত্বগ্রহণকে লক্ষ্য করিয়া একটা নূতন চাল চালিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুদের সমুচ্চ গুণাবলীতে এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের গঠনশক্তিতে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে এবং বিশেষ নিরুৎসাহজনক অবস্থা সত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতের সেবায় প্রতিভা নিয়োগ না করিয়া তাঁহারা পারিবেন না।" ভয় প্রদর্শনে বা যুক্তিতর্কে যাহাদের কাবু করা না যায়, অনেক সময় প্রশংসা করিয়া তাহাদের বশীভূত করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের রাজনীতিকগণ এই কথাটা বুঝিতে না পারিবার মত শিশু নহেন। কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ অস্বীকার করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। কংগ্রেসে যাঁহাদের প্রাধান্য আছে তাঁহাদেব সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকিলেও তাঁহারা ধর্ম্মে অনেকে হিন্দু এবং সুকৌশলে তোয়াজ করিয়া হয়ত তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে শান দিয়া যাগাইয়া তুলা যাইতে পারে এবং কাজেও লাগান যাইতে পারে, সম্ভবতঃ লর্ড জেটল্যাণ্ডের এইরূপ ক্ষীণ আশা আছে।

নূতন শাসনতন্ত্রের সহযোগিতা করাই যে ভারতের সেবার একমাত্র পথ এই কথাটা না বুঝিয়া এবং ইহার প্রণেতাদের উদ্দেশ্যের গুণ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়াই ভারতবাসীরা যত গোল বাধাইয়াছেন।

গণ-সংযোগ সমিতির ইস্তাহারে কৃষকদের কথা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গণ-সংযোগ সাব-কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আবদুস সত্তর তাঁহার বিবৃতিতে কর্ম্মীদিগকে জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষকদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ভূমিব্যবস্থা, ঋণগ্রস্ততা এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত অন্যান্য যে সকল সমস্যার সহিত কৃষকদের জীবন বিশেষভাবে জড়িত সেই সকল সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাবের প্রতি আমাদিগকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সেই মনোভাবকে যথাযথভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।...জমিদারের কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর আমাদিগকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাহাতে কোন বে-আইনী আদায় হইতে না পারে তাহা দেখিতে হইবে।......" কংগ্রেস যদি কার্য্যতঃ জনসাধারণের বিশেষ করিয়া কৃষকদের স্বার্থ লইয়া লড়িতে পারেন, যেখানে ইঁহাদের স্বার্থের সহিত শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের বিরোধ আছে সেখানে সাহস করিয়া ইঁহাদের পক্ষসমর্থন করিতে পারেন, ইহাদিগকে অত্যাচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষার চেষ্টা করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু, তাহা হইলেও কংগ্রেস এদিক দিয়া একটু ভুল পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। ইহার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সহায়তা কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। সকল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার পক্ষেও দেশের রাষ্ট্রিক মুক্তি অপরিহার্য্য। কৃষকদের স্বার্থের পক্ষেও সেই কথা। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন স্বাধীনতালাভ না হইলে তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশা পুরাপুরি ঘুচিবে না, এবং প্রকৃতপক্ষে সেই স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করিবেন ও কংগ্রেসে তাঁহাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে না তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কংগ্রেসের অনুরক্ত হইবেন। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই বিশ্বাস উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন যে কংগ্রেসে তাঁহাদের দাবী যথাযথ গুরুত্ব পাইবে। এদিকে কংগ্রেস সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতিষ্ঠান—ইঁহাদের সকলের স্বার্থ সমান নহে, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। কাজেই, কংগ্রেস কৃষকদের দাবী মাত্র ততটুকু কার্য্যতঃ মানিয়া লইবেন যতটুকু না মানিলে কৃষকেরা কংগ্রেসে যোগ দিতে চাহিবেন না। কোন কৃষক ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের নিকট হইতে ইহা আদায় করিতে পারিবেন না, এবং ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিতে গেলে ঠকিবার এবং অনেক অল্পে সন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। ইহাতে কৃষকদের পূর্ণ সহানুভূতি কখনই পাওয়া যাইবে না। কংগ্রেসের নিকট হইতে ইহা আদায় করিতে গেলে কৃষক-

দিগকে শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। কংগ্রেসকেও কৃষকদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইলে শ্রেণী সমবায় গঠনে কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মতামত ও দাবীর কথা এই সকল সমবায়ের মারফতে জানিতে হইবে এবং কংগ্রেসের কথাও কৃষকদিগকে এই সমবায়ের মধ্য দিয়া জানাইতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকদিগকে কংগ্রেসের সভ্য করিবার চেষ্টা না করিয়া এই সকল সমবায়কে কংগ্রেসের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ও ইহাঁদিগকে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দিতে হইবে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের কথা বলিতেছেন বটে তবে, তাঁহাদের কাছে যাইতেছেন ব্যক্তি হিসাবে।

তবে কৃষক ও অন্যদের মধ্যে যাঁহারা প্রধানতঃ নিজেদের কৃষক বা সমাজের বিশেষ কোন আর্থিকস্তরের লোক মনে না করিয়া প্রথমতঃ নিজেদের হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান প্রভৃতি বলিয়া ভাবেন এবং তদনুযায়ী স্বার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যাইয়া মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া যদি কংগ্রেস তাঁহাদিগকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন তবে তাহাতে ইঁহাদের যোগদানে যেমন একদিকে কংগ্রেস শক্তিশালী হইবেন অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্ত্তে জাতীয়তার উদ্বোধনে সাধারণ ভাবে দেশ উপকৃত হইবে। যাঁহারা নির্য্যাতীত ও শোষিত শ্রেণীর লোক, তাঁহাদের মনে যে দিক দিয়াই হউক রাজনীতিক চেতনা জাগিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনাও জাগ্রত হইবে। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য তাহা হইতেছেনা।

ইস্তাহারে মুসলমানদের কথা

"কংগ্রেস কোন বিশেষ শ্রেণী বা শ্রেণী সমূহের প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা ভারতের সকল অধিবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবী করে এবং ইতিপূর্ব্বেই ইহা সকলের প্রতিনিধি স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কখনই ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের নামে কথা বলে না। তবুও, দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা বলিতে গেলে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিয়াছেন এবং তপশীলভুক্ত জাতিদের কংগ্রেস হইতে দূরে লইবার জন্য কোন কোন স্থান হইতে সযত্ন চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু-ভারত কংগ্রেসের পশ্চাতে রহিয়াছে, হিন্দুরা কংগ্রেসের আহ্বানে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছেন। এখন আমাদের, মুসলমানদিগকে অনুরূপ ভাবে ও অনুরূপ পরিমাণে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করিতে হইবে। আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিলে তাঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে আসিয়া পড়িবেন।" বাংলার মুসলমানদের কাছে এই আবেদন ব্যর্থ না হইলে আমরা সুখী হইব।

অর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি

আলোচ্য ইস্তাহারে বলা হইয়াছে (এখানেই অবশ্য নূতন বলা হয় নাই) যে, সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হোক এবং তাহার পরিবর্ত্তে অর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হোক্। ব্যক্তিগতভাবে যিনি যে ধর্ম্মের বা যে মতের লোক হো'ন না কেন ইহার ফলে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হইবেন।

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর লড়িয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমানে অর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতির কথাও বলিতেছেন। অর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িকতাও টিকিতে পারিবে না এবং এই উপায়ে কংগ্রেসের অনেক দিনের চেষ্টা সফল হইতে পারে। কিন্তু, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, অর্থনীতিক পন্থা গ্রহণ করিলে কংগ্রেসকে প্রথমে শ্রেণীসমবায়গুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কাহার দাবী তাঁহারা কতটা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন তাহা দেখিতে হইবে। ইহা না করিয়া যদি তাঁহারা মুখে মাত্র অর্থনীতিক কর্ম্মপন্থার কথা বলিতে থাকেন তবে লোকের মনে এমন সন্দেহ হওয়া অন্যায় হইবে না যে, তাঁহারা কথাগুলির সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন।

বাংলাভাষা প্রচলন

ব্যবহারকারীদের সংখ্যা হিসাবে ভারতে কথিত

ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার স্থান দ্বিতীয়। সমগোত্রীয় যে সকল ভাষাকে হিন্দীর সহিত গণনা করা হইয়াছে বাংলার প্রতিও সেই সুবিচার করিলে এবং বিহারীকে বাংলার স্বগোত্রীয় বলিয়া ধরিলে (অনেক ভাষাবিদের মতে তাহাই সত্য—বিহারী হিন্দী অপেক্ষা বাংলার অধিকতর নিকটবর্ত্তী) সংখ্যার দিক দিয়া হিন্দীর স্থান প্রথম থাকিবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবার দাবী যে বাংলার হিন্দী অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু সে কথা বাদ দিয়া এবং বাংলার সাধারণভাষা হইবার দাবী উত্থাপন না করিয়াও এ কথা বলা যায় যে বাঙ্গালীরা সচেষ্ট হইলে এবং অন্যান্য প্রদেশবাসীরা বাংলার ন্যায্য দাবী স্বীকারে অনিচ্ছুক না হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহুলোকে বাংলা শিখিতে পারেন। এ বিষয়ে হিন্দীভাষীদের চেষ্টা ও উদ্যম প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

যদিও, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অ-হিন্দীভাষীদের মধ্যে হিন্দী শিখিবার কিছু আগ্রহ দেখা দিয়াছে এবং হিন্দীর বিস্তারসাধনে তাহা সহায়তা করিয়াছে তবুও, হিন্দীভাষীদের বিশেষ প্রকারের উদ্যমশীলতা ব্যতীত হিন্দীর বর্ত্তমান জনপ্রিয়তা কখনই সম্ভব হইত না এবং বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিলে, এতটা না হইলেও, অনেকটা সফল যে তাঁহারাও হইতেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার এই যে, যাঁহাদের ভাষা হিন্দীর নিকটবর্ত্তী এমন অ-প্রধান ভাষার লোকেরা সহজে হিন্দী গ্রহণ করিতেছেন অথচ, বাংলা সম্পর্কে আসামের অধিবাসীদের পক্ষে এই কথা সত্য হয় নাই। বাংলার সীমান্তবাসীরা যাঁহাদের পক্ষে পূর্ণভাবে বাংলাভাষী হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, ক্রমেই বাংলা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন; যে সকল স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীরা বহু সংখ্যায় বাস করেন, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বাংলার কোন প্রসার ঘটে নাই। বাঙ্গালীরা যে কাহাকেও নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন না তাহা তাঁহাদের চরিত্রগত কোন দুর্ব্বলতার ফল কিনা, অপরদের প্রতি উদ্ধত, অনাত্মীয়বৎ, সহানুভূতিহীন ব্যবহারের ফল কি না, তাহাও আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ভাষার সংযোগ যে অপরিহার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দীর দ্বারা এই কাজ চালাইবার চেষ্টা আমাদের প্রায় সকল দলের নেতাদের সমর্থন লাভ করিয়াছে। বাংলার দাবী ন্যায়সঙ্গত হইলেও, বাংলার পক্ষ সমর্থন করিবার লোক নাই,—যাঁহারা আছেন, জনমতের উপর তাঁহাদের তেমন কোন প্রভাব নাই। অবশ্য, বহির্জগতের সহিত আমাদের সংযোগ রক্ষার অপরিহার্য্য আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিলে, হিন্দী বা বাংলা উভয়েরই পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রীক ও সাধারণ ভাষার স্থানে ইংরাজীকে রক্ষা করাই অধিকতর সুবিধার ও লাভের হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যাহাতে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন, পরস্পরের চিন্তা ও ভাবধারার সন্ধান রাখিতে পারেন, পরস্পরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে দূরে গিয়া না পড়েন তাহার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যবর্ত্তিতায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অপর কোন প্রধান জীবিত ভারতীয় ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে অবশ্য শিক্ষণীয় করা যাইতে পারে। এ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে এবং বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষার প্রতি অন্যদের অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারিলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষারও প্রসার সম্ভব হইত। কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না ;—হিন্দী সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি টিকিবে না।

হিন্দীকে যদি রাষ্ট্রভাষা বলিয়া আমরা ধরিয়াই লই এবং এই জন্য অ-হিন্দীভাষীদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষাটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলেও, এ আশা করা অন্যায় হইবে না যে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের প্রতি সুবিচারের জন্য হিন্দীভাষীরাও অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিখিবেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়দের মধ্যে ভাষার পার্থক্য হেতু যাহাতে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি না হয় বা

একযোগে কাজ করা অসম্ভব হইয়া না পড়ে তাহার জন্যই সাধারণভাষা হিসাবে বিশেষ কোন ভাষাকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দীকে এই সাধারণভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার ফলে অ-হিন্দী-ভাষীদিগকে তাঁহাদের মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দি শিখিবার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে অথচ হিন্দীভাষীদের পক্ষে অপর কোন ভারতীয় ভাষা শিখিবার দায়িত্ব থাকিবে না। অ-হিন্দীভাষীরা ভারতের ঐক্যের জন্য হিন্দী শিখিবার পরিশ্রম করিতে সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইবেন না। হিন্দীভাষীরাও যদি অপর একটি প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করেন তবে, অন্যদের অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না—অন্যদের সঙ্গে সমানই পরিশ্রম করিতে হইবে (নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিবার)। অ-হিন্দী প্রদেশগুলিতে হিন্দী গৃহীত হইলে সমগ্র ভারতের যোগাযোগ যেমন ঘনিষ্ঠতর হইবে, তেমনই হিন্দী-ভাষীরাও অন্যদের ভাষা শিখিলে এই যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িবে, অ-হিন্দীভাষীরা যেমন হিন্দীর সাহিত্য-সম্পদের সহিত পরিচিত হইবেন হিন্দীভাষীরাও তেমনই অন্যদের ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। যোগাযোগের ভিত্তি পরস্পরের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাহা অনেক বেশী দৃঢ় ও স্বাভাবিক হইবে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের লোকদের যেমন হিন্দি শিখিবার কথা বলা হইতেছে, হিন্দীভাষীদিগকে অন্যান্য ভাষা শিখিবার কথা তেমন কিছু বলা হইতেছে না। কিন্তু নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে তেমন কিছু বলা না হইলেও বাঙ্গালীদের পক্ষে এই প্রকার একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করা এবং হিন্দীভাষী-দিগকে বাংলা শিখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব নহে।

এপ্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, হিন্দী শিখিবার জন্য লোককে উৎসাহিত করা হইতে থাকিলেও, সেই উৎসাহের বশে বেশী লোকে হিন্দী শিখিতেছেন না। উৎসাহ দানের ফলে, যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন প্রদেশে কয়েক লক্ষ লোক প্রতি বৎসর হিন্দী শিখিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে অথবা অন্য কোন প্রকারে হিন্দী শিখাইবার জন্য আজও কোন বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করা হয় নাই।

নিখিলভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তা পাওয়া যা'ক বা না যা'ক বাংলাসাহিত্যানুরাগীরা সংঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে তাঁহাদের পক্ষে এ আন্দোলন সৃষ্টি করা অসম্ভব হইবে না যে হিন্দীভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিত। এ আন্দোলনে তাঁহারা অন্যান্য প্রদেশবাসীদেরও সমর্থন পাইতে পারেন। একথাটা এতটা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত যে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকা সম্ভব নহে। হিন্দীভাষী নেতারাও যুক্তিযুক্তভাবে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে পারিবেন না, কারণ ইহাতে হিন্দীর প্রাধান্য ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এ প্রকার আন্দোলন সফল হইলে বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় ভাষারও প্রসার ঘটিবে—যদিও, বাংলা সম্বন্ধে যথোচিত অনুরাগ সৃষ্টি করিতে বাঙ্গালীরা সক্ষম হইলে, বাংলা ভাষাই ইহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইত। একথা হিন্দীভাষী লোকদের পক্ষে মাত্র সত্য হইলেও, ইহার পরোক্ষ ফলে বাংলার ঐশ্বর্য্য ও শক্তির কথা অ-হিন্দীভাষীদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িত এবং তাঁহারাও অনেকে বাংলা শিখিতেন।

এ প্রকার আন্দোলন ব্যতীতও বাংলাভাষার অনেকখানি প্রসার সম্ভব। যদি এই আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তবুও বাংলাভাষার প্রসার প্রধানতঃ নির্ভর করিবে, অন্যদের মনে বাংলা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করিবার উপর। অন্য কোন প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি না করিতে পারিলেও যদি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা অন্যপ্রদেশবাসীদের মনে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিতে পারেন তাহা হইলেও বাংলা-সাহিত্যের বিস্তার ঘটিবে। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এবিষয়ে অনেকখানি করিতে পারেন এবং তাহা করিবার দায়িত্বও তাঁহদের আছে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জিনিস-গুলিকে ভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে প্রচারিত করিয়া, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বাংলা শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির ভাল অনুবাদ করিয়া, বিভিন্ন ভাষার সাময়িক পত্রিকাদিতে বাংলাভাষা

এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বিভিন্ন প্রদেশের প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিতে বাংলাপুস্তকের সমালোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে লোককে আগ্রহশীল করা যাইতে পারে। কিন্তু, এপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে বটে কিন্তু তাহার দ্বারাই মাত্র ভাষার প্রসার ঘটিবে না। এজন্য যদি সংঘবদ্ধ চেষ্টা চালান যায়, বাংলা শিখাইবার জন্য ভারতের বড় বড় সহরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সাহায্যে বাংলা লিখিবার মত পুস্তকাদি প্রণয়ন করা যায়, এক কথায়, এজন্য সংঘ গড়িয়া তুলিয়া ধারাবাহিক চেষ্টা চালান যায় তবে অনেকখানি সাফল্য সুনিশ্চিত। বাংলা ও আসামের আদিম জাতিদের মধ্যে এবং বাংলার সীমান্তের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের বাংলাভাষী জেলাগুলিতে বাংলাভাষা বিস্তারের ক্ষেত্র আছে।

বাংলাসাহিত্যের প্রতি অন্যেরা অনেক বেশী আকৃষ্ট হইবেন, যদি বাংলায় শুধু রসসাহিত্যের নয়, শিক্ষা, তথ্য ও গবেষণামূলক পুস্তক বহুল পরিমাণে লিখিত হয় ও বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট তাহা আদৃত হয়।

কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের ভাবিবার কথা

যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক যুবসম্মেলনের সভাপতিরূপে কংগ্রেসের কর্ম্মনীতির সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত এম-এন-রায় বলিয়াছেন :—

"জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস তাহাদিগকে সাহায্য করিতে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু, কি করিয়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হইবে তাহা বিশদ করিয়া বলা হয় নাই। ঐক্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইবেন বলিয়া, সমাজ পুনর্গঠনের সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনা এড়াইয়া যাওয়া হয়। কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা যাহাতে ভয় না পান তাহাই যদি স্বরাজ লাভের একটি সর্ত্ত হয় তাহা হইলে স্বরাজের জন্য যাহাদের আনুগত্য এত আগ্রহের সহিত পাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহাদের কাছে লক্ষ্যকে স্পষ্টতঃ শক্তভাবে আগাম বাঁধা রাখা হইল। সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতিকে বাধা দিবার সময় আমাদের নেতৃবৃন্দ সুনির্দ্দিষ্ট গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেও সমর্থন করিতে সক্ষম হইলেন না। যদি একটিকে প্রত্যক্ষ ভাবে ও অপরটিকে পরোক্ষ ভাবে বাদ দেওয়া হয় তবে কি আর অবশিষ্ট থাকে। জাতীয়তাপন্থী স্বরাজের আমলে ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র পার্লামেণ্টী গণতন্ত্র অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে; ভারতের আর্থিক বিধানকে আধুনিক করিবার জন্য এবং তাহার উপর নির্ভরশীল জাতীয় প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা যে সম্পত্তি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজন তাহাই থাকিয়া যাইবে। আন্দোলনের ইহাই রাজনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি এবং গোঁড়া জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত ইহা সংযুক্ত। স্বরাজ অতি সামান্য রাজনীতিক অবস্থান্তর হইবে মাত্র। জনসাধারণের বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্য অজ্ঞতা এবং অধঃ-পতনের জন্য মূলতঃ যে প্রাচীন সম্পত্তি-ব্যবস্থা দায়ী সমাজের অর্থনীতিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ভবিষ্যৎ আরও শঙ্কাজনক। শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা স্বরাজকে ফাসিস্ট্ একনায়কত্বে পরিণত করিবে। গোঁড়া জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে স্বরাজের রামরাজ অপেক্ষা হিটলাররাজ হইবার সম্ভাবনাই বেশী।"

আইন সভায় কংগ্রেসের রফা করিবার মনোবৃত্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :—

"শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু, শাসনতন্ত্র ধ্বংস করা আর আমাদের বর্ত্তমান নীতির অংশ নহে। সুযোগ পাইলে, শাসনতন্ত্রকে চালু করিবেন কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছেন।"

সমাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলিয়াছেন :—

"সমাজতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি অনেক আপত্তি শুনিয়াছি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব আপত্তি সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে নয়,—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও সাধারণ অর্থনীতিক প্রগতিই এ সকল আপত্তির লক্ষ্য ···গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যই রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনসমূহ আবশ্যক। যদি ভারতবর্ষকে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জনসাধারণকে আর্থিক দুর্গতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্বর্ত্তীতা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দুইটি জিনিস প্রয়োজনীয়; যে ভূমি বর্ত্তমানে উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান উপায় পরশ্রমজীবিগণ যাহাতে তাহার মালিক থাকিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা এবং যাহার ফলে জনসাধারণ রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে সেই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রহিত করিবার কথা ইহাতে উঠে না। যে ভূমি এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে সেই ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনই প্রয়োজনীয়। পরশ্রমজীবি করগ্রহীতার নিকট হইতে ইহা কৃষকের হাতে যাইবে মাত্র। এই ব্যবস্থার দাবীকে সমাজতন্ত্রের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলা হয়। সম্পত্তির এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছার ফলে গণতান্ত্রিক স্বধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। এমন কি ধনতান্ত্রিক পথেও দেশের স্বাভাবিক অর্থনীতিক উন্নতির পথে কৃষকদের দারিদ্র্য প্রধান অন্তরায়।"

বার্ম্মার দৃষ্টান্ত

'অল-ইণ্ডিয়া-পলিটিক্যাল-প্রিজনার্স-রিলিফ-কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাক্‌সেনা রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অক্ষমতা ও এবিষয়ে বার্ম্মার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া সংবাদপত্রের একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন:—বিনাবিচারে বন্দী ও রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে বাংলার প্রধান মন্ত্রী এখনও সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলিও এপর্য্যন্ত এদিক কিছুই করেন নাই—ওদিকে বার্ম্মা হইতে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সুসংবাদ আসিল—এমন কি গত বিদ্রোহের সম্পর্কে যাহারা গুরুতর দোষের জন্য শাস্তি পাইয়াছিল তাহাদেরও। কতটা বৈপরীত্য! বাস্তবিকপক্ষে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের পরিচয় দান হিসাবে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান করা প্রত্যেক মন্ত্রীমণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হওয়া উচিত ছিল। ইঁহাদের মুক্তির জন্য ব্যাপকভাবে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে এবং কোন মন্ত্রীমণ্ডলই ইহাকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনগুলি সাধারণতঃ শান্তিপূর্ণভাবে হইয়াছে এবং বার্ম্মাকে অনেকদিন ধরিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে; ইহা ব্যতীত বার্ম্মা ও ভারতের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বার্ম্মাবিদ্রোহের তুলনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য বিপ্লবাত্মক ঘটনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রীবর্গ তাঁহাদের কর্ম্মতালিকায় এই গুরুতর সমস্যাটির উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক রাজনীতিক বন্দী আছেন—ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সামরিক আইনের সময় এবং তাহারও পূর্ব্ব হইতে জেলে রহিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে অন্যদের কথা ছাড়াও চৌরিচৌরা ও কাকোরি মোকর্দ্দামার বন্দীদের মুক্তি অনেকদিন পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। সীমান্তপ্রদেশে গাড়োয়ালি এবং অন্যান্য বন্দীরা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় শাস্তি পাইয়াছিলেন।

নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত কংগ্রেস সহযোগিতা করিবেন কি না!

প্রাদেশিক গবর্ণরদের নিকট হইতে মন্ত্রীদের আইনানুগ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি যখনই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে চাওয়া হইয়াছিল তখনই আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম যে ইহার দ্বারা সহযোগিতা করিবার ইচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের এই সামান্য দাবীও প্রাদেশিক শাসকবর্গ পূর্ণ করিতে অস্বীকার করায়, এসম্পর্কে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত মনোভাবের প্রমাণ পাইবার সুযোগ হয় নাই। তবুও লোকের কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছে এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাকে

বারবার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে। যদিও সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে শাসনতন্ত্র ধ্বংস করা ব্যতীত কংগ্রেসের অন্য কোন নীতি থাকিতে পারে না তবুও কংগ্রেসের শক্তিশালী নেতৃবর্গ শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার নীতির যে নূতন ব্যাখ্যা দিতেছেন তাহার সহিত শাসনতন্ত্রকে চালু করিবার নীতির কোন পার্থক্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে না। কংগ্রেস যখন প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, তখনই একথা তাঁহাদের স্বীকার করা হইয়াছিল যে প্রতিশ্রুতি পাইলে তাঁহারা শাসনতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিবেন। মহাত্মাজীর প্রেরণায় ও চেষ্টায় এই প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছিল। তিনি এই সহযোগিতার কথা স্পষ্টভাবে বলিতে দ্বিধা করেন নাই। খুব দৃঢ়তার সহিত একথা বলিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন যে, এজন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইতেন। সম্প্রতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া কোন কাজ হইবে না। গঠনমূলক কাজের দ্বারা যাহাতে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে, এমন কাজ করাই উচিত হইবে!

ব্রিটীশ সরকারের যাঁহারা ভক্ত এমন লোকেরাও নূতন শাসনতন্ত্রকে খুব ভাল বলেন নাই—ইহার দ্বারা যতটা সুবিধা করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাই করিয়া লওয়া তাঁহাদের নীতি—অন্ততঃ তাহাই তাঁহাদের মুখের কথা। কাজেই, কার্য্যক্ষেত্রে, তাহা হইলে, কংগ্রেসের নীতির সহিত ইঁহাদের পার্থক্য কোথায় থাকিল। যদি কংগ্রেসের এই মতাবলম্বী নেতৃবর্গ এখন বুঝিয়াও থাকেন যে, শাসনতন্ত্র ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভুল হইয়াছিল এবং এখন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে সহযোগিতা করাই ঠিক তাহা হইলে সে কথা স্পষ্ট করিয়া জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। ইহাতে যাঁহারা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, তাঁহারা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

যৌবনের সীমা

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

প্রত্যেক মানুষেরই, বোধ হয়, ছেলেবেলায় – পার্থিব, অপার্থিব কতকগুলো বাসনা থাকে। শিশু-অবস্থায় মনেই আসে না যে এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় – সে ধারণা দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌তে থাকে। তখন মনে হয় – যা সে বড় হ'য়ে পাবে ভেবেছিল—সে জিনিষ অনেক দূরে স'রে গিয়েচে। জন্ম জন্মান্তর ধ'রে মানুষ এমনি কামনাপূর্ণ যে সে যা চায় তা পায় না—কেন না পেয়ে তার আশা মেটে না কোন দিনই ? অসন্তোষের মূর্চ্ছনা মনের ভেতর থেকেই যায়।

গোধূলিরও এমনি কতকগুলো ভাবনা ছিল তার শৈশবে। সে যখন মায়ের সঙ্গে যেতো মামার বাড়ী—ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করার অবসরে যখন সে দেখতো—কত ট্রেণ, কত মালগাড়ী এদিকে সেদিকে ছুটে চ'লে যাচ্ছে তখন তার সেই শিশু-মনে কত কি যে ভাবনা এসে জুটতো—তার সে কোন 'থল' পেতো না। তার মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছে অনিচ্ছের দ্বন্দ্ব ব'য়ে যেতো। অনেকক্ষণ ভাবার পর সে আর ভেবে উঠতে পারতো না। তার সেই ছোট্ট বুকখানিতে একটি আকাশ-জোড়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হয় তো রেহাই পেতে চাইতো অনিশ্চয়তার হাত থেকে। কিন্তু রেহাই আর পেতো না। আবার ভাবতো। ভাবতে ভাবতে শেষে তার মনে এই ভাবনাটাই প্রবল হ'য়ে রইতো যে বড় হ'লে এই রেল গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে কত দেশই সে না দেখবে—কত ছেলে আছে দেশে দেশে—ভাব ক'রবে তাদের সঙ্গে। এত নিশ্চয় হ'য়ে সে-সব কথা ভাবতো সে যে সেই সমস্ত ইচ্ছের অপূরিত হওয়ার অসম্ভবনীয়তার কথা এক মুহূর্ত্তও মনে জাগেনি তার। ভাবতো—রেলের যারা মালিক তারা যদি বিনা-পয়সায় ঘুরিয়ে আনে তাকে দেশ বিদেশে—তা হ'লে কতো মজা হয়! ভাবতো—রেলের মালিকদের সঙ্গে কেমন ক'রে ভাব করা যায়—ভাব করতে পারলেই খাসা হ'বে। এই কাল্পনিক আনন্দের ভাবনায় মন যখন তার মগ্ন—হয় তো তখন বিরাট ইঞ্জিন-দৈত্যটা সমস্ত ট্রেণখানাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে আস্‌তো—সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠতো লাইনগুলো—দুলে উঠতো প্লাট-ফরমখানা—আর তার সঙ্গে দুর-দুরিয়ে উঠতো গোধূলির বুকখানা। যাত্রীরা ট্রেণে ওঠবার জন্যে হুড়োহুড়ি, কোলাহল আরম্ভ ক'রলে—হারিয়ে যাবার ভ'য়ে গোধূলির মনপ্রাণ ছম্ ছম্ ক'রে উঠতো—যদি ভুল ক'রে অন্য কারুর সঙ্গে অন্য কামরায় উঠে পড়ে! তারপর ট্রেণে উঠে যখন সে-ভয় থেকে নিশ্চিন্দি হ'তো তখন আরম্ভ হ'তো আবার তার সেই ভাবনা।

কিন্তু ভগবান আজ তাকে ইচ্ছে মত সুযোগ না দিলেও তার কিছু পরিমাণ দিয়েছেন। এই তিন চার বছরের মধ্যেই—চৌদ্দ বছর পেরোতে না পেরোতেই বিয়ে হয়ে গেছে তার—দেখবার অনেক জায়গাই সে ঘুরে এসেচে। কিন্তু এতে সে তুষ্ট হ'তে পারেনি। ছেলেবেলায় যেটা তার মনকে প্রবল ভাবে আঁকড়ে ছিল আজ তার গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে গিয়েচে, অন্য অভাব তার মনকে এখন চেপে ধ'রেচে। ছেলে বেলায় দু-একটা স্পষ্ট বাসনা-ধারণার মধ্যে যে কত অস্পষ্ট, অযাচিত, অননুমিত বাসনা মনের আঁধি-সাঁধিতে মাকড়সার জাল বোনে—তা আমরা বুঝতে পারি তখন যখন মনের দরজা-জানলা খুললে সেখানে উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ করে। মনের এই দরজা-জানালা খোলায় তার ভেতর-কার অনেক কিছুই সংস্কৃত হ'য়ে যায়। তাই অনেক জিনিষ সেখান থেকে বেরিয়ে যায়—আবার অনেক জিনিষ নতুন ক'রে এসে ঢুকে পড়ে। গোধূলির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ইচ্ছার-ও পরিবর্ত্তন হ'য়েচে অনেক।

গোধূলির স্বামীর নাম রণেন। রণেন ই-আই-রেলের ছোট্ট একটা ষ্টেশনে কাজ ক'রতো এ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের পদে। মাইনে তার খুব বেশী নয়—এই গোটা সত্তর টাকা। রণেনের একটি বারো বছরের ছোট ভাই ছাড়া তার পোষ্য আর বিশেষ কেউ ছিল না। মনেন, রণেনের ভাই, তার কাছেই থাকতো—কাছে এক স্কুলে পড়তো।

ষ্টেশনটি ছোট। রেলওয়ে কোয়াটার্স ব'লতে মাত্র গোটা তিন-চার ছিল। চারিদিকে ফাঁকা শস্যক্ষেত। কোন ভূঁয়ে আখ, কোন মাঠে অড়হর, সর্ষে প্রভৃতি কত রকম ফসলে সারা বছর চারিধার আলো ক'রে রাখে। দূরে একটা বাগান—তাতে নানারকম ফল ও ফুলের গাছ। আশে পাশে ঝোঁপ ঝাঁপ।

অনেক লোকের মাঝে বাড়ীতে থাকার পর এই রকম একটা লোকবিরল ষ্টেশনে এসে গোধূলির মন গোড়া থেকে কি রকম বিষাদ-মলিন হ'য়ে পড়েছিল। পাশে ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে তাঁর এক মেয়ে ছিল। গোধূলির সমবয়সী না হ'লেও সে তার চেয়ে খুব বেশী ছোট ছিল না। বয়স তার পনেরো ষোলো হ'বে। গোধূলির চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট। তার সঙ্গেই গোধূলির বন্ধুত্ব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার মনের জন্যে মঞ্জুলার সঙ্গেও গোধূলি ভালো ক'রে মেলামেশা ক'রতে পারে না। তার জন্যে মনে মনে সে নিজেই লজ্জিত। চারিদিকের এই আকাশময় মাঠ, দুপুরের চোখ-ধাঁধানো রোদ, ঘুঘুর একটানা দুঃখের সর্ব্বস্বান্ত গানের সুর, সন্ধ্যেবেলায় ঝিঁঝিঁর ঘুম-ঝিমোনো, ঘুম পাড়ানো গান, দুপুররাত্তির তমসা-নিবিড়তা, জ্যোৎস্না রাতের একান্তবর্ত্তীতা—আর সবার ওপর তার এই অবরুদ্ধতা—তার যৌবনোদভ্রান্ত মনের ওপর যেন এক সন্ন্যাসিনীর ঔদাসীন্য এনে দিয়েচে। এতদিন এখানে সে রইলো—কিন্তু একদিনের জন্যেও তার মন টেকেনি। কতবার সে চেষ্টা ক'রেচে—তার মনকে দৃঢ় করবার জন্যে কিন্তু একটা দিনের জন্যেও কি সে মনকে বশাতে পেরেচে! সে জানে, সে বোঝে তার এই অন্যমনস্কতার জন্যে তার স্বামীর কত আকুলতা, কত অসোয়াস্তি! তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা গোধূলিকে সুখী করে। রণেন ভাবে—হয় তো সে বুঝতে পারে না গোধূলির মন, যদি গোধূলি তার মনের কথা খুলে বলে—যদি সাধ্যি থাকে—সে তার অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়, কি বিড়ম্বনা, গোধূলি তার মনের কথা খুলেও বলতে পারে না আবার লক্ষবার চেষ্টা ক'রেও নিজের মনকে সংযতও ক'রতে পারে না। গোধূলি নিজেই যে এর জন্যে দায়ী—তা ব'ললে ঠিক বলা হ'বে না। অযাচিত হ'য়ে আসে এমন ভাব তার মনে, তাড়িয়ে দিলেও যায় না। এই ভাবনায় তার রাতে পর্য্যন্ত ঘুম নেই। গোধূলি জানে—তার স্বামী তাকে আত্মসমাহিত থাকতে বিয়ে ক'রে আনেনি। তাঁর স্বামী হিসেবে একটা দাবী আছে আর গোধূলিরও স্ত্রী হিসেবে একটা কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু, তবু এত জেনে-শুনেও সে সুদূর নীলাকাশের জন্যে পাগল, দৃষ্টির বাইরের দেশের কথা তো দূরের, বোধ হয়, কল্পনার বাইরের দেশের জন্যেও গোধূলির মন আকুল, মায়া-বিহ্বল; জগতের সমস্ত লোকের সঙ্গে মিত্রতা করবার জন্যে উদাসভাবে উদ্ভ্রান্ত। বাইরে কিন্তু সে ধীর, স্থির, গম্ভীর। এমন মেয়েও যে সংসারে থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করা দুরূহ বৈ-কি ?

গোধূলি ভাবে সে তো কত বই প'ড়েচে—কত লোক কত রকম ভাবনা করে, তার অন্তরের ভাবনা তো কই তাদের কারুর ভাবনার সঙ্গে মেলে না, তার চরিত্রটা যে উপন্যাসের চরিত্রের চেয়েও আজগুবি! কেন তার দেশ ছাড়া, ছিষ্টিছাড়া ভাবনা! কেন তার এমন হলো। কোন কারণ খুঁজে পায় না সে। আপন মনের নির্জ্জন প্রান্তরে একলা দাঁড়িয়ে সে কত কাঁদে তন্ময় হ'য়ে, আঁচলে চোখ মোছবারও তার দিশে থাকে না। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হ'য়ে যায় তবু ভাবনা তাকে মুক্তি দেয় না। এর জন্যে কতবার ভগবানকে ডেকেচে সে। ভগবান কোন উপায় ব'লে দিয়েচেন কি না—তিনিই জানেন—সে কিন্তু কোন কিছুই খুঁজে পায় নি।

যতই সে ভাবে ভাবনা তার উত্তরোত্তর বেড়েই চলে অবিশ্রান্ত স্রোতের মত—অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন। কত দেশে কত রঙ বেরঙের, কত গন্ধভরা সুখস্পর্শ ফুল আছে, আরো কত রকম ভাবেই না আনন্দ ছড়ানো আছে। সেসবের

সঙ্গে কি তার পরিচয় হবে না? তার মনের গোপন বাসনা-গুলো কি সত্যি-সত্যিই চরিতার্থতা লাভ ক'রতে পারে না? মনকে সায় দিয়ে বলে, জোর করে বলে—না—জগতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সে তার ব্যতিক্রমণের কথা ভাবতে গিয়ে ভাবে—কেন অধিকাংশ লোক-ই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ সুখের মোহে এত বড় বড় আনন্দের সন্ধান হারায়। তার মনে হয়—হয়তো এমন বিরাট আনন্দোৎসের সন্ধান অনেকেই পায় না।

ষ্টেশনে ট্রেণ আসে—চ'লে যায় আর গোধূলির মনখানা ওলোট-পালোট হ'য়ে যায়। এই সময়েই যেন তার পাগলামিটা ঘাড়ে চেপে বসে। শ্রাবণমেঘের মত ভাবনা জমাট বাঁধতে থাকে। এমনি কত অকল্পনীয় ভাবনা ভেবেচে সে জান্‌লার গরাদ ধ'রে আকাশের পানে চেয়ে—উদাস দৃষ্টিতে। রণেনবাবু তাকে এমনি অবস্থায় অনেক দিনই দেখেচেন—কাজের ফাঁকে ফাঁকে। গোধূলির নিরুদ্দেশ-সমর্পিত মনের জন্যে তাঁরও ভাবনার অন্ত নেই।

সেদিন দিনটা মেঘলা-মেঘলা ছিল। বিকেল বেলা পানে দক্ষিণ আকাশে মিশ-কালো মেঘ থাকে থাকে জ'মে উঠেচে। কালো মেঘকে 'হামান্-দিস্তেয়' গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে কোন এক দৈত্য আকাশে জমা ক'রে রেখেচে হয়তো। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখ্‌লে দেখা যেতো যে কালো কালো মেঘের গুঁড়ো যেন ঝুর-ঝুরিয়ে প'ড়চে দিক দিগন্ত ভ'রে। দিনটা এমনি যে অতি সাধারণ মানুষের মনটাও উতলা হ'য়ে ওঠে; ভাবপ্রবণ গোধূলির তো কথাই নেই। আজ—এমনি দিনে—যেন তার জন্ম-জন্মান্তরের কথা মনে প'ড়তে লাগলো,—মনে প'ড়তে লাগলো কত অদৃশ্য ভুবনের কথা, রণ-রণিয়ে উঠলো কত পুরোনো স্মৃতি তার মনের নাট-মন্দিরে। আত্মহারা হ'য়ে সে ভাবতে লাগলো—ঐ মেঘের দেশে সেও একদিন ছিল কিনা কে জানে, হয় তো সে বারিধারার মত ঝ'রে প'ড়েচে একদিন পৃথিবীর বুকে; কত ফুলফলের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে তার দেহ জুড়িয়ে গিয়েছিল, সুকোমল তৃণ আলিঙ্গন ক'রে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়েছিল,—ভাবতে ভাবতে তার দেহ পুলকাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। একটু দূরে পাশ থেকে দাঁড়িয়ে রণেন্ তাকে দেখছিল—দেখে সেও বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল—গোধূলির ঐ নবরূপ দেখে। মনে হ'ল তার—গোধূলিকে সে এত কাছে কত রকম ক'রে দেখেচে কিন্তু এত সুন্দর তো আর কোনদিন দেখেনি—গোধূলি যেন চির-আকাঙ্ক্ষিত রূপকুমারী—চিরচাওয়ার কিন্তু চির না-পাওয়ার—রণেনের মনে হ'ল। সেদিনের সেই নিবিড়াভ অস্পষ্টতায় তাকে যেন কোন কল্পলোকের সুন্দরী ব'লে মনে হচ্ছিলো। সেই ভাসা-ভাসা চোখ, অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম, ভাব-মধুর মুখ—কত স্বাভাবিক সুন্দর ব'লেই না মনে হচ্ছিলো। রণেন নিজেকে প্রবুদ্ধ করে এই ব'লে—এমন জিনিষ পেয়ে হারিয়েও সুখ।

রণেন আস্তে আস্তে জানলার পাশে দাঁড়াতে গোধূলি তাকে অন্য কেউ মনে ক'রে সরে যাচ্ছিল। রণেন তাকে ডেকে বল্লে—'শোনো, শোনো, বলি, অমন উদাস হ'য়ে আছ কেন?' গোধূলি ভাবনার ঘোর কাটিয়ে নিয়ে বল্লে—'কেন?—না—তবে মনটা আজ বড্ড খারাপ—একেবারেই ভালো লাগচে না।' 'মন খারাপ ক'রে লাভ কি, বাপের বাড়ী যেতে চাও যদি, বল তা হ'লে, দিয়ে আসি—সেখানে কিছুদিন থাকলে যদি মন ভাল হয়'—এই ব'লে গোধূলির পানে আর একবার তাকিয়ে ষ্টেশনের দিকে গেল—কাজে।

রণেন তার night dutyর মাঝ থেকে এসে মাঝে মাঝে দেখে যেতো গোধূলিকে—যে সে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমুচ্চে না কি তার সেই ভাবনাতেই ডুবে আছে। রণেন প্রায়ই দেখতো গোধূলি ঘুমের ঘোরেও যেন কি বলে বিড়-বিড় করে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। গোধূলি রোগশয্যায় শুয়ে—দেহ ক্ষীণায়মান, লাবণ্য নির্ব্বাণোন্মুখ, মন আরও নিরুদ্দিষ্ট। পাশে রণেন ব'সে। গোধূলির কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লে যে জ্বরে সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুনের ফুল্‌কি ছুটছে। কপালে হাত দিতেই গোধূলি একবার চেয়েই চোখ বুজলো। রণেন শুধোলে—"কী তোমার হচ্চে বল? ডাক্তারকে সে সব কথা ব'লতে হ'বে তো? তা নইলে সারবে কেমন ক'রে? ডাক্তারবাবু ব'লে গিয়েচেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, ভালোভাবে শুশ্রূষা করলেই শীগ্‌গির সেরে উঠবে।" গোধূলি এসব কথার কোন উত্তর দেয়না। তবে মাথা

নেড়ে এইটুকুই জানায় যে তার বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কপালে হাত রেখে গোধূলি ভাবে : এ যাত্রা যদি সে বেঁচেই ওঠে তা হ'লে সে আর সেই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সংসারের মধ্যে থাকবে না—বেরিয়ে যাবে—হাঁ, লোকের অপযশ নিয়েই বেরিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রান্তহীন পথের বুকে—আর তারই মাঝে যত পান্থশালা আছে—সে সেখানের লোকেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রবে। আর যদি সে এ যাত্রা অনন্ত-পথের যাত্রীই হয় তা হ'লে সে ভগবানকে এই দোষই দেবে যে সে নিতান্ত অবিবেচক, অবিচারী, স্বার্থপর। যদি কোন দিন তাঁর সঙ্গে তার দেখা হয় সে বল্‌বে—'তুমিই না পরমকারুণিক নামের বড়াই কর? চরিতার্থ করবার শক্তি যদি আমায় না দিয়েছিলে তবে কেন তুমি আমায় অমন মারাত্মক বাসনা দিয়ে আমার সব কূল ভাঙ্‌লে?'

এক নাগাড়ে জ্বর আজ কতদিন হ'ল লেগেই আছে। এত ওষুধ-পত্তির পরও ছাড়তে চায় না। রণেনের ভাবনারও অন্ত নেই। ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীর ওরা এসে মাঝে মাঝে দেখাশোনা ক'রে গেলেও রণেন বেশ বোঝে যে সে একলা। রণেনের সমস্ত শরীরের ওপর একটা মলিন ছায়া এসে প'ড়েচে। গোধূলির রোগচিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে আরো কত চিন্তা এলো তার মনে। সে ভাবে হয়তো কপালে তার সুখ ছিলনা—তাই; নইলে সে যে-সামান্য সুখের সামগ্রী পেয়েচে তাও তো অনেকেরই ভাগ্যে জোটেনা। তার চেয়ে অভাবগ্রস্ত লোকও সুখে থাকে দেখা যায়! তার পুরোণো-দিনের স্মৃতির ছবিগুলো একবার এধার থেকে ওধার অব্‌ধি দেখা গেল। মনে-প'ড়ে গেল তার—একদিন কত অভিলাষই না ছিল তার। যেটুকু সম্বল সে জীবনে সঞ্চয় ক'রেছিল তাই নিয়েই সুখী হ'বে ভেবেছিল কিন্তু জীবনরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে বিধাতা অলক্ষ্যে উপহাস কোরছিল বোধহয় সেদিন। ভগবান যেন তার জন্যে একটা নতুন কিছু ষড়যন্ত্র করে তাকে এই রকম ক'রে পাকে ফেল্‌বার ব্যবস্থা ক'রে রেখেচেন—এই কথাই তার এখন বেশী মনে হচ্চে।

গোধূলির জ্বর এগোতে এগোতে গিয়ে বিকারে ঠেকেচে। ভুলও বক্‌তে আরম্ভ করেচে সে মাঝে মাঝে। ভুল-বকার মাঝে তার সেই আকুল তৃষ্ণার কথাই ধরা পড়ে যেন। যাক, অনেক সেবাশুশ্রূষায় গোধূলি সেরে উঠ্‌লো। সেরে উঠ্‌লো বটে কিন্তু যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিভাবে নয়। তার জীবনের সেই জাগ্রত স্বপ্ন—সেই ঘোর কেটে গিয়েচে—সে যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ, সে নিজেই চিন্‌তে পারেনা। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির মতন গত জীবনের সেই ভাবের একটু-আধটু আভাষ পায়: কোন কোন জিনিষের আশ্রয়ে যেন স্মৃতিগুলো আছে লুকিয়ে—যেমন থাকে পরিচিত অথচ বিস্মৃত কোন সুরভির মধ্যে কোন জিনিষের স্মৃতি। রণেন মনে করে ঠাট্টা ক'রে সে সেই সব কথা দু-একবার তোলে, কিন্তু ঘর-পোড়া গরু সে—ভরসা পায়না সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌তে। ভাবে কখন কি হ'য়ে পড়ে—তার চেয়ে ওতে আর কাজ নেই। এমনি ক'রে ভাবে-বিলাসে দু'বছর কেটে গেল ওদের। এরই মধ্যে তাদের সুখের সংসারে আর একটি সুখের সামগ্রী এসে জুটেচে—এর জন্যে তাদের দু'জনেরই অন্তরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ, মুখে সলজ্জ সুকুমার হাসি। গোধূলির মনে যেটুকু পূর্ব্বস্মৃতির রশ্মিচ্ছটা ছিল—সেটুকুও নিবে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে তার শিশু-সামগ্রীটির মুখের পানে তাকিয়ে। সেখানে তাকালেই যেন তার অন্তরের জন্ম-জন্মান্তরের কামনার নিষ্কৃতি হয়—সেই শিশিরাক্ত মুখের পানে চাহিলেই সে সারা পৃথিবীর শিশুর হাসিকান্না দেখ্‌তে পায়। অসুখের আগে তার জগত ছিল ঘরের বাইরে আর এখন তার জগত এসেচে ঘরের ভেতর! গোধূলি কি এখন বোঝে যে যে-সুখের জন্যে সে একদিন বাইরে ছুটে যেতে চেয়েছিল ঘরকে বাধা মনে ক'রে—সেই ঘরই আজ তার সেই সুখের-হ'বে। এর মধ্যে রহস্য যে কতখানি তা জানবার সময় আজ তার নেই—ইচ্ছেও নেই।

শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর
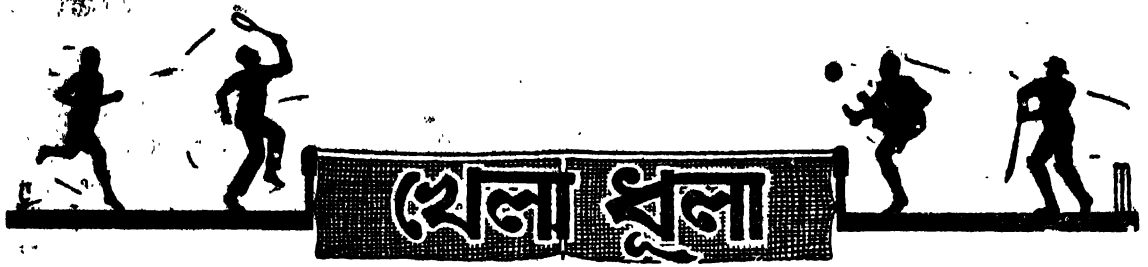
শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী এম্‌-এ

লীগের দ্বিতীয় হাফ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু খেলার মাঠে তেমন উৎসাহ আর দেখা যায় না। দর্শকদের ভীড়ও হয় না। খুব অল্প টীমই জয়ী হবার জন্যে প্রাণপণ করে খেলছে। কোন মতে লীগ শেষ হতে পারলেই খেলোয়াড়রা যেন বাঁচে। কারণ একা ডালহৌসি ছাড়া লীগের কোন টীমেরই বি, ডিভিসনে নাববার সম্ভাবনা নেই। লীগের গোড়ার দিকে এরিয়ান্সের অবস্থা ছিল শোচনীয় কিন্তু এরা লীগে ক্রমশঃ ভাল স্থান করে নিয়েছে। তারপর লীগ চ্যাম্পিয়ান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে মাত্র ক্যামেরনিয়ান্স ও মহমেডান দলের মধ্যে। আর বাকি টীমদের না খেললেই নয় সুতরাং মাঠে নাবা।

এবার নামজাদা খেলোয়াড়দের তেমন উচ্চাঙ্গের খেলা আমাদের চোখে পড়েনি। যেমন নূরমহম্মদ, সাবু, এস মজুমদার, এস দত্ত, করুণা, এস চৌধুরী প্রভৃতি। তারপর খেলার নিম্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে "রেফারিং" ঠিক পাল্লা দিয়ে চলেছে। অফ্‌সাইড, পেনালটী, ফাউল, ইচ্ছেমত দিলেই হল। এই রেফারিদের ফুটবল খেলার নিয়মকানুনের অল্প জ্ঞানের জন্য ফলভোগ করছে লীগের কয়েকটী ভাল দল। ভাল রেফারি থাকলে লীগের অনেক গেমের ফলাফল বোধ হয় অন্য রকম দাঁড়াত।

লীগের দ্বিতীয় হাফের গোড়ায় ক্রীড়ামহলে এক অভিনব ব্যাপার সৃষ্টি হয়। খেলাটী ছিল ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান। মাঠে লোকে লোকারণ্য! ইষ্টবেঙ্গলের দুই যাদুকর মুরগেস ও লক্ষীনারায়ণ পরপর ৪ গোল দিয়ে মহমেডানের ভক্তদের ক্রোধ বাড়িয়ে দিল। মহমেডানও দুই গোল দিয়েছিল কিন্তু লীগে মহমেডানের সর্ব্বপ্রথম পরাজয়ে ইষ্টবেঙ্গলের উল্লাস দেখে কে! ফলে খুনাখুনি, মারামারি—কয়েকজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালের স্মরণাপন্ন হতে হয়। রাত ৯টা পর্য্যন্ত পুলিশ পাহারা দেয় এবং এদেরই সাহায্যে ইষ্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা নিরাপদে বাড়ী ফিরে। সেদিন খেলায় রহমৎ গোল দিবার মুখে আহত হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী মিষ্টার ঘোষ ছুটে যায় তাকে শুশ্রূষা করতে কিন্তু হাবিব বা সত্তর তাকে আঘাত করে। I. F. Aএর জরুরী সভা বসল। হাবিব তিন বছর সস্পেণ্ড হলো এবং টীমটীকে সতর্ক করে দেওয়া হলো! এর প্রত্যুত্তরে মহমেডান আর খেলবে না জানাল। সেইজন্যে ব্যাপার গুরুতর দেখে মহমেডানদলের প্রেসিডেণ্ট স্যার নাজিমুদ্দিনকে দার্জ্জিলিং হতে নাবতে হল।—মহারাজ সন্তোষের সঙ্গে কয়েক দিন জরুরী বৈঠকের ফলে মহমেডান আবার খেলতে নেবেছে। হাবিব সম্বন্ধে I. F.Aএর বিচার এখনো শেষ হয়নি। খেলায় যা একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তাও নিবে গেল। মহমেডান খেলতে নেবেই প্রথমে দুর্ব্বল ডালহৌসিকে ২-০ গোল ও এরিয়ান্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে এখনো লীগের ১ম স্থান অধিকার করে আছে। খেলা হিসেবে মহমেডানের সেই সুন্দর উচ্চাঙ্গের খেলা আর নেই। নূর মহম্মদের নাম শোনাই যায় না—সাবু ও রহিম টীমের স্কোরার হিসেবে সম্মান পায় তবুও এঁদের মুগ্ধকর ক্রীড়ানৈপুণ্য কচিৎ দেখা যায়।

ক্যামেরনিয়ান্স এখনো দ্বিতীয় স্থানে—মহমেডানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের ডিফেন্স বেশ। কিন্তু ভাল স্কোরার নেই।

মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গলকে হারাতে পারলেই ক্যামের-

নিয়ান্স লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে কিন্তু এদের হারাবার মত শক্তি ও সামর্থ্য ক্যামেরনিয়ান্সের আছে কিনা সন্দেহ! এই দুটী খেলার ওপর লীগের অনেক কিছু নির্ভর করছে। লীগের তৃতীয় স্থানে আপাততঃ ভবানীপুর। নিয়ে ভবানীপুরের ক্রীড়াসাফল্য প্রশংসার যোগ্য। সেণ্টার ফরোয়ার্ড মাসুদ স্কোর করেছে ১৩।

সবাইকে টেক্কা মেরে ক্রীড়ামাঠে যে সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা এনেছে—সে ইষ্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান বনাম কাষ্টমস্। —খেলায় মোহনবাগান জয়ী হন।

এই প্রথম ১ম ডিভিসন খেলতে নেবে ভবানীপুর লীগের অনেক নামজাদা টীমদের হারিয়ে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। যদিও অখিল, আহমেদ, মাসুদ, আখতার হোসেন দিল্লীর খেলোয়াড় কিন্তু তরুণ খেলোয়াড়দের

লীগের প্রথম হাফে ইষ্টবেঙ্গলের পয়েণ্ট ছিল মাত্র ৫। বি, ডিভিসনে নামে আর কি! বাঙ্গালোর হতে মুরুগেস ও লক্ষ্মীনারায়ণকে আনা হোল, টীমের খেলার ধরণ গেল বদলিয়ে। পরপর গেমগুলিতে অতিসহজে চার পাঁচ

গোল দিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিল। কালিঘাট ও ইষ্টবেঙ্গল পয়েন্ট করল ১৬ আর একা মুরগেসই প্রায় ১৬টী
মহমেডানকে ৪ গোল এবং ক্যালকাটা ও কে, ও, এস, বিকে গোল দিয়ে লীগের সর্ব্বোচ্চ স্কোরার বলে সম্মান পেল
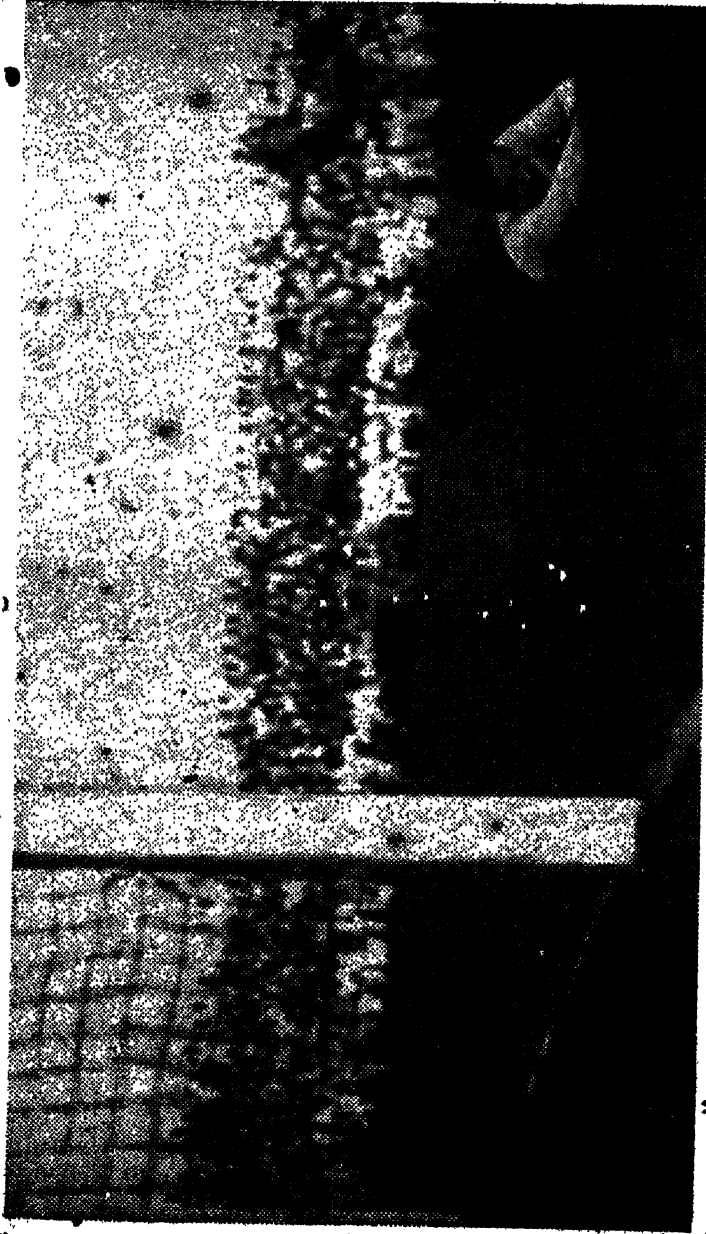
ক্যামেরনিয়ান্স বনাম ভবানীপুর খেলায় ক্যামেরিয়ান্সের গোলকীপারের গোল রক্ষার্থে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

। গোল দিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্রীড়ামাঠে এক নতুন রেকর্ড গত ১৯২৫এ লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুরগেস ইষ্টবেঙ্গলের হোয়ে
ল। এতবড় কীর্ত্তিও ইষ্টবেঙ্গল করতে পারে। ৮টী গেমে খেলেছিল। মুরগেসকে খারাপ খেলার জন্যে শেষে বসিয়ে

রাখা হয়েছিল কিন্তু এবার বেষ্ট স্কোরার শুধু নয় লীগের বেষ্ট সেণ্টার ফরোয়ার্ড মুরগেস।' সেণ্টার হাফ বি, সেন ও ব্যাকে আর, মজুমদার অতি উত্তম খেলছে।

কালিঘাটের খেলা তেমন আশাপ্রদ নয়। ডা ডি টেষ্টের রেঙ্গুনে চলে যাওয়ার পর ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভাবে কোন মতে ড্র বা হেরে চলেছে! বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে এমন করে কালিঘাট কতদিন বেঁচে থাকবে।

ইণ্টার-ন্যাসনাল গোলকিপার এস, বানার্জ্জিকে ইচ্ছে করে বসিয়ে রাখবার মানে কি! তারপর ভাল ভাল বাঙ্গালি খেলোয়াড়দের জোর করে টীম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে! লীগে কোনমতে মাঝামাঝি স্থান পেয়েই কালিঘাট সন্তুষ্ট। ক্যালকাটার সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল ইষ্টবেঙ্গলের হাতে ৫ গোল খেয়ে। তারপরও মোহনবাগান ২ গোল দেয়। কিন্তু ভবানী-পুরের সঙ্গে ড্র ও অন্যান্য টীমদের হারিয়ে ক্যালকাটা লীগে মন্দ স্থান করে নি! লীগে কয়েকটা আপসেট এঁরাই করেছে।

ক্যামেরনিয়ান্সকে প্রায় কাষ্টমস হারিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুটো পেনালটীর জোরে গোড়াদল জয়লাভ করে। মহমেডানকে কাষ্টমস সব চেয়ে বেগ দিয়েছিল যদিও শেষ পর্য্যন্ত মহমেডান জয়লাভ করে। ভৌমিক, সিয়ান ও রিবেলো টীমের বেষ্ট খেলোয়াড়। শেষ পর্য্যন্ত লীগে বহু একটা আপ-সেট এরা করবে আশা করা যায়। মোহনবাগানের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। অতি পুরোনো ও জুনিয়ার খেলোয়াড় নিয়ে মোহনবাগান এখনো টিঁকে থাকতে চায়। তার ফলে সেই ক্রীড়ানৈপুণ্য আর নেই—এবং প্রাণপণ দিয়ে খেলে জয়ী হবার উদ্দীপনাও দেখা যায় না। মোহনবাগানের খেলার Standard ছিল তার বিশেষত্ব। জুনিয়ার খেলোয়াড়রা অতি বাজে খেলে নিজেদের অযোগ্য প্রমাণ করেছে। তাই বৃদ্ধ বয়সে কুমারকে নাবতে হল! শেষ পর্য্যন্ত লীগের মাঝামাঝি স্থানে মোহনবাগান পৌঁছবে!

এবার ই, বি, আর তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কয়েকটা গেমে ভাল খেলেও হার স্বীকার করতে হয়েছে। ই, বি, আর-এর সঙ্গে খেলতে নেবে অন্য টীমগুলি আর তেমন ভয় পায়না। একা সামাদ ছাড়া এদের এমন কেউ নেই যে স্কোর করতে পারে! ব্যাকে কার্ভে এখনও সুন্দর খেলছে। লীগে ১৫টী গেমে ৩২টী গোল খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চুপ মুখে

মহমেডান স্পোর্টিং বনাম ডালহৌসী। খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে জয়ী হন।

যে খেলে যাচ্ছে সে কে,' ও, এস, বি! এদের প্রায় গেমেই ৩।৪ গোল লেগেই আছে কিন্তু তাতে কে, ও, এস, বির ভাবনার কিছু নেই। কারণ মিলিটারী টীম বি, ডিভিসনে

নাববে না। সুতরাং খেলায় তত উৎসাহ দিয়ে না খেললেও কিছু আসে যায় না।

এরিয়ান্স ও ডালহৌসি প্রথমে পাল্লা দিয়ে চলেছিল কে নাববে। শেষ কয়েকটী গেমে এরিয়ান্স অতি সুন্দর খেলে ১ম ডিভিসনে স্থান পাকা করে নিয়েছে। মোহনবাগান, ডালহৌসিকে এরিয়ান্স হারিয়েছে। ডালহৌসিকে এবার ২য় ডিভিসনে নাবতে হবে। পুরোণ ও বিখ্যাত ডালহৌসির শোচনীয় অবস্থায় সত্যিই দুঃখ হয়। লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ডালহৌসিই প্রথম লীগ খেলার পত্তন করে। দেখা যাক, I. F. A শেষ পর্য্যন্ত এঁদের সম্বন্ধে কি স্থির করেন!

ই, বি, আর বনাম ইষ্টবেঙ্গল খেলায় ই, বি, আর-এর গোলকিপার একটি গোল বাঁচাচ্ছেন। ইষ্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে জয়ী হন।

প্রথম ডিভিসন লীগ

	খেলা	জয়	ড্র	পরা	গোল স্বঃ	গোল বিঃ	পয়েণ্ট
মহমেডান	১৫	১০	৪	১	৩৪	১১	২৪
ক্যামেরনিয়ান্স	১৭	১২	২	৩	২৮	১২	২৬
ভবানীপুর	১৮	১০	৫	৩	২৯	২০	২৫
ইষ্টবেঙ্গল	১৬	৯	৩	৪	৩৯	১৬	২১
মোহনবাগান	১৭	৬	৪	৭	১৫	১৭	১৬
কালীঘাট	১৩	৭	২	৭	১৭	২৪	১৬
ক্যালকাটা	১৬	৪	৭	৫	১৪	১৭	১৫
ক্যাষ্টমস	১৭	৬	২	৯	১৭	২১	১৪
ই, বি, আর	১৬	৩	৮	৫	১৬	২২	১৪
এরিয়ান্স	১৭	৫	২	১০	২২	৩২	১২
কে, ও, এস, বি	১৬	৪	৪	৮	১৬	৩২	১২
ডালহৌসি	১৭	০	৩	১৪	১০	৩৩	৩

শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী

খেলাধূলার ব্লকগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রতিবাদ

মহাশয়,

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় "খেলা-ধূলা" প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয় রায়চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন···"বাইরে থেকে ধার করা খেলোয়াড় আনিয়ে ভবানীপুর কালীঘাটের মত বাঙালী খেলোয়াড়দের অপমান করেনি।"

এবং লিখেছেন,···"অখিল আমেদ একাই টীমটীকে চালিয়ে নিচ্ছে"—কিন্তু "এই অখিল আমেদ, মহম্মদ হোসেন, বরকৎ, ফৈয়াজ, বুলান ডাক্তার আক্তার— ইহারা কেহই বাঙালী নন, সকলেই "দিল্লীওয়ালা", দিল্লীর স্থায়ী অধিবাসী এবং স্থানীয় বিখ্যাত "ইয়ংম্যানস্ ক্লাবের" সভ্য এবং নিয়মিত খেলোয়াড়।

সুতরাং পাঠকগণ বিচার করবেন লেখক মহাশয়ের এই উক্তি কতদূর সত্য যে "ভবানীপুর বাইরে থেকে ধার করে খেলোয়াড় আনিয়ে···বাঙালী খেলোয়াড়দের অপমান করেনি।"

বাঙলার বাহির হ'তে খেলোয়াড় আমদানী করা যদি বাঙালী খেলোয়াড়দের অপমান করা হয় তবে ভবানীপুরের অপরাধ কালীঘাটের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

শ্রীআশুতোষ সেন

স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-রচিত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৬। মূল্য ১৲।

বঙ্গভাষার মুদ্রিত পুস্তকের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ উপকরণের অভাব। এই ইতিহাস প্রণয়নের পথে আগে বাধা অনেক ছিল, এখনও কম নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা বই ছাপা আরম্ভ হয়। ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে অনেক বই ছাপা হইয়াছিল—সংখ্যায় কত তাহা জানি না। তবে ১৮৫৯ সালে সরকারী রিপোর্টে বাহির হইয়াছিল—"Within the last quarter of a century the number of Bengalee books printed and sold has not been less than 8,000,000, while during half a century more than 1,800 distinct works, either original, or translations from Sanskit, English and Persian have been produced."*

পুরাপুরি অষ্টাদশ শতকে, এমন কি উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত আমাদের ভাষা অনাদৃত ছিল। সাময়িক বিবরণে পাওয়া যায় এবং সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত দেখা যায় যে লোকেরা সংস্কৃত শিখিত, কিন্তু বাঙলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত।† সেইজন্যই দেখা যায়, বই ছাপা হইলেও তখন অনেক বই-ই যত্নসহকারে রক্ষিত হয় নাই। ফলে, বহুপুস্তকের আজ অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে। অনেক পুস্তক কোন কোন বাড়ীতে এখনও আত্মগোপন করিয়া অযত্নরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কীটদংশন-জর্জরিত হইয়া সেগুলিও আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিবে না। এমন অনেক পুস্তক আছে যাহাদের সংবাদ লেখকের উত্তরাধিকারীগণও রাখেন না। অনেকে আবার প্রাচীন পুস্তকের মূল্য বোঝেন না বলিয়াই অনেক দুর্লভ পুস্তক জঞ্জাল মনে করিয়া স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির বেশীর ভাগই বিকলাঙ্গ। আমাদের জাতীয় এই সম্পদের বিনাশের মূলে আমাদের অজ্ঞতা। বঙ্গাক্ষরে বাঙলা পুস্তক মুদ্রিত হইবার প্রথম অবস্থা হইতে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত কত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার সন্ধান এখনও মেলে নাই। কিন্তু ১৮৬৮ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত বই ছাপা হইয়াছে সেগুলির পরিচয় Calcutta Gazette দিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বকালের ছাপা বইগুলির তো সন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধান কার্যে যাঁহারা বদ্ধপরিকর দেশ তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রকারে কৃতজ্ঞ।

আমরা তিনজনের জয়জয়কার দিয়া থাকি—যাঁহারা পুরাতন পুঁথির সংগ্রহ করিয়া সাধারণের উপকারের জন্য

---

* Selections from the Records of the Bengal Government,—1859, p. I, para 2.

† Brahminical Colleges existed at Nadia for 6 centuries and more than 2,000 were established through Bengal. but no pandit connected with them wrote anything in the vulgar tongue for the Profanum Vulgus. The Pandit despised the language asmuch as he did the lower orders."—Ibid, p. X. (form). এ ছাড়া "The Moslem in Bengal allowed no language but Persian as the language in the courts and of Governments", Ibid p. IX.

রক্ষা করেন, যাঁহারা পুরাতন গ্রন্থ সাহিত্যিকদের কাজে লাগাইবার জন্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেন, আর যাঁহারা যে সকল পুরাতন গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না, সেগুলি বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া পুনর্মুদ্রণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রয়েল এসিয়েটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠান পুরাণ পুঁথির আড়ৎ। সকল সময় আমরা এগুলির জয়জয়কার দিয়া থাকি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, এসিয়েটিক সোসাইটী ও উত্তরপাড়া লাইব্রেরী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রন্থাগারে অনেক পুরাতন দুর্লভ গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। যে সব গ্রন্থ অনেক দিন পূর্বে ছাপা হইয়াছে, বাজারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, লোকেদের বাড়ীতে কদাচ মেলে, এই রকমের গ্রন্থ পূর্বে বটতলা ছাপিত; এখনও কিছু কিছু ছাপে। মহেশ পাল ছাপিতেন, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কয়েকখানি ছাপিয়াছেন। যখন সয়ের-উল-মুতাক্ষরীণ বাজারে কোথাও মেলা ভার হইয়াছিল তখন ক্যাম্বে কোম্পানী তাহা ছাপিল। এসিয়েটিক সোসাইটীর বিব্লোথেকা ইণ্ডিকা অনেক দুর্লভ জিনিষ ছাপিয়াছে। বঙ্গবাসীর যোগীন্দ্রনাথ বসু পুরাণগুলি যদি না ছাপিতেন তাহা হইলে পুরাণ আলোচনায় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ষ্টুয়ার্টের হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল যখন দুর্লভ হইল, তাঁরা ছাপিলেন। টডের রাজস্থানও পুনর্মুদ্রিত হইল। টেকচাঁদ ঠাকুরের এবং কালিপ্রসন্ন সিংহের কিছু কিছু বইও ছাপা হইল। কানিংহামের এন্সিয়েণ্ট জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়া সম্পাদন করিয়া ছাপিলেন চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি কোম্পানীরা। আজকাল এই রকম কাজে আর বড় একটা কেহ হাত দেন না। সম্প্রতি সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট এই রকম কাজে হাত দিয়াছে। কিছু কিছু গ্রন্থও ছাপিয়াছে। আজ লিখিতে বড়ই আনন্দ হইতেছে যে বাঙ্গালা ভাষার একেবারে গোড়ার দিকের দুর্লভ কয়েকখানি গ্রন্থ অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকাশ কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব খাটিয়া খুটিয়া গ্রন্থকারদিগের জীবনী, গ্রন্থগুলির প্রায় প্রতি সংস্করণের প্রকাশকাল প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছয়খানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়ক প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্র ও নাট্যশালার ইতিহাসের অন্বেষণের ব্যপদেশে সম্প্রতি দুর্লভ প্রাচীন গ্রন্থমালার মুদ্রণে ব্রতী হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অদম্য উৎসাহের ফলে একে একে ছয়খানি অতি প্রয়োজনীয় প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ পাইলাম। আমরা তাঁহার সম্পাদিত 'কলিকাতা কমলালয়' 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষ সতর্কতা, ভূয়োদর্শন ও প্রকৃত গবেষণার পরিচয় পাইয়াছি; এই নূতন গ্রন্থখানির সম্পাদন-কৃতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে তিনি গৌরমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিচয় অল্প হইলেও তাহাতে ব্রজেন্দ্র বাবু যে সংবাদগুলি দিয়াছেন সেগুলি তাঁহার বিপুল পরিশ্রম ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহারা আকৃষ্ট তাঁহাদেরই এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার গ্রাহক হইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর এই সাধু প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করা উচিত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক

গত ১২ই মে, ১৯৩৭ ইংলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত গির্জ্জা ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার অ্যাবীতে আর্চবিশপ অফ ক্যাণ্টারবরী কর্ত্তৃক মহাসমারোহের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার উৎসবাদি হয়েছিল।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়া-তৃতীয়া উৎসব

বিগত ১৩ই মে হইতে ত্রয়োদশ দিবস ব্যাপী প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ১৫শ বার্ষিক অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। ময়মনসিংহের মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এম্-এল-এ মহাশয় মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী বিভাগে পুরুষোত্তম ও তাঁহার পঞ্চশক্তি—শ্রীসাবিত্রী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীদুর্গা ও শ্রীরাধার ধারা নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমানে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়, শ্রীযুক্ত অতুল বসু, শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে ললিতকলা শাখার সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদিগের সঙ্গীতালাপ, আমোদ-প্রমোদ, নাট্যাভি[illegible] বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, অমিয়প্রসূন দত্ত, ডাঃ কে সাহা ও অন্যান্য সুধীবৃন্দের পরম [illegible]। কি ঐশ্বরিক প্রেরণা ও কর্ম্ম[illegible] শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন তা ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য হতে হয়। বাংলার কথাশিল্পী ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট্ মহাশয় প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্র
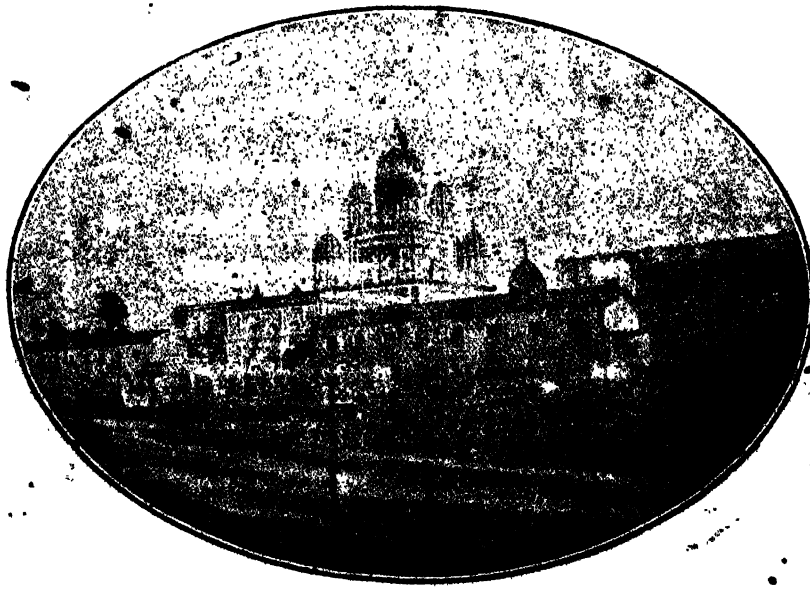
প্রবর্ত্তক-সংঘ যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির

বৃন্দের স্কাউটিং ক্রীড়াকৌশল পরিদর্শনার্থে উপস্থিত হয়ে উৎসবের আনন্দ ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

এই অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সাহিত্য সভার অধিবেশন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দীনেশবাবু বলেন—"সাহিত্য-আলোচনা, কবিতা, উপন্যাস, গল্প-রচনা বা শিল্প-চর্চ্চাই জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বঙ্কিম, মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাধনায় আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া ভারতীয় ভাবধারায় পাশ্চাত্যের দান পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহারা সংগঠন-যজ্ঞের ভিত্তি-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের পথ স্বতন্ত্র। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের উপরই তাঁহারা সাহিত্য, শিক্ষা এবং গঠনকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীঅনুকূল ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাদের অন্যতম।" শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তদ্ভিন্ন কবিতাপাঠ ও সঙ্গীতাদিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাশ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হোক, এই আমাদের ঐকান্তিক কাম্য।

নবদ্বীপ সাহিত্য সভা (ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব)

এই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে আমরা অতিশয় সুখী হ'য়েছি। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের কি রকম আকৃষ্ট করেছে তা' নিম্নলিখিত বিবরণ (প্রাপ্ত) হ'তে সপ্রমাণ হ'বে।

"গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মেলন

সভাপতির সম্বর্দ্ধনা (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ)

সাহিত্য সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সজ্জন ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেলার বহু সাহিত্যসেবী, লেখক ও কবি যোগদান করেন। কবি কালিদাস রায়ের "বুদ্ধ-পূর্ণিমা" শীর্ষক কবিতাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ও সমাগত সাহিত্যসেবীবৃন্দ কবি শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বৈশাখী পূর্ণিমা" নামক কবিতা ও শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী মহাশয়ের "বুদ্ধ-স্মৃতি" শীর্ষক

নিবন্ধটির সবিশেষ প্রশংসা করেন। তাহা ছাড়া গান, বক্তৃতা, আলোচনা প্রত্যেকটিই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। অনুপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে মাননীয় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচিত্রা-সম্পাদক এবং প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীযুত মতিলাল রায় মহাশয়ের পত্র দুখানি পঠিত হইয়াছিল

বাম হ'তে—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যা (বিচিত্রা সম্পাদক), ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীমতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সম্পাদক)

সাহিত্য সভাটির মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণী পাঠ হইলে সম্মেলনের বৃহত্তর আদর্শ সম্বন্ধে সকলে অবগত হন। বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির নাম, যথা—(১) শ্রীযুত সরোজরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বি-এ (সভাপতি) (২) শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ (সহঃ সভাপতি) (৩) শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক) (৪) শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি (সহঃ সম্পাদক) (৫) শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী, কাব্যতীর্থ, (সহঃ সম্পাদক)। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, যথা—(৬) শ্রীযুত রমেশচন্দ্র আচার্য্য, বি-এস-সি (৭) শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ (৮) শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য (৯) শ্রীযুত ননীগোপাল বসু বি-এ (১০) শ্রীযুত আনন্দগোপাল গোস্বামী, কাব্যতীর্থ (১১) শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর গুপ্ত (১২) শ্রীযুত অনিলকুমার গোস্বামী।

পরামর্শ সমিতি—(১) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিচিত্রা-সম্পাদক), সম্পাদক-পরামর্শ সমিতি (২) শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম্পাদক, সাহিত্য পরিষৎ (৩) কবি শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৪) শ্রীযুত মতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক-সম্পাদক (৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী (৬) ডক্টর অধ্যাপক শ্রীযুত বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস।

মধ্যস্থলে সভাপতি কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, তাঁর দক্ষিণে কবি শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তদ্ভিন্ন নবদ্বীপ পূর্ণিমা সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ

পরলোকে রক ফেলার

গত ২৩শে মে ১৯৩৭ আমেরিকার ধনকুবের জন্ ডি রক ফেলার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৯৭ বৎসর বয়স হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর আয়ু শতবর্ষ পূর্ণ করবেন,—কিন্তু সব ইচ্ছাই মানুষের পূর্ণ হয় না, এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম রকফেলারেরও নয়।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের প্রভাবে তিনি বিপুল অর্থ অর্জ্জন করেন। কিন্তু বাল্যকালের দরীদ্র সন্তান রকফেলার এই অর্থ শুধু নিজের ভোগের জন্যই সঞ্চয় করেন নি। তিনি যেমন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন তেমনি একজন শ্রেষ্ঠ দাতাও ছিলেন। জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁর দান অপ্রতিহত ছিল। আমাদের কলিকাতা নগরীও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নি। কলিকাতার রকফেলার ইনষ্টিটিউট একথার প্রমাণ। আমরা কামনা করি রকফেলারের পরলোকগত আত্মা যেন অক্ষয় শান্তি লাভ করে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এ্যাসিওরেন্স্ কোং লিঃ

উক্ত বীমা কোম্পানীর ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ সাল-তামামীর বিবরণী পরীক্ষা করে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছি। ভারতবর্ষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানীর মধ্যে এই কোম্পানীটি অন্যতম এবং ক্রমোন্নতিশীল নিম্নলিখিত কয়েকটি বাব হ'তে একথা সপ্রমাণ হ'বে।

বীমার সাধারণ বিভাগ—গত বৎসর তায়দাদী ১,১০,৪০,৮৫০৲ টাকার ৫৬২১টি প্রস্তাব উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে মোট তায়দাদী ৯১,৮০,০০০৲ টাকার ৪৯১৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপূর্ব্ব বৎসর এই তায়দাদ ছিল ৮৩,৫৩,২৫০৲ টাকা এবং ৫০০ পাউণ্ড।

দাবী পরিশোধ—সাধারণ বিভাগ মৃত্যুর দারা ১৮১টি দাবী উপস্থিত হয়। তার তায়দাদ ছিল মায় বোনাস্ ৩,৮৩,৭৪৫-৪-৮ টাকা। চুক্তিকাল পূরণ হেতু মোট তায়দাদী ১,৯০,২৩০-১১-০ আনা ১১৬টি দাবী মেটানো হয়।

জীবন বীমা তহবীল—জীবন বীমা তহবীল ৬২,৯১,৫৫৭-১৫-৬ পাই হ'তে ৭৪,৯৮,৮৩৩-১৩-৪ পাই তায়দাদে বর্দ্ধিত হ'য়েছে।

ডিভিডেণ্ড—গত বৎসরে ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক শতকরা ৮½ ডিভিডেণ্ট প্রস্তাবিত হ'য়েছে।

নওগাঁ সাধারণ পাঠাগার ও নওগাঁ নওজোয়ান সমিতি

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ অপরাহ্নে নওগাঁ (রাজসাহী) নওজোয়ান সমিতির বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সুবৃহৎ এবং সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে বহু ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। উৎসব সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন খাঁ সাহেব কাজী মহিউদ্দীন সাহেব। প্রবন্ধ পাঠাদি শেষ হ'লে সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হ'য়ে বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় নওজোয়ান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাগণকে তাঁদের কর্ম্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করেন। তৎপরে, এই সভায় বক্তৃতাদানের জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত, ডক্টার সানাউল্লা এম, এ; পি-এইচ, ডি (লণ্ডন); ব্যার-অ্যাট-ল; এম. এল, এ মহাশয় ইসলাম ধর্ম্মের অভিনব ব্যাখ্যা সম্বলিত অতি সারগর্ভ এবং কৌতূহলোদ্দীপক বক্তৃতা দান করেন, এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বিচিত্রা সম্পাদকের সম্বর্দ্ধনার জন্য স্থানীয় সাধারণ পাঠাগার গৃহে একসাইজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মুকুন্দপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। উক্ত সভাতেও ডাঃ সানাউল্লা সাহেব হিন্দু মুসলমানদের মিলনের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। বিচিত্রা সম্পাদক তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে এবং বাঙ্গলা সাহিত্য যে উক্ত ঐক্য সাধনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে তদ্বিষয়ে তিনি তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণের পর ধন্যবাদ প্রদান কালে সব-রেজিষ্ট্রার খাঁ সাহেব মহম্মদ আফজল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি এবং মুসলিম লেখকগণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিচিত্রা সম্পাদককে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন

আগামী বর্ষের বিচিত্রা

আগামী শ্রাবণ মাস হ'তে বিচিত্রার একাদশ বর্ষ আরম্ভ। নূতন বর্ষে বিচিত্রাকে আরও চিত্তাকর্ষক এবং সম্পদশালী করবার জন্য আমরা নানাবিধ আয়োজন করেছি। আশা করি ভগবানের কৃপায় গ্রাহক ও পাঠক সম্প্রদায়ের তুষ্টি বিধানে আমরা সক্ষম হব।

শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকের মধ্যে শ্রাবণের বিচিত্রা গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত হবে। আশা করি যথা-সময়ে ভিঃ পিঃ গ্রহণ ক'রে গ্রাহকগণ আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Sebak Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Tridibhusan Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.